প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

ষোড়শ ভাগ—প্রথম খণ্ড
১৩২৩ সাল, বৈশাখ—আশ্বিন

প্রবাসী কার্য্যালয়
২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

প্রবাসী ১৩২৩ বৈশাখ—আশ্বিন

১৬শ ভাগ ১ম খণ্ড

বিষয়-সূচী

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

চিত্র-সূচী

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩২৩

১ম সংখ্যা

যৌবন

যৌবন রে, তুই কি র'বি সুখের খাঁচাতে ?
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের পরে
পুচ্ছ নাচাতে।
তুই পথহীন সাগরপারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
অবাধ যে তোর ধাওয়া;
ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে
তোর যে দাবী-দাওয়া।

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল, আয়ুর ভিখারী ?
মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে
তুই যে শিকারী।
মৃত্যু যে তোর পাত্রে বহন করে
অমৃতরস নিত্য তোমার তরে ;
বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া
মরণ-ঘোম্‌টা টানি।
সেই আবরণ দেখ্ রে উতারিয়া
মুগ্ধ সে মুখখানি।

যৌবন রে, রয়েছ কোন্ তানের সাধনে ?
তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
পুঁথির বাঁধনে ?
তোমার বাণী দখিন হাওয়ার বীণায়
অরণ্যেরে আপনাকে তার চিনায়।
তোমার বাণী জাগে প্রলয়-মেঘে
ঝড়ের ঝঙ্কারে ;
ঢেউয়ের পরে বাজিয়ে চলে বেগে
বিজয়-ডঙ্কা রে।

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডীতে ?
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।
খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্ঝটিকা,
জীর্ণতারি বক্ষ দু-ফাঁক করে'
অমর পুষ্প তব
আলোকপানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্যনব।

যৌবন রে, তুই কি হবি ধূলায় লুণ্ঠিত ?
আবর্জ্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানি-ভারে
রইবি কুণ্ঠিত ?
প্রভাত যে তার সোনার মুকুটখানি
তোমার তরে প্রত্যুষে দেয় আনি,
আগুন আছে ঊর্দ্ধশিখা জ্বেলে
তোমার সে যে কবি।
সূর্য্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।

শান্তি[illegible] চৈত্র ১৩২২ । শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবিধ প্রসঙ্গ

নেতৃত্বের হ্রাস।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৮১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত হইতে মান্দ্রাজে আসেন এবং ১৮২৩ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত গবর্ণর-জেনারেলের কাজ করেন। তিনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ১৮১৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত একটি ডায়েরী লিখিয়াছিলেন। এই দৈনন্দিন-লিপিতে ১৮১৫ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী আগ্রার দুর্গ দর্শন উপলক্ষে তিনি লিখিয়াছেন :—

"ইহার উচ্চ ও বিশাল সিংহদ্বারগুলির ভিতর দিয়া যাইবার সময় প্রথমেই আমার মনে এই বিস্ময়ের ভাবের উদয় হইল, যে, যে-জাতির মানুষেরা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? যাহারা এখন এই প্রদেশে বাস করে, তাহারা ত মনে এত বড় একটি জিনিষের কল্পনা ও ধারণা করিয়া এত বড় বড় পাথর দিয়া এমন কারিগরীর সহিত ইহা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ নহে। ইহা খুবই সত্য যে রাজার চরিত্র সত্বরই প্রজাবর্গের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যতদিন মুসলমান সম্রাটেরা আপনাদের কর্ম্মিষ্ঠতা ও শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহাদের প্রজারাও গৌরবপূর্ণ কার্য্য করিতে সমর্থ ছিল। ......উচ্চ-শ্রেণীর মুসলমানেরা বস্তুতঃ শীঘ্রই ব্যসনাসক্ত ও পৌরুষহীন হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহা হয় নাই। তাহারা জাতীয় গৌরবের অনুভূতি হারাইয়াছে বটে,......; কিন্তু তাহাদিগকে প্রায়ই সৈনিকের কাজ করিতে হইত বলিয়া তাহারা পুরুষানুক্রমে ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধপ্রিয় ও সাহসী রহিয়াছে। বাস্তবিক, মুসলমানেরা নিশ্চয়ই সর্ব্বদা এইরূপ মনে করিয়া থাকিবে যে তাহারা তাহাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী হিন্দুদের মধ্যে সশস্ত্র সন্ধির অবস্থায় বাস করিতেছে। এই কারণে তলোয়ারের উপর অনুরাগ তাহারা পোষণ করিয়া আসিতেছে, এবং মুসলমানদের মনের ভাব এইরূপ হওয়ায় হিন্দুরাও [illegible] অস্ত্র ব্যবহারে আপনাদিগকে অভ্যস্ত রাখিয়াছে। এই-সব প্রদেশে পৌরুষ আছে বলিয়া আমি যে লক্ষ্য করিয়াছি, এইরূপ অবস্থাই তাহার কারণ। আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই শৌর্য্যকে সকল অবস্থায় দৃঢ় রাখিতে হইলে যে মনের প্রসার, নানা বিষয়ে বুদ্ধির দৌড় এবং উচ্চ বা বড় লক্ষ্যের প্রয়োজন, তাহা ইহাদের নাই; এই জন্য কোন দিকে কোন একটা বড় সাহসের ও শক্তির কাজ করিতে গেলে তাহারা আমাদের নেতৃত্বের প্রয়োজন অনুভব করে। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তখন এরূপ অবস্থা ছিল না। সাধারণ লোকেরা ইহা নির্ম্মাণ করিতে যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা শুধু শারীরিক শ্রমের সাহায্য নহে। ইহার প্রত্যেক অংশ যে ভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে মিস্ত্রিরা স্থাপত্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিয়ম জানিত, এবং তদনুসারে কাজ করিতেও পারিত।" *

* "The first sensation I felt in passing through its tall and massive gateways, was wonder at what had become of the race of men by whom such a pile had been raised. The magnitude of the plan, the size of the stones which composed the walls, and the style of the finishing, do not belong to the class of inhabitants now seen in these regions. So true it is that the character of a sovereign imparts itself speedily to all whom he sways. As long as the Mussulman Emperors preserved their individual energy, the people over whom they ruled were capable of proud and dignified exertions.........The higher classes, in fact, became rapidly vitiated and effeminate; not so the lower orders. These lost, indeed, a sense of national pride.........; but the constant call for military service, to which they thought themselves born, has kept them from generation to generation individually martial. In truth the Mussulman part of the population must have felt itself as at all times living only under an armed truce amid the more numerous Hindus. Thence the attachment to the sabre has been maintained, and this disposition in the Mussulman has caused the Hindoo to habituate himself to arms in self-defence. This is what has occasioned the manly spirit observed by me as so prevalent in these upper provinces. It is, luckily for us, a spirit unsustained by scope of mind; so that for an enterprise of magnitude in any line, these people require our guidance. Such was not the case when their forefathers built this fort. The help contributed by the multitude in raising it has not been

কর্ম্মক্ষেত্র।

বড় কাজ মাত্রেরই দুটা অংশ আছে। শ্রেষ্ঠ অংশটিতে মানসিক শক্তির অধিক প্রয়োজন; অন্য অংশটিতে মানসিক শক্তি বেশী না থাকিলেও চলে, শারীরিক শ্রম করিবার ক্ষমতাই বেশী আবশ্যক। দুই রকমের কাজের উল্লেখ করিয়া মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ দেখাইয়াছেন যে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় ও তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের লোকদের মানসিক ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছিল। প্রথমটি যুদ্ধ। এখন যেমন ভারতীয় সিপাহীরা খুব সাহসী যোদ্ধা, তখনও তেমনি সাহসী ছিল। কিন্তু সেনাপতির যে নেতৃত্বশক্তি থাকা দরকার, তাহা কমিয়া গিয়াছিল। সিপাহীদিগকে যেমন ভাবে প্রাণ দিতে বল, তাহারা তাহা দিতে, এখনকার মত, তখনও প্রস্তুত এবং সমর্থ ছিল; কিন্তু যুদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুরূপ যে-সকল উপায় বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে হয়, তাহা করিবার লোক ছিল না, এবং লক্ষ্য স্থির করিয়া দৃঢ়তার সহিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া থাকিবার মত মনের জোরও ছিল না। যুদ্ধের উদ্দেশ্য নানাবিধ;—পররাজ্য আক্রমণ করিয়া তথায় নিজ রাজত্ব স্থাপন, আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া দেশের শান্তি, শক্তি, ও সমৃদ্ধি রক্ষা, ইত্যাদি। মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ নিজের ডায়েরীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার সময়ে উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে সমাজের যে-সব নিম্নশ্রেণীর লোকে সিপাহী হইত, তাহারা সাহসী ও রণনিপুণ ছিল বটে, কিন্তু তাহারা সেনাপতির হাতের অস্ত্রের মত ছিল; যাহা করিতে বলিবে অকুতোভয়ে করিয়া দিবে; কিন্তু কি করিতে হইবে, কেন করিতে হইবে, করিতে পারা যাইবে কি না, সঙ্কট-সময়ে কি কর্ত্তব্য, এ-সব স্থির করিবার মত মানসিকশক্তিবিশিষ্ট দেশী নেতা তাহাদের ছিল না। ইংরেজের নেতৃত্বে তাহারা আশ্চর্য্য কাজ করিতে পারিত, এবং এখন পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছে; কিন্তু ইংরেজের পরিচালনা ভিন্ন পারিত না। সে সময়ের অবস্থা বুঝিয়া হেষ্টিংস্ ইহাকে ইংরেজদের সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াছেন।* কারণ দেশীলোকদের শারীরিক সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, ও অস্ত্রচালনে দক্ষতা যেমন ছিল, মানসিকশক্তি ও দৃঢ়তা এবং উচ্চ লক্ষ্য সেরূপ থাকিলে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না, এবং তাঁহারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভারতের মঙ্গল করিবার সুযোগ পাইতেন না। একশত বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা ও দেশের লোকের মনের ভাব যেরূপ ছিল, এখন ঠিক্ সেরূপ নাই। তখন প্রধান প্রধান লোকদের মনে সম্ভবতঃ ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রবল ছিল; এখন তাহা নাই। সুতরাং এখন সুবুদ্ধি ও বিচক্ষণ ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে এরূপ বলা বা মনে করা বোধ হয় ঠিক্ হইবে না, যে, ভারতবাসীরা ইংরেজের হাতের অস্ত্রস্বরূপই হইয়া থাকুক, আপনারাই আপনাদিগকে পরিচালন করিবার ক্ষমতা তাহাদের জন্মিয়া কাজ নাই। হেষ্টিংস্ আবার জন্মিয়া ভারতে আসিলেও এরূপ কথা কখনই বলিতেন না; কেননা ১৮১৮ সালের ১৭ই মে তিনি তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন যে অনতিদূর ভবিষ্যতে এমন সময় আসিবে, যখন সুযুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিয়া, ইংলণ্ড, ক্রমে ক্রমে ও অনভিপ্রেত ভাবে ভারতবর্ষের উপর যে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, যাহা তিনি এখন ছাড়িয়া দিতে পারেন না, তাহা তিনি ছাড়িয়া দিবেন।* এখন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার কথা কোন ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ বলেন না বটে, কিন্তু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষকে অন্যান্য অংশের মত স্বরাজ দেওয়া উচিত তাহা অনেকে বলিতেছেন। তদ্ভিন্ন, বর্ত্তমান যুদ্ধেই দেখা যাইতেছে, যে, যদি ইংলণ্ড আগে-হইতে ভারতবাসীদিগকে, প্রদেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে, কেবল ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুসারে, সিপাহী ও সেনানায়ক হইবার ক্ষমতা দিতেন, তাহাহইলে ব্রিটিশ পক্ষে যথেষ্ট সৈনিক ও সেনানায়কের অভাবে যুদ্ধ এত দীর্ঘকালব্যাপী হইত না; এত

* ...mere bodily labour. The execution of every part of it indicates workmen conversant with the principles and best practice of their art."—*The Private Journal of the Marquess of Hastings. Reprinted by the Panini Office, Allahabad.*

* "A time not very remote will arrive when England will, on sound principles of policy, wish to relinquish the domination which she has gradually and unintentionally assumed over this country and from which she cannot at present recede."—*The Private Journal of the Marquess of Hastings.*

দিনে জার্ম্মেনী পরাজিত হইয়া যাইত। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কারণ আছে। এই যুদ্ধ ত আর শেষ যুদ্ধ নয়। এশিয়ার এবং এশিয়ার কোন কোন দেশের প্রভুত্ব লইয়া ইহা অপেক্ষা ঘোরতর যুদ্ধ আমাদের জীবিতকালেই হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সে যুদ্ধে এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য খুব বেশী পরিমাণে ভারতবর্ষীয় সৈন্য ও সেনানায়কের প্রয়োজন হইতে পারে। ইংলণ্ড হইতে এবং ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সকল হইতে এরূপ মহাসংগ্রামের জন্য যথেষ্ট শ্বেতকায় সৈন্য ও সেনানায়ক পাওয়া যাইবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও অন্য কয়েকটি সাম্রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোট অধিবাসীর সংখ্যা মোটামুটি ৪৩ কোটি। তাহার মধ্যে কেবল ৬ কোটি শ্বেতকায়। বাকী ৩৭ কোটির মধ্যে সাড়ে একত্রিশ কোটি ভারতবাসী। চীন সাধারণ-তন্ত্রের লোক-সংখ্যা ৩২ কোটি। জাপান চীনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে চেষ্টা সফল হইলে জাপানের সৈন্যবল অতিমাত্রায় বাড়িবে। খাস্ জাপানীর সংখ্যা পাঁচ কোটি ৩৬ লক্ষ। তা ছাড়া, জাপানের অধীন কোরিয়া ও ফর্মোজার লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি। রুশিয়ার লোকসংখ্যা সাড়ে সতর কোটি। জার্ম্মেন সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি লইয়া মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ ভারতবাসীদের মানসিক শক্তির অবনতি হইয়াছে বলিয়াছেন, তাহা 'স্থাপত্য'। তাঁহার মন্তব্যের অর্থ এই যে পূর্ব্বে ভারতবাসীরা নিজেই দুর্গ, প্রাসাদ, অট্টালিকা, স্তূপ, দেবমন্দির, মসজিদ, সমাধিমন্দির, সেতু, খাল, প্রভৃতির কল্পনা, নক্সা, ধারণা, নিজেরাই করিত, এবং তাহাদেরই নেতৃত্বে ভারতীয় মিস্ত্রি ও মজুরদের দ্বারা এই-সব ইমারৎ নির্ম্মিত হইত; মিস্ত্রিরাও স্থাপত্য-কলা জানিত এবং তদনুসারে কাজ করিত। এখন কল্পনা ও বুদ্ধির অংশটা, পরিচালনাটা, ইংরেজের দ্বারা হইতেছে; ভারতবাসীরা দেহের, হাতের খাটুনিটা খাটিয়া দিতেছে। এ-সব বিষয়ে বুদ্ধির কাজ একবারেই ভারতবাসীরা করে না, এমন নয়; কিন্তু যাহা করে, তাহা নিম্নস্থানীয়। নেতৃত্ব ও দায়িত্ব তাহাদের নয়।

অন্যান্য কার্য্যক্ষেত্রে।

মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস কেবল দুটি কার্য্যক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু অন্য অনেক কার্য্যক্ষেত্রেও কাজের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব আমরা হারাইয়াছি। ধর্ম্ম-ও-সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে ভিন্নধর্ম্মী ও ভিন্নদেশীয় লোকদের হাত দিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু তাহাতেও আমরা নিজের ঘর সম্পূর্ণ নিজেরা সামলাইতে না পারিয়া বিদেশীর আশ্রয় লইয়াছি। আমাদের দেশের বিধবাদের বিবাহ চলিবে কি না, বিদেশী শাসনকর্ত্তারা তাহার জন্য আইন করিয়াছেন; ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোকদের বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য একটি আইন কেশববাবু করাইয়াছিলেন, তদপেক্ষা বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য একটি আইন করাইবার ব্যর্থ চেষ্টা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু করিয়াছেন। অথচ এইরূপ বিবাহ প্রাচীন ভারতে চলিত, এখনও হিন্দুরাজ্য নেপালে চলে। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়, কেশববাবু, বা ভূপেন্দ্রবাবুর কার্য্যের ও চেষ্টার নিন্দা করিতেছি না; কেবল এই বলিতেছি যে যে-সব বিষয় নিতান্তই আমাদের ঘরোআ ব্যাপার, তাহার নিষ্পত্তির জন্যও আমরা বিদেশীর আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি। শুধু হিন্দু-সমাজেই যে এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহা নয়, মুসলমানদের বিবাহ এবং ধর্ম্মার্থ দান প্রভৃতি ব্যাপারও বিদেশীর ব্যবস্থা দ্বারা নিয়মিত হইতেছে।

কারণ জিজ্ঞাসা।

দেশবাসী সমুদয় শ্রেণীর লোকদের ভাবিবার বিষয় এই, যে, একটি একটি মানুষ ধরিলে ভারতবাসীদের মধ্যে সকল রকম দৈহিক ও মানসিক শক্তি ও যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সমুদয় ভারতীয় মানুষের সমষ্টি দুর্ব্বল ও অবনত। ইহার কারণ কি? হঠাৎ ইহার এই একটা সোজা উত্তর মনে আসিতে পারে, যে, শক্তিমান্ ও যোগ্য লোকের সংখ্যা সমুদয় অধিবাসীর তুলনায় অত্যন্ত কম, এই জন্য আমরা হীনদশাপন্ন। কিন্তু এই উত্তর সম্পূর্ণরূপে ভ্রমপূর্ণ না হইলেও ইহা সন্তোষজনক নহে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। জাতীয় শক্তির একটা ভিত্তি সামরিক শক্তি। এই সামরিক শক্তির জন্য দেশের অধিকাংশ

লোকের স্যাণ্ডোর মত বলবান হওয়া আবশ্যক নয়। স্যাণ্ডো বা রামমূর্ত্তির সংখ্যা সব দেশেই কম। এ কথাও বলিবার জো নাই যে ভারতবর্ষের লোকেরা ভাল সৈনিক হয় না। ক্লাইবের আমলে বাঙ্গালী, বিহারী ও তেলেঙ্গা সিপাহীরাই ভারতবর্ষে ইংরেজরাজত্ব-স্থাপনের মূলীভূত ছিল। এখনও ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকায় ভারতের যে যে প্রদেশের লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পাইয়াছে, তাহারাই অন্য দেশসমূহের সৈন্যদের সমান সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, ও অস্ত্রচালন-দক্ষতার পরিচয় দিতেছে।

অথচ ভারতবর্ষকে সামরিক হিসাবে পৃথিবীর লোকে দুর্ব্বল বলিয়া মনে করে, এবং এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ভারতবর্ষের যে-সব রাজমিস্ত্রী আগে কত দুর্গ, স্তূপ, সেতু, মন্দির, মসজিদ, সমাধিমন্দির, গড়িয়াছে, এখনও এইরূপ কাজে লাগাইলে তাহাদের বংশধরেরা নিজেদের কাজ উত্তমরূপে করে। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় ভারতবাসীরা পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মজুরী পর্য্যন্ত সমুদয় কাজ করে না, সমুদয় কাজের উপযুক্ত বিবেচিত হয় না।

ভারতবর্ষের সৈন্যেরা যেমন অন্য যে-কোন দেশের সৈন্যদের মত যুদ্ধ করিতে পারে, ভারতবর্ষের কারিগরেরাও তেমনি সরকারী কারখানায় যুদ্ধের অস্ত্র, গোলাগুলি, শেল প্রস্তুত করে, এবং তাহা বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতবর্ষের কারিগরেরাই আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের উদ্ভাবিত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসকল নির্ম্মাণ করিয়াছে। কলকারখানার জন্য বিখ্যাত আমেরিকা হইতে এই সকল যন্ত্রের জন্য ফরমাইস্ আসে। ভারতবর্ষের রেলওয়ের কারখানায়, জেসপ, বার্ন, প্রভৃতি ইংরেজ কোম্পানীর কারখানায় দেশী কারিগরেরাই নানা রকম যন্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ নির্ম্মাণ করে। ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে করে বটে, কিন্তু শিল্পনৈপুণ্যটা দেশী কারিগরদেরই। শাসনবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, বিচারবিভাগ, রাজস্ববিভাগ, মন্ত্রীসভা, ব্যবস্থাপক সভা, যেখানে ভারতবাসী কাজ করিতে পায়, সেখানেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে।

অথচ মোটের উপর ভারতবাসী যে-কোন উচ্চ কাজের যোগ্য, ইহা স্বীকৃত হয় না। শুধু যে ইংরেজেরা স্বীকার করে না, তাহা নয়; আমাদেরই দেশের লোক কোন একজন উচ্চপদস্থ দেশী কর্ম্মচারীর কোন ত্রুটি দেখিলে তাহা জাতিগত, এবং কোন একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীর কোন গুণ দেখিলে তাহাও জাতিগত মনে করেন। পক্ষান্তরে, তাঁহারাই কোন দেশী কর্ম্মচারীর যোগ্যতা এবং কোন ইংরেজ কর্ম্মচারীর অযোগ্যতা ব্যতিক্রমস্থল মনে করেন।

আমাদেরই দেশের লেখকদের দ্বারা দেশভাষায় স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখাইয়া ম্যাকমিলান প্রভৃতি ইংরেজ প্রকাশকগণ খুব টাকা করিতেছেন। এই-সব লোকদের বহি দেশী প্রকাশক ছাপিলে তাহা চলিত না। এই-সব বহির ছাপা যে অতুলনীয় সুন্দর, তাহাও নয়।

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন পর্য্যন্ত অল্পলোকেই করিয়াছেন। কিন্তু যে কয়জন চেষ্টা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে খুব বেশী অংশ অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অথচ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আমাদের ক্ষমতা স্বীকৃত হয় না; কেননা আমাদের মধ্যে আবিষ্কারকের সংখ্যা খুব কম! এক শতাব্দী পূর্ব্বে পাশ্চাত্য কোন দেশেই ত গণ্ডায় গণ্ডায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক জন্মে নাই; তাহার পর কিন্তু বিস্তর জন্মিয়াছে।

যাহা হউক, এখন কথাটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে। পাশ্চাত্যেরা বলিতেছেন, "তোমরা অযোগ্য, তাই কোন বড় কাজ করিবার ভার পাও না।" স্বদেশভক্ত ভারতবাসীরা বলিতেছেন, "আমরা যোগ্য, কিন্তু তোমরা সুযোগ দিতেছ না বলিয়া আমরা যোগ্যতা সপ্রমাণ করিতে পারিতেছি না।" তৃতীয় পক্ষ বলিতে পারেন, "অপরে তোমাদিগকে যোগ্য মনে করিবে তবে তোমরা যোগ্য বিবেচিত হইবে, অপরে তোমাদিগকে সুযোগ দিবে, তবে তোমরা বড় কাজ করিতে পারিবে, এ অবস্থায় তোমরা আসিলে কেমন করিয়া? কি কারণে এই অবস্থাটা ঘটিল?"

উত্তরের সন্ধান

সকল পক্ষেরই সত্য বলিয়া ধারণা হয়, এরূপ কোন উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ। প্রশ্নটি সকলের নিকট উপস্থিত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

মানসিক শক্তি ও মানসিক উৎকর্ষলাভের চেষ্টা কোন

দেশে কেবল কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে তাহা সে দেশের পক্ষে মঙ্গলের কারণ হয় না। রক্তের, মানসিক শক্তির, সামরিক দক্ষতার, বা অন্য কোন প্রকারের আভিজাত্য কয়েকটি শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকিলে তাহা অকল্যাণকর হয়। সকল দেশেই অভিজাত-শ্রেণী ক্রমশ নির্ব্বংশ হইয়া পরিশেষে লোপ পায়, যদি অন্য শ্রেণীর লোকেরা অভিজাত-শ্রেণীতে উন্নতিলাভের সুযোগ পাইয়া তাহাকে পুষ্ট করিতে না পারে।

দেশ রক্ষার এবং দেশের গৌরব রক্ষার ভার কেবল কয়েকটি শ্রেণীর উপর অর্পিত থাকিলে দেশের শক্তি ও সমৃদ্ধি লোপ এবং দেশের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। জাতি, বংশ ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে কেবল যোগ্যতা-অনুসারে সকলেরই সেনা-নায়ক হইবার অধিকার না থাকিলে দেশে নেতৃত্বের বিকাশ ভাল করিয়া হয় না, সুতরাং দেশরক্ষা দুঃসাধ্য হয়। কোন প্রকার বৈধ ব্যবসায়, বৃত্তি বা কাজ হেয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নহে। যে কাজ, বৃত্তি বা ব্যবসায় হেয় বিবেচিত হয়, তাহা সমাজের মানসিকশক্তিসম্পন্ন লোকেরা অবলম্বন করে না; সুতরাং তাহার ক্রমোন্নতি না হইয়া ক্রমিক অবনতি হইতে থাকে। যাহা হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্ততপক্ষে যাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইলেও সম্মান ও গৌরবের কারণ হয় না, সেরূপ বৃত্তি, ব্যবসায় বা কাজ যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়, তাহারাও উহাতে সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ ও গৌরব অনুভব করিতে না পারায়, তাহাদের যতটুকু মানসিকশক্তি আছে, তাহাও উহাতে পূর্ণমাত্রায় প্রযুক্ত হয় না। এই কারণেও উহার উন্নতি হয় না। সুতরাং ঐ-সকল বৃত্তি বা কাজে বাহির হইতে প্রতিভার আমদানী না হওয়ায়, এবং উহা যাহাদের ব্যবসায় তাহাদেরও শক্তি উহাতে প্রযুক্ত না হওয়ায় উহার অবনতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

অনেক লোক আছে, যাহারা তত্ত্বাবধায়কের চোখের সামনে ভিন্ন ভাল করিয়া কাজ করে না,—আলস্য করে, ফাঁকি দেয়; যেমন, অনেক শিক্ষক, কেরানী, কারিগর, মজুর, ইত্যাদি। তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন ও পরিমাণ সব দেশে সমান নয়। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি না, কিন্তু শুনিয়াছি, যে, আমাদের দেশের লোকজনকে কাজ করাইতে হইলে যত তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয়, ইংরেজ, জার্ম্মেন, চীনা, প্রভৃতিকে কাজ করাইতে হইলে তত পরি-দর্শনের প্রয়োজন হয় না। ইহা সত্য কি না বলিতে পারি না। কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় আমরা যেমনই হই, ইহা সত্য যে আমাদের দেশের লোকদিগের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে হইলে তাহাদের উপর বড় বেশী নজর রাখিতে হয়। যাহারা কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে কাজ করে না, ভয়ে করে, তাহারা দেশী উপরওয়ালা অপেক্ষা ইংরেজ উপর-ওয়ালার অধীনে যে বেশী কাজ করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ দেশী লোক অপেক্ষা ইংরেজকে অধিক ভয় করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

যাহারা কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে কাজ করে না, ভয়ে করে, তাহারা স্বয়ং স্বাধীন ভাবে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পাইতে পারে না। অন্যদিকে ইহাও সত্য যে, যদি লোকে বড় কাজে স্বাধীন দায়িত্বভার বহন করিতে অনভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্ববোধ এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান কমিয়া আসে; কারণ, তাহারা মনে করে যে তাহাদের উপর দেশের বা সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে না।

নিজের সম্বন্ধে হীন ধারণা, মানুষের উন্নতির অন্তরায়, এবং অবনতির কারণ। আমি চেষ্টা করিলে ঠিক অন্যের মত কর্ম্মিষ্ঠ ও কর্ম্মনিষ্ঠ হইতে পারি, আমার জাতি ঠিক অন্যজাতির মত কর্ম্মী ও শক্তিশালী হইতে পারে, এই বিশ্বাস না থাকিলে কোন মহৎ বা কঠিন কাজ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অন্য দিকে আবার যদি কোন দেশের মানুষ দেখে যে তাহাদের জাতির কাহারও দ্বারা বড় কাজ হইতেছে না, তাহা হইলে নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া দুর্ঘট। এইখানে এমন এক এক জন অসাধারণ রকম মানুষের দরকার হয় যাঁহাদের নিজেদের উপর এবং নিজেদের জাতির উপর বিশ্বাস দৃষ্টান্তের অপেক্ষা রাখে না, যাঁহারা আত্মোপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা বুঝিয়াছেন, যে, শক্তির উৎস সকল জাতির মানুষের আত্মার মধ্যে রহিয়াছে। এই অসামান্য মানুষেরা যখন নিজের জীবন, চরিত্র ও বাক্য দ্বারা আহ্বান করেন, তখন দুর্ব্বলচেতারাও, অল্পবিশ্বাসীরাও প্রাণে বল পায় এবং তাঁহাদের বিধিদত্ত পতাকার অনুসরণ করে। এমন মানুষ আমাদের দেশে জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের

আহ্বান, তাঁহাদের আশ্বাসবাণী, আমরা কি শুনিতে পাইতেছি না? যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা তন্দ্রালস ত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। কিন্তু মানুষের কথার উদ্দীপনা স্থায়ী হয় না। মানুষের কথায় জাগিয়া যদি আমরা আত্মস্থ হই, এবং নিজের নিজের আত্মাতেই বিধিনিহিত শক্তি খুঁজিয়া পাই, তাহা হইলেই আমরা অক্ষয় বলে বলী হইতে পারি।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী অধ্যাপক।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র বসু আমেরিকার আইওা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন। তিনি ঢাকাজেলার কেওটখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল তথাকার ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। উহার প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার ভ্রাতা। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকা যান, এবং তদবধি সেখানে আছেন। তিনি প্রথমে মিসোরি রাষ্ট্রের পার্ক কলেজে অধ্যয়ন করেন, এবং পরে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া ১৯০৭ সালে তথাকার বি-এ হন। তাহার পর-বৎসর তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট বৃত্তি পান। এখানে তিনি "ডেলী মেরূন" নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিক কাগজের সম্পাদকসমিতির অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন। তাহার পর আবার ইলিনয়ে আসিয়া ১৯০৯ সালে ইংরেজীভাষা ও সাহিত্যে এম্ এ উপাধি পান। অতঃপর তিনি একবৎসর আমেরিকার দক্ষিণ রাষ্ট্রসকলে ভ্রমণ ও অধ্যয়ন করেন। ১৯১০ সালে তিনি গবেষণাকার্য্য করিবার জন্য আইওা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। সেখানে তিনি দুইবার রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞানে ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ইহার কিছুপরে ঐ বিদ্যালয় তাঁহাকে নূতন প্রতিষ্ঠিত "প্রাচ্য রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতা"র অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আইওা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টার অব্ ফিলসফী উপাধি প্রদান করেন। ইহার পর হইতে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন। তাঁহার অধ্যাপনার বিষয়

শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু এম-এ, পি এইচ-ডি।

"বিশ্ব-রাষ্ট্রনীতি," "ঔপনিবেশিক শাসন-কার্য্য," "প্রাচ্যরাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতা।"

ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা যাহাতে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিশ্বিদ্যালয়-সকলে প্রবেশ করিতে পারে, ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু সে বিষয়ে মন দিয়া থাকেন। তিনি আমেরিকায় হিন্দুস্থান সভা স্থাপন করিয়া প্রথম দুই বৎসর ইহার জাতীয় সভাপতির কাজ করিয়াছেন। এই সভা ভারতবর্ষীয় যে ছাত্রের আমেরিকার যে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলে বেশী উপকার হইবে, তাহাকে তথায় ভর্ত্তি করাইতে চেষ্টা করেন, এবং ছাত্রকে এজন্য যাহাতে বেশী কষ্ট পাইতে না হয়, তাহা দেখেন। হিন্দুস্থান এসোসিয়েশান বা সভা নানাপ্রকারে ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের বন্ধু ও পরামর্শদাতার কাজ করেন। এই সভা 'হিন্দুস্থানী ষ্টুডেণ্ট' নামক একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রমণ্ডল

(U. S. A.) হিন্দুদিগের আমেরিকায় প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য একটি আইন করিবার চেষ্টা করেন, তখন সুধীন্দ্র বাবু রাজধানী ওাশিংটন' গিয়া সরকারী কমিটির সমক্ষে উহার বিরুদ্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও বিশেষ দক্ষতার সহিত নানা যুক্তি উপস্থিত করেন।

সুধীন্দ্রবাবু মডার্ন রিভিউ প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় মাসিক পত্রে সকলে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি আইওার "হক-আই" (Hawk-eye) নামক বার্ষিক পত্রিকার একজন সম্পাদক ছিলেন।

তিনি স্বকৃত পুরুষ। প্রায় কিছু পুঁজি না লইয়া তিনি আমেরিকায় জীবনসংগ্রাম আরম্ভ করেন, এবং ধৈর্য্য ও পরিশ্রমদ্বারা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন।

ইতিহাসে বিধাতার বিধান।

যাহা কল্যাণকর, তাহাকেই আমরা বিধাতার বিধান বলিয়া মনে করি। যাহা সাক্ষাৎভাবে অশুভ, পরে তাহাও পরোক্ষভাবে মঙ্গলের কারণ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও এই অমঙ্গলটিকে আমরা বিধাতার বিধান বলি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দাসত্বপ্রথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনেক লক্ষ নিগ্রো পুরুষ নারী বালক বালিকাকে আফ্রিকা হইতে ধরিয়া আনিয়া আমেরিকায় দাসত্বে নিযুক্ত করা হইত। তাহাদিগকে পশুর মত ক্রয়বিক্রয় করা হইত, নির্দ্দয়ভাবে প্রহার ও কখন কখন বধ করা হইত, স্ত্রীলোকদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করা হইত; সহজে কল্পনা করা যায় না এরূপ আসুরিক অত্যাচার তাহাদের উপর হইত। "টম কাকার কুটীর" (Uncle Tom's Cabin) যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা এ-সব অবগত আছেন। এখনও প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক নিগ্রো পুরুষ নারীকে বিনা বিচারে আমেরিকার উত্তেজিত পশুবৎ জনতা কোথাও কোথাও ফাঁসী দিয়া বা পুড়াইয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু নিগ্রোরা যে ভাবে বা যে কারণেই আমেরিকায় আনীত হইয়া থাকুক, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা পাইবার পর এখন তাহারা হাজারে হাজারে সুশিক্ষিত, সুসভ্য ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এখন লক্ষ লক্ষ নিগ্রো সকল বিষয়ে শ্বেতকায়দের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকায় যে-সকল নিগ্রো আছে, তাহারা এরূপ শিক্ষিত, সভ্য ও সমৃদ্ধ নহে। আমেরিকার নিগ্রোরাও এইরূপ হীন অবস্থায় থাকিত, যদি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দাসরূপে আমেরিকায় নীত না হইত। কিন্তু তা বলিয়া কোন জাতির মানুষকে দাসে পরিণত করা, তাহাকে পশুর মত ক্রয়বিক্রয় করা, নিষ্ঠুরভাবে তাহার উপর অত্যাচার করা, কোন জাতির স্ত্রীলোকের সতীত্বের কোন মূল্য নাই মনে করিয়া তাহার উপর আসুরিক অত্যাচার করা, এ-গুলাকে আমরা বিধাতার বিধান কেমন করিয়া বলিতে পারি? পরোক্ষভাবে দাসত্ব উপলক্ষে সুফল ফলিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য দাসত্বকেই বিধাতার বিধান মনে করিয়া শিক্ষিত নিগ্রোরা তাহারই স্থায়িত্ব সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে নাই। সত্য বটে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বনিয়ন্তা। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলেরই জন্য তিনি দায়ী কিনা, এই প্রাচীন প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা এখানে করিব না।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাই, উহা পরে পরে রোমান, স্যাক্সন, ডেন ও নর্ম্মানদের দ্বারা বিজিত হইয়াছে তথায় নানা বিপ্লব ঘটিয়াছে, এমন কি প্রজার হাতে রাজার প্রাণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। রক্তপাতশূন্য নানা চেষ্টা, নানা দাঙ্গাহাঙ্গামা, নানা যুদ্ধের ভিতর দিয়া, প্রজাশক্তি ক্রমশঃ প্রবলতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু কোন অবস্থা বা ঘটনাকেই ইংলণ্ডের লোকেরা বিধাতার স্থায়ী বিধান মনে করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন করে নাই। আমি যদি লাহোর যাইতে চাই, তাহা হইলে রেলগাড়ীর কর্ম্মচারী-বিশেষের উপদ্রবকে যেমন বিধাতার বিধান মনে করি না, তেমনি এলাহাবাদ, আগ্রা বা দিল্লীর কোন ভাল সরাইয়ে কিছুকাল আরামে যাপন করিতে পাইয়া, তাহাকে বিধাতার বিধান মনে করিয়া সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাসও করি না। লাহোর যাত্রাই যে আমার লক্ষ্য, তাহা বিস্মৃত হই না।

ভারতবর্ষ মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হওয়ায় যেমন বিজয়-কালে ও পরে অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল, তেমনই দেশের অনেক উপকারও হইয়াছিল। উপকারটুকুকে আমরা বিধাতার বিধানপ্রসূত, সুতরাং মুসলমান রাজত্বকেও আংশিক ভাবে বিধাতার বিধান, মনে করি। কিন্তু

উপকার হইয়াছিল বলিয়া, অনিষ্ট যাহা হইয়াছিল তৎসমুদয়কেও আমরা বিধাতার বিধান বলি না। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের দ্বারা ভারতবর্ষের কিছু উপকার করাইয়া লওয়া যেমন বিধাতার অভিপ্রায় ও বিধান বলিয়া মানি, তাঁহাদের দ্বারা যখন আর উপকার হইতেছিল না তখন তাহাদের প্রভুত্বলোপও তেমনি বিধাতার অভিপ্রায় ও বিধান বলিয়া স্বীকার করি। বিধাতার স্থায়ী বিধান নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাহা কোন বাহ্য ঘটনা বা অবস্থা নয়। বাহ্য ঘটনা ও অবস্থাগুলি উপলক্ষ্য ও উপায় মাত্র। প্রয়োজনমত এগুলির পরিবর্ত্তন হয়।

"The old order changeth, yielding place to new,
And God fulfils Himself in many ways,
Lest one good custom should corrupt the world."

কোন কোন কঠিন পীড়ায় মানুষ সংজ্ঞাহীন হইলে বিষ প্রয়োগ দ্বারা তাহার চেতনাসম্পাদন করিতে হয়। কিন্তু চেতনাসম্পাদন-রূপ উপকার হইল বলিয়া কোন বুদ্ধিমান রোগী বিষকে বিধাতার স্থায়ী বিধান মনে করিয়া ক্রমাগত বিষ সেবন করিতে থাকেন না, কোন সুচিকিৎসকও এরূপ ব্যবস্থা মনে করেন না। তিক্ত কুইনীনে জ্বর সারে বলিয়া কেহ আজীবন কুইনীন সেবন করে না। পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে জোড়া লাগিবার জন্য বাঁধিয়া রাখা দরকার। বন্ধন বিধাতার অস্থায়ী বিধান, স্বচ্ছন্দ বিচরণ স্থায়ী বিধান। এই জন্য জোড় লাগিবার পরও কোন সুচিকিৎসক বা বুদ্ধিমান রোগী বন্ধনের পক্ষপাতী নহেন। শরীরের অবস্থা অনুসারে কখন উপবাস, কখন বা ভোজন বিধেয়, স্বাস্থ্যের চেষ্টাই স্থায়ী বিধান।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ এই নিয়ম ও ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে, যে, আইন সকলের উপর, সকলেই আইনের অধীন। এইরূপে ইংরেজের প্রভুত্ব ও শাসনদ্বারা যে পরিমাণে দেশের অন্যবিধ উপকারও হইতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসের আর দশটা বিধানের ন্যায়, সেই পরিমাণে উহাও বিধাতার বিধান। আবার, যে পরিমাণে ঐ প্রভুত্ব দূর হইয়া আমরা স্বায়ত্তশাসন পাইতেছি ও পাইব, তাহাও বিধাতার বিধান। স্থায়ী বিধান এই যে প্রত্যেক জাতি বিচক্ষণতার সহিত নিজেই নিজের কাজ করিতে সমর্থ হইবে ও কাজ করিবে।

সমাজবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞান পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত। এই সকল যাঁহারা বুঝেন, এবং আধুনিক যুদ্ধের আয়োজন সরঞ্জামাদির খবর রাখেন, তাঁহারা সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা বা গুপ্ত হত্যা দ্বারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছা বা কল্পনা করেন না। অন্যদিকে, ইংরেজের যতটা প্রভুত্ব প্রথমে ছিল বা এখনও যতটা আছে, তাহাকেও তাহারা বিধাতার স্থায়ী বিধান মনে করেন না। ভারতবর্ষকে যিনি যে পরিমাণে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজের কাজ করিতে সমর্থ হইবার পক্ষে সাহায্য করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে বিধাতার আদেশ পালন করিবেন। ইংরেজরা যে পরিমাণে ও যত শীঘ্র শীঘ্র ভারতবাসীদিগকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মনির্ভরসমর্থ হইতে সাহায্য করিবেন, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ বিধাতার বিধান বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

ব্যোমকেশ মুস্তফী।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি ধনী ছিলেন না, বিদ্বান ছিলেন না, প্রতিভাশালী ছিলেন না, বাগ্মী ছিলেন না, বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু হিতব্রত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের জন্য তিনি বহুবৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে অবিরত নিঃস্বার্থ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন। ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে তিনি এই কার্য্যে অকাতরে সময় ও শক্তিনিয়োগ না করিলে পরিষদ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহার সেরূপ উন্নতি এখনও হইত না। ব্যোমকেশ বাবুর সাংসারিক অসচ্ছলতা খুব ছিল। তিনি পরিষদের জন্য যত পরিশ্রম করিতেন, যত সময় দিতেন, অর্থোপার্জ্জনে তাহা নিয়োগ করিলে সম্ভবতঃ সাংসারিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া পরিষদেরই সেবা করিয়া গেলেন। ইহাই তাঁহার মহত্ত্ব। এরূপ মহত্ত্ব কোথাও সুলভ নহে। বাংলা দেশের "গণ্যমান"দের তালিকায় যে তাঁহার মত লোকের নাম নাই, ইহা ভালই। অকপট সেবকদের জন্য যে নিভৃত নিলয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় তাঁহার জন্য আসন বিছান ছিল। সেই স্থান অধিকার করিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি ক্ষয়রোগে ভুগিতেছিলেন।

দুর্ভিক্ষ।

গবর্ণমেণ্ট বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, লোকের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে। যাঁহারা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট সাহায্যের জন্য এখন দিন দিন অধিকতর লোক আসিতেছে। এক একটি সাহায্যকেন্দ্রের ব্যয় দুই তিন গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আরও বাড়িবে। লোকদিগকে অন্নদান ও বস্ত্রদান পূর্ব্বাবধিই চলিতেছিল। এখন আরও নানা রকমের সাহায্য অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্র ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য কূপখনন ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের প্রয়োজন হইয়াছে। জলের অভাবে এবং দূষিত কর্দ্দমাক্ত ময়লা জল ব্যবহার করিয়া লোকের বসন্ত ওলাউঠা প্রভৃতি রোগ হইতেছে। এই জন্য চিকিৎসাও আবশ্যক। দুই তিন বৎসর ধরিয়া গরীব লোকদের ঘরের চালে খড় না পড়ায়, এবং অনেকে চালের খড় টানিয়া খাওাইয়া গোরু মহিষের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করায় ঘরগুলি বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখানেই দুঃখীদের দুর্গতির পরিসমাপ্তি হয় নাই। অনেকগুলি গ্রামে আগুন লাগিয়া বিস্তর ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। অনেক জায়গায় জলের অভাবে আগুন নিবাইবার চেষ্টা পর্য্যন্ত হয় নাই। সম্প্রতি আবার ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে, অনেক গোরু মহিষ মরিয়াছে ও বিস্তর ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। মানুষ মরিয়াছে কি না এখনও জানা যায় নাই। ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে অনেক গাছ পড়িয়া গিয়াছে, এবং আম ও অন্যান্য ফলশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শিলাবৃষ্টি এরূপ হইয়াছিল যে ২৪ ঘণ্টা পরেও মাটীর উপর এক হাত দেড়হাত পুরু বরফ জমিয়া ছিল।

গবর্ণমেণ্টের যেরূপ প্রভূত শক্তি, তাহার তুলনায় অল্প হইলেও, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন। নানা সভাসমিতি হইতেও অন্নবস্ত্র দান, কূপ খনন, পঙ্কোদ্ধার, গৃহমেরামৎ ও নির্ম্মাণ, চিকিৎসা চলিতেছে। কিন্তু যাঁহাদের হাতে সঞ্চিত অর্থ যাহা আছে, তাহা শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইবে। ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, সকলে মুক্তহস্ত হউন। ছাত্রগণ গ্রীষ্মাবকাশে সাধ্যমত অর্থসংগ্রহ ও অন্যান্য কাজ করিয়া গরীবের সেবা করুন।

বাঁকুড়াসম্মিলনীর ভাণ্ডারে গত একমাসে যে অর্থ আসিয়াছে, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত অন্যত্র স্বীকৃত হইল।

কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষা।

গত ২৭শে চৈত্র কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়া গ্রামে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে মহাসভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিতবর সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্তম্ভের ভিত্তিস্থাপন করেন। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ফুলিয়া পর্য্যন্ত একটি রাস্তা কৃত্তিবাসের নামে অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার নামে একটি মাইনর স্কুল স্থাপিত ও একটি কূপ খনিত হইয়াছে। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় কৃত্তিবাস-বৃত্তি স্থাপনার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে কিছু টাকা দিবেন বলিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের কাব্যই কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠ স্মারক চিহ্ন। গ্রামে নগরে সর্ব্বত্র উহা পঠিত হয়। দরিদ্র নিরক্ষর অনেক বাঙালী পুরুষ ও স্ত্রীলোক এই উদ্দেশ্যে বাংলা পড়িতে শিখে যে তাহারা কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতে সমর্থ হইবে। কৃত্তিবাস আপনিই আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। তথাপি বাঙালীর তাঁহার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দেখাইবার প্রয়োজন ছিল। যিনি প্রীতি ও ভক্তির পাত্র তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তি করিতে না পারা অধোগতির লক্ষণ; প্রীতি ও ভক্তি করিতে পারা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

বালক শিল্পী।

বহুবৎসর পূর্ব্বে আমরা "প্রদীপ" মাসিক পত্রে শ্রীযুক্ত গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রে-নির্ম্মিত "মন্দিরপথবর্ত্তিনী" মূর্ত্তির ছবি মুদ্রিত করি। তাহার পর তাঁহার আরও অনেক মূর্ত্তির সহিত আমরা প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর পাঠকদিগকে পরিচিত করিয়াছি। আজ গণপৎরাও যশস্বী শিল্পী কিন্তু যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ শ্যামরাও শিল্পনৈপুণ্যে বোধ হয় পিতাকেও অতিক্র

বাঁকুড়ার কতকগুলি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী ও বালকবালিকা অধিকাংশ ব্রাহ্মণ। বাঁকুড়া-সম্মিলনীর তোলা ফোটোগ্রাফ হইতে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভদ্রগৃহস্থেরাও অবশেষে বাঁকুড়াসম্মিলনীর সাহায্যকেন্দ্র হইতে সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছেন

"আঙুর!"

শ্যামবাবু গণপতি পালের নির্ম্মিত প্রমাণ আকারে।

"আমার ঠাকুরদাদা!!"
শ্যামরাও গণপত-ম্হাত্রের নির্ম্মিত, প্রমাণ আকার।

শ্যামরাও গণপত ম্হাত্রের ঠাকুরদাদার ফটোগ্রাফ।

হইবে। এই বালকের নির্ম্মিত অনেকগুলি মূর্ত্তির ফোটোগ্রাফ আমরা দেখিয়াছি। দুটি মাত্র প্রকাশিত করিলাম। একটি বালক শ্যামরাওএর নির্ম্মিত তাহার পিতামহ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ক্ষাত্রের আবক্ষ মূর্ত্তি। পিতামহের ফোটোগ্রাফ এবং পৌত্র পিতামহের যে মূর্ত্তি গড়িয়াছে তাহার ফোটোগ্রাফ পাশাপাশি ছাপা হইয়াছে। পাঠক দেখিবেন, কেমন চমৎকার সাদৃশ্য। মূর্ত্তিটিতে জীবিত মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও ভাবের ব্যঞ্জনা আছে। ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই টাউনহলে যে শিল্পপ্রদর্শনী হয়, তাহাতে এই মূর্ত্তিটির জন্য বালক শিল্পী সার্ দোরাব তাতা প্রদত্ত ৫০ মুদ্রা পরিমিত দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছে। শ্যামরাও "আঙুর" নাম দিয়া যে একটি কল্পিত বালিকামূর্ত্তি গড়িয়াছে, তাহারও প্রতিলিপি দিতেছি। উহা ছোট পুতুল নয়, প্রমাণ আকারের মূর্ত্তি। বালিকাটির হাতে একগোছা আঙুর আছে। তাহা হইতেই মূর্ত্তিটির নামকরণ হইয়াছে। মূর্ত্তিটি স্বাভাবিক, সুন্দর ও জীবিতবৎ হইয়াছে। মুখে বালিকাসুলভ সরলতা ও প্রফুল্লতার ছাপ রহিয়াছে। বসিবার ও হাত বাড়াইবার ভঙ্গীতে কোন আড়ষ্টতা নাই। এই বালক দীর্ঘজীবী ও স্বকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া বংশকে উজ্জ্বল এবং ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করুক, এই কামনা করি।

বঙ্গে শিক্ষার বিস্তার।

১৯১৪ ১৯১৫ সালের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজ পর্য্যন্ত সর্ব্ব শ্রেণীর শিক্ষালয়ে মোট ৫২২১৮১ জন ছাত্র বাড়িয়াছে। যথেষ্ট বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ম্যালেরিয়া আদি পীড়াসত্ত্বেও ১৯১৭ সালে বঙ্গে মানুষ বাড়িয়াছিল ১০৩,৯৯১।

যদিও প্রতিবৎসর অনেক ছাত্র ভর্ত্তি হইতে না পারিয়া কলেজে কলেজে ঘুরিয়া বেড়ায়, তথাপি ১৯১৪ ১৫ সালে একটিও কলেজ বাড়ে নাই। গবর্ণমেণ্ট নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম এমন কড়া হইয়াছে যে বেসরকারী কলেজ স্থাপন প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় কলিকাতার স্বাস্থ্যকর এক পাড়ায় একটি বৃহৎ বাড়ীতে ছাত্রাবাস-সমন্বিত একটি কলেজ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অনেক হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি তিনি দিবেন, বাড়ীটিও দিবেন। তথাপি, শুনিতেছি, সিণ্ডিকেট তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমান বিভাগে উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা কমিয়াছে; প্রেসিডেন্সী বিভাগে যেমন ছিল, তেমনি আছে। রাজসাহী বিভাগে কেবল ৭টি বাড়িয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগে নিম্ন প্রাইমারী স্কুল কমিয়াছে।

ইউরোপীয় স্কুলের ব্যয়।

যে-সকল স্কুলে প্রধানতঃ ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রছাত্রী পড়ে, তাহাদিগকে ইউরোপীয় স্কুল বলে। এই সকল স্কুলের মোট ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ১০,০৭৭। তাঁহাদের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯১৪-১৫ সালে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ১১,৮৫,১৩৯, টাকা দিয়াছিলেন। অর্থাৎ মোটামুটি প্রতিজনের জন্য ১১৮ ্ টাকা দিয়াছিলেন। ঐ সালে দেশী ছাত্রছাত্রী ১৭,৩৬,৯৬৭ জনের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে দিয়াছিলেন ৬৭,৯৯,৩৩৬ টাকা; অর্থাৎ জনপ্রতি চারি টাকারও কিছু কম। এক একটি ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রছাত্রীর জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহা খরচ করেন, তাহা দেশী প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের ত্রিশগুণ।

এরূপ অসাম্য বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা যে হারে ট্যাক্স দি, ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়রা তাহার ত্রিশগুণ অধিক হারে ট্যাক্স দেয় না। তাহারা অবনত শ্রেণীর লোকও নহে, যে, তাহাদের জন্য অনেক বেশী ব্যয় করা ন্যায়সঙ্গত হইবে।

ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয়।

ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় খুব দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে। যুদ্ধবিভাগের ব্যয় যেরূপ বাড়িয়াছে, আর কোন বিভাগের ব্যয় তত বাড়ে নাই; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিভাগের ব্যয় ত সেরূপ বাড়িবার আশাই করা যায় না। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইহা দ্বিগুণিত হইয়াছে। কোন্ বৎসর কত কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল বা হইবে নীচে তাহা মুদ্রিত হইল।

বৎসর	কোটি টাকা	বৎসর	কোটি টাকা
১৮৮৪-৮৫	১৭.০৫	১৯০৯-১০	৩১.৬৬
১৮৯৩-৯৫	২৩.৫৩	৯১৩-১৪	২৯.৮৫
১৮৯৯-১৯০০	২৬.৪৪	৯১৫-১৬	৩০.২৫
১৯০৩-০৪	২৭.২১	৯১৬-১৭	৩৪.৭৫

বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের রাজস্ব ত্রিশ বৎসরে দ্বিগুণ হয় নাই।

এই দেশের মোট রাজস্বের তুলনায় সামরিক ব্যয় অত্যন্ত বেশী। ১৯১৬-১৭ সালে ভারত সাম্রাজ্যের মোট আয় ১২৯ কোটি টাকার উপর হইবে বলিয়া রাজস্ব-মন্ত্রী ধরিয়াছেন। যুদ্ধ-বিভাগের ব্যয় ধরিয়াছেন ৩৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ সমগ্র রাজস্বের একচতুর্থাংশেরও বেশী সামরিক ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আজকাল যুদ্ধ ব্যাপারটি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিতে হইলে ইহা অপেক্ষাও বেশী টাকা খরচ করা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু, সরকারী গৃহস্থালিতেই হউক আর ব্যক্তিবিশেষের গৃহস্থালিতেই হউক, ব্যয়ের একটা সোজা নিয়ম এই যে আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে হয়। কোন গৃহস্থের সমুদয় আয়ের সিকি অংশ যদি দাবোয়ান চৌকিদারের বেতন দিতে ও লাঠি কিনিতে খরচ হয়, তাহা হইলে সেরূপ গৃহস্থালিকে লোকে একটু অসাধারণ রকমেরই মনে করিয়া থাকে। ভারতের সামরিক ব্যয় যে খুব বেশী, তাহা এশিয়ার প্রবলতম দেশ জাপানের সঙ্গে তুলনায় বুঝা যাইবে।

১৯১৫-১৬ সালে জাপানের মোট রাজস্ব ৫৫৭,১৯১,৭৭৬ য়েন্ ধরা হইয়াছে। এক য়েন্ দেড় টাকার সমান। ঐ বৎসরের যুদ্ধবিভাগের ব্যয় ৮৩,১০৬,৩৫২ য়েন্, অর্থাৎ মোট রাজস্বের ষষ্ঠাংশ ও সপ্তমাংশের মাঝামাঝি। জাপানী রণতরী বিভাগেরও ব্যয় যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সমগ্র ব্যয় মোট রাজস্বের সিকি অপেক্ষা কিছু বেশী হয়। কিন্তু তুলনার জন্য তাহা ধরা ন্যায়সঙ্গত ও আবশ্যক নহে। কারণ ভারতবর্ষের রণতরী-বিভাগ নাই, এবং সেই জন্যই এম্ডেন আসিয়া আমাদিগকে অপমানিত ও বিব্রত করিতে পারিয়াছিল।

বহিঃশত্রু হইতে ভারতবর্ষ রক্ষিত হওয়ায় ভারতবাসীদের লাভ আছে, এইজন্য সামরিক ব্যয় আমাদের দেওয়া উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষকে নিজ অধিকারে রাখিয়া ও তথায় শান্তিরক্ষা করিয়া ইংলণ্ড ও বিশেষভাবে লাভবান্ হইয়া থাকেন। সুতরাং ভারতের সামরিক ব্যয়ের একটা ন্যায্য অংশ ইংলণ্ডের দেওয়া কর্ত্তব্য

আরও দুটি কারণে এই অংশ দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের সৈন্যদল কেবল ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য ত ব্যবহৃত হয় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজন-মত ভারতবর্ষের সৈন্যদল ভারতের বাহিরে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, সর্ব্বত্র যুদ্ধ করে। ব্রিটিশসাম্রাজ্যের বড় বড় সেনাপতি হইতে অজ্ঞাতনামা বহুসংখ্যক সাধারণ গোরা পর্য্যন্ত সকলে ভারতবর্ষের সৈন্যদলে থাকিয়া ভারতবর্ষের বেতন লইয়া ভারতের ব্যয়ে যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ হইয়া উঠে। ডিউক্ অব ওয়েলিংটন, লর্ড উলস্লী, লর্ড রবার্টস্, লর্ড কিচনার্, এবং আরও কত কত বিখ্যাত সেনাপতি ভারতবর্ষের টাকায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পাকা যোদ্ধা হইয়াছেন। ইংলণ্ড যখন এতটা উপকার পাইয়াছেন, তখন ব্যয়ের ন্যায্য ভাগ দেওয়া নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত।

আমাদের আরও একটা দাবী আছে। যুদ্ধবিভাগের মোটা বেতনের চাকরীগুলি সবই ইংরেজরা পান। ব্যয় হয় আমাদের টাকা, অথচ মোটা বেতন দেশী একজন লোকও পান না। আমরা চাই, দেশী লোকও যোগ্যতা অনুসারে সেনানায়ক নিযুক্ত হইয়া সামরিক ব্যয়ের কিয়দংশ বেতনরূপে দেশে রাখিতে সমর্থ হউন। বেতন অপেক্ষাও মূল্যবান্ আর একটি জিনিষ হইতে তাহা হইলে ভারতবাসীরা বঞ্চিত হয় না। তাহারা যদি সেনানায়ক হইতে পায়, তাহা হইলে নেতৃত্বের অভ্যাস, অভিজ্ঞতা ও শক্তি তাহারা লাভ করিতে পারে, এবং নেতৃত্বশক্তি ও রণদক্ষতারূপ ঐশ্বর্য্য ভারতবর্ষে থাকে। বর্ত্তমানে এই সুবিধা হইতে আমরা বঞ্চিত রহিয়াছি।

শিল্পে উন্নতি ও বিস্তৃতি দ্বারা দেশের ধন বাড়িলে এই সামরিক ব্যয় ততটা গায়ে লাগে না, এমন কি ব্যয় আরও বাড়ান যাইতে পারে। কিন্তু ধনবৃদ্ধির দিকে সরকারের তেমন দৃষ্টি কই?

জলকষ্ট।

শীতকাল শেষ হইতে না হইতে বঙ্গের চারিদিক হইতে জলকষ্টের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়। যে-সকল গ্রাম

স্রোতস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত, তাহাদের জলকষ্ট হয় না। কিন্তু এইরূপ নদীগুলিও ক্রমে ক্রমে বুজিয়া আসিতেছে; এখন আর সকলগুলিতে সম্বৎসর জল প্রবাহিত হয় না। যে-সকল গ্রামের লোকের পুষ্করিণীর উপর নির্ভর তাহাদের কষ্ট আরও অধিক। পুরাতন পুষ্করিণীগুলি শুকাইয়া পঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়াছে। লোকে আর যথেষ্ট নূতন পুকুর দিতেছে না। পুরাতন পুকুরগুলির মালিকেরা অনেক স্থলে গরীব হইয়া গিয়াছে, কিম্বা সরিকে সরিকে এক মত হইতে না পারায় পঙ্কোদ্ধারে মন দিতে পারিতেছে না। উৎকৃষ্ট কূপও যথেষ্ট নাই।

বাংলা দেশের লোকদের এমন কতকগুলি কষ্টের কারণ আছে, যাহা কেবল টাকার দ্বারা দূর করা যায় না। যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর। কেন এই জ্বর হয়, এবং কিরূপে উহা নির্মূল করা যাইতে পারে, প্রথমে তাহা ঠিক জানা চাই। তাহার পর যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু জলকষ্ট নিবারণ কেবল টাকা খরচ করিলেই হইতে পারে। টাকাও গবর্ণমেণ্ট ১৮৭১ সাল হইতে আদায় করিতেছেন। ঐ বৎসর রোডসেস্ ধার্য্য হয়। রোডসেস আদায়ের উদ্দেশ্য গ্রাম্য রাস্তা নির্ম্মাণ, গ্রামের লোকদের জন্য ভাল জলের ব্যবস্থা, এবং অতিরিক্ত বা ময়লা জল নিঃসারণের জন্য নর্দ্দামা নির্ম্মাণ। এই সেস দ্বারা যে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হয়, তাহা এতকাল গবর্ণমেণ্ট ঐ তিনটি কার্য্যে খরচ না করিয়া অন্যভাবে খরচ করিয়া আসিতেছেন। ১২।১৩ বৎসর উহার সমস্ত টাকা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসকলকে দেওয়া হইয়াছে। এখন পব্লিক ওআর্ক্স সেসও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির হাতে দেওয়া হইতেছে। এখন জলকষ্ট নিবারণের সমুচিত ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ১৯১৪-১৫ সালে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির কার্য্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলিতেছেন যে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় গ্রামের লোকেরা, জলের সুবন্দোবস্তের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ দিতে রাজী না হওয়ায় কোন কাজ হয় নাই। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সমুদয় বাংলা দেশের লোক ৪৪ বৎসর ধরিয়া জলের জন্য ট্যাক্স দিয়া আসিতেছে। তাহার উপর খরচের এক-তৃতীয়াংশ আবার কেন দিবে? তদ্ভিন্ন বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার লোকেরা অজন্মা ও বন্যায় বিপন্ন হইয়াছে। তাহাদের নিকট সাহায্যের দাবী করা অনুচিত। পুষ্করিণী কূপ প্রভৃতি নির্ম্মাণ বা মেরামতের এক-তৃতীয়াংশ গ্রামের লোকদিগকে দিতে হইবে, এ নিয়ম পরে রদ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা প্রবর্ত্তন করাই অন্যায় হইয়াছে।

জলকষ্ট ও স্বায়ত্ত-শাসন।

একটা কথা আছে যে, যে দেশের লোক যেরূপ শাসনপ্রণালীর উপযুক্ত তাহারা তাহাই পাইয়া থাকে। ইহার দ্বারা খুব অপকৃষ্ট রকমের শাসনপদ্ধতিও সমর্থিত হইতে পারে বটে, কিন্তু কথাটার মূলে সত্য আছে। এই আমাদের বাংলাদেশে আমরা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জলের জন্য ট্যাক্স দিয়া আসিতেছি, অথচ জল পাইতেছি না! ইহার জন্য দেশে কি বেশী কিছু আন্দোলন হইয়াছে? বিশেষ কিছুই না। দেশের লোক যাহার জন্য টাকা দিতেছে, তাহা পাইতেছে না; ময়লা জল ব্যবহার করিয়া নানা রোগে হাজার হাজার লোক মরিতেছে, জল জল করিয়া সকলে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু যাহার কাছে জল পাওনা রহিয়াছে, তাহার নিকট আদায় করিবার সমুচিত চেষ্টা হইতেছে না। আমরা যে যথেষ্ট চেষ্টা করি নাই, তাহার কারণ এই যে, হয়ত অধিকাংশ লোক জানেই না যে গবর্ণমেণ্ট জলের জন্য আমাদের নিকট দেনদার আছেন। অনেকে জানিয়াও উদাসীন। তা ছাড়া ইহার মূলে আলস্য, ভীরুতা, স্বার্থপরতা, আশাহীনতা প্রভৃতি কারণও আছে। কেহ ভাবিতেছেন, কে এত হাঙ্গামা করে বাপু? কেহ বা হাকিমদের ভয়েই আড়ষ্ট, কেহ নিজে সহরে থাকেন, জলের কষ্ট ভোগ করেন না, সুতরাং পরের জন্য তাঁহার মাথা ব্যথা করে না। কেহ বা ভাবেন, আমাদের ত কোন ক্ষমতা নাই, চেঁচাইলে কর্ত্তৃপক্ষ শুনিবেন কেন? যে দেশের লোকদের মনের ভাব এইরূপ তাহারা স্বায়ত্তশাসন কেমন করিয়া পাইবে? স্বায়ত্তশাসন পাইতে হইলে পৌরুষ, উদ্যম, পরার্থপরতা, ও অমর আশার প্রয়োজন।

গ্রামের লোকদেরও দোষ আছে। তাঁহারা তরল কাদা, এমন কি, প্রকারান্তরে বিষ্ঠামূত্র পান করিবেন,

মরিবেন, তবু পাঁচজনে মিলিয়া স্বহস্তে কোদাল ধরিয়া কূপ পুষ্করিণী খনন করিবেন না, বা করাইবেন না। সরিকে সরিকে অমিল যাঁহারা দূর করিতে পারেন না, তাঁহারা দেশের কাজ চালাইবার ভরসা রাখেন কি বলিয়া?

জমিদারগণ নিজ নিজ জমিদারীতে বাস না করায় আরও অনিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা যদি বৎসরের কিয়দংশ নিজের জমিদারীভুক্ত গ্রামে বাস করিতেন, তাহা হইলে গ্রামগুলির কিছু উন্নতি নিশ্চয়ই হইত। তাঁহারা যদি বৎসরে একবার করিয়া তাঁহাদের জমিদারীভুক্ত সমুদয় গ্রামে বেড়াইয়া আসেন, তাহা হইলেও দেশের মঙ্গল হয়। বাঁকুড়া জেলার অর্দ্ধেক জমিদারী বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের। বাঁকুড়ার এই যে ঘোর বিপদ যাইতেছে, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ একবার তাহা দেখিয়া আসুন না। এইরূপ অন্যান্য জমিদারেরাও করুন। কেহই যে করেন না, তা নয়; কেহ কেহ করেন।

বাংলাদেশে জলকষ্ট আছে বটে; কিন্তু মনুষ্যত্বের অভাব তদপেক্ষাও শোচনীয়।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নিন্দা।

চৈত্রের প্রবাসীতে ইস্‌লাম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের অযথা নিন্দা একখানি স্কুলপাঠ্য ইংরেজী বহিতে আছে বলিয়া লিখিয়াছিলাম। একথা প্রথমে "মুসলমান" নামক ইংরেজী কাগজে বাহির হয়। শিক্ষাবিভাগ হইতে ইহার প্রতিকার হইবে অবগত হইলাম।

সেনহাটী হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন, যে, বহুবৎসরাবধি বি-এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য এল্‌ফিনষ্টোনের ভারতবর্ষের ইতিহাসেও মহম্মদকে "false prophet" অর্থাৎ ঝুটা বা মিথ্যাবাদী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। আমরা দেখিলাম বটে, প্রচলিত নবম সংস্করণের ২৯৩ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে, "Such was the nation that gave birth to the false prophet, whose doctrines have so long and so powerfully influenced a vast portion of the human race." এই বাক্যটি পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। প্রকাশকগণ তাহাতে রাজী না হইলে বহিখানি বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা হইতে বাদ দেওয়া উচিত।

পরীক্ষকের মুরুব্বিয়ানা।

১৯১৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় একজন পরীক্ষক রবিবাবুর লেখা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া পরিক্ষার্থীদিগকে তাহা মার্জ্জিত খাঁটি সুন্দর বাংলা (chaste and elegant Bengali) করিয়া লিখিতে বলিয়াছিলেন। এবৎসর বি-এ পরীক্ষায় খুড়োকে রেহাই দিয়া রবিবাবুর ভাইপো অবনীবাবুর উপর আর এক পরীক্ষক (কিম্বা সেই আগেকার পরীক্ষকই) মুরুব্বিয়ানা করিয়াছেন। তিনি অবনীবাবুর কিছু রচনা উদ্ধৃত করিয়া আদেশ করিয়াছেন— "Re-write the following in chaste and elegant Bengali." "নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি খাঁটি মার্জ্জিত সুন্দর বাংলায় পুনর্ব্বার লিখহ।"

রবিবাবু যে এখনও নাবালক আছেন, বাংলা লিখিতে জানেন না, বয়স ৫৫ হইয়া যাওয়ায় আর উন্নতির আশাও নাই, ইহা সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরও যে এই দুর্দ্দশা ঘটিল, ইহা নিতান্তই আপসোসের কথা।

পরীক্ষকদ্বয় (বা পরীক্ষক মহোদয়) যে রবিবাবু ও অবনীবাবু অপেক্ষা বড় সাহিত্যিক, সুতরাং তাঁহাদের বাংলা দুরুস্ত করিয়া দিতে সমর্থ, তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে যে এতাদৃশ mute inglorious Miltonsও (মূক ও এতাবৎ-যশোহীন মিল্টন-বৃন্দও) হাজার হাজার জন্মিয়াছেন, যে, তাঁহারা রবিবাবু ও অবনীবাবুর বাংলাকে মার্জ্জিত বিশুদ্ধ সুন্দর করিয়া দিতে পারেন, এই সংবাদে পরম পুলকিত হইলাম।

জয় হউক পাণ্ডিতি ও কেতাবি বাংলার!

ভারতে শিল্পের বিস্তৃতি ও উন্নতিসাধন।

ভারতে খনিজ ও উদ্ভিজ্জ যে সকল জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা কলকারখানার সাহায্যে ভারতবাসীর ও অন্যান্য দেশবাসীর প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্যে পরিণত হইতে পারে। এই প্রকারে ভারতবর্ষের লোক সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইতে পারে। ভারতে কি কি শিল্পের প্রবর্ত্তন, বিস্তার ও উন্নতি করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের

সভাপতি মিষ্টার ষ্টিউআর্ট ইহার অন্যতম সভ্য। ইহাঁর সম্বন্ধে আমরা গত মাসে লিখিয়াছিলাম :—

ইংরেজ বণিকের মনের কথা।

বাংলাদেশ-প্রবাসী ইংরেজ বণিকদের একটি সমিতি আছে; তাহার নাম বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স্। ইহার বার্ষিক সভায় সভাপতি মিষ্টার ষ্টিউআর্ট বলেন—"ভারতবাসীদের নিজেদের ব্যবহার্য্য জিনিষের কিয়দংশও নিজেরাই উৎপাদন করিতে এখনও অনেক বৎসর লাগিবে, এবং প্রসঙ্গত ইহাও বলা যায় যে, ভারতবাসীরা যখন তাহা করিতে পারিবে, তখন তাহা ব্রিটেনের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না।" * তা ত বটেই!

ষ্টিউআর্ট সাহেবের মত ভারত-হিতৈষীর পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট আর কাহাকেও নিযুক্ত করিলে ভাল করিতেন।

মহীশূরের দেওআন সার্ বিশ্বেশ্বর আইয়া এবং রাসায়নিক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়দিগকে এই কমিশনের সভ্য নিযুক্ত করিলে ভাল হইত।

বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর প্রথম বৎসরের কার্য্যবিবরণ আশাপ্রদ। এই বৎসর মণ্ডলী প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কাজগুলি করিয়াছেন :—(১) মুর্শিদাবাদ জেলার তালগ্রামে আগুন লাগিয়া ৩৫০ খানা ঘর পুড়িয়া যায়, ও ১১৮টি পরিবার নিরাশ্রয় হয়। মণ্ডলী স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়া অনুসন্ধানের পর অর্থ সাহায্য করেন, এবং পীড়িতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। (২) ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় বন্যায় বিস্তর ঘরবাড়ী ডুবিয়া ভাসিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, বিস্তর শস্য নষ্ট হয়, ও গোরু বাছুর মারা পড়ে। অন্যান্য কারণেও এই মহকুমার বিস্তর গ্রামে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। মণ্ডলী যথাসাধ্য সাহায্য করেন এবং প্রয়োজন-মত চিকিৎসারও বন্দোবস্ত করেন। (৩) খুলনায় ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাবের সময় মণ্ডলী চিকিৎসক, ঔষধপত্র, এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা পাঠাইয়া বিপন্ন লোকদের সাহায্য করেন। (৪) বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে মণ্ডলী প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত লোকদের খুব সাহায্য করিতেছেন। ইহা ভিন্ন সামাজিক তথ্যসংগ্রহ, সমাজসেবা সম্বন্ধীয় সংবাদ ও পরামর্শ দান, সমাজসেবা সম্বন্ধীয় পুস্তক সংগ্রহ, সমাজসেবা প্রচার, বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা শিক্ষা বিস্তার, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগনিবারণ উদ্দেশ্যে পুস্তিকা ও পত্রী বিবরণ, প্রভৃতি নানাকার্য্য মণ্ডলী করিয়াছেন। মণ্ডলীর সম্পাদক ও প্রধান সেবক শ্রীযুক্ত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের উৎসাহ, আশাশীলতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতিরেকে এরূপ শৃঙ্খলার সহিত এত কাজ কখনই হইতে পারিত না।

আপনাকে বিশ্বাস ও পরকে বিশ্বাস।

শুধু বড় ব্যবসা বাণিজ্য নয়, অন্য রকমেরও বড় কাজ আমাদের দেশে হওয়ার একটা প্রধান বাধা ও অন্তরায়, পরস্পরকে বিশ্বাসের অভাব। কেহ বিশ্বাসের যোগ্য না হইলে তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না বটে, কিন্তু বিশ্বাস না করিলেও আবার মানুষ বিশ্বাসভাজন হয় না। যাহার বিরুদ্ধে কিছু জানি না, তাহাকে একটু বিশ্বাস করিলে ক্রমশঃ বুঝা যায় যে সে আরও বিশ্বাসের যোগ্য কি না। পৃথিবীর অনেক মহৎ লোক বিশ্বাস করিয়া কোন কোন স্থলে ঠকিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যদি বিশ্বাসপ্রবণ না হইতেন, তাহা হইলে মোটের উপর তাঁহাদের দ্বারা জগতের এত কল্যাণ হইত না। আত্মনির্ভর ও পরনির্ভরের মূল একই—মানব-প্রকৃতির উপর আস্থা। সেই জন্য দেখা যায়, যে জাতির মধ্যে আত্মনির্ভরের ভাব প্রবল, তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাসও তত করে, এবং সেই জন্য তাহাদের মধ্যে নেতৃত্ব, দল বাঁধিবার শক্তি, নেতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, দলের স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগের শক্তি, সহযোগী প্রীতি, অনুচরবাৎসল্য, প্রভৃতি সদ্গুণ লক্ষিত হয়।

স্বেচ্ছাসেবক বাঙালী শুশ্রূষাকারীর দল।

পৃথিবীর যে-সকল জাতির সাহসী বলিয়া খ্যাতি আছে, অন্ততঃ ভীরু বলিয়া অখ্যাতি নাই, তাহাদের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী। তাঁহারা দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, যুদ্ধ চান না; যুদ্ধের কারণীভূত অন্তর্জাতিক সমুদয় ঝগড়াবিবাদ সালিসী দ্বারা নিষ্পত্তি হয়, এই তাঁহাদের ইচ্ছা। অনেকে যুদ্ধ তাঁহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করেন; যেমন ইংলণ্ডের কোএকারগণ।

---

* In the course of his address as President of the Bengal Chamber of Commerce, the Hon'ble Mr. Stewart was candid enough to declare that "it must be very many years before India can supply even a fair proportion of her home requirements and that, incidentally, it will not particularly suit Britain when India can do so."

এই কারণে, ইংলণ্ডে সমর্থবয়স্ক সকল পুরুষকে সৈন্য হইতে বাধ্য করিবার জন্য যে আইন হইয়াছে, তাহাতে সেই-সব লোককে অব্যাহতি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহারা যুদ্ধ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করে।

কিন্তু যাহারা যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী তাহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিদের শুশ্রূষা করিতে ও করাইতে ব্যগ্র। সুতরাং শুশ্রূষাকারী বাঙালী স্বেচ্ছাসেবকদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধসমর্থনকারী বা যুদ্ধবিরোধী কোন দলেরই কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। তথাপি বেঙ্গল এম্বুল্যান্স কোর্ (Bengal Ambulance Corps) নাম দিয়া, যে কমিটি এইরূপ দল গঠন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন, ও পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগের বিবেচ্য কয়েকটি বিষয় আছে। নিবেদন করিতেছি।

তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা চান যে এই উদ্যোগটি শিক্ষিত সাধারণের অনুমোদিত এবং লোকপ্রিয় হয়। এইজন্য আমাদের যেখানে খট্‌কা বাধিয়াছে, বলিতেছি। তাঁহারা, যাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, এরূপ ছেলেদিগকেও এই দলে ভর্ত্তি করিতেছেন। ছেলেরা কেহ কেহ অভিভাবকের অজ্ঞাতসারে এবং আপত্তি সত্ত্বেও ভর্ত্তি হইতেছে। কমিটির সম্পাদক আপত্তি জানিয়াও কিছু করিতে নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিতেছেন, কিম্বা সামর্থ্য সত্ত্বেও আপত্তি অগ্রাহ্য করিতেছেন। সত্য বটে, অভিভাবকের সম্মতি আছে কি না তাহা অবগত হইতে, কিম্বা আপত্তি আছে জানিলেও তাহা গ্রাহ্য করিতে, কমিটির সম্পাদক বা কমিটি আইন অনুসারে বাধ্য নহেন। কিন্তু তাঁহাদের গুরুতর নৈতিক দায়িত্ব আছে। ইংলণ্ডে যে-সব বালক ও যুবক যুদ্ধে যাইতেছে, তাহারা কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়া বিনা পরীক্ষায় সিবিলসার্বিসে চাক্‌রী পাইবে, যাহারা সিবিলসার্বিস পরীক্ষা দিতে চাহিবে, তাহারাও নির্দ্দিষ্ট বয়স অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও স্থলবিশেষে পরীক্ষা দিতে পাইবে। অন্য নানাবিধ উৎসাহেরও ব্যবস্থা হইবে। তা ছাড়া চিরদিনের জন্য অক্ষম প্রভৃতিদের পেন্‌শ্যান আছে। আমাদের যে-সব ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে, তাহারা এরূপ কোন সুবিধার অধিকারী নহে। দেশী সিপাহীদের মত কোন প্রকার পেন্‌শ্যানও তাহারা পাইবে না। যে-সব ছেলের শিক্ষা শেষ হয় নাই, যাহারা হয়ত কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিয়া হয় ত আর তাহাদের পড়া হইবে না। কমিটি বা গবর্ণমেণ্ট তাহাদের এই ক্ষতি পূরণ করিবেন না। যথেষ্ট শিক্ষার অভাবে বেকার থাকিলে তাহাদের ভরণ পোষণের ভার অভিভাবকদের স্কন্ধেই পড়িবে। আহত বা অঙ্গহীন হওয়ায় কেহ জন্মের মত অক্ষম হইয়া পড়িলে অভিভাবককেই তাহার ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী হইতে হইবে। সুতরাং দায়িত্বের বেলায় একমাত্র অভিভাবকেরাই দায়ী রহিলেন; অথচ ছেলেগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইবার সময় অভিভাবকদের মত লওয়া বা তাঁহাদিগের আপত্তি গ্রাহ্য করা কমিটি দরকার মনে করিতেছেন না। অন্ততঃ, আমরা যতদূর জানি, এ পর্য্যন্ত এইভাবে কোন কোন স্থলে কাজ হইয়াছে। কমিটির সভ্যেরা গণ্যমান্য শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক। তাঁহারা সকলে কুলির আড়কাটিদের মত সামাজিক মতকে জানিয়া শুনিয়া অগ্রাহ্য করিবেন, ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না, কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদেরই আরব্ধ কাজ পণ্ড হইবার সম্ভাবনা।

মানুষ অনেক সময় কাজের অভাবে দুষ্কর্ম্মান্বিত হয় এবং আইন ভঙ্গ করে। যে-সব ছেলে যাইতেছে, তাহারা সাহসী ছেলে; ফিরিয়া আসিয়া যদি তাহারা শিক্ষাও না পায়, এবং বেকার থাকিতেও বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা যে আইনদ্রোহী হইবে না, এমন বলা যায় না। সুতরাং এদিক দিয়াও, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত অসমাপ্তশিক্ষা যুবকগণের শিক্ষার ও পারিশ্রমিকযুক্ত কার্য্যপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিবার ভার কমিটির লওয়া উচিত। "অভিভাবকদিগের আপত্তি শুনিব না, তাহাদের মেজাজ বিগড়াইয়া দিব, অথচ আমরাও যুদ্ধক্ষেত্রপ্রত্যাগত কাহারও শিক্ষার বা সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিবার দায়িত্ব লইব না," কমিটির এ ভাবে কাজ করা উচিত নয়। সভ্যগণের মধ্যে ধনী লোক আছেন। তাঁহারা যে ভার লইতে পারেন না, এমন নয়। আমরা আশা করি, তাঁহারা আপনাদের দায়িত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া আহতের শুশ্রূষারূপ পুণ্যকার্য্যে সকলের হৃদয়কে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন, এবং পরোক্ষভাবে সাহসী বাঙালীদের একটা নূতন কার্য্যক্ষেত্র খুলিয়া দিতে পারিবেন।

বকের পাহারা।

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের অঙ্কিত।

সারস।

নীলগীর।

খঞ্জন
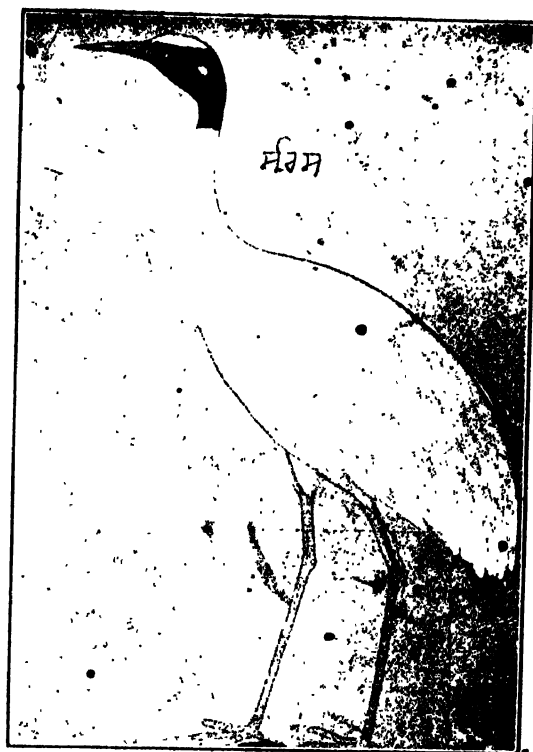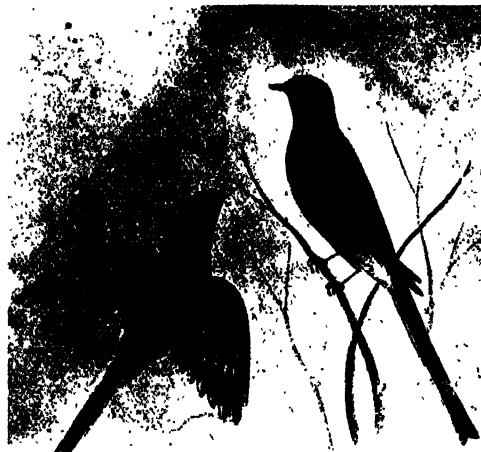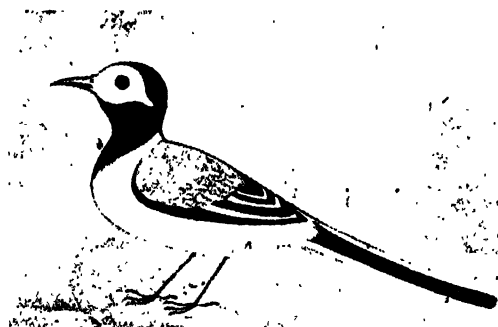
পশুপাখীর চিত্র

শিল্পের রঙ্গমঞ্চে মানুষ পশু পাখী সকলেরই আনাগোনা আছে। কেবল ভাব নিয়ে যে শিল্প সেটা বড় গভীর। কিন্তু শিল্পের আরও একটা দিক আছে যেটা বড় সরল। শিল্পের এই বিভাগে পশুপাখীর যাওয়া-আসা। জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্বভাবের দেওয়া। এ সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হয় তখনই যখন মানুষ অস্বাভাবিক হয়। বনের পশুপাখীকে যখন আমরা বন্দী করি তখনই তারা আমাদের ভয় করে। এ ব্যাধের ব্যবসায় না করলে মানুষ আর পশুপাখীর মাঝে স্বভাবের দেওয়া সম্বন্ধ অটুটই থাকে। হিংস্র জন্তুদের কথা ছেড়ে দিতে হয়, কারণ তাদের সঙ্গে মানুষের খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ। কিন্তু অন্যান্য নিরীহ পশুপাখী অধিকাংশই এমন যে তারা সহজেই মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে বেশ মিলেমিশে থাকতে পারে। পুরাকালে ঋষিমুনিদের আশ্রমে মৃগের দল নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াত। আশ্রমবাসীদের সুখে তাদের সুখ, দুঃখে তাদের দুঃখ ছিল। শকুন্তলার আশ্রম-ত্যাগের সময় বিরহ সম্ভাবনায় মৃগী ময়ূরী ও চক্রবাকী অধীরা হয়ে পড়েছিল। কণ্বমুনির আশ্রমে মানুষ ও পশুপাখীর অবাধ মিলন ছিল, তাই এমন সহানুভূতি ছিল। রামচন্দ্রের সহায়তা করলে সুগ্রীব আর তার অনুচরেরা। বিপন্না সীতার জন্য প্রাণসমর্পন করেছিল জটায়ু। এসব পৌরাণিক কথা রূপক হতে পারে, কিন্তু এরূপ কথার মধ্যেও সত্যের যথেষ্ট আভাস আছে। মানুষের ব্যবহারে জীবজন্তু বশ মানে আর তারা মানুষের সুখ দুঃখে সহানুভূতি ও সহায়তা করে। রাস্তার কুকুর, যে কেবল বাড়ীর খাবারের আবর্জ্জনার সামান্য অংশ কখন কখন খেতে পায় সে, অনেক সময়ে বেতনভোগী চৌকিদারের চেয়ে অধিক বিশ্বাসী ও কাজের। কিন্তু সকল সময় আমরা এ কথাটা ভেবে দেখি না।

আজকাল পশু-পাখীর উল্লেখ করলে চিড়িয়াখানায় বন্দী-করা মরণাপন্ন জন্তু ও বাড়ীতে-পোসা খাঁচার পাখীকে মনে পড়ে। পশুপাখীর সঙ্গে এখন আমাদের বন্দী ও ব্যাধের সম্বন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৃগশিশু পেলে এখন আমরা শিকলে বেঁধে রাখি। গলায় পাটার রগড়ানিতে তার গলায় ঘা হয়ে যায়, বাঁধা থেকে থেকে এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে ছাড়া পেলেও আর সে দৌড়াতে পারে না। আমবাগানে কোকিলের চড়া তান শুনে আমরা ঘেরাটোপ-দেওয়া এক খাঁচার ভেতর কোকিল পুষি। কোকিলটা হয় সব সময়েই ডাকে কিংবা আদপেই ডাকে না। ময়ূর পুষি তার পেখমের খেলা দেখবার জন্যে, কিন্তু রাখি ডানাটি কেটে, বেশী সাবধান হতে গিয়ে কখন কখন পেখমও পঁচিয়ে দি। লেজ-বিহীন ময়ূরের ধড়টা কাঁ কাঁ করে আমাদের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। এখন পশুপাখীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় কতকটা এইরূপেই হয়। তাদের আমরা ছলে কৌশলে বন্দী করে মনস্ করে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখি। তাদের স্বাধীন অবস্থার প্রকৃত প্রকৃতি জানি না। কাজেই আজকাল তাদের ছবির কল্পনা করতে হলে এই বন্দী অবস্থার কথাই প্রথমে মনে হয়। হিংস্র জন্তুর সঙ্গে পিঞ্জরার ও পাখীর সঙ্গে খাঁচার কথা যেন আমরা না ভেবে থাকতে পারি না। জন্তু যদি ছাড়া পায়, পাখী যদি উড়ে যায়। এমনই সঙ্কোচ আমাদের হয়ে পড়েছে। কিন্তু পুরাকালে শিল্পীদের এমন কোন দ্বিধা ছিল না। তারা পশু পাখী আঁকতো তেমনি ভাবে যেমন প্রকৃতিতে তারা ঘুরে বেড়ায়। হাতী আঁকবে যদি তাহলে মত্ত হাতী কমলবনে কেমন করে মাতোয়ারা হয়ে ফুল ছোড়াছুড়ি করে তাই দেখাত, বাঘ এঁকেছে জঙ্গলে ছাড়া অবস্থায় বা মৃগের উপর লাফিয়ে পড়ার অবস্থায়, বলদ এঁকেছে বোঝা বইবার অবস্থায় না, অন্য একটা বলদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করার অবস্থায়, শূকর এঁকেছে পোসমানা নিরীহ নয়, অশ্বারোহী শিকারীর প্রতিদ্বন্দ্বী বরাহ এঁকেছে, পাখী এঁকেছে মুক্তপ্রকৃতির শ্যামল পল্লবের ছায়ায় ফলের কুঞ্জবনের মাঝে; মরাল এঁকেছে শতদল-শোভিত সরোবরের মাঝে বা নীল আকাশের গায়ে; ক্রৌঞ্চের সার এঁকেছে বিজুলী-হানা কালো মেঘের গায়ে; কপোত কপোতী এঁকেছে পাশাপাশি লতাপাতার মাঝে; বাজপাখী এঁকেছে চোখে ঠুলি-দেওয়া পোষা নয়, এঁকেছে শিকার ধরা জঙ্গলী বাজ।

ভারত চিত্রশিল্পে পশুপাখীর ছবি অনেক দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শিল্পের যা কিছু অবশিষ্ট এখনও দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে জীবজন্তুর আকৃতি নিয়ে অনেক ছবির

কল্পনা আছে। অজন্তার চিত্রাবলীতে জীবজন্তুর অসংখ্য চিত্র দেখা যায়। তার মধ্যে এই কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সিংহ মৃগ বলদ ঘোড়া হাতী বানর ময়ূর হংস শকুনি। অজন্তা চিত্রাবলীর অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ জাতক সম্বন্ধীয়। জাতকের অধিকাংশ গল্পগুলিতেই জীবজন্তুর বিবরণ আছে। সেই-সকল উপাখ্যানের চিত্র সঙ্কলন করতে জীবজন্তুর আকৃতি আঁকা হয়েছে। অজন্তায় আঁকা এই-সব পশুপাখী দেখলে অবাক হতে হয়। সেসকল শিল্পীদের দেখবার ও দেখাবার কৌশল অতি অদ্ভুত ছিল। জন্তু ও পাখীগুলি এমন ভাবে এঁকে রেখেছে যে তাতে তাদের প্রকৃতির পরিচয় সম্পূর্ণভাবে ফুটে রয়েছে। এই-সকল পশুপাখীর আকৃতি দেখাবার জন্যই যে এগুলি আঁকা হয়েছিল তা নয়।

এই ধরণের ছবি আঁকা মোগল চিত্রশিল্পে অনেক আছে। ইসলাম শিল্পে মানুষ বা জীবজন্তুর প্রতিরূপ আঁকা নিষেধ ছিল। কিন্তু বাদশা আকবরের সময় যখন একবার সে নিষেধের ব্যতিক্রম হল তখন মোগল শিল্প অনেক দিক দিয়ে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। যেমন মানুষের বহু প্রতিকৃতি আঁকা মোগল শিল্পের একটা অংশ ছিল, সেইরকম কেবল জীবজন্তুর আকৃতি নকল করারও চেষ্টা হত। বাদশা জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনবৃত্তান্তে জীবজন্তুর ছবি আঁকার সবিশেষ বর্ণনা আছে। এ সকল চিত্রের বিশেষত্ব এই যে নকলগুলি প্রায় নিভুর্ল হয়েছে। কারিগরির বাহাদুরী ও অধ্যবসায় এই দুটোই এই-সকল চিত্রের দেখবার জিনিস। চিত্রকর যা দেখেছে সেই চোখে-দেখা জিনিসটি হয় সামনে কিংবা স্মরণে রেখে হুবহু করে কাগজের উপর রং ফলিয়ে নিখুঁত করে বসিয়ে দিয়েছে। বাজপাখীর চোখ এঁকেছে আগুনের হল্কার মত চঞ্চল, ঠোঁট এঁকেছে বজ্রের মত কঠিন, পালক এঁকেছে ঠিক পালকেরই মত কোমল। মোগল শিল্পীদের আঁকা পশুপাখীর ছবিতে এইরকম নকলের বাহাদুরী।

হিন্দু চিত্রশিল্পেও পশুপাখীর অনেক ছবি দেখা যায়। কিন্তু সেগুলি অনেকের কাছেই অপরিচিত। এই প্রবন্ধে তার সামান্য পরিচয় আছে। রাজপুতানায় পশু-পাখীর অধিক ছবি নাই। কাংড়ার শিল্পে অসংখ্য পশুপাখীর পৃথক পৃথক ছবি আছে। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে কয়েকটি প্রতিলিপি দেওয়া হল সেগুলি অধিকাংশই কাংড়া থেকে পাওয়া। কাংড়ার এই-সকল চিত্রের বিশেষত্ব এই যে এগুলি অতি সহজভাবে আঁকা। মোগল শিল্পের সুক্ষ্মতা এর কোনটায় নাই। কিন্তু সকল অংশই অতি স্পষ্ট ও নির্ভুল ভাবে দেখান হয়েছে। অধিকাংশ ছবি চিত্রকরের স্মরণার্থ মোটা নক্সা। কিন্তু সেগুলি সবই অদ্ভুত দক্ষতায় আঁকা। এ-সকল জীবজন্তুর সঙ্গে শিল্পীদের কি করে এত পরিচয় হয়েছিল কল্পনা করা যায় না। ছবিগুলি দেখলে বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে পশুপাখী সামনে রেখে সেগুলি আঁকা নয়। মনে হয় যেন চিত্রকরেরা প্রথমে জীবজন্তুকে প্রকৃতির মাঝে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে এসেছে, তারপর মনে-আঁকা চিত্রের প্রতিলিপি কাগজে ফুটিয়ে তুলেছে। স্মৃতির এই শিক্ষা শিল্পে কত প্রয়োজনীয়, তা এই চিত্রগুলি আমাদের বুঝিয়ে দেয়। চোখে দেখে মনে গেঁথে নেওয়াই শিল্পীর কাজ। কেবল চোখে দেখে মনে কিছু না রেখে কোন লাভ নেই। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে কল্পনার অস্তিত্ব বাস্তবে রেখে শিল্পের আরাধনা করাই প্রয়োজনীয়। পাঠে স্মরণশক্তি যেমন দরকারী, শিল্প-চর্চ্চায়ও ঠিক তেমনই প্রয়োজনীয়। পুরাকালে শিল্পীরা এ বুঝত ও সেইজন্যই তাদের শিল্পসাধনা এত সফল হত। জীবজন্তুর ছবি চিত্রশিল্পের একটা সামান্য অংশ। কিন্তু এই অংশেও তাঁরা যা রেখে গেছে এখন আমরা চিড়িয়াখানা ও যাদুঘরেও তার সব দেখতে পাই না। তার কারণ এই যে তারা প্রকৃতির মাঝে গিয়ে প্রাকৃতিক চিড়িয়াখানায় যেটি দেখে আসত সেইটিই মনে এঁকে এনে শিল্পের কৌতুকাগারে রেখে দিত।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মিলনের আক্ষেপ

বিরহে তোমার কত যে দুঃখ দেখাতে তোমারে ইচ্ছা করে;
দেখা পেলে হায়, ব্যথা যে লুকায়, হাসি ফুটে ওঠে ওষ্ঠাধরে;
দেখে ভাব তুমি কত আনন্দ কত সুখ মোর নাহিক ওর,—
বন্ধু তোমারে দেখাতে নারিনু হাসির আড়ালে আঁখির লোর!

শ্রী—

চড়ুই

বকের বিবিধ ভঙ্গির নক্সা

মাছরাঙা।　　　　পোষা বাজের শিকার

কাঠঠোকরা।　　　　হাড়গিলা।　　　　তুতী।

তিত্তির।　　　　দহেল পাখী।　　　　চড়ই
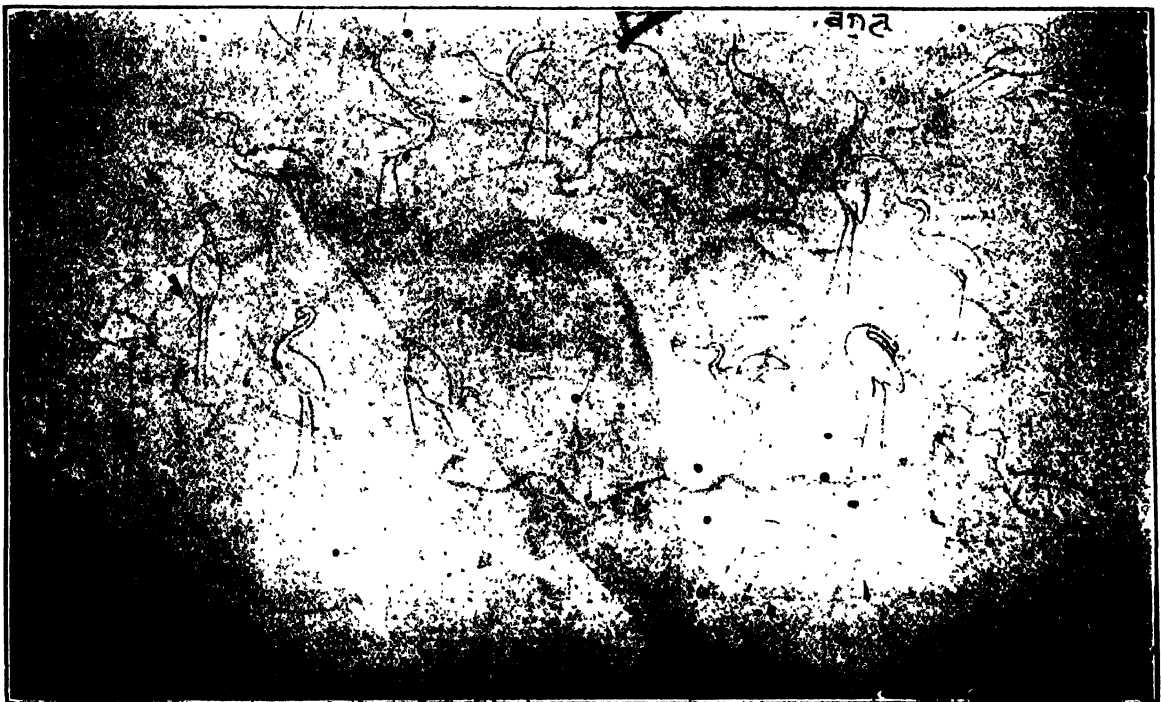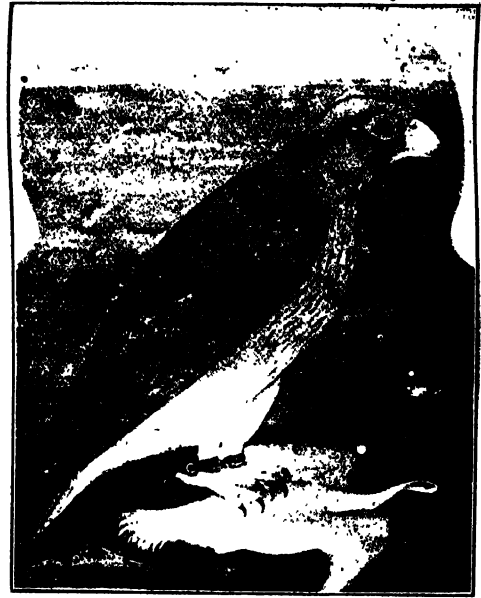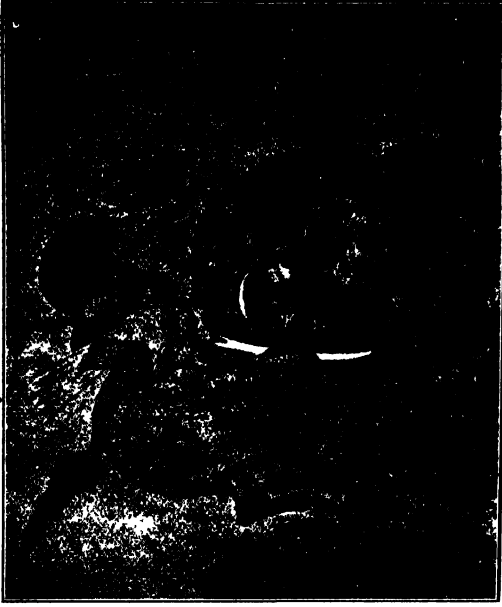
শূকর শিকার।

বাঘ।

মত্ত হস্তী।

মহিষের লড়াই

হাতীর লড়াই।

পলাতক মহিষ।
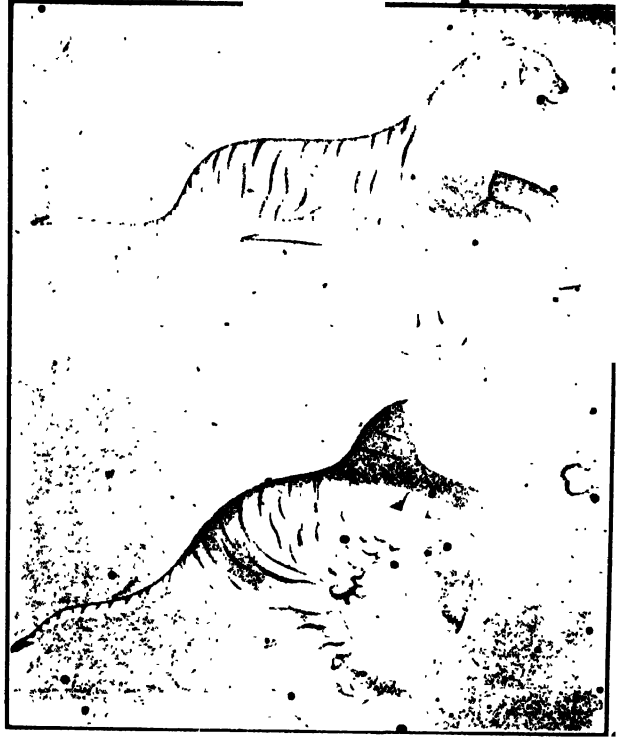
বিবাহ

(গল্প)

(১)

"আমার যে হৃদয় তাহা তোমার—"

তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত সভা। পুষ্পগন্ধ, নরনারীর বেশবাসের আতরের সৌরভের ভার বহিয়া বায়ু যেন ক্লান্ত। ঘূর্ণায়মান তাড়িত-ব্যজনীও যেন তাহাকে নাড়াইতে পারিতেছে না—পূর্ণগর্ভা রমণীর ন্যায় সে অলস, অচঞ্চল। সহস্র উৎসুক নেত্র, সহস্র উৎকর্ণ শ্রবণ, বর ও কন্যার মুখের দিকে তাহাদিগের উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা শুনিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছে।

সহসা সভাপ্রান্তে কিসের কলরব উঠিল। সুধার লজ্জাশীল কণ্ঠস্বর তাহাতে ডুবিয়া যাওয়ায় আচার্য্য আবার কহিলেন—"আমার যে হৃদয়—"

একজন লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া আসিল "মশাই থামুন! থামুন!" রুক্ষ তাহার কেশজাল, বক্ষ তাহার দ্রুততালে উঠিতেছে পড়িতেছে, গাত্রে তাহার মদের গন্ধ।

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বর মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার গৌরসুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, চন্দনলিপ্ত ললাট কি এক ঘৃণার বেদনায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কন্যাকর্ত্তা প্রিয়নাথ বাবু সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুককে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। দুই চারিজন নিমন্ত্রিত আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দক্ষিণা বাতাসের আগমনের আভাস পাইয়া যেমন সমস্ত বনানী মরমর করিয়া ওঠে, তেমনি গণ্ডগোলের আভাস পাইয়া সমস্ত সভা সচকিত হইয়া উঠিল।

পশ্চাৎ হইতে কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল "(Scoundrel) স্কাউনড্রেল পাজী, মারো উস্কো।"

আগন্তুক চীৎকার করিয়া উঠিল "বর সতীশ বিবাহিত। তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান।"

পুষ্পমাল্যের গ্রন্থির নীচে সুধার একমুঠা-ফুলের-মত-কোমল হাতখানি সতীশ বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। সে অনুভব করিল যে সে হাতখানি বেতসপত্রের মত কাঁপিতেছে—কি হিমশীতল তাহার স্পর্শ।

সভায় ভীষণ কোলাহল উঠিল। সুধার দুই ভ্রাতা ছুটিয়া আসিয়া সতীশকে চাপিয়া ধরিল। প্রিয়নাথবাবু তাহাদিগকে থামাইয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন "বাবা সতীশ! এ কি সত্য?"

আগন্তুক তখনও চেঁচাইতেছে "সতীশের হিন্দুমতে বিবাহিতা স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান আছে, ও—যদি অস্বীকার করে ত তাকে (Produce) প্রোডিউস করতে পারি! বলেন ত মশাই" কয়েকজন ভদ্রলোক লোকটিকে টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কোলাহল-মুখর সভাতল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ছিন্ন পুষ্পমালা, পরিত্যক্ত মুদ্রিতপঙ্ক্তিপত্র ও শূন্য আসনের উপর বিজলীবাতি আলোক বিকিরণ করিতে লাগিল। কোথায় সে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ! কোথায় সে মণিমাণিক্যের তীব্র দ্যুতি!

বাসরশয্যায় রক্তাম্বরা আভরণময়ী সুধা সারারাত্রি বিনিদ্র নয়নে নিশ্চল প্রস্তরপ্রতিমার মত জাগিয়া বসিয়া রহিল। কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে বা স্পর্শ করিতে সাহস পাইল না।

প্রভাতে গতরাত্রির অভুক্ত ভোজ্যদ্রব্য বিতরণকালে যখন কাঙালীদিগের মধ্যে কোলাহল রব উঠিল তখন প্রায়লুপ্তচেতনা সুধার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে সেই শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল "ওগো! আমার এ কাঙালহৃদয় কাহার দ্বারে ভোজ্য প্রার্থনা করিবে? তাহাকে এমনি করিয়া কে নিষ্ঠুর রিক্ত করিয়া গেলে কেন? কোন্ অপরাধে তাহাকে এত লাঞ্ছিত, এত অবমানিত করিয়া গেলে?"

সংবাদপত্রগুলি যে তাহাদিগের অপমানে মুখর হইয়া উঠিবে, ভ্রাতা দুটি এই ক্ষোভে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ভগ্নহৃদয় পিতামাতা দুঃখিনী কন্যাকে লইয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন।

দোষ ত তাঁহাদেরই! তাঁহারা কেন ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলেন না! তাঁহারাই বা কি করিবেন? সতীশকে তিন বৎসর তাঁহারা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছেন—কি নম্র, কি শান্ত, মিষ্টভাষী সে! তাহাকে সচ্চরিত্র বলিয়া জানিতেন বলিয়াই ত আদরের দুলালীকে তাহার হস্তে

সমর্পণ করিতে গিয়াছিলেন। তাহার স্ত্রী যে বর্ত্তমান তাহা ত ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারেন নাই। পুত্রবৎ তাহাকে স্নেহ করিতেন, তাই ত সানন্দে তাহাকে জামাতৃপদে বরণ করিতে গিয়াছিলেন। হায় সতীশ! তোর মনে এই ছিল? আনন্দের হাট ভাঙিয়া দিলি? ফুল্ল কমল যে শুকাইয়া যায়!

(২)

নির্জ্জন প্রদেশে বন্যপ্রকৃতির নীরব শোভায় সুধা আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। কতদিন একাকিনী সে নদীতটে পলাশবনে বিচরণ করিতে করিতে আপনার তপ্তহৃদয়ের ব্যথকাননা বিশ্বদেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিত।

একদিন সে তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় ভগ্নকণ্ঠে তাহাকে কে ডাকিল—সুধা! এ যে তাহারই কণ্ঠস্বর যাহাকে হৃদয়মন্দিরে আসন দিয়া সে কলঙ্কের বোঝা তুলিয়া লইয়াছে—তবুও ভুলিতে পারে নাই। যাহার কথা, সমাজ উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া বলিয়াছে, তাহার ভোলা উচিত ছিল, কিন্তু তবুও ভুলিতে পারে নাই। এই কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য, এই একজনের সান্নিধ্য অনুভব করিবার জন্য, তাহার প্রাণ এখনও কাঁদিয়া ওঠে। এ যে তাহার নিকট ঘোরতর অপরাধী, কিন্তু তবুও সে যে ইহাকে অপরাধী করিতে পারে নাই—ক্ষমা করিয়া ভালবাসিয়াই চলিয়াছে। এই ভালবাসার জন্য যে সে আজ অনেকের ঘৃণার পাত্রী হইয়া উঠিয়াছে।

সুধা থমকিয়া দাঁড়াইল। মাথ সতীশ নিকটে আসিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল "সুধা! দয়া করে একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

সুধার কি বলা উচিত ছিল—আমার সঙ্গে তোমার কোনও কথা থাকতে পারে না? সুধা ও কথা বলিতে পারিল না। সে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুক যে দুঃখ বেদনায় তোলপাড় হইয়া যাইতেছিল। অভিমানে যে হৃদয়ের উপর গুমরাইয়া কাঁদিতেছিল "ওগো, আমি কি করেছিলাম তোমার? ওগো আমি কি করে জানি যে তুমি আমায় এই ব্যথা দিলে?"

সতীশ কাঁদিয়া কহিল "সুধা, আমায় ক্ষমা কর। আমি জানতাম না, আমি জানতাম না। তাই তোমার কাছে আমি ঘোর অপরাধী। আমায় তুমি ক্ষমা কর। আমি সেই রাত্রি থেকে এই কথাটি তোমায় বলবার জন্যে আকুল হয়ে আছি। তুমি আমায় কি ভাবলে সুধা, এই ভেবে আমি যে কোনও শান্তি পাইনি! তোমার অজানিতে এই সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজে খুঁজে ছায়ার মত যে পিছনে পিছনে ঘুরেছি। উঃ সুধা, সেদিন যখন ওরা আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আমি একটিবার তোমার কাছে যাবার জন্য কত কাতরাতে, কত মিনতি করতে লাগলাম, কেউ আমার কথায় কান দিলে না, উল্টে ঠেলতে ঠেলতে বার করে দিলে! সুধা! আমার সে যন্ত্রণা তুমি ভিন্ন আর কেউ বুঝবে না! আমার অন্তর বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছ?"

সুধা মনের মধ্যে সমস্ত ঝড় চাপিয়া রাখিয়া প্রলয়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তের প্রকৃতির মত শান্ত স্থিরকণ্ঠে কহিল "আমি সে অপরাধ ক্ষমা করেছি—সেই দিনই করেছি।"

সতীশ আবার কহিল "সুধা! মনে পড়ে, আমার প্রতিজ্ঞা করা হয়ে গিয়েছিল; তুমি প্রতিজ্ঞা করছিলে, তুমি কি বলছিলে মনে আছে? আমার যে হৃদয়—"

বাধা দিয়া সুধা কহিল "এই বলতে এসেছেন আপনি? আমি তবে যাই।"

হায় সুধা! হৃদয়ের বাঁধ যে ভাঙিয়া গিয়াছে। এ বন্যা কি অত অল্পে থামে? "না না, সুধা যেও না, আমি এ বলতে আসিনি। সুধা! সুধা! আজ আমি 'আপনি', আজ আমি পর?"

"হাঁ, আর আমিও সুধা নই। আমি মিস রায়।"

"আচ্ছা, তাই হোক, মিস রায়—না, না, সুধা তুমি সুধা, চিরদিনই আমার কাছে সুধাই থাকবে। জান ঈশ্বর সাক্ষী করে আমি তোমায় স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি——"

"সে প্রতিজ্ঞার কোনও মূল্য নেই।"

"মূল্য নেই? আছে, খুব আছে।"

"না, নেই! আপনি সে প্রতিজ্ঞা আগে আরেকজনের কাছে করেছেন।"

"আগের প্রতিজ্ঞারই মূল্য নেই, সুধা! তা জানি বলেই আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে এ প্রতিজ্ঞা করতে পেরেছিলাম।"

"মূল্য নেই? আগের প্রতিজ্ঞার মূল্য নেই? আপনার স্ত্রী

তবে ?—" আশার বেদনায় সুধার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

"বেঁচে আছে, সুধা! তা ঠিক! কিন্তু আমার কাছে সে মৃত! বুঝতে পারলে না? তাকে আমি গ্রহণ করতে পারি না। তোমায় ভালবাসি বলে নয়, সুধা। সমাজ তার হাতে আমার হাত বেঁধে দিয়েছিল বটে কিন্তু সে স্বেচ্ছায় বন্ধন খুলে দিয়েছে, তাই সে প্রতিজ্ঞার মূল্য নেই। তাই তুমি আমার সুধা!"

"বেঁচে আছেন? মরেন নি? তবে—তবে?"

"বুঝলে না? সে আমাকে ত্যাগ করে গেছে!"

"কিন্তু তিনি ত আপনার স্ত্রী?" সুধার নিকট বিশ্বজগত একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চিহ্ন, একটা অসীম জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না।

"হাঁ, সে আমার স্ত্রী ছিল এককালে, আজও সে বলবে না সে আমার স্ত্রী। হিন্দুমতে বিবাহিত, সে, তার স্বামী ত্যাগ করবে না, তাই সে আমার স্ত্রী।"

"তাই আপনার স্ত্রী!"

"সুধা, সুধা! তুমি জান না সে আমার অদৃষ্টাকাশের ক রাহু! সে যে আমার সব সুখ গ্রাস করে ফেলেছে।"

সুধা দুই হাত জোড় করিয়া বলিল—অন্তরের মধ্যে কসের প্রেরণা সে অনুভব করিল সে বুঝিল না—কাতর-কণ্ঠে মিনতির স্বরে সে বলিল "আপনি আমায় ভালবাসেন বলছিলেন তাই বলছি, সতীশ বাবু, যদি আপনি মানুষ ন, যদি আপনি আমায় ভালবাসেন—"

"যদি, সুধা! যদি ভালবাসি!" হায় নারী, তুমি কি বুঝবে কি গভীর ভালবাসা এ, এ যে দামোদরের বন্যার মত হৃদয়ের দুইকূল প্লাবিয়া, সমাজশাসন কর্ত্তব্য সংযম সব ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

"তবে সেই ভালবাসার দোহাই দিয়ে বলছি—আপনি তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, আপনি তাঁকে গ্রহণ করুন।"

"তুমি কি বলছ তুমি বুঝছ না সুধা! সে যে—!"

সুধা বাধা দিয়া কহিল "বুঝেছি, ভাল করেই বুঝেছি, তাই বলছি, আপনি যান তাঁকে ফিরিয়ে আনুন।"

ম্লানমুখে, অপরাধীর মত দণ্ডাজ্ঞা শিরে তুলিয়া সতীশ চলিয়া গেল। সুধা যে কি করিয়া কখন গৃহে ফিরিল তাহা অন্তর্যামী ছাড়া কেহই জানিল না।

"ওগো তুমি যাও। কর্ত্তব্যপালনে যে অবহেলা করিয়াছ সে অপরাধের গুরু প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ কর। যে বৃহৎ প্রতিজ্ঞা অগ্নি সাক্ষী করিয়া একদিন করিয়াছিলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা কর। বুক যদি ফাটিয়া যায়, হৃদয়রক্ত যদি বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরিয়া পড়ে, তবুও তাহা রক্ষা কর। আমায়ও তুমি গ্রহণ করিয়াছ, ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমিও তোমার স্ত্রী? ওগো, সমাজ যে বলে "না," আইন যে বলে "না"। কি জানি তবে আমি কি! সমাজের জীব আমি, তাই তারই শাসন মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু অন্তর আমার তোমাকেই জানে, তোমাকেই স্বামী বলিয়া চিনে, সে পাপই হোক আর পুণ্যই হোক তাই আজ তোমার সঙ্গে ব্রত করিতেছি, তোমারই মত দারুণ দুঃখ মাথায় তুলিয়া লইতেছি।"

(৯)

থিয়েটারের গ্রীনরুমে বসিয়া বিজলী যেখানে পান চিবাইতে চিবাইতে একদল পুরুষের সঙ্গে রসালাপ করিতে-ছিল, সতীশ ঠেলাঠেলি করিয়া একেবারে সেখানে ঢুকিয়াই কহিল "বিজলী তোমায় নিতে এসেছি, বাড়ী চল।" যাহারা তাহাকে চিনিত না তাহারা মনে করিল যে এ বুঝি তাহা-দেরই মত এক পতঙ্গ বিজলীর রূপবহ্নিতে আপনার পাখা পুড়াইতে আসিয়াছে। দু-একজন যাহারা চিনিত, তাহারা প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই মাতালের বিকট হাসি হাসিয়া কহিল "উহু বাবা, তা হবে না। বিজলী যাবে না।" সতীশ বিজলীর সম্মুখে হাত ধরিয়া কহিল "ওঠ, চল।"

বিজলী হাত ছিনাইয়া লইয়া, নয়নে অধরে বিজলীরই মত তীব্র হাসি খেলাইয়া, ললিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে মধুর কণ্ঠে গাহিল

> "যদি এসেছ, এসেছ বঁধুহে,
> দয়া করে কুটীরে আমার।"

সতীশ তীব্রস্বরে কহিল "তুমি যাবে কি—না?" মাতা-লেরা উত্তর দিল "না, না, যাবে না।" বিজলী শুধু হাসিল। কি দারুণ অবজ্ঞারই হাসি সে! সতীশের আপাদমস্তক সেই হাসিতে জ্বলিয়া উঠিল—এই তাহার স্ত্রী! সমাজ

তাহাকে ইহারই সহিত গাঁটছড়া বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আর সুধা! অদৃষ্টের এ কি নিদারুণ পরিহাস!

বিজলীকে তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে—এ যে সুধারই আদেশ! কিন্তু সুধা ত জানে না যে বিজলী বাস্তবিকই বিজলী—সেই রকমই সুন্দর, সেই রকমই ভয়ঙ্কর জ্বালাময়! যে তাহাকে ধরিবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়, সে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবেই মরিবে।

"ঢাস আর নাই কর, তোমাকে যেতেই হবে।" দৃঢ়কণ্ঠে এই কথা বলিয়া সতীশ আবার বিজলীর হাত ধরিল। সেই স্পর্শে ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর কুঞ্চিত হইয়া শিহরিয়া উঠিল। আচার্য্য যখন সুধার হাত তাহার হাতে দিয়াছিলেন তখন তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিয়াছিল কি পুলকে! কি গভীর আনন্দে! আর বহুদিন পূর্ব্বে একদিন এই হাতখানিই সে কত আদরের মোহে, কত আগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল! সেদিন সে কত সুখের স্বপ্নই না রচনা করিয়াছিল!

বিজলী সে বজ্রকণ্ঠে ও বজ্রমুষ্টিতে ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "ওগো আমায় মেরে ফেল্লে গো! ও লালুবাবু, ও টুরো, তোরা আয় না।"

ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল যেমন রক্তের গন্ধে ছুটিয়া আসে তেমনি করিয়াই অনেকে ছুটিয়া আসিল মজা দেখিবার জন্য। মাতালদের নেশা ছুটিয়া গেল। থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন "হাঁ, হাঁ, কে হে তুমি বেয়াক্কেল! মাঝ সিজনে ষ্টারকে নিয়ে টানাটানি!"

সতীশের চোখ মুখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া উঠিল "আমার স্ত্রীকে আমি নিতে এসেছি। বিজলী চল!"

বিজলী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "কে ওর স্ত্রী? কোথাকার মাতাল একটা!—আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না।"

সতীশ আর সেখানে দাঁড়াইল না। সারারাত্রি পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ভোরের বেলা সে ক্লান্তদেহে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহার পর চিঠির কাগজের পর কাগজ নষ্ট করিয়া বেলা প্রায় ৮টার সময় সে সুধাকে একখানা চিঠি লিখিল। তাহার মনের সমস্ত জ্বালা সেই চিঠিতে ভাবে ভাষায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। তাহার অন্তরের কাতর ক্রন্দন ও মিনতি জানাইয়া সে লিখিল "সুধা, তবুও কি তোমার দয়া হবে না?"

দুইদিন পরে বড় আশায় চিঠি খুলিয়া দেখিল সুধা লিখিয়াছে—

"আপনি যে দয়া করতে বলেছেন সেই দয়াই যে পরম নিষ্ঠুরতা হবে। আর আজকের এই নিষ্ঠুরতা যে উভয়ের চরম কল্যাণ।

"যদি কখনো সময় হয়, তখন নিজে থেকেই, যা জিজ্ঞাসা করেছেন, তার উত্তর দেবো। আর যদি সময় না হয়, তবে আশা আছে, জীবনান্তে এ জীবনে যা কিছু আজ জটিল এবং অবোধ্য মনে হচ্ছে তা সরল এবং সহজবোধ্য হয়ে উঠবে।

"আপনি আবার চেষ্টা করুন, কৃতকার্য্য হবেন।

সুধা।"

হতাশহৃদয়ে সতীশ বসিয়া পড়িল। তাহার জীবনের এই জটিল সমস্যার মীমাংসা কে করিবে? এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কবে আলোকের রেখাপাত হইবে? এ দুঃখরাত্রির অন্তরালে তাহার জন্য প্রভাত অপেক্ষা কোথায় করিতেছে? কতদিন, সে কতদিন!

হতাশার প্রবল অবসাদ কাটিয়া গেলে বিদ্রোহী চিত্তকে সংযত করিয়া, সঙ্কুচিত হস্তে সতীশ বিজলীকে এক পত্র লিখিল—

"বিজলী, যদি তুমি কখনো গৃহে ফিরতে চাও, শঙ্কা বা সঙ্কোচ বোধ না করে ফিরে এসো। আমার গৃহদ্বার তোমার কাছে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত অবারিত থাকবে। সতীশ।"

(৪)

পুরীতে সমুদ্রতীরে জ্যোৎস্নাবিধৌত রজনীতে সতীশ ও সুধার আবার দেখা! সতীশ অন্যমনস্ক হইয়া চলিতে চলিতে সম্মুখে সুধাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া কহিল "সুধা?"

"হাঁ আমিই, সুধা! আপনি এখানে?"

"হাঁ, আমরা কয়েক দিন হল এখানে এসেছি। আমার স্ত্রীর বড় অসুখ, তাই তাকে নিয়ে এসেছি।"

সুধার পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। সতীশ তবে তাহার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছে! এ কি ব্যথা তাহার অন্তরে আজ জাগিয়া উঠিতেছে? সেই

দুভাগ্যবতীর ঐ ভাগ্যবিবর্ত্তনে সে কেন সুখী হইতে পারিতেছে না ?

উত্তরে সংক্ষিপ্ত একটি "ও" বলিয়াই সুধা দ্রুতপদে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার সংযমের উপর সে কোনও বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছিল না।

হায় সুধা! তাহার চিত্তসিন্ধু মন্থন করিয়া কর্ত্তব্য যে গরল তুলিয়াছে তাহাতে তাহার সকল বিশ্ব যে জ্বালায় ছটফট করিতেছে। অন্তর তাহার কেবলি কাঁদিতে লাগিল "ওগো সে তোমার স্ত্রী! আর আমি, আমি কি ?"

সতীশের পত্র লিখিবার বৎসর দুই পর বিজলী যখন যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া তাহার স্বরের মাধুর্য্যের সহিত থিয়েটারে প্রতিপত্তিও হারাইয়া ফেলিল, তখন তাহার স্বামীর সেই অনাদৃত লাঞ্ছিত পত্রের কথা স্মরণে আসিল। এই পত্র লইয়াই মর্ম্মান্তিক উপহাস করিয়াছে যে সকল বন্ধুরা সেই বন্ধুর দল যখন দুরারোগ্য হোয়াচে রোগগ্রস্ত বলিয়া তাহাকে দূরে রাখিতে লাগিল, তখন একদিন সে সতীশের বাসায় আসিয়া, শুষ্ক ম্লানহাসি হাসিয়া তাহাকে জানাইল যে সে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই অবধি সতীশ তাহাকে লইয়া দেশদেশান্তরে ঘুরিতেছে।

(৫)

বৎসর দুই পর মসুরী পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া সুধা একদিন শুনিল যে সতীশ মসুরীতে আছে। সে ভাবিল ভাগ্যদেবতার একি নিষ্ঠুর খেলা! তিনি যদি তাহাদিগকে মিলিত হইতে দিবেনই না, তাহা হইলে তাহাদিগের জীবন-সূত্রকে এরূপভাবে গ্রথিত করিয়াছেন কেন যে এই বিশাল ধরণীতে তাহাদিগের এত ঘন ঘন সাক্ষাৎকার ঘটিতেছে ? কি উদ্দেশ্যে এই দুটি জীবনকে অনন্তের পথে ধনকেতুর মত বারবার সন্নিহিত করিয়া সরাইয়া দিতেছেন ?

বিজলী কেমন আছে জানিবার জন্য সুধার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। বিধাতা তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া জানিবার সুযোগ আপনিই মিলাইয়া দিলেন। একজন অল্পবয়স্ক ডাক্তার সুধার মাকে দেখিতে তাহাদিগের বাড়ীতে আসিতেন, তিনিই একদিন কথাপ্রসঙ্গে সতীশের কথা তুলিয়া বলিলেন "বেচারী ভদ্রলোকের স্ত্রী (Pthisis) থাইসিস হয়ে এখানেই মারা যান। তারপর ভদ্রলোকটির ও সেই রোগ দাঁড়িয়েছে, সেই অবধি লোকটি এখানে। আহা এমন নম্র বিনয়ী লোক খুব অল্পই দেখা যায়।"

সুধার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। সতীশ অসুস্থ রোগগ্রস্ত! তাহার দেহমন সতীশের সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য সুধার সমস্ত হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল।

সে লজ্জার মাথা খাইয়া সতীশকে পত্র লিখিল—

"শুনলাম, আপনার অসুখ করেছে এবং আপনি একলা। এসময়ে আপনার সেবার অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত করছেন কেন ?　　　সুধা।"

উত্তরের প্রতীক্ষায় সে ব্যাকুল হৃদয়ে পথ চাহিয়া রহিল। রক্ত তাহার দপ্ দপ্ করিয়া শিরায় শিরায় ছুটিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। উত্তর আসিলে চিঠিখানি বুকে ধরিয়া বিছানার উপর পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার প্রতি সতীশের সভাব ভালবাসা বিন্দুমাত্র কমে নাই এবং সেইজন্যই সতীশ তাহাকে ডাকিতে পারে না। মৃত্যুপথের যাত্রী সে, পারের খোঁজে চলিয়াছে, এপারে কোনও বন্ধন আর সে রাখিতে চাহে না। সুধাকে সে চিরদিনই ভাল বাসিয়াছে। আজও বাসে। সুধা তাহার সেবার অধিকার পাইতে ইচ্ছুক এই তাহার চরম সুখ ও পরম সান্ত্বনা, কিন্তু সেবায় যে তাহার আর প্রয়োজন নাই। সুধার জীবনে শনির মত সে, তাহাকে দুঃখই দিয়াছে, আজও দুঃখ দিতেছে, এই দুঃখ বহন করিবার শক্তি তাহার হৌক সতীশের অন্তরের কামনাই যে এই।

সুধার কর্ত্তব্যজ্ঞান সতীশ ও সুধাকে এতদিন দূরে রাখিয়াছিল। আজ সতীশের কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাদিগকে একত্রিত হইতে দিল না। নদীর মত এই দুটি হৃদয়তটের মধ্যে ব্যবধান কি কখনো ঘুচিবার নয়! হায় কোন্ সে সেতু যে এই ব্যবধানের বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়া তাহাদিগের চিরবাঞ্ছিত মিলন-বাঁধনে তাহাদিগকে বাঁধিয়া দিবে ?

সুধা যেদিন শুনিল সতীশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, আর বাঁচিবার আশা নাই, সেদিন সে তাহার অন্তরের ক্রন্দন কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া একেবারে সতীশের

গৃহে গিয়া সেখানে সতীশের কঙ্কালসার দেহযষ্টি শয্যার সহিত মিশাইয়া গিয়া আপনার নশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিল সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার নিঃশব্দ আগমনও সতীশের কর্ণে বাজিয়া উঠিল। আসন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তাহার সকল শক্তিই যেন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অতি স্নেহের স্বরে সে ডাকিল "সুধা!" সেই ডাকে সুধার এতদিনের সঞ্চিত সযত্নে চাপা বেদনার রাশি হৃদয় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল, সে সতীশের পায়ের উপর কাঁদিয়া পড়িল "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় পায়ে ঠেলো না। তোমার কাছে এই শেষ সময়টুক থাকবার অধিকার দাও।" সতীশ তাহাকে বুঝাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই পারিল না। সুধার অশ্রুজল ও অনুনয়ের নিকট সে হার মানিল।

আইন অনুসারে উহাদিগকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য পনর দিন অন্ততঃ অপেক্ষা করিতেই হইবে। এ পনর দিন যদি না কাটে? সুধা যুক্তকরে, উর্দ্ধমুখে প্রতি দিন প্রার্থনা করিতে লাগিল "হে কাঙালের ঠাকুর, দয়া কর। আমায় একটি দিন অন্ততঃ তাঁর স্ত্রী হ'য়ে সেবা করবার অধিকার দাও। আমায় দয়া কর।"

অনেকে এই বিবাহের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন, কেহ বলিলেন এ ত উদ্বাহ নয়, এ যে উদ্বন্ধন। সুধা কিন্তু চারিদিকের এই ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও আপনার সঙ্কল্পের উপর দৃঢ় অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

(৬)

সতীশ মৃত্যুর মত শীর্ণ, কঙ্কালসার মুখ, মৃত্যুর দেবতা যমের মতই অগ্নিময় গৌরবর্ণ। চক্ষু দুটিতেই দেহের সমস্ত জীবনীশক্তি যেন সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদিগের দৃষ্টি এত সজীব, এত প্রখর। আজও দীপালোক বরের অঙ্গের পট্টবাস, পুষ্পমালা ও চন্দনের উপর উচ্ছলধারে ঝরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু তাহার অন্তরে আজ সুখের পরিবর্ত্তে বেদনা জাগিতেছিল, যদিও সেদিনকার সে চাঞ্চল্যের পরিবর্ত্তে সে আজ গভীর শান্তি অনুভব করিতেছিল।

আজিও সুধা রক্তাম্বরা, সেই রজনীর সেই সজ্জাই তাহার অঙ্গে, আজ কিন্তু সে লজ্জাবনতা নহে। স্থির অকম্পিত কণ্ঠে সে আপনার মন্ত্র পাঠ করিয়া গেল। মৃত্যু পুরোহিতের আসন সম্মুখে আচার্য্য যখন কহিলেন "আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হোক" তখন সুধা অনুভব করিল যে পুষ্পমাল্যের গ্রন্থির নীচে সতীশের মুষ্টি বজ্রকঠিন হইয়া উঠিতেছে।

বেহুলার মত বিনিদ্রনয়নে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া সুধা তাহার বাসররজনী কাটাইল। কালসর্প যে তাহার স্বামীকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

অরুণালোক পূর্ব্বাকাশকে রাঙাইয়া তুলিবার পূর্ব্বেই সতীশের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সুধার আনতনয়নের সপ্রেম করুণ দৃষ্টির নীচে তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল "সুধা, বড় সুখী আমি। বড় সুখেই যাচ্ছি। আবার একবার বল ত শুনি, আমার যে হৃদয়—"

আর্দ্র সজল-কণ্ঠে সুধা কহিল "আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হোক—"

সতীশের কণ্ঠ মৃদুতর স্বরে বাজিল "আর তোমার যে হৃদয়—"

"আর তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হোক—"

মদের নেশার মত, গভীর সুখের আবেশের মত, মৃত্যু ধীরে ধীরে আসিয়া সতীশের নয়নপল্লবের উপর নামিল।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

অধীনা

তোমার গাঁথা মালার ফুলে গন্ধ যদি নাইবা থাকে
মন্দ তাহা নয় কখনই নয়,
তোমার আঙুল, পরশ দানে— গড়বে প্রেমে পুণ্য যা'কে
গন্ধ তার এ বুকের ভিতর বয়।
দীনের মতন চাইছ কেন?—অভাব মোরে জানাও মিছে,
তোমার ভাবেই বিভোর আমার প্রাণ,
কাঁপ্‌ছে কেন কণ্ঠ তোমার গাইতে তুমি নাইবা পারো
তোমার সলাজ নয়ন শুনাক্ গান!
স্বভাব-সরল শ্বাসের গতি— অমন ক'রে বাঁধলে কেন?
বক্ষ তোমার উঠ্‌লো ফুলে বুঝি,—
কইতে কথা উঠ্‌লে ঘেমে ভাষায় তোমার দৈন্য কোথা
মনের ভিতর পাইনা তো তা' খুঁজি!
তোমার নিভাঁজ পল্লীবুলি আমার বড়ই মিষ্ট লাগে—
ইচ্ছা করে জীবন ভরেই শুনি,
তাহার চেয়েও মধুর কিগো— ঢেউ-তোলা এই ছন্দগুলি
কও দেখি হে সমালোচক গুণী?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।

পরগাছা

(১)

গোসাঁইগঞ্জের বৃন্দাবন গোস্বামীর বিধবা ভগিনী মাধবী স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলেন তত বেলাতেও তাঁহার ভ্রাতার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী নারাণদাসীর ঘুম ভাঙে নাই। মাধবী তাড়াতাড়ি কাঁখ হইতে গঙ্গাজলের ঘড়া নামাইয়া ভিজা কাপড়েই রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিলেন। দেখিলেন, রান্নাঘরের দরজায় তালা বন্ধ। মাধবী ব্যস্ত হইয়া নামিয়া আসিলেন, কাপড় ছাড়িলেন, কাপড় শুকাইতে দিলেন, বার কতক শব্দ করিয়া করিয়া ভ্রাতৃজায়ার ঘরের সামনে দিয়া যাওয়া আসা করিলেন; স্নানের পূর্ব্বে বাসন মাজিয়া জল ঝরিবার জন্য উবুড় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেগুলিতে গঙ্গাজল বুলাইয়া খুব ঠনঠন ঝনাৎঝন শব্দ করিয়া ঘরে তুলিতে লাগিলেন, তবু নারাণদাসীর নিদ্রা হইতে জাগরণের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তখন মাধবী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। উঠানে রোদ চড়চড় করিতেছে—একবার উঠানে নামিয়া আসিয়া সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া কতখানি বেলা বাড়িতেছে দেখিতেছেন, আবার ভ্রাতৃজায়ার দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইতেছেন। নারাণদাসীর কাঁচা ঘুম ভাঙিলে মাথা ধরে, মাথা ধরিলে চড়া মেজাজ উর্দ্ধক হয়, সুতরাং ভ্রাতৃজায়াকে জাগাইতে মাধবীর সাহসে কুলাইতেছিল না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া করিয়া মাধবী ভ্রাতৃজায়ার ঘরের রক হইতে নামিয়া গোয়ালঘরের পাশে কূয়োর ধারে আপনার মেটেঘরের দাওয়ায় গিয়া উঠিলেন। সেখানে একটি ষোল সতর বৎসরের সুন্দর ছেলে বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্কুলের পড়া করিতেছিল। তাহার খড় কড় কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি স্তবকে স্তবকে ফুলিয়া ফুলিয়া কপালের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। মাধবী তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—হাঁরে রাখাল, আজ কি তোর ইস্কুল আছে?

রাখাল বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—আছে বৈ কি দিদিমা, আজকে আবার কিসের ছুটি থাকবে?

মাধবী আর কিছু না বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। আবার গিয়া নারাণদাসীর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইলেন। নারাণদাসী ভালো করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। তখন অসম সাহসকে প্রাণপণে অবলম্বন করিয়া মাধবী ছোট্ট করিয়া ডাকিলেন—বৌ!

বৌএর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

মাধবী গলার কাঠের মালায় আংটা দিয়া ঝুলানো হরিনামের মালার ঝুলিটি বুকের কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া নারাণদাসীর ঘরের দরজার সামনে ধন্না দিয়া জপ করিতে বসিলেন।

রোদে রোদে উঠান ভরিয়া উঠিয়াছে, শেষ জ্যৈষ্ঠের খর রোদে কাঠ ফাটিতেছে, কিন্তু নারাণদাসীর ঘুম চটিতেছে না, মাধবীকে তাহার দরজার গোড়ায় ধন্না পাড়িয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কিন্তু মেজাজ চটিতেছে।

মাধবী আবার উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরের দাওয়ার নীচে দাঁড়াইয়া বলিলেন—রাখাল, বেলা হল, নাইতে যা।

রাখাল এলজেব্রার একটা অঙ্ক কষিয়া স্লেট হইতে খাতায় কালি দিয়া লিখিয়া লইতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল—এই যাই দিদিমা। তোমার রান্না কি হল?

"তুই নেয়ে আসতে আসতে হয়ে যাবে। তুই নাইতে যা।"—বলিয়া মাধবী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন; পাছে তাঁহার একগুঁয়ে তেজী স্বভাবের নাতিটি তাহার রাঙা দিদিমার আচরণের আভাস পাইয়া চটিয়া উঠিয়া একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করিয়া বসে, এই তাঁহার ভয় হইতেছিল।

রাখাল কুলীনের ছেলে; জন্মে সে কখনো বাপের মুখ দেখে নাই; তাহার মাও তাহার মামার বাড়ীতে রাখালকে প্রসব করিয়াই মারা গিয়াছেন, মাকেও সে দেখে নাই। তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন তাহার দিদিমা; তিনিও কুলীনের স্ত্রী, তিনি কখনো শ্বশুরবাড়ীতে পা দ্যান নাই। এজন্য রাখাল তাহার মায়ের মামা বৃন্দাবনের গলগ্রহ আশ্রিত; তাহার উপর বৃন্দাবন আবার প্রসিদ্ধ কৃপণ সুদখোর মহাজন বনবিহারী গোস্বামীর কন্যা নারাণদাসীকে সুন্দর দেখিয়া দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। দিদিমা মা ও নিজে পরপর কোনো ন্যায্য অধিকার না থাকিলেও যেখানে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে সেখানে

যতখানি কুণ্ঠিত হইয়া ও পরের মন জোগাইয়া চলিতে হয়, রাখাল সেরূপ চলিতে জানিত না। সে যে-বাড়ীতে জন্মিয়াছে সেখানকার সে আপনার, এই ধারণায় সে জোর করিয়া স্নেহ না হোক ন্যায্য ব্যবহারের দাবী করিতে চাহিত। তাহার দিদিমা মাধবী এইজন্য তাঁহার নাতিটিকে বিশেষ রকম ভয় করিয়া চারিদিক সামলাইয়া লইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন।

মাধবী আসিয়া দেখিলেন তখনো নারাণদাসীর ঘুম ভাঙে নাই।

মাধবী ব্যাকুল ও হতাশ হইয়া নারাণদাসীর ঘরের রকে উঠিবার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন।

কৈবর্ত্তদের থাকোর মা উঠানে আসিয়া ডাকিল—কৈ গো মা-গোসাঁই!

মাধবীকে দেখিয়া থাকোর মা বলিল—কি গো দিদি-গোসাঁই, তুমি অমন করে বসে রয়েছ? রান্না-বান্না এখনো চড়েনি?

মাধবী একটু হাসিয়া বলিলেন—না, আজ একাদশী।

থাকোর মা জিজ্ঞাসা করিল—মা-গোসাঁই কম্‌নে? চান্ কর্‌তে গেছে বুঝি?

মাধবী আস্তে বলিলেন—না, ঘুমুচ্ছে।

থাকোর মা আশ্চর্য্য হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ঘুমুচ্ছে! ভ্যালা গেরস্তর বৌ যা হোক! এতখানি বেলা হল, এখনো পড়ে পড়ে ঘুমুতে নেগেছে! তুমি জাগিয়ে দাও না!

মাধবী বলিলেন—শরীরটে বোধ হয় ভালো নেই, কাঁচা ঘুম ভাঙাব না।

থাকোর মা বলিল—তবে বোলো, আমি এয়েলাম, সুদের পয়সা কটা দিতে। পারি ত ওবেলা আসব'খন।

থাকোর মা চলিয়া যাইতেছে। অমনি নারাণদাসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া নাক সিঁটকাইয়া পরম বিরক্তির ভরে মাধবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—আঃ! কী জালাতন! একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার জো নেই। ভোর না হতে দরজার সামনে বসে বকর বকর বকর!... বলি ও থাকোর মা, গেলি নাকি?...

বলিতে বলিতে নারাণদাসী উঠানে নামিয়া তাড়াতাড়ি থাকোর মাকে গেপ্তার করিতে ছুটিল।

পলাতক পয়সা কয়টিকে আদায় করিয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে নারাণদাসী উঠানে ফিরিয়া আসিলে মাধবী সসঙ্কোচ ধীর স্বরে বলিলেন—বৌ, রান্নাঘরের চাবিটে?

নারাণদাসী হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে গম্ভীর হইয়া বলিল—আজ আর রান্না চড়াতে হবে না—মহাপ্রসাদের বাড়ী আমার নেমন্তন্ন, ওঁর আজ হরিবাসর,—রান্না হবে কার জন্যে।

মাধবী সঙ্কুচিত হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন—রাখাল?

নারাণদাসী মুখ বাঁকাইয়া নথ দুলাইয়া বলিল—হ্যাঃ! রেখোর জন্যে আবার কাঠ পুড়িয়ে তেল নুন খরচ করে রাঁধতে হবে! ওকে মহাপ্রসাদের বাড়ী, না হয় ঠাকুর-বাড়ী পাঠিয়ে দিও, চারটি খেয়ে আসবে।

মাধবী মর্ম্মাহত হইয়াও সকল ব্যথা গোপন করিয়া বলিলেন—ওর যে স্কুল আছে বৌ! বেলা করে খেলে যে ওর স্কুল কামাই হবে!

নারাণদাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিল—তা না হয় স্কুল থেকে এসেই খেলে।

দু ক্রোশ দূরে স্কুল। সেখানে না খাইয়া পড়িতে গিয়া ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। এতখানি বেলা না খাইয়া ছেলেমানুষ রাখাল কেমন করিয়া থাকিবে?—এ সব তর্ক মাধবীর মনে উঠিলেও তর্ক নিষ্ফল জানিয়া তিনি মিনতির স্বরে বলিলেন—তুমি রান্নাঘরের চাবিটে শুধু দাও, আর সংসার থেকে তুমি একটু নুন দিও; আমি আর সব জোগাড় করে ওকে চারটি রেঁধে দেবো।

নারাণদাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—চাল ডাল তেল তরকারী কোথা থেকে জোগাড় করবে শুনি!

মাধবী কুণ্ঠিতস্বরে অপ্রতিভ মুখে বলিলেন—কাঠ কুড়িয়ে রেখেছি; আমায় দশমীর রাত্তিরে যে চাল-গুড় খেতে দাও তাই জমিয়ে জমিয়ে রেখেছি; কেদার দুলের কাছ থেকে চারটি পাটের শাগ এনেছি; তাই দুটো সেদ্ধ করে দেবো। তুমি শুধু রান্নাঘরের চাবিটে দেবে চল।

নারাণদাসী অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বলিল—সে চাবি আমার গয়নার সিন্দুকে।

মাধবী মিনতি করিয়া বলিলেন—সিন্দুক খুলে বার করে

দেবে চল বৌ; অনেক বেলা হয়ে উঠল, এই রদ্দুর মাথায় করে ওকে দুকোশ পথ হেঁটে ইস্কুল যেতে হবে।

নারাণদাসী নিতান্ত অগ্রাহ্যের ভাবে বলিল—এড়া কাপড়ে সিন্দুক ছোঁব কি করে? ডুবটা দিয়ে আসি।

নারাণদাসীর ডুব দেওয়া মানে যে কতখানি ডুব দেওয়া তাহা মাধবীর বিলক্ষণ জানা ছিল। মাধবী বলিলেন—সিন্দুকের চাবিটে আমায় দাও, আমি বার করে নিচ্ছি।

নারাণদাসী গম্ভীর হইয়া বলিল—ও সিন্দুকে অনেক লোকের গচ্ছিত টাকা আছে, বন্ধকী গয়না আছে, ওর চাবি তোমার হাতে কেমন করে দেবো!

রাখাল তখন নাহিতে যাইবে বলিয়া রান্নাঘরে তেল লইতে আসিতেছিল। সে নারাণদাসীর কথা শুনিয়া উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সেখানে আসিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল—কী! যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা, আমার দিদিমা চোর!

মাধবী তাড়াতাড়ি আসিয়া রাখালের হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন—রাখাল, দাদা আমার, তুই নাইতে যা।

রাখাল রুখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কি বলব রাঙা দিদিমা, তুমি আমার মায়ের মামী; দিদিমার পর মা, মায়ের পর আমি ক্রমান্বয়ে তোমাদের অছেদ্দার উচ্ছিষ্ট খেয়ে মানুষ; নইলে অন্য কেউ হলে যে-মুখে আমার দিদিমার অপমান করেছে সে-মুখ আস্ত থাকত না।

মাধবী চোখ রাঙাইয়া বলিলেন—রাখাল! ও কি কথা! আমি যেমন তোর দিদিমা বৌও তেমনি তোর দিদিমা। যা, পায়ে ধরে ঘাট মান।

নারাণদাসী তাড়াতাড়ি কাঁধে গামছা ফেলিয়া কাঁখে কলসী তুলিয়া তেলের বাটি হাতে করিয়া তাহার গোলালো দেহখানি দুলাইয়া বাড়ী হইতে হনহন করিয়া বাহির হইয়া নাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আগে কুকুর লেলিয়ে দিয়ে পরে আর ঠাট করে ওষুধ মালিস করে আত্তি জানাতে হবে না! থাক্, ঢের হয়েছে!...

মাধবীকে পদে পদে ছুতায় নাতায় মর্ম্মান্তিক অপমান করিয়া কষ্ট দিতে নারাণদাসীর অসীম ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যাইত। কিন্তু রাখালের কাছে কখনো সে এই পরিচয় দিতে পারিত না। কারণ নারাণদাসীর মনের মধ্যে রাখালের যে কতকগুলি বিশেষণ জমা করা ছিল, তাহার মধ্যে গোঁয়ার গুণ্ডা-দুটি।

চাবি না দিয়াই নারাণদাসী নাহিতে চলিয়া গেল দেখিয়া রাখাল গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—দিদিমা, তুমি আমায় ছেড়ে দাও, আমি রান্নাঘরের তালা ভেঙে ফেলি।

মাধবী দৃঢ়স্বরে বলিলেন—না, গোঁয়ার্ত্তুমি করতে পাবিনে।

রাখাল অভিমান করিয়া বলিল—তুমি মুখটি বুজে অপমান বরদাস্ত করবে, তা লোকে তোমায় অপমান করবে না! বেশ করে রাঙা দিদিমা তোমায় অপমান করে!

মাধবী হাসিয়া বলিলেন—যা যা নেয়ে আয়গে, মাথা গরম হয়ে উঠেছে, একে আজ রুক্ষ নাইতে হবে, অত মাথা গরম করিসনে।

দিদিমার এত দুঃখেও মুখে হাসি দেখিয়া রাখালও ছল-ছল চোখে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—রুক্ষ নাওয়াটা কি আজকে দিদিমা নতুন?

মাধবী উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস ও বিগলিত অশ্রু চাপিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাখালও গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া শূন্যের দিকে চাহিয়া সেইখানেই সিঁড়ির ধাপে বসিয়া পড়িল।

একটি তের চোদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ে আসিয়া সুন্দর মুখে হাসি মাখাইয়া বলিল—রাখাল-দা, তুমি অমন করে বসে রয়েছ যে? নাইতে যাওনি? দাদারা যে সব খেতে বসেছে। তুমি নাবে খাবে কখন?

রাখাল দুই হাতের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া হাসিয়া বলিল—আজকে খাব না, আজ একাদশী।

কিশোরী হাসিয়া বলিল—ইস্! এখনো ওঁর পৈতে হয়নি, উনি আবার একাদশী করবেন! সকল মিথ্যে কথা।

রাখালের মুখ হইতে সকল অসন্তোষ বিরক্তি রাগ ও দুঃখের চিহ্ন ঐ সুন্দর মেয়েটির স্নিগ্ধ হাসিটি মুছিয়া দিয়াছিল। রাখাল প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে হাসিয়া বলিল—মিথ্যে কথা নয় প্রসাদী, ঐ দেখ্ রান্নাঘরে তালা বন্ধ। গোসাঁইদা আজ হরিবাসর করবেন, আর আমি তাঁর ভক্ত নাতি হরিমটর করব!

প্রসাদী একবার রান্নাঘরের তালার দিকে আরবার

রাখালের কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে অবাক হইয়া তাকাইতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া রাখালের হাত ধরিয়া প্রসাদী বলিল—রাখাল-দা, তুমি আমাদের বাড়ী খাবে এস।

রাখাল অপ্রস্তুত হইয়া চট করিয়া এক মোচড়ে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল - যাঃ, আর পাকামি করতে হবে না। আজ আমার একাদশী।

তারপর গলায় গামছা ফেলিয়া একছুটে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। প্রসাদী ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিয়া গেল। মাধবী তখন মরাইএর আড়ালে দাঁড়াইয়া অঝোরঝোরে কাঁদিতেছিলেন।

মাধবী আঁচলে চোখ মুছিয়া দুখানি ইট পাতিয়া রাখালের জন্য আলুনি পাটশাক-সিদ্ধ দুটি ভাত রাঁধিবার জোগাড় করিতে লাগিলেন। প্রসাদীর দাদা ব্রজ আসিয়া বলিল ঠাকুরমা, আপনাকে আর রান্নার জোগাড় করতে হবে না। রাখাল আমাদের বাড়ীতে খাবে। প্রসাদী আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

মাধবীর চোখের জলে আগুন আর জ্বালা গেল না।

রাখাল স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেই ব্রজ বলিল—কি রে রাখাল, তোর রকম কি, স্কুল যাবিনে?

রাখাল বলিল—যাব বৈকি। তুই বই নিয়ে নতুন দীঘির ধারে দাঁড়াগে, আমি কাপড়টা ছেড়েই যাচ্ছি।

ব্রজ বলিল—তুই বই নিয়ে আমাদের বাড়ী চ, ভাত খেয়ে নিবি।

রাখাল কাপড় ছাড়িয়া ছেঁড়া জ্যালজেলে ময়লা উড়ানিখানি গায়ে দিতে দিতে বলিল—আজ আমি ভাত খাব না, আজ আমার একাদশী।

ব্রজ হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—চ চ, আর পাগলামি করতে হবে না।

রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল—পাগলামি নয়, সত্যি বলছি ব্রজ, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আজ থেকে একাদশী করব। বাঙালীর বিধবার মতন কুলীনের ছেলেও নিরাশ্রয়; তাকেও উপোষ অভ্যাস করতে হবে। আজ থেকে দিদিমার সঙ্গে আমারও একাদশী।

রাখাল বই লইয়া উঠানে নামিল। ব্রজ রাখালের একগুঁয়ে স্বভাবের কথা জানিত; রাখালের সত্য কথা জোর করিয়া বলিবার খ্যাতি তাহার সমবয়সী দলে বিলক্ষণ ছিল; তাহারা জানিত রাখাল যাহা বলে তাহা করে; তাহার কথা কখনো যদি একটু আধটু টলে তবে সে তাহার দিদিমার অনুরোধে। সুতরাং ব্রজ তাহাকে আর খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিল না।

মাধবী বলিলেন—ওরে রাখাল, একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খেয়ে যা...

—না দিদিমা, আমি আজ আর কিছু খাব না।

মাধবী রাখালের হাত চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন—কিছু না খেলে তোকে আজ ইস্কুল যেতে দেবো না।

রাখাল দাওয়ায় উঠিবার সিঁড়িতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—কি দেবে দাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

"তুই ছেঁচ থেকে উঠে বোস"—বলিয়া মাধবী ঘরে মিষ্টি আনিতে গেলেন; একখানি রেকাবিতে করিয়া দুটি ছোট-ছোট গুড়ের নারিকেল-সন্দেশ ও এক গেলাস জল রাখালের সম্মুখে আনিয়া রাখিলেন।

রাখাল এই দুর্লভ দ্রব্য দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টি দিদিমার দিকে ফিরাইয়া বলিল—এ কোথায় পেলে দিদিমা?

—তা যেখানে পাই না কেন, সে খবরে তোর কাজ কি? তুই খা না।

"চুরির জিনিস আমি খাইনে"—বলিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল। "কাল দশমীর রাত্তিরে এইটুকু জল খেতে পেয়েছিলে, তাও নিজের মুখের কাছ থেকে চুরি করে আমার জন্যে রেখেছ; তাই আমি খাব? বেশ করে রাঙা দিদিমা তোমায় চোর বলে!" রাখালের চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মাধবী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।

রাখাল চট করিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—"দিদিমা, ও তুলে রেখে দাও, আমি স্কুল থেকে এসে খাব।" তার পর ব্রজকে বলিল চ।

ব্রজ রাখালকে বলিল—জুতো পায়ে দিলিনে।

রাখাল সহজ অসঙ্কোচের ভাবে বলিল—জুতো আমার নেই, ছিঁড়ে গেছে।

রাখাল জোরে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইল। ব্রজ নীরবে ধীরে ধীরে রাখালের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল। মাধবী দুই চোখে আঁচল চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

(২)

নারাণদাসী বাঁ-কাঁখে জলভরা কলসী, ডান হাতে হরি-নামের মালার ঝুলি লইয়া নাহিয়া বাড়ী ঢুকিতেই দেখিল মাধবী দাওয়ায় বসিয়া সামনে একখানি রেকাবিতে দুটি নারিকেল-সন্দেশ সাজাইয়া কাঁদিতেছেন। নারাণদাসীকে দেখিয়া মাধবী তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া সন্দেশের রেকাবিখানি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নারাণদাসী রান্নাঘরের দাওয়ায় দুম করিয়া কলসী নামাইয়া বলিল—ঠাকুরঝি, ও নারকোল-সন্দেশ কি হবে ?

মাধবী অপরাধীর মতন কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—রাখালকে খেতে দিয়েছিলাম।

নারাণদাসী বলিয়া উঠিল—নাতি বুঝি রাগ করে না খেয়েই ইস্কুলে গেলেন ? বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলো-পানা চক্কর ! দেখে আর বাঁচিনে !—তা ও সন্দেশ পেলে কোথায় ?

মাধবী বলিলেন—কাল রাত্তিরে আমায় খেতে দিয়েছিলে, আমি খাইনি।

নারাণদাসী মুখ বাঁকাইয়া জনান্তিকে বলিতে লাগিল—সবাই অমনি না খেয়েই থাকে ! থাকা হত্তুকি খেয়েছে আর কি ? তাইত বলি, যে, রোজ রোজ ঘরের জিনিস এমন করে উড়ে যায় কোথায় ? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না তাইতেই !

মাধবী দৃপ্তস্বরে বলিলেন—দেখ বৌ, অমন অকথা কুকথাগুলো বোলো না। ভগবান জানেন, তুমিও জানো, যে, আমি চুরি করিনে. চুরি করবার আমার জো নেই, শূন্যো উনুনটাতে পর্য্যন্ত তোমার চাবি !

নারাণদাসী নিতান্ত নির্য্যাতিত নির্দ্দোষীর মতন ভাব করিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা ঠাকুরঝি, আমি তোমার নাম বাপ্প কিছু করেছি যে তুমি এই সক্কালবেলা ভগমান দেখিয়ে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে ? আমি যার এইসব ছোটনোকপনা ঝগড়া গিটিমিটির ভয়ে বাড়ীতেই থাকিনে। বুকের ওপর বসে নাতিপুতি নিয়ে গণ্ডেপিণ্ডে গিলবে আবার ভগমান দেখিয়ে শাপ মন্যিও দেবে ! এমনি কলিই বটে !

মাধবী আর কিছু না বলিয়া সন্দেশের রেকাবিখানি লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। নারাণদাসী গজর গজর করিতে করিতে কাপড় ছাড়িয়া কাপড় শুকাইতে দিতে ছাতে গেল।

খানিক পরে নাকে গোপীচন্দনের সূক্ষ্ম একটি তিলক কাটিয়া, হাতে একজোড়া তাস লইয়া, নারাণদাসী বাহির হইল। মাধবীর ঘরের দাওয়ার কাছে আসিয়া দাওয়ার উপর ঝনাৎ করিয়া রিং-সুদ্ধ দুটা চাবি ফেলিয়া দিয়া নারাণদাসী বলিল—ঠাকুরঝি, আমি মহাপ্পেসাদের বাড়ী যাচ্ছি ; তুমি এক তোলো ধান সেদ্ধ কোরো, ঘরে চাল বাড়ন্ত ;—রাত পোয়ালে তোমারই নাতি সক্কলের আগে গোগ্রাসে গিলবে।

(৩)

মাধবী ধান সিদ্ধ করিতেছেন। বৃন্দাবন গোসাঁই সর্ব্বাঙ্গে হরির নাম ও চরণের ছাপ মারিয়া, নাকের ডগা হইতে কপালের উপর-সীমা পর্য্যন্ত তিলক কাটিয়া, ন্যাড়া মাথার মধ্যস্থল হইতে মোটা লম্বা তেলচিকচিকে টিকি দুলাইয়া, ভুঁড়ি ফুলাইয়া, হাতে হুঁকা ঝুলাইয়া, বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন মাধবীকে বলিলেন—মাধী, আজকে রেগে নাকি রাঙা বৌএর সঙ্গে ঝগড়া করে না খেয়ে ইস্কুলে গেছে ?

মাধবী কোনো জবাব দিলেন না।

বৃন্দাবন বলিয়া চলিলেন—ভ্যালা গোঁয়ার ছেলে হয়েছে। ওকে এর পর এটে ওঠা দায় হবে। ওকে বাড়ীতে রাখতে হলে একটা লেঠেল রাখতে হবে দেখছি। যার ছেলে সে সকল উৎপাত গিষ্টি মেনে সয়ে যেতে পারে ; পরে সইবে কেন ? রাঙা বৌ যদি রেখোর গোঁয়ার্ত্তুমিতে রাগ করে, তবে তাকে ত সেজন্যে দোষ দেওয়া যায় না। মাধী, তুমিই ভেবে দ্যাখ না। আমি হক্ ন্যায্য কথাই বলছি, কারো দিকে টেনে বলছি নে। এক তোমাকেই চিরকালটা বাড়ীতে পুষতে হল, তারপর তোমার মেয়েকে পুষতে হল—তোমরা কেউ একদিনের তরে ত শ্বশুর-সোয়ামির ভিটে মাড়ালে না......

মাধবী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন

—দাদা, সেটা কি আমাদের দোষ? আমার অজ্ঞানে বাবা কুলীনের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, তখন আপত্তি করতে পারিনি। কিন্তু যখন আমার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ তোমরা কুলীনের ঘরে করছিলে তখন কি আমি আপত্তি করিনি? আমি কি বলিনি, কুলীনে আর কাজ নেই, কুলীনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে? বংশজেরা বিয়ে করতে মেয়ে পায় না, তাদের ঘরে পড়লে মেয়ে আমার সোয়ামির ভিটেয় আসভাত খেয়ে সুখে থাকবে,—সেই রকম একটা পাত্তর দেখে বিয়ে দেবার জন্যে তোমাদের কি সাধিনি? তার উত্তরে তোমরা বল্লে কি যে কুলীনের মেয়ের জাত মারলে অধর্ম্ম হবে। মস্ত কুলীন দেখে বিয়ে দিলে তোমার ভাগ্নীর! তোমরা জাত দেখেছিলে, ভাত দেখনি; এখন বিরক্ত হলে চলবে কেন দাদা?

বৃন্দাবন অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—আমরা ভালো ভেবেই ত করেছিলাম। আর ভালো যে নাই হবে তাই বা কে বলতে পারে। কেনারাম দাদা বলছিল যে পাহাড়পুরের রাজারা মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে একটি ঘরজামাই খুঁজছে—পাত্তরটি দেখতে শুনতে ভালো হবে, কুলীনের ছেলে হবে, বাপ মা কেউ থাকবে না, বয়েস অল্প হবে। রাখালের সঙ্গে সব ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে। তুমি যদি বল ত আমি কেনারাম দাদাকে দিয়ে রাখালের জন্যে চেষ্টা করি। রাখাল সেখানে রাজার হালে সুখে থাকবে, রাজার সেই এক মেয়ে মাত্তর, আর ছেলেপিলে হয়নি।

মাধবী একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—সে পাহাড়পুর কোথায়? রাজারা বামুন ত?

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, বামুন বৈ কি। সেই যে যেখানে বাণেশ্বরপুরের পঞ্চু মুখুয্যের ছেলে শ্রীকেষ্ট বিয়ে করেছিল। শ্রীকেষ্ট হল গে সেই রাজার ভগ্নীপোত।

মাধবী খুসী হইয়া বলিলেন—ও! তা হলে ত খুব ভালোই হয়। শ্রীকেষ্ট তা হলে রাখালের পিসশ্বশুর হবে। শ্রীকেষ্টর বৌকেও আমরা দেখেছি, সেবার বিন্দাবনে দেখা হয়েছিল, বেশ অমায়িক লোক। তা দাদা, তুমি একটু চেষ্টা কর।

(৪)

অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে রাখাল পাহাড়পুরের রাজার ঘরজামাই হইতে যাইতেছে। গ্রামের লোকে ছেলেটার পাতাচাপা কপাল দেখিয়া কপালে চোখ তুলিতে লাগিল।

খবর শুনিয়া প্রসাদীর বাবা মথুর আসিয়া মাধবীকে বলিল—মাধীপিসি, যা শুনছি তা কি সত্যি?

—সত্যি মিথ্যে এখন ভবিতব্যই জানেন বাবা, আমরা চেষ্টা করছি।

—কিন্তু রাখালকে যে আমার জামাই করব অনেক দিনের সাধ ছিল। সেই মনে করে পেসাদীর এত বড় বয়সেও আমি বিয়ের চেষ্টা করিনি।

—জানি বাবা। কিন্তু কি দেখে তুমি পেসাদীকে রাখালের হাতে দিতে চাচ্ছ। যার মাথা গুঁজবার মতন একখানা চালা নেই, দুটি কিছু সেদ্ধ করে খাবার মতন একটা চুলো নেই, তাকে মেয়ে দিতে চাও কোন্ সাহসে? যাদের বাড়ীতে আছে তারা যেদিন কিছু খেতে দ্যায় খেতে পায়, না খেতে দিলে উপোষ করে থাকে। আজকে রাখাল আমার না খেয়ে ইস্কুলে গেছে।

মাধবীর চোখ ছলছল করিতে লাগিল। মথুরও দুঃখিত হইয়া বলিল—সবই শুনেছি পিসি! রাখাল খেয়ে যায়নি বলে পেসাদীর সে কী কান্না, সেও কি কিছুতে ভাত খায়। তবে বুঝলে কিনা পিসি, ছেলেটি ভালো দেখে দেওয়া, তারপর মেয়ের বরাতে সুখ থাকে হবে, না থাকে ত আমরা কি করতে পারি বল! রাখালকে আর ব্রজকে ত আমরা ভিন্ন মনে করিনে। রাখাল এখন না হয় আমাদের বাড়ীতেই থাকবে। তারপর বড় হয়ে আপনার পথ আপনিই দেখে শুনে নেবে।

মাধবী বলিলেন—তুমি ছা পোষা মানুষ, মেয়ে জামাই পোষবার মতন অবস্থা ত তোমার নয়। খাওয়া-পরার সংস্থান আছে এমন ভালো ছেলে পেসাদীর জন্যে ঢের পাবে বাবা। তোমরা দশজনে আশীর্ব্বাদ কর আমার রাখালের একটা হিল্লে লাগুক।

মথুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হ্যাঁ, সে ত আশীর্ব্বাদ করছিই, রাখাল ত আমাদের পর নয়।

রাখালের উপর গ্রামের অকর্ম্মণ্য ছেলের দলের বিশেষ আক্রোশ ছিল। তাহারা পরিপাটি ভাবে ঠিলকে

সেবা করিয়া সমস্ত দিন তাস পিটিয়া গাঁজা টানিয়া গুড়ুক ফুঁকিয়া কদর্য্য আলাপে দিন কাটাইত, এবং সময়ে সময়ে গোসাঁইজু সাজিয়া শিষ্যবাড়ী হইতে টাকাটা সিকেটা ফলটা তরকারীটা সংগ্রহ করিয়া আনিত, এবং মচ্ছবের সময় কীর্ত্তনে মাতিয়া লাফালাফি করিয়া দশায় পড়িয়া মালসা-ভোগটা মালপোটা সংগ্রহ করিত। এজন্য রাখাল তাহাদিগকে দেখিতে পারিত না, তাহাদের সঙ্গে মিশিত না। তাহাদিগকেও রাখালকে সমীহ করিয়া চলিতে হইত, রাখালকে দেখিয়া অভিভাবকের আবির্ভাবের মতন তাড়াতাড়ি গাঁজার কল্কে লুকাইতে হইত, কদর্য্য আলাপ থামাইতে হইত; এজন্য রাখালের উপর তাহাদের বিষম আক্রোশ ছিল।

রাখাল স্কুল হইতে ফিরিয়া গ্রামে ঢুকিতেই দেখিল তাহারা দল পাকাইয়া ঘোষের 'পড়া'র উপর বসিয়া আছে। নবগোপাল ওরফে নবাই ডাকিয়া বলিল—ওহে রাখাল, তোমার আর পৈতে হল না; একেবারে বিয়েই হবে।

এত বয়স পর্য্যন্ত পৈতা হয় নাই বলিয়া রাখাল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও লজ্জিত থাকিত। কিন্তু তাহার মায়ের মামা বৃন্দাবন গোসাঁই এই বাজে খরচটা যতদিন পারেন না-করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং মাধবী কখনো তাগাদা করিলেই বলিতেন—দাঁড়াও, দেখি, কোনো শিষ্যি সেবক যদি পৈতেটা ওরু দিয়ে দায়। নইলে আমি খরচপত্তর করে পৈতে দি এমন ত আমার অবস্থা নয়।" বোধ হয় বৃন্দাবনের মনে নারায়ণদাসী এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিল যে মাধবীর কিছু গুপ্তধন নিশ্চয়ই আছে, কারে-পড়িয়া একদিন তাহা বাহির করিতেও পারে হয়ত।

নবাইএর কথা শুনিয়া রাখাল লজ্জিত হইয়া কোনো কথা না বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। নিমে বলিয়া উঠিল —উঃ! রাজার জামাই হবে কিনা, তাইতে আর দেমাকে মুখ থেকে রা খরচ করা হচ্ছে না।

কাঙালী উহারই মধ্যে একটু লেখাপড়ার ধার ধারিত, দুচারখানা নাটক নভেল পড়িয়াছিল। তাই সে পালের গোদা। বয়সেও সে দলের ছেলেদের চেয়ে অনেক বড় এবং উহারই মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়া চুকিয়াছিল। সে দীনবন্ধুর জামাই-বারিকের গৎ আওড়াইয়া বলিল—

ঘরজামায়ে পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।

নেনে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—ওরে—

কালো বামুন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মোছলমান,
ঘরজামায়ে পুষ্যিপুত্তুর সব কটাই সমান।

ভুতো সুর করিয়া বলিল—ঘরজামায়ের আদর কতক্ষণ?

তেতো তেমনি সুর করিয়া জবাব দিল—তার বৌ-মনিবটি যতক্ষণ!

কাঙালী বলিল—ওহে রাখাল, তুমি ত ভাই রাজনন্দিনীর খাস খানসামা হতে চললে। আমাদেরও এক-একটা মহিসী মহিষী জোগাড় করে দিও।

কাঙালী মহিষী শব্দটার উপর এমন জোর দিয়া বলিল যে সকলে তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল।

রাখাল ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেন উহারা তাহাকে ওরূপ সমস্ত কথা বলিল তাহা ঠিক বুঝিতে না পারায় রাগ সম্বরণ করিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

বটু চেঁচাইয়া বলিল—যাও যাও, তোমার শ্বশুরের লেঠেল ডেকে আনগে যাও।

সকলের উচ্চ হাসি রাখাল দূর হইতে শুনিতে পাইল আর শুনিতে পাইল কাঙালী তাহাদের মূল গায়েন হইয়া সুর করিয়া দীনবন্ধুর মাণিকপীরের গান গাহিতেছে—

"পাহাড়ে প্রকাণ্ড হাতী শিকলি বাঁধা পায়।
ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ীর ব্যাঙের লাথি খায়!"

বিশ্বাসদের ডোবার ধারে বিন্দির-মা গরু বাঁধিতেছিল। রাখালকে শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া সে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—আহা বাছারে! এখানে বড় কষ্ট, ভগবান মুখ তুলে চান, সেখানে যেন বিয়েটা হয়।

রাখাল বাড়ী ঢুকিতেই নারাণদাসী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার দাড়ি ধরিয়া বলিল—হাঁ-রে রাখাল, আমি নেয়ে এসে ভাত রেঁধে দিচ্ছি বলে নাইতে গেলাম; ডুবটা দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসে দেখলাম তুই না খেয়ে চলে গেছিস! ভ্যালা রাগ ভাই তোর! দিদিমা হই, নাতির সঙ্গে একটু ঠাট্টা করি, তাও বুঝতে পারিসনে; এই এত বড় আয়াঢ়াস্ত বেলা ঠায় অমনি গেল; মুখ যে শু-

আমাস দড়ি হয়ে গেছে! নে নে চটপট হাত মুখ ধুয়ে নে, আমি ভাত বাড়িগে।

রাখাল তাহার রাঙা দিদিমার এই অকস্মাৎ স্নেহাতিশয্যের কোনো সঙ্গত কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া একবার মাধবীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—আমি আজ ভাত খাবনা রাঙা দিদিমা, আজ একাদশী।

নারাণদাসী স্নেহের অনুযোগের স্বরে বলিল—আবার রাগ করে! নে নে আর রাগ করতে হবে না, আয়।

—রাগ নয় রাঙা দিদিমা। কালই ত ভাত খেতে হবে। কিন্তু আজ খাব না। আজ থেকে আমি একাদশী আরম্ভ করেছি।

—আচ্ছা তবে আয় জল খাবি আয়।

রাখাল হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া খাইতে বসিয়া দেখিল একখানা বড় থালায় আম জাম কাঁঠাল তালশাঁস শশা ফুটি ছানা ক্ষীর সন্দেশ, এবং তিনটি পাথর বাটিতে চিনির পানা, বেলের পানা, তরমুজের সরবৎ সাজানো রহিয়াছে। যে দিনটা নিরম্বু একাদশী দিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, সে দিনটার অবসানে এমন রাজভোগ যে কেন এবং কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা রাখাল কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না। যেন আরব্য-উপন্যাসের কোন্ পরীর অনুগ্রহে হঠাৎ তাহার দৈন্যদশা হইতে রাজার হাল হইয়াছে। রাখাল অল্পক্ষণ অবাক হইয়া বসিয়া থাকিয়া ডাকিল—দিদিমা।

মাধবী আসিলে রাখাল তাঁহাকে বলিল - দিদিমা, আমি যে তোমায় নারকোল-সন্দেশ তুলে রাখতে বলেছিলাম, এনে দাও।

মাধবী সেই ত্বটি তে-বাস্‌টে নারিকেল-সন্দেশ আনিয়া দিলে রাখাল তাহাই খাইয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত এক গেলাস জল খাইয়া বলিল—আঃ!

মাধবী ভীত হইয়া উঠিলেন পাছে বা রাখাল নারাণদাসীর দেওয়া খাবার স্পর্শও না করে। তাই আদেশের স্বরে বলিলেন—রাখাল, খা।

রাখাল একবার দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে নত হইয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

(৫)

রাখাল খাওয়া-দাওয়া করিয়া নিজের মেটে ঘরটিতে গিয়া দিদিমার কোলের কাছে বসিয়া বলিল—দিদিমা ব্যাপার কি বল ত?

রাখাল দিদিমার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল প্রদীপের আলোতে তাঁহার চোখে জল চকচক করিতেছে। অথচ কথায় পরম সন্তোষের হাসি মাখাইয়া মাধবী বলিলেন—তোর যে রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে!

—দিদিমা, তোমরা কি ক্ষেপেছ? নিজেরা খেতে পাও না, তার ওপর রাজার মেয়েকে নিয়ে আসবে রাঙা দিদিমার মুখনাড়া খাওয়াতে আর উপোষ করাতে।

মাধবী হাসিয়া বলিলেন—না রে সে ভয় আর নেই, দেখছিস নে রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে উদ্দেশেই বৌএর মেজাজ বদলে গেছে। কিন্তু মেজাজ বদলাক আর না বদলাক, তাতে কিছু আসে যায় না; রাজার মেয়ে এ ভিটে মাড়াতে আসছে না; তুই রাজার বাড়ীতে গিয়ে রাজার হালে থাকবি।

—ও! তাইতে কাঙালী ননে ভুতো ওরা আমাকে ঘরজামায়ে বলে ঠাট্টা করছিল! না দিদিমা, আমি ঘরজামাই কিছুতেই হব না। তুমি যদি জোর কর ত আমি দেশত্যাগী হয়ে যাব।

মাধবী রাখালের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহকোমল স্বরে বলিতে লাগিলেন—আমার কি বড় সাধ যে তোকে সেই সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে পাঠিয়ে আমি এই ভিটেয় একলা পড়ে থাকি? তোর এই পেটে ত্বটি অন্ন পড়ে না, রুক্ষ মাথায় একটু তেল পড়ে না, পরণে একখানা কাপড় জোটে না, পায়ে জুতো নেই, গায়ে জামা নেই, এ আর আমি দেখতে পারিনে। তুই শুকনো মুখে খালি গায়ে খালি পায়ে ত্বকোশ পথ হেঁটে ত্ববেলা রোদ্দুর মাথায় করে ইস্কুলে যাওয়া আসা করিস, আমার বুক যে ফেটে ফেটে যায়।

মাধবীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—কিন্তু দিদিমা, তুমি যাই বল, আমি ঘরজামাই হতে পারব না। না হতেই লোকে কত-ঠাট্টা করতে লেগেছে। শ্বশুরবাড়ীর সুখের চেয়ে আমার এ ত্বঃখ ঢের ভালো।

মাধবী সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন—মেয়েরা যে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে থাকে তাদের ত কৈ তাতে অপমান হয় না? শ্বশুর ত বাপের সমান। তোর যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে, বাপ-মায়ের সে একমাত্তর সন্তান; সমস্ত বিষয় ত তোরই হবে; তা ছাড়া বিয়ে হলে বরপণ ও কুলীনের মর্য্যাদা বলে যা পাবি তাতেই ত তোর ভেসে যাবে।

রাখাল মাথা নাড়িয়া বলিল—না না দিদিমা, আমাদের হেডমাষ্টার বলেন যে বিয়ে করে পয়সা নেওয়া বড় খারাপ।

মাধবী বলিলেন—এ ত আর আমরা জোর করে নিচ্ছিনে, তারা নিজে থেকে ইচ্ছে করে দিচ্ছে। সে ত তোর হক্কের পাওনা।

রাখাল জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল—তা আমি অত-শত বুঝিনে, আমি কিছুতেই ঘরজামাই হব না।

মাধবী রাখালকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন—তুই ভেবে দেখছিস নে, এখানে থাকলে তোর লেখাপড়া কেমন করে হবে? এখান থেকে মেরে কেটে না হয় এন্টেন্সটা দিবি। তারপর? আমি যে তোকে এত কষ্ট করে মানুষ করলাম, তুই কি আমাকে একদিনের তরেও সুখী করবিনে, আমার এই দুঃখ তুই কখনো ঘোচাবিনে?

রাখাল দিদিমার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল তাঁহার চোখ ছলছল করিতেছে। ক্ষণেক নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা দিদিমা, রাজার বাড়ী বিয়ে করলে তোমার দুঃখু কি করে ঘোচাব?

—কেন? সেখানে তুইই ত রাজা হবি। আমি রাজার দিদিমা হব!

—কিন্তু দিদিমা, ভুতো আর হেতো বলছিল ঘর জামাদের আদর কতক্ষণ? যা, তার বৌ মনিবটি যতক্ষণ!

—ষাট ষাট! ওকি অলক্ষুণে কথা! তোরা চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকবি।—পোড়ারমুখো ডেকরাদের যেমন কথা! পরের ভালো সহ্য হয় না, সেই জ্বালাতে যা মুখে আসে তাই বলে।—বলিয়া মাধবী রাখালের মাথায় আপনার হাতখানি একবার রাখিয়া চোখ বুজিলেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল—আচ্ছা ধর, যদি ভুতোর কথা ঠিকই হয়।

মাধবী একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন—ঈশ্বর না করুন, যদি তাই হয়, ততদিনে তুই লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হবি, আমাদের দুজনের চলে এমন রোজগার করতে পারবি। গরীব হওয়ার দুঃখু ত দেখছিস, কত গরীবকে তুই অন্ন বস্ত্র বিদ্যে দান করবি। আমি দেখে সুখী হব।

রাখাল আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদিমা, তুমি ঠিক বলছ—আমি রাজার মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার দুঃখ ঘুচবে? তোমার কষ্ট দূর হবে?

মাধবী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—হবে রে হবে। আমার দুঃখ ঘুচবে বলেই ত তোকে বলছি।

রাখাল দিদিমার বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মাধবী সমস্ত রাত্রি মা মরা হাতে-করিয়া মানুষ-করা নাতিটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। যখন ভোর বেলা কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল তখন তিনি অশ্রু মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া "হরিহে দীনবন্ধু" বলিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। অতি সন্তর্পণে রাখালের দাড়িতে হাত দিয়া চুমু খাইয়া তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন—সেই ভালো, তুই মনে করে থাক আমার দুঃখ ঘুচবে! তোকে ছেড়ে আমার দুঃখ যে শতগুণ বেড়ে যাবে ভাই!

তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না উছলিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন নারাণদাসী অত ভোরে উঠিয়া বাড়ীর পাটঝাঁট করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল—ওকি ঠাকুরঝি, এত ভোরে উঠলে কেন, কাল থেকে উপোস করে রয়েছ!

মাধবী ম্লান হাসি হাসিয়া মনে মনে বলিলেন—ওরে রাখাল, দেখে যা, আমার দুঃখ এরই মধ্যে ঘুচেছে!

তারপর নারাণদাসীর নিষেধ না মানিয়া তিনি আপনার নিত্যকার অভ্যস্ত গৃহকর্ম্মে নীরব হাসিমুখে লাগিয়া গেলেন।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অশ্রু-ঝারি

প্রণয়ে তোমার হৃদয় আমার গলিয়া গলিয়া হয়েছে বারি,
পরাণ-পাত্র ছাপায়ে উঠেছে, নয়ন আমার হয়েছে ঝারি;
তোমার চরণে ঝরিয়া শরণ ঝরে-পড়া তার সফল হোক,
পাদ্য অর্ঘ্য তোমার পূজার হউক সকল কাঁদন শোক।

শ্রী—

কষ্টিপাথর

বার্দ্ধক্য ও পরমায়ু।

বার্দ্ধক্যে তিনটি প্রধান প্রশ্নের সমাধান অত্যাবশ্যক। (১ম) চিকিৎসা বিষয়ক; (২য়) বৃদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক; (৩য়) সমাজ-সম্বন্ধীয়।

বার্দ্ধক্যে মানুষ অথর্ব হইয়া পরনির্ভর হইয়া পড়ে, এজন্য লোকে এই অবস্থাকে এত ভয় করে। বার্দ্ধক্য মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা। এই জন্য বার্দ্ধক্য আরও ভয়ের কারণ। প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রেই মরণশীল নহে। বহুবিধ নিম্নশ্রেণীর প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থ—উদ্ভিদই হউক বা জন্তুই হউক—মরণশীল নহে। অতএব প্রাণ থাকিলেই মৃত্যু অনিবার্য্য, ইহা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থের মৃত্যু আকস্মিক অর্থাৎ বহিরাগত কোন দুর্বিপাক-জনিত মাত্র, স্বাভাবিক নহে।

জীবদেহ আণুবীক্ষণিক কোষ-সমবায়ে গঠিত। এই কোষের ইংরেজী নাম সেল্ (cell)। স্বাভাবিক মৃত্যু বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হয়। অতএব যাহাদের মৃত্যু রহিয়াছে, তাহাদেরই বার্দ্ধক্য রহিয়াছে,—ইহা স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। যে-সমস্ত জীবের মৃত্যু রহিয়াছে এবং যাহাদের মৃত্যু নাই, তাহাদের পরস্পরের শরীরের গঠন তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আণুবীক্ষণিক কোষের পার্থক্যই একের মৃত্যু আনয়ন করে এবং অন্যকে অমর করে। মানব বা উচ্চ শ্রেণীর জীব-শরীর-গত আণুবীক্ষণিক কোষ সর্ব্বত্র সমান নহে,—ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে, এক অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অংশে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই পার্থক্যই তাহাদের মৃত্যুর একমাত্র কারণ। অমর প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থের শরীরগত কোষের কুত্রাপি কোনও পার্থক্য নাই; সর্ব্বত্রই একরূপ। কিন্তু অন্যান্য জীবের বিভিন্ন শরীরাংশে বিভিন্নরূপ কোষ। যখন শরীরে কোষের অবস্থা এবং প্রকৃতি একইরূপ থাকে, তখন শরীরস্থ কোষগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় খণ্ড খণ্ড হইয়া নূতন নূতন জীব উদ্ভূত করিতে পারে। কিন্তু যেমনই তাহাদের মধ্যে পার্থক্য উপস্থিত হয়, অমনই তাহারা বিভক্ত হইয়া নূতন জীবন লাভ করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে। উচ্চ শ্রেণীর জীব বা উদ্ভিদ গত-প্রাণ যে হয় ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ইঁহাদের শরীর নানাবিধ কোষে নির্ম্মিত। এক এক জাতীয় কোষ এক-একটি বিশিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করে। তাহারা খণ্ডখণ্ড হইয়া বা অন্য কোন প্রকারে নূতন জীবন লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ—যেমন শৈবাল (উদ্ভিদ), অ্যামিবা (জন্তু) ইত্যাদির দেহ সর্ব্বত্র একইরূপ কোষে গঠিত বলিয়া তাহারা অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

বার্দ্ধক্য শব্দের অর্থ শরীরের নীরসতা ও কঠিনতা; জন্মের অব্যবহিত পর হইতেই জীব বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ঠিক জন্মের সময় প্রচুর পরিমাণে তরল অর্থাৎ আঠাল পদার্থ শরীরে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু প্রাণীমাত্রেই কাঠিন্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ক্রমে এই তারল্য অন্তর্হিত হইয়া ভ্রূণ, ভ্রূণ হইতে শিশু, শিশু হইতে যুবক, যুবক হইতে প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ় হইতে বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়। অতএব বার্দ্ধক্যে শরীরে তারল্যের হ্রাস হয়, এবং সর্ব্বত্র কাঠিন্য প্রকাশিত হইতে থাকে। কাজেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনায়াসে কার্য্য করিতে পারে না। শৈশবে তারল্য অত্যন্ত অধিক, বার্দ্ধক্যে অত্যন্ত অল্প। কেবল যৌবনেই ইহাদের সামঞ্জস্য সঙ্ঘটিত হয়। অতএব যৌবনই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। মেশিনিকফ্, লর‍্যাণ্ড ইত্যাদি বহু ধীমান বার্দ্ধক্যের আরও নানাবিধ কারণ স্থির করিয়াছেন।

আমাদের অন্ত্রে নানাবিধ রোগ-বীজ রহিয়াছে, এই স্থান নানাবিধ বিষ দ্বারা সর্ব্বদা পূর্ণ। মেশিনিকফ বলেন যে, আমাদের শরীর ক্রমাগত এই-সমস্ত বিষ শোষণ করিয়া জীর্ণ হইয়া পড়ে। এই-সমস্ত বিষই মানবের বার্দ্ধক্যের কারণ; অন্ততঃ এই-সমস্ত বিষ নষ্ট করিতে পারিলে বার্দ্ধক্য একবারে বিদূরিত না হইলেও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়া সম্ভব। এক কথায় মানবের পরমায়ু অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাসিলাই নামক একপ্রকার জীবাণু অন্ত্রে প্রবেশ করাইতে পারিলে, অন্ত্রস্থ যাবতীয় রোগ-জীবাণু ধ্বংস হইতে পারে। ঘোলে বা দধিতে প্রচুর পরিমাণে ল্যাকটিক অ্যাসিড জীবাণু রহিয়াছে। ঘোল পানে বা দধি ভোজনে অন্ত্রস্থ বীজাণু নষ্ট হওয়া সম্ভব।

লর‍্যাণ্ড বলেন যে পেশী এবং গ্ল্যাণ্ড-সমূহের কর্ম্মে অক্ষমতাই এইরূপ বার্দ্ধক্যের কারণ। মানব-শরীরে বহুবিধ গ্ল্যাণ্ড রহিয়াছে; তন্মধ্যে থাইরইড, অ্যাড্রিন্যাল, পিটুইটারি বডি, অণ্ডকোষ ইত্যাদির কর্ম্মশক্তি হ্রাস পাইলেই বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। জীবন-রক্ষা-কল্পে শরীর-যন্ত্র-সমূহের কার্য্য-কালে যে বিষ উৎপন্ন হয়, তাহা বিদূরিত না হইলে শরীর নষ্ট হওয়া অনিবার্য্য। "The limit of life is a matter of excretion"। যেমন বয়স অগ্রসর হইতে থাকে, অমনি পেশী ও গ্রন্থিসমূহ ক্রমাগত কার্য্য করিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শরীরের যাবতীয় পেশী, শিরা, নাড়ী ইত্যাদি ক্রমাগতই বিষাক্ত দ্রব্য শরীর হইতে বিদূরিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু বার্দ্ধক্যে শরীর ও শারীর-যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় বিষ-দ্রব্য দূর করিতে পারে না, ফলে বিষ শোষিত হয়, ক্রমে ক্রমে ধমনী কঠিন হইয়া উঠে,—অর্থাৎ জরা বা বার্দ্ধক্য আক্রমণ করে।

যৌবনে শরীর ইত্যাদি যেরূপ কর্ম্মক্ষম থাকে, বার্দ্ধক্যে সেরূপ থাকে না। শরীর ইত্যাদির পরিবর্ত্তন হয়। এরূপ পরিবর্ত্তন সুফলপ্রদ। বার্দ্ধক্যে শরীর-যন্ত্র শিথিল হয়। কাজেই কোনওরূপ গুরুতর কার্য্য দুর্ব্বল শরীর দ্বারা সম্ভব নহে, অথবা সম্পাদিত হইলে শরীর অতি শীঘ্র নষ্ট হইতে পারে। বার্দ্ধক্যে অস্থিসমূহ কঠিন হইয়া উঠে, স্পঞ্জের ন্যায় থাকে না এবং ভঙ্গুর হয়। চর্ম্ম পাতলা হইয়া যায়, সেরূপ স্থিতি-স্থাপক থাকে না এবং স্বচ্ছ হইয়া উঠে। পেশীসমূহের আয়তন হ্রাস পায়। হৃদযন্ত্র বৃহৎ হইয়া উঠে। অবশ্য হৃদযন্ত্রের বৃহৎ হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা রক্তবহা ধমনীসমূহ কঠিন এবং তাহাদের আয়তন হ্রাস হওয়ায়, সেই নলি দিয়া শোণিত চালাইতে হইলে অধিক শক্তির প্রয়োজন। কাজেই হৃদযন্ত্র বড় না হইলে শোণিত সম্যক-রূপে পরিচালিত হয় না। এই জন্যই বার্দ্ধক্যে শোণিত-চাপ অধিক হয়। এই সময়ে শরীর ক্রমে ক্রমে বক্র হইতে থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পন্দিত হয়, মস্তক স্থির থাকে না। হস্তদ্বয় কম্পিত হয়। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়। কিন্তু শরীরের তাপমাত্রা আদৌ বৃদ্ধি পায় না।

অবশ্য বৃদ্ধ হইলেই যে শরীরের অবস্থা মন্দ হইতে হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই। তবে অধিকাংশ বৃদ্ধেরই শরীর নষ্ট হয়। শরীর অনেক স্থলে বেশ পরিষ্কার থাকে বটে, কিন্তু মানসিক পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্রই অনিবার্য্য। কাজেই শরীরের পরিবর্ত্তন অপেক্ষা মানসিক পরিবর্ত্তনই বেশী বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ চিন্তাই যাহাদের ব্যবসায় তাহাদের পরিবর্ত্তন আরও বেশী বুঝিতে পারা যায়। চিন্তাশীল ব্যক্তির বার্দ্ধক্যে শরীর প্রায়ই সেরূপ নষ্ট হয় না।

আকার যদি বৃহৎ হয়, প্রজ্ঞা তদনুপাতে কম হয়। শরীরের বৃদ্ধির একটা সীমা করা যাইতে পারে কিন্তু মনের বৃদ্ধি অসীম। বার্দ্ধক্যে এই মনের শক্তি বেশ নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু শরীর ভাঙ্গিতে যত সময় আবশ্যক হয়, মন ভাঙ্গিতে তদপেক্ষা অনেক সময় আবশ্যক হয়। কাজেই কোন কোনও স্থলে দেখা যায় যে অশীতিপর বৃদ্ধ যুবকের ন্যায় চিন্তাপটু, তাঁহারই ন্যায় মানসিক-তেজ-বিশিষ্ট।

কিন্তু যে-সময়ে শরীর ত্বরিত গতিতে পূর্ণতা পাইতেছিল, সে সময় যদি মন বৃদ্ধি পাইয়া না থাকে, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে যখন শরীর ভাঙ্গিতে থাকে তখন আর মন পূর্ণতা পাইবার অবকাশ পায় না অর্থাৎ তাহার মন আর কখনও পূর্ণতা পায় না। কুস্তিগিরি সারা যৌবন ব্যাপিয়া শরীরের চর্চ্চায় কাটায়, কাজেই বার্দ্ধক্যে যখন শরীর ভাঙ্গে অথবা শরীর না ভাঙ্গিলেও সেই অসময়ে মন আর পূর্ণতা পাইবার অবকাশ পায় না। এইরূপ বৃদ্ধের অবস্থা বড় শোচনীয়। প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত তাহার শরীর তাহাকে রক্ষা করে, তখন মনের শক্তির প্রয়োজনীয়তা সে বুঝিতে পারে না। কিন্তু যখন শরীর ভাঙ্গিতে থাকে তখন তাহাকে কে রক্ষা করিবে? তবে যাহাদের শরীর স্বভাবতঃ বেশ বলিষ্ঠ দেখা যায় তাহাদের মনও বেশ পূর্ণতা পাইবার অবসর পায়।

কিন্তু যাহাদের শরীর দুর্ব্বল তাহারা শরীরের চর্চ্চায় বয়স কাটাইলে মন নষ্ট হয়, এবং মনের চর্চ্চায় কাটাইলে শরীর নষ্ট হয়। তবে মনের চর্চ্চায় কাটাইলে শরীর নষ্ট হইতে প্রায় দেখা যায় না, দুর্ব্বল থাকিয়া যাইতে পারে এই মাত্র।

বৃদ্ধাবস্থায় বিবেক নষ্ট হয়। গর্ব্ব, অর্থগৃধ্নুতা, অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হৃদয়হীনতা, অসন্তুষ্টি ইত্যাদি বার্দ্ধক্যের লক্ষণ। প্রায়ই বৃদ্ধ বয়সে লোকে কৃপণ হয়, খিট্‌খিটে হয়, লোককে আদেশ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, পরের নিকট হইতে অন্যায় করিয়া কাজ আদায় করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধ সর্ব্বদাই উৎসাহহীন, কাহাকেও কোনও সাহসের কার্য্য করিতে দেখিলে, তাহাকে উৎসাহ না দিয়া হয় চুপ করিয়া থাকে, না হয় ভয় দেখায়। তাহাদের চিত্ত অনুদার হইয়া উঠে এবং নিজে যাহা ভাবিবে, তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। বৃদ্ধের একগুয়েমি সর্ব্বজনের পরিচিত। এ সময়ে প্রলোভনের জালে পড়া অধিক সম্ভব। বৃদ্ধ কোনও বিষয়ে হতাশ হইলে অস্থির হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা ক্রুদ্ধচিত্ত এবং বিষণ্ণ থাকে। সৌন্দর্য্যের ধারণা, সদিচ্ছায় উন্মাদনা একেবারে নষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্তগুলি বৃদ্ধের মনের বাহ্যিক লক্ষণ। আভ্যন্তরিক লক্ষণ ইহা অপেক্ষাও গুরুতর এবং তাহারই ফল বাহিরে প্রকাশিত হয় মাত্র। সে কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারে না। তাহার স্মৃতি-শক্তি একেবারে লোপ পায়। এই অবস্থায় আমরা বলিয়া থাকি, বৃদ্ধের "ভীমরতি" হইয়াছে। শারীরিক বা মানসিক কার্য্যে উৎসাহ নষ্ট হয়। কল্পনা-শক্তি অত্যন্ত হ্রাস পায়। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা প্রায় লুপ্ত হয়। সহসা ধারণা করিবার শক্তি হ্রাস পায় বা লোপ পায় বলিয়া কথিত বিষয়ের পরিমাণও হ্রাস পায়। কাজেই একই বিষয় লইয়া ক্রমাগত তোলাপাড়া করে।

(বিজ্ঞান, ডিসেম্বর) শ্রীক — ।

* *
*

ডুমুরের ফুল।

অনেকেই বোধ হয় কখনও "ডুমুরের ফুল" দেখেন নাই, কেননা অনেকেরই ধারণা আছে যে, "ডুমুরের ফুল" দেখিলে রাজা হওয়া যায়। অতএব অদ্য আপনাদিগকে ডুমুরের ফুল দেখাইবার প্রয়াস পাইব। তবে আপনারা রাজত্ব পাইবেন কি না তাহা ভবিতব্য বলিতে পারেন। তবে একটু আমোদ যে পাওয়া যাইবে তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

পৃথিবীতে যত রকম ফুল আছে তাহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। এক রকম একক-পুষ্প (Solitary flowers), আর এক রকম পুষ্পগুচ্ছ (Inflorescence)।

Solitary flower বা একক-পুষ্প নাম দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এই জাতীয় ফুলগুলি একটি বৃন্তে একাকী জন্মগ্রহণ করে। একাধিক পুষ্প এক বৃন্তে জন্মায় না। বেল, মল্লিকা, জবা, প্রভৃতি এই জাতীয় ফুল।

যখন একাধিক পুষ্প একই বৃন্তে জন্মায় তখন এই পুষ্পসমষ্টিকে পুষ্পগুচ্ছ বা Inflorescence বলে। Inflorescence সংখ্যা খুব বেশী। ইহার আবার নানারূপ ভাগ আছে—যথা কলা-ফুল জাতীয়, কচু-ফুল জাতীয়, কদম্ব-ফুল জাতীয়। যে প্রধান বৃন্ত হইতে পুষ্পগুচ্ছের প্রত্যেক ফুল জন্মায় সেই মূল বৃন্তটিকে Rachis বা কাণ্ডবৃন্ত বলে। পুষ্পগুচ্ছের যে ফুলগুলি এই কাণ্ডবৃন্ত হইতে জন্মায় তাহাদের আবার প্রত্যেকটির এক-একটি সরু সরু বৃন্ত থাকে। কখনও কখনও এই বৃন্তগুলি খুব ছোট হয়। কিন্তু প্রায়ই এই বৃন্তগুলি দীর্ঘ এবং সরু হইয়া থাকে। যথা ধোনে-ফুল, পিঁয়াজ-ফুল ইত্যাদি। আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে এই বৃন্তগুলি একবারেই থাকে না, তখন পুষ্পগুচ্ছের ফুলগুলি কাণ্ডবৃন্তে Sessile বা বৃন্তহীনরূপে জন্মগ্রহণ করে।

যদি পুষ্পগুচ্ছের কাণ্ডবৃন্ত বা Rachis লম্বায় বড় হইতে না পায় তবে সেটা অবশ্যই একটা বাটির মত অথবা গোল ভাটার মত হইয়া যাইবে। কদম্বজাতীয় পুষ্পগুচ্ছের কাণ্ডবৃন্তের দুর্দ্দশা ঠিক এই রকম। কদম-ফুল একটা পুষ্পগুচ্ছ। সমস্ত ফুলটির বহির্ভাগে যে ছোট ছোট ফুলের পাপড়ীর মত জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি প্রকৃত পাপড়ী নহে প্রত্যেকে এক একটি ফুল। কদম-ফুলের কাণ্ডবৃন্তটা, অভ্যন্তর ভাগে একটা ছোট-খাটো গুলির আকারে বিরাজ করে। ফুলগুলি সব বৃন্তহীন ভাবে ঐ গোলক কাণ্ডবৃন্তের উপর সাজান থাকে। গাঁদা-ফুল একটা পুষ্পগুচ্ছ। এখানে কাণ্ডবৃন্ত গোল আকার গ্রহণ না করিয়া Rachisটি চওড়া চ্যাপটা বাটির মত হইয়া গিয়াছে। এখানে কাণ্ডবৃন্তের বিশেষ নাম Receptacle বা আধারবৃন্ত। গাঁদা-ফুলের যেগুলি পাপড়ী বলিয়া ভ্রম হয় তাহা বাস্তবিক এক-একটি ফুল। এই ফুলগুলি আবার বৃন্তের উপর বৃন্তহীন ভাবে সাজান থাকে।

এখন যদি এই বাটির আকারের আধারবৃন্তের প্রান্তদেশ ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইয়া উঠে এবং উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে যুক্ত বা সম্মিলিত হইবার চেষ্টা করে তবে এই ফুলগুলির দুর্দ্দশা কি হইবে? সেগুলি অবশ্যই আধারবৃন্তের ভিতর রুদ্ধ হইয়া যাইবে, ফুলগুলিকে তখন বাহিরে হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ডুমুরের ঠিক এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। ডুমুর পুষ্পগুচ্ছের এক বিশেষ প্রকার মাত্র। এখানে আধারবৃন্ত বা receptacleটি সমস্ত ফুলগুলিকে বাহির হইতে ঢাকা দিয়া ফেলিয়াছে। ডুমুর কাটিলেই ডুমুরের ভিতর অসংখ্য ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আমরা যাহাকে ডুমুর বলি তাহা বাস্তবিকই পুষ্পগুচ্ছ মাত্র। যে অংশ ভোজন করি তাহা স্থূল মাংসল কোমল আধার-বৃন্ত মাত্র। যাহাকে বীজ মনে করি, তাহা প্রথমাবস্থায় পুষ্প এবং পক্ক অবস্থায় ফল মাত্র। অতএব পল্লীগৃহস্থ প্রতিমাসে অনেকবার ডুমুর-ফুল দেখিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গের প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য কাহার ভাগ্যে সফল হইয়াছে?

(বিজ্ঞান, ডিসেম্বর) শ্রীঅমরেন্দ্র সাহা।

* *
*

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার।

(৫)

২১। রাজা পৃথ্বী চাঁদ।—হাজারা। চমুনের রাজা জগৎ সিংহ বিদ্রোহী হইয়া চম্বার রাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলে, তাহাদিগকে তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরণ করেন পৃথ্বীরাজ

তাহাতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়াতে তিনি রাজদরবারে উচ্চ সম্মান লাভ করেন।

২২। প্রেম দেব।—সুষামলের পুত্র এবং রাণা অমর সিংএর পৌত্র। পূর্ব্বে রাণার দরবারের কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে তিনি সম্রাট শাহজাহানের দরবারে উপস্থিত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া তিন হাজারী পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি একাধিকবার কান্দাহার অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সহিত তিনি দাক্ষিণাত্যেও সামরিক এবং শাসনবিভাগের উচ্চপদে কাজ করিয়াছিলেন। ১০৬৮ হিজরীতে, শমুগড়ের যুদ্ধে দারাশেকোর সৈন্যদলে অগ্রগামী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। শাহসুজাহ ও দারাশেকোর দ্বিতীয় যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের পক্ষে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে তিনি দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২৩। রায় তলুক চাদ।—রায় মনোহরের পৌত্র। তিনি প্রথমতঃ দৌলতাবাদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে হাজারী পদে উন্নতিলাভ করেন। শাহজীর বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়াছিলেন। বলখ বাদোখশানের অভিযানে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

২৪। রাজা রায় টোডর মল। পূর্ব্বে সম্রাট শাহজাহানের প্রধান মন্ত্রী আল্লামী আফজল খাঁর সরকারে নিযুক্ত ছিলেন। পরে রাজদরবারে প্রবেশ করেন। সহরন্দের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। লক্ষীজঙ্গলের ফৌজদার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদেও বহাল ছিলেন। দিবালপুর, পরগণা জালেন্দর ও পরগণা সোলতানপুরের দেওয়ানী পদেও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় উল্লিখিত পরগণাসমূহের আয় ৫০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। রাজদরবার হইতে তিনি পুনঃ পুনঃ খেলাৎ, পুরস্কার ও জায়গির লাভ করিয়াছিলেন।

২৫। রাজ অনুরূপ।—তিনি হাজারীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকবার রাজদরবার হইতে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রাজা জগদীপ, সম্রাট আকবরের দরবারে পরে হাজারী-পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা অনুরূপের দুই পুত্রও শাহজাহানের দরবারে আমিরী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

২৬। মহারাজা যশোবন্ত সিং।—সম্রাট শাহজাহান তাঁহাকে অতি উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমোন্নতি করিয়া ছয় হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদকে বর্ত্তমানের গবর্ণর জেনারল ও প্রধান সেনাপতি উভয়ের মিলিত পদের অধিকারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি কান্দাহার ও আকবরাবাদের গবর্ণরের পদেও নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার সামরিক যোগ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তিনি অনেক যুদ্ধে যোগদান করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সম্রাটের পীড়ার সময় শাহজাদা দারাশেকোর ক্ষমতার সময় তিনি সপ্তহাজারী পদে উন্নতি লাভ করিয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ভীষণযুদ্ধের পর তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার জন্মভূমি ও জায়গির যোধপুরে পলাইয়া যান। পরে তিনি আওরঙ্গজেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ওমরা-শ্রেণীতে স্থান লাভ করেন।

২৭। মির্জ্জা রাজা জয়সিংহ।—ক্রমোন্নতি করিয়া চারি হাজারী পদে নিযুক্ত হন। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার খানে জাহানের অধীন ছিলেন। সুবাদার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে, তিনি পলাইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হন। বলখ অভিযানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। বিজাপুর ও আহমদনগরের যুদ্ধেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি শেষে পঞ্চ হাজারী পদ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি শেষে রাজস্বসচিবের পদে কাজ করিতেন। আওরঙ্গজেব প্রভৃতির বিদ্রোহের সময় জয়সিংহ ষষ্ঠ হাজারী এবং শেষে সপ্ত হাজারী পদে উন্নতিলাভ করেন। এত বড় উচ্চপদ কোন শাহজাদার ভাগ্যেও সহজে ঘটে না। তাহা সামরিক বিভাগের প্রধান কর্ত্তা অথবা বর্ত্তমান সমরসচিবের পদ অপেক্ষাও উচ্চতর পদ ছিল। শাহজাদাগণের বিদ্রোহের সময় জয়সিংহ শাহ সুজার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। সুজাকে বাঙ্গালার দিকে তাড়িত করিয়া দিয়া তিনি এলাহাবাদের নিকট উপস্থিত হইলে আওরঙ্গজেবের জয়-সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া মাথুরানগরে আওরঙ্গজেবের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে এক কোটি দাম বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ দান করেন।

২৮। ছত্রভুজ।—সপ্তশতী। নানা যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়া রাজার প্রীতিভাজন হন।

২৯। চন্দ্রভান।—সপ্তশতী। দৌলতাবাদ ও বলখ অভিযানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করায় রাজদরবার হইতে পুরস্কার লাভ করেন।

৩০। মুনশীরাম ভান।—জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রথমাবস্থায় রাজমন্ত্রীর সরকারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শী মুনশী ছিলেন। কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাদশাহ তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ দরবারে স্থান দান করেন। তাঁহার স্থাপিত একটি উদ্যান 'বাগে চন্দ্রভান' নামে এখনও আগ্রা ও সেকন্দ্রার মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিদ্যমান আছে।

৩১। রাজা জয়রাম।—রাজা অমল সিংএর জ্যেষ্ঠপুত্র। ক্রমোন্নতি করিয়া দুই হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৩২। চন্দ্র মল। দেড় হাজারী পদে ছিলেন। দাক্ষিণাত্য ও বদোখশানের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন।

৩৩। রাজা দেবী সিং।—দুই হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কাবুল, বদোখশান, উজ্জয়িনী ইত্যাদি বহু যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। আড়াই হাজারী পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

৩৪। রাজা সুদা।—দুই হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। দৌলতাবাদের যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হাতী সিং দেড় হাজারী পদ লাভ করিয়াছিলেন।

৩৫। রাজা দোয়ার্কাদাস।—দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার পুত্র নরসিংহ দাস অষ্টশতী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাবুল দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন।

৩৬। রায় রায়ান দেয়ানত রায় গুজরাটী।—জাতিতে ব্রাহ্মণ ও গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। সম্রাটের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে প্রধান মন্ত্রীর দ্বিতীয় সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। দাক্ষিণাত্যের ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন। আল্লামী আফজল খাঁর মৃত্যুর পর প্রধান মন্ত্রীর পদে কেহ নিযুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অস্থায়ী ভাবে প্রধান মন্ত্রীর কাজ করেন। এ সময় রায় রায়ান উপাধি প্রাপ্ত হন। মধ্যে একবার তিনি সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া বেনারসে গঙ্গা-তীরে অবস্থান করেন। পরে পুনঃ রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন।

৩৭। রাজপুত দয়াল দাস।—বলখ অভিযানে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সাহচর্য্য করিয়াছিলেন। ১০৬৮ হিজরীতে উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যশোবন্ত সিংএর সহকারী ছিলেন। সপ্তশতী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

৩৮। রাজা রায় সিং।—তিনি ক্রমোন্নতি করিয়া পাঁচ হাজারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। বহু যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কান্দাহার উজ্জয়িনী ও দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে তাঁহার বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পায়।

৩৯। রায় সিং।—হাজারী পদে উন্নতি লাভ করেন। দারা

শেকোর সহিত কান্দাহার অভিযানে ও অন্যান্য অনেক যুদ্ধে তাঁহার নাম দেখা যায়।

৪০। রাজা রূপ সিং।—চারি হাজারী উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কান্দাহার বিজয়ে আওরঙ্গজেবের সহকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। মাণ্ডেলগড় পরগণা তাঁহার জায়গীর ছিল।

৪১। রাওরূপ সিং।—নয়শতী পদে ছিলেন। রামপুর পরগণা তাঁহার জায়গীরভুক্ত ছিল। বলখ অভিযানে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করায় ক্রমে দুই হাজারী পদে উন্নতি লাভ করেন।

৪২। বওন সিং।—শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সহিত বলখ অভিযানে গিয়াছিলেন। দুই হাজারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনী যুদ্ধেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

৪৩। রাজা রাজরূপ।—ক্রমে সাড়ে তিন হাজারী পদে উন্নতি লাভ করেন। বলখ যুদ্ধে শাহাজাদা মোরাদ বখশের সহিত অশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবের সহিত কান্দাহার অভিযানে এবং সোলেমান শেকোর সহিত কাবুলে গমন করিয়াছিলেন।

৪৪। রাজ সিং রাঠোর প্রধান।—হাজারী পদে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

৪৫। রায় রায়ান রাজা রঘুনাথ দাস।—অঙ্ক শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী নওয়াব সাদুল্লা খাঁর মৃত্যুর পর তিনি রায় রায়ান উপাধি লাভ করিয়া, প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য পরিচালনা করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলেও তিনি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শাহসুজা ও দারাশেকোর যুদ্ধে তিনি বিশেষ রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ১০৭৩ হিজরী পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেব কর্তৃক রাজা উপাধি লাভ করেন। তিনি ১০৬৮ হিজরীতে শম্ভুগড়ের যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেবের দরবারে প্রবেশ করেন।

৪৬। রাম সিং রাঠোর।—তিন হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

৪৭। রাও মত্তর সাল।—তিন হাজারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। বহু যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আওরঙ্গজেবের সহিত উজ্জয়িনীতে যে ভীষণ যুদ্ধ হয় তাহাতে রাও মত্তর সালের নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য।

৪৮। শিবরাম গৌড়।—আড়াই হাজারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বদোখশান, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

৪৯। সোবহান সিং।—দুই হাজারী মনসবদার ছিলেন। বলখ অভিযানে, কান্দাহার বিজয়ে, উজ্জয়িনী যুদ্ধে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৫০। রাজা সোবহান সিং।—মালওয়া প্রদেশে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংএর সঙ্গে উজ্জয়িনী যুদ্ধেও উপস্থিত ছিলেন।

৫১। রাও কর্ণ বিকানিয়র।—তিন হাজারীর সম্মানিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। এমতাবস্থায় দৌলতাবাদের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন। আওরঙ্গাবাদে তাঁহার নামে এখনও একটি পল্লী অভিহিত হইয়া থাকে।

৫২। রাজা কিষণ সিং।—হাজারী পদে ছিলেন। বিজাপুর অভিযানে তাঁহার বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পায়।

৫৩। রায় কাশীদাস।—হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গদেশে দেওয়ানী পদে অনেককাল ছিলেন। কাবুলেও বহুদিন বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিয়াছিলেন।

৫৪। গিরিধর দাস গৌড়।—দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। খানেজাহান লোদীর পশ্চাদ্ধাবন-কালে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

৫৫। গোকুল দাস।—হাজারী পদের অধিকারী ছিলেন। শাহাজাদা মোরাদ বখশের সহিত বলখ বদোখশানের যুদ্ধে ছিলেন।

৫৬। গুরধন রাঠোর।—অষ্টশতি। গৌড়ে দুর্গের অধ্যক্ষ হন।

৫৭। রাজা মানসিং গোয়ালিয়র।—ইনি প্রসিদ্ধ মানসিং নহেন। নয়শতী পদে ছিলেন। যমুন অভিযানে তাঁহার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

৫৮। রায় মুকুন্দ দাস।—আটশতী পদে ছিলেন।

৫৯। মহেশ দাস রাঠোর।—তিন হাজারী উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার বীরত্ব ও রণনীতির যথেষ্ট প্রশংসা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নামীয় আরও একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন।

৬০। মধুসিং হাড়া।—ক্রমোন্নতি করিয়া চারি হাজারী পদের অধিকারী হন। কাবুলে শাহজাদা সুজার সহিত বহুদিন ছিলেন। বোরহানপুরের সুবাদার পদেও অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বলখের দুর্গাধ্যক্ষের পদেও কিছুদিন ছিলেন।

৬১। মুকুন্দ সিং। তিন হাজারী পদে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। বেচওাভেব ও উজ্জয়িনীর যুদ্ধে তাঁহার নাম বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

৬২। মামুজী।—পঞ্চ হাজারীর অত্যুচ্চ পদে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল।

৬৩। রাজা মহাসিং।—তিন হাজারী পদে ছিলেন।

৬৪। হরিসিং রাঠোর।—দেড় হাজারী। বিজাপুর, বলখ ও কাবুল অভিযানে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

৬৫। হরদেরাম।—দেড়হাজারী পদে ছিলেন।

৬৬। উগর সেন।—আটশতী। কান্দাহার, বলখ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন।

৬৭। রাজা উদয় সিং।—পঞ্চশতী পদে ছিলেন।

৬৮। উগর সেন দ্বিতীয়।—পাঁচশতী পদাধিকারী।

৬৯। রাজা অমর সিং কচ্ছ।—বলখ বাদোখশান অভিযানে নিযুক্ত ছিলেন।

৭০। সুজ রাজ।—হাজারী পদে ছিলেন। উদয়গিরির দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে

আওরঙ্গজেবের পিতৃ-আমলের হিন্দু কর্ম্মচারীগণ ব্যতীত তাঁহার নিজ আমলে যে-সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অথবা পূর্ব্বে পদচ্যুত হইবার পর যাঁহারা পুনঃ উচ্চ পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। রাজা অমর সিংহ—সম্রাট শাহজাহানের আমলের কর্ম্মচারী। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে তাঁহার যথেষ্ট পদোন্নতি হয়। তিনি প্রথমতঃ আসাম অভিযানে এবং দ্বিতীয়বার সীমান্ত দেশের পাঠান অভিযানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি উভয় যুদ্ধে যথেষ্ট শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

২। রাজা ইন্দ্রমন—রাজপুত বংশধর রাজা ইন্দ্রমন, সম্রাট শাহজাহানের অনুগত রাজা শিবরামকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার পিতৃরাজ্য ধন্দেরা অধিকার করায় সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে প্রবলবাহিনী প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে হালবসির দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। আওরঙ্গজেবের ১০৬৮ হিজরী অব্দে দাক্ষিণাত্য হইতে আগ্রা আগমন-কালে রাজা ইন্দ্রমনকে কারামুক্ত করিয়া তিন হাজারী উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। উক্ত রাজা উজ্জয়িনীর ও শম্ভুগড়ের যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শাহ সুজার প্রথম যুদ্ধের পর রাজা ইন্দ্রমন বঙ্গদেশে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং এই বঙ্গদেশেই তিনি পরলোক গমন করেন।

৩। রাজা অনুপ সিং—ইনি রাও কর্ণের পুত্র এবং রাও সূর্য্য সিংএর পৌত্র, তিনি বহুকাল দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বহু যুদ্ধে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন; পরে তিনি আওরঙ্গাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি নসরাবাদ সরকারের দুর্গাধ্যক্ষ ও ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া দুই হাজারী পদে সম্মানিত হন।

৪। স্বরূপ সিং—অনুপ সিংএর মৃত্যুর পর সম্রাট তাঁহার পুত্র স্বরূপ সিংহকে তাঁহার পিতৃরাজ্য বিকানিয়ারের গদিতে বসাইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে দেড় হাজারী পদে আওরঙ্গজেবের সরকারে নিযুক্ত ছিলেন। স্বরূপ সিংএর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইন্দ্র সিং এবং তৎপর আনন্দ সিংএর পুত্র জোরআওর সিং এবং তৎপরে তদীয় পালকপুত্র গজর সিং তাঁহার পিতৃরাজ্যের গদি প্রাপ্ত হন।

৫। এনিরায়—জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হিসাব-বিভাগের প্রধান দেওয়ান অর্থাৎ একাউণ্টেণ্ট জেনারলের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিল পাস না করিলে কাহারো এক কপর্দ্দকও বেতন বা বৃত্তি পাইবার উপায় ছিল না। তিনি নিতান্ত নিরপেক্ষ ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন।

৬। রাজা ইন্দ্র সিং—ইনি রাজা রায় সিংএর পুত্র ও রাজা অমর সিংএর পৌত্র। মহারাজা যশোবন্ত সিংএর মৃত্যুর পর রাজা উপাধি লাভ করিয়া তিনি যোধপুরের গদিতে উপবেশন করেন; তিন হাজারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

৭। রাজা উর্দ্ধভঙ্গ সিং—চিতোর দুর্গের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তদীয় পিতার মৃত্যুর পর রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। দরজন সিংএর বিরুদ্ধে এবং বিজাপুর অভিযানে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিন হাজারী পদে উন্নীত হন।

৮। মহারাজা অজিত সিং—মহারাজা যশোবন্ত সিংএর পুত্র। কাবুলে তাঁহার জন্ম হয়। কাবুলে যশোবন্ত সিংএর মৃত্যুর পর রাজানুমতির প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহার দুই স্ত্রী কতিপয় রাজপুত সহচর সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লাহোরে উপস্থিত হইলে যশোবন্ত সিংএর গর্ভবতী রাণী অজিত সিংহকে প্রসব করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজপুত কর্ম্মচারী ও রাণীদ্বয়ের গহিত ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এবং তাঁহাদিগকে রাজকীয় সৈন্যের তত্ত্বাবধানে থাকিতে আদেশ প্রদান করেন। এবং তাঁহাদের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য পাহারা বসাইয়া দেন। যশোবন্ত সিংএর রাণীদ্বয় অদ্ভুত কৌশলে পলায়ন করিয়া যোধপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উদয়পুরের রাণার কন্যার সহিত অজিত সিংএর বিবাহ হয়। রাজপুতগণ সম্রাটের বিরুদ্ধে একাধিকবার বিদ্রোহ উপস্থিত করে, অজিত সিং আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যোধপুর আক্রমণ করেন। বাহাদুর শাহের আমলে অজিত সিংহ দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তখন তাঁহাকে তিন হাজারী পদ প্রদান করা হয়। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ফররখসিয়রের রাজত্বকালে অজিত সিংহ তাঁহার কন্যার সহিত সম্রাটের পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক একটি স্থায়ী সন্ধি স্থাপন করেন। রাজপুত বংশের সহিত মোগল বংশের ইহাই সর্ব্বশেষ বৈবাহিক সম্বন্ধ। বাদশাহ মোহাম্মদ শাহের আমলে অজিত সিংএর পুত্র মহারাজ উভয় সিং গুজরাটের সুবাদার বা গবর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

৯। রাওভাও সিং—ইনি রাও সওর সালের পুত্র। তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হন, শাহ সুজার সহিত সংগ্রামকালে রাজকীয় কামানবাহী সৈন্যশ্রেণীর অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শাহ সুজাকে বিতাড়ন করার পর দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমির শায়েস্তা খাঁর সহিত তিনি ইসলামাবাদ দুর্গের অবরোধ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎপর তিনি মহারাজা যশোবন্ত সিংএর সহিত শিবাজীর বিদ্রোহ-দমন-কার্য্যে নিযুক্ত হন। রাওভাও সিং নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট তদীয় ভ্রাতা ভগবন্ত সিংএর পৌত্র অনর্দ্দা সিংকে ভাও সিংএর রাজ্যের গদিতে স্থান দান করেন। অনর্দ্দা সিংএর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বুধ সিং সম্রাট বাহাদুর শাহের দরবারে সাড়ে তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়া রামরাজা নামে অভিহিত হন।

১০। রাজা পাহাড় সিং—তিনি সম্রাট শাহজাহানের আমলে চারি হাজারী পদ পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে শাহজাদা দারা শেকোর সহিত কান্দাহার অভিযানে মোতায়েন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ইন্দ্রমন ও সোবহান সিংকে সম্রাট উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ইন্দ্রমন প্রথমতঃ পাঁচশতী পদে নিযুক্ত হন।

১১। ধীরাজ রাজা জয়সিং—হাজারী পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি রাজা জয়সিং উপাধিতে ভূষিত হন। আসদখাঁর খিলনা দুর্গাধিকার-কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় প্রাপ্তে সম্রাট তাঁহাকে দুই হাজারী পদে নিযুক্ত করেন।

১২। রাজা রায় সিং—সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে যশোবন্ত সিং রাজকীয় কারখানাদি লুণ্ঠন করিয়া খাজুয়া হইতে পলাইয়া যোধপুরে পৌছিলে আওরঙ্গজেব রায় সিংকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়া রাজা উপাধি দান করেন এবং তাঁহাকে চারি হাজারী পদে নিযুক্ত করেন; যশোবন্ত সিংএর বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরিত হয় তাহাতে মোহাম্মদ আমিন খাঁ মীর বখশীর সহিত তিনিও সেনাপতি-পদে বৃত হন। যশোবন্ত সিং বশ্যতা স্বীকার করার পর রায় সিং দরবারে আহুত হন এবং পরে দারাশেকোর দ্বিতীয় যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি বিজাপুর অভিযানেও শিবাজীর সহিত যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করায় আওরঙ্গজেব তাঁহাকে পঞ্চ হাজারী পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহাকে প্রচুর ভূসম্পত্তি জায়গির প্রদান করিয়াছিলেন।

(আল-এসলাম, মাঘ ও ফাল্গুন) এস্‌লামাবাদী।

* *
*

কলা।

ভারতীয় যতপ্রকার ফল আছে, তন্মধ্যে আমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বত্র আদৃত ও ব্যবহৃত। আমের পরেই কদলীর আদর ও ব্যবহার। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে অপক্ব কদলী প্রধান খাদ্যরূপে রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এক বিঘা জমিতে কদলীর চাষ দিলে উৎপন্নদ্রব্যে যত লোকের ভরণপোষণ হইতে পারে অপর কোন দ্রব্যের চাষ আবাদে ততটা লোকের ভরণপোষণ হইতে পারে না। গমের সহিত তুলনা করিতে গেলে কদলীর অনুপাত ১৩৩:২ হয় এবং গোল-আলুর তুলনায় উহার অনুপাত ৪৪:১ হয়।

কদলীফলের রাসায়নিক বিধান এবং পোষণশক্তি প্রায়ই গোল-আলুর সমান। কদলীর খাদ্য প্রায়ই অন্নভোজনের তুল্য মূল্য। কদলী বাস্তবিকই অন্নের ন্যায় সর্ব্বপোষণক্ষম খাদ্য। যদি পক্ব অবস্থায় খাওয়া যায়, তাহা হইলে একজন সারাজীবন কদলী খাইয়াই জীবিত ও পুষ্ট থাকিতে পারে। অপক্ব অবস্থায় ইহাতে অধিক পরিমাণ ষ্টার্চ্চ বা শ্বেতসার থাকে, পরন্তু পক্ব অবস্থায় ঐ শ্বেতসার শর্করাতে পরিণত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কদলীতে এবং ইহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কদলীর রাসায়নিক বিধান ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কদলীতে এবং এক এক জাতীয় কদলীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে শর্করার পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। পরিপক্ক কদলীফলে শতকরা বাইশ ভাগ শর্করা থাকে, তাহার মধ্যে আবার ষোল ভাগ স্বচ্ছীকৃত শর্করা। কদলী সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইলে পর স্বচ্ছীকৃত শর্করার ভাগ শীঘ্র শীঘ্র যে পরিমাণে কমিতে থাকে, অস্বচ্ছীকৃত শর্করার ভাগ সেই পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কদলীতে আবার কদলীর ভক্ষণীয় অংশ ও খোসা প্রভৃতি ত্যাজ্য অংশও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

কলিকাতা সহরে সচরাচর যে-সকল জাতীয় কদলী ফল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে আসল খাদ্যাংশ কত এবং ত্যাজ্য অংশ বা কত রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু তাহা পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষার ফল নিম্নে দেওয়া গেল।

	ভক্ষণীয়	ত্যাজ্যঅংশ
কাঁঠালি	৭০·৮৫	২৯.১৫
চাঁপা	৭৪ ৩৭	২৫.৬৩
চাটিম	৮৬ ০২	১৩.৯৮

এই কয় প্রকারের কদলীর মধ্যে চাটিম কলাতেই খাদ্যাংশ অধিক বলিয়া লোকে চাটিম কলাকেই বেশী পছন্দ করে।

কদলীতে খাদ্যাংশের শতকরা হিসাব।

জল	৭৫.৩
আমিষজাতীয় উপাদান	১·৩
স্নেহজাতীয় উপাদান	·.৬
শালিজাতীয় উপাদান	২১·০
তন্তুজাতীয় উপাদান	১·০
ভস্ম	০·৪
সর্ব্ব সমষ্টি	১০০·০

কদলী ফলের খাদ্যাংশ শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ এবং ইহার ত্যাজ্য অংশ গড়পড়তায় ২০ হইতে ৩০ ভাগ।

কদলীতে শতকরা ২১ ভাগ স্নেহ ও শালি জাতীয় উপাদান থাকে। ইহারা কার্ব্বন-ঘটিত পদার্থ বলিয়া ইহাতে কার্য্য করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে অপরাপর ফল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন বা পেশী-বর্দ্ধনকারী উপাদান থাকাতে, শুদ্ধ ইহারই উপর নির্ভর করিলে লোকের দেহ সম্পূর্ণরূপে পুষ্ট হইতে পারে।

কদলী সবুজ অবস্থায় যখন বাজারে আইসে, তখন লোকে ইহা ক্রয় করিয়া ভাণ্ডারজাত করে এবং তথায় ইহা পাকিতে থাকে। অত্যন্ত কাঁচা অবস্থায় কলার কাঁদি কাটিলে পরিপক্ক হইলে সেই কলাতে সুঘ্রাণ জন্মে না। পরন্তু ঐ-সকল কলার মধ্যে একটি করিয়া কালো রঙের শক্ত দ্রব্য থাকে। যখন কদলীতে এই কালো পদার্থ লক্ষিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে কলা ভাল করিয়া পাকে নাই অথবা উহা অত্যন্ত কাঁচা অবস্থায় কাটা হইয়াছে।

কাঁচা কলার খোসা ছাড়াইয়া তাহার ভিতরকার অংশ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া তাহাকে রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। উহা উত্তম রূপে শুকাইলে পর গুঁড়া করিয়া চালনি দিয়া চালিয়া লইলে কলার ময়দা প্রস্তুত হয়।

ফল ব্যতীত কদলীর অপরাপর অংশও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মোচা ও থোড় তরকারি করিয়া খাওয়া হয়। কলাগাছ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গরু ভেড়াকে খাইতে দেওয়া হয়। গরুর দুধ বেশী হইবে বলিয়া অনেকে ইহার আলটে গরুকে খাইতে দেয়।

কাঁচকলাতে কিঞ্চিৎ লবণ-মিশ্রিত শ্বেতসার অধিক পরিমাণে থাকায় এবং কিয়দংশ ট্যানিন্ নামক পদার্থ থাকায় ইহা ধারক বা সঙ্কোচক ও পুষ্টিকারক এবং পেটের গোলমাল হইলে ইহা উত্তম খাদ্য। সমুদয় কাঁচাকলাটি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জলে সিদ্ধ করা হয় কিম্বা অগ্নিতে সেঁকিয়া লওয়া হয়। পরে খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলে ভিতরে যে শস্য পাওয়া যায় উহা মাখমের ন্যায় কোমল হইয়া থাকে। এই মাখমের ন্যায় কদলীশস্য রোগীর রুচি অনুসারে ঘোল বা দধি, চিনি এবং লবণ সংযোগে খাইলে বড় সুখাদ্য হয়। ইহার সহিত জীরা ভাজার গুঁড়া মিশ্রিত করিলে খাদ্যটি বড় সুগন্ধবিশিষ্ট এবং তাপোৎপাদক হয়। ভাত এবং দধির সহিতও এই কদলীখাদ্য খাওয়া যায়। লোকে কাঁচকলার ময়দায় একপ্রকার রুটি করে, তাহাও শীঘ্র জীর্ণকারক।

কাঁচকলা শীতল ও ধারক। ইহার কচি পাতা ব্লিষ্টার এবং দাহ-জনিত ক্ষতের উপর আচ্ছাদন-জন্য দেওয়া হয়। ইহার শিকড় ও স্কন্ধ বলকারক, স্কার্ভি রোগনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং রক্তবিকৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

কাঁঠালি, চাঁপা এবং চাটিম এই তিন শ্রেণী কদলীর মধ্যে চাটিম্ কলাই পুষ্টি ও জীর্ণ করার পক্ষে উৎকৃষ্ট। আর দুই শ্রেণীর কলা অপেক্ষা ইহার খোসা খুব পাতলা। লোকে সচরাচর চাঁপা কলা ব্যবহার করে বটে কিন্তু উহাতে অম্ল হয়, কেননা উহাতে স্নেহজাতীয় উপাদানের পরিমাণ অধিক। উহা সহজে জীর্ণ হয় না বলিয়া দুর্ব্বলাগ্নি লোকের পক্ষে উহা ব্যবহার করা উচিত নয়। যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল, তাহাদের পক্ষে পাকা কলা উপকারী; কিন্তু যাহাদের অম্ল বা অজীর্ণ আছে- যাহারা মন্দাগ্নিবিশিষ্ট তাহাদের পক্ষে উহা খাওয়া নিষিদ্ধ।

লোকে পক্ক কদলী হইতে কাফি প্রস্তুত করে। কলা প্রথমে শুকাইতে হয়। তার পর দানা বাঁধিলে উহা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। এই কলা-সিদ্ধের আস্বাদ কাফির ন্যায়। পরন্তু ইহা কাফির ন্যায় স্বাস্থ্যের হানিজনক নয়।

টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া পাকা কলা কাটিয়া তাহা শুকাইতে হয় এবং ইহাকে সুমিষ্ট করিবার জন্য চিনি মিশাইতে হয়। এইরূপে বেনানা ফিগ্ প্রস্তুত হয়।

পাকা কলাকে খুব পাতলা করিয়া কাটিয়া চিনি এবং কমলা লেবুর রস মিশাইয়া সুখাদ্য মিষ্টান্ন করা হয়।

কদলীর নাল, মূল, কন্দ, পুষ্প ও ফল সকলই আমাদের এত উপকারী যে আমরা এই কদলী বৃক্ষকে দেবতা বলিয়া পূজা করি। ইহা তৃণ জাতীয় ওষধি। "ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ।" যাহারা ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। আমরা দুর্গোৎসবের সময় ধান মান প্রভৃতি নবপত্রিকা পূজার কালে কলাবধূরও পূজা করিয়া থাকি। কলার মোচা, কলার থোড়, কলার পাতা, কচি কলা, কাঁচ-কলা, পাকা কলা, কলার এঁটে প্রভৃতি সকলই আমাদের আহারে ও ব্যবহারে লাগে। কলা পরম মাঙ্গল্য, বরণডালায় ইহার পরম সমাদর। দেবভোগ্য নৈবেদ্যে বা পিতৃভোগ্য পিণ্ডে কলা না হইলে নিবেদন-কার্য্যই চলে না। কেবল তরকারি বা খাদ্যের জন্যই যে কলা পরম উপকারী তাহা নহে। পরন্তু আজও অনেক দেশে লবণের পরিবর্ত্তে লোকে কলার এঁটের ক্ষার-জল দিয়া ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া থাকে। কদলীকন্দসম্ভব ক্ষার-জলকে কোচবিহারের লোকে "ছ্যাকা" বলে; ছ্যাকা না দিলে তথাকার শাকসব্জি পাক হয় না। আমাদের দেশে ব্যঞ্জন রাঁধিবার সময় ছাঁকা দেয় বটে, কিন্তু তাহা অন্যরূপ। টীকাকার বিজয়রক্ষিত মধুকোষ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন

"ক্ষীরোদকসাধিতং ব্যঞ্জনমশ্নন্তি কামরূপাদৌ ॥" অর্থাৎ কামরূপ প্রভৃতি দেশে লোকে ক্ষারজল-সাধিত ব্যঞ্জনাদি খাইয়া থাকে। আজও আমাদের দেশের দরিদ্র লোকেরা কদলীক্ষার দ্বারা মলিন বস্ত্র ধৌত করিয়া থাকেন। কুম্ভকারেরাও ইহার শুষ্ক পত্র দ্বারা "পোয়ান্" পোড়াইয়া থাকে। ইহার কাঁচা পাতা আমাদের বাসনের কাজ করে। অম্ল অজীর্ণ রোগে কলাপাতায় ভাত খাওয়া প্রশস্ত।

কলাপাতা শুদ্ধ বলিয়া আমরা কলাপাতায় হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া থাকি। এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ইহার পাতা ও খোলা ব্যবহার করি। সেকালে পাঠশালায় তালপাতের লেখা সাঙ্গ হইলে গুরুমহাশয় কলাপাতে লেখাইতেন। আজও অনেকে কলাপাতায় প্রতিদিন দুর্গানাম অঙ্কিত করেন এবং ইহার কচি পাতা ক্ষত বন্ধনার্থ "ওয়েল সিল্কের" প্রতিনিধি-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, অধিকন্তু ইহা ব্লিষ্টারের (Blister) পক্ষে স্নিগ্ধ আচ্ছাদক। এতদ্দেশীয় লোকে নেত্ররোগে, কচি কলাপাতার দ্বারা নেত্র আচ্ছাদন করিয়া থাকে। ইহাতে চক্ষু শীতল থাকে এবং সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষিত হয়।

ইমার্সান সাহেব বলেন কদলীবৃক্ষের রস বিসূচিকার তৃষ্ণা প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। শুষ্কীকৃত অপক্ব কদলীচূর্ণ, উত্তম পুষ্টিপ্রদ, খাদ্যৌষধ ও উদারাময়গ্রস্ত রোগীর প্রশস্ত পথ্য। ইহা পেরেরা প্রভৃতি সাহেব স্বীকার করেন। কদলীফল তর্পক, পোষক এবং কষায়। ইহা গলক্ষত, শুষ্ককাস, এবং মূত্রকৃচ্ছ্রাদি বস্তির উত্তেজনা-জাত পীড়ায় হিতকর। কদলী-মূল যে ক্রিমিঘ্ন ইহা নব্যমতে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(স্বাস্থ্য-সমাচার)

* *
*

ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র।

পলাশীর যুদ্ধের ঠিক সাত বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও আর এদেশে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। James Augustus Hicky নামক এক ইংরেজ ইহা প্রকাশিত করেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ২৯শে তারিখে শনিবারে হিকি তাহার কাগজ বাহির করে। উহার নাম ছিল 'The Bengal Gazette', অথবা সম্পাদকের নামে জনসাধারণে প্রচলিত ছিল Hicky's Gazette বা Journal. কাগজের গোড়াতেই সম্পাদক স্পষ্টাক্ষরে ইহার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া লিখিয়াছিল, "A weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none."

কলিকাতা Imperial Libraryতে এই গেজেট অদ্যাপি আছে, তবে সকল সংখ্যা পূরা নাই। বিলাতে London British Museumএ ইহার অপর এক কপি আছে, এবং উহার অবস্থাও নাকি কলিকাতার কপি অপেক্ষা অনেক ভাল। এই কাগজের ছাপা এবং কাগজ অত্যন্ত খারাপ ছিল। অবশ্য প্রথম চেষ্টাতেই আমরা ভাল ছাপা ও কাগজ আশা করিতে পারি না। কাগজে লিখিত প্রবন্ধাদি কখনই উচ্চ অঙ্গের হইত না, প্রায়শঃই সভ্যতাবিরুদ্ধ কটূক্তিতে পূর্ণ থাকিত। বস্তুতঃ প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন কদর্য্য গালাগালি দেওয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিক কথা লইয়া অন্যায় আলোচনা করাই এই কাগজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তত্রাচ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্তই ইহা শান্তিতে কাটাইতে পারিয়াছিল।

(নারায়ণ, চৈত্র) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম।

বাঙ্গালায় ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ। উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে একটি মহলের নাম বোধ অর্থাৎ বৌদ্ধ। সেখানে এখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। গড়জাত ও কিল্লাজাত মহলের অনেক জায়গায়—এমন কি মোগলবন্দীতেও পুরী ও কটক জেলার অনেক থানায় সরাকি নামে এক জাত তাঁতি বাস করে। তাহাদের বিবাহাদি শুভকার্য্যে এখনও বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। সরাকি তাঁতি বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলাতেও আছে, কিন্তু তাহারা একেবারে হিন্দু হইয়া গিয়াছে—তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্মে এখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গন্ধও নাই। 'সরাকি' 'শ্রাবক' শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং সরাকিরা যে এককালে বৌদ্ধ ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই। উড়িষ্যায় উহারা এখনও অনেকটা বৌদ্ধ।

উড়িষ্যার জগন্নাথদেব নিজেই বুদ্ধমূর্ত্তি। এখন তিনি নারায়ণের অবতার হইলেও নবম অবতার অর্থাৎ বুদ্ধ অবতার। চূড়ামণি দাস চৈতন্য-চরিত লিখিতে গিয়া জগন্নাথদেবকে বুদ্ধ-অবতারই বলিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বাহির করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু।

অশোকেরও পূর্ব্বে উড়িষ্যাদেশে বিশেষ ভুবনেশ্বরের চারিপাশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বেশ প্রবল হইয়াছিল। ঐর নামে একজন রাজা অশোকের অনেক পূর্ব্বে মগধের হস্ত হইতে উড়িষ্যার উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অনেক মঠ ও গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অশোকরাজা উড়িষ্যা জয় করেন এবং তথায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের খুব শ্রীবৃদ্ধি করেন। উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ প্রায় একই দেশ। কটক ও পুরী জেলা কলিঙ্গও বটে উড়িষ্যাও বটে। কিন্তু বালেশ্বরকে কখনও কলিঙ্গ বলে কি না জানি না। অশোকের সময় কলিঙ্গের রাজধানী ছিল তোষলি। উহার এখনকার নাম 'ধৌলি', তোষলি শব্দেরই অপভ্রংশ। অশোকের তোষলিতে একটি পাহাড়ের মাথা ছাঁটিয়া একটি হাতীর মূর্ত্তি বাহির করা হইয়াছে। হাতীর মাথা আছে, শুঁড় আছে, সামনের দুটি পা আছে এবং ধড়ের অনেকটা আছে। বাকীটা খুদিয়া বাহির করা হয় নাই। পাহাড়ের গা বেশ পরিষ্কার করিয়া তাহাতে অশোকের একটি শিলালেখ আছে। অশোকের পরে উড়িষ্যায় জৈন-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। কারণ উদয়গিরির হাতীগুম্ফায় যে প্রকাণ্ড শিলালেখ পাওয়া যায় সেটি জৈনলেখ। খণ্ডগিরিতেও জৈন-ধর্ম্মের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সেখানে লোপ হয় নাই। হিয়েন-সাং যখন নালন্দায় পড়িতেছিলেন তখন উড়িষ্যায় হীনযানীরা মহাযানীদিগকে কাপালিক বলিয়া গালি দিয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হিয়ান-সাংকে বিচার করিবার জন্য উড়িষ্যায় পাঠাইয়াছিলেন।

মহাযান-ধর্ম্মে যখন নানা দেবদেবীর উপাসনা আরম্ভ হইল—অর্থাৎ বজ্রযান ধর্ম্ম যখন প্রবল হইয়া উঠিল—তখন উড়িষ্যা বজ্রযানের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রবারাহীর পূজা প্রকাশ করেন, তিনি বজ্রযানের অনেক পুস্তক লিখিয়া যান। উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, মগধ, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে তাঁহার মতের খুব আদর ছিল। তাঁহার এক মেয়ে ছিলেন, নাম লক্ষ্মীঙ্করা। তিনিও বজ্রযানমতের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যার তেলি, কায়স্থ প্রভৃতি জাতের লোকেও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। এই-সকল পুস্তকেরই তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা আছে এবং তিব্বতী লোকে আদর করিয়া পড়ে।

ইন্দ্রভূতির পর সোমবংশ, গঙ্গবংশ, গজপতিবংশ ও সর্ব্বশেষে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। ইঁহাদের সময়ে উড়িষ্যায় বৌদ্ধও ছিল, হিন্দুও ছিল। কিন্তু রাজা হিন্দু হওয়ায়, এবং মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা হিন্দু ও বৌদ্ধের ভেদ করিতে না পারায়, উড়িষ্যা হিন্দুর দেশ বলিয়াই পরিচিত হইত। মগধ ও বাঙ্গালার বৌদ্ধপণ্ডিতেরা লোপ হইয়া যাওয়ায় উড়িষ্যার বৌদ্ধেরা অতি হীন ভাবে বাস করিত। প্রতাপ রুদ্রের সময় ১৫০০ হইতে ১৫৩৩ পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের উপর উড়িষ্যায় অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল। বড় বড় বৌদ্ধগণ বাহিরে বৈষ্ণব সাজিয়া থাকিতেন কিন্তু চলিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা শূন্যপুরুষ মানিতেন। শূন্যপুরুষকেই বিষ্ণু মনে করিয়া পূজা করিতেন। তাঁহারা অলেখ শব্দ সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন। অলেখ অর্থাৎ অরেখ অর্থাৎ কোন দাগ নাই। নিরঞ্জন শব্দও এই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে।

শূন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদের কেমন অদ্ভুত মিলন! যিনি শূন্য, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পুরুষোত্তম।

অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস, ও চৈতন্য দাস—ইঁহারাই এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান কবি। অচ্যুতানন্দ প্রতাপরুদ্রের সময় নীলাচলে বাস করিতেন। বলরাম দাস প্রণব-গীতা লেখেন এবং মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া বেদান্তমতে প্রণব-গীতার ব্যাখ্যা করেন—তাহাতে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনবরত গালি দিতে থাকে। মহারাজ প্রতাপরুদ্রও রাগান্বিত হইয়া বলেন, "তুই শূদ্র, প্রণব উচ্চারণে ও বেদের ব্যাখ্যায় তোর কি অধিকার আছে?" তাহাতে বলরাম হাসিয়া বলেন, "শ্রীপতি কাহারও নিজস্ব নন। যে ভক্ত, যে ধার্ম্মিক, তাঁরই তিনি। জগন্নাথে কাহারও একচেটিয়া অধিকার নাই। ব্রাহ্মণেরা কেবল দাম্ভিকতা করিয়া বলিতেছেন জগন্নাথ তাঁহাদেরই। আমি বেদের বচন উদ্ধার করিয়া এ-সকল কথা প্রমাণ করিতে পারি।" ব্রাহ্মণেরা শুনিয়া আরও রাগিয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "করুক্, করুক্, এখনই করুক্, এখনই করুক্।" রাজাও তাহাতে সায় দিলেন। স্থির হইল, সকলে পরদিন প্রভাতে বলরামের আখড়ায় যাইবে এবং তথায় বিচার হইবে। বলরাম সেদিন ভয়ে আর বাড়ী গেলেন না—বটমূলে আশ্রয় লইলেন। গভীর নিশায় নরহরি আসিয়া বলরামকে দেখা দিলেন এবং তাঁহাকে ভরসা দিয়া গেলেন। পরদিন রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলে বলরাম বলিলেন, "আপনি নিজে শূদ্রের মুখে বেদের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিয়াছেন, তাই আমি ব্যাখ্যা করিতেছি। আমি জড়, মূঢ়মতি, এখানে ভিক্ষা করিয়া খাই। আমি বেদ ব্যাখ্যা করিলে আপনি রাগত হইবেন না।" ব্রাহ্মণেরা বলিল, "ও যদি বেদ ব্যাখ্যা করিতে পারে আমরা পরাজয় স্বীকার করিব।" বলরাম বলিলেন, "তবে শুনুন। নিত্য হইতে শূন্যের উৎপত্তি; শূন্য হইতে প্রণবের উৎপত্তি; প্রণব হইতে শব্দের উৎপত্তি; শব্দ হইতে বেদের উৎপত্তি, বেদ হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি।" এই কথা শুনিয়া রাজা ও ব্রাহ্মণেরা সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং বলরামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একবার প্রতাপরুদ্র রাজার বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছিল। রাজা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধপণ্ডিতদিগকে আনাইয়া চুরির ঠিকানা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা পারিল না, বৌদ্ধেরা পারিল। সুতরাং রাজা বৌদ্ধদিগকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু রাণী তাহাতে ভারি চটিয়া গেলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের মধ্যে কে বড় আবার পরীক্ষা হইল। একটা মুখঢাকা হাঁড়ী সভায় আনা হইল এবং জিজ্ঞাসা করা হইল এ হাঁড়ীতে কি আছে? তাহার ভিতরে ছিল সাপ। ব্রাহ্মণেরা বলিল, 'মাটি আছে'। ঢাকা খুলিলে মাটিই দেখা গেল। ব্রাহ্মণদের উপর রাজার ভক্তি বাড়িয়া গেল। তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন এই সময় বোধ হয় বলরাম দাসকেও পলাইয়া যাইতে হয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর বাইশ বৎসর পরে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব রাজা হইলে বলরাম আবার ফিরিয়া আসিলেন—কারণ মুকুন্দদেব বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধদিগকে যথেষ্ট আদর করিতেন। মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত উর্গা নগরের প্রধান লামা তারানাথ এই সময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবস্থা জানিবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছিলেন তিনি বলিয়া গিয়াছেন, উড়িষ্যার রাজা তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব বৌদ্ধ এবং তাঁহার রাজত্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

প্রায় পঞ্চাশবৎসর হইল গড়জাত মহলে মহিমাধর্ম্ম নামে এক নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এ ধর্ম্ম নীচ জাতির মধ্যেই চলে। প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট মিল আছে। এ ধর্ম্মেও অলেখ পুরুষ, শূন্য পুরুষের পূজা আছে। ইহাতেও জাতিভেদ নাই। ইহাও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মেও ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। এ ধর্ম্মের প্রধান গুরু ভীমভোই—ইহার পুরা নাম ভীমসেন ভোই অরক্ষিতদাস। ঢেকানল রাজ্যে জুবন্দাগ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন এবং অতি নীচ কন্ধ জাতিতে ইঁহার জন্ম। ইনি ধান ভানিয়া খাইতেন। কিন্তু ভগবানের প্রতি ইঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। একুশ বৎসর বয়সে ইনি মনের দুঃখে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান, এবং আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগে থাকেন। একদিন যাইতে যাইতে তিনি এক কূয়ার মধ্যে পড়িয়া যান। কূয়ার মধ্যে তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া গেল। নিকটের লোকে তাঁহাকে উঠাইবার অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু তিনি উঠিতে চাহিলেন না। তিনদিনের দিন রাত্রিশেষে ভগবান্ নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া কূয়ার উপর দাঁড়াইলেন এবং ভীমভোইকে ডাকিতে লাগিলেন। "ভীম তুমি উপর দিকে চাহ—দেখ আমি আসিয়াছি।" ভীম অন্ধ ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি ভগবানকে দেখিলেন। ভগবানও হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে কূয়া হইতে উঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, "যাও, অলেখ ধর্ম্ম প্রচার কর।" ভগবান্ তাঁহাকে একখানি কৌপীন দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "রান্না ভাত ছাড়া তুমি আর কোন জিনিষ ভিক্ষা করিও না, গ্রহণও করিও না।" কৌপীন পরিয়া ভীমভোই যখন ভিক্ষা করিতে গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "একটা পেটের মত চারটিখানি ভাত দাও," তখন গাঁয়ের লোকে সব হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ভীম যখন ভাত ছাড়া আর কিছু লইবেন না জানিল, তখন "এ লোকটা আমাদের জাত খাইতে আসিয়াছে" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। তিনিও কৌপীন ফেলিয়া কপিলাশের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গেলে শূন্য পুরুষ তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং রাগত হইয়া বলিলেন, "তোমার এখনও সিদ্ধি হয় নাই। নহিলে তুমি মার খাইয়া পলাইয়া আসিবে কেন?" এই বলিয়া তিনি ভীমভোইর হাত পা বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে একটি মন্দিরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং সে মন্দিরের অন্ধি-সন্ধি সব বুজাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি বাহিরে বসিয়া তিন বার হাততালি দিব, তোমার যদি সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, ত, তুমি বাহিরে আসিতে পারিবে।" তিন তালির পর ভীম যখন বাহিরে আসিলেন, তখন ভগবান বলিলেন, "ভীম তোমার সিদ্ধি হইয়াছে। তুমি জুবন্দাতেই থাক। তোমায় আর কোথাও যাইতে হইবে না। তুমি এখানে বসিয়াই অলেখ ধর্ম্মের কবিতা লেখ।" ইহার পর ভীমভোই ভগবানের আজ্ঞায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার সন্তানাদিও হইল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে

লাগিল। তিনি অনেক কবিতা লিখিলেন: তাঁহার প্রধান পুস্তকের নাম 'কলি-ভাগবত'। তাঁহার বহুতর ভজন ও পদাবলী আছে। দশ বার বৎসর হইল তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভীমভোই একবার সদলবলে জগন্নাথের মন্দির দখল করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে মার খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। যশোমতী-মালিকা নামক গ্রন্থে এই ধর্ম্মের সমস্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের বিনয়পিটকের নিয়মের সহিত ভীমভোইর প্রবর্ত্তিত নিয়মের অনেক মিল আছে। ভেকধারী বৈষ্ণবেরা এসকল নিয়ম পালন করে না, বিশেষতঃ বৈষ্ণবেরা নীচজাতির অন্ন গ্রহণ করে না। নীচজাতির অন্ন মহিমা-ধর্ম্মীর পক্ষে শুদ্ধ। ইহারা কুম্ভক নামক গাছের বাকল পরে, সেইজন্য ইহাদিগকে কুম্ভপটিয়া বলে।

ইহাদের মতে বুদ্ধদেব অলেখ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচারের জন্য এবং উদ্ধারের জন্য বোধ মহলের গোলসিংহা নামক স্থানে বাস করেন। জগন্নাথদেব নীলাচল ছাড়িয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কাহার আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছেন।" বুদ্ধদেব বলেন, "আমি অলেখের আজ্ঞায় আসিয়াছি। অলেখই পরাৎপর গুরু।" বুদ্ধদেব জগন্নাথকে সমাধিস্থ হইয়া কপিলাশে থাকিতে বলেন। তিনিও ঋরবৎসর দুধ ও জল খাইয়া কপিলাশে থাকেন। সমাধির অন্তে জগন্নাথ ভীমভোইয়ের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া অন্তর্ধান হন।

(নারায়ণ, চৈত্র)। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পৃথিবীর পূর্ব্বতম প্রদেশে

পোর্ট-আর্থার।

এশিয়ার ম্যারাথন, জাপানী মাঞ্চুরিয়ার হল্‌দিঘাট, পোর্ট আর্থার নবীন এশিয়ার জন্ম দিয়াছে। নোগি-তোগোর পরাক্রমভূমি, শিশুজাপানের-পরীক্ষাক্ষেত্র, এই পোর্ট আর্থার এশিয়াবাসীর চোখের ঠুলি খুলিয়া দিয়াছে। ইহার নীল-জলধিজলে এবং নির্ম্মম গিরিপৃষ্ঠে যুবক এশিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে। নব্য-জাপানী সামুরাইগণের এই বীরত্ব-নিকেতন রুশদর্প হরণ করিয়া জগতে শ্বেত-প্রাধান্যে বাধা দিয়াছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া দুনিয়ার সর্ব্বত্র ইউরোপ আমেরিকার আস্ফালন বাড়িয়া চলিয়াছিল। ১৯০৫ সালে পোর্ট-আর্থারে শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্য সর্ব্বপ্রথম কঠোর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৎসর মানবসমাজে এক যুগান্তর সৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর এসিয়া সম্বন্ধে ইতিহাস রচিত হইবার কাল যখন আসিবে, তখন পোর্ট-আর্থারের ১৯০৫ সালের ১ জানুয়ারির ঘটনা যুগপ্রবর্ত্তকরূপে বিবৃত হইবে।

পোর্ট-আর্থার, মানবেতিহাসের সর্ব্বনূতন পরিমাপ-প্রস্তর; উহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে জগৎ যে ভাবে চলিত, তাহার পরে ঠিক সেইভাবে চলিতেছে না। ইহা জগতে নবনব কর্ম্মশক্তি ও চিন্তাশক্তির সৃষ্টি করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র প্রাচ্য জগৎ নিতান্ত নিষ্প্রভ ও ঘৃণ্য ছিল। পোর্ট-আর্থার বিশ্ববাসীকে উচ্চকণ্ঠে জানাইয়াছে—"প্রাচ্য জনগণও 'বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত' হইতে জানে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় বিশেষ কোন মহাদেশের একচেটিয়া প্রভাব থাকিবে না। যাহারা এখনও প্রধান আছে ক্রমশঃ সাবধানতার সহিত তাহাদিগকে এশিয়ায় বিচরণ করিতে হইবে। ইয়োরোপ-আমেরিকায় এশিয়াবাসীর যে স্থান হইবে, এশিয়ায় ও ইয়োরোপ-আমেরিকানের সেই স্থান থাকিবে!"

যুগপ্রবর্ত্তক পোর্ট-আর্থার কত জাতির কত কুসংস্কার একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! ইহার ফলে ইয়োরোপ-আমেরিকার দাম্ভিকতা অপহৃত হইতেছে, এশিয়াবাসীর আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস দূরীভূত হইতেছে। ইহা সকলকেই শিখাইয়াছে "আত্মবিস্মৃতিই সকল অনর্থের মূল।" ইয়োরোপ-আমেরিকা এই শিক্ষা পাইয়া আত্মসংযম অভ্যাস করিতেছে, এশিয়াবাসীও স্বকীয় ক্ষমতার অনুশীলন করিতেছে। এইরূপে মানবেতিহাসে নূতন এক নবজীবন বা রেনেসাঁসের আয়োজন হইতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্যেরা ভাবিত—"প্রাচ্য নরনারীগণের দ্বারা সাংসারিক জ্ঞানবিজ্ঞান লাগিবে না। ইহারা মায়াবাদী ও অলীক কল্পনায় নিরত।" প্রাচ্যেরাও ভাবিত—"পাশ্চাত্ত্যেরা ইহজগৎ লইয়া মায়ামুগ্ধ রহিয়াছে। আমরা উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের কর্ম্ম করিতেছি।" পাশ্চাত্ত্যেরা প্রাচ্যকে অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত ও অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিত; প্রাচ্যেরা পাশ্চাত্যকে ভোগী নিষ্ঠুর বর্ব্বর বলিয়া নিন্দা করিত। ১৯০৫ সালের পোর্টআর্থার উভয়েরই অজ্ঞান অবিদ্যা ও কুসংস্কার দূরীভূত করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যেরা দেখিল প্রাচ্যেরা পাশ্চাত্যদিগের মতই ড্রেডনট এরোপ্লেন চালাইতে পারে। সুতরাং প্রাচ্যেরাও সুসভ্য সুশিক্ষিত। এদিকে প্রাচ্যেরাও বুঝিল তাহারাও বৈষয়িক শিল্পবিজ্ঞানে সুদক্ষ হইতে জানে। পরলোকের তত্ত্বই তাহাদের একমাত্র ধ্যানধারণার বিষয় নয়। পোর্ট-

আর্থার এই বলিয়া বিংশশতাব্দীর মূলসূত্র প্রচার করিয়াছে যে—"রক্তমাংসের মানুষমাত্রই একপ্রকার—মানবসমাজে প্রাচ্য পাশ্চাত্য প্রভেদ সত্য নয়। যিনি East is East এবং West is West বলিয়াছেন তিনি ঘোরতর কুসংস্কারে অন্ধ ছিলেন।

পোর্ট-আর্থার সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়াছে যে এই প্রভেদ-জ্ঞান মাত্র এক শতাব্দীর বস্তু। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ইত্যাদি শব্দ মানবসমাজে প্রচারিত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে প্রাচ্যজগতে পাশ্চাত্যজাতির প্রভাব বিস্তৃত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে উচ্চজাতি নিম্নজাতি, প্রাচ্যসমস্যা, পীতাতঙ্কবিভীষিকা ইত্যাদি শব্দ সুপ্রচলিত হইয়াছে। অথচ প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে এশিয়াবাসীর সঙ্গে ইয়োরোপীয়ানের আদানপ্রদানে এইরূপ জাতিসমস্যা বা race problem দেখা দিত না। সেই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করিয়া চলিত। এশিয়ায় ইয়োরোপে একটা দাগ টানিয়া মানবজাতিকে উচ্চনীচ স্তরে বিভক্ত করা হইত না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চাত্য মানবের ভ্রম হইয়াছিল। ১৯০৫ সালের শ্মশান পাহাড় ইয়োরোপ-আমেরিকাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে মানচিত্র দেখিয়া কোন জাতিকে উত্তম কোন জাতিকে অধম কোন জাতিকে অধম বিবেচনা করিতে নাই, আজ যে অধম কাল সে উত্তম হইতে পারে, আবার আজ যে উত্তম কাল সে অধম হইতে পারে। সাময়িক সফলতা দ্বারা কোন জাতির চরিত্র ও কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে নাই। সাময়িক অকৃতকার্য্যতা দেখিয়াও কোন সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব গণনায় প্রবৃত্ত হইতে নাই। তাহা হইলে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হয়। কেননা চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

পোর্ট-আর্থারের কীর্ত্তি প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ইয়োরোপ-আমেরিকার পণ্ডিত, দার্শনিক এবং সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণও কুসংস্কারে মগ্ন ছিলেন। রাষ্ট্রমণ্ডলের কৃতকার্য্যতা অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া তাঁহারা জগতের জাতিপুঞ্জের চরিত্রবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতেন। ডিপ্লম্যাট এবং রাষ্ট্রবীরগণের "Nothing succeeds like Success" তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক
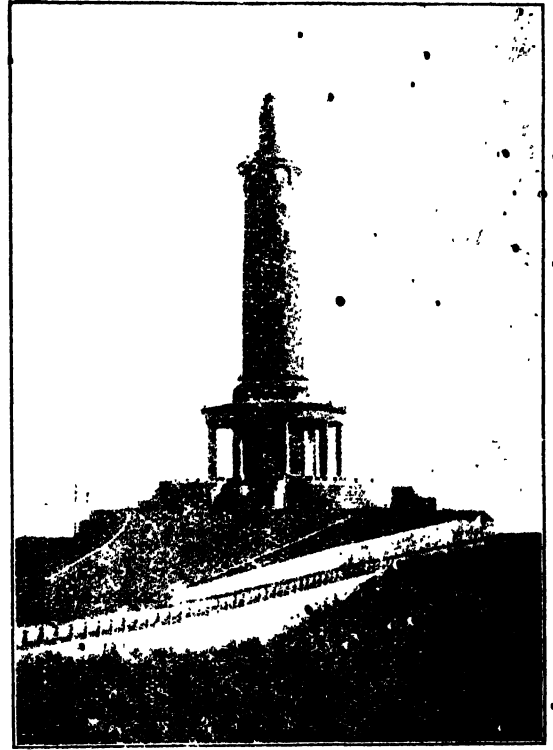
পোর্ট-আর্থারে জাপানী জয়ের স্মৃতিস্তম্ভ।

মহলেও প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইহার প্রভাবে পণ্ডিতগণ অন্ধভাবে সমাজবিজ্ঞানের ও নৃতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয়েরা যখন বিজয়শীল এবং এশিয়াবাসী যখন ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর তখন এক জাতি নিশ্চয়ই চিরকাল সকল বিষয়ে গুণবান্ এবং অপর জাতি নিশ্চয়ই চিরকাল সকল বিষয়ে গুণহীন—এইরূপ ধারণা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় গৃহীত হইত। সাময়িক জয়-পরাজয়ের অতিরিক্ত তথ্য আলোচনার জন্য দার্শনিকগণ সচেষ্ট ছিলেন না। কাজেই প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প ইত্যাদি স্বভাবত সকল অঙ্গ নিকৃষ্ট বিবেচিত হইত, এমন কি এইগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ পর্য্যন্ত অনাবশ্যক বোধ হইত। পোর্টআর্থার পণ্ডিতমহলে চৈতন্য সঞ্চার করিয়াছে। রাষ্ট্রবীরগণ প্রাচ্যমণ্ডলের এক "inferior race"কে 'ফার্ষ্ট ক্লাস' পাওয়ার রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তৎপূর্ণাৎ ইয়োরোপ আমেরিকার পণ্ডিত-পরিষৎও তাঁহাদের পুরাতন স্বতঃসিদ্ধগুলি সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রাচ্য মানবের চরিত্র, প্রাচ্য মানবের বিদ্যা, প্রাচ্য মানবের সভ্যতা বিশ্ববাসীর উপেক্ষণীয় নয়, বৈজ্ঞানিকেরও উপেক্ষণীয় নয়—এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে। বরং উল্টাদিকেই ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ইয়োরোপ-আমেরিকা ভরিয়া প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য কলা দর্শনের চর্চ্চা ও সমাদর আরব্ধ হইয়াছে।

পোর্ট-আর্থার দুনিয়ার চিন্তায় এশিয়ার বাণীকে স্থান দিয়াছে। আজ ইয়োরোপ-আমেরিকান সমাজের তথ্য ও তত্ত্বসমূহ এশিয়ার তথ্য ও তত্ত্বসমূহের সঙ্গে সমান আদরের সহিত একত্র আলোচিত হয়। যথার্থ তুলনামূলক আলোচনাপ্রণালীর (Comparative Method) প্রবর্ত্তনে ইহা সাহায্য করিয়াছে।

বিগত দশবৎসরের ভিতর জগতের যে-কোন ক্ষেত্রে যে-কোন ঘটনা দেখিতেছি তাহার প্রত্যেকটাতেই ইহার প্রভাব বুঝিতে পারি। ইহা সপ্রমাণ করিয়াছে যে এশিয়াবাসী নব্য ইয়োরোপ-আমেরিকান বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া জগতে যশস্বী হইতে পারিবে। খৃষ্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যান্ত ইয়োরামেরিকানেরা এশিয়াবাসী অপেক্ষা কোন বিজ্ঞানে শিল্পে বা দর্শনে উন্নত ছিলেন না। বরং এশিয়াবাসীই পাশ্চাত্য নরনারীর নিকটে বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে "জ্ঞান দম্ব কত কাব্যকাহিনী" প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে প্রাচ্যজগতে বিদ্যার ভাটা পড়িয়াছিল। তাহা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু নবীন জাপানে "মেজি"-যুগের পর এশিয়ায় বিদ্যার জোয়ার আবার বহিয়াছে। তাহা বিশ্ববাসীকে জানাইবার জন্যই পোর্ট-আর্থারের আবির্ভাব। বিংশশতাব্দীর মধ্যেই এশিয়ার জনসাধারণ নব্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া জগতে আবার মানুষের মত বিচরণ করিবে। খৃষ্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যান্ত প্রাচ্যমানব যে উপায়ে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া সংসারে বিরাজ করিত একবিংশ শতাব্দী হইতে তাহাদের আবার সেইরূপ পদমর্য্যাদা হইবে।

দেওয়াল-মহানগর।

মুকডেন হইতে পিকিঙ্।

সন্ধ্যার গাড়ীতে পোর্ট-আর্থার হইতে মুকডেনে ফিরিলাম। পথে ঘণ্টাখানেক ড্রাইরেনে যাবা গেল। এইখানে জাপানী-মাঞ্চুরিয়ার বড় বড় কর্ম্মচারী ও সেনাপতি ইত্যাদি উঠিলেন।

মুকডেন পর্য্যন্ত জাপানী কোম্পানীর রেল। সকালে চীনা গবর্ণমেন্টের গাড়ীতে বসিলাম। মুকডেন হইতে পিকিঙ্ ৫২২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ২২ ঘণ্টায় রাস্তা।

জাপানী রেলে যে-সমুদয় আরাম উপভোগ করা গিয়াছে চীনা রেলে তাহা পাওয়া গেল না। চীনাদের বন্দোবস্ত বিশেষ সুবিধাজনক নয়।

জাপানে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার মুকডেন পোর্ট-আর্থার পর্য্যন্ত রেলে শ্বেতাঙ্গ কদাচিৎ চোখে পড়ে। মুকডেনের পর দেখিতেছি গাড়ীভরা শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনী। ইঁহাদের ভিতর পর্য্যটক বেশী নাই—প্রায় সকলেই চীনে কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন। ভারতবর্ষে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি যেমন একপ্রকার শ্বেতাঙ্গদের জন্যই নির্ম্মিত হইয়া থাকে, চীনেও এই দৃশ্যই দেখিতেছি। দুএকজন চীনাকে প্রথম শ্রেণীতে দেখিলাম—কিন্তু তাহারা নিতান্ত নিষ্প্রভ। ভারতবর্ষেও প্রথম শ্রেণীর দেশী আরোহীগণের অবস্থা এইরূপই। অধিকন্তু গাড়ীতে গার্ড একজন শ্বেতাঙ্গ। ষ্টেশনে ষ্টেশনে শ্বেতাঙ্গ নরনারীর দুই চারিজন দেখিতে পাইতেছি। চীনে শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্ব আছে—জাপানে বিন্দুমাত্রও নাই। এইজন্যই শ্বেতাঙ্গেরা চীনাদিগকে আদর করে। শুনিলাম যে পথে চলিতেছি তাহার মূলধন জোগাইয়াছেন ইংরেজ লক্ষপতিগণ।

মাঞ্চুরিয়ার উর্ব্বর সমতল প্রান্তরের উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। মাঝে মাঝে নদী পার হইতেছি। ভারতীয় দৃশ্য মনে পড়ে। কোথাও কোথাও নদীর বন্যায় সেতু বাঁধ ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে দেখিতেছি। কয়েক দিন হইল একটা বড় নদীর উপদ্রবে বহু পল্লীর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। শুনিলাম অনেক মহাজন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। রেলে বসিয়া বন্যার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল।

এই-সকল অঞ্চলে পূর্ব্বে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত জনপদ ছিল না। রেলপথ উন্মুক্ত হইবার পর হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ নগর নানাস্থানে গড়িয়া উঠিতেছে। একটা বড় সহরের নাম সিন্ মিন-ফু। ইহা মুকডেন হইতে বেশী দূরে নয়। আর-একটা প্রসিদ্ধ সহর চিন্ চো য়ু। ইহা অতি প্রাচীন নগর। গাড়ীতে

গাধার গাড়ী।

আণ্টঙ হইতে পিকিঙ পর্য্যন্ত কোথাও ধানের চাস দেখি নাই--কিন্তু কোরিয়ায় ফুসান হইতে আণ্টঙ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ধান্যক্ষেত্র চোখে পড়িয়াছিল। মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিবামাত্র চারিদিকে ভুট্টা বজরা ও কাওনের ক্ষেত দেখিতেছি। শত শত মাইল ধরিয়া এই একধরণের শস্যশ্যামল ভূমি দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। সাতশত মাইল পাটের জমি যেরূপ দেখাইবে সেইরূপ একঘেয়ে দৃশ্য আণ্টঙের পর হইতে পাইতেছি।
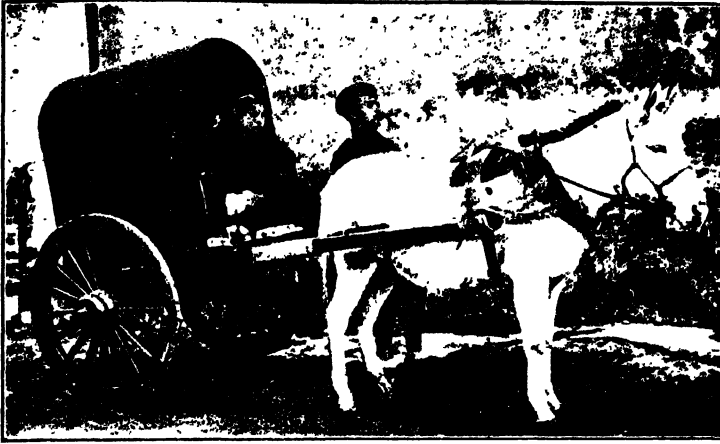
বাসিয়াই দেখিলাম একটা সুদীর্ঘ গোলাকার প্যাগোডা নগরের স্তম্ভস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে তাং-বংশীয় সম্রাটগণের আমলেও মাঞ্চুরিয়ার এই নগর সুপরিচিত ছিল। অদ্যাপি মাটির প্রাচীর বর্ত্তমান রহিয়াছে।

উপসাগরের অল্প দূরে-দূরে রেলপথ বিস্তৃত। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব্বসীমা আরম্ভ হইয়াছিল আণ্টঙে। এইবার পশ্চিম সীমাও অতিক্রম করিতে হইল। সন্ধ্যার পর শান-হাই-কোয়ান নগরে গাড়ী থামিল। মুকুডেনের পর এতবড় সহর আর নাই। এই নগরের পূর্ব্ব প্রাচীর হইতে চীনের জগদ্‌বিখ্যাত Great Wall বা বিরাট প্রাচীর বাহির হইয়াছে। এই দেওয়ালকে চীনের উত্তর সীমা বলা যাইতে পারে। কারণ মাঙ্গোলিয়ার দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে চিন্‌-বংশীয় সম্রাট শি-হুয়াঙ এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করান। নগরে সমুদ্র এবং পর্ব্বত উভয়ের প্রভাবই বিরাজমান। প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরও দৃষ্ট হয়।

পরদিন প্রত্যুষে টিন-সিন নগরে পৌঁছিলাম। এতবড় সহর ও বন্দর চীনে বেশী নাই। শাংহাইয়ের পরেই ইহার প্রতিপত্তি। এইখানে প্রায় সকল শ্বেতাঙ্গই নামিয়া গেলেন। বিরাট আফিস, কারখানা, চিম্‌নি, ফ্যাক্টরি ইত্যাদি দেখিয়া চীনে আধুনিকতার পরিচয় পাইলাম। আর ৩ ঘণ্টার ভিতর গাড়ী পিকিঙে আসিয়া পৌঁছিল।

ইটের বা মাটির দেওয়াল, প্রাচীরবেষ্টিত পল্লী বা নগর, টিকিওয়ালা পুরুষ ও নীলবসনাবৃত নরনারী, ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছি জাপানের আবেষ্টন বহুকাল ছাড়াইয়া আসিয়াছি। জাপানীদৃশ্যের মধ্যে এক্ষণে আছে কেবল খোলার ছাদ। লোকজনের আকৃতি এখানে কিছু অধিকতর দীর্ঘ ও হৃষ্টপুষ্ট।

চীনারা ষ্টেশনে ভাজাডিম, সিদ্ধ মুরগী, কাটা ফলমূল ইত্যাদি বেচিতে আসে। জাপানী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সৌষ্ঠবজ্ঞান চীনাসমাজে পাইতেছি না। লাউ, কুমড়া, পদ্মচাকা, আঙ্গুর, তরমুজ, শসা ইত্যাদি নানা জিনিষ বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। সন্ধ্যাকালে এবং সকালে সপুষ্প রজনীগন্ধার গাছ লইয়া মালীরা ষ্টেসনে বেচিতে আসে। রুটি পাকৌড়ি ইত্যাদিও বিক্রয় হইতেছে।

পিকিঙ পৌঁছিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে একটা উচ্চ প্রাচীর ভেদ করিয়া চলিলাম। এখান হইতে প্রাচীরের প্রভাব আরম্ভ হইল।

প্রথম দিবস—চীনের দুর্দ্দশা।

আজকাল নজর বড় হইয়া উঠিতেছে। কাজেই পিকিঙ দেখিবামাত্র একটা অপরিষ্কার নগরের দৃশ্য চোখে পড়িল। প্রকাণ্ড ফটকের সম্মুখে রেলওয়েষ্টেশন। গাড়ী হইতে নামিয়া হোটেলে আসিলাম।

আবার যেন কাইরোতে ফিরিয়া আসিয়াছি। হোটেল বিদেশীয় মহাজনগণের মূলধনে, বিদেশীয় তত্ত্বাবধানে

পরিচালিত। ইহাই চীনের সর্ব্ববিখ্যাত হোটেল। ফরাসী ইংরেজ, জার্ম্মান ইত্যাদি নানা দেশীয় অংশীদারেরা সমবেত হইয়া হোটেল চালাইতেছেন। ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্র সুরু হইবার পর জার্ম্মানগণকে হোটেলের কর্ত্তৃত্ব হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

চীনারা এখানে সেবক মাত্র। দুই একজন চীনা অতিথিও দেখিলাম। কিন্তু জাপানের হোটেলসমূহে ইয়োরোপ-আমেরিকানগণের যে দুরবস্থা দেখিয়াছি চীনা "স্বরাজের" প্রধান নগরের International Hotel-এ চীনা অতিথিগণের সেই দুরবস্থা দেখিতেছি। শ্বেতাঙ্গ নরনারীগণ এখানে মহা আনন্দে উল্লাসে কালাতিপাত করিতেছেন। চীন ইহাঁদের ভোগভূমি—জাপান ছাড়া এশিয়ার সকল জনপদই ইহাঁদের ভোগভূমি।

হোটেল যে পাড়ায় অবস্থিত তাহার নাম Legation Quarter। এই অঞ্চলে ইয়োরোপ-আমেরিকার সকল রাষ্ট্র এবং জাপান তাহাদের প্রতিনিধিগণের আফিস, লেগেশন, দূতকার্য্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন। তাহাদের পল্টনও এই অঞ্চলে রক্ষিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এই পাড়াটা চীনা স্বরাজের বহির্ভূত চীনারাষ্ট্রের কোন এক্তিয়ার এই স্থানে নাই। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, শিকাগো ইত্যাদি বড় বড় নগরে জার্ম্মান মহাল্লা, চীনাটোলা, পোলটুলি, ইহুদিবাজার ইত্যাদি যে ধরণের, পিকিঙের এই "দূত-মহাল্লা" সেই ধরণের নয় ইহা একটা বিদেশী পাড়া মাত্র নয়। এই অঞ্চলকে বিদেশী মুল্লুক বলা উচিত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বক্সার বা কুস্তীগির (Boxer) নামধারী চীনা স্বদেশসেবকগণ চীন হইতে বিদেশীয়দিগকে তাড়াইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিল। তাহার ফলে দেখিতেছি বিদেশীয়েরা চীন জুড়িয়া বসিবার অধিকার পাইয়াছে। হায় চীন!

এইরূপ বিদেশী মুলুক চীনের প্রত্যেক নগরে নগরেই আছে। এই ধরণের বিদেশীয় ভোগভূমিকে Concession বলাও হইয়া থাকে। জাপানীরা বহুকাল এই অত্যাচার স্বদেশে সহ্য করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা প্রবল—কাজেই অন্যান্য ইয়োরোপ আমেরিকানদের মত জাপানীরাও চীনের বুকে বসিয়া মুল্লুক Concession অধিকার ইত্যাদি ভোগ করিতেছে।

নব্যধরণের অট্টালিকার কোনটা ব্যাঙ্ক, কোনটা কাছারীঘর, কোনটা ব্যারাক। সর্ব্বত্রই বিদেশীর প্রভুত্ব। চীনাদের গতিবিধিও এই অঞ্চলে নাই। কেবল অট্টালিকাগুলির সম্মুখে চীনা রিক্শ্-কুলী দেখিতে পাই।

দুনিয়ার আর কোথাও বিদেশীয় রাষ্ট্রের পোষ্টআফিস আছে কিনা জানি না। চীনের বড় বড় নগরে জাপান, ফরাশী, ইংরেজ, জার্ম্মান, রুশ ইত্যাদি প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য চীনা ডাকঘরও আছে। চীনা "স্বরাজের" বা স্বাধীনতার মূল্য কতখানি তাহা এই বিদেশীয় পোষ্ট-আফিসের অস্তিত্বেই বেশ প্রমাণিত হয়। শুনিতেছি চীনারা ডাকঘরের উন্নতিবিধানে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছে। কালে হয়ত বিদেশী পোষ্ট-আফিস থাকিতে দিবার আবশ্যকতা দূরীভূত হইবে।

চীনের টাকা পয়সা বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। এক এক নগরে এক এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন। মুদ্রার মূল্যও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন। আধুনিক চীনের সর্ব্ব অঙ্গেই ঘা। চীনের দুর্দ্দশা ঘুচিবে কি?

চীনদেশের বিরাট প্রাচীর সম্বন্ধে গল্প ছেলেবেলা হইতে সকলেই শুনিয়া আসিতেছি। প্রাচীর বেষ্টিত নগর বা পল্লী কিরূপ হয় তাহা অনেকেরই জানা আছে। পিকিঙে আসিতে আসিতে সেই জগৎপ্রসিদ্ধ বিরাট প্রাচীরের কোণ ঘেঁসিয়া আসিয়াছি। মুক্‌ডেনে প্রাচীর-বেষ্টিত নগর দেখা হইয়াছে। পিকিঙনগরেরও একটা প্রাচীরের কিয়দংশ রেলে বসিয়াই দেখিয়াছি।

রাস্তায় বাহির হইয়া বুঝিতেছি—পিকিঙ একটা প্রাচীরবেষ্টিত নগর মাত্র নয়। এই নগরের সর্ব্বত্রই প্রাচীর দেখিতে পাই। যেখানে যাই সেইখানেই হয় মন্দিরের প্রাচীর, না হয় প্রাসাদের প্রাচীর, না হয় সাধারণ গৃহের প্রাচীর, না হয় দূত-কার্য্যালয়ের প্রাচীর, না হয় নগরের প্রাচীর—সর্ব্বত্রই উচ্চ দুর্গদেওয়াল স্বরূপ বেড়া চোখে পড়ে। সমস্ত সহরটাই যেন দেওয়ালে ভরা। তাহার উপর নগরটা স্বয়ংই ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত—প্রকোষ্ঠগুলি এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর। প্রত্যেক নগরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর। প্রথমে রাজপ্রাসাদ। ইহা একটা নগর বিশেষ। ইহার ভিতর উচ্চ কর্ম্মচারী বা ম্যাণ্ডারিন এবং পাশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি

ব্যতীত জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। এই নিষিদ্ধ পুরীর নাম "Forbidden City"। ইহা দেওয়ালে ঘেরা। নিষিদ্ধ পুরীর চারি প্রাচীরের বাহিরে আর একটা নগর। তাহার নাম Imperial City বা রাজ-নগর। ইহার চতুর্দ্দিকেও প্রাচীর। তাহার চারিদিকে আর একটা নগর। এই নগরকে তাতার বা মাঞ্চুনগর বলা হয়। তাতার-নগরের প্রাচীরই পিকিঙ মহানগরীর সর্ব্ববহিঃস্থ আবেষ্টন। তাতার-নগরের দক্ষিণে আর একটা নগর—তাহাকে বলা হয় চীনা-নগর। এই চীনা-নগরের উত্তর-প্রাচীর এবং তাতার-নগরের দক্ষিণ-প্রাচীর একই। অপর তিনদিকে তিনটা প্রাচীর। কাজেই দেওয়ালভরা মহানগরের যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকেই দেওয়াল দেখি। কোন উচ্চস্থান হইতে মুসলমান-নগরের সাধারণ দৃশ্য দেখিলে যেমন গম্বুজ, মিনারেট, মসজিদ ইত্যাদিই চোখে পড়ে, কোন হিন্দুনগরের চিত্রে যেমন মন্দির মঠ ইত্যাদিই দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পিকিঙের বিশেষত্ব তাহার দেওয়াল ও ফটক।

জলের কল পিকিঙের সর্ব্বত্র নাই। রাস্তার কোণে কোণে পাতকুয়া, ইঁদারা ইত্যাদি দেখিতেছি। বালতিতে করিয়া রাস্তায় জল ছিটান হইতেছে। আমরা আমাদের দেশে শীতকালে গাঁদা ফুল দেখি, এখানে ভাদ্রমাসের ভরা গরমেও গাঁদাফলের মালা বিক্রয় হইতেছে। জাপানীদের যেমন কোন বিশেষ শিরস্ত্রাণ নাই, চীনাদের মাথায়ও সেইরূপ কোন আবরণ দেখিনা। জাপানী ও চীনা জাতিদ্বয় এই হিসাবে বাঙ্গালী। চীনাদের মাথায় লম্বা চুলের বেণী আজও বিরল নয়। অবশ্য ইহা মাঞ্চুদের খাঁটি স্বদেশী আবিষ্কার। চীনা স্ত্রীলোকদিগের ক্ষুদ্র চরণযুগল মুকুডেন, এমনকি সিউল হইতেই দেখিতেছি। ইহারা রাস্তায় হাঁটে কি করিয়া তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

অসহ্য গরম—রাস্তায় ধূলাবালির দৌরাত্ম্য—তাহার উপর "রেতে মশা দিনে মাছি।" গলিতে গলিতে ঘুরাফিরা করিলাম। রিকশ ও গাধায়-টানা শ্যাম্পনি এই দুই যানের ব্যবহার বেশী। দুই একখানা ঘোড়ার ল্যাণ্ডো এবং ট্যাক্সি গাড়ী কখনও কখনও দেখা যায়। সন্ধ্যার সময়ে রিকশতে লোকজনের গতিবিধি বাড়িতেছে। বড় রাস্তা বেশী নাই। ইলেক্‌ট্রিক বাতির আয়োজন আছে। কোন রাস্তায় ট্রাম নাই।

তোকিও, কিয়োতো ইত্যাদি নগর দেখা থাকিলে মধ্যযুগের প্রাচ্য এশিয়া সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান সংগ্রহ আবশ্যক হয় না। এই নগরদ্বয়ের আধুনিক অংশ বর্জ্জন করিলে মধ্যযুগের চীনা সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন পাইতে পারি। চীনের সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানই জাপানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কাজেই জাপানে চীনের জিনিষই দেখিয়াছি। তবে জাপানীরা চীনা মালের উপর ঘসিয়া মাজিয়া খানিকটা নূতন জিনিষ প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাতে এক অভিনব সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু "মেজি"যুগের প্রভাবে জাপানে নব্য আলোক প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু পিকিঙে সেই মধ্যযুগের মামুলি ব্যবস্থাই দেখিতেছি, তাহার উন্নতি আর হয় নাই। বর্ত্তমান ইয়োরোপ আমেরিকার আবিষ্কারসমূহও এখানে বিরল। এই কারণে শিষ্যকে দেখিয়া যত আনন্দ পাইয়াছি স্বয়ং গুরুর গৃহে আসিয়া তত পাইতেছি না—পাইব কিনা সন্দেহ, এমন কি অনেকটা হতাশ দুঃখিত হইতেই হইবে জানিতেছি।

যাহা হউক, অলিগলি, রাস্তাঘাট, দোকানবাজার, লোকজনের চলাফেরা ইত্যাদি পিকিঙে যেরূপ, জাপানের নগরে নগরে তাহারই অনুকরণ দেখিয়া আসিয়াছি। মোটের উপর, কাইরো, তোকিও, পিকিঙ - প্রাচ্যজগতের সকল নগরেই একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাই। এই-সকল ধরণধারণ ইয়োরোপ-আমেরিকার কুত্রাপি নাই। বাঙ্গলাদেশে মধ্যযুগের নগর একটাও নাই বলিলেই চলে। আজকালকার ঢাকা মুরশিদাবাদ মুসলমানী আমলের সাক্ষ্য বেশী দেয় না। তবে উত্তর ভারতের লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর ইত্যাদি নগরে মধ্যযুগের এশিয়া খানিকটা বুঝা যায়। সেই মধ্যযুগই পিকিঙেও দেখিতেছি বলা যাইতে পারে। দিল্লীর লোক চীনাদের ভাষা বুঝিবে না। কিন্তু পিকিঙে আসিলে অন্যান্য সকল বিষয়ে ভারতীয় দৃশ্যই দেখিবে। দিল্লীতে নিউইয়র্কে আকাশ-পাতাল প্রভেদ; কিন্তু পিকিঙে কাইরোতে, দিল্লীতে কিয়োতোতে প্রভেদ অতি সামান্য মাত্র।

রাত্রিকালে একটা চীনা হোটেলে আহার করিতে

গেলাম। চীনে মুসলমান ধর্ম্মেরও প্রচার হইয়াছিল। এ কথা বোধ হয় অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর জানা আছে। কিছুকাল হইল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস চীনে মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তার সম্বন্ধে "মডার্ণরিভিউতে" একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আর কোন ভারতবাসী এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন কি না জানি না। যাহা হউক আজ চীনা মুসলমানের হোটেলে আহার করা গেল। অবশ্য সাজসজ্জা কথাবার্ত্তা ইত্যাদি দেখিয়া বৌদ্ধ, কন্‌ফিউশিয়ান বা মুসলমান চীনাদের মধ্যে প্রভেদ করা অসম্ভব। আমার দোভাষী মহাশয় কনফিউশিয়ান-মতাবলম্বী।

প্রথমেই গরম জলে তোয়ালে ভিজাইয়া মুসলমান ভৃত্য টেবিলের সম্মুখে রাখিয়া গেল। মুখ মুছিয়া আহারে বসা এখানে রীতি। চপ ষ্টিকও আসিল। তাহার পর নানা প্রকার ফলমূল ও শাকসব্জীর আয়োজন। দুগ্ধহীন চিনিহীন গরম চা'র সঙ্গে কুমড়ার বীজ ভাজা খাইতে পাইলাম। নানাপ্রকার বীজভাজা চীনারা খাইয়া থাকে। ধনিয়ার শাক, শিঙ্গারা কেশুর বাদাম সিদ্ধ, আখরোট ভাজা পদ্মচাকার বীজ ইত্যাদি নিঃশেষ হইলে খাঁটি ভারতীয় রুটি পাওয়া গেল। রুটি আমার ফরমায়েস অনুসারে আসে নাই। চীনারা এই রুটিই খাইয়া থাকে। নূতন তরকারির মধ্যে খাইলাম কচি বাঁশের বা কঞ্চির ঝোল, খাইতে মন্দ না। মাছমাংস ছিল, গ্রহণ করিলাম না।

হোটেলে প্রবেশ করিবার সময়ে এক উচ্চ চীৎকার শুনিয়াছিলাম। আহার করিতে বসার পর এইরূপ চীৎকার বহুবার শুনিতে পাইলাম। দোভাষী বলিলেন—"মহাশয়, ভয় পাইবেন না। অতিথি গৃহে প্রবেশ করিলে চীনারা এইরূপে অভিবাদন করিয়া থাকে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এরূপ ডাকাতের ডাক কেন?" ইনি বলিলেন—"হোটেলের ম্যানেজার চীৎকার দ্বারা জানান যে একজন আসিয়াছেন। অমনি যে যেখানে আছে সকলে সমস্বরে চীৎকার করে।"

জাপানী খাদ্য খাইয়া পেট ভরে নাই। চীনা আহার্য্য দ্রব্য ভারতবাসীর রপ্ত হওয়া সহজ।

চীনে স্বরাজ বা রিপাব্লিক বোধ হয় আর টিকিল না। চীনা সমাজে নানা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা রাজতন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছে। বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্টই বোধ হয় সম্রাট হইবেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা

পরাবিদ্যা আমাদের দেশের সমস্ত বিদ্যার মূল উৎস। এই মূল উৎস হইতে দুইটি ধারা বিনিঃসৃত হইয়া যুগ বাঁধিয়া পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে। একটি ধারা ব্রহ্মজ্ঞান, আর একটি ধারা অধ্যাত্ম যোগ। কঠোপনিষদে এই দুইটি ধারার গোমুখী হইতে সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত যাত্রাপথের ঠিকানা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এইরূপ :—

(১) জ্ঞানপথের উত্তরোত্তরবর্ত্তী বিশ্রাম তীর্থ।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

ইহার অর্থ :—

ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ; বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ; মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ; অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ; পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; পুরুষই পরা কাষ্ঠা পুরুষই পরা গতি।

ইহার টীকা।

বলা হইয়াছে "ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ—বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ।" তবেই হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় দুয়েরই অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। তা যদি হয়—এরূপ যদি হয় যে ইন্দ্রিয় এবং বিষয় দুয়েরই অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, তবে তাহা হইতেই আসিতেছে যে দুয়ের মধ্যে যেটা মনের অপেক্ষাকৃত নিকটের বস্তু সেইটেই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে কোন্‌টা মনের অপেক্ষাকৃত নিকটের বস্তু—ইন্দ্রিয় না বিষয়? ইন্দ্রিয় মনের বহির্দ্বার। বিষয়-সকল যদিচ ঐ বহির্দ্বার দিয়া মনের অন্তঃসদনে প্রবেশ করে, কিন্তু তা

বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে তাহারা সেই অন্তঃসদনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাহাদের সহিত মনের কোনো-প্রকার সম্পর্ক থাকে না—সেই অন্তঃসদনে প্রবেশ করিবার পর-মুহূর্ত্তেই তাহারা মনের বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বহির্দ্বার অপেক্ষা অন্তঃসদন যে-হিসাবে সুখাসীন গৃহপতির বেশী নিকটের বস্তু, সেই-হিসাবে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয়-সকল মনের বেশী নিকটের বস্তু। অধিকন্তু এখানে দ্রষ্টব্য এই যে বিষয়-সকল মনের অন্তঃসদনে প্রবেশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না পরন্তু তাহারা কালের পর্য্যায়-গতিকে মনের মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায় যে স্বপ্নকালে যখন ঐ বহির্দ্বারের কপাট বন্ধ থাকে তখন মন শ্রুতপূর্ব্ব এবং স্পৃষ্টপূর্ব্ব শব্দস্পর্শাদি উপকরণ-সকল জোড়াতাড়া দিয়া আপনা হইতেই বিচিত্র বিষয়-সকল উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করে। স্বপ্নকালের বিষয়-সকল যে ইন্দ্রিয়ের কোনো অপেক্ষা রাখে না তাহার একটি নির্ঘাত প্রমাণ এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি দুর্দৈবগতিকে অন্ধ হইয়া পড়ে তাহা-হইলেও সে স্বপ্নাবস্থায় চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির ন্যায় নানা প্রকার দৃশ্য দর্শন করে। অতএব স্বপ্নের বিষয়সকল মনেরই অঙ্গের সামিল তাহাতে আর ভুল নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি—বহির্বিষয় সকল মনের বহির্দ্বার দিয়া অন্তঃসদনে প্রবেশপূর্ব্বক মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া মনের অঙ্গের সামিল হইয়া গিয়াছিল কোন্ সময়ে? অবশ্য জাগ্রৎকালে। তবেই হইতেছে যে স্বপ্নকালেও যেমন জাগ্রৎকালেও তেমনি—উভয়কালেই মনোগোচর বিষয়সকল মনেরই অঙ্গের সামিল। এখন দ্রষ্টব্য এই যে মনোগোচর বিষয়-সকল যেমন মনের অঙ্গ—ইন্দ্রিয়গণ তেমনি শরীরের অঙ্গ। অতএব মনের আপনার অঙ্গ যে-হিসাবে শরীরের অঙ্গ অপেক্ষা মনের বেশী নিকটের বস্তু—মনোগোচর বিষয়-সকল সেই-হিসাবে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মনের বেশী নিকটের বস্তু। এই কারণেই (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মনোগোচর বিষয়-সকল মনের বেশী নিকটবর্ত্তী বলিয়াই) বলা হইয়াছে "ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ।"

তাহার পর বলা হইয়াছে "মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ।" এখন জিজ্ঞাস্য এই—কিসে শ্রেষ্ঠ? মন অপেক্ষা বুদ্ধি কিসে যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলিতেছি—প্রণিধান জাগরণ-কালে **বুদ্ধি** নিজমূর্ত্তি ধারণ করে বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় জাগরণের আর এক নাম **প্রবোধ**।*

প্রবোধ-কালে অর্থাৎ জাগরণ-কালে ইন্দ্রিয়-দ্বার প্রমুক্ত পাইয়া সেই সুযোগে **বুদ্ধি** সদ্যঃসমাগত প্রত্যক্ষ বিষয়-সকলের সহিত দৃষ্টপূর্ব্ব শ্রুতপূর্ব্ব স্পৃষ্টপূর্ব্ব প্রভৃতি স্মরণাধিষ্ঠ বিষয়-সকলের ঐক্যানৈক্য অবধারণ-মতে "এটা এই" "ওটা এই" এইরূপ করিয়া পুরোবর্ত্তী বিষয়-সকলের তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ করে। পক্ষান্তরে, স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়-দ্বারে কপাট বন্ধ থাকা-কারণে প্রত্যক্ষ বিষয়-সকলের নবাগমন বন্ধ হইয়া যাওয়াতে কেবল-মাত্র স্মৃতি-গুপ্ত বিষয়-সকল মনের সাজঘর হইতে নানাবেশে সাজিয়া বাহির হইয়া স্বপ্নের নাট-মন্দিরে উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে নাচিয়া বেড়াইতে থাকে। এরূপ অবস্থায়, স্মরণোদিত বিষয়-সকলের সঙ্গে সদ্যঃসমাগত প্রত্যক্ষ বিষয়-সকলের যোগভঙ্গ হইয়া যাওয়া-কারণে উভয়ের (অর্থাৎ স্মরণোদিত বিষয় এবং প্রত্যক্ষ বিষয় এই দুই রকম বিষয়ের) ঐক্যানৈক্যের **অবধারণ কার্য চালাতে না-পারাতে** বুদ্ধির হস্তে কোনো কার্য্য থাকে না; কাজেই **বুদ্ধি** রুদ্ধদ্বার মনের শয়নাগারে সুখশয্যায় গা ঢালিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। বুদ্ধির এইরূপ প্রসুপ্ত অবস্থায় দৃশ্যমান বস্তুসকলের কোন্‌টা যে, বস্তুত কী, তাহার তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা মনের আকৃলার কম্ম না। স্বপ্নকালে দৃষ্ট বিষয়সকলের তত্ত্বাতত্ত্ব যে, দ্রষ্টা পুরুষের গণনার মধ্যে আমল পায় না, তাহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, স্বপ্নে যদি একটি ক্ষুদ্র বিড়াল দেখিতে দেখিতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হইয়া উঠিয়া হালুম্ হালুম্ শব্দে গর্জ্জন করিতে থাকে, অথবা একটা গাছের রঙ্‌চঙে ফল প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া বেড়াইতে থাকে, তবে তৎকালে তাহা দ্রষ্টা পুরুষের চক্ষে স্বল্পমাত্রও অঘটন-ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, স্বপ্নকালেরও যেমন—জাগ্রৎকালেরও তেম্নি, উভয়কালেরই বিষয়সকল মনেরই অঙ্গের সামিল; কিন্তু, তখন, দুইকালের দুইতরো বিষয়-

* প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকের প্রবোধ-শব্দটির অর্থ জাগরণ। "জাগরণ" কিনা মোহনিদ্রা হইতে জাগরণ।

সকলের মধ্যে প্রভেদ যে, কি, সে বিষয়ের কোনো কথা ওঠে নাই; এখন দেখিতেছি যে, দুয়ের মধ্যে বেশ একটি পরিষ্কার প্রভেদ-চিহ্ন দাগিয়া দেওয়া যাইতে পারে এইরূপ;—স্বপ্নকালের বিষয়সকল তত্ত্বাতত্ত্বের ধার ধারে না, পরন্তু জাগ্রৎ-কালের বিষয়সকল তত্ত্বগর্ভ।

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, স্বপ্নরাজ্য—মনোরাজ্য; জাগরণ-রাজ্য প্রবোধরাজ্য। স্বপ্নরাজ্যের রাজা **মন**; জাগরণ-রাজ্যের রাজা **বুদ্ধি**। মনের মুখ্য ধর্ম্ম হ'চ্চে এটা ওটা সেটা প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী বিষয়সকলের মধ্যে স্বপ্নবৎভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো; বুদ্ধির মুখ্য ধর্ম্ম হ'চ্চে সজাগভাবে বিদিত-পূর্ব্ব বিষয়সকলের সহিত বিদিতব্য বিষয়ের ঐক্যানৈক্য সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া শেষোক্ত বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণ। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

রামকমল শ্যামকমলের হস্তে ফুল একটি প্রদান করিয়া বলিলেন "বল দেখি এটা কী ফুল?" শ্যামকমল বলিলেন "আমার মনে হইতেছে—ঠিক্ এইরূপ বর্ণ গন্ধ এবং আকৃতি বিশিষ্ট ফুল কোথাও যেন আমি দেখিয়াছি—মনে করি রো'সো—মনে পড়িয়াছে! ইংলণ্ডে দেখিয়াছি;—এটা টিউলিপ ফুল তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।" শ্যামকমল যে-সময়ে বলিয়াছিলেন "মনে করি রো'সো", সে-সময়ে তাঁহার মন নানা ফুল মুহুর্মুহু ভাঙিয়া গড়িয়া তাহাদের মধ্যে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিল। নানাবিষয়ে মনের এইরূপ অধীরভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো'কে মনন বলে। তাহার পরে তিনি যখন দেখিলেন—তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট টিউলিপ ফুলের সহিত তাঁহার হাতের ফুলটির ভাবের মিল রহিয়াছে চমৎকার, তখন তাঁহার বুদ্ধিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীভূত হইল যে, এটা টিউলিপ ফুল। বুদ্ধির এইপ্রকার নিশ্চয়-ক্রিয়াকে তত্ত্বনির্দ্ধারণ বলে। যে হিসাবে মনন অপেক্ষা তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ শ্রেষ্ঠ—সেই হিসাবে মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ।

তাহার পরে বলা হইয়াছে—বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ। এখানে যেমন বুদ্ধির একধাপ উপরেই রহিয়াছে "মহান্ আত্মা"—সাংখ্য দর্শনে তেমনি অহঙ্কারের একধাপ উপরেই রহিয়াছে **"মহান্"**। সাংখ্য দর্শনে মহান্ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে **বুদ্ধি**। বুদ্ধি কি? না "এটা এই" এই প্রকার অধ্যবসায়। কিন্তু অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধি কিসে যে মহান্—বুদ্ধিকে মহান্ বলা হইল কী-যে অভিপ্রায়ে—সে বিষয়ে সাংখ্যদর্শন একেবারেই চুপ। আমাদের দেশের প্রাচীন সূত্রকারদিগের অর্দ্ধেক কথা পেটে—অর্দ্ধেক কথা মুখে—এটা একটা বিধির বিড়ম্বনা; আর, সেইজন্য, তাঁহাদের কোন্ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি তাহা ভাষ্যকারেরা অনেক সময় স্থির করিয়া উঠিতে পরাভব মানিয়া কতকগুলা বাজে কথার আন্দোলন করিয়া দুধের সাধ ঘোলে মেটা'ন্। সাংখ্য-সূত্রকারের পেটে রহিয়াছে **"মহতী বুদ্ধি"**, মুখে ব্যক্ত করা হইতেছে তাহার বিশেষণটুকুমাত্র পুংলিঙ্গ-বেশে—"মহান্" এই অর্দ্ধাংশটুকু-মাত্র! কিন্তু পর্ব্বতও মহান্—সমুদ্রও মহান্—আকাশও মহান্—জগতে মহানের অভাব নাই;—কাজেই সাংখ্যসূত্রকারকে দায়ে পড়িয়া শেষে বলিতে হইল, "এই যে মহান্ এটা বুদ্ধি!" মনে কর একজন চিত্রকর কুকুর আঁকিতে গিয়া এমন একটি জন্তু আঁকিয়া বসিলেন যে, তাহা কুকুরও হইতে পারে, শৃগালও হইতে পারে, বানরও হইতে পারে;—কাজেই তাঁহাকে আলেখ্যপটের নীচের ফাঁকা স্থানে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিতে হইল **"কুকুর"**। সাংখ্যের সূত্রকার তেম্নি "মহান্" লিখিয়া তাহার পার্শ্বে লিখিয়া দিলেন **"বুদ্ধি"**। বুদ্ধি-শব্দ দিয়া সাংখ্যের "মহান্"-শব্দটির অঙ্গ পূরণ করিবার জন্য কেন; যে আমার এত মাথা ব্যথা তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে; সে কারণ এই যে, "মহান্"-শব্দটির ঐরূপে অঙ্গ-পূরণ করিলে—প্রচলিত সাংখ্য যে ঔপনিষদ সাংখ্যেরই দ্বিতীয় সংস্করণ, তাহার প্রমাণেরও সেই সঙ্গে অঙ্গপূরণ করা হয়। যথা;—দাহিকা শক্তিতে যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব হয়, ধীশক্তিতে তেম্নি আত্মার আত্মত্ব হয়; সুতরাং "মহান আত্মা" বলিলে যাহা বুঝায়—মহতী বুদ্ধি বলিলে প্রকারান্তরে তাহাই বুঝায়; এমন কি, কঠোপনিষদের যে শ্লোকটি একটুপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার যে স্থানটিতে রহিয়াছে **"বুদ্ধি"**, উহার দুই চারিছত্র পরবর্ত্তী শ্লোকের ঠিক সেই স্থানটিতে রহিয়াছে **"জ্ঞানাত্মা"**। পূর্ব্বাপরবর্ত্তী শ্লোকাংশ দুটি যথাক্রমে (১) (২) অঙ্কে চিহ্নিত করিয়া নিম্নে পাশাপাশি বিন্যস্ত করিলাম।

(১)

মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ ;
বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ

ইহার অর্থ :—

মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ;
বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা
শ্রেষ্ঠ।

(২)

তৎ (অর্থাৎ মনঃ)
যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি ;
জ্ঞানং আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ।

ইহার অর্থ :—

মনকে জ্ঞানাত্মাতে
সঁপিয়া দিবে ; জ্ঞানকে মহান্
আত্মাতে সঁপিয়া দিবে।

তবেই হইতেছে যে, কঠোপনিষদের মতে মনের একধাপ উপরের তত্ত্বকে বুদ্ধি বলাও যা, আর, জ্ঞানাত্মা বলাও তা, একই কথা। ইহা হইতেই আসিতেছে যে, অহঙ্কারের এক ধাপ উপরের তত্ত্বকে মহতী বুদ্ধি বলাও যা, আর মহান আত্মা বলাও তা, একই কথা। মানিলাম যে, অহঙ্কারের একধাপ উপরের তত্ত্বটির তাৎপর্য্যার্থ মহতী বুদ্ধি ; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অহঙ্কারের নিজের তাৎপর্য্যার্থ কি ? তা যদি জিজ্ঞাসা কর—বলি শোনো তবে :—

আমি যখন কোনো বিষয় জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তখন আমারই বুদ্ধিতে আমি তাহা উপলব্ধি করি ; তুমি যখন কোনো বিষয় জ্ঞানে উপলব্ধি কর, তখন তোমারই বুদ্ধিতে তুমি তাহা উপলব্ধি কর, আর এক ব্যক্তি যখন কোনো বিষয় জ্ঞানে উপলব্ধি করেন তখন তাঁহারই বুদ্ধিতে তিনি তাহা উপলব্ধি করেন ; তা বই, দেবলোকবাসী অমরগণের মধ্যেও কেহ এতবড় একটা স্পর্দ্ধার কথা বলিতে সাহস পান না যে "আমার বুদ্ধি একেবারেই অহঙ্কারবর্জ্জিত পরম পরিশুদ্ধ বুদ্ধি।" পঞ্চদশীতে স্পষ্টই লেখা আছে

"অহম্বৃত্তি রিদম্বৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহংবৃত্তিরিদংবৃত্তির্মনোভবেৎ॥"

ইহার অর্থ :—অহংবৃত্তি এবং ইদংবৃত্তি এই দুই বৃত্তিতে অন্তঃকরণ দ্বিধা বিভক্ত ; তাহার মধ্যে বিজ্ঞান (অথবা যাহা একই কথা বুদ্ধি)—অহংবৃত্তি, মন ইদংবৃত্তি।

পঞ্চদশীর এ কথাটি খুবই ঠিক্। মনে কর আমার ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালানো হইবামাত্র দেয়ালের কোণে আমি একটা চকচকে সামগ্রী দেখিতে পাইলাম ; দেখিতে পাইয়া তাহাকে শুদ্ধ কেবল "ইদং" বলিয়া (অর্থাৎ "এই জিনিসটা" বলিয়া) মনে গ্রহণ করিলাম, কিন্তু সেটা যে, কী জিনিস, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার পরে তাহার কাছে গিয়া ঠাহর করিয়া দেখিলাম যে, সেটা আঙটি। আমার পার্শ্বস্থিত বন্ধুকে যখন আমি তাহা দেখাইলাম, তখন তিনি দেখিয়া বলিলেন "আমার বুদ্ধিতে এটা সোণালি রঙ্ করা পিতলের আঙটি" ; আমি বলিলাম "আমার বুদ্ধিতে এটা প্রকৃতপক্ষেই সোণার আঙটি।" এই জন্য বলিলাম যে, পঞ্চদশীতে যে বলা হইয়াছে "বুদ্ধি অহংবৃত্তি"—ঠিকই বলা হইয়াছে। সব বুদ্ধিই তো এইরূপ অহঙ্কার-গর্ভ ক্ষুদ্র বুদ্ধি—অহঙ্কারশূন্য মহতী বুদ্ধি আবার কোন্‌তর বুদ্ধি তাহা তো জানি না। তাহা যে কোনতর বুদ্ধি তাহা বলিতেছি—প্রণিধান কর।

কঠোপনিষদের শাঙ্করভাষ্যে মহান্ আত্মার অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এইরূপ :—"সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ আত্মা। মহান্ :—সর্ব্বমহত্ত্বাৎ অব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্ত্বং বোধাবোধাত্মকং মহান্ আত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে।" ইহার অর্থ :—সর্ব্বজীবের বুদ্ধির প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ অধ্যাত্মা কিনা অধিষ্ঠাতৃ-আত্মা—এই অর্থে আত্মা। সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ যে, অব্যক্ত, তাহা হইতে প্রথম জাত—এই অর্থে মহান্ ; এইরূপ বোধাবোধাত্মক হৈরণ্যগর্ভ তত্ত্বকে বলা হইয়াছে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ মহান্ আত্মা। ইতি শাঙ্কর ভাষ্য। শাঙ্কর ভাষ্যের এই-সকল কথার অর্থ আনন্দগিরি-কৃত টীকাতে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :—"সুরনরতির্য্যগাদি-বুদ্ধীনাং বিধারকত্বাৎ সাতত্যগমনাৎ আত্মোচ্যতে। সূত্র-সংজ্ঞকং হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বং ইত্যর্থঃ। বোধাবোধাত্মকমিতি—জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাত্মকং ইত্যর্থঃ।" ইহার অর্থ—সুরনরপশু-পক্ষী প্রভৃতি জীবগণের বুদ্ধির বিধারক এবং সর্ব্বগত এই অর্থে আত্মা অর্থাৎ সূত্রসংজ্ঞক হৈরণ্যগর্ভ-তত্ত্ব। এই সূত্র-সংজ্ঞক হৈরণ্যগর্ভ তত্ত্বকে বোধাবোধাত্মক বলা হইয়াছে এইজন্য—যেহেতু হিরণ্যগর্ভরূপী মহান্ আত্মাতে জ্ঞান এবং অজ্ঞান ক্রিয়াশক্তি দুইই একাধারে বর্ত্তমান। ইতি আনন্দ-গিরিকৃত টীকা। আনন্দগিরি তাঁহার কৃত টীকাতে হৈরণ্যগর্ভ তত্ত্বকে সূত্র-সংজ্ঞক বলিয়াছেন এইজন্য—যেহেতু হিরণ্যগর্ভ দেবতা সূত্রাত্মা বলিয়া বেদান্ত-শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ। বেদান্তে এইরূপ লেখে যে, মুক্তামালায় যেমন মুক্তাগণ একই অখণ্ড

সূত্রে গ্রথিত থাকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তেমি সমস্ত জীবের বুদ্ধি একই মহতী বুদ্ধিতে—হিরণ্যগর্ভরূপী মহান্ আত্মাতে—গ্রথিত রহিয়াছে; আর সেইজন্য হিরণ্যগর্ভরূপী মহান্ আত্মা সূত্রাত্মা শব্দের বাচ্য। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা যেমন জীবাত্মা—বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা তেমি হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা বা মহান্ আত্মা। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, প্রত্যেক জীবাত্মার বাহিরে অনেকানেক জীবাত্মা রহিয়াছে, আর সেইজন্য জীবাত্মার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি-তুমি-তিনি'র প্রভেদ অহঙ্কার-বেশে সাজিয়া বাহির হওয়া অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে সূত্রাত্মার বাহিরে দ্বিতীয় সূত্রাত্মা নাই, আর, সেইজন্য, সূত্রাত্মার মহতী বুদ্ধিতে অহঙ্কারের দাঁড়াইবার স্থান নাই। একজন আধুনিক ফরাসীস গ্রন্থকার (Camille Flammarion) এ-কালের বৈজ্ঞানিক ভাষায় সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভের পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন এইরূপ—

The sun—the great heart of his system and source of life—shines on the orbits of the planets, and he himself moves in a sidereal system that is vaster still. We have no right to deny that thought can exist in space, and that it directs the movements of vast bodies, as we direct those of our arms or legs. The instinct which controls living beings, the forces which keep up the beating of our hearts, the circulation of our blood, the respiration of our lungs, and the action of our stomachs, may they not have parallels in the material universe, regulating conditions of existence incomparably more important than those of a human being, since, for example, if the sun were to be extinguished, or if the earth were put out of its course, it would not be one human being who would die, it would be the whole population of our globe, to say nothing of that of other planets.

ইহার ভাব এই যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার-সকলই কি কেবল বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, আর, যাহার একটু-ইদিক্-উদিক্ হইলে কত লোক যে মরিয়া যায় তাহার সংখ্যা নাই সেই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের গুরুতর ব্যাপার-সকল কি বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে না?, অবশ্যই তাহা বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে।

ঋক্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২১শ সূক্তে অনুপম হৃদয়-স্পর্শী কবিতার ভাষায় সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভের পরিচয় জ্ঞাপন করা হইয়াছে এইরূপ—

হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ। প্রজাপতি দেবতা॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যাং উতেমাং। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা। যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ। যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

যেন দ্যৌ রুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া। যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ। যোঽন্তরীক্ষে রজসো বিমানঃ। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

ইহার অর্থ—

হিরণ্যগর্ভ ঋষি। প্রজাপতি দেবতা॥

সমস্ত ভূতের একমাত্র পতি হইয়া হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমান হইলেন। তিনি পৃথিবী এবং আকাশকে ধরিয়া রহিলেন। কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা সেবা করিব? (অর্থাৎ এই দেবতাকে নহে তো আর কোন্ দেবতাকে?)

যিনি আত্মা প্রদান করেন, যিনি বল প্রদান করেন; সমস্ত বিশ্ব যাঁহার প্রশাসন মানিয়া চলে, দেবগণ যাঁহার প্রশাসন মানিয়া চলেন; অমৃত এবং মৃত্যু যাঁহার ছায়া। (ইঁহাকে নহে তো আর) কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা সেবা করিব?

এই হিমবান্ পর্ব্বত-সকল এবং নদীর সহিত সমুদ্র যাঁহার মহিমা বলিয়া ঋষি-মধ্যে প্রসিদ্ধ; এই দিক্-সকল যাঁহার বাহু। (ইঁহাকে নহে তো আর) কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা সেবা করিব?

যাঁহা দ্বারা আকাশ উচ্চ হইয়াছে এবং পৃথিবী দৃঢ়া হইয়াছে; যাঁহা দ্বারা স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-দ্যুলোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অন্তরীক্ষে যিনি জল বিতত করিয়াছেন। (ইঁহাকে নহে তো আর) কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা সেবা করিব?

প্রশ্ন॥ বেদমন্ত্রটি আরম্ভ করা হইয়াছে "হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতি দেবতা" বলিয়া, অথচ উহার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত হিরণ্যগর্ভেরই মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে—একটি স্থানেও প্রজাপতি দেবতার নামোল্লেখ নাই; ইহার কারণ কি?

উত্তর॥ হরি বৈষ্ণব হরিনাম জপ করিতেছেন দেখিয়া যদি বলা যায় যে, "হরি উপাসক—হরি উপাস্য দেবতা" তবে তাহা শুনিয়া শ্রোতা'র এরূপ মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে

যে, বক্তাটি ঘোর অদ্বৈতবাদী, কেননা তাঁহার মতে যে-হরি উপাস্য দেবতা—সেই হরিই উপাসক। কিন্তু যদি বলা যায় 'হরি উপাসক - শ্রীকৃষ্ণ উপাস্য দেবতা" তাহা হইলে উপাসক'কে যে উপাস্য দেবতা হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ করা হইতেছে এ বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ থাকে না। তেমনি, "হিরণ্যগর্ভ ঋষি—হিরণ্যগর্ভ দেবতা" বলিলে বিকল্পে এরূপ বুঝাইতেও পারে যে, যে হিরণ্যগর্ভ—ঋষি, সেই হিরণ্যগর্ভই দেবতা। এইজন্য "হিরণ্যগর্ভ ঋষি হিরণ্যগর্ভ দেবতা" এরূপ দ্বৈধসূচক বাক্যের পরিবর্ত্তে বলা হইয়াছে "হিরণ্যগর্ভ ঋষি—প্রজাপতি দেবতা"। এরূপ বলাতে কোনো দোষ হয় নাই এইজন্য যেহেতু "শ্রীকৃষ্ণ" যেমন উপাস্য-দেবতা হরিরই আর এক নাম—(সকল শাস্ত্রেই বলে যে) প্রজাপতি তেম্নি হিরণ্যগর্ভ দেবতারই আর এক নাম, অতএব হিরণ্যগর্ভ দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করাতে প্রজাপতি দেবতারই মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

প্রশ্ন ॥ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ-দেবতারই আর এক নাম—এটা যেন বুঝিলাম। কিন্তু বেদমন্ত্রটির উপর-অঞ্চলে, যখন উপাস্য-দেবতার নাম দেওয়া হইয়াছে "**প্রজাপতি**", তখন, তাহার ভিতর-অঞ্চলে সে-নামটির পরিবর্ত্তে দোসরা একটি নাম দেওয়া হইল কেন যে—হিরণ্যগর্ভ নাম দেওয়া হইল কেন যে—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

উত্তর ॥ রাসলীলার বর্ণনা-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের রাধাবল্লভ নাম যেমন সংলগ্ন হয়, মধুসূদন নাম সেরূপ সংলগ্ন হয় না। তেম্নি, উদ্ধৃত বেদমন্ত্রটিতে মহান্ আত্মার হিরণ্যগর্ভ নামটি যেমন সংলগ্ন হয়—প্রজাপতি নামটি তেমন সংলগ্ন হয় না।

প্রশ্ন ॥ কেন সংলগ্ন হয় না?

উত্তর ॥ সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন **প্রজা**'র নামগন্ধও ছিল না, তখন প্রজাপতি বর্ত্তমান ছিলেন—এ কথাটা শিরোনাস্তি শিরঃপীড়ার ন্যায় অত্যন্ত বেখাপ শুনায়। পক্ষান্তরে, সৃষ্টির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভ বর্ত্তমান ছিলেন—এ কথাটা মন্ত্ররচয়িতা ঋষির প্রকৃত অভিপ্রায়ের সহিত কেমন দিব্য খাপ খায়, তাহা যদি দেখিতে চাও তবে প্রণিধান কর :—

হিরণ্যগর্ভ শব্দের ভাবার্থ তেজোগর্ভ। সৃষ্টির পূর্ব্বে জল স্থল অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সমস্তবিশ্বচরাচর মহান্ আত্মা হিরণ্যগর্ভের তেজোময় শক্তিতে দ্রবীভূত ছিল - তন্ময়ীভূত ছিল; তাহার পরে, সৃষ্টিকালে তাঁহার সেই তেজোরূপী প্রভাব হইতে জল জলরূপে, স্থল স্থলরূপে, বায়ু বায়ুরূপে, অগ্নি অগ্নিরূপে আবির্ভূত হইল। অতএব উদ্ধৃত বেদমন্ত্রটিতে হিরণ্যগর্ভ নামটি ঠিক জায়গায় বসিয়াছে তাহাতে আর ভুল নাই। ইতি প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত।

একটু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, শাঙ্করভাষ্যে হৈরণ্যগর্ভ তত্ত্বকে, অর্থাৎ সাংখ্যের মহত্তত্ত্বকে, বলা হইয়াছে "বোধাবোধাত্মক" এবং আনন্দগিরিকৃত টীকাতে বোধাবোধাত্মক শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—"জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তি উভয়াত্মক।" সাংখ্যদর্শনে তাই মহত্তত্ত্বরূপী মহতী বুদ্ধির লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এইরূপ—"অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ"। "বুদ্ধি কি? না অধ্যবসায়"। অর্থাৎ সকল বুদ্ধিই চিৎশক্তি-সমন্বিতা; তাহার মধ্যে কোনো কোনো বুদ্ধি চিৎশক্তি এবং ক্রিয়া-শক্তি উভয়-সমন্বিতা। সাংখ্যদর্শনকার বলিতে চাহিয়াছেন এই যে, মহত্তত্ত্ব শেষোক্ত প্রকার অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, তা বই তাহা সামান্য শ্রেণীর বুদ্ধি নহে—শুধুই কেবল বিচারাত্মিকা বুদ্ধি নহে।

প্রশ্ন ॥ কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—কাহাকেই বা বলিতেছ বিচারাত্মিকা বুদ্ধি তাহা আমি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হয়।

উত্তর ॥ মনে কর একজন সুনিপুণ গায়ক মগ্নচিত্তে মালকোষ রাগের একটি গীত গান করিতেছেন। এরূপ স্থলে গায়কের কণ্ঠ দিয়া যে, মালকোস বাহির হইতেছে, এটা হইতেছে তাঁহার ক্রিয়াশক্তির বলে বা অধ্যবসায়ের বলে; আর যাহা তাঁহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইতেছে তাহা মালকোষ—এই তত্ত্বটি যে, তাঁহার জ্ঞানে স্ফুরিত হইতেছে, এটা হইতেছে তাঁহার ধীশক্তির বলে। এইরূপে গায়কের ধীশক্তি এবং অধ্যবসায়-সমন্বিত ক্রিয়াশক্তি দুইই পরস্পরের সহিত মাখামাখি-ভাবে একসঙ্গে কার্য্যে খাটিতেছে। গায়ক যখন বুদ্ধিপূর্ব্বক মালকোষ গাহিতেছেন, তখন, তাহা তো মালকোষ হইবেই, সুতরাং তাহা মালকোষ কি না এরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। অতএব যেরূপ বুদ্ধিতে গায়ক বুঝিতেছেন যে, গীয়মান গীতটি মালকোষ, সেরূপ বুদ্ধিকে বিচারাত্মিকা বুদ্ধি না

বলিয়া বলা উচিত "অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি"। গীতাশাস্ত্রে বলা হইয়াছেও তাই; বলা হইয়াছে

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরু-নন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।"

ইহার অর্থ:—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (অথবা যাহা একই কথা, অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি) একনিষ্ঠা, কুরুনন্দন; অব্যবসায়ীদিগের বুদ্ধি বহুধা বিক্ষিপ্ত। অব্যবসায়ী শ্রেণীর কোনো সমজদার ব্যক্তি গায়কের ঐ গানটি শুনিয়া বলেনও যদি "এটা মালকোষ", কিন্তু তাঁহাকে মালকোষ গাহিতে বলিলে তিনি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিবেন সন্দেহ নাই যে, তাহা আমার কর্ম্ম না; আমি রাগরাগিণীর বিচার করিতে পারি কিন্তু রাগরাগিণী কণ্ঠ দিয়া বাহির করিতে পারি না। এখন বোধ করি তুমি বলিবামাত্রই বুঝিতে পারিবে যে, গায়কের রাগ-রাগিণী-বিষয়িনী বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্মিকা—অব্যবসায়ী শ্রোতার উক্ত-বিষয়িনী বুদ্ধি বিচারাত্মিকা। ইতি প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তটির সম্বন্ধে আর-একটি কথা আমার বলিবার আছে এই যে, গায়ক যে সময়ে ভাবে-ভোর হইয়া—একপ্রকার আত্মহারা হইয়া—তদ্গত চিত্তে গীতটি গাহিতেছেন, সেই মুখ্য সময়টিতে তাঁহার মন গীয়মান গানের প্রতিই ষোলো আনা নিবদ্ধ রহিয়াছে—তাঁহার আপনার ওস্তাদি'র প্রতি তখন মূলেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। এই জন্য বলি যে, অন্ততঃ সেই মুখ্য সময়টিতে তাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কারবর্জ্জিত। পক্ষান্তরে, অব্যবসায়ী শ্রেণীর শ্রোতা যে-সময়ে যুক্তি-বিচার খাটাইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করেন যে, গীয়মান গানটি মালকোষ, সে সময়ে "আমি কেমন ঠিক বুঝিয়াছি" এইরূপ অহঙ্কার—আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়া—তাঁহার মনোমধ্যে ঝটিতি প্রবেশ করে—কিছুতেই বারণ মানে না।

প্রশ্ন। তুমি কি বলিতে চাও যে, গায়কের অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এবং অব্যবসায়ী শ্রোতার বিচারাত্মিকা বুদ্ধির মধ্যে যেরূপ প্রভেদ দেখাইলে—সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভের মহতী বুদ্ধি এবং জীবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির মধ্যে ঠিক সেই রকমের প্রভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে?

উত্তর। তোমার জানা উচিত যে, কোনো উপমাই উপমেয় বিষয়ের সহিত সর্ব্বাংশে সংলগ্ন হয় না। বর্ত্তমান স্থলের উপমাটি যে অংশে সংলগ্ন হয় না, সে অংশ যে, কোন্ অংশ, তাহা তুমিও জান, আমিও জানি, সকলেই জানে; সুতরাং সে বিষয়ের আন্দোলন নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন; পরন্তু উপমাটি উপমেয় বিষয়ের সহিত যে অংশে সংলগ্ন হয়, সে-অংশে তাহা কি-প্রকার সংলগ্ন হয় এবং কতদূর সংলগ্ন হয়, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলিতেছি প্রণিধান কর।—

(১)

গীয়মান গীতটিতে যেমন গায়কের ক্রিয়াশক্তি এবং ধীশক্তি পরস্পরের সহিত মাখামাখি ভাবে এক সঙ্গে কার্য্যে খাটিতেছে—তেমনি ভ্রাম্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভের মহতী বুদ্ধি এবং ক্রিয়াশক্তি পরস্পরের সহিত মাখামাখি ভাবে একসঙ্গে কার্য্যে খাটিতেছে।

(২)

গায়ক যদি মালকোষ না গাহিতেন, তবে শ্রোতা যেমন বলিতে পারিতেন না যে, এটা মালকোষ, তেমনি, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যদি হিরণ্যগর্ভের শক্তিপ্রভাবে স্ব স্ব পরিধিপথে বিধৃত না থাকিত, তবে জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারিতেন না যে, এটা চন্দ্র, এটা সূর্য্য, এটা বৃহস্পতি, এটা শুক্র ইত্যাদি।

(৩)

গায়ক গান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যখন এঁএঁএঁ এই রকম একটি ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া গীতের গোড়া বাঁধিতেছেন, তখন, তাহা শুনিয়া যেমন শ্রোতার সাধ্য নাই—গায়ক কী রাগ বা রাগিণী গাহিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা বুদ্ধিতে স্থির করিয়া ওঠা, তেমনি, বহুপূর্ব্বে এক সময় যখন সমস্ত পৃথিবী জলে জলময় ছিল, তখন তাহা দেখিয়া কাহারো সাধ্য নাই—পৃথিবী পরে যেরূপ জল স্থল অগ্নি বায়ু তরু লতা জীবজন্তুতে সমাকীর্ণ সুব্যবস্থিত মূর্ত্তি ধারণ করিবে তাহা যে, কিরূপ মূর্ত্তি, তাহা বুদ্ধিতে স্থির করিয়া ওঠা।

উপমাটির সহিত উপমেয় বিষয়ের এইরূপ অনেক অংশে মিল রহিয়াছে।

প্রশ্ন॥ উপমাটির সহিত উপমেয় বিষয়ের মিলই তো দেখিতেছি আগাগোড়া—অমিল যে, কোন্ স্থানে তাহা ত দেখিতে পাইতেছি না।

উত্তর॥ গায়ক হাজার ওস্তাদ হউন না কেন—এক সময়ে তিনি কাহারো না কাহারো সাক্রেদ ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। পক্ষান্তরে, অনুপম তালমান-লয়-সঙ্গত বিশ্বসঙ্গীতের যিনি একমাত্র অদ্বিতীয় গায়ক, তিনি সকল গুরুর গুরু—কোনো কালেই কাহারো তিনি শিষ্য ছিলেন না। এই স্থানটিতে উপমা এবং উপমেয় বিষয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কঠোপনিষদে তাই বলা হইয়াছে "বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ" অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অপেক্ষা -বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের মহতী বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ।

তাহার পরে বলা হইয়াছে "মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ—অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ।"

ইহার টীকা।

বেদান্ত শাস্ত্রে একই অদ্বিতীয় পরমাত্মার দুইরূপ স্থিতির উল্লেখ আছে—(১) স্বরূপে স্থিতি এবং (২) আপন মহিমাতে স্থিতি। পরমাত্মাকে আপন অব্যক্ত শক্তিতে নিগূঢ় এবং স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতরূপে ভাবনা করিবার সময় তাঁহার নাম দেওয়া হইয়া থাকে পরব্রহ্ম; আর, তাঁহাকে আপন মহিমাতে—জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যাতিসূর্য্যে—প্রতিষ্ঠিত-রূপে ভাবনা করিবার সময় তাঁহার নাম দেওয়া হইয়া থাকে অপর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ। আবার, বেদান্ত-শাস্ত্রে এ কথাও বলে যে, "তাবান্ অস্য মহিমা—ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ!" ইহার অর্থ এই যে, এ সমস্ত তাঁহার মহিমা; পুরুষ যিনি—তিনি তাঁহার মহিমা অপেক্ষা বড়। কঠোপনিষদে তাই বলা হইয়াছে "মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ—অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ।" যেমন চন্দ্রের ব্যক্ত মুখচ্ছবি অপেক্ষা অব্যক্ত অবশিষ্ট অংশ বড়, তেমনি পরমাত্মার ব্যক্ত মহিমা অপেক্ষা তাঁহার অব্যক্ত শক্তি বড়; কেননা, তাঁহার ব্যক্ত মহিমা তাঁহার অব্যক্ত শক্তির একাংশ মাত্র—উপরি-ভাগ মাত্র। আবার সমগ্র চন্দ্র যেমন তাহার ব্যক্ত মুখচ্ছবি এবং অব্যক্ত অবশিষ্ট অংশ দুয়েরই অপেক্ষা বড়, তেমনি, পুরুষ কি না পরব্রহ্ম আপনার ব্যক্ত মহিমা এবং অব্যক্ত শক্তি দুয়েরই অপেক্ষা বড়। উপনিষদে তাই বলা হইয়াছে "মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ।" তাহার পরে বলা হইয়াছে "পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই—পুরুষই পরা কাষ্ঠা—পুরুষই পরা গতি।"

প্রশ্ন॥ জীবাত্মাও তো পুরুষ শব্দের বাচ্য; সুতরাং পুরুষ এক কি অনেক এই প্রশ্নটি এখানে অনিবার্য্য। কাপিল সাংখ্যের মতে পুরুষ অনেক। পাতঞ্জল সাংখ্যের মতেও তাই;—প্রভেদ কেবল এই যে, পাতঞ্জল সাংখ্যের মতে পুরুষগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ তিনি অনাদি নিত্যকাল ক্লেশাদি হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত; আর, সেই যে, পরমোৎকৃষ্ট পরম পুরুষ—তিনিই ঈশ্বর শব্দের বাচ্য; পরন্তু কাপিল সাংখ্য ঈশ্বর-বিষয়ে একেবারেই চুপ। শাঙ্কর বেদান্তের মতে—পুরুষ প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত এবং একমাত্র অদ্বিতীয়; কেবল, ভ্রান্ত জীবদিগের অবিদ্যাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হ'ন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তিন দর্শনের এই তিনটি কথার কোন্ কথাটি সত্য?

ক্রমশঃ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চশস্য

চশমার ইতিহাস—

চশমা কবে, কি করিয়া আবিষ্কৃত হইল সে সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্য হইতে সত্যকে বাছিয়া লওয়া, নিতান্ত সহজ ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। চীনেম্যানরাই সর্ব্বপ্রথমে চশমার ব্যবহার করিতে শিখে এইরূপ বিশ্বাস লোকের মনে অনেক দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেছিল। কিন্তু কলোম্বিয়া য়ুনিভার্সিটীর অধ্যাপক হার্থ (Hirth) সে বিশ্বাস একবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে চশমার সৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে রোম নগরে হইয়াছিল। তাঁহারা যে যুক্তির বলে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমাদের কাছে তাহা খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাস পাঠে জানা যায় বটে যে, কিছু দেখিতে হইলেই সম্রাট নীরো (Nero) তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে একখানা পান্না (emerald) পাথর ধারণ করিতেন। ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখিবার জন্যই নীরো এইরূপ পাথর ব্যবহার করিতেন। নীরো যে খাটো-দৃষ্টি (শর্ট সাইটেড) ছিলেন ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি একজন দক্ষ রথী ছিলেন। যে ব্যক্তি দূরের জিনিস ভাল

দেখিতে পায় না, তাহার পক্ষে একজন যশস্বী রথী হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। আমাদের মনে হয়, নীরো তীব্র আলোক সহ্য করিতে পারিতেন না, তীব্র আলোকে কিছু দেখিতে হইলে, তাঁহার চোখে জল দেখা দিত—সেই কারণেই সম্ভবতঃ তিনি সবুজ পাথর ব্যবহার করিতেন। নীরোর সময়ে লোকে যে চশমার ব্যবহার জানিত ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না।

অনেকে আবার রজার্ বেকন্‌কে চশমার আবিষ্কারক বলিয়া গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা করেন। রজার্ বেকন্ আলোক ও দৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে চশমারও আবিষ্কারক বলিতে হইবে, ইহার কি অর্থ আছে। Glass sphere বা কাঁচের গোলক যে বর্দ্ধিতায়তন দেখাইবার (ম্যাগ্‌নিফাইং) শক্তি রাখে রজার্ বেকনের পূর্ব্বেও লোকে তাহা না জানিত এমন নহে।

আমাদের মনে হয়, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পৃথিবীর নানা দেশে একই সময়ে চশমার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এ সময়ে ফ্লোরেন্স (Florence) নগরে যে চশমার ব্যবহার ছিল, তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। ফ্লোরেন্সে এক ব্যক্তির সমাধিস্তম্ভে নিম্নের কথা কয়টি লিখিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল:—"এখানে Salvino Armeti নিদ্রা যাইতেছেন, ইনিই সর্ব্বপ্রথমে চশমার আবিষ্কার করেন। ঈশ্বর ইঁহার পাপ ত্রুটি প্রভৃতি মার্জ্জনা করুন। খৃঃ অব্দ ১৩১৭।"

পীজা (Pisa) নগরে ১২৯৯ খৃঃ অব্দে লিখিত একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লেখক বলিতেছেন, নূতন আবিষ্কৃত চশমা ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত শুধু 'চাল্‌শে' দোষ নিবারণ করিবার জন্যই চশমার ব্যবহার হইত। ন্যুব্জ কাচ (Concave glass)—যাহার ব্যবহারে দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়—তখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। র‍্যাফেল্ (Rafael) দশম পোপ্ লিয়োর একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন, ইহাতেই আমাদের সর্ব্বপ্রথমে ন্যুব্জপৃষ্ঠ কাচের সহিত পরিচয় হয়।

প্রথম প্রথম কাঁচের চশমাই ব্যবহৃত হইত, পাথরের চশমার বড় একটা প্রচলন ছিল না। ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত Marano নামক স্থানেই একমাত্র চশমার কারখানা থাকিতে দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কনিগ্‌স্‌বার্গ সহরে এম্বার নামক পদার্থ হইতে চশমা প্রস্তুত হইতে থাকে।

* * *

কাইজার কি পাগল ?—

কাইজারের মনের অবস্থা স্বাভাবিক কি না, এই লইয়া প্রায় সকল দেশেই আজকাল কিছু-না-কিছু আন্দোলন হইতেছে। একজন খুব নাম-করা পণ্ডিত তাঁহাকে একেবারে বিকট উন্মাদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা যে আজ প্রথম উঠিয়াছে, তাহা নহে। বহুদিন আগে কাইজারের আপনার দেশের একজন পণ্ডিত তাঁহাকে ক্যালিগুলার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসের North American Review পত্রে ডাক্তার Melane Hamilton জার্ম্মানীর রাজবংশ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির করেন। এই প্রবন্ধে ডাক্তার হ্যামিল্‌টন্ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে Hohenzollern বংশের কাহাকেও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ বলা যায় না। প্রাচীনকালে এই বংশের প্রায় সকলেই নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারপ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও এই বংশের প্রায় সকল রাজারই একটু-না-একটু মনের বিকৃতি (mental degeneration) থাকিতে দেখা যায়। বর্ত্তমান কাইজারের চরিত্রে এই মানসিক বিকৃতি বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। শৈশবে ইঁহার আচার ব্যবহারাদির মধ্যে সর্ব্বদাই একরূপ অস্বাভাবিকত্ব দৃষ্ট হইত। যৌবনে এই অস্বাভাবিকত্ব এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে, তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ ও সুস্থমনা পুরুষ কোন মতেই বলা যায় না।

গত বৎসরের জুন মাসের পত্রিকায় ডাক্তার হ্যামিল্‌টন্ কাইজার্ সম্বন্ধে আর-একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এবার তিনি কাইজারকে বদ্ধ পাগল বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের প্রতি কাইজারের যে বিদ্বেষ আছে, ডাক্তার হ্যামিল্‌টন্ সেটাকেও সুস্থ মনের কাজ বলিয়া মনে করেন না। আজ জগতের চক্ষে কাইজার যে একটা প্রকাণ্ড অভিশাপের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া ডাক্তার হ্যামিল্‌টন্ বলিয়াছেন—একে ত কাইজারের বিচারশক্তি খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর, তাহার উপর অসম্ভব ক্ষমতাপ্রিয়তার যোগ ঘটায়, অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার এই নিষ্ঠুরতার অভিনয় অধিক দিন চলিবে না। যে-ব্যক্তি একবারেই প্রকৃতস্থ নয়, তাহার পরিচালনায় যে সমর আহুত হইয়াছে, তাহাতে তাহার পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে ?

ডাক্তার Morton Prince (মর্টন্ প্রিন্স) আমেরিকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনস্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত (psychologist)। ইনিও কাইজার সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইনি তাঁহার পুস্তকে কাইজারের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কাইজারের সকল কাজেরই মূলে democracy-বা প্রজাতন্ত্র-বিভীষিকা থাকায়, আজ পৃথিবীর চক্ষে তিনি একজন অদ্বিতীয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রাজতন্ত্রের স্থানে, পাছে প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব হয়, এই ভয়ে তিনি সদাই শঙ্কিত হইয়া আছেন। এই ভয়ে তাঁহার হৃদয় এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, যে, ইহাকে একপ্রকার পাগলামি বলিলে অন্যায় বলা হয় না। Paris Facultyর Dean, অধ্যাপক Landanzy, Academie de Medicineএ একদিন বলিয়াছিলেন—কাইজার একপ্রকার মানসিক ব্যাধিতে ভুগিতেছেন—চিকিৎসাশাস্ত্রে এই ব্যাধিকে mental degeneracy (মানসিক বিকার) কহে। যাহাদের হাতে অসীম ক্ষমতা পড়ে, যাহার ইচ্ছাকে কোন ব্যক্তি কোন আইনের জোরে আঁটিতে পারে না, সাধারণতঃ তাহাদেরই এই রোগ হইয়া থাকে।

কাইজারের মানসিক অবস্থাবিষয়ে ব্রিটিশ মেডিক্যাল্ জার্ণাল্ (British Medical Journal) পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় তাহা অনেকটা পক্ষপাতশূন্য বলিয়া বোধ হয়। ইনি বলেন কাইজার যে পাগল, সে কথা জোর করিয়া বলা যায় না। ইঁহার সম্বন্ধে এত কথাই লিখিত হইয়াছে যে, সেগুলি একত্র করিলে একটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরী হইয়া দাঁড়ায়। সম্পাদক মহাশয় এ-সকল কথার উপর আস্থা রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি বলেন কাইজার সম্বন্ধে বাহিরে যে-সকল কথা শোনা যায়, সেগুলি দুই শ্রেণীর লোকের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। এক—তাঁহার চাটুকারের দল, যাহারা কাইজারকে দ্বিতীয় জগদীশ্বর বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথম শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইঁহারা কাইজার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার মধ্যে একটা বিদ্বেষের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকিতে দেখা যায়। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে কাইজারের চরিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তি একটিও দেখা যায় না। কাইজারের চরিত বিশ্লেষণ করিয়া, তাঁহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে জোর করিয়া কোন কথা বলিবার সুবিধা যে যথেষ্ট উপস্থিত হইয়াছে একথা বলিবার জো নাই।

ইঁহার সম্বন্ধে আমরা এ-কাল পর্য্যন্ত অতি অল্প কথাই জানিতে পারিয়াছি। এবং যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাও যে আবার নিরপেক্ষ ও নির্ভুল সে কথাও বলিতে পারা যায় না। কাইজার সম্বন্ধে আমরা যতখানি জানিয়াছি, তাহা হইতে অবশ্য এরূপ সিদ্ধান্ত অনায়াসে করা যায় যে, সম্পূর্ণ পাগল না হইলেও তিনি যে সাধারণ ব্যক্তির মত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থ তাহা নহে। ক্ষমতার মদে মত্ত হইয়া, তিনি সময়ে সময়ে তাঁহার destructive sword বা মারণাস্ত্র এবং তাঁহারই প্রতি ভগবানের ধ্রুব করুণা ও অনুগ্রহ সম্বন্ধে যে-সকল কথা উচ্চারণ করেন, তাহাতে তাঁহাকে কেহ যদি সম্পূর্ণ সুস্থমনা না বলে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটের যেমন কোন বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না, বর্ত্তমান কাইজার সম্বন্ধে অবশ্য সে কথা বলা যায় না। খুব বেশি বুদ্ধিমান না হইলেও, ভাসা-ভাসা জ্ঞান তাঁহার অনেক বিষয়েই থাকিতে দেখা যায়। এক-একটা লোক থাকে তাহারা যেন "সব-জান্তা" পুরুষ। বর্ত্তমান কাইজারও সেই শ্রেণীর লোক। ইহার জন্য তাঁহার নিজেরই দেশে তিনি এক সময়ে বিশেষ উপহাসের পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শুধু তাহা নহে, চিত্রকর ও ভাস্করদিগের স্বাধীন পরিকল্পনার উপর হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়ায় এক সময় জার্ম্মানীর শিল্পীসমাজের নিকট তিনি বিশেষ বিরাগের পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই-সকল কারণেই যে তাঁহাকে পাগল বলিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই; আসল ব্যাপারটি হইতেছে এইরূপ—অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে যদি অগাধ ক্ষমতা পড়ে, তাহা হইলে অনর্থ না ঘটিয়া যাইতেই পারে না। ক্ষমতা জিনিসটা বড় ভয়ানক জিনিস। খুব বুদ্ধিমান, সদ্বিবেচক ব্যক্তিই অনেক সময় ইহার তাল সহ্য করিতে পারে না, অন্যে পরে কা কথা। যে-ব্যক্তির যাহা-খুসী করিতে পারে, যাহার কাজে বাধা দিবার কেহই নাই, তাহার যে নৈতিক অবনতি ঘটিবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বর্ত্তমান কাইজারের অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়াছে। দুরাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ তাঁহার হৃদয়কে এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, তাঁহার ভালমন্দ দিক্‌বিদিক জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়। আত্মশ্লাঘা ও তাঁহার প্রজাবৃন্দের উত্তেজনাবাক্যে কাইজার নিজেকে প্রায় ঈশ্বরের মত শক্তিমান মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যে তাহা অনেক সময়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পৃথিবীর দুর্ভাগ্য এই যে, একটা সাধারণ লোকের বুদ্ধির বিকৃতি ঘটিলে, লোকে তাহাকে পাগল বলে এবং হাতে পায়ে বেড়ী পরাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু রাজার পাগলামি যখন লক্ষ লক্ষ লোকেরও প্রাণ নাশের কারণ হয়, তখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পাগল বলিবার জো নাই এবং সমাজে এমন এক ব্যক্তিও নাই, যিনি তাহাকে ঠিক পাগলের মত হাত পা বাঁধিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন।

* * *

Hohenzollerns বা জার্ম্মানীর রাজবংশের কথা—

জার্ম্মানীর রাজবংশকে হোহেনজোলার্ন্‌স্ (Hohenzollerns) বলে। ফ্রেডরিক্ উইলিয়াম এই বংশের স্থাপনকর্ত্তা। ইনি ১৬৪০ হইতে ১৬৮৮ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ফ্রেডরিক্ উইলিয়াম নামের সঙ্গে কতকগুলা ভুয়া রাজকীয় উপাধি সংযোগ করিতে ভাল বাসিতেন। Edict of Nantesএর revocation বা খারিজ করার সময়ে প্রায় ১০ হাজার ফরাশী জার্ম্মানীতে গিয়া বাস করে। ইহার পূর্ব্বে জার্ম্মানরাজ্য একটা অনুর্ব্বর মরুভূমি এবং ইহার অধিবাসীরা এক-প্রকার অর্দ্ধসভ্য জাতি ছিল মাত্র। এই ফরাশীরাই জার্ম্মানদের সভ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহাঁদের আগমনের পূর্ব্বে জার্ম্মানীতে শিল্পকলা, কলকারখানা প্রভৃতি ছিল না—ইহারাই সে সকলের প্রতিষ্ঠা করেন। জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ উন্নতি ও পরিণতির মূল কারণ যে এই-সকল ফরাশী, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই।

ফ্রেডেরিক্ উইলিয়াম্ ৬৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র ফ্রেডারিক্ King of Prussia নাম গ্রহণ করিয়া, সিংহাসনে আরোহন করেন। অভিষেককালে, কোন একটি ধর্ম্মযাজক রাজার শিরে মুকুট পরাইয়া দিবেন, ইয়ুরোপের এইরূপ সনাতন প্রথা। ফ্রেডারিক্ সে প্রথা না মানিয়া স্বহস্তে মুকুট পরিয়া আপনাকে প্রুশিয়ার অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইনি জাঁকজমক ও আড়ম্বর বড় ভাল বাসিতেন। রাজার পদ ও মর্য্যাদার উপযোগী বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই, তাঁহার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একমাত্র কাজ ছিল। ইহাঁকে দেখিলে মনে হইত, ইনি যেন কোন নাটকের রাজার ভূমিকার অভিনয় করিয়া যাইতেছেন। কথিত আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার কবর-যাত্রার জাঁকজমকটা তিনি নিজের চক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার পর প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম্ সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। কার্লাইল ও মেকলের লেখনী ইহাঁকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইহার মত নিষ্ঠুর রাজা বড় একটা দেখা যায় না। প্রজা ও পরিবারবর্গ, সকলেই ইহার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে, ইনি এক সময় নিজহস্তে পুত্রের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় কৃপণ স্বভাবের লোক ছিলেন। কিন্তু এক বিষয়ে ইহাঁকে মুক্তহস্ত হইতে দেখা যায়। দীর্ঘকায় ব্যক্তির সন্ধান পাইলেই, ইনি বহু অর্থ ব্যয়ে তাহাকে হস্তগত করিয়া, নিজের সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করিতেন এবং দীর্ঘকায়া রমণীর সহিত জোর করিয়া হইলেও বিবাহ দিয়া দিতেন। এরূপ বিবাহের ফল যে ভাল হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বয়স বৃদ্ধির সহিত ইহার বর্ব্বর প্রকৃতিটা বিকট উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। এ সময় তাঁহার দেহে মৃগী রোগের সঞ্চার হইয়াছিল এবং উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ইহার পাগলামির মধ্যে কোন একটা method (ধারা) থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

ইহার মৃত্যুর পর Frederick The Great (ফ্রেডারিক্ দী গ্রেট) রাজা হয়েন। ইহার বুদ্ধি খুবই সূতীক্ষ্ণ ছিল। কিন্তু ইহার নৈতিক আদর্শ খুব উচ্চদরের ছিল না। প্রুশিয়ায় উন্নতিকল্পে ইনি বিস্তর করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে-সব ন্যায় ও সত্য পথে থাকিয়া নয়, শঠতা ও এক-প্রকার দস্যুতা অবলম্বন করিয়া বলিলেও হয়। ইহার কথার কোনও স্থিরতা ছিল না—সন্ধিপত্রের সর্ত্ত রক্ষা করা তাঁহার নিকট নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজার যাহা-ইচ্ছা করিতে থাকিবে, তাঁহার কাজে হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই—ফ্রেডারিক দী গ্রেট এই নীতি মানিয়া চলিতেন। ইহার কার্য্যকলাপ দেখিলে, ইহাঁকে পরস্বাপহরণ-কারী একজন সাধারণ দস্যু ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। ইনি যদিচ তাঁহার বাপের মত বদ্ধপাগল ছিলেন না বটে, তথাপি, পিতার দোষ যে তাঁহার চরিত্রে একবারেই বর্ত্তায় নাই, সেকথা বলা যায় না। পিতার নিষ্ঠুরতা তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবেই বিদ্যমান ছিল, তবে বুদ্ধির প্রাচুর্য্য বশতঃ তাহা স্পষ্ট ধরা পড়িত না। আশ্চর্য্য এই যে অন্যদিকে এত নিষ্ঠুর হইলেও কুকুরের প্রতি তাঁহার দয়া অসীম ছিল। কুকুর ছাড়া তিনি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেন না। মানুষের প্রতি তাঁহার এতদূর বিরক্তি ও অবজ্ঞা ছিল

যে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে যে উইল্ করেন, তাহাতে এই কথা লেখা ছিল যে, মৃত্যুর পর তাঁহাকে মানুষের সমাধিক্ষেত্রে কবর না দিয়া যেন কুকুরের সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত করা হয়। লোকটির দুই একটা খুব বড় গুণও যে না ছিল এমন নয়। রাজকার্য্যে তাঁহার কখনও অবহেলা বা ঔদাস্য ছিল না, রাজ্যের প্রত্যেক শাখা প্রশাখা তিনি স্বয়ং পরিচালিত করিতেন। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাঁহার একবারে অভ্যাস ছিল না। কার্য্যের পর তাঁহার যে সামান্য একটু অবসর থাকিত, সেটুকুও কখনও বৃথায় যাইতে দিতেন না—হয় কবিতা, নয় অন্য কিছু লিখিয়া অতিবাহিত করিতেন। নিজের মনকে তিনি সর্ব্বদাই কিছুতে-না-কিছুতে ব্যাপৃত রাখিতেন, কখনও স্বাধীন হইবার অবসর দিতেন না। তাঁহার melancholia (বিষাদ) রোগ ছিল। মনকে একটু স্বাধীন হইতে দিলেই তাহা দেখা দিত। তিনি বলিতেন মনকে কাজ কর্ম্মে, কিম্বা লেখাপড়ায় নিযুক্ত না রাখিতে পারিলে তাঁহার পক্ষে মদ খাওয়া ভিন্ন আর কোন গতি নাই।

ফ্রেডারিক্ দী গ্রেটের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রেডারিক্ উইলিয়াম্ রাজা হয়েন। ইঁহার হৃদয় কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল। ইঁহার রাজত্বকালে জার্ম্মানীতে Illuminati, Freemasons, এবং Mystics প্রভৃতির অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। রাজা ও পুরোহিতের কবল হইতে জার্ম্মানীকে কি করিয়া রক্ষা করা যায়, ইঁহাদের গুপ্ত সভায় দিন রাত তাহারই ষড়যন্ত্র চলিত। ইঁহার পর তৃতীয় ফ্রেডারিক্ উইলিয়াম সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি খুবই সাদাসিদে ধরণের লোক ছিলেন। ইঁহার তেমন মনের বল ছিল না। ইঁহার মহিষী রাণী লুইজা পরম রূপবতী ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা (influenza) রোগে তৃতীয় উইলিয়াম্ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার পর চতুর্থ উইলিয়াম রাজা হয়েন। চতুর্থ উইলিয়াম অতিশয় স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। রাজকার্য্যে প্রজাদের যাহাতে কোন রকম হাত না থাকিতে পারে, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে জার্ম্মানীতে যে-সকল অশান্তি উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

* * *

মানবের নূতন-ভীতি:—

গীতাকার একটা আশার কথা বড় জোরের সহিত বলিয়াছেন "নাত্মানমবসাদয়েৎ" আত্মাকে কখনই অবসন্ন করিবে না উপরে উঠাও। সমাজের জীর্ণ অবস্থায় মানুষ আত্মার এই উর্দ্ধাভিমুখী মহতী শক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে সাহস পায় না। সাধনায় বলে, যোগলব্ধ ব্রহ্মতেজের প্রভাবে যে মানুষের ভিতরে অতীন্দ্রিয় শক্তি জাগ্রত হইয়া তাহাকে অসাধারণ ব্রত উদ্‌যাপনে সক্ষম করিয়া তুলে ইহা সে ভুলিয়া যায়। এইরূপে উর্ণনাভের মত আপন শক্তির একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডি কল্পনা করিয়া নিজেকে তাহার ভিতর গুটাইয়া আনিয়া মানুষ নিজেই নিজের রিপু হইয়া দাঁড়ায়। সমাজের ঈদৃশ অবস্থায় যাঁহারা দেবদূতরূপে জ্ঞানের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া মানব-সমাজকে সত্যের সুদৃঢ় পথে চালিত করিবার জন্য আবির্ভূত হন, অনান্ধ মানব হয় তাহাকে সরাসরি ঈশ্বর বানাইয়া বসে, না হয় ভূত পিশাচ আদির শক্তিতে শক্তিমান বলিয়া আত্ম-সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। মহাপুরুষেরা যে-সমাজে জন্মগ্রহণ করেন সেই সমাজের লোকের বুদ্ধি-বৃত্তি যে-পর্য্যন্ত না অজ্ঞতার কুহক আবরণ এড়াইয়া তদীয় সত্যের মর্ম্ম-গ্রহ করিবার উপযুক্ত হয় সে-পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সমাজে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত এবং হাস্যাস্পদই হইতে হয়। গ্যালিলীও এবং হার্ভির আবির্ভাবের পূর্ব্বে মানুষ পৃথিবীর গতিরাহিত্যে এবং রক্তের স্থিরতায় বিশ্বাস করিত। দশের রাগে সায় দিয়া এই দুইটি অন্ধ বিশ্বাস মানিয়া লইতে পারেন নাই বলিয়াই প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ভূগর্ভস্থ কারাগারে বন্দী অবস্থায় দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে আজীবন মানব-সমাজের বিদ্রূপভাজন হইতে হইয়াছিল। সক্রেটিসের প্রজ্ঞা এবং ধর্ম্মজীবনের পুরস্কার হইয়াছিল প্রাণদণ্ড। আনাক্সাগোরাস্ ভগবানের সত্যসন্ধান নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়া আজীবন বন্দী ছিলেন। আরিষ্টটল বহুকাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণা সহিয়া পরিশেষে বিষপান করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। হেরাক্লিটাস তাঁহার দেশবাসীগণ কর্ত্তৃক অশেষরূপে উগ্র অভিনন্দনে অভ্যর্থিত হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। খ্যাতনামা জ্যামিতিবিদ এবং রাসায়ন-পণ্ডিত গার্বার্ট ও রজার বেকন যাদুকর বলিয়া মানব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা নাকি পিশাচসিদ্ধি করিয়াছিলেন এবং এমন কি ভূতপ্রেতের সহিত নাকি ইঁহাদের আলাপ ব্যবহারও ছিল। সল্টজ্‌বার্গের (Saltzburg) বিশপ ভারজিলিয়াস্ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠবাসী জীবসত্তার সন্ধান দিয়াছিলেন, এই অপরাধে মেণ্টজের (Mentz) পাদরী-সর্দ্দার তাঁহাকে অপধর্ম্মী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং উক্ত গুরু পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে তাঁহাকে আগুনের দ্বারা দগ্ধ করিয়া তদীয় আত্মার উর্দ্ধগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। ব্রুনোকে আগুন দিয়া পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল।

গ্যাব্রিয়েল নড জগতে যাদুকর বলিয়া অভিযুক্ত, দণ্ডিত, লাঞ্ছিত হইয়া মহাপুরুষদিগের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে যাইয়া যে মর্ম্মস্পর্শী অধ্যায় বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে শত শত প্রাজ্ঞের তর্পণ করা হইয়াছে। কয়েকটি দার্শনিক অভিজ্ঞতা হাতে-কলমে বুঝাইয়া দিতে যাইয়া কর্ণেলিয়াস অগ্রিপ্পাকে কত না কঠোর যন্ত্রণা পাইতে হইয়াছিল। অত্যাচারের চোট সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি ভিটামাটি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার একটি অমার্জ্জনীয় গুরুতর অপরাধ ছিল, তিনি আগনিস্ দেবীর তিন স্বামী ছিল এই প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে দেখিলে নাক সিঁটকাইয়া সরিয়া যাইত। তিনি কোন স্থানে দিনেকের তরে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। প্রায়ই দেখা যাইত তিনি যে রাস্তায় পা দিয়াছেন তাহা একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। লোকের মনে মহাভয়, 'কলঙ্ক পরশে পাছে পরশি অঙ্গার!' প্রাচীন যুগে সাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির একটু উপরেই ভূতের সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য ছিল। কেহ কোন বিষয়ে একটু অসাধারণ হইলেই তাহার সহিত যে ভূতের পরিচয় আছে ইহা প্রতিপন্ন হইত। এগ্রিপার একটা কালো কুকুর ছিল; লোকে সেটাকে ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিত। উরবান গ্রাণ্ডিয়ারও উপরি-উক্ত অপরাধীদিগের একজন। লোকে মহা হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া তাঁহাকে শূল দিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাঁহার মাথার উপরে একটা মাছি উড়িয়া আসিয়া পড়িল; ইহাতে একজন পাদরী ঠাওরাইয়া ফেলিলেন লোকটি বাস্তবিকই অপরাধী—ভূত মাছি হইয়া আসিয়া তাহার উপর অধিষ্ঠান করিল। তাল-বেতালের রাজত্ব আর কি! বেতাল মাছি হইয়া নাকি ভানুমতীর গালে বসিয়া বিক্রমাদিত্যকে সনাক্তের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল! ফরাসী মন্ত্রী Langear চার-চক্ষু ছিলেন, এজন্য অনেকে তাঁহাকে পিশাচসিদ্ধ মনে করিত। তিনি মন্ত্রতন্ত্রের বলে অনেক হোমরা-চোমরা ভূত-প্রেতকে খাটাইয়া লইতে পারিতেন। কার্ডানকে লোকে যাদুকর মনে করিত। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, তিনি এক প্রবীণ প্রকৃতিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছিলেন। যাঁহারা প্রকৃতির মর্ম্মের খবর রাখিতেন সেকালে তাঁহাদিগের অনেককেই লোকে যাদুকর

ঠাওরাইত। আলবার্ট নামক একজন বৈজ্ঞানিক একটি কল তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহা হইতে অবিকল মনুষ্যের কণ্ঠস্বরের ন্যায় আওয়াজ বাহির হইত। ইহা লোকের এরূপ ভয়ের কারণ হইয়াছিল যে তাহা লাঠি দিয়া গুঁড়া করিয়া তবে তাহারা সোয়াস্তি পাইল। রোমের প্রথম পোয়েট লরিয়েট পেত্রার্ক। পুরোহিত মহাশয়েরা তাঁহাকে ভূতসিদ্ধ বলিয়া যত্রতত্র খোঁচাইয়া অস্থির করিতেন। তদানীন্তন রোমীয় সাধারণের বিশ্বাস ছিল, ভূতপিশাচ হাতে না থাকিলে মানুষের ছড় বাঁধিবার শক্তি হয় না। দেকার্টকে হল্যাণ্ডে ভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উট্রেক্ট সহরের একটা গোঁড়া তাঁহাকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার নামে এক নালিশ চড়াইল। দণ্ডের ব্যবস্থাও তাহার মনে জাগিয়াছিল বড় চমৎকার ধরণের। সহরের কোন একটা উঁচু ইমারতের উপর এমন একটা প্রকাণ্ড আগুন করিতে হইবে যে সাতটি প্রদেশ হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে অপরাধীকে পোড়াইয়া মারিতে হইবে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ-পর্য্যন্ত য়ুরোপে এই অগ্নি-পরীক্ষার ধুম পুরাদমে চলিয়াছিল।

কিন্তু যিনি প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা, তাঁহার কাছে নিন্দাস্তুতি তুল্য। তাঁহার ব্রাহ্মীস্থিতি হাওয়ায় উড়িবার নহে। জাগতিক বাহ্য সুখ-বিপর্য্যয়ে তিনি নিতান্ত নিরপেক্ষ। তিনি অন্তর্জ্যোতি, অন্তরেই তাঁহার আরাম। জগত আজ তাঁহাকে স্বীয় অজ্ঞনতাবশতঃ প্রতিপদে আগুনে পোড়াইয়া বা গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে পারে কিন্তু কাল সেই তাঁহার দোহাই দিয়া মাথা নোয়াইয়া বলিবে তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

যুদ্ধে ছদ্মবেশ—

জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণীজগতে প্রকৃতিদত্ত ছদ্মবেশধারণের বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রাণী নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থানের মধ্যে আত্মগোপনের সুবিধার জন্য দেহে আবেষ্টন-দৃশ্যের অনুরূপ চিত্রবিচিত্র দাগ ডোরা বুটি প্রভৃতি ফুটাইয়া তুলে। ইহা আমরা বাঘ সিংহ জেব্রা জিরাফ খরগোষ প্রভৃতি বহু জন্তুর ও প্রজাপতি প্রভৃতি কীটপতঙ্গের অঙ্গচিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারি। কতকগুলি প্রাণী স্বভাবত নিরীহ হইলেও শত্রুকে ঠকাইয়া ভয় লাগাইয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য হিংস্র-প্রকৃতির বলবান অপর প্রাণীর রূপের অনুকরণ করে—যেমন, অনেক মাকড়সা পিঁপড়ের, অনেক পতঙ্গ বোলতা ভীমরুলের, অনেক ব্যাং টিকটিকি কাঁকড়া-বিছের অনুকরণ করে। অনেক প্রাণী নিজেদের দেহে একপ্রকার দুর্গন্ধ বা তিক্তরস সঞ্চয় করিয়া শত্রুর গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করে। সরীসৃপ পতঙ্গ ইত্যাদির বিষদাঁত বা হুল এই আত্মরক্ষারই অস্ত্র মাত্র। আবার অনেক প্রাণী কাঠি পাথর নুড়ি প্রভৃতি অচেতন পদার্থের রূপ ধরিয়া হয় আপনাদিগকে শত্রুর দৃষ্টি হইতে বাঁচায় অথবা নিজেদের শিকার খাদ্য প্রাণীদের ধোকা দিয়া নিজেদের আক্রমণ করিবার গণ্ডির মধ্যে ভুলাইয়া আনে।

মানুষের সংগ্রামেও এইরূপ বহু ছদ্মবেশের কৌশলে শত্রুকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। সৈন্যের পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্রের রং পারিপার্শ্বিক অবস্থানের সঙ্গে এমন মিলাইয়া করা হয় যেন নিকট হইতেও খুব জোরালো দূরবীনেও তাহাদের অস্তিত্ব সহজে ধরা না পড়ে; সৈন্যের পোষাকের খাকী রং দূর হইতে মাটি ঘাস গাছপালার সঙ্গে এমন একসা হইয়া যায় যে সৈন্যের অবস্থান পৃথক করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। বরফের সময় সমস্ত জমি শাদায় শাদা হইয়া যায়; সে সময় রুষ সৈন্যেরা শাদা পোষাক পরিয়া জার্ম্মান শত্রুদের দৃষ্টি এড়াইয়াছে।

যুদ্ধ-জাহাজগুলি সমুদ্র ও পশ্চাৎদৃশ্য আকাশের রঙের সঙ্গে মিল করিয়া রং করা হয়। জার্ম্মান বহর নর্থ-সীতে থাকে; নর্থ-সীর জলের রং ধূসর; এজন্য জার্ম্মান রণতরীর রং ফিকে ধূসর। ইংলণ্ডও রুষ বহরের রং গাঢ় ধূসর। টর্পেডোবোট রাত্রে চলে বলিয়া তাহার রং করা হয় অন্ধকারের মতো কালো। রুষিয়ার টর্পেডোবোট ও অন্তর্জ্জলী জাহাজের রং গাঢ় সবুজ, রুষিয়ার যে বহর ব্ল্যাক সী বা কৃষ্ণসাগরে থাকে তাহার জাহাজের রং ফিকে ধূসর, টর্পেডোবোট কৃষ্ণ-ধূসর, অন্তর্জ্জলী জাহাজ ফিকে ধূসর-সবুজ। ফ্রান্সের রণতরীর কার্য্যক্ষেত্র অতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে, এজন্য তাহার রং বহুবিস্তারী সাগরজলের ন্যায় নীলাভ ধূসর, টর্পেডো-বোট কৃষ্ণধূসর, অন্তর্জ্জলী জাহাজ গাঢ় সবুজ (বোতলের রং)—পরিষ্কার দিনে মাঝ সমুদ্রের জলের ঐ রকম রংই চোখে লাগে। গ্রীষ্মমণ্ডলে আকাশ প্রায়ই মেঘমুক্ত ও বাষ্প-কোয়াসা-শূন্য থাকে, এজন্য সমুদ্রের জল স্বচ্ছ মনে হয়; সেজন্য গ্রীষ্মমণ্ডলের বহরের জাহাজগুলি উজ্জ্বল শুভ্র রঙে রং করা হয়, টর্পেডো-বোটগুলিও কালো করা হয় না, হয় ফিকে ধূসর নয় ত শাদা রং করা হয়—ইহাই গ্রীষ্মমণ্ডলের রাত্রির রং।

ডাঙার যুদ্ধসরঞ্জামেও এই রীতিতে রং নির্ব্বাচন করা হয়। সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থানের রং যেমন সেখানকার পণ্টুন পুল, যানবাহন, মাল গাড়ী প্রভৃতির রং তেমনি মিলাইয়া করা হয়।

আজকাল আবার এক উৎপাত জুটিয়াছে উড়ন-জাহাজ—সে উপরে উড়িয়া অনেক জিনিসের গোপনতা ফাঁস করিয়া দ্যায়। তাহার চোখে ধুলা দিবার জন্য কামানগুলিকে মাটিতে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া গর্ত্তের উপর তক্তা ঢাকা দিয়া মাটি ঢাকা দিয়া তাহার উপর ঘাসের চাপড়া ঝোপ ঝাড় গাছ পালা লাগাইয়া দেওয়া হয়, উপর হইতে দেখিয়া আর কামানের অস্তিত্ব ধরিবার জো-টি থাকে না। কামানের মুখের ফাঁদলও উপর হইতে ধরা পড়ে না, সামনে হইতেও খুব নিকটে না আসিলে টের

বরফাচ্ছন্ন দেশে শাদা-উর্দ্দি-পরা সৈন্যকে দূর হইতে বরফের চাঁই বলিয়াই শত্রুর ভ্রম হয়।

পাওয়া যায় না। যদি কোনো গ্রামের মধ্যে কামান পাতা হয় তবে কামান ঢাকা তক্তার পাটাতনের উপর পোড়ো বাড়ার অনুকরণ করা হয়। জঙ্গলের কাছে বড় বড় গাছের ডাল কাটিয়া জঙ্গল তৈরি করিয়া তাহার আড়ালে কামান ও গোলন্দাজ লুকানো হয়।

উড়ন-জাহাজ উপরে উঠিয়া শত্রুর অন্ধিসন্ধি সন্ধান করে যেমন

উড়ন-জাহাজের শ্যেন-দৃষ্টিকে ফাঁকি দিবার ব্যবস্থা।

তেমনি শত্রুর অভ্রভেদী কামান আবার উড়ন জাহাজ দেখিলেই গোলা ফুঁকে। সেজন্য উড়ন-জাহাজেরও আত্মগোপন করা দরকার হয়। উড়ন জাহাজে মেঘলা আকাশের মতন রং লাগাইয়া তাহাকে ছদ্মবেশ দিবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু শীতপ্রধান দেশের আকাশ সদাপরিবর্ত্তনশীল, এজন্য একটা রং মাখিয়া উড়ন-জাহাজ সর্ব্বদা আত্মগোপন করিতে সক্ষম হয় না, এই অসুবিধা প্রতিকারের জন্য স্বচ্ছ কাচের আবরণ দিয়া তাহাকে অদৃশ্য করিবার চেষ্টা হয়; যে পদার্থ কোনো আলোকরশ্মি প্রতিফলিত, পরাবর্ত্তিত বা প্রতিহত না করে তাহাই স্বচ্ছ অর্থাৎ তাহা অরূপ, তাহা চোখে দেখা যায় না। জার্ম্মানেরা ত অদৃশ্য উড়ন জাহাজ তৈয়ারী করিয়াছে।

গাছের ডাল কাটিয়া তাহার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া যুদ্ধ করা পুরাতন ফন্দি, শেক্‌স্‌পীয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে ইহার ব্যবহার উল্লিখিত আছে। আধুনিক যুদ্ধে মালগাড়ী রসদবহা গাড়ী প্রভৃতি লুকাইবার জন্য এই ফন্দি অবলম্বন করা হইতেছে। পাতা-ওয়ালা ডাল মুড়ি দিয়া গাড়ীগুলি চলিতে থাকে; উড়ন-জাহাজের ভনভনানি শুনিবামাত্র সমস্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, উড়ন-জাহাজ উপর হইতে শুধু সারবন্দি ঝোপ ঝাড় দেখিয়াই ঠকিয়া যায়। বেড়া, খড়ের পুলুই, ফসলের ক্ষেত প্রভৃতি নকল করিয়া তাহার আড়ালে কামান পথার জোল ঘাঁটী প্রভৃতি কত কি যুদ্ধ-আয়োজন করা হয়।

ফসলের ক্ষেতে, তরকারীর ক্ষেতে, ফলের বাগানে নকল মানুষ খাড়া করিয়া চাষার ও মালীরা পাখী বাদুড় বাঁদর প্রভৃতিকে ধোকা দিয়া ভয় পাওয়াইয়া ভাগায়। বাঁশ খড় দিয়া হাত পা ছড়ানো একটা খাড়া করিয়া মনুষ্যাকৃতি গড়িয়া তাহার গায়ে একটা ছেঁড়া জামা ও মাথায় একটা পাগড়ী দিয়া মূর্ত্তিটাকে ভয়ানক করিতে চেষ্টা করা হয়। নির্ব্বোধ পশুপক্ষীরা উহাকে ক্ষেতের পাহারাদার মনে করিয়া প্রতারিত হয়। যুদ্ধের সময়ও যাহা ভয়ের নয় তাহাকে ভয়ঙ্কর আকার দিয়া যেখানে বিপদ নাই সেখানে বিপদের আশঙ্কা জন্মাইয়া শত্রুকে প্রতারণা করা হয়। গাছ পাথরের মাথায় সেনার টুপি বসাইয়া ধোকা দিয়া শত্রুকে ভুল পথে চালন করা, সেই মিথ্যা সৈন্যের উপর গুলি গোলা দাগিতে বাধ্য করিয়া শত্রুর অনর্থক ক্ষতি করা প্রভৃতি এই ফন্দির উদ্দেশ্য। বাঁশকাটা কাস্তে কাত করিয়া উচু করিয়া পুঁতিয়া রাখিলে দূর হইতে কামান বলিয়া ভ্রম হয়; জার্ম্মানেরা এই ফন্দিতে ফরাসীর ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল। মাটির নল সারি সারি কাঠের গুঁড়ির উপর এড়ো বাগে সাজাইয়া কামানের সারি বলিয়া শত্রুর ভ্রম জন্মানো হয়; মাঝে মাঝে এক-একটা কোটের উপর টুপি চড়াইয়া গোলন্দাজ বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করা হয়।

আক্রমণের সময় কখনো কখনো সেনারা সঙ্গিনের উপর টুপি ও কোট বসাইয়া উঁচু করিয়া ধরিয়া শত্রুর ধোকা লাগাইয়া দেয়; শত্রুর গোলন্দাজেরা মনে করে উঁচু জায়গার উপর দিয়া খুব লম্বা লম্বা অতিকায় সৈন্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে; তাহারা টুপির বরাবর তাগ করিয়া গোলাগুলি ছুড়ে এবং সেসব সেনাদের মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায়, কেহ জখম হয় না।

রুষীয়রা জার্ম্মানীর ঘাটী কোথায় আছে ঠিক করিবার জন্য নদীতে একটা ভেলায় করিয়া খড়ে-তৈরি নকল গোলন্দাজ ও মাটির নলে গড়া কামান প্রভৃতি ভাসাইয়া স্রোতে ছাড়িয়া দিয়াছিল; উদ্দেশ্য ছিল যে জার্ম্মানেরা উহা দেখিয়া মনে করিবে

ঘাস খড় শস্য-গাছ মুড়ি দিয়া সৈন্যের আত্মগোপন।

শত্রু নদী পার হইতেছে এবং উহার উপর গুলি বর্ষণ করিয়া নিজেদের গোপন আড্ডা ফাঁস করিয়া ফেলিবে।

আর এক প্রকারের ছদ্মবেশ ব্যবহৃত হয় যাহাতে শত্রুকে মিত্র বলিয়া ভ্রম জন্মে। জার্ম্মানীর প্রসিদ্ধ বোম্বেটে যুদ্ধ-জাহাজ এমডেন একটা নকল চোঙ পরিয়া চার চোঙা-ওয়ালা রুষ জাহাজের রূপ ধরে, এবং স্বচ্ছন্দে অসন্দিগ্ধ রুষ জাহাজের গা ঘেঁসিয়া গিয়া তাহাকে টর্পেডো মারে। এমনি মিত্রবেশে শত্রুতা সাধনে যেমন সুবিধা তেমনি বিপদেরও সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে।

যুদ্ধে ছদ্ম আচরণ শুধু দৃশ্য ব্যাপারেই আবদ্ধ নয়। তুরী ভেরীর সঙ্কেত বা প্রশ্ন করার কায়দা অনুকরণ করিয়া অনেক সময় শত্রুকে বিপদে ফেলা হয়। সম্প্রতি একদল জার্ম্মান সৈন্যের ঘাটী-আগলদার রুষ সৈন্যের অবস্থান সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। একটা জঙ্গলের কাছে আসিতেই হঠাৎ জার্ম্মান ভাষায় প্রশ্ন হইল—হাল্ট! ভেরার ডা? —খাড়! কে যায়?—কোনোরূপ সন্দেহ মাত্র না করিয়া জার্ম্মান সৈন্যেরা আপনাদের পরিচয় দিল; কিন্তু বেচারারা ত অবাক—যাইবার অনুমতির বদলে চড়্‌চড়্‌ করিয়া গুলিবর্ষণ হইতে লাগিল, রুষ সৈন্য
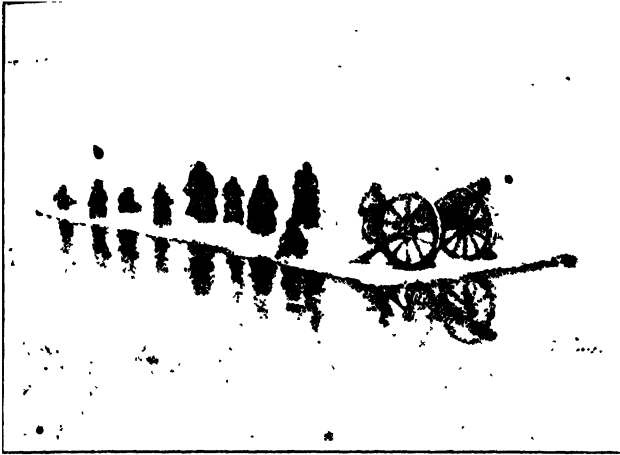
ভেলার উপর নকল কামান ও পুতুল সৈন্য ভাসাইয় শত্রুর গোপন আড্ডা হইতে গোলাবর্ষণ করাইয়া তাহাদিগকে ঠকাইবার ফন্দি।

শত্রুকে আক্রমণের সময় জামা-টুপি সঙ্গিনে চড়াইয়া শত্রুর গোলন্দাজের লক্ষ্য ব্যর্থ করিবার ফন্দি।

জার্ম্মানদের বলসংখ্যা ও অবস্থান জানিয়া লইবার ফন্দিতে শত্রুর ভাষায় প্রশ্ন করিয়া শত্রুকে ঠকাইয়াছিল।

১৮৭০-৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধে এক সেনাপতি একজন ফরাসী তূরী-বাদককে যুদ্ধে গ্রেপ্তার করেন, কিন্তু অন্যান্য সেনারা পলাইয়া যায়। তখন সেই সেনাপতি তূরীবাদককে সৈন্য জড়ো করিবার সঙ্কেত বাজাইতে বাধ্য করেন। সেই আহ্বান শুনিয়া বন্ধুর আহ্বান বলিয়া ভ্রম করিয়া পলাতক ফরাসী সেনারা আবার ফিরিয়া আসে এবং অতি সত্বরই জার্ম্মানদের প্রতারণা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারে।

চারু।

মনের বিষ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সময় উড়িয়া চলিয়াছে। আমার তাম্রলিপ্তিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর একমাস তিন সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যেই আমি তাম্রলিপ্তিতে, সুবিখ্যাত হইয়াছি, বিখ্যাত, কেন না আমি অদ্বিতীয় ধনী, আমার গৃহ রাজপ্রাসাদ তুল্য, আসবাবগুলি মূল্যবান, আমার ভৃত্য অনুগৃহীত অগণিত, গাড়ীঘোড়া নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আমার সুখভ্রমণোপযোগী তরণীখানি সুরম্য, সুসজ্জিত;—অন্যের বিলাসস্পৃহা পরিতৃপ্তির জন্য আমি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। সত্যই, সমাজে বিখ্যাত হইতে হইলে ব্যক্তিগত গুণের আবশ্যক নাই; ঐশ্বর্য্য থাকিলেই যথেষ্ট;—তুমি যতই হেয় হীনস্বভাব হওনা কেন, ক্ষতি বৃদ্ধি কি? যত বেশী আমোদ-উৎসবের আয়োজন করিতে পারিবে, অন্তঃসার-শূন্য, নামসর্ব্বস্ব আভিজাত্য-বুভুক্ষু সম্প্রদায়ের ক্ষুধা যে-পরিমাণে নিবৃত্তি করিতে পারিবে, তোমার যশ সম্মান ততই। আমি তাহাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখি নাই; আমার প্রশংসা, সুতরাং সুবৃহৎ ধনীর গৃহ হইতে দরিদ্রের ক্ষুদ্র কুটির পর্য্যন্ত, ধ্বনিত না হইবে কেন। তাম্রলিপ্তির অনেকেই আমার অনুগ্রহপ্রার্থী; ধনীসম্প্রদায় আমার নিত্য অতিথি, আমিও তাঁহাদের গৃহে কারণে অকারণে নিমন্ত্রিত,—যদিও অনেকস্থলেই আমাকে বিনয়বাক্যে তাঁহাদের অযাচিত অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে; বিবাহের উপযুক্তা কুমারীকন্যাগণের মাতাদের স্নেহ আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্যক্ত করিয়াছে;—কথায় কথায় তাহাদের কন্যার প্রশংসা, সুন্দরীগণের সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিবার পালা। বৃদ্ধের সহিত মেয়েগুলার নির্লজ্জ হাবভাব আরও বিস্ময়কর! আমার ঐশ্বর্য্য-অঞ্জনে তাহাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়াছে; আমার যুবোচিত বদনখানিতেই কেবল তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে, শুভ্রকেশ চাহারা দেখিয়াও দেখে নাই; দেখিলেও ঐশ্বর্য্যের

প্রভাবে আমার সৌন্দর্য্যেরই অঙ্গ বলিয়া মনে হইয়াছে।

তাহাদের নির্লজ্জতায় অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক হইলেও, বাহ্যিক ব্যবহারে আমি তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করি নাই। সমাজের পতন এতদূর হইয়াছে দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ঔৎসুক্য জাগ্রত হইয়াছে। আমার সংকল্পসিদ্ধিকল্পে এরূপ স্তাবকদলের আবশ্যক ছিল। আমি তাহাদের প্রীতির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নিত্য নূতন নূতন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিতাম। বলা বাহুল্য, আমার স্ত্রী ও গোবিন্দ আমার নিমন্ত্রিতের মধ্যে প্রধান ছিল। নীলা, প্রথমে তাহার শোক অশৌচের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে আমোদ উৎসবে যোগদান করিতে আপত্তি করিয়াছিল। আমি যখন বৃদ্ধজনোচিত গম্ভীর স্বরে তাহাকে বুঝাইয়াছিলাম, সমাজের কঠোর রীতি অনুসারে শোককাল অবশ্য পালনীয় হইলেও লোকের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিটা সর্ব্বাগ্রে দেওয়া উচিত, তাহার মত সুন্দরী যদি সকল-প্রকার আমোদ প্রমোদ হইতে নিজকে বঞ্চিতা করিয়া মনের স্ফূর্ত্তি একবারে নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা হইলে স্বাস্থ্য-ভঙ্গের আশঙ্কা আছে, বিশেষতঃ আমার গৃহ তাহার পরের নহে, সেখানে গেলে কেহই তাহাকে নিন্দা করিতে সাহসী হইবে না, বরং এমন শোকসময়েও পুরাতন বন্ধুকে অনুগৃহীত করা হইয়াছে বলিয়া লোকে তাহাকে প্রশংসাই করিবে, তখন সে অতি সহজেই সম্মত হইয়াছিল। নীলাও আমাকে সম্মানিত করিবার জন্যই যেন আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিল—বিধিমতে এইরূপ ভাবই প্রকাশ করিয়াছিল; অন্যান্য আগন্তুকদিগকেও সে বুঝাইত—আমার স্ত্রীশূন্য গৃহে অগত্যা তাহাকে গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃও গৃহস্থালি ব্যাপারে নীলাকে আমি যেরূপ স্বাধীনতা দান করিয়াছিলাম, আমার গৃহিণী থাকিলেও তাহার অধিক কর্তৃত্ব করিতে পাইতেন কিনা সন্দেহ। অপর পক্ষে শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদে আমার অবারিত দ্বার। তথায় গমনাগমনের সময় কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল না; যখন ইচ্ছা আমার প্রিয়তম প্রাসাদে উপস্থিত হইতাম। আমার পুস্তকালয়ের পুস্তকগুলি পাঠ করিতাম; আমার বড় সাধের লতামণ্ডপে প্রভুভক্ত বাঘাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতাম। গোবিন্দকেও অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ দেখাইয়া, আমার ক্রীতদাসের অধিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহার চিত্র ক্রয় করিয়া, তাহার ঋণ শোধ দিয়া, নূতন নূতন আমোদে ডুবাইয়া রাখিয়া, পোষাক পরিচ্ছদ, নগদ অর্থ দিয়া তাহার বিশ্বাস উচ্চমূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাম। নির্ব্বোধ, আমার নিকট তাহার প্রেম-অভিনয়ের গল্প করিত। রাগে আমার বক্ষের রক্ত ফুটিতে থাকিত। মনে হইত, তখনি বলিয়া ফেলি, - সে প্রেমের পরিণাম কি ভয়ানক, শেষ দিনে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবার কাল কত দ্রুত তাহার সন্নিহিত হইতেছে। নীরবে সকলই সহ্য করিতাম। আমি তাহার সম্মুখে অতি সাবধানতার সহিত বাক্য ব্যবহার করিতাম। নীলাও সে সম্বন্ধে অতি সতর্ক। তাহার অসাক্ষাতে পাপীয়সী আমাকে প্রলুব্ধ করিতে বিবিধপ্রকারে চেষ্টা করিত; গোবিন্দর নিন্দা করিতেও ছাড়িত না। জিতকাম কর্ত্রীর নির্দ্দেশমত ফুলফলে উপহারের ডালি সজ্জিত করিয়া নিত্য আমার গৃহে উপস্থিত হইত। আমিও তুল্য উপহার শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদে প্রেরণ করিতে কার্পণ্য করিতাম না। ক্রমে নীলার সহিত আমার প্রেম-অভিযান স্পষ্টতর হইয়া আসিতেছিল। সে আমাকে জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প, আমিও জিত হইবার জন্য প্রস্তুত। এ অভিযান মন্দ নয়;—আমারই স্ত্রীর সহিত আমারই প্রণয়লীলা! এমন কৌশলে আমাদের প্রণয়লীলা চলিয়াছে, যে, গোবিন্দ তাহাতে এক-টুকুও সন্দেহ করিবার সুযোগ পায় নাই। সে নীলার বাহ্যিক প্রেম-আলাপনে মুগ্ধ, আমার অনুগ্রহে অন্ধ; আমার পূর্ব্বজীবনে আমি তাহাকে যেরূপ অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া মনে করিতাম, এখন সে আমাকে তেমনি ভাবে। আমার মতন তাহারও একদিন সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু সে জাগরণ কি মর্ম্মবিদারক,—কি কঠোর!

শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদে সর্ব্বদাই চম্পাকে দেখিতে পাইতাম। ও-গৃহে সে-ই আমার একমাত্র আকর্ষণ; বালিকাও আমাকে পাইলে আর কাহাকেও চাহিত না। আমাকে দেখিবামাত্র সে দৌড়াইয়া নিকটে আসিত; আমার ক্রোড়ে উঠিয়া স্নেহচুম্বন আদায় না করিয়া ক্ষান্ত হইত না। অন্যের সমক্ষে তাহাকে গম্ভীর দেখিতাম, আমার সহিত তাহার কথা ফুরাইত না; অনবরত কেবল বকিয়া যাইত। হায়!

রলা বালিকা যদি জানিতে পারিত, সে কিসের টানে আমাকে এত ভাল বাসে,—সে যে আমারই।

চম্পার ধাত্রী অশান্তা, প্রায়ই তাহাকে আমার আলয়ে দুই এক ঘণ্টার জন্য বেড়াইতে লইয়া আসিত। মেয়ের তখন আনন্দ দেখে কে। আমি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কত উপকথা বলিতাম। সে সেই কাল্পনিক রাজা রাণী ও পরীদিগের সম্বন্ধে কত কি প্রশ্ন করিত। এক দিন একটা কাহিনীতে এক ছোট বালিকার পিতার নিরুদ্দেশ-যাত্রার কথা বলিতেছিলাম। চম্পা তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "ওর বাবা কি ফিরিয়া আসিবেন না?" আমি তাহাকে শান্ত করিতে বলিলাম "আসিবে না কেন, নিশ্চয়ই আসিবে, বাবা কি কখন মেয়েকে ছাড়িয়া বেশী দিন বিদেশে থাকিতে পারে?"

চম্পা হাসিয়া আগ্রহের সহিত বলিল, "আমার বাবাও তবে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন? গোবিন্দ কাকা বলেন, বাবা আমার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাকে ছাড়িয়া আর কত দিন থাকিবেন? তিনিও আপনার মত ছিলেন,—আমাকে এমনি ভালবাসিতেন।"

আত্মসম্বরণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইল। স্নেহাবেগে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম; চুম্বন করিয়া বলিলাম "তোমার বাবা তোমাকে খুব ভালবাসেন; তিনি কেন তোমার উপর রাগ করিবেন। তিনি কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে বিদেশে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।"

বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "কবে ফিরিবেন?"

মনে মনে বলিলাম "যে-দিন তাহার প্রতিহিংসা-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে পারিবে।" তাহাকে বলিলাম "এ কার্ত্তিক মাস যাইতেছে না? উত্তরায়ণের আর বা কয় দিন বাকি; উত্তরায়ণের মত আনন্দের দিনে তিনি কি তোমাকে ভুলিয়া থাকিবেন? বোধ হয়, সে সময় বাবা তোমায় দেখা দিবেন।"

বালিকা সহাস্যে বলিল "এবারে উৎসব তবে কত সুখের হইবে!"

ধাত্রী অশান্তা অদূরে বসিয়াছিল, আমরা তাহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তাহার স্বরে চমকিয়া উঠিলাম। সে বলিল "মাননীয় মহাশ্রেষ্ঠী! কেন উহাকে বৃথা আশা দিতেছেন? আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, নতুবা এমন কাহার হয়;—শেষ দেখাটাও দেখিতে পাইলাম না। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, প্রভু আমাদের বেশীদিন পৃথিবীতে থাকিবেন না; অমন পুণ্যাত্মা কি সংসারে বেশীদিন টিকিতে পারেন?—তিনি নিষ্পাপ ছিলেন তাই অকস্মাৎ এত শীঘ্র স্বর্গে চলিয়া গেলেন। আমার ভয় হয়, মেয়েটাও বা কবে আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়!"

অশান্তার নয়নপল্লব অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। সংসারে নারীই হেয়তম পিশাচী, নারীই আবার দেবী। পরের জন্য এমন করিয়া নারী ব্যতীত অন্যে কি কাঁদিতে পারে! অশান্তা বলিল, "মহাশ্রেষ্ঠী, চম্পার দিকে চাহিয়া দেখুন। মেয়েটা দিন দিন কি হইয়া যাইতেছে। কর্ত্রীকে সে কথা কত দিন বলিয়াছি, তিনি তাহা কানে তুলেন না!"

চম্পা সত্যই শুকাইয়া যাইতেছে। আমি সময়ান্তরে নীলার দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম; নীলা হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল "আমাদের প্রতি আপনার স্নেহ অসীম। সে জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিলে অকৃতজ্ঞতা-দোষে দোষী হইতে হয়। কিন্তু আপনার আশঙ্কার কোন মূল্য নাই; চম্পার ও অসুখ নয়; মেয়েরা যখন তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে, তখন অমনি দেখায়। আপনি বৃথা ওর জন্য ভাবিবেন না।"

নীলার বাক্যে সম্মতি দান ব্যতীত আমার অন্য উপায় কি? বিধির বিপাকে প্রিয়তম কন্যার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। কত দিন আর এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বিধাতাই জানেন। অযত্নে অবহেলায় বালিকাকে চিরতরে না হারাই। ইহাদের হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রাণপণ করিয়াছি, কিন্তু আমাকে যে অতি সন্তর্পণে তিলে তিলে পাষাণ খুঁদিয়া সংকল্প-সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইতেছে; এত বিলম্ব তাহার সহ্য হইবে কি না কে জানে!

কার্ত্তিক মাসের শেষ; শীত ঋতু আগতপ্রায়। কোন কোন দিন দস্তুর-মত শীত পড়িতেছে। বাহিরের আমোদ উৎসব বন্ধ। শীতের আসর জমকাল রাখিতে, আমি কয়েকটি বড় বড় ভোজের ব্যবস্থা করিতেছি। গোবিন্দের তাহাতে যথেষ্ট উৎসাহ। সে নূতন নূতন আমোদের

উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমার গৃহকে তাম্রলিপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "আনন্দ-আলয়ে" পরিণত করিতে অবিরাম চেষ্টা করিতেছে; সেজন্য আমি তাহাকে শুধু ধন্যবাদ দিয়া ক্ষান্ত হই নাই, অর্থদানে পরিতুষ্ট করিয়াছি। গোবিন্দর স্ফূর্ত্তি আমা অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাহার উৎসাহের ব্যতিক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। বেচারী আমাকে তাহার আগমন-বার্ত্তা না দিয়াই আমার কক্ষে অসময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। আমার পার্শ্বের চৌকিখানিতে নিতান্ত নিঃসহায়ের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া পড়িয়াছিল। বদনে তাহার স্পষ্ট কালিমা মাখা।

আমি তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "ব্যাপার কি? টাকাকড়ির গোলমাল কি? তা' যদি হয়, ভাবনা কি? এই হুণ্ডি লউন,—আপনার ভাণ্ডার আমি—বোধ হয় এত শীঘ্র দেউলিয়া হইয়া পড়ি নাই।"

গোবিন্দ কষ্টে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ! টাকার কথা নয়—কারণ অন্য,—আমার মত হতভাগা আর কে আছে!"

আমি উৎকণ্ঠার ভাব দেখাইয়া বলিলাম "তবে শ্রেষ্ঠিনীর সম্বন্ধে! আশা করি, তিনি আপনার বিশ্বাসহন্ত্রী হন নাই। তিনি আপনাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হন নাই ত?"

গোবিন্দ দম্ভের সহিত বলিল "সে সাধ্য তাহার নাই; আমাকে উপেক্ষা করা তাহার পক্ষে সহজ নহে, অত সাহস সে রাখে না।"

আমি বলিলাম, "আপনার জয়ে আমি সুখী! কিন্তু সাধ্য নাই—কথাটা কত জোরের ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি বন্ধু!"

গোবিন্দ নিজেও কথাটা অতর্কিতভাবে বলিয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিল। সে সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "না-না, আমি সে অর্থে বলি নাই। তাহার যা ইচ্ছা অবশ্য করিতে পারেন, কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইয়া অন্যমত করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে কি?"

"নিশ্চয়ই না।' তিনি, যদি নিতান্ত হীন প্রকৃতির না হন, নিশ্চয়ই এ অবস্থায় ফিরিতে পারেন না। আপনি তাঁহার সচ্চরিত্রতায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন, আপনার মুখে কাজেই অত জোরের কথা খুব শোভা পায়; শ্রেষ্ঠিনী যত বাঁধা পড়েন ততই ভাল। যাক, অর্থ ও প্রেম আদত দুইটি বিষয়েই আপনি যখন নিরাপদ তবে এমন বিমর্ষ হইবার অন্য কি কারণ থাকিতে পারে বলুন ত?"

গোবিন্দ সহসা উত্তর দান করিল না; তাহার অঙ্গুরীটি অঙ্গুলির চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে লাগিল; অবশেষে বলিল "কথাটা হইতেছে কি—আমি কয়েকদিনের জন্য তাম্রলিপ্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি।"

আনন্দে আমার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। সম্মুখ-শত্রু, আমাকে জয়মাল্যে ভূষিত হইবার সুযোগ দান করিয়া, সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেছে। তাম্রলিপ্তি হইতে পলায়ন! সে অবশ্য তাহার প্রায়শ্চিত্তের অংশ গ্রহণ করিতে আবার তাম্রলিপ্তিতে ফিরিবে; তাহা হইলেই হইল; যথাসময়ে তাহাকে চাই। বিধাতা আজ আমার প্রতি প্রসন্ন, তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এতদিনে চম্পার আমার একটা গতি হইবার পথ দেখিতেছি! এত দুঃখেও আজ আমার তাই আনন্দের দিন।

আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম, "তাম্রলিপ্তি পরিত্যাগ করিতেছেন? এ সময়? কেন—এমন কি কাজ?"

গোবিন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল "আমার এক খুড়া গৌড়ে মৃত্যুশয্যায় এখন-তখন। তিনি আমাকে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি দান করিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন। আমি ব্যতীত তাঁহার আর তিন কুলে কেহ নাই। তাঁহার এ-সময় অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও একবার দেখা দেওয়া উচিত;—শেষ মুহূর্ত্তে তথায় উপস্থিত থাকাটাও দরকার। দেরী করিলে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। কাজেই কি করি, আমাকে একবার গৌড়ে যাইতেই হইতেছে—অবহেলায় ত আর লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিতে পারি না; কিন্তু এদিকে অন্য লক্ষ্মীটিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেও ভরসা হয় না;—বেশী দেরী হইবে না; বড় জোর এক পক্ষ। এই সময়টা আপনি যদি—" গোবিন্দ থামিল; আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম "যদি কি? বলুন না? আপনার অনুপস্থিতকালে আমি যে-কোন-প্রকারে আপনার সাহায্য করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।"

"তা জানি মহাশ্রেষ্ঠী। আপনার অনুগ্রহে আমার অসীম বিশ্বাস, তাই ত দৌড়াইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি আমার জন্য অনেক করিয়াছেন; ইচ্ছা করিলে আপনার অসাধ্য কি আছে? আমার সুখ-দুঃখ আপনারই হস্তে। আমি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি। তাহাকে দেখিবেন। তাহার অভিভাবক আর কে আছে? শ্রেষ্ঠিনী সুন্দরী—অসাবধান। কেবল আপনিই অভিভাবকরূপে তাহাকে সতর্ক করিতে সমর্থ। আপনার বয়স, পদমর্য্যাদা, সম্মান, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠী-পরিবারের সহিত আপনার বন্ধুত্ব, এ দায়িত্বগ্রহণে আপনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছে। কোন ভবঘুরে যুবক তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিলে আপনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহাকে সাবধান করিবার নাই।"

আমি সহসা আসন পরিত্যাগ করিয়া, পরিহাসচ্ছলে হস্ত দ্বারা তরবারির ন্যায় তাহার স্কন্ধে আঘাত করিয়া অভিনেতার ভঙ্গীতে বলিলাম, "যদি কোন দুরাত্মা সে সাহস করে, আমি তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড না করিয়া ছাড়িব না!"

হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম। গোবিন্দ সে হাসিতে প্রাণ ভরিয়া যোগ দিতে পারিল না। আমি তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া স্বর বদলাইয়া বলিলাম "না-না, বন্ধু, আমার রহস্যের জন্য ক্ষমা করিবেন। আমি এখানে থাকিতেও আপনার এত ভয়,—সেইজন্যই রহস্য করিতেছিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত মনে তাম্রলিপ্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে—শ্রেষ্ঠিনীর হিতাহিত দেখিতে বাধ্য,—আপনার অনুরোধ বাহুল্য। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনি যেমন আপনার স্বর্গীয় বন্ধু হেমরাজের ঐশ্বর্য্য সম্মান বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করিয়া বন্ধুত্বের অকৃত্রিম আদর্শ দেখাইয়াছেন, আমিও আপনার বন্ধুত্বের তেমনি আদর্শ দেখাইতে পরাঙ্মুখ হইব না;—ইহা হইতে উৎকৃষ্ট উপমা খুঁজিয়া পাইলাম না বন্ধু।"

গোবিন্দ চমকিয়া উঠিল; তাহার বদনমণ্ডল হইতে প্রত্যেক রক্তবিন্দু অপসারিত হইয়া গেল। সে আমার পানে একবার বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। কি যেন বলিতে যাইতেছিল; আমার বদনে সযত্ন-অভ্যস্ত সরলতা ও ঈর্ষ্যা-বিমুক্ত ভাব বিরাজ করিতেছে দেখিয়া সে আত্মসম্বরণ করিয়া সংক্ষেপে বলিল, "শত ধন্যবাদ; আমি জানি, আপনার সুনাম ও সততার উপর নির্ভর করা অনর্থক হইবে না।"

স্থিরকণ্ঠে বলিলাম "নিশ্চয় না। আপনি যেমন আপনার নিজের সুনাম ও সততার উপর বিশ্বাসবান, আমার উপরও তেমনি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন। আরও কি কথায় বেশী বলিতে হইবে?"

গোবিন্দ গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িল। আমি তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলাম "বড়ই পরিতাপের বিষয়, এ সময় আপনাকে বিদেশে যাইতে হইতেছে। আমার বাড়ীর ভোজ ও উৎসবের সমস্ত আয়োজন, আপনি না ফেরা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবে। আপনার লাভের বিষয় না হইলে, কখনই এখন আপনাকে যাইতে দিতাম না। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এ বিদায়ে আমার দুঃখ হইতেছে না;—অর্থের উপাসক আমি, আমি ভাল মতে জানি ধন সহজে আসে না;—হোক আমাদের আপনার অদর্শনে সাময়িক কষ্ট; আপনি ধনী হইয়া ফিরিয়া আসিলে তখন আবার কত আনন্দ। ভোজ উৎসব তখন আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে করিতে পারিব। কি বলেন?"

গোবিন্দ এবারে হাস্য করিল। বস্তুতঃই, আমি তাহার অপেক্ষায় আমোদ উৎসব বন্ধ রাখিব, শুনিয়া সে আহ্লাদিত হইয়াছিল। সে কৃতজ্ঞতার সহিত বলিল, "মহাশ্রেষ্ঠী, আপনার স্নেহ-ঋণ শোধ দিতে পারিব না। জানিনা, কথায় কি করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়।"

আমি কৌতূহলে বলিলাম, "আগে, ফিরিয়া আসুন, এক দিন আপনার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা লইব। কবে রওনা হইতেছেন?"

কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা অর্থে, গোবিন্দ আনন্দ-উৎসব বুঝিল। ভাল! সে হাসিয়া বলিল "আগে লাভ, পরে ব্যয়। কল্যকার প্রাতেই আমাকে রওনা হইতে হইবে।"

বলিলাম, "এত সত্বর! তবে জিনিষপত্র ঠিকঠাকের চেষ্টা দেখুন গিয়া; শুনিয়া ভাল হইল, কাল বিদায়কালে উপস্থিত থাকিতে পারিব।"

গোবিন্দ আমার বন্ধুত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট মনে প্রস্থান করিল। সমস্ত দিনের মধ্যে তাহার আর

সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না; আমি জানি সে সমস্ত দিন কোথায় অতিবাহিত করিয়াছে,—আমারই প্রাসাদে! কেন? নীলার প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে! তাহার মৌখিক আশ্বাস প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাও নহে; কিন্তু—কিন্তু তাহাতে লাভ কি! পাপমোহের আয়ু আর কতক্ষণ? অতৃপ্ত অশান্ত প্রণয়ী নিত্য নূতনত্বের জন্য বুভুক্ষু হইয়া আছে। একবার নয়নের অন্তরাল হও, তাহার পর তুমি তাহার কে? তোমার স্থান অন্যের অধিকার করিতে আর কতক্ষণ! সে আশঙ্কায় গোবিন্দ তুমি আজ জর্জ্জরিত—তাহা পাপ-অভিনয়ে অনর্থক নহে।—কে বলিবে—তোমার এ বিদায়, তাহার সহিত চির বিদায় নয়!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পর দিন প্রাতঃকালে, আমি গোবিন্দর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। গোবিন্দর মুখের ভাব বড়ই বিমর্ষ; সে আমাকে দেখিয়া একটু প্রফুল্ল হইল। সে মৃদুস্বরে বলিল "তবে চলিলাম,—স্মরণ রাখিবেন আমি আপনাকে তাহার অভিভাবকস্বরূপ রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছি।"

আমি বলিলাম, "ভয় নাই; আমি আপনার স্থান অধিকার করিব।"

সে বিমর্ষভাবে অশান্তির হাসি হাসিল; বলিলাম, "নমস্কার, বিদায়, বিদায়।"

আমি এখন একা,—প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন; আমার ইচ্ছায় বাধা দিবার আর কেহ নাই। ইচ্ছা করিলে অদ্য রাত্রেই নীলার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় দিতে পারি,—তাহার মুখের উপর তাহার পাপকাহিনী বর্ণনা করিয়া বিশ্বাসঘাতিনীর বক্ষের রক্তে ধরা কলুষিত করিতে পারি; বঙ্গভূমিতে কেহই আমাকে সে জন্য দোষী করিবে না। তথাপি আমি সে পথের পথিক নহি; হত্যা আমার উদ্দেশ্য নহে; তাহা হইলে তাহার ব্যবস্থা তখনই করিতাম। পাপীকে ঘৃণ্য বলিয়া যদি দূরে সরাইয়া দাও, প্রকারান্তরে তাহা হইলে তাহার যথেচ্ছাচারিতারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়; কিম্বা অনুশোচনার অবসর না দিয়া তাহাকে হত্যা করিলেই বা কি ফল, কেবল হত্যাপরাধে নিজকে নরকস্থ করা। আমার পন্থা স্বতন্ত্র; জাল পাতিয়াছি, মোহমুগ্ধ লালসার তাড়নায় তাহাতে আপনি আসিয়া পড়িবে। বিলাস-স্বপ্নের অস্তিত্ব আর কতক্ষণ? ফাঁদের টানে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও কি সে একবার তাহার অমানুষিক লোভের পরিণাম স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইবে না? মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়াও কি মনে হইবে না—দুরন্ত ইন্দ্রিয়-লালসা কৃতান্তের আকার ধারণ করিয়া তাহাকে কি ঘোর নরকে লইয়া যাইতেছে! ভগবানের নাম স্মরণ করিলাম; একবার মনে হইল—আমি ইহাদের শাস্তি দিবার কে? পর মুহূর্ত্তেই ভাবিলাম,—আমার অন্তরের শান্তি—বংশের সম্মান যাহারা হরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আবার ক্ষমা? শ্রীকৃষ্ণ কি কংশকে বধ করেন নাই? আমি কেন তবে তাহাতে পশ্চাৎপদ হইয়া কাপুরুষতার পরিচয় দিব?

চিন্তার সীমা নাই। চিন্তিত মনে গৃহে ফিরিতেছি; পথিমধ্যে আমার ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ; বেচারী সমস্ত পথ দৌড়াইয়া আসিয়াছে। বিনীতভাবে সে নমস্কার করিয়া একখানি পত্র আমার হাতে দিল। শিরোদেশে লেখা ছিল "বিশেষ জরুরী।" আমার স্ত্রীর হস্তাক্ষর। তাড়াতাড়ি পত্র খুলিয়া পড়িলাম, "অনুগ্রহ করিয়া এখনি একবার আসিবেন;—চম্পা অত্যন্ত পীড়িত,—আপনাকে দেখিতে চাহিতেছে।"

ব্যস্ত হইয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কে তোমাকে এ পত্র দিল?"

"জিতকাম হুজুর। আপনি বাড়ী নাই শুনিয়া বুড়া কাঁদিয়া ফেলিল। মেয়েটির নাকি বড় অসুখ, বড়ই কষ্ট পাইতেছে। দুপুর রাত্রে তাহার অসুখের সূচনা, ধাত্রী তখন অত সাংঘাতিক বলিয়া মনে করিতে পারে নাই।"

"বৈদ্য ডাকা হইয়াছে বোধ হয়?"

"হাঁ, হুজুর, জিতকাম বলিল; তবে—"

ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তবে কি?"

"না হুজুর,—বৈদ্য নাকি বলিয়াছেন বড় দেরী হইয়া গিয়াছে; রোগী নাকি এখন-তখন!"

মন একবারে দমিয়া গেল, দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না যেন! প্রাসাদে রওয়ানা হইলাম। ভৃত্যকে বলিয়া গেলাম, হয় ত সমস্ত দিনের মধ্যে আমি বাড়ী ফিরিতে নাও পারি।

প্রাসাদ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, জিতকাম বিষণ্ণ

মুখে দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম "রোগীর অবস্থা এখন কেমন?"

সে কোন উত্তর না দিয়া, নমস্কার করিয়া একটি ভদ্রলোককে দেখাইয়া দিল। দেখিয়াই বুঝিলাম, তিনি বৈদ্য। বৈদ্য আমার অতি নিকটে আসিয়া অতি নিম্ন স্বরে বলিলেন, "কথা হইয়াছে কি—রোগীকে প্রথমে আদৌ যত্ন করা হয় নাই; অনেক দিন হইতেই মেয়েটি দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিল,—ব্যারামটা তাই এত সকালে বৃদ্ধি পাইতে পারিয়াছে। অসুখের সূচনা মাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে হয় ত এরূপ সাংঘাতিক হইত না, দুঃখের বিষয় ধাত্রী অত রাত্রে কর্ত্রীকে বিরক্ত করিতে সাহস করে নাই। অসময়ে বৈদ্য ডাকিলে আর কি ফল হইতে পারে বলুন?"

আমি বজ্রাহতের ন্যায় অসাড় নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অশান্তা, এত দিনের দাসী, সেও নীলাকে রাত্রে বিরক্ত করিতে সাহসী হইল না! কেন? সহস্র বৃশ্চিক হৃদয়ে দংশন করিল। গোবিন্দ নিশ্চয় গত রাত্রে এখানে অবস্থান করিয়াছে। বিদায়-প্রারম্ভে তাহাদের প্রেম-অভিনয়ে বাধা দিতে দাসী সাহস করে নাই। তাহারা জানে গৃহীকর্ত্রীর যে মেজাজ তাহাতে তাহার সুখের তিল মাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইলে, মহা বিপদ। সুখ? সুখ শব্দের কি পৈশাচিক ব্যাখ্যা। সুখের নামে সংসারে কি ভয়ানক ভয়ানক ব্যাপারই সংঘটিত হইতেছে, তবুও কখনও সুখ-দুঃখের সীমা নিরূপিত হইল না। নিজের নাড়ী-ছেঁড়া ধন,—তাহাকে বক্ষে লইয়া সুখ হয় না! সুখ কি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে নরকরাজ্যে বিচরণ করিয়া! যে বিকট সুখের কল্পনা রাক্ষসীও করিতে পারে না, সভ্য সমাজ, তাহাই কি তোমার উপাস্য? বুকের ধন ধাত্রীর হস্তে ফেলিয়া রাখিয়া জননীর সুখ? যে এই হৃদয়হীন, নির্ম্মম দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখিয়াছে, সে ত ইহার কল্পনাও করিতে পারিবে না; অথচ ধনী-সমাজে পরভৃত শিশুর সংখ্যা ত কম নহে। নীলা! ছদ্ম-বেশে রাক্ষসী! স্বামী যেন পর,—সন্তানও কি তোর কেহ নয়?

বৈদ্য আমার ক্লিষ্ট ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মেয়েটি, আপনাকে দেখিবার জন্য বড় অস্থির হইয়াছে। আমিই, শ্রেষ্ঠিনীকে অনুরোধ করিয়া আপনায় খবর দিতে বলিয়াছি। সংক্রামক ব্যাধি, রোগীর নিকটে গেলে অবশ্য আপনার বিপদের আশঙ্কা আছে; সেই জন্যই বোধ হয় শ্রেষ্ঠিনী আপনাকে লিখিতে চান নাই।"

বলিলাম "অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তেমন কাপুরুষ মনে করিবেন না। গত মড়কের সময় তাম্রলিপ্তির লোকেরা ভীরুতার যথেষ্ট প্রমাণ দিলেও, তাহাদের মধ্যে দুই-একজন অন্য-প্রকার থাকা অসম্ভব নয়।"

বৈদ্য হাসিয়া বলিলেন, "সাহসীর মৃত্যু সহজে হয় না, মহাশয়। আপনি যত সত্বর রোগীকে দেখেন ততই ভাল; বলিয়াছি, সে আপনার পথ চাহিয়া আছে। আপনাকে দেখিলেও সে একটু শান্তি পাইবে। আমি অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইতেছি;—অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আশা কি একটুও নাই?"

বৈদ্য গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আছে বলিয়া মনে হয় না।"

"কোন কি উপায় হইতে পারে না?"

"না—রোগীর জীবনীশক্তির অভাব,—কোনো চেষ্টায়ই ফল হইবে না, কেবল কষ্ট বৃদ্ধি করিবে। যন্ত্রণার লাঘবের জন্যই এখন চিকিৎসা। ঔষধ দিয়া গেলাম; ফিরিয়া আসিয়া বলিতে পারিব, অবস্থা কেমন। ঔষধটা শ্মশান-চিকিৎসা।"

বৈদ্য চলিয়া গেলেন। জনৈক পরিচারিকা আমাকে রোগীর কক্ষে লইয়া চলিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রেষ্ঠিনী কোথায়?"

"তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে।"

"কন্যার অসুখের পর তিনি কি তাহাকে দেখিতে আসেন নাই?"

দাসী ভয়বিহ্বল চকিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিল; অতি অনুচ্চ স্বরে বলিল "না।"

হৃদয়হীনা রমণী প্রাণভয়ে ভীতা হইয়াছে, পাছে সংক্রামক ব্যাধিতে সে আক্রান্ত হয়! জীবন কি এতই মায়ার!

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে, নিঃশব্দ-পদে আমি রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলাম। ধাত্রী অশান্তা বিষণ্ণ বদনে

বালিকার পার্শ্বে নীরবে বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বেচারীর চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িল। বলিল, "আপনি আসিয়াছেন! আপনার কথাই বারবার বলিতেছে। এক পিতা ব্যতীত, আপনার ন্যায় ওর ভালবাসার আর কেহ নাই!"

"বাবা"—বালিকা ক্ষীণ কণ্ঠে, অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল। একটি বালিশে ভর করিয়া সে বসিয়া আছে; শ্বাসকষ্টে সে ছটফট করিতেছে; তাহার মুখখানি দেখিয়া কে বলিবে—সে চম্পা। আমি তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিলাম, "মা আমার! স্থির হও; শোও, শুইয়া থাকিলে কষ্ট কম হইবে।"

বালিকা শয়ন করিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "শুইতে পারি না।"

আমি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম। তাহার শুষ্ক, মলিন ওষ্ঠে হাস্য দেখা দিল; তাহার ক্ষীণ বাহুদ্বয়ে আমার গ্রীবা জড়াইয়া ধরিল; বলিল "বাবা! আপনি কি আমার বাবা নন?"

আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না; গভীর স্নেহাবেগে তাহাকে চুম্বন করিলাম। অশান্তা নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল; নয়ন নত করিয়া আপনা-আপনি ধীর মৃদুস্বরে বলিল "হা ভগবান, সময় হইয়া আসিয়াছে,—মেয়ে, বাবাকে দেখিতে পাইতেছে! পিতার স্নেহের কন্যা,—তিনি কি ইহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন; স্বর্গের আত্মা প্রিয়তম কন্যাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে বুঝি তাহাকে দেখা দিয়াছেন; এ স্থানে ইহাকে ফেলিয়া রাখিয়া তিনিও কি স্থির আছেন!"

অশান্তা ভক্তিভরে কর জোড় করিয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিল।

বালিকা অতি কষ্টে বলিল, "বাবা, আমার বুকের মধ্যে কেমন করিতেছে, জিভ শুকাইয়া আসিতেছে,—আপনি কি তাহা ভাল করিয়া দিতে পারেন না?"

প্রাণশঙ্কা হইবার উপক্রম হইল। আমি তাহাকে একটু জল দিয়া বলিলাম, "আমার প্রাণের চম্পা, আমার না হইয়া তোর কেন এ অসুখ হইল! ভয় নাই মা, এখনি সকল কষ্টের শেষ হইবে।"

বালিকা জল গলাধঃকরণ করিতে পারিল না; সে কষ্টে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল "বাবা! এতদিন আমাকে একা ফেলিয়া কোথায় ছিলেন? আমি আপনার কথা কত ভাবিয়াছি। আমি কবে আবার আপনার হাত ধরিয়া বাগানে বেড়াইতে পারিব বাবা?" বালিকা অত যন্ত্রণার মধ্যেও হাসিল; বলিল "খুকু কোথা? সে বুঝি ভাবিয়াছে, আমি গলার যন্ত্রণায় তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি! বাবা, খুকুকে আমায় দিন ত!"

একটা পুতুল নিকটে পড়িয়াছিল। আমি তাহা তুলিয়া চম্পার হাতে দিলাম। সে এক হাত আমার কাঁধে রাখিয়া অপর হাতে পুতুলটি বক্ষে জড়াইয়া ধরিল; বলিল, "বাবা, খুকু আপনাকে খুব চেনে; আপনিই তাহাকে আমায় আনিয়া দিয়াছিলেন। খুকু আপনাকে ভালবাসে, কিন্তু আমার মত ও আপনাকে অত ভাল বাসিতে পারিবে না।"

চম্পা ডাকিল "ধাই-মা।"

অশান্তা তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, "চুপ কর মা! বৈদ্য কথা বলিতে বারণ করিয়াছেন।"

চম্পা বলিল "তবে—তুমি বাবাকে দেখিয়া আনন্দিত হও নাই?" বালিকা আর বলিতে পারিল না; নূতন উপদ্রবে তাহার নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিল। আমি তাহার বক্ষে হস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম; অশান্তা ব্যগ্র হইয়া বাতাস দিতে লাগিল; এই বুঝি যায়, সব বুঝি শেষ হয়!

কতক্ষণ পরে বালিকা একটু সুস্থ হইল; বলিল, "বাবা, বড় কষ্ট! ঠোঁট ফাটিয়া যাইতেছে!"

আমি আমার প্রিয়তমা স্নেহপুত্তলিকাকে প্রাণের সমস্ত স্নেহ, শুভ আশীর্ব্বাদ একত্র করিয়া চুম্বন করিলাম। সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। দশ মিনিট,—কুড়ি মিনিট,—অর্দ্ধ ঘণ্টা সেই অবস্থায় অতীত হইয়া গেল; বালিকা যেন ঘুমাইতেছে। বৈদ্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন, বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখের ভাব মনের ভাব পাঠ করিতে চেষ্টা করিলাম,—তাহা নৈরাশ্যপূর্ণ! হা অদৃষ্ট!

বালিকা অবশেষে নয়ন মেলিয়া আমার পানে চাহিল। আমি তাহার বদনপ্রান্তে মস্তক নোয়াইয়া

ধীরে বলিলাম "লক্ষ্মী মেয়ে আমার! কোন কি কষ্ট হইতেছে?"

সে অতি মৃদু, অস্পষ্টস্বরে বলিল "না বাবা! আমি খুব ভাল আছি; কোনই কষ্ট নাই। ধাইমা কখন্ আমাকে আপনার সঙ্গে বেড়াইবার জন্য পোষাক পরাইয়া দিবে? বাবা, আমি জানিতাম, নিশ্চয় আপনি ফিরিয়া আসিবেন!"

বৈদ্য গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মস্তিষ্কের বিকৃতি আরম্ভ হইয়াছে;—আর কষ্ট বেশীক্ষণ নাই।"

চম্পার অন্যদিকে দৃষ্টি ছিল না। সে আমাকে বলিল, "বাবা, আমাকে আর ছাড়িয়া যাইবেন না। ওরা বলে, আপনি আমার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; সত্য নাকি বাবা?"

আমি বলিলাম, "না লক্ষ্মী! আমি কেন তোমার উপর রাগ করিব।"

"আমিও ত তাই ভাবি বাবা!" চোখের দিকে চাহিয়া বলিল, "চোখে ওটা কি দিয়াছেন? খুলিয়া ফেলুন। আমি, আপনার চোখ দেখিতে পাইতেছি না।"

চোখের আবরণ খুলিতে দ্বিধা বোধ হইল, চাহিয়া দেখিলাম,—অশান্তা দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া ভগবানের নাম করিতেছে। আবরণ খুলিয়া লইলাম। বালিকা আনন্দে বলিয়া উঠিল, "বাবা বাবা!"—কথা শেষ হইল না; তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষের জল ধরিতে পারিলাম না, তাড়াতাড়ি চক্ষে আবরণ দিয়া কন্যাকে বক্ষে তুলিয়া লইলাম। বৈদ্য আরও নিকটে আসিলেন। "সকল যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে,—আর কেন!" বৈদ্যের বাক্যে চমকিয়া উঠিলাম। স্বর্গের পাখী স্বর্গে উড়িয়া গিয়াছে! সকলই শূন্য! অশান্তা শোকে চীৎকার করিতে লাগিল। বৈদ্য তাহাকে নীরব হইতে মুখা ইঙ্গিত করিলেন। আমি শিশুর জীবনহীন মৃতদেহ বক্ষে সজোরে চাপিয়া ধরিলাম, আমার বক্ষের মধ্যে কি হইতেছিল, অন্তর্যামীই জানেন! কণ্ঠের স্বর রুদ্ধ হইয়াছিল, চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল, দেহ-প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না যেন। চিন্তাহীন, সংজ্ঞাহীন আমি, জানি না তখন কি অবস্থায় ছিলাম! বুঝি নাই, আমার চতুষ্পার্শ্বে কি ঘটিতেছিল!

কতক্ষণ পরে বৈদ্য আমার হস্ত ধারণ করিয়া, আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "শ্রেষ্ঠী বাহিরে চলুন। ক্ষুদ্র, নির্ম্মল আত্মা, সর্ব্ব-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়াছে; এখন আর সংসারের কিছুতেই তাহাকে দুঃখ দিতে পারিবে না। আপনাকে পাইয়া মেয়েটির শেষ মুহূর্ত্ত অনেকটা সুখের হইয়াছিল। তাহার পিতা বলিয়া আপনাকে ভ্রম করায়, সে জীবনের শেষ সময়ে একটা গভীর দুঃখ ভুলিতে পারিয়াছে! আপনিও দেখিতেছি সেজন্য কম কাতর হন নাই!"

অগত্যা অতি সন্তর্পণে কন্যার প্রাণহীন নশ্বর দেহ বক্ষ হইতে নামাইয়া কোমল শয্যায় রক্ষা করিলাম; মস্তকের নিম্নে উপাধান স্থাপন করিলাম। কল্যাণময়ের নিকট নীরবে হৃদয়ের কাতরপ্রার্থনা জ্ঞাপন করিলাম। কুসুমকোরক, আমার হৃদয়বৃক্ষের অস্ফুটন্ত কলিকা,—কে বলিবে ঝরিয়া পড়িয়াছে! তাহাকে কীট দংশন করিতে সাহস করে নাই; মাতৃশাখা ভগ্ন হইয়াছে; স্নেহ-রস অভাবে সে ঢলিয়া পড়িয়াছে। জীবন গিয়াছে, লাবণ্য যায় নাই। প্রশান্ত মনে তখনও যেন সে মহা শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে। ওষ্ঠে সেই হাস্যরেখা; বদন প্রসন্ন; উপাধানের উপরি দিয়া কুঞ্চিত কেশদাম লতাইয়া পড়িয়াছে, আমি তাহার একগুচ্ছ তুলিয়া লইলাম,—জীবনের শেষ চুম্বন করিলাম। উন্মত্তের ন্যায় বলিলাম "সত্যই কি তাহার সকল যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে?" বৈদ্যও অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি আমার হস্ত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। অশান্তা নয়নজলে ভাসিতেছিল, আমাদিগকে কক্ষ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া বলিল, "কি করিয়া কর্ত্রীকে আমি এ সংবাদ দিব!"

বৈদ্য ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। বলিয়া ফেলিলেন, "যিনি তোমাদের কর্ত্রী, তাহার কি এসময় এখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল না?"

অশান্তা বলিল, "হায়! চম্পা একবার ভুলিয়াও যে তাঁহার নাম করে নাই!"

বৈদ্য বলিলেন, "ঠিক, তাহার আত্মা তাঁহাকে চিনিত।"

নীরবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। আমি ভাবিতেছিলাম হইল কি! এত দুঃখের মধ্যেও যেন একটা পাষাণভার হৃদয় হইতে নামিয়া গেল! চম্পা মরে নাই, বাঁচিয়াছে! এ গৃহে তাহার সুখ কি ছিল! সে বাঁচিয়া থাকিলে পরিণত

বয়সে কি হইত কে জানে! বিষবৃক্ষের ফল,—সে ভয় আমার সর্ব্বদাই হইত,—নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক আত্মা লইয়া পুণ্যরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে এই আমার শান্তি।

বৈদ্য আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি শ্রেষ্ঠিনীকে সংবাদটা দিবেন কি?"

বলিলাম, "ক্ষমা করিবেন,—দৃশ্যটা দেখিয়া আমার মনের স্থিরতা নাই!"

বৈদ্য বলিলেন, "ঠিকই! আপনার না যাওয়াই ভাল; কর্ত্রীটি, একজন কম অভিনেত্রী নন,—তাঁহার ব্যবহারে আপনাকে আরও দুঃখিত করিবে।"

বৈদ্য চলিয়া গেলেন। আমি একা,—কি ভাবিতেছিলাম বলিতে পারি না। বৈদ্য ফিরিয়া আসিয়া সহাস্যে বলিলেন, "যা বলিয়াছি তাই। কন্যার মৃত্যুসংবাদে অচেতন,—আর্ত্তনাদ, চন্দন-সলিল কিছুরই অভাব হয় নাই। সমস্তই যথাযথ অভিনীত হইয়াছে। আমি এখন তবে যাইতে পারি; দুঃখের বিষয়, আপনাকে আরও কিছুকাল এখানে অপেক্ষা করিতে হইতেছে। কর্ত্রীটি আপনাকে বলিতে বলিলেন,—তাঁর একটা কি সংবাদ আপনাকে দিতে আছে। বেশীক্ষণ আপনি এখানে দেরী করিবেন না। তবে আসি!"

বৈদ্য বিদায় হইলেন। আমি অশান্ত হৃদয়ে পদচারণ করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ জিতকাম একখানি পত্র আনিয়া আমার হস্তে দিল। কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "অবশেষে ছাড়িয়া গেল, পিতার শোকেই গেল; না, না, প্রভু মরেন নাই—আমার কিছুতেই তা বিশ্বাস হয় না!"

পত্র খুলিয়া পাঠ করিলাম; লেখা আছে—"হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর্য্যন্ত শক্তি নাই। গোবিন্দকে এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ লিখিয়া আমাকে বাধিত করিবেন কি?"

জিতকামকে বলিলাম "তোমাদের কর্ত্রীকে বলগে,—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

বিমর্ষ বৃদ্ধ প্রস্থান করিল। আমিও আমার অভিশপ্ত গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। সে স্থানে যাহা হারাইয়াছি, যাহা হারাইলাম, তাহা জীবনপাত করিলেও ফিরিয়া পাইব না!

(ক্রমশ)

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

ভারতের সহিত আমেরিকার যোগ

বষ্টনের বেদান্ত-ভবন।

বষ্টন-নগরের Boston Transcript ইয়াঙ্কিসমাজের বনিয়াদি সংবাদপত্র। যুক্তরাষ্ট্রবাসী মাত্রেই ইহার গৌরব করিয়া থাকেন। ইহার কার্য্যালয় দেখা গেল। সম্পাদক বলিলেন—"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইয়াঙ্কিদের মনোযোগ আকর্ষণ করা বড় কঠিন। আমরা এ বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। প্রায় স্ত্রীপুরুষের মুখেই আজকাল ঠাকুর-কবির নাম শুনিতে পাইবেন। ইয়াঙ্কিস্থানে তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিক্রয়ও মন্দ নয়। কিন্তু আলোচনা করিলে দেখিবেন—কেহই ঐ-সমুদয় পাঠ করে নাই।"

নিউইয়র্কের মত বষ্টনেও রামকৃষ্ণ-ভক্তগণের এক কেন্দ্র আছে। এইরূপ কেন্দ্র ওয়াশিংটনে এবং সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা-নগরেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই-সকল কেন্দ্রে বৈদান্তিক মত প্রচারিত হইয়া থাকে। বষ্টন-কেন্দ্র হইতে The Message of the East নামক এক মাসিকপত্র বাহির হয়। বষ্টন-কেন্দ্রের স্বামীজী প্রত্যেক সপ্তাহে ৬০।৭০ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনী পাইয়া থাকেন। বৎসরখানেক হইল এই কেন্দ্রের নিজ গৃহ ক্রয় করা হইয়াছে। এই বেদান্তালয়ের বক্তৃতাগৃহে একটি বেদী আছে। তাহার উপর দেবনাগরী অক্ষরে লেখা—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" একটি বৃহদাকারের "ওঁ" অক্ষর প্রাচীরে অঙ্কিত দেখিলাম। ক্ষুদ্র লাইব্রেরীতে ধর্ম্মবিষয়ক এবং ভারত-সম্পর্কিত নানা-প্রকার গ্রন্থ আছে—পাঠকেরা গৃহে লইয়া যাইতেও পারে।

এখানে ভগ্নী "দেবমাতা"র সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে কর্ম্ম করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করাই ইহার কার্য্য ছিল। বষ্টনের বেদান্ত-কেন্দ্রে ইনি স্ত্রীবিভাগের কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। ৺ভগ্নী নিবেদিতার পর ভগ্নী ক্রিষ্টিনা কলিকাতায় শিক্ষাপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার শরীর খারাপ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সম্প্রতি তিনি আমেরিকায় স্বাস্থ্যলাভ করিবার জন্য

আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে নিউইয়র্কে দেখা হইয়াছিল। ভগ্নী দেবমাতাকে এই দুইজনের অনুরূপই বোধ হইল।

নিউইয়র্কে এবং বষ্টন কেম্ব্রিজে বহু ইয়াঙ্কির সঙ্গে বেদান্ত-সমিতি-সমূহের সম্বন্ধে নানা কথা হইয়াছে। সকলের মুখেই শুনিতে পাই—"মহাশয়, স্বামীজীদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য উচ্চশিক্ষিত পুরুষেরা বেদান্তালয়ে যান না। একমাত্র রমণীগণই ইঁহাদের মক্কেল। ভারতবর্ষকে সুপ্রচারিত করিতে হইলে এইরূপ হুজুগপ্রিয়

বষ্টনের বেদান্ত-ভবন।

ইয়াঙ্কি নারীর সাহায্য লইলে চলিবে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলের চিত্ত অধিকার করিতে পারিলে ভারতবাসীরা সত্যসত্যই দেশের কাজ করিতে পারিবেন। আপনাদের পণ্ডিতগণ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় আসুন—পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় আন্দোলন আরব্ধ হইবে। থিয়জফি এবং বেদান্তের মামুলি বোলচাল দিয়া আমাদের মন ভিজান অসম্ভব।"

এ কথাটা প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। তাহা বলিয়া ভারতীয় স্বামীদিগের পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং কর্ম্মনিষ্ঠাও অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। ইয়াঙ্কিস্থানই হউক অথবা ইয়োরোপই হউক—কোথাও ভারতবর্ষের যথার্থ সম্মান নাই। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় থাকিয়াও যাঁহারা দশবিশজন নরনারীকে স্বকীয় প্রভাবের বশে আনিতে পারেন এবং গৃহনির্ম্মাণ, পত্রিকাপ্রচার ও গ্রন্থাদি প্রকাশের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন তাঁহারা ভারতবাসীমাত্রের সম্মানার্হ। আরাম-কেদারায় বসিয়া স্বামীদিগকে মূর্খ অথবা পাণ্ডিত্যহীন ইত্যাদি বলিয়া তিরস্কার করা অন্যায়। এই-সকল ভারত-প্রচারক এখনও স্বদেশের একটি কপর্দ্দকও খরচ করেন নাই—নিজ নিজ চরিত্রবলে স্থানীয় জনগণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াছেন। আর পাণ্ডিত্যের কথা তুলিলে জানিয়া রাখা উচিত যে, সাধারণ পাদ্রী মহাশয়গণের পেটে যতটা বিদ্যা থাকে আমাদের স্বামীগণের বিদ্যা অন্ততঃ ততটুকু আছে। দুএকক্ষেত্রে চরিত্রসম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া কোন কোন ভারতীয় স্বদেশসেবক হয়ত ভাবিবেন—"ইহাতে ভারতবর্ষের নাম খারাপ হইতেছে। ভারতবাসীর মুখে চূনকালি পড়িতেছে।" একটুকু গভীরভাবে দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে ইহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় না। দুএকজনের চরিত্র-দোষে একটা জাতি অথবা একটা আন্দোলন পচিয়া যায় না। "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

যাহা হউক একমাত্র বেদান্তপ্রচারেই ভারতপ্রচার হইবে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাষ্ট্রশক্তি, ভারতবাসীর ধারাবাহিক বিজ্ঞান-বল, ভারতীয় কৃষিশিল্পবাণিজ্যের ইতিহাস, বর্ত্তমানভারতের কর্ম্মবীর ও সাহিত্যবীরগণের জীবনবৃত্তান্ত, যুবক ভারতের সর্ব্বতোমুখী "রোমাণ্টিক" আন্দোলন ইত্যাদি নানাবিধ তথ্য দুনিয়ায় প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। এজন্য সাহিত্য-সমালোচক, চিত্রশিল্পী, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সংবাদপত্রের সম্পাদক, শিক্ষাপরিষদের ধুরন্ধর, শিল্পকারখানার পরিচালক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ভারতীয় পর্য্যটকগণের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। "গীতাঞ্জলি" ও "সাধনা"র যুগ পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে ইয়োরোপীয়েরা বেদান্ত উপনিষৎ ও থিয়জফির দেশ বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতমাতার অন্যান্য মূর্ত্তি দেখাইবার সময় আসিয়াছে—বিদেশীয়েরা সেই মূর্ত্তি দেখিবার জন্যও উদ্গ্রীব। জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, ভাণ্ডারকর, গোখলে *, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র

* আজ (২১ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫) গোখলের মৃত্যুসংবাদ Boston Transcriptএ বাহির হইয়াছে। রাত্রি ১১টার সময় সংবাদ পাই। শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে দিনের ভিতর প্রায় ২৫ বার গোখলের কথা মনে হইয়াছিল। অথচ আর কোন দিন গোখলের বিষয় এত ভাবি নাই।

এবং শিক্ষাব্রতধারী মুন্সীরাম ইত্যাদি ভারতরত্নগণের অনুচরগণ এই কর্ম্ম গ্রহণ করুন। তাহা হইলে বর্ত্তমান জগতের পণ্ডিত-মহলে ভারতীয় চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির যাচাই হইতে পারিবে। তখন পাশ্চাত্যেরা বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত বৈদান্তিক আন্দোলনের যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

মেয়েরা যে-সকল আন্দোলনে যোগদান করে পণ্ডিতেরা সেই-সকল আন্দোলনের মূল্য স্বীকার করেন না। আমেরিকায় এ বিষয়টা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। যতই স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং পুরুষের সঙ্গে রমণী-জাতির সাম্য প্রচারিত হউক না কেন, ইয়াঙ্কিরা ভিতরে-ভিতরে রমণীজাতিকে কিছু তরলমতি, চঞ্চলচিত্ত, হুজুগপ্রিয় এবং ভাবপ্রবণ বিবেচনা করিয়া থাকেন। সেদিন জাপানী অধ্যাপক আনেসাকি বলিতেছিলেন—"মহাশয়, আমি জার্ম্মানীতে এবং আমেরিকাতেও লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে-সকল কলেজে মেয়েছাত্র বেশী সেই-সকল শিক্ষালয়ের অধ্যাপকগণ কিছু অগভীর এবং যুক্তিহীন হইয়া পড়েন। মেয়েদের স্বভাব এবং বিচিত্র প্রশ্ন ও সমস্যা বুঝিয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিবার জন্য অধ্যাপকগণকে খানিকটা নিম্নতর ভূমিতে নামিতে হয়। ইহাতে জ্ঞান মাপিবার কাঠি বেশ খাটো হইয়া যায়।" কাজেই ভারতগৌরব রমণীমহলে আবদ্ধ থাকিলে বেশী ফল পাওয়া যাইবে না।

যুবকভারতে 'রোমাণ্টিসিজ্‌ম্' ও 'প্রাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্'।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজয়ী পাশ্চাত্যেরা ভারতের সমাজ ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে প্রচার করিয়াছেন—"ভারতবাসীরা অকর্ম্মণ্য, উচ্ছ্বাসময়, কাণ্ডজ্ঞানহীন, পরলোকতন্ত্র, বাস্তব জীবনে উদাসীন এবং নৈরাশ্যশীল।" অথচ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের আমল হইতে মারাঠা বীর বাজীরাও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের লোকেরা শিল্পকর্ম্মে, যুদ্ধবিদ্যায়, দুর্গনির্ম্মাণে, সমুদ্র-বাণিজ্যে, রাষ্ট্র পরিচালনায়, শত্রুবিজয়ে কোন দিনই পরাঙ্মুখ ছিল না। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইতালীয়, ইংরেজ নানা জাতীয় পর্য্যটকই ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের নগরশাসন, জনগণের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি, রাস্তাঘাট ইত্যাদির যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। ইংরেজ ক্লাইবের চোখে মুর্শিদাবাদ তাৎকালীন লণ্ডন অপেক্ষা উন্নত ছিল। ফরাসী কাপ্তেনের চোখে ভারতীয় সমুদ্রপোত ফরাসী ও ইংরেজ জাহাজ অপেক্ষা বেশী শক্ত কর্ম্মক্ষম বিবেচিত হইত। অথচ এই জাতিই আবার বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, ভক্তিশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র ইত্যাদি রচনা করিয়া ইহ সংসারের হীনতা প্রচার করিয়াছে। সত্য কথা হিন্দু জাতির নজর দুই দিকেই সমানভাবে ছিল—তাহার ভাবুকতায় বাস্তব জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা দেখা যায়, আবার অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধেও চুলচেরা বিশ্লেষণ দেখা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী সকল-কর্ম্মক্ষেত্রেই বাস্তব হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাদিগকে অতীন্দ্রিয় লইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবহীন অতীন্দ্রিয়—অলীক ও কল্পনার সামগ্রী মাত্র এইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে বেদান্ত উপনিষৎ গীতা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক সাহিত্য আগা-গোড়া ভুল বুঝা হইয়াছে। একটা মিথ্যা মায়াবাদ প্রচারিত হইয়া ভারতবাসীকে জড়পদার্থে পরিণত করিয়াছে। এমন কি এই মায়াবাদ লইয়াই ভারতবাসী গৌরবও করিয়াছেন। পাশ্চাত্যেরা যখন ইহ জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইলেন তখন ভারতবাসী পাশ্চাত্যগণকে বলিতে থাকিলেন—"বেশ ত, ইয়োরোপীয় দর্শন ভোগমূলক—তোমরা প্রবৃত্তি-মার্গের লোক। ভারতীয় দর্শন ত্যাগমূলক—আমরা নিবৃত্তি-মার্গের লোক। তোমরা এই সংসারের তত্ত্ব লইয়া মজিয়া রহিয়াছ, আমরা পরলোকের চরম আনন্দে বিভোর হইয়া থাকি।" এইরূপ আলোচনায় পরাধীনজাতি শান্তি পাইয়া থাকে। যীশুখ্রীষ্টও এইজন্য রোমীয় সম্রাট্‌সম্বন্ধে বলিতেন—"Render unto Cæsar the things that are Cæsar's" এবং "My Kingdom is not of this world." কথায় বলে—"পায় না ত খায় না।" ইংরেজীতে ইহার নাম "Virtue of a necessity"! এই অবস্থায় পাশ্চাত্যেরা ভারতবাসীর অকর্ম্মণ্যতা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, মায়াবাদ ইত্যাদি লক্ষ্য করিবার অনেক সুযোগ পাইলেন। তাহা দেখিয়া-শুনিয়া ভারতের সমগ্র অতীত ইতিহাসটাকেই জড়ত্ব, মায়াবাদ,

দুঃখবাদ, পারলৌকিকতা ইত্যাদির বিবরণরূপে প্রচার করিতে থাকিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ ভারতবাসী বুঝিলেন—ভারতবর্ষের প্রশংসাই বোধ হয় করা হইতেছে। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও এই সুরই ধরিলেন।

ভারতবাসীর চিত্তসংমোহন আজকাল দূরীভূত হইয়াছে। বিংশশতাব্দীর যুবক ভারত আর কর্ম্মজ্ঞানহীন বেদান্তের গৌরব করেন না—জগৎকে একটা অলীক বস্তু বিবেচনা করা আর ইঁহাদের প্রবৃত্তি নয়। বেদান্ত গীতা উপনিষদের যথার্থ ভাবুকতা—বাস্তবযুক্ত আধ্যাত্মিকতা ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। আমরা দুইদিকেই দৃষ্টি দিয়াছি। আমাদের রোমাণ্টিক আন্দোলনে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িতেছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন প্রচারিত হইতেছে—প্রকৃতিদেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার সেই সঙ্গেই বর্ত্তমানকেও নানা উপায়ে সুখময় করিয়া তুলিতেছি—মানবসমাজ হইতে দূরে পলাইয়া যাইবার প্রবৃত্তি কমিয়া আসিতেছে শিল্পের আন্দোলন, সেবার আন্দোলন, পল্লীসংস্কারের আন্দোলন, শ্রমজীবীদিগের উন্নতিবিধান, শিক্ষাপ্রচার, ইত্যাদি বাস্তব ও বর্ত্তমান সমস্যাগুলি দক্ষতার সহিত সমাধান করা যাইতেছে। একদিকে কবি গাহিতেছেন:—

"শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া, যাইব বহিয়া।" ইত্যাদি
অথবা—"সংসার কি ভয় দেখাও আমারে
ভাল নাহি বাস যাব চলে দূরে।"
অথবা—"অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা
সে ঘটনা হবে হবে।"
এবং—"ভুলে যাও বর্ত্তমানে দূর ভবিষ্যতে চাহি।"

অপর দিকে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে জেলায় জেলায় নগরে নগরে বর্ত্তমান অবস্থা সংস্কারের জন্যই অসংখ্য কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কুলী মজুর তাঁতী জোলা অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরেজী অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ লোক নানা আন্দোলনে যোগদান করিতেছে। ইহাও বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতা। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস হইতেও ভারতবাসীর বিজ্ঞানবল, কর্ম্মশক্তি, রাষ্ট্রপাণ্ডিত্য, রণপাণ্ডিত্য ইত্যাদির নিদর্শন বাহির করা হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী তাঁহাদের ইতিহাসে মায়াবাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর যুবক ভারত অতীত ইতিহাসে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছেন। ইতিহাসের সারাটাই নূতন প্রণালীতে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

ভারতীয় চিন্তা এক্ষণে যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে মনে হয় বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সংসারের প্র্যাগ্‌ম্যাটিজম্-তত্ত্ব ভারতবাসীর উপযোগী। যুবক ভারত এই তত্ত্ব অনুসারেই জীবন যাপন করিতেছে। সুতরাং জার্ম্মান অয়কেনের
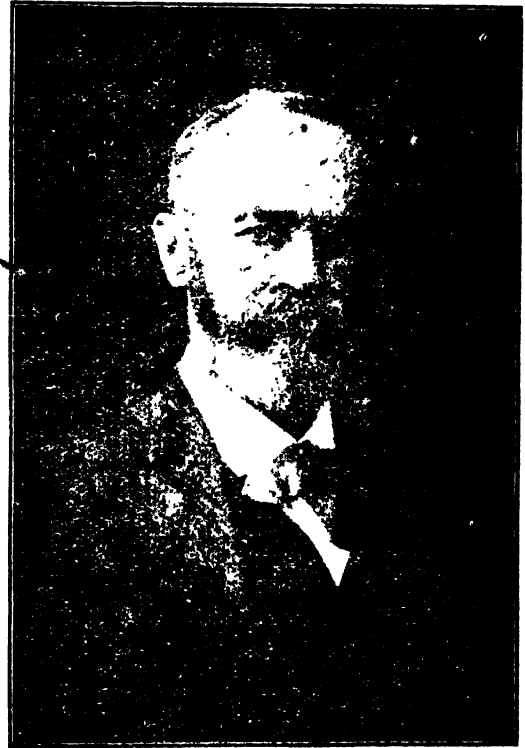
দার্শনিক জেম্‌স্।

Life's Basis, ফরাসী ব্যার্গসঁর Creative Evolution এবং অক্সফোর্ড অধ্যাপকগণের প্লেটোতত্ত্ব ইত্যাদির প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি বেশী দিবার প্রয়োজন নাই। হার্ভার্ডের দার্শনিক জেম্‌স্-প্রবর্ত্তিত চিন্তা-প্রণালী বর্ত্তমান কালে ভারতবাসীর পক্ষে অতি উপাদেয় হইবে। ভারতে এক্ষণে ফলবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, বহুত্ব, বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিত্বের দর্শন

আবশ্যক। জেম্‌সের Pragmatism, Pluralistic Universe এবং Varieties of Religious Experience এই তিনখানা গ্রন্থ ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হওয়া কর্ত্তব্য। যুবক ভারত এক্ষণে Pragmatic, Pluralist এবং Varied হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের অনুরূপ দর্শন ও যুক্তি জেম্‌সের আলোচনায় প্রচুর পাওয়া যায়।

শ্রী[illegible]।

ভারতীয় সঙ্গীত

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক লিখিত।

এস্‌রাজের পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট কান থাকে, আর তাহাতে সরু সরু তার পরান থাকে। সেই তারে আমি ফুঁ দিয়া দেখিয়াছি, তাহা গুনগুন করিয়া বাজে।

আমাদের বুকের ভিতরেও নাকি এইরূপ একটা ব্যাপারের ব্যবস্থা আছে। সেখানে অবশ্য কান নাই, তারও নাই; তাহার বদলে ২২টি নাড়ী সাজান রহিয়াছে, হাওয়া লাগিলে সেগুলি গুনগুন করিয়া বাজে। বাইশটি নাড়ীর বাইশ রকমের স্বর, তাহার প্রত্যেকটি একটি 'শ্রুতি'।

এইরূপ গলায় আর মাথায়ও নাকি বাইশটি করিয়া নাড়ী আছে, তাহা হইতেও বাইশটি করিয়া শ্রুতি পাওয়া যায়।—

"হৃদূর্দ্ধ নাড়ী সংলগ্না নাড্যো দ্বাবিংশতি র্মতাঃ।
তিরশ্চাস্তাসু তাবতাঃ শ্রুতয়ো মারুতাহতাঃ।
উচ্চোচ্চতরতাযুক্তাঃ প্রভবন্ত্যুত্তরোত্তরম্‌॥
এবং কণ্ঠে তথা শীর্ষে শ্রুতির্দ্বাবিংশতির্মতা॥

(সঙ্গীতরত্নাকর)

এই-সকল শ্রুতি 'উচ্চোচ্চতরতাযুক্তাঃ' কি না পরস্পর ক্রমেই উঁচু। এমন সূক্ষ্ম হিসাবে তাহারা ক্রমে উঁচু হইয়াছে যে, পাশাপাশি দুটি শ্রুতির মাঝখানে আর তৃতীয় শ্রুতির স্থান নাই—"শ্রুত্যোর্মধ্যে ধ্বনন্ত্যন্তরাশ্রুতেঃ।" এই জন্যই বলা হইয়াছে, "শ্রবণাচ্ছ্রুতয়ো মতাঃ"—শোনা যায়, তাই তাহার নাম 'শ্রুতি'। অর্থাৎ স্বরের সূক্ষ্মতম যে প্রভেদটুকু কানে ধরা যায়, শ্রুতি-সকল সেইরূপ প্রভেদ-বিশিষ্ট স্বর।

যে-কোন স্বর, আর তাহার অষ্টম, এই দুইয়ের মধ্যে ২২টি শ্রুতি আছে। ২২টি শ্রুতির ২২টি নাম—তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রক্তিকা, রৌদ্রী, ক্রোধী, বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জ্জনী, ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা, ক্ষোভিনী।

আমাদের সঙ্গীতে যত স্বর ব্যবহার হয়, তাহার সকলই এই শ্রুতিগুলির ভিতরে আছে। কিন্তু ইহাদের ঠিক কোন্‌টি যে সা, কোন্‌টি ঋ, কোন্‌টি গা, এ বিষয়ে প্রাচীন মতের সহিত আধুনিক ব্যবহারের প্রভেদ দেখা যায়। ষড়্‌জ কোন্‌টি? ইহার উত্তরে প্রাচীনেরা বলেন 'ছন্দোবতী', আধুনিকেরা বলেন 'তীব্রা'। প্রাচীন মতে ঋষভ 'রক্তিকা', আধুনিক মতে 'দয়াবতী'। প্রাচীন মতে গান্ধার 'ক্রোধা', আধুনিক মতে 'রৌদ্রী'। প্রাচীন মতে মধ্যম 'মার্জনী', আধুনিক মতে 'বজ্রিকা'। প্রাচীন মতে পঞ্চম 'আলাপিনী', আধুনিক মতে 'ক্ষিতি'। প্রাচীন মতে ধৈবত 'রম্যা' আধুনিক মতে 'মদন্তী'। প্রাচীন মতে নিষাদ 'ক্ষোভিনী', আধুনিক মতে 'উগ্রা'।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেকালের হিসাবে সা ঋ গ ম প ধ নি বলিলে যে-সকল স্বরকে বুঝায়, এখনকার সা ঋ গ ম প ধ নি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।* অথচ কাজের সময় যে সেকালে এমন বিভিন্ন স্বরের ব্যবহার হইত, তাহাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি? যে সঙ্গীতরত্নাকরে এইরূপ প্রাচীন 'সা ঋ গ ম'র উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতেই আবার 'তোড়ী' 'বাঙ্গালী' 'ভৈরব' 'বরাটী' 'গুর্জ্জরী' 'হিন্দোল' প্রভৃতি রাগেরও প্রসঙ্গ দেখা যায়। এ-সকল নাম শুনিলে, সেকালের 'সা ঋ গ ম' একালের 'সা ঋ গ ম' হইতে নিতান্ত বিভিন্ন ছিল বলিয়া তো মনে হয় না। কেননা, এ-সকল রাগ ছিল, কিন্তু তাহারা একবারে অন্য রকম স্বরে বাজিত, এ কথা বলিবার যোগ্যই নহে। তাই কোন কোন শ্রদ্ধাস্পদ লেখক বলিয়াছেন যে, শ্রুতিসংখ্যানুসারে সাত স্বরের স্থান নির্দ্দেশ করিতে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের ভ্রম হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, এ-সকল কথার মীমাংসা না হইলেও আমাদের কাজের কোন ক্ষতি হইবে না। তবে প্রাচীনই হউক, আর আধুনিকই হউক, সকল স্বরেরই ভিত্তি যখন

* এখন রে গা মা পা ধা নি র্সা গাহিলে যেমন সুর হয়, সেকালে সা রে গা মা পা ধা নি গাহিলে অবিকল সেইরূপ সুর হইত।

'শ্রুতি', তখন এই জিনিসটার কিঞ্চিৎ পরিচয় লইতে পারিলে ভাল হয়।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে শ্রুতির জন্মের যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আর অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন দেখা যায় না। ইহার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে একটু কঠিন; এমনকি, আমার নিজেরই ভয় হইতেছিল, পাছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক, বিশেষতঃ ডাক্তারগণের কেহ ইহা শোনেন। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখিবেন। প্রাকৃতিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিতে গিয়া প্রাচীনেরা অনেক সময় এরূপ সাদাসিধা কথা বলিয়াছেন, অথচ কাজের সময় তাঁহাদের হিসাবের তেমন গোল হয় নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, সময়ের সূক্ষ্ম ভাগ সম্বন্ধে কিরূপ কথা বলা হইয়াছে।—

"সকলের বড় যেমন বিরাট পুরুষ, সকলের চেয়ে সূক্ষ্ম তেমনি পরমাণু। দুই পরমাণুতে এক অণু, তিন পরমাণুতে এক ত্রসরেণু, তিন ত্রসরেণুতে এক ত্রুটি, শত ত্রুটিতে এক বেধ, তিন বেধে এক লব, তিন লবে নিমেষ, তিন নিমেষে ক্ষণ, পাঁচ ক্ষণে কাষ্ঠা, দশ কাষ্ঠায় লঘু, পঞ্চদশ লঘুতে দণ্ড, ইত্যাদি" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)।

কেহ আবার বলিয়াছেন, –"চোখের পলকে নিমেষ, আঠার নিমেষে কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় কলা, ত্রিশ কলায় ক্ষণ, দ্বাদশ ক্ষণে মুহূর্ত্ত, ত্রিশ মুহূর্ত্তে মানবের এক অহোরাত্র।"

আবার এইরূপ কথাও আছে,—"খুব ধারাল ছুঁচ দিয়া অতিশয় দ্রুতবেগে একশত খানা পদ্মের পাতা ভেদ করিলে প্রত্যেকটি পাতা ভেদ করিতে যে সময় লাগে, তাহার নাম এক ত্রুটি।"

শেষের কথাগুলি অনেক বৎসর পূর্ব্বে একখানি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, ঠিক বলিতে পারিয়াছি কি না জানি না। কিন্তু আসল কথার তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। পাঠকগণ দেখিবেন, কিরূপ জিনিষের উপর হিসাবের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। পরমাণু তো সময়ের অংশ নহে, তাহার উপর আবার সে কতখানি বড় তাহার কোন ঠিক নাই। চোখের পলক ইচ্ছা করিলেই ধীরে ধীরে বা তাড়াতাড়ি ফেলা যায়, একজনের চেয়ে আরেকজন হয়ত অনেক বেশী তাড়াতাড়ি ফেলিতে পারে। ছুঁচ দিয়া পাতা বিঁধার সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে।

অথচ সময়ের হিসাব সেকালের লোকে জানিত না, এমন কথা বলিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে, কারণ, জ্যোতিষ-চর্চ্চা তখন ভাল করিয়াই হইত। কাজের সময় আমরা মোটামুটি ঠিক হিসাবেই কাজ চালাইয়া আসিয়াছি, সেই হিসাবকে অত্যধিক বিজ্ঞান-সম্মত করিতে গিয়াই যত গোল বাধিয়াছে।

শ্রুতির সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছে। ওস্তাদেরা এ-সকল স্বরের ব্যবহার নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধের খাতিরেই করিয়াছেন। মানুষের পেটের ভিতরে স্বর তয়ের করিবার কিরূপ কারখানা আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার তাঁহাদের কোন প্রয়োজন হয় নাই। সে-সকল কারিকুরী করিয়াছেন পণ্ডিত মহাশয়েরা। তাঁহাদের পুস্তক লিখিতে হইয়াছিল, কাজেই কিছু সূক্ষ্ম সংবাদ প্রচারের অবসরও হইয়াছিল।

আর ঐ-সকল কথার ভিতরে একেবারেই যে কোন সত্য নাই, এরূপ মনে করাও সঙ্গত নহে। বুকের ভিতরে, নাভির ভিতরে, মাথার ভিতরে কোনরূপ স্বর উৎপাদনের কৌশল নাই। তাই প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কথা শুনিয়া আধুনিকদিগের কেহ হাসিয়া বলিয়াছেন বটে, যে,—

"প্রাচীনকালে শারীরবিদ্যা সম্যক প্রস্ফুটিতা না হওয়াতেই ঐ ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। নাভি হইতে কোন সাংগীতিক ধ্বনি নির্গত হয় না; সকল স্বরই কণ্ঠ হইতে নির্গত হয়। উদরাময়ের পীড়া হইলে নাভির নিকট গড়্‌গড় শব্দ শুনা যায়; এতদ্ভিন্ন সাংগীতিকধ্বনি উৎপাদনের কোন কলবল নাভির মধ্যে নাই।" (গীত-সূত্রসার)। কিন্তু নাভি (উদর), বুক, মাথা, এ-সকল স্থান হইতে স্বরের পুষ্টির (resonance) বিশেষ সহায়তা হয়, একথা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। গায়কেরা সতর্কভাবে সঙ্গীত সাধন করিবার সময় ঐ বিষয়টি মোটামুটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। খাদ স্বর গাহিবার সময় বুকের ভিতরে, আর চড়া স্বর গাহিবার সময় মাথার কাছে তাহার ধাক্কা লাগে, ইহার পরীক্ষা সহজেই হইতে পারে। সুতরাং আমাদের ওস্তাদেরা যে ঐ সকল স্থানকে স্বরের উৎপত্তি-

স্থান মনে করেন, ইহাতে তাঁহাদের নিতান্ত অপরাধ হয় না।

যাহা বলিতেছিলাম। গানের সময় ওস্তাদেরা শ্রুতির ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, সেই সূত্রেই তাহার সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছে। এ জিনিসটি তাঁহাদের স্বাভাবিক সুরবোধের ফল; উহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যাহাই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

'স্বাভাবিক সুরবোধ' বলিতে আমি কি মনে করিতেছি, তাহা বোধ হয় একটু খুলিয়া বলা দরকার। এই কথাটাকে আমরা চলিত কথায় বলিয়া থাকি 'কান'। সংগীতের সুরগুলি কাহারও মনগড়া জিনিস নহে। সুর সকল কম্পনের ব্যাপার, একথা আজকাল সকলেই জানেন। শ্লথ কম্পনে খাদ সুর, দ্রুত কম্পনে চড়া সুর উৎপন্ন হয়। নৃত্যের সময় পা ফেলিবার হিসাবের উপর যেমন দৃষ্টি রাখিতে হয়, আর তাহাতেই নৃত্যের আনন্দ, গান গাহিবার সময়ও সুরগুলির কম্পনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তাহা বাছিয়া ব্যবহার করিতে হয়, আর তাহার ভিতরেই গীতের আনন্দ।

এই আনন্দ শৃঙ্খলার আনন্দ। শৃঙ্খলাটি থাকিলে আনন্দ আপনা হইতেই আসে। মধু খাইলে যেমন মিষ্ট লাগে, ইহাও সেইরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার; ইহার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হয় না। দর্শনশক্তি, ঘ্রাণশক্তির ন্যায় ইহাও একটি স্বাভাবিক শক্তি। ইহাকেই আমি বলিতেছিলাম "স্বাভাবিক সুরবোধ"। বিভিন্ন সুরের কম্পনের ওজনের মধ্যে শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় আছে কি না, 'সুরবোধ' অথবা 'কান' হইতেছে তাহাই অনুভব করিবার —অর্থাৎ সুর চাখিবার—শক্তি।

একটি সুর বাজিতে সেকেণ্ডে একশত বার কম্পন হয়, আর একটি বাজিতে দুইশত বার কম্পন হয়, আর একটি বাজিতে তিনশত বার হয়, আর একটি বাজিতে চারিশত বার হয়, এইরূপ ব্যাপারকেই বলি 'কম্পনের ওজনের শৃঙ্খলা'। কখন কি ওজনে কম্পন হইতেছে, গানের সময় তাহা গণিয়া দেখা সম্ভব নহে, কিন্তু আমাদের কান এমনি আশ্চর্য্য জিনিস যে গণিবার পূর্ব্বেই সে তাহা ঠিক করিয়া বসে। অবশ্য, সে 'একশত কম্পন' 'দুইশত কম্পন' এরূপ কিছু বলে না; সে বলে মিষ্ট, বিশ্রী,— অথবা, শিক্ষিত হইলে, সা পা—এইরূপ।

ভালরূপ শিক্ষা পাইলে এই শক্তি যে কতদূর মার্জ্জিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ 'শ্রুতি'। সেই শক্তির দ্বারা চালিত হইয়াই প্রাচীন সঙ্গীতকারেরা শ্রুতির ব্যবহার করিয়াছিলেন, আর সেই শক্তি ম্লান হওয়াতেই আমরা তাহা লইয়া এত ভাবনায় পড়িয়াছি।

কথাটাকে পরিষ্কার করিয়া বলার আগ্রহেই আমি একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলাম। কিন্তু বিষয়টি যে এতদপেক্ষায় অনেক জটিল, সে কথা চাপা দিলে চলিবে না। এত সূক্ষ্ম সুর যে বাস্তবিক ব্যবহার হয়, গীতসূত্রসার-কর্ত্তা তাহা স্বীকার করেন না। আমাদের দেশের অনেক শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতাচার্য্যও সে কথায় সায় দিয়া থাকেন। 'সঙ্গীতসারে' 'অতি কোমল' ঋ গ আর ধ'র ব্যবহার দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু সে ত কেবল তিনটি সুর মাত্র। ২২টি শ্রুতির সবগুলিই যে কাজে লাগে, বাঙ্গালা দেশের সঙ্গীতে তাহার কোন প্রমাণ নাই।

ইহার উপরে আবার প্রাচীন পুস্তকেও সকল স্থলে ২২টি শ্রুতির উল্লেখ নাই, কোন কোন জায়গায় বেশীর কথাও বলা হইয়াছে। যাহাদের ওকালতী করিতে হইবে, তাহারা কয়জন, একথায়ই যদি সন্দেহ থাকে, তবে কাজ একটু কঠিন হইয়া দাঁড়ায় বৈকি? যাহা হউক, আমরা সংখ্যা-নির্ণয়ের জন্য ব্যস্ত না হইয়া, বস্তুগুলিকে একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লই।

বস্তুগুলিই যে সঙ্গীতের ব্যবহারোপযোগী খাটি সুর, একথায় অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সে সন্দেহ যদি সঙ্গত হয়, তবে ত আর কোন কথা বলিবারই প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং সকলের আগে এ কথারই মীমাংসা হওয়া দরকার।

আমাদের দেশে সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় অনেকদিন পূর্ব্বে এ বিষয়ের চর্চ্চা করেন। তাহার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, শ্রুতিসকল বাস্তবিকই সঙ্গীতে ব্যবহারোপযোগী আধুনিক নাদশাস্ত্রসম্মত গণিতসিদ্ধ স্বর। প্রায় বারো বৎসর হইল, তাঁহার গবেষণার ফল একটি তালিকার আকারে 'সঙ্গীত-প্রকাশিকায়' মুদ্রিত হয়।
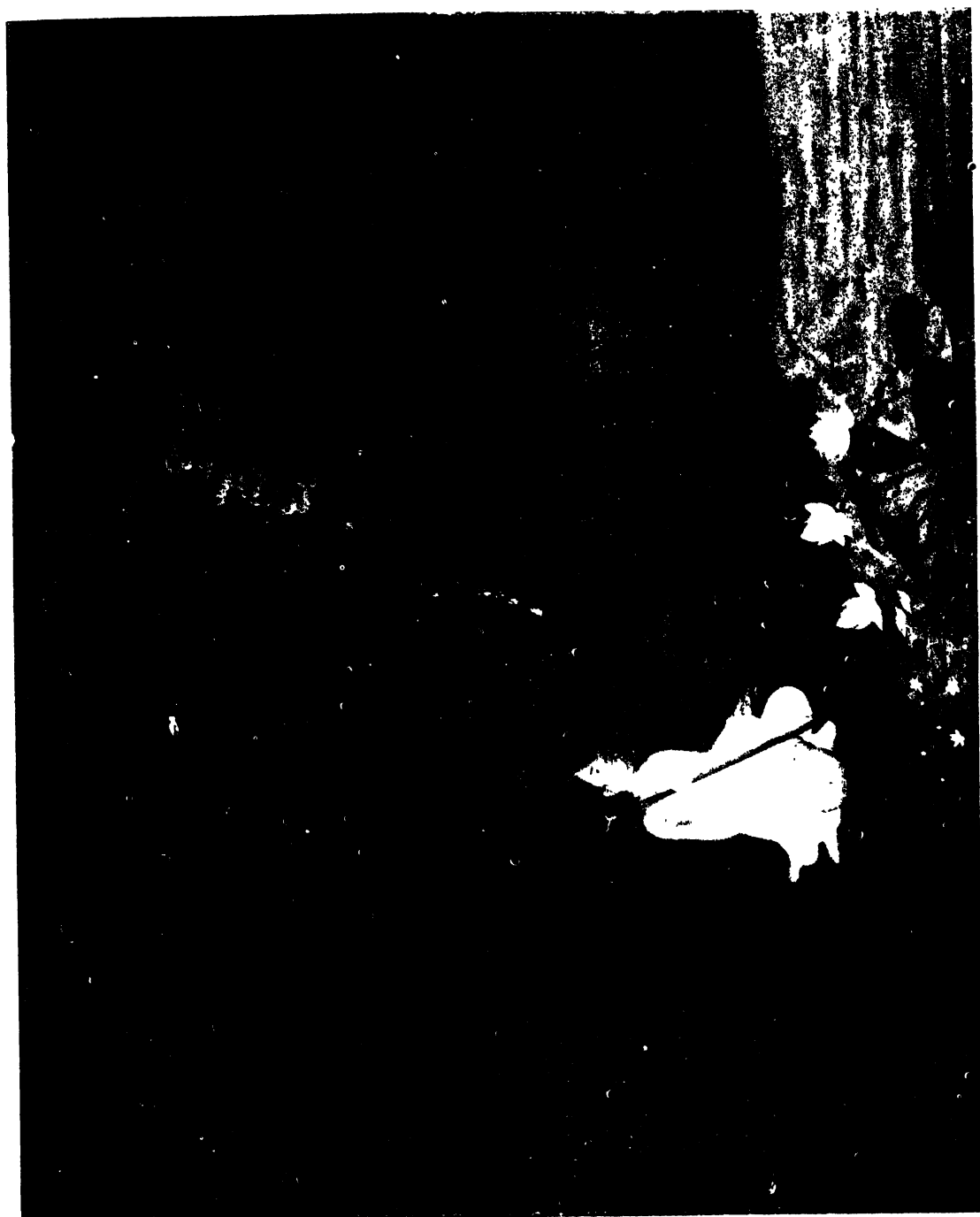
দুঃখের বিষয় সারদাবাবু সেই গবেষণার প্রণালী সম্বন্ধে কোন সংবাদই প্রকাশ করেন নাই, কাজেই তাঁহার সিদ্ধান্ত কতদূর প্রামাণ্য তাহার বিচারও হইতে পারে নাই।

ইহার পরে, গত ১৯১০ সালে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণজী বল্লাল দেবল মহাশয়ের "The Hindu Musical Scale and the Twenty two Shrutees" নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাখানি আটবৎসরের গভীর গবেষণার ফল। কোলাপুর দরবারে সঙ্গীতাচার্য্য আবদুল করিম একজন অতি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ, শ্রুতি সকলের তারতম্য তিনি ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং বলিবামাত্র গাহিয়া শুনাইতে পারেন। দেবল মহাশয় নিজে আধুনিক নাদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। আবদুল করীমের সহায়তায় তিনি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে এ বিষয়ের চর্চ্চা করেন। আট বৎসর এইরূপ পরীক্ষার পর তিনি শ্রুতিসকলের যেরূপ মূল্য নিরূপণ করেন, উক্ত পুস্তিকাখানিতে তাহার তালিকা আছে। ঐ তালিকায় বাইশটি শ্রুতির কম্পনের যে সকল অনুপাত লেখা হইয়াছে, তাহার ১৮টি অবিকল সারদাবাবুর তালিকায় লিখিত অনুপাতের অনুরূপ। এসকল সিদ্ধান্ত যে বাস্তবিকই প্রামাণ্য, এই ঐক্য তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

চারিস্থলে অনৈক্য হওয়াতে কোনরূপ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। শ্রুতির সংখ্যা যে ঠিক বাইশটি নহে, দেবল মহাশয়ও একথা বলিয়াছেন। ওস্তাদদিগের মধ্যে নানারূপ সম্প্রদায় (School) আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরাই মোটের উপর ২২টি শ্রুতি ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহা সকল স্থলে ঠিক এক জিনিস নহে। সকলের তহবিল মিলাইয়া দেখিলে বাইশটির অধিক শ্রুতি পাওয়া যাইবে।

এস্থলে একটা কথা উঠিতেছে। বিভিন্ন স্বরের কম্পন সংখ্যার মধ্যে একটা সহজ সম্বন্ধ থাকিলে তবেই তাহা সঙ্গীতে ব্যবহারের উপযোগী হয়, অর্থাৎ সেই-সকল স্বরই শুনিতে মিষ্ট শুনায়। অন্যরূপ স্বর শুনিতে মিষ্ট হয় না, তাহাকে আমরা বলি 'বেসুরা'। শ্রুতির সংখ্যা যদি এতই হইল, তবে তাহাদের বেলায় কম্পনের সহজ সম্বন্ধ সকল স্থলে রক্ষা হয় কিরূপে?

এ কথার উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। আমরা চলিত ১২টি স্বাভাবিক এবং কড়িকোমল স্বর ব্যবহার করিবার সময় যতটুকু সূক্ষ্ম হিসাব করি, শ্রুতির ব্যবহারে বাস্তবিক তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম হিসাবের প্রয়োজন হয় না। গ'র পর ম গাহিতে, অথবা ম'র পর গ গাহিতে যে ওজনে স্বরকে চড়ান বা নামান হয়, স্বাভাবিক স্বরের পর কড়ি কোমল গাহিতেও ঠিক সেই ওজনে চড়ান বা নামান হয়।

ইহা ত বেশ সহজ হিসাবই হইল। শ্রুতির হিসাবও ইহা অপেক্ষা কঠিন বা জটিল নহে। গ আর ম'র তফাৎটুকু খাটাইয়া যেমন সাধারণ কড়ি কোমল পাইয়াছি, গ আর কোমল গ'র তফাৎটুকু খাটাইয়া তেমনি অবশিষ্ট শ্রুতি কয়টিকে পাইতে পারি।

স্বরে স্বরে যে মিল (concord) হয়, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটি স্বরকে পাইয়াছিলাম।

(অসমাপ্ত)

হারামণি

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন। কবিওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা, জারিওয়ালা বাউল দরবেশ ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের।]

তোমার বাঁশী।

ধন্য আমি বাঁশীতে তোর আপন মুখের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি নাইবে কোনো দুখ॥
ত্রিলোকধাম তোমার বাঁশী, আমি তোমার ফুঁক।
ভালমন্দ রন্ধ্রে বাজি, বাজি সুখ আর দুখ॥
সকাল বাজি, সন্ধ্যা বাজি, বাজি নিশুইত রাত।
ফাগুন বাজি, শাঙন বাজি, তোমার মনের সাথ॥
একই বারেই ফুরাই যদি কোনো দুঃখ নাই।
যেন সুরে গেলাম বাইজ্যা আর কি আমি চাই॥

গানটি খুব প্রাচীন। ফরিদপুর জেলার ফরিদপুরের একশত বৎসর পূর্ব্বেকার গায়ক ভদ্রঠাকুর এই গানটি গাহিতেন, তিনিও জানিতেন না গানটি কার রচিত।

সংগ্রাহক—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

বাংলা বানান

আমাদের এই যে দেশকে মুসলমানেরা বাঙ্গালা বলিতেন তাহার নামটি বর্ত্তমানে আমরা কিরূপ বানান করিয়া লিখিব শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় চৈত্রের প্রবাসীতে তার আলোচনা করিয়াছেন।

আমি মনে করি এর জবাবদিহি আমার। কেননা আমিই প্রথমে বাংলা এই বানান ব্যবহার করিয়াছিলাম।

আমার কোনো কোনো পদ্যরচনায় যুক্ত অক্ষরকে যখন দুই মাত্রা হিসাবে গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখনই প্রথম বানান সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক হইতে হইয়াছিল। "ঙ্গ" অক্ষরটি যুক্ত অক্ষর—উহার পূরা আওয়াজটি আদায় করিতে হইলে এক মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। সেটা আমার ছন্দের পক্ষে যদি আবশ্যক হয় ত ভালই, যদি না হয় তবে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

এক-একটি অক্ষর প্রধানত এক-একটি আওয়াজের পরিচয়, শব্দতত্ত্বের নহে। সেটা বিশেষ করিয়া অনুভব করা যায় ছন্দরচনায়। শব্দতত্ত্ব অনুসারে লিখিব এক, আর ব্যবহার অনুসারে উচ্চারণ করিব আর, এটা ছন্দ পড়িবার পক্ষে বড় অসুবিধা। যেখানে যুক্ত অক্ষরেই ছন্দের আকাঙ্ক্ষা সেখানে যুক্ত অক্ষর লিখিলে পড়িবার সময় পাঠকের কোনো সংশয় থাকে না। যদি লেখা যায়—

> বাঙ্গলা দেশে জন্মেছ বলে
> বাঙ্গালী নও তুমি;
> সন্তান হতে সাধনা করিলে
> লভিবে জন্মভূমি—

তবে আমি পাঠকের নিকট "ঙ্গ" যুক্ত-অক্ষরের পূরা আওয়াজ দাবি করিব। অর্থাৎ এখানে মাত্রাগণনায় বাঙ্গলা শব্দ হইতে চার মাত্রার হিসাব চাই। কিন্তু যখন লিখিব, "বাংলার মাটি বাংলার জল" তখন উক্ত বানানের দ্বারা কবির এই প্রার্থনা প্রকাশ পায় যে "বাংলা" শব্দের উপর পাঠক যেন তিনমাত্রার অতিরিক্ত নিশ্বাস খরচ না করেন। "বাঙ্গলার মাটি" যথারীতি পড়িলে এইখানে ছন্দ মাটি হয়।

> ঝিঙা না ভাজিয়া ভাজিলে ঝিঙ্গা
> ছন্দ তখনি ফুকিবে শিঙ্গা।

এই গেল ছন্দব্যবসায়ী কবির কৈফিয়ৎ।

কিন্তু শুধু কেবল কাব্যক্ষেত্রে ডিক্রি পাইয়াই আমি সন্তুষ্ট থাকিব না, আমার আরো কিছু বলিবার আছে। বীরেশ্বর বাবুর মতে মূল শব্দের সহিত তদ্ভব শব্দের বানানের সাদৃশ্য থাকা উচিত। যদি তাঁর কথা মানিতে হয় তবে বাংলার বানান-মহালে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। এই আইন অনুসারে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তার গোটাকতক নমুনা দেখা যাক্ শাঁখ—শাঙ্খ্। আঁক—আঙ্ক্। চাঁদ—চান্দ্। রাগ—রাক্ষ আমি—আহ্মি।

হয়ত বীরেশ্বর বাবু বলিবেন, হাঁ এইরূপ হওয়াই উচিত। তাঁর পক্ষে ভালো নজিরও আছে। ইংরেজিতে বানানে-উচ্চারণে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক, পরস্পরের মাঝখানে প্রাচীন শব্দতত্ত্বের লম্বা ঘোমটা। ইংরেজিতে লিখি ট্রেআস্‌উরে (treasure) পড়ি ট্রেজার; লিখি কৃনৌলেডগে (knowledge) পড়ি নলেজ্, লিখি রিঘ্‌টেওউস (righteous) পড়ি রাইটিয়স। অতএব যদি লিখি পাক্ষী অথচ পড়ি পাখী, লিখি বিদ্যুলি পড়ি বিজুলি, লিখি শ্রবণিয়াছিলাম পড়ি শুনিয়াছিলাম, বিলাতিমতে তাহাতে দোষ হয় না।

কিন্তু আমাদের দেশের নজির উল্টা। প্রাকৃত ও পালি, বানানের দ্বারা নির্ভয়ে নিজের শব্দেরই পরিচয় দিয়াছে পূর্ব্বপুরুষের শব্দতত্ত্বের নহে। কেননা বানানটা ব্যবহারের জিনিস, শব্দতত্ত্বের নয়। পুরাতত্ত্বের বোঝা মিউজিয়ম বহন করিতে পারে, হাটে বাজারে তাহাকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করিতে হয়। এইজন্যই লিখিবার বেলায় আমরা "সোনা" লিখি, পণ্ডিতই জানেন উহার মূল শব্দে একটা মূর্দ্ধন্য ণ ছিল। এইজন্যই লিখিবার বেলা গাম্‌ছা না লিখিয়া আমরা গামলা লিখি, পণ্ডিতই অনুমান করেন উহার মূলশব্দ ছিল কুম্ভ। আমরা লিখিয়া থাকি আঁতুড় ঘর, তাহাতে আমাদের কাজের কোনো ক্ষতি হয় না—পাণ্ডিত্যের দোহাই মানিয়া যদি অন্ত্র-কুট্ট ঘর বানান করিয়া আঁতুড় ঘর পড়িতে হইত তবে যে শব্দ প্রাচীনের গর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে তাহাকে পুনশ্চ গর্ভবেদনা সহিতে হইত।

প্রাচীন বাঙালী, বানান সম্বন্ধে নির্ভীক ছিলেন, পুরানো বাংলা পুঁথি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। আমরা হঠাৎ ভাষার উপর পুরাতত্ত্বের শাসন চালাইবার জন্য ব্যস্ত

হইয়াছি। এই শাসন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি অন্যান্য নানা উপসর্গের মত চিরদিনের মত বাঙালীর ছেলের আয়ুক্ষয় করিতে থাকিবে। কোনো অভ্যাসকে একবার পুরানো হইতে দিলেই তাহা স্বভাবের চেয়েও প্রবল হইয়া ওঠে। অতএব এখনো সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত। সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অনেক আছে, এবং চিরদিন থাকিবেই— সেখানে সংস্কৃতের রূপ ও প্রকৃতি আমাদের মানিতেই হইবে,—কিন্তু যেখানে বাংলা শব্দ বাংলাই সেখানেও সংস্কৃতের শাসন যদি টানিয়া আনি, তবে রাস্তায় যে পুলিস আছে ঘরের-ব্যবস্থার জন্যও তাহার গুঁতা ডাকিয়া আনার মত হয়। সংস্কৃতে কর্ণ লিখিবার বেলা মূর্দ্ধণ্য ণ ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য, কিন্তু কান লিখিবার বেলাও যদি সংস্কৃত অভিধানের কানমলা খাইতে হয় তবে এ পীড়ন সহিবে কেন?

যে সময়ে ফোর্ট-উইলিয়াম হইতে বাংলা দেশ শাসন সুরু হইয়াছিল সেই সময়ে বাংলা ভাষার শাসন সেই কেল্লা হইতেই আরম্ভ হয়। তখন পণ্ডিতে ফৌজে মিলিয়া বাংলার বানান বাঁধিয়া দিয়াছিল। আমাদের ভাষায় সেই ফোর্ট-উইলিয়মের বিভীষিকা এখনোও তাই গৌড়সন্তানের চোখের জলকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য যেখানে আমাদের পিতামহেরা "সোনা" লিখিয়া সুখী ছিলেন সেখানে আমরা সোণা লেখাইবার জন্য বেত ধরিয়া বসিয়া আছি।

কিন্তু ফোর্ট-উইলিয়ামের বর্ত্তমান দণ্ডধারীদের জিজ্ঞাসা করি—সংস্কৃত নিয়মমতেও কি সোণা কাণ বিশুদ্ধ বানান? বর্ণন হইতে যদি বানান হয়, তবে কর্ণ হইতে কি কাণ হইবে? রেফ লোপ হইলেও কি মূর্দ্ধণ্য ণ তার সঙীন খাড়া করিয়া থাকিতে পারে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূতন শিক্ষা ও প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা

নূতন বলিতেছে আমাকে বরণ করিয়া লও; আমি মৃত প্রাচীনের উত্তরাধিকারী; প্রাচীনের মধ্যে যাহা-কিছু জীবনপ্রদ ছিল, যাহা-কিছু সুন্দর এবং মধুর ছিল, সেগুলি অঙ্গীভূত করিয়া আসিয়াছি। নূতনের ডাকে যখন উদ্বুদ্ধ হইতেছিলাম, তখন আমাদের পাড়ার টোলের অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, যে, প্রাচীন তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে, সে দান বা will করিয়া কাহাকেও কোন সম্পত্তি দিয়া যায় নাই; সে যদি মরিত, তবে তিনিই সর্ব্বাগ্রে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পাইতেন। অধ্যাপক মহাশয়ের সহজ কথা এই, যে, তোমরা উপার্জ্জনের সুবিধার জন্য নূতনকে আশ্রয় করিতে পার, কিন্তু যদি আধ্যাত্মিকতা চাও, এদেশের বিশেষত্বটুক হারাইতে না চাও, তবে প্রাচীনকে ছাড়িও না। টোলের অধিপতিরা নূতনকে চিনেন না, কাজেই তাঁহাদের কথা উপেক্ষা করিতে পারিতাম; কিন্তু যাঁহারা নূতনের আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতেও কয়েকজন নামজাদা পুরুষ প্রাচীনের ঐ বিশেষত্বের কথা বলিতেছেন। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন ও প্রাচীনকে একসঙ্গে বরণ করিবার কথা উঠিয়াছে। নূতনে যাহা নাই, সেই আধ্যাত্মিকতাটি কি, এবং কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতিতে উহাকে আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা কেহ বলেন নাই। একবার তাহার অনুসন্ধান করিব।

যাহা আমাদের চাই, এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রে তাহা চতুর্বর্গে বিভক্ত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাণে-প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহা কাম্য, চাতুরীর সঙ্গে সংসার চালাইবার জন্য যাহার প্রয়োজন, নূতনে সেই দুই বর্গের শিক্ষা ষোল আনা আছে বলিয়াই স্বীকৃত হইতেছে। বাকী রহিলেন ধর্ম্ম ও মোক্ষ। মোক্ষ হইল, ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও পরলোক-তত্ত্ব লইয়া; আর ধর্ম্ম হইল, সেই-সকল আচার ও অনুষ্ঠান লইয়া, যাহা অংশত ইহলোকের সহিত ও অংশত ব্রহ্ম-তত্ত্ব এবং পরলোকের সহিত সম্পর্কিত। মানুষ ইন্দ্রিয়সংযম করিবে, দয়ালু হইবে, সত্যবাদী হইবে, পরের উপকার করিবে,—এগুলি ধর্ম্মবর্গের অন্তর্গত। ধর্ম্মবর্গের বাহ্যিক আচার সম্বন্ধে দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে প্রভেদ

আছে; কিন্তু যে আভ্যন্তরিক গুণগুলির নাম করিলাম, তাহাদের সম্বন্ধে বড় মতভেদ নাই। এই কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মসাধনা না করিলে, যে, মোক্ষের কথায় অধিকারই জন্মে না, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা আরব্ধ হইতেই পারে না, ইহাই হইল এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রের কথা। কাজেই দেখিতে হইতেছে, যে, নূতনে ধর্ম্মের গৌরব স্বীকৃত হইলেও তাহার আশ্রয়ে এই ধর্ম্ম-পরিচর্য্যার ব্যবস্থা আছে কি না, এবং থাকিলেও নূতন শিক্ষা-পদ্ধতিকে প্রাচীনের সহিত তুলনায় ভাল বলা যাইতে পারে কি না? একালে ধর্ম্ম শব্দ মোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং Morality-র তর্জ্জমায় নীতি শব্দ ধর্ম্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভাষায় যে ব্যবহার স্থায়ী হইয়াছে তাহাকে অনুসরণ করিয়া ধর্ম্ম অর্থে বহুস্থানে নীতি শব্দই ব্যবহার করিব। দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণগুলি যখন আধ্যাত্মিকতা লাভের উপায়, তখন ঐ গুণগুলি কিরূপে জন্মে ও কিরূপে বাড়ে তাহার সন্ধান লইব; কারণ তাহাতে নূতন ও প্রাচীনের মধ্যে কাহার শিক্ষাপদ্ধতি ভাল তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে।

মানুষের যে-সকল ধর্ম্মের (এ যুগের ভাষায় 'নীতির') কথা বলিয়াছি, সেগুলির বীজ যে ভাবেই শরীরে বা মনে উপ্ত থাকুক না কেন, অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকিলে যে উহাদের নামের কোন অর্থ হয় না, তাহা সুস্পষ্ট। মানুষকে পরের শরীরের মধ্যে বাস করিয়া জন্ম লইতে হয়, পরের আশ্রয়ে বাড়িতে হয়, পরের সহিত দল বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, পরকে খুসী করিয়া সুখী করিয়া আপনাকে সুখে বাঁচাইবার উপায় করিতে হয়। অন্যকে ছাড়িলে চলে না, বরং অন্যকে আমার আপনার করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ আমার স্বার্থ-ই হইল এই, যে, পরের সুখ সুবিধা দেখিতে হইবে অর্থাৎ পরার্থপর হইতে হইবে। আমাদের পরার্থপরতা, যে, স্বার্থপরতার-ই রূপান্তর মাত্র, সেই সহজ কথাটুকু বুঝাইবার জন্য কয়েকটি বড় সহজ কথার উল্লেখ করিয়াছি। অন্যের সঙ্গে মিলিলেই যে-গুণগুলি বাড়িবার পথ পায়, সে গুণগুলি যে কোণ-ঠেসা ক্ষুদ্র সমাজ অপেক্ষা বহুপ্রসারিত বড় সমাজে অধিক আছে, তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল প্রথমে পরস্পরে লড়াই করিয়াছে, তাহার পর লড়াইয়ের পরিচয় হইতেই একটু একটু কাছে আসিয়াছে, এবং তাহার পর অধিকতর স্বার্থের বুদ্ধিতে—অর্থাৎ স্বার্থপরতার বুদ্ধিতে মিলিয়া মিশিয়া সামাজিক প্রসার বাড়াইয়াছে। মিলিবার পূর্ব্বে ঝগড়া অবশ্যম্ভাবী; ঝগড়া লড়াই না হইলে বৃহত্তর সমাজের উৎপত্তি হয় না। মানুষে মানুষে সংঘর্ষণ না হইলে সভ্যতার জন্ম হইতে পারে না, গৃহের কোণের সুশীতল শান্তি তাহার মৃত্যুর কারণ। এই কথা বুঝিয়াই কঁৎ নামক ফরাসী পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, যে, মানব-সমাজের প্রসার যত বাড়িতেছে এবং বাড়িবে ততই যথার্থ ধর্ম্ম বাড়িয়া উঠিতেছে ও উঠিবে। 'ছোট' না বুঝিলে যেমন 'বড়' বুঝি না, 'গরম' না বুঝিলে যেমন 'ঠাণ্ডা' বুঝি না, 'ঝগড়া,' 'লড়াই' না বুঝিলেও তেমনি 'মিত্রতা' বুঝি না। সমাজের দাঙ্গাহাঙ্গামাকে ধর্ম্মের জন্মসময়ের প্রসববেদনা বলা চলে।

একদিন আর্য্যদের বিভিন্ন দলের মিলনে এবং আর্য্যের সহিত দ্রবিড়াদি জাতির মিশ্রণে এ দেশের সামাজিক প্রসার খুব বাড়িয়াছিল। এখন প্রাচীনতার ভ্রান্ত দোহাই দিয়া, বর্জ্জনবিধি অনুসরণ করিয়া, আমাদের সমাজকে সঙ্কুচিত করিতেছি না ত? ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থানের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছি না ত? যাঁহারা অমিশ্র প্রাচীনতার আশ্রয়ে আছেন তাঁহাদের শিক্ষার ফল দেখিয়া প্রচলিত রকমের প্রাচীনতার শিক্ষার উপযোগিতা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

একদিন শতাধিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের একটি সভার কোণে গিয়া দাঁড়াইলাম। সভায় যে গভীর তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল তাহার পরিচয় দিতেছি। যে ডিঙ্গী-নৌকায় চড়িয়া ভয়ে ভয়ে গঙ্গা পার হইতে হয়, তাহা অপেক্ষা কত অধিক দীর্ঘ বা প্রস্থ হইলে, সে নৌকায় পা দিলে কিছুতেই জাতি বজায় থাকে না, এই হইল প্রথম গভীর সমস্যা। ঐ প্রসঙ্গে একথাও বিচারিত হইতেছিল, যে, সেই ঘৃণিত আয়তনের নৌকাখানি যদি বাবুঘাট হইতে ৪৩ মাইলের অধিক দূর চলিয়া যায় তাহা হইলে সেই নৌকার কোন আর্য্য-আরোহী তুষানলে মরিলেও জাতি বাঁচাইতে পারেন কি না? নৌকার আয়তন এবং মাইলের পরিমাণ প্রভৃতির সংখ্যা এত সূক্ষ্মভাবে গণিত

হইতেছিল, যে, সে সংখ্যা-বিচারের কাছে সাংখ্য-তত্ত্ব ছোট হইয়া গেল। বেদান্তে বেদের অন্ত পাওয়া গিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু ইহাঁদের সাগরান্ত বিচারে সিদ্ধান্ত হইল, যে, এ দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশ দেখিলেই সর্ব্বনাশ হইবে। সোডা, মিঠাপানি, এবং অন্যবিধ কোন কোন পানীয়, বাদে যে লোকবিশেষের ছোঁয়া কোন পদার্থ খাইলে আধ্যাত্মিকতা ভস্ম হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে অনেক বিত্তাদ্ঘটিত তত্ত্ব-ও উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।

কালাপানিতে ভাসিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, কেননা আজ-কাল ডুবুরী নৌকায় যাত্রীদের নৌকা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। সুস্থ শরীরে খাইবার বিষয়ে ধরা-কাট হইলে কিছু গোল হয় বলিয়া, পাড়ার অধ্যাপক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে, খাদ্যে খাদ্যে (বিশেষ মাংসে মাংসে) যে আধ্যাত্মিক প্রভেদ আছে, তাহা বিচার না করিয়া চলিলে সমাজের কাছে দোষের ভাগী হইতে হইবে কেন? পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন, যে, যাহা খাইলে শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট না হইলেও আধ্যাত্মিক কষ্ট হয়, অর্থাৎ স্বর্গে যাইবার পথ বন্ধ হয় তাহা নিষেধ করিতেই হইবে। পণ্ডিত মহাশয় একথাও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে নিষিদ্ধ খাদ্যে শারীরিক স্বাস্থ্যও নষ্ট হয়। খ্রীষ্টান এবং মুসলমান যে হিন্দু অপেক্ষা অসুস্থ তাহার প্রমাণ নাই; আর যদি প্রমাণ থাকেই তাহা হইলেই বা কি? একজন যদি গোটাকতক আচার মানিয়া চলে, কিন্তু যদি তাহার ধর্ম্মপ্রাণতা না থাকে, তাহা হইলেই কি তোমরা তাহাকে সমাজ হইতে তাড়াইয়া দাও? আধ্যাত্মিকতার পর্ব্বতাধ বিচারে কি তোমরা লোকের জাতি-মারা বা জাতি-রাখার ব্যবস্থা কর? যদি না কর, তবে অনাধ্যাত্মিক খাদ্য খাইয়া আমি যদি নিজের স্বর্গের পথে নিজে কাঁটা দিই, তাহা হইলে তুমি আমার জাতি মারিতে আসিবে কেন? ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে তোমরা যে-সকল খাদ্য অস্বাস্থ্যকর বলিয়া মনে করিয়াছ, সে খাদ্য খাইলে না হয় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে বলিয়া স্বীকার করিলাম; কিন্তু তাহাতে আমার জাতি যাইবে কেন? ঐ ত তুমি সেদিন নিজে বৈদ্যের নিষেধ না শুনিয়া জর-গায়ে রসগোল্লা খাইয়া ভুগিলে, তাহাতে কি তোমার জাতি গিয়াছিল? দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিয়া তোমার পুত্রের জর বিকারের কারণ হইলে এবং কিছুতেই বাড়ীর ময়লা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য বলিয়া না বুঝিয়া বাড়ীসুদ্ধ সকলকে রুগ্ন করিয়া তুলিলে তাহাতে কি তোমার জাতি গিয়াছে? আমি অনাধ্যাত্মিক আচারে অসুস্থ হইব কল্পনা করিয়া আমাকে দেশছাড়া করিতে আসিবে কিন্তু প্রত্যক্ষরকম ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে আমার কোন দোষ হইবে না। একি বিচার ঠাকুর? অধ্যাপক আমাকে অভিসম্পাত দিয়া চলিয়া গেলেন। অর্থাৎ দেখা গেল যে যাহাতে সামাজিক প্রসার না বাড়ে, অভিজ্ঞতা না বাড়ে, নিজে নিজে পথ চলিবার ক্ষমতা না বাড়ে অর্থাৎ যাহাতে যথার্থ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়, প্রচলিত রকমের প্রাচীনতার ধুয়ায় তাহাই ঘটিতেছে। এত ক্ষুদ্র, অসার, উপহাসাস্পদ ও সমাজক্ষয়কর বিষয় লইয়া যাঁহারা পাণ্ডিত্য করেন তাঁহাদের শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা হওয়াই স্বাভাবিক। সামাজিক প্রসারের পথ রোধ করিয়া, অর্থাৎ ক্ষুদ্র স্বার্থকে পরার্থপরতায় বাড়াইবার উপায় নষ্ট করিয়া, অর্থাৎ যথার্থ ধর্ম্মকে পায়ে দলিয়া যাঁহারা আধ্যাত্মিকতা খুঁজিতেছেন, তাঁহারা প্রতারিত। শুদ্ধ আচারের নামে পৃথিবী সুদ্ধ লোককে না ছুঁইয়া যাঁহারা স্নাত শরীরটিকে ব্রহ্ম-সান্নিধ্যের উপযোগী করিতেছেন, তাঁহাদের মুক্তি নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্ম অর্জ্জন না করিলে, "অথ, অতঃ" বা তাহার পরের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় কাহারও অধিকার নাই।

জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক ও সংঘর্ষণে যে শিক্ষা হয় ও ধর্ম্মলাভ ঘটে, বালকেরা তাহাদের খেলায় ও ঝগড়ায় অজ্ঞাতসারে তাহাই লাভ করে। গাছে চড়িয়া, সাঁতার কাটিয়া, ফুটবল খেলিয়া, কোলাহল ও মারামারি করিয়া, বালকেরা যে ধর্ম্ম লাভ করে, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের পড়া মুখস্থ করিয়া তাহা লাভ করা অসম্ভব। টোলের অধ্যাপক মহাশয় বলিবেন, যে, উপনয়নের পর হইতেই শিশুর দাপাদাপি বন্ধ করিয়া গুরুগৃহে শিষ্টাচার ও বিদ্যাশিক্ষা করাই প্রাচীন আদর্শ! কথাটি সত্য। গৃহ্যসূত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিতে আছে, যে, শিক্ষার্থী বালকেরা সাঁতার কাটিবে না, গাছে চড়িবে না, দৌড়ধাপ করিবে না, দাঁত মাজিবে না, দর্পণ দূরে থাকুক জলেও আপনার ছবি দেখিবে না, হাসিবে না, গান গাহিবে না, এবং গম্ভীর হইয়া অতি গম্ভীর গুরুর উপদেশ লইবে। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, যে

যাহারা লেখাপড়া শিখিতে পারিয়াছিল, তাহারা এই অস্বাভাবিক নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া বিস্তর দাপাদাপি করিত; গুরুপত্নীর জন্য তেঁতুল পাড়িয়া আনিত, পাড়ার মেয়েদের গালি হজম করিয়া তাহাদের কলসী বুকে দিয়া সাঁতার কাটিতে শিখিত, এবং শিষ্টাচারের জড়বন্ধন এড়াইয়া মানুষ হইয়া উঠিত। গুরুদের যে হাসিতে নাই, দৌড়াইতে নাই, সে কথা আমরা নূতন শিক্ষায়ও ভুলিতে পারি নাই। 'ভদ্রলোকের' পক্ষে ছুটাছুটি করা অশিষ্টাচার, অর্থাৎ একটু বয়স হইলেই সকলকে বুজ্‌রুক সাজিতে হইবে।

খেলার খেয়ালে মুক্ত-বাতাসে দৌড়ধাপ করিয়া যাহারা আনন্দের আস্বাদে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারা 'বনং ব্রজেৎ' এর বয়সেও শরীরকে জড় করিয়া বজরুক সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। পরিশ্রমবিমুখের সুপুষ্ট ভুঁড়ি যে বিলাস-লালসার দুর্গ, একথা হয়ত গোঁসাই গোবিন্দ এবং মহন্তদের দৃষ্টান্তে অস্বীকৃত হইবে; কিন্তু শারীর ক্রিয়ার বিজ্ঞান বুঝাইতেছেন যে যেখানে মুক্ত আকাশতলায় ছুটাছুটি এবং উচ্চহাস্য আছে সেখানেই আত্মজয়ের ও সংযমের যে উপাদান আছে, তপস্যা-শীর্ণ শরীরে তাহা নাই। সুগম্ভীর বুজ্‌রুকের কাছে যাহাদের চলা-ফেরা হাসি-তামাসা প্রভৃতি আধ্যাত্মিকতার বিরোধী ও আসুরিক বলিয়া বিচারিত হয়, তাহারা যেমন সমুদ্রে নৌকা-ডুবির সময় স্থিরবুদ্ধিতে পরকে বাঁচাইয়া নিজে ডুবিয়া মরিতে পারে, কোন নির্জন-গৃহের মন্ত্রসাধক সহসা তেমনটি করিতে পারেন কি? আধ্যাত্মিকতার বিচার কি কেবল পরলোকেই হইবে? স্ত্রীলোকের মুখ দেখিব না বলিয়া শিষ্টাচার ফাঁদিলে যে স্ত্রীলোক কেবল বিলাসেরই সহচরী, এই বুদ্ধিকেই বিশেষ করিয়া বাড়াইয়া তোলা হয়, এবং ইহার ফলে তপস্যার নির্জন কোণে বসিয়াই, অতিদূরে উর্বশীর আঁচলের বাতা সুতাটুক দেখিয়াই বিকার রোগে মরিতে হয়। বিরোধের ভিতর দিয়া না চলিলে দম বা মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। জড়ভরতদিগকে কর্মবিমুখ করিয়া আরও জড় করিয়া রাখিবার অভিসন্ধিতে যদি কোন মায়াবী তোমাদের আধ্যাত্মিকতার প্রশংসা করিয়া প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করিতে বলে, তবে হে ভরত! হে ভারত! তুমি প্রতারিত হইও না।

বড়ই দুঃখ হয়, কিসে আমরা ভাল হইব, বড় হইব, উন্নত হইব, সে চিন্তা চুলায় গেল,—আর পণ্ডিতের ছুতারের মাপকাঠি লইয়া নৌকার আয়তন দেখিয়া আধ্যাত্মিকতার বিচার করিতে বসিলেন, খাদ্যতত্ত্বের জ্ঞানে অতিবড় মূর্খ হইয়াও আধ্যাত্মিকতার মাকড়সার জাল বুনিতে বসিলেন। কথা এই, শিক্ষার কুপদ্ধতিতে, প্রাচীনতার যাহা ভাল, যাহা পুষ্টিকর, যাহা জীবন-প্রদ, তাহা ইহারা ধরিতে পারিতেছেন না। শিখাইবার পদ্ধতির দোষে যে ভাল কথাও কিরূপ অসার হইয়া উঠে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

যে বয়সে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া না করিলে ভাত হজম হয় না, চুল ধরিয়া টানিয়া মাকে না কাঁদাইলে মায়ের কোলে শুইয়া ঘুম হয় না, অর্থাৎ যে সময়ে শিশুরা মা ছাড়া কাহাকেও জানে না এবং যথার্থ মাতৃভক্তিতে শরীর এবং মন পূর্ণ থাকে, সেই সময়ে শিশুপাঠ্য পুস্তকে মাতৃ-ভক্তি শিখাইবার জন্য যে অদ্ভুত উপদেশ মুদ্রিত হয় তাহার সহিত হয়ত সকলেই পরিচিত। "মাতাকে ভক্তি করিবে, কারণ তিনি তোমাকে নয় মাস, নয় দিন গর্ভে ধারণ করিয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন।" সৌভাগ্যের বিষয় এই কুশিক্ষার বিষ বালকদিগকে ছুঁইতে পারে না, কারণ তাহারা শরীরে রক্তপাতের ভয়ে 'ভক্তি'র বানান মুখস্থ করিতেই ব্যস্ত থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে মনুসংহিতায়ও মাতৃভক্তির ঐ কারণ দেওয়া হইয়াছে। যে সংহিতাতেই থাকুক, অভক্তি বাড়াইবার এমন উপদেশের জোড়া পাওয়া ভার। যে সহজ মাতৃভক্তি, কেবল ভালবাসিয়াই প্রাণের টানে বাড়িয়া উঠিতে পারে, এবং যাহা মা অথবা সন্তানের অন্য কোন স্বার্থজনিত দুর্ব্যবহারে মলিন হইতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে একটা উপদেশ দেওয়াই বিড়ম্বনা।

নূতন পদ্ধতির মাহাত্ম্য বুঝাইবার সুবিধার জন্য, পুরাতন পদ্ধতির আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। নীতিশিক্ষা বলিলে আমরা এখন সকলেই Moral training বুঝিয়া থাকি। বালকদের নীতিশিক্ষার জন্য যে-সকল ছত্র আবৃত্তি করান হয় তাহার মধ্যে একটি এই যে,—মিথ্যা কথা কহিও না, কারণ মিথ্যা কথা কহিলে পরমেশ্বর রাগ

করেন ও দণ্ড দিয়া থাকেন। দশ আজ্ঞাই হউক, আর বিশ আজ্ঞাই হউক, ঐ আজ্ঞাগুলি যে উপদেশের আকারে হজম করিলে হজমশক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং আজ্ঞাগুলি অসার হইয়া পড়ে সে কথা না হয় প্রথমতঃ নাই ধরিলাম। কিন্তু মিথ্যা কথা না কহিবার কারণস্বরূপে বালকেরা একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা শিখিবে কেন? পরমেশ্বরকে যাহারা দৈবাৎ খুব ভাল করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহারাও কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে পরমেশ্বরের ক্রোধ, দ্বেষ প্রভৃতি কিছু আছে? জুজুর ভয় না দেখাইলে যদি নীতিশিক্ষা দেওয়া না চলে, তবে না হয় জুজু বা ভূতের রাগ করিবার কথা মিথ্যা করিয়া শিখাও, কিন্তু গোড়াতেই পরমেশ্বরকে একটা হীন জুজু বা কুৎসিত ভূত করিয়া তুলিবে কেন? শিব গড়িতে পার না বলিয়া শিবকে বান্দর করিয়া গড়িবার তোমার অধিকার নাই। নীতিশিক্ষার মন্ত্র খুঁজিয়া যদি শিশুপাঠ্য বইগুলি বাড়াইতেই হয়, তবে যে উপদেশে উপদেশের মাহাত্ম্য নষ্ট না হয় তাহারই কতকগুলি ত লিখিয়া দিলে চলে। পাঠ্যপুস্তকের কর্তারা লিখিয়া দিতে পারেন যে, পায়ে না চলা অন্যায়; মুখ দিয়া না খাইলে দোষ হয়; নাক দিয়া নিশ্বাস টানা সত্যন্ত উচিত; ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাতে সত্য কথাও শিখান হইবে, কোন গোলযোগও ঘটিবে না।

নীতিশিক্ষার মন্ত্র মুখস্থ করিলে কিম্বা নির্জ্জনে বসিয়া ঐ মন্ত্রগুলির ধ্যান ধারণা করিলে যদি মানুষ সুচরিত্র হইয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে কিছু না খাইয়া কেবল খাইতেছি খাইতেছি বলিয়া ধ্যান করিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইতে পারে। একজনের স্বার্থের সঙ্গে যেখানে অন্যের স্বার্থের বিরোধ ঘটিতে পারে সেখানেই নৈতিক ব্যবহার বা সাধুতা অসাধুতার কথা উঠিতে পারে। যেখানে অন্যের সঙ্গে একজনের কোন সম্পর্ক নাই, অন্যকে কিছু বলিবার বা জানাইবার নাই, সেখানে সেই লোক যদি একটি গাছ দেখে তবে সে কখনও নিজের মুখে আওড়াইয়া এই মিথ্যা কথা বলিবে না যে সে যাহা দেখিতেছে, সেটা গাছ নহে, সেটা ঘোড়া। মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিশিতেই হইবে, এবং পরস্পরের মিশিবার পর অবস্থাক্রমে কখনও বা মিথ্যা কথা কহিবার, কখনও বা চুরি করিবার এবং কখনও বা অন্য প্রকার ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে। বালকদের খেলা-ধুলা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা এই সময়ে অসাধু ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া সাধুতাকে শরীর ও মনের প্রাকৃতিক অবস্থা করিয়া তুলিতে পারে। বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া কোন বিশেষ প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবার পূর্ব্বে সেই প্রবৃত্তির সংযমের শিক্ষা নিতান্ত নিরর্থক নয় কি? কেহ জন্মের পূর্ব্বে পাঠশালায় গিয়াছে তাহার ইতিহাস নাই।

নূতন বলিতেছেন, আমি প্রাচীন দার্শনিক পদ্ধতিটাকে সামূল ধ্বংস করিয়া প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষকে মানুষ করিতে চাই। নিজের মনেই "আত্মরতি ও আত্মক্রীড়া" চলিবে না, তুমি যে আত্মস্থ হইয়া মাকড়সার মত নিজের পেট হইতেই নিজের জাল বাহির করিয়া দর্শন রচনা করিবে, তাহা চলিবে না, নিজের মনের কল্পবৃক্ষের তলায় বসিয়া ধ্যানের বলে এবং ইচ্ছার বলে যত খুসী কল্পনাবৃক্ষের কল্পফল খাইবে তাহাও চলিবে না। মানুষকে মানুষের সঙ্গে লড়াই করাইয়া মনুষ্যত্ব আনিয়া দিব, স্বার্থের প্রেরণার ভিতর দিয়া পরার্থপরতা ফুটাইয়া তুলিব, প্রতি মুহূর্ত্তের অনুভূত প্রত্যক্ষ পদার্থের মাঝেই এমন কিছু দেখাইব, যাহা তোমাদের দার্শনিক অধ্যাত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম দোয়াস মিলাইয়া দিতে চাহিতেছে।

হাসিয়া খেলিয়া যেমন আমাদের শরীরে কতকগুলি বাধা বিপদ এড়াইবার শক্তিকে প্রাকৃতিক করিতে হইবে, মানসিক বিকাশ এবং চরিত্র গড়নের জন্যও সেইরূপ প্রথা অনুসরণ করিতে হইবে। নূতনের এই শিক্ষা-পদ্ধতিটি বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক বালক আপনার স্বাভাবিক কৌতূহলে যাহা জানিতে চায়, অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিতে চায়, একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া তাহাকে তাহা শিখাইলেই সুশিক্ষা দেওয়া হয়, এবং বালকও হাসিয়া খেলিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারে। আমরা কিন্তু বালকের জিজ্ঞাসা চাপিয়া রাখিয়া, অনিচ্ছুক অতএব অমনোযোগী বালককে যাহা সে শিখিতে চায় না তাহাই শিখাইয়া থাকি। গল্পে আছে, যে, এক বালক-জামাই নদীর বিপুল খানা দেখিয়া, সে খানার মাটি কোথায় গেল বলিয়া শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এবং বুদ্ধিক শ্বশুর তাহার উত্তরে

বলিয়াছিলেন, যে, সে মাটির অর্দ্ধেক তিনি খাইয়াছেন এবং অপর অর্দ্ধেক বালকের পিতা খাইয়াছে। বাপ এবং শ্বশুরের কসুরে অনেক ছেলে ও জামাইকে মূর্খ হইতে হইতেছে। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 'বস্তুবিচার' বইখানি কবে প্রকাশিত হইয়াছিল জানি না, কিন্তু বেশ মনে আছে যে প্রায় ৪৪।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা ঐ বইখানি লইয়া কত আনন্দ অনুভব করিত। যুবকদের পাঠ্য দুর্গেশ-নন্দিনী ও মৃণালিনীর দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকাইত না। বালকেরা সাজি মাটি, নারিকেল তেল, ও কলি চুন খুঁজিয়া 'সাবাং' গড়িত এবং সোরা গন্ধক ও ভাঙ্গা কড়ার মরিচা আনিয়া 'আতস বাজি' তৈয়ারি করিত। নিজেদের গড়া অপদার্থ 'সাবাং', অপবিত্র পদার্থে প্রস্তুত নয় জানিয়া, বুড়াদিগকে দেখাইয়া দেখাইয়া সেই 'সাবাং' দিয়া পৈতা পরিষ্কার করিত, কারণ বুড়ারা বকিলেই বালকেরা 'সাবাং'-এর উপাদানের কথা শুনাইবার ইচ্ছা পোষণ করিত। বইখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল না বলিয়া, উহার প্রতি আসক্তির জন্য বালকদিগকে বেশ তিরস্কৃত হইতে হইত বলিয়া মনে আছে। পদার্থতত্ত্ব জানিবার জন্য বাল্যকালেই যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়, তাহা বানান মুখস্থের ঝড়েই নিবিয়া যায়। সকল কৌতূহল পিষিয়া মারিবার পর যখন কলেজে ৩ বৎসর পড়িয়া তাড়াতাড়ি বিদ্যাশেষ করিবার সময় হয়, তখন সর্ব্বপ্রথম পদার্থতত্ত্বের সহিত পরিচয়ের সুবিধা হয়। সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে, সে সময়ে সকল বিদ্যাই দর্শনশাস্ত্রের মত ওগ্রাইয়া গিলিয়া সডিগ্রী হজম করিতে হয়, এইজন্য অধিকাংশ ছাত্রের মনে কৌতূহলের উদ্দীপনা জন্মে না, এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় চরিত্রের মূল ভিত্তি যেরূপ পাকা হইয়া গড়িয়া উঠিবার কথা, তাহা হয় না। জড় এবং উদ্ভিদাদির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে যে নৈতিক বল বাড়ে, তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি।

একটি পদার্থের একটি গ্রেনেরও অনেক ক্ষুদ্রভাগ অতি সাবধানে ওজন করিয়া আর একটি পদার্থের ক্ষুদ্র অংশের সহিত মিশাইলে একটি ফল লাভ করিতে পারা যাইবে, এখানে আন্দাজ একেবারেই চলিবে না, একটু অসাবধান হইলে সকল পরিশ্রম নষ্ট হইবে, এবং ফলের দ্বারাই পরীক্ষিত হইবে যে ওজনাদি ঠিক হইয়াছে কি না। একবার ভুল হইলে আর একবার দুই ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া প্রত্যক্ষ ফলটুকু লাভ করিতে হয়। বাল্যকাল হইতে এই পদ্ধতিতে কাজ করিলে সাবধানতা যে কত বাড়ে, এবং সত্যনিষ্ঠার মূল যে কত দৃঢ় হয়, তাহা কি বুঝাইয়া বলিতে হইবে? একটি গাছের ডাঁটার অংশ এমন করিয়া চোস্ত হাতে কাটিয়া লইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বসাইতে হইবে, যাহাতে কোন-প্রকারে আঁত জড়াইয়া না যায়, কোন-প্রকারে দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখিতে তিলমাত্র গোল না হয়। কোন-প্রকারে যবস্তব করিয়া গোঁজামিল দিয়া কাজ করিলে চলিবে না। 'প্রায় ঐ রকমই,' অথবা 'কি জানি কেমন' বলিলে দর্শনশাস্ত্র হইতে পারে, কবিতা হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলিতে পারে না। চিন্তার জড়তা এড়াইবার জন্য, সুস্পষ্টতাকেই আদর্শ করিবার জন্য এমন শিক্ষা কি আর আছে? একটি অতি ক্ষুদ্র প্রজাপতির পাখার অতি ক্ষুদ্র অংশ, নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধন মুক্ত করিয়া, পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করিতে হইলে যে ধীরতা এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, কোন কৈবল্য লাভের যোগচর্চ্চায় তাহা হয় না। যাহারা স্বাভাবিক কৌতূহল উদ্‌বুদ্ধ করিয়া আনন্দ সহকারে কাজ করিতে করিতে, অতর্কিতভাবে এতগুলি গুণকে মনের প্রকৃত অবস্থায় পরিণত করিতে পারেন, তাহাদের শিক্ষার সহিত কি কোন যোগ-তপস্যার শিক্ষা তুলিত হইতে পারে? টোলের ছাত্রেরা মনে রাখিবেন যে দ্রব্য ও গুণাদির সংখ্যা মুখস্থ করিয়া গেলে পদার্থ-তত্ত্বের জ্ঞান হয় না, এবং তাহাদের সেই জ্ঞানের গ্রন্থ এখন কেবল প্রাচীন জ্ঞানের ইতিহাসেই উল্লিখিত হইবার যোগ্য—উদ্দীপ্ত কৌতূহলে হাতে-কলমে কিছু না শিখিলে, বিদ্যাও হয় না, উদ্ভাবনী শক্তিও জন্মে না।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অর্থ, মনের কৌতূহল ও সন্দেহ বাড়াইয়া নূতনের পর নূতন শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া। আমাদের মনে একটা বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া দেওয়া, একটা Scientific mood of mind লাভ করা, নূতন শিক্ষার উদ্দেশ্য। নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শিখিলে, কাব্য ইতিহাস প্রভৃতি পাঠেও মনে ঐ প্রকৃতি ও শক্তি লাভ করা যাইতে পারে। মানুষ এই

নূতন শক্তি লাভ করিলে, নিজেই নূতন পদ্ধতিতেই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বল, আর যাহাই বল, নিজেই লাভ করিতে পারিবে। শাস্ত্র মুখস্থ করিলে কেবল অনর্থক কথার রাশি বাড়িবে, কিন্তু কোন ফল হইবে না। এই শিক্ষা-পদ্ধতির অভাবেই, 'অতি সত্য,' 'ভারি সনাতন,' এবং 'বেজায় আধ্যাত্মিক' কথাগুলি, অকর্ম্মশীলার নুড়ির মত পড়িয়া আছে; উহা ভাঙ্গাও যায় না, ব্যবহারেও লাগে না। ভূতত্ত্ববিদেরা এই নুড়িগুলির কোন নামকরণ করেন নাই। ইংরেজি কথায় উহাদিগকে Cant বলে, কিন্তু আমরা ঐ আধ্যাত্মিকতার শব্দগুলিকে গুণের হিসাবে, গুড়িয়া কথা ধার করিয়া 'অকর্ম্মশীলা' বলিতে চাই।

নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা, একটু স্বতন্ত্রভাবে বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাঠকেরা বলিতে পারেন, যে, এই নূতন শিক্ষায় মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল বাড়িতে পারে, এবং তাহার ফলে জড়-তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, সমাজের উৎপত্তি ও স্থিতির তত্ত্ব, সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইতে পারে, সুখ সুবিধার জন্য, অনেক কল-কৌশল উদ্ভাবিত হইতে পারে, শিক্ষা-পদ্ধতির গুণে ধৈর্য্য ও সংযম প্রভৃতি বাড়িয়া চপলতা দূর হইতে পারে, কিন্তু উহাই কি যথেষ্ট? আত্মার কথা, আত্মার অধিষ্ঠিত পরমাত্মার কথা কি উপেক্ষিত হইবে? উত্তরে বলিতে পারি যে মানুষ যে-কৌতূহলে ও জ্ঞান পিপাসায় বিশ্ব-বিশ্লেষণে নিযুক্ত হয়, তাহা অধ্যাত্ম-তত্ত্বের জিজ্ঞাসায় নিরস্ত হয় না। যে কারণে এই পদ্ধতির নামে নাস্তিকতার অপবাদ আছে, তাহা খুলিয়া বলিলেই সন্দেহ দূর হইবে।

নূতন পদ্ধতিতে নিজে পরীক্ষা করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হয় বলিয়া অর্থাৎ পরের মুখে শুনিয়া বা শাস্ত্রে পড়িয়া কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে নাই বলিয়া, অভ্রান্ত শাস্ত্র ও সর্ব্বজ্ঞ গুরু আদপেই স্বীকৃত হয় না। যে অতি-অল্প জ্ঞান-বল লইয়াও নৃ-তত্ত্বের আলোচনা করে, তাহাকেও অতি বড় মনস্বী ও তত্ত্ব-দর্শী ডারউইনের দোহাই দিয়া কিছু মানাইতে পারা যায় না। বিজ্ঞানের ছাত্র যে গুরু মানিবে না এই কথা একজন শিক্ষক বা গুরু এই ভাষায় বলিয়াছেন:—"He should not be biassed by appearances; have no favourable hypotheses; be of no school, and *in doctrine* have *no master.* He should not be a *respecter of persons*, but *of things.* * গুরু বলিয়াছেন অথবা শাস্ত্রে লেখা আছে এই অজুহাতে কোন সত্যের বা তত্ত্বের কথায় কেহ দাঁড়ি দিয়া বসে না। পরীক্ষা করিয়া গুরুর কথায় ভুল দেখাইলে পাতক হয় না। 'কুঁটে ছেলে' হইয়া ঋষির বচন না মানিলে অপ্রশংসার কথা হয় না, বরং উন্নতির পর উন্নতি আনিবার প্রযত্নের জন্য অক্ষম ব্যক্তিও প্রশংসিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের ক্রমোন্নতির প্রত্যক্ষ-বিশ্বাসে যদি কেহ বেদ বাইবেলের উক্তিকে চরম জ্ঞান বলিয়া না মানে, যদি কেহ কোন ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেষ্টার পায়ের গোড়ায় গরুড় পক্ষীর মত হাত জুড়িয়া বসিয়া না থাকে, তাহা হইলেই কি তাহাকে নাস্তিক বলিবে? যাহারা জ্ঞানের বিষয়টিকে অনুসরণ করে এবং তত্ত্বের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাবান, তাহারা কদাচ জ্ঞানীবিশেষের মূর্ত্তি খাড়া করিয়া পূজা করিতে বসিতে পারে না।

কেহ বলিতে পারেন, যে, ছোট-খাট জ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা খাটে, মোক্ষ-তত্ত্বের কথায় তাহা খাটে না, মোক্ষ-তত্ত্বের কথা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি যাহা জানিয়া ফেলেন এবং শাস্ত্রে লেখেন তাহা না বুঝিয়াই সত্য বলিয়া ধরিতে হয়। ইহার উত্তরে নূতনের শিষ্যেরা বলেন, যে, মন্ত্রদ্রষ্টারা এবং ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রেরা তাহাদের রচিত শাস্ত্রে, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি অতি ছোট বিষয়ের কথাও লিখিয়াছেন, পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে যে তাহাদের ঐ ছোট বিষয়ের সিদ্ধান্তগুলি ভুল। যাহারা ছোট বিষয়ে ভুল করিয়াছেন, তাঁহারা যে বড় বিষয়ে বা মোক্ষ-তত্ত্বে খাঁটি সত্য বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। বহুসমাজের সহিত যতই পরিচয় বাড়িতেছে ততই প্রমাণিত হইতেছে, যে, মনুষ্যত্ব বিধানের উপায় বা সত্য, কোন লোকবিশেষে বা জাতিবিশেষে বা দেশ বিশেষে প্রকাশিত বা আবিষ্কৃত হয় না। চতুর্ব্বর্গের কোন বর্গের কথাতেই বাবা শাস্ত্র চলিতে পারে না। উহার শাস্ত্র প্রত্যেক দেশে প্রতিদিনই রচিত হইতেছে। জাতি- ও দেশভেদ না করিয়া, যেখানে যাহা আবিষ্কৃত,

* J. A. Thomson's Progress of Science.

যাহা-কিছু যে-কোন স্থানে মানুষের হিতকর বলিয়া সুপরীক্ষিত, তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতাই যথার্থ মনুষ্যত্ব। সকল দেশ হইতে ভাল জিনিস সংগ্রহ করাকেই ম্যাথিউ আর্নল্ড্ নামক কবি ও সমালোচক Culture আখ্যা দিয়াছেন। যাহাকে Culture বলি, যাহা Scientific mood of mind নামে উক্ত হইয়াছে, উহাই ধর্মলাভের ও মোক্ষ-তত্ত্বের গোড়ার কথা বা বীজমন্ত্র। দেশের প্রভেদে বা জাতির প্রভেদে সত্যে সত্যে প্রভেদ ঘটে নাই। কোনও সত্যের শরীরে কোনও জাতির ছাপ নাই; যাহার গায়ে জাতিবিশেষের ছাপ আছে, যাহা দেশান্তরের মানুষকে জ্ঞানে বা ধর্মে বড় করিতে পারে না, তাহা খাঁটি সত্য নহে। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের মাথায় একটা hat নাই, কিংবা আর্য্যভট্টের সিদ্ধান্তের মাথায় একটা টীকি নাই। ফরাসী পণ্ডিতের সমাজবিজ্ঞান বুঝিতে হইলে বেং-এর ঝোল খাইতে হয় না, এবং কপালে ফোঁটা না কাটিলেও গীতার আলোচনা করা চলে। সুবৃহৎ মানবসমাজকে দূরে রাখিয়া হিন্দুর বিশেষত্বের গর্ত্তে ডুবিলে অতি সঙ্কুচিত হইয়া অন্ধকারে ডুবিতে হইবে; বিশ্বের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিতে না পারিলে বিশ্ব-প্রাণকে চিনিতে পারিবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ভারতে বর্ণভেদ

(Emile Senart এর ফরাসী হইতে *)

কতকগুলি সাধারণ ধারণা।

আমরা প্রায়ই বলি—"কাস্ট্" (Caste)। জিনিসটা খারাপভাবে আলোচিত হইলেও শব্দটার খুবই পসার। যাই হোক, ইহার ব্যুৎপত্তি বিদেশীয় এবং আমদানিটাও খুব হালের। আমরা পোর্টুগীজদের নিকট হইতে "কাসটা" (Casta) শব্দ পাইয়াছি, যাহার অর্থ বংশ (race)।

যখন মালাবার উপকূলের হিন্দুদিগের সহিত পোর্টুগীজদের কারবার আরম্ভ হয়, পোর্টুগীজরা তখনই লক্ষ্য করিয়াছিল,—এই হিন্দুদের মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ আছে। বিভাগগুলি বংশানুক্রমিক, রুদ্ধদ্বার এবং ব্যবসায়ের বিশেষত্ব অনুসারে উহাদের ভেদাভেদ নির্ণীত হয়। আমাদের পুরোহিত-শাসনতন্ত্রের পদমর্য্যাদার ন্যায় এই বর্ণভেদেও উচ্চ-নীচতার সোপান-পরম্পরা আছে। নিম্নতম বর্ণগুলির সহিত সর্ব্বোচ্চ বর্ণগুলির যাহাতে কোনপ্রকার সম্মিলন না ঘটে তজ্জন্য ঐ সর্ব্বোচ্চ বর্ণগুলি অন্ধভাবে আপনাদিগকে সযতনে রক্ষা করে। এই সকল বিভাগকেই পোর্টুগীজরা "কাস্ট্" নামে অভিহিত করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বে, ভারতের সহিত যে-গ্রীকেরা সর্ব্বপ্রথমে একটু ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, এই অপূর্ব্ব প্রথাটি তাহাদেরও চোখে পড়িয়াছিল। সেল্যুকসের দূত মেগাসথিনিস তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা কতকগুলি "ভগ্নাংশে"(১) বিভক্ত, এবং এই বিভাগগুলির অন্তর্ভূত ব্যক্তিরা—যে-বিভাগে জন্মিয়াছে সে বিভাগটি ছাড়া অন্য কোন বিভাগে যাইতে পারে না, বিবাহও করিতে পারে না, এবং নিজের কৌলিক ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতে পারে না।

অতএব তথ্যটি ত বেশ স্পষ্টই রহিয়াছে; তবে, ইহার বিশেষ অবস্থাগুলি আরও অধিক তমসাচ্ছন্ন। সকলের সম্বন্ধেই, বিশেষত বৈদেশিকের সম্বন্ধে, হিন্দুর ঘরোয়া জীবনটি একবারে রুদ্ধ-দ্বার,—একপ্রকার মর্য্যাদা-সঙ্কুচিত ভীরুতার দ্বারা সমাচ্ছন্ন; উহার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ নহে। তা ছাড়া, ভারতের সামাজিক গঠন, উহার কলকাঠিগুলির বিচিত্র ক্রিয়া,—সমধিকরূপে প্রচলিত প্রথার দ্বারাই নিয়মিত হইয়া থাকে। এই প্রথা স্থানানুসারে

* "Les castes dans L' Inde,"

(১) মেগাসথিনীস যে ৭ অংশের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অবশ্য গভীর জ্ঞান বা তথ্য ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা একটা কৌতূহলের বিষয় ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আমরা এই ৭ সংখ্যার কথা অবগত হই। অনেক জাতের ভিতরেই এই সংখ্যাটি সুপরিচিত। গ্রীকদিগের সাক্ষ্য যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তবে শেষ বিশ্লেষণে কি আমরা দেখিতে পাইব যে, কোন যুদ্ধপ্রথার সহিত গোলযোগ করিয়া উহারা ঐরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে? ইহাও আশ্চর্য্য—ইজিপ্টের জনসমাজ কতকগুলি বর্ণে বিভক্ত এই কথা বলিতে গিয়া হেরোডোটাসও ৭ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। তা ছাড়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থকারদের লেখায় এই সংখ্যারই একটু তারতম্য দেখা যায়। (দ্রষ্টব্য —Mallet—Les premiers etablissements des Grecs en Egypte, p. 410-11)।

বিভিন্ন, এবং এত জটিল যে ঠিক্ ধরা ছোঁয়া যায় না; কিন্তু প্রামাণিক কতকগুলি বচন-বদ্ধ আইনের সূত্রের দ্বারা উহা সহজে আমাদের অধিগম্য হইয়াছে। যে-সকল গ্রন্থকে আমরা সচরাচর আইনের সংগ্রহ-গ্রন্থ বলিয়া মনে করি তাহার প্রদত্ত আদেশ-উপদেশগুলিতে এমন কিছু নাই যাহা দেওয়ানি বিভাগ-সংক্রান্ত ব্যবহারে বাধ্যতামূলক বা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই-সকল গ্রন্থ ধর্ম্মগ্রন্থ,—যাজ্ঞবল্ক্যীয় গ্রন্থ। ইহার মধ্যে এমন অনেক ঔৎসুক্যজনক কথা আছে যাহা নিতান্তই অস্পষ্ট। অনেক বিষয় সম্বন্ধে, এই-সকল গ্রন্থে, বাস্তবের উপযোগী ঠিক্-ঠাক্ সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তে, ধর্ম্মতত্ত্ব-সংক্রান্ত একটা আদর্শের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে মাত্র। একে ত তথ্যের বৈচিত্র্য ও জটিল সংমিশ্রণ, তাতে আবার যথাযথ বিবর্ত্তিত আইনের কোন "থিয়োরি"র দ্বারা অনুশীলনের সাহায্য হওয়া দূরে থাক্ আরো বেশী গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই "থিয়োরি" বা সিদ্ধান্তের প্রমাণ এত উচ্চে স্থাপিত যে, এই সিদ্ধান্তরূপ একটা বেড়া সত্ত্বেও, ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানের জন্য একটা মুক্ত পথ উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। এই ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানগুলি খুবই বিভিন্ন, এবং অপূর্ব্বদৃষ্ট সম্মিলনের একটা অতিমাত্র বৈচিত্র্যও ইহাতে আছে। ইহার কার্য্যফল সকল সময়েই ভাসমান ও অনিশ্চিত। জ্ঞাতব্য তথ্যের এইরূপ অসম্পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা পথভ্রান্ত হইয়া, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে দূরে চলিয়া গিয়া, এই দুরূহ বিষয় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলি যে সাধারণত সত্যের বিপরীত কতকগুলি সাদাসিধা সরল কথায় পর্য্যবসিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এই বিষয়ের তথ্যগুলি বড়ই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুর বর্ণভেদ-প্রণালীটি এইভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে যেন ইহা একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রণালী যাহার স্থিরতা অলঙ্ঘনীয়, যেন ইহার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষ একটা শৃঙ্খলে কতকগুলি পৈত্রিক ব্যবসায়ের মধ্যে চিরকালের জন্য আবদ্ধ, যেন ভাবী সামাজিক উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের স্বতঃচেষ্টার দ্বার একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ—যাহারা ধর্ম্মজীবনের ব্রতগ্রহণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবসায় অবলম্বন ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারে না, সৈনিকগণ—নিজ যোদ্ধৃশ্রেণী ছাড়া আর কোন শ্রেণীর মধ্য হইতে যাহাদের সংগ্রহ হইতে পারে না; প্রধানেরা—ক্ষত্রবংশ ছাড়া যাহারা আর কোন বংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না,—এই-সকল শ্রেণী স্মরণাতীত কাল হইতে অক্ষতভাবে নিজ নিজ প্রথা কঠোরভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে,—আমার মনে হয়, সাধারণত এই ভাবেই হিন্দুসমাজের আলোচনা হইয়া থাকে।

গত শতাব্দী হইতে, এইভাবে-গঠিত এই সমাজ-দেহ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া আসিতেছে। অদ্যকাল পর্য্যন্ত এই কুসংস্কারটি চলিয়া আসিয়াছে। জ্ঞানালোকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, নিজ কার্য্যগতিকে যাঁহারা স্থায়ীভাবে তথ্যাদির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, যাঁহারা তুলনামূলক আইনের আধুনিক উন্নতি হইতে আরম্ভ করিয়া হালে গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারাও বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এইভাবে আলোচনা করিয়াছেন—এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা উচ্চাভিলাষী কোন শ্রেণীবিশেষের ভাবিয়া-চিন্তিয়া-ঠিক্-করা, বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ণ অভিসন্ধির নিন্দাবাদ করিয়াছেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া এই সুযোগ্য ব্যক্তিগণ একটা ইচ্ছাকৃত অভিসন্ধি যে আরোপ করিয়াছেন, ইহাতেও প্রকারান্তরে ঐ পুরাতন ধারণারই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে কি বিস্মিত হইতে হইবে? তাহা হইলে প্রচলিত মুদ্রার ন্যায় যে সমস্ত ধারণা জনসমাজে প্রচলিত সেই-সকল ধারণার আধিপত্য কতটা বদ্ধমূল ও দীর্ঘস্থায়ী তাহা আমাদের ভুলিয়া যাইতে হয়। অন্তত: উহার দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে এই প্রশ্নটি অতীব দুরূহ। আবার ইহা একটা অনন্যসাধারণ ব্যাপার বলিয়া কম ঔৎসুক্যজনক নহে। ভারতবর্ষ ছাড়া এই প্রণালীর অস্তিত্ব আর কোথাও দেখা যায় না। অতএব প্রশ্ন সমাধানের কতকটা চেষ্টা করা অনুশীলনকারীর অযোগ্য নহে।

আজিকার দিনে এই সমস্যা সমাধানের যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এমন আর কোনদিন হয় নাই। সেই সঙ্গে ইহার কঠিনতাও একটু কমিয়া গিয়াছে। হিন্দু-য়ুরোপীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে যে একটা আত্মীয়তা প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই আত্মীয়তার সম্পর্কটা আশ্চর্য্যরূপে আমাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে; তাই ভারতের বিজয়ী আর্য্যগণ আজ

কাল আমাদের কৌতূহল আকর্ষণ করে। প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক মিল আছে (শুধু ধর্মের ঐতিহ্য সম্বন্ধে নহে পরন্তু সমাজ শরীরের উপাদান সম্বন্ধেও) সেই মিল অল্পে অল্পে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং প্রথমত ভাষার সাদৃশ্য এই-সকল আত্মীয়তার বন্ধনকে আরো দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। সময়ে সময়ে, এই ভাষা-সাম্য হইতে, প্রথা-সাম্য হইতে, শোণিত-সাম্য হইতে কতকগুলা ঐকান্তিক সিদ্ধান্ত কি স্থাপন করা হয় নাই? ইহা সুনিশ্চিত যে-সকল প্রতিষ্ঠান আমাদের সুদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষদিগের অতীতের উপর আধিপত্য করিয়াছিল, যাহা এখনো এই বর্ত্তমানকালে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যাহা বহু বিভিন্ন অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের পথে চলিয়াছে, সেই-সকল প্রতিষ্ঠানের একই উৎপত্তি-স্থান, ইহা মনে করিলে স্বভাবতই একটা অপূর্ব্ব ঔৎসুক্য জন্মে—একটা নূতন রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। যে-সকল জাতির মধ্যে ভাষার সাদৃশ্য হইতে আত্মীয়তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় প্রথমতঃ সেই-সকল জাতির প্রতিষ্ঠানগুলি তুলনা করিয়া দেখা হইয়াছিল। কিন্তু অতিশীঘ্রই এই গণ্ডিটি পার হইয়া আলোচনা আদিম-মানব-সুলভ বিভিন্ন সমাজ-গঠনকে আলিঙ্গন করিল। এই আলোচনায়, বিস্তারের হিসাবে, যে পরিমাণে লাভ হইয়াছিল, নিশ্চিত জ্ঞানলাভের হিসাবে সেই পরিমাণে কখন কখন ক্ষতি হইয়াছিল কিনা—একথা আমি ঠিক্ করিয়া বলিতে পারি না। অসামান্য মেধা পরীক্ষা চালাইবার জন্য এই-সকল দুঃসাহসিক, এমন কি অপরিণামদর্শী বিপুল উদ্যমের যে কোন ফল হয় নাই একথা বলা চলে না। ইহাতে করিয়া পর্য্যবেক্ষণশক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, দৃষ্টির সূক্ষ্মতা জন্মিয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সাবধান ও পরিণামদর্শী আলোচনার পক্ষেও অনেকটা লাভ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে অনেক দলিল-দস্তাবেজ সঞ্চিত হইয়াছে; আমরা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ও যথাযথ অনেক বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি। ভাইসরয়ের শাসন বিভাগের মুদ্রিত সরকারী কাগজপত্রের একটা ন্যায্য খ্যাতি আছে, যথা—বিগত বারের আদমসুমারীকে ভিত্তি করিয়া যে-সকল বিবরণী প্রকাশিত হয় এবং তাহার সহিত যে-সকল অতীব মূল্যবান তথ্যতালিকা সংযুক্ত হয়, কতকগুলি বিজ্ঞাপন, কতকগুলি প্রকৃত ধরণের মন্তব্যলিপি। যে সময়ে আমরা লব্ধজ্ঞান হইতে লাভ আদায় করিতে অধিকতর সমর্থ হইয়াছি সেই সময়েই আমরা অধিকতর জ্ঞান লাভও করিতেছি।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাব প্রদেশসম্বন্ধীয় (Nesfield ও Ibbetson) নেসফীল্ড ও ইবেটসন সাহেবের প্রণীত গ্রন্থে যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, সম্প্রতি "বঙ্গের শাখা-বংশ ও বর্ণভেদ সম্বন্ধে" রিজলী সাহেবের গবেষণা তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছে। নৃ-তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনায় যে প্রণালীটি সমুচিত, ঐ গ্রন্থে সেই প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে এবং শেষ পরিণামে তাহার গবেষণা জাতি-বর্ণনা-শাস্ত্রসংক্রান্ত একটি বিশাল শব্দকোষে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অসংখ্য তথ্যের সঙ্গে গ্রন্থকার উহাতে মোটের উপর তাঁহার সমস্ত মতামতের সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন। কত সতর্কতা ও কত প্রযত্ন সহকারে জাতিবৃত্তান্তের মূল-উপকরণগুলিকে একত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে, সংযত করা হইয়াছে, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। শ্রমসাপেক্ষ এই বিশাল অনুষ্ঠানে ন্যায্য বিশ্বাস থাকায় এবং এই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রন্থকার বিশেষ-বিশেষ শিল্পবিজ্ঞানের পারিভাষিক সমালোচকদিগকে নির্ব্বন্ধাতিশয়-সহকারে আহ্বান করিয়াছেন। আমি এই আহ্বানের সমুচিত উত্তর দিতে পারি এরূপ স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমি কেবল তাঁহার প্রত্যক্ষলব্ধ তথ্যগুলি হইতে, তাঁহার প্রদত্ত বৃত্তান্ত হইতে, কিঞ্চিৎ ফললাভ করিতে চাহি এইমাত্র। এই-সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ত্তমান তথ্যসমূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত। যাহা আমার নিজের আলোচ্য বিষয় সেই পুরাতত্ত্ববিদ্যা ও ইতিহাসের দিক দিয়া এই-সকল তথ্যের আলোচনা করিলে বোধ হয় কিছু লাভ হইতে পারে।

জাতের পরিচয়-লক্ষণ।

আমাদের মধ্যে এবং আমাদের সভ্যতার মধ্যে, সামাজিক তথ্য-সকল যে-আলোকে আমাদের নিকট প্রকাশ পায়;—আমাদের বাহিরে,—আমাদের সভ্যতার বাহিরে, —সামাজিক তথ্যসকল আমরা ঠিক্ সেই আলোকেই

বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই। এই অভ্যাসটি ছাড়িতে হইবে। এই অভ্যাসটি ভারতে লইয়া গেলে চলিবে না।

আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ, বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও স্থির-নির্দ্দিষ্ট বহুল নিয়মের জালে আবদ্ধ;—উহা অপূর্ব্বদৃষ্ট অভিনব বিষয়ের জন্য, বৈচিত্র্যের জন্য, বিরোধ সংঘর্ষের জন্য, যতদূর সম্ভব খুব কম স্থানই রাখিয়াছে।

আসলে ভারত প্রথার দ্বারা পরিশাসিত; এই প্রথার প্রভুত্ব যেমন দীর্ঘস্থায়ী তেমনি খামখেয়ালি; উহা বহু পরিবর্ত্তনশীল স্থানীয় প্রভাবের বশবর্ত্তী, উপস্থিত কাজের পক্ষে অতীব শক্তিমান, কিন্তু সুদূর ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি, সমগ্রের সামঞ্জস্যের প্রতি "খাতিরনদারদ্"। ইহা জটিলতার রাজত্ব,—সরল-রুচির একান্ত বিরুদ্ধ। মূল-শরীরের প্রতিকূলে কতকগুলি স্বতন্ত্র শরীর-যন্ত্র স্থাপন করিয়া, একটা গোল পাকাইয়া, সমস্তকে সঙ্কটাপন্ন করা হইয়াছে। মূল-শরীরটা ন্যূনাধিক কার্য্যোপযোগী হইলেও, উহার সহিত যে-সকল অবয়ব সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের একটা সুস্পষ্ট ভেদ এবং আত্ম-নিবদ্ধ একটা নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া সযত্নে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই, হিন্দুসমাজের সুদীর্ঘ অতীত সত্ত্বেও, আমাদের একাল পর্য্যন্ত, হিন্দুসমাজ আদিমকালসুলভ একটা অনুন্নত আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এই হিন্দুসমাজ হইতে এমন একটা রাষ্ট্রপ্রণালী পরিপুষ্ট হইয়া উঠে নাই যাহার সহিত আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রের তুলনা দূরে থাক্, প্রাচীন গ্রীকের অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ রাষ্ট্রপ্রণালীরও তুলনা হইতে পারে। যাহাকে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় নিয়ম বলা যায় সেরূপ কোন নিয়মপদ্ধতি না থাকায়, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও সমাজসংক্রান্ত প্রভাব,—ধীরে-ধীরে, পর-পর, এমন একটা বেগ সঞ্চালিত করিয়াছিল যে, সেই বেগ, সমস্তের উপর একটা সাধারণ মুখশ্রী মুদ্রিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে, সুস্পষ্ট পরস্পর-বিরুদ্ধ নিয়মগুলাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সমতলের মধ্যে আনিতে পারিয়াছে; কিন্তু উহা ঐক্য সম্পাদন করিতে পারে নাই, এবং একাকার সাধন করিতে আরও কম সমর্থ হইয়াছে, এমন-কি উহা জাতীয় একতাও সাধন করিতে পারে নাই,—এই ফাঁকটা বড়ই গুরুতর, ও নিগূঢ় অর্থব্যঞ্জক।

ভারতে আর্য্য-প্রবেশ অল্প অল্প করিয়া হইয়াছিল, অসমানভাবে হইয়াছিল। এমন-কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও আক্রমণকারী আর্য্যজাতির সংখ্যা এত অধিক ছিল কি না যে তাহাদের সেই সংখ্যাধিক্য, ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী আদিম জাতির লোকদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে কিংবা একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। দাক্ষিণাত্যে আর্য্যদিগের বিসর্পণ আরও সংযত ও বিলম্বিত ভাবে হইয়াছিল। সেইজন্য সমস্ত ভারতে আর্য্যজাতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক না হইলেও, সর্ব্বত্রই উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। অতএব বিজয়ী সভ্যতা, সমস্তের উপর যে-একটা "পালিশ" চড়াইয়া দিয়াছিল, সেই পালিস-সত্ত্বেও এমন কতকগুলা ব্যবহার, প্রথা, মনের গতি, প্রবৃত্তি রহিয়া গিয়াছে যাহার সহিত আর্য্যসভ্যতার সম্পর্ক নাই, অথবা যাহা আর্য্যসভ্যতার বিরোধী। আজিকার দিনেও, আদিম অধিবাসীর ন্যূনাধিকসংখ্যক কতকগুলি দল, আমাদের চোখের সামনেই, বিশাল ব্রাহ্মণ্যিক সমাজের সাধারণ কাঠামের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

এইরূপ ক্রিয়াশীল অথচ অস্থায়ী সংমিশ্রণের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলা জটিলতা ও অসংলগ্নতা যে আসিয়া পড়িবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করা যায়। সমস্ত অবস্থা হইতে একটা জীবন্ত ছবির ধারণা করিতে হইলে, ঐসকল জটিলতা ও অসংলগ্নতাকে কতদূর পর্য্যন্ত ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনা যাইতে পারে, তাহাও কতকটা বুঝা যায়। ব্যতিক্রম-স্থলের সীমা নাই; কিন্তু আবার খুব সাধারণ তথ্যগুলিই ঐসকল ব্যতিক্রমস্থলের পোষকতা করে। আলোচনার ভূমি এত বিস্তৃত যে, পদ্ধতিক্রমে ও সুশৃঙ্খলরূপে যে ব্যাখ্যা করা যাইবে তাহাও বৃহদায়তন হইয়া উঠিবে। আর সিদ্ধান্তের হিসাবে সমস্ত উপসংহার কাজেকাজেই অসম্পূর্ণ ও এক-হিসাবে ভ্রান্তিজনক হইবে—কেননা, জাতি-উপজাতির বৈচিত্র্য এতই বেশী। অতএব এক্ষণে আমি তথ্যের ব্যাখ্যা করিতেও চেষ্টা করিব না, সার-সিদ্ধান্তের হিসাবে উপসংহার করিতেও চেষ্টা করিব না। সমস্যাটি কিরূপে বেশ ভাল করিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে অন্ততঃ এইখানে তাহারই চেষ্টা করা আবশ্যক।

ভারত-অধিবাসীর মধ্যে যে-সব লোক জাত্যংশে নিশ্চয়ই

নিকৃষ্ট, ভৌগোলিক সংস্থান ও ইতিহাসের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও পৃথকৃকৃত, সংখ্যা-গৌরবের হিসাবে যাহারা গৌণ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাদিগকে আলাদা করিয়া ধরা যাক্; সমগ্র ভারতবর্ষ, আমাদের নিকট, শুধু কতকগুলা ব্যক্তিবিশেষের সমবায় বলিয়া মনে হয় না, পরন্তু কতকগুলা দলবদ্ধ সমাজের (corporative unities) সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। উহাদের সংখ্যা, চরিত্র, লক্ষণ, ও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের এত বিচিত্রতা যে তাহার অন্ত নাই, সর্ব্বত্রই উহারা অধিবাসী-লোকসংখ্যার অপরিবর্ত্তনীয় ও —আমার মনে হয়—অবশ্যম্ভাবী কাঠাম-স্বরূপ। সুবিস্তৃত প্রদেশসমূহে, গোষ্ঠী-সমাজ সংরক্ষিত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, চিরপ্রচলিত প্রথার হিসাবেই বল,—বিশেষতঃ কেন্দ্রবর্ত্তী শক্তির অক্ষমতার হিসাবেই বল, গ্রামের স্বায়ত্ত-শাসন-অধিকার খুব বিস্তৃত হইবারই কথা, কেননা, তাহার উত্তরাধিকারী ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্বে, গ্রামের কর্ম্ম-প্রণালীতে বড় একটা পাণ্ডিত্য বা নৈপুণ্য ছিল না। খাজনা আদায় করাই তাহার নিয়মিত কাজ ছিল, ইচ্ছা-করিয়াই ঐ কাজে সে আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু আমি যে সকল দলের কথা এইখানে বলিব মনে করিয়াছি তাহাদের কার্য্য-পরিসর ততটা সংযত বা সংকীর্ণ নহে। উহারা স্বভাবত কোন সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক বিভাগের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে। অনেকগুলি গ্রাম তাহাদের অধিকার-ভুক্ত; ঐসকল গ্রামের একই এলাকার মধ্যে তৎসদৃশ অপর-অনেকগুলি দলও তাহাদের সহিত একত্র "জড়পুটলি" হইয়া বাস করিতেছে। সংখ্যায় অসমান, ব্যবহারে বিরুদ্ধাচারী হইলেও তাহাদের এমন কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে যাহাতে-করিয়া তাহারা এক-পর্য্যায়-ভুক্ত হইয়াছে। তাহারা কতকগুলি বিশেষ নামে পরিচিত, কতকগুলি বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য তাহারা একত্র সমবেত হয়; উহারা খুব সতর্কতার সহিত অন্য দল হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, তাহাদের সহিত বিবাহের আদান-প্রদান করে না; ছোঁয়াছুঁয়ি করে না, একত্র বসিয়া আহারও করে না। এ সমস্তই নিষিদ্ধ। তাহাদের ব্যবসায়ের দ্বারাই তাহাদের ভেদ নির্ণয় হয়। এই-সমস্ত ব্যবসায় প্রত্যেকেরই বিশেষ-বিশেষ ও কুল-ক্রমাগত। উহাদের একটা বিচার শাসনের কর্ত্তৃত্ব ও অধিকার আছে, সেই অধিকারের বলে, স্বকীয় চিরপ্রচলিত প্রথা ও নিয়মাদি সম্যক্রূপে পরিচালিত হইতেছে কি না, তৎসম্বন্ধে তাহারা প্রখর দৃষ্টি রাখে ও তত্ত্বাবধান করে। ইহারাই "কাষ্ট" caste অথবা quasi caste ("কাষ্ট"-কল্প)।

ফলতঃ, এই-সমস্ত দলের মধ্যে একটা সাধারণ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, উহাদের ব্যবহার ও বিশিষ্ট কার্য্যের মধ্যেও কতকটা সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, উহাদের বৈচিত্র্য অতীব গভীর।

অনেকগুলি বৈচিত্র্য সম্পূর্ণরূপে স্থানীয়; এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা নিতান্তই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল। "নায়ির"দিগের যে অভিজাত-তন্ত্র মালাবার উপকূলের মধ্যেই আবদ্ধ, তাহা বহুপতি-বিবাহ প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মুসলমান-বিজয় ও বৈদেশিক উপাদানের নিত্য প্রসার,—দেশের সামাজিক প্রকৃতির উপর একটা সুস্পষ্ট ক্রিয়া প্রকটিত করিয়াছিল, সেই পঞ্জাবে, অসংখ্য শ্রেণীর লোক, যাহাদের জাতের (caste) প্রকৃত লক্ষণ পরিচায়ক নিয়ম বলা যায় সেই-সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত যথাঃ—পাঠান, বেলুচি,—যাহাদের নাম ন্যূনাধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ ভৌগোলিক উৎপত্তির সাক্ষ্য দেয়। ভারতের অপর সীমায়, বঙ্গদেশে অনেকগুলি সামাজিক দল আছে যাহারা ব্রাহ্মণ-উপদিষ্ট বর্ণভেদ-প্রণালীর যতটা সম্ভব কাছাকাছি গিয়াছে; অথচ উহাদের নামের দ্বারাই হউক, সমস্ত সাক্ষীগণের সমবেত প্রমাণের দ্বারাই হউক, উহারা অসম্পূর্ণরূপে-হিন্দু-গণ্ডীভুক্ত অনার্য্যের দল বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে; নিতান্ত যদৃচ্ছাক্রমে উহাদিগকে হিন্দু-সমাজপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বত্র। তাই, সর্ব্বত্র বংশ ও গোষ্ঠী সংক্রান্ত ধারণা, ও জাত (caste) সংক্রান্ত ধারণা ন্যূনাধিক পরিমাণে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তথাপি, জাতের যে-সকল অপেক্ষাকৃত সাধারণ লক্ষণ, সেই লক্ষণগুলা যতটা কাছাকাছি পারা যায় ঠিক্ করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; এবং অবনতিগ্রস্ত জাতগুলারও একটা সাধারণ আদর্শ বা ছাঁচ যতটা সম্ভব ঠিক্ করিতে হইবে।

প্রায়ই দেখা যায়, অনেকে, বিশেষতঃ ইংরেজি-ধরণে শিক্ষিত হিন্দুরা, যতটা পারে, আমাদের জাতির সহিত তাহাদের জাতের নৈকট্য স্থাপন করিবার জন্য এবং ভারত ও য়ুরোপের মধ্যস্থিত প্রাচীরটা নামাইয়া ফেলিবার জন্য অন্তরের সহিত চেষ্টা করে। তাহারা আমাদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক ভেদাভেদের সহিত, তাহাদের বর্ণভেদ-প্রণালীর তুলনা করিয়া থাকে। এই বর্ণভেদের মর্য্যাদা-সোপান-প্রণালী স্থানানুসারে একটু নড়চড় হইলেও, সকল প্রদেশেই লোকমতের প্রভাবে বেশ স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই বর্ণভেদের মর্য্যাদা-সোপান-প্রণালী হইতেই স্বভাবত তাহারা একটা ছুতা পাইয়াছে। তথাপি, আমাদের সামাজিক শ্রেণীসমূহের সহিত "কাষ্টের" অতীব দূর-সাদৃশ্য। "কাষ্টের" গঠন অন্য হিসাবে সুদৃঢ়, "কাষ্টের" কার্য্য-পরিসর অন্য হিসাবে স্থিরনির্দ্দিষ্ট। ইহা একটা প্রতিষ্ঠান, এবং মুখ্য রকমের প্রতিষ্ঠান।-

ভারতের অধিকাংশ লোক ইহার অন্তর্ভুক্ত শুধু নহে, ইহা সমস্ত সমাজের এরূপ একটা কাঠামের মত অবস্থিত, ইহা ধর্ম্মজীবনের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠরূপে অনুস্যূত, যে, যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায়, উহাকে সেই হিন্দুধর্ম্মরূপ অনির্দ্দিষ্ট অপরিস্ফুট শরীরের – সেই তরল ধরণের প্রথা ও বিশ্বাসাদির প্রাণ বা আত্মা না বলিয়া থাকা যায় না।

প্রচলিত মতবিরুদ্ধ (heterodox) কত অভিনব মতবাদ অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু শুধু মতামতের (thoretically) হিসাবেই হউক, সূত্রবদ্ধ কতকগুলি বচনের হিসাবেই হউক, অথবা মত-গত যুক্তিমত্তার বলে অপ্রত্যক্ষ-ভাবে প্রচলিত মতের বৈধতা আক্রমণ করিয়া উহার ভিত্তি-মূলকে শিথিল করা প্রযুক্তই হউক, ঐ-সকল অভিনব মতবাদ অন্তর্হিত হইয়াছে অথবা উদ্ভিদের ন্যায় কোনরূপে প্রাণধারণ করিয়া আছে মাত্র। কিন্তু বর্ণভেদ-প্রথা অবিনশ্বর হইয়া এখনো টিকিয়া রহিয়াছে। মুসলমান-ধর্ম্ম ভারতে সবলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, উহার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ণভেদ-প্রথা স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ প্রতি-কূলতার দ্বারা, ঘৃণাসূচক বিমুখতার দ্বারা, অল্পে অল্পে জয়ী হইয়াছে; প্রায় বরাবরই উহার প্রসারিত অজেয় জালের দ্বারা ইসলাম-ধর্ম্মকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, আটকাইয়া রাখিয়াছে; ভারতের যে-সকল আদিমবাসী লোক বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দু-সভ্যতার বাহিরে ছিল, আজিকার দিনে তাহারাও বর্ণভেদ-প্রণালীর আদর্শ প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করায়, জোর করিয়া হিন্দুসভ্যতার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং উহারা সাধারণ আশ্রয়গৃহের মধ্যে একটা স্থান পাইবার দাবী রাখে। যথাযথ ভাষা প্রয়োগের ত্রুটিপ্রযুক্ত যে-সকল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সেই-সব গোলযোগ সত্ত্বেও, আসলে ধরিতে গেলে, ভারতে কোন "Outcast" সমাজ-বহিষ্কৃত লোক নাই। যে-সকল ব্যক্তি নানা কারণে স্বকীয় জাত হইতে বহিষ্কৃত হয়, তাহারা শীঘ্রই আবার অন্য কতকগুলি দলের সারাংশরূপে গড়িয়া উঠে। কেবল দুইটি মাত্র উপায় তাহাদের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হয়, হয় নিকৃষ্টতর জাতের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দেওয়া; অথবা স্বকীয় দুর্ভাগ্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটা নূতন জাত গড়িয়া তোলা। বস্তুত, বেশ বুঝা যায়,—এই সকল রুদ্ধ-দ্বার সমাজ-দেহের স্বাভাবিক অবাধ কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে, কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। যে "প্যারিয়া"র উপর, Bernard in de Saint Pierre হইতে আবহমান কাল পর্য্যন্ত, কোমল হৃদয় মহাত্মা-দের অনুকম্পা পতিত হইয়াছে, সেই "প্যারিয়া" যতটা কল্পনা করা যায় আসলে সেরূপ বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত নহে। হয় তো সে যে দলের অন্তর্ভুক্ত সে দলটি খুবই দুরবস্থাপন্ন, খুবই অবজ্ঞার পাত্র, কিন্তু তথাপি সে একটি দলের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণেরা যতই অবজ্ঞা ও ঘৃণা করুক না,—এমন কতকগুলি "প্যারিয়া" জাতি আছে যাহাদের আত্মা-ভিমানের অভাব নাই; তাহারাও আবার তাহাদের প্রতি-বাসীদিগকে অবজ্ঞা করে।

এই-সকল দল, বর্ণ-বিশেষ, বা বর্ণের অনুরূপ যে কত অসংখ্য লোক আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন্ এক প্রদেশেই এইরূপ শত শত দল গণনা করা যায়। যাহার অধিবাসী-সংখ্যা ২,০০,০০০ সেই পুণাতেই এইরূপ ১২০ দল লোক আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

তথাপি ঐ অঙ্কটির দ্বারা একটি খণ্ডাংশের একটা অসম্পূর্ণ ধারণা হয় মাত্র। বাস্তবিক যাহাকে জাত (caste) বলে ঐ অঙ্কের দ্বারা সেই জাতের সংখ্যা নির্দ্দেশ হইলেও উহারা

অধিকাংশই উপশ্রেণী-ভুক্ত। কিন্তু ঐ বিশেষ সমাজ-মণ্ডলীর সাধারণ নাম ধারণ করা সত্ত্বেও, আচার ব্যবহারে সৌসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, নানান হিসাবে, বিশেষত বিবাহের হিসাবে ঐ উপশ্রেণীগুলিও অতগুলি স্বতন্ত্র জাত। ঐ পুণাবিভাগেই, যে ব্রাহ্মণদিগকে দূর হইতে এবং কতকগুলা মতবাদের বিশ্বাস-বলে, আমরা সমস্ত ভারতের মধ্যে একটা অনন্য-সাধারণ জাত বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি সেই ব্রাহ্মণেরা বাস্তবপক্ষে ১৪ জাতে বিভক্ত; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি—যাহারা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত অংশও নহে তাহারাও আবার কতকগুলি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। এই উপশ্রেণীগুলির মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান চলে না। এইরূপ সর্ব্বত্রই।(১)

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীতে যে-সকল ছবি খাড়া করা হইয়াছে তাহারই সম্মিলিত সমগ্র ছবি হইতে ৪৫৫এর কম নহে এরূপ বিভিন্ন জাতের খবর পাওয়া যায়। তাহাদের লোকসংখ্যা হাজারের কম হইবে না। উহারা একাধিক প্রদেশে বা দেশীয় রাজার রাষ্ট্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। অপেক্ষাকৃত কম-সংখ্যক লোক, অথবা যাহারা কেবল একটিমাত্র প্রদেশে বা দেশীয় রাজার রাষ্ট্র ছাড়া আর কোথাও যাহাদের অস্তিত্ব নাই তাহাদের সংখ্যা যোগ করিলে ১২২৯ এই সংখ্যাঙ্কে উপনীত হওয়া যায়। এই গণনার সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার আরও কত নীচে তাহা কে বলিতে পারে। তালিকায় একটি কোঠার মধ্যেই ১ কোটি ৪০ লক্ষ ব্রাহ্মণ, ১ কোটি ২০ লক্ষ কুর্নবি, ১ কোটি ১০ লক্ষ চামার প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই-সকল বিভিন্ন জাত একই নামে অভিহিত হইলেও, বাস্তবপক্ষে উহারা বহুসংখ্যক উপশ্রেণীতে বিভক্ত; এই উপশ্রেণীগুলি এক-একটি স্বতন্ত্র দলের অন্তর্ভুক্ত; উহারা অন্য দলের লোককে প্রায়ই অবজ্ঞা করে, সচরাচর তাহাদের সহিত বিবাহের আদান-প্রদান করে না, একসঙ্গে বসিয়া আহারও করে না। বস্তুত সকল জাতের মধ্যেই, ন্যূনাধিক সংখ্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইবার দিকে একটা প্রবণতা দেখা যায়:—একটা সাধারণ সমাজমণ্ডলীর মধ্যে অতগুলা ভিন্ন ভিন্ন দল। জাত ও উপজাতগুলা যে-নামে অভিহিত হয় সে নামগুলা সব সময়ে স্বচ্ছার্থ নহে। দুই তিনটি উপাধি ছাড়া—যথা, ব্রাহ্মণের, রাজপুতের—যাহা জাতিবাচক এবং যাহা কুলক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে—অধিকাংশ উপাধিই যাহার অর্থ সহজবোধ্য—উৎপত্তির হিসাবে নিম্নোক্ত চারি পর্য্যায়ের কোন-না-কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, যথা:—ভৌগোলিক নাম যাহা অবস্থানুসারে কোন নগণ্য স্থান বা কোন প্রদেশের নাম হইতে গৃহীত ব্যবসায়িক নাম; হয়, উহা কোন বিশেষ দলের বিশেষ ব্যবসায়,—নয়, ব্রাহ্মণ্যিক "কাষ্ট"দের সম্বন্ধে তাহাদের যাজকীয় ধর্ম্মের কোন বিশেষত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়; পদার্থবিশেষ বা জন্তুবিশেষের নাম, যে-নাম কোন কুলক্রমাগত কাহিনী বা বিশেষ কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের বন্ধনে আবদ্ধ ও যে-নামে সেই সমাজমণ্ডলী পরিচিত হইয়া থাকে; পৈতৃক নামানুসারী নাম, যাহার সহিত, প্রত্যক্ষভাবেই হউক, বা ডাক-নামের আকারে প্রকারান্তরেই হউক,—কোন কল্পিত পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধ আছে। বেশ বুঝা যায়, অধিকাংশ নামের ব্যাখ্যা স্থলে, যে সকল জাত ঐ-সকল নামে অভিহিত হয়, তাহাদের উৎপত্তি কোন-না-কোন কাহিনীর দ্বারা প্রায়ই ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে সম্বন্ধটা উল্টাইয়া দেওয়া আবশ্যক, অনেক স্থলে নামটাই গল্পকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, গল্পবস্তু হইতে নামটা উদ্দীপনালাভ করে নাই।

এই-সকল বিবরণের মধ্যে অবশ্য সেই-সকল জনশ্রুতি-মূলক বিবরণই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, যাহার মধ্যে ন্যূনাধিক দূর দেশ হইতে আগমনের বার্ত্তা আছে; এবং সেই আগন্তুকদের জাতের নামটি সেই আগমনের স্মৃতি বা কীর্ত্তি-অভিমান চিরস্থায়ী করিয়া রাখে। এই স্থান-পরিবর্ত্তনের বিবরণ প্রায় উচ্চবর্ণদিগের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কম অর্থব্যঞ্জক নহে। রাষ্ট্র-সাধারণ জাতীয় ভাবের (national) অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ভূমির মধ্যে লোকের জীবন কেন্দ্রীভূত। জীবনের যে-সকল বন্ধন আছে, জীবনের প্রয়োজন হইতে যে-একটা সাধারণ স্বার্থ-সংহতির সৃষ্টি হয়, জীবনের কাজে যে-সকল ব্যবহার উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে;—তৎসমস্তের দ্বারা কোনো জাত বা বংশ—স্বকীয় স্নেহমমতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

(১) Kitts, Compendium of Castes and Tribes Found in India, Bombay 1885.

করিতে পারে, স্বার্থরক্ষা করিতে পারে, স্বকীয় চিরসংস্কার-গুলিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিতে পারে। এই জাত-রূপ মণ্ডলীটিই প্রকৃত স্বদেশ; ইহার রক্ষণাধীনে, অস্থায়িত্বেরই প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়:—কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষ কতকগুলি বন্ধন সঙ্গে করিয়া আনে, এবং সেই-সকল বন্ধনের মূল্য উহারা খুব বেশী করিয়া ধরে; এই জন-গুচ্ছের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, সেই একই স্বভাব-সংস্কারের স্থায়ী প্রভাব-বশতঃ নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উহারা আবার নূতন করিয়া আপনাদিগকে গড়িয়া তুলে। চিরদিনই ভারত, এইরূপ কতকগুলি চির-চঞ্চল সমাজ-শরীরের একটা প্রকাণ্ড জটিল যন্ত্র বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। এই সকল সমাজমণ্ডলী খুব বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা একীভূত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহা নিশ্চিত যে, এই-সকল উপাদানের মধ্যে, মূলোৎপত্তি-সংক্রান্ত বৈচিত্র্য, ও বংশ-বৈচিত্র্যের অনেকটা স্থান আছে।

যে-সকল বিরোধ অনেক স্থানেই বিভিন্ন জাতের মধ্যে স্থায়ীভাবে রহিয়া গিয়াছে, তাহা কি পূর্ব্বস্মৃতির স্থায়িত্ব হইতে এবং সেই পূর্ব্ব স্মৃতিজাত বৈরিতা হইতে সমুদ্ভূত? ভারত-অধিবাসীরা সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়, তাই এই বিরোধের ব্যাপারটা আরো বেশী করিয়া চোখে ঠেকে। সেই বৈরিতাই সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী ও প্রসিদ্ধ যাহা দাক্ষিণাত্যে "দক্ষিণ হস্ত" ও "বাম হস্ত" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মনে হয়, ঐ প্রদেশে মোটামুটি জাতের দুইটি পর্য্যায় আছে। এক পর্য্যায়ের অনুরূপ—কতকগুলি কারিগরের জাত; অপর পর্য্যায়ের অনুরূপ—কতকগুলি কৃষকের জাত। (২)

উহাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস কখনই স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় নাই। ইহার মধ্যে নিশ্চিত এইটুকু—পরস্পরের প্রচণ্ড বিরোধবশতঃ সমস্ত অধিবাসীকে যে দুই বিরোধী শত্রু-শিবিরে পরিণত করিয়াছে, সেই বিরোধের মূল-উৎস চিরকালই এবং অদ্যাপি উহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুই "হস্তের" মধ্যে কোন "হস্ত" যে-কতকগুলি অধিকার দাবী করিয়া থাকে, কোন-এক পক্ষ সেই অধিকার-সীমা লেশমাত্র লঙ্ঘন করিলেই যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। (৩) উহা হইতে প্রায়ই মধ্যে-মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎপত্তি হইয়াছে; "প্রথমে কাছাকাছি পরে সমস্ত দেশময় বিরোধের বীজ ছড়াইয়া পড়িয়া, সর্ব্ব-প্রকার অত্যাচারের উপলক্ষ্য হইয়াছে, অবশেষে প্রায়ই রক্তপ্লাবী যুদ্ধে উহার অবসান হইয়াছে।"

অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ হইলেও—এইরূপ তথ্যসমূহ, ভারতের অনেক অঞ্চলেই পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময়, সম্মানের কতকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার লইয়া এই-সকল ঝগড়াঝাঁটির সূত্রপাত হয়। আমাদের চক্ষে উহা নিতান্তই নিরর্থক। উভয় পক্ষই এই বিবাদে ভয়ানক মাতিয়া উঠে। তাই বলি, সর্ব্বত্রই বর্ণভেদ-প্রণালীটা পদমর্য্যাদার সোপান-সমন্বিত (hierarchy) প্রকৃত পৌরোহিত-শাসনতন্ত্রের একটা কাঠাম বলিলেও হয়; চিরাগত প্রথার দ্বারা বা লোকমতের দ্বারা প্রত্যেকেরই নিজস্ব পদমর্য্যাদা পরিচিহ্নিত হইয়াছে; প্রত্যেকেই এই সোপানের নির্দ্দিষ্ট ধাপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, কিংবা এই সোপানের উচ্চধাপে আপনাকে বলপূর্ব্বক উন্নীত করিতে চাহে। এই প্রতিষ্ঠানের মুখশ্রীতে এই যে বিশেষ-রেখাটি অঙ্কিত দেখা যায় ইহা সম্পূর্ণরূপে ইহার পরিচায়ক লক্ষণ। ব্রাহ্মণিক বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং উহার বহুল শাখা-প্রশাখাই এই সোপানের প্রধান ভিত্তি। ব্রাহ্মণিক বর্ণের সহিত যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের উপরেই মুখ্যতঃ অন্যান্য বর্ণের স্থান-সন্নিবেশ, সম্মান বা অবজ্ঞা নির্ভর করে। অনেকগুলি ব্রাহ্মণিক জাতি লোকের নিকট হতাদর ও হতশ্রদ্ধ হইলেও মোটের উপর সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণেরা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। (৫)

যে-সকল শ্রেণীবিভাগ বহুল পরিমাণে শাস্ত্রীয় উপদেশের উপর ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অন্ধসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠত্ব—সেই-সকল শ্রেণীবিভাগের প্রমাণ-গৌরব আরো দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সম্বন্ধে কদাচিৎ কাহাকে প্রতিবাদ করিতে দেখা যায়। বরং প্রায়ই

(২) Burnell-Yule, Holeson Jobson, S. V. Caste—দ্রষ্টব্য।

(৩) Abbe Dubois, Mœurs &c.,

(৪) দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য, "Caste factions"—সম্বন্ধে April 1892—6, Asiatic Quarterly পত্রিকায় Elliot সাহেবের মন্তব্যলিপি।

(৫) Jogendra Chandra Ghose, Cal. Review—Guru Prasad Sen—Cal. Review—

দেখা যায়, উহাদের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য, অপেক্ষাকৃত হীন শ্রেণীদিগের মধ্যে, নির্ব্বন্ধাতিশয্য ও জলন্ত আগ্রহ সহকারে যুঝাযুঝি চলিতেছে। সকল বর্ণই—এমন-কি অধিকার-চ্যুত বর্ণগুলিও একটা আত্মাভিমানের দ্বারা, একটা রুদ্ধ দ্বারী "একল ষেঁড়ে" ভাবের দ্বারা উত্তেজিত, তাহাতে করিয়া এই-সকল বিরোধ আরো বিষাক্ত হইয়া উঠে। যে-সকল অধিকার থাকিলে সর্ব্বসাধারণের সম্মানভাজন হওয়া যায়, সেই-সকল অধিকার সমর্থন ও দখল করিবার জন্য, জাতের বিভিন্ন দল,—কলুষিত আচরণ ও চাতুরী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাশ্য বলপ্রয়োগ পর্য্যন্ত—সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। (৬)

রাজ্য বিশালায়তন, উৎপত্তি ও যোগ্যতার হিসাবে বিভিন্ন বংশের লোক সেই রাজ্যের মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া রহিয়াছে, বিভিন্ন দল বা জনগুচ্ছ পরস্পরের সহিত সংজড়িত, সমানভাবে সমুন্নত, অসংখ্য বিভাগে বিভক্ত, সংকীর্ণ স্থানচ্যুতির বশবর্ত্তী, কখন কখন পরস্পরের সহিত শোণিত-স্রাবী যুদ্ধে প্রবৃত্ত। তবে কি, এই প্রতিষ্ঠানটির একটা সমগ্র ধরণের চিত্র পাঠকের সমক্ষে ধারণ করিতে বিরত হইতে হইবে? ইহা অসম্পূর্ণ হইবারই কথা, তাই বলিয়া অবশ্য ভাবীরূপে ইহা ভ্রান্তিজনক ও মিথ্যা এ কথাও বলা যায় না। এই প্রণালীটির আপাত-প্রতীয়মান একতা কতকগুলি বেখাপ্পা রকমের তথ্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও, বস্তুত উহা অনেকগুলি মূলগত সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইটুকু স্মরণে রাখিলেই হইবে, কোন প্রতিপাদিত কথা একেবারে ঐকান্তিক বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে; তথ্যসমূহের মূলোৎপত্তির সন্ধান করিতে গেলে সেই সূত্রস্থানে মধ্যবর্ত্তী রং-এর বিচিত্রছায়া ও আভার সমাবেশ থাকিতে পারে, এবং সমস্ত বিষয়টা সম্বন্ধে কেবল কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ অবধারণ করা যাইতে পারে মাত্র।

এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া, এমন একটি রুদ্ধদ্বার দলবদ্ধ-মণ্ডলীর কল্পনা করা যাউক, যাহা অন্ততঃ মতামতের হিসাবে (in theory) কঠোররূপে কুলানুক্রমিক;—যাহার একটা চিরাগত ও স্বতন্ত্র গঠনপ্রণালী আছে, একজন দলপতি আছে, একটা সভা আছে; মধ্যে-মধ্যে সেই সভার অধিবেশনে উহারা একত্র সমবেত হয়। প্রায় কতকগুলি উৎসবসূত্রে উহারা একীভূত; একটা সাধার ব্যবসায়ের বন্ধনে একত্র আবদ্ধ; বিবাহ, আহার, ছোঁয়াছুঁ শুদ্ধাশুদ্ধি সম্বন্ধে উহাদের একই ব্যবহার; পরিশেষে, স্বী প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য, ঐ মণ্ডলীর ন্যূনাধিক বিস্তৃ বিচারের অধিকার আছে, ক্ষমতা আছে। অপরা অমার্জ্জনীয়ই হউক, মার্জ্জনীয়ই হউক, বহিষ্করণ প্রভৃ কতকগুলি দণ্ডের দ্বারা উহারা মণ্ডলীর প্রভুত্ব সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে সমর্থ হয়। সংক্ষেপে "কাষ্ট্" জিনিসট আমাদের নিকট এইরূপই প্রতীয়মান হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬) গুরুপ্রসাদ সেন। Cal : Review)

দেশের কথা

বাঁকুড়ার দুর্গতির অন্ত নাই। ছিল অন্নকষ্ট এখন জলকষ্ট নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। তার উপর কয়েকটি নূতন উপস জুটিয়াছে। স্থানীয় সংবাদপত্র "বাঁকুড়া দর্পণে" প্রকাশ—

দীর্ঘকাল বৃষ্টি হয় নাই, কাজেই এবার বসুন্ধরা যেরূপ শুষ্ক হইয় ছেন এরূপ শুষ্ক অবস্থা আর কখনও দেখা যায় নাই। বাঁধ, পুষ্করি সমস্ত শুকাইয়াছে, অনেক কূপেও জল নাই।

এই দুর্ভিক্ষের দিনে বাঁকুড়া জেলার বিপদ দিন দিন বৃ পাইতেছে। প্রথম অন্নকষ্ট, দ্বিতীয় জলাভাব এবং তৃতীয় গো-মহিষা গৃহপালিত পশুর খাদ্যাভাবের কথা "দর্পণের" পাঠকগণ বিশেষরূ অবগত আছেন। তাহার উপর আবার শালতড়া থানার অধীন পাবড় হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে প্রায় এক সহস্র গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে ওন্দা থানার অধীন মেদিনীপুর গ্রামেরও শতাধিক গৃহ ভস্মীভূ হইয়াছে; তদ্ভিন্ন শালডিহা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম হইতেও ২।১টি করিয় গৃহদাহের সংবাদ আসিতেছে। তদুপরি বিসূচিকা ও বসন্ত এই ঋতু চিরসহচর। এ জেলার অনেকগুলি গ্রামে বসন্ত পীড়া বিস্তৃত হইয়াছে কয়েকখানি গ্রামে বিসূচিকাও দেখা দিয়াছে। জলাভাবই এই-সক গ্রামে পীড়া-বিস্তৃতির প্রধান কারণ।

গবর্ণমেণ্ট এ জেলায় বাঁধ খনন জন্য প্রথমে ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাক দিয়াছিলেন। সেই টাকা নিঃশেষ হইবার পর আবার কতক টাক দেন; তাহাও নিঃশেষ হইয়াছে। আবার বর্ত্তমান বর্ষে যে এ বিষয়ে বহু অর্থ ব্যয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঁকুড়া জেলার এরূপ দুর্দ্দিন আর কখনও হয় নাই।

আমাদের দেশে কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় অহরহ যে-সব দুঃখ ভোগ করে তার মধ্যে সুদখোর মহাজনের অত্যাচা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে "রায়ত" বলেন—

অত্যধিক সুদের চাপনে পড়িয়া এদেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ কৃষকগণ যে রসাতলে যাইতেছে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রাজ-আইন-দ্বারা সুদের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত দেশে আইনের কবাঘাতে সুদের সীমা মীমাংসিত না হইবে ততদিন নানাপ্রকার দুঃখ দুর্গতি ও অশান্তি লইয়া পল্লীবাসীকে জীবন কাটাইতে হইবে। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার ফজলভাই করিমভাই এ সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট সুদখোরদের অত্যাচার প্রতিকারকল্পে যে চিঠি জারী করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট কি অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন যে তৎসম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ কি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্টও এ সম্বন্ধে কোন আইন বিধিবদ্ধ করিবেন কি না? গবর্ণমেণ্ট আইন প্রস্তুত করিলে সেই আইনের কোনও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে কি না? সরকারপক্ষ উত্তরে বলিয়াছেন "যাঁহাদের মতামত জানিবার তাহা জানা হইয়াছে, কতকগুলি দরকারী কার্য্যের জন্য আইনের মুসাবেদা সম্প্রতি স্থগিত রহিয়াছে।"

কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে "রায়তের" নিম্নে-উদ্ধৃত মন্তব্য সমীচীন বলিয়া বোধ হইল —

বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ গবর্ণমেণ্ট দেশের কৃষির উন্নতির জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন এবং তাহাতে অর্থব্যয়ও যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ ব্ল্যাকউড মহোদয়ের নিকট আমরা অসঙ্কোচে নিবেদন করিতেছি শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কতকগুলি ফুলবাবুর হাতে কৃষিকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ ও কৃষকদিগকে কৃষিশিক্ষা দিবার ভার অর্পণ করিয়া সহরের সীমানায় তাহাদিগকে বসাইয়া রাখিলে কিছুমাত্র কাজ হইবে না। ইহার জন্য গ্রামে গ্রামে হাতে দাঁতে খাটিয়া কাজ শিক্ষা দিবার, সারের কথা, চাষ আবাদ বীজ প্রভৃতির কথা বুঝাইবার লোক চাই। কৃষিবিষয়ক জ্ঞান বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে-সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন তাহা সহজ বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত হইয়া উপযুক্তভাবে গ্রামে গ্রামে বিতরণ হওয়া চাই। পল্লীগ্রামের স্থানে স্থানে যাহাতে কৃষি-প্রদর্শনী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া চাই ইত্যাদি। অন্যথা সরকারের সাধু উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

আমাদের সমাজ বিধবাবিবাহের বিরোধী, অথচ সমাজে মেয়েদের বাল্য-বিবাহের অবাধ প্রচলন। বিধবা-বিবাহ যখন চলিবে না তখন মেয়েদের বাল-বৈধব্য যাহাতে না ঘটে সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কিন্তু শোনে কে! বাড়ীতে যাঁরা বিধবা-বিবাহের কথা মুখে আনেন না সেই-সব স্বল্পায়ু স্বাস্থ্যহীন পুরুষেরাই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বারম্বার বিবাহ করিয়া অনেক মেয়ের বাল-বৈধব্যের পথ উন্মুক্ত করেন। "বাঙ্গালী" নিম্নলিখিত সংবাদ দিয়াছেন—

তিন স্ত্রীর মাথা খাইয়া ত্রিপুরা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বৃদ্ধ মোক্তার শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর বর্দ্ধন চতুর্থবারে আর একটি বালিকার পাণিপীড়ন করিয়াছে। গত ১৫ই ফাল্গুন এই বিবাহ ব্যাপার মহা ধুমধামে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বৃদ্ধ চন্দ্রশেখরের তৃতীয়া স্ত্রী কিরণবালা বিবাহের এক মাস মধ্যে কেরোসীনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অথচ এই ঘটনার ৪।৫ মাস গত হইতে না হইতেই আবার এক বালিকার কর-গ্রহণ। ত্রিপুরা জিলার বিয়ে-পাগলা বুড়ো শ্রীযুত বাবু নবকিশোর পাল আর ইহধামে নাই। তিনি পুলিসের দারোগা ছিলেন। তাঁহার ধনজনের অভাব ছিল না। তিনি ক্রমান্বয়ে পাঁচটি কন্যের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পেন্সন লইয়া আসিবার পরই বিবাহের মাত্রা চড়িয়া যায়। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তৃতীয় স্ত্রী বর্ত্তমানেই তিনি চতুর্থবার বিবাহিত হইয়াছিলেন। ৮০ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে অনেকে দারোগা বাবুকে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ নবকিশোর বলিল—"জাত-পত্রে যখন বিবাহের কথা লিখা আছে তখন আমি কি করিব, বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেও।" শুনিয়াছি জাতপত্রে নাকি বৃদ্ধের সাতটি বিবাহের কথা লেখা আছে। বৃদ্ধের সে কামনা পূর্ণ হয় নাই।

"স্বরাজ" ও একটি সংবাদ দিয়াছেন—

পাবনা ধোপাকোলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রামবন্ধু লাহিড়ী বি, এ, মহাশয় কিছুদিন হইল বিপত্নীক অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন। গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবার লাহিড়ী মহাশয় ৬০ বৎসর বয়সে টাঙ্গাইলের কোন ভদ্রলোকের একাদশ বর্ষীয়া একটি কন্যার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয়ের তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

"বাঙ্গালার ছাত্রসমাজ"-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চট্টগ্রামের "জ্যোতি" লিখিয়াছেন —

এ দেশের ছাত্রদের জীবন প্রণালী, স্বভাব চরিত্র ও নৈতিক আচরণ লইয়া সম্প্রতি চারিদিকে খুব আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রজীবনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সে পরিবর্ত্তনকে অতীত যুগের ছাত্রসম্প্রদায়ের জীবনাদর্শের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাদের উপর ঔদ্ধত্য ও দুর্ব্বিনীত ভাবের আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। তাঁহাদের ধারণা এই যে শিক্ষা বিষয়ে যুবকেরা দেশের সনাতন আদর্শ ও লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাঁরা ভুলিয়া যান যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় আমাদের ধর্ম্ম সমাজ ও শিক্ষা প্রভৃতি জীবনের সকল বিভাগে অব্যবস্থার অবস্থার বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং ছাত্রেরাও যে যুগধর্ম্মের প্রভাবে কিছু পরিবর্ত্তনকামী হইয়াছে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। বাঙ্গালী ছাত্রমাত্রেই অভদ্র ও দুর্ব্বিনীত নহে। বরং অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের ছাত্রসমাজ অবিচলিত ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, গুরুভক্তি ও জ্ঞান-পিপাসার জন্য জগতে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা, সংযমের কঠিন ও অচ্ছেদ্য বর্ম্মে আপনার জীবন আবৃত করিয়া এ দেশের ছাত্রগণ শান্তি কামনায় অধ্যয়নকে কঠোর তপস্যা জ্ঞানে তাহাতে রত থাকিত। এখন রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনে সে অবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকিলেও আমাদের ছাত্রসমাজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছাত্রবর্গের মত দুর্দ্দান্ত ও অসংযত হয় নাই। বালকদের স্বাভাবিক চপলতা, আবদার ও দৌরাত্ম্য জগতের সব দেশে চিরকাল আছে এবং থাকিবে। কারণ তাহা নিতান্ত স্বভাবসুলভ ও প্রকৃতির ধর্ম্ম এবং তাহা না থাকিলে সংসারে বালক, বৃদ্ধ ও যুবার বয়সগত কোন পার্থক্য ও বৈচিত্র্য থাকিত না। ছাত্রদের অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের আমরা সমর্থক নই। কিন্তু সর্ব্ববিধ অশান্তিকর ও অবৈধ ব্যাপারে ছাত্রসমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে বা তাহারাই সকল দুষ্কর্ম্মের জন্য দায়ী—এ মত আমরা সমর্থন করি না, কারণ তাহা সত্য নহে।

"সাধনা"য় আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পড়িয়া সুখী হইয়াছি,

প্রবন্ধটিতে খাঁটি কথা আছে। নীচে উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম—

দেশে অনেক লোক উকিল ও জজ হয়েছেন। এখন চাই আমরা—রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ ও সমাজ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিত।

তার জন্য এমন লোকের দরকার, যিনি এতবড় একটা সমাজের সমগ্র অতীত পর্য্যবেক্ষণ এবং বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক আলোচনা ক'রে সুদূর ভবিষ্যতের জন্য কোন্ পথে চলতে হবে, তার আবিষ্কার করতে পারেন। অসংখ্য মতভেদ, জাতিভেদ, অবস্থাভেদ, ধর্ম্মভেদের মধ্যে কি উপায়ে সমন্বয় ও ঐক্য সাধন হ'তে পারে, যাতে কোনও ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষের অসুবিধা না হয়, অথচ অধিকার ও উপযোগিতানুসারে প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে দেওয়া যায়, সেরূপ ব্যবস্থা করতে পারেন এমন প্রশস্ত-হৃদয়, স্থিরবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। আইন মেনে চলতে পারে, বা কেবল আইন প্রয়োগ করতে পারে এমন লোকের প্রয়োজন বেশী নাই। আমরা চাই এমন লোক, যাঁরা আইন প্রস্তুত করতে পারেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী আবিষ্কার করতে পারেন।

এদেশে এতদিন কেবল কেরাণী উকিল ডাক্তারই তৈরী করা হয়েছে; আমাদের সমাজে উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিসম্পন্ন, কোন কাজে দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত মানুষ প্রস্তুত করার সুবিধা নাই।

আদর্শ কর্ম্মী ব্যাপকভাবে সমগ্র কাজ দেখে অতি দূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কাজে হাত দিবেন।

তাঁকে সমাজের কোথায় কোন্ শক্তি আছে যত জায়গায় যত সুযোগ ও সুবিধা আছে, সব খুঁজে বের করে সকলের ব্যবহার করতে হবে। এজন্য উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যার দ্বারা যে উপকার যতটুকু সম্ভব কাজ করিয়ে নিতে হবে। তাঁকে অনেক মানুষ ও অনেক জিনিস নিয়ে কারবার করতে হবে। তাই কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার দরকার বুঝে চলা শিখ্‌তে হবে, এবং অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত বা অমার্জ্জিত-বুদ্ধি সকল লোককে দায়িত্বের কার্য্য একটু একটু করতে দিয়ে ভবিষ্যতে তাহাদিগকে দিয়ে স্বাধীনভাবে বড় কাজ করবার জন্য উপযুক্ত করে নিতে হবে। এরূপ কাজের লোক ছোটখাট অনেক তৈরী করা চাই।

সকল কাজে সমাজের প্রত্যেক লোকের নিকট অর্থসাহায্য নিতে হবে। মাসিক চাঁদা ক'রে টাকা তোলাই বাঞ্ছনীয়। এই উপায়ে নিজেদের লোককে নিজেরা 'কর' দিতে শেখা হবে। বড় বড় এণ্ডাউমেণ্ট বা জমিদারী পেলে কাজ খানিকটা এগিয়ে যায় বটে, কিন্তু তাতে জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হয় না। হঠাৎ দুটা একটা লোক দান ক'রে, স্বার্থত্যাগ দ্বারা উঁচিয়ে গেলে সমস্ত দেশের উপকার হয় না। সমগ্র সমাজের লোককে যথাসাধ্য ত্যাগ শিক্ষা করাতে হবে। ইহাতে যেটুকু ফল লাভ হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কাঙ্গাল গরীব, মুটে মজুর সকলের ধনেই দেশের ধন, সকলের শক্তি একীকরণে দেশের সামর্থ্য।

"কৃষিকর্ম্মের অন্তরায়" শীর্ষক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে আশা করি—

কৃষিকর্ম্মের অন্তরায় ধনীসম্প্রদায়

কি স্বদেশ কি বিদেশে স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিবার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ধনীসম্প্রদায়। তাঁহাদিগের অনেক অর্থ সঞ্চিত থাকাতে তাঁহা ইচ্ছামত যে-কোন দ্রব্য মূল্যের দ্বারা কিনিতে পারেন। সেইটু পারেন বলিয়াই তাঁহাদিগের বিলাসিতা ও ভোগস্পৃহা প্রভৃতি জাগ হইয়া উঠে। সেই-সকল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া অব্যবহার অপব্যবহারের ফল দুর্ব্বলতা। এই সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসা তাঁহারা শরীরে ও মনে নানাপ্রকারে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং নিজে দুর্ব্বলতার দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নানা উপায়ে বংশপরম্পরায় অনুক্রামি করেন। তাঁহারা নিজেদের সেই দুর্ব্বলতা সমর্থন করিবার হাতেহেতেড়ে কাজমাত্রকেই হেয় চক্ষে দেখিয়া মানহানিকর "ছোটলোকের" কার্য্য বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহ ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা যে কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি হাতেহেতে কাজগুলিকে ছোটলোকের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতে চাহেন, সে সকল কার্য্য ব্যতীত, সেই-সকল "ছোটলোকের" সাহায্য বি তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের সম্পূর্ণ অভাব হইত। শ্রমের যে একটা মূ আছে, মর্য্যাদা আছে, সে কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। ধনীরা ম করেন যে, চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকা, নানা কারুকার্য্যবিশি দ্রব্যসমূহে নিজের ধনবত্তার পরিচয় প্রদান করা এবং পরগাছার স্ব অপরের ঘর্ম্মাক্ত পরিশ্রমের উপর নিজেদের ভোগেচ্ছা চরিত করাতেই যত কিছু মান ও যত কিছু মর্য্যাদা—হাতেহেতেড়ে শ্রমজন কার্য্যের কোনই মান বা মর্য্যাদা নাই।

ধনীদের সহরপ্রীতির কারণ

মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার উপযো নানা দ্রব্য সহজে পাওয়া যাইতে পারিবে এবং কৃষক প্রভৃতির রক্তে বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা সংগৃহীত নানাবিধ দ্রব্যের প্রদর্শনী খুলি আন্তরিক না হইলেও মৌখিক প্রশংসা পাইবার অনেক লোক পাওয়া যাইবার সুবিধা আছে বলিয়া ধনীরা পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করি সহরে বাস করিতে ভাল বাসেন। ধনীরা তোষামোদকারীদিগের মু স্বকৃত সকল বিষয়ে সায় প্রাপ্ত হইলে এবং প্রশংসা শুনিতে পাইলে পরম পরিতৃপ্ত হয়েন। সেই-সকল প্রশংসার ভিতরে কতটুকু বা সত্য আর কতটুকুই বা মিথ্যা আছে, সে বিষয়ে ধনীরা চিন্তা করি দেখিবার অবসরও পান না এবং দেখিতে চাহেনও না।

দরিদ্র শিক্ষিত পল্লীবাসীগণের সহরপ্রীতির কারণ

ধনী সহরবাসীগণের ঐশ্বর্য্য ও তজ্জনিত বাহিরের জাঁকজমক সুখভোগ কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং কানাঘুষায় সেই-সক বিষয়ের কথা খুব বৃহদাকারে শুনিয়া, দরিদ্র পল্লীবাসীগণ সহরে গি প্রভূত ঐশ্বর্য্যলাভ এবং তাহার ফলে সুখের সাগরে চিরকাল অবগাহনে অবসর পাইবার কল্পনায় ও মহা সুখস্বপ্নে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তখ তাঁহারা সুখভোগেচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে পল্লীগ্রামের বাসস্থা পরিত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইবার অভিলাষী হইয়া পড়েন। এইরূপে পল্লীবাসীগণের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার ফলে সহরে আসি চাকরী, ব্যবসায় বা অন্যান্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের সক্ষমতা ধার করেন, তাঁহারা কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সহরবাসী হইয়া পড়েন।

সক্ষম লোকদিগের পল্লীগ্রাম পরিত্যাগের কুফল

যাঁহারা পল্লীগ্রামের কোন উপকার করিতে পারিতেন, সেই ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিবার কারণে তাঁহাদিগে আদিম বাসস্থান-সকল অমনোযোগের বিষয় হইয়া পড়ে। তখন সেই সকল স্থানের জলাশয়গুলি পানা ও মাটিতে ভরাট হইয়া যায় এবং গ্রামগুলি বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া নানাবিধ রোগের আশ্রয়স্থান হই

পড়ে। তখন আবার, সেই-সকল ধনী ও শিক্ষিত সহরবাসীগণ রোগের দোহাই দিয়া, খাদ্যদ্রব্যের ও পানীয়জলের অভাব প্রভৃতির দোহাই দিয়া পল্লীগ্রামে বাস করিতে অস্বীকার করেন। পরিণামে পল্লীগ্রামের উন্নতির সকল সম্ভাবনাই রুদ্ধ হইয়া যায়। অপরদিকে, অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসীগণ রোগজীর্ণ শরীর লইয়া স্বীয় বাসস্থানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেনও না এবং সমর্থও হয় না—তাহারা চিরকালের জন্য বংশপরম্পরায় রোগজরাময় অবস্থাতেই যথাকথঞ্চিৎরূপে জীবন রক্ষা করে। অবশেষে যখন সেই-সকল পল্লীবাসীগণ রোগজরাজীর্ণ দেহে নূতন নূতন রোগের আক্রমণফলে শেষবাস করিতে নিতান্তই অক্ষম হয় এবং অগত্যা তাহাদের নিকট হইতে খাজনা প্রভৃতি আদায়ের বিলম্ব হওয়ায় ধনীদিগের বিলাসভোগে ব্যাঘাত ঘটে এবং সহরবাসীদিগের অন্নবস্ত্র মহার্ঘ হইয়া উঠে, তখন সকলে মিলিয়া দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের স্কন্ধে ধনীদিগের বিলাসের অভাব ও সহরবাসীদিগের অন্নবস্ত্রের মহার্ঘতার সমস্ত দোষ নিক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগের প্রতি অলস ও দুষ্ট প্রভৃতি কতকগুলি কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া হাহুতাশ করিতে থাকে এবং নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করে।

কাপুরুষতা আমাদের দেশের অনেক লোকের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। তাই আমরা দুর্ব্বল অসহায়কে সুবিধায় পাইলেই অপমান ও অত্যাচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করি না। সম্প্রতি এইরূপ কাপুরুষতা ও নীচতার দুটি দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে উগ্র হইয়া লাগিয়াছে।

ইংরজী বেঙ্গলীতে কয়েক দিন হইতে একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে যে একজন ৪২ বৎসর বয়সের আধ-বুড়ো উকিলের স্ত্রী রুগ্না হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া তাহার জন্য একটি বালিকা বধূ চাই।

ইহার চেয়ে নির্লজ্জতা নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা আর কি হইতে পারে? যদি সেই উকিল-বাবুটি রুগ্ন হইয়া পড়িতেন তবে তিনি ধর্ম্মতঃ ও স্বভাবতঃ দাবী করিতেন যে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে তাঁহার আমরণ সেবা করিবেন এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহার প্রতি ভক্তি অচলা রাখিয়া তাঁহারই স্ত্রী হইয়া থাকিবেন। স্ত্রী স্বামীর নিকট কেন এরূপ ব্যবহার পাইবেন না?

আর একটি দৃষ্টান্ত দৈনিক বসুমতী দিয়াছে। সাহিত্য-সম্মিলনে এবার পঁচিশ জন লেখিকা উপস্থিত হইয়া প্রবন্ধ পাঠ করিবেন এই সংবাদ পাইয়া বসুমতী অভদ্র অশ্লীল ইঙ্গিত করিয়াছে। এই কাগজের আচরণে দুঃখিত হইয়া যশোহরের "যশোহর" পত্রিকা খুব মোটা কালো ঘেরা দিয়া ঐ অভদ্রতার প্রতি সাহিত্যিক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার। "যশোহর" বুধগুলীকে বিচার করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন যে বিদ্বৎসভায় এইরূপ প্রকৃতির লোকেরা স্থান পাইবার যোগ্য কি না। নিশ্চয়ই নয়। সাহিত্যসম্মিলনের উদ্যোক্তাদিগের উচিত ও কর্ত্তব্য ঐরূপ লোকদিগের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করা। সম্মিলনের সভাপতিরা ও অপরাপর নিমন্ত্রিত ভদ্রসাহিত্যিকেরা এরূপ লোকের সহিত একত্র আসন গ্রহণ করিতে স্বভাবতই অপমান বোধ করিবেন। "যশোহর" এই বিষয়ে সাহিত্যসম্মিলনের কর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আপনার জেলার ও সাহিত্যসম্মিলনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।

গান

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক
আমি দেখি নাই তোমারে।
হঠাৎ স্বপন-সম দেখা দিলে
বনেরি কিনারে॥
ফাগুনে যে বান ডেকেছে
তোমার মাটির পাথারে,
তোমার সবুজ পালে লাগল হাওয়া
ভেসে এলে জোয়ারে—
যৌবনের জোয়ারে॥
কোন্ দেশে যে বাসা তোমার
কে জানে ঠিকানা,
কোন্ গানের সুরের পারে
তার পথের নাই নিশানা।
ওগো সেই দেশেরি তরে আমার
মন যে কেমন করে,
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস
আমার প্রাণে বিহারে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

না না II র্সা র্সা না । ধা পা পা I গা গা মা । মা পা পা I ‌।।। ।।। I সা সা রা
তু মি কো ন্ প দে শে ০ এ ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ ০ ০

রা রা গা I গা । । । গা গা মা I রা গা গা । মা পা পা I মা পা গা ।
লে প ০ থিক্ ০ ০ ০ আ মি দে খি ০ না ই তো মা ০ রে

। না না I না র্সা র্সা । র্সা । । I র্সা । । । নর্সা র্রর্সা র্সা I না । । । । । । I
০ হ ঠাৎ স্ব প ন স ০ ০ ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

। না না I না র্সা র্সা । র্সা । । I র্সা । । । নর্সা র্রর্সা র্সা I না । । ।
০ হ ঠাৎ স্ব প ন স ম ০ দে খা ০ দি লে ০ ম নে ০

না না র্সনা I ধা না পা । । না না II
বি কি ০ মা, ০ বে ০ তু মি

II {ধা না ধা । পা পা ধা I ধা না না । ধা । নর্সা । না । । । । । । I
মা শু ০ মে ঘে ০ এ দে শে ০ ০ ছে ০ ০ ০ ০ ০

পর্সা র্সা না । না র্সা র্রা I র্সা । । । । । নর্সর্রর্সা I না । । । । (র্সা র্রা) } I
মা টি র পা ০ থা রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

না না I না র্সা র্সা । র্সা র্সা । I র্সা র্সা র্সা । র্সা নর্স র্রর্সা I না । । । । না না ।
তো মার স বু জ পা লে ০ লা গ্ ল হাও য়া ০ ০ ০ ০ ০ তো মার

না র্সা র্সা । র্সা র্সা । I র্রা র্সা র্সা । র্সা সা র্রর্সা I না র্সা না । ধনা র্সা না I
স বু জ পা লে ০ লা গ্ ল হাও য়া ০ এ লে ০ জো ০ যা

ধপা । । । । না না I র্সা র্সা না । ধনা র্সা না I ধপা । । । । । না I
রে ০ ০ ০ ভে সে এ লে !০ জো ০ য়া রে ০ ০ ০ ০ যৌ

র্সা র্সা না । ধনা র্সা না I ধপা । । । । না না II
ব নে র জো ০ য়া রে ০ ০ ০ "তু মি"

II সা সা সা । রা রা । I রা রা গা । গা রা মা I গা । । । । । মা ।
কো ন দে শে ০ বা ০ ০ সা তো ০ মা ০ ০ ০ ০ র

রা গা । । মা পা ধপা I মা পা । । । । পা I পা দা দা ।
কে জা ০ নে ঠি ০ কা না ০ ০ ০ কোন গা নে র

দা দা ণা I পা । । । । ধনা র্সনা I ধপা । । । । না না I না র্সা । ।
সু রে র পা ০ ০ ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ তার প থের ০

র্সা । না I ধনা র্সনা ধপা । । না না I র্সা র্সা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা । I
নাই ০ নি শা ০ না ০ ও গো সে ই দে শে রি ০

র্রা র্রা । । র্রা র্রা র্জ্ঞা I র্সা র্সা র্রা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা I র্সা । । । । নর্সা র্রার্সা I
ত রে আ মা র ম ন সে কে ম ন ক ০ ০ ০ ০ ০

না । । । । । । I না র্সা র্সা । র্সা র্সা । I র্সা । । ।
বে ০ ০ ০ তো মার মা লা র গ ন্ ০ ধে ০ ০

। নর্সা র্রর্সা I না । । । । না না I না র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I র্রা র্সা । । র্সা র্সা র্রসা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো মাব মা লা র গ ন্ ধে তা রি ০ আ ভা স

না র্সা না । ধনা র্সা না I ধপা । । । । না না I র্সা র্সা না । ধনা র্সা না I
প্রা ণে ০ দি ০ হা বে ০ ০ ০ আ মার প্রা ণে ০ বি ০ হা

ধপা । । । । না না II II
বে ০ ০ ০ "তুমি"

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অর্ঘ্য-পঞ্চক

(কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি-পূজায় বিনিয়োগ)

বঙ্গ-বাল্মীকি।

বাল্মীকি গড়িল যাহা সংস্কৃতের সংহত শিলায়
তারি কি নকল তুমি করেছ হে গঙ্গামৃত্তিকায়
কৃত্তিবাস ? তব কবি-চিত্তের সুষমা রাশি রাশি
করেনি কি রঞ্জিত তা সবে পদে-পদে ? তব হাসি,
তব অশ্রু ? দেশের দেহের ধাতু ভক্তিনীরে ছানি'
গড়েছ যে নবসীতা, নির্ম্মিয়াছ নবসীতাজানি,
আর সে দোসর চির গড়েছ হে সোদর লক্ষ্মণ,
ওগো কবি ! তব স্পর্শে রামায়ণ হয়েছে নূতন,
হয়েছে সে বাঙালীর একান্ত আপন—মন্ত্রে তব,
বাল্মীকির পুনর্জ্জন্ম তব তপে হয়েছে সম্ভব,
নিষ্ঠুর দস্যুরে তুমি আর্দ্র করি দেছ মমতায়,
জাগায়েছ দুর্ব্বৃত্তের চিত্তবাসী সুপ্ত দেবতায় ;
জীবে জীবে ওগো কবি ! জাগায়েছ শিব-সম্ভাবনা ;
নকল-নবীশ নও, কবি তুমি, তুমি মহামনা,
দুষ্টের পরাণ-কোণে দেখিয়াছ অভীষ্টের ছবি,
ম্লানিহরা তব গীতি, তব-গান পবিত্র জাহ্নবী।

বাণীর পূজারী।

"যার কণ্ঠে সদাকালে বৈসে সরস্বতী"

বাণী-পূজা-দিনে উদয় তোমার
উদয়ে ধন্য জন্মভূমি,
বঙ্গ-বাণীর পূজার প্রচার
ষোড়শোপচারে করিলে তুমি।
অশেষে করিলে বিশেষে প্রকাশ
আভাসে বাঁধিলে ভাষায় গুণী !
ভক্তির সাজি ভরিলে স্বদেশী
বাঁধুলি টগর দোপাটি চুনি।
কবি সরোরুহ ফুটিল যে সরে
তব তপে সেথা আসিল নামি
পাবনী ফোয়ারা জাহ্নবী-ধারা,
বাঁওড়ের জল সাগর-গামী !
পল্বলে ওঠে প্লাবনের রোল,
কল্লোল ওঠে প্র-নবে মিশি,
তোমার গানের সুরধুনী স্নেহে
শীতলিছে দেশ দিবস নিশি।

শীতলিছে আর করিছে অমল
চির-নিরমল পানের পানি,
ছোটো বড় তাহে সুখে অবগাহে
রাঢ়-বাংলার নিখিল প্রাণী।
দেবভাষা দেবলোকে যে ছিল গো
তব তপে সে যে এল কানাচে,
সপ্তকোটির হৃদয়-পরাণ
আজো তব নামে তাই তো নাচে।
সপ্ত কোটির মিলন-তীর্থ
ভূপ-সুনীচেরও মনের মিতা,
পূজারী পসারি সবারি যে তুমি
একাধারে চারি বেদ ও গীতা।
তোমার গানের রেশ লাগি কানে
কত প্রাণে গান উঠিল জেগে,
কত নীহারিকা সূর্য্য হ'ল গো
দানা বেঁধে তব জ্যোতির্মেঘে।
ভক্তির বলে শক্তি জাগালে
দেশ ভারতীরে করিলে ধনী,
বাংলা দেশের বাল্মীকি ওগো,
বঙ্গবাণীর পদ্ম যোনি!

*

বিধান-দাতা।

তোমারি কথাই মানব মোরা
মনুর বচন মানব না।
সংহিতাতে ছাই দিয়ে আজ
চলুক তোমার গান শোনা।
তোমার গানে পেয়েছি যে বল
সার যে সকল সংহিতার,
বাঁধ নূতন বিধান দাতা
সবাই পাবে ন্যায় বিচার।
তোমার গানের, তোমার প্রাণের
পঞ্চবটীর আবছায়ায়
কত যে বীজ ছড়িয়ে আছে
বলবে কে তা' জানবে হায়!
আদি কবি নও হে শুধু
সাম্য-সামের হও আদি—
কাঠগড়াতে বামুন ঠাকুর
পথের কুকুর ফরিয়াদী!
কুকুরকে দাও ডিক্রি তুমি,
ঠাকুরকে দাও দণ্ড হে,
রাজার সেরা রামকে দিয়ে
করলে একি কাণ্ড হে!
অন্যায়ে মন দায়নি যে সায়
বুঝছি সে সুস্পষ্ট হে,
কবি! তোমার প্রাণ যে কাঁদায়
উৎপীড়িতের কষ্ট হে!
কুকুরকে তাই জয় দিয়েছ,
পৈতে ছেঁড়ার শঙ্কা নেই,
সাম্য মহাসাম গেয়েছ
হয় তো নিজের অজ্ঞাতেই!
উদ্ভাসিছে গান যে তোমার
ভবিষ্যতের পূর্ব্ব-ভাস,
কবি তুমি দ্রষ্টা তুমি
কীর্ত্তিমন্ত কৃত্তিবাস।
শূদ্র দ্বিজের পৃথক্ আইন—
আছে মনুর কুকীর্ত্তি;
ঠাকুর কুকুর একসা করে'
নাড়িয়ে দিলে সে ভিত্তি।
গানে তুমি মন কেড়েছ
তোমার পিছেই চলবে দেশ,
গানের গাঁথন কয় যে আইন
সেই আইনই ফলবে শেষ।

*

যশোধন।

"যেথা যাই সেথাই গৌরব-মাত্র সার"

চাও কেবল যশ অমল
কীর্ত্তিসার কৃত্তিবাস!
স্বর্ণ নয় হর্ম্য নয়
দাস-দাসীর নাইক আশ।

চাওনা পদ, পয়সা নয়,
রাজপ্রসাদ—চাওনা তাও,
গৌরবের সৌরভেই
মন মাতাল, ধাও উধাও।

ঢের রাজার যাও সভায়
গান শোনাও, রস বিলাও,
রাজ-শ্রোতায় দ্যায় যা পায়
নাওনা তাও, তাও ফিরাও।

এই তো ঠিক প্রাণ কবির
এই তো রীত মন্-ভোলার,
রাজ-দাতায় দাও জবাব
"নিই নে দাম দিল্ খোলার।

"যাই যেথাই রস বিলাই
পাই সেথাই যশ কেবল,
লই যে দান সে সম্মান
আর শ্রোতার মন্ কমল।"

এই কবির উচ্চ শির
এই কবির উচ্চ প্রাণ
হোক্ মোদের হোক সহজ
কৃত্তিবাস কীর্ত্তিমান।

উঞ্ছ লোভ দগ্ধ হোক
সব কবির মোর দেশের,—
পূর্ণতার উৎস যার
চিত্ত, তার ক্ষোভ কিসের?

দাও হে বর হেঁট না হয়
শির কবির বঙ্গে আর,—
যেই দেশের মুল গায়ন
কৃত্তিবাস—কীর্ত্তিসার।

অগ্রহারী।

ওগো! কাল্-ভোলা কীর্ত্তি তোমার অচপল,
কবি! মৃত্যু-বিজয় তব কাব্য সফল;
ঝরে কণ্ঠে পীযূষ তব নিত্য-কালে,
চির রাজটীকা ভাস তব দীপ্ত ভালে!

তুমি কঙ্কালে প্রাণ দিলে সঞ্চারিয়া!
ওঠে মন্ত্রে তোমার মৃত সিংহ জীয়া!
তব স্পর্শে শ্যামল হ'ল রিক্ত মরু!
তব সঙ্গীতে মুঞ্জরে শুষ্ক তরু!

কত অ-ন্দরি বল্মীকে অঙ্গ ঢাকা,
তবু উদ্ভাসে বঙ্গ ও কীর্ত্তি-রাকা;
তব কণ্ঠে সরস্বতী, চক্ষে বিভা,
আনে গৌড়ে নূতন দিবা শ্রী-প্রতিভা।

তুমি বঙ্গবাণীর প্রিয় আদ্য কবি
এলে বজ্র-সাধন শেষে সৌম্য ছবি;
তুমি নির্ম্মিলে দেশ-ভাষা কাব্য ছাঁদে
এল গঙ্গা তরঙ্গিয়া শঙ্খ নাদে!

ছিলে মান্-সরোবর্-জলে হংস তুমি,
বুঝি স্বপ্নে বাণীর পাদ-পদ্ম চুমি,
এলে পথ-ভোলা হংস শ্রীপঞ্চমীতে
বহি' বাক্ দেবতার বীণা এই নিভৃতে!

তুমি জাগ্‌লে দখিন হাওয়া পূর্ণ মাঘে
যবে কণ্ঠে কোকিল শামা কেউ না জাগে,
তুমি জাগিয়ে যখন দিলে জাগ্‌ল সবাই
আজি লক্ষ পাখীর গানে বিশ্রামই নাই!

আজি সব গানে গুঞ্জনে অর্ঘ্য তোমার
সারা বঙ্গ পরায় গলে বন্দনা-হার;
লেখে ছন্দে যে, শিষ্য সে কৃত্তিবাসের
তুমি কেন্দ্র হে ছন্দোমি রাস-বিলাসের।

আজি বিশ্বে যে পায় পূজা বঙ্গবাণী
তারি গড়নে প্রথম ভূমি আদরা খানি,
তারে পূজিবে যে পূজিবে তোমায় সে, কবি!
জ্ঞানে অজ্ঞানে অর্পিবে যজ্ঞ-হবি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

—————

পুস্তক-পরিচয়

হেঁয়ালি—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য ২৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা। ১৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

প্রচ্ছদের উপর বইএর নামটি গোলকধাঁধার আকারে লেখা—সুন্দর হইয়াছে।

এখানি কবিতার বই। বিজয় বাবুর কবিতার চোস্ত ভাষা, বিচিত্র ছন্দের ঝঙ্কার ও মিলের কারিগরী অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। তিনি অনেকগুলি কবিতার বই লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে ফুলশর, যজ্ঞভস্ম ও পঙ্কমালা প্রধান। বর্ত্তমান পুস্তকে ফুলশর ও যজ্ঞভস্মের বাছাইকরা কবিতার কয়েকটি, নূতন কবিতা কতকগুলি ও কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা স্থান পাইয়াছে। নূতন কবিতাগুলি কবির দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবার পরে পরকে বলিয়া লেখানো। তাহাতে দুই একটা জায়গায় ছন্দের একটু আধটু গোলমাল বা শ্রুতিকটু শব্দ দুই একটা স্থান পাইলেও কবিতাগুলি কারিগরীর হিসাবে অতি চমৎকার হইয়াছে। পরিশিষ্টে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের কিয়দংশের ও ধনিয়সুত্তের পদ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এইসব নানা কারণে বইখানি অতি মনোরম হইয়াছে এবং আমরা আশা করি যে ইহা সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে। পাঠক এই কবিতাগুলির মধ্যে রচনার কারিগরী দেখিয়া প্রীত হইবেন নিশ্চিত।

গৃহশ্রী—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ৩৫৮ পৃষ্ঠা। ভালো এণ্টিক কাগজে খুব চওড়া মার্জ্জিন রাখিয়া পরিষ্কার ছাপা। কাপড়ে বাঁধা সচিত্র মলাট সুদৃশ্য হইয়াছে। মূল্য মাত্র দেড় টাকা। ভিতরেও দুখানি রঙিন ছবি আছে।

এই বইখানিতে গৃহলক্ষ্মীদের কি প্রণালীতে ঘরকন্না করিলে গৃহশ্রী প্রতিষ্ঠা করা সহজ হইবে তাহাই স্বীয় সাংসারিক অভিজ্ঞতা হইতে ব্যবস্থিত হইয়াছে। বইখানি নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে—(১) গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। এই পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে গৃহিণী শুধু রাঁধুনী বা পরিচারিকা নহেন, গৃহের যাহাকিছু তিনি তাহার সকলের নিয়ন্ত্রী। (২) স্ত্রী-শিক্ষা। লেখকের মতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই; মোটামুটি লেখাপড়া ও ঘরকন্নার ব্যাবহারিক শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু লেখক যাহাকে পোষাকী বিদ্যা বলিয়াছেন তাহাই যদি ব্যাবহারিক হইয়া উঠিতে পায় তবে কি সেই গৃহিণী অল্পশিক্ষিতা ঘরকন্নায়-পটু গৃহিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবেন না? লেখক বলেন "গৃহের সমস্ত সুখদুঃখ, অভাব অভিযোগ, সমগ্রভাবে চিন্তা করিয়া গৃহের ব্যবস্থা করিবার শিক্ষা যিনি পাইয়াছেন তিনি কেন যে উচ্চশিক্ষিতা বলিয়া গণ্য হইবেন না তাহা বুঝিতে পারি না। গৃহের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পারিলেই স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় তাহাই মনে করিতে হইবে।" কেন মনে করিব? গৃহিণী কি শুধু ঘরকন্না সুশৃঙ্খলায় চালাইবার যন্ত্র? তিনি প্রথমে মানুষ, পরে তাঁহার অপর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিবিধ বিদ্যাচর্চ্চার দ্বারাই উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিশেষত্ব ও মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করে। মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পর গৃহিণী প্রথমে সহধর্ম্মিণী তারপর মাতা। উচ্চশিক্ষিত পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইতে হইলে নারীকে নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষিতা হইতে হইবে নতুবা তিনি পতির চিন্তারাজ্যের ও ভাবরাজ্যের বাহিরে পড়িয়া থাকিয়া নিজেও অতৃপ্ত থাকিবেন, স্বামীকেও অতৃপ্ত রাখিবেন। মাতার কর্ত্তব্য বর্ণন করিতে গিয়া লেখক গৃহিণীর যেসব গুণ থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন—যেমন, পুত্রকন্যাকে মুখে মুখে বিবিধ ভাষা শিক্ষা দেওয়া, ইতিহাস ভূগোল বস্তুতত্ত্ব শেখানো, অঙ্ক গান সেলাই রান্না প্রভৃতি শেখানো—এসব উচ্চশিক্ষিত মাতা ভিন্ন অপরের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এখানে লেখক আদর্শ বড় দেখাইয়াছেন কিন্তু প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার মমতায় পড়িয়া আদর্শের বিরোধী কথা গোড়ায় বলিয়া ফেলিয়াছেন। (৩) শিশুদিগের শিক্ষা। এ পরিচ্ছেদে লেখক বলিতেছেন "গৃহিণী যতটা শিক্ষিতা হইবেন সেই পরিমাণে শিশু সন্তানের উন্নতি সাধনের যোগ্যা হইবেন।" তাঁহার মতে মেয়েদেরও স্কুলে পড়া উচিত, কিন্তু তাহাদের প্রধান মূলধন রূপলাবণ্যের ক্ষতি হয় এমন বদ্ধ অবস্থায় নহে। স্বাস্থ্যহানি হইলেই স্ফূর্ত্তি কমে, রূপলাবণ্য নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা ছেলে মেয়ে উভয়ের পক্ষেই তুল্য আবশ্যক। লেখকের মতে ছেলেমেয়েদের শিশুকাল হইতেই কাজ করানো উচিত, কারণ "কাজ করা নয়, কাজ শিক্ষা।" (৪) একান্নবর্ত্তী পরিবার। এই পরিচ্ছেদে এই প্রথার সু ও কু দুই দিকই আলোচিত হইয়াছে; স্বার্থ ত্যাগ করিয়া চিত্তসংযম অভ্যাস না করিলে একান্নবর্ত্তী পরিবার কখনো সুখশান্তির কারণ হয় না, ইহা বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। (৫) সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য। (৬) দাসদাসীর প্রতি ব্যবহার। (৭) গুরুজনের প্রতি ব্যবহার। (৮) দাম্পত্য জীবন। এই কয় পরিচ্ছেদে অনেক অভিজ্ঞতা-লব্ধ কাজের কথা আলোচিত হইয়াছে। দাসদাসীকে পরিবারের লোক মনে করিয়া তাহাদের সহিত সদয় ও সমান ব্যবহার করা উচিত। ঘোমটা টানাই "লজ্জা নহে, লজ্জার অভিনয় মাত্র। সংযত ব্যবহারেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত লজ্জা প্রকাশ পাইয়া থাকে।" (৯) শেষের কথা। এই পরিচ্ছেদে—নিরাশ্রয়ের সান্ত্বনা কি? মৌখিক জপ বৃথা, তিনি নিত্যই আসেন—প্রভৃতি বিষয় উপন্যস্ত হইয়াছে।

পরিশিষ্টে এলোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী মতে গৃহ-চিকিৎসা প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজের দ্বারা লিখিত হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞের রচিত কৃষিপঞ্জিকা—অর্থাৎ কোন্ মাসে কোন্ তরিতরকারীর গাছ পুঁতিতে হয় ও তাহাদের লালন পালন; ভৃত্য ও কর্ম্মচারীদের বেতনের হিসাব—মাসমহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত—তাহার হিসাব করিয়া-দেওয়া তালিকা; জিনিসের ওজনের হিসাব; সাংসারিক আয়ব্যয়ের হিসাব বা জমাখরচ রাখিবার আদর্শ পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে পাঠকপাঠিকারা বুঝিতে পারিবেন যে বইখানি নিত্য জীবনের ব্যবহারের উপযোগী বহু উপদেশ পরামর্শ ও কাজের কথায় পূর্ণ ও গৃহিণীদের বহু আবশ্যকে সাহায্যে লাগিবে। বইএর ভাষা অতি সরল ও সরস, সুতরাং অল্পশিক্ষিতারাও সহজে বুঝিতে পারিবেন এবং পড়িতে ভালোও লাগিবে। এই পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ব্বাহিত হইলে গৃহশ্রী বর্দ্ধিত হইবে। বিবাহের সময় নববধূকে উপহার দিবার যোগ্য। অল্পশিক্ষিতা সাধারণ গৃহিণীদের প্রত্যেকের সহচরী হইবার উপযুক্ত। ইহার উপযুক্ত সমাদর হইবে আশা করি।

মুদ্রারাক্ষস।

নিবেদিতা—শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত ও ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ১নং মুখার্জ্জির লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। মূল্য ।০ আনা। এণ্টিক কাগজে পাইকা অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ১২৮ পৃঃ।

"চোখের জলের কালী দিয়া" লেখা ভগিনী নিবেদিতার পবিত্র চরিত্রের এই কাহিনীটি তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যখন প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় তখন অনেকেই তাহা পাঠ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। নিবেদিতার বাগবাজারস্থিত বোসপাড়ার বালিকা-বিদ্যালয়ের সহিত লেখিকা ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়াতে তাঁহার দৈনন্দিন অন্তর্জীবনের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাইবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন। সুমধুর সরল মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লেখিকা সেই অসাধারণ মনস্বিনী ও নিষ্কাম-ব্রতধারিণী মহিলার চরিত্রের বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। নিবেদিতার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও ভারতবর্ষের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির কথা এই চরিত-কথাটিতে লেখিকা শ্রদ্ধামুগ্ধচিত্তে বর্ণনা করিয়া একস্থলে লিখিতেছেন, "ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই তিনি (নিবেদিতা) একেবারে ভাবমগ্ন হইয়া যাইতেন। মেয়েদের বলিতেন—ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!! ভারতবর্ষ!!! মা! মা! মা! ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করিবে, ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা!" বলিয়া নিজের জপমালা হাতে লইয়া নিজেই জপ করিতেন—মা! মা! মা!"

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আমরা সকলকে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহার বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ তপস্বিনী নিবেদিতার আজীবন সাধনার জীবন্ত ও জ্বলন্ত সাধন-ক্ষেত্র বোসপাড়ার বালিকা-বিদ্যালয়—অনশন অর্দ্ধাশন স্বীকার করিয়া যাহাকে তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছেন—তাহার সাহায্যে ব্যয়িত হইবে।

প্রয়াগধামে কুম্ভ-মেলা—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। স্বর্ণাঙ্কিত-অক্ষর-খচিত কাপড়ে বাঁধানো। উৎকৃষ্ট স্বদেশী এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা।

এই পুস্তকখানি ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়। তাহার পর ইংরেজী ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। সমালোচ্য সংস্করণটি তৃতীয় সংস্করণ। ইহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি কুম্ভমেলার ইতিহাস নহে, ভক্তচরিত-কথা।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় বাংলা ১৩০০ সনে প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা দেখিবার জন্য গমন করিয়া সেখানে ও মেলায় সমবেত যে-সমুদয় সাধুমহাজনদের সাক্ষাতের সুযোগলাভ করেন তাঁহাদের বিষয় এই পুস্তকে সহজ ও সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই-সমস্ত সাধু মহাত্মাদিগের নির্ম্মল চরিত্র, দয়া দাক্ষিণ্য ও সাধনার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে হৃদয় উন্নত ও মন পবিত্র হয়। গ্রন্থকার সাধুমহাত্মাগণের যে চরিতকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নীরস ও শুষ্ক হয় নাই, পরন্তু প্রাণস্পর্শী হইয়াছে।

লোকচক্ষুর অন্তরালে সভ্যসমাজ হইতে দূরে থাকিয়া এই দেশে কত সাধুমহাত্মা লোকসেবায় ও সাধন ভজনে কিরূপে জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদের পূত চরিত্রের প্রভাব কত ব্যাপক, তাঁহাদের মত কত উদার, তাঁহাদের হৃদয় কত মহৎ, তাহা গ্রন্থকারের লেখনী অতি নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই পুস্তকপাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন।

পুস্তকখানিতে কয়েকটি সাধুর সুন্দর প্রতিকৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ বিরচিত। কলিকাতা, ১৩২২। মূল্য ১, টাকা মাত্র। এণ্টিক কাগজে পাইকা অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ১২৫ পৃষ্ঠা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নাম জানেন না এমন লোক এদেশে বিরল। অধিকাংশ লোকেই তাঁহাকে মহাভারতের অনুবাদক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী-অনুবাদক বিপন্ন পাদ্রী লংসাহেবের বিপদে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়াই জানেন। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িতা, কালীপ্রসন্ন সিংহের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শুধু পণ্ডিত কিম্বা বদান্য ধনী বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু মনস্বী স্বদেশপ্রেমিক ও তেজস্বী সমাজসংস্কারক, বিচক্ষণ রাজনৈতিক, শক্তিধর সংবাদপত্র-সম্পাদক, সুরসিক লেখক, নাট্যকলানুরাগী অভিনেতা বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাই। কালীপ্রসন্ন যেমন একদিকে সংস্কৃতানুযায়ী বঙ্গভাষায় মহাভারতের অনুবাদক, অপরদিকে তেমনই চলতি বাংলায় 'হুতোমের' লেখক। শুধু এই দুই-প্রকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন রচনারীতির লেখক হিসাবেও বাংলা-সাহিত্যে কালীপ্রসন্নের স্থান—নিতান্ত নিম্নে নহে।

গ্রন্থকার এই জীবনচরিতখানিতে কালীপ্রসন্ন ও তাঁহার সমসাময়িক বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা স্থান হইতে প্রচুর জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু পুস্তকখানির ভাষা স্থানে স্থানে কৃত্রিম ও অনর্থক ভারাক্রান্ত।

সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিয়া উহাতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর প্রতিভা-পুনঃপ্রদীপ্তির (Renaissance) যাহারা প্রবর্ত্তক কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহাদিগের অন্যতম।" এই ভূমিকাটি পুস্তকের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে।

এই গ্রন্থখানিতে প্রায় ২০ খানি চিত্র আছে। কিন্তু কোনটিই সুমুদ্রিত নহে।

ব্যথা—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত ও ৫২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুরেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

ছোটগল্পের বই। পুস্তকের ভূমিকারূপে "দুটা কথায়" শ্রীযুক্ত জলধর সেন বলিতেছেন, "লেখক নবীন যুবক, কলেজের ছাত্র।" প্রকাশক তাঁহার "বক্তব্যে" বলিতেছেন—"পুস্তকের অধিকাংশ গল্পই বিশ্বপতি বাবুর বাল্যের রচনা * * সে সময়ে লেখকের বয়স ষোল কি সতের হইবে। বাল্যের রচনাগুলি প্রকাশিত করিতে তাঁহার তত আগ্রহ ছিল না, আমিই কেবল জোর করিয়া সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম।" "মাসিক পত্রিকার পাঠকগণ গ্রন্থকারের গল্পাপেক্ষা কবিতার সহিতই অধিক পরিচিত"—এই বলিয়া প্রকাশক আশ্বাস দিতেছেন যে, "লেখকের বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলিও ভবিষ্যতে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।"

আমাদের ধারণা ছিল—যে, আমরা মাসিক পত্রিকাগুলি নিয়মিত রূপে পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু এখন দেখিতেছি—আমাদের সে ধারণা নিতান্তই ভুল। কেননা আমরা গ্রন্থকারের গল্প দূরে থাকুক কবিতারও সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই! সে যাহা হউক এখন পুস্তকের কথা বলি।

রচয়িতা তাঁহার গল্পগুলির নাম দিয়াছেন 'ব্যথা', কেননা তাঁহার বিশ্বাস তিনি "বাংলা মায়ের ঘরের ব্যথার কথা" লিখিয়াছেন। প্রত্যেক গল্প করুণ-রসাত্মক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু যে পরিমাণ ক্ষমতা, মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা, লিপিকৌশল ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের শক্তি থাকিলে পাঠকের চিত্তে "ব্যথা" লাগিতে পারে তাহার এতটুকু পরিচয়ও কোন গল্পে নাই। শুধু কতকগুলি দুঃখের ব্যাপার আকারে

ক্ষুদ্র করিয়া লিপিবদ্ধ করিলে গল্পও হয় না আর কেহ ব্যথাও পায় না—এই কথা মনে রাখিলে প্রকাশক হয় ত কখনই তাঁহার বন্ধুর বাল্যরচনা "জোর করিয়া" প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিতেন না।

কার্ত্তিকচরিত—শান্তিপুর মিউনিসিপাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি-এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও শান্তিপুর সুতরাগড়ের চড়কতলা ষ্ট্রীটস্থ ৩২ নং ভবন হইতে শ্রীপাঁচুগোপাল ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। মূল্যের উল্লেখ নাই। এই পুস্তকখানিতে শান্তিপুর সুতরাগড়-নিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয়ের জীবনী-প্রসঙ্গে উক্তগ্রাম ও তত্রত্য মোদক জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে।

অ।

চিত্রপরিচয়

রাজা বীরসিংহ পঞ্জাবের অন্তর্গত নুরপুরের অধিপতি ছিলেন। তিনি নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। মহারাজা রণজিৎ সিংহের কোনো একটি আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করায় বীরসিংহ মহারাজার কোপে পড়েন। ১৮১৫ সালে তিনি নুরপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া চম্বাতে আত্মীয় রাজার আশ্রয় লয়েন; তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরদের সাহায্যে নষ্টরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বিফল হন; তৎপরে পাহাড় ছাড়িয়া লুধিয়ানায় নামিয়া আসিয়া কাবুলের শা-সুজার সহিত ষড়যন্ত্র পাকাইবার চেষ্টা করিয়াও বিফল হন; ১৮২৬ সালে পুনরায় নষ্টরাজ্য উদ্ধারের যথেষ্ট চেষ্টা করেন; কিন্তু এবারেও পরাজিত হইয়া আবার চম্বাতে আশ্রয় লয়েন, চম্বার রাজা চরৎ সিংহ ছিলেন বীরসিংহের শ্যালক; শ্যালক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আশ্রিত ভগিনীপতিকে মহারাজা রণজিৎ সিংহের হস্তে সমর্পণ করেন। সাত বৎসর কারাবাসের পর তাঁহাকে মুক্তি দিয়া রণজিৎ সিংহ বীরসিংহকে একটি জায়গীর দিতে চাহেন। রাজা বীরসিংহ দয়ার দান সদর্পে প্রত্যাখ্যান করিয়া নুরপুর রাজ্যে আপনার ন্যায্য দাবীতে ১৮৩৬ সালে আর একবার অপহৃত রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ১৮৪০ সালে নুরপুর দুর্গের সম্মুখে শত্রুদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া হৃতরাজ্য উদ্ধার করিয়া তিনি সেই যুদ্ধে নিহত হন। তিনি প্রাণ দিয়া স্বরাজ্য লাভ করিলেন; পুনরায় রাজা হইলেন; কিন্তু রাজ্য ভোগ করা ভাগ্যে ঘটিল না।

রাগিণী মেঘমল্লার ছবিখানিতে আসন্ন ঝড়বৃষ্টির ভাবটি একই মুখে চলিষ্ণু মেঘপুঞ্জ, প্রবাহিত শাখাপল্লব, ও প্রণমিত পদ্মবন দ্বারা ইঙ্গিতে চমৎকার ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

এবারকার প্রচ্ছদের রঙিন নক্সাটি ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল মহাশয়ের পরিকল্পনা অনুসারে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের অঙ্কিত।

প্রবাসী পুরস্কার।

এ বৎসর দুটি প্রবন্ধের জন্য "নৃত্যগোপাল-স্মৃতি-পুরস্কার" নামক দুইটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি নগদ ৫০৲ টাকা পরিমিত। একটির বিষয় "বঙ্গে শিল্পের উন্নতি," দ্বিতীয়টির বিষয় "বঙ্গে কৃষির উন্নতি"। প্রত্যেকটিতে, গভর্ণমেণ্টেকে কি করিতে হইবে এবং দেশবাসীদিগকেই বা কি করিতে হইবে, তাহা লিখিতে হইবে, এবং অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীবর্গ তত্তৎদেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন আবশ্যকমত তাহার উল্লেখ ও বৃত্তান্ত দিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থাদি হইতে এই সব বৃত্তান্ত গৃহীত তাহার নাম ও পত্রাঙ্ক দিতে হইবে। ইংরেজি কিছু উদ্ধৃত হইলে তাহার বাংলা অনুবাদ দিতে হইবে।

পুরস্কারের জন্য আগামী ১লা আশ্বিন (১৩২৩) তারিখের মধ্যে রেজেষ্টারী ডাকে প্রবাসী-সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি এবং পুরস্কার-প্রতিযোগী প্রবন্ধের মধ্যে যে চারিটি প্রবন্ধ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে তাহা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে এবং পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি পুস্তিকাকারে বা যে-ভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের থাকিবে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ যিনি ফেরৎ চান তিনি পাঠাইবার সময়ই রেজেষ্টারী ফী দুই আনা সমেৎ ডাকমাশুল পাঠাইবেন।

প্রবন্ধ কাগজের এক পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

প্রবন্ধ উপযুক্ত না হইলে কেহ পুরস্কার পাইবেন না বা কোনটিই প্রকাশিত হইবে না।

ইচ্ছা করিলে একজন দুই বিষয়েই প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন। একাধিক প্রবন্ধ সমান বিবেচিত হইলে পুরস্কার ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

আমাদের বিনা অনুমতিতে আমাদের প্রকাশিত রচনা লেখক বা অপর কেহ অন্যত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

২১১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা।

করাচী হইতে দি ওআর লীগ্ জার্নেল নামক একখানি মাসিক পত্র বাহির হইতেছে। উহার এপ্রিল সংখ্যার গোড়ায় একখানি মানচিত্রে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের বন্ধুগণের সাম্রাজ্যসমূহ লাল রঙে রঙাইয়া এবং তাঁহাদের শত্রু-পক্ষের অধিকৃত দেশসকল কাল কাল ফুটকি দিয়া দেখান হইয়াছে। লাল দেশগুলির আয়তন কাল ফুটকি দেওআ দেশগুলির আয়তন অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার পর একটি প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে বৃটিশ পক্ষীয়দের সৈন্যবল যত হইতে পারে, তাঁহাদের শত্রুপক্ষদের সৈন্যবল তত হইতে পারে না। উভয়পক্ষের সৈন্যবলের ঊর্দ্ধসংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ দেওআ হইয়াছে।

জার্মেনী	৯৫,০০,০০০ জন
অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী	৫০,০০,০০০ "
তুরস্ক	[illegible]০,০০,০০০ "
বুলগেরিয়া	৪,০০,০ ০ "
মোট	১,৬৯,০০,০০০ জন

রুশিয়া	১,৫০,০০,০০০ জন
ফ্রান্স	৬০,০০,০০০ "
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য	৫০,০০,০০০ "
ইটালী	৪৫,০০,০০০ "
জাপান	৩০,০০,০০০ "
বেলজিয়ম	১০,০০,০০০ "
সার্বিয়া	৫,০০,০০০ "
পোর্টুগ্যাল	৪,০০,০০০ "
মোট	৩,৫৪,০০,০০০ জন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে জার্মেন পক্ষের সৈন্যবল অপেক্ষা ব্রিটিশপক্ষের সৈন্যবল দ্বিগুণের অধিক হইতে পারে।

কোন্ রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা কত, এবং সৈন্যবলের ঊর্দ্ধসংখ্যা কত ধরা হইয়াছে, তাহা নীচের তালিকায় দৃষ্ট হইবে

রাষ্ট্র	লোকসংখ্যা	সৈন্যের উচ্চতম সংখ্যা
রুশিয়া	১৭,৪০,৯৯,৬০০	
ফ্রান্স	৮,০৫,৮৮,৫০১	
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য	৪৩,৪১,৮৬,৬৫০	৫০,০০,০০০
ইটালী	৩,৬২,৮৬,৬৮৩	৪৫,০০,০০০
জাপান	৬,৭১,৪২,৭৯৮	৩০,০০,০০০
বেলজিয়ম	৭৫,১৬,৭৩০	১০,০০,০০০
সার্বিয়া	২৯,১১,৭০১	৫,০০,০০০
পোর্টুগ্যাল	১,৫৬,৩৫,০৫৬	৪,০০,০০০

তালিকাতে যে লোকসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, উহা প্রত্যেক দেশের ও তাহার উপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশসকলের মোট লোকসংখ্যা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, রুশীয় সাম্রাজ্যেরও আড়াই গুণ। কিন্তু ইহার সৈন্যবল যত বেশী হইতে পারে, তাহা রুশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ দেখা যাইতেছে, এমন কি ফ্রান্স অপেক্ষাও কম দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অধিকাংশ দেশ ও জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হয় না। যদি তাহা করা হইত, তাহা হইলে ইহার সৈন্যবল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত, এবং জার্মেনী কবে পরাজিত হইয়া যাইত।

ইংলণ্ডের যে সৈন্য কম, তাহাতে প্রশংসার বিষয় এই যে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ইংলণ্ডে জার্মেনী বা রুশিয়ার মত একটা যুদ্ধভক্তি (militarism) বা সৈনিক প্রাধান্য নাই। কিন্তু নিন্দার বিষয়ও এই আছে যে ফ্রান্স, রুশিয়া প্রভৃতি শক্তি অধীনস্থ অশ্বেত অখৃষ্টিয়ান জাতিসকলকে যে-পরিমাণে সৈন্যদলে গ্রহণ করে ও সৈনিকের অধিকার দেয়, ইংলণ্ড তাহা দেয় না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোটামুটি সাড়ে ৪৩ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ৭ কোটি মাত্র শ্বেতাঙ্গ। সমর্থ-বয়সের সুস্থ শ্বেতকায় পুরুষ মাত্রেরই সৈনিক হইবার অধিকার আছে। সাম্রাজ্যের বাকী সাড়ে সাঁইত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে সাড়ে একত্রিশ কোটি ভারতবর্ষে বাস করে। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোক ভারতবাসী। ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশবাসী কয়েকটি জাতি মাত্রকে সিপাহী দলে ভর্ত্তি করা হয়। অধিকাংশ প্রদেশ ও জাতি হইতে সিপাহী লওয়া হয় না। সকল প্রদেশের সকল জাতীয় সমর্থবয়স্ক সুস্থ পুরুষমাত্রেরই যদি সিপাহী হইবার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত।

যেমন ব্রিটিশসাম্রাজ্যের শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ছয় কোটি, তেমনি ফ্রান্সদেশবাসীদের সংখ্যা কিছু কম ৪ কোটি; এবং ফ্রান্সের উপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশগুলির লোকসংখ্যা ৪ কোটির কিছু অধিক। ফ্রান্স নিজ উপনিবেশ ও অধীনস্থ স্থান-সকল হইতে যত সৈন্য লয়, ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশ-সকল হইতে সে পরিমাণে সৈন্য লওয়া হয় না। এই জন্য ফ্রান্সের সৈন্যসংখ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা বেশী।

চন্দননগরের বাঙালী সৈন্য।

বাঙালীর ইংরেজের পল্টনে সিপাহী হইবার অধিকার নাই; কিন্তু ফরাসীরা এভাবে বাঙালীকে বাদ দিতেছে না। চন্দননগর একটি ছোট শহর। সেখান হইতে ২০ জন সিপাহী গিয়াছে, আরও চৌদ্দ জন যাইবে। এই ৩৪ জন বাঙালী সিপাহী দ্বারা ফ্রান্সের সৈন্যবল বেশী বাড়িবে না, তাহারা গিয়াই জার্মেনদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। ফ্রান্সের সৈন্যবল ইংরেজের সৈন্যবল অপেক্ষা কম নয়। ফরাসী সৈন্যেরা যুদ্ধ করিতেছেও খুব সাহস ও দক্ষতার সহিত। সুতরাং ফ্রান্স নিতান্ত বিপন্ন হইয়া, ৩৪ জন বাঙালী সিপাহীর সাহায্যে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে ভাবিয়া, বাঙালীকে সিপাহী করিতেছে, এমনটা না হইতেও পারে।

ফ্রান্স বোধ হয় ফরাসী সাধারণতন্ত্রের শাসিত কোন জাতি বা দেশকে কোন স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে চায় না। যুদ্ধ যতদিন পৃথিবী হইতে লোপ না পাইতেছে, ততদিন প্রত্যেক জাতিরই নিজের দেশ, নিজের জাতি, নিজের ঘরবাড়ী, নিজের পরিবার রক্ষা করিবার সামর্থ্য থাকা উচিত। এই সামর্থ্য লাভ করিবার অধিকার স্বাভাবিক।

ফ্রান্সের হয়ত একরূপ গূঢ় অভিপ্রায়ও থাকিতে পারে, যে, তাহার দেখাদেখি মিত্র ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষের সব প্রদেশ হইতে পল্টনে সিপাহী ভর্ত্তি করিতে থাকে, তাহা হইলে মিত্রপক্ষের মোট সৈন্যদল শীঘ্র যথেষ্ট বাড়িবে, এবং জার্মেনী অনতিবিলম্বে পরাভূত হইবে। ফ্রান্সের আত্মরক্ষার জন্য যে অনেক সৈন্য চাই, তাহা ফ্রান্সে বিস্তর রুশীয় সৈন্যের আমদানী হইতেই বুঝা যাইতেছে। রুশিয়া অপেক্ষা ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে সৈন্য আনা সোজা। তথাপি রুশিয়া হইতে আনিবার কারণ এই যে ইংলণ্ডের সৈন্যদলে এখনও যথেষ্ট সৈন্য ভর্ত্তি হয় নাই। চন্দননগর হইতে কয়েকটি সৈন্য লইয়া ফ্রান্স হয়ত পরোক্ষভাবে ইংলণ্ডকে তাগিদ দিতেছে আরও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফ্রান্সে পাঠাও।
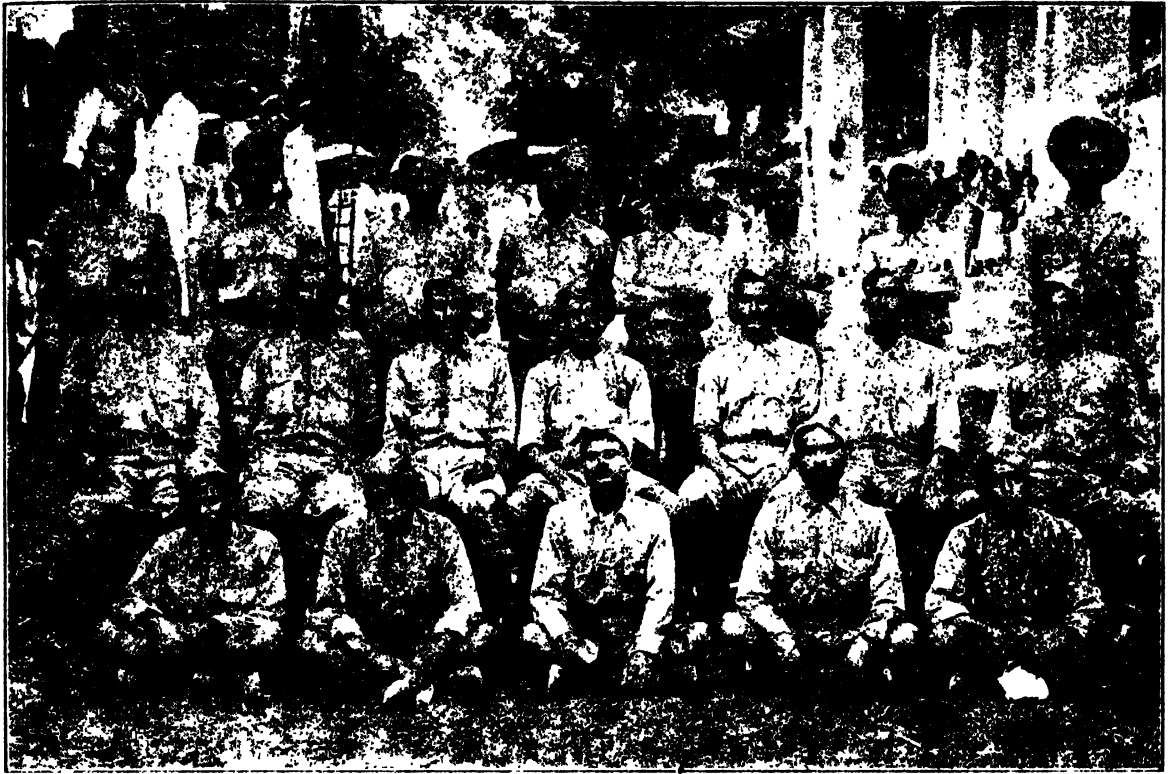
দাঁড়াইয়া — সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, মনোরঞ্জন দাস, ফণীন্দ্রনাথ বসু, আশুতোষ ঘোষ, রামপ্রসাদ ঘোষ, সন্তোষকুমার সরকার রাধাকিশোর সিংহ, হারাধন বসু।

চেয়ারে বসিয়া — পাঁচকড়ি মোদক, তারাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ সরকার, করুণাময় মুখোপাধ্যায়, অমিতাভবুদ্ধ ঘোষ, ব্রহ্মমোহন দত্ত, বিপিনচন্দ্র ঘোষ।

মাটিতে বসিয়া — বলাইচন্দ্র নাথ, হাবুলচন্দ্র দাস, পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিশ্চন্দ্র সিংহ, রবীন্দ্রনাথ রায়।

বাঙালী কি সৈনিক হইবে?

ইংরেজ বাঙালীকে সিপাহী করেন না কেন, তাহার ঠিক্ কারণ আমরা জানি না। যুদ্ধ করিতে হইলে সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ, সাহস ও বুদ্ধি চাই। বুদ্ধিতে বাঙালী কাহারও চেয়ে হীন নয়। যুদ্ধের সাহসটা অন্য রকমের সাহস হইতে স্বতন্ত্র একটা সৃষ্টিছাড়া জিনিষ নয়। বাঙালী জীবনের সকল বিভাগে সাহস দেখাইতেছে, যুদ্ধে সাহস দেখাইতে পারিবে না, ইহা ধরিয়া লওয়া ঠিক্ নয়। বাঙালীরা ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, বিপন্নের ও সংক্রামক ব্যাধিতে পীড়িতের সেবক, আসন্নমৃত্যু হইতে উদ্ধারকর্ত্তা, পর্য্যটক ও ভৌগোলিক আবিষ্কারক, নদী ও সমুদ্রগামী নৌকা ও জাহাজের মাঝিমাল্লা, বেলুন-আরোহী, সিংহব্যাঘ্রবশীকারক, প্রভৃতি হইয়া বহুস্থলে চূড়ান্ত সাহস দেখাইয়াছে। অল্পসংখ্যক লোক যুদ্ধক্ষেত্রেও সাহস দেখাইয়াছে। ইহা পুরাকালের কথা নয়, বর্ত্তমান সময়ের। অতীতকালে, ইংরেজরাজত্বের প্রারম্ভকালেও বাঙালী যে যুদ্ধে দক্ষ ছিল, তাহার প্রমাণ ইতিহাস হইতে অনেকবার দিয়াছি। সাহসী ব্যাঘ্রশিকারীর বংশ বাংলাদেশে এখনও নির্ম্মূল হয় নাই। বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও, প্রচুর খাদ্যের অভাব সত্ত্বেও, এখনও হাজার হাজার বলিষ্ঠ সুস্থ লোক আছে। অযোগ্য লোককে যেমন অন্যদেশে বাদ দেয়, এদেশেও তেমনই না লইলেই হয়।*

---

* ইংলণ্ডের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। তথাকার দি নেশ্যন (The Nation) কাগজ বলেন ;—

আপত্তি হইতে পারে যে বাঙালী বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আর সমুদয় বিভাগে বাঙালী উচ্চতম পদেও বিশ্বস্তভাবে কাজ করিয়াছে, আর যেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে ফাঁসীর সম্ভাবনাই বেশী, সেখানেই বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, বাঙালীকে এতটা বোকা মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা জাতিদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, রাজদ্রোহ-প্রচার, প্রভৃতি করিয়া দণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু সেই-সকল জাতি হইতে ত এখনও সিপাহী লওয়া হইতেছে? দুদশজন বাঙালী সিপাহী বদি বা ফাঁসী যান, তাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কিছুই ক্ষতি হইবে না। বাংলা দেশে যেরূপ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, যোদ্ধা জাতিদের অধ্যুষিত প্রদেশ-সকলে তেমন শিক্ষাবিস্তার হয় নাই বটে। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জার্মেনী প্রভৃতি দেশে বাংলা দেশ অপেক্ষা অধিক শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও যদি লোকেরা যুদ্ধে অসমর্থ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই দেশেই শিক্ষা লোককে পৌরুষহীন করিবে কেন?

বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভ কালে বাঙালী স্বেচ্ছাসৈনিকদল গড়িবার প্রস্তাব দেশবাসী কোন কোন প্রধানলোক করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, লর্ড কারমাইকেল ইহার পক্ষে ছিলেন; লর্ড হার্ডিংও নাকি পক্ষে ছিলেন। কিন্তু, কাহাদের প্রতিকূলতায় জানি না, পরিণামে প্রস্তাবটা নামঞ্জুর হইল। বাস্তবিক কি কি কারণে নামঞ্জুর হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু

Mr. Snowden severely criticised the work of the Military Service Tribunals in the House on Thursday. Some of his examples of the way in which "unfits" were being dragged into the Army were a pitiable enough exposure of such administration. According to the *Daily Chronicle*, they included

1.—Youth of twenty-two, subject to fits (had fifteen fits in one day).

2.—Man with one hand.

3.—Man with paralysed leg.

4.—Man suffering from effects of abdominal operation.

5.—An imbecile. ("Nobody but a born idiot would think of making a soldier of a man like this," was an independent local comment.)

কাগজে এইটুকু বাহির হইয়াছিল, যে, যুদ্ধ করা শিক্ষা-সাপেক্ষ, যুদ্ধে অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ কতকগুলি স্বেচ্ছা-সৈনিককে পল্টনে ভর্ত্তি করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান যাইতে পারে না। ইহা সত্য কথা; কিন্তু বাংলা দেশে এমন বেকুব তখনও কেহ ছিলনা এবং এখনও কেহ নাই যে মনে করে, যে, যুদ্ধ শিক্ষা করিতে হয় না, সবাই যুদ্ধ করিতে পারে। বাংলা দেশের লোকে এ কথাটাও জানে যে ইংলণ্ডে যাহারা পল্টনে নূতন ভর্ত্তি হয় এবং এখনও হইতেছে, তাহারাও তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হয় না, তাহাদিগকেও দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ শিখিতে হয়। সুতরাং বাঙালী যে সব যুবক সিপাহী হইতে চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া শিক্ষা দিলে তাহারা এত দিনে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিতে পারিত, যেমন চন্দননগরের স্বেচ্ছাসৈনিকেরা কয়েক মাস পরে যুদ্ধক্ষম হইবে।

চন্দননগরের যে কয়টি লোক সেনাদলে ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহারা বেতনাদি ঠিক্ ফরাসী সৈন্যদের মত পাইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পল্টনে সিপাহীরা গোরাদের সমান বেতন পায় না, কম পায়। বাংলাদেশে শারীরিক শ্রমের কাজ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে হিন্দুস্থানী, বিহারী ও ওড়িয়ারা করিতেছে। সুতরাং যে বেতনে ভারতবর্ষের শিখ, গুর্খা, আদি জাতিরা সিপাহী হয়, সেই বেতনের জন্য বাংলা দেশ হইতে দৈহিক শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক না পাইবারই কথা, এবং তাহা পাওয়া না গেলে এদেশ হইতে বেশী সৈন্য মিলিবে না। "ভদ্র" শ্রেণী হইতে কিছু লোক পাওয়া যাইতে পারে। সিপাহীদের বেতন বাড়িলে পরে "নিম্ন" শ্রেণীর বাঙালীও পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু যে সামান্য বেতনে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে না, তাহার জন্য "ভদ্র" বঙ্গবাসী কেন যুদ্ধ করিতে যাইবে?

কেন যাইবে, তাহা বলিতেছি। বাঙালীকে অপরেরা ভীরু বলে, এই অপবাদটা এখনও অনেককে ক্লেশ দেয়। আমরা ইহা গ্রাহ্য করিনা, কারণ আমরা জানি ভীরুতা জাতিগত নহে। কিন্তু যাঁহারা ক্লেশ পান তাঁহারা অপবাদ ক্ষালন করিতে চান, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেক যুবক আছেন। বিপদের, নূতন [illegible] বিচিত্র ঘটনার, সাহস

সামর্থ্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইবার ক্ষেত্রের, একটা মোহিনী শক্তি আছে, যাহা সুস্থপ্রকৃতির মানুষ মাত্রকেই আকর্ষণ করে। তরুণবয়স্ক এরূপ মানুষ বাংলা দেশেও আছে। তাহারা ঐ আকর্ষণে যুদ্ধে যাইতে পারে। অনেকের এই অটল বিশ্বাস আছে যে আমরা স্বরাজ লাভ করিব। কিন্তু অধিকার ও দায়িত্ব একই জিনিষের দুই পিঠ। যাহাকে স্বদেশের কাজ চালাইবার অধিকার পাইতে হইবে, তাহাকে বাহ্যশত্রু ও অন্তর্বিপ্লব হইতে দেশরক্ষার সামর্থ্যও অর্জ্জন করিতে হইবে। জলে না নামিলে সাঁতার শিখা যায় না; যুদ্ধ না করিলে যুদ্ধের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের যুদ্ধশিক্ষার একমাত্র প্রশস্ত ক্ষেত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে-পরিমাণে মনুষ্যোচিত অধিকার দিয়া মানুষের দায়িত্বের বোঝাও আমাদের দেশের লোকের ঘাড়ে চাপাইবে, সেই পরিমাণে তাহাদের মনের ভাব উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুকূল হইবে। এই ভাবের দ্বারা চালিত হইয়াও অনেকে পল্টনে ঢুকিতে পারে।

আমাদের প্রদেশ রক্ষা অন্য লোকেরা করিবে, আমরা করিতে পারিব না, ইহা আমাদের পক্ষে লজ্জা ও অপমানের বিষয়। এরূপ অবস্থার উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টাও বাঙালীকে সিপাহী হইতে প্রবৃত্ত করিবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্রিটিশ জাতির গৌরবের ও লাভের বস্তু। এইজন্য বিলাতে সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম কত কত লোককে সৈন্যদলে আনিয়া ফেলিতেছে। তাহার উপর সৈনিক হইলে উপযুক্ত বেতন আছে, পেনশন আছে, স্বজাতীয়ের প্রশংসা আছে, যুদ্ধান্তে কাহারও কাহারও ভাল চাকরীর আশা আছে। এ-সকল সত্ত্বেও যথেষ্ট লোক স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে ভর্ত্তি না হওয়ায় সমর্থবয়স্ক প্রত্যেক পুরুষকে আবশ্যক হইলে যোদ্ধা হইতে বাধ্য করিবার জন্য বিলাতে আইন করা হইতেছে। অতএব মানবচরিত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান কোন ইংরেজ এরূপ আশা করেন না যে বাংলা বা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশ হইতে কেবলমাত্র ব্রিটিশসাম্রাজ্যানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া লোকে দলে দলে পল্টনে প্রবেশ করিবে। বিলাতে যেমন, এখানেও তেমনি, নানা লোকে নানা কারণে ও নানা উদ্দেশ্যে সৈনিক হইতে চাহিবে। বৈধ সর্ব্ববিধ কারণ ও উদ্দেশ্য বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের নিকট উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

আরো সিপাহীর প্রয়োজন আছে কি ?

এখন বাঙালীদিগকে কেহ বলিতে পারেন, তোমরা সিপাহী হইতে চাহিতে পার, কিন্তু সরকারের প্রয়োজন না থাকিলে সরকার নূতন সিপাহী ভর্ত্তি কেন করিবেন ? আরো সৈন্যের যে প্রয়োজন আছে, তাহা প্রমাণ করা অনাবশ্যক। কারণ ইংলণ্ডে, কি করিয়া অধিক সৈন্য পাওআ যায়, তাহা লইয়া খুব দলাদলি তর্কবিতর্ক চলিতেছে, এবং সমুদয় সমর্থ বয়সের সুস্থ পুরুষকে সৈন্য হইতে বাধ্য করিবার জন্য আইন হইতেছে। ভারতবর্ষেও পঞ্জাব, বালুচীস্থান, গড়োআল, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে সিপাহী লওয়া হইতেছে। কিন্তু সৈন্যের প্রয়োজন থাকিলেও, গুর্খা, শিখ, পাঠান, প্রভৃতি যাহাদের রণদক্ষতা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারা থাকিতে

বাঙালীকে কেন লওআ হইবে ?

এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার উত্তর এই যে গবর্ণমেণ্টের অন্য সব কাজ দিবার সময় ত বাঙালী যে-সব কাজে খুব যোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, কেবল বাঙালীকেই তাহা দেওআ হয় না। শিক্ষক, অধ্যাপক, বিচারক, কেরাণী, ডাক্তার, প্রভৃতির কাজে বাঙালীর যোগ্যতা সর্ব্ববাদীসম্মত। এই যোগ্যতা উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র প্রমাণিত হইয়াছে। উত্তর ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের লোকে এ-সব কাজে ক্রমশঃ বাঙালীর সমান যোগ্য হইবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে বটে। কিন্তু যখন তাহাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয় নাই, তখনও ত এই-সব কাজ বাঙালীর একচেটিয়া ছিল না, এখনও নাই; তখনও কোন প্রদেশ বা জাতির লোককে এই-সব কাজ হইতে, অযোগ্যতার ওজুহাতে, সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রাখা হয় নাই। অন্য সব কাজের বেলা বাঙালীকে বলা হয়, তুমি বিহারী নও, বিহারে কাজ পাইবে না, এখানে বিহারীরাই কাজ পাইবে; তুমি পঞ্জাবী নও, পঞ্জাবে কাজ পাইবে না, এখানে পঞ্জাবীরাই কাজ পাইবে; ইত্যাদি। কিন্তু শিখ গুর্খা প্রভৃতিকে ত বলা হয় না, যে, তোমরা বাঙালী নও, অতএব বাংলাদেশের পল্টনে কাজ পাইবে না, এখানে

বাঙালীরাই কাজ পাইবে। যদি বলা হয় যে বাঙালীরা পল্টনের কাজের অনুপযুক্ত, আমরা বলিব, তাহার প্রমাণ কোথায়? যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ না দিলে যোগ্যতা অযোগ্যতা কিছুই প্রমাণ হয় না। প্রত্যেক প্রদেশের কাজে সেই প্রদেশবাসীর দাবী সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য, এই যে যুক্তিটা অন্য সব প্রদেশে বাঙালীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়, সে যুক্তিটা বাংলাদেশে ও ব্রহ্মদেশবাসীর সপক্ষে প্রয়োগ করা হয় না। সকল প্রদেশের সৈন্যদলে সমগ্র ভারতবাসীদের মধ্যে যোগ্যতম লোকই লওআ উচিত, যদি এই নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহা হইলে এই নিয়মও করা হউক, যে, সরকারী কাজের অন্য সকল বিভাগেও জাতি-ও-প্রদেশ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীদের মধ্যে যোগ্যতম লোক লওআ হইবে।

বাস্তবিক কিন্তু কেবলমাত্র যোগ্যতম জাতি হইতেই সিপাহী লওআ হয় না। মোটামুটি নিম্নলিখিত জাতি-সকল হইতে সিপাহী লওআ হয়:—

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের কোন কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় খত্রি বা ছত্রী, রাজপুত, ডোগ্রা, জাট, গুজর, আহীর, গুর্খা, গড়োয়ালী, মরাঠা, তামিল, নায়ার, থারেয়া, শিখ, ভীল, কোলী, মুসলমান জাট, মুসলমান রাজপুত, মুসলমান গুজর ও আহীর, হিন্দুস্থানী মুসলমান, পঞ্জাবী মুসলমান, মাপ্পিলা, পাঠান, বালুচী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোন কোন শ্রেণীর খ্রীষ্টিয়ান। তদ্ভিন্ন দেশী রাজ্যের অধিবাসীরা নিজ নিজ রাজার রাজ্যে সিপাহী হইয়া থাকে।

ইহারা সকলে যুদ্ধে সমান দক্ষতা বা সাহস দেখায় নাই, সমান খ্যাতি লাভ করে নাই। সুতরাং যোগ্যতমকেই সিপাহী করা হয়, ইহা বলা চলে না। যাহাদিগকে সিপাহী করা হয়, তাহারা সকলেই যোগ্যতম বাঙালীর চেয়েও সবল, সাহসী, বুদ্ধিমান্ ও বিশ্বাসী, ইহা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। গড়োআলী, শিখ, গুর্খা, পাঠান, ও রাজপুত সিপাহীদের মধ্যে প্রত্যেকেই গায়ের জোরে, সাহসে ও বুদ্ধিতে বলিষ্ঠতম ও সাহসীতম বাঙালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাও মিথ্যা কথা। মানসিক বা শারীরিক কোনও শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলা মূর্খতা মাত্র যে অমুক জাতির সমুদয় লোক অপর কোন জাতির সমুদয় লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা দেশ, জাতি বা শ্রেণীগত নহে, ইহা ব্যক্তিগত। সকল শ্রেণীর এবং সকল জাতির লোককে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত যোগ্যতা দেখিয়া যে সিপাহী হইতে দেওআ উচিত, জেনারেল জন্ জেকবের এই মত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন:—

"The attending to, acknowledging at all, in any way, any distinctions of race, tribe, caste, etc, as giving any rights or implying any merits, appears to me to be a very great error.

"Men should be enlisted with reference to individual qualifications only. Any race, tribe, or caste, the individuals of which possessed high personal qualifications, would necessarily predominate over the others, but not by reason of race, tribe or caste, but simply on account of their personal and individual qualifications. This cannot, I think, be too much insisted on, or too frequently kept in view." P. 78 of *Papers connected with the Reorganisation of the Army in India*, presented to both houses of Parliament by command of Her Majesty, 1859.

ইউরেশীয় পল্টন।

যাহারা এ পর্য্যন্ত সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে পাইত না, তাহারা কখনও সে অধিকার পাইতে পারে না, তাহাও বলা যায় না। ইউরেশীয়রা বর্ত্তমান বৎসরে এই অধিকার পাইয়াছে। শুধু সৈনিক হইবার অধিকার নহে। তাহারা ইংরেজ গোরার সমান বেতন পেন্‌শ্যন আদি পাইবে, এবং ইংরেজ পল্টনের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য হইবে। ভারতীয় যোদ্ধাজাতিদের কাহারও এ-সব অধিকার নাই। অথচ ইউরেশীয়রা যে ভারতীয় সিপাহীদের চেয়ে ভাল যোদ্ধা হইবে, এমন কি তাহাদের সমান হইবে, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। সুতরাং ইউরেশীয়দের জন্য যদি নূতন নিয়ম হইতে পারে, তাহা হইলে ভারতীয় কোন জাতির জন্য কেন হইতে পারিবে না? বাংলাদেশের ইউরেশীয় বঙ্গের অন্য কোন অধিবাসী অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। রক্তের গুণে বিশ্বাসী কেহ যদি বলেন উহাদের ধমনীতে ইংরেজের রক্ত আছে, তাহার পরিষ্কার উত্তর এই যে উহাদের অনেকের পিতৃমাতৃকুলে কেহ ব্রিটিশ বা ইউরোপীয় ছিল না। যদি বলা হয়, উহারা ব্রিটিশ রাজত্বের সৃষ্টি, ব্রিটিশ রাজত্বের সহিত উহাদের অস্তিত্ব জড়িত, সুতরাং উহারা কখনও

অবিশ্বাসী হইবে না, তাহার উত্তরে বলি, অনুমানে প্রয়োজন কি? এই শ্রেণীভুক্ত কোন কোন লোক রাজনৈতিক ডাকাত বা এনার্কিষ্টদের মত লোকদিগকে অবৈধ উপায়ে অস্ত্রশস্ত্র জোগাইত বলিয়া আদালতে তাহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে, এবং তাহারা দণ্ড পাইয়াছে। অবশ্য ইউরেশীয়রা সকলে বা অধিকাংশ এরূপ নয়। কিন্তু সকল বা অধিকাংশ বাঙালীও ত এনার্কিষ্ট নয়?

যাহা হউক, ইউরেশীয় পল্টন হওয়ায় এই একটা নজীর হইল যে ভারতবর্ষের যে-কোন প্রদেশে জন্ম ও পুরুষানুক্রমে বাস সৈন্য হইবার অযোগ্যতার একটা কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহার কুফল এই যে এই-প্রকার পক্ষপাত করাতে ভারতবর্ষের যোদ্ধা অযোদ্ধা সব জাতি অসন্তুষ্ট হইল। অসন্তোষ হইতে কখন্ কি কুফল ফলে না-ফলে কেহ বলিতে পারে না। লর্ড কার্জন বাঙালীদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে অগ্রাহ্য ও অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সার্ এডোআর্ড বেকারও তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া সেই আগুনে ঘি ঢালিয়াছিলেন। ইহাতে ফল ভাল হয় নাই। তাহারা এরূপ না করিলে বাংলাদেশের লোকেরা অনেক দুঃখকষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইত, এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকেও দেশব্যাপী অশান্তিজনিত উদ্বেগ সহ্য করিতে হইত না। এইজন্য, ভারতবর্ষের সমুদয় লোককে বা কোন কোন প্রদেশের লোককে তুচ্ছ মনে না করিয়া, রাজপুরুষেরা যদি সকল প্রদেশের লোককে ইউরেশীয়দের সমান অধিকার দিয়া অসন্তোষের বীজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। মোটে হাজার খানেক মাত্র ইউরেশীয় সৈন্য পাওয়া যাইবে। তাহার জন্য সমস্ত দেশের লোকদের মনে একটা অসন্তোষ ও অপমানের ভাবের উদ্রেক বাঞ্ছনীয় নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলে সমুদয় ভারতীয়ের সন্তোষের মূল্য একহাজার ইউরেশীয় সৈন্যের অপেক্ষা অনেক বেশী।

ইউরেশীয়েরাও ভারতবাসী। তাঁহারা কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত থাক্, ইহা আমরা চাই না। আমরা বলি, শুধু তাহারা নয়, সমস্ত দেশবাসীই সমুদয় অধিকার লাভ করুক। ইউরেশীয়েরাও পরের মত না থাকিয়া দেশভাষা শিখিয়া দেশকে প্রীতি ও ভক্তি করিতে শিখুক।

অদূর ভবিষ্যতে সিপাহীর প্রয়োজন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে শীঘ্র জয়লাভ করিবার জন্যই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আরও অনেক সৈন্যের প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক সৈন্যের প্রয়োজন হইতে পারে। এশিয়া মহাদেশের সমুদয় পূর্ব্বঅংশে জাপান প্রভু হইতে চাহিতেছে। চীনের যে অল্প অংশ জার্ম্মেনীর অধীন ছিল, তাহা জাপান দখল করিয়াছে, মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়ায় রুশিয়া ও জাপান প্রভুত্ব ভাগাভাগি করিয়া লইতেছে। চীনের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাপানীরা খনি হইতে ধাতু উত্তোলনের অধিকার, রেলওয়ে নির্ম্মাণের অধিকার, উচ্চ পুলিশ কর্ম্মচারী হইবার অধিকার, রাষ্ট্রনৈতিক সামরিক এবং আর্থিক বিষয়ে চীনের পরামর্শদাতা হইবার অধিকার, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার শুল্ক ও ট্যাক্স বন্ধক রাখিয়া চীন বিদেশে ঋণ করিতে পাইবে না এই অঙ্গীকার আদায় করিবার অধিকার, চীনের ফেঙ্‌টিয়েন প্রদেশের সরকারী কাজের জন্য চীনকে জাপানের ঋণ দিবার অধিকার, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীদের জমীর মালিক হইবার, এবং তথায় বাস ও স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার;—চীনের কাছে জাপান এইরূপ কত কি দাবী করিতেছে। ইউরোপের প্রবল শক্তিপুঞ্জ এখন নিজ নিজ ঘর সামলাইতে ব্যস্ত। এখন জাপানের অভিসন্ধিতে কে বাধা দিতে পারে?

চীনের ইয়াংসী উপত্যকায় বাণিজ্য লইয়া এবং অন্যত্র রেলওএ নির্ম্মাণ লইয়া জাপানীদের সঙ্গে চীনপ্রবাসী ইংরেজদের মনকষাকষি চলিতেছে। জাপানী কাগজে ইংলণ্ডের সহিত জাপানের যে সন্ধি ও মিত্রতা আছে, তাহার মূল্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে খুব আলোচনা চলিতেছে। জাপানী জাহাজ হইতে ব্রিটিশ রণতরীবিভাগের কর্ম্মচারীরা কয়েকজন ভারতীয়কে বিপ্লবকারী বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহাতেও জাপানের একদল লোক খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছে। অন্যদিকে রুশিয়ার সঙ্গে জাপানের আজকাল ভারি বন্ধুত্ব। জাপান রুশিয়াকে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সৈনিকের পরিচ্ছদ বিক্রী করিয়া খুব রোজগার

করিতেছে। রুশিয়ার মুদ্রা জাপানের টাকশালে প্রস্তুত হইতেছে, রুশিয়ার রাজপরিবারের একজন লোক নূতন জাপানসম্রাটের মুকুটধারণ উৎসবে তাঁহাকে রুশিয়ার সম্রাটের পক্ষ হইতে অভিনন্দন করিতে গিয়াছিলেন। জাপানসম্রাট স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। রাজকীয় আদব-কায়দায় ইহা নূতন।

আমাদের মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে ও পূর্ব্ব-এশিয়ার অন্যান্য দেশে বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য লইয়া প্রবল প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। তাহার ফলে ভীষণ সংগ্রাম হইতে পারে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইউরোপের অন্যান্য শক্তির ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অর্থক্ষয়, লোকক্ষয়, শক্তিক্ষয় হইতেছে। কিন্তু জাপানের বাণিজ্য ও অর্থ বাড়িতেছে। লোকক্ষয়, অতি অল্পই হইয়াছে। ভারতবর্ষের রণতরী ও নৌসেনা নাই। জাপানের রণতরী-বিভাগ বেশ শক্তিশালী। ভবিষ্যৎ বিপৎ-সম্ভাবনা হইতে দেশরক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সমুদয় লোকবল সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও দলবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সমুদ্রতটবর্ত্তী প্রদেশগুলিকে এই শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা দূরে থাক্, বিশেষভাবে তাহাদের সাহায্য প্রয়োজন হইবে বলিয়া, সেই-সকল স্থান হইতে স্থলসৈন্য ও নৌসেনা সংগ্রহ করিয়া সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা এখন হইতে করিলে বুদ্ধির কাজ হইবে।

সমগ্র ভারতবর্ষকে শক্তিশালী ও দেশরক্ষায় সমর্থ করিয়া তোলায় ইংলণ্ডের চিন্তার কারণ কিছুই নাই, ইহা আমরা বলি না। ইহা নিশ্চয়ই ইংরেজের ভাবিবার বিষয়। কিন্তু তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে শক্তিহীনের অনুরাগ মূল্যহীন, যদিও তাহার বিরাগ অবজ্ঞেয় নহে। অপরদিকে শক্তিশালীর বিরাগ ভয়ের কারণ হইলেও, তাহার অনুরাগ বাস্তবিকই খুব মূল্যবান্, এবং তাহারই অনুরাগ বাঞ্ছনীয়, শক্তিহীনের নহে। কিন্তু ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভরক্ষম করিলে উভয় দেশে কৃতজ্ঞতার, অনুরাগের, বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হইবে; অতীত-ইতিহাস-জাত বিরাগ প্রবল না হইয়া ক্রমশ ক্ষীণবল হইতে থাকিবে। ইহাই স্বাভাবিক। এইসব বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডকে স্থির করিতে হইবে যে ভারতবর্ষকে শক্তিহীন রাখা ভাল, না তাহার শক্তির উন্মেষের সাহায্য করা ভাল। ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে যদি কখন স্বাধীনও হয়, তাহা হইলেও এই দেশ শক্তিশালী হইবার পক্ষে ইংলণ্ড-প্রদত্ত সাহায্যের ঋণ স্মরণ করিয়া তাহার বন্ধুই থাকিবে। এইরূপ একটা দূরবর্ত্তী সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ লিখিয়াছিলেন:—

"In that hour it would be the proudest boast and most delightful reflection that she [England] used her sovereignty towards enlightening her temporary subjects, so as to enable the native communities to walk alone in the paths of justice, and to maintain with probity towards their benefactress that commercial intercourse in which we should then find a solid interest."

রাজা রামমোহন রায় ইংরেজদের বন্ধু ছিলেন; কিন্তু তিনিও তাঁহার Settlement in India by Europeans নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন:—

"Canada is a standing proof that an anxiety to effect a separation from the mother country is not the natural wish of a people, even tolerably well-ruled...... ...Yet,.........if events should occur to effect a separation, (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make predictions), still a friendly and highly advantageous intercourse may be kept up........."

ভারতবর্ষের পক্ষে, এবং, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকলের চেয়ে মূল্যবান অংশ বলিয়া, ব্রিটিশসাম্রাজ্যের পক্ষে, কঠিনতম সমস্যা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিতেছে। ইহার জন্মস্থান ইউরোপ, আমেরিকা, বা আফ্রিকায় নহে। ইহার উদ্ভব পূর্ব্ব এশিয়ায়। আমাদের ভাগ্যলিপি ইহার সহিত জড়িত।

ইংরেজের স্তবস্তুতি করিয়া কাজ আদায় করা যেমন অসম্ভব, ইংরেজের চোখে ধুলা দিয়া চাতুরী দ্বারা কাজ হাসিল করাও তেমনি দুঃসাধ্য। আমরা কোনটাই করিতে চাই না। আমরা যা চাই, তাহা বলিলাম, এবং কেন চাই, তাহাও বলিলাম। ইহাতে আমাদের স্বার্থ কি, মোটামুটি তাহা যেমন বলিলাম, ইংরেজের কি স্বার্থ তাহারও আভাস দিলাম। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে বিধাতা ইংরেজ অপেক্ষা আমাদিগকে অধিক অভ্যস্ত

করিয়াছেন। যাহাই ঘটুক, আমাদের উৎকণ্ঠা অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী সৌভাগ্যশালী ইংলণ্ডের উৎকণ্ঠার কারণ বেশি কিনা, ইংরেজ তাহা ভাবিবেন।

ভারতের সকল প্রদেশের সাম্যের প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ এত বড় দেশ, এত বেশী প্রদেশে বিভক্ত, ইহাতে এত ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে, যে, ইহার উন্নতি হইতেছে কি না, বেশ করিয়া না ভাবিয়া বলা কঠিন। সকলের উন্নতি না হইলে ত দেশের উন্নতি হইয়াছে বলা যায় না। সকলে যে সমান অগ্রসর নয়, ইহাতেও নানাপ্রকারে উন্নতি এবং জাতীয় ঐক্যের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। সকল প্রদেশ প্রত্যেক বিষয়ে সমান অগ্রসর হইবে, এরূপ আশা করা যায় না, কারণ সকলের প্রাকৃতিক ও অন্যবিধ অবস্থা এক রকম নয়। কাহারও খনিজ সম্পত্তি অধিক, কাহারও সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুবিধা অধিক, কাহারও জমী কার্পাসের, কাহারও পাটের, কাহারও বা গমের বেশী উপযোগী। শীত গ্রীষ্ম, বায়ুর আর্দ্রতা শুষ্কতার প্রভেদও আছে। কেহ আধুনিক শিক্ষার সুযোগ আগে পাইয়াছে, কেহ বা পরে পাইয়াছে। আমরা সবাই মোটের উপর সমান সমান হইলে ভাল হয়। তাহা না হওয়ায় অনেকগুলি প্রদেশের মধ্যে ঈর্ষ্যাদ্বেষ রহিয়াছে। ইহা জাতীয় একতার অন্তরায়। যে-সকল ইংরেজ ভারতবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির বিরোধী, তাহারা আমাদের অসাম্যকে এক প্রবল যুক্তি স্বরূপ-উপস্থিত করে। আমরা যদি বলি, সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা ভারতবর্ষেও গৃহীত হওয়া উচিত, অমনি তাহারা উত্তর দেয়, "তাহা হইলে বাঙালীরা খুব বেশী পরিমাণে ম্যাজিষ্ট্রেট জজ হইবে, উহাদিগকে পৌরুষশালী জাতিরা অবজ্ঞা করে, তাহারা বাঙালীর দ্বারা কখনই শাসিত হইতে ভাল বাসিবে না, ভারতের যে-সব জাতি পাস্ করিতে মজবুত, তাহারা সাহসে নেতৃত্বে প্রভুত্বশক্তিতে হীন," ইত্যাদি। এরূপ যুক্তির সত্যতা ও মূল্য যাহাই হউক, ইহা ইংরেজের কাছে অনেক সময় অকাট্য মনে হয়। অধুনা কয়েক বৎসর হইতে বাঙালীর চেয়ে মোটের উপর অন্য জাতির লোকেরাই বেশী সিবিলিয়ান হইয়াছে। সকল প্রদেশ ও সকল জাতি হইতে সিবিলিয়ান হইলে এই যুক্তিটা অকেজো হইয়া পড়িবে।

বাঙালীদের লেখাপড়ায় এবং পরীক্ষা পাস করার দক্ষতা যেমন তাহাদের বিরুদ্ধে এবং ভারতবাসীদের পূর্ব্বোক্তরূপ অধিকার লাভের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়, বাঙালী যে যোদ্ধা নহে, তাহাও তেমনি তাহাদের বিরোধীদের হাতের একটি অস্ত্র। আমরা যদি স্বরাজ অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন চাই, তাহা হইলে বলা হয়, "তোমরা ত ভীরু, শক্তিসামর্থ্য-পৌরুষহীন; স্বরাজ পাইলে ত যোদ্ধা জাতিরা আসিয়া তোমাদের গলা কাটিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যাইবে, এবং তার চেয়েও বেশি দুর্গতি করিবে। অতএব এ অধিকার লইয়া কি করিবে, এবং তাহা রক্ষাই বা কি প্রকারে করিবে?" এই যুক্তি শুধু আমাদের বিরুদ্ধে নয়, লেখাপড়ায় পারদর্শী অন্যান্য ভারতীয় জাতিদের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হইয়া সমগ্র ভারতের স্বায়ত্তশাসনলাভের অন্যতম অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া আছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভকালে যখন কতকগুলি বাঙালী যুবক সিপাহী হইতে চাহিয়াছিল, তখন লর্ড কারমাইকেল ও লর্ড হার্ডিং অনুকূল ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। যাঁহাদের বিরোধিতায় ঐ-সকল বঙ্গীয় যুবকের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, তাঁহাদের আপত্তির কারণ কি জানা যায় নাই। অনুমান করিয়া কতকগুলি আপত্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিরোধিতার আর একটি কারণ থাকিতে পারে। বাঙালী যদি যুদ্ধ করিতে সুযোগ পায়, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও রণদক্ষতা দেখাইতে পারে, তাহা হইলে ভারতবাসীদের উচ্চাধিকার লাভের বিরোধীদিগের একটা চমৎকার যুক্তি লোপ পায়। যদি প্রমাণ হয় যে বঙ্গবাসী পাস্ করিতেও পারে, যুদ্ধ করিতেও পারে, তাহা হইলে, "যোদ্ধা জাতিরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের দ্বারা শাসিত হইতে চাহিবে না, তাহারা শাসনশক্তিহীন," ইহা বলিয়া ভারতবর্ষে সিবিলসার্বিস পরীক্ষা গ্রহণে বাধা দেওআ চলিবে না; আবার, ইহা বলিয়া হোমরুল বা স্বরাজের বিরুদ্ধে আপত্তি করাও চলিবে না, যে, "স্বরাজ দিলে পাঠান শিখ গুর্খা আসিয়া বঙ্গের নির্বীর্য্য লোকদের গলা কাটিতে আরম্ভ করিবে।" এমন যুক্তিটার প্রাণরক্ষা করায় এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থ আছে।

বৈশাখের প্রবাসীতে আমরা মার্ক ইস্ অব্ হেষ্টিংসের দৈনন্দিন লিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, যে, ইংরেজরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্কালে ভারতবাসীদের অবনতির একটি কারণ এই ছিল, যে, অনেকের দৈহিক সাহস ও সামর্থ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে মানসিক শক্তির মণিকাঞ্চন যোগ হয় নাই। এখনও যে-সব ভারতীয় জাতি দৈহিক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহারা মানসিক শক্তি ও ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ নহে, আবার যাহারা মানসিক শক্তিসম্পদে অগ্রণী, তাহাদের দৈহিক উৎকর্ষের খ্যাতি নাই। কিন্তু উভয়ের সম্মিলন ভিন্ন দেশের উন্নতি হইবে না। যাহারা লর্ড কারমাইকেল ও লর্ড হার্ডিংএর সহিত বঙ্গীয় যুবকদের সিপাহী হওয়া বিষয়ে একমত হন নাই, হয় ত তাঁহারা চান না যে, বঙ্গের অধিবাসীদের দেহমন বিকশিত হইয়া উভয়েরই সামর্থ্যের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা চাই, যোদ্ধা জাতিরা মানসিক সম্পদেও ঐশ্বর্য্যশালী হউন, এবং বঙ্গের অধিবাসীরা সুস্থ সবল ও পৌরুষসম্পন্ন হউন। যে-সব ইংরেজ ভারতবর্ষের কল্যাণ-কামী বলিয়া পরিচিত হইতে চান, তাঁহাদেরও ইচ্ছা এইরূপ হইলে ভাল হয়।

রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন।

গত ৯ই বৈশাখ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পৈত্রিক বাসভূমি ও জন্মগ্রাম রাধানগরে তাঁহার স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তিনি দেশে নারীহত্যা ও নারীর আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া সমাজের মহা উপকার করিয়াছেন। নারী তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-কার্য্যে সহায় হইয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়। শ্রীমতী হেমলতা দেবী স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের কন্যার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্রবধূ, এবং স্বয়ং বিদুষী ও ব্রহ্মবাদিনী। ভিত্তি-স্থাপয়িত্রী নির্ব্বাচন ঠিকই হইয়াছিল। আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের জন্মগ্রামে তাঁহার কোন নিদর্শন না থাকা সমগ্র ভারতবাসীর, বিশেষ করিয়া বাঙালীদের কলঙ্কের বিষয় হইয়াছিল। উদ্যোগকর্ত্তাগণ সেই কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলে মহাত্মার জন্ম-স্থান-তীর্থের যাত্রীরা তথায় বিশ্রাম করিতে পারিবেন, এবং তথায় উপনিষদ এবং তাঁহার গ্রন্থাবলী অধ্যাপনার বন্দোবস্ত হইবে।

প্রস্তাবিত স্মৃতিমন্দিরের পরিকল্পিত চিত্র ও আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ মুদ্রিত করিয়া বাংলা ও ইংরেজীতে সর্ব্ব-সাধারণের নিকট অর্থ চাওয়া আবশ্যক।

দুর্ভিক্ষ।

বাংলা দেশে বাঁকুড়া জেলায়, ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া সব্‌ডিবিজনে, মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সবডিবিজনে, এবং মানভূম জেলায়, দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন রাজপুতানায় এবং কাঠিয়াবাড়েও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। প্রবাসীর সম্পাদক বাঁকুড়া-সম্মিলনীর দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডের কোষাধ্যক্ষ, এবং একখানা কাগজের সামান্য চেষ্টায় সকল স্থানের সাহায্য হইতে পারে না। এইজন্য আমরা কেবল বাঁকুড়ার কথাই বিশেষ করিয়া লিখিয়া আসিতেছি। ভগবানের কৃপায় সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে অনেকগুলি লোকের প্রাণ-রক্ষাও হইতেছে। মাননীয় মিষ্টার বীট্‌সন্ বেল এবং অন্য একজন রাজকর্ম্মচারী বাঁকুড়া-সম্মিলনীর কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। প্রত্যেক কেন্দ্রের, শেষ যে তারিখের হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে বাঁকুড়া-সম্মিলনীর সাহায্যকেন্দ্রগুলি হইতে মোট ১২৬৮ জন সাহায্য পাইতেছে। এখন সম্ভবতঃ আরও বেশী লোককে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। সাহায্য বিতরণ সপ্তাহে একদিন করা হয়। এই-প্রকারে চাউল দেওয়া ব্যতীত অন্য রকমেও বিপন্ন লোকদের সাহায্য করা হইতেছে। হাড়মাসড়া গ্রামের একটি শুষ্ক পুষ্করিণী পুনর্ব্বার খনন করান হইয়াছে। ইন্দাস গ্রামে একটি পুষ্করিণীর সংস্কার আরম্ভ করা হইয়াছে। গোপালনগরের একটি পুষ্করিণীর জন্যও কমিটি সাহায্য মঞ্জুর করিয়া রাখিয়াছেন। আরও পুকুরের বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে। তিনটি বৃহৎ কূপ খনিত হইতেছে, এবং আরও খনন করাইবার সঙ্কল্প আছে। জামজড়ী গ্রামের পার্শ্ববাহিনী বিড়াই নদী হইতে পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া জল আনিলে কয়েকটি গ্রামের সুবিধা হইতে পারে। তন্নিমিত্ত সাহায্য কমিটির বিবেচনাধীন আছে। অগ্নিদগ্ধ একটি গ্রামের অনেক লোককে গৃহনির্ম্মাণের জন্য নগদ টাকা

দেওআ হইয়াছে। কয়েকটি গ্রামের মধ্যবিত্ত কতকগুলি পরিবারকে অর্থসাহায্য করা হইয়াছে। যাঁহারা দান লইতে সম্মত নহেন, এরূপ কতকগুলি লোককে ঋণ দেওআ হইয়াছে। যাহারা অল্প মূলধন পাইলে কোন না কোন প্রকার শিল্পকার্য্য বা অন্য প্রকার শ্রমের কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহাদিগকে মূলধন দেওআ হইয়াছে। তাহার বিনিময়ে সম্মিলনী শিল্পজাত দ্রব্য লইবেন।

কলিকাতা হইতে সপ্তাহে একবার সাহায্যকেন্দ্রগুলিতে টাকা পাঠান হয়। গত ১৫শে বৈশাখ ৭০০৲ সাত শত টাকা পাঠান হইয়াছে। সম্মিলনীর হাতে যে টাকা মজুত আছে, তাহাতে আর কেবল চারি সপ্তাহ চলিবে। কিন্তু, যদি আশুধান্য হয়, তাহা হইলেও, আরও ১৫ সপ্তাহ সাহায্য করিতে হইবে। আশু ধান্য না হইলে আরও দীর্ঘকাল সাহায্য করা আবশ্যক হইবে। বিপন্নের জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যত বেশী পারেন টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে গুরুতর কর্ত্তব্যভার বহন করিতে সমর্থ করুন। বাঁকুড়া জেলার অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের শেষ রিপোর্ট এই:—State of affairs and condition of people in affected areas are generally unchanged... scarcity of fodder continues. Prices are rising. "দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান-সকলের লোকদের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। গবাদি পশুর খাদ্য পূর্ব্ববৎ দুষ্প্রাপ্য আছে। জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িতেছে।" গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে ভাল দিক্‌টা দেখাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। তাহাতেও যখন অবস্থা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তখন সাহায্য দিতে থাকা যে কত দরকার তাহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

দুর্ভিক্ষে যে হাজার হাজার লোক বিপন্ন হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত ক্লেশকর। কিন্তু ইহার মধ্যেও সুখের বিষয় এই, যে, ভারতসাম্রাজ্যের সকল প্রদেশ হইতে টাকা আসিতেছে। আজকাল বরং বাঙালীরাই কম টাকা দিতেছেন। অন্য ভারতবাসীরাই বেশী টাকা দিয়া, বাঙালীকে কার্য্যত লজ্জা দিতেছেন। তদ্ভিন্ন আফ্রিকা, আমেরিকা, ও আয়র্লণ্ড হইতে ভারতবাসীরা টাকা পাঠাইয়াছেন এবং আরও পাঠাইবেন।

বাঁকুড়া জেলা সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা, এবং বাঁকুড়া সম্মিলনীর এপ্রিল পর্য্যন্ত আয়ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে। আধ আনার টিকিট দিয়া কলিকাতায় ২০ শাখারীটোলা ইষ্ট লেনে বাবু ঋষীন্দ্রনাথ সরকারকে পত্র লিখিলে পাওআ যাইবে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিলাতে নূতন আইন।

ভারতবর্ষ-শাসন সম্বন্ধে আগে যত আইন বিলাতের পার্লেমেণ্টে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সেগুলি সম্মিলিত, সমঞ্জসীভূত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে "দি ইণ্ডিয়ান কন্সলিডেশ্যন এক্ট" নাম দিয়া পার্লেমেণ্ট একটি আইন পাশ করেন। সম্প্রতি ইংরেজ শাসকগণ তাহাতে কিছু নূতন বিধি সংযোগ আবশ্যক মনে করায় আর একটি আইনের খসড়া হাউস্ অব্ লর্ডসে উপস্থিত করিয়াছেন। উহা ঐ অভিজাত-সভায় প্রথম বার পঠিত হইয়াছে। উহার একটি ব্যবস্থা এইরূপ :—

The Viceroy with the approval of the Secretary of State may declare eligible for appointment to any civil or military office to which a native of British India may be appointed, the ruler or subjects of any State in India, subjects of any State in territory adjacent to India, or members of any independent race or tribe in territory adjacent to India.

"ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের অনুমোদন সহকারে, যে-কোন কাজে ব্রিটিশভারতজাত ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইতে পারে, তাহাতে ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের শাসনকর্ত্তা বা প্রজাদিগকে বা ভারতসন্নিহিত কোন রাজ্যের প্রজাদিগকে, বা ভারতসন্নিহিত দেশবাসী কোন স্বাধীন জাতির ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।"

ইহাতে আমাদের আপত্তি আছে। কথায় বলে, আপনি খেতে পায় না শঙ্করাকে ডাক্। ব্রিটিশ ভারতে ও সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যের উপযুক্ত যথেষ্ট লোক কি নাই, যে বাহির হইতে লোক আমদানী করিতে হইবে? ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীরা ব্রিটিশ ভারতের নানা উচ্চ বেতনের পদ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। তাহাতে পাশ্চাত্য বিদেশীরা নিযুক্ত হয়। আমরা কিছু বলিলে, ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা বলেন, "গবর্ণমেণ্ট সকলকেই চাকরী দিবেন, এমন কোন অঙ্গীকার করেন নাই, সকলকেই চাকরী দেওআ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব। তোমরা সবাই স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন কর।" আমরা তাহার উত্তরে বলি, দেশের যতগুলা উচ্চ চাকরী আছে, তাহার সব না

হোক অধিকাংশ আমাদিগকে দিয়া তবে এরূপ উপদেশ দিলে শোভা পায়। কিন্তু দখলীকার না শুনে ধর্মের কাহিনী। মহারাণী ভিক্টোরিয়া জাতি-ধর্ম্ম-বাসস্থান-গাত্রবর্ণ নির্বিশেষে সাম্রাজ্যের সকল প্রজার সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র সেই অঙ্গীকার বলবৎ রাখিয়াছেন। কিন্তু উচ্চপদগুলির দখলীকারেরা এই স্বাভাবিক এবং রাজ-স্বীকৃত অধিকার কার্য্যতঃ অস্বীকার করিতেছেন। তাহার উপর, আমরা যে কাজগুলি পাই, তাহাতেও অংশীদার জুটাইতেছেন। ইহা ঠিক নয়।

দেশী রাজ্যে ব্রিটিশভারতের লোকেরা কেহ কেহ চাকরী পায়। সুতরাং আদান-প্রদানের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আমরা না হয় দেশী রাজ্যের প্রজাদেরও ব্রিটিশ ভারতে দুএকটা চাকরী পাওআয় আপত্তি না করিলাম। কিন্তু উঁহাদের শাসনকর্ত্তাদের ব্রিটিশ ভারতের চাকরীতে নিয়োগ সব দিক্ দিয়া অন্যায় ও অবাঞ্ছনীয় মনে করি। তাঁহারা ছোটখাট চাকরীতে নিযুক্ত হইবেন না, ভারত-গবর্ণমেন্টের মন্ত্রিসভায় যেমন কাজে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, আলী ইমাম, শঙ্করন্ নায়ার নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই প্রকারের বড় কাজেই তাঁহারা নিযুক্ত হইবেন। তাহা হইলে ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের এ-সব উচ্চপদ পাইবার সম্ভাবনা খুব কম হইবে। তদ্ভিন্ন, সাধারণতঃ দেশীরাজ্যের নৃপতিদের চেয়ে ব্রিটিশভারতের নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও স্বাধীনচিত্ততা অধিক। দেশীরাজ্যের নৃপতিরা ব্রিটিশভারতের অবস্থা, প্রয়োজন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আমরা যেমন জানি, তেমন জানেন না। এইসব কারণে ব্রিটিশ ভারতের উচ্চপদগুলিতে সাক্ষীগোপাল-স্বরূপ জনকয়েক রাজামহারাজা নবাবের নিয়োগ অবাঞ্ছনীয়। নৃপতিদের পক্ষ হইতে ইহা বলা যাইতে পারে যে হায়দরাবাদের নিজাম, উদয়পুরের মহারাণা, প্রভৃতির মত তাঁহাদের অনেকে ভারতসম্রাটের মিত্র (Allies of the King-Emperor)। গবর্ণর-জেনারেলের বা কোন প্রাদেশিক গবর্ণর লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের অধীনে চাকরী লওয়া কি তাঁহাদের পক্ষে সম্মানের বিষয় হইবে, না সঙ্গত হইবে? যে সব নৃপতি সম্রাটের মিত্র নহেন, তাঁহাদেরও অনেকে সম্মানে গবর্ণর-জেনারেলের সমকক্ষ লোক। তাঁহাদের পক্ষেও চাকরী করা সাজিবে না। তাহার পর দেশীয় নৃপতিদের রাজ্য ও প্রজাদের পক্ষ হইতেও আপত্তির কারণ আছে। নিজের রাজ্যের ও প্রজাদের সুশাসন ও উন্নতি করা তাঁহাদের প্রধান ও সর্ব্বাগ্রে-কর্ত্তব্য কাজ। ইহার জন্য যাহা করা উচিত, দিনরাত পরিশ্রম করিলেও তাঁহারা তাহা করিয়া উঠিতে পারিবেন না। অনেকে সে-চিন্তা করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা অবহেলা করেন বলিয়া অবহেলার আরও একটা কারণ জুটাইয়া দেওআ ঠিক নয়। যে-সব নৃপতি ব্রিটিশ ভারতে চাকরী লইবেন, তাঁহারা নিজ রাজ্যে থাকিলে ব্রিটিশ ভারতের কাজ করিতে পারিবেন না, ব্রিটিশ ভারতে থাকিলে নিজ রাজ্যের কাজ করিতে পারিবেন না। এ অবস্থায় তাঁহাদিগকে ব্রিটিশ ভারতের কোন চাকরী দেওয়া সম্পূর্ণ গর্হিত হইবে।

ভারতসন্নিহিত দেশের স্বাধীনজাতীয় ব্যক্তিগণ বলিতে বোধ হয় আফগানীস্থান, পারস্য, আরব,* নেপাল, তিব্বত, শ্যাম ও চীন দেশের লোক বুঝিতে হইবে। ব্রিটিশভারতের যে-কোন সিবিল বা মিলিটারী, অর্থাৎ সাধারণ রাষ্ট্রীয় বা সৈনিক কাজে ব্রিটিশ ভারতের প্রজারা নিযুক্ত হইতে পারে, ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যের রাজা ও প্রজা, এবং পূর্ব্বোক্ত স্বাধীন দেশের প্রজারাও তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারিবে, এইরূপ নিয়ম নূতন আইনের পাণ্ডুলিপিতে নিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা যে-সব কাজ পাই, তাহাতে নূতন অংশীদার জুটান যে কেন অন্যায় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তথাপি, আমরা দেশী রাজ্যে দুএকটা কাজ পাই বলিয়া, দেশী রাজ্যের প্রজাদের ব্রিটিশ ভারতে দুএকটা কাজ পাওআয় আপত্তি করা উচিত নয়, বলিয়াছি। কিন্তু ভারতসন্নিহিত স্বাধীন রাজ্যগুলির সম্বন্ধে একথা খাটে না। তাহার পর বক্তব্য এই যে ব্রিটিশভারতের সরকারী সিবিল কার্য্য নির্ব্বাহ ইংরেজী-জ্ঞানসাপেক্ষ। আমরা দস্তরমত ইংরেজী শিখি বলিয়া এই-সব কাজ পাই। ভারতসন্নিহিত স্বাধীন দেশসকলে ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী কিম্বা অন্ততঃ ভারতবর্ষের সমান ইংরেজী-জ্ঞান হয় নাই। সুতরাং ইংরেজীজ্ঞানসাপেক্ষ সিবিল চাকরীর জন্য ঐ-সব দেশ হইতে লোক আমদানী করিবার

* কারণ আরবদেশের অন্তর্গত এডেন ও তৎসন্নিহিত ভূখণ্ড ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে বিলাতী নূতন আইনটিতে চাকরী সম্বন্ধীয় এই বিধিটি বসাইবার অর্থ কি? আমাদের মনে হয়, সৈনিক কাজে বিদেশী লোকদিগকে বেশী পরিমাণে নিযুক্ত করিবার জন্য হয় ত এইরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, এরূপ ব্যবস্থা করিবার কারণ দুটি হইতে পারে। (১) ভারতবর্ষে যথেষ্ট সংখ্যক বলিষ্ঠদেহ সিপাহী পাওয়া যাইতেছে না। (২) ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। প্রথম কারণটি সত্য হইলে, তাহার প্রতিকার গবর্ণমেণ্টের হাতে রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট বলিষ্ঠদেহ সিপাহী পাইয়া আসিতেছিলেন। এখন যদি না পান, তাহা হইলে তাহার কারণ, বোধ হয়, দেশের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছে ও খাদ্য দুর্মূল্য হইয়াছে। দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি, এবং লোকের আয় বাড়াইবার জন্য কৃষিশিল্পের উন্নতির উপায় অবলম্বন করিলে প্রতিকার হইতে পারে। সিপাহীদের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। আরও কিছু বাড়ান আবশ্যক, বাড়াইলে ভাল হয়। তাহা হইলে তাহারা ভাল খাইতে পাইবে, এবং আরও বলিষ্ঠ হইবে। দ্বিতীয় কারণটি আমরা সত্য বলিয়া মনে করি না। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ও বহুসংখ্যক সিপাহী বিশ্বস্ত ছিল, এবং তাহাদের সাহায্য না পাইলে বিদ্রোহদমন সহজ হইত না।

যে কারণেই হউক, গবর্ণমেণ্ট এশিয়াজাত ইতর বিদেশী সৈন্য নিযুক্ত করিলে, দেশের লোক স্বভাবতই গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য, স্বদেশরক্ষায় অসমর্থ বা সন্দেহভাজন মনে করেন ভাবিয়া, অপমান বোধ করিবে ও অসন্তুষ্ট হইবে। রাজপুরুষদের যদি এরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে, আশা করি—নাই, তাহা হইলে এ পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। এ পথ অবলম্বন করিলে ভারতবাসীরা মনে করিবে যে তাহাদিগকে আরব, কাবুলী, চীনা, তিব্বতী, লুর, প্রভৃতিদের অধীন করা হইতেছে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ ব্যতীত অন্য বিদেশী সৈন্য নিযুক্ত করিবার কথা পূর্ব্বেও উঠিয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে ও ১১ই জুন তারিখের দুটি সার্কুলার দ্বারা তৎকালীন ভারত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে প্রধান প্রধান সিবিল ও সৈনিক কর্ম্মচারীদের মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। অনেকে এই প্রস্তাবের সপক্ষে মত দিয়াছিলেন। কিন্তু বিপক্ষে মত দিয়াছিলেন সার্ জন (পরে লর্ড) লরেন্স, মিষ্টার (পরে সার্ বার্টল্) ফ্রেয়ার, জেনারেল জন্ জেকব্, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নেভিল চেম্বারলেন, কর্ণেল হার্বার্ট বি, এডোআর্ডস্, প্রভৃতি। সকলের সমগ্র মত উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। এখানে দুএক জনের মতের কিয়দংশ দিতেছি। সার্ জন্ লরেন্স্, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নেভিল্ চেম্বারলেন, এবং কর্ণেল হার্বার্ট বি, এডোআর্ডস্ লিখিয়াছেন :—

"Military service is one of the most powerful means of conciliation which the British Indian Government has at its disposal; but after we have given all the service that is available, it is still one of the popular complaints that we give so little. It is a necessity of our position in India that we must spend a large proportion of the revenues of the country on European soldiers, but no such necessity exists for bringing in Mahommadan, Hindu, and Buddhist foreigners from other tropical countries. Such a policy would be felt to be oppressive, and would be departing from the benevolent desire we have ever had to rule India for the benefit of the Indians. Moreover, with the memories of 1857 still fresh, we doubt much whether the natives of India are not the most docile of coloured military races. Again, every coloured soldier that you bring into India displaces an Indian soldier,—a soldier, too, by caste and profession,—who will take to no other livelihood. What would the advocates of foreign mercenaries propose to do with these displaced military classes? No statesman can ignore them. The wise policy is to feed, use, and control them."

মিষ্টার ফ্রেয়ার, তখন সিন্ধুদেশের কমিশনার, লেখেন—

"Tartars, Chinese, or Malays, with whom your only bond of union must be the mercenary one of pay, would require an overpowering force of Europeans to ensure their fidelity."......

"They can have to us no single tie, but the mercenary one of pay, in which we may be at any time outbid. No sepoy in India can possibly be so purely and entirely mercenary as these tropical foreigners must be."......

"The expedient of relying on such foreigners has again and again been tried by oriental despots, and is indeed a stereotyped part of their policy. A body-guard of exotic mercenaries so pampered and indulged as to leave them nothing to gain by change, so hated by the people as to make their interests one with

those of their master, and so small as to put independent action out of the question, has often shown exemplary fidelity to a tyrant. But when such a body outgrows the small dimensions which are essential characteristics of such a guard, it has invariably been found dangerous and generally fatal to its employer, and in no case has it ever afforded an example which the Government of British India would follow without cartain danger, and hardly doubtful disgrace."

"Every plan of the kind proceeds on the supposition, which I believe to be most erroneous, that natives of India are not to be trusted; but I hold entirely with General Jacob......that in the military races of India we have the best possible material for a native Indian army,"....

মেজর জেনারেল সার্ সিডনী কটন, কর্ণেল মেহিউ, কর্ণেল গ্রান্, কর্ণেল মেল্ভিল্, প্রভৃতিও প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। লরেন্স প্রভৃতি বিখ্যাত লোকের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। যাহারা সিপাহীবিদ্রোহ স্বয়ং দেখিয়াছিলেন, তাহা দমন করিবার জন্য লড়িয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্রোহের অভিজ্ঞতাসত্ত্বেও এদেশে এশিয়াজাত বিদেশী সৈন্য নিয়োগের বিপক্ষে মত দিয়াছিলেন। যদি বাস্তবিক এখন সেই আগেকার প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা হইলে লরেন্সের মত লোকদের আপত্তির কারণ ভাল করিয়া বিবেচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডিং ও অন্য কোন কোন শাসনকর্ত্তা, এবং এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজওআলাদের মত এই যে, যুদ্ধটা যতদিন চলে, তত দিন, যাহাতে খুব মতভেদ আছে, এবং যাহা তর্কবিতর্কের কারণ হইতে পারে, এরূপ কোন আইন বা প্রস্তাব করা উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, গবর্ণমেণ্ট নিজে, এই পরামর্শ অনুসারে চলিতেছেন না। এই গত বৎসর সিবিল সার্বিসে নিয়োগ সম্বন্ধে যে আইন হইয়াছে, তাহাতে ভারতবাসীদের অসুবিধা হওআয় খুব আন্দোলন হইয়াছে। আইন পাস্ হইবার আগে ভারতবাসীরা নিজের মত প্রকাশের অবসর পায় নাই। সে দিন আবার আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানদিগের স্বতন্ত্রভাবে মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং মুসলমানদের সংখ্যার অনুপাতে যত প্রতিনিধি পাওনা হয়, তদপেক্ষা বেশী দেওআ হইয়াছে। ইহাও হঠাৎ করা হইয়াছে; আগ্রা-অযোধ্যাবাসীরা এ সম্বন্ধে আপনাদের মত জানাইবার সুযোগ পায় নাই। এই আইন হওআয় ঐ প্রদেশে খুব আন্দোলন চলিতেছে, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সংবাদপত্রেও আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছিয়াছে। ইহার পর এখন এই বিলাতী আইনের সংবাদ আসিল। এরূপ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উচিত হইতেছে না।

বিলাতী আইনটির যে ব্যবস্থার কথা লিখিলাম, তৎসম্বন্ধে বা আইনটির অন্যান্য ধারা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতাম না, এরূপ আইন যে হইবে তাহাও কেহ মনে করে নাই। ভারতবর্ষের লোকে এ বিষয়ে যাহা বলিবে, লিখিবে, তাহা বিলাতে পৌঁছিবার আগেই বিলটি আইনে পরিণত হইবে। আমরা কিছু মত প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলেই যে আমাদের মত অনুসারে কিছু কাজ হয়, তাহা নহে; কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে মত জানাইবার সুবিধা দিলে রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহ-প্রণালীর আদবকায়দা ও ভব্যতা রক্ষা পায়। সর্ব্বসাধারণের মত অনুসারে কাজ না করিলেও তাহাদের মত জানায় গবর্ণমেণ্টের লাভ আছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি নিবারণের জন্য বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন অংশের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত লোকদের সাহায্য লইতে হইলে ব্রিটিশ জাতির গৌরব বাড়িবে না, ব্রিটিশ জাতিকে অন্যান্য জাতি অধিকতর সম্মান করিবে না, ইহা ব্রিটিশ জাতিকে বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন রাখিবার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক ও একমাত্র উপায় সাম্রাজ্যের সমুদয় অংশকে বলিষ্ঠ করা। ভারতবর্ষের লোকেরা সাম্রাজ্যের অধিবাসীদিগের বড় অংশ। সুতরাং ভারতবর্ষের লোকদিগকে শক্তিশালী করা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে ইংলণ্ডের মঙ্গল, ভারতের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন।

গত মাসে যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের নেতৃত্বে যশোহরের অধিবাসীরা

যত্নসহকারে আপনাদের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মজুমদার মহাশয়ের ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ প্রশংসনীয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণে পাণ্ডিত্য আছে। কিন্তু উহা নানা কথায় পূর্ণ; সমস্ত অভিভাষণটির ভিতর দিয়া বিশেষ একটি কিছু বক্তব্যের ধারা লক্ষিত হয় না।

তাঁহার অভিভাষণের শেষ পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন "সাহিত্যের আদর্শ", কিন্তু তাহাতে সাহিত্য অপেক্ষা ভাষার কথাই বেশী বলিয়াছেন। ভাষা আর সাহিত্য কি এক জিনিষ? তিনি বলিতেছেন:—

আমি অকুণ্ঠিতহৃদয়ে বলিতে পারি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমুদয় ভাষা বর্ত্তমান কালে প্রচলিত আছে বা ভবিষ্যতে প্রচলিত হইবে সে সমুদয়েরই আদর্শ সংস্কৃত ভাষা হওয়া উচিত। কি বৌদ্ধগণ, কি জৈনগণ, কি অন্যধর্ম্মাবলম্বিগণ, যাঁহারা যখন যে ভাষায় সাহিত্য গঠন করিয়াছেন, সেই ভাষার সহিত সংস্কৃতের একটা অপরিহার্য্য সম্বন্ধ তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাখিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গভাষারও আদর্শ ঐরূপ সংস্কৃত ভাষাকেই রাখিতে হইবে। আদর্শ স্থির থাকিলে সকল কার্য্যেই একটা শৃঙ্খলা জন্মে, কার্য্যটা সহজসাধ্য হয়। সংস্কৃত ভাষা অবশ্য কোন দিনই ভারতের কথিত ভাষা ছিল না। যাঁহারা বিশেষ শিক্ষিত বা ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্রতী, তাঁহারাই সংস্কৃতের অধিকতর বশবর্ত্তী হইতেন। অন্যথা কোন দিনই এই বিশাল ভারতের সর্ব্বত্র সংস্কৃত ভাষা কথোপকথনের ভাষা বলিয়া সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। কথোপকথনের ভাষা না হইলেও, আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, সংস্কৃতকেই গ্রহণ করিতে হইবে। বঙ্গভাষা এতদিনের সাধনায় বর্ত্তমান কালে যে আকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এখন তাহাকে অন্যদিকে নূতন করিয়া পরিচালিত করা অসম্ভব। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার প্রায় সমস্ত শব্দই সংস্কৃত হইতে গৃহীত, অনেক শব্দ কেবল সুবাদি-বিভক্তি-বর্জ্জিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপস্থলে সেই সংস্কৃতানুগামিনী ভাষাকে অন্যমুখী করিবার চেষ্টা করা বৃথা শ্রম। সংস্কৃত আদর্শ স্থির রাখিয়া, যতটা সম্ভব, বঙ্গভাষাকে সুগঠিত করিতে হইবে। এইভাবে কার্য্য করিতে পারিলে ভাষার কল্যাণ হইবে, ভাষা উত্তরোত্তর শক্তিশালিনী হইবে।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিতেছেন:—

কোনও দেশে লিখিবার ও বলিবার ভাষা এক হইতে পারে নাই ও পারিবে না। বঙ্গদেশে মহর্ষি পাণিনির ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কোনও মহাপুরুষ এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ না করিলেও বঙ্গভাষার একটী আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা গঠিত হইতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্ব, মধ্য, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে কথোপকথনাদিতে যিনি যেরূপ ভাবে যে শব্দ উচ্চারণ করুন না কেন, লিখিবার ভাষা সকলেরই এক ছিল। কোনও বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ কোনও সাহিত্যিক স্থানীয় শব্দের অবতারণা করিলেও তাঁহাদের আদর্শের ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় নাই। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে ব্যতিক্রমের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণকর কি অকল্যাণকর তাহা বঙ্গের সুধীবৃন্দের বিবেচ্য।

মজুমদার মহাশয় ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, একটি ছোট টিপ্পনীতে তাহার সম্যক্ আলোচনা করা অসম্ভব। আমাদের মনে হয়, ভাষার কোন অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ থাকিতে পারে না। উহা পুকুরের স্থির জল অপেক্ষা অনেকটা নদীর স্রোতের জলেরই মত। নদীর জল উপর হইতে যেমনটি আসে, নীচে তেমনটি থাকে না, অথচ সম্পূর্ণ নূতনও নহে। ভাষারও জীবন আছে বলিয়া গতি আছে, পরিবর্ত্তন আছে। বৈদিক ভাষা তাহার পরবর্ত্তী সংস্কৃতে পরিণত হইল কেন ও কেমন করিয়া? আবার সংস্কৃতে উপদেশ না দিয়া বুদ্ধদেব তৎকালের-কথিত ভাষায় উপদেশ দিলেন কেন? লিখিবার ভাষা ও বলিবার ভাষা এক না হউক, উভয়ের মধ্যে বেশী প্রভেদ প্রাণবান শক্তিশালী সাহিত্যে থাকিতে পারে না। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতদের ভাষা, বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অংশের ভাষা, তাঁহার শেষ অংশের ভাষা, আলালী ভাষা, বঙ্কিম বাবুর প্রথম লিখিত উপন্যাসগুলির ভাষা, তাঁহার পরিপক্ক বয়সের উপন্যাসগুলির ভাষা,—এসব কি এক? এক নহে। পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, এবং সেই পরিবর্ত্তন ক্রমাগত লিখিত ভাষাকে কথিত ভাষার দিকে লইয়া যাইতেছে। অন্যদিকে কথিত ভাষাও এখন আগেকার চেয়ে কেতাবী হইয়াছে ও হইতেছে। ভাষার ও সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রীকে 'বাক্'-দেবী বলা হয়, "লিখন"-দেবী বলা হয় না, "ভাষা" শব্দের ধাতু "ভাষ্", যাহার মানে বলা; ইংরেজী tongue কথাটার মানে জিহ্বানামক কথা-বলিবার যন্ত্র, এবং ভাষা, উভয়ই; ভাষার অন্য ইংরেজী প্রতিশব্দ language লাটিন lingua শব্দ হইতে উৎপন্ন, যাহার প্রথম অর্থ জিহ্বা, ফারসী জবান্ মানে জিহ্বা ও ভাষা দুই-ই। ইহা হইতে কি আমরা

বুঝিতে পারিতেছি না, যে, যাহা বলা হয়, তাহাই ভাষার অস্থিমজ্জা, প্রাণ? কেতাবী ভাষা কথিত ভাষা হইতেই উৎপন্ন, এবং তদনুসারে নিয়মিত ও পরিবর্ত্তিত সকল দেশে সকল যুগে হইয়া আসিতেছে ও হইবে। কেতাবী ভাষার একটা অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ খাড়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা। বলিবার ভাষাকে তুচ্ছ করিলে চলিবে না।

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বটে, এবং সে সম্পর্ক পরেও থাকিবে। কিন্তু সংস্কৃত দ্বারা বাংলা নিয়মিত হইবে না। উভয়ে বিস্তর প্রভেদ আছে, উভয়ের ব্যাকরণগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ বেশী আছে বলিয়াই উহা সংস্কৃত দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে না। ভাষাবিশেষের আসল প্রকৃতি তাহার শব্দাবলীর দ্বারা তত ধরা যায় না, যত তাহার ব্যাকরণ দ্বারা ধরা যায়। তামিল ভাষাতেও ত সংস্কৃত শব্দ বিস্তর আছে। কিন্তু তামিল কি সংস্কৃতের অনুগমন করে? অবশ্য তামিল দ্রাবিড় ভাষা, বাংলা "আর্য্য" ভাষা, উভয়ে একজাতীয় নহে।

বাংলা সাহিত্যকেও সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে গড়া চলিবে না। সাহিত্য অতীত ও বর্ত্তমান কালের মানুষের বাহিরের ও ভিতরের জীবনের কতকটা ছবি, কতকটা সমালোচনা, কতকটা ভবিষ্যতে ঐ জীবন কিরূপ হইতে পারে তাহার আভাস, এবং তাহার দিকে মানুষকে প্রেরণ করিবার শক্তির আধার। ইহা তথ্যের বা সত্যের নীরস আকারে আমাদের কাছে উপস্থিত হয় না। ইহা আনন্দের সৃষ্টি, রসময়। সংস্কৃত সাহিত্য যেসকল যুগ ব্যাপিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, মানুষের তখনকার বাহ্য ও আন্তরিক জীবনে এবং এখনকার জীবনে বিস্তর প্রভেদ ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে আরো ঘটিবে; সুতরাং সাহিত্যের রূপ ও প্রকার বদলাইয়াছে, এবং পরেও বদলাইবে। উহা ক্রমপরিবর্ত্তনশীল। উহাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। আমরা বলিতেছি না যে ভাষা বা সাহিত্য কোন নিয়ম মানিবে না। কিন্তু নিয়মও পরিবর্ত্তনশীল হইবে, এবং পরিবর্ত্তনের নিয়ন্তা হইবেন প্রতিভাশালী লেখকেরা।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের ধাত্রী বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সাহিত্যপরিষদ নয়। সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত সাহিত্য-পরিষদ ফ্রান্সের। তাহার সম্বন্ধে নেপোলিয়নের ইতিহাস-লেখক প. লাঁফ্রে (P. Lanfrey) বলেন:—

"If we examine its influence on the national genius, we shall see that it has given it a flexibility, a brilliance, a polish, which it never possessed before; but it has done so at the expense of its masculine qualities, its originality, its spontaneity, its vigour, its natural grace. It has disciplined it, but it has emasculated, impoverished and rigidified it......In the works produced under its auspices we discover the rhetorician and the writer, never the man."

এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার মতে—

"Its attempts to impose its laws on language have, from the nature of the case, failed. For, however perfectly a dictionary or a grammar may represent the existing language of a nation, an original genius is certain to arise—a Victor Hugo or an Alfred de Musset—who will set at defiance all dictionaries and academic rules."

ফরাসী পরিষদ তবু ত তাঁহাদের দেশে ভাষাকে flexibility, brilliance ও polish দিয়াছিলেন। বাংলা দেশে যাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যকে আদর্শ ও নিয়মের নিগড়ে বাঁধিতে চান, ভাষার তত টুকু উন্নতি করিবারও ক্ষমতা তাঁহাদের কাহারও বা সকলের সমষ্টির আছে কি?

দেশ কেমন করিয়া জাগিবে?

শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার তাঁহার অভিভাষণে সত্যই বলিয়াছেন:—

কেবল পুরুষ জাতিকে জাগরিত করিলে চলিবে না, নারী জাতি, যাঁহারা আমাদের মাতা ভগিনী, দুহিতা ও সহধর্ম্মিণীস্বরূপ তাঁহাদিগকেও জাগরিত করিতে হইবে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—"না জাগিলে যত ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" যে সমাজ তাহার অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপ—মহিলা জাতিকে বাণীর প্রসাদ হইতে বঞ্চিত রাখে, তাহার আর অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা কোথায়? ব্যষ্টির উত্থান ব্যতীত সমষ্টির উত্থানের আশা করা বাতুলতা মাত্র। শৃঙ্খলের অতি ক্ষুদ্র অংশও দুর্ব্বল থাকিলে সমস্ত শৃঙ্খলটাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। জাতি-বর্ণধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, জৈন বা শিখ, শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায় সকলকেই জাগরিত করিতে হইবে। ব্যষ্টির আত্মজ্ঞান স্ফুরিত করিয়া আত্মবিস্মৃতি বিদূরিত করিতে পারিলে, সমষ্টির জীবাত্মা চেতন প্রাপ্ত হইয়া আত্মপ্রত্যয়ে পৃথিবীস্থ জাতিসঙ্ঘের মধ্যে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে।
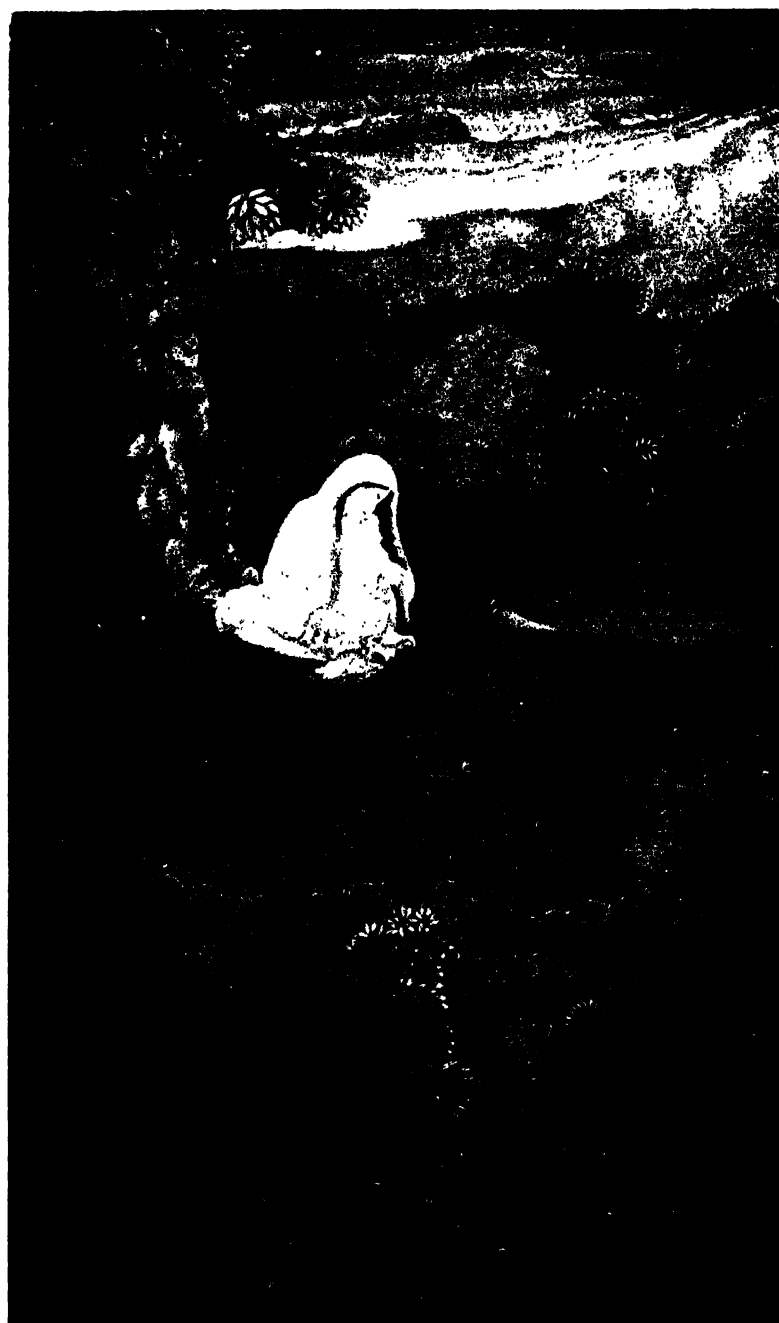
রামায়ণ ও মহাভারতের চিত্র

মানবের মন যখন পরিণতির দিকে ছোটে তখন সে শিল্পের অবতারণা করে। শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য কাব্যের মত রসাত্মক ভাব বিকাশ করা। যে শিল্পে তা নাই সে শিল্প ঐহিক, অসার, ও অশ্রদ্ধেয়। সে শিল্প শরৎ-কালের ভাসা-ভাসা মেঘের মত না দেয় কখন ছায়া, না করে কখন বর্ষণ, কেবল আকাশময় ছুটোছুটি করে নিজের অস্তিত্বের বিফলতা প্রচার করে।

শিল্পের মূলে ইসলাম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী, কাব্য ও মহাকাব্যের প্রভাব আছে। হিন্দুশিল্পেও তাই।

ধর্ম্ম ও কাব্যের গতি যখন যে দিকে ফিরেছে শিল্পের রূপও সেইমত পরিবর্ত্তিত হয়েছে। শৈব শিল্প দৃঢ় ও মহান্; বৈষ্ণব শিল্প করুণ ও গভীর।

কিন্তু এ পার্থক্য থাকা সত্বেও এ দুই শিল্পই এক, ও উভয়ের মধ্যেই রামায়ণ ও মহাভারতের অনন্ত রসের ধারা প্রবাহিত। হিন্দুশিল্পের উপর এই দুই মহাকাব্যের প্রভাব কি তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের

অশোক-তরুতলে সীতা।

ভাবের ভাণ্ডার কাব্য। কাব্যে প্রেম ও আনন্দের যুগল মিলন; এই মিলনের মাঝে শিল্পের স্থান। সেই জন্য শিল্পের সহিত ধর্ম্ম ও কাব্যের সম্বন্ধ নিত্য। শিল্পের ইতিহাসে দেখা যায় যে এমন কোন শিল্প সাফল্য লাভ করে নাই যাহাতে ধর্ম্ম বা কাব্যের প্রভাব ছিল না। বৌদ্ধ যাবনিক ও হিন্দু শিল্পে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। বৌদ্ধ শিল্পের মূলে বৌদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও পারসিক মোগল

প্রভাব লোপ হবার পর ইলোরায় যে-সকল গিরিগুহা নির্ম্মিত হয়েছিল তাতে অনেক স্থানেও এইরূপ মহাভারতে বর্ণিত বিষয় তক্ষিত আছে। অন্যান্য স্থানে রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কীয় ভাস্কর্য্যচিত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশে বিষ্ণুপুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানে কয়েকটি মন্দিরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক মৃণ্ময় (terra cotta) চিত্র আছে।

হনুমানের ল্যাজে আগুন লাগানো।

লঙ্কার এপারে সমুদ্রতীরে শ্রীরামচন্দ্র।
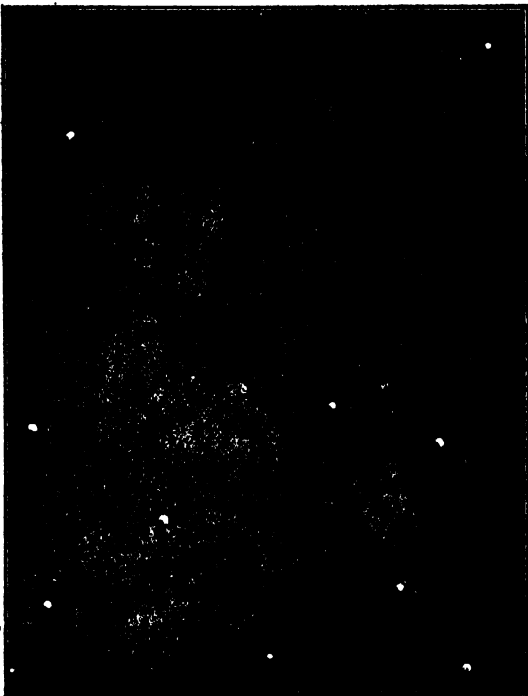
চিত্রশিল্পে এই দুই মহাকাব্যের প্রভাব আরও অধিক। মোগল চিত্রশিল্পকেও এ প্রভাব স্পর্শ করেছিল। পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্ড়া ও অন্যান্য পার্ব্বত্যস্থানে এককালে চিত্রশিল্পের প্রভূত চর্চ্চা ছিল। সে চর্চ্চার বিশালতা আমাদের অনেকের কাছেই অবিদিত। এককালে কত শত শিল্পী এই স্থানে একই সময়ে শিল্পের আরাধনা করেছে। শিল্পের সে সাধনা সে আদর এখন কোথায়? এখন সে-সকল শিল্পীদের নামও কেহ জানে না, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাদের শিল্পই তাদের পরিচয় দেয়। তাদের আঁকা অসংখ্য চিত্র বর্ত্তমান আছে। কত চিত্র নষ্ট হয়ে গেছে; কত চিত্র দেশদেশান্তরে চলে গেছে, এখনও যাচ্ছে; কিন্তু তবুও এ প্রভূত চিত্রাবলির শেষ নাই। এখনও পঞ্জাবে কত লক্ষ চিত্র আছে বলা সম্ভব নয়। এই অসংখ্য চিত্রাবলীর কেন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারত। পাঞ্জাবী চিত্রের অধিকাংশই এই দুই মহাকাব্য-বিষয়ক। এক স্থানে আমি কেবল রামায়ণের আট শত রেখাঙ্কিত চিত্র দেখেছিলাম। রামায়ণে যে এত চিত্রের বিষয় আছে তাহাই কল্পনা করা দুরূহ। এ-সকল চিত্রাবলী দেখলে মনে হয় যেন শিল্পীগণ

শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন।

বানর কটক সহ শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধ উত্তরণ

বিভীষণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিত্রতা।

কাব্যের প্রতি-ছত্রেই চিত্রের বর্ণনা দেখত আর তাই চিত্রে অভিনবরূপে প্রকাশ করত। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি রেখাঙ্কনের প্রতিলিপি প্রদত্ত হল।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রাজগৃহ

বুদ্ধগয়া ও গয়া ভিন্ন প্রাচীন মগধে আর যে-সকল স্থান আছে তাহার মধ্যে রাজগৃহই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক স্থান বলিয়া বোধ হয়। পাটলিপুত্র কেবল নামেই আছে, তাহার খনন ও উদ্ধার-কার্য্যও সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। রাজগৃহ একটি ধ্বংসস্তূপময় উপত্যকা মাত্র, কিন্তু ইহার দুই দিকের পাহাড়গুলি আমাদের মনোযোগ নিবেশের যথেষ্ট উপকরণ জোগাইয়া দেয়; ইহাদেরই সাহায্যে আমরা প্রাচীন নগরের অবস্থান-ভূমি এবং বৌদ্ধলেখকগণের কথিত অনেক কাহিনী-সংসৃষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই পাহাড়গুলির ইতিহাস মহাভারতে বর্ণিত সুদূর প্রাচীনকালের ঘটনাবলীর সহিতও জড়িত। এখানে দাঁড়াইয়া মগধরাজের শত্রুতার প্রতিশোধ তুলিতে আগত কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনকে আমরা এখনও কল্পনানেত্রে দেখিতে পাই। পরবর্ত্তীযুগে যখন বুদ্ধদেব বিশ্ব-মানবপ্রীতির বার্ত্তা বহন করিয়া আবির্ভূত হইলেন তখনও এই পার্ব্বত্যনগর মগধের রাজধানী ছিল এবং শিশুনাগ-বংশীয় বিম্বিসার ইহার রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু নূতন রাজগৃহ স্থাপন করেন এবং তাহাই তাঁহার রাজধানী হয়। সে নগর এখন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রাচীররেখাগুলিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। পাহাড়গুলির ঠিক বিপরীত দিকে উত্তরে এই নূতন নগরটি ছিল এবং পর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকাটির মধ্যে পুরাতন রাজগৃহ ছিল। হিউয়েনসাং ইহাকে কুশগড়পুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বর্ণনাকালে ইহাকে 'পার্ব্বত্য দুর্গ' 'প্রাসাদ-পুরী' প্রভৃতি

ভীম-জরাসন্ধের মল্লভূমি, গিরিব্রজ।

নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইতিহাসে প্রাপ্ত সকল নামের মধ্যে 'গিরিব্রজ' নামটিই প্রাচীনতম। দানববংশীয় বিখ্যাত মগধরাজ জরাসন্ধের রাজত্বকালে তাঁহার এই অভেদ্য দুর্গের নাম গিরিব্রজ ছিল। মহাভারতে ইহাঁর রাজ্যজয় প্রভৃতির দীর্ঘ বর্ণনা আছে এবং বন্দী রাজাদিগকে শিবের নিকট বলি দিতেন বলিয়া অখ্যাতি ঘোষিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির রাজচক্রবর্ত্তী হইবার ইচ্ছায় রাজসূয় যজ্ঞ করিতে গিয়া শুনিলেন জরাসন্ধ বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহার যজ্ঞ সমাধা হইবে না। তখন ভীম ও অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকানাথ কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে গিরিব্রজে চলিলেন। জরাসন্ধ পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া ভীমকে উপযুক্ত প্রতিযোদ্ধা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধ বহুক্ষণ ধরিয়া চলিল। এই দুই মহাশক্তিশালী পুরুষশার্দ্দূল পরস্পরকে পরাজিত করিতে উৎসুক হইয়া আনন্দিতচিত্তে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। "তাঁহারা করগ্রহণপূর্ব্বক পাদাভিবাদন করিয়া বাহ্বাস্ফোটন-পূর্ব্বক পরস্পরের স্কন্ধে বাহু দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন।" শব্দে সমগ্রভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল। দুই মত্ত হস্তী যেমন শুণ্ডযুদ্ধ করে, সেইরূপে তাঁহারা পরস্পরকে 'বিবিধ বন্ধন দ্বারা কক্ষাবদ্ধ করিয়া অঙ্গসমাপীড়ন করিতে লাগিলেন।' 'তাঁহাদের মুষ্ট্যাঘাত ও গ্রীবাকর্ষণ প্রভৃতির শব্দ বজ্রপাত ও পর্ব্বতপাতের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়েই বলীশ্রেষ্ঠ এবং উভয়েই এইরূপ যুদ্ধে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেছিলেন।'

যুদ্ধে ভীম জয়লাভ করিলেন। নগর-প্রাচীরের বাহিরে

'রণভূমি'তে এই যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা আজিও সকলের মনে আছে। যে স্থানটি এই বিখ্যাত মল্লভূমি বলিয়া পরিচিত তাহা আজিও লোকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। একটি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে সযত্নে সমতল করিয়া ও তাহাতে একপ্রকার সুন্দর সূক্ষ্ম শাদা মাটি দিয়া এই স্থানটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এখনও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে মল্লগণ আসিয়া এই 'বীর মাটি' লইয়া যায়; মল্লযুদ্ধের পূর্ব্বে ইহারা সর্ব্বাঙ্গে এই মাটি মাখে। তাহাদের বিশ্বাস, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীমের নামের গুণে এই মাটি মল্লের দেহের বল বাড়াইয়া দিতে ও তাহাদিগের সহায়তা করিতে পারে।

উৎকীর্ণ চিত্রাদি দেখিলে রাজগৃহের সৌন্দর্য্য আমাদের মানসনয়নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। উক্ত প্রাচীন নগরে গৃহের নিম্নতলগুলি পাথর কিম্বা মাটি দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে বহুকারুকার্য্য-খচিত কাঠের বারাণ্ডা, চূড়া, গম্বুজ প্রভৃতি স্থাপন করা হইত। কি প্রাসাদ কি কুটীর সর্ব্বত্রই কাঠের ব্যবহার সমান ছিল। স্থানে স্থানে বৃহৎ প্রস্তরস্তূপ-সকল দেখিয়া বোধ হয় বড় গোছের বাড়ীগুলি পাথর দিয়াই নির্ম্মিত হইত। দুর্গপ্রাচীর নির্ম্মাণেই পাথরের বিশেষ আদর দেখা যাইত। পর্ব্বতগাত্রে এখনও এইরূপ অনেক প্রাচীরের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। হিউয়েনসাং-বর্ণিত বিম্বিসারের স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসনকাহিনী পাঠ
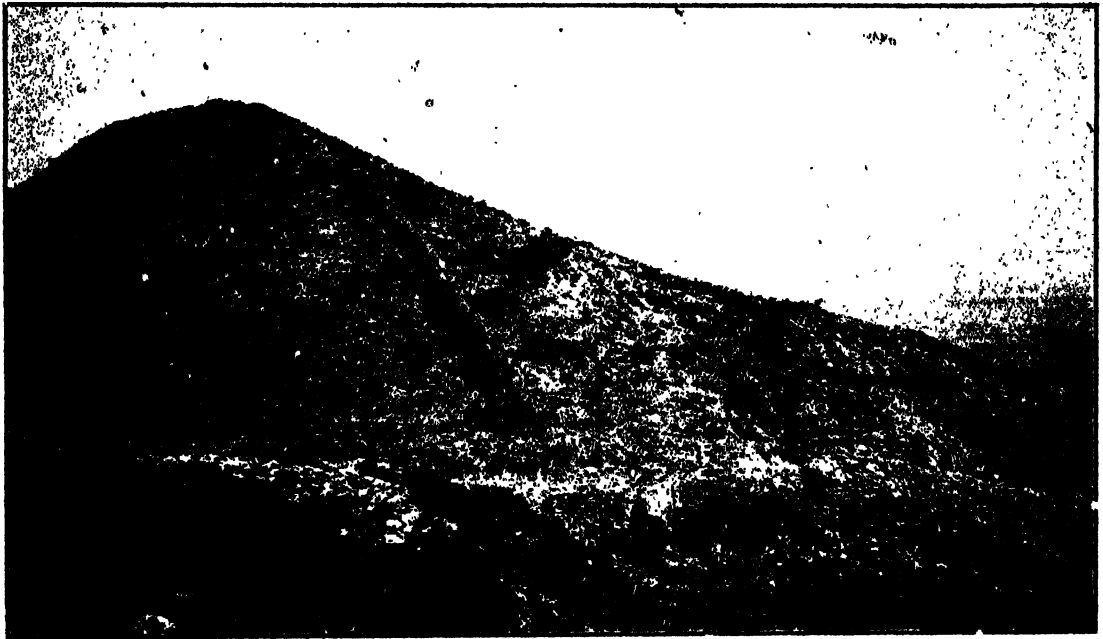
সুবর্ণগিরির উপর পুরাতন প্রাচীর, রাজগৃহ।

মহাভারতের যে অংশে এই নগরের বর্ণনা আছে, সেটি বেশ চিত্তাকর্ষক। চারিবর্ণের সুপুষ্ট ও হর্ষোৎফুল্ল নাগরিকবর্গে নগর পরিপূর্ণ, সেখানে নিত্যই উৎসব। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত সকল রকম ধনে সেখানকার বিপণিগুলি পরিপূর্ণ। সেখানে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা শোভা পাইত। সাঁচি ও বার্হুতের প্রাচীনতম উৎকীর্ণ গৃহ-চিত্রাবলীও কোন কোন বিখ্যাত গুহার প্রবেশদ্বারের

করিলে বোধ হয় রাজগৃহে গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে কাঠেরই বিশেষ চলন ছিল। এই-সকল কাঠের বাড়ী এমন গায়ে গায়ে লাগান ছিল যে, একখানা বাড়ীতে আগুন লাগিলেই সে পাড়ার সব কয়টা বাড়ী পুড়িয়া যাইত। নগরবাসীরা এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ক্রমাগত রাজসমীপে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। নগরবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য ও জনসাধারণকে অধিকতর সতর্ক করিবার

শোণ-ভাণ্ডার গুহার অভ্যন্তর, রাজগৃহ।

ন্য রাজা বিম্বিসার এক নূতন আইন প্রচার করিলেন। এইবার যাহার গৃহে প্রথম আগুন লাগিবে তাহাকে পর্ব্বতের উত্তর সীমান্তে অরণ্যে নির্ব্বাসন দেওয়া হইবে। কালক্রমে নৃপতি বিম্বিসারের গৃহেই অগ্নিদেবের দৃষ্টি লাগিল। রাজা স্বকৃত আইনের মান্যরক্ষার জন্য স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া অরণ্যবাসী হইলেন। আজকালকার দিনে এখানে গৃহনির্ম্মাণের জন্য কাঠ পাওয়া কঠিন ব্যাপার, কিন্তু হিউয়েনসাং বলেন যে তখনকার সময় রাজপথের দুইধারে সুগন্ধী কনকচাঁপার বৃক্ষ শোভা পাইত আর প্রতি বসন্তের আগমনে অরণ্যানী সোনার বরণ হইয়া উঠিত। মহাভারতেও দেখিতে পাই যে পর্ব্বতমালা লোধ্র ও পিপ্পল বৃক্ষে আচ্ছন্ন ছিল, উপত্যকা গো ও মেষপালে পরিপূর্ণ ছিল এবং সেখানকার জলাশয় কখনও শূন্য হইত না। এই অশেষসমৃদ্ধিশালী নগরে এখন কতকগুলি ঝোপ-ঝাড়ে আচ্ছন্ন প্রস্তরস্তূপ মাত্র প্রাচীন প্রাসাদ, মন্দির ও নগর-প্রাচীর প্রভৃতির সাক্ষীস্বরূপ পড়িয়া আছে। এই জনশূন্য উপত্যকাকে বেষ্টন করিয়া এখনও পাঁচটি পর্ব্বত নগরপ্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "উন্নতবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন, উচ্চচূড় বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক যেন একত্রে গিরিব্রজকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে।" বৈভার-গিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও স্বর্ণগিরি নামক পাঁচটি পর্ব্বতচূড়া এখনও দেখা যায়। এগুলি চূড়া মাত্র, ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বত নয়। এই পর্ব্বতমালার গা দিয়া পঁচিশ মাইল লম্বা একটি দুর্গবেষ্টনী প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে উচ্চ বাঁধ দিয়া সমতলভূমির দুই প্রান্তস্থিত

প্রাচীরগুলিকে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৈভারগিরি ও সোনাগিরিকে যুক্ত করিয়া পশ্চিমে জরাসন্ধবাঁধ। ইহার সিকি মাইল পূর্ব্বে বৈভারগিরির পাদদেশ হইতে একটি বাঁধ গিয়া নগরমধ্যস্থ প্রাচীরে যুক্ত হইয়াছে। রত্নগিরি হইতে উদয়গিরি পর্য্যন্ত একটি বাঁধ আছে, গৃধ্রকূট পর্ব্বত হইতে একটি প্রাচীর আসিয়া আবার ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। নগরের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর-বেষ্টনীর ব্যাস প্রায় চারি ক্রোশ। নগরের বাহিরে দক্ষিণদিকের দুর্গপ্রাচীরগুলি বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। এইস্থানে উদয়গিরি ও দেড় হাত লম্বা এক-একটি বড় পাথরের আধারের ভিতর ছোট ছোট পাথর দিয়া প্রাচীরগুলি গাঁথা হইয়াছে, ইহাতে কোন-প্রকার সংযোজক প্রলেপ ব্যবহার করা হয় নাই। পাথরের খাঁজে খাঁজে পাথর বসাইয়াই সমস্ত প্রাচীর গাঁথা। ভারতবর্ষে যত পুরাতন পাথরের গাঁথনি দেখা যায়, তাহার মধ্যে এইগুলিই বোধহয় প্রাচীনতম। শত শত বৎসরের ঝড়ঝঞ্ঝার বিক্রম সহিয়াও এখনও স্থানে স্থানে প্রাচীরগুলি যেরূপ সুরক্ষিত আছে তাহাতে তৎকালীন স্থপতিদের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

বৈভার-গিরির পাদমূলে কুণ্ড, রাজগৃহ।

সোনাগিরির মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট হইতে শীর্ণকায়া বাণগঙ্গা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাতন দুর্গ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীরের পার্শ্বে এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীটিকে ঠিক একখানি ছবির মত দেখায়। এই পাহাড় দুটিতে ওঠা খুবই সহজ বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের গায়ে এত দৃঢ় প্রাচীরের ঘটা। দুইটি পর্ব্বতের গাত্র দিয়াই ১৭ ফুট চওড়া ও ১২ ফুট উচ্চ প্রাচীর উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে, তাহার মাঝে মাঝে আবার নিরেট পাথরের বুরুজ। পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিবার জন্য প্রাচীরগাত্রের ভিতর দিয়া সিঁড়ি কাটা আছে।

স্নাতক ব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণ ও তাঁহার বন্ধুবর্গ জরাসন্ধের রাজধানীতে আসিয়া সোজাপথে নগরে ঢুকিলেন না। মগধের গৌরব চৈত্যকচূড়া বাণে বিদ্ধ করিয়া ও বাহুবলে ভাঙিয়া ফেলিয়া তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের এই দাম্ভিকোচিত কীর্ত্তিই তাঁহাদের শত্রু বলিয়া পরিচিত করিয়া দিল। তাঁহারা আতিথ্যাদি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। রাজা তাঁহাদের স্নাতকের বেশে অপথে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ বলিলেন 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণই স্নাতক ব্রাহ্মণের ব্রত গ্রহণ করিতে

উদয়গিরি ও বাণগঙ্গা গিরিবর্ত্মে পুরাতন দুর্গপ্রাকার, রাজগৃহ।

পারেন; ইহাদের যে-সকল বিধি আছে তাহাতে শত্রুর গৃহে অপথে ও মিত্রের গৃহে সুপথে প্রবেশেরই ব্যবস্থা আছে। কাজেই ইহাতে কোন-প্রকার অন্যায় হয় নাই। এই চৈত্যকচূড়া কোন্‌খানে অবস্থিত তাহা বলা যায় না। বীরগণ উত্তর-পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া গঙ্গা ও শোণ নদী পার হইয়া পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলেন। হিউয়েনসাং বলেন, একটি সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়া এই নগরের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করা যায়। মিঃ ব্রড্‌লি বলেন চত্তবা চক্ক নামক বৈভার পর্ব্বতের একটি ক্ষুদ্র শাখার ও সোনাগিরির মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ খাদ আছে; ইহাই বোধ হয় ক্রুদ্ধ নৃপতির নির্দ্দিষ্ট পথ। পূর্ব্বদিকে আর-একটি গিরি আছে। মিঃ ব্রড্‌লি বলেন যে ইহা বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত গৃধ্রকূটকূড়া। পর্ব্বতশৃঙ্গটি খুব উচ্চ ও বন্ধুর, পর্ব্বতমালার উত্তর দিক দিয়া ইহাতে আরোহণ করা বড় শক্ত। কিন্তু বুদ্ধদেব যখন এই পর্ব্বতশৃঙ্গটিকে তাঁহার পবিত্র পদধূলিতে রঞ্জিত করিয়াছিলেন তখনও বোধ হয় ইহার একটা পবিত্রতার খ্যাতি ছিল। সমস্ত পর্ব্বতেই বিহার ও স্তূপের ছড়াছড়ি, কিন্তু এই চূড়াটির সহিতই বুদ্ধদেবের নাম বিশেষভাবে জড়িত। মগধবাসীগণ এদেশের প্রাচীন রাজ-বংশাবলীর কীর্ত্তিগাথা ও পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে কত মানবকে দেবত্বের মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তোলা হইয়াছে। এই-সকল দেবদেবীর পশ্চাতে লুক্কায়িত মানুষগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করার মধ্যে বেশ একটা আনন্দ আছে, কিন্তু ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবার মত বস্তু আছে কি না বলা যায় না। রাজগৃহে এই-সকল কাহিনীর একটি ভৌগোলিক ভিত্তি পাওয়া যায়। জনশ্রুতিকে বিশ্বাস করিলে ইহার সাহায্যে অনেক বিস্মৃত সত্যের পুনরুদ্ধার সাধন হয়।

এই-সকল পর্ব্বত-চূড়ার মধ্যে গৃধ্রকূট পর্ব্বতটিই বৌদ্ধ-গণের মনে বিশেষ ভাবের উদ্রেক করে। ভগবান বুদ্ধ শেষ-জীবনের অধিকাংশকালই এই পর্ব্বতচূড়ায় কাটাইয়া-ছিলেন, এবং এইস্থান হইতেই অনেক সূত্র প্রচার করিয়া-ছিলেন। মহাযানপন্থীগণ বলেন বুদ্ধের চিরবাসভূমি এই গৃধ্রকূট পর্ব্বতেই সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক ও প্রজ্ঞাপারমিতার উৎপত্তি

হইয়াছে। এই উচ্চ একক শৃঙ্গটির যে-সকল প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে ইহাকে চিনিয়া বাহির করা খুবই সোজা। উত্তরের পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্ব বাহিয়া এই শৃঙ্গটি উর্দ্ধমুখে উঠিয়াছে। ইহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে অনেকখানি গিয়াছে, কিন্তু উত্তর হইতে দক্ষিণে অতি অল্পই অগ্রসর হইয়াছে। মিঃ ব্রড্‌লি এই পর্ব্বতগাত্রে একটি পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। কথিত আছে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধদেবের বাণী শুনিবার জন্যই নগর হইতে আসিবার এই পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই পথের পার্শ্বে যে দুইটি স্তূপ পর্ব্বতের যেস্থানে তিনি পাদচারণা করিতেন তাহারই নিকট একটি প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে; কথিত আছে দেবদত্ত এই প্রস্তরখণ্ড তাঁহাকে ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন। বিহারের দক্ষিণদিকের একটি প্রস্তরভবনে বুদ্ধদেব কোন এক পূর্ব্বজন্মে সমাধিলাভ করিয়াছিলেন। এই গৃহেই মার আনন্দকে ভয় পাওয়াইলে বুদ্ধদেবের হস্ত প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিয়া তাঁহার ভয়কম্পিত মস্তকে অভয় স্পর্শ দিয়াছিল। চীনদেশীয় তীর্থ-যাত্রীদের বিবরণীতে প্রাপ্ত এই-সকল স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন এখনও দেখিতে

রাজগৃহে কুণ্ড-তীরে জৈনমন্দির।

নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেগুলিও আবিষ্কারকালে পাওয়া গিয়াছে। প্রাসাদ হইতে রাজা যে রথে আরোহণ করিয়া আসিতেন প্রথম স্তূপটির নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিবার অধিকার তাহার ছিল না; এইখানে রাজা রথ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে বুদ্ধের পাদপদ্ম দর্শন করিতে যাইতেন, দ্বিতীয়টির নিকটে আসিলেই অনুচরদিগকে বিদায় দিতে হইত। পর্ব্বতের পশ্চিম মুখে একটি বিহার ছিল, সেইখানে বসিয়া বুদ্ধদেব জনসমূহকে উপদেশ দিতেন। পাওয়া যায়। সোনাগিরির শিখরদেশে নির্ম্মিত বর্ত্তমান জৈন মন্দিরটির পাশে একটি প্রাচীন সঙ্ঘারাম ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট অশোক সম্ভবতঃ এই স্থানেই শেষ বয়সে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ডাঃ ফ্লিট অশোকের রাজশাসন প্রভৃতি হইতে তাঁহার জীবনের শেষ সময় ও তৎকালীন ঘটনাসকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিবার পর সম্রাট অশোক পৌত্রকে সিংহাসন দান করিয়া সুবর্ণগিরিতে নির্জ্জন বাস করিতে

পিপ্পল-প্রস্তর-গৃহ, রাজগৃহ।

য়ান। এই সময় বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ২৫৫ বৎসর অতীত হয়। সেই জন্য সুবর্ণগিরি-প্রয়াণের পরবর্ত্তী ২৫৬ রাত্রি অশোক পূজায় নির্ব্বাহিত করেন। পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী প্রতি বৎসরের স্মৃতিতে এক-একটি রাত্রি উদ্‌যাপিত হয়।

সোনাগিরি ও বৈভারের মধ্যবর্ত্তী সমতলভূমির প্রায় কেন্দ্রস্থলে, প্রাচীন নগরের প্রাচীর-বেষ্টনীর ভিতর একটি পুরাতন মৃত্তিকাস্তূপের উপর মনিয়ার মঠ নামক একটি অযত্ন-পরিত্যক্ত ছোট জৈন মন্দির ছিল। মিঃ ব্রডলি ইহার পার্শ্বে কতকগুলি ভাঙা ইট, স্ফটিকস্তম্ভ এবং বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও নাগমূর্ত্তি-অঙ্কিত কার্ণিশের টুকরা প্রভৃতি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। পরে ডাঃ ব্লক এই স্তূপটি খনন করাইয়া তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি চুনবালির-কাজ-করা মূর্ত্তি পান। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ছয়টির মাথায় সাপের ফণার মুকুট। তাহাদের একটি বোধ হয় বাণাসুরের মূর্ত্তি (কৃষ্ণ ইহার হাত দুখানা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন), একটি নটরাজ শিবের মূর্ত্তি, একটি গণেশ-মূর্ত্তি ও একটি পুষ্পমালা-শোভিত শিবলিঙ্গ। শিব, বিষ্ণু ও নাগ পূজার এই একত্র সমাবেশ বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। মহাভারতে বর্ণিত আছে, কৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গীদিগকে অর্ব্বুদ, শক্রবাপী, স্বস্তিক ও মণিনাগ প্রভৃতির পূর্ব্ববাসস্থান দেখাইয়া দিতেছেন। এই মুনিনাগের নাম অনুসারেই বোধ হয় এই স্থানের নাম মুনিয়ার মঠ হইয়াছিল। কথিত আছে যে, এখানে বহু অর্থ প্রোথিত আছে। এই প্রোথিত ধনের কাহিনীর সহিত যক্ষরাজ মণিভদ্রের পূজা ও নাগগণের পূজারও বোধ হয় কিছু যোগ আছে। নাগগণ ধন রক্ষা করে ও অনাবৃষ্টির আক্রমণ নিবারণ করে।

এদেশে প্রচলিত শিবপূজার কথাও মহাভারতে পাওয়া যায়। রাজা জরাসন্ধ শিবের নিকট বলি দিবার জন্য ৮৬ জন বন্দী রাজাকে শিবমন্দিরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; একশত জন পূর্ণ হইলে সকলকে পশুর ন্যায় দেবতার সম্মুখে বলিদান করেন। জরাসন্ধ নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীম তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

গিরিব্রজে নাগপূজা ও বৃহদ্রথের বংশের গৃহদেবী জরা রাক্ষসীর উৎসবাদির কথাও মহাভারতে পাওয়া যায়।

বৈভার পর্ব্বতের দক্ষিণাংশের পাদদেশে, উষ্ণ প্রস্রবণ-গুলির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় এক মাইল দূরে শোণ-ভাণ্ডার গুহা অবস্থিত। হিউয়েনসাং যে প্রথম বৌদ্ধ-স্তূপার অধিষ্ঠানভূমি সপ্তপর্ণী গুহা দেখিয়া গিয়াছিলেন, পূর্ব্বে লোকে শোণ-ভাণ্ডারকেই সেই পরিচয়ে পরিচিত করিত। এই গুহাটি ৩৩ ফুট লম্বা, ১৭ ফুট চওড়া ও ১৬ ফুট উচ্চ। ইহার মধ্যে একটি চতুষ্কোণ প্রস্তরস্তূপ আছে, তাহার চারিপাশে পদ্মাসনে দণ্ডায়মান চারিটি মূর্ত্তি খোদিত, প্রত্যেক মূর্ত্তির নীচে দুইটি শঙ্খ ও একটি চক্র অঙ্কিত। করা নয়, পালিশ করা। এই গুহার সম্মুখে পাহাড়ের গায়ে যে-সকল গর্ত্ত কাটা আছে, তাহাতে বোধ হয় নানা-প্রকার সুদৃশ্য কাঠের বারাণ্ডা মিনার গম্বুজ প্রভৃতি বসান হইত।

বৈভার পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বে কারণ্ড-বেণুবন হইতে মাইলখানেক দূরে একটি নীচু পর্ব্বতশাখার উপর এখনও একটি প্রকাণ্ড মঞ্চের ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীর-ভিত্তির জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়-কাটা পাথরের চাপ দেখিতে পাওয়া যায়। পিপ্পলের প্রস্তরগৃহ নির্ম্মাণ করিতে এই রকম

মকদুম কুণ্ড, রাজগৃহ।

এগুলি বোধ হয় স্ব স্ব চিহ্ন ও অনুচর-সম্বলিত ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি। এই গুহার দ্বারে তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীর একটি লিপি দেখিয়া ডাঃ ব্লক অনুমান করেন বৈরদেব মুনি জৈনদের জন্য গুহাটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লিপির মধ্যে এক জায়গায় আছে, "তিনি অর্হৎ-মূর্ত্তির জন্য দুইটি গুহা নির্ম্মাণ করেন।" লিপিখানির পার্শ্বে একটি চরণসই রকমের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ছবিখানি বোধ হয় কোন তীর্থঙ্করের। শোণ ভাণ্ডার গুহার ভিতরটি খোদাই পাথরই ব্যবহার করা হইয়াছিল। ডাঃ ব্লক বলেন, এই ধ্বংসরাশিই সপ্তপর্ণীর শেষ চিহ্ন।

বৈভার ও বিপুলগিরি এই উপত্যকাটির উত্তরসীমান্তের প্রাচীর-স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। রত্নগিরি ও বৈভার হইতে বাণগঙ্গা ও সরস্বতী নাম্নী দুইটি ক্ষুদ্র নদী বাহির হইয়া এই-খানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থলের প্রায় ১৬০ ফুট দূরে যে নগরপ্রাচীরের রেখা দেখা যায়, তাহা দেখিয়া বোধ হয় এইখানেই নগরের ভিতরে প্রবেশের

দ্বার ছিল। বহির্দুর্গের প্রবেশপথ আরও আড়াই শত ফুট উত্তরে ছিল। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত দ্বার প্রভৃতির যে শেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে মনে হয়, এগুলি খুব বিশাল প্রাচীর ও বিপুল-দেহ বুরুজ প্রভৃতির দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। চীনা-তীর্থযাত্রীদের মাপজোখ অনুসারে বিচার করিলে বোধ হয় এই পর্ব্বতসীমানার বাহিরেও অনেক উল্লেখযোগ্য প্রাসাদাদি ছিল।

অজাতশত্রুর প্রতিষ্ঠিত নূতন রাজগৃহ বর্ত্তমান রাজগির গ্রামের পশ্চিমে তৃণগুল্মে ঢাকা একটি নগর-সমাধির মত পড়িয়া আছে। এই নগরের ভিতরকার প্রাচীরের একটি কাঠামো এখনও দেখা যায়। প্রাচীরটি আন্দাজ ১৪ ফুট চওড়া ছিল। কারণ্ড সংঘকে যে বেণুবন, উদ্যান ও বিহার দান করিয়াছিলেন, কারণ্ড-বেণুবন নামে খ্যাত সেই স্থানটি নূতন রাজগৃহ ও পর্ব্বতশ্রেণীর মাঝখানে অবস্থিত। এই বেণুবন ও বিহারের মধ্যে কেবল একটি রাবিশের ঢিবি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ঢিবিটির উপরে একটা মুসলমানদের কবর আছে। ডাঃ ব্লক ঢিবিটি খুঁড়িয়া কতকগুলি খুব ছোট ছোট মাটির বৌদ্ধস্তূপ পাইয়াছেন। বিহারের উত্তরে কারণ্ডহ্রদ নামক একটি হ্রদ ছিল; মিঃ ব্রডলি সেইখানে একটি মূর্ত্তি ও হ্রদ উৎসর্গের একটি লিপি পাইয়াছিলেন। এখন যেখানে শ্মশান আছে, প্রাচীনকালেও বোধ হয় সেইখানেই শ্মশানঘাট ছিল। রাজগির গাম হইতে এই শ্মশান-ঘাটটি অনেক দূরে। বহু প্রাচীনকালে এই গ্রামবাসীদের পূর্ব্বপুরুষগণ বোধ হয় ঘাটের অনেক নিকটেই বাস করিতেন; এখন গ্রাম সরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু নগরবাসী পূর্ব্বপুরুষদের নির্দ্দিষ্ট ঘাটটি সেইখানেই আছে। ঘাটের পাশে পুরাকালে যে দুইচারিটি গাছ ছিল, তাহা এখন বন হইয়া উঠিয়াছে। চীনাতীর্থযাত্রীরা যে দুইটি স্তূপের কথা বলিয়াছেন, বৈভার ও বিপুলগিরির পাদদেশস্থিত মাটির ঢিবি দুইটিই বোধহয় তাহাদের শেষ চিহ্ন। বিপুলগিরির তলদেশস্থ ঢিবিটির উপর এখন একটি শিবমন্দির আছে।

সরস্বতী নদীর তীরে বৈভারগিরির পাদদেশে ৭।৮টি ও বিপুলগিরির পাদদেশে মুখদুম সাহের হজরার নিকট পাঁচটি বিখ্যাত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তিন বৎসর অন্তর প্রতি মলমাসের সময় এই প্রস্রবণগুলির কাছে "লওান" মেলা নামক এক মেলা বসে। এইখানে কয়েকটি হিন্দু-দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

কুণ্ডগুলির উপরে বড় বড় পাথরের তৈরি দুটি প্রকাণ্ড মঞ্চ আছে। ডাঃ ব্লক মনে করেন, উত্তরের দরজার রক্ষীরা এই দুইটি উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে নজর রাখিত। উপরের মঞ্চটির নাম "সীতামারী"। ইহার

মনিয়ার মঠ, রাজগৃহ।

৮০০ ফুট নীচে মার্কণ্ডেয় কুণ্ডের ২৭০ ফুট উপরে পাহাড়ের গায়ে দ্বিতীয় মঞ্চটি। ইহা উচ্চে প্রায় ২৮ ফুট, উপর হইতে দেখিলে ৭০ কি ৮০ বর্গফুট একটি সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র মনে হয়। ইহার চলিত নাম "জরাসন্ধকা-বৈঠক"। ইহার সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে পশ্চিম হইতে আগত শত্রুদের আক্রমণ হইতে গিরিব্রজকে রক্ষা করিবার জন্য জরাসন্ধ একরাত্রে এই মঞ্চ ও পাহাড়ের ঠিক উপরের পাথরে-বাঁধান রাস্তাটি নির্ম্মাণ করান। ইহার সাহায্যেই তাঁহার সৈন্যদল পাহাড়ের মাথায় সমবেত হইয়াছিল। মঞ্চটির নীচের দিকে কতকগুলি ছোট ছোট খোপ ও পিছনে একটি গুহা আছে। হিউয়েনসাং বলিয়াছেন, উষ্ণকুণ্ডগুলির পশ্চিমদিকে "পিপ্পল-প্রস্তর-গৃহে" তথাগত

গরম দিনগুলি কাটাইতেন। এই মঞ্চটিই তথাগতের বিশ্রামগৃহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গৃহের প্রাচীরের পিছনে একটি গভীর গহ্বর আছে; সেটা এক অসুরের প্রাসাদ। মঞ্চটির উপরে তিনটি মুসলমানী কবর আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণবিহারে কামদার খাঁ মায়ী নামক একজন বিখ্যাত মুসলমান সর্দ্দার ছিলেন। ইঁহার বীরত্ব সম্বন্ধে এদেশে এখনও অনেক গাথা চলিত আছে। জরাসন্ধকা-বৈঠকের উপরিস্থিত একটি কবর বোধ হয় এই যোদ্ধ,পুরুষেরই।

বৌদ্ধযুগ বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধের স্মৃতি এখনও এই পর্ব্বতমালাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। হিন্দুমুসলমান সকলেই রাজগিরকে নিজ নিজ তীর্থস্থান বলিয়া দাবী করেন। পর্ব্বতমালা উত্তরাধিকারসূত্রে জৈনদের হাতেই আসিয়াছে। এখন প্রতি পর্ব্বত-চূড়াতেই তাহাদের শ্বেত মন্দিরগুলি ঝক্‌মক্ করে। তাহাদের কাছে রাজগির পরেশনাথ ও পাওাপুরী প্রভৃতির ন্যায়ই পবিত্রভূমি। শেষোক্ত গ্রামটি বিহারনগরের দক্ষিণে পঞ্চনা নদীর তীরে অবস্থিত। রাজগির হইতে বেশীদূর নয়। জৈনদের শ্রেষ্ঠ ও শেষ জিন মহাবীর বর্দ্ধমান এইখানে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। প্রতিবৎসর বহু জৈনতীর্থযাত্রী এই তিনটি তীর্থভূমি দর্শন করিতে আসে। তাহাদের প্রদত্ত অর্থেই এখানকার নূতন মন্দিরগুলি এমন সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়। বহু পুরাতন মন্দির ও স্তূপাদির উপকরণ লইয়া এগুলি রচিত। এই-সকল মন্দিরে অনেক কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরখণ্ড স্তম্ভ ও বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া যায়। প্রতি মন্দিরে এক একজন তীর্থঙ্করের "চরণ-পাদুকা" আছে। বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি, সোনাগিরি প্রভৃতি সকল পর্ব্বতেই এখন বুদ্ধদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীরের জৈনমন্দির শোভা পাইতেছে। এই সকল-মন্দিরই বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা গঠিত। বৈভার পর্ব্বতের উপরে ভগ্ন বৌদ্ধ মন্দিররাশির মধ্যে একটি সুন্দর মন্দির আছে। মিঃ ব্রড্‌লি বলেন, 'এ-জাতীয় মন্দিরের মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা সুগঠিত। ইহার উপরের ছোট গম্বুজটি পড়িয়া গিয়াছে, ভিতরের বুদ্ধমূর্ত্তিটিও আর নাই, কেবল প্রবেশদ্বারের ফ্রেমের মাথার উপরের কাঠটিতে একটি খোদিত মূর্ত্তি আছে। গৃধ্রকূট পর্ব্বতচূড়াটিতে জৈনদের হাত পড়ে নাই। সেই অতীতযুগে এই পর্ব্বত-শিখরেই ভগবান্ বুদ্ধ বাস করিতেন। যে তীর্থযাত্রী বুদ্ধের জীবনকালে জন্মিবার সৌভাগ্যলাভ করেন নাই, তাঁহারা তাঁহার বাসের চিহ্ন ও বাসস্থান দেখিয়াই তৃপ্ত হন। কল্পনানেত্রে ইহার মধ্যে তাঁহাকে উপস্থিত দেখেন।

শত শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের যুগে রাজগিরের যেখানে যে পথঘাট ছিল, দেখিলে মনে হয় এখনও সেগুলি প্রায় সেইখানেই আছে। রাজ-উদ্যান, রাজপ্রাসাদ, উদ্যানের বিচিত্র জলনালী, রাজপথ, দোকান বাজার সকলেরই যেন একটা নক্সাকাটা পড়িয়া আছে। কল্পনার জোর থাকিলে এইখানে দাঁড়াইয়া এখনও সেই বৌদ্ধ-নগরটি দেখা যায়। এই পার্ব্বত্য উপত্যকাটিতে পুরাকালে জলপ্রবাহকার্য্যে অনেক নৈপুণ্য দেখা যাইত। তাহার নিদর্শন এখনও পুরাতন পুষ্করিণী, নদী-কাটা খাল প্রভৃতিতে দেখা যায়।

রাজগিরের মতন এমন পুরাতন আর কোনও স্থানের বিষয়ে এত তথ্য বোধ হয় জানা যায় না। সম্ভবতঃ ৫৯০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এই উপত্যকার পথ দিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় যোগীপুরুষ এই নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই-সকল পথ দিয়াই ভোরের বেলা যখন রাজমন্দিরে বলির জন্য শত শত মূক ছাগকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখনই বোধ হয় ভোরের আলোক গায়ে মাখিয়া সেই অপূর্ব্ব পুরুষ নগর-পথে দেখা দিয়াছিলেন! অথবা যখন গোধূলির ম্লান আলোকে রাখাল-বালকেরা ছাগগুলিকে রাত্রির বিশ্রামের জন্য গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছিল, তখনই হয়ত তাহার উদয় হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন তিনি একটি নিরীহ পঙ্গু ছাগশিশুকে বুকে করিয়া আগে আগে চলিতেছিলেন, আর তাঁহার পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুরের ধ্বনি তুলিয়া সারি সারি নরভোগ্য পশু চলিতেছিল। মানুষেরই মত তাহাদের জন্মমৃত্যু আছে, সুখদুঃখ আছে, আনন্দ নিরানন্দ আছে; কিন্তু মানুষের মতন ভাষা তাহাদের নাই, তাই তাহারা কিছুই প্রকাশ করিতে জানে না। মানুষের এই অসহায় মূক ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য সেই অহিংসাধর্ম্মী মহাপুরুষের মনে দুঃখের ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। তাঁহার

করুণ আঁখি ছুটির দৃষ্টি হইতে প্রেম ও দয়া ক্ষরিত হইতে-ছিল। ঐ নির্ব্বোধ পশুপালও তাহার অর্থ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চারিপার্শ্বে ঘিরিয়া, তাঁহার দেহ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। রাজগৃহে পদার্পণ করিলে অহিংসার প্রতিমূর্ত্তি বুদ্ধদেবের পশুবেষ্টিত চিত্র ভাবুক মাত্রেরই নয়নপথে ফুটিয়া উঠে। এই রাজগৃহের প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া মহারাজ বিম্বিসার ইহারই পথে পথে শাক্যসিংহের তরুণ বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতেন। জগতের অতুল ধন সম্পদ, অজস্র সম্মান কিছুই তাঁহাকে গৃহে বাঁধিতে পারে নাই। বৈরাগ্যের গলায় মাল্যদান করিয়াই ঐ তরুণ ভিখারীর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছিল।

শ্রীশান্তা চট্টোপাধ্যায়।

ভাষার প্রকৃতি

কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি অর্থ জ্ঞাপন করিলে ভাষা হয়। বাক্যসমষ্টি মাত্রেই ভাষা নহে। 'আমি বই খাচ্ছে' ভাষা নহে, যদিও উহা বাক্যের সমষ্টি; 'আমি বই পড়ছি' ভাষা, কারণ ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। যাবতীয় জিনিসের ন্যায় ভাষাও পরিবর্ত্তনশীল। দেশের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়, সেই বৈচিত্র্যের দ্বারা ভাষারও বৈচিত্র্যসাধন হয়। ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাষারও পরিবর্ত্তন ঘটে। বাঙ্‌লাভাষাকে উদাহরণস্বরূপ লইলে দেখা যাইবে, ঐ ভাষা মুসলমানী যুগে ও ইংরিজী যুগে কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নূতন নূতন কথার সন্নিবেশ ত হইয়াছেই। তাহার উপর ভাষার ছাদও অনেক স্থলে বদ্‌লাইয়াছে। আমরা মুসলমান রাজাগণের সময় যেরূপে পরস্পরকে অভিবাদন করিতাম, আধুনিক যুগে সেরূপ কদাচ করিয়া থাকি। পূর্ব্বে রাগপ্রকাশের ভাষা এখনকার হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ইংলণ্ডে স্যাকসন-বিজয় হইতে আজ পর্য্যন্ত, ইংরিজী ভাষাই প্রচলিত। কিন্তু আলফ্রেডের ভাষা আর টেনিসনের ভাষা দুইটি স্বতন্ত্রভাষা বলিলে ভুল হয় না। অথচ উভয়েই ইংরিজী ভাষায় লিখিয়াছেন। চসারকে অনেকে আধুনিক লেখক বলেন; কিন্তু চসার ও ব্রাউনিংএর লেখার মধ্যে কতদূর তফাৎ দেখা যায়। শেক্‌স্‌পীয়র চসারের আরও পরের, শেক্‌স্‌পীয়র নিশ্চয়ই আধুনিক, কিন্তু টেনিসনের ইংরিজী শেক্‌সপীয়রের ইংরিজী হইতে কত পরিবর্ত্তিত। মার্কিন মুলুকের লোকেরা ইংরিজী ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু মাতৃভূমির সহিত বিচ্ছেদ আমেরিকানদের ভাষার পরিবর্ত্তনের একটি হেতু হইয়াছে। ইংরেজ যাহাকে 'biscuits' বলেন, আমেরিকান তাহাকে বলেন 'crackers'; আবার ইংরেজ যাহাকে 'cakes' বলেন, মার্কিনে তাহার নাম 'biscuits'; ইংরেজের 'luggage van' আমেরিকানের 'baggage car' [ভারতবর্ষে অন্ততঃ একটি সরকারী রেলপথে 'luggage van'এর পরিবর্ত্তে 'baggage car'এর ব্যবহার দেখিয়াছি।].

এমন কি একই ভাষা একই সময়ে একাধিক আকারে দেখা যায়। বাঙ্‌লাভাষা বাঙ্‌লাদেশেরই স্থানবিশেষে বিশেষ বিশেষ আকারে দেখা যায়। এই ভাষার স্বাতন্ত্র্যের জন্যই পূর্ব্ববঙ্গবাসী কলিকাতাবাসীদের কাছে 'বাঙাল' বলিয়া উপহাসাস্পদ। পূর্ব্ববঙ্গীয়েরাও কলিকাতার 'বাঙাল'দের ঠিক সেই কারণেই বিদ্রূপ করিতে পারেন। আমাদের 'বেলে মাছ', মেদিনীপুর জেলার 'ভোলা মাছ'। বয়স হইলে আমাদের 'জ্ঞান হয়', উক্তজেলার লোকের 'জ্ঞান পড়ে'। এইরূপ ভাষার নিঃশব্দ পরিবর্ত্তনের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করাই ভাষাতত্ত্বের কাজ।

এখন দেখা যাক্, ভাষার পরিবর্ত্তন হয় কেন? এমন এক যুগ ছিল যখন ইংরেজী ভাষা আমাদের দেশে জানা ছিল না। তখন লোকে কোনও বিষয়ে অগ্রাহ্যভাব জ্ঞাপন-কালে বলিত, "আমি গ্রাহ্য করি না"; কিন্তু এখন একেবারে অশিক্ষিত লোকের মুখেও শুনিতে পাই, "আমি কেয়ার করি না।" এমন কি শিশুর আধো আধো ভাষায়ও শোনা গিয়াছে, "আমি কেয়াল্ কলি না।" অবশ্য 'গ্রাহ্য করি না' এ কথা কেহই বলে না, তাহা নহে, কিন্তু 'কেয়ার' কথাটি শতকরা ৭০ জন বা ততোধিক লোক ব্যবহার করিয়া থাকে। এইরূপ অনেক বিদেশী কথা বাঙ্‌লা ভাষায় স্বাভা-বিকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। কেন এরূপ হয়? লোকে 'গ্রাহ্য করি না' না বলিয়া 'কেয়ার করি না' বলে কেন? ইহার উত্তর, "ঐরূপ বলা তাহার পক্ষে সুবিধাজনক"। ভাষা ভাব প্রকাশ করে। যত সহজে লোকে মনের ভাব

ব্যক্ত করিতে পারে, তাহাই চেষ্টা করে। জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত উপায়ও বৃদ্ধি হয়, যদ্দ্বারা ভাষা সরল হয়। এই সহজে উচ্চারণ করিবার চেষ্টাই ভাষার পরিবর্ত্তন-শীলতার মূলীভূত কারণ।

দেখা গিয়াছে বিশেষ বিশেষ ভাষায় বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারিত হয় না। ফুসফুস হইতে যে বাতাস বাহির হয় তাহাই দন্ত, তালু, ওষ্ঠ ইত্যাদিতে ধাক্কা খাইয়া শব্দের সৃষ্টি করে। পাইলে (Dr. Peile) বলেন

"Speech is the expression of thought by the instrumentality of a succession of sounds; and those sounds are produced by a current of air passing from the top of the wind-pipe, and modified in different ways by the speech-organs—the uvula (i.e., the soft palate which is movable at the back of the mouth), the tongue, the teeth, and the lips This current of air is the material of speech."

মূর্দ্ধা, তালু, জিহ্বা, দন্ত ও ওষ্ঠ এই কয়টি বাক্‌যন্ত্রের কাহারও হয় ত এক বা অধিক এমন বিকল যে সেই সেই স্থানের উচ্চারণ তাঁহার হয়ই না অথবা বিকৃতভাবে হয়। কেহ কেহ তালব্য 'শ'কে দন্ত্য 'স'এর মত উচ্চারণ করেন; 'ড়'কে 'র'এর ন্যায় এবং 'র'কে 'ড়'এর ন্যায় উচ্চারণ করার উদাহরণ বিরল নহে। 'বায়ু'কে 'বাউ', 'মায়া'কে 'মাআ', 'দয়া'কে 'দআ' উচ্চারণ করিতেও শুনিয়াছি। কেহ কেহ একেবারে বোবা হয়। আবার সদন্ত মুখের উচ্চারণ অনেক স্থলে অদন্ত মুখের উচ্চারণ হইতে বিভিন্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোনও বিশেষ একটা ধ্বনি যে সকলেই একই-প্রকারে উচ্চারণ করে, তাহা নহে। সেইরূপ কোন কোন দেশের লোক হয়ত কোন বিশেষ বিশেষ ধ্বনি উচ্চারণই করিতে পারেন না; যদিও সেই ধ্বনি সকল-স্থানেই silent বা উহা নহে, তথাপি তাঁহারা কোন স্থানেই উহা উচ্চারণ করিতে পারেন না। ফরাসীরা 'র' অক্ষরটির ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারেন না, যদিও এরূপ বলা ভুল যে 'র' ধ্বনি ফরাসী ভাষায় একেবারে অনুচ্চারিত। আমি জনৈক ফরাশী রমণীর মুখে শুনিয়াছিলাম,—Fenchmen can pronounce no a's, but in French all a's a p'onouncible (Frenchmen can pronounce no r's, but in French all r's are pronouncible)। ব্যবহার দ্বারা এইরূপ দোষ ক্রমশঃ দাঁড়াইয়া যায়। ইংরিজীতে 'h'এর ধ্বনি অনেক স্থলে নাই, যথা though, dough, bough, brought। কোন কোন স্থলে 'ফ'এর ন্যায়,—laugh, cough trough। আবার 'Edinbur h'তে 'gh'এর একটি নূতন ধ্বনি লক্ষিত হয়। বাঙ্‌লার 'দ' ও 'খ' ধ্বনি, জার্ম্মান ও ফরাশীরা উচ্চারণ করেন না। এইরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

আবার দেখা যায় একই ধ্বনি (sound) ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমরা কেহ কেহ 'জিজ্ঞাসা' স্থলে 'জিজ্ঞাহা' বলি; সখি—সই কোনখানে—কোঁহানে; আবার রাধিকার অপর নাম 'রাই'। Old English 'isen' আধুনিক 'iron', সেইরূপ 'ast' হইতে 'art'। ফরাশী ভাষাতে 'ক'এর ধ্বনি 'শ'এর মত হয়; লাটিন *camera* হইতে ফরাশী *chambre*; এদিকে ইংরিজীতে 'bench,' 'bank' হইতে। 'স'এর ধ্বনি গ্রীকে একরূপ নাই; লাটিনে প্রায় 'র'এর ধ্বনিতে পরিণত হয়।

'কবুলি' 'কবুলুম' 'মরলি' 'মরলুম' না বলিয়া. কল্লি কল্লুম মল্লি মল্লুম্ এইরূপই বলিয়া থাকি। 'বিড়াল' কোথাও কোথাও 'বিলাই' 'বিল্লি' নামে সুপরিচিত। এ-সকল স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী ধ্বনি পরবর্ত্তী ধ্বনির কবলে পড়িয়া, কথার রূপান্তর ঘটাইয়াছে। ইংরিজীতে 'woman' কথাটি, Anglo-Saxon, *wif-man*, উহা হইতে 'wimman' হইয়া 'woman' দাঁড়াইয়াছে। 'Feet' কথাটি, Anglo-saxon, *foti*; যখন 'ō' উচ্চারণ করা যাইতেছে তখন হইতেই একটা প্রচ্ছন্ন জ্ঞান আছে যে শীঘ্রই 'i' উচ্চারণ করিতে হইবে; এইরূপে 'ō,' 'i'এর কবলে পড়িয়া, নিজে ত মারা গেলই, উপরন্তু 'ō' 'i'এর অস্তিত্ব লোপ করিল; মানুষ 'fōti' বলিতে 'feet' বলিল। 'Clothes' কথাটির 's'এর উচ্চারণ 'z'এর ন্যায়।

প্রায়ই তাড়াতাড়ি উচ্চারণের ফলে কথা রূপান্তরিত হয়। 'Station,' 'stocking,' 'school,' 'Star Theatre,' বাঙ্‌লায় 'ইষ্টিশান' 'এষ্টাকিং' 'ইস্কুল' 'এষ্টার থিয়েটারে' দাঁড়াইয়াছে। লাটিন *schola* হইতে ফরাশী ecole; ইংরিজীতে 'special' -'especial,' 'state'

estate' দুই রকমই চলে। এরূপ দেখা গিয়াছে কেহ কেহ পূর্ব্বে স্বরবর্ণ উচ্চারণ না করিয়া, st অথবা ষ্ট কথার পূর্ব্বে উচ্চারণ করিতে পারেন না। এইরূপ রূপান্তরের ইংরিজীতে একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। আমরা জানি warrant,' 'guarantee'; 'ward' 'guard'; 'wise' guise' এইরূপ কতকগুলি একার্থবোধক ও প্রায় একাকৃতি যুগ্ম কথা আছে। সকল আসল কথার পূর্ব্বে 'w' ও তাহাদের রূপান্তরিত কথাগুলির পূর্ব্বে gu আছে। W-পূর্ব্ব কথাগুলি টিউটনিক। এখন 'warrant' কথাটি লওয়া যাক্। যখন ফ্রাঙ্করা ফ্রান্সে আসে তখন তাহাদের সঙ্গে warrant' কথাটিও আসে। কিন্তু তখনকার ফরাশীরা 'w' উচ্চারণ করিতে না পারায়, কথাটির পূর্ব্বে একটি 'g'এর ধ্বনি আসিয়া পড়ে। সুতরাং warrant কথাটি ফরাশীরা 'gu' উপসর্গ-পূর্ব্ব করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই 'gu' উপসর্গ-পূর্ব্ব কথাগুলি আবার নরম্যান-ফ্রেঞ্চরা একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই ইংলণ্ডে লইয়া আসেন। এদিকে টিউটন-আনীত 'warrant' কথাটি ইংলণ্ডে পূর্ব্ব হইতেই ছিল; এখন নরম্যান আনীত 'guarantee'ও চলিতে লাগিল, এইরূপে দুইটি কথাই ইংরিজী শব্দ সমাজে স্থান পাইয়াছে। সেইরূপ 'ward' guard,' 'wise' 'guise'ও চলিয়াছে।

আর একপ্রকার অতি প্রচলিত রীতি দেখা যায়। প্রত্যেক বর্ণের একটিবিশেষ উচ্চারণ-স্থান আছে। এখন কোন কথা উচ্চারণ করিতে একটি বর্ণ হইতে আর-একটি বর্ণে যাইতে, মধ্যে একটি তৃতীয় বর্ণ আপনিই আসিয়া যাইতে পারে। সংস্কৃতভাষায় 'র'জাত বিসর্গ ও 'স'জাত বিসর্গের উদাহরণ আমরা জানি। 'পুনরাগমনং' কথাতে 'র' ছিল না; 'পুনঃ' এবং 'আগমনং' এই দুইটি কথা একত্রে উচ্চারণ করিতে গেলে মধ্যে একটি 'র' আপনা হইতেই আসিবে; সুতরাং হইল 'পুনরাগমনং'; 'নমস্কারঃ', 'পুরস্কারঃ' 'তিরস্কারঃ', 'স'জাত বিসর্গের ঐরূপ উদাহরণ। আবার 'নিশ্চন্দ্রঃ', 'বহুষ্টঙ্কারঃ', প্রভৃতি ঐ রীতিমূলক। বাঙলায় 'বহুষ্টঙ্কার' কথাটি চলে। 'জায়া' ও 'পতি' এই দুইটি কথার মিলনে হইয়াছে 'দম্পতী'। ইংরিজীতে 'passenger' ও 'messenger' বাস্তবিক 'passager' ও 'message',

কিন্তু উচ্চারণকালে মধ্যে 'n'এর আগম হইয়া উহারা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আবার 'humble' 'humilis' হইতে, 'chamber', 'camera' হইতে। এই নিয়মে অনুনাসিক ছাড়া অন্য শব্দও আসে—যেমন বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ হইতে দেখান হইয়াছে। ইংরিজীতে আবার 'thunder', 'thunor' হইতে, 'corporal' 'caporal' হইতে; এই দুই স্থানে অনুনাসিকের চিহ্ন নাই।

কথার শেষে কোন বর্ণের অনিমন্ত্রিত ভাবে আগমন ভাষায় প্রচুর দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ কাবুলিওয়ালার মুখে বলাইয়াছেন, "গোখি, সোশুর বাড়ী যাবিস"। এখানে কাবুলিওয়ালার অদ্ভুত বাঙ্লা-জ্ঞান যে 'স'টাকে আহ্বান করিয়া, 'যাবি'র পরে জুড়িয়া দিয়াছে তাহা আমরা বুঝিয়াছি; কিন্তু কত সহজে 'স'টা ওস্থানে আসিতে পারে তাহাও আমরা বুঝি। সেইরূপ ইংরিজীতে 'ancient'এর শেষে 't' ছিলনা, 'whist' ও 'amongst'এর 't'ও অধিকন্তু। 'Sound', 'sonus' হইতে।

আবার 'নূতন', 'নতুন', 'box,' 'বাস্ক', 'tax,' 'টেসক'; 'desk', 'ডেস্ক' ইত্যাদি স্থলে বর্ণের স্থান-বিনিময়ও দেখা যায়। ইংরেজী 'bird,' 'bridde' হইতে; 'third,' 'thridde' হইতে; 'ask,' 'axe' হইতে।

এইরূপ নানাপ্রকারের পরিবর্ত্তনের উদাহরণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান নিবন্ধে কেবলমাত্র কয়েকটি খুব প্রচলিত উদাহরণই দেওয়া গেল। এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটি মজার রীতির কথা বলিব। বঙ্কিমবাবুর 'ইষ্টিরসে'র ঔষধ 'কেষ্টরস' বাজারে চলে কি না জানি না; কিন্তু 'বেলের চারা'র (Blister বেলেস্তরা) কথা শুনিয়াছি। আবার রসভরি (raspberry), ও ইষ্টাবড়ি (strawberry) শৈল-প্রবাসী বাঙালীরা খাইয়া থাকেন।

এইবার 'বাঙ্লা' হইতে দুই একটি বিশেষ বিশেষ উদাহরণ লওয়া যাক। (১) বাঙ্গালা, (২) বাঙ্গলা, (৩) বাঙ্লা, (৪) বাংগলা, ও (৫) বাংলা—এই কয়টিতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। কোনটা ঠিক? এখন দেখা যাক, এই পাঁচ দাবীদারের কাহার কিরূপ দাবী, কোন্ দাবীর জোরই বা কতদূর।

কথাটা যাহাই হোক, 'বঙ্গ' হইতে আসিয়াছে। বঙ্গ শব্দের বর্ণ-বিচ্ছেদ করিলে এইরূপ পাই—ব্+অ+ঙ্+গ্+অ। এবং

(১) বাঙ্গালা=ব্+আ+ঙ্+গ্+আ+ল্+আ।
(২) বাঙ্গলা=ব্+আ+ঙ্+গ্+অ+ল্+আ।
(৩) বাঙ্লা=ব্+আ+ঙ্+ল্+আ।
(৪) বাংগলা=ব্+আ+ং+গ্+অ+ল্+আ।
(৫) বাংলা=ব্+আ+ং+ল্+আ।

এই পাঁচটির মধ্যে গোলমাল ঐ মাঝখানটা লইয়া—'ব+আ' আগে ও 'ল+আ' পরে, এটা সকলেই চায়। এখন দেখা যাক্ আমাদের 'বঙ্গ' মাঝের কোনটিকে আমল দেন।

এই পাঁচজনের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথমটি 'আ'র দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু 'আ'এর দাবী আমরা কি করিয়া স্বীকার করি? 'বঙ্গ'তে ত 'আ'র নামগন্ধ নাই; আবার আমরা ভাষার নামটি যেরূপে উচ্চারণ করি তাহাতেও 'আ' নাই। সুতরাং মাঝ হইতে 'আ'কে কেন বসিতে দিব,—তাহাতে কতকটা নিশ্বাস খরচ বই লাভ কিছুই নাই। পাণিনির 'অদর্শনং লোপঃ' সূত্রটি যথার্থই এস্থলে প্রযুজ্য। সুতরাং 'বাঙ্গালা'কে আমরা ধুলোপায়ে বিদায় দিই।

এইবার 'ং'এর দুইজন দাবীদারকে লইয়া পড়া যাক্। চতুর্থ চা'ন—'ং+গ্+অ'; অ'এর দাবী পাকা হইয়া গিয়াছে; বাকী রহিলেন, 'ং+গ্'। 'গ', 'বঙ্গ' হইতে পাই, কিন্তু অনুস্বার ত পাই না—'ঙ্' পাই বটে। 'ঙ্' আর 'ং' কি এক জিনিস? 'ঙ'র উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূলে, 'ং'এর নাসিকা। বানান যেরূপেই করি না, কথাটা উচ্চারণ আমরা কখনই নাসিকা দিয়া করি না, জিহ্বামূলের দ্বারাই করি। সুতরাং ক্ষমতাসত্ত্বেও কথাটা বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করায় লাভ নাই। সুতরাং 'বাংগলা' ও 'বাংলা' আমরা পরিবর্জ্জন করিলাম।

বাকী পড়িলেন, 'বাঙ্গলা' ও 'বাঙ্লা'। বানান হিসাবে দেখিতে গেলে 'বাঙ্গলা'ই ঠিক; কিন্তু উচ্চারণ-হিসাবে 'বাঙ্লা'ই দাঁড়ায়। যদি 'অদর্শনং লোপঃ' মানা যায়, তাহা হইলে 'বাঙলা' কথাটাই চলা উচিত—কেননা আমরা 'গ'এর উচ্চারণ করি না। যাহা হউক 'বাঙ্গলা' তবু চলে; তবে লেখা ও কথা দুয়েতেই যদি 'বাঙ্লা' চলে, তাতেই বা দোষ কি? বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ছন্দের উদাহরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন, যে 'বাঙ্গলা' অচল, 'বাঙলা' চলাই উচিত।

'ইঙ্রেজ', 'ইঙ্গরেজ' ও 'ইংরেজ', এই তিনের কাহারও পক্ষে রায় দিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে কথাটার উৎপত্তি কোথায়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে ও ষষ্ঠ-শতাব্দীর প্রথমে টিউটন আক্রমণের ফলস্বরূপ গ্রেটব্রীটেনে স্যাক্সন ও অ্যাঙ্গল্‌সদের প্রভুত্ব হয়। স্যাক্সনরা উক্ত-দ্বীপের দক্ষিণাংশ ভোগ করিতে লাগিলেন; অ্যাঙ্গল্‌সরা মধ্যাংশ উত্তরাংশ ও বর্ত্তমান স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশে রাজত্ব করেন; অধিকন্তু অ্যাঙ্গল্‌সরা স্যাকসন অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিলেন। পরে যখন নবম শতাব্দীতে দুই জাতি মিলিত হন তখন অপেক্ষাকৃত অধিক-সংখ্যক, অতএব অধিকতর পরাক্রমশালী জাতির নামেই, মিলিত জাতির ও ভাষার নামকরণ হইল—Englise.

কথাটা যদি Englise হইতে হয়, তাহা হইলে বাঙলায় ইংরিজী *ng*'র ধ্বনিমূলক অক্ষর বসাইতে হইবে। মরিস (Dr. Morris) বলেন, *ng*'র উচ্চারণ-স্থান 'root of tongue and soft palate' যথা *King*—অর্থাৎ অনুনাসিক। এখন সংস্কৃত তথা বাঙলা ভাষায় অনুনাসিক বর্ণ 'ং'। সুতরাং 'ইংরেজ'এর বেলায় 'ং' সমীচীন বলিয়া মনে হয়। যদিও ঙ, ঞ, ণ, ন, ম কখন কখন নাসিকাতেও উচ্চারিত হয়, সত্য, তথাপি এস্থলে 'ং' অবলম্বন করাই উচিত মনে হয়। যাঁহাদের মতে 'ইংরেজ', ফরাসী 'Anglais' হইতে, সেইজন্য 'আঙ্রেজ'ই ঠিক উচ্চারণ, তাঁহারা 'ঙ' অনুনাসিক ধরিয়া, 'আঙ্রেজ' বিশুদ্ধ বলিতে পারেন। তবে কথাটা বাস্তবিক 'Anglais' হইতে না 'Englise' হইতে? অন্ততঃ বাঙালীরা 'Englise' (English) হইতে আনিয়াছে, বোধ হয়, কারণ আমরা 'ইংরেজ'ই বলিয়া থাকি। তবে কথাটা 'Anglais' হইতে আসুক বা 'Englise' হইতে আসুক, এবং 'আঙরেজ'ই হোক বা ইংরেজই হোক, 'ইংরাজ' নহে। 'আ' কোথা থেকে পাই।

"বাঙলায় বিসর্গ বর্জ্জনের প্রস্তাব-সম্বন্ধে কিছু বলিয়া অদ্য

এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বিসর্গ ত নিজেই আশ্রয়-স্থানভাগী, সুতরাং উহাকে বিদায় করিতে এত ক্লেশ কেন? উহাকে বলিলেই হইল, "বাপু, পথ দেখ, এখানে আর পোষাচ্ছে না।" মোটকথা যেখানে বিসর্গ উচ্চারণই করি না, এবং করিবার সামান্যমাত্র প্রয়োজন হয় না, সেখানে ঐ বিসর্গকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখায়, কথার চেহারার সৌষ্ঠবসাধন ভিন্ন অন্য লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীঅজরনাথ ঘোষ।

ব্যবধান

(গল্প)

(১)

তনপুরুষের জমাখরচের খাতার পুরাতন দপ্তরগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলে পঞ্চোপচারেও কার্ত্তিকপূজার একখানি ফর্দ্দ মিলিবে না, ফটিকচাঁদ এমন বংশের বংশধর। এই ন বরপণের উচ্ছেদসাধনে কতকগুলা লোক উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, ছত্রপুরের অধিকারী-বংশের ফটিকচাঁদের পিতা কিষণচাঁদ তাহাদের মতের অনুকূলেও নাই, প্রতিকূলেও নাই। তবে ইহা স্থির যে, ফটিকচাঁদের বিবাহের সময়ে বরপণের উচ্ছেদসাধনে কেহ সাহায্যপ্রার্থী হইলে কিষণচাঁদ আর কিছু না হউক, পরের বাড়ী হইতে একছিলিম তামাক চাহিয়া-আনিয়া, নিজেই সাজিয়া, দুইটান দিয়া বা না দিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে ধূমপান করাইয়া সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে বিরত হইতেন না। তিনটি কন্যার বিবাহে প্রায় তিনসহস্র রজতখণ্ড গণিয়া লইয়া কিষণচাঁদ তিনজন ব্রাহ্মণের গলদেশে যে ঋণের ভার চাপাইয়া দিয়াছেন, সে-সকল কথা এখন বলে কে? কিন্তু ফটিকচাঁদের বিবাহে তাঁহাকে সর্ব্বসাকল্যে সাতশত তেরটাকা সাড়ে চৌদ্দআনা ব্যয় বা অপব্যয় করিতে হইয়াছে। সাতবৎসর পূর্ব্বের কথা হইলেও, এখনও এমন দিন নাই, যে-দিন উহার জন্য তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ না করেন। যতই দিন যাইতেছে, এই দীর্ঘশ্বাস ব্যাপারটা সঞ্চিত ব্যাধির মতই বাড়িয়া উঠিতেছে। সাত কুড়ি, তাহার উপর কত—এতটাকা ব্যয় করিয়া একটা পরের মেয়ের ভরণপোষণের ভার তাঁহাকে লইতে হইয়াছে। একটা লোকের পেটে কম লাগে না। সেটা বরং সহ্য করা যায়; কিন্তু যাহার জন্য যাহা, তাহা যে চাই! বধূমাতার বয়স কম নহে,—প্রায় বিশ বৎসর। দেখা গিয়াছে, এ-বয়সের কত মেয়ে তিনচারিটি কন্যারত্নের জননী হইয়াছেন। কিষণচাঁদের অদৃষ্টে কিন্তু সে গুড়ে বালি! অধিকন্তু ফটিকের তিন বৎসরের পুত্রটি কি একটা গলগ্রহ! এতখানি বয়স হইল, এখনও সে ভাত খাইতে চাহে না। দুধের দর কম নহে, আবার ছেলেটা খায় অনেকখানি। এই সকল কথা ভাবিতে গেলে আফিংএর মাত্রা চড়াইতে হয়, তাহাতেও আবার দুধের খরচ। ভুলিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও ভুলিতে পারা যায় না। ছেলেটা যখন-তখন আসিয়া কোলে বসে, পিঠে উঠে, আবার বলে কি না, "দা, দা, দা-মশাই!" উৎপীড়ন আর কাহাকে বলে?

দিন-দিন ছেলেটার দৌরাত্ম্য বাড়িয়া উঠিল। সকালে উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া কিষণচাদ হুঁকায় জল ফিরাইতেছেন, ওদিকে হতভাগা ছেলে এত সকালেই উঠিয়া তাহার তামাকটুকতে বেশ করিয়া মাটি মিশাইয়া রাখিয়াছে। স্নানের পর পরকালের সদ্গতির জন্য একমনে কিছুক্ষণ ধ্যান করিবার সময়েও কোন-কোন দিন ছেলেটা কোথায় হইতে ছুটিয়া আসিয়া কিষণচাঁদের গলা জড়াইয়া-ধরিয়া ডাকে, "দা-মশাই!" সে ডাকে ধ্যান ভাঙে। আহারের সময়ে সে দাদা মহাশয়ের আসনের চারিদিকে লাফাইয়া-ঝাঁপাইয়া খেলা করে। জননীর নিষেধ সে মানে না, ধমক দিলে কাঁদিয়া উঠে। আহারের পর দরজায় বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে সংসারচিন্তায় নিমগ্ন হইবার উপায় নাই। চিন্তাটা বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিয়াছে আর কি, এমন সময়ে খোকা হাজির! সুতরাং খোকাকে দূরে রাখিলেও যখন দূরে রাখা যায় না, তখন তাহাকেই দূরে থাকিতে হয়। কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণার শরীরে, সংসারচিন্তায় হাবুডুবু খাইয়া মানুষ কতক্ষণ বাহিরে-বাহিরে থাকিতে পারে? বিশেষতঃ বাঁচিবার সঙ্গী, মনের মানুষ, কিষণচাঁদের সে-গামে খুবই কম।

ত্ষ্ণবতী গাভীর লাথি বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু দম্মের ষাঁড়ের ফোঁস-ফোঁসানিতে কাহার গাত্র জ্বালা না করে? যাহার কাছে কিষণচাঁদ কোনরূপ লাভের আশা করেন না, অধিকন্তু ক্ষতির আশঙ্কা তেমনি, কিরূপে সেই অকাল-

কুষ্মাণ্ড পৌত্রটার অশেষবিধ উপদ্রব সহ্য করিয়া, তাহার উপর তিনি স্নেহরস দরদর ধারায় ঢালিয়া দিতে পারেন ?

কিষণচাঁদ পৌত্রের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার ক্রোধ ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। সে-ক্রোধের অগ্নিশিখা ক্রমে পুত্র ও পুত্রবধূকে স্পর্শ করিল।

(২)

কিষণচাঁদ কতদিন ধরিয়া পুত্রকে বলিয়া আসিতেছেন, "বাপু হে, দিন-কাল যেমন পড়েছে, তা'তে দিন চালান ভার হয়ে উঠছে। দিন দিন খরচ বাড়ছে বৈ ত কমছে না।" কথাটা ঠিক, ফটিকচাঁদ তাহা বুঝে, এখানে-ওখানে সে একটা কাজকর্ম্ম জুটাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এ-বাজারে চাকরী দুষ্প্রাপ্য, চাকুরে সস্তা! যদি-বা কোন উপায়ে কোন জমিদারের ঘরে মাসিক পাঁচটাকা বেতনের একটা গোমস্তা-গিরি খালি হইল, যদি-বা নায়েব-খাতাঞ্চীর বাসায় ছুটাছুটি করিয়া, অনেক সাধ্য-সাধনায় চাকরিটি স্থির হইল, কিন্তু তাহার পর জমিদারের আদেশ—নগদ হাজার মজুত চাই,—তখনই চক্ষু স্থির! এতটাকা সে কোথায় পাইবে! কিষণচাঁদ ইচ্ছা করিলে টাকা দিতে পারেন বটে, কিন্তু এ-রকম ইচ্ছাই যে তাহার হইবে না। ঘরের পয়সা পরের হাতে দিবার যুক্তিই বা কে মরীয়া হইয়া তাঁহাকে দান করিতে অগ্রসর হইবে ?

এইরূপ ক্ষেত্রে যেটুকু গোলযোগ হওয়া সম্ভব, কিষণচাঁদের সংসারে তাহা পূর্ণমাত্রায় চলিল। "না বাছা, ছেলেটার জালায় আমার সন্ধ্যা-আহ্নিক মাথায় উঠেছে, আটকিয়ে রেখো একটু।" বিরক্তিব্যঞ্জক সুরে শ্বশুরের এইভাবের আদেশ শুনিয়া-শুনিয়া বধূ অচলা চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর নিভৃত দরবারে নালিশ রুজু করিয়াও সে একটা আশার কথা শুনিতে পায় না। ফটিকচাঁদ যাহা মন্তব্য প্রকাশ করে, তাহাতে পিতৃবাক্যেরই সমর্থন বুঝায়। কিন্তু উপায় কি? অচলা একাধারে সেই সংসারের বধূ ও গৃহিণী। ঝাঁট দেওয়া হইতে বৃদ্ধ শ্বশুরের-জন্য পান ছেঁচিয়া রাখা পর্য্যন্ত গৃহস্থালির সকল কাজ তাহার হাতে। খাটিয়া-খাটিয়া মাথা ধরিলেও, মাথায় কাপড় জড়াইয়াও তাহাকে খাটিতে হয়। তাহার উপর সে কোন্ সময়ে ছেলেটাকে আটকাইয়া রাখিবে? নিতান্ত বিরক্ত হইলে সে ছেলেকে দুই এক ঘা মারে। সে বেদনা ছেলে ভুলিলেও সে ভুলিতে পারে না। সে-আঘাতের শব্দটুকু তাহার কানের ভিতর দিবারাত্রি ঘুরে।

এত করিয়াও শ্বশুরের মন উঠে না, স্বামীর সমবেদনা প্রকাশ পায় না। ছেলেটার স্বভাবের পরিবর্ত্তনও ঘটে না। সংসারের গোলযোগ ক্রমেই পাকিয়া উঠিল।

বাড়ীর মধ্যে তিনটি লোক—কিষণচাঁদ, ফটিকচাঁদ ও অচলা—তিনটি গোটা মানুষ, আর ছেলেটা ফাউ। ফাউ ছাড়িয়া ও ধরিয়া, ঐ তিনটি বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে তিনটি মতের সৃষ্টি হইল। কিষণচাঁদ ছেলেটির বিপক্ষে, অচলা স্বপক্ষে, আর ফটিকচাঁদ দুইপক্ষে অর্থাৎ নিরপেক্ষ। দুইটি বিরোধী মত উপস্থিত হইলে, যে নিরপেক্ষ তাহার মাথার উপর দিয়া যত ঝড় বহিয়া যায়। নিরপেক্ষের দোষ না থাকিলেও দোষ এই যে, সে ইহাকে এবং উহাকে—কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না। ফলে, শক্তি না থাকিলে দুইদিকের চাপে হয় তাহাকে একদিকের মতের জালে জড়াইয়া পড়িতে হয়, নতুবা একদম গা-ঢাকা দিতে পারিলেই তাহার নিষ্কৃতি।

কিন্তু নিষ্কৃতি চাহিলেই পাওয়া যায় না। সন্তানের মায়া অপেক্ষা অর্থের মায়াই যাহার কাছে প্রবল, ভরণ-পোষণের-জন্য এমন পিতার উপর নির্ভর করিতে হইলে, অসমর্থ পুত্রের পক্ষে সেই পিতার ন্যায়-অন্যায় বিচার করা চলে না। এইজন্যই ফটিকচাঁদ পিতার সমক্ষে পুত্রের সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু তাহার অন্তরের মাঝে অশান্তির যে আগুন অহরহ জ্বলে, তাহার পরিচয় ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কে জানিবে? ভবিষ্যৎ-চিন্তাপরায়ণ পিতার শাসনবাক্য, স্ত্রীর অভিযোগ-অনুযোগ, পুত্রের আবদার-অভিমান সমানভাবে সহ্য করিয়া চলিয়াও, সংসার-ফসলের ক্ষেতে সে নিজেকে আগাছার মতই ভাবে। আগাছার মতই সে যেন বাড়ীখানার মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল, সুদূরদেশের কৃষক আসিয়া মূলচ্ছেদন না করিলে যেন তাহার মুক্তি নাই!

তথাপি এই কঠোর বন্ধন শীঘ্রই কাটিল। কিষণচাঁদ আফিংএর মাত্রা চড়াইয়া শেষে একদিন ফটিককে বলি-

লেন, "বৌমাকে কিছুদিনের জন্যে তাঁর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আর তুমি বিদেশে গিয়ে একটা চাকরির চেষ্টা দেখ। সংসারের খরচপত্র চালান আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।"

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ফটিক উত্তর দিল, "বেশ, আজই।"

পুত্রের অভিমান পিতা বুঝিলেন না। পুত্রও বুঝিল না, উত্তর যত সহজে দেওয়া যায়, সেই-মত কার্য্য করা তত সহজ নহে। সহজ না হইলেও, নিভৃত পল্লীর আওতায় বাড়িয়াও, বাহিরে আসিয়া জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে সে আজ প্রস্তুত।

(৩)

বেলা আর বেশি নাই। কিষণচাঁদ দরজায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। চিন্তার আতিশয্যে, ভাবের আবেশে এক-একবার তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। প্রাঙ্গণে ডুলি সাজাইয়া বেহারারা তাঁহার প্রসাদী কলিকার অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সে-আশা বৃথা। খোকা তাহার মামার বাড়ীর দেওয়া পূর্ব্ববৎসরের স্মৃতার খাটো মলিন পোষাক পরিয়া ডুলিতে উঠিতে ব্যস্ত। ডুলির মধ্যে মায়ের কোলে বসিয়া, মুখখানি বাহির করিয়া বলিল, "দা-মশাই, তুমি এসো।" দাদামহাশয়ের কর্ণরন্ধ্রে খোকার কথা প্রবেশ করিলেও তিনি তাহার উত্তর দেওয়া সমীচীন বোধ করিলেন না। একবার উর্দ্ধে চাহিয়া, হাই তুলিয়া, তুড়ি দিতে দিতে তিনি আপন মনে বলিলেন "দুর্গা—শ্রীহরি!" বেহারারা ডুলি উঠাইয়া চলিল।

কিছুক্ষণ পরে ফটিক বিদায়ের সাজে বাহিরে আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিল। কিষণচাঁদ পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একদিনে দুইদিকে দুইজনের যাওয়া শাস্ত্রের নিষেধ—অগস্ত্য যাত্রার দোষ ঘটবে। আচ্ছা পাঁজিখানা নিয়ে এসো, দেখি একবার। দেখা যাক্ চন্দ্রশুদ্ধি হচ্ছে কি না।"

ফটিক মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "দিনক্ষণ দেখবার আর প্রয়োজন নাই।"

কিষণচাঁদ রুষ্ট হইলেন; বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "নাই ত নাই। আমরাও এককালে বাপের ছেলে ছিলাম হে বাপু; তোমাদের মত অল্প বয়সেই সবজান্তা হই নাই।"

ফটিক পূর্ব্ববৎ নম্রভাবে বলিল, "বেলা যাচ্ছে, তবে যাই।"

কিষণচাঁদ স্বর অধিকতর চড়াইয়া বলিলেন, "বেশ ত, নিষেধ করছে কে তোমাকে?" তাহার পর কিছু শান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তবে, হ্যাঁ, একটা কথা হচ্ছে, সব জিনিসের বাজারদর যেমন চড়ে উঠেছে, তাতে আমার পক্ষে সংসার-চালান কঠিন। চাকরীর চেষ্টায় চললে, আমার আশীর্ব্বাদে চাকরি তোমার একটা হবেই হবে। হ্যাঁ, চাকরি অবশ্যই হবে। টাকাকড়ি যেন ঠিকমত পাঠান হয় বাপু।"

ফটিক নীরব।

কিষণচাঁদ আবার বলিতে লাগিলেন, "যে কষ্টে তোকে মানুষ করেছি ফটিক, সে-সব কথা তোর মা আজ বেঁচে থাকলে শুনতে পেতিস। তিনি স্বর্গে গিয়েছেন, আমিও কিছু বেশী দিন থাকছি না। সংসারে কেমন একটা বিতেষ্টা জন্মে গিয়েছে। যদি কিছু রেখে যেতে পারি, সেটা তোরই থাকবে, বাবা! টাকাকড়ি পাঠাতে যেন গোলযোগ করিস না। আমি তোকে বড় কষ্টে মানুষ করেছি রে!"—

কিষণচাঁদের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি কাপড়ের খুঁট নাকে লাগাইয়া সজোরে নাক ঝাড়িলেন। একটা শব্দ হইল মাত্র। কয়েকবার দ্রুততালে আঁখিপল্লব সঞ্চালন করিলেন, কিন্তু তাহা কোন মতেই অশ্রুসিক্ত হইল না।

ফটিক আর-একবার পিতাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

একমনে বসিয়া তামাক টানিতে-টানিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কিষণচাঁদ নিরাশার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া আপন মনে বলিলেন, "বুঝেছি, এ-সব বৌমার কীর্ত্তি, ছেলে ত আমার এমন ছিল না! বৌমার কুচক্রে পড়ে শেষে কি আমি এই বয়সে ছেলের সাহায্য পর্য্যন্ত পাব না!" আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তিনি বলিলেন, "জগদম্বা, সকলি তোমার ইচ্ছা মা!" তাহার পর খড়ম পায়ে খট্ খট্ শব্দে বড় ঘরের দাবায় উঠিলেন। সে-দিন সায়ংসন্ধ্যা শিকায় উঠিল। চালের বাতায় কাগজে-মোড়া যে তামাকটুকু ছিল,

তাহা পাড়িয়া, মোটা এক ছিলুম তামাক সাজিলেন। তাহার পর চকমকি ঠুকিয়া, শোলা ধরাইয়া, আগুন করিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে লাগিলেন।

আজ আর খোকা নাই; কোন উপদ্রবই নাই। গাঢ় স্তব্ধতায় বাড়ীখানি আজ শান্ত। রাত্রির অন্ধকার সে-স্তব্ধতা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কত রকম উৎকট চিন্তার ঢেউ কিষণচাঁদের মগজের মধ্যে খেলিয়া গেল। পুত্রের অবাধ্যতা,—বধূর কুচক্র, পৌত্রের উপদ্রব—সকল-রকম চিন্তার পর ক্ষুধার তাড়নায় পেট জ্বলিয়া উঠিল; তখন তাঁহার মনে হইল—তাই ত সবাই চলিয়া গেল, এখন ভাতজলের ব্যবস্থা করে কে?—

তাহার পর কিষণচাঁদ প্রদীপ জ্বালিলেন, হাঁড়ি হইতে কাঁসার একটা বড় বাটিতে একসের আন্দাজ মুড়ি ঢালিয়া জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। কলসীতে জল ছিল। গ্লাসে জল ঢালিয়া জলযোগের পূর্ব্বে গলাটা একবার ভিজাইয়া লইলেন। উদর ঠাণ্ডা হইলে তাঁহার মনে পড়িল—বড় মেয়ে কুমুদকামিনী কতকাল আসে নাই। মেয়েটার শ্বশুর বিবাহের সময়ে অনেকগুলি টাকা দিয়াছিল; তাহার সুদও তিনি বেশ দু'পয়সা পাইয়াছেন; সেই বেশ কথা।...

এতক্ষণের পর কিষণচাঁদের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর বড় রকমের একটা ঢেকুর তুলিয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন।

(৪)

অচলার পিতা ধ্বজাধারী চক্রবর্ত্তী কন্যার বিবাহের সময়ে বৈবাহিকের কাছে নগদ পাঁচশত টাকা গণিয়া লইয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তীর অবস্থা বেশ, দুইখানি লাঙ্গলের চাষ। কন্যার বিবাহে তিনি পণ পাইয়াছিলেন স্বভাবে, অভাবে নহে। ও-বংশে ঐ প্রথা বল্লালীপ্রথাকে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া কতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। পাঁচ-জন এক স্থানে বসিয়া কন্যাপণের কথা তুলিলে কিষণচাঁদ কোন-একটা কাজের অছিলায় সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ধ্বজাধারী এ-রকম লজ্জার ধার ধারেন না। কন্যা-পণের কথা উঠিলে তিনি চীৎকার করিয়া বলেন, "বাপু হে, মা-বাপের কাছে ছেলে ও মেয়ে দুই সমান। ততদিন বেঁচে থাকলে শেষ বয়সে ছেলের সাহায্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু একটা ছেলেকে মানুষ করতে ঢের কাঠখড়ি পোড়ে। ছেলের পড়ার খরচ বলেই হোক বা আর কিছু বলেই হোক, তার বিয়েতে যদি টাকা নিতে হয়, তবে মেয়ের বিয়েতেই বা ফাঁকি পড়া যায় কেন? আট-দশ-বার বছর একটা মেয়ে পুষতেও টাকার ঘণ্ট! বিয়ে দিয়ে তাকে যখন একটা সংসারে দাসী ক'রে দিলাম, তখন তার পণটাই বা ছাড়ি কেন? তোমরা ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা নিও না, ব্যস্, আমিও মেয়ের বিয়েতে এক পয়সা নেব না। যদি নিই, আমি চণ্ডাল!"—ইহার উপর আর উত্তর চলে না। বাবুলহাটির ব্রাহ্মণসমাজের নেতারা বুঝিয়াছেন, 'শাস্ত্র মানে না, যুক্তি বুঝে না' এ-রকম দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণকে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে গেলে, সমাজের আচার-নিয়মগুলা, বিশেষতঃ বল্লালসেনের প্রথাটার তলদেশ পাছে ফাঁসিয়া যায়! সুতরাং ধ্বজাধারী চক্রবর্ত্তী সে-গ্রামে কুলীন-ব্রাহ্মণগণের সহিত সমান প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

বহুকালের অভ্যাস—ধ্বজাধারী সন্ধ্যার পর রাত্রি-ভোজনের পূর্ব্বে একটি ছিলুম গাঁজা খান। আবশ্যক বোধ করিলে, অর্থাৎ শরীরটা কোন দিন মেজমেজে গোছের হইলে, সে-দিন অতিরিক্ত একছিলুম গাঁজা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিঃশেষ করেন। কথাটা বাড়ীর সকলেই জানে, বাহিরের কেহ জানে না, এমন কথা হলপ লইয়া বলা যায় না।

* * * *

রাত্রি প্রায় দশটা। আহারের ডাক পুনঃপুনঃ উপেক্ষা করিয়া ধ্বজাধারী অল্পে-অল্পে গাঁজার ধূম গিলিতেছেন, এমন সময়ে গৃহিণী দুয়ারের কাছে আসিয়া জানাইলেন, "অচলা এসেছে।"

নিশ্চিন্তভাবে ধ্বজাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অচলা কে?"

গৃহিণী বলিলেন, "অচলাকে চেনো না, তুমি তার এমনি বাপই বটে! ভাত খাবে ত এসো।"

কিছুক্ষণ ঝিমাইয়া ধ্বজাধারী বলিতে লাগিলেন, "এঃ, কিষণচাঁদ অধিকারী ভারি চালাক দেখছি! আমি ত অচলাকে নিয়ে আসতে লোক পাঠাই নাই, তবে সে আসে কেন? অধিকারীই বা তাকে পাঠায় কেন?"—

কিন্তু ধ্বজাধারীর কথা শুনিবার জন্য তাঁহার গৃহিণী

অপেক্ষা করেন নাই। তিনি তখন বাড়ীর মধ্যে গিয়া অচলার খোকাকে কোলে লইয়া সোহাগ করিতেছিলেন।

কলিকায় 'শেষটান' দিয়া ধ্বজাধারী বাড়ীর মধ্যে গেলেন। অচলা তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি সে-দিকে লক্ষ্য না করিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলে কার? অচলার বুঝি? অচলা কই?" তাহার পর অচলার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "ও—কখন এলি? ভাল ছিলি? বেশ, বেশ। অধিকারী দেখছি ভারি চালাক!"

"দেখছ না, মেয়েটার কেমন চেহারা হয়েছে! ডুব্বচ্ছর বলে অচলাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

গৃহিণীর কথায় বাধা দিয়া ধ্বজাধারী বলিলেন, 'এঃ ডুব্বচ্ছর? যত ডুব্বচ্ছর সেই ভেড়ের ভেড়ের! আর আমার ভারি সুবচ্ছর, কেমন? আচ্ছা দেখা যাবে, সে কেমন অধিকারী। ধ্বজাধারী তাকে একহাত না দেখিয়ে ছাড়ছে না, তুমি ঠিক জেনো গিন্নি।"

গৃহিণী বলিলেন, "তার ঘরের বৌ, মেয়ে নয় ত, তাই সে ডুব্বচ্ছর বলে অচলাকে বিদেয় দিতে পেরেছে। তুমি কি তা পারতে?"

ধ্বজাধারী রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেন পারব না? সে পারে, আর আমি পারি না!" পরক্ষণেই বলিলেন, "দেখ দেখি, তা ও কি আবার একটা কথা! তাই কি পারা যায়? কখখনো না।"

খোকা দিদিমায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। অচলা তাহাকে শোয়াইবার জন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আহারে বসিয়া ধ্বজাধারী দুই চারিবার বলিলেন, "অধিকারী কিন্তু ভারি চালাক, ভারি ছোট লোক, নয় গিন্নি?"

গৃহিণী সে-কথার উত্তর দিলেন না।

(৫)

পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্রকে বিদায় দিয়া, এবং জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ঘরে আনিয়া, যে অতৃপ্তির ভারে তাঁহার নড়িতে-চড়িতে কষ্ট হইত, সে-ভার কিষণচাঁদ অনেকখানি সরাইয়াছেন। কন্যা কুমুদকামিনী শাকের চড়চড়ি যেমন রাঁধে, এমন ব্যঞ্জন কতকাল খান নাই, একথা তিনি কত লোকের কাছে কতদিন বলিয়াছেন। এখন সংসারের খরচ ঢের কম। খোকার জন্য একসের দুধের রোজ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছে। মাছ কোন দিন এক পয়সার লওয়া হয়, কোন দিন বা হয় না। ইহাতে কিষণচাঁদের তৃপ্তি আসিবে, সেটা কিছু বড় কথা নহে। অধিকন্তু খোকা চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার অবাধ চিন্তায় বাধা দিবার কেহই নাই। সন্ধ্যা-আহ্নিক যথানিয়মে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু ফটিকচাঁদ কোন্ দিন বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে, এতদিন একটা কাজ সে অবশ্যই পাইয়াছে, অথচ এপর্য্যন্ত একটি পয়সাও বাড়ীতে দেয় নাই। ইহাতে তাঁহার মনে কি-আছে-অথচ-কি-নাই গোছের একটা নূতন রকমের চিন্তা গজাইয়া উঠিয়াছে। তবে, আপাততঃ তিনি যে-শান্তিটুকু পাইয়াছেন, ইহাও আবার পূর্ব্বে ছিল না, ইহাই যাহা-কিছু সান্ত্বনার কথা।

কুমুদকামিনীর যত্নে, সেবায়, বিশেষতঃ রন্ধনপটুতায় কয়েকদিনের মধ্যেই কন্যার প্রতি কিষণচাঁদের স্নেহ এতই বাড়িয়া উঠিল যে, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, ঘরের মেয়ে ঘরসংসার যে ভাবে চিনিয়া লইতে পারে, পরের মেয়ে তাহা পারে না। সেই সময়ে হঠাৎ একদিন জামাতা হলধর দেখা দিলেন। দুই, তিন, চারিদিন গেল, জামাতা বাবাজী নড়িতে চাহেন না। অপিচ দুই বেলায় তিনি যে-পরিমাণ অন্নের পাত্র উজাড় করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া কিষণচাঁদ এতই বিচলিত হইলেন যে, কন্যাকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলতে পারিস কুমোদ, হলধর আর ক'দিন এখানে থাকবেন?"

কুমুদ বলিল, "জানি না।"

পরদিন সকালে উঠিয়া মুখ-হাত না ধুইয়াই কিষণচাঁদ পুনরায় কুমুদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জিজ্ঞেস করেছিলি কুমোদ?"

কুমুদ অনিচ্ছার সহিত সংক্ষেপে উত্তর দিল, "না।"

কিষণচাঁদ দাঁত-মুখ খিচাইয়া বলিলেন, "নাঃ!"

"বাবা, সাধে-সাধে বকছেন কেন? আমি ত আসতে চাই নাই।"

"আমি তোমাকে এনেছি, আমার অপরাধ হয়েছে, আমার চোদ্দপুরুষের অপরাধ হয়েছে, স্বীকার করছি। তোমাকে এনেছি বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে এমন সর্ত্ত ত করি নাই যে, তোমার শ্বশুরকুলের যে-কেউ আসবেন,

দশদিন ধরে তাঁর ভাত জোগাতে হবে আমাকে!"—বলিতে বলিতে কাঁধে চাদর ফেলিয়া কিষণচাঁদ বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া আপন মনে হন্‌হন্ করিয়া চলিলেন। পথের ধারে নটবর সিদ্ধান্তবাগীশ দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিষণচাঁদ সে দিকে লক্ষ্য না করিলেও, সিদ্ধান্তবাগীশ ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "ভায়া যে! ঠোক ধরে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

কিষণচাঁদ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, দাদা, তুমিই এর বিচার কর। মেয়েকে দু'দিন ঘরে রাখতে পারা যায়, কিন্তু আমার মত অবস্থার ক'জন ক'দিন জামাই পুষতে পারে হে? আমার খরচ কিসের? ছেলে চাকরি করতে গিয়েছে। বৌমা খোকাকে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়েছেন। এ-সময়ে দেখ দেখি দাদা, হলধর এসে নড়তে চাবে না। কি অন্যায়! বৌমারা বাপের বাড়ীতে আছেন, এই বুঝে ফটিক যদি আমাকে টাকাকড়ি না দেয়, এই চিন্তাই আমার এখন প্রবল। এ-সময়ে মেয়ে-জামাই পুষে হাতির চারা জোগাতে আমি পারি! তুমিই বল ত দাদা।"

ঘটনাটি সিদ্ধান্তবাগীশ সহজেই বুঝিলেন, সংযুক্তি দিলেন, "বৌমাকে ঘরে নিয়ে এসো। বৌমা এখানে থাকলে ফটিক টাকাকড়ি অবশ্যই দিবে। মেয়ে-জামাইকে ঘরে রেখে লাভ কি?"

কিষণচাঁদ প্রসন্নভাবে বলিলেন, "আমি তা-ই মনে করে বেরিয়েছি দাদা।" তাহার পর গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

(৬)

খোকা এখন বেশ আছে। নূতন দাদামহাশয়, তাহার চেয়ে নূতন দিদিমাকে পাইয়া খোকা যে সুখ পাইয়াছে, সে-সুখ পরিণত বয়সে কোন অবস্থাতেই উপভোগ করা যায় না। পূর্ব্বে কথায়-কথায় অচলা তাহাকে ধমক দিত, সে ঠোঁট ফুলাইয়া ভয় দেখাইত, 'বাবাকে বলে দেব।' তাহার পর হয়ত সে-কথা আর তাহার মনে থাকিত না। মনে থাকিলে, বাবাকে বলিয়া হাসি ব্যতীত মাকে শাসন করিবার জন্য আর সে কিছুই আদায় করিতে পারিত না। কিন্তু অচলা এখন তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় যখন-তখন তাড়া দেয় না। তাড়া দিলেও, দিদিমা তাহার পক্ষসমর্থন করেন। এ-দাদামহাশয় সে-দাদামহাশয় অপেক্ষা লোক অনেকগুণে ভাল। "কল্কেটা নিয়ে আয় ত রে খোকা!"—নূতন দাদামহাশয়ের এইরূপ আদেশ পালন করিতেও সে আনন্দবোধ করে। খোকা এখন দুধ ব্যতীত দিদিমায়ের সঙ্গে বসিয়া চারিটি ভাত খায়। সকালে ও বিকালে সে শাদা এনামেলের বাটিতে মুড়ি লইয়া কতক ছড়ায়, কতক খায়। এই ভাবে তাহার দিন চলিয়া যায়।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ধ্বজাধারী গাঁজার কলিকা কুলুঙ্গি হইতে পাড়িয়া সাজিবার জোগাড় করিতেছেন। হাতে কাজ ও মুখে সে-কালের একটা শিবসঙ্গীত চলিতেছে, এমন সময়ে অনতিদূরে পদশব্দ হইল। ধ্বজাধারী চকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেঃ!" আগন্তুক আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বসে আছেন?" আগন্তুককে চিনিতে আর বিলম্ব হইল না,—বৈবাহিক কিষণচাঁদ!

কিষণচাঁদের অপ্রত্যাশিত আগমনে ধ্বজাধারী এতই বিস্মিত হইলেন যে, নিজের দৃষ্টিশক্তির উপর আস্থাস্থাপন করিতে তাঁহার প্রায় পাঁচ মিনিট সময় অতিবাহিত হইল। এতদিন বৈবাহিকের উপর তিনি যে-বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করিতেন, সে-সকল কথা এখন তাঁহার মনেই আসিল না। কুশলসম্ভাষণ করিতেও তিনি ভুলিয়া গেলেন,—বসিতে বলা ত দূরের কথা!

নির্ব্বাক বৈবাহিকের সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিষণচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর সব মঙ্গল ত, বেয়াই মশায়? ফটিকের কোন সংবাদ পেয়েছেন এ-দিকে? বৌমা ভাল আছেন? খোকা আমাকে ভুলে যায় নাই ত?"—

প্রশ্নের পর প্রশ্ন হয়ত আরও দুই চারিটি চলিত। ইতিমধ্যে ধ্বজাধারী নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, কিষণচাঁদের কথায় বাধা দিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "তাই ত, আমি আগে চিনতেই পারি নাই! চিনব আর কি করে? পায়ের ধূলো ত আর গরীবের বাড়ীতে দেন না! বসুন। হ্যাঁ, ফটিক বাবাজীর চিঠি পেয়েছি, ভাল আছেন। কেষ্টপুরে বাসনের একটা গদিতে কাজ পেয়েছেন। কাজটা ভালই। উপরি-পাওনা নাকি মন্দ নাই।"

কিষণচাঁদ বৈবাহিকের পাশে বসিয়া বলিলেন, "বটে! তা কলিকালের ছেলে কিনা বেয়াই, আমাকে একখানা পত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই।...... এই যাঃ! এ-ই যাঃ!"—

কিষণচাঁদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধ্বজাধারীও বিলম্ব না করিয়া দাঁড়াইতে গেলেন। তাঁহার হাত কাঁপিয়া, কলিকাটি মেজের উপর পড়িয়া দুই-আধখান হইল। কাগজে-মোড়া গাঁজার পুরিয়াটি তাঁহার হাত হইতে ছটকাইয়া কিষণচাঁদের পায়ের কাছে পড়িল। কিষণচাঁদ তাহা কুড়াইয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু ধ্বজাধারী এত শীঘ্র উহা কুড়াইয়া লইলেন যে, কিষণচাঁদকে অর্দ্ধপথেই আবার হাত উঠাইয়া লইতে হইল।

কিষণচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা কি ও আফিং বুঝি।"

"হ্যাঁ, না-না, ওটা, ওটা—আপনি ও-রকম করলেন যে! হল কি?"—কথাটা বলিয়াই ধ্বজাধারী গলা ঝাড়িলেন।

"আফিং ফেলে এসেছি যে! কি হবে তবে? সন্ধ্যা হয়েছে, আফিং যে একটু দেখে-শুনে দিতে হচ্ছে।"

"আফিং ত আমরা কেউ খাই না। কি হবে তবে?"

গায়ের চাদরখানার এদিক ওদিক খুঁজিয়া প্রসন্নভাবে কিষণচাঁদ বলিলেন, "থাক, বাঁচা গেল। খুঁটে একটু বাঁধা আছে দেখছি। আমি কিন্তু বেয়াই, আফিং ছাড়া এক পাও চলি না। কি-জানি কোথায় পাওয়া যায় না-যায়।"

ধ্বজাধারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যদি না-ই থাকত, আমি যদিও খাই না, তা হলেও কি কারো কাছ থেকে চেয়ে একটু আফিং পাওয়া যেতো না?"

কিষণচাঁদ বলিলেন, "বটেই ত।" তাহার পর মেজের উপর ভাঙ্গা কলিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওটা কি বেয়াই?"

বিস্ময়ের ভান দেখাইয়া ধ্বজাধারী বলিলেন, "কৈ টা, কোথায়?" তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "ও—আর বলব কি ভাই, রগড়ের কথা, আমাকে তামাক খেতে দেখে আমার খোকা ভায়া বলে কি না, তামাক খাব। পা লেগে কল্কেটা ভেঙ্গে গেল, খোকা ত সকালে উঠেই জুলুম করবে দেখছি!"—কথাসমাপ্তির পূর্ব্বেই ধ্বজাধারী কলিকার ভাঙ্গা অংশগুলি কুড়াইয়া উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

বৈবাহিকের কৈফিয়ৎটা যে ভাসা-ভাসা ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিল, কিষণচাঁদের মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল।

(৭)

তাহার পর উভয়েই গম্ভীর হইলেন। অভ্যস্ত গঞ্জিকা-সেবায় বাধা পাইয়া কিষণচাঁদের পূর্ব্ব-আচরণের কথাগুলা ধ্বজাধারীর মনের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল। কিন্তু কিষণচাঁদের মনে কোন দ্বিধাবোধই ছিল না। আফিংয়ের দলা মুখের মধ্যে রাখিয়া, অল্পে-অল্পে ঢোক গিলিয়া তিনি অদ্ভুতভাবের কতই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; সে স্বপ্নে সুখ ছিল, দুঃখও ছিল, আশা ছিল, নৈরাশ্যও ছিল। সে সকল অবান্তর কথার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আহারে বসিয়া কিষণচাঁদ কথা পাড়িলেন, "বৌমাকে এখানে রাখলে আর আমার চলছে না। বাড়ীতে মেয়ে-জামাই রয়েছে, তারা আর ক'দিন?"

ধ্বজাধারী উপযুক্ত অবসর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাখা যে চলবে না, পাঠাতে বলেছিল কে তবে?"

কিষণচাঁদ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "সেটা কি জানেন, বেয়াই, সেটা হচ্ছে গিয়ে"—

"হচ্ছে টচ্ছে ও-সব বাজে কথা ধ্বজাধারী চক্করবতীর কাছে খাটছে না।" ধ্বজাধারী কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি সোজা মানুষ, সোজা কথা বুঝি, সোজা কথা বলতে আমি গুরুকেও ডরাই না। আসল কথা এই, আপনার মতন লোককে বেয়াই বলে পরিচয় দিতেই আমার লজ্জাবোধ করে। ছ'বচ্ছর বলে ছেলের বৌ, ছেলের ছেলেকে বাড়ী থেকে যে বিদেয় করে দিলেন, সেটা কেমন কথা হল? আমি জায়গা না দিলে তারা দাঁড়াত কোথায়? তবে হ্যাঁ, ফটিককে চিঠি দিলাম, সে মাসের মাস পাঁচটি টাকা দিতে রাজি হল, তাই এখনো আমি আদালতে দাঁড়াই নাই। গিন্নি, চিঠিখানা ভাল করে রেখে দিও, হারায় না যেন। এখন আপনি নিতে এসেছেন। আমি পাঠিয়ে দিয়ে বেকুব হই আর-কি! বলি, দু'দিন পরে যদি আপনি ফের নাতি বৌকে বিদেয় করে দেন, আর তখন যদি ফটিক এদের খোরপোষের ভার নিতে রাজি না-ই হয়, তখন কি আর আমার এই চিঠিখানার কোন দাম থাকবে? সাধে-সাধে কেঁচে গণ্ডুষ করতে যাই কেন? সে-টি হচ্ছে না, অচলাকে আমি আপনার বাড়ীতে পাঠাচ্ছি না।"

পরের বাড়ী বলিয়াই হউক, আর অহিফেনপ্রসাদেই হউক, বৈবাহিকের লম্বা-লম্বা কথাগুলা ভাত-ডালের মতই অতি সহজে হজম করিয়া কিষণচাঁদ সহজ-শান্তস্বরে বলিলেন, "আমার দোষ সবই। জগদম্বা প্রতিকূল হলে এমনটা হয়েই থাকে। সে-সব কথা ছেড়ে দেন। বৌমাকে পাঠাতেই হবে।"

ধ্বজাধারী পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন, "হ-বে-না!"

বৈবাহিকের মেজাজ যেরূপ চড়িয়াছে, তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিতে অধিকক্ষণ লাগিবে না, ভাবিয়া কিষণচাঁদ মুখ চাপিলেন। ইচ্ছা রহিল, সকালে আর একবার কথাটা পাড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সকালে উঠিয়া কিষণচাঁদ কতরকমভাবে বৈবাহিককে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বৈবাহিকের সেই একই উত্তর—হ-বে-না!

সুতরাং কিষণচাঁদ যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই তাঁহাকে ফিরিতে হইল। প্রান্তরে আসিয়া একবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া তিনি আপন-মনে বলিলেন, "হঃ! বাপ থাকল পড়ে, আর শ্বশুর পাচ্ছেন টাকা—মাসে পাঁচ-টা! জগদম্বা, সকলি তোমার ইচ্ছা মা!"

* * *

হলধর শ্বশুরমহাশয়ের মেজাজ বুঝিয়া বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। কুমুদও এ বাড়ীতে আর থাকিতে চাহে না। কিষণচাঁদ ফিরিয়া আসিলে কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, বৌ এলো না?"

অন্য দিন হইলে কিষণচাঁদ হয়ত দাঁত-মুখ খিচাইয়া উঠিতেন, কিন্তু আজ তিনি নূতন রকম চিন্তা মাথায় পুরিয়া নূতন মানুষ হইয়া বাড়ী আসিয়াছেন; সরলভাবে গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক স্বরে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "না।"

কুমুদ বলিল, "উনি বাড়ী যাচ্ছেন, আমি গেলে আপনার ভাত-জলের কি ব্যবস্থা হবে?"

"যা-হয় হবে।"—কথাটা বলিয়াই কিষণচাঁদ হুঁকা-হাতে বাহিরের দরজায় গিয়া বসিলেন।

শ্বশুরমহাশয় সরিয়া গিয়াছেন দেখিয়া হলধর ধীরে ধীরে কুমুদকামিনীর কাছে আসিয়া বলিল, "কেমন, হল ত, না, আর কিছু কথা আছে? গাড়ী তোয়ের, আর কেন, এখন চল।"

কিষণচাঁদ চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, হলধর ও কুমুদ-কামিনী তাঁহার সম্মুখ দিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল,—ধীরে ধীরে গাড়ীখানা তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার পর তিনি আপন-মনে বলিয়া উঠিলেন, "ব্যস, আজ থেকে জানলাম আমার কেউ নাই।"

(৮)

কিষণচাঁদ জোর করিয়া মনকে বুঝাইলেন, "আমার কেউ নাই।" কিন্তু তাঁহার এই দারুণ অভিমানের মধ্যে আগুনের একটা ফুলকি রহিয়াই গেল। প্রতিবেশী রজনী-রায়ের ছেলে হরগোপালের সুখ্যাতি গ্রামের সকলেই করে। হরগোপালের কথা মনে হইলে, তাঁহার মনে পড়ে—তাঁহারও এক ছেলে আছে। ও-পাড়ার বৃদ্ধ যুগল নাপিত সেদিন যখন তাহার পৌত্রকে লইয়া খেলা দিতেছিল, সেই পথ দিয়া যাইবার সময়ে তিনি যে-দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনের মধ্যে একখানা প্রতিচ্ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। গ্রামের মধ্যে সকলের বাড়ীতেই কত লোকজন, নাই কেবল একজনের পাড়ার রামচাঁদের। রামচাঁদের সংসার মন্দ ছিল না। সে একে-একে সকলকে যমের মুখে তুলিয়া দিয়া বৃদ্ধবয়সে বাস্তুভিটাখানি আঁকড়াইয়া-ধরিয়া পড়িয়া আছে। বাস্তবিকই সে বড় দুঃখী,—তাহার কেহই নাই। কিন্তু কিষণচাঁদের অভাব কিসের? ছেলে, মেয়ে, ছেলের ছেলে—তাঁহার কে নাই? তথাপি তিনি রামচাঁদের দোসর হইয়াছেন, কথাটা যখন-তখন তাঁহার মনের মধ্যে চিন্তার একটা বোঝা চাপাইয়া দিত। তন্দ্রার আবেশে তিনি স্বপ্ন দেখিতেন, খোকা বড়ই উপদ্রব করিতেছে, বৌমা একটু হিসাব করিয়া খরচপত্র করিতে জানেন না, ফটিক আর কতকাল বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে! পরক্ষণেই স্বপ্ন ভাঙ্গিলে তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিতেন—কৈ, কেহই নাই, বাড়ীর মধ্যে ঝিঁঝিঁপোকার ঝিঁ-ঝিঁ শব্দ ছাড়া আর কোনই গোলযোগ নাই! প্রতিদিন অপরাহ্নে মধ্যাহ্নভোজ-নের পর তিনি যখন ঘরের দাবায় বসিয়া আলস্যকাতর দেহখানি দেওয়ালে হেলাইয়া, মনে মনে সঞ্চিত অর্থের হিসাব করিতেন, সেই সময়ে "সে-দিন কেমন, ভাবলি না মন, যে-দিন জীবন যাবে রে!" ইত্যাদি কত কথাই এলো-মেলো ভাবে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত।

এইভাবে প্রায় একমাস গেল।

একদিন তাঁহার মাথা ভার হইল, শরীর কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিল, শেষে প্রবল জর আসিল। সারারাত্রি বিছানায় পড়িয়া তিনি ছটফট করিলেন। আঁধার ঘরে তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুর বাহিরে কয়েকজন ভীষণাকৃতি পুরুষ বিছানার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল! তিনি ভয়কম্পিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "ফটিক, ফটিকরে!" অতিকষ্টে চক্ষু মেলিলেন, কিন্তু কিছুই যে দেখা যায় না,—শুধু আঁধার! পাশ ফিরিয়া শুইয়া আবার তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, কিছুক্ষণ পরেই আবার দেখিতে লাগিলেন যেন, খোকা—তাহারই ফটিকের ছেলে—ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কোলের কাছে বসিয়া বলিল, "দা-মশাই কেমন আছ?" তিনি তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া খোকাকে ধরিতে গেলেন! খোকার উপর আর তাহার পূর্ব্বের বিরক্তি নাই। তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া যে-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, খোকা তাহা বুঝিয়াছে, নতুবা সমবেদনার ভাষা তাহাকে কে শিখাইল? কত স্নিগ্ধ, কত মধুর কথাগুলি!

জ্ঞানসঞ্চার হইলে কিষণচাঁদ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, বাহিরের আলো দুয়ারের ফাঁক দিয়া তাহার শয্যায় পড়িয়াছে। বেলা প্রায় দশটা। কিষণচাঁদ একটু সুস্থ হইয়া কোন্ কালের বনাতখানি গায়ে জড়াইয়া, আঙ্গিনায় মাদুর পাতিয়া, আধ-ছায়া-আধ-রৌদ্রে বসিলেন। তখনও উনান পরিষ্কার হয় নাই, ঘরে এতটুকু জল ছিল না। তখনও রামার মায়ের দেখা নাই। রামার মা পর—প্রতিমাসে একটি টাকা লইয়া তবে কাজ করে, কিন্তু যাহারা নিজের, তাহারা এ-সময়ে—এই অসময়ে—কোথায়? কিষণচাঁদ একটা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া আপন-মনে বলিলেন, "আমার কেউ নাই রে!" তাহার পর কি মনে হইল, তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাঠের সিন্দুকটি খুলিয়া টাকার একটি তোড়া বাহির করিয়া গণিতে লাগিলেন,—কুড়ি আর কুড়ি—চল্লিশ, আর দশ—পঞ্চাশ! যতই কঠিন জিনিসে আঘাত করা যায়, শব্দ ততই মিষ্ট হয়, কি সুন্দর জিনিস! কিন্তু আজ যদি আবার জর আসে, সে-জর যদি আরও প্রবল হয়, তবে এই-সব টাকার কাছ হইতে তিনি কতদূরে গিয়া পড়িবেন, ভাবিয়া তাঁহার মাথা ঝিমঝিম করিয়া উঠিল।

বাহিরে রামার মায়ের সাড়া পাওয়া গেল। কিষণচাঁদ তাড়াতাড়ি তোড়ার মধ্যে টাকাগুলি পুরিয়া, সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া দিয়া, তালা লাগাইয়া দুই তিনবার টানিয়া দেখিলেন, তাহার পর রামার মায়ের উদ্দেশে বলিলেন, "কা'ল আমার জর এসেছিল, জান ত বাছা, আজ আসতে এতখানি বেলা করলে, এ-রকম করলে কি আমার চলে?"

রামার মা উত্তর দিল, "না চললে আর কি করব ঠাকুর মশায়? খোকার অসুখ, রোগা ছেলে ফেলে কেমন করে সকালে আসি? অসুবিধে হলে অন্য লোক দেখুন।"

রামার মা বিদায় চাহিলেও কিষণচাঁদ তাহাকে বিদায় দিতে পারিলেন না, বলিলেন, "খোকার অসুখ! খোকা কে? ও—রামার ছেলে বুঝি।" একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "উনোনটা শীগ্‌গীর ধরিয়ে দিয়ে ডাকঘর থেকে দু'পুরিয়ে কুইনাইন এনে দাও। আর, রামাকে একবার ডেকে দিও, একখান গাড়ী চাই। বৌমাকে আনতে আজই রেতে আমাকে যেতে হবে।"

(৯)

আবার সেই পথ। এই পথে আসিয়া একদিন কিষণচাঁদ ধ্বজাধারীর লম্বা-লম্বা কথা শুনিয়া ফিরিয়াছিলেন; আবার আজ! আজ ধ্বজাধারীর কোন রূঢ় কথাতেই তিনি রাগ করিবেন না। আজ তিনি পুত্রবধূ ও পৌত্রকে বাড়ী লইয়া আসিতে চলিয়াছেন। মুখের কথায় ফল না ফলে, ধ্বজাধারীর পা ধরিতেও আজ তিনি প্রস্তুত।

শেষরাত্রে গাড়ী ছাড়িয়া পাঁচক্রোশ পথ চলিতে পরদিন বেলা অনেকখানি হইল। তখনও প্রায় একপোয়া পথ বাকি। সেইখানে গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি তাড়াতাড়ি চলিলেন।

ধ্বজাধারী বৈঠকখানায় গালে হাত দিয়া বসিয়া ছিলেন, বৈবাহিককে দেখিয়া কোন কথাই বলিলেন না।

"ভাল আছেন, বেয়াই মশায়?"—কথাটা বলিয়াই কিষণচাঁদ ধ্বজাধারীর পাশে বসিলেন।

ধ্বজাধারী ব্যাকুলভাবে কিষণচাঁদের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "খোকাকে আর বাঁচাতে পারি না যে

কিষণচাঁদ চঞ্চলভাবে বলিলেন, "সে কি, হ্যাঁ, বলেন কি? হয়েছে কি খোকার?"

ধ্বজাধারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আগে পেটের অসুখ হয়েছিল, তাই থেকে আমাশয়। ওষুধ"—

বাধা দিয়া কিষণচাঁদ বলিলেন, "ওষুধ, ওর ত সুন্দর আছে। গোড়াতেই দিনে দু'তিনবার চুনের জল দিলে কি আর আমাশয়ে দাঁড়াত? হ্যাঁ, তারপর—"

কিষণচাঁদের হাত ছাড়িয়া ধ্বজাধারী বলিলেন, "চুনের জলের ব্যবস্থা আপনি এসে করলেই পারতেন। সে-কথা যাক্। ফটিক বাবাজী কাল এসেছেন। খোকাকে নিয়ে বাড়ীতে সবাই ব্যস্ত,—দিন যায় ত রাত যায় না, রাত যায় ত দিন যায় না।"

কিষণচাঁদ ঘাড় বাঁকাইয়া বিজ্ঞের মত বলিলেন, "তবেই ত বেয়াই, একটা সংবাদ আমাকে দেওয়া উচিত ছিল আপনার। খোকা যে আমার ফটিকচাঁদের ছেলে, বেয়াই! জগদম্বা জানেন, আমার কপালে কত কষ্টই আছে!"

"আমি না-হয় সংবাদ দিই নাই, আপনিও ত খোঁজ নিতে পারতেন এতদিন।"—ধ্বজাধারীর কথার উত্তর আর কিষণচাঁদকে দিতে হইল না। বাড়ীর মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল।—"ওমা, ওগো, কি হল গো, খোকা যে কেমন করছে!......চুপ, চুপ, দেখি: ফটিক, একটু সরে বসো।......মাগো, আমার কি হলো!"—

কিষণচাঁদ ভীতিশুষ্ক কণ্ঠে ডাকিলেন, "বেয়াই মশায়!"

ধ্বজাধারী নীরব,—তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল।

তাহার পর কম্পিতপদে কিষণচাঁদ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মূর্চ্ছিতা অচলার মাথা কোলে রাখিয়া তাহার মাতা কাঁদিতেছেন, আর সেইখানে ফটিক খোকাকে বুকে লইয়া বসিয়া আছে—তাহার চোখে জল নাই, মুখে কথা নাই! কিষণচাঁদ কাঁদিয়া ডাকিলেন, "বাবা ফটিকচাঁদ, ফটিক রে—"

ফটিক উত্তর দিল না, খোকার মৃতদেহ পিতার পায়ের কাছে নামাইয়া ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইল!

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতের বিবাহ-নিয়ম

আমাদের সম্মুখে একটি কুলানুক্রমিক সুগঠিত সমাজ-প্রণালী বিদ্যমান; অতএব, এই সামাজিক দেহ-যন্ত্রের মধ্যে বিবাহের নিয়মরূপ অঙ্গটির সমধিক প্রাধান্য হওয়া উচিত, বাস্তবপক্ষেও তাহাই হইয়াছে। এই প্রাধান্যটা এমন চোখে ঠেকে যে, বিবাহসম্বন্ধীয় নিয়ম ও আটকগুলিই বর্ণভেদ-প্রণালীর সারাংশ বলিয়া পাঠকের সম্মুখে অর্পিত হইয়াছে (১)। ইহা একটা অত্যুক্তি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে নিয়ম যাহাই থাকুক না কেন—বর্ত্তমানে, বহুবিবাহ যে শাস্ত্রানুমোদিত তাহা ভারতবর্ষের বিবাহ-অনুষ্ঠানে স্বীকৃত হইয়াছে। একথা বলিতেছি না যে, ইহার ব্যবহার সর্ব্বত্রই প্রচলিত, অথবা ইহা সচরাচর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দারিদ্র্য উহাতে বাধা দেয়; তা ছাড়া, পাশ্চাত্যের মতামত, একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে, যেন ছাঁকনী-জালের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। কিন্তু, যাই হোক, বহুবিবাহের অস্তিত্বটা, আইনের মধ্যে একান্তভাবেই আছে এবং অনেক সময় ব্যবহারেও উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। তথাপি, কতকগুলি বিশেষ-স্থল ছাড়া,—বর্ণভেদের বিভিন্নরূপ চিত্রিত-করিবার সময়, কোন অসুবিধা না করিয়াও বহুবিবাহ প্রথাটাকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে;—বিশেষত যখন দেখা যায়, প্রথম-বিবাহের উপর একটা বিশেষ রকমের পবিত্রতা আরোপ করা হইয়া থাকে, প্রথম পত্নীর সম্বন্ধে একটা প্রামাণিকতা, একটা উচ্চতর মর্য্যাদা বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে।

এই কথাগুলির সত্যতা যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে, এক্ষণে বর্ণভেদপ্রণালী, বিবাহের উপর যে নিয়ম জারী করিয়াছে সেই নিয়মের সার-কথাটি কি তাহাই খুব একটা উদার-দৃষ্টিতে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

এই নিয়মের একটি যুগলাত্মক দিক্ আছে; ইহা এক পক্ষেই আদেশ-বাচক ও সীমানির্দ্ধারক। এই নিয়মের দ্বারা দুইটি যুগল-চক্র বা গণ্ডী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথম গণ্ডীটি বৃহত্তর, তাহার মধ্যে থাকিয়া বিবাহ করিতে হইবে;

(১) Risley, Ethnographical Glossary P. XLII.

দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, প্রথম গণ্ডীরই অন্তঃপাতী—এই গণ্ডীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। আমাদের বিবাহের নিষিদ্ধ-ধাপগুলা হইতে উক্ত দ্বিতীয় গণ্ডীটি সম্বন্ধে আমরা, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না হউক, কতকটা ধারণা করিতে পারি। প্রথম গণ্ডীর মধ্যে যে-সকল আটক আছে, তাহা অন্তত আইনের হিসাবে, আমাদের নিকট অপরিচিত। এই যুগলাত্মক নিয়মটিকে এইরূপ সূত্রবদ্ধ করা যাইতে পারে:—নিজ বর্ণের মধ্যে বিবাহ করা অবশ্যকর্ত্তব্য এবং স্বগোত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

উক্ত সংজ্ঞার অর্থ যতই বিস্তৃত হউক না কেন, আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে, অনেকগুলি ভাষ্য ও সীমা-নির্দ্দেশক নিয়মের আশ্রয় লইতে হয়। এই শেষ-কয়েক বৎসরের মধ্যে, নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান, এরূপ কতকগুলি পারিভাষিক সংজ্ঞার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা বর্ব্বরভাবাপন্ন হইলেও খুবই সুবিধাজনক এবং ইহারই মধ্যে তাহার ব্যবহার খুবই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমিও এই সংজ্ঞাগুলি এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার জন্য পাঠকের নিকট অনুমতি চাহিতেছি। তাহা হইলে, কতকগুলি গোলমেলে ঘোরাল-পেঁচাল বাক্যের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বিবাহ বদ্ধ রাখিবার প্রথাটিকে "Endogamy" (অন্তর্বিবাহ) এবং একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে বিবাহ করিবার নিয়মটিকে "Exogamy" (বহির্বিবাহ) বলা হইয়া থাকে।

তাই আমাদের মধ্যে কেবল বহির্বিবাহের নিয়মটিই আছে—অর্থাৎ যে নিয়মের দ্বারা, শোণিত সম্পর্কীয় নিকট-আত্মীয়ের কোন-কোন ধাপে বিবাহ নিষিদ্ধ। ইহার বিপরীতে, বর্ণভেদপ্রথার নিয়মটি, জাতের হিসাবে অন্তর্বিবাহের নিয়ম এবং গোত্রের হিসাবে বহির্বিবাহের নিয়ম। সংজ্ঞার্থ অস্পষ্ট হইলেও, নিয়মটি অ-ব্যতিক্রমী। কিন্তু ব্যবহারে ইহার কিরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে, দেখা আবশ্যক।

প্রথম নিয়মটি খুব সাধারণ ধরণের, তথাপি, যাহাকে প্রকৃতপক্ষে জাত বলা যায় সেই জাতের মধ্যে ও শাখা-বংশের (Tribe) মধ্যে, রংএর একটু তারতম্যসহ এই নিয়মটি দেখা দেয়। প্রথম নিয়মটি বেশী কড়াক্কড়, অন্তত, শাখা-বংশের মধ্যে—বর্ণকল্প, মুসলমানদিগের মধ্যে। উহারা সচরাচর অন্তর্বিবাহ-পরায়ণ হইলেও উহাদের অন্তর্বিবাহ নিয়মটা ততটা কড়াক্কড় নহে। বেলুচী ও পাঠানদের মধ্যে শুধু এইটুকু দেখা আবশ্যক যে, কোন সর্দ্দারের পত্নী নিজ শাখা-বংশ হইতেই যেন গৃহীত হয়। (২) পঞ্জাবের গখ্খরেরা অন্য শাখাবংশের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, পক্ষান্তরে আওয়ানেরা নিজ শাখা-বংশের রমণী ছাড়া অন্য বংশের রমণীকে বড় একটা বিবাহ করে না (৩)। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে সীমাপ্রান্তে অবস্থিত—সেই-সকল লোকের মধ্যে,—যেখানে বিদেশীয় উৎপত্তির স্মৃতিটা উদ্বর্ত্তন করিয়াছে। আরও আগে, ভারতবর্ষে, কতকটা জাতের অনুকরণে, মুসলমানেরা সচরাচর এ বিষয়ে খুব কড়াক্কড় ছিল। তাহারা "কফে'র বাহিরে অর্থাৎ নিজ জাতের মুসলমান কর্ত্তৃক অধ্যুষিত কতকগুলা গ্রামের বাহিরে বিবাহ করিত না। (৪) যে সকল শাখা-বংশ অল্প বিস্তর বর্ব্বর, সাধারণের মতে যাহারা আদিম নিবাসী লোক, মোটামুটি তাহারাও বর্ণভেদ প্রথার কাছাকাছি আসিয়াছে। উভয়ই, কতকগুলি বড়-বড় উপবিভাগে প্রায়ই বিভক্ত হইয়া থাকে, একটা সাধারণ নামের আবরণে আচ্ছাদিত হইলেও, উহারা আসলে অতগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাত—যাহাদের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। একজন হিন্দু নিজেই বলিয়াছেন,—"বাঙ্গলার ব্রাহ্মণেরা অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে, বাঙ্গলার কায়স্থেরা অন্য প্রদেশের কায়স্থদের মধ্যে, বাঙ্গলার অন্যান্য জাতেরা, অন্যপ্রদেশের অন্যান্য জাতের মধ্যে বিবাহ করে না"। তাছাড়া, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণসমাজে—রাঢ়ীশ্রেণী বারেন্দ্রশ্রেণী, বৈদিকশ্রেণী, বা দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি হয় না। পূর্ব্ববাঙ্গলায় যাহাদিগের বাস সেই বল্লালসেনী বৈদ্যেরা, পশ্চিম-বাঙ্গলার লক্ষ্মণসেনী বৈদ্যের মধ্যে বিবাহ করে না। এবং চারি শ্রেণীর বাঙ্গালী কায়স্থ আপনাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করে না। হিন্দুস্থানে, কায়স্থের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। উহাদের

(২) Ibbetson 380, 391

(৩) Ibbetson 464, 466

(৪) গুরুপ্রসাদ সেন—Calc-Review July 1870

১২টি বিভাগ। ইহা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। শ্রীযুক্ত নেসফীল্ড যিনি, কেবল ব্যবসায়-ভেদই বর্ণভেদের মূল এই কথা দৃঢ়রূপে সমর্থন করেন—স্বয়ং তিনিও স্বীকার করেন, সমস্ত নামচিহ্নিত জাতই এইরূপে কতকগুলি উপবিভাগে বিভক্ত হয় এবং এই উপবিভাগগুলিও একএকটি স্বতন্ত্র জাত। তিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বরহই বা ছুতার শ্রেণীর মধ্যে ৭টি, কায়স্থদের মধ্যে ১০টি, ছত্রিদের মধ্যে—কৃষক জমিদার-দের মধ্যে ৩০টি, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৪০টি উপবিভাগ আছে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন (৫)। অন্যত্রও এইরূপ। আর বেশী নাম স্তূপাকার করা বাহুল্যমাত্র। যে জাতির লোকেরা আচার ব্যবহারে ও বর্ব্বরতায় আদিমবাসীর আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাদের মধ্যেও এই একই প্রবণতার আধিপত্য দেখা যায়। (৬) স্বল্পাধিক পরিমাণে বিস্তৃত অন্তর্ব্বিবাহ-নিয়মাধীন কতকগুলি দলের আকারে উহারা হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ক্রোড়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে দেখা যায়। রীজলি সাহেব, এই টুকরা-গুলাকে, দলবন্ধনের প্রবর্ত্তক কারণ-অনুসারে কতকগুলি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা:—বিশেষ দেশীয়, ভাষা-সম্বন্ধীয়, স্থানীয়, ব্যবসায়সম্বন্ধীয়, উপবিভাগসম্বন্ধীয়, সমাজ সম্বন্ধীয়। সর্ব্বস্থলেই উহার ব্যবহার এরূপ বিশ্বজনীন ও—এক হিসাবে বলা যায়—"জোর-করিয়া" প্রবর্ত্তিত যে, আমরা কখন-কখন একটা কৃত্রিম সংখ্যার প্রয়োগ দেখিতে পাই। সাত জাতের বিভাগ করা আমার মনে হয় পঞ্জাবে একটা ধরণের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে (৭)। নিয়মটা খুব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; তবে একেবারে অব্যতিক্রমী নহে। যেমন মনে কর, পঞ্জাবের ক্ষত্রীজাত, এই সম্বন্ধে, কতকগুলা জটিল ধরণের সম্মিলিত নিয়মের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। ঐ-সকল নিয়মের দ্বারা উহারা জাতের কোন কোন উপবিভাগের মধ্যে বিবাহ করিতে পারে; অন্য উপবিভাগের মধ্যে পারে না (৮)। রাজপুতানায় বিভিন্ন অধিবাসী লোকের মধ্যে, কতকগুলি শাখা, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করে, পক্ষান্তরে উহারা অন্য শাখাদিগকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। অনেকগুলি অনিয়মের দ্বারা এই নিয়মটি ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—গৌড়-ব্রাহ্মণেরা দিল্লীতে তাগা-ব্রাহ্মণদের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু তাদের স্বজাতীয় লোক, দোয়াব ও রোহিলখণ্ডে এই প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করে (৯)। এই প্রকারের শত শত উদ্ভট প্রথার মধ্যে ইহা একটি। দম্পতীর সাম্য সর্ব্ববাদী-সম্মত হইলেও, অনেক জাতের মধ্যে (তারা নিতান্ত হেয় জাতও নহে) ব্যবহারে অনেকটা নিজের সুবিধামত এই নিয়মের ফের-ফার হইয়া থাকে;—নিম্নতর জাতের রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কতকটা বিশেষ-অবস্থায় পড়িয়া বাধ্য হইয়া এই ব্যাপারটা অনুষ্ঠিত হয়। নীচকুল হইতে পত্নীগ্রহণই এই ব্যাপারের মূল কথা। পুরাকালে যে প্রথাটিকে ততটা কঠোরভাবে দেখা হইত না, ইহা সেই প্রথারই নবপ্রতিষ্ঠা মাত্র।

এই ব্যতিক্রমস্থলগুলি মূলনিয়মকে খণ্ডন করে না। ইহার বিপরীতে, জাতের বা শাখার অন্তর্বিবাহের নিয়মটা একটা স্থায়ী নিয়ম।

এই-নিয়মের "ও-পীঠ" স্বরূপ, গোত্র-মধ্যে বহির্বিবাহের নিয়মটাও গুরুত্বের হিসাবে কিছুমাত্র কম নহে। জাতরূপ বৃহত্তর বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত, বহির্বিবাহরূপ ক্ষুদ্র বৃত্তটির নাম নির্ব্বাচন করা সহজ নহে। উহার চৌহদ্দি সীমার, উহার লাক্ষণিক সংজ্ঞার, উহার বিশেষ বিশেষ নামের কত যে বদল হয় তার ঠিক্ নাই। অথচ জিনিষটার অস্তিত্ব সমভাবেই অথবা প্রায়-সমভাবেই রহিয়াছে; উহার কার্য্যফল সর্ব্বত্রই অনুভূত হইয়া থাকে।

ইহার মধ্যে এত গোলযোগ আছে যে হিন্দু স্মার্ত্ত-বাগীশেরা, একটা প্রণালীবদ্ধ নিয়মশৃঙ্খলা স্থাপন করিবার জন্য এই গোলমেলে নিয়মগুলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে বা প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্যে যে

(৫) Nesfield—Caste System, 192.

(৬) যথা মীনাদিগের ৪ উপবিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য Lyall Asiatic Studies, p. 162; মহার-দিগের সম্বন্ধে মন্তব্য Poona Gazetteer; ইত্যাদি।

(৭) চামারদের মধ্যে, ধানুকদের মধ্যে, ধোবিদের মধ্যে, কাচিদের মধ্যে, ইত্যাদি। Elliot, The Races of the North-West Provinces of India.

(৮) যথা, Elliot. Loc. land. S. V. Bisens.

(৯) Elliot p. 112—গৌতম রাজপুতরাও ঐরূপ—P. 119.

ব্যবহার প্রচলিত তাহারা তাহাই নিয়ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন (১০)। এ সমস্ত সত্ত্বেও, সাধারণ নিয়মটা ঐ জটিলতা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া খুব প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই সাধারণ নিয়মটি এক কথায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে—স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ (১১)। কোন সাধারণ পিতৃপুরুষ হইতে, কোন ঋষি হইতে, পুরোহিত হইতে বা কোন পৌরাণিক সিদ্ধপুরুষ বা মুনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ এক মণ্ডলীকে গোত্র বলা যায়। ইহার সংখ্যা সীমাবদ্ধ;—তাই যাহারা জাত্যংশে একেবারেই পৃথক্, তাহাদের মধ্যেও এই একই গোত্র পরিলক্ষিত হয়, যদিও আমাদের নিকট এই ব্যবস্থাটা তেমন "logical" বা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আসলে "গোত্র"টা ব্রাহ্মণজাতিরই নিজস্ব। এ কথা সত্য—ধর্মব্যবস্থা, এই গোত্রকে অন্য দুই উচ্চ জাতি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যেও প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। একটা কৃত্রিম মূল্য বসাইয়া উহারা আপনাদের সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকে। ঠিক্ যুক্তি-অনুসারে ব্রাহ্মণঋষির বংশধর ব্রাহ্মণ হইবারই কথা। যে-সকল গোষ্ঠী নিজের গোত্র অবগত নহে, তাহারা যেমন জমদগ্নির গোত্রে পরিচিত হয়, সেইরূপ কতকগুলি গোষ্ঠী স্বকীয় পুরোহিতের গোত্র, গুরুর গোত্র, (কাজেকাজেই পরিবর্ত্তনশীল) আপনাদের উপর আরোপ করিয়া থাকে। ইহার কোনটাই 'কাজের কথা" নহে; গম্ভীরভাবে ভাবিবার বিষয় নহে। বস্তুত কতকটা সাধারণ ভাবে, ব্রাহ্মণদিগেরই গোত্র আছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান ও এই নামের স্বল্পবিস্তর সঠিক অনুকরণ, অনেক জাতের মধ্যে—বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণিক নিয়ম-অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে বলিয়া অহঙ্কার করে সেই বণিকশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে; নামটা এত আগে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, যে, অবশেষ অনেকস্থলেই স্বকীয় আদিম অর্থ হইতে উহা দূরে সরিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে, আদমসুমারীর বিবরণে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

(১০) Narain Mandlik, Vyavahara Mayukha.

(১১) "প্রবর" নামক মণ্ডলীর কথা আমি এক্ষণে উল্লেখ করিব না (N-Mandlik যাহার বিষয় বলিয়াছেন)—আসলে উহা গোত্রের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

যাহারা কদাচিৎ হিন্দুধর্ম্ম-কাঠামের অন্তর্গত, সেই সীমান্ত প্রদেশস্থ মুসলমান-শাখাজাতিদের মধ্যে পর্য্যন্ত এই বহির্বিবাহ নিয়মাধীন মণ্ডলী আছে। কখন কখন ইহা খুবই সংযত ও সংকীর্ণ; মুসলমান-লোকের স্বাভাবিক প্রবণতাসত্ত্বেও সর্ব্বত্রই একটা সীমাবদ্ধ শ্রেণী বা থাকের মধ্যে উহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। ব্যতিক্রমস্থল থাকিলেও এত বিরল এবং এরূপ বিশেষ-প্রয়োজনের হেতুনির্দ্দেশে উহা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে যে, উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিলেও চলে (১২)।

এই মণ্ডলীগুলি, অবস্থা ও স্থান-অনুসারে যতই বিভিন্ন নাম গ্রহণ করুক না কেন, সমষ্টির হিসাবে একটা সহজ নামে উহাদের নির্দ্দেশ করা সুবিধাজনক। গোত্র শব্দটিতে এই উদ্দেশ্য রক্ষিত হইতে পারে; কেননা, সব সময় স্পষ্টার্থ না হইলেও পারিভাষিক ভাষায় এই সংজ্ঞাটি গৃহীত হইয়াছে, এবং সচরাচর এই সংজ্ঞাটি খুবই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার আধিপত্য সর্ব্বত্রই প্রবেশ লাভ করিয়াছে; তবে, সর্ব্বত্র ইহার শাসন সমান কড়াক্কড় নহে।

এ-কথা বলা যাইতে পারে, যে-গোত্রের নাম গৃহীত হয় (সুতরাং পিতৃগোত্র) সেই গোত্রের মধ্যে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধে আইনঘটিত বারণগুলা নিঃশেষিত হয় না। সচরাচর নিয়মটি এই—কোন ব্যক্তি স্বীয় মাতৃগোত্রে, কিংবা স্বীয় পিতার মাতৃ-গোত্রে, কখন কখন স্বীয় মাতার মাতৃগোত্রে আর বিবাহ করিতে পারে না (১৩)। মায়ের দিকের যে বহির্বিবাহ-নিয়ম তাহার প্রসর অতীব পরিবর্ত্তনশীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ এরূপ কতকগুলি জাত বা শাখার উল্লেখ করা হয়, যাহাদের মধ্যে, গোত্রের পাশাপাশি ও গোত্রের নীচে, আরও ছোট ছোট বিভাগ আছে; মনে হয়, ঐ সকল ক্ষুদ্র বিভাগগুলিকে মায়ের দিককার বহি-র্বিবাহনিয়মের কাঠাম-রূপে ব্যবহার করা হয় (১৪)। যাই হোক্, গোত্র-উৎপন্ন বারণ-বাধাগুলি, জটিল আকার ধারণ করিয়া, একটা নিষিদ্ধ ধাপের সোপান প্রস্তুত করে। উহাও আবার জাত-অনুসারে, স্থান-অনুসারে, ও কাল-অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়।

(১২) Risley.

(১৩) Risley.

(১৪) Ibbetson. Elliot Risley

সমস্ত ধরিয়া বলিতে গেলে, আমাদের যে সোপানে বহির্বিবাহ-নিয়মের কতকগুলা উদ্বৃত্ত অংশ থাকিয়া যায়, সেই সোপান অপেক্ষাও উক্ত সোপানের ব্যাপকতা আরও অধিক। যাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "সপিণ্ড" বলে, সেই সপিণ্ড-সম্বন্ধ থাকিলে, বিবাহের পাত্রদিগের মধ্যে বিবাহ চলিতে পারে না। সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ, যদি পুরুষ হয়, তাহা হইলে এই সপিণ্ড-আত্মীয়তার সোপান তিন ধাপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়;—যদি এই পূর্ব্বপুরুষ নারী হয়,—সে স্থলে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে ৬ পুরুষ পর্য্যন্ত, কাহারও কাহারও মতে ৪ পুরুষ পর্য্যন্ত (১৫) এই নিষেধের ধাপ বিস্তৃত। ভাষ্যকারেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এই নিয়মটি, সমস্ত ধরিয়া ২১২১ সম্ভবপর আত্মীয়কে বিবাহের গণ্ডী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। আচারব্যবহারের মধ্যে, ব্যবহার-ভেদের মধ্যে এতই অনিশ্চিততা ও ব্যতিক্রমস্থল আছে যে পণ্ডিতদিগের "চুল-চেরা" সূক্ষ্ম পার্থক্য বিচার করিবার বেশ একটা অবসর হইয়াছে। আমার মনে হয়,—বিশেষজ্ঞ হিন্দুদিগের একটা প্রলোভনের বিষয় হইলেও, উহা আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না। আমরা যে প্রশ্নসমাধানে ব্যাপৃত, তাহার সহিত ইহার পরোক্ষ-সম্বন্ধ মাত্র। জাতের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে,—যে-সাধারণ তথ্য, কৌতূহলজনক তথ্য আমাদের মনে রাখা আবশ্যক সেটি এই:—জাতের বাহিরে বিবাহ করা নিষিদ্ধ; গোত্রের বাহিরে বিবাহ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পিতৃসম্পর্কেই বিবাহের বাধা হয়। মাতৃসম্পর্কের বাধা ততটা নাই। কোন কোন স্থলে, এই বারণ-বাধাগুলা অতীব সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। এমন কতকগুলি জাতের উল্লেখ করা হইয়া থাকে, যাহাদের মধ্যে নারীর দিক্ দিয়া সমুৎপন্ন, (সুদূরবর্ত্তী হইলেও) কোন কোন আত্মীয়, বিবাহের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী না হউক অন্ততঃ বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় (১৬)।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১৫) H. Mayne, Hindu Law and Usage--S. Siromani Commentary on Hindu Law.

(১৬) Lyall, Berar Gazetteer.

এক পুরুষের সহিত অনেক পুরুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ

পুরুষ এক কি অনেক—এই প্রশ্নটির উত্তরে তিন দর্শন তিনরূপ কথা বলে দেখিয়া আমাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ "উহার কোন্ কথাটা সত্য!" আমি তো তিন কথার কোনোটারই মধ্যে সত্য ছাড়া অসত্য দেখিতে পাইতেছি না। সাংখ্যদর্শনের এই যে একটি কথা—যে, পুরুষ অনেক, এ কথা তুমিও বল' - আমিও বলি - সকলেই বলে। পাতঞ্জল-দর্শনের এই যে একটি কথা—যে, পুরুষ অনেক যদিচ, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পরমোৎকৃষ্ট পুরুষ পরমেশ্বর যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্—যিনি সর্ব্বকালেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত—যিনি সকল গুরুর আদি গুরু—তাঁহার সহিত অপর কোনো পুরুষের তুলনাই হয় না; একথাও সর্ব্ববাদিসম্মত। আর বেদান্তদর্শনের এই যে একটি কথা—যে, পুরুষ স্বরূপত একমাত্র অদ্বিতীয়—প্রতিরূপত অনেক, একথাটাও বুঝিয়া দেখিবার বিষয়। কিন্তু আবার এটাও দেখিতেছি যে, তিন দর্শনের ঐ যে তিন কথা উহা কঠোপনিষদের একটিমাত্র কথাতেই পর্য্যাপ্ত। কাজেই বলিতে হয় যে, কঠোপনিষদের সেই একটিমাত্র কথার গুরুত্ব—তিন দর্শনের ফি-তিনটি কথার গুরুত্ব অপেক্ষা তিনগুণ বেশী। আমি তাই বলি যে, তিন দর্শনের তিন কথা স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্—উপনিষদের অ্যাক কথা, কামারের অ্যাক্ ঘা। কঠোপনিষদের সে কথাটি এই:—

নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥

ইহার অর্থ।

নিত্যের যিনি নিত্য, চেতনের যিনি চেতন *, এক যিনি অনেকের কামনার বিষয়সকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা আত্মস্থ দেখেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি—আর কাহারো না।

* শাঙ্কর-ভাষ্যে "নিত্যোনিত্যানাং" এই দুইটি সমাস-বদ্ধ পদের সন্ধিস্থলে একটি লুপ্ত অকার গুঁজিয়া দিয়া উহার অর্থ-ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এইরূপ,—

ইহার টীকা।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "ইন্দ্রিয় এক না অনেক" তবে তাহার সহজ উত্তর এই যে, **এক ইন্দ্রিয়ের** আশ্রয়ে অনেক ইন্দ্রিয় স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং অনেক ইন্দ্রিয় লইয়া **এক ইন্দ্রিয়** সর্ব্বেসর্ব্বা। **এক-ইন্দ্রিয়**—সে মন; **অনেক ইন্দ্রিয়** চক্ষু-শ্রোত্রাদি। তেমনি যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "পুরুষ **এক** না অনেক" তবে তাহার সহজ উত্তর এই যে, **এক পুরুষের** আশ্রয়ে অনেক পুরুষ স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং অনেক পুরুষ লইয়া **এক পুরুষ** সর্ব্বেসর্ব্বা। **এক পুরুষ** তিনি পরমাত্মা; **অনেক পুরুষ** অসংখ্য জীবাত্মা। কিরূপ? না এক সূর্য্যের যেমন অসংখ্য কিরণ,—সেইরূপ। আবার, যেমন **এক ইন্দ্রিয়ের** চেতনপ্রভাবে দশ ইন্দ্রিয় চেতনাবান্, এবং **এক ইন্দ্রিয়ের** ইচ্ছানুসারে দশ ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তমান; তেমনি, **এক পুরুষের** চেতনপ্রভাবে অসংখ্য পুরুষ চেতনাবান্ এবং **এক পুরুষের** ইচ্ছানুসারে অসংখ্য পুরুষ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তমান।

(২) অধ্যাত্ম যোগের ক্রম-পদ্ধতি।

কঠোপনিষদে আছে

"যচ্ছেৎ বাঙ্‌মনসি প্রাজ্ঞস্তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তৎযচ্ছেৎশান্ত আত্মনি॥"

ইহার অর্থ এই :—

প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্যকে মনেতে সঁপিয়া দিবেন; মন'কে জ্ঞানাত্মাতে সঁপিয়া দিবেন, জ্ঞান'কে মহান্ আত্মাতে সঁপিয়া দিবেন, মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মাতে সঁপিয়া দিবেন।

ইহার বাঙ্‌লা অনুবাদ সমেত শাঙ্কর ভাষ্য।

যচ্ছেৎ নিযচ্ছেৎ উপসংহরেৎ প্রাজ্ঞো বিবেকী [প্রাজ্ঞ, কিনা বিবেকী, টানিয়া লইবেন] কিং? [কী টানিয়া লইবেন?] বাক্ বাচং [বাক্য টানিয়া লইবেন] বাগত্রোপলক্ষণার্থা সর্ব্বেষাং ইন্দ্রিয়াণাং [বাক্য এখানে উপলক্ষ মাত্র, বুঝিতে হইবে—শুধু কেবল বাগিন্দ্রিয় নহে পরন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়—দশেন্দ্রিয়]। ক? [ইন্দ্রিয়গণকে টানিয়া লইবেন কোন্ স্থানে?] মনসি [মনের ভিতরে]। তং চ মনো যচ্ছেৎ জ্ঞানে প্রকাশ-স্বরূপে বুদ্ধৌ আত্মনি [সেই মন'কে আবার টানিয়া লইবেন প্রকাশস্বরূপ জ্ঞানাত্মার ভিতরে বা বুদ্ধি-আত্মার ভিতরে]। বুদ্ধির্হি মন-আদি করণানি আপ্নোতি-ইতি আত্মা প্রত্যক্ তেষাং [মন'কে-সুদ্ধ ধরিয়া একাদশ ইন্দ্রিয় বুদ্ধির আশ্রয়াধীন এই অর্থে বুদ্ধি মনঃপ্রভৃতি-ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ আত্মা অর্থাৎ অধ্যাত্মা; তাই শুধু-বুদ্ধি বা শুধু-জ্ঞান না বলিয়া বলা হইয়াছে জ্ঞানাত্মা]। জ্ঞানং বুদ্ধিং আত্মনি মহতি প্রথমজে নিযচ্ছেৎ; প্রথমজবৎ স্বচ্ছস্বভাবকং আত্মানো বিজ্ঞানং আপাদয়েৎ, ইত্যর্থঃ [জ্ঞানকে কিনা বুদ্ধিকে প্রকৃতির প্রথমজাত মহান্ আত্মার ভিতরে টানিয়া লইবেন; অর্থাৎ আপনার বিজ্ঞান'কে প্রথমজাত মহৎ বিজ্ঞানের ন্যায় পরম পরিশুদ্ধ করিয়া গড়িয়া দাঁড় করাইবেন]। তং চ মহান্তং আত্মানং যচ্ছেৎ শান্তে সর্ব্ববিশেষপ্রত্যাস্তমিতরূপে অবিক্রিয়ে সর্ব্বান্তরে সর্ব্ববুদ্ধিপ্রত্যয়-সাক্ষিণি মুখ্যে আত্মনি [আর সেই মহান্ আত্মাকে টানিয়া লইবেন শান্ত নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার সর্ব্বান্তরস্থিত সমস্ত

"নিত্যোঽবিনাশী, অনিত্যানাং বিনাশিনাং" "বিনাশিগণের মধ্যে অবিনাশী"। জিজ্ঞাস্য :—

তবে কি জীবাত্মারা অবিনাশী নহে?

আবার, "চেতনশ্চেতনানাং" ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এইরূপ -

"চেতয়িতৃণাং বৃক্ষাদীনাং প্রাণিনাং অগ্নি-নিমিত্তমিব দাহকত্ব-মনগ্নীনাং উদকাদীনাং আত্মচৈতন্য নিমিত্তমেব চেতয়িতৃত্বং অন্যেষাং" তপ্ত জলের ন্যায় অনগ্নি পদার্থ-সকলের দাহকত্ব যেমন অগ্নিনিমিত্তক, বৃক্ষাদি প্রাণিগণের চেতয়িতৃত্ব তেমনি আত্মচৈতন্য-নিমিত্তক।" জিজ্ঞাস্য :—

তবে কি —জল যেমন অনগ্নি-পদার্থ, বৃক্ষাদি প্রাণিগণ তেমি অচেতন পদার্থ?

তাহা যদি হয় তবে উদ্ধৃত উপনিষদের শ্লোকটিতে "চেতনোঽচেতনানাং" (অর্থাৎ অচেতনের মধ্যে চেতন) না বলিয়া "চেতনশ্চেতনানাং (অর্থাৎ চেতনের চেতন) বলা হইল কেন? কাজেই শঙ্করাচার্য্যের পরিউক্ত কথাগুলিতে আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সায় দিতে পারিতেছি না। আমি উহার অর্থ ব্যাখ্যা করি এইরূপ :— গোড়ায় নিত্য একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা; তাঁহার ইচ্ছাপ্রভাবে সমস্ত জগৎ নিত্য-নিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইতেছে এবং জীবাত্মারা নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া পুরুষার্থ সাধনের পথে নিত্যানিয়ত অগ্রসর হইতেছে। অতএব পরমাত্মা এবং যেমন অবিনাশী, তাঁহার প্রসাদে জীবাত্মারাও তেমনি অবিনাশী। এই অর্থেই পরমাত্মাকে বলা হইয়াছে "নিত্যের নিত্য।" তেমনি আবার গোড়ার চেতন একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা; তাঁহার প্রসাদে জীবাত্মা-সকলও চেতনাবান্। এই অর্থেই পরমাত্মাকে বলা হইয়াছে "চেতনের চেতন।"

বুদ্ধিপ্রত্যয়ের সাক্ষী যিনি মুখ্য আত্মা সেই মুখ্য আত্মার ভিতরে]।

শঙ্করাচার্য্যের এই কথাগুলির কোনো স্থানে কোনো ফাঁটাখোঁচা নাই, উহার আপাদমস্তক নিখুঁত পরিষ্কার। কিন্তু হইলে হইবে কি—শঙ্করাচার্য্যের দুর্দমনীয় হস্ত এক-প্রকার মরণ-কাঠি; তিনি যখনই যে-কোনো উপনিষদ্-বাক্যে হস্তার্পণ করেন, তখনই সেই বাক্যটির মর্ম্মের ভিতরে অদ্বৈতবাদ প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাণবধ করিয়া তবে ছাড়ে। মূল শ্লোকের "যচ্ছেৎ" শব্দটির সোজা অর্থ "বিন্যস্ত করিবে" বা "সঁপিয়া দিবে"; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে শঙ্করাচার্য্য উহার অর্থ করিয়াছেন "উপসংহার করিবে।" এইরূপ অর্থ-করণের ফল হইয়াছে লাভের মধ্যে—মূল শ্লোকের প্রকৃত মন্তব্য কথাটির **প্রলয়ে পর্য্যবসান!** মনে কর—কোনো সাধক অনেক কষ্টে শঙ্করাচার্য্যের ঐ উপদেশ-বাক্যটিকে কার্য্যে ফলাইয়া তুলিলেন;—তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল মনে লয়প্রাপ্ত হইল, মন বুদ্ধিতে লয় প্রাপ্ত হইল, বুদ্ধি মহান্ আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইল, মহান্ আত্মা শান্ত আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইল:—ইতিমধ্যে শঙ্করাচার্য্যের মস্ত একজন শিষ্য আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল এইরূপ:—

প্রশ্ন॥ সবই যদি লয়প্রাপ্ত হইল—অবশিষ্ট রহিল তবে কী?

উত্তর॥ অবশিষ্ট রহিল কেবলমাত্র সেই মুখ্য আত্মা যিনি সমস্ত বুদ্ধিপ্রত্যয়ের সাক্ষীস্বরূপ।

প্রশ্ন॥ এ যাহা তুমি বলিতেছ তাহা আগে বলিলে শোভা পাইত—এখন তাহা বলিয়া কোনো ফল নাই। সিদ্ধিমঞ্চে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সাধকটির বুদ্ধিরও অভাব ছিল না—বুদ্ধিপ্রত্যয়েরও অভাব ছিল না। কিন্তু হায়! এখন আর তাহার বুদ্ধিও নাই—বুদ্ধিপ্রত্যয়ও নাই। আর তার কথাও নাই। এরূপ অবস্থায় "বুদ্ধিপ্রত্যয়ের সাক্ষী" এ কথাটা শিরোনাস্তি-শিরঃপীড়ার ন্যায় অর্থশূন্য।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য নিরুত্তর!

শাঙ্কর-ভাষ্যের উপরি-উক্ত কথাগুলি কষ্টিপাথরে ঘষিয়া দেখিবামাত্র তাহার মধ্য হইতে এইরূপ-যখন গলদ্ বাহির হইয়া পড়িতেছে, তখন কাজেই আমার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাইয়া উপরি-উদ্ধৃত কঠোপনিষদের শ্লোকটির অর্থ ব্যাখ্যা করা ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই। অতএব তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে; কঠোপনিষদের শ্লোকটির সোজা অর্থ এই যে, বাক্যাদি ইন্দ্রিয়গণকে মনের অধীনে সমর্পণ করিবে, মনকে অহঙ্কারাত্মক বুদ্ধির অধীনে সমর্পণ করিবে, অহঙ্কারাত্মক বুদ্ধিকে সত্যাত্মক মহতীবুদ্ধির অধীনে সমর্পণ করিবে, সত্যাত্মক মহতী বুদ্ধিকে আনন্দস্বরূপ শান্ত আত্মার অধীনে সমর্পণ করিবে।

টীকা।

বর্ত্তমান শ্লোকটি কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর ত্রয়োদশ শ্লোক। ইহার কিয়ৎপূর্ব্বে আমি আর-যে দুইটি শ্লোকের সবিস্তরে অর্থব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা ঐ অধ্যায়ের ঐ বল্লীর দশম এবং একাদশ শ্লোক। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, দশম এবং একাদশ শ্লোকদুটির সহিত এবারের ব্যাখ্যাতব্য ত্রয়োদশ শ্লোকটি পুঙ্খানুপুঙ্খ যোগসূত্রে গ্রথিত। এই তিনটি শ্লোকের মধ্য হইতে সার নিষ্কর্ষণ করিয়া আমরা পাইতেছি এই যে, জ্ঞান-সোপানের ধাপ মোটের উপর তিনটি:—

মাঝের ধাপ অহঙ্কারাত্মক বিজ্ঞানাত্মা; নীচের ধাপ মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয়; উপরের ধাপ কী তাহা বলিতেছি। ১০ম ১১শ শ্লোকদুটিতে উপরের ধাপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তিনটি; ১৩শ শ্লোকটিতে দুইটিমাত্র। তিনকে সংক্ষিপ্ত করিয়া যেমন দুই করা হইয়াছে—দুইকে সংক্ষিপ্ত করিয়া, তেমি, এক করিবার পক্ষে আমি কোনো বাধা দেখিতে পাইতেছি না। আমি তাই বলি যে উপরের ধাপ একটিমাত্র;—কি না পরমাত্মা। যথা;—

১০।১১ শ্লোকে	১৩শ শ্লোকে	বর্ত্তমান স্থলে
পুরুষ অব্যক্ত	শান্ত আত্মা	পরমাত্মা
মহান্ আত্মা	মহান্ আত্মা	

এখন দেখিতে হইবে এই যে, অব্যক্তের ওপিঠে যিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত শান্ত আত্মা—অব্যক্তের এপিঠে তিনিই স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ মহান্ আত্মা। আমাদের যেমন জ্ঞানবলক্রিয়া রাত্রিকালে বিশ্রামের আনন্দ-নীড়ে নিলীন হয় এবং প্রাতঃকালে

নবোদ্যমের সহিত স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, পরমাত্মার জ্ঞানবল-ক্রিয়া সেরূপ কালে পরিবর্ত্তিত হয় না। পরমাত্মার জ্ঞানবলক্রিয়াতে বিশ্রামের আনন্দ এবং উদ্যমের স্ফূর্ত্তি দুইই নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়বল্লীর একবিংশতি শ্লোকে তাই বলা হইয়াছে—

"আসীনো দূরংব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" "তিনি স্বস্থানে স্থিত হইয়া দূরে প্রস্থিত হ'ন, শয়ান থাকিয়া সর্ব্বত্র গমন করেন।"

এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, জ্ঞানসোপানের ধাপ মোটের উপর তিনটি; যথা;—মাঝের ধাপ বিজ্ঞানাত্মা বা জীবাত্মা; নীচের ধাপ মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয়; উপরের ধাপ পরমাত্মা। নীচের ধাপ হইতে উপরের ধাপে আরোহণ করিবার ক্রমপদ্ধতি, তেমনি, মোটের উপর দুইটি; যথা;—(১)মনঃপ্রধান ইন্দ্রিয়গণকে জীবাত্মার অধীনে নিয়োজিত করা, এবং (২) জীবাত্মাকে পরমাত্মার অধীনে নিয়োজিত করা। সাধনের এই যে-দুইটি ক্রম-পদ্ধতি—এ দুইটি ক্রমপদ্ধতি সার্ব্বভৌমিক ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়-সে এইরূপ:—

তুমি যদি বল' যে, তোমার পুত্রের উচিত তোমাকে মান্য করা, তবে তাহাতে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, তোমারও উচিত তোমার পিতাকে মান্য করা। তেমনি, জীবাত্মা যদি বলে যে, আমার মনের **আমি** যেমন হিতাকাঙ্ক্ষী এমন আর কেহই নহে, এইজন্য আমার মনের উচিত আমার বশতাপন্ন হওয়া, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, জীবাত্মার নিজেরও উচিত পরমাত্মার বশতাপন্ন হওয়া। একজন তুখোড় বিষয়ী ব্যক্তিকে একথা বলা বাহুল্য যে, সংসারকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে মন'কে অহঙ্কারাত্মক বিষয়বুদ্ধির অধীনে সঁপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি কেবল তাঁহাকে বলিতে চাই এই যে, তাঁহার মন'কে তিনি যেমন অহঙ্কারাত্মক বিষয়-বুদ্ধির বা বিজ্ঞানাত্মার অধীনে সঁপিয়া দিয়াছেন, তেমনি, সেই সঙ্গে আর একটি কার্য্য তাঁহার করা উচিত—অহঙ্কারাত্মক বিষয়বুদ্ধিকে বা বিজ্ঞানাত্মাকে সত্যাত্মক মহতী বুদ্ধির বা মহান্ আত্মার অধীনে সঁপিয়া দেওয়া উচিত; তাহা যতক্ষণ তিনি না-করিতেছেন, ততক্ষণ আমি কিছুতেই বলিতে ছাড়িব না যে, তিনি বৃক্ষের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিতেছেন। ফল কথা এই যে, পুরুষার্থ সাধনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে মনকে বিজ্ঞানাত্মার অধীনে সঁপিয়া দেওয়া **যেমন** আবশ্যক—বিজ্ঞানাত্মাকে পরমাত্মার অধীনে সঁপিয়া দেওয়া **তেমনি** আবশ্যক। সাধনের এই দুই ধাপের **দুই কার্য্য** যিনি একযোগে সমাধা করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন, তিনিই যথাকালে অধ্যাত্মযোগে সিদ্ধিলাভ করেন। গীতাশাস্ত্রে তাই বলা হইয়াছে

"যাঁহার আহারবিহার যোগসঙ্গত, কর্ম্মচেষ্টা যোগসঙ্গত, স্বপ্নজাগরণ যোগসঙ্গত—তাঁহার যোগই সর্ব্বদুঃখের মহৌষধ।"

আমাদের দেশের পরাবিদ্যার জ্ঞানাঙ্গ এবং সাধনাঙ্গের ক্রমপদ্ধতি মোটের উপর এ যাহা আমি প্রদর্শন করিলাম—এখানকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ঋষিরা তাঁহাদের এই বহু যত্নের ধন পরাবিদ্যাটি কোথা হইতে যে পাইলেন, তাহা আমি বলিয়াছি যদিচ ঢের, তথাপি এই স্থানটিতে তাহা আর একবার বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধটির প্রাচ্যখণ্ডের উপসংহার করা শ্রেয় বোধ করিতেছি। সে কথা এই:—

পশুপক্ষীদিগের স্বাভাবিক সংস্কার যেমন তাহাদের সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের পথপ্রদর্শক—মনুষ্যের প্রাণের ভিতর হইতে দেবোন্মুখী প্রার্থনাবাণী যাহা আকাশে উত্থিত হয়, তাহা তেমনি পরাবিদ্যার পথ-প্রদর্শক। ব্রাহ্মণ কুলপতিরা যে-সময়ে যাগযজ্ঞাদির অরণ্যে অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের ব্যথিত অন্তরাত্মা হইতে দেবোন্মুখী প্রার্থনাবাণী আকাশে উত্থিত হইল এইরূপ:—

"অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" "অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে

লইয়া যাও। আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" সত্যের জন্য, আলোকের জন্য, মৃত্যুহীন জীবনের জন্য, পরমাত্মার প্রকাশের জন্য, এবং তাঁহার প্রসন্ন মুখের অভয়রশ্মির জন্য এই যে প্রার্থনাবাণী—যাহা মনুষ্যমনের নিগূঢ় মর্ম্মের ভিতরে সে-যাবৎকাল পর্য্যন্ত চাপা দেওয়া ছিল—সত্যান্বেষী ঋষিদিগের অন্তরাত্মাতে তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল, আর তাহার প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের মনের সমস্ত অন্ধকার ঘুচাইয়া সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের ভাব প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া উঠিল। এইরূপে আমাদের দেশের পুরাতন ঋষিরা অপরাবিদ্যাকে অনেকদূর পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া পরাবিদ্যার মহোচ্চ শিখরে সমুত্থান করিলেন। ইতি প্রাচ্যখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি

অস্কার ওয়াইল্ড্ তাঁহার "De Profundis" বইটিতে এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, বাহিরের সৌন্দর্য্য তাঁহাকে যেমনি মুগ্ধ করুক না কেন, এটা তিনি অনুভব করেন যে সেই সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে একটি spirit, একটি প্রাণ সঙ্গোপনে রহিয়াছে। "The Mystical in Art, the Mystical in life, the Mystical in Nature—this is what I am looking for." আর্টে, জীবনে, বিশ্বপ্রকৃতিতে সেই অতীন্দ্রিয় প্রাণকে তিনি খুঁজিয়া ফিরিতেছেন।

আর্ট আর্টেরই জন্য (Art for art's sake)—সমস্ত জীবনের জন্য নয়—এই কথা বলিয়া যাঁহারা আর্টের চিরপ্রবহমান ধারায় কতগুলি কলাবিধি, কলাপদ্ধতির শক্ত বাঁধ দিয়া আর্টের অন্তর্নিহিত, জীবনের বেগপদার্থটাকে স্থির করিয়া রাখিতে চান, তাঁহাদের দলের একজন পাণ্ডার মুখে উপরের ঐ কথাগুলি কি আশ্চর্য্য নয়?

আর্ট সমস্ত জীবনের প্রকাশ। জীবনের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার প্রসার, জীবনের গভীরতার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার গভীরতা। এইজন্য যে-দেশে, যে-জাতির মধ্যে জীবন বেগবান্, সেই দেশে সেই জাতির মধ্যে আমরা আর্টের নব নব বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। জীবনের আগুনে সেখানকার শিল্পীরা আর্টের নানা ছাঁচ তৈরী করিয়া লইতেছে।

আধুনিক সাহিত্যের কথাই ধরা যাক্। ইউরোপীয় সাহিত্যে রোমান্টিকপর্ব্ব শেষ হইয়াছে এবং বাস্তব (realistic) সাহিত্যের আরম্ভ হইয়াছে শুনিতে পাই। সেইজন্য নাট্যসাহিত্যে দেখি, বাস্তব সামাজিক নাট্য (realistic social drama) যদি সুরু হইল ইব্‌সেনে, তারপর বার্ণাড শ, গল্‌স্‌ওয়ার্দি, ষ্ট্রাইন্‌ড্‌বার্গ, হাউপট্‌ম্যান প্রভৃতি কত কত নাট্যকারের ভিতর দিয়া যে সেই ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার ঠিকানা নাই। এখনকার সামাজিক জীবনের পাক ইব্‌সেনের সামাজিক নাট্যগুলিতে প্রচুর উঠিয়া আসিয়াছে বটে; কিন্তু সেই-সঙ্গে সেই নাট্যগুলির মধ্যে পূর্ণতর সমাজ শতদলের ভাবী বিকাশের একটা অস্ফুট আভাসও যেন আছে। ষ্ট্রাইনড্‌বার্গ প্রভৃতির মধ্যে সেই আভাসটুকু বাদ পড়ায় এবং পাকের পরিমাণ বেশি জমিয়া উঠায়, ষ্টিভেন্‌সনের ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহারা পাঠকদিগকে রাশীকৃত অর্থহীন তথ্যের তলায় চাপা দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই জন্য এই-সকল লেখককে (decadent) অবনতিশীল শ্রেণীর মধ্যে ধরা হইয়া থাকে।

আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, রোমান্টিক পর্ব্ব চুকিয়া গিয়া সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিক পর্ব্বের যে আরম্ভ হইয়াছে, এমন কথা আমি স্বীকার করি না। এখনকার কালের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবন যেমন অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনের মধ্যে সন্ধি করিয়া চলিয়াছে, অথবা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, অতীতকে বর্ত্তমানে সঞ্জীবিত করিয়া বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে,—এখনকার কালের সাহিত্যেও তাহারই অনুরূপ একটা চেষ্টা দেখিতে পাই। ক্লাসিক্যাল, রোমান্টিক—এ-সকল ভেদ আর থাকিতেছে না। গ্রীকদের সাহিত্যের শ্রেণীনির্দ্দেশ, যথা:—Epic, Drama-

ic, Lyric ইত্যাদি, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে মিলিতে চলিয়াছে। শেলির 'প্রমিথিউস্ আন্‌বাউণ্ড' যেমন লিরিক্যাল ড্রামা, ব্রাউনিংএর লিরিক কবিতাগুলি তেমনই ড্রামাটিক্ লিরিক্। এখন আর মহাকাব্যের কাল নাই বটে, কিন্তু এমন এক-একটা আর্টের রূপ মাঝে মাঝে দেখা দেয় যাহার মধ্যে এপিকের রস এপিকের আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ ভাবে এখনকার কালের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে একথা বলা যায়। ভিক্টর হ্যুগোর উপন্যাস অথবা বাল্‌জাকের Comedie Humaine উপন্যাসগুলি, ডষ্টয়ভ্‌স্কির Poor Folk, The Idiot প্রভৃতি উপন্যাসগুলি ফ্রান্স ও রাশিয়ার একালের মহাভাষ্বিত, একথা বলা যাইতে পারে। একালের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, কর্ম্ম—জীবনের কোন দিকই সেই-সকল উপন্যাসে বাদ পড়ে নাই—আদিপর্ব্ব হইতে শান্তিপর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পর্ব্বের কথাই তাহাদের মধ্যে আছে। আধুনিক কোন কোন নাটকের মধ্যেও এই এপিকের রস আছে। লিরিক কবিতার মধ্যেও আছে। সুতরাং গ্রীকদের শ্রেণীভেদ একালে খাটিতেছে না।

যেমন ঐ শ্রেণীভেদ খাটিতেছে না, তেমনি বিশেষ বিশেষ আর্টেও পরস্পরের শ্রেণীভেদও গলিয়া মিলিয়া নানা সঙ্কর শ্রেণীর উৎপত্তি করিতেছে। সুতরাং "আইডিয়ালিষ্টিক্," "রিয়ালিষ্টিক্," "সিম্বলিক্," প্রভৃতি শ্রেণীও একালে পূর্ব্বের মত খাড়া হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। ইহাদেরও জাতিভেদ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবার দিকে চলিয়াছে।

আধুনিক পশ্চিম দেশীয় নাট্যসাহিত্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ ইবসেন হইতে হাউপ্‌টম্যান গল্‌স্‌ওয়ার্দির নাট্যই বুঝি। সেইজন্যই নানা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নাট্যসাহিত্য যে আছে, সে কথা ভুলিয়া বসি। ইব্‌সেন্ হইতে হাউপ্‌টম্যানের পাশাপাশি মেটারলিঙ্কের নাট্য, কেল্টিক দলের ইয়েট্‌স্ প্রভৃতির নাট্য, সিঙ্গের নাট্য, তারপর আধুনিক রুশসাহিত্যে যে-সকল নাটক দেখা দিতেছে, যথা,—লিওনিড্ আ্যান্‌ড্রিভের নাট্য—এ সকল নাট্যও যদি দেখি, তবে আধুনিক নাট্যের রূপ যে কত বিচিত্র তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শেষোক্ত নাট্যগুলি প্রায়ই রূপকজাতীয় বা Symbolical বটে, কিন্তু Symbolical বলিলেও ঠিক্ বলা হয় না। মেটারলিঙ্কের ব্রুবাডের Symbolism আর ইয়েট্‌সের "The Shadowy Waters"এর Symbolism কি এক ধরণের?

সেইজন্য, এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি। কথাটি এই। যে-সকল নাটককে আমরা নিছক বস্তুতন্ত্র বলি, তাহাদের সঙ্গে এই রূপকজাতীয় নাট্যের খুব একটা গুরুতর প্রভেদ আছে বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না। এই কারণে, সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা (Realism) কথাটা ব্যবহার করিলে তাহা যে কি অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহা বোঝা শক্ত হয়। কারণ বস্তুতন্ত্রতার (Realism) রূপ হাজারো রকমের রহিয়াছে। বস্তুটা কি, বস্তু বলিতে কে কি বোঝে, তাহা লইয়াই মতের নানা পার্থক্য আছে। ফরাসী মনীষী বার্গস সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা রূপকজাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। এখানে বোধ হয় তাঁহার কথাগুলি উদ্ধার করা যাইতে পারে।—

তিনি বলিতেছেন, "Could Reality come into direct contact with sense and consciousness, could we enter into immediate communion with things and with ourselves—then we should all be artists. ......Deep in our souls we should hear the uninterrupted melody of our inner life: a music often gay, more often sad, always original. All this is around and within us; yet none of it is distinctly perceived by us. Between nature and ourselves—more, between ourselves and our own consciousness—hangs a veil: a veil dense and opaque for normal men, but thin, almost transparent, for the artist and poet."

অর্থাৎ, বাস্তব জিনিসটা যদি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ এবং চৈতন্যের অব্যবহিত সংস্পর্শে আসিতে পারিত, যদি আমরা আমাদের নিজেদের সত্তার সঙ্গে এবং বস্তুসত্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ লাভ করিতাম—তবে আমরা সকলেই শিল্পী হইতাম। তবে আমার আত্মার গভীরতম স্থলে আমরা আমাদের অন্তরতর জীবনের অনবরুদ্ধ সঙ্গীত শুনিতে পাইতাম—সে সঙ্গীত কখনো আনন্দময়, প্রায়ই

বিষাদপূর্ণ কিন্তু সর্ব্বদাই অনন্যতন্ত্র। এ সমস্তই তো আমাদের চারিদিকে আছে, আমাদের ভিতরে আছে; অথচ কৈ ইহার কিছুই তো স্পষ্ট করিয়া আমরা অনুভব করিতে পারি না। বিশ্বপ্রকৃতি এবং আমাদের মাঝখানে, আমরা এবং আমাদের চৈতন্যের মাঝখানে, একটা অবগুণ্ঠন রহিয়াছে। সাধারণলোকের পক্ষে সেই গুণ্ঠনটি ঘন এবং অস্বচ্ছ; কিন্তু কবি ও শিল্পীর পক্ষে তাহা নিতান্ত লঘু এবং স্বচ্ছপ্রায় হইয়া থাকে।

বার্গস এই যেভাবে সাহিত্যের বাস্তবতা বা বস্তুতন্ত্রতাকে ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেই ভাবেরই অস্পষ্ট অনুভাবের কথা অস্কার ওয়াইল্ডও বলিয়াছেন। "The Mystical in Art" বলিতে এই ভাবের কথাই বোঝায়। এদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মেটারলিঙ্ক বা সিঙ্গ বা লিওনিড্ এন্ড্রিভ বা রবীন্দ্রনাথ মস্ত বড় বস্তুতন্ত্রলেখক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। জোলার বস্তুতন্ত্রতা আর এই বস্তুতন্ত্রতাতে আকাশপাতাল তফাৎ।

মেটারলিঙ্ক তো তাঁহার নাট্যকে অবাস্তব বলিতে মোটেই রাজি নন্। এন্ড্রিভও নন্, রবীন্দ্রনাথও নন্। মেটারলিঙ্কের The Sightless বা The Blue Birdএর সৃষ্ট চরিত্রগুলি যে সাবেক নাট্যের সৃষ্ট চরিত্রের চেয়ে কোন অংশে অবাস্তব একথা তিনি মানেন না। এখনকার মানুষের মনস্তত্ত্বের একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কারণ, সমস্ত জগৎ জুড়িয়া এখন যে মানসিক একটি আব্-হাওয়া তৈরি হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের সঙ্কীর্ণ দেশকালের মধ্যে বদ্ধ আবহাওয়ার সঙ্গে তাহার স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট। তারপর, অধিকাংশ মানুষ আগে যে instinct বা প্রবৃত্তির স্তরে ছিল, যেখানে তাহার রাগ অনুরাগ প্রভৃতি প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের লীলা দেখা যাইত, শেক্সপীয়র প্রভৃতি নাট্যকারেরা তাহাই নাট্যের মধ্যে লীলায়িত করিয়া দেখাইতেন। এখনও অধিকাংশ মানুষ সেই স্তরে থাকিলেও, শিক্ষিত মানুষ যে আর সে স্তরে নাই একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। যৌনপ্রবৃত্তির লীলা দেখাইতে গেলে এখন আর রোমিও জুলিয়েট, এন্টনি ক্লিয়োপ্যাট্রা মিলিলে চলিবেনা। এখনকার কালের মানুষের যৌনপ্রবৃত্তির ভোগলালসার-সঙ্গে-সঙ্গে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবৃত্তি, সমাজ-বোধ অথবা স্বাজাত্যবোধ (social or race consciousness) বিজ্ঞান-চৈতন্য (scientific consciousness) এমন কি হয়ত বা কোথাও কোথাও অধ্যাত্মবোধও জড়িত-মিশ্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার হৃদয়াবেগ রোমিও বা ওথেলো বা এন্টনির মত নয়; তাহা অত্যন্ত জটিল। ডষ্টয়ভস্কির Crime and Punishmentএ একজন খুনীর জীবনচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; অথচ শেষ পর্য্যন্ত সে খুনী, দানব কি দেবতা এ দ্বিধা কোন মতেই ঘুচিতে চায় না। যদি তাহাকে criminal বলি, তবে divine criminal বলিতে হইবে। জর্জ্জমেরেডিথের The Egoist উপন্যাসের নায়ক যে সত্যসত্যই Egoist বা অহঙ্কারী তাহা সে নিজেও জানেনা এবং তাহার নিকটতম লোকেরাও জানেনা। সমস্ত উপন্যাসের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া তাহার চরিত্রের সেই গোপন অংশের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। লিয়রের মত বা ম্যাক্‌বেথের মত সেই চরিত্র সরল একবগ্‌গা চরিত্র নয়। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে সন্দীপ যে ইন্দ্রিয়পর সে কথা যেমন সত্য, তেমনি সে যে যথার্থ স্বদেশবৎসল, ভাবুক এবং বীর সে কথাও তেমনি সত্য। আগেকার নাট্যে উপন্যাসে লেখকেরা যে-সকল simple types লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন, এখনকার নাটকে নভেলে তাহারা অচল। ইব্‌সেনের নাটক The Lady from the Sea, বা মেটারলিঙ্কের নাটক, Monna Vanna বা এদেশের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি বা ঘরে-বাইরের প্রধান নায়িকারা যে অসতী একথা সংস্কারের দিক্ দিয়া যেমন জোরেই বলা যাক, সত্যের দিক্ দিয়া বলিতে গেলে একটুখানি ভাবিতে হয়, সরাসরি 'রায়' দিয়া ফেলা যায় না।

কেবল যে এ কালের জটিল মনস্তত্ত্ব এবং মানসপ্রকৃতির জন্যই এ কালের নাট্যের রূপের বদল হইয়াছে, তাহা নয়। বোধহয় আইডিয়া বা আইডিয়ালিজ্‌ম্ (কোন বিশিষ্ট দার্শনিক অর্থে বলিতেছি না) জিনিসটা আমাদের এখনকার কালের ব্যক্তিত্বের যতটা অঙ্গীভূত অংশীভূত হইয়াছে, ততটা আগেকার কালে ছিল না, কোন কালেই ছিল না। অর্থাৎ আইডিয়াগুলাই এখন মানুষের অনুভূতির, মানুষের রসবোধের জিনিস হইয়াছে। সেইজন্যই যেমন সেকালের আদি, হাস্য, করুণ, প্রভৃতি রস লইয়া কবিদের ও নাট্য-

কারদের কারবার ছিল, তেমনি একালের বিচিত্র বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক নানা আইডিয়া রস হইয়া উঠিয়া এখনকার উপন্যাস-নাট্যের মধ্যে স্থান পাইতেছে। এসকল রসও বস্তু, সুতরাং এ-সকল তত্ত্বরসাত্মক উপন্যাস বা নাট্যকে অবাস্তব বলিবার উপায় নাই। সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার রূপ এখনই যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাই এত বিচিত্র, ভবিষ্যতে আরও কত দাঁড়াইবে তাহা কে বলিতে পারে!

অবশ্য শুধু এ কালেই যে তত্ত্ব রস হইয়া উঠিয়া আর্টের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতেছে, পূর্ব্বকালে করে নাই এমন কথা বলিলে পূর্ব্বকালের প্রতি অবিচার করা হইবে। মহাকবি দান্তের "ভিটা নুওভা" এই শ্রেণীর রচনা; তাহা একাধারে রস এবং তত্ত্বের সম্মিলন। গেটে ও শিলার তাঁহাদের কালের অনেক তত্ত্বকে আর্টে রসরূপ দিয়াছেন। এ কাজ সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া চলিতেছে এবং চিরকালই চলিবে। তবে এখনকার কাল Democratic বা গণতন্ত্রের কাল বলিয়া সাহিত্য অন্যান্য কালের চেয়ে বিশেষভাবে আপন অধিকারের সীমাকে বাড়াইয়া চলিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে Symbolist movement বা এই রূপকনাট্য বা কাব্য বা উপন্যাস রচনার প্রয়াস তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। উইলিয়ম ব্লেক এ কালের "ভিটা নুওভা" লিখিয়াছেন বলিতে পারি; তাঁর প্রসিদ্ধ The Marriage of Heaven and Hellকেই একালের ভিটানুওভা বলা যায়। তাহাও রূপক। বার্গসঁর মত তিনিও বলিয়াছেন—"Cleanse the doors of perception, so that everything may appear as it is—infinite."—চৈতন্যের দরজাগুলি সাফ করিয়া ফেল, যেন বস্তুই যেমনটি আছে তেমনটিই প্রতিভাত হয়—অনন্তরূপে প্রতিভাত হয়। যে বস্তু যেমনটি আছে, তেমনটি তাহাকে দেখিতে গেলে যদি তাহা অনন্ত হয়, তবে তাহাকে বাস্তব বলিব কি না-বলিব তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা। জগদ্বিখ্যাত মনীষী ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয়ের কন্যা প্রতিভাসম্পন্না শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তার "বসন্তপ্রয়াণ" বা "ত্রিবেণীসঙ্গম"ও বাংলাসাহিত্যে এই তত্ত্বরসাত্মক রচনার উদাহরণ। দান্তের কাব্যের মত তাহাও নানা তত্ত্বকে রসরূপ দিয়া আর্টের বস্তু করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং এই ধরণের রস সাহিত্যে চলিবে, অন্যধরণের রস চলিবে না; এমনতর রসশুচিবায়ুগ্রস্ত হইবার কাল এ নয়। অন্য সকল ক্ষেত্রে জড় সংস্কারের অচলায়তন ভাঙিয়া ফেলিব, কেবল সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে সেই পূর্ব্বসংস্কারের অচলায়তনকে পাকা করিয়া রাখিব, এ কথা আর্ট-অচলায়তনের মহাপঞ্চকের দল গালি পাড়িয়া ঘোষণা করিতে থাকিলেও সে অচলায়তন ভাঙিবেই। কারণ যেমন অধ্যাত্মব্যাপারে তেমনি আর্টের ব্যাপারেও

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।"

এ কাল Democratic বা গণতন্ত্রের কাল। সর্ব্বত্রই সকল বিষয়েই নানা পরীক্ষা চলিবে। অতএব যেমন এখনকার কালের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনেক তত্ত্ব রস হইয়া সাহিত্যে আকার লাভ করিতেছে, তেমনি বৈজ্ঞানিক, তেমনি দার্শনিক, তেমনি আধ্যাত্মিক নানা তত্ত্বও রস হইয়া নূতন নূতন আর্টের সৃষ্টি করিতেছে ও করিবে।

মেটারলিঙ্কের মধ্যে বিস্তর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রস হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই-সকল রস প্রকাশ করিবার জন্য নূতন নূতন চরিত্র (types and temperaments) তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। মেটারলিঙ্ক তো স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, এখনও অনেক আইডিয়া আছে যেগুলি অনুভূতি বা রস হয় নাই, অনেক আইডিয়া আছে যেগুলি রস হব-হব করিতেছে ("On their way to becoming sentiments")। তাঁহার মতে যখন বুদ্ধির সঙ্গে সহজ সংস্কারের পূর্ণ মিলন সাধিত হইয়া যাইবে, তখন যে ভবিষ্যৎ নাট্য জন্মলাভ করিবে তাহা তাঁহার ভাষায় "A Theatre of peace and of beauty without tears" অশ্রুপাতহীন শান্তি এবং সৌন্দর্য্যের রঙ্গভূমি হইবে। তাহার কারণ তিনি বলিতেছেন, "A truly illumined consciousness has passions and desires infinitely less exacting, infinitely more pacific, more salutary, more abstract and more generous than an unillumined consciousness"—যথার্থ উদ্ভাসিত চৈতন্যের হৃদয়াবেগ এবং বাসনাগুলি অনুদ্ভাসিত চৈতন্যের হৃদয়াবেগ এবং বাসনাগুলির চেয়ে অনেক কম প্রবল, এবং অনেক বেশি প্রশান্ত, সুস্থ, অতীন্দ্রিয় এবং উদার।

তাহ যদি হয়, তবে এখনকার কালের নাট্যে কিম্বা উপন্যাসে আর সেই-সব প্রবৃত্তির বা instinctএর স্তরের রাগদ্বেষ অভিমানের হানাহানি কাটাকাটির লীলা দেখিতে পাইব না। সে-সব বাস্তব ব্যাপার, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ স্থূল ব্যাপার, অপেক্ষাকৃত সাদাসিধা চরিত্রের খেলা, এখনকার নাটকে মিলিবে না। এখনকার নাট্যে যেখানে রক্ত-মাংসের চেহারাবিশিষ্ট মনুষ্য দেখিব, সেখানেও তাহার জটিলতা অনেক; তাহার মধ্যে নানা বৃত্তির মিশ্রণ দেখিতে পাইব। সুতরাং ঘটনার ভিতর দিয়া সে-সকলের রচনা হইবে না—ঘটনার আড়ালে সেই সব সূক্ষ্ম জটিল মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষ দেখিতে পাইব। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের চেয়ে সেই মানস বৃত্তিগুলার ঘাতপ্রতিঘাত দেখার ঔৎসুক্য কোন মতেই কম নয়।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

"রাজা"

বাংলা সাহিত্যে যে-সকল উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা ও নাটক পড়া যায়, তাহা হইতে বাঙালীপাঠকের মানসিক স্তর নির্ণয় করিবার জন্য কোন গভীর গবেষণার প্রয়োজন মাত্র করে না। আমাদের ডিমাণ্ড অনুসারেই এ-সকল জিনিসের সপ্লাই হয় সত্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত দিনকার শিক্ষাসত্ত্বেও আমরা instinctএর স্তর বেশিদূর পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া উঠিতে পারি নাই। সেইজন্য আমাদের রুচি যথেষ্ট শুচি হয় নাই, রসবোধ যথেষ্ট গভীর হয় নাই। আমরা যে সকল স্থূল, নিম্নপ্রবৃত্তি-ময় জীবনের নিতান্ত নিম্নরসের সৃষ্টি করিতেছি, তাহাও আবার এমনি ছায়া-ছায়া ভাসা-ভাসা ও দুর্ব্বল যে মনে হয় সে-সকল সৃষ্টিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ফল বই আর কিছুই নয়। তাহাদেরও মধ্যে যদি এই শ্রেণীর ফরাসীস্ লেখকদের সজীবতা থাকিত, তবে কথা ছিল না। কবিবর রবীন্দ্রনাথের "রাজা" যে সেই-সকল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টির অন্তর্গত নয়; এ নাটকে যে কতগুলি নিতান্ত স্থূল মানুষের রাগদ্বেষ প্রণয়াদি হাসিকান্নার ব্যাপারের কৃত্রিম উত্তেজনাপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে না; এ যে একেবারেই সেই পুরাণো শ্রেণীর নাটক নয় বরং অত্যন্ত আধুনিক, আধুনিকতম শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সগোত্র; এই কথাগুলি বুঝাইবার জন্যই আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে আধুনিক নাটকের স্বরূপ সম্বন্ধে অত কথার আলোচনা করিয়াছি। আধুনিক নাট্যসাহিত্যের মধ্যে "রাজা" নাটকের স্থান কোথায়, ইহার আর্টরূপের কোন বিশিষ্টতা আছে কি না, ইহার মধ্যে কোন নূতন রস সৃষ্ট হইয়াছে কি না, মানবজীবনের কোন্ অংশকে ইহা উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়াছে, ইহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে কোন নূতনত্ব আছে কি না—এই আলোচনাগুলিতে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আধুনিক নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে গোড়ায় একটু মুখবন্ধ করিয়া লওয়া দরকার বোধ করিয়াছি।

"রাজা" অধ্যাত্মরসের নাট্য—এ নাট্যের অনুরূপ কোন সৃষ্টি সাহিত্যে আছে বলিয়া আমি জানি না। পশ্চিম মহাদেশে থাকিলেও নাটকাকারে নাই, অন্য আকারে আছে। প্রাচীন কালের সেণ্ট অগষ্টিনের Confession বা দান্তের Vita Nuova এবং একালের ব্লেকের The Marriage of Heaven and Hell বা ফ্রান্সিস টম্পসনের The Hound of Heaven, এ-সকলের সঙ্গে এ নাট্যের বিষয়ের কতক কতক সাদৃশ্য আছে। তবে সে সাদৃশ্য কোন কাজেরই নয় এই জন্য যে, সে-সকল গ্রন্থের অধ্যাত্মরসের সঙ্গে এ রসের প্রভেদ যথেষ্ট। শুধু যে ধর্ম্মভেদের জন্য এই ভেদ ঘটিয়াছে তাহা আমি একেবারেই মনে করি না; কারণ ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের মতগত ভেদ যেমনি থাক, অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য সকল দেশের ধর্ম্মসাধনার মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মভেদের জন্য অধ্যাত্মরসের যে ভেদের কথা বলিতেছি তাহা ঘটে নাই। প্রধান যে কারণে ঘটিয়াছে তাহা বলি।

আর্টের সাধনার সঙ্গে অধ্যাত্ম-সাধনার একজায়গায় গুরুতর রকমের প্রভেদ আছে। শিল্পসাধকের কাছে তাহার নিজের বিশেষ রূপটাই বড়; সমস্ত বিশ্বকে সেই রূপের ছাঁচে ঢালাই করিতে পারিলে তবেই তাহার তৃপ্তি। বিশ্ব তার জন্য, সে বিশ্বের জন্য নয়। বিশ্ব তার উপকরণ, সে যেমন খুসি তাহাকে গড়িবে, ভাঙিবে। এইজন্য তাহার কোথাও নিঃশেষে আত্মদান নাই; কেবলি আত্মগ্রহণ আছে। অর্থাৎ

। কেবলি আপনার আধারের মধ্যে বিশ্বকে গ্রহণ করে, শ্বকে বিশেষ করিয়া নয়।

অধ্যাত্মসাধকের পথ একেবারে ইহার উল্টা। তাহার ছে বিশ্বই বড়; আপনাকে সেই বিশ্বের মধ্যে নিঃশেষিত রিতেই তাহার সমস্ত তৃপ্তি। সে বিশ্বের জন্য, বিশ্ব তাঁর গু নয়। বিশ্বরূপের কাছেই তার আত্মদান সম্পূর্ণ হইলেই বেই তাহার সাধনার সম্পূর্ণতা।

তবে সেকালের অধ্যাত্মসাধনার পথ ঠিক এই পথ ন এ কথা বলা যায় না। সে সাধনা প্রধানভাবে বিশ্বের ধ্য বাড়া ছিল না, বিশ্বকে ছাড়া ছিল। আত্মদান এখনর মত তখনও তাহার লক্ষ্য ছিল বটে, কিন্তু সে হয় এক নন্ত, অনধিগম্য, নিরুপাধি ঈশ্বরের কাছে আত্মদান, নয় ক সান্ত, সাকার বিগ্রহের কাছে আত্মদান। সেইজন্যই পের সাধনার সঙ্গে অধ্যাত্ম-সাধনার ভেদ সেকালে লানো শক্ত ছিল। অবশ্য মধ্যযুগে ইউরোপে, কিম্বা দ্ধযুগে ভারতবর্ষে, চীনে এবং জাপানে যেখানে যেখানে ল্প ধর্ম্মের সেবা করিয়াছে দেখা যায়, সেখানে সেখানে ল্পসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনা যে মিলিয়াছে এমন কথা বলা য় না। বরং সেখানে শিল্প নিজের স্বরূপ খর্ব্ব করিয়া শেষভাবে ধর্ম্মশিল্প বা religious art হইয়া উঠিয়াছে, াই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং শিল্প ও শিল্পসাধনা বলিতে মরা এখন যাহা বুঝি, সে-সকল যুগের শিল্প ও শিল্প ধনা একেবারেই তাহা নয়। তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই; র্ম্মের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর মধ্যে তাহাদের সীমা ।। এই কারণেই ধর্ম্মের আধিপত্য ছাড়াইয়া ঠবার জন্য আর্টের প্রাণপণ প্রয়াস হয় এবং মশঃ ধর্ম্ম আর্টকে তাহার স্বতন্ত্রপথে যাইতে না লে, আর্টের রস বিকৃত হইতে থাকে এবং সেই বিকার তখন ধর্ম্মের মধ্যেও বিকার ঘটায়। ইতালীর ং ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের যুগে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ থা গিয়াছে। আর্টের সাধনা এবং অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে পার্থক্য আছে বলিলাম তাহাকে ভুলিতে গেলেই, কোনতকে দুই সাধনাকে এক করিতে গেলেই, ইহারা পরস্পর স্পরকে কাটে।

অথচ একালে আমরা দেখিতেছি যে, এই দুই সাধনার মধ্যে যে একান্ত ভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা থাকিলে তো চলে না। এখন তো আর জীবনকে পায়রার বাসার মত খোপে খোপে ভাগ করিয়া রাখা সম্ভব নয়। জীবন যে এক বস্তু; তাহার মধ্যে এত ভাগ এবং এত ভেদ কেমন করিয়া করা যায়? সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সাধনার ভেদগুলিকে অস্বীকার করিয়া নয়, বরং পুরামাত্রায় মানিয়া লইয়াই দেখিতে হইবে সেই সমস্ত ভেদের মধ্যে অভেদ কোথায়, ঐক্যতত্ত্বটি কোন্‌খানে? সেই ঐক্যতত্ত্বটি যেমনি বাহির হইবে, অমনি তাহার রসও আর্টের ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিবে।

"রাজা" নাটকের নাট্যবস্তু এই রূপের সাধনা এবং অধ্যাত্ম সাধনার ভেদ লইয়া এবং এই ভেদজনিত সংঘাতের উপরেই এই নাটকের পত্তন। সুতরাং এ নাটকে যে-সকল রস ফুটিয়াছে তাহা একেবারে নূতন। এ-সকল রস যেমন নূতন, যে-সকল চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া এই রসগুলি ফুটিয়াছে তাহারাও নূতন। নাটকের প্রধান নায়িকা—সুদর্শনা। রূপের সাধনার যে স্বরূপ বর্ণনা করিলাম তাহাই তাহার চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছে। নাটকের প্রধান পাত্র, ঠাকুরদাদা। অধ্যাত্মসাধনার যে স্বরূপ বর্ণনা করিলাম তাহাই সেই চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আর প্রধান অথচ অদৃশ্য নায়ক স্বয়ং রাজা—তাঁহার সম্বন্ধে পরে কথা হইবে।

নাটকের গল্পটি একটি বৌদ্ধ জাতক হইতে লওয়া হইয়াছে। মূল গল্পটি নাট্যে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা এই:—

এক কুরূপ বা অরূপ রাজা (মানব হিসাবে ধরিলে কুরূপ, ঈশ্বরের হিসাবে ধরিলে অরূপ) তাঁর "সুদর্শনা" রাণীকে এক অন্ধকার ঘরে আনাইয়া সেইখানে প্রত্যহ তাহার সঙ্গে মিলিত হইতেন। তাঁহার প্রতি পরম ভক্তিমতী তাঁহার এক দাসী ছিল, তাহার নাম সুরঙ্গমা—সে যৌবনে নষ্ট হইবার পথে গিয়াছিল, তার পরে রাজার আশ্রয়ে আসিয়া সে রক্ষা পায়—রাজা তাহাকে সেই অন্ধকার ঘরের দাসী করিয়া দেন। রাণীর মধ্যে রূপের তৃষ্ণা প্রবল, রাজাকে চক্ষে না দেখিতে পাইয়া রাণীর মন অধীর হইয়া উঠিয়াছে। দাসী সুরঙ্গমার মত অন্ধকার

ঘরে রাজাকে ধ্যান করিয়া তাঁর তৃপ্তি নাই। রাণী শেষে রাজাকে ধরিয়া বসিলেন, রাজাকে একবার সব জিনিসের মাঝখানে বাইরে আলোয় দেখা দিতে হইবে। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, বেশ, বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে প্রাসাদের শিখরের উপর দাঁড়াইয়া রাণী হাজার লোকের মাঝখানে রাজাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। রাজা তাহাকে সেই লোকের ভিড়ের মধ্যে সকল দিক হইতেই দেখা দিবেন।

সে দেশের লোকে কিন্তু রাজাকে কখনো চক্ষে দেখিতে পায় না—কারণ রাজা যেমন রাণীর কাছে দেখা দেন না তেমনি প্রজাদের কারো কাছেই দেখা দেন না। তাহাদের অনেকেরই তাই সংশয় যে রাজা মোটেই নাই। বসন্ত-উৎসবে অন্যান্য রাজারা আমন্ত্রিত, রাজার দেখা না পাইয়া তাহাদের মনে সেই সংশয়ই পাকা হইয়াছে। কেবল কাঞ্চীর রাজার মনে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই—লোকটা সংশয়বাদীও নয়—একেবারে নাস্তিক ও বিদ্রোহী বলিলেই হয়।

ইতিমধ্যে বসন্ত-উৎসবে সুবর্ণ নামে এক ছদ্মবেশী এবং সুপুরুষ এবং সেই কারণেই ভিতরে কাপুরুষ ব্যক্তি সে দেশের রাজা বলিয়া নিজেকে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কাঞ্চী-রাজের কাছে তার ফাঁকি ধরা পড়িয়াছে। কাঞ্চীরাজ আসল রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যতই জোর করিয়া অবিশ্বাস করুক, নকল রাজার নকলটুকু তাহার চোখ এড়ায় না। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে লাভ করিবার লোভ রাখে; সুবর্ণকে তার সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সে হাতে রাখিল।

বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে সেই সুরূপ সুবর্ণকে দেখিয়া সুদর্শনা রাণী তাহাকেই রাজা বলিয়া ভ্রম করিল। সুরঙ্গমা তাহার কাছে ছিল না। রাণী পদ্মপাতায় ফুল সাজাইয়া সুবর্ণকে রাজভ্রমে অর্ঘ্য পাঠাইল। সুবর্ণ তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু কাঞ্চীরাজ বুঝিতে পারিয়া সুবর্ণের গলা হইতে মুক্তার একগাছি মালা নিজে খুলিয়া লইল এবং দাসীর হাত দিয়া মহারাজের মালা বলিয়া রাণীকে পাঠাইয়া দিল। রাজার হাতের এই অগৌরব রাণীকে বিঁধিল।

তারপরে, অদৃশ্য রাজার প্রতি অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহী কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে পাইবার আশায় প্রাসাদের এককোণে আগুন ধরাইয়া দিতে সে আগুন দেখিতে দেখিতে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে কাঞ্চী নিজে পলাইবার পথ পায় না। বেচারা সুবর্ণ তখন ভয়ে আকুল। রাণী আগুন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার শরণাপন্ন হইতেই সে তৎক্ষণাৎ কবুল করিল যে সে রাজা নয়। লজ্জায় সুদর্শনা ম্রিয়মাণ হইল। তারপরে সেই প্রলয়ের দিনে আসল রাজার প্রচণ্ড ভয়ানক রূপ সে দেখিতে পাইল—ধূমকেতু-ওঠা আকাশের মত কালোরূপ। রাজা সেই ভয়ানক রুদ্রভীষণরূপেই রাণীকে প্রবৃত্তির প্রলয়দাহ হইতে রক্ষা করিলেন। তখন রাণীর ভিতরে একদিকে পাপের নিদারুণ দাহ ও লজ্জা, অন্যদিকে রূপের তীব্রনেশা। রাজার সেই ভীষণরূপ সে সহ্য করিতে পারিল না। রাজার কাছ হইতে সে দূরে পালাইয়া যাইতে চাহিল।

সুদর্শনা রাজার কাছে থাকিল না। রাজা তাহাকে কোন নিষেধ করিলেন না, তাহার উপর জোর করিলেন না। সুদর্শনার মনে তীব্র অভিমান জাগিয়া উঠিল। তাহার সেই বিদ্রোহের দিনে সুরঙ্গমা তাহার সঙ্গ লইল। সে বলিল, তোমার পাপের আমিও ভাগী। আমি তোমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকিব। স্বাভিমানের সঙ্গ লইল নম্রতা।

সুদর্শনা তখন তাহার বাপের বাড়ী আসিল। রাজার সম্বন্ধে তখন তাহার তীব্র অভিমান; কারণ বাপের বাড়ীতে তাহার তো আর রাণীর ঐশ্বর্য্য নাই, সেখানে তাহার অগৌরবের স্থান, সেখানে তাহাকে দাসী হইয়া থাকিতে হইতেছে। তাহার যে পতন হইয়াছে এবং সেইজন্য তাহার অহঙ্কার যে পদে-পদেই ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সে-কথা বুঝিলেও সে-কথা মানিয়া লওয়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। রূপলালসা তখনো তাহার মন হইতে সরে নাই; সুবর্ণ তখনো তাহার কাঙ্ক্ষিত, যদিচ তাহার ভীরুতার জন্য তাহার প্রতি সুদর্শনার ধিক্কার জন্মিয়াছে। পাপের বিদ্রোহের ভিতরে একটা সাহস আছে, একটা উত্তেজনা আছে, সে উত্তেজনা প্রলয় ঘটাইবার উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার ভিতরে তীব্র আনন্দ। শেক্‌স্‌পীয়রের এণ্টনি এণ্ড ক্লিয়োপেট্রার মধ্যে সেই প্রলয়ের তীব্র উত্তেজনার

নন্দের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সুদর্শনার বিদ্রোহের
্য সেই সাহস, সেই উন্মাদনা প্রচুর ও প্রবল রূপে
গিয়াছে, কিন্তু যাহার জন্য সে সমস্ত ছাড়িল, সে
থায়? সে এমন ভীরু? সুদর্শনাকে জোর করিয়া
ড়িয়া লইবার সাহস তাহার নাই?

ইতিমধ্যে কাঞ্চীরাজ সুবর্ণকে বাহন করিয়া সুদর্শনাকে
বার জন্য তাহার পিতার রাজ্যে উপস্থিত। দেখিতে
খিতে কাঞ্চী ছাড়া আরও কয়েকজন রাজা আসিল।
ই সাত রাজার সঙ্গে তখন সুদর্শনার পিতার যুদ্ধ বাধিল
ং তিনি বন্দী হইলেন। সুদর্শনার জন্য স্বয়ম্বর সভা
ত হইল। সেই সভায় কাঞ্চীরাজ সুবর্ণকে ছত্রধর
য়া সিদ্ধিলাভের আশা করিল। রাজসভায় সুবর্ণকে
হইতে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহার প্রতি সুদর্শনার
ান্ত ঘৃণা জন্মিল। তখন তাহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল,
র্ণ কিছুমাত্র সুন্দর নয়। সে স্থির করিল যে, এই সাত
ুর সাত রাজার টানাটানির আয়োজনের মাঝখানে
ই স্বয়ম্বর সভায় বুকে ছুরি বসাইয়া সে আত্মঘাতিনী
বে।

এইখানেই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ। তাহার
্য যে সৌন্দর্য্যের অন্তরতর রিক্ত নিস্বল "সবরূপ-
বানো রূপের" কাছে না পৌছিয়া কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
ন্দর্য্যের ভোগলালসাপ্রদীপ্ত স্থূলরূপের মলিনতার মধ্যে
। পৌছিয়াছে এবং ধূলায় লুটাইয়াছে, যে মুহূর্ত্তে ইহা
অনুভব করিতে পারিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তো তাহার
য়শ্চিত্তের সুরু এবং মুক্তিরও সূত্রপাত। সৌন্দর্য্যবৃত্তির
তার্থতা সাধন তো পাপ নয়; পাপ—যখন লালসা
ন্দর্য্যবৃত্তির স্থান জুড়িয়া বসে। সে লালসা নিতান্ত
য়ের জিনিস—হৃদয়কে তাহা নষ্ট করিতে পারে না।

তারপর হঠাৎ স্বয়ম্বর সভায় রাজাদের আসন কাঁপিয়া
ল এবং যোদ্ধবেশে ঠাকুরদাদা প্রবেশ করিলেন।
পূর্ব্বে কাঞ্চীরাজ প্রভৃতি বসন্ত-উৎসবে ঠাকুরদাদাকে
গুলি দলবল লইয়া নাচিতে গাহিতে দেখিয়াছে। এখন
দা যখন বলিলেন, রাজা এসেছেন এবং তাঁহার সেনাপতি
নই; তখন কাঞ্চীরাজ সে কথায় ভুলিল না। আর
ল রাজাই ভয়ে তখনি হার মানিল। কেবল কাঞ্চীরাজ
শেষ পর্য্যন্ত লড়িবার জন্য তৈরি হইল। সে বিদ্রোহী, সে
পুরাপুরি অবিশ্বাসী।

সুদর্শনার অভিমান তখনও যায় নাই। কেবল মনটা
ভিতরে গলিয়াছে, পাপের মলা বেদনার অশ্রুজলে ধুইয়াছে।
তাহার বিশ্বাস রাজা তাহাকে নিশ্চয়ই ডাকিয়া লইবেন।
সে ঠাকুদ্দার মুখে শুনিল, রাজা যুদ্ধ শেষ করিয়া চলিয়া
গিয়াছেন। তাহাকে তিনি উদ্ধার করিলেন, কিন্তু ডাকিয়া
লইলেন না।

তারপর শেষ দৃশ্যে পরাজিত কাঞ্চীরাজ, ঠাকুরদাদা,
রাণী, সুরঙ্গমা সকলেই পথে বাহির হইল। সে পথ যাত্রীর
পথ, মুক্তির পথ, বিশ্বের পথ। সকল অভিমান ভাসাইয়া
দিয়া সেই পথে রাণী বাহির হইতেই রাজাকে যেন সেই
পথেই পাইল। তখন তাহার দীনবেশ, তাহার রথ নাই,
তাহার কোন সমারোহ নাই। শেষে রাজার সঙ্গে দেখা
মিলিতে রাণী বলিল—আমি তোমার দাসী, আমাকে সেবার
অধিকার দাও। তাহার আত্মদান এতদিনে সম্পূর্ণ হইল।
রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে সইতে পারবে? রাণী
বলিল, পারব। "প্রমোদবনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে
দেখ্‌তে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখে-
ছিলুন—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার
চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে! তোমাকে তেমন করে দেখবার
তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও,
প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।"

রাজা বলিলেন, "তোমারি মধ্যে আমার উপমা আছে।"
সুদর্শনা বলিল, "যদি থাকে ত সেও অনুপম। আমার
মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া
পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও
—সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।"

তখন রাজা তাহাকে বলিলেন—অন্ধকারের লীলা
এবার শেষ হল। এখন বাইরে চ'লে এস, আলোয়।
নাটকের এইখানে সমাপ্তি।

আমি বলিয়াছি রূপের সাধনা ও অধ্যাত্ম সাধনার দ্বন্দ্বের
উপরেই এ নাটকের ভিত্তি। সুদর্শনার ভিতর দিয়াই সেই
দ্বন্দ্বের লীলা এ নাটকে আমরা দেখিতেছি। তাহার রূপের
জন্য প্রবল তৃষ্ণা। প্রথম অবস্থায়, সেই তৃষ্ণা তাহাকে

অশুচি অসতী করিল, তাহার প্রমোদ-উদ্যানে আগুন লাগাইয়া দিল, তাহাকে প্রতিষ্ঠাচ্যুত করিয়া সাত রিপুর টানাটানি হানাহানির মাঝখানে ফেলিয়া দিল, তাহার ভিতরে প্রবল আত্মাভিমান জাগাইল। দ্বিতীয় অবস্থায়, অপমান এবং আঘাতের ভিতর দিয়া বাহ্যরূপের কামনা ক্রমে ক্রমে মরিয়া গিয়া "সবরূপ-ডোবানো রূপ" অপরূপ রূপ রাণীর মনটিকে ক্রমশ অধিকার করিয়া তাহাকে মধুর করিল এবং পরিপূর্ণ আত্মদানে যখন তাহার আত্মাভিমানও নিঃশেষে বিলুপ্ত হইল, তখনই রাজার সঙ্গে তাহার যথার্থ মিলন ঘটিল। সুদর্শনার পরিণতির ক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে;—আদিতে, সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, মধ্যে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া নৈতিক বৈবর্ত্ত—লালসার অগ্নিকাণ্ড, প্রবৃত্তির বিদ্রোহ; শেষে, দ্বন্দ্বাবসানে মাধুর্য্যে আত্মদান এবং আত্মাভিমানে জলাঞ্জলি, ঐশ্বর্য্যের বদলে দৈন্যকে স্বীকার এবং নিখিল জগতের মধ্যে সেবার অধিকার লাভ। সৌন্দর্য্য হইতে ধর্ম্মনীতিতে এবং ধর্ম্মনীতি হইতে আধ্যাত্মিকতায় এই যে উত্তরণ, ইহা এমন ধাপে ধাপে না ঘটিলে আত্মার পক্ষে অন্ধকার হইতে আলোকে আসা কোনমতেই সম্ভাবনীয় ছিল না। সুদর্শনার ইতিহাস আত্মার এই অন্তরঙ্গ জীবনের ইতিহাস এবং এই অভিনব Soul Dramaর প্রধান নাট্যবস্তু।

কিন্তু এ ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে, যদি রাজার স্বরূপটি কি তাহা না দেখি। সে রাজা কি বেদান্তের অনন্ত, অনধিগম্য, নিরুপাধি ব্রহ্ম না বৈষ্ণবের সচ্চিদানন্দঘন সরূপ ভগবান? এ নাট্যে রাজার স্বরূপ কি তাহা না জানিলে রাণীর এই আত্মার ইতিহাসের কোন মূল্যই থাকে না।

একমাত্র লোক যিনি রাজাকে চেনেন তিনি ঠাকুরদাদা—সুতরাং তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে রাজার স্বরূপের কোন কোন লক্ষণ ধরা পড়িতে বাধ্য।

একবারে প্রথম দৃশ্যে যখন রাজার এই নূতন রাজ্যে পথিকের দল উপস্থিত, তখন তাহারা প্রহরীকে উৎসবে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিতেছে। প্রহরী উত্তর করে—"এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক্ দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছিবে।" এ খোলা রাস্তার দেশ—এ "open road"—এখানে কোন মানা বা নিষেধ নাই। রাজাকে কেউ দেখে না তাই কেউ ভয়ও করে না। রাজা কেন দেখা দেন্ না তার উত্তরে ঠাকুরদাদা বলিতেছেন—"সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।"

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌ব কি স্বত্বে।
আমরা যা খুসি তাই করি
তবু তাঁর খুসিতেই চরি
মোরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌ব কি স্বত্বে!"

রাজা সবাইকেই বিধিনিষেধহীন খোলা রাস্তায় বাহির করিয়া রাজা করিয়া দিয়াছেন, এ তো স্পষ্টই এখনকার democratic ঈশ্বরের কথা। ডিমোক্রাটিক বা গণেশ ভগবানের ধারণা আমাদের দেশে যে নাই তাহা নয়। তাঁহাকে নরনারায়ণ রূপে দেখিবার সাধনা, জীবে জীবে তিনি শিবরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন এ ভাবে দেখিবার সাধনা, তাঁহাকে বিশ্বরূপ করিয়া দেখিবার সাধনা আমাদের দেশের কোন কোন সাধকশ্রেণীর মধ্যে ছিল এবং এখনও আছে। যে যে-পথে যাক্, সে যে তাঁরই পথে চলিয়াছে, সকলেরই পথ যে তাঁর পথ—এ কথাও আমাদের দেশের ধর্ম্মসাধনার মুখ্য কথা। তবু মনে হয় যে, ডিমোক্রাসি জিনিসটা পশ্চিমের জিনিস বলিয়া ডিমোক্রাটিক ভগবানের ধারণা পশ্চিমে যেমন করিয়া জাগিয়াছে, এমন করিয়া আমাদের দেশে কখনও জাগিয়াছিল কিনা সন্দেহ। সাবেক কালে যখন ব্যক্তিদের তাল পাকাইয়া এক-একটা class বা জাতি তৈরি করা হইত, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের কোন কথাই ছিল না। তখন এ তত্ত্ব কেহ বুঝে নাই যে, মানবসমাজের চালক মানবসমাজ নিজেই—কোন রাজাও নয়, কোন জাতিতন্ত্রও নয়। সমাজের সকল সামাজিকের পরস্পরের সীমাসংখ্যাহীন অদৃশ্য ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজ জিনিসটা ক্রমশঃ একটা অখণ্ড বস্তু হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। এই সমাজ আত্মক্রীড়, আত্মরতি, আত্মক্রিয়াবান্, আত্ম-অগ্রসরশীল। অথচ এই সমাজ কেবল মানুষেরই নয়, ইহা অসংখ্য জীবের আছে। সেই নিখিল বিশ্বসমাজের পরিপূর্ণ স্বরূপ ভগবানের স্বরূপ। সেই নিখিল বিশ্বসমাজের

(cosmic society) অভিব্যক্তি যেমন শেষ হয় নাই, তেমনি সেই সমাজের চিদ্রূপী যে ভগবান, তাঁহারও শেষ হইতে পারে না। তিনি সেই ক্রমবিকাশশীল নিখিলবিশ্ব-সমাজের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতেছেন, নিখিল বিশ্বসমাজের সঙ্গে-সঙ্গে নানা ভোগ ভুগিতেছেন, এবং নিখিলবিশ্বসমাজের সমস্ত বাধাকে জয় করিয়া-করিয়া ক্রমাগতই চলিতেছেন। ইহা একালের Democratic বা গণেশ ভগবানের ধারণা। আমাদের দেশে যুগধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান যে ক্রমাগতই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতেছেন, এই ভাবের সঙ্গে পশ্চিমের এই অভিনব ডিমোক্রাটিক ভগবানের ভাবের বেশ মিল আছে। দুইই এক বস্তু।

"Democracy : a New unfolding of Human Power" গ্রন্থে অধ্যাপক যুড্‌স্ বলিতেছেন—"This new spirit, forming itself, as it were, upon the restless sea of humanity, will, without doubt, determine the future sense of God and destiny. ...Society, as a federal union, in which each individual and every form of human association shall find free and full scope for a more abundant life, will be the large figure from which is projected the conception of the God in whom we live and move aud have our being."

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' একদিকে সকলকে রাজা করিয়া দিয়া সমস্ত মানুষকে বিধিনিষেধহীন "খোলা রাস্তার দেশে" বাহির করিয়া দিয়াছেন—তিনি এই ডিমোক্রাটিক ভগবান। অন্যদিকে তিনি রাণীর বা আত্মার একমাত্র স্বামী, একমাত্র প্রণয়ী। আত্মা তাঁহার "দ্বিতীয়", আত্মা তাঁহার "উপমা", আত্মা তাঁহারই "সুদর্শনা রূপ"। তাই ঠাকুর্দ্দা ও তাঁহার দলের ভিতর দিয়া এই রাজার স্বরূপের এক পরিচয়; সুদর্শনা রাণীর ভিতর দিয়া এই রাজার স্বরূপের অন্য পরিচয়। এই দুই পরিচয়ই সমান সত্য ও মূল্যবান। তিনি বিশ্বরূপ, অথচ তিনি বিশেষরূপ। তিনি সমস্ত অথচ তিনি একক। রবীন্দ্রনাথের রাজার মধ্যে এই দুই স্বরূপের মিলন, যেন বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বে এবং পশ্চিমে রাজার দুই ভিন্ন রকমের স্বরূপ বোধের মিলন।

এইজন্য এই নাট্যে ঠাকুর্দ্দার প্রয়োজন আছে রাণীকে; রাণীর প্রয়োজন আছে ঠাকুর্দ্দাকে। ঠাকুর্দ্দা যতদিন রাণীর ভিতর দিয়া রাজাকে দেখেন নাই, ততদিন রাজাকে পূরা করিয়া সমগ্র করিয়া দেখিতে পারেন নাই। আবার রাণী রাজার অন্য স্বরূপ কোন দিনই বুঝিতেন না, যদি রাণীকেও পথে বাহির হইতে না হইত। এইরূপে অধ্যাত্মসাধনার প্রয়োজন ছিল রূপের সাধনাকে; রূপের সাধনার প্রয়োজন ছিল অধ্যাত্মসাধনাকে। যে ঠাকুরদাদা বিশ্বের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন তিনি জানেন নাই যে ত্যাগের শেষেও একটি ভোগ আসে, একবার আপনার আধারে বিশ্বকে নিবিড় করিয়া পাওয়া দরকার। সেই আধার রূপের আধার। পক্ষান্তরে, যে রাণী বিশ্বকে কেবলি বিশেষ রূপ দিয়া সেই আধারেই ভোগ করিয়াছে, সে জানে নাই যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ভিন্ন ভোগের পূর্ণতা নাই, আপনাকে বিশ্বের মধ্যে নিঃশেষে বিলাইয়া চুকাইয়া দিলে তবেই ভোগের পূর্ণতা।

কেবল রাজার স্বরূপের মধ্যে একটি দিক্ পাই না। এ রাজা দুঃখময় ভগবান নন্, suffering God নন্। জীবাত্মা রাণীর মুখ দিয়া রাজাকে যখন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কেমন দেখ্‌তে পাও, কী দেখ?" রাজা উত্তর করিতেছেন যে, তিনি মানুষকে বিশ্ব-অভিব্যক্তির চরমতম পূর্ণতম রূপ করিয়া দেখিতেছেন। কি আশ্চর্য্য, কি চমৎকার সেই জায়গাটি! রাজা বলিতেছেন, "দেখ্‌তে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধ'রে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!" মানুষের এই সীমাবদ্ধ এতটুকখানি রূপের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের রূপ সমস্ত চন্দ্রসূর্য্যতারার রূপ যে ভরিয়া আছে এবং অরূপ ভগবান্ যে সেই রূপে মুগ্ধ, এমন কথা এমন আশ্চর্য্য ভাষায় পৃথিবীর আর কোন্ মহাকবি বলিয়াছেন আমি জানি না।

অথচ দেখি, সেই রাজা, সুদর্শনার পতনের পর একেবারে নিশ্চল নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিকার। যে সুদর্শনা "তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার দ্বিতীয়", সে তো দূর নয়, সে তো অন্য নয়। তাহার পাপভোগে কি তাঁহার কোন ভোগ নাই, তাঁহার কোন যন্ত্রণা নাই? রবীন্দ্রনাথের রাজা তো স্বতন্ত্র নির্লিপ্ত সুদূর ভগবান্ নন্। অবশ্য রাজা সে সময়ে গোপনে

সুদর্শনার বাতায়নের নীচে প্রেমের বীণা বাজাইয়া সুদর্শনার ভিতর হইতে তাহার মন গলাইবার চেষ্টা করিলেন এবং সাত রিপু বা সাত রাজার টানাটানির অপমান হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু জীবের মুক্তির জন্য কোথায় তাঁহার বেদনা, তাহার ব্যাকুলতা?

আমার মনে হয়, একপক্ষে রাজার প্রেম এমনি নির্ব্বিকার নিরুদ্বিগ্ন প্রেম বলিয়া অন্যপক্ষে সুদর্শনার প্রেমও প্রথম অবস্থায় প্রবৃত্তির অপেক্ষাকৃত নীচের স্তর ছাড়াইয়া খুব বেশি উঁচুতে উঠিতে পারে নাই। অভিমানের আগুন যখন গলিল, তখনও কোথায় সুদর্শনার প্রেমের গভীর শান্তি, রহস্যগম্ভীরতা, নিবিড় পরিপূর্ণতা, আত্মবিহ্বল রসপ্লাবন? নাটকের শেষের ভাগে এগুলির আভাস আছে বটে—কিন্তু আরও একটু পূর্ণতর স্ফুটতর প্রকাশ হইলে, সুদর্শনার অন্যান্য প্রেমের মাধুর্য্যপরিপ্লুত ভক্তিবিনম্র রূপটি আরও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত।

সুদর্শনার পাশাপাশি রাজার দাসী সুরঙ্গমার চিত্রটি কি আশ্চর্য্য! ঠিক একটি ভক্তসাধকের চিত্র। তাহার চরিত্রে কোন জটিলতা নাই। এক সময়ে সে পাপের পথে গিয়া ঘা খাইয়া ধর্ম্মের পথে ফিরিয়াছে, তারপর ঐকান্তিক নিষ্ঠাতেই তাহার সমস্ত চরিত্র স্থিতি পাইয়াছে। সে বলিতেছে—রাজার কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা! অথচ বলিতেছে—"এত অটল এত কঠোর বলেই এত নির্ভর এত ভরসা।" ক্রমে সেই নিষ্ঠার ভিতর দিয়া সে এক সময়ে অন্ধকার ছাড়িয়া আলোতেই আসিল। অর্থাৎ আপনার ভিতরকার সাধনার নিভৃত বেষ্টনটি ছাড়াইয়া সমস্ত সংসারের ভিড়ের মধ্যেই আসিল। সুদর্শনা যখন রাজার উপর রাগ করিয়া দূরে চলিল, তখন সে বলিল—আমি তোমার সঙ্গে যাব। সুদর্শনা তাহাকে বলিল—না, তোকে আমি নিতে পারব না—তোর কাছে থাকলে আমার বড় গ্লানি হবে—সে আমি সইতে পারব না। সুরঙ্গমা বলিল—মা, তোমার সমস্ত ভালমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি।

"আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী
আমি সকল দাগে হব দাগী।"

সুরঙ্গমা এইখানেই তাহার ভক্তিসাধনার চরম অবস্থায় গিয়া পৌঁছিল। এতদিন সে অন্ধকার ঘরের দাসী ছিল, সে আপনার ভিতরকার সাধনার নিষ্ঠার মধ্যেই স্থির হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিল। এখন সে সংসারে আসিয়া সকলের কলঙ্কভাগী, সকলের পাপের দাহের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কারণ তাহা না হইলে পাপ তো যায় না। পাপ যায় পাপের ভার গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ পাপ যায় প্রেমে। কারণ প্রেমেই ভার লয়, ভার বয়। তাই সুরঙ্গমা গাহিতেছে:—

"আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে
যে পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি!"

মানুষের পাপ সম্বন্ধে ঈশ্বরেরও তো ঠিক এই ভাব। নইলে তাঁহারও প্রেমের মূল্য কি? সুরঙ্গমার এই প্রেম, এই অচল নিষ্ঠাই সুদর্শনাকে ভিতরে ভিতরে গলাইয়াছে। অবশ্য সুদর্শনার পরিবর্ত্তন তাহার মত এমন সহজে ঘটিবারই নয়। কারণ, তাহার অভিমানের আয়োজন অত্যন্ত বিচিত্র, তাহার পক্ষে অভিমানত্যাগ বড় কঠিন; তাই তাহার আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন ঘটানোও কঠিন। সে যে অন্ধকারকেই চায় না, অর্থাৎ সে সাধকদের মত অরূপকে শুধু অন্তরে ধ্যানলোকের মধ্যে দেখিতে চায় না। সুরঙ্গমা বলে—"আমার বোঝবার জন্য কিছুই দরকার হয় না। আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে তার পায়ের শব্দ পাচ্ছি।" সুদর্শনা ঠিক তার উল্টা কথা বলে—"যেখানে আমি গাছপালা পশু পাখী মাটি পাথর সমস্ত দেখ্‌চি সেইখানেই তোমাকে দেখ্‌ব।"

সুদর্শনার মত বিদ্রোহী কাঞ্চীর রাজা; যদিচ তাহার Type স্বতন্ত্র। রাজাদের মধ্যে তাহারও পরিবর্ত্তন ঘটানোও তুল্য কঠিন। কারণ আর সবাই মূঢ় সংস্কারের বশবর্ত্তী—তাহারা রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিলেও যেমনি শোনে যে, রাজা আসিয়াছেন অমনি মাথা নীচু করে। কিন্তু কাঞ্চী শেষ পর্য্যন্ত অটল। এই বিদ্রোহ আত্মশক্তির উপর ষোলআনা নির্ভরের জন্য বিদ্রোহ। সুতরাং এ বিদ্রোহ প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙে। শেষ দৃশ্যে যখন সকলেই Pilgrim's Progressএর মত রাজার দর্শন-

লাভের জন্য পথে চলিয়াছে, তখন কাঞ্চী বলিতেছে :— 'যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতে চাইনি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মত এসে এক মুহূর্ত্তে আমার ধ্বজাপতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানার জন্য পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নাই।"

কাঞ্চীরাজার বিদ্রোহ সুদর্শনার চেয়ে ঢের জোরালো। সে রাজার রাণীকেই জোর করিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে এবং সেজন্য কত কলকৌশলের অবতারণা করিয়াছে। সে ঈশ্বরকে চায় নাই, ঐশ্বর্য্যকে চাহিয়াছে। সে ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়া ঈশ্বরের জায়গায় নিজেকে বসাইতে চাহিয়াছে। এ বিদ্রোহ শেষ পর্য্যন্ত লড়ে, তারপরে মরে।

এইবার ঠাকুর্দ্দার কথা ও ঠাকুর্দ্দার দলের কথা বলিয়া এ নাটকের কথা শেষ করিব। গ্রীক নাটকে কোরাসের যে কাজ ছিল, ঠাকুর্দ্দা ও তাহার দলের ঠিক সেই কাজ এ নাটকে দেখিতে পাই। এ নাটকের মধ্যে লিরিক অংশের সন্নিবেশ ঐখানে।

রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ লিরিক কবি বলিয়া তাঁহার নাটকের মধ্যে, গল্পের মধ্যে, এমন কি উপন্যাসের মধ্যেও মূল প্লটের সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছায়াপ্লট সর্ব্বদাই গাঁথা থাকে—ড্রামার সঙ্গে-সঙ্গে একটা গীতি-অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা-নাট্যে বসন্তোৎসবের অবতারণা এবং ঠাকুর্দ্দার দলের অবতারণা এ নাটকের সেই লিরিক ভাগ এবং বোধ হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ।

গ্রীক কোরাসের আসল অর্থ ছিল নৃত্য কিম্বা নৃত্যের রঙ্গমঞ্চ। গ্রীক দেবতাদের উৎসবে নৃত্য একটা বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। এই নৃত্য হইতেই ক্রমে গ্রীক নাট্যের উৎপত্তি। গোড়ায় নৃত্যে কোন কথা ছিল না—ক্রমে নাট্যের উৎপত্তি হইতে কোরাসের মুখে কথা জোগাইল। এই কোরাস গ্রীক নাট্যে একটা বিশেষ লিরিক রস সঞ্চার করিয়াছিল।

গ্রীক ড্রামা হইতে এই কোরাসের ভাব লইয়া যে রবীন্দ্রনাথ "রাজা" নাট্যে ঠাকুর্দ্দার দলটিকে আনিয়াছেন তাহা বলি না। ইহা নাটকের একটা গভীরতর প্রয়োজন হইতে আসিয়াছে। গিলবার্টমারে গ্রীক কোরাসের যে প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন তাহাও এখানে কতকটা খাটে। তিনি বলিয়াছেন "It (chorus) will translate the particular act into something universal." কোরাস্ একটা বিশিষ্ট ঘটনাকে বিশ্বব্যাপক করিয়া তাহার রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রয়োজন এই যে, সকল নাট্যদৃশ্যের পিছনে একটি অদৃশ্য সত্তার অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে।—সে দ্রষ্টা, সে সাক্ষী। নাট্যের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া যে চরম পরিণাম বা climaxটি তৈরি হইয়া উঠিতেছে, সে তাহার সবটাই যেন জানে। তাহার কাছে যেন রঙ্গমঞ্চের সকল দৃশ্য, সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ, নেপথ্য পর্য্যন্ত অনাবৃত। নাটকের সেই বিচিত্ররসকে সে আপনার অখণ্ডদৃষ্টির দ্বারা এক রস করিয়া লয়। মধ্যে মধ্যে তাই এই কোরাস্ আসাতে সেই অখণ্ড রসটি অখণ্ড সুরটি সকল বিচিত্রতার ভিতরে ভিতরে জাগিতে থাকে বলিয়া নাটক জিনিসটা নাটক থাকিয়াও একটি লিরিকের সম্পূর্ণতা লাভ করে।

ঠাকুর্দ্দা একটি মুক্ত-আত্মা — সর্ব্বদাই আনন্দিত। তাঁহার সকলেরই মধ্যে প্রবেশ অত্যন্ত স্বচ্ছ অবাধ এবং সহজ— কারণ তাঁহার বিশ্বের কাছে আত্মদান একেবারে সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভাল মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।"

বসন্তোৎসবে এই তাঁর নাচের গান। রাজা নাটকে এই কোরাসের গান।

অথচ ঠাকুর্দ্দা বসন্তোৎসবে আনন্দ করিতেছেন বলিয়া দুঃখের কথা মোটেই বিস্মৃত নন্। তাঁহাকে যখন কেহ আসিয়া ছেলের মৃত্যুসংবাদ দিতেছে এবং রাজাকে সেই-জন্য অবিশ্বাস করিতেছে—তিনি তখন উত্তর দিলেন — "ছেলে ত গেলই, তাই বলে ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব!"

সে ব্যক্তি বলিল "ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!"

ঠাকুরদাদা বলিলেন—"ঠিক্ বলেছিস ভাই। তা সেই অন্ন-রাজাকেই খুঁজে বের কর! ঘরে বসে হাহাকার করলেই ত তিনি দর্শন দেবেন না।" তার পর গাহিতেছেন :—

"বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলারে?
দেখিস্‌নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরা ফুলের খেলারে!
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগ্‌চে সারা বেলারে।
বসন্তে আজ দেখ্‌রে তোরা ঝরা ফুলের খেলারে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কিরে মাণিক জ্বলে?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলারে!
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে কজন আছে
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলারে
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলারে!"

এ গানের চেয়ে "ঝরাফুলের মেলা" এবং "লক্ষ মাটির ঢেলা" পৃথিবীর ব্যর্থকাম অবোধজনদের সান্ত্বনার গান কি দুনিয়ায় আর কাহারো দ্বারা কোথাও রচিত হইয়াছে? এত বড় ভরসার কথা পশ্চিমে ডিমোক্রাসির জয়গান যিনি করিয়াছেন, সেই মহাকবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটি কবিতার মধ্যেও নাই।

এখনকার কালের সভ্যতার বসন্ত উৎসব যে এই "লক্ষ মাটির ঢেলা" জনগণকে লইয়া। এই যে সবাই চলিয়াছে, খোলা রাস্তার দেশে পা ফেলিয়া ফেলিয়া। এ কালের democratic stateএর ভাগ্যবিধাতা তো কোন একজন মানুষও নয়, কোন একদল মানুষও নয়। এই কারণে সকলেরই মনে কত সংশয় হয়, কত ভয় হয়। মনে হয়, "সবাই রাজা" ভাল, না "এক রাজা" ভাল? অথচ বিজ্ঞ, অবিজ্ঞ, সুনীতিপরায়ণ, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থপর, পরার্থপর, দেশহিতৈষী, দেশবিদ্রোহী, ভালমন্দমাঝারি, বালবৃদ্ধ নরনারী—এই সমস্ত স্তূপ মিলিত হইয়াই আজ তাহা "মানব-ভাগ্যবিধাতা" হইয়াছে। এই স্তূপের ভিতরেই ভগবান, এই স্তূপ ভগবানের ভিতরে। ইহার মধ্যে কাহাকে বাদ দিবে, কাহাকেই বা অবজ্ঞা করিবে? বিবেকানন্দের ভাষায়—এ সমস্তই যে ব্রহ্ম; এ সবই যে নারায়ণ।

ঠাকুর্দ্দা তাই গাহিতেছেন :—ভয় নাই, ভাবনা নাই—

"কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ!"

ঠাকুর্দ্দার এই কোরাসের সুর আগাগোড়া সমস্ত নাটকটির ভিতর দিয়া প্রবাহিত। শেষ পর্য্যন্ত এই সুর।

আমি বলিয়াছি যে ঠাকুরদাদার প্রয়োজন ছিল সুদর্শনাকে, সুদর্শনার প্রয়োজন ছিল ঠাকুরদাদাকে।

সুদর্শনার পাপের মূলই তাহার আত্মাভিমানে। তাহার কাছে তাহার নিজের রূপটাই ছিল বড়—সে বিশ্বকে সেই রূপের ছাঁচে ঢালাই করিতে চাহিয়াছিল। সকল আর্টিষ্ট-প্রকৃতিই তাই চায়। সে তো রাজার কাছে কোনদিনই আপনাকে নিঃশেষে দান করে নাই; সে রাজাকেও আপনার রূপ দিয়া কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহাকে আপনার বিশেষ ভোগের সামগ্রী করিতে চাহিয়াছিল। আত্মাভিমানেই আত্মাভিমানের ক্ষয়। তাহার প্রবৃত্তির তাহার ভোগলালসার আগুন জ্বালাইয়া সে যখন রাজাকে দেখিল, দেখিল তিনি "ঝড়ের মেঘের মত কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা," তখন সে যে "ননীর মত কোমল, শিরিষ ফুলের মত সুকুমার, প্রজাপতির মত সুন্দর" সৌন্দর্য্যলোকটি কল্পলোকটি তৈরি করিয়াছিল। তাহা টেনিসনের Palace of Artএর মত এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সৌন্দর্য্যের মধ্যে এতদিন সে শুধু দেখিয়াছিল মনোহর অংশটুকু, এখন সৌন্দর্য্যের অন্তরতর প্রচণ্ড রুদ্র অংশকেও সে দেখিতে পাইল।

এই আত্মাভিমানটিই জীবের কাছে ভগবানের সকলের চেয়ে বড় প্রার্থনার জিনিস। এইটিই পাত্র, যে পাত্রে তিনি অমৃত পান করেন; এইটিই দর্পণ, যে দর্পণে তিনি আপনার রূপ আপনি দেখেন। ঠাকুরদাদার এইটিই ছিল না—সেইজন্য সুদর্শনাকে দেখিবার আগে বসন্ত-উৎসবে হোলির মাতামাতির রাতে তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁর মন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল—

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে
কোন্ নিভৃতে ওরে কোন্ গহনে ?

তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে—

কাটিল ক্লান্ত বসন্ত নিশা
বাহির অঙ্গনে সঙ্গী সনে।

কিন্তু—

উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে
কে লয়ে যাবে সে ভবনে
কোন্ নিভৃতে ওরে কোন্ গহনে ?

সকল ত্যাগের শেষে যে একটি ভোগ আছে, নিজের আধারটি প্রস্তুত না থাকিলে সে ভোগ ত পূর্ণ হয় না। সুরঙ্গমাকেও তাই শেষকালে পথে বাহির হইতে হইল—সবল সব পিছনে পড়িয়া রহিল। সুদর্শনাকেও পথে বাহির হইতে হইল কিন্তু সে পথে আরও সঙ্গ-যাত্রীর দল সঙ্গে চলিয়াছে। দু-জনের দু-রকমের মুক্তি !

রাজা নাটকখানি সম্বন্ধে আমার আলোচনা এইখানেই শেষ করি। হিমালয় পর্ব্বত কেমন, লোকমুখে তাহার গল্প শোনার চেয়ে নিজে গিয়া একবার দেখিয়া আসা ভাল। তাহারা যাহারা হিমালয় ভ্রমণ করিয়াছে তাহারা পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিলে তাহাদের কত আনন্দ ! তাই আমার এ আলোচনা যদি রাজা পড়িতে কাহাকেও উৎসাহিত করে, তবেই আমার এ আলোচনা আমি সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্মশানের প্রদীপ

জীবন-শ্মশানে মোর আনন্দের চিতা
সব নির্ব্বাপিতা।
চিতার শিয়রে তুমি আনন্দের টিপ
জ্বলিছ প্রদীপ।
পাছে বা নিবিয়া যাও আমারি নিশ্বাসে
প্রাণ কাঁপে ত্রাসে।
সে কম্প লেগেছে প্রিয়া তোমারও অন্তরে ?—
কাঁপ থরথরে !
তুমি যদি নিবে যাও কি থাকিবে আর ?—
শুধু ছাইভস্ম আর শুধু অন্ধকার !

শ্রী—।

পঞ্চশস্য

অগ্নির ব্যবহার ও আগ্নেয় দ্রব্য উদ্ভাবনার প্রাচীনত্ব—

অতি প্রাচীনকালে আগ্নেয় দ্রব্যের ব্যবহার মানবের অজ্ঞাত ছিল। ইহার উদ্ভাবনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীনগণ ধর্ম্মসম্পর্কীয় উৎসব ব্যতিরেকে অগ্নির নানাপ্রকার ব্যবহার করিতে জানিতেন না। প্রকৃতির উপর তদীয় প্রভাব বিস্তার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িলে মানব ক্রমে অগ্নির বহুপ্রকার ব্যবহার শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। আদিম যুগে মানব অগ্নিকে সম্মান এবং ভীতির চক্ষে দেখিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর অগ্নিরূপে মানবের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। বৈদিক ঋষিগণ অগ্নিকে দেবতার মুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পবিত্র হব্যাগ্নি তাঁহাদের নিত্য পূজনীয় ছিল। যম নচিকেতাকে সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নামানুসারে অগ্নির নাম নচিকেতা রাখিয়াছিলেন। প্রাচীন প্রতীচ্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও দেখা যায়, ঈশ্বর কখন কখন শুদ্ধতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ অগ্নির বেশে মানবের গোচরীভূত হইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বসংহারক রোষের সহিত অগ্নির সর্ব্বভুক্ প্রভাবের তুলনা করা হইয়াছে। তিনি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন—একটা দীপ্ত অগ্নিশিখা ঝোপ জঙ্গল পুড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলিল। ঈশ্বর বিদ্যুতাগ্নি বিকাশের দ্বারা মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ কিংবা মানবকে তদীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন প্রাচীন শাস্ত্রে ইহাও দৃষ্ট হয়। দেবতা ক্রুদ্ধ হইলে অগ্নি বৃষ্টি করিয়া থাকেন প্রাচীনগণ ইহাও বিশ্বাস করিতেন। কোনো কোনো জাতি অগ্নিকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিত। প্লেটোর শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকের এরূপ বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা অগ্নিকে ঐশী জ্ঞানস্বরূপ মনে করিতেন। তৎকালীন লোকের অগ্নিকে রাজচিহ্ন বলিয়া ধারণা ছিল। প্রাচীনদিগের ইহাও বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বর অগ্নিস্তম্ভ পুরোভাগে রাখিয়া পৃথিবীতে মানবের সহিত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। হেরোডটাস বলেন, এসিয়ার রাজগণের গমনকালে অগ্রভাগে অগ্নি বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। কোনো ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন পারসীকগণের সৈন্য-দলের পুরোভাগে রজতপাত্রে করিয়া অগ্নি লইয়া যাওয়া হইত। পুরোহিতগণ সেই পাত্র বেষ্টন করিতে করিতে সুর করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন।

রোমীয়দিগের মধ্যেও অগ্নিকে রাজচিহ্ন রূপে ব্যবহার করা হইত। কোন কোন ইংরেজ লেখক বলেন হিব্রুগণই সর্ব্বপ্রথম অগ্নিকে দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, পৌত্তলিকগণ তাহাদের নিকট হইতে অগ্নি উপাসনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

প্রাচীনকালে হোমানল প্রজ্বলিত অবস্থায় রাখিবার প্রথা ছিল। যাহাতে পবিত্র বহ্নি নির্ব্বাপিত না হয় তদুদ্দেশ্যে গৃহস্থগণ অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। অ্যারণ যৎকালে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়াছিলেন তৎকালে স্বর্গ হইতে একটা অগ্নিশিখা উল্কার মত জ্বলিয়া তাঁহার যজ্ঞস্থলে পতিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে। পুরোহিতগণ বহু দিবস পর্য্যন্ত এই পবিত্র দৈবী হোমশিখা প্রদীপ্ত রাখিয়াছিলেন; কাহারও কাহার মতে যজ্ঞাগ্নি সংরক্ষণে প্রাচীনগণের সতর্কতা অবলম্বনের মূলে অ্যারণের অনুকরণ। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। রোমীয় নরপতিবর্গের মধ্যে সার্ভিয়াস্ একজন প্রধান; ইনি আদেশ করিয়াছিলেন শস্যবপনকালে নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রতি সহরের কোন প্রকাশ্য স্থানে সুবৃহৎ তৃণস্তূপে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেশবাসীর মঙ্গল-

কামনায় বহ্ন্যুৎসব করিতে হইবে। উৎসববিশেষে গ্রীকগণ বিদ্যা-দেবী মিনার্ভার সম্মানার্থ প্রদীপ দানের বিধিপালন করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, দেবী তাঁহাদিগকে তৈলদান করিয়া থাকেন। প্রমিথিউস স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন এবং ভাল্‌কান্‌ প্রদীপ উদ্ভাবন করিয়াছেন সুতরাং ইঁহাদিগকেও উক্তরূপে সম্মানিত করা হইত। ব্যাকাস নামক উৎসবানুষ্ঠানকল্পে খুব আড়ম্বরসহকারে নিশা-দীপ-দান-বিধি পালন করা হইত। সিরিস নরকের তীব্র তিমিরে তদীয় কন্যার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্যে রোমীয়গণ নির্দ্দিষ্ট দিবসে কতকগুলি মশাল জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় হিন্দুদিগের নিত্য পূজার্চ্চনায় দীপদানের বিধি আছে। এতদ্ব্যতীত উৎসববিশেষেও আগ্নেয় অনুষ্ঠান করা হয়। দীপান্বিতা রজনীর অপরূপ মাধুরী, আলোকদামবিভূষিতা ভাগীরথীর বক্ষের মনোহারিণী শোভা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে আকাশ-দীপ দানের বিধি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। দোল-যাত্রায় বহ্ন্যুৎসব হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত। যাগযজ্ঞ একরূপ বিলুপ্ত হইলেও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষে অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বে খ্রীষ্টানগণের দীক্ষাগ্রহণকালে মন্ত্রগ্রহীতা আলোকময় জীবনে প্রবিষ্ট হইতেছেন ইহা চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে আলোকদান করা হইত। মুসলমানগণের ন্যায় কবরের উপর প্রদীপ দেওয়ার রীতি খৃষ্টানগণেরও ছিল, কিন্তু কালক্রমে উহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

ফ্লোরেন্স এবং মধ্য ইটালীর সিয়েনার (Siena) অধিবাসীগণের নিকট ইউরোপীয়গণ আগ্নেয় দ্রব্যের উৎকর্ষসাধনহেতু ঋণী। উক্ত দেশে সর্ব্বপ্রথম এক প্রকার চূর্ণদ্রব্যের উদ্ভাবনা হয়, তাহা হইতে সুন্দর আগ্নেয় দৃশ্যের সৃষ্টি হইত। এতদ্ব্যতীত কৌতুকপ্রদ আগ্নেয় কারুকার্য্যেও তাঁহারা অগ্রগামী। তাঁহারা কাঠের ইমারতের উপর দীক্ষাদাতা "জনের" কার্য্যাবলী ও খ্রীষ্টমাতা মেরীর সশরীরে স্বর্গে গমন সুকৌশলের সহিত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে মূর্ত্তিগুলির সাহায্যে ইহা সজ্জিত করা হইয়াছিল তাহাদের মুখ ও চোখ হইতে কৌতুকপ্রদ অগ্নিশিখা বাহির হইত।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে টোরী নামক একজন ইটালীয় শিল্পী ফ্রান্সে এক-প্রকার অপূর্ব্ব আতসবাজী দেখাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার এই বাজীর অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছিল; কিন্তু লোকের ভিড়ে জনসাধারণের অসুবিধা এবং অগ্নিভয়ের আশঙ্কায় ফরাসীকর্ত্তৃপক্ষ সহজে ইহা প্রদর্শনের অনুমতি দিতে চাহেন নাই। পরিশেষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া এই বাজী দেখান হয়। অপূর্ব্ব তৎপরতা সহকারে শিল্পী একটির পর আর একটি করিয়া এই বাজী দেখাইতে থাকেন। একটি আগ্নেয় তোরণ প্রদর্শন করিয়া ইহা শেষ করা হয়। অগ্নিনির্ম্মিত প্লেটোর প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে মদনদেবের মূর্ত্তির উপরে অগ্নিময় অক্ষরে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিত দেখিয়া দর্শকমাত্রে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

টোরী তাঁহার শিল্পকৌশলের আরও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়নির্ব্বাচনক্ষমতাও অসাধারণ ছিল। তিনি ইহার পরে এটনা নামক আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্গিরণের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল। আগুন লইয়া খেলা করিবার প্রবৃত্তি এ দেশের লোকেরও কম ছিল না; কিন্তু গ্রহনক্ষত্রের উজ্জ্বল দৃশ্য, সবিতৃমণ্ডলের দিব্য জ্যোতি এখন আর তেমন করিয়া আমাদের চিত্তের উদ্দীপনা, চিন্তার স্ফূর্ত্তি জাগাইয়া তুলে না ইহার কারণ কি?

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

* * *

অপচয় ও অপব্যবহার—

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ স্থির করিবার জন্য বিলাতে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটির অনুসন্ধানের ফল আমাদের হস্তগত হয় নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে এ সময় কোন মতামত প্রকাশ করা সঙ্গত হয় না; তথাপি এই কথাটি আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি, খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আমরা যে-পরিমাণ অর্থব্যয় করি, তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প খরচে আমাদের যে না চলে এমন নয়। শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সে-সকল অতি সামান্য ব্যয়েই পাওয়া যাইতে পারে। আমরা অধিক অর্থ ব্যয় করি শুধু রসনার পরিতৃপ্তির জন্য। বাছিয়া লইতে পারিলে, সস্তা খাদ্যে, দামী খাদ্যের এক সুগন্ধ ও সুস্বাদ ছাড়া আর সব গুণই পাওয়া যাইতে পারে। রাঁধিতে পারিলে, সস্তা খাদ্যকেও রসনাতৃপ্তিকর করিয়া তুলিতে না পারা যায় এমন নয়।

গাওয়া ঘিয়ের সুগন্ধ ও আস্বাদ ভৈঁষা ঘিয়ের অপেক্ষা অনেক বেশি, এইজন্য ইহার দামও বেশি, কিন্তু গুণের হিসাবে ইহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। আবার ঘিয়ের দ্বারা শরীরের যে কাজ হয়, তেলেও ঠিক সেই কাজ হয়; ঘির অপেক্ষা তেল যে কত সস্তা সে কথা বলাই বাহুল্য। দাদখানি চাউল ৮৲ টাকায় কমে এক মন পাওয়া যায় না, মোটা চাউল ৪৲ টাকাতেই এক মন মিলে। পরিপোষক ক্ষমতা দুই প্রকার চাউলেরই একরূপ। আমরা যে ৪৲ টাকার স্থানে ৮৲ টাকা ব্যয় করি, সে শুধু সুগন্ধ ও সুস্বাদের খাতিরে—অন্য কোন কারণে নহে। প্রস্তুতের দোষে চাউলের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অংশটি আমরা অনেক সময়ই ত্যাগ করিয়া থাকি। সকলেই জানেন তুষ হইতে বাহির করিলে চাউলকে শাদা দেখায় না, ইহা লাল রঙের এক প্রকার পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। এই লাল রঙের পদার্থটিকে ছাঁটিয়া বাদ দিলে, তবেই চাউল নয়নতৃপ্তিকর শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। এই আবরক পদার্থটিকে Vitumine (ভিটুমাইন্‌) বলে। ইহার পরিপোষক ক্ষমতা খুবই বেশি। ইহাকে বাদ দিলে চাউলের গুণ অনেকটা হানি করা হয়। ধান হইতে যখন অঙ্কুর বাহির হয়, তখন সেই অঙ্কুরটি এই ভিটুমাইনের উপর নির্ভর করিয়াই বড় হয়। অতএব ইহার পরিপোষক গুণ যে খুবই বেশি, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। অতএব এই পদার্থটিকে বাদ দেওয়া একরূপ অপচয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে! শুধু অপচয় নয়, ইহাতে আরও একটি অনিষ্ট হইতে পারে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যাহারা প্রধানতঃ ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা যদি ভিটুমাইন্‌-বর্জ্জিত (ছাঁটা) চাউলের ভাত খায় তাহা হইলে তাহা-দের বেরি-বেরি রোগ দেখা দিবার খুবই সম্ভাবনা।

চাউলের পর গম একটা অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য। আজকাল জাঁতার ময়দা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে অমল ধবল কলের ময়দার প্রচলন হইয়াছে। এই কলের ময়দা লোকের যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা এক কথায় বলিয়া উঠা যায় না। চাউলের ন্যায় গমও ভিটুমাইন দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। ময়দা যতই শাদা হয়, তাহার পরিপোষক গুণ ততই কমিয়া যায়। গম হইতে ময়দা প্রস্তুত করিবার সময় গমের যে অংশটি ত্যাগ করা হয়, সেইটাই হইতেছে গমের সারভাগ। ইহাতে ভিটুমাইন, ফস্‌ফেট্‌, তৈল ও এল্‌বুমেন্‌ আছে। খাদ্য-হিসাবে এগুলির স্থান যে খুবই উচ্চে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। গমের যে অংশ বাদ দেওয়া হয়, তাহা খাইয়া গোরু বাছুরের শরীরের কেমন পুষ্ট হয়, ইহা ত সকলেই দেখিয়াছেন। জাঁতার ময়দায় এ সকল অনেকটা থাকিয়া যায় বলিয়া ইহা এত উপকারী। অতএব দারিদ্র্যই যে জাতীয় স্বাস্থ্যের

অবনতির একমাত্র কারণ, তাহা ঠিক বলা যায় না, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও অবিবেচনাও ইহার জন্ম অল্প দায়ী নয়।

সস্তা খাদ্যের মধ্যে আলু একটা খুব ভাল খাদ্য বলিতে হইবে। গোটা কয়েক-আলু, খানিকটা দুধ এবং একটুখানি ঘি, তেল বা চর্ব্বি খাইয়া স্বাস্থ্য ও শক্তি উভয়ই রক্ষা হইতে পারে। রাঁধার দোষে আলুর পুষ্টিকর অংশের অত্যন্ত অপচয় হইয়া থাকে। সিদ্ধ করিবার সময় কিম্বা ভাজিবার সময় আলুর খোসা একবারে ফেলিয়া দিতে নাই। তাহাতে আলুর ভিটেমাইন্, ফস্ফেট্ ও প্রোটিন্ অংশ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। আলুকে সিদ্ধ করিতে হইলে, তাহার খোসা না ফেলিয়া, সিদ্ধ হইবার পর সন্তর্পণে উপর উপর পাতলা খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হয়। আলুর খোসা ছাড়াইয়া জলে ভিজাইয়া রাখিলে, জলের সঙ্গে আলুর অনেকটা সারপদার্থ বাহির হইয়া যায়। ভাতের ফেন কিছুতেই ফেলা উচিত নয়। চাউলের সারভাগের অনেকটা ফেনের মধ্যে থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ তরিতরকারীর খোসা না ছাড়াইয়া রন্ধন করা হয় না। একটু বিবেচনা করিয়া রাঁধিলে, এগুলিও কাজে লাগাইতে পারা যায়। খোসার মধ্যে পরিপোষক পদার্থ নিতান্ত অল্প থাকে না।

অতিরিক্ত ভোজনে খাদ্যের যতটা অপচয় ও অপব্যবহার হয় এমন আর কিছুতেই নয়। দুঃখের বিষয়, একটু অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে এ অপচয় নিত্যই হয়। গরীবের ভাগ্যে আহার জুটে না, অথচ ধনীরা আবশ্যকের অধিক ভোজন করে। এই কারণেই ত খাদ্য এমন দুর্মূল্য হইয়াছে। আবশ্যকের অধিক ভোজন করিলে, পরিপাক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না– ভুক্তদ্রব্য পেটের মধ্যে পচিতে থাকে এবং তাহাতে একপ্রকার বিষ উৎপন্ন হয়; এই বিষ রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া দেহের অবনতি ও স্বাস্থ্যের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। তাহার জন্য সুখশান্তি সকলই নষ্ট হয়। খাদ্যের আবশ্যক দেহের পুষ্টিসাধন ও শক্তিসঞ্চারের জন্য। যতটা খাইলে, এ উদ্দেশ্যটি সাধিত হয়, তাহার অধিক খাওয়া খাদ্যের অপচয় ও অবমাননা ভিন্ন আর কি বলা যায়। মোটর গাড়ীর তেলাধারে যতটা পেট্রোলিয়ম্ ধরে, তাহার বেশি ঢালিতে গেলে, পেট্রোলিয়মের অপচয় করা হয় মাত্র। খাদ্য সম্বন্ধেও একথাটি যে না খাটে এমন নয়।

যে-সকল ব্যক্তি আবশ্যকের অধিক ভোজন করিতেছে, তাহারা যদি তাহাদের এই কদভ্যাসটি পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, ইহাতে তাহাদেরও মঙ্গল, গরীবদেরও মঙ্গল। তাহাদের রোগে ভুগিতে হয় না, আর গরীবেরা অনাহারে মরে না। সংসারে এত যে অশান্তি, অসন্তোষ, অতৃপ্তি, রোগ শোক, এ সমস্ত দেখিতে দেখিতে অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। অধিক ভোজনের জন্য ধনীর সন্তানদের দেহের পরিণতি হইতে পারে না। সাধারণতঃ ইহাদের দিনে চারিবার খাইতে দেওয়া হয়, ইহার উপর মধ্যে মধ্যে সন্দেশটা কি ফলটা না পড়ে এমন নয়। ইহার জন্য তাহাদের আবশ্যকের অপেক্ষা অধিক ভোজন করা হয়। এই কারণে তাহাদের পরিপাক-যন্ত্রের কাজ ভাল হয় না। এইজন্য শরীরের যথোচিত পরিপোষণ হইতে পারে না। আবশ্যকের অপেক্ষা অল্প খাইলে যেমন দেহের অনিষ্ট সম্ভব, অধিক খাইলেও তাহার লক্ষণ সম্ভাবনা আছে, একথাটি ভুলিলে চলিবে না। দিবসে তিন বারের বেশি আহার করিবার যে কোন আবশ্যক আছে, আমাদের তাহা মনে হয় না। আহারে বসিয়া, সমস্ত ক্ষুধা মিটিবার পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করা উচিত।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস কি করিয়া সম্ভব—ইহা যেমন ভাবিবার বিষয়, খাদ্যদ্রব্যের অপচয় ও অপব্যবহার কি করিলে নিবারিত হয়, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই।

চিকিৎসকের যশ—

বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপের এই ভীষণ যুদ্ধে যে-সকল ডাক্তার আহত ও রোগগ্রস্ত সৈন্যদের চিকিৎসা ও সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সমস্ত সভ্য-সমাজ এক বাক্যে তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। ইঁহারা যে-ভাবে তাঁহাদের নিজের সুখ শান্তি, আরাম বিরাম প্রভৃতি ভুলিয়া, এবং তাঁহাদের নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ বিপদের মধ্যে ফেলিয়া অন্যের জীবন রক্ষা করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে ইঁহাদের এই প্রশংসা যে অন্যায় এবং অকারণসম্ভূত, একথা অবশ্য কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ সময় আমরা একটি কথা না বলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিলাম না। আজ লোকের মুখে এই-সব ডাক্তারদের যতই স্তুতিবাদ ঘোষিত হোক্ না কেন, দুদিন বাদে যখন এই ভীষণ সমরানল নিভিয়া যাইবে, আজিকার এই যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে যখন পুনরায় শান্তি দেখা দিবে, তখন কিন্তু কেহই ভুলিয়াও একবার এই-সব জীবনদাতা ডাক্তারদের নাম করিতে যাইবেন না; তখন বরঞ্চ যে-সকল ব্যক্তি লোকের জীবন সংহারই জীবিকা করিয়াছিল, সেই-সব সৈন্যদেরই সুখ্যাতি শোনা যাইবে। চিকিৎসকের যশের মত এমন ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী জিনিস আর দুটি দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে, বিভিন্নবিভাগে যে-সকল কর্ম্মীপুরুষ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কে কেমন সম্মানের পাত্র সেই বিষয়ে শ্রীযুক্ত পিকারিং Science পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যশের মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য কাহার কিরূপ যোগ্যতা, তাহা স্থির করিবার জন্য আমেরিকায় তিনবার ভোট লওয়া হয়। পিকারিং বলেন এই তিনবারই রাজনৈতিকের দল (politicians) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহাদের পর লেখকশ্রেণীর স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা দর্শন, বিজ্ঞান অথবা অন্য কোন গম্ভীর বিষয়ে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা গল্প বা উপন্যাস-লেখক এবং কবিরা অধিক ভোট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লেখকদের পর সৈন্য ও নাবিকদের স্থান দেওয়া হইয়াছিল। ডাক্তারদের স্থান খুবই নীচে পড়িয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে আমেরিকায় প্রতিদিনই নূতন নূতন কল, নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে, যেখানকার লোকদের অর্থই একমাত্র উপাস্য দেবতা বলিলেই হয়, সেখানে ইন্‌জিনীয়ার, সওদাগররা কি করিয়া এত নীচে পড়িয়া গেল? জনহিতৈষী ও স্বদেশপ্রেমিকের দল আবার সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ভোট প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আমেরিকানদের মত বিষয়বুদ্ধি পৃথিবীতে আর কোন জাতিরই নাই; ইহাদের মত practical বা কৃতকর্ম্মা জাতিও আর দেখা যায় না; ডাক্তার ইন্‌জিনীয়ার ব্যবসাদারদের উপেক্ষা করিয়া ইহারা কেন যে, কবি, ঔপন্যাসিকদের বেশি সম্মান করিয়া থাকে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

* * *

জাতীয় স্বাস্থ্যের চরম উন্নতি কেবলমাত্র স্বাস্থ্যবিভাগের চেষ্টায় সম্ভব নয়—

জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ যথেষ্টই করিতেছেন এবং এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক করিবেন। তথাপি আমরা একথা বলিতে বাধ্য—খুব শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যবান জাতি বলিলে যাহা বুঝায় তাহা কেবলমাত্র স্বাস্থ্যবিভাগের সাহায্যে সম্ভব হইতে পারে না। স্বাস্থ্য-বিভাগের গোঁড়াদের ধারণা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষেই (Faulty environment) যখন ব্যাধির সৃষ্টি, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার

দোষ সংশোধন করিতে পারিল অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্দোষ স্বাস্থ্যবিভাগের সাহায্যে জাতীয়স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ কেনই বা না হইবে। প্রথম শুনিলে কথাটার মধ্যে যে কোনপ্রকার ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে, সে কথা আমাদের মনেই হয় না। তথাপি ইহার মধ্যে একটা ভারি মারাত্মক ভুল রহিয়াছে। ভুলটা এত বড় যে তাহা উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। প্রকৃতির চোখে ধূলা দেওয়া বড় সহজ কথা নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রত্যেকের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিলেই, প্রকৃতি প্রসন্নচিত্তে নীরব থাকিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। প্রকৃতি কোন কালেই তাহা করে নাই, কখন যে করিবে তাহার আশাও করা যায় না। জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাই। এই যে আমরা যাহাকে অভিব্যক্তি বলি, সেটা কি? সে ত শুধু যাহারা জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার অনুপযোগী, তাহাদের সরাইয়া, যাহারা যোগ্যতর, তাহাদিগকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিবার একটা অন্তহীন অবিশ্রাম, ধারাবাহিক চেষ্টার কাহিনী ভিন্ন আর কিছুই নয়। কোন জাতির শ্রেষ্ঠ অঙ্গের যোগ্যতা যদি কিছু থাকে, তাহাকে অক্ষুন্ন রাখিবার, ইহাই ত একমাত্র সনাতন রীতি। অযোগ্যদের সরাইয়া যোগ্যদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলা ভিন্ন আর ত দ্বিতীয় উপায় দেখা যায় না। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিদ্‌রা অবশ্য প্রকৃতির এই নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিধি উল্টাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট এবং তাঁহারা এমনও আশা রাখেন একদিন-না-একদিন কৃতকার্য্যও হইবেন। কিন্তু সে আশা তাঁহাদের দুরাশামাত্র। মানবজাতি যদি সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্ত্তনশীল থাকিত, যদি পুরুষানুক্রমে মানুষের মধ্যে কোন-রকমই পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা না রহিত, তবে বরঞ্চ একদিন তাঁহাদের সুখস্বপ্ন সত্য হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু কোন জাতিই কোন কালেও একই অবস্থায় থাকে নাই এবং থাকিবেও না। জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। খুব সাধারণ উপযোগিতা হয়ত অনেকেরই নাই। এক পিতামাতার পাঁচটি সন্তান ঠিক একরকম হয় না। কেহ হয়ত সাধারণ উপযোগিতা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, কেহ হয়ত খুবই নীচে পড়িয়া আছে। এই জন্য জাতীয় অবনতি নিবারণ করা একেবারে অসম্ভব, যদি সম্পূর্ণ অযোগ্যদের সংসার হইতে একেবারে সরাইয়া না ফেলা হয়। অক্ষম অযোগ্যদের যদি অপর সাধারণদের মত বংশবিস্তার করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে জাতির মধ্যে পুরুষানুক্রমে অযোগ্যের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

যোগ্যতা শব্দটি এস্থলে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণ যোগ্যতা সম্বন্ধেও যে নিয়ম কোন একটি বিশেষগুণ সম্বন্ধেও ঠিক একই নিয়ম বুঝিতে হইবে। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। মনে করা যাক এমন একটা জাতি গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহাদের সকলেরই দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নির্দ্দোষ। ইহা করিতে হইলে, ঐ জাতির মধ্যে যাহারা দূরের জিনিস ভাল দেখিতে পারে না (myopic), দল হইতে তাহাদের বাহির করিয়া দিতে হইবে। তাহা যদি না করা হয়, তাহা হইলে myopic (দূরের জিনিস দেখিতে না পাওয়া) দোষটা পুরুষানুক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকিবে। সভ্যজাতির মধ্যে একাল পর্য্যন্ত তাহাদের বাদ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। কাজেই সভ্যজাতিদের কাহারও দৃষ্টিশক্তি যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহা বলিবার উপায় নাই। এ দোষটার সম্বন্ধে অবশ্য একথা বলা যাইতে পারে যে, দোষটা তেমন মারাত্মক নয়, কেননা চশমার সাহায্যে দোষটার সংশোধন সম্ভব। এই কারণে এটাকে বরং আমরা এখন একরকম স্নেহের চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি, দোষ বলিয়াই মনে করি না। চশমা পরার ইচ্ছাটা এখন আমাদের মধ্যে যেন সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এমন অনেক দোষের নাম করা যাইতে পারে—যাহাদের সংশোধনের উপায় নাই। অথচ এই-সব দোষ যাহাদের আছে, তাহারা বিবাহাদি করিয়া অপরের মত বংশবিস্তার করিতেছে। ইহার ফলে জাতীয় স্বাস্থ্যের দিন দিন অধোগতি হইতেছে। প্রতিদিনই সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা এমন অনেক লোক দেখিতে পাই, যাহাদের দেখিলে মনে হয়, ইহাদের জীবনধারণ শুধু বিড়ম্বনা মাত্র—যতটুকু উপযোগিতা থাকিলে জীবনটা অন্ততঃ রাখিবার মত হয়, ইহাদের সেটুকু যোগ্যতাও নাই। ইহারা যতদিন বাঁচিয়া থাকে কেবল নিরানন্দই ভোগ করে—আনন্দের আস্বাদ কদাচিৎ টের পায়। ইহাদের জন্য ত কিছুই করিবার নাই। তবে এই হতভাগ্যদের অনর্থক সমাজে থাকিতে দিয়া কি লাভ? প্রকৃতি অনেক সময় অমঙ্গল দিয়া মঙ্গলকেই বরণ করিয়া লয়। প্রকৃতির এই বিরাট সংহার অস্ত্রই বা ইহাদের প্রতি প্রয়োগ না হইবে কেন? ইহার অপেক্ষা কোন কথাই বেশি সত্য ও বড় নয় যে, অবিশ্রান্ত চেষ্টাদ্বারা সমাজ হইতে সম্পূর্ণ অনুপযোগীদের সরাইয়া না ফেলিতে পারিলে জাতীয় উৎকর্ষ চরমসীমায় উপনীত হইতে পারে না।

কিন্তু এই-সব অযোগ্য অক্ষম ব্যক্তি যাহারা জাতীয় যোগ্যতার উন্নতির অন্তরায় তাহাদের সরাইবার কি উপায়? প্রকৃতির ব্যবস্থা ত একান্ত নির্ম্মম। প্রকৃতি জাতির উন্নতির জন্য ব্যক্তিবিশেষকে বলি দিতে তিলমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। সে জাতির কথাই ভাবে, মানুষটির কথা নয়। সমাজের মধ্যে যদি কোন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত লোক থাকে, তাহাকে সরাইবার উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য এই যে, তাহার আর বংশবিস্তারের সম্ভাবনা থাকে না—সে এমন কাহাকে রাখিয়া যাইতে পারে না, যে উত্তরাধিকারসূত্রে তাহার অক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রকৃতি এ উদ্দেশ্য সাধন করে, একবারে তাহার সংহারমূর্ত্তিতে। সে বেচারাকে একবারেই পৃথিবী হইতে অপসৃত করিতে চাহে। কিন্তু অতদূর না গিয়াও যে উদ্দেশ্যটি সফল না করা যায় এমন নয়। অক্ষম অযোগ্য লোকেরা যদি কোন মতেই বিবাহ না করে—চিরকালই কুমার থাকে, তাহা হইলে না মরিয়াও সমাজের চক্ষে তাহারা মৃতেরই মত হয়—কেননা তাহাদের বংশে বাতি দিবার জন্য কেহই থাকে না।

এই কারণে জাতীয় সামর্থ্যের উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে, জাতির মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল ও অক্ষম, তাহাদের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহাদি হইতে বিরত থাকিতে হইবে। বিবাহ করিয়া অক্ষম, দুর্ব্বল বংশ স্থাপন করা কোন মতেই উচিত নয়। আমাদের আশা হয় এইরূপ চিরকুমারের সমস্যা একদিন চরম সীমায় উপনীত হইবে। এমন একদিন আসিবে, যে সময় অক্ষমদের বংশবিস্তারের চেষ্টাকে লোকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতে থাকিবে।

এইরূপে অক্ষম অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিরা যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বংশবিস্তার করিতে ক্ষান্ত থাকে, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে জাতীয় উন্নতি বিবিধ ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকিবে। মানসিক ও দৈহিক শক্তি উৎকর্ষ লাভ করিবে, রোগের আক্রমণ বহু পরিমাণে হ্রাস হইতে থাকিবে এবং লোকের পরমায়ু যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

উপসংহার-কালে একটি কথা বলিয়া রাখি—সংস্কার কাজটা রাতারাতি করিতে গেলে কোন কালেই সফল হইতে দেখা যায় না। পুরাতনকে একদিনে বিদায় করিয়া নূতনকে বরণ করিবার উদ্যোগ করিতে গেলে, পুরাতনও যায়, নূতনও আসে না। ফলে সমাজে একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়। জাতীয় উন্নতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, বিবাহ ও বংশবিস্তারের স্বাধীনতা সমাজের সকলেরই থাকা উচিত নয়, সে কথা খুবই ঠিক। কিন্তু এ আইন রাতারাতি জারী করা যায় না। ইহাকে ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করাইতে হইবে।

লোকদের ইহার উপকারিতা বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে।

আমাদের বিশ্বাস চিকিৎসক-সম্প্রদায় চেষ্টা করিলে কাজটা শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

* * *

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম—

চীন হইতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কালক্রমে সেই ধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাহার মধ্যে দাই-নিচি বৌদ্ধ-সম্প্রদায় প্রধান।

জাপানের পুরাণে সূর্য্যদেবতার নাম দাই-নিচি—দাই মানে মহান্ আর নিচি মানে সূর্য্য। এই পৌরাণিক দেবতার সহিত নবাগত বুদ্ধদেবকে এক করিয়া তোলা হইয়াছিল। আসলে এই সম্প্রদায়ের উপাস্য বুদ্ধদেবের সংস্কৃত নাম ছিল শ্রীমহা-বৈরোচন-তথাগত। প্রথমে উহার পরিবর্ত্তন হয়—বিরুশানো-নিয়োরাই—অর্দ্ধেক সংস্কৃত ও অর্দ্ধেক জাপানী, নিয়োরাই মানে উপশম, তথাগত শব্দের বদলে জাপানীরা ইহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। পরে আধা সংস্কৃত আধা জাপানী কথাটাকে পুরা জাপানী করা হইল—দাইনিচি নিয়োরাই।

কঙ্গো-কাই বুদ্ধ যে-ভাবে হাত রাখেন তাহাতে জগতের জ্ঞান তাঁহার আয়ত্ত ইহাই বুঝানো হয়। কঙ্গোকাই বুদ্ধের মুকুটে পাঁচটি তাইজো-কাই বুদ্ধমূর্ত্তি ও তাইজো-কাই বুদ্ধের মুকুটে পাঁচটি কঙ্গো-কাই বুদ্ধমূর্ত্তি থাকে। তাহার দ্বারা জ্ঞান ও নিয়মশৃঙ্খলার সুসংগ্রস যোগ সূচিত হয়।

তাইজো-কাই বুদ্ধের গায়ের রং সোনালি—তাহা অপরিবর্ত্তনের চিহ্ন। কঙ্গো-কাই বুদ্ধের রং শ্বেত। উভয় বুদ্ধই পদ্মাসনে উপবিষ্ট—পদ্ম অপরিবর্ত্তন ও শান্তির চিহ্ন। তাইজো-কাই বুদ্ধের পদ্মাসন রক্ত-বর্ণ; কঙ্গো-কাই বুদ্ধের শ্বেত।

কেহ কেহ মনে করেন দাইনিচি নিয়োরাই স্বয়ং শাক্যমুনি। কেহ আবার মনে করেন দাইনিচি নিয়োরাই আসল বুদ্ধ—বুদ্ধের নিরঞ্জ-মূর্ত্তি, তিনি সমস্ত বস্তুর হেতু ও কর্ত্তা; এবং শাক্যমুনি তাঁহারই অবতার মাত্র—গুণময় ব্যক্তি মাত্র।

বুদ্ধদেবের এই দুই আকারের চিহ্নরূপে দুইটি সংস্কৃত অক্ষর ব্যবহৃত হয় এবং তাহা প্রায়ই পদ্মাসনের সম্মুখের পাপড়িতে অথবা কখনো কখনো ছত্রাতপে লেখা থাকে। দাইনিচি নিয়োরাই বুদ্ধ কখনো কখনো স্তূপ-রূপে চিহ্নিত হন। তাইজো-কাই বুদ্ধের স্তূপ পাথরের, পাঁচ তলা—চতুরস্র, মণ্ডল, ত্রিভুজ, চন্দ্রকলা, বুদ্বুদ,—যথাক্রমে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সূচনা করিয়া থাকে। কঙ্গো-কাই বুদ্ধের

জাপানী বুদ্ধমূর্ত্তি
(দাইনিচি নিয়োরাই তাইজো-কাই।)

জাপানী বুদ্ধমূর্ত্তি
(দাইনিচি নিয়োরাই কঙ্গো-কাই।)

দাইনিচি নিয়োরাই জগতের সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার দুই দিক আছে—(১) তাইজো-কাই বা অপরিবর্ত্তনীয় সত্য নিয়ম ও (২) কঙ্গো-কাই বা সত্য জ্ঞানের জগৎ। এই দুই দিক অনুসারে দাইনিচি নিয়োরাই দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে পূজিত হন। তাইজো-কাই বুদ্ধ কোলে হাত রাখিয়া বসিয়া থাকেন, তাহার মানে এই যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু একই নিয়মে বিধৃত হইয়া আছে। বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলি বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল ও অন্তর-ইন্দ্রিয়গুলি ডাহিন হাতের পাঁচ আঙুল দ্বারা সূচিত হয়। বুদ্ধের যুক্ত পাণি এই বুঝায় যে অন্তরের সহিত বাহিরের যোগ নিত্য; এবং ডাহিন হাত বাঁ হাতের উপরে থাকিয়া এই জানায় যে বাহ্য বস্তু অপেক্ষা অন্তর-বৃত্তি প্রধান ও প্রবল।

স্তূপ কাঠের হয়; তাহা মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহাতে পরলোকগত আত্মার সহিত বুদ্ধের যোগ বুঝায়।

যে দুইটি সংস্কৃত অক্ষর বুদ্ধের পদ্মাসনের পাপড়িতে লেখা থাকে, তাহার একটি অ (তাইজো-কাই বুদ্ধের চিহ্ন) ও অপরটি বং (কঙ্গোকাই বুদ্ধের চিহ্ন)। এই দুটি অক্ষরের রূপ অবিকল-বাংলা অক্ষরের ন্যায়। ইহা হইতে দুইটি অনুমান কতকটা সমর্থিত হয়—(১) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পুরাবিদেরা যে অনুমান করিয়াছেন যে বাংলা অক্ষর দেবনাগর অক্ষর অপেক্ষা প্রাচীন তাহা, এবং (২) পরলোকগত শ্রীযুক্ত ওকাকুরা প্রমুখ বিজ্ঞেরা যে বলিতেন যে জাপানী ও কোরিয়াবাসীরা বাঙালী ও চীন উপনিবেশীদের মিশ্রণ-জাত জাতি
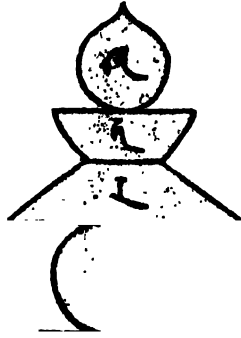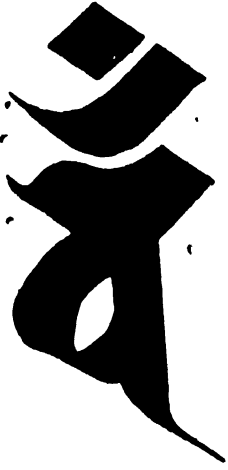
জাপানী বুদ্ধ দাইনিচি নিয়োরাই কঙ্গো-কাই মূর্ত্তি বুঝাইবার চিহ্ন স্পষ্ট বঙ্গাক্ষর বঁ বা বং।

জাপানী বৌদ্ধস্তূপগাত্রে সংস্কৃত অক্ষর।

জাপানী বুদ্ধ দাইনিচি নিয়োরাই তাইজো-কাই মূর্ত্তি বুঝাইবার চিহ্ন জাপানী-ঢঙের সংস্কৃত বা বঙ্গাক্ষর অ।

তাহা। কোন্ সুদূর অতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলা অক্ষর জাপানে পূজিত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে ইহা ভাবিলেও বাঙালীর আনন্দ ও গর্ব্ব হয়। যাহা অতীতে হইয়াছিল তাহা ভবিষ্যতেও হইতে পারিবে এই আশা জন্মে।

* * *

জাপানীদের কর্ম্মনৈপুণ্য—

হাতের কাজে জাপানীরা জগতের সকল জাতির চেয়ে নিপুণ। ছেলেবেলা হইতেই দুইটি মাত্র কাঠির সাহায্যে খাওয়া অভ্যাস করিতে করিতে উহাদের আঙুলগুলি কর্ম্মচাতুর্য্য লাভ করে। জাপানীরা অতি সত্বর ও সহজেই কাগজ দিয় কুকুর ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু গড়িতে পারে এবং সরু সরু কাগজের ফালি জড়াইয়া দড়ি পাকাইতে পারে। জাপানী কাগজ একটু কড়া ও মড়মড়ে বলিয়া কাগজ হইতে প্রজাপতি, বক, ব্যাং, নৌকা প্রভৃতিও সুন্দর তৈয়ার হয়।

জাপানীদের পা হাতের ন্যায়ই দক্ষ। তাহারা পা দিয়া দড়িতে গেরো কষিতে বা দড়ির গেরো খুলিতে পারে। কাঠের উপর বা পর্দ্দার গায়ে রেশমের যে-সব তোলা নক্‌সা করা হয়, তাহাও উহারা পা দিয়াই করে। গেতা বা খড়ম, মোজা প্রভৃতি উহারা হাত না লাগাইয়া কেবল পা দিয়াই পরিয়া থাকে। উহারা পায়ের আঙুল দিয়া সেলাই পর্য্যন্ত করিতে পারে। জাপানীদের পায়ের আঙুল খুব খেলে বলিয়া উহারা গাছে পাহাড়ে খাড়া দেয়ালে খুব সহজে তরতর করিয়া উঠিতে পারে। জাপানীরা হাতে পায়ে সমান দড় বলিয়া আমেরিকায় জাপানী মজুরদের উপর আমেরিকানদের অত আক্রোশ। জাপানীরা ধোপার কাজে খুব নিপুণ; উহাদের চতুর আঙুলগুলি কাপড়ে ফুল কোঁচাইতে অতীব দক্ষ। জাপানী ছুতার জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উহাদের আঙুলের বোধশক্তি প্রবল বলিয়া উহারা নক্‌সা কাটিতে অদ্বিতীয়।

জাপানীদের মনের আন্দাজ করিবার শক্তিও খুব প্রবল। উহারা এক চমক দেখিয়াই বা কোনো জিনিষের একাংশ মাত্র দেখিয়াই উহার সর্ব্বাঙ্গ আন্দাজ করিয়া লয়। সেই আন্দাজ যখন চিত্রে বা মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় তখন উহা বস্তুতন্ত্র হয় না বটে, কিন্তু তাহাতে বস্তুর প্রাণের পরিচয় ধরা পড়ে। ইহাতে তাহাদের অঙ্কিত ছবি বা মূর্ত্তি বাস্তব হয় না—হয় মাত্র ভাবের ছাপ, অনুভবের প্রকাশ মাত্র। তুলির দুই চারি পোঁচে একটা পাখী বা ঘোড়া আঁকিলে তাহা বস্তুতন্ত্র না হইতে পারে, কিন্তু আসল জিনিষটার অন্তরভাবটি ঠিক প্রকাশ পায়। এইজন্য ভাবুক ব্যতীত অপরে জাপানী আর্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এইরূপ ভাবপ্রাধান্য জাপানের সাহিত্যের মধ্যেও দেখা যায়। উহাদের সাহিত্য অতি সামান্য উপকরণে গঠিত; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে বিষয়ের প্রাণটিকে ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দেখানো।

জাপানীদের হাতের লেখাতেও তাহাদের নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। অক্ষর নয় ত চিত্র।

কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য প্রভাবে পড়িয়া জাপান কলকারখানার মধ্যে জড়াইয়া গিয়া তাহার জাতীয় নিপুণতা হারাইতে বসিয়াছে।

জাপানের ন্যায় ভারতের কারিগরদেরও হস্তনৈপুণ্য জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। এখন ভারতের অক্ষমতাই সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে শুনা যায়। হায় অদৃষ্ট! চারু।

জাগরণ

চন্দ্র আছে পথ চেয়ে, মৌন অন্ধকারে—
ওগো প্রিয়, তব আঁখি-আলোক মাগিয়া,
নিশিশেষ-স্বপনের জাল বুনিবারে
চেয়ে আছে, সারানিশি একেলা জাগিয়া!

বন্ধু মোর ওঠ জেগে, চাও একবার,
কিরণ-কটাক্ষে তব কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দূরে পলাইয়া যাক আকুল আঁধার;
আধ ঘুমে সাড়া দিক দয়েল পাপিয়া!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পরগাছা

(৬)

প্রভাতে বৃদ্ধ কেনারাম বাঁড়ুজ্জে একটা থেলো হুঁকায় মা নল লাগাইয়া টানিতে টানিতে খালি গায়ে খালি ায়ে মাথায় একখানি গামছা পাট করিয়া বসাইয়া বৃন্দাবন গাসাইএর বাড়ীতে আসিয়া ডাকিল—বৃন্দাবন ভায়া, াড়ী আছ?

বৃন্দাবন রকের উপর উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতে-ছলেন, তাড়াতাড়ি হুঁকাটা এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়া াখিয়া দিয়া বলিলেন—আসুন দাদা। ওরে রাখাল, এক-ানা মাদুর এইখানে পেড়ে দে ত।

রাখাল লজ্জিত মুখে আসিয়া মাদুর পাতিয়া দিল। কনারাম মুড়ো-করিয়া ছাঁটা পাকা গোঁফের তলা হইতে াসিয়া বলিল কি রে শালা, রাজার জামাই হয়ে গেলি! ামি ঘটক, বুঝলি ত, বখরা দিতে হবে!

রাখাল সেখান হইতে মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল। ক কথা হয় শুনিবার জন্য মাধবী সেখানে আসিয়া দাঁড়াই-লন এবং নারাণদাসী ঘরের দরজার আড়াল হইতে উঁকি মারিতে লাগিল।

বৃন্দাবন উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—তারপর দাদা, শুভ কার্য্যটা হবে ত?

কেনারাম ছাঁটা গোঁফ চুমরাইয়া, খড়ো ঘরের ছাঁচ-তলা হইতে উননের ধোঁয়া বাহির হওয়ার মতন গোঁফের তলা হইতে তামাকের ধোঁয়া ছাড়িয়া, খুব গ্রামভারী চালে বলিল—হাঁ। হবে বৈ কি। কেনারাম বাঁড়ুজ্জে যে কাজে হাত দিয়েছে সে কাজ কি না-হয়ে যায়? আমি কাল টেলিগেরাম করেছিলাম,—

হাতের মুঠার ভিতর হইতে টেলিগ্রামের একখানা লাল খাম মাদুরের উপর ফেলিয়া দিয়া কেনারাম বলিতে লাগিল —এই দেখ তার জবাব এসেছে। ওরে রাখাল, এইটে পড়ে শুনিয়ে দিয়ে যা ত...

রাখাল আবার মাথা নীচু করিয়া লজ্জিতভাবে সেখানে আসিল। বৃন্দাবন টেলিগ্রামটা তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। রাখাল পড়িল—Agreed, marriage settled 23rd Asarh, come with bridegroom, letter follows.

কেনারাম বিরক্ত হইয়া বলিল—তোকে ঐ ক্যাটর-ম্যাটর কথাগুলো পড়তে কে বল্লে? বাংলা ক'রে পড়্ যে বুঝি।

রাখাল টেলিগ্রামের কাগজের দিকে নজর রাখিয়া অর্থ করিয়া শুনাইল—রাজি, বিবাহ স্থির ২৩শে আষাঢ়, বর নিয়ে এস, চিঠি যাচ্ছে।

রাখাল আস্তে আস্তে কাগজখানি মাদুরের উপর রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কেনারাম তামাটে গোঁপজোড়া নাড়িয়া বলিল—এদিককের ত সব ঠিক। কিন্তু রাখালের পৈতেটা ত দিয়ে দিতে হয়।

বৃন্দাবনের প্রফুল্ল মুখ শুকাইয়া উঠিল। আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—যারা বিয়ে দিচ্ছে তারা পৈতেটা দিয়ে নেবে না?

কেনারাম হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—আরে রাম, তাও কি কখনো হয়? ষোল সতর বছরের একটা ছেলেকে নিয়ে যাব অপৈতক, লোকে কি বিশ্বাস করবে যে ও বামুনের ছেলে? পৈতের বয়েস উৎরে গেছে, এখন প্রাচিত্তির করিয়ে পৈতে দিতে হবে। কাজেই পৈতে দেওয়াটা এখান থেকেই সেরে নিতে হবে। নইলে আমাদের গাঁয়ের, এই দক্ষিণদেশের ভারি নিন্দে হবে। ওরা একেই দক্ষিণদেশী বলে আমাদের ঠাট্টা করে।

বৃন্দাবন ওজর তুলিয়া বলিলেন—এর মধ্যে কি আর পৈতের দিন আছে?

—পাঁজিখানাই একবার দেখ না?

বৃন্দাবন ঘরের দিকে চাহিলেন। ক্ষণেক পরেই এক-খানা পাঁজি দরজার ফাঁক হইতে আসিয়া ধুপ করিয়া মাদুরের উপর পড়িল।

বৃন্দাবন পাঁজি তুলিয়া এ-পাত সে-পাত উল্টাইয়া একটু মুখ বাঁকাইলেন।

কেনারাম বলিল—কি দেখছ?

—দুটো দিন আছে, একটা তিরিশে জোষ্টি, আর-একটা তেরই আষাঢ়।

কেনারাম বলিল—তা বেশ, তিরিশে হয়ে না ওঠে তেরই হবে। আমরা এখান থেকে আঠারই উনিশে রওনা হয়ে যাব।

ঘরের মধ্যে চুড়িবালা খুব ঝনঝন করিয়া উঠিল। বৃন্দাবন কথা টানিয়া বলিলেন—আ—চ্ছা দে—খি।

কেনারাম উঠিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—যা ঠিক কর চটপট করে বোলো, তাদের আবার লিখতে জানাতে হবে ত। ওরা হল গিয়ে রাজা, রাজার ঐ এক মেয়ে, তারা রীতিমত উজ্জুগ আয়োজন করবে...তারা আষাঢ় মাস পেরুতে দেবে না, মেয়ে তের চোদ্দ বছরের হয়ে গেছে, চারিদিকে ছেলে খুঁজতে লেগে গেছে।

কেনারাম চৌকাঠ ডিঙাইতে না-ডিঙাইতে নারাণদাসী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিয়া উঠিল—জোষ্টি মাসে জ্যেষ্ট ছেলের পৈতে কি করে হবে? আষাঢ় মাসে মেঘ ডাকবার ভয় আছে। শীতকাল নইলে কি ছেলের পৈতে দ্যায়?

মাধবী কাতর দৃষ্টিতে নারাণদাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া করুণ স্বরে বলিলেন—জোষ্টি মাসের তের দিন বাদ দিয়ে ত জ্যেষ্ট ছেলের বিয়ে পৈতে হতে পারে বৌ! আর যার তিন কুলে কেউ নেই তার আবার লক্ষণ অলক্ষণ।

নারাণদাসী দরদ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—ষাট ষাট! অমন কথা কি বলতে আছে! আমরা বুঝি পর, আমরা বুঝি ওর কেউ নই? এখন আবার একটা পরের মেয়ের হাত ধরতে যাচ্ছে! আহা তাদের মা-বাপের ঐ একটি!

—বলিয়া নারাণদাসী একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

মাধবী তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার আকস্মিক স্নেহের আতিশয্য দেখিয়া নিরুপায় ভাবে মিনতি করিয়া বলিলেন—তবে না হয় আষাঢ় মাসেই হবে। কিন্তু তাতে আপত্তি কোরো না বৌ।

নারাণদাসী কিছু না বলিয়া বৃন্দাবনের মুখের দিকে চাহিল। সে চাহনির অর্থ—এইবার তোমার ওজর করিবার পালা।

বৃন্দাবন কোণ হইতে হুঁকাটি উঠাইয়া লইয়া বলিলেন—এর মধ্যে উজ্জুগ আয়োজন হয়ে উঠবে কেমন করে?

মাধবী বলিলেন—বড় সাধের বিয়ে তার আবার দু পায়ে আলতা! না হলে নয় তাই মাথাটা মুড়িয়ে গলায় তে-দণ্ডি সুতো ঝুলিয়ে দেওয়া। এর আর কি উজ্জুগ করতে হবে দাদা!

বৃন্দাবন ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে বলিলেন—আমার নলকাঁপার শিষ্যি নফর কুণ্ডুর বৌ বলেছিল যে এবারকার পাট বিক্রী হলেই রাখালের পৈতে দিয়ে দেবে। তাতে ঘটা করে পৈতেটাও হত, আমাদেরও দু পয়সা ঘরে আসত।

মাধবী কাতর হইয়া বলিলেন—কিন্তু দাদা, কেনা-দাদা বলে গেল রাজারা আর অপিক্ষে করবে না।

বৃন্দাবন গম্ভীর হইয়া হুঁকার মুখ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—তা যদি অপিক্ষে না করে, কি করব বল, রাখালের অদেষ্টে রাজভোগ নেই বুঝতে হবে। আমি এখন কোত্থেকে পৈতের খরচপত্তর কবব। আমাদের ত শিষ্যি-সেবকের নিয়েই নাচন-কোঁদন।

মাধবী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন—তবে কি হবে দাদা!

—আমি আর কি বলব বল। রাধাকান্ত যা করবেন তাই হবে।—বলিয়া বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিলেন। পিছনে পিছনে নারাণদাসীরও অন্তর্ধান।

ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাধবী ডাকিয়া বলিলেন—দাদা, আমার ত একখানা গহনাপত্তরও নেই যে তাই বাঁধা দিয়ে কি বেচে ওর পৈতেটা দিয়ে দেবো। ওর মায়ের হার আর বালা তোমাদের কাছে ছিল, তাই বেচে ওর পৈতেটা দিয়ে দাও।

নারাণদাসী বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ওমা! সে কি কথা ঠাকুরঝি? ভারি ত সে বালা হার, হাল্কা ফঙফঙে, মরা সোনার,—সে বেচে তিন কুড়ি টাকাও হয়নি। এতকাল যে রাখালের ইস্কুলের মাইনে গুণলাম, সে কোত্থেকে? আমাদের ত আর বাঁধা হুণ্ডি নেই!

মাধবী অবাক হইয়া খানিকক্ষণ নারাণদাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নারাণদাসী সঙ্কুচিত হইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া নিরুপায়ের কাতরতায় ব্যাকুল হইয়া মাধবী বলিলেন—তবে কি হবে বৌ? শেষকালে কি আমাকে দোরে দোরে ভিক্ষে করে রাখালের পৈতে দিতে হবে?

নারাণদাসী তাহার নথটিতে একটু দোল খাওয়াইয়া মুখ ঘুরাইয়া বিরক্তির স্বরে বলিল—তোমার যে দেখছি ধনুকভাঙা পণ ঠাকুরঝি ! বাবা ! একটু তর সয় না ! এত-কাল গেল আর এই ক'টা মাস বৈ ত নয়, মাঘ মাসেই নফর কুণ্ডুর বৌ পৈতের খরচ ত দেবে বলেছে !

মাধবী দৃঢ়স্বরে বলিলেন– সে ত আজ তিন বচ্ছর ধরে শুনে আসছি বৌ ! রাখালের এই বিয়ে আমি কস্মিনকালেও হতে দেবো না। তাতে আমাকে ভিক্ষে করতে হয় তাও স্বীকার !

নারাণদাসী ফর্‌কিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে পরম ঘৃণার ভরে বলিয়া গেল— তা তোমার যেমন পিরবিত্তি।

মাধবী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে দাদা, আমি গাঁয়ের লোকের কাছে ভিক্ষে করিগে ?

বৃন্দাবনের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তাহাদের মনে বোধ হয় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মাধবী তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিবার ফন্দিতে আছেন। ইঁহারা যখন কিছুতেই উপুড়-হস্ত করিবেন না, তখন বাধ্য হইয়া মাধবী তাহার লুকানো পুঁজি-পাটা বাহির করিবেন। সত্য-সত্য তিনি আর কখনো দাদার মুখ হেঁট করিয়া গাঁয়ের লোকের কাছে ভিক্ষা করিতে যাইতে পারিবেন না। বৃন্দা-বন মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে মাধবী যদি নেহাতই নিজের পুঁজি না ভাঙেন তবে তিনি নমোনমঃ করিয়া রাখালের পৈতেটা দিয়া দিবেন। কিন্তু নারাণ-দাসীর সঙ্কল্প ছিল চরম কঠিন—যাহারা অন্নধ্বংস করিতেছে তাহাদের জন্য উপরি বাজে খরচ কিছুতেই নয় ; তা মাধবী যদি ভিক্ষা করেন করুন, তাহাতে তাহারা অপমান গায়ে পাতিয়া লইবে না।

মাধবী সেখান হইতে চলিয়া গিয়া পাঠে রত রাখালকে বলিলেন—রাখাল, রান্নাঘরে ভিজে ভাত আছে ; আর-কোনো তরকারি পেলাম না ভাই, একটা কাঁচকলা পুড়িয়ে ঢেকে রেখে গেলাম ; খেয়ে ইস্কুলে যাস। আমি পৈতের জোগাড় করতে যাচ্ছি।

এতকাল পরে তাহার পৈতা হইবে শুনিয়া রাখালের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে তখনো জানে না যে তাহার অমন তেজস্বিনী দিদিমা তাহার ভাবী সুখের জন্য কি দারুণ অপমান স্বীকার করিতে যাইতেছেন।

মাধবী চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া বৃন্দাবন একবার রাঙা বৌএর মুখের পানে তাকাইলেন। নারাণদাসী ভাব বুঝিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—যাক গে ! বোনের মেয়ে ভাগ্নী, তার ছেলে, বৈ ত নয়। এতে তোমার কিছু অপমান নেই।

বৃন্দাবনের মুখ ফুটিল, একটু কিন্তু-ভাবে বলিলেন—রাখালের বড়লোকের বাড়ী বিয়ে হলে নানারকম পাওনা-থোওনাতে এ খরচটা উঠে যেত। মাধী যদি গাঁ জানিয়ে পৈতে দ্যায়, রাখালের মন চটে থাকবে।

নারাণদাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিল—ভাবো কেন ? ওর দিদিমা ত আমাদের এক্তেয়ারীতেই রইল। দিদিমাকে সুখে রাখবার জন্যে ও আমাদের একেবারে ঠেলে ফেলতে কিছুতেই পারবে না।

বৃন্দাবন সন্দেহাকুল স্বরে বলিলেন—রাখাল যদি তার দিদিমাকে নিজের কাছে নিয়ে যায় ?

নারাণদাসী নথ দুলাইয়া বলিল—ভাবো কেন ? রাজারা মাওড়া ডোকলা ছেলে খুঁজছে, যে, মেয়ে ছাড়া আর কোনো দিকে জামাইএর টান থাকবে না। তারা জামাইএর দিদিমাকে নিয়ে যেতে দিলে ত ? আর যদিই বা নিয়ে যেতে চায়, ঠাকুরঝি যাবে না—এই ভাইএর ভিটেয় উপোস করে মরবে, তবু নাতির রাজা-শ্বশুরের বাড়ী যাবে না। হয় না-হয়, দেখে নিয়ো।

বৃন্দাবন রাঙা বৌএর কথা সুযুক্তি বলিয়া মানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া হুঁকা ফুঁকিতে লাগিলেন।

(৭)

প্রসাদী স্নান করিয়া নিংড়ানো ভিজা কাপড়ে গামছা-খানি জড়াইয়া ঘাটের তোলো রাখিয়া কাঁধের কাছে উঁচু করিয়া ধরিয়া আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। সম্মুখেই মাকে দেখিয়া বাধিত স্বরে বলিল—মা, রাখালদার পৈতে গাঁ থেকে ভিক্ষে করে হবে ; গোসাঁইদাদা পৈতের খরচ দেবে না।

প্রসাদীর মা বলিলেন—দূর, তা আবার কখনো হয় ?

প্রসাদী জোর করিয়া বলিল—হ্যাঁ, আমি শুনে এলাম মাধী-ঠাকুরমা বড়গোসাঁইকে বলছে। মাধী-ঠাকুরমা এখুনি ফিরিবে, তুমি হয় নয় জিজ্ঞাসা কর।

দীর মা ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন—আচ্ছা তুই যা, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকগে, মাধী-পিসি এদিক দিয়ে গেলে ডেকে আনবি।

প্রসাদী মাধবীকে ডাকিয়া আনিল।

প্রসাদীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন—পিসিমা, সত্যি ?

ছলছল চোখে মাধবী বলিলেন—আমার পোড়াকপালে সবই সত্যি হয় বৌমা।

—কি ঠিক হল ?

—বড়গোসাঁই আর কেনা-দাদা ভার নিয়েছে, গাঁ থেকে চাঁদা তুলে এই তিরিশে জ্যেষ্টিই পৈতে দিয়ে দেবে।

প্রসাদীর মা কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—পিসিমা, আমি একটা কথা বলব ?

মাধবী উৎসুক ও আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি বলবে বৌমা ?

প্রসাদীর মা ব্যথিত স্বরে বলিলেন—আমাদের বড় সাধ ছিল, রাখালের সঙ্গে পেসাদীর বিয়ে দেবো। তা যখন হল না, রাখালের পৈতে আমিই দেবো; ভিক্ষে করে ওর পৈতে হতে দেবো না।

মাধবীর অশ্রুসাগরে বান ডাকিল। ধৈর্য্যের সংযের বাঁধ ভাঙিয়া অশ্রুর স্রোত বেগে বহিতে লাগিল। এ কান্না বড় দুঃখের, বড় আনন্দের। প্রসাদীর মারও চোখ হইতে জল পড়িতেছিল। তাহাদের দেখাদেখি অবুঝ দুঃখে প্রসাদীর চোখ দুটিও শুষ্ক ছিল না।

মাধবী একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—বৌমা, তুমি রাখালের মা, তুমিই রাখালের পরম লজ্জা নিবারণ করলে। রাখাল তোমার। তুমি পেসাদীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও দিও, আমি রাজার মেয়ের লোভ ছেড়ে দিলাম।

প্রসাদীর মাতা প্রসাদীর দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন—পেসাদীর অদৃষ্টে যা আছে হবে, আমরা রাখালের সুখের অন্তরায় হব না পিসিমা!

মাধবী অতিশয় সুখে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন—আমি আশীর্ব্বাদ করছি বৌমা, পেসাদী আমাদের রাজরাণী ভাগ্যিমানী হবে।—তারপর প্রসাদীর দাড়িতে হাত দিয়া চুমু খাইলেন।

ছলছল চোখে লজ্জা ভরিয়া প্রসাদী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৫

প্রসাদীদের বাড়ীতেই রাখালের পৈতা হইল। রাখাল তাহাদেরই বাড়ীর একটা ঘরে বন্ধ আছে। প্রসাদীর দাদা ব্রজ স্কুলে চলিয়া যায়; প্রসাদী সমস্ত দিন রাখালের ঘরে থাকিয়া রাখালের নির্জ্জন বন্দীদশার দুঃখ লাঘব করে।

সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ম্লান অন্ধকারে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া ছটফটে রাখালের মন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল; সে একবার উঠিয়া একদিককার একটা জানালা একটু ফাঁক করিয়া বাহিরের উজ্জ্বল হাসিমুখ দেখিয়া লইল। অমনি প্রসাদী তিরস্কার করিয়া সাবধান করিয়া বলিয়া উঠিল—ও কি রাখাল-দা, সুয্যি দেখা যাবে যে, শুদ্দুরের মুখ দেখে ফেলবে যে!

রাখাল হাসিয়া বলিল—যা যা, তোকে আর গিন্নেমো করতে হবে না।

প্রসাদী খুব ভারিক্কি চালে বলিল—হবে না বৈকি ? মা আমায় তোমাকে আগলাতে বলেছে! দাঁড়াও ত মাকে বলে দিচ্ছি!

রাখাল বলিল—আচ্ছা আচ্ছা, জানলা বন্ধ করে দিচ্ছি, মামীকে কিছু বলিসনে যেন।

প্রসাদী আবার তাহার ভুল সংশোধন করিয়া দিয়া বলিল—মামী বলছ আবার! মা যে তোমার ভিক্ষে-মা!

রাখাল সুখে পূর্ণ হইয়া বলিল—ভিক্ষে-মা নয় পেসাদী; মা তোরও মা, আমারও মা! পেসাদী, তোর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হত ত বেশ হত!

প্রসাদী ভ্রূকুটিতে আনন্দ চাপা দিয়া বলিল—যাও রাখাল-দা, অমন করলে আমি চলে যাব বলছি, থাকবে একলাটি এই অন্ধকারে পড়ে!

রাখাল তাহার নরম হাতখানি মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল না ভাই লক্ষ্মীটি, চলে যাসনে।

রাখাল নিজের মুঠির মধ্যে প্রসাদীর হাতটিতে চলিয়া যাইবার মতন কোনো রকম আকর্ষণ অনুভব না করিয়া হাসিল। সে হাসি প্রসাদীর স্বচ্ছ সুন্দর চোখে মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই তাহাদের মুখের সে হাসি মিলাইয়া গেল। রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আর ক'টা দিনই বা, চলে যেতে হবে। পেসাদী, এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি,

দিদিমার কষ্ট ঘুচবে বলেই আমি সেখানে বিয়ে করতে যাচ্ছি, নইলে তোকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতাম না।

—আমি আর কক্খনো তোমার ঘরে আসব না।—বলিয়া প্রসাদী রাখালের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বড় জোরে মল বাজাইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার একখানা কুঁড়ে ঘরও যদি থাকত তবে তোমায় চলে যেতে দিতাম বৈ কি?

প্রসাদী ঘাড় ঘুরাইয়া দৃষ্টিতে তীব্র তিরস্কার হানিয়া চলিয়া গেল।

রাখাল বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল—এই-সমস্ত চেনা লোকদের ছাড়িয়া তাহাকে কোথায় যাইতে হইবে; সেখানকার লোকেরা কি রকম; সেখানে কাহার সহিত সে খেলা করিবে; তাহাদের সহিত তাহার মন মিলিবে? তাহার মন এই চেনা ছাড়িয়া অজানার সহিত নূতন পরিচয়কে ভয় করিতে লাগিল। তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অন্ধকার ঘরে একলাটি বসিয়া এইসব চিন্তা তাহাকে অত্যন্ত উতলা করিয়া তুলিতে লাগিল।

একটু পরেই প্রসাদী ঘুরিয়া আসিয়া দরজার বাহির হইতে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। অন্যমনস্ক রাখাল তাহাকে দেখিতেছে না দেখিয়া প্রসাদী এ-জানলা হইতে ও-জানলায় বারবার উঁকি মারিয়াও যখন তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না তখন রাগে ঠোঁট ফুলাইয়া মল বাজাইয়া চলিয়া গেল। আবার পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল। চিন্তাকুল রাখাল তবুও কোনো কথা বলিল না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া প্রসাদী বলিল—রাখাল-দা, কেমন! একলা আছ!

রাখাল ম্লান মুখে বলিল—তুই আয়।

রাখালের মুখে স্বরে রঙ্গ রসিকতার কোনো আভাস না পাইয়া প্রসাদী আস্তে আস্তে আবার ঘরে ঢুকিয়া রাখালের কাছে গিয়া বসিল।

তিন দিন এমনি আনন্দেই কাটিয়া গেল। রাখাল মুক্তি পাইয়া বাহির হইল। অমনি গাঁয়ের ভুতো নন্দে প্রভৃতি ছেলেরা তাহাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। নেড়া মাথায় টোপর যে চমৎকার মানাইবে; তাহার মাথা মুড়ানো হইয়াছে, এইবার ঘোল ঢালিয়া গাধার টুপি মাথায় পরাইয়া ভাঙা ঢোল বাজাইয়া তাহাকে জন্মের মতো গাঁয়ের বাহির করিয়া দিলেই হয়; ইত্যাদি বিদ্রূপ তাহারা সুযোগ পাইলেই রাখালকে শুনাইতে লাগিল। রাখাল পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা অনেক লঘু অপরাধে ইহাদিগকে গুরুদণ্ড দিত; ইহারা সকলে মিলিয়াও গায়ের জোরে তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না; সেজন্য, রাখাল যাহা গায়ের জোরে করিত ইহারা দূর হইতে কথার ধূলাকাদা ছুড়িয়া তাহারই প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করিত। আজকাল রাখাল ইহাদিগকে কিছুই বলে না দেখিয়া কাপুরুষের দল তাহাকে অধিকতর আঘাত করে, এবং আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে রাখালটার এ হইল কি!

(৮)

স্বভালাভালি রাখালের পৈতা দেওয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মাধবীর চিন্তার অন্ত নাই। রাখাল যে বিবাহ করিতে যাইবে, তাহার বরবেশ জোগাড় হইবে কোথা হইতে? দাদার নিকট চাহিতে মাধবীর আর প্রবৃত্তি হইতেছিল না। অপরের কাছে ভিক্ষা করা আরো অপমানের। হায়, মাধবী কি আগে জানিতেন যে রাখালকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহাকে এত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে? রাখাল যদি সুখী হয় তবেই এই সুদুঃসহ দুঃখ সার্থক হইবে।

মাধবীর একখানি মাত্র পুরাতন তসরের কাপড় ছিল। সেইখানি তো-করিয়া লইয়া তিনি রাখালের হাতে দিয়া বলিলেন—রাখাল, আজকে একটু সকাল-সকাল ইস্কুলে যা, শিবগঞ্জের বাজারে যে দর্জ্জি আছে তাকে এই কাপড়-খানা দিয়ে তোর গায়ের দুটো জামা করে দিতে বলিস।

রাখাল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এমন বিলাস-সজ্জা ত তাহার জন্মে কখনো হয় নাই। সে কাপড়খানি হাতে করিয়া লইয়া হাসিমুখে বলিল—দিদিমা, এ কাপড় তুমি আর পরবে না?

রাখালের মুখে হাসি দেখিয়া মাধবীর মন আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু রাখালকে তিনি চিনিতেন, বালক হইলেও কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া সে নিজে সুখ ভোগ করিবে ইহা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই মাধবী

বলিলেন—আমি ত অনেক দিন পরলাম; এখন পুরোনো হয়ে গেছে, এবার তুই পর; আর ত আমি তোকে কিছু পরাতে পাব না; আমার কাছ থেকে নেবার মতন আর তোর অভাবও কিছুই থাকবে না।

মাধবীর আনন্দ ছাপাইয়া চোখে জল ছলছল করিয়া উঠিল। রাখাল সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই আপনার নূতন ঐশ্বর্য্যের আনন্দে তন্ময় হইয়া তসরের কাপড়খানির উপর পরিপূর্ণ মমতায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু দিদিমা, সেলাইয়ের বানি দেবে কোত্থেকে?

মাধবী চোখের জলে হাসি ঢাকা দিয়া বলিলেন—সে ভাবনা তোর কেন? তোর দিদিমা কি এতই গরিব?

রাখাল অপ্রতিভ হইয়া কাপড়খানি লইয়া স্কুলে চলিয়া গেল।

আবদারে দুঃখের রক্ত-আমাশা হইয়া মরিবার দশা হইলে মাধবী তাহাকে একটি টোটকা ঔষধ দিয়া ভালো করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ চাষা দিদি-গোসাঁইকে তাহার ক্ষেতের ধান ও পাট কিছু উপহার দিয়াছিল। ধান ক'টি হইতে মুড়ির চাল করিয়া রাখালের জলখাবারের সংস্থান হইয়াছিল। এবং পাটগুলি মাধবী অবসর-সময়ে পাকাইয়া পাকাইয়া দড়ি করিয়াছিলেন; সেই দড়ির কিছু দিয়া গোটা দুই শিকা ভাঙিয়াছিলেন। সেই দড়ি আর শিকাগুলি লইয়া গিয়া আবদারে জুলেকে দিয়া মাধবী বলিলেন—আবদার, তোমাকে আমার এইগুলি দু-এক দিনের মধ্যেই বেচে দিতে হবে ভাই।

আব্দার বলিল—তার জন্যে ভাবনা কি দিদি-গোসাঁই! দরবেরে দুলে ঘরামির কাজ করে, দড়ি সে নেবে খ'ন; আর অতিকান্ত রাঙুবাবুদের বাড়ী জল তোলে, সে এক জোড়া শিকে খুঁজছিল, তাকে এই শিকেজোড়াটা গছিয়ে দেবো।

মাধবী বলিলেন—আমার দামটা শিগ্গির চাই আবদার, রাখালের জামা করতে দিয়েছি, দাম দিতে হবে।

আবদার বলিল—কালকেই আপনাকে আমি পয়সা দিয়ে আসব দিদি-গোসাঁই।

মাধবী জিজ্ঞাসা করিলেন—এতে কত হতে পারবে আবদার?

আবদার দড়ির মুটিটা হাতে তুলিয়া নাচাইতে নাচাইতে বলিল—দড়ি সের পাঁচেক হবে—এতে টাকা ডেড়েক; আর শিকের দর ত দশ আনা বাঁধা—তা এ বেশ পোক্ত মজবুত আছে, আমি বারো আনার কমে এ ছাড়ব না! তা হলে হল গিয়ে এক ট্যাকা আট আনা আর বারো আনা—দুট্যাকা চার আনা। এর বেশী হবে ত কম হবে না দিদি-গোসাঁই। আমি যতটা পারি টেনে দেখব।

—তা ত দেখবেই। নইলে এত লোক থাকতে তোমায় কেন দিলাম ভাই?—বলিয়া মাধবী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

আবদার ডাকিয়া বলিল—আচ্ছা দিদি-গোসাঁই, রাখালের যেখানে বিয়ে হবে তারা শুনছি নাকি রাজা! বাইশটে নাকি হাতী আছে! বাইশ-বাইশটে হাতীর খোরাক জোগায়, সে ত বড় কেউ-কেডা নয়।

মাধবী আনন্দিত হইয়া বলিলেন—হ্যাঁ ভাই, তারা খুব বড়লোক। তোমরা পাঁচজনে আশীর্ব্বাদ কর রাখাল আমার সুখী হোক।

আবদারে উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল—উঃ রাখাল বড্ডি ভালো ছেলে! আমাকে বলে আবদার মামা! রাখাল ত রাজা হবেই! ওর ভালো হবে না ত কি ভালো হবে ননে ভুতো তেতোর? ঝাঁটা মারো অমন সব ছেলের মুয়ে!

মাধবী হাসিয়া বলিলেন—অমন কথা বলতে নেই আবদার, হাজার হোক ওরা বামুনের ছেলে, দুষ্টু দজ্জাল হলেও আমাদেরই ত আপনার।

আবদার অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আমি কি আর ওনাদেরকে অমন কথা বলতে পারি দিদি-গোসাঁই; ঝাঁটা মাবলাম ওনাদের রীতকে, ওনাদের আক্কেলকে।

মাধবী আবার যাইবার উপক্রম করিতেছেন। আবদার বলিল—আচ্ছা দিদি-গোসাঁই, গোসাঁইজির কেমন আক্কেল! তারই ত নাতি হাজার হোক! অপর লোকে পৈতে দিয়ে দিলে একটু লাজসরম হল না! তারপর বিয়ে করতে যাবে, একটা জামা কাপড় চাই, তাও তুমি গতর খাটিয়ে দড়ি ভেঙে, তাই বেচে, করে কম্মে দেবে, তবে হবে? দেখ দিদি-গোসাঁই, দোজবোরে-গুনোর অমনিই এক ধারা!

মাধবী দাদার নিন্দায় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন—না আবদার। রাখালকে খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করলে কে? সে ত দাদাই। রাখালের ইস্কুলের মাইনে বই জোগাচ্ছে কে? সে ত রাঙা বৌই। এখন দাদার হাতে টাকা নেই, দাদা ত শীতকালে পৈতে দিয়ে দিতই, কিন্তু এই বিয়েটা ফস্কে যায় বলে আমার এত তাড়াতাড়ি। সে ত আমারই দোষ আবদার, আমি ব্যস্ত হয়ে দাদার মুখ হেঁট করেছি!

আবদার গর্ব্বিত ভাবে বলিল—আমাদের হাতে টাকা না থাকলে আমরা কি করতাম দিদি গোসাঁই জানো? আমরা মহাজনের কাছে তমসুক কেটে টাকা কর্জ্জ করতাম, বোনকে পরের বাড়ী মাগতে যেতে দিতাম না!

মাধবী নিরুত্তর। তিনি পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু আবদারের কথার ছিড় আর মরে না।

আবদার তাঁহার গমনে বাধা দিয়া বলিতে লাগিল—তুষ্টু গয়লা বলছিল কি দিদি-গোসাঁই, যে, আমাদের দুঃখু বিপদে সবার আগে দিদি-গোসাঁই হামরাই হয়ে বুক দিয়ে এসে পড়ে; আমরা ওনাদের সেবক,—সেবক না ছেলে; আমরা সবাই মিলে চাঁদা করে রাখালকে যতুক দেবো। ধুম্‌সো সেতো গঞ্জের হাটে জামা কাপড় জুতো কিনতে যাবে।

মাধবীর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা দুষ্কর হইয়া উঠিল। "না না, তুষ্টুকে বলিস তোদের কিছু করতে হবে না। আমি সব জোগাড় করেছি।"—বলিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

আবদার অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল দিদি-গোসাঁই দূরে গিয়া মাথার ঘোমটা একটু নামাইয়া দিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন।

মাধবী বাড়ী আসিয়াই আপনার বেতের-উপর-চামড়া-মোড়া চৌ-আড়ী পুরাতন পেটারীটি খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া খানকতক কাপড় ও রাখালের জামা উড়ানি বাহির করিলেন; এগুলি পূজা পার্ব্বণ মচ্ছব নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে ব্যবহারের জন্য তোলা থাকিত। জীর্ণ ছিটের জামাটির দু-এক জায়গায় মচকাইয়া গিয়াছে; হলদে-পেড়ে কাপড়খানির এক জায়গায় খোঁচ লাগিয়াছে; উড়ানিখানিতে দিস্তা পড়িয়াছে। মাধবী সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া ছেঁড়াগুলি রিফ করিলেন; নিজের দুখানি থান কাপড়ে ছেঁড়া কাপড়ের পাড় সেলাই করিয়া লাগাইলেন। তারপর সেগুলিকে ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া গঙ্গা হইতে কাচিয়া আনিয়া শুকাইতে দিলেন।

বৃন্দাবন রকে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া মাধবীর কাণ্ড দেখিতেছিলেন। নারাণদাসী বৃন্দাবনকে মাধবীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—নাতির রাজবেশের জোগাড় হচ্ছে!

স্বপ্নে রাজার হয়েছি রাণী,
জেগে দেখি আমার ন্যাকড়া কানি!

বৃন্দাবনের মনে বোধ হয় একটু বেদনা, একটু লজ্জা বোধ হইতেছিল। তিনি মাধবীকে ডাকিয়া বলিলেন—মাধী, কালকে গঞ্জের হাট; রাখালের জামা কাপড় কি কি চাই বোলো, কাল কিনে আনব।

মাধবী দাদার অনুগ্রহে কৃতার্থ হইয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দের আগ্রহের সহিত বলিলেন—আমি সব একরকম জোগাড় করেছি দাদা, তুমি শুধু একজোড়া জুতো কিনে দিও।

বৃন্দাবন গম্ভীর হইয়া বলিলেন—রাখাল যেন স্কুলের ছুটির পর হাটে আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি উমেশো কয়ালির আড়তে থাকব।

নারাণদাসী বৃন্দাবনের পিঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া চাপা গলায় বলিল—আর কিছুর যখন দরকার নেই তখন শুধু একজোড়া জুতোই কিনে দিও।

বৃন্দাবন কিছু না বলিয়া, একটুও না নড়িয়া, এক মনে ধীরে ধীরে হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময় রাখাল হাসিমুখে বাড়ী ফিরিল, দর্জি তাহার জামা কালই দিবে বলিয়াছে। সে-হাসিমুখ আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যখন সে দেখিল তাহার দিদিমা তাহার জন্য কত কাপড় জামা চাদর ধুইয়া পাট করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তারপর যখন শুনিল যে তাহার গোসাঁই-দাদা কাল হাট হইতে জুতা কিনিয়া দিতে চাহিয়াছেন তখন রাখালের মন সুখের ভারে ভাঙিয়া পড়িবার মতন হইল।

আনন্দের নিষ্ঠুর তাড়নায় অস্থির হইয়া সমস্ত রাত্রি

তাহার চোখে ঘুম আসিল না। কখন্ সকাল হইবে, কখন্ সে হাটে যাইবে, এই ঔৎসুক্য তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। সকাল যদি হইল ত স্কুল যাইবার বেলা আর হয় না; স্কুল যদি গেল ত ছুটির ঘণ্টা আর বাজে না।

সুখের প্রতীক্ষারও অন্ত আছে। সন্ধ্যাবেলা রাখাল বড় একটা পোঁটলা হাতে ঝুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিল—আজ তাহার আশাতীত আনন্দ! তাহার গোসাঁই-দাদা দু-দুজোড়া ধোয়া ফুলপেড়ে ধুতি কিনিয়া দিয়াছেন; দু-দুটো জামা কিনিয়া দিয়াছেন—তাহার একটা লাল ছিটের, একটা রেশমী; একজোড়া রেশম-পেড়ে উড়ানি কিনিয়া দিয়াছেন; আর কিনিয়া দিয়াছেন এক জোড়া চকচকে বার্ণিশ-করা ঘোরতোলা জুতো! আর দর্জি তসরের জামা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে, তাহারও মজুরী গোসাঁই-দাদা দিয়াছেন, দিদিমার একটা পয়সাও খরচ হয় নাই!

রাখাল পরিপূর্ণ আনন্দে হাসিমুখে বোচকা খুলিয়া আপনার নূতন ঐশ্বর্য্য একটার পর একটা তুলিয়া তুলিয়া দিদিমা ও রাঙা-দিদিমাকে দেখাইতে লাগিল। মাধবীর মুখও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু রাখাল একটার পর একটা জিনিস তুলিয়া তুলিয়া দেখাইতেছিল আর ভিমরতি বুড়ো-মিন্সের এতগুলো বাজে খরচ দেখিয়া নারাণদাসীর গা যে জ্বলিয়া যাইতেছিল তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তাহার আড়ষ্ট মুখের উপর যেন এক এক পোঁচ কালি মাড়িয়া দিতেছিল।

এমন সময় ধুমসো সাতো একটা রংচঙা টিনের তোরঙ্গ মাথায় করিয়া বাড়ী ঢুকিল,—তাহার পশ্চাতে এক-একটা ভার কাঁধে করিয়া করিয়া আসিল তুষ্টু গয়লা, আবদার, সোনা কৈবর্ত্ত, আর কেদার্ত্ত দুলে।

সেবক শিষ্যেরা ভেট লইয়া আসিয়াছে দেখিয়া প্রাপ্তির সম্ভাবনায় নারাণদাসীর অন্ধকার মুখ বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—এসব কিরে সাতু? ঐ-ঐঘরের রকে নামাগে।

সাতকড়ি বলিল—রাখালের আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব এনেছি মা-গোসাঁই।

নারাণদাসীর মুখ আবার অন্ধকার হইয়া গেল। সে আর সেখানে না দাঁড়াইয়া একেবারে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

তুষ্টু জিজ্ঞাসা করিল—দিদি-গোসাঁই এসব কোথায় নামাব।

মাধবী নারাণদাসীর ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—ঐ রকে নামাওগে ভাই।

এক ঝুড়ি আম, বড় দুটো কাঁঠাল, এক হাঁড়ি শিবগঞ্জের রসগোল্লা, এক হাঁড়ি দই, এক হাঁড়ি ক্ষীর, একটা চাল ডাল তরকারীর সিধে, একটা ময়দা ঘি চিনির সিধে ভার হইতে বাহির হইল।

মাধবী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোরা কি ক্ষেপেছিস তুষ্টু? কত খরচ করেছিস? বাক্‌সতে আবার কি?

সাতকড়ি ট্র্যাক হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া বাক্সের ডালা খুলিয়া দিয়া কৃতকর্ম্মের আনন্দের তৃপ্তিতে দাঁত বাহির করিয়া দাঁড়াইল। আর সকলেও হাসিমুখে মাধবীর মুখের দিকে চাহিল। মাধবী ও রাখাল উৎফুল্ল হইয়া দেখিলেন বাক্সের মধ্যে কাপড় জামা জুতা রহিয়াছে।

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ওরে রাখাল, তোর রাঙা কনেকে ডাক, তার ফুলশয্যের জিনিস এসেছে, ঘরে তুলুক!

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নারাণদাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিল—তুমি থাকতে আমাকে কি আর রেখোর মনে ধরবে ঠাকুরঝি?

মাধবী হাসিয়া বলিলেন—তুমি হলে গিয়ে রাঙা বৌ! দেখছ না, রাখাল কেমন একদিষ্টে তোমার চাঁদমুখের দিকে চেয়ে আছে! আমার ছুটি হয়ে গেছে রাঙা বৌ!

উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারার মুখে দীর্ঘনিশ্বাস চাপা দিয়া মাধবী হাসিলেন। কিন্তু সে হাসি বড় ম্লান, দারুণ শোকের যবনিকার মতন তাহা রাখালের সলজ্জ সুখের হাসি ও নারাণদাসীর আড়ষ্ট কাষ্ঠহাসির মাঝখানে দুলিতে লাগিল।

গাঁয়ের সকল লোকেই একে একে রাখালকে আইবুড়ো ভাত খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া কাপড় চাদর দিতে লাগিল। চাষাদের দেওয়া রঙিন টিনের তোরঙ্গটি বোঝাই হইয়া উঠিল, রাখালের ঐশ্বর্য্য আর তাহার বুকে ধরে না।

মাধবী তুষ্টুদের বলিলেন—দেখ্‌ তুষ্টু, যে যতই দিক, তোদের যতুক সবার সেরা!

তুষ্টুরা কৃতার্থ হইয়া হাসিয়া বলিল—সে আপনাদের ছিচরনাশীর্ব্বাদে, আপনাদেরই খেয়ে পরে!

রাখাল স্কুল হইতে আসিয়া বলিল—দিদিমা, স্কুলে পর্য্যন্ত খবর পৌঁছে গেছে। হেডমাষ্টার কত দুঃখু করছিলেন, বলছিলেন, এ বছর তুমি এণ্ট্রান্সে স্কলারশিপ পাবে বলে আমরা কত আশা করে ছিলাম, তুমি কিনা পড়া ছেড়ে বিয়ে করতে চল্লে! তিনি আমাকে বড় ভালো বাসতেন দিদিমা। তিনিও আমাকে জলখাইয়ে ধুতি চাদুর দিয়েছেন।

মাধবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—চিরজীবন যেন তুই এমনিধারা সকলের ভালোবাসা পাস।

(৯)

ক্রমে রাখালের যাওয়ার দিন আসিল। আজ সন্ধ্যার সময় সে আজন্মের চেনা দেশ ও জানা লোকদের ছাড়িয়া কোন্‌ অজানা দেশে অচেনা লোকেদের মধ্যে বাস করিতে যাইবে। যে-দেশকে যে-সব লোককে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে, জীবনে আর তাহাদের হয়ত সে দেখিতে পাইবে না। রাখালের প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। গ্রামের যে 'পড়া'য় সে তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে হাড়ুডুডু খেলিয়াছে, যে পুকুরে এক ঘণ্টা ধরিয়া সাঁতার কাটিত, যে বাগানে গাছে উঠিয়া আম পাড়িয়া খাইত, আজ তাহারা সকলেই যেন বিচ্ছেদের বেদনায় ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের বাড়ীর পাশের কৃষ্ণচূড়ার গাছটির তলায় সে প্রসাদীর সহিত বসিয়া গল্প করিত, ঠাকুরবাড়ীর চাঁদনিতে পাড়ার সকল ছেলেমেয়ে জুটিয়া লুকাচুরি খেলিত,—আজ সেসব জায়গা শূন্য উদাস দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করিয়া যেন তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। আজ সকাল হইতে রাখাল গ্রামের পথে পথে ঘুরিতেছে, তরু লতা ঘাট বাট সকলকে জন্মের শোধ যেন দেখিয়া লইতেছে; এতদিনকার পরিচিত তাহারা, তাহাদের কাছে চিরবিদায় চাহিয়া লইতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে পথে দুলে মুচি হাড়ি কৈবর্ত্ত যাহাকে দেখিতেছে তাহাকেই কান্নাভরা কণ্ঠে বলিতেছে· আজ আমি য়াব!—বুকের মধ্যে কান্না ফুলিয়া ফুলিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে; চাপিয়া রাখা যে আর যায় না!

বিকাল হইয়া আসিল। রাখাল গ্রামের সকল আত্মীয়ের বাড়ী বাড়ী গিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া আসিতে লাগিল,—তাহার চোখ দিয়া শুধু জল পড়িতেছিল, মুখে কোন কথা ছিল না।

অকর্ম্মা ছেলেদের আড্ডায় গিয়া একে একে তাহাদের দুই হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চোখের জলে ভাসিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে রাখাল বলিল—আমি ভাই, তোদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছি। আমাকে আজ ভাই মাপ কর। আমি আর কখনো তোদের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসব না। তোদের সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা!

রাখাল উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। উহাদের চোখেও আজ জল, মুখে একটি কথা নাই।

সব শেষে রাখাল প্রসাদীদের বাড়ী গেল। দরজার কাছেই ব্রজ দাঁড়াইয়া ছিল, রাখাল দৌড়িয়া গিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইয়া শিশুর মতন কাঁদিতে লাগিল; ব্রজও কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা দুটিতে যে ছেলেবেলা হইতে একসঙ্গে, রাখাল যে ব্রজকে সকলের চেয়ে বেশী ভালো বাসে, ব্রজও যে সকলের চেয়ে রাখালকে বেশী ভালো বাসে; আজ তাহাদের জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি! শুধু কান্না, শুধু কান্না! কথায় বলিবার কিছু নাই!

উহাদের কান্নার শব্দ শুনিয়া প্রসাদীর মা আসিয়া দুজনকে দুই হাতের বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিয়া কোলের কাছে করিয়া বসিলেন। তিনিও শুধু কাঁদিলেন, কোনো কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে রাখাল প্রণাম করিয়া উঠিল। প্রসাদীর মা অশ্রুভরা কণ্ঠে বলিলেন—রাজ্যেশ্বর হও বাবা!

রাখাল আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—মা, আমার দিদিমা রইল। তোমরা দেখো।

প্রসাদীর মাও চক্ষে অঞ্চল দিয়া বলিলেন—তা দেখব বৈ কি বাবা। এ আর তোমার বলতে হবে কেন?

রাখাল কাঁদিতে কাঁদিতে একবার যেন কাহাকে দেখিবার আশায় চারিদিকে চকিতে চাহিয়া লইল। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অনিচ্ছা-মন্থর পদে বাড়ীর দিকে চলিল।

রাখাল যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া সকল লজ্জা সঙ্কোচ দমন করিয়া বলিল— মা, পেসাদী কৈ ?

মা করুণ দৃষ্টিতে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন— ঐ ঘরে।

রাখাল সেইঘরে গিয়া ঢুকিতেই প্রসাদী দুই হাতে আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাখালও নীরবে দাঁড়াইয়া কাঁদিল। তারপর আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় সদর দরজায় দুখানা গরুর গাড়ী আসিয়া লাগিল ; বর ও বরযাত্রীরা রেল-ষ্টেসনে যাইবে। বরযাত্রী যাইবে ঘটক কেনারাম, বরকর্ত্তা বৃন্দাবন, প্রসাদীর বাবা মথুর, সয়া ভট্চাজ আর রাধু নাপিত।

কেনারাম প্রকাণ্ড ভুঁড়ির নীচে একটা চাদর বাঁধিয়াছে, পায়ে একজোড়া নূতন চটি দিয়া অনভ্যাসের জন্য পটাস পটাস শব্দ করিয়া পায়চারি করিতেছে, এবং ডাবা হুঁকায় লম্বা নল লাগাইয়া তামাটে ছাঁটা গোঁফের ভিতর দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে থাকিয়া থাকিয়া চেঁচাইতেছে— ওহে বৃন্দাবন, চটপট করহে, চটপট কর।

মাধবী বুকে পাথর বাঁধিয়া হাসিমুখে সমস্ত রান্নাবান্না করিয়া সকলকে খাওয়াইলেন। তারপর শুষ্ক চোখে হাসি-মুখে রাখালকে বরবেশে সাজাইলেন। তারপর রাখালের হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে গেলেন।

গ্রামের মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো ভাঙিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কেবল আসে নাই প্রসাদী। রাখাল কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া নারাণদাসীকে প্রণাম করিয়া বলিল-- রাঙা-দিদিমা, আমি চল্লাম ; আমার দিদিমা রইল দেখো।

এই কথা শুনিয়া ও রাখালের আকুল কান্না দেখিয়া কেহ স্থির থাকিতে পারিল না। মাধবী রাখালকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাখাল এক এক পা যায় আর এক এক জনকে প্রণাম করে আর অশ্রুজালের ভিতর দিয়া করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে—আমি চল্লাম, তোমরা আমার দিদিমাকে দেখো !

গাড়ীর পাশে গিয়া রাখাল দিদিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বড় কান্নাটাই কাঁদিল। মাধবীর ত আজ সকল সুখ সকল সাধের বিসর্জ্জন। তাঁহার বুক দুঃসহ বেদনায় চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

"আর দেরী নয়, আর দেরী নয়, কনকাঞ্জলি সেরে রাখালকে গাড়ীতে উঠিয়ে দাও।"--চারিদিক হইতে তাগাদা আসিতে লাগিল।

নারাণদাসী আসিয়া রাখালের হাতে পূর্ণপাত্র দিল— থালা-ভরা চাল, তাহার উপর একটা সুপারি, একটা পান ও একটা টাকা। নারাণদাসী বলিল— ঠাকুরঝি, আঁচল পাত।

মাধবী ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—আমাকে আর কেন বৌ, তুমি নাও।

"তা কি হয় কখনো"—বলিয়া নারাণদাসী মাধবীর আঁচল জোর করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া মেলিয়া ধরিল। তারপর মাধবীকে বলিল—বল ঠাকুরঝি।

মাধবী কিছুতেই কথা আর বলিতে পারেন না। অনেক কষ্টে কান্না সম্বরণ করিয়া সেই কথা বলিতে যান অমনি কান্না আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এতক্ষণ যাহারা তাগাদা করিতেছিল তাহারাও মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে অস্ফুটস্বরে শুধু বলিতেছিল—রাধাকান্ত ! রাধাকান্ত !

অনেক কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া মাধবী বলিলেন— রাখাল, কোথায় যাচ্ছিস ভাই ?

রাখাল নারাণদাসীর শিক্ষা-মত অস্ফুটস্বরে বলিল— দিদিমা, তোমার দাসী আনতে !

এই কথা নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া সকলেরই কানে ঠেকিল। রাখালের মনে বাজিল। রাখাল ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া মুখ ঘুরাইয়া পূর্ণপাত্রটি দিদিমার আঁচলে ফেলিয়া দিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। মাধবী ছুটিয়া বাড়ীতে আসিয়া দাওয়ার উপর উবুড় হইয়া পড়িলেন।

গাড়ী ব্যথিত আর্ত্তনাদে গ্রামের রাস্তা ধ্বনিত করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। পাড়ার লোকে যে যার ঘরে ফিরিয়া গেল। নারাণদাসী বাড়ীতে আসিয়া বলিল— ঠাকরঝি, উঠে এস, হেঁসেল তোলোসে।

মাধবী উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন--সকল দুঃখ বুকে বেঁধে যার মুখ চেয়ে তোমার সংসারে খাটতাম বৌ, আজ তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি ! আর আমি পারব না বৌ ! একসন্ধ্যে দুটি খেতে দিতে হয় দিও, নয়ত এখানেই পড়ে পড়ে মরে যাব।—এই ঘরে ষোল বচ্ছর আমার রাখাল ছিল ! আজ নেই ! (ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাভার মহারাজা

পাঞ্জাবের মধ্যে নাভারাজ্য। আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত রাজার অধীনে রাজ্যের কত দিকে কতবিধ উন্নতি হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত নাভা রাজ্যের বর্ত্তমান মহারাজার শাসনকালের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায়। মাত্র চার বৎসর মহারাজা রিপুদমন সিংহ মালবেন্দ্র বাহাদুর রাজ্যভার পাইয়াছেন। ইহারই মধ্যে রাষ্ট্রপরিচালন-কার্য্যের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বিচারকার্য্যের ব্যক্তিগত প্রভুত্ব বন্ধ হইয়াছে, নিম্নশিক্ষা অবৈতনিক করা হইয়াছে এবং তাহা বাধ্যতামূলক করিবারও আয়োজন হইতেছে।

মহারাজা রিপুদমন সিংহের বয়স বেশী নয়, তাঁহার জন্ম ইংরেজি ১৮৮৩ সালে; তখন তাঁহার পিতা মহারাজা হীরা সিংহ মালবেন্দ্র বাহাদুরের বয়স ৪০ বৎসর; তত বয়সে রাজ্যের উত্তরাধিকারীর জন্মে মহারাজা হীরা সিংহ অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন।

সেকালের হিসাবে মহারাজা হীরা সিংহ একজন উঁচু-দরের লোক ছিলেন। তিনি মাতৃভাষা গুরুমুখী ও শিখ ধর্ম্মসংক্রান্ত ও অন্যান্য পাঞ্জাবী সাহিত্য বিশেষভাবেই আলোচনা করিয়াছিলেন। হিন্দী সংস্কৃত সাহিত্যের সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি দেশীয় ইতিহাসেরও যথেষ্ট খবর রাখিতেন। শাস্ত্রী, জ্যোতিষী ও কবিদিগকে মাসহারা দিয়া তিনি প্রতিপালন করিতেন; তাঁহার সাহায্য পাওয়াতেই মেকলিফের শিখধর্ম্মের ইতিহাস প্রকাশ হইতে পারিয়াছিল। মহারাজার রাজ্য ৯২৮ বর্গ মাইল বিস্তৃত; লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৮৭; এত বড় রাজ্যের এতগুলি লোককে তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া দেশে শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি সৎকার্য্যের পুরস্কার ও অপকর্ম্মের জন্য তিরস্কার অপক্ষপাতে ব্যবস্থা করিতেন। মকদ্দমা মামলা মীমাংসা হইতে দেরি হইতেছে দেখিলে তিনি দুই পক্ষকে ডাকিয়া মধ্যস্থ হইয়া সত্বর মীমাংসা করিয়া দিতেন।

কিছু একটা গড়িয়া তোলার দিকে মহারাজার ভারি সখ ছিল। মিস্ত্রীরা ভাঙিয়া গড়িত, গড়িয়া ভাঙিত। একজন মিস্ত্রী এক দৈবজ্ঞকে ঘুষ খাওয়াইয়া মহারাজকে

মহারাজা হীরা সিংহ মালবেন্দ্র বাহাদুর।

বলাইয়াছিল যে তিনি বাড়ী গড়া বন্ধ করিলেই মারা পড়িবেন। মহারাজ এই ব্যাপারে খুব খুশী হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, কূপ খনন, গুণীজনকে মাসহারা দেওয়া প্রভৃতিতে খরচ প্রচুর হইলেও তাঁহার নিজের খরচ বেশী ছিল না। তিনি মোটামুটি সামান্য এক আধ রকম খাদ্য খাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন; তাঁহার পোষাকও বেশী দামী হইত না; সাদা মসলিনের সদ্য ধোয়া পোষাকে তাঁহার খুব সখ ছিল।

নিজে বিলাসী ছিলেন না বলিয়া অপরকেও বিলাসী হইতে দিতে চাহিতেন না। তাঁহার দরবারীদের বেতন সামান্য ছিল; রাজকার্য্য সস্তায় সারা হইত; প্রজারা সুতরাং অল্প কর দিয়াই অব্যাহতি পাইত। কোনো কর্ম্মচারী প্রজাপীড়ন করিয়া ঘুস লইতে বা বাজে আদায় করিতে সাহস করিত না—মহারাজার চক্ষুকর্ণ সর্ব্বদা সজাগ থাকিত।

এইরূপ পিতার স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান মহা-

মহারাজা রিপুদমন সিংহ মালবেন্দ্র বাহাদুর।

রাজা চরিত্রের পবিত্রতা, জ্ঞানানুরাগ, এবং বিলাসবর্জ্জন অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন। পিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যুবরাজ টীকা-সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাকেও প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সময় শক্তি বুদ্ধি সমস্তই পুরামাত্রায় নিয়োগ করিতে হইবে।

টীকা-সাহেব অল্প বয়সেই লেখা পড়া শিখিয়া এমন দক্ষ ও বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে ১৯০৬ সালে পঞ্জাবের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণার তাঁহাকে গভর্ণার জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া পাঠান। লোকে তখন ভাবিয়াছিল ইহা সরকারের ধামা-ধরার দল পুরু করিবার একটা ফন্দি। কিন্তু শীঘ্রই টীকা-সাহেব ভারতের প্রতিনিধি হইয়া দাঁড়াইয়া ও গোখলের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া লোকের ভুল ভাঙিয়া দিলেন। ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি ব্যবস্থাপক সভার সংস্রবে থাকিয়া রাজ্যপরিচালন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, দেশের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দেশীয় নেতৃমণ্ডলীর পরিচয় পাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ইহার পরেই টীকা-সাহেব য়ুরোপ ভ্রমণে যাত্রা করেন। নানা প্রতিষ্ঠান ও বিখ্যাত মনস্বী নরনারীর পরিচয় পাইয়া তাঁহার জ্ঞান বিস্তার লাভ করে।

টীকা-সাহেবের মহিষী তাঁহার সঙ্গে য়ুরোপে গিয়াছিলেন। তিনিও বিদুষী ও সুশিক্ষিতা। তিনি স্বামীর সহধর্ম্মিণী।

১৯১১ সালে টীকা-সাহেব পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে রাজ্যটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিতেছেন; তিনি স্বদেশী উপযুক্ত লোক বাছিয়া যোগ্য বেতনে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত, হাইকোর্ট স্থাপন, নির্দ্দিষ্ট আইন বিধিবদ্ধ করা, পূর্ত্তকর্ম্মের সুব্যবস্থা, এবং জলের কল, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি বা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা তাঁহার রাজ্যকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আড়াই লক্ষ প্রজার মধ্যে মাত্র ৭১৪৩ জন লোক লিপিতে পড়িতে পারে দেখিয়া মহারাজা ১৯১৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিয়া দিয়াছেন। শীঘ্রই সকলকেই প্রাথমিক শিক্ষা পাইতে বাধ্য করা হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দিয়াছেন। শিক্ষা মানে শুধু পুরুষের শিক্ষা নয়; তাহা অনুভব করিয়া মহারাজা রাজধানীতে একটি স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ও মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি মেধাবী ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন; বৃত্তি দিয়া বিদেশে ছাত্র পাঠাইবারও ব্যবস্থা হইতেছে।

পরলোকগত ও বর্ত্তমান উভয় মহারাজই স্বরাজ্যের বাহিরেও শিক্ষাদানে সাহায্য করিয়াছেন। ফিরোজপুরের কন্যাপাঠশালা, ভাসৌর কন্যাবিদ্যালয় প্রভৃতি মহারাজার দানে পুষ্ট। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রজাদিগকে স্বায়ত্তশাসনে তালিম করিয়া তুলিবার জন্য মহারাজা জেলা-কমিটি ও পরামর্শদাতা-কমিটি গঠন করিয়াছেন; জেলার লোকে জেলা-কমিটির সভ্য নির্ব্বাচন করে; জেলা-কমিটি হইতে নির্ব্বাচিত সভ্য মিলিয়া পরামর্শদাতা কমিটি হয়; জেলা-কমিটি জেলার কর্ত্তা নাজিমদিগকে পরিচালন করে; পরামর্শদাতা-কমিটি মহারাজাকে মন্ত্রণা দ্যায়।

মহারাজা রিপুদমন সিংহ মালবেন্দ্র বাহাদুরের রাজ্যে অভিষেক।

এই সূত্রপাত হইতে দেশে ক্রমে স্বায়ত্তশাসন পাকা ও কায়েমি হইয়া উঠিবে।

মহারাজা কোনো কর্ম্মচারীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না; তাহাদের পরামর্শ দিয়া ত্রুটি বিচ্যুতি তাহাদিগকে দিয়াই সংশোধন করান। মহারাজার শাসনবিভাগের মন্ত্রীরা বিচার-বিভাগে হস্তক্ষেপ করেন না।

অত্যাচার অবিচার নিবারণের জন্য মহারাজা মধ্যে মধ্যে রাজ্যের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন এবং স্বয়ং প্রজার অভাব অভিযোগ শুনিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন।

মহারাজা মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন না। তিনি সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী। এইজন্য ১৯০৯ সালের ভারতীয় সামাজিক সমিতিতে তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। জাতিভেদ, অবরোধপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বাধ্য করিয়া বিধবা রাখা, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুরীতির উচ্ছেদসাধনে তিনি যত্নপর। মহারাজার পুত্র না হওয়া সত্ত্বেও সেই অছিলায় তিনি আবার একটা বিবাহ করেন নাই।

আমাদের দেশীয় রাজারা একে একে নিজেদের গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া এমনিভাবে উন্নতিকামী হইতেছেন, ইহা দেশের শুভলক্ষণ। বঙ্গদেশের জমিদারবৃন্দ বড়োদা, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, নাভা প্রভৃতি মিত্ররাজ্যের দৃষ্টান্তে নিজ নিজ জমিদারীতে ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে বেশী দেরী লাগে না।

চারু।

চোখের আলো

মুখ দিয়া রক্ত ছোটে শিং হয় ভোঁতা
চোখ ঘুরাইয়া ভেড়া কাঠে মারে গুঁতা।
চোখে আগুনের দাপ, মুখে ছোটে হাঁপ,
তবু পাথরের গায় ছোঁ মারিছে সাপ।
বুদ্ধিমান কহে চোখ-কার রাগে খোঁজ
চোখের যে আলো যদি না থাকে মগজ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

মনের বিষ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চম্পাকে হারাইয়াছি, তবু যে অভিনয় করিতে বসিয়াছি, জগৎ উল্টাইয়া গেলেও, তাহা আমাকে করিতেই হইবে; শোক করিবার অবসর আমার নাই।

নীলার পত্র পাইলাম,—তাহার শরীর নাকি অসুস্থ; হৃদয় বিদীর্ণ,—সে স্বয়ং কন্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্পাদনে অশক্ত। তাহার পারিবারিক পুরাতন বন্ধু বলিয়া আমাকে কন্যার শেষ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিয়াছে। সাগ্রহে তাহাতে সম্মতি দান করিলাম; প্রকাশ্যে বালিকার পিতা বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকার হারাইয়াছি; পিতার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের সুযোগ লাভ করিয়া কেন তাহা ত্যাগ করিব? আর একটি আশঙ্কা হইতে সেই সঙ্গে বিমুক্ত হইলাম। অন্যে এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে সমাধি-গুম্ফার দ্বার উদ্ঘাটিত হইত এবং তথায় আমার ভগ্ন শবাধার দেখিয়া অন্যে হয়ত সন্দেহ করিত। আমি অন্য প্রকার ব্যবস্থা করিলাম; শ্যামল সমাধি-প্রাঙ্গণে পত্রবহুল বৃক্ষতলে, ছায়াশীতল সুরম্য স্থানে চম্পার অন্তিম সমাধি-শয্যা রচনা করিলাম। সর্ব্বংসহা মাতা বসুমতী তাঁহার স্নেহময় বক্ষে আমার স্নেহের ধনকে স্থান দিলেন। সমাধির পার্শ্বে বৃক্ষ রোপিত হইল; শুভ্র মর্ম্মর প্রস্তরে সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। তাহার গাত্রে বালিকার পিতামাতার নাম, তাহার জন্ম-মৃত্যুর তারিখ খোদিত করাইলাম; লিখাইলাম "চম্পা—একটি নির্ম্মল, ক্ষুদ্র কলিকা —এখানে ঝরিয়া পড়িয়াছে।"

সমস্তই মিটিয়া গেল, আমার কার্য্য তবুও মিটিল না: নিপীড়িত আমি,—অশেষ যন্ত্রণায়, অবিশ্বাসীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া, তাহাদের অবজ্ঞার ফলে সংসারের শ্রেষ্ঠতম বস্তু হারাইয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছি! এখন আমার অসাধ্য কিছুই নাই; বক্ষের ক্ষত প্রতিহিংসায় ঢাকিয়া, আবার কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

কন্যার মৃত্যুতে শ্রেষ্ঠীপ্রাসাদে নব শোকচিহ্ন সংযোজিত হইয়াছে। প্রাসাদ-অভ্যন্তরের সংবাদ কয়েক দিন আমি রাখিতে পারি নাই। অনুরুদ্ধ হইয়াও আমি তথায় যাই নাই; ওজর আপত্তিতে আমাকে নীলার আহ্বান কাটাইয়া দিতে হইয়াছে। সে শোকসন্তপ্তা বা যাহাই হউক, আমার প্রতি তাহার কৃপাদৃষ্টির ব্যতিক্রম হয় নাই; বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে; শোককে আশ্রয় করিয়া আমাকে সে নিকট হইতে অতি নিকটে টানিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছে; আমিও তাহার ইচ্ছায় বাধা দেই নাই; ধরিবার সুযোগ দিয়াছি, ধরা দেই নাই, তাহাতে তাহার ঔৎসুক্য কেবল বৃদ্ধি করিয়াছে। এ শোকাবহ ঘটনার পর প্রথম সাক্ষাতের দিনেই নীলা আমার অনুপস্থিতির জন্য অনুযোগ দিয়া বলিয়াছে, "এ সময়ে আপনিও আমাকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; এখন একা থাকা যে কি কষ্ট আপনি কি বুঝিতে পারেন না; মনে করিয়াছিলাম, আপনি নিত্য সঙ্গী হইবেন; সে ত দূরের কথা—আপনাকে ডাকিয়াও দেখা পাওয়া যায় না।"

আমার দেখা পাওয়ার মধ্যে কি আছে আমি জানিতাম। সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিতা রমণীর হৃদয় কাচের মত স্বচ্ছ কি না বলা কঠিন; কিন্তু উহা যে কাচ অপেক্ষা কঠিন তাহা সুনিশ্চিত; কোন বস্তুরই দাগ উহাতে সহজে অঙ্কিত হইবার নহে। মদমত্তা রূপসীর হৃদয়-দর্পণে বোধ হয় তাহার আত্মচ্ছবি ব্যতীত অন্য প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয় না,—জগতের অন্য সমস্তই তাহার চক্ষে অস্পষ্ট, তুচ্ছ, স্বপ্নতুল্য; ইচ্ছা করিলে সে সৌন্দর্য্যমূল্যে পৃথিবীর সমস্তই ক্রয় করিতে পারে যেন। সৌন্দর্য্য তাহার অর্থ, বিত্ত, অস্ত্র, সুখ,—সে রূপের জোরে সর্ব্বজয়ী হইতে চায়; সেই তাহার সাধ,—জগত তাহার রূপের রাজসিংহাসনের তলে ক্রীতদাসের মত নত শিরে কেন দাঁড়াইবে না; বিজাতীয় বিজয়দম্ভে সে সংসারের সকলি বিস্মৃত হইতে সমর্থ; তাহার চেষ্টা, লক্ষ্য কেবল সৌন্দর্য্যের মোহ বিস্তার। মরুর শিশির-বিন্দুর ন্যায় কন্যার শোক নীলার হৃদয় হইতে অচিরে অন্তর্হিত হইয়া অন্য আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহার জীবন-ইতিহাসে ইহা এই নূতন নহে।

গোবিন্দ বেচারীর অর্থলাভের আশায় গৌড়ে গিয়াও শেয়াস্তি নাই; পত্রের পর পত্র লিখিতেছে; আমার স্ত্রীর

নামীয় পত্র অবশ্য আমি দেখি নাই, আমার পত্রে ছত্রে ছত্রে কেবল নীলার জন্য ব্যাকুলতার কথা। চম্পার মৃত্যুর পর, একদিন আমি ও নীলা একত্র শ্রেষ্ঠীপ্রাসাদে বসিয়া ছিলাম, উভয়েই গোবিন্দর পত্র পাইলাম। নীলা পত্র পাঠান্তে বলিল, "গোবিন্দ লিখিয়াছে, সে চম্পার অকাল মৃত্যুতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছে।" আমার পত্রে কিন্তু ভিন্ন সুর। আমাকে সে লিখিয়াছে, "প্রিয় শ্রেষ্ঠী! আপনার ন্যায় বন্ধুর নিকট কিছুই গোপন করিবার নাই। আমি হেমরাজের কন্যার মৃত্যুতে দুঃখিত হই নাই। সে জীবিত থাকিলে, তাহার ও আমাদের দুঃখ ও অসুবিধার যথেষ্ট কারণ ছিল। বালিকা আমাকে দেখিতে পারিত না। আমিও তাহার মৃত্যুতে হেমরাজের অপ্রীতিকর স্মৃতি হইতে রক্ষা পাইয়াছি। ভগবান্, তাহার আত্মার কল্যাণ করুন।"

অন্যত্র লিখিয়াছে, "আমার খুড়া জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে খাবি খাইতেছে, বুড়ার কি কঠিন প্রাণ, তবুও বাহির হইতে চায় না। কি আপদ! বৈদ্য বলিতেছেন, আর বেশী দিন নাই! দেরী হইলে আমি সম্পত্তির আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। নীলার জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদা অস্থির! যদিও জানি, আপনি তথায় তাহাকে দেখিবার আছেন, তবুও ধৈর্য্য ধরিতে পারি না।"

আমার স্ত্রীকে পত্রের শেষাংশ পড়িয়া শুনাইলাম। নীলার বদনমণ্ডলে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে ঘৃণার সহিত বলিল "শ্রেষ্ঠী মহাশয়, আপনার পত্র আমাকে শুনাইলেন বলিয়া শত ধন্যবাদ। নির্লজ্জতা কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহার একটা উদাহরণ আমাকে জানিবার সুযোগ দিলেন, তাহার জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আমি বুঝিতে পারি না, মানুষ কি করিয়া এরূপ অভদ্রভাবে পত্র লিখিতে পারে। গোবিন্দ আমার স্বামীর বন্ধু ছিল, সেই অহঙ্কারেই বুঝি ভাবে, আমার উপর তাহার অসীম অধিকার। কি ভুল! দাবিটা মন্দ নয়। তাহার কল্পিত স্নেহের অত্যাচার অনেক সহ্য করিয়াছি; কিন্তু সকলেরই একটা সীমা আছে।"

মনে মনে বলিলাম, "সত্যই!" পত্রখানা উত্তরীয়ে বাঁধিয়া উত্তর করিলাম, "গোবিন্দর মনোভাব বোধ হয় অন্য প্রকার; তিনি শুধু আপনার স্বামীর বন্ধু হইয়া তৃপ্ত নন্; সত্বরই অন্য নিকট সম্বন্ধ স্থাপনের আশা করেন, মনে হয়।"

নীলা যেন আকাশ হইতে পড়িয়া সবিস্ময়ে বলিল, "বটে! গোবিন্দ কি এতই নির্ব্বোধ, অনায়াসে এমন একটা অসম্ভব আশা পোষণ করে! সে দুরাশার দাস জানি, কিন্তু এমন নির্লজ্জ, উন্মাদ, পূর্ব্বে জানিতাম না! উন্মাদ না হইলে কোন্ সাহসে আমাকে বিবাহ করিবার আশা করে? অন্য সম্বন্ধ অর্থে বিবাহ ত?"

আমি সংক্ষেপে উত্তর করিলাম "হাঁ—আমার বিশ্বাস তাঁহার সেই আশা।"

নীলা বলিল "যথাসময়ে বিষয়টা ভাবিবার সুযোগ লাভ করিয়া উপকৃত হইলাম। সে যেভাবে আমার অভি-ভাবকত্ব করিয়া আসিতেছে তাহাতে অন্যের এরূপ সন্দেহ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু শ্রেষ্ঠী, আপনিই বলুন ত, এ অবস্থায় কি আমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারি?"

আমি উত্তর করিলাম না। কি ভয়ানক স্ত্রীলোক! এই না সে গোবিন্দকে স্বর্গে তুলিয়া দিয়াছিল,—সে রাত্রের কথা আমি কি কখন বিস্মৃত হইব! গোবিন্দ, তোমার এ ভাগ্য আমার অদৃষ্টপূর্ব্ব নহে; আমার ন্যায় তোমাকেও একদিন বুঝিতে হইবে—মৌখিক প্রেমসম্ভাষণের মূল্য কি! আমার মন লইয়া নীলাকে বুঝিও; কেন আমি প্রতিহিংসা-প্রয়াসী বুঝিতে পারিবে।

নীলা বলিল "বলুন, শ্রেষ্ঠী, আপনার কি মনে হয়?"

আমার মনে কি হয়, আমিই জানি; তোমার জানিতেও অধিক বিলম্ব হইবে না। প্রকাশ্যে উত্তর করিলাম "মহাশয়া, আমি অবশ্য আপনাদের বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া কখন ভাবিয়া দেখি নাই। তবে গোবিন্দর বিবাহের আশা করা অস্বাভাবিক নয়; সে যুবক—চেহারাও তাহার সুশ্রী, তাহার খুড়ার মৃত্যুতে এখন ত সে ধনবান হইয়াছে; সে আপনার স্বামীর বন্ধু, আপনার চিরপরিচিত—"

নীলা আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল "সেই জন্যই আরও আমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারি না। সে যদি আমার স্নেহের পাত্র হইত;—আমি জানি তাহার জন্য আমার বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই,—তাহা হইলেও তাহাকে আমি বিবাহ করিতাম না; এরূপ বিবাহের পশ্চাতে একটা অপবাদ

লুকাইয়া থাকে, একটা লোকনিন্দা না আসিয়া যায় না,—আমি তাহা কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই।"

আমি বলিলাম, "সে কি? আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

সে আমার বিশ্বাস ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার প্রয়াসে মুখের নিকট মুখ আনিয়া মৃদু, মধুর, অনুরাগব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিল, "আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না—লোকে যাহাকে আমার মৃত স্বামীর বন্ধু বলিয়া জানে, তাহাকে যদি আমি বিবাহ করি, তাহা হইলে বিশ্বনিন্দুকরা কি বলিবে না, আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই বন্ধুপ্রবরের উপর আমার অনুরাগ ছিল? নিশ্চয় এ কথা উঠিবে—সে কলঙ্ক কে সাধ করিয়া ঘাড়ে লইতে চায় বলুন?"

সে মিথ্যা বলে নাই; গোবিন্দকে বিবাহ করিলে লোকে বলিবেই ত, "এতদিনে হত্যা-রহস্য প্রকাশ পাইল।" আমি যাহা ভাবিতে পারি নাই, নীলা তাহা ভাবিয়াছে; পাপীর মনে সর্ব্বদা ভয়,—পাপীরা বস্তুতঃই অনেক সময় অতি সন্তর্পণে আত্মকৃত অপরাধ ঢাকিতে গিয়া প্রকারান্তরে নিজকে অভিযুক্ত করে। আমার স্ত্রীরও সেই দশা।

আর কত সহ্য হয়। তবুও সহিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, হাসিয়া বলিতে হইবে, "আপনি মহোদয়া!" হাসিয়াই উত্তর করিলাম, "আমি থাকিতে আপনার নিন্দা করে এত সাহস কার?" একটু থামিয়া বলিলাম, "সত্যই কি তবে আপনি গোবিন্দকে পছন্দ করেন না?"

সে স্বরে জোর দিয়া বলিল, "হাঁ সত্যই, তাহার স্বভাব অতি কর্কশ,—সময় অসময়ের জ্ঞান তাহার একবারেই নাই। অত্যন্ত মাতাল; মদকে সে পানীয় না ভাবিয়া মত্ততার উপকরণ মনে করে; সভ্যসমাজের সে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমি তাহাকে পছন্দ করি না, বরং তাহার স্নেহের অত্যাচারকে ভয় করি।"

আমি তাহার দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। তাহার মুখ বিবর্ণ, হস্ত ঈষৎ কাঁপিতেছে। সহাস্যে বলিলাম "হতভাগ্যের অদৃষ্ট তাহা হইলে নিতান্ত মন্দ; তাহার প্রাণে বড় বাজিবে- এমন সুন্দরীর আশা সহজে কে ছাড়িতে পারে,—তাহার জন্য দুঃখ হয়! পক্ষান্তরে আপনার এ ভাবে আমরা সুখী। কারণ—"

নীলা আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিল, "কারণ কি?"

আমি অপ্রতিভের ভান করিয়া বাধ-বাধ স্বরে বলিলাম "কারণ গোবিন্দর যদি আশা না থাকে, সর্ব্বগুণান্বিতা, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠিনীর পাণিগ্রহণের আশা অন্যের করা অস্বাভাবিক বা অন্যায় হইবে না।"

সে তাহার মস্তক দুলাইয়া বলিল "অন্য!—ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত গোবিন্দ আমাকে ঘিরিয়া আছে, অন্য কেহ কি সহজে আমার সম্মুখীন হইতে পারে। সে আমাকে জ্বালাতন করিল;—সে বুঝে না কেন, আমি কিছুতেই তাহাকে বিবাহ করিতে পারি না;—নির্ব্বোধের একটু সামান্য জ্ঞানও নাই। সে তাম্রলিপ্তিতে ফিরিবার পূর্ব্বে অন্যত্র পলায়ন ব্যতীত তাহার হস্ত হইতে উদ্ধারের অন্য উপায় দেখিতেছি না।"

আমি বলিলাম "কেন?"

"অন্য উপায় আর কি আছে? প্রকাশ্যে আমি আমার স্বামীর বন্ধুর সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না; তাহাতে লোক-নিন্দার ভয় আছে। গোবিন্দর চেয়ে আপনি এ পরিবারের সহিত কম ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নন,—এক, আপনার সাহায্য, অভিভাবকত্ব পাইলে অবশ্য আমি নিরাপদ, কিন্তু সময়-মত আপনার সাক্ষাৎ-সুখই লাভ হয় না!"

ঈপ্সিত মুহূর্ত্ত উপস্থিত! আমি তাহার নিকটে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম "কেন,—আমার অভিভাবকত্ব এমন দুর্লভ কি? সে ত আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে।"

সে চমকিয়া উঠিল; হাতের ফুলটি নীচে পড়িয়া গেল। সত্যই লজ্জিত, স্মিতমুখে বাধ-বাধ স্বরে বলিল "আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি তাহার ফুলটি তুলিয়া দিবার ছলে নত হইয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলাম "আমি বলিতে চাই—অত উতলা হইবেন না—আপনি আমার অভিভাবকত্বে বঞ্চিত বলিলেন কিনা—তাই বলিতেছিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে আমার সকলই করতলগত করিতে পারেন—আমাকে বিবাহ করিলেই সে দাবী আপনার।"

নীলা কম্পিত স্বরে বলিল "মহাশ্রেষ্ঠী!"

আমি, পূর্ব্ববৎ বিষয়কর্ম্ম স্থির করিবার উপযোগী

গম্ভীর স্বরে বলিলাম, "অবশ্য আমি বেশ বুঝি, বয়স আমাদের এ সম্বন্ধের অন্তরায় ; যুবকের ন্যায় কান্তি আমাতে সম্ভব নয়, নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা, দুর্ঘটনা আমাকে এরূপ করিয়াছে ; আমার ব্যক্তিগত গুণ এমন কিছু নাই, যাহাতে আপনাকে আকৃষ্ট করিতে পারি। থাকার মধ্যে আমার অর্থ,—অগাধ অর্থ—পদগৌরব, সম্মান ;—আপনার সৌন্দর্য্যের আমি উপাসক, যদি ইহা জানিয়াই আপনি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন, সুখী হইবার আশা করেন—আমি যুবকের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া প্রেমের কথা, ভালবাসা জানাইতে, এ বয়সে না পারিলেও, আমি আপনার ন্যায্য অধিকার পূর্ণরূপে দান করিতে প্রাণপণ করিব। আপনি এখন দ্বিধা না করিয়া বলিতে পারেন, আমার সাহচর্য্য আপনার প্রার্থনীয় কি না।"

আমি নীরব হইলাম। নীলার বদন আরক্তিম, চিন্তায় সে নিমজ্জিত। অনেকক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইল। নীলা ধীরে ধীরে নয়নপল্লব উত্তোলন করিয়া আমার বদনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল,—আমার চক্ষের উপরকার নীল আবরণ ভেদ করিয়া সে আমার নয়ন-তারকার সন্ধান করিতেছিল। বদন তাহার প্রফুল্ল, নয়ন ভাবময়—সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন! সে আমার আরও নিকটে সরিয়া বসিল। তাহার উষ্ণ নিশ্বাস আমার কপোল স্পর্শ করিতেছিল। মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত বিস্মৃত হইয়া ভাবিয়াছিলাম—নীলা, আমার সেই নীলা।

নীলা, প্রেমের আধ অস্পষ্ট মধুময় স্বরে ধীরে ধীরে বলিল "আপনি আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক—কিন্তু আপনি ত আমাকে ভালবাসেন না!"

সে আমার স্কন্ধে আদর-ভঙ্গিতে তাহার শুভ্র হস্ত স্থাপন করিল ; একটি বিলম্বিত মৃদুমধুর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। চকিত আমি তাহার মুখের পানে চাহিলাম—নীলা কি সুন্দর! যে সৌন্দর্য্যে একদিন আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া সংসারের সকলকেই সুন্দর দেখিয়াছিলাম, সাধ হইতেছিল, আজও আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের হলাহলে জীবন বিসর্জ্জন দেই। জীবনের কথা মনে হইতেই জীবনব্রত স্মরণে আসিল। চমকিলাম। নীলা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মানসিক সমর লক্ষ্য করিতেছিল, বুঝিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। সে ধীরে ধীরে আমার স্কন্ধ হইতে হস্ত তুলিয়া লইল, অতি সন্তর্পণে তাহার সুকোমল অঙ্গুলী আমার কেশে প্রবেশ করাইয়া দিল ; অন্যমনস্কভাবে কেশে মৃদু মৃদু অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে লাগিল ; অবনত নয়নে বক্র দৃষ্টিতে কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "না, আপনি আমাকে ভালবাসেন না!" পরে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু সত্য বলিতে কি—আমি আপনায় ভালবাসি!"

নীলা পূর্ণায়তন বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। তাহার তখনকার ভাব ভঙ্গী নাট্যশালার শ্রেষ্ঠতমা অভিনেত্রীকেও পরাস্ত করিতে পারিত। আশ্চর্য্য! এমন একটা মিথ্যা কথা সে এমন সরলতার সহিত, প্রেম-আবেগ কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া গেল যে, অন্যের কথা দূরের, আমাকেও ক্ষণতরে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ভাবিতে হইয়াছিল, নীলা বলে কি? সত্যই কি সে আমাকে ভালবাসিতে পারে! কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার উত্তর অন্য ; উদ্দেশ্য আমার ভিন্ন, জীবনে আর কখন প্রেমিক হইতে পারিব না। আমি তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "তুমি আমাকে ভালবাস? না না, সে কি করিয়া হইতে পারে!"

সে আবার সেই হৃদয়-বিভ্রমকারী হাস্য-লহরী তুলিয়া কটাক্ষ হানিয়া বলিল "সম্পূর্ণ সত্য,—ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। যে দিন আপনাকে প্রথম দেখিয়াছি, সেই দিনই নিজকে হারাইয়াছি। আমি আমার স্বামীকে ভালবাসিতে পারি নাই ; যদিও কতক বিষয়ে তাহাতে আপনাতে সাদৃশ্য আছে, তবুও তাহার সহিত আপনার পার্থক্য বিস্তর ; তাহাতেই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি বলিতে বাধ্য, জগতে যদি আমি কাহাকেও ভালবাসিয়া থাকি সে আপনি!"

যেন স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।"

উত্তর করিল, "নিশ্চয়—আনন্দের সহিত। বল তোমার ডাক-নাম কি! শেষাদ্রি না?"

"হাঁ।"

"তবে শেষাদ্রি প্রিয়তম, আজ তুমি আমাকে ভাল না বাস—একদিন বাসিতে হইবে—জানিও, আমাকে ভালবাসিতে তোমাকে বাধ্য করিব।"

আমার ওষ্ঠতলে সে গণ্ড স্থাপন করিল। সর্পিণী আমাকে দংশন করিয়াছে, আমি কেন আজ তাহাকে দংশন না করিব!

আমি তাহার হস্ত তুলিয়া ধরিলাম। বিবাহকালে যে হীরক-অঙ্গুরী তাহার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়াছিলাম আজও তাহা তেমনি রহিয়াছে। শুনিয়াছি, হীরকে বিষ আছে—ইচ্ছা হইল তাহাতে চুম্বন করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করি। নীলা এমন সময় বলিয়া উঠিল "ও! শেষাদ্রি! তুমি কত সুন্দর! প্রথম সাক্ষাৎ-কালেই কি বলি নাই, তোমাকে দেখিয়া কে বলিবে তুমি বৃদ্ধ—তুমি আমার প্রিয়তম—অতি সুন্দর!"

আমি তাহার হস্ত মুক্ত করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে সহসা বলিয়া উঠিল, "তুমি কি এ কথা গোবিন্দকে জানাইবে? না—এখন নয়!"

"না—সে ফিরিবার পূর্ব্বে তাহাকে কেন এ সংবাদ জানাইতে গেলাম। এ সংবাদ পাইলে কি সে আর গৌড়ে থাকিবে? গৌড় ছাড়িয়া দৌড় দিবে। যত দিন সে দূরে থাকে, ততই আমাদের ভাল। কি বল?"

নীলা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। আমি তাহার কেশগুচ্ছ লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলাম। এত শীঘ্র যে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে ভাবিতেও পারি নাই। নীলা যদি জানিত আমি কে, তাহা হইলে কি সে আজ আমাকে এরূপ প্রেম-প্রবাহে ডুবাইতে চাহিত।

সে কতক্ষণ আমাকে নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তোমার একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে পারি কি? ক্ষতি তাহাতে তোমার কিছুই নাই, অথচ আমার তাহাতে অসীম আনন্দ!"

"কি?—আমি এখন তোমার-হুকুমের বাধ্য।"

নীলা হাসিয়া বলিল "তবে—এক নিমেষের জন্য তোমার চোখ খুলিয়া ফেল; আমি তোমার চক্ষু দেখিতে ব্যগ্র!"

আমি আসন হইতে তাড়াতাড়ি উঠিলাম; কাতরস্বরে বলিলাম, "আর যা হয় অনুরোধ কর; আলোক আমার একবারে সহ্য হয় না; চোখ খুলিলে আমার অসহ্য যন্ত্রণা হইবে। আজ নয়, সময়ান্তরে তোমার কৌতুহল চরিতার্থ করিব—প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

"কবে?"

আমি তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিলাম, বলিলাম, "আমাদের বিবাহের দিনে—বিবাহ অন্তে রাত্রে যখন তোমাকে নিতান্ত আমার বলিতে পারিব সে রাত্রে, তোমার জন্য সকল যন্ত্রণা আমি আনন্দে বহন করিব।"

"আঃ সে যে অনেক দেরী!"

"আর কত দেরী? এ শরৎকাল।—তোমার অনুমতি হইলে বসন্তকালেই বিবাহ হইতে পারে।"

সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "কিন্তু আমি যে সবে মাত্র সে দিন বিধবা হইয়াছি; চম্পা আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে!"

বলিলাম, "ততদিনে তোমার স্বামীর মৃত্যুকাল ছয়মাসের অধিক হইয়া যাইবে। সমাজে সুন্দরীরা আর কত দিন অপেক্ষা করে? চম্পার শোকাবহ মৃত্যুর জন্যই সকাল-সকাল বিবাহ হওয়া দরকার; তুমি এ অবস্থায় একা থাকিলে পাগল হইয়া যাইবে যে। আমি তোমাকে না পাইলে সর্ব্বদা তোমার নিকটে থাকিব কি করিয়া? বিবাহ হইলে আমাদের একত্র বসবাসে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না, নতুবা অন্যে—"

নীলা হাসিয়া বলিল "তোমার যে ইচ্ছা;—তাম্রলিপ্তিতে যাহাকে লোকে স্ত্রীবিদ্বেষী বলিয়া জানে সে যদি এমন অধৈর্য্য প্রেমিকের পরিচয় দেয়, তবে আর আমার কি আপত্তি?"

"প্রেমিক আমি নই সত্য, কিন্তু অধৈর্য্য, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ দেখি না!"

ধীরে ধীরে বলিলাম "কেননা, আমি যত শীঘ্র তোমাকে পাই ততই নিরাপদ। কখন কে আমাদের মধ্যে পড়িয়া বিপদ ঘটায় কে জানে।"

সহাস্যে সে বলিল, "ভাল, ভাল! তুমি স্বীকার না করিলেও, তুমি একজন প্রকৃত প্রেমিক। তুমি তোমার গাম্ভীর্য্যের অত্যাচারে ভালবাসাকে প্রশ্রয় দিতে চাও না। কিন্তু প্রেম যে বাধায় আরো বৃদ্ধি পায়। তুমি প্রেমিক,—তোমার ভালবাসা আমাকে পাগল করে,—তুমি নিশ্চয় আমাকে ভালবাস—নিশ্চয়!"

বলিলাম, "এ যদি ভালবাসা হয়, তবে ভালবাসি।

প্রেমের উপাসনা কখনও করি নাই ; জানি না, আমার মনে যাহা হইতেছে তাহার নাম কি। মনে হইতেছে—তুমি কেবল আমার হও, আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করি।"

সে বলিল "ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন ; আমি তোমাকে, আমার যাহা কিছু আপনার, তাহা দিয়া তোমার প্রেমানুরাগে কত সুখী হইব।"

হাসিয়া বলিলাম "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক ; তুমি সে সুখে সুখী হও। তবে আজ আসি, বেশী রাতজাগা আমার সহ্য হয় না।"

সে সহানুভূতির স্বরে বলিল "সত্যই তবে তুমি চক্ষের অসুখে বড় কষ্ট পাইতেছ। রীতিমত সেবা শুশ্রূষা হইলে শরীর অমন থাকিবে না। আশা করি, আমি তোমার সে দিন আনিয়া নিজেও সুখী হইব।"

উত্তর করিলাম "বিশ্রাম ও যত্ন আমার শরীর সুধরাইবার প্রকৃত ঔষধ বটে ; কিন্তু তাহা দিতে তোমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, পূর্ব্বে হইতেই বলিতেছি, আমাকে বিবাহ করিলে তোমার মত সুন্দরী যুবতীর পক্ষান্তরে একটা দুঃসহ ভার গ্রহণ করিতে হইবে ; সেটা আমার সুখের হইলেও, তোমার তাহা হইবে কি ? এখনও ভাবিয়া দেখ।"

সে উত্তর করিল "ভালবাসা অন্য ভাবনার ধার ধারে না ; আমি তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে চাই। অমন অসুখ অনেকেরই হয় ; যত্নচেষ্টা হইলেও রোগ আর তিষ্ঠিবে কতক্ষণ ?"

"সে ঠিক। এককালে শরীরে যে শক্তি ছিল, লোকের অমন কমই থাকে ; আজও যাহা আছে, তাহাতে যুবককেও আমার নিকট পরাভব মানিতে হইবে। তবে চোখটার স্নায়ুতে আমার অসুখ, আমি— "হাই তুলিয়া হস্ত দুইখানি মস্তকের উপর বিস্তার করিয়া কথাটা শেষ করিতে যাইতেছিলাম। সহসা নীলা কেমন হইয়া গেল। তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি তাহাকে বাহুবেষ্টন করিয়া না ধরিলে মাটীতে সে পড়িয়া যাইত। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ তোমার একি হইল ? শরীর কেমন বোধ হইতেছে ?"

সে কষ্টে উত্তর করিল "তুমি কি এই বাড়ীর কেহ ?"

বলিলাম "কেন ?"

বলিল "হাঁ। তুমি যখন হাত দুখানি মাথার উপর তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলে, আমার যেন মনে হইতেছিল, তুমি হেমরাজ, তাহার প্রেতাত্মা, আবার শরীর ধরিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ।"

আমি নীলাকে ধরিয়া লইয়া জানালার পার্শ্বে কোলে বসাইলাম, জানালার পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া বলিলাম, "আজ তোমার এমন কল্পনা মনে আসা বিচিত্র নয় ; উত্তেজনার কারণ যথেষ্ট হইয়াছে ; তাহার কথা স্মরণ হওয়া এ অবস্থায় স্বাভাবিক। আমি এ পরিবারের কেহ নই,—বন্ধু বটে, অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু—সেই জন্যই বোধ হয় তাহাদের হাব-ভাব, আদবকায়দা আমাতে কিছু-কিছু আসা সম্ভব। এ বিষয় লইয়া আর মাথা খারাপ করিও না,—একটু বিশ্রাম কর,—শরীরটা সুস্থ হোক।"

"শরীর সুস্থ হইয়াছে—জানালা দাও ; জানি না কেন মাথাটা কেমন খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তখন তোমার দিকে চাহিতেই বড় ভয় হইতেছিল,—ভয়ানক স্বপ্ন !"

আমি জানালা বন্ধ করিয়া বলিলাম, "তোমার ভাবী স্বামীর পক্ষে সেটা আনন্দের কথা নয়—আমার চেহারাটার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য বোধ হয় !"

সে হাসিয়া বলিল "ক্ষমা প্রার্থনার সময় এখনও কাটিয়া যায় নাই,—তুমি যদি কখনও আমার পাণিগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হও, ক্ষমা তোমাকে চাহিতে হইবে,—শুধু ক্ষমা নয়, আরও বেশী শাস্তি ;- আমি কিন্তু কিছুতেই আমার মত পরিবর্ত্তন করিতেছি না। আমার সমস্ত একদিকে আর তুমি আর এক দিকে,—আমি তোমার ভালবাসায় সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত,—তুমি আমার সর্ব্বস্ব !"

আমি সস্নেহে নীলার হস্ত গ্রহণ করিলাম,—চুম্বন করিলাম, বলিলাম, "আর বলিবার আছে কি ! বৃদ্ধকে তুমি গ্রহণ করিতে চাও, কর। আমিও অসুখী হইব না। তবে আসি, শরীর তোমার ভাল নাই ; বিশ্রাম দরকার, বিশ্রাম কর। আমাদের বিবাহের কথা এখন সাধারণে গোপন থাকিবে কি ?"

নীলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল "দু'একদিন নীরব থাকা মন্দ কি, গোবিন্দ পাছে এ সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসে। কিন্তু মন বলে, সংবাদটা প্রচার হোক,—আমার

সৌভাগ্য দেখিয়া কত ভামিনী জ্বলিয়া মরিবে - তাহা দেখিতে বড় আমোদ!"

"সে আমোদের দিন যাইবে কোথা? দু'দিন আগে আর পাছে—গোবিন্দ না ফেরা পর্য্যন্ত চুপচাপ থাকাই ঠিক। তা নয় কি শ্রেষ্ঠিনী?"

নীলা কটাক্ষ হানিয়া বলিল "শ্রেষ্ঠিনী? আমার কি নাম নাই? নীলা বলিলেই আমাকে বেশী আদর করা হয়।"

বলিলাম, "যে আজ্ঞা। নীলা তবে আসি। আজকার রাত যেন তোমার আমার স্বপ্নে কাটে।"

সে হাসিয়া বলিল "অনেক রাতেই তুমি আমার সঙ্গী। আশা করি কাল প্রাতেই তোমার সাক্ষাৎ পাইব।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। তোমার স্বাধীনতা আমি নিজে গ্রহণ না করিয়া কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছি না। তুমি আমারই, আমাতেই তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে; আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী; স্ত্রী অর্থে, স্বামীর জন্য আত্মবলি,—জান ত?"

সহাস্যে সে উত্তর করিল, "জানি, খুব জানি, সেই ত রমণীর সুখ—নারী চিরকাল আশ্রয়-ভিখারিণী।"

মনে মনে হাসিলাম। এই কি তোমার প্রাণের কথা! পরীক্ষা তাহার হইয়া গিয়াছে; আবার পরীক্ষা! আমারই নিজের স্ত্রীর সহিত আবার প্রেম-পরিচয়,—বিবাহ—সেই স্বামিত্বের স্বত্ব-নিরূপণ,—স্বামীর জন্য স্ত্রীর আত্মবলিই যদি প্রকৃতির নীতি হয়, তাহাই পূর্ণ হোক; সে নীতির যে অবমাননা করিয়াছে—তাহার বিচার ভগবান করিবেন।

বিদায় হইলাম। মাতা বসুমতি, স্বর্গের দেবতা, সাক্ষী থাক, নীলা বলিয়াছে, সে স্বামীর সুখের জন্য আত্ম-বলি দিতে প্রস্তুত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিন পরে গোবিন্দর একখানি পত্র পাইলাম। সে লিখিয়াছে:—

প্রিয় বন্ধু,

আপনি চিঠির উপরের কাল চিহ্ন দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছেন, আমি আপনাকে কি আনন্দ সংবাদ দিতে যাইতেছি। আমার খুড়ার মৃত্যু হইয়াছে। ভগবানকে ধন্যবাদ, বুড়া আমাকে তাহার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছে। এখন আমি স্বাধীন। তাম্রলিপ্তিতে এখনি ফিরিতে পারি,—যথাসম্ভব ফিরিবও; তবে আরও দুই একদিন সম্পত্তিটার বন্দোবস্ত করিতে যে দেরী। রওনা হইবার পূর্ব্বে আপনাকে জানাইব। কিন্তু একটি বিনীত অনুরোধ, এ সংবাদ এখন শ্রেষ্ঠিনীকে দিবেন না; অকস্মাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে চাই। বেচারী এ কয়েকদিন না জানি নিজকে কেমন একা সঙ্গীহীন মনে করিতেছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাকে সম্মুখে দেখিয়া বিস্ময়ে তাহার সুন্দর চক্ষু-তারকা বিস্ফারিত হইবে—তাহা আমার দেখিবার সাধ। আমার মনের ভাব আপনাকে বুঝাইতে পারিলাম কি? আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া হাস্য করিবেন না; সুরূপা স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে হতবুদ্ধি বৈ কি! হতবুদ্ধি হইয়াই আনন্দ! আর্থিক উন্নতির জন্য তত নয়, বৃদ্ধের সম্পত্তি আমার এই আনন্দলাভের পথ সুগম করিয়াছে সেই জন্য বুড়াটাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না। সমাজে নীলা ও আমার স্থান এখন প্রায় সমান সমান; আমি তাহার অযোগ্য, তাহা আর কেহ বলিতে সাহসী হইবে না। নীলার পত্রগুলি পাঠ করিয়া যদিও হতাশ হইবার কিছু পাই নাই, স্নেহের নিদর্শন তাহার ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান, তবুও আমার ধনরাশি আমাকে তাহার আরও নিকটে স্থাপন করিবে। অর্থের জন্য তবে আমি কেন গর্ব্বিত হইব না?

আপনার নিকট আমি ঋণী। আমাকে দরিদ্র জানিয়াও আপনি অযাচিতভাবে বহু অর্থ ধার দিয়াছেন; এখন দেশে ফিরিয়া তাহা সুদসহ পরিশোধ করিতে পারিলে আমার আত্মগরিমা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইবে। সেদিন সত্বর আসুক।

আপনার একান্ত অনুগত—গোবিন্দ।

পত্রখানি পাঠ করিলাম; একবার নহে, দুইবার নহে, বারবার। আত্ম-তৃপ্তির জন্য নহে—আমার স্ত্রীর ব্যবহার, ও গোবিন্দর পরিণাম চিন্তা করিয়া। গোবিন্দও আমার ন্যায় প্রতারিত; আমিও কি একদিন মৃত্যুর দ্বার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সর্ব্ব প্রথমেই ঐ কপটীর লোকললাম বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি দর্শন করিবার জন্য গোবিন্দর ন্যায়ই আকুল হই নাই? কি দেখিয়াছিলাম? আমার সকল সাধ,

সকল সুখের শ্মশান! গোবিন্দ কি দেখিবে? তাহার সকল আশা হত; পিশাচী তাহাকে মধুর অনুপানে মহা বিষ পান করাইয়াছে। সে মৃত, তথাপি রাক্ষসী ক্ষান্ত নহে, সে তাহাকে স্বহস্তে ভস্মীভূত করিয়া তৃপ্ত হইবে। এখনও প্রেম-পত্র! এ প্রেম কি ভয়ানক! পুরুষ, দেখিয়াও কেন সাবধান হইতে জানে না,—প্রাণ অপেক্ষাও কি প্রবৃত্তি বড়! অথবা পুরুষ অন্ধ!

গোবিন্দ দেশে ফিরিয়া আমার ঋণ পরিশোধ করিবে। সে বুঝি ভুলিয়া গিয়াছে, সে আমার কি ধন গ্রহণ করিয়াছে? তাহার প্রাণপাতেও যে সে ধনের বিনিময় সম্ভব নয়। হতভাগ্যের জীবনেই বা আর কি অবশিষ্ট আছে? কি আছে আর কি দিবে? যাহার আশায় নিজকে হেয় পশুর অধম করিয়াছে তাহাও যে পরহস্তগত। গোবিন্দের জন্য দুঃখ না হোক, দয়া হয়; অন্ধের ন্যায় কৃপার পাত্র জগতে আর দ্বিতীয় কে আছে? আমি পত্রের উত্তর লিখিলাম :—

প্রিয়, সুদর্শন,

আপনার সৌভাগ্যের সংবাদে সুখী হইলাম; আশা করি সত্বরই আপনার দর্শন লাভ করিয়া সুখী হইব। শ্রেষ্ঠিনীর বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়ন দর্শনের সাধ আপনার স্বাভাবিক; তাহার যথোচিত আয়োজন করিয়া রাখিব; বিশ্বাস করুন, আমি আপনার আগমনের দিন কাহাকেও জানিতে দিব না। আপনি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিয়া অনুগৃহীত করিবেন কি? এবারে আমি সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে অভ্যর্থনা করিতে চাই। বসন্ত-পূর্ণিমার সেই শুভ রজনীতে আপনার অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে একটা ভোজের আয়োজন করিবার ইচ্ছা। বেশী কেহ নয়, কেবল কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধু একত্র হইয়া আপনাকে সর্ব্বপ্রথমে সংবর্দ্ধনা করিবার অভিলাষ? তাহা পূরণ করিবেন কি? যাহা মত হয় জানাইলে কৃতার্থ হইব। আশা করি, 'বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি দর্শনে' একটু বিলম্ব হইবে, সেই ভয়ে আমাকে হতাশ করিবেন না। সবুরে মেওয়া ফলে, বিলম্বে মিলন আরও মধুর,—সত্য নয় কি?

অনুগ্রহপ্রার্থী—শৈলাদ্রি গুপ্ত।

আমার নব-অভ্যস্ত স্পষ্ট স্পষ্ট বাঁকা অক্ষরে পত্রখানি শেষ করিয়া নিজ হস্তে তাহা গালামোহর করিলাম। ভৃত্যকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ পত্রখানি ডাকে দিতে বলিলাম। আহারের ইচ্ছা ছিল না, চিন্তা আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা হরণ করিয়াছিল। এক, দুই, তিন, চারি—আর চারি দিবস পরে গোবিন্দ তাম্রলিপ্তিতে ফিরিবে; সে দিন আমার বিষম পরীক্ষার কাল, জয় পরাজয়ের সন্ধিস্থল; কি উপায়ে, কি কৌশলে শত্রুর চেষ্টা ব্যর্থ করিব, তাহাই ভাবিতেছিলাম। নীলাকে দূরে সরাইতে হইবে, দুষ্টা স্ত্রীকে বিশ্বাস নাই; তাহার উন্মত্ত প্রেমিক গোবিন্দর উপরও আস্থা নাই, হয় ত সে নিরাশ হইয়া নীলাকে হত্যা করিতে প্রাণপণ করিবে; আমি নীলার সেরূপ মৃত্যু প্রার্থনা করি না। নীলা সুন্দরী, আত্ম-সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিতা, একমাত্র অর্থ ঐশ্বর্য্য জগতে তাহার আকর্ষণের বস্তু—তাহার মৃত্যুও সেই ঐশ্বর্য্যে, ঐশ্বর্য্য-কণ্টকে জর্জ্জরিত হইয়া ক্ষতসৌন্দর্য্য পদ্মদলের মত সে ধীরে ধীরে ঢলিয়া পড়িবে; আত্মকৃত ব্যাধির চরম পরিণাম চিন্তা করিবার অবসর প্রদান না করিলে তাহার মৃত্যুতে মঙ্গল নাই। যে মৃত্যুর সাহায্যে আমার চক্ষু উন্মোচিত হইয়াছে, তাহাকে সেইরূপ মৃত্যু দান করিতে হইবে।

কালবিলম্ব না করিয়া সেই দিনই নীলার প্রাসাদে দেখা দিলাম। পুষ্পস্তবকের সহিত একটি মণিময় স্বর্ণপুষ্প নীলার জন্য সঙ্গে লইতে বিস্মৃত হইলাম না। সে আমাকে অভ্যর্থনা করিতে তিলমাত্র বিলম্ব করিল না। সুন্দরী, বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া, আমার প্রতীক্ষাতেই ছিল যেন। আমি অভিবাদনান্তে তাহাকে চুপে চুপে বলিলাম "একটা সংবাদ দিতে আসিয়াছি, গোপনে শুনিবার অবসর হইবে কি?"

আমার স্ত্রী দাসীদিগকে কক্ষ পরিত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিল। আমার হস্ত ধরিয়া তাহার পার্শ্বে বসাইয়া বলিল, "ব্যাপার কি? কি কথা?"

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "আজ গোবিন্দর পত্র পাইয়াছি।"

সে কম্পিত হইল, উত্তর দিল না। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলাম; বলিলাম, "দুই-তিন দিনের মধ্যেই সে ফিরিবে।" হাসিয়া বলিলাম "তুমি বোধ হয় তাহাকে দেখিয়া সুখী হইবে।"

সে একবার আসন হইতে উঁচু হইয়া আবার বসিল; তাহার দেহ কম্পিত হইতেছিল;—যেন কি বলিতে

চাহিয়াও বলিতে পারিতেছে না। উদ্বিগ্নের স্পষ্ট রেখা তাহার বদনে বর্ত্তমান; কুহকিনী ধরা পড়িবার ভয়ে ভীত হইয়াছে।

বলিলাম "গোবিন্দ হইতে কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিতেছ কি? আমার সঙ্গে তোমার বর্ত্তমান সম্বন্ধ অবগত হইলে সে নিশ্চয়ই তুষ্ট হইবে না। আমি বলি, এ সময়টা কয়েকটা দিন তোমার কোন বন্ধুর আলয়ে কাটান মন্দ নয়; তারপর যা' হয় হইবে। কি বল?"

নীলা অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল "প্রিয়তম, তোমার যে ইচ্ছা আমারও তাই। গোবিন্দ অতি বদরাগী; তাহার একটা ভ্রান্ত ধারণা, আমি তাহাকে—, যাক, এ-সকল কথা জানিলে সে তোমাকে অপমান করিতে ছাড়িবে না—কাজেই—"

আমি বলিলাম, "আমার জন্য তোমার বৃথা ভাবিবার আবশ্যক নাই, আমি আমার দিকটা নিজেই ঠিক করিয়া লইব। সে তোমাকে সহজে অব্যাহতি দিবে না, সেই ভয়. সে তোমাকে লাভ করিবার আশা পুরাদমে করিয়া আছে, পত্রেও সে সে আভাষ দিয়াছে—লিখিয়াছে, সে তোমার পত্র পাইয়াছে!"

নীলা আরও বিবর্ণ হইয়া উত্তর করিল, "হাঁ, তাহাকে আমি দুই চারিখানি পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছি; আমার বিষয়কর্ম্মের সহিত সে সংশ্লিষ্ট, তাহারই একটা বিধি-ব্যবস্থা করিতে তাহাকে পত্র লিখিয়াছি; সে হয় ত সেই পত্রগুলি অন্যভাবে লইয়া বৃথা আশার প্রশ্রয় দিয়াছে।"

গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলাম "যাহাই হোক, তাহার মনোভাব অন্য। তোমার স্থানান্তরে যাওয়াই এখন ঠিক। নয় কি?"

সে আসন পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। আমার হস্ত দুইখানি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল "যদি তোমার অনুমতি পাই তবে এ কয়েকটা দিন আমি ভিক্ষুণী সঙ্ঘে কাটাইতে পারি। সেখানে আমি শিক্ষিত হইয়াছি; সকলেই আমাকে সেখানে ভালবাসে, ধর্ম্মচারিণী মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীদিগের পবিত্র সঙ্গে নিজকে সমাহিত করিয়া আমিও পবিত্র বিবাহের জন্য প্রস্তুত হই। কেবল তোমার অনুমতির অপেক্ষা।"

বলিলাম, "যথার্থই তোমার প্রস্তুত হইবার সময় উপস্থিত—ভবিষ্যতে কি আছে কে জানে—জীবনমৃত্যু গালি নয়, সংসারে বিলাসই একমাত্র উপাস্য নয়,—জীবনটাকে ভগবানের দিকে মুখ করিয়া সকলেরই দেখা উচিত! নীলা! আমি তোমার এ ভাবকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রশংসা করি। যাও একবার পূতপ্রাণা সন্ন্যাসিনীদিগের সংসঙ্গে পবিত্রতা লাভ করগে। সেখানে গিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিও—তুমি যেন অন্তরে বাহিরে সুন্দর হইতে পার, তোমার মত স্বামীর জন্য,—আমার জন্য নিঃস্বার্থভাবে প্রার্থনা করিও। হয়ত আমি তোমাকে যতটুকু বুঝিয়াছি তাহা হইতে তুমি অন্য, তুমি পবিত্র, তুমি নারী, স্নেহের আধার—তোমার আত্মার উন্নতি হোক। গোবিন্দর ভয় করিও না,—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সে যাহাতে তোমার অসম্মান করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা আমিই করিব।"

সে বলিল "আঃ তুমি জান না—তাহার প্রকৃতি কি ভীষণ; সে তোমাকে নানা-প্রকারে কষ্ট দিবে।"

বলিলাম, "তাহাকে নিরস্ত করিবার অস্ত্র আমার আছে। তুমি ত তাহাকে আশান্বিত হইবার কোন আভাস দাও নাই। যদি না দিয়া থাক, সে তবে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া উন্মত্ত হইয়াছে—সে দোষ ত তাহারই!"

"নিশ্চয়—কিন্তু আমার স্নায়ু দুর্ব্বল, অমঙ্গলের আশঙ্কাই আগে মনে আসে। যাক—কবে আশ্রমে যাওয়া তোমার মত?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমার মতামত লইয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছার জন্য আমি আপ্যায়িত; কিন্তু আজও ত আমি তোমার স্বামী নই, তোমার সময় তুমিই নিরূপণ কর।"

"তবে আজই রওনা হইব, যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। আমার সন্দেহ হইতেছে—সে নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বেই আসিয়া পড়িবে।"

আমি বিদায় লইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "তোমাকে যাত্রার জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে,—আমি তবে আসি। সঙ্ঘমিত্রা মহাশয়াকে অবশ্য আমাদের সম্বন্ধের বিষয় জানাইতে ভুলিবে না—নচিলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সহজ হইবে না।"

"তা আর বলিতে হইবে না, আশ্রমের নিয়ম অতি কড়া, কিন্তু পুরাতন ছাত্রীদের সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা,—অতি সহজেই তোমার সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি পাইব।"

"তাহা হইলেই হইল, তবে আসি।"

বিদায় হইলাম।

বাসায় ফিরিবা মাত্র ভৃত্য একখানি পত্র দিল। গোবিন্দ লিখিয়াছে সে দোল পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময় ফিরিবে। ভৃত্যকে তাহা শুনাইয়া বলিলাম "গোবিন্দর অভ্যর্থনার জন্য একটা বিশেষ ভোজের আয়োজন করিতে হইবে। ১৫।১৬ জনের আন্দাজ—দেখিও ভোজটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়া চাই। সুরা সম্বন্ধে বলিবার আছে—গোবিন্দ অপরিমিত মদ্যপ; মদ্য উৎকৃষ্ট হইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তীব্র হওয়া চাই। তুমি তাহার আসনের পশ্চাতে নিজে থাকিয়া নির্জ্জলা কড়া মদ্যের ব্যবস্থা করিবে, আহার শেষ পর্য্যন্ত, এ কথাটা দেখিও ভুল হয় না যেন।"

সে নমস্কার করিয়া বলিল "যে আজ্ঞা প্রভু।"

"শুধু আমাকে প্রভু বলিলে আমি আজ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না, ভিত্তুর! তুমি বল, আমি তোমার উপর আমার স্বাস্থ্য, সম্পত্তি, মান, দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কি না! আমাকে দেখিবার তুমি ব্যতীত আর কেহ নাই, তোমাতেই আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছি। বল তুমি, আমার বিশ্বাস অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয় নাই।"

ভিত্তুর আমার বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে কখন আমাকে এরূপ ভাবে কথা বলিতে শুনে নাই, বিস্ময় দমন করিয়া সহানুভূতিসূচক স্বরে বলিল, "কেন প্রভু, আজ কেন এ কথা বলিতেছেন? আমার কোন কার্য্যে সন্দেহ করিবার কিছু পাইয়াছেন কি?"

উত্তর করিলাম "তোমার কার্য্যে কখন সন্দেহ করিতে পারি নাই বলিয়াই বলিতেছি, আমি জানি—তুমি আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য—ভৃত্য নয় বন্ধু, তাই বলিতেছি, আমার সঙ্কট সময় উপস্থিত,—তোমাকে আমায় সাহায্য করিতে হইবে।"

ভিত্তুর বলিল "প্রভু, এ দাস মগ,—এক সময়ে সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিয়াছে, মনিবের আদেশের মূল্য কি এ ভাল মতে জানে। জানি না প্রভুর কি সঙ্কট,—জানিয়া আবশ্যক নাই,—কেবল জানি, প্রাণ দিয়াও প্রভুর আদেশ পালন করিব। মগ কখন সহজে কাহার নিকট কৃতজ্ঞ হয় না, কিন্তু একবার কৃতজ্ঞতা অনুভব করিলে আজীবন তাহা ভুলে না। হুজুর, আপনি আমাকে শুধু অন্ন দেন নাই—উপযুক্ত মর্য্যাদা সম্মান দিয়াছেন, আমি কৃতজ্ঞ।"

বাক্যে তাহার উক্তির উত্তর দিতে পারিলাম না। বস্তুতঃই তখন আমার হৃদয় আবেগময়; আমি জানি, সে আমাকে যথার্থই ভালবাসে, আমার জন্য নিজকে বিপন্ন করিতে পারে। আর আমার স্ত্রী? সংসারে সকলের অপেক্ষা যে আদরের বস্তু, সে কিনা আমার মৃত্যুতে সুখী! সভ্যতায় কি হৃদয়বৃত্তি হ্রাস করে। তুলনায় ভৃত্যকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহাকে সেই ভাবেই সমাদর করিলাম। সে আমার আদরের অবমাননা করে নাই; প্রভুর দান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পর তাহাকে যাহা যাহা আদেশ করিয়াছি, অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে।

এ আহবে মগ ভিত্তুর আমার দক্ষিণ হস্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

দেশের কথা

"স্বরাজ" দুঃখপ্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে সেকালের জমিদারের যেরূপ মতিগতি ছিল বর্ত্তমানে তাহার বিকার ঘটিয়াছে। প্রজার সঙ্গে জমিদারের যে সম্বন্ধ ছিল তাহাও অধুনা তিরোহিত।

সেকালে জমিদার ও প্রজার পিতাপুত্র সম্বন্ধ ছিল। জমিদার সর্ব্বদা নানারূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন—প্রজারা তাঁহার সহায় হইত। আবার জমিদারও প্রজারক্ষার জন্য সর্ব্বস্বপণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে জমিদারেরাই প্রজারক্ষার উপায় বিধান করিতেন।

সেকালে জমিদার বহু লোককে পোষণ করিতেন। তাই এক সময়ে জমিদার-বাটীতে কাজ করিয়া এখনও বহু ধোপা, নাপিত, বেহারা ইত্যাদির পুত্রপৌত্রাদিরা 'চাকরান' উপভোগ করিতেছে। বংশের কোন্ লোক কোন্ দিন জমিদার-সরকারে চাকুরী করিয়া গিয়াছে, এখনও সেই উপলক্ষে তাহার বংশীয়েরা নিষ্কর সম্পত্তি উপভোগ করিতেছে।

সে কালের জমিদারেরা মিশুক ছিলেন। তাঁহারা আজকালের জমিদারদিগের মত লাট বেলাটের করমর্দ্দন করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না। সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া অনেক দীনদুঃখীর বাটীতেও পদার্পণ

করিতেন। প্রজাদের অভাব অভিযোগ স্বকর্ণে শুনিতেন এবং প্রতিকারের যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেন। আর্ত্তের কষ্টমোচনের জন্য তাঁহাদের প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইত। পল্লীবাসী অন্যান্যের মত তাঁহারাও হলধর নাপিত, বিপিন হালদারকেও 'দাদা' 'কাকা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। স্থাবার জমিদার-তনয়েরাও ঐ সম্বন্ধ মানিয়া চলিত। এইরূপ সম্বোধন হইতে বাটীর চাকর চাকরাণীও বঞ্চিত হইত না। এইরূপ ব্যবহারে অনেকে পরিবারভুক্ত হইয়া সারা জীবন কাটাইয়া গিয়াছে। এই-সমস্ত ভৃত্যাদির মৃত্যুর পর জমিদারেরাই তাহাদের শ্রাদ্ধাদির বিধি ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহাদের পোষ্যাদি প্রতিপালনের উপায় বিধান করিয়া দিতেন।

সম্প্রতি অধিকাংশ জমিদারই উপাধি-বাতিকে উন্মত্ত। এই বাতিকের নিবৃত্তির জন্য ইঁহারা বহু অর্থ জলের মত খরচ করিয়া থাকেন। শুনি, কেহ কেহ নাকি ঋণ-জালে জড়িত হইয়াও এই বাতিকের নিবৃত্তি করিতেছেন। একবার নামের অন্তে উপাধি সংযুক্ত হইলে এই বাতিকের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। রায় বাহাদুর, রাজা এবং মহারাজা উপাধির জন্য আকুল হইয়া উঠেন। বৈতরণী নদী আশার নিবৃত্তি হয় না। এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য অনেক সময় বিপন্ন প্রজার উপরও চাঁদার অঙ্ক বসিয়া থাকে। জানিনা, জমিদারকুলের এই উপাধি লাভে প্রজার কি ইষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

বরিশাল মিউনিসিপালিটির ওভারসিয়ার প্রসন্নকুমার বসু সেবাব্রতে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। "রংপুর-দর্পণে" এই বীরের পুণ্যকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে।

বাল্যকাল হইতে প্রসন্নকুমার বলিষ্ঠ, তেজস্বী, উৎসাহ-উদ্যমপূর্ণ খেলোয়াড়, সৎকার্য্যে অনুরাগী, পরহিতৈষী এবং বিপন্নের বান্ধব বলিয়া বরিশাল সহরে সুপরিচিত। তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা অতি সাধারণ ছিল। কিন্তু দৈহিক বলে, মনের সাহসে, প্রসন্নকুমার একজন বীর বলিয়া আখ্যা পাইয়া আসিয়াছেন। প্রচুর আহার্য্য সহজে হজম করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। মনের তেজোবীর্য্য এতদূর ছিল যে, কোন-প্রকার বাধাবিঘ্ন তাঁর উদ্দেশ্যপথে প্রতিবন্ধক হইতে পারিত না। বঙ্গে ফ্লোটিলা কোম্পানীর সহিত ঠাকুর কোম্পানীর ষ্টীমারের পরবর্ত্তী সময়ে স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী যখন ষ্টিমার চালাইতে আরম্ভ করেন তখন, ১৩১২০ বৎসরের নব্যযুবক এই প্রসন্নকুমারই তাঁহার উদ্যোক্তা এবং বিশ্বস্ত ও অদম্য উৎসাহী ও কর্ম্মী ছিলেন। ২০ বৎসরের অধিক কাল প্রসন্নকুমার বরিশাল মিউনিসিপালিটীর অধীনে ওভারসিয়ারের কার্য্য করিয়া সহরবাসীর বিপদে আপদে, সংক্রামক ব্যাধির ভয়ঙ্কর দিনে, সকলকে বিপন্মুক্ত করিয়াছেন। কলেরার সেবকদল বরিশালে অনেক। কিন্তু ভীষণ সংক্রামক বসন্ত রোগীর তত্ত্বাবধান, নিজ হস্তে বাড়ীঘর পরিষ্কার করা, রোগীর ব্যবহৃত বিছানা বালিশ দগ্ধ করা, বসন্তের মৃতদেহ সৎকার করা প্রভৃতি কার্য্যে প্রসন্নকুমার তুলনা-রহিত নির্ভীক বীর। মনের বল তাঁর এত অধিক ছিল যে, কোন দিন বসন্ত পীড়াপীড়িসত্ত্বেও ইংরেজী টীকা পর্য্যন্ত নেন নাই। ৬।৭ বৎসর হইতে এখানে বসন্তের প্রকোপ দেখা যাইতেছে। ১৩২০ সনে এই রোগের প্রকোপে সহর যখন প্রায় জনশূন্য, শ্মশানে বান্ধব নাই, তখন প্রসন্নকুমার প্রধান বান্ধব। তাঁহার সাহস দেখিয়া সহরবাসী অবাক্ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। এ বৎসর সহরে ৮।১০টি লোকের বসন্ত হইয়া ৬।৭ জন লোক মারা গিয়াছে। প্রায় ২০ দিন হইল প্রসন্ন বাবু একটি বসন্ত রোগীর দেহ স্কন্ধে বহন ও দাহন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বসন্তে আক্রান্ত হন। তখনও অদম্য সাহস, নিশ্চিন্ত প্রাণ। ১২ দিন ভুগিয়া বীর প্রসন্নকুমার তেজোপূর্ণ প্রাণমন লইয়া দেহলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।

আমাদের নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে "মোহাম্মদী" দুই চারিটি স্পষ্ট কথা শুনাইয়াছেন। নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ছোট লোকে মদ খায়, তাহাদিগকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখি, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আমরা নারাজ, কারণ তাহারা নীতিহীন মদ্যপায়ী। পক্ষান্তরে, আমরা এমন অনেক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করি, বন্ধুত্বস্থাপন করি, যাহাদিগকে আমরা নিয়মিত মদ্যপায়ী বলিয়া অবগত আছি। তাহাদের টাকা বা বিলাতী সভ্যতার মোহে আমাদের মন এমনই মুগ্ধ যে, তাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা দূরের কথা, তাহাদের একটা "হাড্ডু"-সম্বলিত হাতঝটকা পাইলে আমরা আপ্যায়িত হইয়া যাই। অন্যদিকে দেখুন, পাড়ায় একটা চোর ধরা পড়িলে, পথিক লোকেরাও তাহার পিঠে দু'ঘা লাগাইয়া দেয়। কিন্তু এই যে সভ্য শিক্ষিত ভদ্র আমরা, চুরি ছাড়া আমাদের কয়টা কাজ আছে বলুন দেখি। বাঙ্গালীর চাতুর্ব্বর্গলাভের একমাত্র কল্পতরু যে আপিস আদালত, যেখানে উপরি পাওনা, বার খরচ, আমলা খরচ ইত্যাদি নাম দিয়া অপহরণের যে অবাধ স্রোত বহিতেছে, কয়জন তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে? এই যে বড় বড় হোমরা-চোমরা ভদ্রলোক মাত্র দুইটি তাম্র মুদ্রার খাতিরে ট্রাম কণ্ডাক্টারের হাত টেপাটিপি করিতেছে—ইহা কি চুরি নহে? তবে পার্থক্য এইটুকু যে, ছোট লোকেরা চুরি করে অভাবে পড়িয়া, সিঁদকাটি লইয়া; আর আমরা চুরি করি স্বভাবের দোষে লৌহচক্ষু লেখনী ধরিয়া। মফস্বলে গিয়া দেখ, একজন নিরক্ষর চাষাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইতে তোমাকে গলদঘর্ম্ম হইতে হইবে, কিন্তু ভদ্রলোক মিথ্যা সাক্ষীর দাম—১০ টাকায় এককুড়ি। লাভের মধ্যে হইয়াছে সরলতার অভাব ও আড়ম্বরের প্রাদুর্ভাব, সভ্যতা ও ভদ্রতার পাশ্চাত্য খোলষ গুরুগম্ভীর সমাসবিন্যাস। ব্যক্তি ও জাতিগণের কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় যেমন ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়াই পাওয়া যায়, সেইরূপ ঐ-সব ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়াই তাহার নীতিহীনতার ক্রম নির্দ্ধারণ করা যায়। হাজার হাজার লোকের উৎসাহ ও হাততালির মধ্যে চরিত্রের যে হঠাৎ উন্মেষ, তাহা বানের জল আর মাতালের বলের মত ক্ষণস্থায়ী, পরন্তু পরমুহূর্ত্তেই অবসাদ-প্রতিক্রিয়াজনক। পক্ষান্তরে, জনসাধারণের ঘৃণা ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের মধ্যে যে পাপের অনুষ্ঠান, তাহার প্রতিক্রিয়ায় অতিবড় পাষণ্ডের মনেও অনুতাপের ভাব জাগিয়া উঠে, এ রোগ দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। কিন্তু পাপের ক্রমাগত স্রোত যখন মানবের ভাবপ্রবণতার উপর হইতে ঘৃণার ভাবগুলিকে ধুইয়া ফেলে, যখন যুগপৎভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের মন হইতে লজ্জা ও অনুতাপের ভাব দূর হইয়া যায়, অর্থাৎ পাপ আর কোথাও দূষণীয় ও ঘৃণার্হ বলিয়া বিবেচিত হয় না, তখনই রোগ একেবারে মারাত্মক ও অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

মাসিক কাগজের সঙ্গে যাঁহাদের সংশ্রব আছে। তাঁহারা জানেন এদেশে কবিতা রচনার ইচ্ছা কিরূপ সংক্রামক। প্রত্যহই আপিসে ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতার আবির্ভাব হয় কিন্তু সেগুলি ছাপিবার উপযুক্ত নয়। অনেক কবি-যশঃপ্রার্থী ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের জন্য নিম্নে একটি আনন্দ-সংবাদ উদ্ধৃত করিলাম—

পুরস্কার—আমরা মনে করিয়াছি; যে যুবক দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অথচ রাজভক্তিমূলক কবিতা লিখিতে পারিবেন আমরা তাঁহাকে 'কবিবিনোদ' বলিয়া সম্বোধন করিব। কবিতা আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে আমাদের কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য।—কাশীপুর নিবাসী।

মাকড়সার জালের উপকারিতা সম্বন্ধে "নীহার" লিখিয়াছেন যে উহা হাঁপানি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। জনৈক আমেরিকান ডাক্তার নাকি ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। বাগান আস্তাবল প্রভৃতিতে যে মাকড়সার জাল পাওয়া যায় তাহাই বিশুদ্ধ। উহা এগু জরেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাঁপানী রোগে ৫ হইতে ১৫ গ্রেন বা ২০ গ্রেন পর্য্যন্ত গুলি পাকাইয়া শয়নকালে সেবনীয়। এগু জ্বরে দিবসে ২ বার সেবন করিতে হয়।

এত সহজপ্রাপ্য ঔষধটির এই উপকারিতার বিষয় সাধারণের একবার পরীক্ষা করিয়া তাহার ফলাফল প্রকাশ করা উচিত।

কষ্টিপাথর

স্ত্রী-শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

এক জীবনে বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার চারিযুগ দেখিলাম। প্রথম বয়সে বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার অমানিশা বা অন্ধকার যুগ দেখিয়াছিলাম। তখন মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা একটা ভয়ানক নিন্দার কথা ছিল। এমন কি মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়, এ-প্রকার সংস্কারও অনেকের ছিল।

ক্রমে দেখিলাম, ভদ্রপরিবারের ২।১টি মেয়ে অতি গোপনে স্বামী বা পরিবারস্থ কোন আত্মীয় বালকের নিকটে কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই শুভ উদ্যম কোন-প্রকারে প্রকাশ হইলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা থাকিত না। এইটি স্ত্রী-শিক্ষার অরুণ যুগ।

ক্রমে পূর্ব্ব-গগনপ্রান্ত আরক্তিম হইয়া উঠিল। বেথুন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিদেশী ও স্বদেশী মহাত্মাগণ স্ত্রীশিক্ষার অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। মহানগরী হইতে ক্রমে স্ত্রী-শিক্ষার জয়পতাকা লইয়া যজ্ঞাশ্ব চারিদিকে ছুটিল। অনেক যুদ্ধ বাধিল, অনেক বাধা পড়িল; কিন্তু সত্যের জয় হইতে লাগিল। নিতান্ত রক্ষণশীল সমাজের ভিতরেও স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, ক্রমে এমন সময় আসিল, যখন, পূর্ব্বে যে-পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষায় বৈধব্যের আশঙ্কা ছিল, সেখানেও বিবাহের সময় কন্যার শিক্ষা-বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। তৎকালীন সাহিত্য-জগতে, যিনি লিখিবার কোন বিষয় খুঁজিয়া পাইতেন না, তিনিও এই বিষয়ে কিছু-না-কিছু লিখিতেন। দেশীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে দেশীয়খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজ বিশেষভাবে অগ্রগামী হইয়াছিলেন।

ক্রমে এমন সময় আসিল, যখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতাবিষয়ে আর লেখা বা বক্তৃতার প্রয়োজন থাকিল না। অনেক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইতে লাগিলেন। এইটি মধ্যাহ্ন যুগের আরম্ভ। পাঠশালা হইতে মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়, উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় ও কলেজ পর্য্যন্ত স্থাপিত হইল। শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী ও লেডী ডাক্তার পর্য্যন্ত হইতে লাগিলেন।

এই সময় স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থক-সভা, বক্তৃতা ও প্রবন্ধের প্রবাহ মন্দগতি হইয়া আসিল বটে, কিন্তু আর একটা আন্দোলনের পথ খুলিয়া গেল। শিক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইল। পুরুষোপযোগিনী শিক্ষা নারীদিগের পক্ষে উপযোগিনী কি না এই লইয়া মত-ভেদ উপস্থিত হইল। যে শিক্ষা-প্রভাবে নারীর নারীত্ব সংরক্ষিত ও একাধারে কন্যার কর্ত্তব্য, ভগ্নীর কর্ত্তব্য, স্ত্রীর কর্ত্তব্য ও সর্ব্বোপরি মাতৃকর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়া গৃহে গৃহে প্রেমরূপিণী সেবাদেবীর দিব্যমূর্ত্তি স্থাপিত হইতে পারে, সংক্ষেপতঃ এইরূপ মহান্ ও উদার ভিত্তির উপর স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, কিন্তু সে আদর্শ অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। কিন্তু মধ্যাহ্নের পরেই অস্তের আয়োজন আরম্ভ হয়, বর্ত্তমান বিষয়েও সেরূপ কোনি আশঙ্কা আছে কি না, সেটা আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

নারীজাতির উচ্চশিক্ষার আমি সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ বৈদেশিক। বিদেশী কোন বিষয় গ্রহণ করিতে হইলে, তাহা দেশীয় অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া না লইতে পারিলে ঘোর অনিষ্টের আশঙ্কা। নারী-প্রকৃতি প্রেমপ্রধান। পারিবারিক বন্ধনের জন্য স্ত্রী-প্রকৃতি বিধাতার একটি বিশেষ সৃষ্টি। কন্যা, ভগ্নী, স্ত্রী ও মাতা নারীজীবনের এই চারিটি অবস্থা। যে দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা প্রচলিত, সে দেশের পক্ষে এই চারিটি অবস্থা আরও বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা থাকা উচিত কি না, সেটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তবে এ কথা ঠিক যে, নারীজাতির বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ দেশের নারীধর্ম্ম বড়ই মিশ্রভাবাপন্ন (Complex)। পিতৃকুল, শ্বশুরকুল উভয়কুলের কুকুর-বিড়ালটির প্রতি পর্য্যন্ত যথাযথরূপে কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্য কেবল নীতিমূলক হইলে চলিবে না, প্রেমমূলক হওয়া চাই। নীতিমূলক কর্ত্তব্যপালন নীরস ও কর্কশ, প্রেমমূলক কর্ত্তব্যপালনে রস আছে, মিষ্টতা আছে, সুতরাং কর্ত্তব্যের মূলে স্নেহ, ভক্তি ভালবাসা না থাকিলে সংসারে সুখ থাকে না, আরাম থাকে না।

অধিকাংশ স্থলে উচ্চশিক্ষা দিতে হইলে বালিকাকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ছাত্রী নিবাসে রাখিতে হয়। ছাত্রীনিবাসের স্নেহশূন্য কর্কশ বিধির ভিতরে থাকিয়া স্বতঃই বালিকা হৃদয়শূন্য একটি কলের পুত্তলিকা হইয়া পড়ে। নারীজাতি স্বভাবতঃ প্রেমপ্রবণ হইলেও উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে নারীজাতিসুলভ কোমলতা পুষ্ট হইতে পারে না। এই প্রকারে নারীত্ব-বিনাশকেও নারীহত্যা বলা যায়। হিন্দুমতে নারীহত্যা মহাপাপ।

নারীজাতিই পরিবারের ধর্ম্মরক্ষার প্রধান সহায়। অধুনাতন নিরীশ্বর বিদ্যালয়ের সংযুক্ত নিরীশ্বর ছাত্রীনিবাসে নিরীশ্বর-শিক্ষা ও সংসর্গের প্রভাবে ভাবী গৃহিণীগণ ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইবেন, ইহা অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের মতে আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতির সমন্বয়-সাধন শিক্ষার ও মানবজীবনের উচ্চতম লক্ষ্য। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি ছাড়িয়া দিলে বাকী থাকে শারীরিক উন্নতি। বর্ত্তমান জড়বাদের মতে শরীরের স্বাস্থ্য ও শক্তি পার্থিব সকল-প্রকার উন্নতির মূল। দুর্ব্বল পিতামাতার সন্তানগণ বংশাবলীক্রমে পরিবারের ও সমাজের দারিদ্র্য ও অশান্তি বৃদ্ধি করে। এইজন্য অনেক দেশে চিররুগ্নের বিবাহ নিষেধ।

বালকদিগের শারীরিক উন্নতির পথ কথঞ্চিৎ পরিষ্কার আছে। তাহারা স্বাধীন ভাবে মুক্ত বায়ুতে বেড়াইতে পারে, নানাপ্রকার ক্রীড়াদিতে মন ও দেহের উন্নতির অবসর পায়। বালিকাদিগের সে সুযোগ কোথায়? পল্লীগ্রামের পথে বা নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে যে-সকল গৃহকার্য্য-তৎপরা কৃষক-বালিকা ও যুবতী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের সুস্থ সবল দেহ ও সরল স্বাভাবিক হাসিমাখা মুখ কি বিদুষীদিগের মধ্যে সহসা দৃষ্টিগোচর হয়? বিদ্যালয়ের ও নিজ নিজ সুখ্যাতি-লোলুপ শিক্ষকদিগের শাসনাধীনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিলোলুপ মহিলাগণ নারীজাতির অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্য সকল শিক্ষা অগ্রাহ্য

করিয়া মনের ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলিকে পদদলিত করিয়া ও শারীরিক উন্নতি সাধনের সুযোগে বঞ্চিত হইয়া আশৈশব অসূর্য্যম্পশ্য গৃহকোণে রুদ্ধ বায়ুতে বসিয়া কেবলই আত্মনাশের ও বংশনাশের যে আয়োজন করিতেছেন, সে বিষয় আমাদের সকলেরই একবার ভাবিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই-সকল মহিলা প্রায় সমাজের উর্দ্ধ শ্রেণীর। ইহাঁদেরই বংশাবলী সমাজের ও দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন। বংশাবলীক্রমে যাঁহারা বলবীর্য্যে স্বাস্থ্যাদিতে পরম্পরাক্রমে হীন হইতে হীনতর অবস্থার দিকে সবেগে ধাবিতা, সেই জীর্ণাশীর্ণা চিররুগ্না জননীর ক্রোড়ে হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ু বালক-বালিকা আশা করিতে হইলে, সমস্ত শরীর-বিজ্ঞানকে ভস্মীভূত করিতে হয়। জীবনের হ্রস্বতা, দেহের খর্ব্বতা, ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা এবং স্বাস্থ্যের হীনতা যে দ্রুতবেগে আমাদিগকে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাঁহারা দেশের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, সেই-সকল মহাত্মারা ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ শীঘ্র একটা মধ্যবর্ত্তী পথ আবিষ্কার না করিলে শীঘ্রই দেশের সর্ব্বনাশ হইবে।

শ্রীবিপিনমোহন সেহানবীশ (রায় সাহেব)।

(রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা)

* *
*

মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত।

মানভূম জেলার অধিকাংশ অধিবাসী অনার্য্য কোলবংশীয়।

কোলবংশীয় অনার্য্যগণ নৃত্য-গীতে বিশেষ অনুরক্ত। নৃত্য-গীত তাহাদের উৎসবের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার সময়ও তাহাদের গানের বিরাম নাই।

কোল-রমণীগণ যে-সকল গানে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে, অনেক সময়ে সেই-সকল গানের কোন বিশেষ অর্থ থাকে না।

কোলগণের সঙ্গীতের সাহচর্য্য করিবার জন্য অনেক সময়ে কোন বাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

নৃত্যের সহিত যে-সকল গান গীত হয়, প্রায় সেই-সকল গানের সহিত মাদোল ও বংশীর ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। এদেশী ভাষার ছাঁচে ঢালা বাঙ্গালা গানের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১)

নাগর[১] যাছন[২] গো
ভাত হাতে[৩] টাঞিয়া[৪] ঝলকায়ে[৫]
বাইরালেন[৬] কুঁকড়ি ডাকে[৭]
সোঝো গ্যালেন্ কুলিবাটে[৮]
চুটিয়া[৯] ফুঁকিয়া[১০]।
ভাত খাবার বেলা হ'ল
এখনো নাগর না আইল
(কোন বাটে) কেঁদ[১১] খাছন্ মহুল বনে।

(২)

জামপাটা[১২] চিরি চিরি নৌকা বনাব[১৩]
নৌকায় নহর[১৪] চলি যাব
বাপ ঘরে তেল পালে তড়কা ঝলমল্ করে।
আমপাতে তড়কা মাঝলে
তড়কা[১৫] ঝলমল করে।

(৩)

তেঁতুল পাতে ধান মেলেছি গো
পায়রা রাজা ঘুরি ফিরি খায়।
ভাল রে পায়রা তোরে দেখিব রে
তোরি পাখায় সিপাহী সাজাব।

(৪)

ডেহিরির[১] উপর ডেহিরি দাদা
ডেহিরি কত দূর রে,
লোয়াগড় চাঁদড়া[২]
দেশ কত দূর রে।

(৫)

কোন্ ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব
কোন্ ফুলের সঙ্গে যাব রে সজনি?
যুঁহি ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব
গুলাব ফুলের সঙ্গে যাব রে সজনি।

(৬)

(প্রশ্ন) কোন্ সঁয়[৩] বাইরায় খড়ি পিঁপড়ি[৪]
কোন্ সঁয় বাইরায় ধেনু গাই।
কোন্ সঁয় বাইরায় শাঁগুকা বিটিয়া[৫]
দুয়ো খোড়ে[৬] আল্তা লাগায়ে?

কষ্টিপাথর ৩

(উত্তর) টিলা[৭] সঁয় বাইরায় খড়ি পিঁপড়ি
বাথান[৮] সঁয় বাইরায় ধেনু গাই।

---

(১) নাগর—রসিক পুরুষ।
(২) যাছন—গিয়াছেন।
(৩) ভাত হাতে—ভাত খাইবার হাতে, অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তে।
(৪) টাঞিয়া—টাঙ্গি, এতদ্দেশীয় এক-প্রকার অস্ত্র।
(৫) ঝলকায়ে—নাড়িতে নাড়িতে।
(৬) বাইরালেন—বাহিরে গিয়াছেন।
(৭) কুঁকড়ি ডাকে—কুক্কুট ডাকিবার সময়, অতি প্রত্যূষে।
(৮) কুলিবাটে—গ্রাম্য রাস্তার দিকে।
(৯) চুটিয়া—চুট্টি, এক প্রকার বিড়ি বা চুরুট।
(১০) ফুঁকিয়া—টানিতে টানিতে।
(১১) কেঁদ—এতদ্দেশীয় এক-প্রকার বন্য ফল।
(১২) জামপাটা—জাম গাছের পাটা বা তক্তা।
(১৩) বনাব—তৈয়ার করিব।
(১৪) নহর—বাপের বাড়ী।
(১৫) তড়কা—কানের ফুল।
(১) ডেহিরি—চৌকাঠ।
(২) গ্রামের নাম।
(৩) কোন্ সঁয়—কোন্ স্থান হইতে।
(৪) খড়ি পিঁপড়ি—শ্বেত বর্ণের পিপীলিকা, উই।
(৫) শাঁগুকা বিটিয়া—শ্বাশুড়ীর কন্যা, স্ত্রী।
(৬) দুয়ো খোড়ে—দুই পায়ে।
(৭) টিলা—উই-ঢিবি।
(৮) বাথান—গোঠ।

ঘর সায় বাইরায় শাঙ্কা বিটিয়া
ডুয়ো খোড়ে আরতা লাগায়ে।

(৭)

(প্রশ্ন) কেতি১ জানল২ বরদা৩ চৈত বৈশাক্
কৈসে৪ জানল আষাঢ় মাস।
কৈসে জানল বরদা আশিন ভাদর্
কৈসে জানল বরদা কাতিক মাস্॥

(উত্তর) ধুলায় জানল বরদা চৈত বৈশাক্
কাদায় জানল আষাঢ় মাস।
আসে জানল বরদা আশিন ভাদর
শিঞারে৫ জানল বরদা কাতিক মাস॥

(৮)

কোন্ ঠাঞে৬ ফোটে হরদিরে৭ ঝিঙ্গা ফুল,
ঝাঁটি গাঁধায়৮ ফোটে হরদিরে ঝিঙ্গা ফুল।
কোন্ ঠাঞে ফোটে লাল সালুকের ফুল,
মালদহে ফোটে লাল সালুকের ফুল।

(৯)

ও বাছা ফুচুর৯
তুই নাকি পুরবাসে১০ যাবি?
পুরবাসে গেলে বাছা
মাড়১১ কুথা পাবি?

(১০)

বাপ্ গুয়ে আনেছে বর
সই, দোষ দিব কি পরকে?
কিবা শিবের রূপের ছটা
গায়ে ভসম্ মাথায় জটা
ঢাকের মত মোটা সোটা
যম লেগেছে বল্‌কে।

(১১)

কোনহ ডালে কুইলিনী১ কুড়ুরছে২
শ্যামবঁধু, কোন ডালে তার বাসা?
আগহি৩ ডালে কুইলিনী কুড়ুরছে
শ্যাম বঁধু, মাঝ্ ডালে তার বাসা।

ছাঁওকে৪ পাড়ব মাটিকে মারব
বাঁসাটি বানে ভাসাব।
বহুত যতনে সাগর বাঁধব।
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল
অভাগীর কপালের দোষে।

এতদ্দেশীয় লোকগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্বদেশাগত বৈষ্ণবগণ এতদ্দেশে বিস্তর বৈষ্ণব পদ আমদানি করিয়াছেন।

গগনে উদিছে ভানু ছল করে বলে কানু
শোন সখি, শোন্।
আমরা গোয়ালা জাতি দেবী ভগবতী
(ও তাই গেল আজ রাতি)
রাখাল সনে বিদ্যমান কপিলাকে দিব দান
শোন্ সখি, শোন্। ইত্যাদি।

এই-প্রকার গান গাহিবার ও শুনিবার জন্য কোলজাতীয় পুরুষ ও রমণীগণের উদ্যম ও আগ্রহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা)

শ্রীহরিনাথ ঘোষ।

* * *

1 Percent এর প্রতিশব্দ

One Percent, Two percent প্রভৃতি কথার বাঙ্গালা কি? কেহ কেহ বাঙ্গালা অক্ষরে "ওয়ান্ পারসেণ্ট", "টু পারসেণ্ট" লিখিয়া গোলমাল এড়াইয়াছেন; কেহ বা খাঁটী বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া "শতকরা এক ভাগ দ্রব, শতকরা দুই ভাগ দ্রব" ইত্যাদি লিখিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে "One percent, Two percent" প্রভৃতির একটি সুন্দর প্রতিশব্দ আছে। কথাটি জমী ক্রয়ে ও কমিশনের হিসাব করিতে ব্যবহৃত হয়। এক শত টাকা মূল্যে ক্রীত জমীর বার্ষিক আয় ৫ টাকা হইলে ঐ ক্রয়কে "পাঁচোত্তরা" ক্রয় বলে। এইরূপে "চারোত্তরা, আটোত্তরা, সাড়ে সাতোত্তরা" প্রভৃতি কথারও ব্যবহার আছে। যদি কোন জমীর আয় চারি টাকা হয় ও মূল্য ৯০ টাকা হয়, তবে তাহা প্রায় "সাড়ে-চারোত্তরা" হইল। "এই জমী কি দরে কেনা হইয়াছে", এই প্রশ্নের উত্তরে "পাঁচোত্তরা কিনিয়াছি" কিংবা "ছয়োত্তরা কিনিয়াছি", এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হয়; প্রশ্নকর্ত্তা, উত্তরদাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতা কাহারও বুঝিবার বাকী থাকে না।

কমিশন করিবার সময়ও ঐরূপ। বড় বড় মামলা-মোকদ্দমা বা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মধ্যবর্ত্তী সম্পাদক (উকীল) যে কমিশন দাবী করিয়া থাকেন, তাহা তায়দাদের উপর "আধোত্তরা, একোত্তরা" বা ততোধিক হিসাবে করা হইয়া থাকে অর্থাৎ মোকদ্দমা বা বেচা-কেনার Valueর (তায়দাদ) উপর একটা শতকরা নির্দ্দিষ্ট হারে পাইয়া থাকেন।

"উত্তর" শব্দের গ্রাম্য ব্যবহারে "উত্তরা" শব্দের উৎপত্তি। "একোত্তর, দুয়োত্তর" লিখিলে যেমন সুশ্রাব্য হয়, তেমনই ব্যাকরণ-শুদ্ধও হয়। এই শব্দটি সাহিত্যিকেরা গ্রহণ করিলে ভাষার একটি অভাব দূর হইবে।

নিম্নে প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল ;—

½ percent Commission—আধোত্তর (বা কথোপকথনে আধোত্তরা) কমিশন।

1 Percent solution—একোত্তর দ্রব।

3 Percent solution of Carbolic acid—কার্ব্বলিক এসিডের তিনোত্তর দ্রব।

4 Percent alcoholic solution—চারোত্তর এলকোহলের চারোত্তর দ্রব।

---

(১) কেতি—কিরূপে।
(২) জানল—জানিতে পারিল।
(৩) বরদা—গাভী।
(৪) কৈসে—কিসের দ্বারা।
(৫) শিঞারে—সাজ-সজ্জায়। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় এ-দেশে গরুর গা চিত্রিত করিতে হয়।
(৬) ঠাঞে—স্থানে।
(৭) হরদিরে—হরিদ্রা রঙ্গের।
(৮) ঝাঁটি গাঁধায়—বন্য কাষ্ঠে নির্ম্মিত মাচার উপর।
(৯) ফুচু—লোকের নাম।
(১০) পুরবাস—প্রবাস।
(১১) মাড়—ভাতের ফেন।
(১) কুইলিনী—কোকিলবধূ।
(২) কুড়ুরছে—গান করিতেছে।
(৩) আগহি—উপরের।

(৪) ছাঁওকে—ছানাকে।

6 Percent watery solution—ছয়োওর বা ষড়োওর, জলীয় দ্রব।

"Percent" এই শব্দের পরিবর্ত্তে ইংরেজীতে যে সাঙ্কেতিক চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়, বাঙ্গালাতে অবিকল তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা) শ্রীতারকনাথ দেব।

* *
*

জনসাধারণের শিক্ষা

মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে-সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি দ্বারা আপনার সর্ব্ববিধ অভাব দূর করাকেই শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। আপনার ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানে বুঝিতে পারা আমাদের জীবনের একটি গুরুতর দায়িত্ব। বর্ত্তমানকে বুঝিয়া ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিবার চেষ্টাই উন্নতিশীলের লক্ষণ। শিক্ষার সুব্যবস্থাতেই ব্যক্তিত্বের ক্রমশঃ সুবিকাশ হয়, ব্যক্তিত্বের সুবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা পূর্ণতালাভ করে, শিক্ষার ব্যবস্থা সুন্দর হইলেই অর্থ-নীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতির স্ফুরণে জাতিগত স্ফূর্ত্তিলাভ ও জাতিগত উন্নতি সাধিত হয়।

জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান অভাব আহার ও বাসস্থানের। খাওয়া পরা কি করিয়া চলে, এ শিক্ষা পাওয়ার আগে তারা কোন শিক্ষাই চায় না।

উচ্চশিক্ষা দ্বারা উন্নত চিত্তের মানুষ গঠন করা যায়। বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষা দান নিতান্তই অর্থ সাপেক্ষ। যে পর্য্যন্ত দারিদ্র্য-নিষ্পেষণে মানুষের অর্থচিন্তা ও হতাশা উভয়ই প্রবল থাকে, ততদিনে তাঁহার উচ্চ-শিক্ষার ফল উন্নত চিন্তাও সাধারণতঃ কার্য্যকরী হয় না। দরিদ্রের উন্নত চিন্তায় জগতের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই চিন্তা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার সুবিধা এখনও তেমন হয় নাই। শিক্ষার ব্যবস্থা যদি প্রাচীন ভারতবর্ষের মত বিনা অর্থব্যয়ে হইত, তাহা হইলে বরং ধনী দরিদ্রকে একত্র টানিয়া শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইত।

দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সময় দারিদ্র্য-চিন্তা দূর করিবার শিক্ষা দেশের জনসাধারণের পক্ষে যেমন উপযোগী, আর কোন শিক্ষাই তেমন উপযোগী নহে। নিম্নশিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে শিল্প শিক্ষাই এখন দেশের জনসাধারণের মুখ্য শিক্ষা হওয়া উচিত। শিল্পশিক্ষাকে নিম্নশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার অন্তর্গত করিলে শুধু শিক্ষিতের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে তাহা নহে, কৃষি-শিল্পের প্রতি আমাদের উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধাও কমিয়া যাইবে। অল্পব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রশিল্প ও হস্তশিল্পের প্রচারই সাধারণতঃ কার্য্যকরী হইবে। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মধ্যে অনেক স্থানে অনেক অবস্থায় অর্থকরী শিল্প শিক্ষার প্রয়োজন, উহারও ব্যবস্থা করা নিতান্ত সঙ্গত।

দরিদ্রের বিনা ব্যয়ে বা স্বল্প ব্যয়ে নিম্নশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার দ্বার ধনীদরিদ্রের জন্য সর্ব্বদাই অবারিত থাকা উচিত। দেশের উন্নতি ধনীর হাতেও নহে, দরিদ্রের হাতেও নহে; দেশের উন্নতি কর্ম্মীর হাতে।

জনসাধারণের শিক্ষার ফলে দেশের দারিদ্র্য ঘুচে। দরিদ্রের শিক্ষা দরিদ্রের মতনই হউক, কিন্তু শিক্ষার ফল যেন দরিদ্র না হয়। দেশের দরিদ্রের অবস্থা উন্নত হইয়াই ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। দরিদ্রের উন্নতিই শুধু উন্নতি নহে, সমাজ-জীবনের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিতে ধনীর আর্থিক, নৈতিক ও পারিবারিক উন্নতি আরও বেশী প্রয়োজন। ধনীর সঞ্চিত অর্থ, ও দরিদ্রের পরিশ্রমই সুশিক্ষাবলে জাতীয় উন্নতির মূলধন-রূপে গণ্য হইতে পারে। শিক্ষাকে ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত ও জাতিগত মনে করিতে পারিলে ধনী ও দরিদ্রের পক্ষে যথার্থ শিক্ষা কি, তাহার মীমাংসা কতকটা সহজ হইয়া পড়ে। ব্যক্তি ও পরিবারের চিন্তাধারা ক্রমশঃ যাহাতে উন্নত হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি ও পরিবারের বিকাশের সঙ্গে ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি ও সমাজরক্ষিণী নীতি যাহাতে উচ্চস্তরের উদ্দেশ্য বলিয়া উচ্চশিক্ষাভি-লাষীরা বুঝিতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষার কথা প্রচার করা যেমন প্রয়োজন, ব্যক্তি ও পরিবারের বিকাশের সুশিক্ষাও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তেমন প্রয়োজন। আমরা শিক্ষার ফলে দরিদ্রের চাই আহার, বাস-স্থান ও বিশ্রাম; ধনীর চাই অর্থরক্ষা করিবার ও বিলাসিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি; আর চাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নতমনা ধনী ও দরিদ্রের জাতীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির চিন্তাধারা ও জাতীয় দারিদ্র্যের প্রশমনকল্পে সঞ্চিত মূলধন।

(গৃহস্থ, বৈশাখ) শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা-শব্দকোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বিজ্ঞানভূষণের সঙ্কলিত বাঙ্গালা-শব্দকোষের চতুর্থ বা শেষ খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে অনেকদিন। এই খণ্ডে য হইতে হ পর্য্যন্ত আছে। পরিশিষ্টে নূতন শব্দযোজনা, ভ্রমসংশোধন ও দীর্ঘ মুখবন্ধ থাকিবে।

এই পরম উপাদেয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য- ও গবেষণাপূর্ণ অনন্যসম্ভব গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের একটি দিককে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল। কিন্তু বড়ই লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় যে এমন একখানি চমৎকার বই সাধারণের যথোচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না। ইহার আলোচনায় পণ্ডিত কেহ এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন না। আমার সামান্য জ্ঞান ও স্বল্প শক্তি লইয়া আমি ইহার পূর্ব্ব খণ্ডগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম; কোষ-কর্ত্তার অল্প কিছুও কাজে লাগিবে মনে করিয়া তাঁহার নিকট ভরসা পাইয়াই বর্ত্তমান খণ্ডেরও বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। নিম্নের শব্দগুলি কোষে হয় ছাড় পড়িয়াছে নয় অসম্পূর্ণ আছে।

যজমানি—যাজন কর্ম্ম; যথা পুরোহিত যজমানি করে, সে যজমানি করিয়া খায়।

যন্ত্রপাতি—যন্ত্রপাত্র না যন্ত্রপংক্তি হইতে?

সখের যাত্রা—যে যাত্রার দল পেশাদার নহে; যে দল গান বা অভিনয় করিয়া বেতন বা মজুরী লয় না। কোষে প্রদত্ত সংজ্ঞা সাধারণ যাত্রা মাত্রেরই বর্ণনা মাত্র। সখের যাত্রা বা পেশাদার যাত্রা উভয়েতেই ছোকরা জুড়ী ইত্যাদি থাকে।

যাই—যেহেতু।

যৈছন—মৈথিলী ভাষায় যৈছন ঐছন প্রচলিত আছে; তাহা হইতেই বাংলায় আসিয়া থাকিবে।

যোগ-সাজুস—সংস্কৃত ও ফার্সী একার্থবাচক যুগ্মশব্দ। ফার্সী সাজিশ মানে যোগ।

যোগান দেওয়া—আবশ্যকমত সময়ে সরবরাহ করা, যথা গোয়ালা বাড়ী বাড়ী দুধ যোগান দ্যায়।

যুড়ি, জুড়ি—যুগ্ম; যোগ করি।

যুটি—খেলার সঙ্গী; একত্র হই।

যাচনদার—যে যাচাই করিয়া দেখে।

যোয়ানে—যোয়ানের (যমানির) ন্যায় (গন্ধবিশিষ্ট)। যথা, যোয়ানে আম।

যেখান—যেস্থান।

যেথানে-সেথানে—যত্র তত্র; সর্ব্বত্র।

যোঙ্গড়া—একপ্রকার দুই-মুখুটি-ওয়ালা শামুক।

যোট—সমবায়।

যোটপাট—সহচর শব্দ।

যোড়েতাড়ে—কোনো রকমে, জো-সো করিয়া।
রং-মশাল—যে মশাল হইতে বিবিধ বর্ণের আলোক নির্গত হয়।
রদো—রদের বাজারে যাহা পাওয়া যায়—প্রায়ই অপকৃষ্ট বস্তু।
রঁদ—ইং round নয়, ফরাসী ronde (উচ্চারণ রঁদ) হইতে।
রব-রবা, রবাব—প্রতাপ; আরবী 'রব'—প্রভু শব্দজ।
রসা—তরকারীর ঝোল; মাছ মাংসের ঝোল হয় বলিয়া গোঁড়া বৈষ্ণবেরা ঝোল শব্দ উচ্চারণ করে না, রসা বলে।
রসান—অলঙ্কারে বা তৈজস পাত্রে দীপ্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া। তাহা হইতে 'কথায় রসান দেওয়া' চলিয়াছে; পরের কথার টীকা করিয়া তাহার সৌষ্ঠব সম্পাদন। যথা, থাম, তোমার আর কথায় রসান দিতে হবে না।
রহিত—স্থগিত।
রাখাল-শসা—আলকুশীর ফলকে বলে।
রাজ-মিস্ত্রী—ফার্সী 'রাজ' শব্দের মানে মিস্ত্রী।
রাতাবী—আরবী রাতিব মানে রুটি, রুটির ন্যায় চ্যাপ্টা সন্দেশ (?)।
রি-রি—গা-টা রি-রি করে উঠল অর্থাৎ গাত্র কণ্টকিত হইল।
রিটার্ণ—ফেরত; যথা, রিটার্ণ টিকিট।
রস'—ধাতু। থাক, অপেক্ষা কর। রয়ুন—মাগ্যে।
রেলা—স্রোত অর্থেও ব্যবহার হয়; যথা, ভোজ-কাজে ভাতের রেলা হয়।
রোক, রোখ—আগ্রহ; যথা, এই কাজে ওর রোখ চেগেছে। দৃষ্টির সরল-রেখায় অবস্থান, বিশেষ ভাবে শতরঞ্চ খেলায় এক বলের চালের মুখে অপর পক্ষের কোনো বল পড়া। ফাঃ—রুখ, কপোল, পার্শ্বদেশ।
রাঙাটে—লোহিতাভ।
রোয়া—কোষ, কমলা লেবুর এক এক রোয়া। খড়ো চালের কাঠামো বাঁধিবার সরু সরু বাখারি।
রোসো—ধাতু, অপেক্ষা কর।
রক্তারক্তি—অতিশয় রক্তপাত; পরস্পরকে আঘাত করিয়া পরস্পরের রক্তপাত।
রাগারাগি—ঝগড়া, পরস্পরে পরস্পরের উপর রাগ প্রকাশ।
রাঙ্গী—টিনের চালুনি।
রাত্রিচরা—যে রাত্রে বিচরণ করে, দুশ্চরিত্র; বাদুড়।
রীজ—রিষ, রোষ।
রোশনদান—skylight—ঘরে আলো আসিবার জন্য ছাদে জানলা।
রেজকারি—রেজগী।
রুজি—রোজের খাদ্য; উপজীবিকা। ফার্সী।
রূপচাঁদ—টাকা (অশিষ্ট); রূপার চাঁদের আকৃতি। পক্ষীর দল প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তির নাম।
রান—ফার্সী; উরু; খাদ্য পশুর উরুর মাংস।
রানা—পুকুরঘাটের সিঁড়ির দুই পাশের ঘাণ বাঁধা পাইড় যেন মানুষের দুই উরুর ন্যায় এই সাদৃশ্যে।
র‍্যাজলা, র‍্যাজবেগে—সাধারণ রকমের, সামান্য, তুচ্ছ, অপকৃষ্ট (সামগ্রী)। আরবী রজিল—হীন, নীচ।
রইকাঠ—পুকুর-জলের গভীরতা মাপিবার জন্য মধ্যস্থলে প্রোথিত খুঁটি।
রপটানি—টো-টো করিয়া বেড়ানো।
রসি—রস-বিকার, যেমন—ভাতা রসি। মদ্য। আরবী রসন—দড়ি।
রাঙা মুখ—য়ুরোপীয়ান।
রাঙা মূলো—সুদর্শন বালক কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি গুণে কিছু না; রাঙা মূলার মতন দেখিতে সুন্দর, স্বাদে ঝাল ও বিকট দুর্গন্ধ।

রটন্তী—মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি; সেই রাত্রের কালীপূজা।
রামখড়ি—কাঠ খড়ি; যে খড়ি দিয়া ছেলেদের হাতেখড়ি হয়।
রেউড়ী—মিষ্টান্ন বিশেষ।
রেপতা—আরবী, mortar চুন-সুরকির মসলা। রেপতার গাঁথুনি—মজবুত গাঁথুনি।
রেজা—যে রাজ-মিস্ত্রীর কাজে যোগাড় দেয় (যোগাড়ে) ও সাহায্য করে।
রেট—কোমরের গোট—প্রায়ই রূপার। Rate. মূল্যের হার।
রোকশোধ—নগদ ঋণ শোধ করা। আরবী রুখসৎ—ছুটি।
রোগাটে—রোগার ভাব; ঈষৎ রোগা।
রামকান্ত—ফার্সী রাম, পোষমানা, আজ্ঞাপালনকারী। অনুগত স্বামী।
রোকা—আরবী, চিঠি; যথা, বাবাজী রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবা।
রক, রোআক—আঃ রিওাক, বারান্দা।
রগন—ফাঃ রৌঘন, তেল, বার্ণিশ।
রইস—আঃ, প্রধান বা মাতব্বর লোক, ধনী।
লগবগে—দীর্ঘ বংশযষ্টির ন্যায় যাহা এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া পড়ে।
লণ্ডাভণ্ড—ভীষণ মারামারি, পরস্পর পরস্পরকে উল্লঙ্ঘন করা। লগে দেওয়া—হত্যা করা।
লড়ালড়ি—পরস্পরে লড়াই।
লেপটা—ধাতু, যথা শেষে দেখি মাথার রতন লেপটে রইলেন আঠার মতন (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।
লম্বাইচৌড়াই—অহঙ্কৃত অতিশয়োক্তি ও দম্ভ।
টাকা লাগানো—টাকা ধার দিয়া সুদে খাটানো।
লাচার—নাচার।
লাফড়িঙা—যে লাফাইয়া ডিঙাইয়া চলে; দুরন্ত।
লালচ—লালস; লোভ। লালচিয়া—লোভী।
লালুয়া, লেলো—যাহার মুখ দিয়া লালা পড়ে।
লেজুড়—দীর্ঘ লেজ।
লাকলাইন—কড়া পাকানো দড়ি।
লেমনেড—নেবু-গন্ধী বাষ্পপূর্ণ সরবৎ।
লাড্ডু—লাড়ু। দিল্লীর লাড্ডু—নামে চমৎকার, কাজে অপকৃষ্ট।
লোহাটে—লোহার ন্যায় স্বাদ বা গন্ধবিশিষ্ট।
লোপাট—লোপ করা; চুরি করা।
লপটালপাটি—পরস্পরে জড়াজড়ি।
লকলকি—ময়দা গুলিয়া তাওয়ায় সেঁকিয়া যে রুটি হয়।
লকড়ি—জ্বালানি কাঠ।
লাপশি—আটা গুড়ের হালুয়া।
লু—গরম বাতাস।
লাগসই—যথোপযুক্ত।
লাহাস—কাছি, মোটা দড়ি। জাহাজের মুসলমান খালাসিরা বলে। কিন্তু মূল কি?
লাগি, লাগিয়া—জন্য; পদ্যে ব্যবহৃত হয়।
লিখিয়ে—লেখক।
লং প্রাইমার—ছাপাখানার বিশেষ এক আকারের হরপ। Long Premier type.
লেত্তি—লেট্টু ঘুরাইবার কানি; লাট্টু ঘুরাইবার দড়ি।
লেপ—আঃ লিহাফ, গায়ের তোষক।
লস—আঃ লহস, চাটা, খাওয়া; তাহা হইতে লোভনীয় বস্তু।
লিড়বিড়ে, লিড়বিড়ে—দীর্ঘসূত্রী, মন্থরকর্ম্মী।
লঙ্কা থেকে হলুদের গুঁড়া আনা—লঙ্কায় সোনা প্রচুর, তাহা না আনিয়া

সোনা ভ্রমে তুচ্ছ হলুদ-গুঁড়া বহিয়া আনা; to carry coal to Newcastle.
লেংচা—দীর্ঘ পান্তুয়া, মিষ্টান্ন বিশেষ।
লোটন পায়রা—যে পায়রা ডিগবাজি খাইয়া লুণ্ঠিত হয়।
শতেক-খোয়ারী—যে নারীর শতেক খোয়ার বা দুর্দ্দশা লাঞ্ছনা ভোগ হইয়াছে বা হইবে। গালি।
শামানো—ধাতু, প্রবেশ করা, ঢোকা, সেঁধনো।
শিমুল ফুল—লক্ষণায়, যে যা যাহা শিমুল ফুলের ন্যায় দেখিতে সুন্দর কিন্তু নির্গন্ধ বলিয়া নিগুণ।
শিরা—চিনির রসকে শিরা বলে, সজ্জিত রস বা ভিনিগার শির্কা।
শুট—ধাতু, দীর্ঘ কোমল বস্তু হইতে বিন্দু বিন্দু ক্ষরণ। চুল থেকে শুঁটিয়ে জল পড়ছে।
শোষ—নালি ঘা। অন্তিম শ্বাসকষ্ট।
শ্রবণা লাগা—শ্রবণা নক্ষত্র পড়িলে আট দিন খড়ের ঘর ছাইতে নাই, ছাইলে আগুন লাগে প্রবাদ। ঘর ছাওয়া আরম্ভ করিয়া শ্রবণা নক্ষত্র আসিলে ছাওয়া বন্ধ রাখিতে হয়। তাহা হইতে আরব্ধ কর্ম্মে বিলম্ব ঘটা; কর্ম্মে বাধা বিঘ্ন লাগা।
শটর-বটর—দম্ভ; আস্ফালন; ধূর্ত্তামি, ষড়যন্ত্র। আগ্রহ।
শড়শড়ি—[illegible] চচ্চড়ি ব্যঞ্জন।
শকরী-আম, আম শকরী—পেয়ারা ফল।
শহর-কোতোআল—নগরের প্রধান রক্ষী। শহর-কোতোআলি—শহর-কোতোআলের কাজ বা তাঁহার থানা।
শহরতলি—নগরোপকণ্ঠ।
শিকলকর—পালিশ করে যে। (?)
শিকপা—ঘোড়ার পিছন-পায়ে খাড়া হইয়া ওঠা।
শিক্ষানবিশ—নূতন কর্ম্ম শিক্ষায় নিযুক্ত।
শিখা—টিকি।
শিরশির—ঈষৎ শীত বোধ। শিরশিরে—ঈষৎ শীতল।
শুঁড়ি—শুঁড়ের ন্যায় দীর্ঘ সরু (গলি পথ)।
শুনানি—শ্রবণকার্য্য। যথা, মোকদ্দমার শুনানি।
শেওড়া—কোষে সেওড়া শব্দে শাওড়া শব্দ দেখিবার বরাত আছে, কিন্তু কোষে শাওড়া খুঁজিয়া পাইলাম না।
শোর-সরাবৎ—গোলমাল। ফার্সী।
শটকা—ধাতু: পলায়ন।
শার্ট—Shirt, কামিজ।
শামলা—পাগড়ী।
শুঁটকী, শুঁটকো—শুকটী, শুকটো শব্দের বর্ণবিপর্য্যয়ে।
শুঁদি, শুঁদি—মালার মধ্যেই শুকাইয়া যে নারিকেলের শাস গোলার ন্যায় মালা হইতে পৃথক হইয়া যায়।
শামাট—মালদহে ওখল (উদুখল)-মধ্যে শস্য পিষিবার দণ্ডকে শামাট বলে।
শিঙা হাতড়ানো—মরণের জন্য প্রস্তুত, মরণোন্মুখ।
শিঙেল—শৃঙ্গী, শৃঙ্গবিশিষ্ট। যথা—মাতাল দাঁতাল শিঙেল তিনই সমান ফিচেল।
শিঁটকা—ধাতু; ভয়ে সঙ্কুচিত হওয়া।
শূনো—শূন্য। যথা—ভরা চেয়ে শূনো ভালো যদি ভরতে যায় (খনা); দুষ্ট গরু চেয়ে শূনো গোয়াল ভালো।
শুভদৃষ্টি—বর-কন্যার প্রথম দৃষ্টিবিনিময়।
শেল্‌ফ্—Shelf।
শাকমূর্ত্তি—পাণ্ডুবর্ণ, পাঞ্চাণ।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

ওড়িষ্যার বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য লিখিতেছেন, তাহা পড়িয়া উপকৃত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহে, ওড়িষ্যার জঙ্গলের বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্যটির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। প্রবন্ধটি প্রায় আগাগোড়াই ভুল বিবরণে পরিপূর্ণ। মহিমাধর্ম্মের একালের নেতা ভীমভোই সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহার একটি অক্ষর সত্য নয়; কেবল ভীমভোই যে অন্ধ ছিলেন, সেই কথাটি সত্য। জন্মান্ধ ভীমভোই সম্বলপুর এলাকার রেড়াখোল রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ধেনকানলে গিয়া মহিমাগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া সম্বলপুরের নিকটস্থ সোণপুর Feudatory রাজ্যে বাস করেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সোণপুর রাজ্যের খলিয়াপালী গ্রামে ছিলেন, এবং ঐ গ্রামেই তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার সমাধি-মন্দির গড়িয়াছেন। ধেনকানলের জুরন্দাগ্রামে বাস করিবার জন্য তিনি কোন গুরুর আদেশ পান নাই এবং জুরন্দাগ্রামে কখনও গুরুপাঠ স্থাপন করেন নাই। তাঁহার নামে, কূপে পড়া প্রভৃতি যে-সকল অলৌকিক কথা লিখিত হইয়াছে তাহা তিনি কখনও তাঁহার শিষ্যদিগকে বলেন নাই, এবং আমি নিজে কখনও তাঁহার মুখে কিম্বা তাঁহার শিষ্যদের মুখে ঐ গল্প শুনি নাই। ভীমভোই-প্রচারিত মহিমাধর্ম্ম যে দিগম্বর জৈনদের মতের ভিত্তিতে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার অনেক নিদর্শন আছে স্বীকার করি। কিন্তু যে শূন্যবাদ বা ব্রহ্মনিরূপণ ভীমভোইএর প্রচারিত গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহার অর্থ একটুখানি নিগূঢ়। বাহিরের লোকে উহার কোন অর্থ বুঝিতে পারে না; কেবল দীক্ষিতেরাই উহার মর্ম্ম জানিতে পারেন। যে উপায়ে আমি ঐ ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, তাহা এদেশে শ্রীযুক্ত ও'মালী সাহেবকে এবং লণ্ডনের Royal Asiatic Societyর সভায় জ্ঞাপন করিয়াছি। কোনও প্রকাশ্য পত্রে ঐ তত্ত্বকথাগুলি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইতে পারে না বলিয়া Royal Asiatic Societyর পত্রিকায় উহা মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু ঘরাও ভাবে সকল কথাই মুদ্রিত করা হইয়াছে; এবং শ্রীযুক্ত কেনেডি সাহেব ও আর কয়েকজন সদস্য উহা লইয়া প্রাসঙ্গিক ভাবে অনেক কথা আলোচনা করিতেছেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আমি প্রথম ভীমভোইএর সহিত পরিচিত হই এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সকল বিবরণই প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। উহার মৃত্যু হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে; সে হইল ২০ বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা। শাস্ত্রীমহাশয়ের সংবাদদাতা এ বিষয়েও ভুল সংবাদ দিয়াছেন। ধেনকানল অঞ্চলের মহিমাধর্ম্মের লোকেরা ভীমভোইকে গুরু বলিয়া স্বীকার করে না। যে কারণে এইটি ঘটিয়াছিল, তাহাও আমার বিবরণীতে মুদ্রিত আছে।

বৌধ রাজ্যটির নাম যে বৌদ্ধধর্ম্মের নামে হইয়াছে একথা সাহস করিয়া বলা চলে না। অন্যস্থান অপেক্ষা যে বৌধে বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন বেশী আছে একথাও ঠিক নয়। এখন যে রাজ্যকে খেমুরি বলে, এবং ইংরেজিতে যাহার নাম Kimidi বলিয়া লিখিত হয়, সেখানকার রাজারা প্রাচীনকালে বৌধ রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন; এবং সে সময়ে খেমরির নাম ছিল খিঞ্জিনী মণ্ডল। এই সময়ে নূতন নগরের অর্থে, দ্রাবিড় ভাষার শব্দে 'বোডো' বা 'বোধ' নাম হইয়াছিল কিনা, তাহা এখনও বিশেষ বিচারাধীন আছে। চট করিয়া শব্দসাদৃশ্যে কিছু স্থির করা সহজ নয়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পুস্তক-পরিচয়

শান্তিনিকেতন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ বা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ড নূতন প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য মাত্র চার আনা।

চতুর্দ্দশ খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়ের ব্যাখ্যান আছে—(১) সুন্দর; (২) বর্ষশেষ; (৩) নববর্ষ; (৪) বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা; (৫) সত্যবোধ; (৬) হওয়া; (৭) সত্যকে দেখা; (৮) শুচি; (৯) বিশেষত্ব ও বিশ্ব। মোট ১৭১ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ খণ্ডে আছে—(১) পিতার বোধ, (২) সৃষ্টির অধিকার; (৩) ছোট ও বড়। মোট ৯৪ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ খণ্ডে আছে—(১) সৌন্দর্য্যের সকরুণতা, (২) অমৃতের পুত্র; (৩) যাত্রীর উৎসব; (৪) মাধুর্য্যের পরিচয়, (৫) একটি মন্ত্র। মোট ৮০ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ খণ্ডে আছে—(১) উদ্বোধন; (২) মুক্তির দীক্ষা; (৩) প্রতীক্ষা; (৪) অগ্রসর হওয়ার আহ্বান; (৫) মা মা হিংসীঃ; (৬) পাপের মার্জ্জনা; (৭) সৃষ্টির ক্রিয়া; (৮) দীক্ষার দিন, (৯) আরো; (১০) আবির্ভাব; (১১) অন্তরতর শান্তি। মোট ৯৮ পৃষ্ঠা।

য়ুরোপে টমাস এ কেম্পিসের ইমিটেশন-অফ ক্রাইষ্ট যেমন ঈশ্বর-ভক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই সুখে দুঃখে, শোকে আনন্দে, সম্পদে বিপদে জীবনের চিরসহচর; তাহার মধ্যেই তাঁহারা মনের বিভিন্ন অবস্থার সাড়া পাইয়া আশ্বাস সান্ত্বনা নির্ভর পাইয়া থাকেন, ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পান; আমাদের বাঙালী-জীবনে শান্তিনিকেতন তেমনি শান্তির নিকেতন হইতে পারিয়াছে। ইহারা পূজার মন্ত্র, হৃদয়ের ভাষা অক্ষম আমাদিগকে জোগাইয়া দ্যায়। ইহাদের মধ্য দিয়া আমরা ব্রহ্মের ও ব্রহ্মাণ্ডের সহিত আমাদের বিবিধ সম্পর্কের রসমাধুর্য্য অনুভব করি; সুন্দরকে ধারণা করিয়া, সত্যকে উপলব্ধি করিয়া নিজেদের জীবনকেও সুন্দর ও সত্য করিয়া তুলিতে পারি। শান্তিনিকেতন বইগুলির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কেবল মাত্র শুষ্ক উপদেশ পুঞ্জিত হইয়া নাই; সাধক ঋষির নিজ জীবনের উপলব্ধ তত্ত্ব জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী কবির জীবন্ত ও জ্বলন্ত ভাষায় প্রকাশ পাওয়াতে উক্তিগুলি একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক সাধনের সহায় হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইয়া রসিক ও ভাবুক জনের চিত্তমোহন হইয়াছে। এই বইগুলি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভক্ত ও ভাবুকের সহচর বন্ধু হইবার উপযুক্ত। উক্তিগুলি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, উদার ভিত্তিতে স্থাপিত বলিয়া সকল ধর্ম্মের লোকেই ইহার মধ্যে আপনার প্রাণের কথা, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা ও আত্মার কল্যাণের ও মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইবেন।

ধর্ম্মপাল—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য আট আনা।

মাত্র আট আনা দামে এত বড় বই এমন সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া প্রকাশ করার উদ্যমের জন্য প্রকাশকেরা বঙ্গীয় পাঠক-সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য।

এই উপন্যাস প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার গুণাগুণ প্রবাসী-পাঠকের অবিদিত নাই।

মুদ্রারাক্ষস।

নূর-জহান্—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ৮+৮৬ পৃষ্ঠা, ৫ খানি চিত্র সহিত। মূল্য বারো আনা। (মিত্র, কোম্পানী, কলিকাতা)।

এই সুলিখিত ও বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক জীবনীখানি অতি সুন্দর ছাপা ও বাঁধা হইয়াছে। এতদিনে বাঙ্গলা ভাষায় নূরজহানের বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ও সমালোচনাপূর্ণ বিবরণ বাহির হইল; ইহা বঙ্গভাষাভাষীদিগের গৌরবের বিষয়। গ্রন্থখানি এই শ্রেণীর রচনার আদর্শ হইবে। ব্রজেন্দ্রনাথ ইংরেজী ও ফার্সী কোন মূল গ্রন্থই ছাড়েন নাই। এখনও অনুবাদ হয় নাই এরূপ সমস্ত ফার্সী ইতিহাস হইতে নিঃশেষরূপে নূরজহানের সম্বন্ধীয় কথাগুলি আমি তাঁহাকে অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছি। এই নবীন গ্রন্থকারের প্রধান গুণ যে ইনি নির্ম্মমভাবে শ্রুতিমধুর প্রচলিত গুজবগুলি ত্যাগ করিয়া খাঁটি ঐতিহাসিক সত্যটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ সত্যপ্রিয়তার বিপদ এই যে সাধারণ পাঠক ইহাতে বিরক্ত হন। কিন্তু সুখের বিষয় নূরজহানের জীবনের ঘটনাগুলি স্বভাবতঃই এত কাব্যরসপূর্ণ ও আশ্চর্য্য যে তাহার সরল সত্যই আমাদের মন আকর্ষণ করে; কল্পনা ফলাইবার আবশ্যক হয় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বাঙ্গলা ভাষায় একজন দক্ষ লেখক; নূরজহানের মত বিষয় পাইয়া এবং সমস্ত আদি বিবরণগুলি ব্যবহার করিয়া তাঁহার "নূরজহান" অতি উপাদেয় ও সুপাঠ্য পুস্তিকা হইয়াছে। মলাটের রং ও সোনালী নাম দেখিয়া চোখ জুড়ায়, বইখানি পকেটে করিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হয়। হাফটোন ছবি পাঁচখানি অতি সুন্দর ও স্পষ্ট ছাপা হইয়াছে।

গ্রন্থকার সাধু ঐতিহাসিকের প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রতি-পৃষ্ঠায় পাদটীকা দিয়া দলিল দস্তাবেজের বলুম ও পৃষ্ঠা সহ উল্লেখ করিয়াছেন; বিভিন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের মধ্যে কেন একজনের উক্তি লইলেন, কেন অপরের উক্তি ত্যাগ করিলেন তাহার যুক্তি দিয়া বিচার করিয়াছেন। আশা করি এই গ্রন্থ প্রকাশের পর নূরজহান সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রমগুলি আমাদের সাহিত্য ও মাসিক হইতে তিরোধান করিবে। এবং এই গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-সম্মত অন্যান্য ঐতিহাসিক জীবনী রচিত হইয়া বঙ্গভাষাকে ধনী করিবে। নূরজহান সম্রাজ্ঞী হইয়া যে সৌন্দর্য্যের বশে জাহাঙ্গীরকে "ভেড়া বানাইয়া" রাখিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা ভ্রম। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চরিত্রের বলই তাঁহার আধিপত্যের কারণ। সেইজন্য বেভরিজ সাহেব Encyclopædia of Islam, Vol I.এ নূরজহানের জীবনীতে লিখিয়াছেন "আকবর নূরজহানের সহিত সেলিমের বিবাহ দিয়া গেলে বড় ভাল হইত। তাহা হইলে জাহাঙ্গীরের নেশা বন্ধ হইত, রাজ্য সুশাসিত হইত, এবং বাদশাহ সুশৃঙ্খিত ভাবে জীবন কাটাইয়া ইতিহাসে বিখ্যাত হইতে পারিতেন।" ব্রজেন্দ্রনাথ রাজনৈতিকক্ষেত্রে নূরজহানের দোষগুণ দুইই দেখাইয়াছেন—গুণ সুশাসনে প্রজারঞ্জনে, দোষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ফন্দিবাজীতে।

কয়েক এমসংশোধন আবশ্যক। ১ পৃঃ "গিয়াস্" না হইয়া "ঘিয়াস্" হইবে। ১৬ পৃঃ ১০৫৫ হিঃ না হইয়া ১০১৫ হইবে। ৩১ পৃঃ ফার্সী শ্লোকটির অনুবাদ ঠিক হয় নাই। ৪৫ পৃঃ টীকা, "বেদৌলৎ" অর্থ রাজদ্রোহী নহে, "সাম্রাজ্যহীন" অর্থাৎ ভাগ্যহীন। ৫৮ পৃঃ টীকা, বুর্হানপুর (বাহাঁনপুর নহে)। ৮৫ পৃঃ "তবকতে" স্থলে তবকাৎ-ই হইবে।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব—শ্রীঅভয়শঙ্কর গুহ এম্-এ, বি-এল প্রণীত। ময়মনসিংহ পোঃ আঃ আঠারবাড়ী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা। (৵+২৪+২৬৩ পৃঃ)।

যেমন বাহিরের সুন্দর পরিচ্ছদ তেমনি ভাষার বিশুদ্ধি ও প্রাঞ্জলতা,

যেমন বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্যশাস্ত্রবিদ্‌গণের বিচিত্র মতের সমাবেশ তেমনি গ্রন্থকারের সুবিন্যস্ত চিন্তাশৃঙ্খলা আলোচ্য পুস্তকখানিকে অতি উপাদেয় ও মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে। লেখক বিভিন্নজাতির মনীষীদের অভিমত পুস্তকের পত্রে পত্রে উদ্ধৃত করিয়া সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান-বিষয়ে বহুবিস্তৃত অধ্যয়নের পরিচয় দিয়াছেন, অথচ এ-সকল দুরূহ ও জটিল মতবাদকে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। বাঙ্গলাসাহিত্যে এই অভিনব চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ও উৎসাহযোগ্য।

প্রাচীনভারতে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল কি না, ভারতীয় আর্য্যগণ তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে প্রাকৃতিক ও মানবীয় সৌন্দর্য্যের তথ্য নিরূপণে কোন প্রতিভা দেখাইয়াছেন কি না,—ভূমিকায় এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এ বিষয়ে প্রতীচ্য পণ্ডিতদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তধারণা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মূল পুস্তকের প্রথম অংশে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব-বিষয়ে গ্রীক, জার্ম্মান, ফরাসি, ইতালীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজ দার্শনিকদের মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে সৌন্দর্য্যস্পৃহার স্বাভাবিকত্ব, প্রকৃতি ও ললিত কলার প্রভেদ, সৌন্দর্য্যের শ্রেণীবিভাগ, সৌন্দর্য্যবোধের ইন্দ্রিয়, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ, সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নির্ণয়ের সূত্র ইত্যাদি বিষয়ের সারগর্ভ আলোচনা পাওয়া যায়। শেষ অংশে সৌন্দর্য্যের স্বরূপবিশ্লেষণ দ্বারা দার্শনিক পণ্ডিতদের যুক্তি বিচার হইতে সাধু মহাজনগণের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের শ্রেষ্ঠতা ও ভগবদ্ভক্তিতেই সৌন্দর্য্যবোধের পরিণতি ও সার্থকতা প্রমাণ করা হইয়াছে। বস্তুর রসাত্মকতা ও বস্তুর অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশই সৌন্দর্য্যের প্রাণ এবং ভগবানের প্রেম ও আনন্দই সৌন্দর্য্যের উৎস—ইহাই লেখকের মূল সিদ্ধান্ত। পরিশিষ্টে কতিপয় বিখ্যাত পণ্ডিতের সৌন্দর্য্যবিষয়ক মতের সারাংশ (ক) ও ললিত কলার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রবীণ লেখকের মত (খ) সন্নিবেশিত হইয়াছে। উপসংহারে সৌন্দর্য্যশাস্ত্র-বিষয়ে জিজ্ঞাসু পাঠকদের সাহায্যের জন্য একটি গ্রন্থবিবরণী দিয়া পুস্তকখানির উপযোগিতা বাড়ান হইয়াছে।

গ্রন্থকারের মূলসিদ্ধান্তটি সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয় হইলেও ইহার পারিপার্শ্বিক অনেক বিষয়ে আমাদের আপত্তি করার কারণ আছে।

১। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের মতে ভারতীয় ঋষিগণ কোন কোন স্থলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও শিল্পকলার বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু সৌন্দর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই বা সৌন্দর্য্যবোধ-বিষয়ে তাঁহাদের তথ্যসমূহ সূত্রাকারে কোথাও প্রকাশিত করেন নাই। প্রফেসর নাইটও অস্পষ্টভাবায় এই কথাটাই প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতে অতি প্রাচীনকালেই অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মত-সকল যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ আকারে ও যুক্তিপূর্ণভাবে আলোচিত হইয়াছিল, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সেরূপ কোন গবেষণা হয় নাই।

এই মত নিরাকরণের জন্য গ্রন্থকার ভূমিকায় রাশি রাশি বৈদিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ভারতের ও জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের সৌন্দর্য্য বর্ণনা ও কাব্য সঙ্গীত স্থাপত্য ও অন্যান্য কলার উপাদান-বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়, সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় আর্য্যগণই সর্ব্বপ্রথমে সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তটি যে-যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই যুক্তিতে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে অমুকদেশের লোক কথা বলিতে জানে সুতরাং বাগ্মিতাশাস্ত্র সেদেশে নিশ্চয়ই বিকাশ পাইয়াছে; অমুক প্রাচীনজাতির মধ্যে হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং ব্যাকরণ-শাস্ত্রে তাহারা নিশ্চয়ই ব্যুৎপন্ন; অমুক সমাজে 'চুরি করিও না' 'মিথ্যা কথা বলিও না' 'অতিথি-সৎকার করিও' প্রভৃতি নৈতিক উপদেশ প্রচলিত, সুতরাং ঐ সমাজে নীতি-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ; অথবা অমুক কবি তাঁহার রচনায় রূপক ও উপমার বহুলব্যবহার করিয়াছেন সুতরাং অলঙ্কার-শাস্ত্রে নিশ্চয়ই তিনি সুপণ্ডিত। তর্কশাস্ত্র বা ন্যায়দর্শনের সৃষ্টি হওয়ার বহু পূর্ব্বেও যখন মানুষ সঙ্গতভাবে চিন্তা করিতে পারিত ও ন্যায্যভাবে তর্কযুক্তি চালাইতে পারিত, তখন বেদের ঋষিগণ প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছেন, অনেক সুন্দর কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, এমন কি ধর্ম্মভাবের আলোকে সকল সুন্দর বস্তুর ভিতর ভগবানের রস অনুভব করিয়াছেন এ-সকল সত্য স্বীকার করিলে ভারতে সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান বা কলাশাস্ত্র বৈদিকযুগের বহু পরকালবর্ত্তী কালের গবেষণার ফল এই মতের ভ্রান্ততা কিরূপে প্রমাণিত হইল তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

২। সৌন্দর্য্য হিসাবে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ কি ললিতকলা শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের মীমাংসায় লেখক বলেন "যে দিক দিয়াই দেখা যাক শিল্পকলা প্রকৃতির নিকট দাঁড়াইতে পারে না" (১১০ পৃষ্ঠা)। আমরা এই সিদ্ধান্তের যুক্তিবত্তা দেখিতে পাই না, কারণ—(১) যেমন প্রকৃতিতে তেমনি শিল্পকলার মধ্যেও "গতি, জীবন ও ব্যক্তিত্ব" আছে—যদিও শেষোক্ত বিষয়টির অনুভূতি চিন্তাসাপেক্ষ। শিল্পকলার গঠনে জড় উপাদানের উপর শিল্পী মানবাত্মার গতি জীবন ও ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত ও মুদ্রিত হইয়া থাকে। যথার্থ সৌন্দর্য্যগ্রাহীর নিকট প্রকৃতি ও ললিতকলা উভয়ের মধ্যেই ভাববৈচিত্র্য সমানভাবে বর্ত্তমান। (৩) প্রকৃতির ন্যায় মানবশিল্পও আমাদিগকে অসীমের রহস্য অনুভব করিতে সমর্থ করে ও আত্মার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেয়। (৪) শিল্পকলা কেবল প্রকৃতির অনুকরণ নয়, শিল্পী প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিয়া, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূলসূত্রের সন্ধান পাইয়া আপনার অন্তরে প্রকাশিত আদর্শের আলোকে প্রকৃতির উপরে উঠিয়া প্রাকৃত উপকরণের সাহায্যে অতি-প্রাকৃত সৌন্দর্য্যকে মূর্ত্তি দিতে চেষ্টা করেন। (৫) লেখক নিজেই শেষ অধ্যায়ে স্বীকার করিয়াছেন যে "ললিতকলা তত্ত্বতঃ ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ।" প্রকৃতির বক্ষে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সমাবেশ যেমন বিশ্বশিল্পীর মহিমা প্রকাশ করে, মানবসমাজের কাব্য সঙ্গীত চিত্র ভাস্কর্য্য স্থাপত্যও তেমনি মানবাত্মার ভিতর দিয়া সেই বিশ্বকর্ম্মীর পরম সুন্দর রচনা প্রকটিত করে। বাস্তব পক্ষে যে মানবপ্রকৃতি হইতে ললিত-কলার উদ্ভব তাহাও ভগবানের প্রকৃতিরাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতে মানবীয় শিল্প-সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলে পরমেশ্বরের গৌরবের কিছুই হানি হয় না।

৩। হিগেলের দর্শনের উপর গ্রন্থকার অতি অন্যায় অবিচার করিয়াছেন। যে বস্তুকে হিগেল Thought নাম দিয়াছেন তাহা এত ব্যাপক যে ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনগণ যাহাকে 'বিজ্ঞান' অথবা 'ভক্তি' ও বিশ্বাস নাম দিয়াছেন তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। হিগেলের Absolute Idea বা নিরবচ্ছিন্ন মূলতত্ত্ব বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধের অতীত, সুতরাং এক অর্থে প্রকৃতির অতীত ও বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য যে মনোবুদ্ধির অগোচর ও তর্ক বিতর্ক দ্বারা কাহাকেও বুঝান যায় না—এ কথা হিগেলের মতের বিরুদ্ধ নয়।

৪। শেষ অধ্যায়ে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিনের কৃত্রিম পার্থক্য সৃজন করিয়া বলিতেছেন, ব্রহ্ম অনন্ত, সুতরাং তাঁহার উপাসনা বা তাঁহার সহিত মানুষের রসের সম্বন্ধ অসম্ভব। তিনি যখন সান্ত হইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে ("ভগবান"রূপে) ভক্তের নিকট দেখা দেন তখনই তাঁহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। এ স্থলে লেখক বৈষ্ণব মহাজনগণের ও পরমহংস রামকৃষ্ণ মহোদয়ের বচন যেরূপ ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে

আমাদের সন্দেহ হয় তিনি কৃষ্ণ রাধা কালী প্রভৃতি সাকার রূপের উপাসনা ও মূর্ত্তিপুজার পক্ষপাতী। সমগ্র গ্রন্থে আমরা যেরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতের পরিচয় পাই তাহার সহিত এই অধ্যায়ের সংকীর্ণ মতের সামঞ্জস্য হয় না। লেখকের চিরাগত সংস্কার ও দেশাচারই কি অনন্তের উপাসকদিগের প্রতি তাঁহার এরূপ তীব্র কটাক্ষপাতের কারণ? তিনি কি উপনিষদের ঋষির উচ্চারিত 'যো বৈ-ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি' এই বাক্যের সত্যতা অস্বীকার করিতে চান? অনন্ত কিরূপে সান্ত হইতে পারেন, নিরাকার পরমেশ্বর কিরূপে ভক্তবিনোদনের জন্য সাকাররূপ গ্রহণ করিতে পারেন, এই সমস্যা দূর করিবার জন্য লেখক প্রচলিত পৌত্তলিক শাস্ত্রকারগণের মত পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার আশ্রয় লইয়াছেন—যেন পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মের সম্মিলন—পাপ ও পুণ্যের, সত্য ও মিথ্যার একাধারে সংমিশ্রণ সর্ব্বশক্তিমানের কাছে আটকায় না। বস্তুতঃ অনন্ত ছাড়া অন্য কিছুই মানুষের উপাস্য হইতে পারে না। সান্তমূর্ত্তির কাছে যখন মানুষ মস্তক অবনত করে তখনও সে তাহার অসীম দিক্‌টাই দেখে। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" ভক্তের কাছে সর্ব্বত্রই অসীমের প্রকাশ।

এই-সকল মতের অমিল ছাড়া পুস্তকখানির আরও দুইএকটি ত্রুটির সংশোধন বাঞ্ছনীয়। কোন কোন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা ভক্তদের মত অনাবশ্যকভাবে বারবার উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই পুনরুক্তি অনেক সময় বিরক্তিকর বোধ হয়। সৌন্দর্য্যের স্বরূপ আলোচনায় জড়বিজ্ঞানের অনেক মূলসত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিস্তারিত স্থান লাভ করিয়াছে। যথা—জড় ও চেতনের পার্থক্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে দিন দিন চিন্তার জগৎ হইতে বিদায় লইতেছে ও প্রকৃতির সর্ব্বত্র এক প্রাণময়ী চৈতন্যশক্তির অধিষ্ঠান স্বীকৃত হইতেছে—এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্র পুস্তকে বাহির হইলে বঙ্গসাহিত্য সম্পদশালী হইত; বর্ত্তমান গ্রন্থের এই অংশে ইহার পরিবর্ত্তে সুন্দরের সহিত, সত্য ও মঙ্গলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে একটু স্পষ্ট ধারণা পাইলে পাঠকগণ লাভবান হইতেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে চাই Mooreএর Principia Ethica নামক চিন্তাপূর্ণ পুস্তকে সুন্দরকে মঙ্গলের উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়া যে-মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাইলাম না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত ও চিন্তার ধারা বঙ্গীয় পরিচ্ছদে ভাষান্তরিত করার নৈপুণ্যে লেখক স্বাভাবিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু দুই এক জায়গায় বক্তব্য সংক্ষেপে শেষ করিবার দোষে ভাবটি কষ্টবোধ্য হইয়া গিয়াছে। হিগেলের Thoughtকে 'বুদ্ধিবৃত্তি' বলিলে ও প্লেটোর Form ও Ideaকে 'আকৃতি' ও 'প্রতিকৃতি' বলিলে মূল ভাবটি পরিস্ফুট না হইয়া বরং পাঠককে বিপথগামী করিতে পারে। যাক্, এসকল অপূর্ণতাসত্ত্বেও গ্রন্থকার দার্শনিক বিষয়ে এরূপ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া বঙ্গভাষাকে ও বঙ্গীয় পাঠকসমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স. চ. রা।

শ্রীমাতৃশ্লোকশতকম্—বঙ্গানুবাদরসোদ্দীপনীটীকা-সমন্বিতম্, তত্র চ শ্রীশ্রীজগদীশস্তোত্রম্, শ্রীমোহিনীমোহন চট্টরাজেন বিরচিতম্, পৃঃ ।৴০ + ১০১, মূল্য ৸৹, ঠিকানা—রামনগর, গমুটিয়া পোঃ, বীরভূম।

কবি মাতৃভক্ত, মাতার বর্ণনার মধ্যে জগন্মাতারও বর্ণনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে ভাব ভাল আছে, কিন্তু ভাষায় তাহা মোটেই ফুটে নাই, ভাষা ভাবের অনুসরণ করিতে পারে নাই। এই অসমর্থ ভাষা বাংলাপদ্যে আরো খারাপ হইয়াছে। নি তা ন্ত কাঁ চা হাতের লেখা। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমস্ত শ্লোকই পড়িয়াছি, কিন্তু এ কটি ও ভাল পাইলাম না। অন্যান্য দোষের কথা বলিয়া কাজ নাই, ব্যাকরণ দোষ (চ্যুতসংস্কৃতি) ও ছন্দোদোষও ভূরি-ভূরি রহিয়াছে। সংস্কৃত ছন্দ-সম্বন্ধে একটা কথা উল্লেখ করা মন্দ হইবে না, কেননা নূতন লেখকেরা অনেকেই এরূপ ভুল করিয়া থাকেন। পদান্তে লঘু স্বর গুরু হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র ইহা খাটে না। সমস্ত ছন্দেই দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষ লঘু স্বর গুরু হইতে পারে, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় চরণের শেষ লঘু স্বর বসন্ততিলক ও তৎসদৃশ ছোট ছোট ছন্দেই গুরু হইয়া থাকে, বড় বড় ছন্দে হয় না। যে-কোন মহাকবির কাব্য দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। অভ্যাসের জন্য প্রথম প্রথম এরূপ কবিতা লিখিতেই হয়, কিন্তু ছাপাইতে হয় না; কেননা তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

Brahmasadhan or Endeavours after the Life Divine. By Pandit Sitanath Tattwabhushan. To be had of the author at 210-3-2 Cornwallis Street, Calcutta. Re 1-8 or 2-6.

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের "ব্রহ্মসাধন" নামক এই ইংরেজী পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি। জীবন ঈশ্বরের অনুগত হওয়া উচিত, এবং ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি অর্পণ করা উচিত, ইহা খুব সাধারণ কথা। কিন্তু কেমন করিয়া আত্মাকে কলুষ-নির্ম্মুক্ত করা ও রাখা যায়, কেমন করিয়া বাহ্য-আচরণ ধর্ম্মসঙ্গত হয়, ঈশ্বরে ভক্তি কেমন করিয়া জন্মিতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন, এমন উপদেষ্টা বা বন্ধু সহজে পাওয়া যায় না। এই পুস্তক ধর্ম্মানুগত জীবন লাভে অনেক পরিমাণে পাঠকগণের সহায় হইবে। বাংলা ভাষাতেও এইরূপ একটি বহি হইলে ভাল হয়।

সাধনের রাজ্য, উপাসনার হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান আদর্শ, আরাধনা, ধারণা, ধ্যানসমাধি, ব্রহ্মোপলব্ধি, প্রার্থনা ও প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া, শ্রেয় প্রেয়, আসক্তি বিরক্তি ভক্তি, ব্যবহারিক জীবনে ঈশ্বরপ্রেম, নারীর সহিত নানা সম্বন্ধ, মানবপ্রেম ও মানবসেবা, এবং সাধুদের সহিত আত্মার যোগ, পুস্তকখানিতে এই-সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। চিন্তা ও শ্রদ্ধার সহিত হিন্দু ও খৃষ্টীয় শাস্ত্র এবং অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং গ্রন্থকার মহাশয়ের নিজের সাধনা হইতে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

অধিকাংশ লোকেই সংসারী, সংসারত্যাগীর সংখ্যা কম। যাহারা সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে চান, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের, সুতরাং অধিকাংশ লোকের উপযোগী। সভাসমিতিতে কিরূপভাবে ব্যবহার করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য; নির্দ্দোষ আমোদের জন্য যে-সকল সান্ধ্যসমিতি আদিতে পুরুষ ও নারীর সমাগম হয়, তৎসমুদয়কে কিরূপে সাধনের সহায় করা যায়; গার্হস্থ্যজীবনকে, নারীর সহিত নানা সম্বন্ধকে কেমন করিয়া ব্রহ্মসাধনের অনুকূল করা যায়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে গ্রন্থকার অতি প্রয়োজনীয় সারবান্ কথা বলিয়াছেন। অবশ্য এবম্বিধ অনেক কথাই পুরুষের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, কারণ লেখক পুরুষ। গ্রন্থের এইসব উপদেশ পুরুষদেরই উপযোগী। কোন সাধিকা যদি এই জাতীয় পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে তিনি নারীর পক্ষ হইতে নারীর উপযোগী কথা বলিতে পারিবেন। কিন্তু মূল জিনিষটি একই, পুরুষ ও নারীতে কেবল প্রয়োগ বিভিন্ন।

র।

কর্ম্মক্ষেত্র—বাঙ্গালী হিন্দুজাতি কেন লোপ পাইতেছে? শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌-ডি, লেফ্‌টেনন্ট-কর্ণেল, আই-এম্‌-এস্ (অবসরপ্রাপ্ত)। প্রকাশক শ্রীশ্রীকালী ঘোষ। ৫৬ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক আনা।

এই পুস্তিকাটিতে পাঠকেরা সুললিত পদবিন্যাস পাইবেন না; অনেক ছাপার ভুল ও বানান ভুল দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এ-সব খুঁত ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয় এইজন্য, যে, ইহাতে একজন প্রকৃত দেশহিতৈষী সরল প্রাণে, মন খুলিয়া কে খুসী হইবে বা না হইবে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, বে-পরোয়া ভাবে, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা যে দেশবাসীদিগকে "ভদ্র" ও "ইতর" এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি, "ইতর"দের অধিকাংশকে আবার "অনাচরণীয়" বা "অস্পৃশ্য" মনে করি, আমরা যে "ইতর"দের সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখি না, তাহাদের হিতচিন্তা ও চেষ্টা করি না, তাহাদিগকে শিক্ষা দি না, অধিকন্তু ইংরেজ কেন তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছে না বলিয়া ঝাল ঝাড়ি,—এবম্বিধ নানা কারণে বাঙ্গালী হিন্দুর অবনতি ও হ্রাস হইতেছে। তিনি মোটের উপর যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা সায় দিতে পারি। যাহারা তাঁহার সহিত একমত নহেন, তাঁহারাও পুস্তিকাখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন। তাঁহার মত একজন শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তির মত খণ্ডন করারও ত প্রয়োজন হইতে পারে?

র।

ফুলদানি—শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী রচিত ও ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা। ছাপা ও কাগজ পরিষ্কার।

পুস্তকখানিতে পাঁচটি ছোটগল্প আছে, তাহার মধ্যে তিনটি ইংরেজী হইতে অনূদিত। বাকি দুইটি সম্ভবত মৌলিক। অনূদিত গল্পগুলি অতি পানসে রকমের—বিলাতি ম্যাগাজিনের গল্প সচরাচর যেমন হইয়া থাকে। অনুবাদেও কোন কৃতিত্ব নাই। অপর দুইটি গল্পের মধ্যে কোনটিই মনে কোন ছাপ রাখে না, সুতরাং ব্যর্থ। লেখিকার ভাষাও গল্পের ভাষা নহে। তাহা নিতান্ত ভারী ও মোটা রকমের।

গতি—গার্হস্থ্য চিত্র; শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও কলিকাতা ১০০ নং অপার চিৎপুর রোড-স্থিত রামময় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

নিবেদনে লেখক বলিতেছেন "পুণ্যের জয়, পাপের শোচনীয় পরিণাম প্রদর্শন করাই 'গতির' মুখ্য উদ্দেশ্য। 'গতি' পাঠে যদি একটিও উচ্ছৃঙ্খল যুবকের মতি পরিবর্ত্তিত হয়, যদি একটিও বালিকার চরিত্র-গঠনের সুবিধা হয় তাহা হইলেই শ্রম সার্থক হইবে।"

আমাদের বিশ্বাস 'গতির' ন্যায় গতানুগতিক উপন্যাস পাঠে উপরোক্ত জিনিষের কোনটিই হয় না; তাহার উপর যদি সে উপন্যাস আবার সুলিখিত না হয়। এই উপন্যাসখানির না আছে ঘটনা-সংস্থান, না আছে ভাষা-পারিপাট্য, না আছে লিপিচাতুর্য্য। পুস্তকখানি দুইবার পড়িয়াও এই মত পরিবর্ত্তন হইল না। "গতি"তে পাওয়া গেল সুদীর্ঘ সমাস ও ততোধিক সুদীর্ঘ নীতি-উপদেশপূর্ণ নীরস বক্তৃতা। পুস্তকখানি যত অসম্ভব আজগুবি ব্যাপারে পরিপূর্ণ।

অহম্।

ভুলের প্রায়শ্চিত্ত—উপন্যাস। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন প্রণীত ও ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ১৫৭ পৃঃ। মূল্য পাঁচ সিকা।

বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই ভালো। ভাষাও মন্দ নয়।

দুই বন্ধু গঙ্গার ধারে সন্ধ্যাকালে বায়ু সেবন করিতেছে, তাহারা মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে। এমন সময়ে এক ভীমকায় ব্যক্তি লগুড় হস্তে ছুটিয়া আসিল। সে যুবকদ্বয়কে মারে আর কি! সে কহিল তাহার ভগ্নী গঙ্গার ঘাটে গা ধুইবার জন্য আসে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই যুবকদ্বয় গান জুড়িয়াছে। যুবকদ্বয় ল' কলেজে পড়ে। তাহারা বলিল তাহাদের কোনো মন্দ অভিসন্ধি নাই। কিন্তু শোনে কে! ঘোরতর বচসা। এমন সময় একটি যুবকের খুড়শ্বশুর আসিয়া ঝগড়া মিটাইয়া দিলেন। যুবকদ্বয় বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়া একটি যুবক দেখিল বাড়ীতে তালাবন্ধ, সে ডাকিয়া ডাকিয়া স্ত্রীর সাড়া পাইল না। অমনি ভাবিয়া লইল পাপীয়সী কুলত্যাগিনী হইয়াছে! সে ভুলিয়াই গেল তার স্ত্রী ভবানীপুরে পিত্রালয়ে গিয়া থাকিবে। তখন দুই বন্ধু কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় স্ত্রীর সন্ধানে ছুটিল। হঠাৎ এক ভাড়াটিয়া গাড়ীর মধ্য হইতে ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া গাড়ী থামাইয়া দেখিল এক যুবতীর গাড়ীর মধ্য হইতে একটা লোক লাফাইয়া পড়িয়া পালাইল। সে আর কেহ নয়, গঙ্গার ধারের সেই লগুড়ধারী ভীমকায় পুরুষ। যুবতীর স্বামী মিথ্যা অভিযোগে দ্বীপান্তর বাস করিতেছে, ভীমকায় পুরুষ যুবতীর স্বামীর বন্ধু, সুযোগ বুঝিয়া যুবতীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। কলেজের যুবকদ্বয় তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। এদিকে খুড়শ্বশুর মহাশয় জামাইয়ের উপর সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। জামাই কহিল সে বন্ধুর হারানো স্ত্রীর অনুসন্ধান করিতে পথে বাহির হইয়া দুর্বৃত্তের হাত হইতে এক যুবতীকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু শোনে কে? অবশেষে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল—অর্থাৎ যুবকের শ্যালক হঠাৎ ভগ্নীপতিকে পাগলের মত রাস্তায় ঘুরিতে দেখিয়া ভবানীপুরে তাহাদের বাড়ীতে ধরিয়া লইয়া গেল। সেখানে আহারাদি করিয়া শুইয়াছেন এমন সময় হারানো স্ত্রীর আবির্ভাব। মাতার রোগবৃদ্ধির খবর পাইয়া তিনি বাড়ীতে তালা লাগাইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। যথাসময়ে দ্বীপান্তর হইতে অন্য যুবতীর স্বামীও ফিরিলেন। এবং সব দেখিয়া শুনিয়া খুড়-শ্বশুর মহাশয়ের সন্দেহ দূর হইল এবং তিনি তাঁর 'ভুলের প্রায়শ্চিত্ত' স্বরূপ একটি প্রীতিভোজ দিলেন—ইহাই হইল উপন্যাসের প্লট। আজগুবি প্লটটির মধ্যে কোনো নূতনত্ব বা সৌন্দর্য্য নাই—বরং মাঝে মাঝে অশ্লীলতার কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে।

সু।

ভ্রম সংশোধন

চৈত্রের "প্রবাসী"তে আমরা যে হেয়ারস্কুলে পাঠ্য ইংরেজী বহিখানিতে ইস্‌লাম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের নিন্দা আছে লিখিয়াছিলাম, তাহা হেয়ারস্কুলের বর্ত্তমান হেডমাষ্টার মহাশয় নির্ব্বাচন করেন নাই, পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাগজে এবিষয়ে আন্দোলন হইবার পূর্ব্বেই বর্ত্তমান হেড্‌মাষ্টার মহাশয়, যে অংশে মহম্মদের নিন্দা আছে, তাহা পড়াইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পুস্তকখানি হিন্দুস্কুলেরও পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বৈশাখ সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভের ১৭ পংক্তিতে "৬৪,৯৯,৩৩৬ টাকা"র পরিবর্ত্তে "৮৭,০২,০১০ টাকা" হইবে। উহার পরবর্ত্তী পংক্তিতে "চারি টাকারও কিছু কম"এর পরিবর্ত্তে "পাঁচ টাকার কিছু বেশী" হইবে। ঐ পৃষ্ঠা ঐ স্তম্ভের ২১ পংক্তিতে "ত্রিশগুণ"এর পরিবর্ত্তে "প্রায় তেইশগুণ" হইবে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩২৩

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অন্তর্জগতে আবিষ্কার।

একজন ভারতপ্রবাসী ইংরেজ সম্পাদক ধুয়া ধরিলেন যে ভারতবর্ষে অধ্যাপকদের গবেষক আবিষ্কারক হইবার দরকার নাই, কেতাবে যাহা লেখা আছে, তাহাই তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া দিতে পারিলেই হইল। ইহাতে আর একজন ইংরেজসম্পাদক এবং একজন মাদ্রাজী সম্পাদক যোগ দিলেন। আমরা মডার্ন রিভিউ কাগজে পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়-সকলের দৃষ্টান্ত এবং শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ও শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞদের উক্তির দ্বারা সহজেই দেখাইতে পারিলাম যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক যাঁহারা নিজে কিছু সত্য আবিষ্কার করেন,– তাহা বৈজ্ঞানিকই হউক, দার্শনিকই হউক, ঐতিহাসিকই হউক, বা সাহিত্যিকই হউক।

বহির্জগতে যাহা ঘটে, বৈজ্ঞানিক তাহা লইয়া গবেষণা করেন। কিন্তু তাঁহার আবিক্রিয়া বহুদূর অগ্রসর হইলে তিনি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হন। যেমন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কোন কোন আবিক্রিয়া তাঁহাকে মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানের রাজ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। ঐতিহাসিক গবেষণাও বহুকাল সম্পূর্ণরূপে বাহিরের ঘটনা লইয়া ব্যাপৃত ছিল। কিছুদিন হইতে ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন যুগে মানুষের চিন্তা ও ভাবের পরিবর্ত্তন, মনের গতি, বাহ্য অনেক ঘটনার মূলীভূত কারণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া এই অন্তর্জগতেরও আলোচনা করিতেছেন। তথাপি প্রধানতঃ ইতিহাস এখনও বাহ্য-জগতেরই ব্যাপার হইয়া আছে। দর্শন ভিতরের জিনিষ। অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে প্রাচীন হিন্দুরা বা প্রাচীন গ্রীকরা দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর আর কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তাহা ভুল। নূতন দার্শনিক তত্ত্বের আবিক্রিয়া পাশ্চাত্যদেশসকলে ত চলিতেছেই, আমাদের দেশেও চলিতেছে। সাহিত্য বাহিরের কথা বলে, অন্তরের কথাও বলে। সাহিত্যেও নূতন রসের সৃষ্টি চলিতেছে। আগেকার সাহিত্যে, মানুষের পারিবারিক বা অপর প্রধান প্রধান সম্বন্ধ, নরনারীর যৌন সম্বন্ধ; মানুষের প্রধান প্রধান, সহজে উপলভ্য, বাসন, প্রবৃত্তি, ভাব; এই-সকল লইয়া রসের সৃষ্টি হইত। এখন হৃদয় মনের অতলস্পর্শ অসীম রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কবি ও অপর সাহিত্যিকেরা কত বিচিত্র রকমের আকর্ষণ বিকর্ষণ দুঃস্পর্শ সংঘর্ষ অনুরাগ বিরাগ পাঠকবর্গের গোচর করিতেছেন। অন্তর্জলধির নাবিক ও ডুবুরী আগেও অনেকে ছিলেন কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বত্র বিচরণ করেন নাই, সকল বা সর্ব্ববিধ বস্তু সংগ্রহ করেন নাই। মানবের জীবনতরী অন্তর্জগতের যে-সব মৃদু বাতাস, ঝড়, তরঙ্গের অধীন, যে-সকল ঝড় তরঙ্গের আঘাতে সে তরী বিপন্ন ভগ্ন হয়, সে-সকলের সম্পূর্ণ বর্ণনা কেহ করেন নাই, করিতে পারেন না। কত নূতনতর মৃদুল বায়ু, ঝড়, তরঙ্গের সন্ধান কবিরা দিতেছেন।

অন্তর্জলধির ডুবুরীরা কত নূতন রত্ন সংগ্রহ করিতেছেন; আগে-অজানা হাঙ্গর কুমীরেরও সন্ধান দিতেছেন।

ব্রহ্মাণ্ড সসীম কি অসীম তাহার আলোচনা বৈজ্ঞানিকেরা মধ্যে মধ্যে করেন। ব্রহ্মাণ্ড যাহাই হউক, পৃথিবী সসীম। কিন্তু এই পৃথিবীরই ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা বা অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত একটি তৃণেরও সমুদয় তত্ত্ব এখনও নির্ণীত হয় নাই। মানুষের আত্মা সম্বন্ধে আমরা বাহিরের ভাষা প্রয়োগ করি; তথাপি বাহিরের জিনিষকে যে-অর্থে আমরা ছোট বড় সসীম অসীম গভীর অগভীর বলিয়া থাকি, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে সে অর্থে সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করা যায় না। তথাপি উপায়ান্তর নাই বলিয়া আমরা বাহিরের ভাষাতেই বলি, অন্তর্জগৎ অসীম, অতলস্পর্শ; ইহার কূলকিনারা কেহ পায় নাই। কেহ ইহার ইয়ত্তা করিতে, নিঃশেষে তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারে নাই। ইহার সৌন্দর্য্য ইহার রস, ইহার আঁধার আলো, ইহার সঙ্গীত, ইহার রঙের খেলা, ইহার তরঙ্গতুফান, ইহার নৌকাডুবি, ইহার সফল যাত্রা, কত রকমের তাহা কে বলিতে পারে? এই রাজ্যে নিত্য নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে।

কোন দেশের কোন যুগের সাধুরাই অন্তর্জগতের ধর্ম্মবিষয়ক কথা শেষ করিয়া বলিয়া যান নাই। আমাদের দেশে বুদ্ধের আগেকার ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, বুদ্ধ তাহা ছাড়া নূতন সত্য দর্শন করিয়া মানুষের কাছে প্রচার করিয়া গেলেন। তাহার পরও নানক চৈতন্য কবীর রামানন্দ তুকারাম একনাথ মীরাবাঈ দাদূ রামপ্রসাদ, প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমস্তই যে প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা নয়। তাঁহারা কেবল পুরাতন গ্রন্থে বিপণিতে মাণিক্য ক্রয় করেন নাই, নিজেরাও ডুবুরীগিরি করিয়াছেন। কেবল গ্রন্থের পাতায় ঈশ্বরের কথা পড়েন নাই, বহির্জগতে ও আত্মার নিভৃত প্রদেশে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন করিয়া তাঁহার বাণী শুনিয়াছেন।

ইহুদীদের দেশে যিশুখৃষ্ট যখন ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, তখন তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী উপদেষ্টাদের কথাই বলিলেন না; নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন শুনিয়াছিলেন স্পর্শ করিয়াছিলেন প্রধানতঃ তাহার কথাই বলিলেন। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য ও অনুচরবর্গের মধ্যেও বিস্তর সাধুপুরুষ ও সাধ্বী-শীল নারী নিজ নিজ আন্তরিক অভিজ্ঞতা হইতে ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন।

মুসলমান-জগতেও মহম্মদের তিরোভাবের 'পর সাক্ষাৎ সত্যদৃষ্টি, সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভূতি লোপ পায় নাই। বহু তাপস তাপসিনী দরবেশ কবি সুফী নিজে সাক্ষাৎভাবে যাহা জানিয়াছেন তাহা জগৎকে জানাইয়াছেন। অন্ততঃ মুসলমানদেশ পারস্যে আধুনিক কালে বাহাই ধর্ম্মের উদ্ভবে প্রমাণিত হইতেছে যে ভগবানের আত্মপ্রকাশ কেবল মাত্র পুরাকালে আবদ্ধ নহে।

খৃষ্টীয় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে একাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন মানুষ জন্মিয়াছেন যাঁহারা অধ্যাত্মরাজ্যে আবিষ্কর্ত্তা সত্যদ্রষ্টা, যাঁহারা পরের মুখে শুনিয়া পুরাতন বহিতে পড়িয়া ভগবানের কথা বলেন নাই, মানুষকে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বাঁচিয়া আছেন এবং আমাদেরই মধ্যে বিচরণ করিতেছেন।

লৌকিক শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন বহু শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক নিজেই আবিষ্কর্ত্তা, ধর্ম্মজগতেও তেমনি যাঁহাদের নিজের অন্তর্দৃষ্টি আছে, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আছে, ব্রহ্মানুভূতি হইতেছে, ভগবানের সহিত যোগ আছে, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ আচার্য্য। তাঁহাদেরই কথা মানুষের মর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়। লৌকিক শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন পূর্ব্বতন জ্ঞানীদের আহৃত জ্ঞানের শিক্ষা দেওআ আবশ্যক; তেমনি আবার তাঁহাদের কথা কষিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবারও প্রয়োজন আছে। এইরূপে অনেক ভ্রম দূর হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, নূতন জ্ঞানের আহরণ ও সঞ্চয়ের। অধ্যাত্ম জগতেও এইরূপ পূর্ব্বলব্ধ তত্ত্বের ব্যাখ্যা, পরীক্ষা, ভ্রমনিরাস যেমন চাই, আচার্য্যের নিজের আবিষ্কার নিজের সত্যদর্শন নিজের আহরণও তেমনি চাই। কেবল প্রাচীন কথার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না। একটা গাছের কথা এখনও শেষ করিয়া জানা হইল না, আর মানুষের আত্মার তত্ত্ব ও জীবাত্মা পরমাত্মার যোগসম্পৃক্ত সমুদয় কথা নিঃশেষে কতকগুলি গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়া আছে, ইহা কি হইতে পারে?

সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক।

মানুষ একা একা থাকিতে পারে না, তাহাতে তাহার মঙ্গল হয় না। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীকেও সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয়। দলবদ্ধ হইয়া থাকা মানুষের স্বভাব। দেশ জাতি ভাষা ধর্ম্ম, গায়ের রং প্রভৃতি অনুসারে মানুষ নানা দলে বিভক্ত। এক একটি পরিবার ক্ষুদ্রতম মানবসমষ্টি। সমস্ত পৃথিবী মহাদেশ ও দেশে বিভক্ত, দেশ আবার প্রদেশ, জেলা, শহর, গ্রামে বিভক্ত। এক একটি গৃহ দেশের ক্ষুদ্রতম ভাগ। মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণের জন্য যেমন ঘরে বাস করা দরকার, তেমনি ঘরের বাহিরের হাওআ, ঘরের বাহিরে বিচরণ আবশ্যক। মানুষের যেমন পরিবারবদ্ধ হওআ দরকার, তেমনি বৃহত্তর দলের এবং সম্প্রদায়েরও আবশ্যক। কিন্তু সম্প্রদায়ও একটা বড় ঘরের মত। ঘর যত বড়ই হউক, মানুষ তাহার মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিলে, যত সুস্থ, যত শক্তিশালী হওআ তাহার পক্ষে সম্ভব, ততটা সে হইতে পারে না। সেইরূপ শক্তির পরিপুষ্টি ও শক্তির প্রয়োগ নিমিত্ত যেমন দল বাঁধা চাই, তেমনি আবার আত্মার স্বাস্থ্যের এবং অধিকতর শক্তিলাভের জন্য সম্প্রদায়ের বাহিরের সহিত সংস্পর্শ চাই, যোগ চাই। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক কেহ নয়, হইতে পারে না। যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মনে করেন, তাঁহারও একটা দল আছে; যদিও হয়ত সেই দলের এখনও একটা স্বতন্ত্র নাম হয় নাই। কেবল নিজের পরিবারের স্বার্থ দেখা খারাপ বলিয়া যেমন পরিবারবদ্ধ হইয়া থাকাটাই মন্দ নয়, তেমনি দলাদলি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঈর্ষা স্বার্থপরতা খারাপ বলিয়া দল বাঁধাটাই খারাপ নয়। ধর্ম্মে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রনীতিতে, দল চাই, কিন্তু দলের বাহিরের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকা চাই, হৃদ্যতা চাই। ঘরের মধ্যে রাঁধিয়া খাই, ঘুমাই, কাজ করি, বলিয়া আমরা চিরজীবন কেহ দুআর জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে থাকি না। যে কখন ঘরের বাহির হয় না, সে নিশ্চয়ই দুর্ব্বল ও অসুস্থ। ধর্ম্মে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে, সাহিত্যে, সামাজিক ব্যবস্থায়, সম্প্রদায়ের বাহিরের হাওআ আলো প্রয়োজনীয়। কোন সম্প্রদায়ের বা জাতির অবনতি ও লয় ততদিন হয় না, যতদিন তাহার বাহিরের সহিত বিশ্বের সহিত আদানপ্রদান থাকে। বিশ্ব-আত্মার প্রকাশ, শক্তি, সর্ব্বত্র রহিয়াছে। যিনি দেশে, জাতিতে, সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকেন, তিনি ভগবানের দানের অধিক অংশ হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখেন।

ভারতবাসীর প্রায়শ্চিত্ত।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বদেশপ্রেমিক হিন্দু ছিলেন। এডুকেশন গেজেটে তাঁহার যে জীবনচরিত বাহির হইতেছে তাহাতে অনেক শিখিবার জিনিষ আছে। তাহার কিয়দংশ আমরা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

এক সময়ে স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি গ্রীস রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন নাই, ইহার কারণ কি?" উত্তরে তিনি বলেন—"গ্রীক, রোমীয় এবং ইংরাজ এই তিনটি সুপ্রধান স্বদেশভক্ত জাতির ইতিহাসে ভারতবাসীর শিখিবার জিনিষ অনেক আছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস ত দুইটি প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস মাত্র।" ভারতবাসীর কি কি পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন,

"(১) স্বধর্ম্মীবিদ্বেষ। হিন্দু তাহার নিম্নশ্রেণীকে অন্ত্যজ বর্ণ নাম দিয়া পশুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করিয়াছে। একজন ডোম বা মেথর উঠান দিয়া গেলে তথায় গোবর জল ছড়া দেওয়া হয়—একটি ছাগল আসিয়া তথায় মলত্যাগ করিলেও শুধু ঝাড়ু দিলেই চলে। অথচ হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্র বলেন, "সর্ব্বঘটে নারায়ণ" আছেন, এবং বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন "ব্রাহ্মণে এবং শ্বপাকে" সমদর্শন করিতে হয়! আধুনিক কালের "সাধারণ" হিন্দু অন্ত্যজের সুখে দুঃখে শিক্ষায় উদাসীন। ব্যবহারক্ষেত্রে হিন্দুর এই স্বধর্ম্মীবিদ্বেষের জন্য ভগবান তাঁহার অসীম কৃপায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্ম্মপ্রেমিক জাতিকে—মুসলমানকে—শাস্তা ও শিক্ষকরূপে ভারতে প্রেরণ করেন। ইহারা আহারে ব্যবহারে ধর্ম্মের মধ্যে পণ্ডিতে এবং মূর্খে, সুলতানে এবং ভিক্ষুকে প্রভেদ করেন না। ঈদের দিনে সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমান সহস্র সহস্র একত্র হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার বন্দনা করেন, ইহা কি সুন্দর দৃশ্য! অন্ত্যজ প্রভৃতি যতক্ষণ হিন্দুয়ানী মানে ততক্ষণই ঘৃণিত; উহারা যেই মুসলমান হয়, অমনি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বলেন, "সেলাম মিয়া সাহেব!" তখন উহাদের বসিবার জন্য কাঠের চৌকী দিতে হয়! এই স্বধর্ম্মীবিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্ত বহুশত বৎসর ধরিয়া মুসলমান রাজত্বে চলার পরে মহারাষ্ট্রে ও পঞ্জাবে ঐ দোষটা একটু কাটিয়াছিল। মোগলের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধের সময়, বিবাহে ও আহারে বর্ণভেদ সত্ত্বেও, মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদিগের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রাধান্যের পথ উন্মুক্ত পাইয়াছিল। তাহাতেই হোলকার জাতিতে ধনগড় (ধাঙ্গড়), গাইকবাড় মেষপালক এবং সিন্ধিয়া জাতিতে কাহার হইলেও আজ রাজতক্তে উপবিষ্ট লক্ষিত হইতেছেন। পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যেও সকল বর্ণের লোকই সিংহ পদবীধারী এবং বিবাহ সম্বন্ধে পার্থক্য রাখিয়াও দৃঢ়-সম্মিলন-প্রাপ্ত।

(২) স্বদেশীবিদ্বেষ ভারতবাসীদিগের মধ্যে বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, মহারাষ্ট্রীয়, পঞ্জাবী, নেপালী, কাশ্মীরী, হিন্দু, মুসলমান, প্রভৃতির

পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ। এই পাপের জন্য মহারাষ্ট্রীয় এবং শিখ প্রাদেশিকভাবে গণ্ডীর বাহির হইতে পারে নাই; সকলেই যে ভারত-মাতার সন্তান এবং তাহাদের ভালবাসার পাত্র ইহা বুঝিয়া স্বদেশী-প্রেমিক হইতে পারে নাই। শিখ সর্হিন্দ প্রভৃতি বড় বড় সহর বিধ্বস্ত করিয়াছিল; মহারাষ্ট্রীয় বার্গি (অশ্বারোহী) নির্দ্দয়ভাবে রাজপুতানা ও বাঙ্গালা লুঠিয়াছিল এবং লুঠেরাই থাকিয়া গিয়াছিল; ভারতে একচ্ছত্র মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার অতটা সুবিধা পাইয়াও স্বদেশী-পীড়ন পাপের জন্য তাহা করিতে পারিল না। এই স্বদেশীবিদ্বেষ পাপের ক্ষালন জন্য ভগবান স্বদেশপ্রেমিক-শ্রেষ্ঠ ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ওয়েল্শ, স্কচ, আইরিশ, ডিসেণ্টার, প্রোটেষ্টাণ্ট, প্রেস্‌বিটিরিয়ান, রোমান কাথলিক, প্রভৃতি ভেদ আছে, কিন্তু সকলেই দেশের কাজে একজোট। ক্লাইব একজন সামান্য ইংরাজ কেরানী ছিলেন। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজকোষের ধনে উঁহাকে কেহ স্বদেশীদ্রোহী করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি অনায়াসে মিরজাফর প্রভৃতিকে ভাঙ্গাইয়া লইলেন। কোন একজন ইংরাজকে কিছু পাইতে দেখিলে সমস্ত জাতিই পরিতৃপ্ত হয়। ইংরাজের আগমনে ও সুদৃঢ় রাজশাসনে সমগ্র ভারত যে এক দেশ তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে; ইহাদের প্রবর্ত্ত রেলপথে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধায় ভারতের আভ্যন্তরিক সম্মিলনসাধন ক্রমবর্দ্ধমানবেগেই হইতেছে এবং ইংরাজ ভারতের এই একচ্ছত্র সম্মিলন সাধন করিয়া অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফলভাগী হইয়াছেন। ফলতঃ ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম্ম এবং বর্ণনির্ব্বিশেষে একটা "জাতীয় ভাব ও স্বদেশী-প্রেম" বিধিপ্রেরিত ইংরাজের রাজত্বকালেই সাধারণের মধ্যেও সুপরিস্ফুট হইতেছে এবং বহুকাল ইহাদের শাসনে থাকিয়াই ভারতবাসী উহা সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইবে। সকল ভারতবাসীরই মুসলমানের আদর্শে স্বধর্ম্মী-প্রেম ও ইংরাজদের আদর্শে স্বদেশী-প্রেম অনুশীলন করিবার খুবই সুবিধা ইংরাজদের আমলে হইয়াছে। কিন্তু পবিত্র ভারতভূমিতে স্বধর্ম্মের এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তি ভালবাসার পোষণ উপলক্ষে অপর ধর্ম্মের বা দেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হওয়া চলিবে না; উহা ভারতবাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং তাঁহার পক্ষে জ্ঞানকৃত পাপ হইবে। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতবাসী এখনও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদার, উচ্চ এবং সুক্ষ্মদর্শী আছেন।"

মেকলের সময়ে বাঙ্গালী ও ইংরেজের চরিত্র।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "হিন্দু-জাতি ও শিক্ষা" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"মেকলে-চিত্রিত বাঙ্গালী-চরিত্র বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। যে সময়ে মেকলে লিখিতেছিলেন সেই সময়ে কর্নেল সাইক্স (Colonel Sykes, R. E,) ইংলণ্ডস্থিত রয়্যাল সোসাইটির সহকারী সভাপতি (Vice-president of the Royal Society) ছিলেন। তিনি সেই সময়ে ইংলণ্ড ও বঙ্গদেশে যে-সকল কয়েদির ফাঁসি বা দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হয়, উভয় দেশের সংখ্যা তুলনা করিয়া লণ্ডনের ষ্টাটিষ্টিক্যাল সোসাইটির (Statistical Society) এক অধিবেশনে পাঠ করেন। তিনি দেখান যে ১৮৩৮ সালে সমগ্র বাঙ্গালা বিভাগে (Bengal Presidencyতে), আসাম হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত এই স্থানের মধ্যে, ৩৮ জনের ফাঁসি হয়, ১৮৩৯ সালে ২৫ জনের ফাঁসি হয়, ১৮৪০ সালে ২৭ জনের ফাঁসি হয়। ঐ তিন বৎসরে ইংলণ্ডে ১১৬ জন, ৫৭ জন ও ৭৭ জনের ফাঁসি হয়। ১৮৩৮ সালে বাঙ্গলা দেশে ৮১ জনের দ্বীপান্তর হয়। ইংলণ্ডে ঐ সালে ২৬১ জন দ্বীপান্তরিত হয়। ১৮৩৯ সালে বাঙ্গলা দেশে ৭২ জনের দ্বীপান্তর আজ্ঞা হয়, ঐ সালে ইংলণ্ডে ২০৫ জন দ্বীপান্তরিত হয়। ১৮৪০ সালে বাঙ্গলাদেশে ১৫০ জনের দ্বীপান্তর হয়, ঐ সালে ইংলণ্ডে ২৩৮ জনের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। তিনি আরও দেখাইলেন যে বাঙ্গলা দেশে লোকসংখ্যা হিসাবে ৯৩৫ জনের মধ্যে একজন মাত্র লোক আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। আর লণ্ডন সহরে প্রতি বৎসর ২৭ জনের মধ্যে একজন লোক পুলিস কর্ত্তৃক অপরাধী বলিয়া গ্রেপ্তার হয়।"

বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষা।

অনেক বাঙালীর এবং তার চেয়েও অধিকসংখ্যক অপর ভারতবাসীর এই ধারণা আছে যে ইংরেজরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া অন্য ভারতবাসীদের চেয়ে বাঙালীদিগকে বেশী শিক্ষার সুযোগ দেওয়ায় তাহারা ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "হিন্দুজাতি ও শিক্ষা" নামক পুস্তক পড়িলে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে। যে কারণেই হউক, মোটের উপর বাঙালী বিদ্যানুরাগী বলিয়াই শিক্ষা-বিষয়ে বাঙালীর অল্প একটু উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পুস্তক হইতে বাঙালীর বিদ্যানুরাগের ২।৩টি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"১৮২৫ সালের জানুয়ারী মাসে সংস্কৃত কলেজের পশ্চিম অংশে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইবার অনুমতি পায়, এতদিন স্থানের অভাব ছিল এখন সে অভাব দূর হইল। ১৮২৫ সালের শেষে ১১০ জন বালক মাহিনা দিয়া পড়িত। ১৮২৬ সালে তাহাদের সংখ্যা ২২৬ জন হয়। ১৮২৭ সালে হিন্দু কলেজে পাঁচ টাকা বেতন দিয়া তিন শত বালক পড়িত। ১৮৩৪ সালে দিল্লী কলেজে ৩৭৮ জন ছাত্র পড়িত। তাহার মধ্যে ৩৫৯ জন পড়িবার নিমিত্ত মাসহারা পাইত। সেই সময়ে হিন্দু কলেজ হইতে বাৎসরিক ১৫,০০০, টাকা বাঙ্গালী ছাত্রদিগের প্রদত্ত মাহিনা হইতে আদায় হইত।"

"তখন এদেশে বাঙ্গালী ছাত্রেরা অধিকাংশই মাহিনা দিয়া পড়িত হিন্দু কলেজের প্রায় সকলেই মাহিনা দিত। ১৮৪৪ সালে আগ্রা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ গভর্ণমেণ্ট-সাহায্যকৃত স্কুলসমূহে ২৪২০ জন বালক পড়িত। তাহার মধ্যে কেবল মাত্র ৪২ জন মাহিনা দিত।"

"চুঁচুড়ায় নদীতীরে ফরাসী জেনারেল লে পেরন (General Le Perron) ১৮১০ সালে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, সেই গৃহ খরিদ করিয়া ১৮৩৬ সালে ১লা আগষ্ট হুগলি কলেজ খোলা হয়। কলেজ খুলিবার তিন দিনের মধ্যে বার শত ছাত্র ইংরেজী বিভাগে ভর্ত্তি হইবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়। অনেকে নদীর উভয় পারের তিন চারি ক্রোশ দুরস্থ গ্রাম হইতে আসে। এতদ্ব্যতীত তিন শত জন মুসলমান বালক আরবী ও ফারসী বিভাগে ভর্ত্তি হয়।"

বঙ্গে বাল্যবিবাহের হ্রাস।

বিহার ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের স্কুলসমূহে এখনও এমন ছাত্র দেখিতে পাওআ যায়, যাহার বিবাহ ও একাধিক সন্তান হইয়াছে। পিতা ও পুত্র একই স্কুলে পড়িতেছে, এরূপ দৃষ্টান্তও কয়েক বৎসর আগে ঐ-সব অঞ্চলে দেখ

যাইত; এখনও দেখা যায় কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু স্কুলে বিবাহিত ছাত্র তথায় এখনও বিস্তর দেখা যায়। তজ্জন্য কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজসংসৃষ্ট স্কুলে কয়েক বৎসর হইল নিয়ম করা হইয়াছে, যে, বিবাহিত কোন ছাত্রকে ভর্তি করা যাইবে না।

এক সময়ে বাংলাদেশেও যে বিবাহিত ও সন্তানবান্ ছাত্রেরা স্কুলে পড়িত, তাহার প্রমাণ আছে। "হিন্দুজাতি ও শিক্ষা" নামক পুস্তকে দেখা যায় যে হিন্দুকলেজের সহিত ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য একটি ডাক্তারখানা সংযুক্ত ছিল।

"The Committee have recently, with large-hearted benevolence, directed that medicines shall be dispensed and medical aid afforded also to the wives and children of the students."

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ঐ ডাক্তারখানা হইতে ছাত্রদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণও বিনাব্যয়ে চিকিৎসকের সাহায্য ও ঔষধ পাইত।

তখন জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে হিন্দুকলেজে তিনদিন ছুটি হইত। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে যে সেকালে ছাত্রদের মধ্যে জামাইবাবুদের এরূপ প্রাচুর্য্য ও প্রাধান্য ছিল যে তাঁহাদের সুবিধার জন্য শিক্ষালয় তিন দিন বন্ধ রাখিতে হইত। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের সকলকে স্কুলের ছাত্র বলা চলে না বটে; কিন্তু নীচের সমুদয় ক্লাসের ছাত্রেরা স্কুলের ছাত্রই ছিল। যখন হিন্দুকলেজ উঠিয়া যায়, তখন উহা ভাঙিয়া ও উহার উপরের চারিশ্রেণী মাত্র লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ গঠিত হয়।

আজকাল বাংলাদেশে কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও বিবাহিত ছাত্রদের সংখ্যা বেশী হইবে না। বালক ও যুবকদের বিবাহের বয়স যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি নানা কারণে শিক্ষিত-লোকদের কন্যাদের বিবাহও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী বয়সে হইতেছে।

শিক্ষা ও জা'ত।

দু-একটি কলেজের আগেকার ইতিহাস হইতে ছাত্রদের জা'ত সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ১৮৩৫,৩৬,৩৭,৩৮,৩৯, ৪০,৪১,৪২,৪৩,৫০,৫১ ও ৫২ সালে কায়স্থ ছাত্রদের সংখ্যা অন্যান্য যে-কোন জা'তের ছাত্র অপেক্ষা বেশী ছিল। প্রায় প্রতিবৎসর তাহার নীচেই ছিল ব্রাহ্মণ। ১৮৩৫এ সংখ্যায় সুবর্ণবণিক তৃতীয়, তন্তুবায় চতুর্থ, বৈদ্য পঞ্চম ও কৈবর্ত্ত ষষ্ঠ ছিল, তাহার পর নাপিত, কর্ম্মকার, তিলি, গোপ, স্বর্ণকার, কাংস্যকার ও শৌণ্ডিক এক এক জন ছিল। ১৮৩৬এ তন্তুবায়েরা তৃতীয়, সুবর্ণবণিকেরা চতুর্থ, এবং বৈদ্যেরা পঞ্চমস্থানীয় ছিল। ১৮৩৭এ সুবর্ণবণিকরা তৃতীয়, তন্তুবায় ও কৈবর্ত্তেরা চতুর্থ, এবং তিলি ও বৈদ্যেরা তাহার পরবর্ত্তী ছিল। ১৮৩৮এ তন্তুবায়েরা ও ব্রাহ্মণেরা সংখ্যায় সমান ও দ্বিতীয়স্থানীয় ছিল। ১৮৪০এ বৈদ্য, কৈবর্ত্ত, তন্তুবায় ও সুবর্ণবণিকেরা সমসংখ্যক ও তৃতীয় ছিল। ১৮৪৪ সালে কায়স্থ ১৭ জন এবং ব্রাহ্মণ ১৮ জন ছিল। কেবল ঐ বৎসর ব্রাহ্মণেরা সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশী ছিল। পারদর্শিতা অনুসারে ১৮৪২ সালে মেডিক্যাল কলেজে সুবর্ণবণিক ছাত্রেরা ১ম, ২য়, ও ৪র্থ স্থান, তিলি ৩য় স্থান, তন্তুবায় ৫ম, ৬ষ্ঠ, ও ৭ম স্থান, কায়স্থ ৮ম স্থান, রজক ৯ম স্থান, ব্রাহ্মণ ১০ম স্থান, এবং একজন মুসলমান ছাত্র একাদশ স্থান অধিকার করে।

সম্ভবতঃ শবব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রবলতম কুসংস্কারের জন্য কিম্বা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য বলিয়া চিকিৎসা শিক্ষায় তখন ব্রাহ্মণেরা কায়স্থদের সমকক্ষ ছিল না।

সাধারণ শিক্ষায় দেখা যায়, কৃষ্ণনগর কলেজে ১৮৫০, ৫১, এই দুই সালে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই খুব বেশী ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল ১২১ ও ১২০ এবং তাহার নীচে ছিল কায়স্থ ৪০ ও ৭১।

স্বল্পব্যয়ে শিক্ষা।

বাংলাদেশে কিরূপ অল্পব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত এবং এখনও হইতে পারে, আগেকার কোন কোন সরকারী শিক্ষা-রিপোর্ট হইতে তাহা জানা যায়। একটি রিপোর্টে আছে:—

"From these and such like indications, I believe that our schools will produce good results with very imperfect apparatus. Even now in some schools, a round earthen pot, costing one farthing, serves for a globe; a black board is made of a mat stiffened with

bamboo splints and well plastered with cow's dung. The brown surface thus produced answers all the requirements of a black board. If the walls of the school-house are made of mud, and washed, as is usual in Hindu houses, with cow's dung, the whole wall serves as a black board, and can be renewed every other day. I expect to see the time when these brown surfaces will be universal in Bengali school-rooms. The boys who draw maps make their own ink from charcoal, and their paint from jungle plants. They also glaze the maps by rubbing them with a smooth stone."

ইহার তাৎপর্য্য:—"কোন কোন স্কুলে এক পয়সার একটা গোল ভাঁড়ের দ্বারা গোবের অর্থাৎ ভূ-গোলকের কাজ চালান হয়। একখানা চাটাই বা মাদুরের পিঠে বাঁশের বাতা বা বাখারি বাঁধিয়া তাহাকে শক্ত করা হয়, এবং তাহার উপর গোবর লেপিয়া শুকাইলে তাহা বোর্ড রূপে ব্যবহৃত হয়। স্কুলগৃহের দেওয়াল মাটির তৈরি হইলে, এবং উহার ভিতর পিঠ, হিন্দু-বাড়ীর রীতি অনুসারে গোবর-লেপা হইলে, সমস্ত দেওআলটিতে বোর্ডের কাজ চলিতে পারে; এবং তাহা একদিন অন্তর নূতন করিয়া গোময়-লিপ্ত হইতে পারে। আমি সেই দিন দেখিবার প্রত্যাশা করি, যখন এই-রূপ গোবর-লেপা দেওআল-রূপ বোর্ড বঙ্গীয় স্কুলগৃহসকলে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইবে। যে সব ছেলেরা মানচিত্র আঁকে, তাহারা কয়লা হইতে নিজেদের কালী, ও জংলী নানা গাছগাছড়া হইতে রং প্রস্তুত করে। তাহারা চিক্কণ একটি পাথর দিয়া ঘষিয়া মানচিত্রগুলিকে চকচকে করে।"

গোবর-লেপা দেওআলে বোর্ডের কাজ হওয়া দূরে থাক্, এখন অনেক জায়গায় দেশী ছুতারের তৈরি কাঠের বোর্ডেও শিক্ষাবিভাগের মন উঠে না। একজন ইন্স্পেক্টর সাহেব হুকুম করিয়াছিলেন যে বোর্ড ম্যাকমিলান কোম্পানীর নিকট হইতে কেনা চাই। কাঠের বোর্ডের চেয়ে গোবর-লেপা দেওআল বা গ্লোবের চেয়ে মাটির ভাঁড় যে ভাল তা নয়; কিন্তু দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা মূর্খ হইয়া থাকার চেয়ে মাটির গোল ভাঁড়, গোবর-লেপা চাটাই বা দেওআল, প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদের শিক্ষালাভ সহস্র-গুণে বাঞ্ছনীয়। এখন কিন্তু শিক্ষাবিভাগের বেশী দৃষ্টি বাহিরের আসবাব সরঞ্জামের দিকে। ভাল ঘর, বেঞ্চি, বোর্ড, প্রভৃতি না হইলে বিদ্যালয় বিদ্যালয় বলিয়াই মঞ্জুর নয়! কেন, বৎসরের অধিকাংশ সময় ত এদেশে গাছের তলায় চট, মাদুর, চাটাইয়ে বসিয়া লেখা পড়া চলিতে পারে? যে ছেলেটি যে রকম ঢ্যাঙা, তদনুযায়ী উঁচু বেঞ্চিতে বসিয়া তাহার মাপসই ও যথাযোগ্য ঢালু ডেস্কে কাগজ রাখিয়া লিখিলে ও বহি রাখিয়া পড়িলে, মেরুদণ্ড ফুস্ফুস ও সমস্ত শরীর বেশ ভাল থাকে, ইহা আমরা জানি। কিন্তু এইরূপ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত মাপসই বেঞ্চি ও ডেস্ক খুব ভাল ভাল গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেও ক'খানা আছে, জানিতে ইচ্ছা করি। বেঞ্চিটা এত উঁচু যে তাহাতে উপবিষ্ট ছেলের পা ঝুলিতেছে, মাটিতে ঠেকিতেছে না, ডেস্কটা এত নীচু যে কুঁজো হইয়া ঝুঁকিয়া লিখিতে হইতেছে অথবা এত উঁচু যে লিখিবার পড়িবার সুবিধা হইতেছে না, এরূপ ত প্রায় দেখা যায়। ঢালু ডেস্কও অনেক বিদ্যালয়ে নাই, যথা-যোগ্য ঢালু ত প্রায় নাই বলিলেই হয়। যে-সব ছেলে বাড়ীতে কখন বেঞ্চে বসে না, হয় ত বড় হইলেও বসিবে না, বেঞ্চের অভাবে তাহাদিগকে মূর্খ থাকিতে বাধ্য করা অপেক্ষা চটে, চাটাইয়ে বসিয়া লিখিতে পড়িতে দেওআ কি ভাল নয়? অনেক স্কুলগৃহ স্যাঁৎসেতে, অন্ধকার, যথেষ্ট বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত-বিহীন। এক একটি কামরায় এত ছেলে বসে যে ঘরে ঢুকিলেই তাহাদের নিঃশ্বাসে ও ঘর্ম্মে কলুষিত গরম দুর্গন্ধ বাতাসে অসুবিধা বোধ হয়। ইহা অপেক্ষা গাছতলা বা অপর ছায়াযুক্ত ফাঁকা জায়গা কি শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে হাজার-গুণে ভাল নয়? শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীরা যাহাই বলুন, যাহাতে খুব বেশীসংখ্যক দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদিগকে সুস্থ রাখিয়া সস্তায় সুশিক্ষা দেওআ যায়, আমাদের দেশের লোকেরা যদি তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। অন্য সব বিষয়ে যেমন, শিক্ষাদান-কার্য্যেও তেমনি, স্বাধীন চিন্তা, স্বাবলম্বন এবং অবস্থা অনুসারে নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের যথেষ্ট আবশ্যক আছে। এইটি সকলে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখুন, যে, যেমন দরিদ্রতমেরও বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক ও সম্ভবপর, তেমনি তাহার জ্ঞান লাভ করাও চাই-ই চাই, এবং তাহা মোটেই অসম্ভব নহে। যাহার কাগজ জুটে না, সে শ্লেট বা তক্তা বা তাল পাতা বা কলা-

পাতা বা মাটিতে লিখুক, যাহার বহি কিনিবার বা ধার করিবার সুবিধা নাই, সে নকল করিয়া লউক; তাহাও সম্ভব না হইলে মুখে মুখে শিখুক। আমাদেরই দেশে ত বেদ লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে শতশত বৎসর মানুষের স্মৃতিতে ও কণ্ঠে বিরাজ করিয়াছিল।

রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা।

রেঙ্গুন হইতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন:—

"জাপান যাইবার পথে কবি রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহরে দুই দিন অবস্থান করেন। ব্রহ্মদেশবাসীরা ও ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতসন্তানগণ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকে এদেশে সম্বর্দ্ধনা করিবার সুযোগ পাইয়া তাঁহার প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল তাসামারু নামক জাপানী ষ্টীমার কবি রবীন্দ্রনাথ, মিষ্টার এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন এবং শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে প্রভৃতিকে লইয়া বন্দরে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই নদীতীরে বিপুল লোকসমাগম হয়। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ জাহাজঘাটে সমবেত হইয়া ষ্টীমার আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বঙ্গের গৌরব রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্রই অভ্যর্থনা-কমিটির সভ্যগণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন এবং সমবেত জনমণ্ডলী দলবদ্ধ হইয়া কয়েকখানি মোটর গাড়ীর সহিত মিছিল করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যান। পথে বর্ম্মিজ, মান্দ্রাজী, মারাঠা, পার্শী, বাঙ্গালী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোকে "বন্দেমাতরং", "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী জয়", শব্দে জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। পরদিন অপরাহ্নে স্থানীয় জুবিলি হলে একটা বিরাট সভার অধিবেশন হয়। প্রায় চারি সহস্র লোক এই অভ্যর্থনা-সভায় যোগদান করিয়াছিল। জুবিলি হলে এরূপ জনতা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। বণিক সম্প্রদায়ের অগ্রণী, দানবীর আবদুল করিম জামাল, সি, আই, ই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ইউ বা খিন নগরবাসীগণের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় একটী অভিনন্দন পাঠ করেন এবং কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের পক্ষ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আর একটী অভিনন্দন পাঠ করেন। অভিনন্দন-পত্র দুই

রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা।
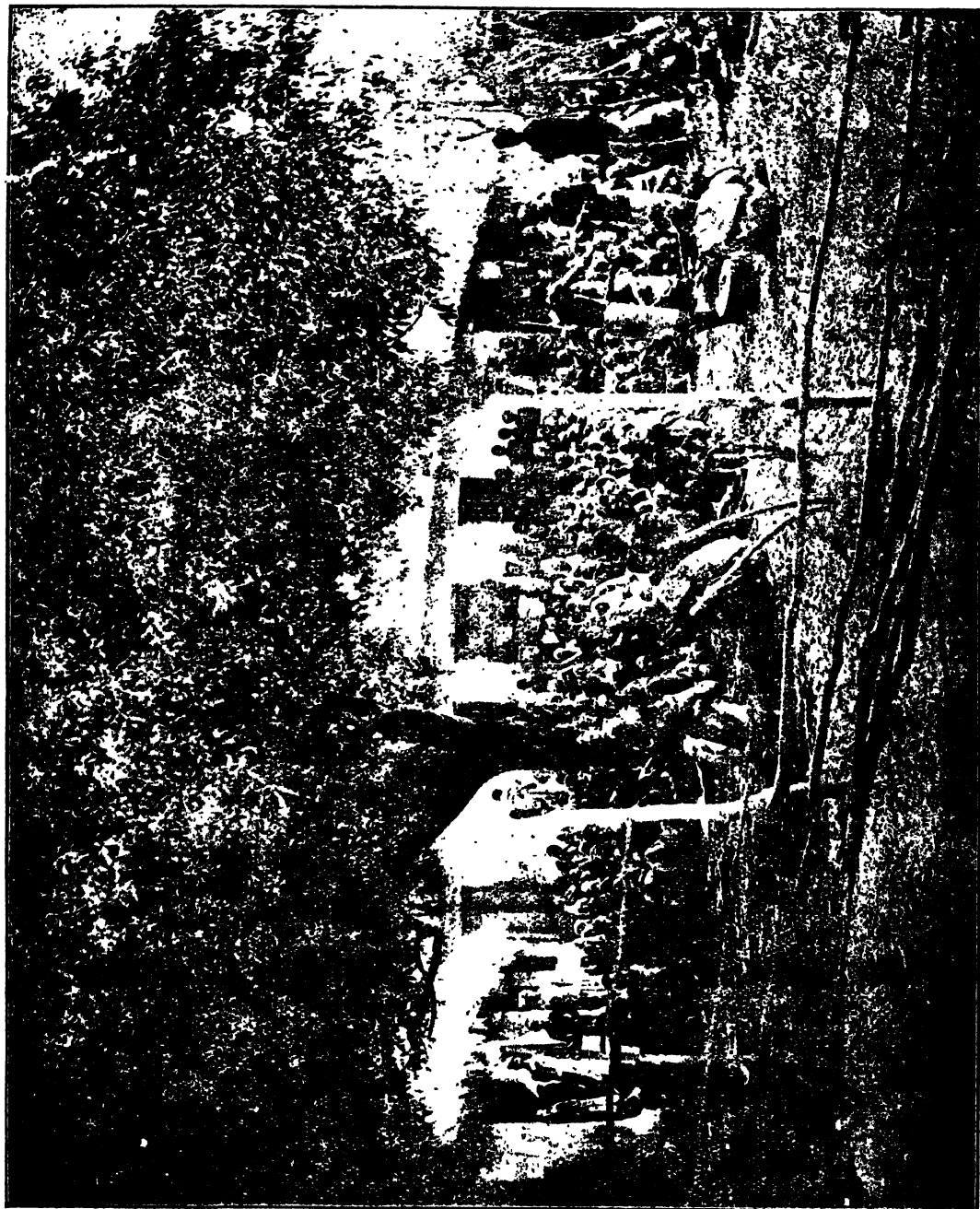
হাড়মাসড়া কেন্দ্রে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে বাঁকুড়াসম্মিলনী কর্ত্তৃক সাহায্য বিতরণ।

খানি ব্রহ্মদেশীয় শিল্পীর কারুকার্য্য-শোভিত দুইটী স্বতন্ত্র রজত আধারে কবিবরকে প্রদান করা হয়। এই সময় সম্বর্দ্ধনা কমিটির কয়েকজন সভ্যের সহিত তাঁহার একটী ফটোগ্রাফ তোলা হয়। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন এবং নানা স্থান হইতে তাঁহার নিকট অনেক পত্র ও টেলিগ্রাম আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে ব্রহ্মদেশের ছোটলাট সার হারকোর্ট বাটলার সাহেব মফস্বল হইতে লিখিয়াছেন, 'এই সুরম্য ব্রহ্মদেশে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে রেঙ্গুন সহরে আমার অনুপস্থিতির জন্য আমি আমার আবাসে আপনার আতিথ্য-সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিলাম না।' "

দুর্ভিক্ষের উপর আগুন।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে শেষ যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে, যে, অবস্থা এখনও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, এবং জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িয়াছে। অতএব গবর্ণমেণ্টেরও মতে, এখনও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোক-দিগকে সাহায্য দিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। সম্প্রতি কিছু বৃষ্টি হওয়ায় চাষের কাজ অল্পস্বল্প আরম্ভ হইয়াছে। যদি বরাবর দরকার-মত বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ধান কাটা ও মাড়ার পর আর লোকদিগকে সাহায্য করিতে হইবে না। সুতরাং এখনও অন্ততঃ চার মাস সাহায্য করিতে হইবে। বাঁকুড়া-সম্মিলনীর হাতে এখন যে টাকা মৌজুদ আছে, তাহাতে বর্ত্তমানে যাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া হইতেছে কেবল তাহাদিগকে আর এক মাস আন্দাজ সাহায্য দেওয়া চলিবে। তাহাদেরই জন্য আরও ৩।৪ মাসের মত, অর্থাৎ আরও ছয় সাত হাজার টাকার প্রয়োজন। নূতন নূতন স্থান হইতে বিপন্ন লোকদিগের কাতর আবেদন আসিতেছে। অর্থাভাবে সম্মিলনী আর বেশী লোককে সাহায্য দিতে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। বেশী পরিমাণে টাকা পাইলে আরও অনেক লোকের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারা যায়। যদি যথেষ্ট টাকা না আসে, তাহা হইলে এখন যাহারা সাহায্য পাইতেছে, তাহাদিগকেও একমাস পরে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, বস্ত্রের অভাব, মানুষের ছিল। ঘরবাড়ী বেমেরামত হইয়া পড়ায় বাসের অসুবিধাও হইতে-ছিল। তথাপি একটু মাথা গুঁজিয়া থাকিবার জায়গা তাহা-দের ছিল। কিন্তু ছোট-মেদিনীপুর, পাবদা, প্রভৃতি অনেক গ্রামে আগুন লাগিয়া বিস্তর ঘর পুড়িয়া যাওয়ায় অনেক লোক গৃহহীন, নিরাশ্রয়, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের শেষ খবর আসিয়াছে তিলুড়ী গ্রাম হইতে। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু বড় গ্রাম। ইহাতে মোটামুটি ১৬০০ ঘর লোকের বাস। তাহার মধ্যে ১০৬৪টি ঘর পুড়িয়া গিয়া লোকে নিরাশ্রয় ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। অনেকগুলি পাকা বাড়ীও নষ্ট হইয়াছে। লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। এই-সকল নিরাশ্রয় লোককে সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক। সকলে মুক্তহস্ত হউন। করুণারূপিণী বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীগণ, জননী ভগিনী কন্যা বধূগণ, সহায় হউন।

বাঁকুড়ার জমিদারদের কর্ত্তব্য।

বাঁকুড়া জেলা স্বভাবতঃ দরিদ্র। তাহার উপর ইহার উৎপন্ন ধন বহু পরিমাণে জেলার বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় ইহা আরও দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। জেলার প্রায় অর্দ্ধেকটার জমিদার বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ। তাঁহার চেয়ে ছোট জমিদারী মানভূম জেলার পাঁচেটের রাজার এবং শিয়াড়-শোলের মালিয়া পদবীধারী জমিদারদের। এই তিন বংশের লোকে বাঁকুড়ার অধিকাংশ জমির জমিদার। দুর্ভিক্ষে মানু-ষের প্রাণ বাঁচান গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু যে-সব জমিদার পুরুষানুক্রমে চাষীদের ধনে ধনী, তাঁহারাও, আইনতঃ না হইলেও, ধর্ম্মতঃ প্রজাদের প্রাণরক্ষা করিতে বাধ্য। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজেরা পুরুষানুক্রমে বৎসরের পর বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁকুড়া হইতে পাইয়াছেন। তাহার বিনিময়ে বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ কি করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা করে। কাগজে দেখিয়াছিলাম তিনি সর-কারী দুর্ভিক্ষফণ্ডে আড়াই হাজার টাকা দিয়াছেন। কিন্তু ইহা অতি সামান্য। বোম্বাইয়ের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গোণ্ডাল। বাঁকুড়ার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তাহার আয় বর্দ্ধমানের মহারাজার জমিদারীর চেয়ে অনেক কম। তাহার ঠাকোর সাহেব (অর্থাৎ রাজা) এবং তাঁহার মহিষী

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ ছয় হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা আরও অনেক সাহায্য করিতেছেন জানিতে পারিলে সুখী হইব। চাষের এই আরম্ভের সময় প্রজাদিগকে ঋণ দিবার বন্দোবস্ত করিলে তাহাদের কত উপকার হয়। গবর্ণমেণ্ট সকলকে ঋণ দিতেও পারিতেছেন না।

পঞ্চকোটের রাজা বা শিয়াড়শোলের জমিদারেরা কি দিয়াছেন, তাহা কাগজে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক ব্যবস্থা ও আইনের ব্যবস্থা এরূপ, যে, অজন্মা হইলে খাদ্য ও ধনের উৎপাদক যে পরিশ্রমী কৃষকশ্রেণী, তাহারাই খাইতে পায় না; কিন্তু তাহাদের শ্রমজাত ধনে ধনী অলস ভোগীদের একজনেরও ভোগবিলাস কমে না, অন্নকষ্ট ত হয়ই না; খাইতে না পাইয়া তাহারা কেহ মরিবে ইহা ত কল্পনার অতীত। বরং বেশী খাইয়াই তাহারা অনেকে অল্পায়ু হয়। কৃষক জলের অভাবে ত্রাহি রব ছাড়ে, পঙ্কিল দুর্গন্ধ জল পান করে, কত কষ্ট পায়। কিন্তু ভোগীর বৈদ্যুতিক পাখা, বরফ, গিরিনিবাস, কিছুরই অভাব হয় না।

খাদ্য ও ধন যে উৎপাদন করে, অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি-অজন্মা হইলে সেই প্রথমে মারা পড়িবে, এবং যাহারা কোন পুরুষে একটি ধানের শীষও উৎপন্ন করে নাই, তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে, ইহা ধর্ম্মানুগত ব্যবস্থা নহে। আইনে বাধ্য না করিলেও মানুষের ধর্ম্মানুগত আচরণ করাই উচিত।

বর্দ্ধমানের কমিশনারের হস্তস্থিত সাহায্যফণ্ড।

দামোদরের বন্যায় বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ যে টাকা উঠে তাহার উদ্বৃত্ত কয়েক হাজার টাকা বর্দ্ধমানের কমিশনারের হাতে জমা আছে। তাহা বন্যা, গৃহদাহ, প্রভৃতি আকস্মিক কারণে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ ব্যয় করিবার কথা। বাঁকুড়া জেলায় তিলুড়ী প্রভৃতি যে-সব গ্রাম পুড়িয়া গিয়াছে, তথাকার অধিবাসীরা কমিশনারের নিকট সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করুন।

বাঁকীপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

কাগজে এইরূপ বাহির হইয়াছে যে বাঁকীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের যে আগামী অধিবেশন হইবে, তাহাতে নারীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে, এবং তাহাতে মহিলারাই সভানেত্রী, প্রবন্ধপাঠিকা, বক্ত্রী, এবং শ্রোত্রী হইবেন। সকল দেশের লোকে নিজেদের ভাষাকে মাতৃভাষা বলে, কেন না জননীদের কাছেই ভাষাটা আমরা প্রথমে শিখি; কিন্তু মাতৃভাষা ও সাহিত্যসম্বন্ধীয় সভায় "মাতৃ"দিগকে পৃথক্ করিয়া দেওয়ার অক্ষয়কীর্ত্তি দেখিতেছি বাঙালীরাই প্রথম স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। অবস্থা- ও ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমরা মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সম্যক্ অনুশীলন করিতে পারি নাই; কিন্তু এ বিষয়ে সামান্য যাহা জানি বুঝি তাহাতে নারীদের মাতৃভাষা ও সাহিত্য এবং পুরুষদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ আছে বলিয়া এপর্য্যন্ত মনে হয় নাই। হয় ত বাঁকীপুরে এই ধারার মূলোচ্ছেদ হইবে।

আমাদের দেশে যে-সকল আমোদ উৎসবে মহিলারা উপস্থিত থাকেন, তথায় পর্দ্দার বন্দোবস্ত থাকে। অন্তঃপুরিকারা তাহার আড়ালে বসেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরেও অনেক মহিলা পর্দ্দার আড়ালে বসেন; যাঁহারা তাহা আবশ্যক মনে করেন না, তাঁহারা পুরুষদিগের হইতে স্বতন্ত্র প্রকাশ্য স্থানে বসেন। সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনেও এইরূপ বন্দোবস্ত করিলে কোন ক্ষতি হয় না। যে-দেশে প্রাচীনকালে প্রকাশ্য সভায় ব্রহ্মবাদিনী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত পরব্রহ্ম বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা এখনও গৌরব বোধ করি, সেই দেশে নারীদিগকে জাতীয় একটি প্রধান অনুষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিবার চেষ্টা আমরা কল্যাণকর মনে করি না। আমাদের অনেক সভায় জননী ও কন্যাগণ উপস্থিত থাকেন না বলিয়া কোন কোন বৃদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিও অসংযত ও অশিষ্ট ভাবে কথা বলেন। পর্দ্দার আড়ালে তাঁহাদেরই কাহারও না কাহারও জননী ভগিনী কন্যা স্নুষা আছেন জানিলে হয়ত তাঁহাদের আচরণ সভ্যসমাজের উপযুক্ত হইতে পারে।

থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর কার্য্যক্ষেত্র সমস্ত পৃথিবীব্যাপী। তাহার নেত্রী শ্রীমতী এনি বেসাণ্ট। তাঁহার জন্য কি একটি থিয়সফিষ্ট নারীবিভাগ প্রয়োজন হইয়াছে, যেখানে নেত্রী, বক্ত্রী, শ্রোত্রী, সকলেই নারী? আমরা থিয়-

রফিক্যাল সোসাইটীর নাম এইজন্য করিলাম যে হাজার হাজার নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ইহার সভ্য আছেন। অন্ততঃ তাঁহাদের কাহারও সাহিত্যসম্মিলনের স্বতন্ত্র নারী-বিভাগ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী হওয়া উচিত নয়।

এ পর্য্যন্ত অতি অল্পসংখ্যক নারী সাহিত্যসম্মিলনে যোগ দিয়াছেন; পর্দ্দার আড়ালে না বসিয়া প্রকাশ্যস্থানে বসিয়াছেন তদপেক্ষাও কম। নারীদের জন্য স্বতন্ত্রবিভাগ না হওয়ায় এরূপ ঘটিয়াছে, সেই কারণেই হাজার হাজার বা শত শত মহিলা যোগ দিতে পারিতেছেন না, বাঁকীপুরের অভ্যর্থনাসমিতি এরূপ কোন প্রমাণ পাইয়াছেন কি না জানি না।

অবশ্য যদি সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক এমন কোন কোন মায়ের-ছেলে থাকেন যাঁহারা মাতৃজাতির মুখ দেখিতে বা মাতৃজাতিকে আপনাদের মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করেন না, তাহা হইলে সেই-সব বাণীপুত্রদের জন্য স্বতন্ত্র ঘন পর্দ্দাঘেরা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত পারে। ইহা অসাধ্য, দুঃসাধ্য বা বহুব্যয়সাধ্য নহে।

নারীবিভাগের নেত্রী নির্ব্বাচন।

কাগজে ইহাও বাহির হইয়াছে যে বাঁকীপুর অভ্যর্থনা-সমিতি কুচবিহারের রাজমাতা মহারাণী সুনীতি দেবী কিম্বা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে সাহিত্যসম্মিলনের নারীবিভাগের সভানেত্রী নির্ব্বাচন করিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের নেতা বা নেত্রী নির্ব্বাচনে সাহিত্য বা বিদ্যাবিষয়ক কৃতিত্বের দিকেই দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। এখানে শুধু ধন, পদ, আভিজাত্য, মানসম্ভ্রমের খোসামোদ পরিবর্জ্জনীয়। যদি একান্তই ধনী মানী অভিজাতের মনস্তুষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হইলে এমন লোকের খোসামোদ করিলে, সাহিত্যিক বিচারশক্তি না হউক, অন্ততঃ সাংসারিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কেবল নারীবিভাগেরই সভানেত্রী হইবার উপযুক্ত এরূপ মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা সভাপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও চেয়ে তিনি সাহিত্যিক শক্তি ও খ্যাতিতে কম নহেন।

ধন ও সাহিত্য-সম্মিলন।

রাজারাজড়ারা সাহিত্যচর্চ্চা ও সাহিত্যসৃষ্টিচেষ্টা অল্পস্বল্প আগেও করিতেন, এখনও করেন। কিন্তু যাহা এক-জন সাধারণ লোকে করিলে তাহাকে সাহিত্যসম্মিলনে প্রধান স্থান দিবার কল্পনাও কেহ করে না, তাহা একজন ধনী মানী লোকে করিলে তাহা একটা দাবী বলিয়া কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যাহাদের ধন মান আছে, তাহারা নিজে কতটুকু লেখে, কতটুকুই বা বেতনভোগী লোকেরা লিখিয়া দেয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কৃত্তিবাস নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যেথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার। সাহিত্যের সেবকদের গৌরবটুকুতে লক্ষ্মীর বরপুত্রদের লোলুপদৃষ্টি না পড়িলেই ভাল। অথবা, হয় ত ইহাতে তাহাদের ততটা দোষ নাই। চাটুকারেরাই লম্বশাটপটাবৃত লোক খুঁজিয়া বেড়ায়। কারণ যাহাই হউক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কতকগুলি তথাকথিত সেবকের চাটুকারিতা লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিতেছে।

লর্ড কিচেনারের মৃত্যু।

লর্ড কিচেনারের মৃত্যুতে ইংলণ্ড ও তাহার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ দেশসকল ক্ষতিগ্রস্ত হইল। প্রকাশ এইরূপ, যে, রুশিয়ার তাঁহার পরামর্শ লইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, এই জন্য তিনি জলপথে রুশিয়া যাইতেছিলেন। জাহাজডুবি হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আগেকার কালে কোন পক্ষের সেনাপতির মৃত্যু হইলে, একজন মহারথীর মৃত্যু হইলে, সে পক্ষের পরাজয় হইবার খুব সম্ভাবনা হইত। আজকাল-কার যুদ্ধ অন্যপ্রকারের। কিচেনারের মত বিখ্যাত যোদ্ধা ইংলণ্ডে আর নাই বটে, কিন্তু তিনি যতদিন রুশিয়ায় অনুপস্থিত থাকিবেন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, তত দিনের মত বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছিলেন; এবং ইংলণ্ডের বৃহৎ সৈন্যদলও গঠন তিনি করিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া, কিচেনার "মায়ের এক ছেলে" ছিলেন না। ব্রিটানিয়ার আরও অনেক নেতৃগুণশালী সন্তান আছেন, যাঁহারা কাজ চালাইতে পারিবেন। সুতরাং কিচেনার নাই বলিয়াই ইংলণ্ডের বা মিত্রপক্ষের পরাজয় হইবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

য়ুআন-শি-কাইয়ের মৃত্যু।

চীন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়ক য়ুআন-শি-কাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার ফল কি হইবে, বলা কঠিন। সম্রাট্ নাম লইয়া তিনি চীনের সিংহাসনে আরোহণ করিবার সংকল্প করায় তথায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং কয়েকটি প্রদেশ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বিদ্রোহ প্রশমিত এবং সমুদয় প্রদেশের একরাষ্ট্রে পুনর্ব্বার সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। দেশে শান্তি স্থাপন, সমুদয় প্রদেশকে সম্মিলিত করা, এবং চীনের উপর জাপানের প্রভুত্বস্থাপন-চেষ্টা ব্যর্থ করা, এই তিনটি কঠিন কাজ করিবার মত সামর্থ্য চীনদেশীয় নেতাদের আছে কি না জানি না। এইরূপ শক্তি থাকিলে চীনের, এশিয়ার ও পৃথিবীর ইতিহাস যেরূপ হইবে, তাহা কল্পনা করিতে ভাল লাগে; না থাকিলে যাহা হইবে, তাহা ভীষণ। বর্ত্তমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভাঙিয়া গলাইয়া নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবার জন্য এরূপ আগুনের প্রয়োজন আছে কি না, বুঝা যাইতেছে না। যাহাই ঘটুক, আশ্বাসের কথা এই যে মহাযুদ্ধে ও মহাবিপ্লবেও মানুষের আত্মা বিনষ্ট হয় না।

"সাহিত্য-পঞ্জিকা।"

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার একটি বার্ষিক "সাহিত্য-পঞ্জিকা" বাহির করিবেন। অনুষ্ঠানপত্রে লেখা হইয়াছে, ইহা চারি ভাগে বিভক্ত হইবে। "(১) বঙ্গীয় জীবিত লেখকগণের নাম, ঠিকানা, পুস্তকের নাম, পুস্তক উপন্যাস কি ইতিহাস, অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীর, পুস্তকের সংস্করণ, ইত্যাদি। (২) এই বৎসরের সাময়িক পত্রিকাদির উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সারাংশ। (৩) বঙ্গভাষায় প্রকাশিত সকল পত্রিকাদির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। (৪) বঙ্গে পাঠাগারাদির তালিকা।" "সাহিত্য-সম্মিলনে (বঙ্গীয়, উত্তরবঙ্গীয়, অন্যান্যে) যাঁহারা সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের ছবি প্রদত্ত হইবে। সাহিত্যসম্মিলনগুলিরও ছবি দেওয়া হইবে। অপর কোন গ্রন্থকার ছবি দিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকে ছবি প্রস্তুতের ব্যয়, আর্ট-পেপারের মূল্য ও ছবি ছাপাইবার খরচ দিতে হইবে।" এরূপ বার্ষিক বহির প্রয়োজন আছে। যদি যোগীন্দ্র বাবু ঠিক্ ঠিক্ খবর পান, তাহা হইলে ইহা দ্বারা অনেকের কৌতূহলও তৃপ্ত হইবে। ছবি সম্বন্ধে ব্যবস্থাটা আমাদের ভাল লাগিল না। কোন আত্মমর্যাদা-বিশিষ্ট গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিজব্যয়ে ছবি সন্নিবিষ্ট করিয়া "খেলো" হইতে চাহিবেন কি না, বলিতে পারি না। যাঁহারা সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি ও অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই যদি বাস্তবিক বঙ্গের জীবিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন, তাহা হইলেও অন্য সকল সাহিত্যিককে প্রকারান্তরে ছাপার কালীতে তুলনায় নিকৃষ্ট বলা তাঁহাদের পক্ষে সুখকর না হইতেও পারে। অবশ্য, কাহারও অগৌরব হয়, যোগীন্দ্রবাবুর ইহা অভিপ্রায় নয়। কিন্তু অনুষ্ঠান-পত্রে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ সাহিত্যিককে খুব সম্মান দেখান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যোগীন্দ্র বাবু নিজব্যয়ে যে-সব ছবি দিবেন, তাহার উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলেই ভাল হইত। তাহা একটুও দোষের কথা হইত না। তাঁহার বহিতে ছবি বাহির হওয়া এমন কিছু বড় সম্মান নহে যে তাহার জন্য টাকা খরচ করিতে হইবে। যাহা ১০।১৫ টাকা খরচ করিলে পাওয়া যায়, তাহার মূল্যই বা কি? তাহা বিজ্ঞাপন ভিন্ন আর কিছু নয়।

ভারতবর্ষে শিক্ষার অবস্থা।

১৯১৪-১৫ সালে ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, কোন্‌দিকে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ একটি রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠশালা পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষালয়ে ১৯১৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ ব্রিটিশ ভারতে মোট ছাত্র ও ছাত্রী ছিল ৭৪,৪৮,৪১৯। ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র অধিবাসীর সংখ্যা ২৪,২৯,৮৮,৯৪৭। অতএব দেখা যাইতেছে যে যাহারা ক খ পড়ে ও যাহারা এম্-এ পড়ে, সকল ছাত্র জড়াইয়া সমগ্র অধিবাসীর শতকরা তিনজন মাত্র শিক্ষা পাইতেছে। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করা যাক। আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের সমুদয় অধিবাসীর শতকরা ২১·২২ জন শিক্ষাধীন। অর্থাৎ

আমাদের চেয়ে সে দেশে শিক্ষার বিস্তার সাত-গুণ বেশী! আরও এ দেশে, যাহারা কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে, তাহারাই ১৯০৯ সালে সমগ্র অধিবাসীদের তুলনায় শতকরা ১৫৬ জন ছিল। কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর এইরূপ সংখ্যা ১৯১১ সালে অষ্ট্রিয়ায় ছিল ১৫·৩০, জার্মেন সাম্রাজ্যে ১৬·৩০, ইংলণ্ড-ওএলসে ১৬·৮৪, স্কটলণ্ডে ১৭·৭৪, আয়ার্লণ্ডে ১৬·১৬, হল্যাণ্ডে ১৫·৪২, এবং জাপানে ১৩·১৬। আরও অনেক দেশের সংখ্যা বাহুল্য-ভয়ে দিলাম না। এই-সব দেশের উচ্চতর বিদ্যালয়-সকলে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা পড়ে, তাহাদের সংখ্যা ধরিলে শতকরা অঙ্ক আরও উচ্চ হয়। এখন ভাবিয়া দেখুন, আমাদের দেশে শিক্ষার কিরূপ দুরবস্থা।

ভারতবর্ষ কত বড়?

যে শুধু লিখিতে ও পড়িতে পারে তাহাকে শিক্ষিত বলা ঠিক্ নয়। যাহা হউক, এরূপ লোকদিগকেও শিক্ষিত বলিয়া ধরিলে ভারতবর্ষে ১,৮৫,৩৯,৫৭৮ জন শিক্ষিত লোক আছে। কোন পরিবারের শক্তি কিরূপ, উপার্জ্জন-ক্ষমতা কিরূপ, তাহা স্থির করিতে হইলে শুধু পরিবারের লোকসংখ্যা গণনা করিলে চলে না। শক্তির হিসাবে খোঁড়া-নুলোকে বাদ দিতে হয়; উপার্জ্জনের হিসাবে অকর্ম্মা লোকদিগকে বাদ দিতে হয়। সভ্যজগতের সহিত কোন দেশের শক্তির তুলনা করিতে গেলে অশিক্ষিত লোকদিগকে বাদ দিতে হয়। তাহারা এক হিসাবে অঙ্গহীন লোকদের মত।

শুধু লোকসংখ্যা হিসাবে ভারতবর্ষ খুব বড় দেশ বটে। কিন্তু বড় হইলেও ইহা যে কেন এত শক্তিহীন, তাহা কেবল শিক্ষিত লোকগুলিকে ধরিলেই বুঝা যায়। পৃথিবীতে এমন অনেক সভ্য দেশ আছে, যেখানে নিতান্ত শিশু ছাড়া আর সকলেই লিখিতে পড়িতে পারে। সেই সব দেশের সঙ্গে তুলনায় ভারতবর্ষ একটি ছোট দেশ যাহার লোক সংখ্যা ১,৮৫,৩৯,৫৭৮। স্পেনের লোক-সংখ্যা ২ কোটি, "শিক্ষিত" ভারতবর্ষের চেয়ে কিছু বেশী। সকল স্পানিয়ার্ড শিক্ষিত নয়। কিন্তু স্পেনের সমান ক্ষমতাও ভারতবর্ষের নাই। উপনিবেশসমেত পোর্টুগ্যালের লোকসংখ্যা ১,৬০,০০,০০০। কিন্তু ভারতবর্ষ পোর্টুগ্যাল অপেক্ষাও শক্তিহীন। ডেনমার্কের লোকসংখ্যা মোটে ২৮ লক্ষ। ভারত উহা অপেক্ষাও দুর্ব্বল। যদি ভারতবর্ষের ১,৮৫,৩৯,৫৭৮ জন শিক্ষিত ব্যক্তি একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র দেশে একজোট হইয়া বাস করিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই অন্ততঃ ডেনমার্ক, পোর্টুগ্যাল, স্পেনের মত শক্তিশালী হইতে পারিত, এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত। তাহারা বর্ত্তমান অবস্থায় কেন যে ঐরূপ শক্তিশালীও নয়, তাহার কারণ তাহারা বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে ছড়াইয়া আছে, জমাট বাঁধিয়া নাই। অপর কারণও আছে। কতকগুলি সুস্থসবল লোককে যদি শীঘ্র শীঘ্র গন্তব্য স্থানে যাইতে হয়, তাহা হইলে তাহারা দ্রুত চলিয়া বা দৌড়িয়া তথায় যাইতে পারে। কিন্তু তাহাদিগকে যদি অনেক খোঁড়া, অসুস্থ, দুর্ব্বল লোককে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে তাহারা দৌড়িতে ত পারেই না, তাহাদিগকে আস্তে আস্তে, হয়ত অনেককে কাঁধে করিয়া, চলিতে হয়। ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকদের চেয়ে অশিক্ষিত লোকদের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় অবস্থাটা ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে।

নূতন কলেজের প্রয়োজন।

প্রতিবৎসর বিস্তর ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইতে চান; কিন্তু বর্ত্তমান কলেজ-গুলিতে যথেষ্ট স্থান না থাকায় তাহারা কলেজে কলেজে ঘুরিয়া বেড়ায়। শেষ পর্য্যন্ত কতকগুলির স্থান হয় না। তা ছাড়া প্রত্যেক কলেজেই এত বেশী ছাত্র ভর্ত্তি হয়, যে, তাহাতে তাহাদের পড়াশুনাও ভাল হয় না, এবং স্বাস্থ্যও খারাপ হয়। বঙ্গের খুব অস্বাস্থ্যকর যে-সব শহরে কলেজ আছে, তথাকার অবস্থা হয় ত এরূপ নয়; কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্র কলিকাতার অবস্থা এইরূপ। কলিকাতায় শিক্ষার সুবিধা বেশী, শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের সংখ্যা কলিকাতায় যত অন্যত্র তত নয়, কলিকাতা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর,—এই-সব কারণে এখানে ছাত্রের ভীড় বেশী হওয়া স্বাভাবিক। এই ভীড় কমাইবার উপায় আরও কলেজ স্থাপন। কিন্তু তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের মত নাই দেখিতেছি। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় কলিকাতায় একটি ছাত্রাবাসসমন্বিত কলেজ করিবার জন্য

চেষ্টিত ছিলেন। বাড়ী ও বার্ষিক ২৪,০০০ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সীণ্ডিকেটের মত হইল না। তাহার সমস্ত কারণ প্রকাশ পায় নাই। দু-একটা যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যথেষ্ট মনে হয় না। একজন ফেলো নাকি বলিয়াছেন, কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে কলেজ হইলে ছাত্রদের সহিত গোরাদের সংঘর্ষ, অতএব সংঘর্ষ ও মারামারি হইবে। অনেক ছাত্র ত ঐ ষ্ট্রীটের মিউনিসিপাল মার্কেটে যায়, চাঁদনী বাজারে যায়, ইডেনগার্ডেনে বেড়ায়, ময়দানে বেড়ায়, ময়দানে ফুটবল খেলা দেখিবার জন্য সমাগত জনতার মধ্যে থাকে। এই সব জায়গায় গোরাদের খুব গতিবিধি আছে। কিন্তু মারামারি ক'টা হয়? আর একজন ফেলো বলিয়াছেন যে কলিকাতায় ছাত্রদের মধ্যে ক্ষয়কাশ রোগ হইতেছে, অতএব আর একটা কলেজ করা উচিত নয়। ক্ষয়কাশ যে কি পরিমাণে হইতেছে, তাহার কোন প্রমাণ তিনি দেন নাই। তিনি নিজে চিকিৎসকও নহেন। কিন্তু যদি হয়ই, তাহা হইলেও ঐ রোগ ত অন্য শহরেও হয়। তবে কি ছেলেদের লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে? তাহাদের খাদ্যের প্রতি, বাসগৃহের প্রতি, অঙ্গচালনার দিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু একটা আবছা আবছা ধারণার ভয়ে শিক্ষা বিস্তারে বাধা দেওয়া যাইতে পারে না। আর-একটা কলেজ বাড়িলে অন্য কলেজগুলিতে ভীড় বাড়িবে না, বরং কমিতে পারে। তাহাতে ক্ষয়রোগের সম্ভাবনা কমিবারই কথা। প্রস্তাবিত কলেজের জায়গাটি ভাল, বাড়ীটি ভাল। তথায় ক্ষয়রোগ হইবার সম্ভাবনা কলিকাতার অন্য অনেক পাড়া অপেক্ষা কম। সুতরাং এ রকম যুক্তির মূল্য বুঝা যায় না।

কর্ত্তৃপক্ষ নিজেরাও যথেষ্ট-কলেজ স্থাপন করিবেন না, অপরকেও স্থাপন করিতে দিবেন না, এ-বড় চমৎকার বন্দোবস্ত। কেহ কেহ এমন অদ্ভুত কথাও বলেন যে দেশে উচ্চ শিক্ষার বড় বেশী বিস্তার হইয়াছে, আর দরকার নাই। যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহারা হয় অন্য দেশের খবর রাখেন না, কিম্বা রাখিয়াও আমাদিগকে মূর্খ রাখিবার জন্য মিথ্যা কথা বলেন। বিলাতের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের কথা সমর্থন করিতেছি।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়ার্লণ্ড, ওয়েল্‌স্; সর্ব্বত্রই লেখাপড়া এবং কেতাবী শিক্ষা ছাড়া আরও নানারকমের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তদ্দ্বারা লোকে শিল্প, বাণিজ্য, কল-কারখানা, যুদ্ধ, প্রভৃতি নানা বিভাগে কাজ করিতে শিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। আমাদের দেশে লোকে প্রধানতঃ লেখাপড়াই শিখে, এবং কেরাণী, শিক্ষক, উকীল ও ডাক্তার হয়, জনকতক এঞ্জিনীয়ার হয়। বিলাতে কেতাবী শিক্ষা ছাড়া আরও শিক্ষা ও উপার্জ্জনের কত পথ থাকা সত্ত্বেও ১৯১৩-১৪ সালে ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির ছাত্র ছিল ২৪,০১০। ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা ৩,৪০,৪৫,২৯০। বঙ্গে ১৯১৩-১৪ সালে কলেজগুলিতে ছাত্র ছিল ১৮,০১৭। কিন্তু বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪,৫৪,-৮৩, ৭৭। হিসাব করিয়া দেখুন বঙ্গে আরও কত বেশী কলেজ ও কলেজের ছাত্র হইলে শুধু কেতাবী উচ্চশিক্ষায় ইংলণ্ডের মত হইতে পারা যায়। স্কটলণ্ডের লোকসংখ্যা ৪৭,৬০,৯০৪; কিন্তু তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা ৭,৫৫০। বঙ্গের লোকসংখ্যা স্কটলণ্ডের নয় গুণেরও বেশী। স্কটলণ্ডের মাপকাঠি অনুসারে বঙ্গের কলেজগামী ছাত্রদের সংখ্যা হওয়া উচিত অন্যূন ৭২,০০০। তাহার জায়গায় আছে আঠার হাজার। যাহা আছে তাহার চারিগুণ হইলে তবে আমরা কেতাবী শিক্ষায় স্কটলণ্ডের সমান হইতে পারি। বিদেশের মধ্যে বিলাতের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক বেশী। এইজন্য বিলাতের দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। অনেকে, কেন জানি না, বাঙালী-দিগকে ভারতবর্ষের স্কচ্ বলে। কিন্তু শিক্ষায় আমরা স্কচ্‌দের মত অগ্রসর নই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বতন্ত্র শহর।

প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন আগে ছেলেরা ধর্ম্মঘট করায়, এবং অধ্যাপক ওটেন কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি-কর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়ায়, প্রেসিডেন্সী কলেজে ছেলেদের বিনয়ের (disciplineএর) অবস্থা কিরূপ তাহার তদন্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র শহর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার একটি প্রস্তাব আছে। এরূপ প্রস্তাব করিবার

সমুদয় কারণ রিপোর্টে লেখা নাই; গবর্ণমেণ্টও যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটা স্বতন্ত্র নগর পত্তন করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কম। রিপোর্টে ছাত্রদের নামে যে-সকল দোষ আরোপ করা হইয়াছে, তাহা গত দশবৎসরের রাজনৈতিক আন্দোলনজনিত উত্তেজনা এবং বিপ্লববাদী ও অরাজকতাবাদীদিগের (revolutionaries and anarchists) মত প্রচারের অন্যতম ফল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এইসকল প্রভাব হইতে ছাত্রদিগকে দূরে রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়-প্রধান শহর স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। আমরা অন্যান্য সর্ব্ববিধ উচ্ছৃঙ্খলতা, পাগলামি ও দুর্বৃত্ততার ন্যায় রাজনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা, পাগলামি ও দুর্বৃত্ততার বিরোধী; কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনমাত্রকেই দূষণীয় মনে করি না; এবং ছাত্রদের রাজনীতির সহিত কোন সংস্রব রাখা উচিত নহে, এরূপও মনে করি না। তবে, তাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে মুরুব্বি, নেতা, বা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের দলভুক্ত হইবে, ইহাও ঠিক মনে করি না।

ছাত্রেরা কেবল বহি পড়িয়া পাস করিলেই তাহাদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাহাদিগকে ভবিষ্যতে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া দেশের কাজ করিতে হইবে। সুতরাং জাতীয় জীবনের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত হইয়া থাকিলে তাহাদের চলিবে না। দেশহিতৈষণা-মন্ত্রে দীক্ষা বাল্যে ও যৌবনেই তাহাদিগকে লাভ করিতে হইবে। সুতরাং জাতীয় জীবন-প্রবাহের টান হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র শহর কল্পনা আমরা সুকল্পনা বলিয়া মনে করি না। তদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-প্রধান স্বতন্ত্র শহরে রাখিয়া ছেলে পড়াইতে কেবল সম্পন্ন লোকেরাই পারেন। অধিকাংশ লোককে শিক্ষার সুবিধা দিতে হইলে প্রত্যেক বড় শহরে কলেজ থাকা দরকার।

বাস্তবিক, কমিটির অভিপ্রেত জাতীয় জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য, সাংসারিকসম্বন্ধবিহীন, "সন্ন্যাসী"-শহর পৃথিবীতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থাপিত নাই। ইংলণ্ডের অক্সফর্ড ও কেম্ব্রিজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এখানে প্রভুত্ব করেন। ছাত্রদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া পাপপথে লইয়া যাইতে পারে, এরূপ কলুষিত-চরিত্র নরনারীকে এখান হইতে কর্ত্তৃপক্ষ তাড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু এই দুটি শহরও কমিটির প্রস্তাবিত শহরের মত নয়। কারণ এখানে রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ বস্তু নয়। রাজনৈতিক উত্তেজনা, দলাদলি এখানে খুব আছে ও হয়। বিশ্ববিদ্যালয় দুটি হইতে পার্লেমেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়, এবং তদুপলক্ষে উত্তেজনা উন্মাদনার অভাব হয় না।

অক্সফর্ড ও কেম্ব্রিজের আদর্শ কোন কোন বিষয়ে সেকেলে; উহারা কিছুদিন হইতে ক্রমশঃ আধুনিক আদর্শ অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইংলণ্ডে নূতন যত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কোনটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ম্মিত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোন শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; যথা—ডর্হাম, লণ্ডন, ভিক্টোরিয়া (ম্যাঞ্চেষ্টার), বার্মিংহাম, লিভারপুল, লীড্‌স্, শেফীল্ড, এবং ব্রিষ্টল। লণ্ডন এবং আরও কোন কোন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোন বিষয়ে অক্সফর্ড ও কেম্ব্রিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেম্ব্রিজের সীনিয়র র‍্যাংলার অধ্যাপক পরাঞ্জপ্যে সংপ্রতি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এক অধিবেশনে প্রসঙ্গতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করেন।* অক্সফর্ড কেম্ব্রিজের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শহরে বাস করিয়া লেখা-পড়া না শিখিলে যদি ভাল শিক্ষা না হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ধনী, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, নিজেদের মত অনুসারে কাজ করিতে সক্ষম স্বাধীন লোকেরা নিশ্চয়ই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্বতন্ত্র শহর ও প্রতিষ্ঠিত করিত। কিন্তু তাহা তাহারা করে নাই। শুধু ইংলণ্ডেই যে উচ্চশিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার অক্সফর্ড কেম্ব্রিজের নজীর অনুসরণ করে নাই, তাহা নয়। লণ্ডনের মত জার্মেনী, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, জাপান, প্রভৃতি দেশসকলের রাজধানীতে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সমুদয় সভ্যদেশে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণ শহরসকলেই স্থাপিত হইয়াছে। লণ্ডন, পারিস, বার্লিন, তোকিয়ো, নিউ ইয়র্ক, প্রভৃতি শহরে রাজনৈতিক আন্দোলন, বিপ্লববাদ, প্রলোভন, কলিকাতা অপেক্ষা কম নয়। তথাপি বাগ্‌দেবী এই-সকল বৃহৎ শহরকে পরিত্যাগ করেন নাই। ছাত্রদিগকে প্রলোভনের মধ্যে, বিপ্লববাদের আড্ডায় ফেলিয়া দিতে বলিতেছি না। কিন্তু পৃথিবীর অন্য সব দেশে যেরূপ উপায়ে ছাত্রগণকে প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা করা হয়, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করা হয়, এদেশেও তাহাই করা উচিত। ছাত্রগণকে ভবিষ্যতে এই ভালমন্দপূর্ণ সংসারেই থাকিতে হইবে। এখানেই তাহাদিগকে রাখিয়া, প্রধানতঃ উচ্চ আদর্শে দীক্ষা দ্বারা, তাহাদিগকে সৎপথে রাখিতে হইবে। ইহা করিও না, উহা করিও না, বলার প্রয়োজন আছে; কিন্তু তদপেক্ষাও বেশী আবশ্যক তাহাদিগকে এমন কিছু হইতে ও করিতে বলা যাহাতে তাহাদের প্রাণ মাতে এবং যাহা পাপশক্রর বিরুদ্ধে ধর্ম্মের কাজ করিতে পারে।

রাজধানীতে যে কেবল কতকগুলি কলেজ, ছাত্র,

* "He took great pride in Cambridge University where he had studied, but they could not overlook the fact that the London and some of the provincial universities were in some respects superior to Oxford and Cambridge." *India*, May 4, 1916, p. 199.

অধ্যাপক, লাইব্রেরী ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার আছে, তাহা নহে। এখানে মানবজীবনের নানা বিভাগ, নানা দিক দেখিবার সুযোগ আছে। এখানকার বিচারালয়, বড় বড় দোকান, কলকারখানা, দুর্গ, ট্রাম, টেলিফোন, জাহাজ, ডক্, জেটি, এ-সকল হইতে বিস্তর জিনিষ শিখিতে পারা যায়। আমরা যে শিখি না, ছেলেদের শিখাই না, তাহা আমাদের দোষ। এখানকার মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, উদ্ভিদবিদ্যার উদ্যান, ও চিত্রশালায় শিক্ষার অসামান্য উপাদান ও উপায়-সকল সংগৃহীত রহিয়াছে। ইহা হইতে শিক্ষা দিবার আয়োজন যে করি না, তাহাও আমাদের দোষ। এখানকার বড় বড় বিচারক, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসক, ধর্ম্মাচার্য্য, নরহিতসাধক, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রভৃতি যত-প্রকারে ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, তাহা তাহাদের পক্ষে সুগম করিয়া দিবার কোন ব্যবস্থা কি আমরা করিয়াছি? অন্ধদের বিদ্যালয়, বধিরমূকদের বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম, চিররুগ্নদের সেবাশ্রম, প্রভৃতি হিতসাধক প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষা লাভ করিতে ছাত্রছাত্রীদিগকে আমরা কি উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকি? বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নূতন করিয়া সৃষ্ট একটি শহরে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষালাভের এইরূপ ও অন্য নানাবিধ আয়োজন করা সম্ভবপর নহে।

গত দশ বৎসরের রাজনৈতিক আন্দোলনে কেবল কুফলই ফলিয়াছে, ইহা সত্য নহে। যাঁহারা দেশের জীবন-প্রবাহ হইতে দূরে বাস করেন না, দেশের কাজের সঙ্গে কিছু কিছু সম্পর্ক রাখেন, তাঁহারা জানেন, গত দশ বৎসরে আমাদের এবং যুবকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা (civic consciousness) ভাল করিয়া দেখা দিয়াছে। কষ্ট স্বীকার করিয়া, স্বার্থত্যাগ করিয়া সেবা করিবার ইচ্ছা অধিকতর লোকের মধ্যে দেখা যাইতেছে, ও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে। শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্ত দেখিলে চলিবে না। সেবার জন্য বিনা বাক্যব্যয়ে বাধ্যতা, কষ্টস্বীকার এবং বিপদ্‌কে অগ্রাহ্য করার দৃষ্টান্তও ত রহিয়াছে।

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়।

আমরা এই বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি।

"অন্ধদিগকে লেখাপড়া ও জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিল্প ও গীতবাদ্যাদি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রায় ২০ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত লালবিহারী শাহ কর্তৃক এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রগণ প্রাথমিক ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারে। এতদ্ব্যতীত শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ্‌-রাইটিং শিক্ষা দেওয়া যায়। লেখাপড়া শিক্ষার পর অধিক বয়সে যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা হীন হইয়াছে, তাঁহারাও টাইপ্‌রাইটিং বিভাগে যোগ দিয়া পুনরায় উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারেন। সাধারণ ছাত্রের জন্য বেতন মাসিক তিন টাকা। বিদ্যালয়সংক্রান্ত একটি ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে; অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্রাবাসেই থাকেন। ছাত্রাবাসের মাসিক ব্যয় দশ টাকা। কোন কোন ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড স্থানীয় বালকদের এই ছাত্রাবাসে অবস্থিতি ও পাঠের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। দরিদ্র বা নিরাশ্রয় ছাত্রের ভার বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের অন্ধ পুত্র বা কন্যা আছে, তাঁহারা তাহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল, উপার্জ্জনক্ষম ও জীবনে যৎকিঞ্চিৎ সুখী হইতে সহায়তা করিবেন, আমরা এমত ভরসা করি। কেহ যদি বাড়ীতে পড়াইতে চান, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ সেইমত ব্যবস্থা করিতে পারেন। বিশেষ বিবরণের জন্য ২২২নং লোয়ার সার্কুলার রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা, ঠিকানায়, সুপারিণ্টেনডেণ্ট, অন্ধ বিদ্যালয়, এই নামে পত্র দিবেন।"

সতীর বীরত্ব।

মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে বেল্‌সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী বনে বাঘ শিকার করিতে যান। একটা বাঘকে বেল্‌সাহেব গুলি করিবার পর সেটা পলাইয়া যায়। অনুচর ও সঙ্গীদের নিষেধসত্ত্বেও বেল্‌সাহেব তাহার অনুসরণ করেন। তাঁহার স্ত্রীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান। বেল্‌সাহেব কতকদূর যাইবার পর একটা ঝোপ হইতে বাঘ তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়ে, এবং তাঁহাকে ফেলিয়া তাঁহার পেট চিরিয়া দেওয়ায় অন্ত্র বাহির হইয়া পড়ে। বাঘ তাঁহার নিতম্বদেশের হাড় চিবাইয়া পিষিয়া দেয়, এবং সেখানে মুখ দিয়া রক্ত পান করিতে থাকে। বাঘ কিম্বা শিকারী কোন শব্দ না করায় বিবি বেল্ দূর হইতে এই ভীষণ ব্যাপার ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই এই লোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তাহাতে আত্মহারা না হইয়া বাঘটাকে লক্ষ্য করিয়া নিজের হাতের ছোট বন্দুক হইতে গুলি ছুড়িলেন। কিন্তু গুলি লাগিল না। বাঘ তখনও তাঁহার স্বামীকে ছাড়ে নাই, তাঁহার রক্ত পান করিতেছে। তিনি তখন জন্তুটাকে বন্দুকের ঘা ও লাথি মারিতে লাগিলেন। অবশেষে বাঘটা ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। সতী তখন স্বামীর অন্ত্র যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া পেট ও অন্যান্য ক্ষত বাঁধিয়া দিলেন, এবং মাতা যেমন শিশুকে বহন করে, তেমনি করিয়া স্বামীকে বহন করিয়া ১৮ মাইল পথ চলিয়া নিকটতম রেলওএ ষ্টেশনে গিয়া চিকিৎসকের সাহায্যের জন্য টেলিগ্রাফ করিলেন। কিন্তু স্বামীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ধন্য এই সতীর প্রেম, সাহস ও শক্তি!

বংশোন্নতিবিজ্ঞান ও পাত্রনির্ব্বাচন

বিবাহের নির্ব্বাচিত পাত্র কিরূপ হইলে ভাল হয় সে সম্বন্ধে সেকালের কথা ছিল—

কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।

আজকালকার কথা হইয়াছে—'বাপের পয়সা, ছেলের পাশ'। এখানে ছেলের পাশ অর্থে পাত্রের বিদ্যা বুঝিলে ভুল হইবে। ছেলে যদি পাশ না করিয়া বাড়িতে বসিয়া একটা লাইব্রেরি পড়িয়া ফেলে তা হইলেও সে মনোমত পাত্র হইবে না। আর যাঁরা অনেক গ্রাজুয়েটের সঙ্গে মিশিয়াছেন তাঁরা নিশ্চয় আমার সঙ্গে বলিবেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী মূর্খের সংখ্যা আমাদের দেশে নিতান্ত কম নয়।

আসল কথা হইতেছে, সব জিনিসের চেয়ে টাকার উপর লোকের ভক্তি বাড়িয়াছে। ছেলের বাপের পয়সা থাকে উত্তম; তা না হইলে ছেলে নিজে টাকা উপায় করা চাই। বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলে পাশ না করিলে উপায় করিতে পারে না—তাই ছেলের পাশ থাকা দরকার।

সেকালে কিন্তু অন্যরূপ ছিল। কন্যার পিতা চাইতেন পাত্রের বিদ্যা—সে বিদ্যার সঙ্গে ধনের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। তখনকার সমাজে বিদ্যার যথেষ্ট সম্মান ছিল। পুরাকালে রাজারা যেমন দিগ্বিজয়ে বেরুতেন, মুসলমান আমলে পণ্ডিতেরাও তেমনি দিগ্বিজয়ে বেরুতেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নাম দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইয়া যাইত। তিনি যে বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন সমস্ত হিন্দুসমাজ অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিত। তখনকার শ্রাদ্ধবাসরে ও বিবাহ-সভায় শাস্ত্রীয় বিচার হইত, এখনকার মত কার কত টাকা আছে তার আলোচনা হইত না।

বান্ধবগণ বা আত্মীয়গণ চাইতেন পাত্রের কুল ভাল হইবে। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি যে কৌলিন্যপ্রথার মূলে বংশোন্নতিবিজ্ঞান ছিল কিন্তু লোকের অজ্ঞতার জন্য কৌলিন্যপ্রথা অনেক সময় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।*

* প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২০, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে জীবতত্ত্বের প্রয়োগ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কন্যা প্রার্থনা করিতেন পাত্রের রূপ এবং মাতা প্রার্থনা করিতেন অর্থ। বলাই বাহুল্য আমাদের দেশের সেকালের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবুদ্ধিতে হীন ছিলেন এবং সেইজন্য পাত্রনির্ব্বাচনে তাঁদের মতের মূল্য অতি অল্প ছিল। পিতা এবং অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়গণই পাত্র নির্ব্বাচন করিতেন।† দেখা গেল তাঁরা চাইতেন পাত্রের বিদ্যা এবং কৌলিন্য, কাজেই বলিতে হইবে পাত্রনির্ব্বাচন-বিষয়ে এই দুইটিই প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইত।‡

আজকালকার সমাজে বিদ্যা ও বংশগৌরবের উপর যে ধনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইয়াছে তার প্রধান কারণ আগেকার চেয়ে এখন ধনের প্রয়োজন অনেক বাড়িয়াছে, আগে মোটা ভাত মোটা কাপড় সকলেরই জুটিত, আজকাল কিন্তু অন্নবস্ত্রের সংস্থান বাঙালীজীবনের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লীগ্রামগুলি ম্যালেরিয়ায় বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই যাঁর অর্থ আছে তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর সহরে বাস করিতেছেন। সহরেতেও এমনি ব্যাপার যে রৌদ্র ও বাতাস পর্য্যন্ত পয়সা দিয়া কিনিতে হয়। তোমার পয়সা থাকে তুমি বেশি খরচ করিয়া রোদ ও বাতাসওয়ালা ভাল বাড়িতে থাকিতে পাইবে, নহিলে দুর্গন্ধপূর্ণ অন্ধকারময় বাড়িতে থাকিয়া তোমার পরিবারবর্গ রোগে ভুগিবে। এদিকে অর্থাগমের পথ বড়ই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যের মূল্য ততই বাড়িয়া যাইতেছে। তার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে থাকিয়া আমাদের অনেক নূতন অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে গোলমাল আরও বর্দ্ধিত হইতেছে।

এরূপ অবস্থায় যে কন্যার পিতা প্রথমেই—পাত্রের ধনশালিতার প্রতি লক্ষ্য করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অনেক যুবক টাকা রোজগার করিতে অক্ষম। কাজেই ধনী পাত্রের অভাবে উপায়ক্ষম দোজবরে, তেজবরে, বুড়ো

† আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের মতে পাত্রনির্ব্বাচন-বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে কন্যার পিতার অধিকার, পিতা অবর্ত্তমানে পিতামহ, পিতামহ অবর্ত্তমানে ভ্রাতা, ভ্রাতা অবর্ত্তমানে জ্ঞাতি (সকুল্য), জ্ঞাতি অবর্ত্তমানে সর্ব্বশেষে মাতার অধিকার। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা দ্রষ্টব্য)

‡ স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিলেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। মনুসংহিতার "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা।" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বরেরও কনের অভাব হয় না—মেয়ের বাপ ভাবেন তবুত মেয়েটা ডুনেনা ডুমুটো খেতে পাবে। আর একটা কথা। যখন ভরণপোষণক্ষম পাত্রের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে তখন যে-সকল যুবক কষ্টে সংসার প্রতিপালনে সমর্থ হইয়াও সে কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বা বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহে পরাঙ্মুখ হন তাঁরা সমাজের নিকট অপরাধী। যাঁরা কোনও উচ্চকার্য্যের জন্য কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করেন তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

এখন দেখা যাক পাশকরা ছেলে আর পয়সাওয়ালা বাপের ছেলে এই দুইএর মধ্যে কোন্‌টি ভাল। যে পাশ করিয়াছে সে অনেকদিন আমোদপ্রমোদে না মাতিয়া পরিশ্রম করিয়া গিয়াছে—অতএব সে পরিশ্রমী ও সচ্চরিত্র এবং বুদ্ধিমান হওয়াও সম্ভব। এই ছেলে বড় হইয়া ব্যবসা বা চাকরি আরম্ভ করিলে চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে পারিবে কি না বলা যায় না, তবে পাশ-না-করা ছেলের চেয়ে তার আমোদপ্রমোদ কিছু পবিত্র হওয়ার কথা। আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাঁরা ভয়ে পড়িয়া নিজের চরিত্র যথাসম্ভব পবিত্র রাখিতে বাধ্য হইবেন। তবে পাশকরা ছেলের এক বিপদ আছে যে হয়ত অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে তার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, হয়ত ক্ষয়রোগ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। এইজন্য মনে হয়, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাপক্ষের কর্ত্তব্য ডাক্তার দিয়া পাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা। অনেকে হয়ত কথাটা শুনিয়া হাসিবেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কথাটার মধ্যে অন্যায় কিছুই নাই। পাশ্চাত্যদেশে একথা অনেক সমাজবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বলিতেছেন। কিন্তু সেদেশে এ প্রথার প্রচলন বড়ই দুরূহ, কেননা সেখানে পাত্রপাত্রীরা স্বয়ংই প্রেমের সাহায্যে নির্ব্বাচন কার্য্য সমাধা করেন। আমাদের দেশে যখন সে নিয়ম নাই—পিতা যখন অনেক দিন দেখিয়া শুনিয়া কন্যার বর ঠিক করেন তখন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান কিজন্য কঠিন হইবে বুঝিতে পারি না। ক্ষয়রোগাক্রান্ত গ্রাজুয়েটের হস্তে কন্যাসম্প্রদান করিতে দেখিয়াছি বলিয়াই এত কথা লিখিলাম।

পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে ভাল লেখাপড়া না করিলে নানা দোষের আকর হইয়া পড়ে। কুচরিত্র হইয়া শুধু যে পত্নীর মনঃপীড়ার কারণ হয় এবং পিতৃসঞ্চিত অর্থ উড়াইয়া দিতে পারে, তা নয়, উপরন্তু রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বীয় পত্নী ও সন্তানগণের মধ্যেও সেই রোগ ছড়াইয়া দেয়। এই-সকল কুৎসিত রোগে কত পরিবার শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে কে তাহা নির্ণয় করিবে? কত লোকের নিরপত্যতা, বাত, পক্ষাঘাত, চক্ষুনাশ ও উন্মাদের কারণ এই-সকল কুৎসিত রোগ কে তাহা বলিবে? মুস্কিল এই, এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করা তথাকথিত ভদ্রতার সীমার বহির্ভূত। কিন্তু এইরূপে চোখ বুজিয়া থাকা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া, সমাজের মঙ্গলের দোহাই দিয়া আমি আমাদের দেশের চিকিৎসকমণ্ডলীকে সানুর্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে তাঁরা এই কপট ভদ্রতার মোহ কাটাইয়া এই কুৎসিত রোগসমূহ আমাদের সমাজে ঢুকিয়া কিরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছে সে সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা করুন, তাঁরা দেশের আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ লাভ করিবেন। তখন লোকে বুঝিবে পাত্র নীরোগ ও সচ্চরিত্র হওয়া কত আবশ্যক।

যিনি ধনী তিনি আর একজন ধনীব্যক্তির পুত্রের সঙ্গেই নিজ কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। ইহা স্বাভাবিক এবং ইহাতে সুবিধাও অনেক। ধনী-কন্যা বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছে, দরিদ্রের ঘরে যাইলে তার বড় কষ্ট হইবার কথা। কিন্তু ওর চেয়েও বড় একটা কথা ভাবিতে হইবে। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদন,—তার জন্য দরকার পাত্রের রূপ গুণ; তার পয়সা থাক আর না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। এই জন্যই দেখা যায় কোনো কোনো বুদ্ধিমান ধনীলোক সদ্বংশজাত এবং গুণশালী যুবক দরিদ্র হইলেও তাহাকে জামাতা নির্বাচন করেন। তাহার ফলে সেই-সকল ধনীর দৌহিত্রগণ বেশ গুণবান হয়। রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠে জানা যায় যে কোনো কোনো রাজা দরিদ্র ঋষিপুত্রের হস্তে কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই সেই রাজার দৌহিত্র বংশ খুব উন্নত হইয়াছিল। আর আমাদের গ্রামে গ্রামে যে শিবদুর্গার কাহিনী গীত হয় তার মধ্যেও বংশোন্নতিবিজ্ঞানের এই তত্ত্বটি লুকান রহিয়াছে। রাজা

হিমালয় দরিদ্র শিবকে অসাধারণ গুণবান দেখিয়া তাঁহার হস্তে কন্যা দুর্গাকে অর্পণ করেন। শিব দিবারাত্র জ্ঞান আলোচনায় বিভোর, সংসারের কিছুই দেখেন না; তাই দুর্গার বড় কষ্ট। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রায়ই আমাদের 'ভোলা মহেশ্বরের' প্রকৃতি-বিশিষ্ট। যাহা হউক সমস্ত কষ্ট সফল হইল যখন তিনি কার্ত্তিক গণেশরূপ পুত্ররত্নদ্বয়ের জননী হইলেন। আর একটা কথা। দারিদ্র্য-কষ্ট ছিল বলিয়া দুর্গাকে দুঃখিনী বলা যায় না। অপরে না বুঝিলেও তিনি নিজে স্বামীর মহত্ত্ব সম্যক অবগত ছিলেন। যখন তিনি শিবমুখ-নিঃসৃত জ্ঞানসুধা পান করিতেন তখন অপর কোনও রমণীকে আপনার অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিতেন কি না সে সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে।

এ সকল সেকেলে নজীর যাঁরা পসন্দ করেন না তাদের জন্য বলিতেছি যে নব্য ইউরোপেও অনেক সময় দেখা যায় ধনীকন্যার সহিত দরিদ্র অধ্যাপক বা দরিদ্র সেনাপতির বিবাহ হইয়া থাকে। সে দেশের সমাজবিজ্ঞানবিদ্‌গণ এইরূপ বিবাহে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন, কেননা তাতে বংশের উন্নতি হইয়া থাকে।

আর একটা বড় কঠিন সমস্যার আলোচনা না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেটা হইতেছে—প্রত্যেক বিবাহযোগ্যা কন্যার একবার করিয়া বিবাহ হওয়া উচিত কি না। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে যে প্রথা চলিত আছে, তাহার গুণ এই যে সকল কন্যাই একবার করিয়া বিবাহের সুযোগ পায়—প্রথাটি না থাকিলে বাপ মা অত কষ্ট করিয়া সকল কন্যার বিবাহ দিতেন না। এই প্রথার দোষ এই যে লোকে পাত্রাভাবে কখন কখন অযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে হইবে, ইহাই সাধারণ বিধি; তবে যোগ্য পাত্র না জুটিলে কন্যাকে আমরণ কুমারী করিয়া রাখিবে, ইহা বিশেষ বিধি (ইংরিজিতে যাকে বলে exception to the rule)। *

পুরাকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই সেদিন পর্য্যন্ত কুলীন ব্রাহ্মণগণ পাত্রাভাবে বয়স্থা কন্যাকে কুমারী অবস্থায় রাখিয়া দিতেন। ধর্ম্মরক্ষার জন্য আপনার সন্তানকে গুণহীন পাষণ্ডের হস্তে ফেলিয়া দিতে হইবে—কি শাস্ত্র কি দেশাচার কেহই এরূপ নৃশংস কথার সমর্থন করে না।

কেহ কেহ আবার বলেন প্রত্যেক কন্যার বিবাহ হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যও বৃদ্ধি পায়। ইহার উত্তরে এই বক্তব্য যে জনবল জাতির একটি প্রধান বল; ইহাকে হ্রাস করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য আমাদের অন্য পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে—যাহাতে আমাদের উপার্জ্জনের ক্ষমতা বাড়ে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। *

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নাম বদল

(গল্প)

বাল্যকাল হইতেই আমার প্রবন্ধাদি লেখা একটু আধটু অভ্যাস আছে। পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যালয়ের সভাসমিতিতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিয়াছি। অনেক সময় রাত্রি জাগিয়া দুই একটি কবিতা রচনা করিবারও চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই একছত্র লিখিয়াই ছিন্ন কাগজখণ্ড মুষ্টি-পিষ্ট করিয়া মুক্তবাতায়নে নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে। কারণ—আমার জানিত সমস্ত বাঙ্গালা শব্দ মন্থন করিয়াও মনোনীত মিল মিলাইতে পারিতাম না। এইরূপে অনেক কবিতা, অনেক গল্প আরম্ভ করিয়া আর শেষ করিতে পারি নাই। অসমাপ্ত অবস্থাতেই তাহাদের অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। কেবল একটি মাত্র যাহা রাখিয়াছিলাম—তাহাই ছিল, এখনও আছে এবং থাকিবে। শুধু আছে, বলিয়াই যে মাত্র চিহ্নটুকু ধারণ করিয়া একপার্শ্বে পড়িয়া আছে, তাহা নহে। আছে—সুখ শান্তি, স্বস্তি সান্ত্বনা, তৃপ্তি গৌরবরূপে আমার বক্ষ ব্যাপিয়া। অস্থি মজ্জায়, শিরায় শোণিতে সুধাসিন্ধুর ঢেউ তুলিয়া। 'আছে' বলিলে

* কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ। (মনু)

* পাত্রনির্ব্বাচন সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পাত্রীনির্ব্বাচন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, এই জন্য এখানে পুনরুক্ত হইল না। (প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২০,)

মিথ্যা বলা হয়। থাকিবে। এখনও থাকিবে। বুঝি মরণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত। সে—কি? আমারই বাল্যরচিত একটি ছোট গল্প। সেই কথাই আজ আপনাদের বলিব।

যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি তখন আমাদের গ্রামে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার কারণ ও অবসান [illegible] করুন, সবই বৃথা ভাবা। ভাবুক আমার কর্ণে একটা আতঙ্কিনী প্রবেশ করিয়া ভাবভাণ্ডারে নাড়া দিয়া, রচনারাজ্যে সাড়া জাগাইয়া দিল। অবিলম্বে একখানি ছোট খাতা বাঁধিয়া উক্ত ঘটনার ছায়া অবলম্বনে একটি গল্প রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। গল্প শেষ করিয়া, একবার দুইবার বারম্বার পাঠ করিলাম, বেশ লাগিল। গল্পটি রচনা করিয়া নিজেই বেশ সন্তোষ ও তৃপ্তিলাভ করিলাম। কোন মাসিকপত্রে পাঠাইয়া দিব স্থির করিলাম। কিন্তু সে কল্পনা তখনকার মত ত্যাগ করিলাম।

আমার বাঙ্গালা হস্তাক্ষর কিন্তু বড়ই বিশ্রী। ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষরের আঁকা বাঁকা ছত্র। ঠিক অনেক স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরের মতই! অনেক সময় বৌদিদিরা রহস্য করিয়া আমাকে বলিয়া থাকেন—আমি নাকি স্ত্রীলোকেরও অধম। কারণ আমার হস্তাক্ষর নাকি তাঁহাদের হস্তাক্ষর অপেক্ষা কদাকার। লজ্জার কথা বটে।

গল্পের খাতাখানি আমার পাঠাগারের টেবেল্‌এর উপর খাতাপত্রের মধ্যেই চাপা থাকিল। মধ্যে মধ্যে বাহির করিয়া পড়িতাম।

যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। তারপর তিন মাসের লম্বা অবকাশ। একমাস চলিয়া গেল। একদিন শুনিলাম—কৃষ্ণনগর হইতে আমাকে দেখিতে আসিতেছে। কেন? আমাতে এমন কি অস্বাভাবিক ও অলৌকিক আছে, যাতে করে আমাদের বাড়ীটা এক্‌জিবিসন্ ক্যাম্প হইয়া দাঁড়াইল! আমি হইলাম—দেখিবার বস্তু। এবং তাহা দেখিবার জন্য লোকসমাগম হইতেছে—দেশবিদেশ হইতে! অর্থাৎ আমার বিবাহ। যদি বলেন—এখনই? আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। কারণ আমি কুলীন-কুমার। আমার দাদাদেরও অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছে। আমাতেও বোধ হয় সেই নিয়মই প্রতিপালিত হইবে। আমার মনে মনে যে একটুও আনন্দ হয় নাই,—সে কথা বলিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে যতটা আনন্দ পাওয়া যায়, বিবাহাসনে উপবেশন করিলে বোধ হয় অনেকটা কমিয়া যায়। বিবাহান্তে আরও কমিয়া যায়। তবে সাধারণের উপর সে নিয়ম খাটে না। ব্যক্তি ও অবস্থা-বিশেষে এ নিয়ম ধ্রুবসত্যের মতই খাটিয়া যায়। অনেককে সারা-জীবন পস্তাইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, একদিন দেখিলাম—বেশ হৃষ্টপুষ্ট ফুটফুটে রঙের বাদসাহি চেহারার একটি বাবু আসিয়া আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম ইনিই আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। ইনি পাত্রীর খুল্লতাত এবং মস্ত বিদ্বান।

বৈকালে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবোধ আসিয়া জানাইল—বৈঠকখানাঘরে আমার ডাক পড়িয়াছে। সেখানে গিয়া দেখিলাম—পাড়ার মুরুব্বিদল, বাবা ও দাদারা সেই বাবুটিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। বাবুর সম্মুখে গিয়া বসিবার হুকুম হইল। আমি একটু সঙ্কুচিত ভাবেই বসিয়া পড়িলাম। বাবুটি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একজন মুরুব্বি বলিলেন—"পুলিন আমাদের ভারি লক্ষ্মীছেলে। অতি সুন্দর স্বভাব—বুঝলেন কিনা পরেশবাবু!" বাবুটি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হুঁ, তা হওয়া ত উচিত।" তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"একজামিনে কেমন লিখলে বাবা?" আমি জানাইলাম—"মন্দ নহে।" এইরূপ আরও দুইচারিটি কথাবার্ত্তার পর বাবুটি সুবোধকে বলিলেন—"ওহে খোকা, একটু কাগজ আর দোয়াত-কলম নিয়ে এসো ত!"

আমি মনে মনে ভাবিলাম—কেন? 'ডিক্‌টেসন্' দিবে নাকি? এ আবার কোন্‌দেশী বিবাহ? আমায় কি পাত্রী দেখিতে আসিয়াছে যে দেখিয়া লইবে—আমি লেখা পড়া জানি কি না, পান সাজিতে জানি কি না, রুটি বেলিতে পারি কি না! আবার ভাবিলাম—না, হয় ত দান-সামগ্রীর ফর্দ্দ করিবে।

অল্পক্ষণ পরে ভ্রাতা আমার দোয়াত কলম ও ভিতর-কার শাদা কাগজ বাহির করিয়া উল্টাইয়া ভাঁজ করিয়া একখানা খাতা আনিয়া বাবুর সম্মুখে রাখিল। বাবু আবার সেগুলি আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—"তোমার যা মনে

আসে—পাঁচসাত লাইন্ বাঙ্গালা লেখ।" এই সেরেছে। যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই রাত্রি হয়। বাঙ্গালা লেখা আমার যে বিশ্রী। কিন্তু এ কি রকম দেখা? মনে মনে একটু রাগ হইল। একটু ভয়ও হইল। বাঙ্গালা লিখিলাম। বাবুটি বলিলেন—"এইবার ঐটার ইংরিজি কর।"

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জলিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে দম্ দম্ করিতে লাগিল। কান দিয়া যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল। এ ত পুরা দস্তুর 'টেষ্ট', এই টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তবেই আমি বিবাহের জন্য 'এলাউ' হইব? এমন বিবাহ না হয় না-ই করিলাম। আজকাল হইলে আমি স্পষ্ট বলিয়া দিতাম—মহাশয় এক্-জামিন্ দিয়া বিবাহ করিতে চাহি না। কিন্তু তখন বলিতে পারি নাই।

বাবা ও দাদাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমারই উপর নিবদ্ধ ছিল। ভাবিলাম বুঝি আমার ভাবান্তর তাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। কি করিব? অগত্যা ইংরেজি করিলাম।

খাতাখানি লইয়া বাবু আমার লেখাটা একবার দেখিয়া হাতব্যাগের মধ্যে রাখিলেন। সুবোধ বলিল "ওখানা যে ব্যাগে রাখলেন?" বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—"নিয়ে যাবো। বাড়ীতে হাতের লেখাটা একবার দেখাব।" কথাটা বিদ্রূপের সুরেই আমার কানে পৌছিল। সেখানে আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বাবুর হুকুম হইল—"আচ্ছা এইবার তুমি যেতে পার।" আমি চলিয়া গেলাম। মনে মনে স্থির করিলাম—এ বিবাহ আমি কিছুতেই করিব না।

একদিন শুনিলাম—বড়দাদা পাত্রী দেখিতে কৃষ্ণনগর যাইতেছেন। সঙ্গে যাইতেছে—সুবোধ। সুবোধকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম—"দ্যাখ, হাতের লেখা নিয়ে আসিস্। উর্দ্ধ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, উদ্বোধন, ব্যয় ইত্যাদি কঠিন কঠিন বানান জিজ্ঞাসা করিস্। কড়া, বুড়ি, শতকে, নাম্‌তা জিজ্ঞাসা করিস্। সামনে বসিয়ে পান সাজিয়ে দেখ্‌বি।" মনে মনে ভাবিলাম এই সব যদি পারে, তবেই বিবাহ করিব—নতুবা নহে।

ভ্রাতা আমার মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল—"সে সব কিছু বোলতে হবে না দাদা, আমি সব জানি।"

পাত্রী দেখিয়া দাদা ফিরিয়া আসিলেন। আমি আমার পাঠগৃহে গিয়া একখানা বই খুলিয়া বসিলাম। কিন্তু কান থাকিল বাহিরে।

বাহিরে পাত্রী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আমি সব কথা শুনিতে পাইতেছিলাম না। কেবল শুনিলাম—"মেয়েটি বেশ সুন্দরী।" লাখ কথার এক কথা। সমস্ত কথাবার্ত্তার এইটুকুই হইল চুম্বক—মেয়েটি বেশ সুন্দরী। আমি কানে প্রাণে কেবলই শুনিতে লাগিলাম—মেয়েটি বেশ সুন্দরী।

মনে মনে কত কল্পনা করিতেছি—এমন সময় সুবোধ হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল—"দাদা আপনি যা যা বলে দিয়েছিলেন, সব করেছিলাম, কিন্তু ঠকাতে পারিনি। দ্বিতীয় ভাগের শক্ত শক্ত বানান ধরেছিলাম, কিন্তু একটাও ভুল যায়নি। কুড়ির ঘর পর্য্যন্ত নামতা জিজ্ঞাসা কোরলাম,—টক্ টক্ ক'রে জলের মত বোললে। আর এই দেখুন হাতের লেখা।" পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া সে চলিয়া গেল। আমি কাগজখানি লইয়া দেখিলাম—তাহাতে মাত্র একটি নাম লেখা আছে। আহা, নামটিও বেশ। দুই তিনবার নামটি পড়িলাম—শ্রীমতী মণিমালিনী দেবী। হস্তাক্ষর অনেকটা আমারই মত। অন্ততঃ আমার হস্তাক্ষর অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ নহে। একদিন মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম—এ বিবাহ আমি কিছুতেই করিব না। আজ তাহার বিপরীত ভাবিলাম। আহা—নামটি বেশ, মেয়েটিও বেশ সুন্দরী। কিন্তু কি হইল? বিবাহের সমস্তই একরূপ স্থির হইয়া সামান্য একটা কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমারও বুক ভাঙ্গিয়া গেল। প্রতিজ্ঞা করিলাম—আর কখনো বিবাহ করিব না।

[২]

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল্-এ পড়িতেছি। পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া একদিন আমার সেই গল্পের খাতাটি অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না। সুবোধকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"সেই বৈশাখ মাসে কৃষ্ণনগর থেকে আপনাকে দেখতে এসেছিল। সেই সময় একখানা খাতা নিয়ে দিয়েছিলাম। যাতে আপনাকে লিখ্‌তে

দিয়েছিল। তারপর সেই বাবুটি ব্যাগে পুরে নিয়ে গ্যালো!"

"ব্যাগে পুরে নিয়ে গ্যালো কিরে? আর সে বুঝি আমারই খাতা? দেখেছ, সে যে আমার বিশেষ দরকারী খাতা।"

"দেখুন ভাল করে খুঁজে। সেখানা নাও হ'তে পারে। তবে একখানা খাতা আমি নিয়েছিলাম—এটা ঠিক।"

"আর দেখতে হবে না। নিশ্চয়ই সেই খাতা।"

অনেকক্ষণ অন্বেষণ করিয়াও খাতা পাইলাম না। সঙ্গে সঙ্গে একটি আশাও আমাকে ত্যাগ করিতে হইল। হায় হায়—অমন গল্পটি। ভাবিয়াছিলাম—যদি ঐ গল্প হইতে ছাপার অক্ষরে আমার নামটা বাহির করিতে পারি। কিন্তু আর বুঝি হয় না। ঘটনা স্মরণ থাকিলেও তেমনটি বুঝি আর দাঁড় করাইতে পারিব না।

ঠিকানা জানা ছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গোপনে সেই বাবুটির নামে কৃষ্ণনগরে একখানি 'রিপ্লাই কার্ড' লিখিলাম। কিন্তু জবাব আসিল—"ক্ষমা করিবেন। খাতাখানি হারাইয়া গিয়াছে।" পত্রে কোন নাম নাই। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না—পত্রের হস্তাক্ষর কোন স্ত্রীলোকের, কি আমারই মত কোন পুরুষের। যাহা হউক খাতার আশা আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করিতে হইল।

তারপর আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। আমি বি-এ পাশ করিয়া 'ল' পড়িতেছি। আজকাল দেখিতে পাই—সাহিত্য-ক্ষেত্রে ছোট গল্পের পল্টনই প্রায় সমস্ত স্থানটুকুই অধিকার করিয়া গর্ব্বোন্নত বক্ষে সমস্ত মাসিক পত্রের বক্ষে 'কুইক্-মার্চ' করিয়া চলিয়াছে। এই সুযোগে অনেকেই স্ব স্ব নাম জাহির করিয়া একটু একটু স্থান অধিকার করিয়া লইতেছেন। আমিও এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্লট্ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু পাই কই? অগত্যা বাল্য-রচিত সেই পুরাতন গল্পের ঘটনা লইয়াই পুনরায় গল্প রচনা করিলাম। কিন্তু ঠিক সেরূপ হইল না। কোন একটি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে গল্পটি পাঠাইয়া দিলাম।

তিন দিন পরে গল্পটি ফিরিয়া আসিল। একটা হতাশের দীর্ঘশ্বাস আমার বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গেল। আমি দমিয়া গেলাম। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মহাশয়, দুঃখের সহিত আপনার গল্পটি—প্রত্যর্পণ করিতেছি। কারণ, আপনার গল্প পাইবার একদিন পূর্ব্বে, ঠিক আপনার ঐ গল্পের প্লটেরই আর একটি গল্প আমরা পাইয়াছি। সে গল্পটির ভাষা সরল, ভাব সুস্পষ্ট। গল্প দুইটি যেন ঠিক একই ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লিখিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেটি সুখপাঠ্য আমরা সেইটিই আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব বলিয়া মনোনীত করিয়াছি। নিবেদন ইতি।"

পত্র পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। আমার গল্প প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। এ প্লট্ অন্যে কি করিয়া পাইল? আবার ভাবিলাম—মানুষের কল্পনায় কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্য ঘটনার ছায়া প্রতিফলিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু কে সে? যে আমার সাহিত্যক্ষেত্রের একটুখানি স্থানও চিরদিনের মত অধিকার করিয়া লইল?

আকুল উদ্বেগে দিন অতিবাহিত করিয়া পরমাসে মাসিক পত্র আসিবামাত্র প্রবন্ধ-সূচী দেখিলাম—তিনটি গল্প আছে। ৩৫৪ পৃষ্ঠা খুলিয়া নিম্নলিখিত গল্পটি পড়িতে লাগিলাম—

"শেষ-চিহ্ন।"

—আজ যে গল্প আপনাদের বলিব তাহা আমার নহে। এ গল্প আমার 'তার' রচিত। আমি মাত্র প্রকাশক। তবে গল্প বলিবার পূর্ব্বে আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে। আশা করি আপনারা বিরক্ত হইবেন না।

ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র-ঝলসিত দ্বিপ্রহরে নিদ্রায় তন্দ্রায় আমাদের বাড়ীখানি নীরব নিস্তব্ধ। আমি আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখি 'সে' তাহার ষ্টিলট্রাঙ্ক খুলিয়া—বস্ত্রাদি, রুমাল, সাবান, এসেন্সের শিশি ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যাদি গৃহের মেঝেয় ছড়াইয়া পুনরায় ঝাড়িয়া, ভাঁজ করিয়া বাক্সে সাজাইতেছে। স্ত্রীলোকের সময় অতিবাহিত করিবার এ একটি প্রধান উপায়। কোন কিছু করিবার নাই,—সুসজ্জিত বাক্স খুলিয়া, জামা কাপড়ের ভাঁজ খুলিয়া ভাঁজ করিয়া, বাক্স সাজাইয়া, পুরাতন পত্রগুলি পুনরায় পড়িয়া সময় কাটাইয়া দিল।

পা-টিপিয়া গিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। বাক্সের সর্ব্ব নিম্ন হইতে সে রুমালে জড়ান

কি একটা বাহির করিল। রুমালের বন্ধন মুক্ত করিয়া বাহির করিল একখানি খাতা। পাতা উল্‌টাইয়া সে কি পড়িতে লাগিল। কিসের খাতা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল হইল। অকস্মাৎ গিয়া ক্ষিপ্রহস্তে খাতাখানি চাপিয়া ধরিলাম। সে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়াই দুই হস্তে খাতাখানাকে কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

"তোমার পায়ে পড়ি, তোমার পায়ে পড়ি—ছেড়ে দাও।" আমি বলিলাম—"তোমার এমন কি গোপনীয় আছে, যা তুমি আমাকে দেখাতে চাচ্ছ না?"

"তোমার কাছে আমার কিছুই গোপনীয় নাই। তবে আজকের মত ছেড়ে দাও। আর একদিন দেখাবো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

আমি আসিয়া—"না আমি দেখবোই" বলিয়া খাতাখানা ধরিয়া একটু জোরে টান মারিলাম। উপরের দুই তিনখানা পাতা ছিঁড়িয়া গেল। উপুড় হইয়া বুকের মধ্যে খাতাখানা চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল—"ছাড়বে না? ছাড়বে না? পায়ে পোড়লাম—তবুও ছাড়বে না?"

সে কাতর কণ্ঠের আকুল প্রার্থনা আর সহ্য করিতে পারিলাম না। ছাড়িয়া দিয়া বলিলাম—"আচ্ছা যাও, না দেখালে। দুদিন বাদে দেখাতে চাচ্ছ, অথচ আজ দেখাবে না।" অভিমানের ভান করিয়া গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। সে কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। সে চাহনিতে আমি সব ভুলিয়া গেলাম। আমিও চাহিয়া দেখিলাম—মুখখানি তাহার লাল হইয়া গিয়াছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"খাতা ছিঁড়ে দিলাম ব'লে রাগ হ'লো নাকি?"

নত দৃষ্টিতে সে বলিল—"না আমি আর রাগ করবো কেন? আমার ভয় হয়েছিল—তুমি বুঝি রাগ করলে!"

"রাগ ত করি, কিন্তু তা বজায় রাখতে পারি কই কালো?"

একটু মৃদু হাসিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বাক্স সাজাইতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—খাতাখানা কিসের? বোধ হয় গানের। সেই কারণ লজ্জায় আমায় দেখাইল না।

একদিন তাহার পিত্রালয় হইতে সংবাদ আসিল—তাহার পিতাঠাকুর মহাশয় বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। আমার নিকট বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। কয়েকদিন পরে জানিলাম—তাহার পিতা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। পরদিন তাহাকে আনিতে গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম—'সে' আমার উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। আহারনিদ্রা ভুলিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিলাম। কিন্তু কি হইল? সকল যত্ন, সকল চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া সে আমার আমারই ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিল। আমি বালকের মতই কাঁদিতে লাগিলাম।

দ্বিপ্রহরে শ্বশুরালয়ের পরিচিত নির্দ্দিষ্ট কক্ষটিতে বসিয়া আছি। সম্মুখে দেওয়ালগাত্রে তাহারই একখানি প্রতিকৃতি সংলগ্ন ছিল। তৎপ্রতি চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুজলে দৃষ্টিরোধ হইল। চক্ষু মুছিয়া পুনরায় চাহিলাম; সেই ফটোর পেরেকেই তাহার চাবির তোড়াটি টাঙ্গান ছিল। আর তাহারই নিম্নে একখানি টুলের উপর, রঙ্গিন কাপড়ের আবরণে ঢাকা তাহার বাক্সটি বসান ছিল। উঠিয়া চাবির তোড়াটি লইয়া বাক্স খুলিলাম। যেমন সাজান তেমনই আছে। নানান রঙ্গের ছোপান কাপড়, জড়িপেড়ে কোঁচান কাপড়, সেমিজ বডিজ্, সায়া সাবান, আলতা আয়না, রুমাল তোয়ালে, এসেন্স আতর যেমন গোছান তেমনই আছে। একে একে সমস্ত বাহির করিলাম। প্রতিদ্রব্যটিতে যেন তাহার গন্ধ ও স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। চক্ষু ফাটিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহারই একখানি গন্ধেভরা রুমাল লইয়া চক্ষে চাপিয়া ধরিলাম।

সর্ব্বশেষে যাহা বাহির করিলাম, তাহা সেই—রুমালে জড়ান খাতা। যে খাতা একদিন তাহার বুকের ভিতর হইতে সবলে টানিয়া বাহির করিতে চাহিয়াছিলাম—কিন্তু পারি নাই। আর আজ? আজ তাহা অনায়াসে আমি আমার শোকদগ্ধ শূন্য বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম—কেহই বাধা দিল না। কাহারও দুইখানি ক্ষিপ্রহস্ত তাহা ছিনাইয়া লইল না। কাতর কণ্ঠে কেহই বলিল না—ছেড়ে দাও ওগো ছেড়ে দাও। পায় পড়ি—ওগো ছেড়ে দাও।

খাতার পাতা উল্টাইয়া কিয়দংশ পড়িয়া দেখিলাম। তাহা একটি গল্পের অবতরণিকা। আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম—সেটি একটি অতি সুন্দর করুণ গল্প। কিন্তু এ কাহার রচিত? এ হস্তাক্ষর কি—হ্যাঁ তাহারই হস্তাক্ষর বলিয়া ভ্রম হয়। বোধ হয় তাহার অনেক দিন পূর্ব্বেকার লেখা।

নির্ব্বাক্ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তাহার বাক্সের সুঘ্রাণে প্রকোষ্ঠের বদ্ধ বায়ু মাতাইয়া আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। ফটোয় বসিয়া সে যেন আমারই দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। খাতাখানাকে বক্ষে করিয়া শয্যায় গিয়া লুটাইয়া পড়িলাম।

"কালো, কালো! দেহের শক্তি, মনের স্ফূর্ত্তি কালো আমার, তোমাতে এমন গুণ ছিল তা একদিনের জন্যও আমাকে জান্‌তে দাও নাই! কেন দাও নাই কালো? এই বুঝি তোমার ভালবাসা? একদিন দেখতে চেয়েছিলাম—লজ্জায় দেখাও নাই। তুমি বর্ত্তমানে এ সুখ দাও নাই কেন কালো?" উপাধানে চক্ষু মুছিয়া গল্পটি পুনরায় পড়িবার চেষ্টা করিলাম। চক্ষুজলে অন্ধ হইলাম। পড়িতে পারিলাম না।

আমার বুকের কলিজা, আমার দেহের প্রাণ, আমার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, তাহার সেই 'শেষচিহ্ন' খাতাখানি লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

কেন সে তাহার নিজগুণকে নিভৃতান্ধকারে চাপা রাখিয়া গুণের অবমাননা করিয়াছিল,—সেই পাপের দণ্ড-স্বরূপ আজ আমি তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিলাম। স্বর্গের দেবী তুমি কালো, স্বর্গ হইতে তোমার হতভাগ্য-স্বামী প্রদত্ত এ শাস্তি মানিয়া লইয়া তাহাকে কৃতার্থ কর। আর বুঝবো তোমার প্রেমের টান, যদি অবিলম্বে তোমারই পার্শ্বে তাহার জন্য একটুখানি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আজ আপনাকে যে গল্প বলিব, তাহা আমার নহে—'তার'। আমি মাত্র প্রকাশক। তাহার গল্প তাহারই নামে নিম্নে প্রদত্ত হইল। সবিনয় প্রার্থনা—অবজ্ঞা করিবেন না; অমর্য্যাদা করিলে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে। এইটুকু তার মধুর স্মৃতি, ওগো এই-টুকু তার 'শেষ-চিহ্ন'।

গল্পটি নিম্নলিখিত রূপ:—

* * * *

[৩]

কোন ভদ্রলোকের প্রকাশিত উপরোক্ত গল্প পাঠ করিলাম। কিন্তু এ কি? পুনরায় পাঠ করিলাম—কিন্তু এ কি? এ যে আমার সেই বাল্য-রচিত গল্প। নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু সত্যই ত এ আমারই সেই গল্প। অক্ষরে অক্ষরে, ছত্রে ছত্রে এ সেই আমারই রচিত গল্প। হায় হায়, যে গল্প হইতে ভাবিয়াছিলাম—নামটা ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাইব, সে গল্প আমার কে হরিয়া লইল! কে আমার পোষিত বাসনায় ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া 'লেখক' নামের স্থানটুকু অধিকার করিয়া লইল!

ওকি? গল্পশেষে লেখকের নামের স্থানে ও কাহার নাম? যে স্থানে আমার নাম দেওয়া ছিল, সেখানে ও কি নাম? এঁ্যা!

মাসিক পত্রখানা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। বিস্ময়ে আত্মহারা হইলাম। শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। এক বিচিত্র যানে আরোহণ করিয়া যেন কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে গিয়া উপনীত হইলাম। চক্ষের সম্মুখ দিয়া একখানি সুন্দর-দৃশ্য-চিত্র ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

এ কাহার নাম? ঈর্ষার পরিবর্ত্তে শান্তি আসিয়া আমার প্রাণ শান্ত শীতল করিয়া দিল। কোন্ এক অজ্ঞানিত সুখস্পর্শের শৈত্য অনুভূতির শিহরণে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আনন্দ-প্রস্রবণে অন্তর ভরিয়া গেল। উল্লাস-উৎসে মন মাতিয়া গেল।

এ কাহার নাম? যে নাম সজাগ প্রহরীর মতই আমার মনটার উপর দিবানিশি পাহারা দিতেছে, এ নাম সেই নাম। যাহার কল্পিত মধুর মূর্ত্তিখানি আজও আমার সমস্ত অন্তর বাহির অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, এ তাহারই নাম।

সার্থক আমার গল্প রচনা। আমার সামান্য খাতাখানি যে তাহার নিকট একটুও আদর পাইয়াছিল, আমার ক্ষুদ্র গল্প যে তাহার প্রাণে একটুও স্থান পাইয়াছিল—ইহাই আমার চরমতৃপ্তি, শীতল সান্ত্বনা।

মাসিকপত্রখানা বক্ষে চাপিয়া টেবিলের উপর মস্তক রাখিলাম।

একি ঘটনা বিপর্য্যয়! এ কি শাস্তি? এ কি সুখ? আমার লেখার সে আজ লেখিকা। কিন্তু সে নাম মুখে আনিবার কোন অধিকার নাই। তথাপি একবার, মাত্র একবার—ওগো একটিবার, নির্লজ্জ বেহায়ার মতই সেই নামটি, সেই বেশ নামটি একবার মুখে আনিব। সে নাম—"মণিমালিনী দেবী।"

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরাজয়ে ভয় কেন?

কখনো পতন হয়নি ইহা গৌরবের কথা নয়, পতনের পর প্রতিবার উঠতে পারাতেই পরম গৌরব।—

গোল্‌ড্‌স্মিথ্‌।

পরাজয়ই শিক্ষা; উৎকর্ষলাভের উহাই প্রথম সোপান।

— ওয়েণ্ডেল্‌ ফিলিপ্‌স্‌।

মল্লভূমিতে বিপুল জনতা। চারিদিকে থরে থরে সহস্র সহস্র রোমীয় উপবিষ্ট—পুরুষ ও নারী, শিশু যুবক ও বৃদ্ধ। কেন? কিসের জন্যে? আজ মল্লভূমিতে ঘৃণিত খ্রীষ্টিয়ানেরা হিংস্র বন্য জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। স্বেচ্ছায় নয়; বন্যজন্তুর মুখে তাদের নিক্ষেপ করা হবে। মল্লভূমির মাঝখানে কেমন করে' তারা মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের বৃথা চেষ্টা করবে, তাই দেখবার জন্যে এই লোক-সমাগম। প্রথমেই দুই পালোয়ানে লড়াই। এ লড়াইয়ে যার হার হবে মৃত্যু তার প্রায়ই অনিবার্য্য। এক পালোয়ান অন্যটিকে ভূপাতিত করে' একবার দর্শকবৃন্দের দিকে চাইবে, যদি তারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে ধরে তো ভূপতিত পালোয়ান রক্ষা পায়; আর যদি অঙ্গুষ্ঠ নীচু করে তো তখনই তাকে মরতে হবে। এই ছিল রীতি। যার জন্যে এইরূপে মৃত্যু নির্দ্ধারিত হ'ল সে যদি গলদেশে অস্ত্রাঘাত গ্রহণ করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে অমনি চারিদিকে নিষ্ঠুর চীৎকার আরম্ভ হয়—নে নে অস্ত্রাঘাত নে! কখনো বা বড় বড় লোকেরা সেখানে ছুটে যেতেন যেখানে মরণাহত মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে; কেহ বা কোনো সাহসী বীরের উষ্ণ শোণিত পান করতেন!

মল্লভূমিতে প্রবেশ করে' দুই বীর উচ্চকণ্ঠে বল্লে—মহারাজ! মরণপথের যাত্রী দুজন তোমাকে অভিবাদন করচে! তারপর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। মরণ পণ করে' তারা লড়তে লাগ্‌ল। বহুক্ষণ কেটে গেল, তাদের সারা অঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠ্‌ল, ধূলায় ধূলায় মুখ মলিন হয়ে গেল। এমন সময় দর্শকবৃন্দের মাঝ থেকে সহসা এক বৃদ্ধ বেষ্টনী অতিক্রম করে' মল্লভূমির মধ্যে গিয়ে পড়লেন। নগ্নপদে অনাবৃত মস্তকে তিনি মরণপথের যাত্রী দুজনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বল্লেন—থাম থাম! শান্ত হও! বিপুল জনতা বিস্ময়ে ক্ষণকাল হতবাক হয়ে গেল। তারপর তাদের মাঝ থেকে কুপিত বিরাট অজগরের ফোঁসফোঁসানির ন্যায় একটা হিস্ হিস্ শব্দ উঠ্‌ল—চীৎকার হতে লাগ্‌ল, ফিরে আয়, ফিরে আয় বুড়ো! কিন্তু বৃথা; সেই পক্ককেশ সন্ন্যাসী—স্তব্ধ অচঞ্চল; মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় উদাসীন। রক্তপাগল মানুষের দলের গর্জ্জন যেন মৃত্যুর আহ্বান! তারা বল্লে—কেটে ফ্যাল্‌, ওকে কেটে ফ্যাল্‌! হতভাগাকে মেরে ফ্যাল, যার এত বড় স্পর্দ্ধা! তারপর—তারপর শান্তিপ্রচারক বৃদ্ধের দেহ ভূলুণ্ঠিত, শোণিতসিক্ত; এবং সেই দেহের ওপর মল্ল দুজনের পুনরায় উন্মাদ যুদ্ধারম্ভ!

কিন্তু কি আসে যায় এতে? এক দীন দরিদ্র বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয়েছে বই তো নয়! তাঁর আগে বিশাল মল্লভূমিতে তো কত শত লোক মরণ বরণ করেছে। তারা বয়সে ছিল নবীন। তাদের শরীর ছিল দৃঢ় বলিষ্ঠ। সেই-সব রূপবান এবং বলবানেরা যেখানে প্রাণ দিয়েছে সেখানে একজন প্রাচীন দুর্ব্বল বৃদ্ধের জীবন অবসান হলই বা! আর সে বৃদ্ধকে কে-ই বা চেনে আর কে-ই বা জানে! কিন্তু সেই অজানা অচেনা নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের মৃত্যুতেই রোমীয়ের চোখের সামনে থেকে যেন একখানা পর্দ্দা সরে গেল। তখন সে নিজের বীভৎস কীর্ত্তি দেখে শিউরে

উঠ্‌ল। সেই অবধি রোম-সাম্রাজ্যে এই প্রাণঘাতী খেলার অবসান।

সন্ন্যাসীর পরাজয়ের ভিত্তির উপর চিরন্তন জয়ের প্রতিষ্ঠা হ'ল—তাঁরই স্মৃতিচিহ্নরূপে সুবিস্তীর্ণ মল্লভূমির ভগ্নাবশেষ এখনো দণ্ডায়মান।

যথাসাধ্য চেষ্টা যে করে তার পরাজয় হয় না। জগৎ তাকে অবজ্ঞা করতে পারে, কিন্তু তার চেষ্টার মাপ, বিশ্বচরাচরের যিনি একমাত্র বিচারক তাঁর তুলাদণ্ডে নিরূপিত হবে। কারণ ব্যতিরেকে ফল কোথায়? অকারণ জগতে কোনো শক্তি ব্যয়ও হয় না। তাই এ নিশ্চয় যে বিবেকানুমোদিত একাগ্রতা একদিন-না-একদিন পুরস্কার লাভ করবেই।

পরাজয় থেকে কেমন করে' জয়লাভ করতে হয়, জীবনের এইটিই প্রথম শিক্ষা। বিফলতায় যখন আমরা ম্রিয়মাণ, বিপদে যখন আমরা বিব্রত, তখন ব্যর্থতার স্তূপ থেকে ভাবী জয়ের বীজ আহরণ করা সামান্য কথা নয়; তা করতে যথেষ্ট সাহস এবং মনের তেজের দরকার; কিন্তু এ না করেও উপায় নেই। কারণ এ থেকেই সফল ও বিফলের মধ্যেকার প্রভেদ নিরূপিত হবে। মানুষকে তার ব্যর্থতা দিয়ে বিচার করলে চলবে না। দেখতে হবে সে তার ব্যর্থতা থেকে পেয়েছে কি। ব্যর্থতাকে কেমন করে' সে গ্রহণ করেছে। দেখতে হবে ব্যর্থ হবার পর সে করলে কি, তার মনের অবস্থা কেমন হ'ল; সে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরে' গিয়ে অন্ধকারে আশ্রয় নিলে কি না; সে কি ভেবে নিলে তার দ্বারা কাজ চলবে না; না আবার কাজে লেগে গেল অদম্য উৎসাহ নিয়ে।

প্রাণপণ চেষ্টা করে' যে অকৃতকার্য্য হয়, এবং তারপর আবার নবীন উদ্যমে নিজেকে সংগ্রামে মাতে, তার জন্যে চিন্তা নেই, সে জয় করবেই।

হেনরি ওয়ার্ড বীচার বলেন—পরাজয়ই অস্থিকে পাথরের মত কঠিন করে, মানুষকে অজেয় করে, জগতে যারা মাথা তুলে দাঁড়ায় সেই-সব বীর সৃষ্টি করে। পরাজয়কে ভয় কোরো না। কারণ কোনো সৎকাজে যখন ব্যর্থ হও তখনি জেনো তুমি জয়ের অতি নিকটে এসে পৌঁছেচ।

সহিষ্ণুতা এবং মনের তেজের শেষ নিরিখ্ হচ্ছে ব্যর্থতা। জীবনকে হয় উহা চূর্ণ করে, নয় সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ করে।

কীট্‌সের মতে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্যর্থতাই সাফল্যের পাকা রাস্তা; কারণ কোনটি ঝুটো আবিষ্কার হলেই সাচ্চার সন্ধানে আমরা বেরোই, আর প্রত্যেক নতুন প্রচেষ্টাই কোনো-না-কোনো ভুল নির্দ্দেশ করে' দ্যায়; ভবিষ্যতে সেগুলিকে আমরা সযত্নে ত্যাগ করি।

যে অকপট, যে সত্যের সাধক, সে কখনো ব্যর্থ নয়। কোনো কাজ ব্যর্থ নয় সাধু যার উদ্দেশ্য। ব্যর্থতা কেবল একটি আছে, তা হচ্ছে আমাদের মধ্যে যা সত্য এবং শ্রেষ্ঠ তাকে না মানা।

র‍্যালি বিফল হয়েছিলেন কিন্তু তাঁহার নাম চিরদিন মহৎ চরিত্র ও অসীম চেষ্টার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকবে। হাঙ্গেরির দেশভক্ত কাসুট সফল হননি বটে, কিন্তু তাঁর জীবন তাঁর বাণী এবং তাঁর নিষ্ঠা চিরদিন মানুষকে স্বরাজ এবং মঙ্গলের পথে চালিত করবে। আমাদের দেশেও কত দেশভক্তের কণ্ঠ আজ নীরব, কিন্তু তাঁদের [illegible] উচ্চারিত বাণী কি আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নেই?

জগতে আজ যারা অপমানিত, বিদ্রূপের কষাঘাতে জর্জ্জরিত, কাল হয়ত তাদেরই জয়গান সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হবে। অত্যাচরিত কবি দান্তে যে কবরে আশ্রয় পেয়ে জুড়িয়েছিলেন সেই কবরেই আজ তিনি পূজিত হচ্ছেন। এইরূপ ঘৃণা থেকে পূজা, জীবদ্দশায় উপহাস এবং মরণের পর প্রশংসা অনেক মনীষী কবি ও সাহিত্যস্রষ্টার ভাগ্যে ঘটেচে। পরাজয় বলে' যা তাঁরা মনে করেছেন তা ই জয়ের ভিত্তি স্থাপনা করেছে।

তাঁদের সম্বন্ধে শ্রীমতী ষ্টো বলেন- এই পৃথিবীতেই তাঁদের পূজার দিন একদিন আসবে। যে-নাম একদিন পদদলিত সমুজ্জ্বল পতাকার ন্যায় ধূলায় ধূসর, সেই নামই আবার বিশ্বমানবের সামনে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

গ্যারিসন্ বা ফিলিপ্‌স্ পচা ডিম, উপহাস ও টিটকারিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। ডেমস্থেনিস ও ডিসরেলি সকলের বিদ্রূপ উপেক্ষা করেছিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন তাঁদের শক্তি কত; এবং এও জানতেন যে এমন দিন আসবে যখন

তাদের কথা লোককে শুনতে হবে। অপমানে ম্রিয়মাণ ও পরাজয়ে উত্তেজিত হয়ে তাঁদের মুখের অর্গল মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। যে-পরাজয় সাধারণ মানুষকে নীরব করে' দিত তা-ই এই-সকল লোককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুললে। দুর্ব্বল, পঙ্গু এবং দৃশ্যত পরাজিত লোকদের নিকট জগৎ কত ঋণী কে তার সংবাদ রাখে? চিরস্থায়ী তাচ্ছিল্যের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা তাদের অমর করেচে! বাইরন তাঁর কাঠের পা এবং তজ্জনিত কুণ্ঠার জন্যেই গান দিয়ে তাঁর হৃদয়কে প্রকাশ করে' ধরেছিলেন। জগতের একটি শ্রেষ্ঠ রূপক বেড্‌ফোর্ডের কারাগারের কল্যাণে পাওয়া গেছে। বানিয়ান তাঁর দ্বাদশবর্ষব্যাপী কারাবাসের পূর্ব্বে বা পরে বিশেষ কিছুই রচনা করেননি!

এমন লোককে জয় করা মৃত্যুর পক্ষে অসম্ভব। নিষ্ঠুর অত্যাচারে রেগুলাসের দেহ ধ্বংস করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর আত্মা রোমকে উত্তেজিত করে' তুললে, ধরাপৃষ্ঠ থেকে কার্থেজ লুপ্ত হয়ে গেল। উইঙ্কেলরীড অষ্ট্রিয়ানের বর্শাবিদ্ধ হয়ে মরেছিলেন, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ড আজ স্বাধীন। লিংকন খুনীর হাতে প্রাণ হারালেন, কিন্তু তাঁর জীবনের কাজ অগ্রসর হয়ে চলল। রাণা প্রতাপ বার বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, রাজ্যভ্রষ্ট গৃহতাড়িত হয়ে অনশন অনাহারে থেকেও দেশভক্তি ও বীরত্বের যে আদর্শ স্থাপনা করে গেছেন তা কি অবিনশ্বর নয়?

যে কখনো ব্যর্থ হয়নি সফলতাও সে কখনো পায়নি। মহৎ কাজে যিনি প্রাণ দ্যান জয় তাঁর অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গ বোধ-হয় তাঁদেরই জন্য খোলা, জগতে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা জীবনে কেবল ব্যথাই পেয়েছেন, আজীবন চেষ্টার কোনো পুরস্কার পাননি, যাঁরা জয় করেছেন অথচ জয়ের গৌরব লাভ করেননি, যে-বীরের মাথায় কেহ জয়মুকুট পরায়নি, জগৎ যদি তাঁদের অগ্রাহ্য করে করুক, কিন্তু তাঁরাই ত শ্রেষ্ঠ, তাঁরাই ত বীর।

জীবনের প্রারম্ভেই অপ্রতিহত সাফল্য লাভে বিপদের সম্ভাবনা। সাবধান! সর্ব্বপ্রথম জয়লাভে আত্মহারা হোয়ো না। হয় ত সেইটিই তোমার ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার মূল কারণ হতে পারে। প্রথম জয়লাভে অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হয়ে অনেকে ধ্বংস হয়েছে। বনস্পতির মাথা কখনো কখনো ঝড়ের তাড়নে ভূমি স্পর্শ করে বটে, কিন্তু যখন সে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধশেষে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায় তখনই প্রকাশ পায় যে তার শক্তি অদম্য; তেমনি মানুষের পতন, সেটা চিন্তার বিষয় নয়, - কিন্তু বিপদ তখনই ঘটে, যদি মানুষ পতনের পর উত্থানশক্তিরহিত হয়।

জগতের সকল মহৎ কাজ সাহসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বে সকলের চেয়ে বড় জয় পরাজয়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচে। মানবের আরাম, ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বতন্ত্রতা যা-কিছু সুখের আমরা অধিকারী সবই সম্ভব হয়েছে দুর্গতির মধ্যে বহুকাল বসবাস করে'। আজ দুর্গতির অন্ধকারে দিশাহারা হোয়ো না, সাধনা কর, একদিন এই অন্ধকারের মধ্যেই আলোর পথ প্রকাশ হবে।

পরাজয়ের হাত থেকে জয় কেড়ে নিতে পারা এবং বাধাবিপত্তিকে উন্নতির সোপানরূপে ব্যবহার করাই সফলতা-লাভের অমোঘ অস্ত্র।

তৃতীয়বার সমুদ্রযাত্রা করবার পর যে জগৎ কলম্বাস আবিষ্কার করলেন সেখান থেকে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে' দেশে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তাঁর দেশবাসীর সহানুভূতি ও রাণীর করুণায় তিনি কারামুক্ত হয়ে সমুদ্রে বার হয়ে পড়লেন। কিন্তু অত্যাচার তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই চলল। সত্তর বৎসর বয়সে দীর্ঘ পর্য্যটনের পর দুর্ব্বল অবসন্ন দেহে তিনি স্পেনে ফিরে এলেন। ভেবেছিলেন এবার পুরস্কৃত হবেন, অন্ততঃ অন্নবস্ত্রের অভাব থাকবে না। কিন্তু বিফল, বিফল, তাঁর সকল প্রার্থনা বিফল হ'ল। দরিদ্র অসহায় ব্যাধিপীড়িত বৃদ্ধ কলম্বাসের কী শোচনীয় অবস্থা! অর্থাভাবে পাওনাদারেরা তাঁর গায়ের জামাটা পর্য্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রী করে' দিলে! তারপর একদিন যখন তাঁর চোখের সামনে জগৎ অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো তখন তিনি বল্লেন—জেনোয়ার অধিবাসী আমি সুদূর পশ্চিমে ভারত মহাদেশ আবিষ্কার করেছি! কলম্বাসের মৃত্যু হ'ল। তাঁর জাহাজের দ্বিতীয় কর্ম্মচারীর নামে তাঁরই আবিষ্কৃত জগতের বৃহত্তম মহাদেশ পরিচিত হ'ল।

জেনোয়ার নাবিক কলম্বাসের জীবন তবে কি ব্যর্থ

হয়েছে? যে জনহীন মহাদেশ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেখানকার লক্ষ লক্ষ নরনারীকে জিজ্ঞাসা কর, জগতের শ্রেষ্ঠতম গণতন্ত্রকে জিজ্ঞাসা কর কলম্বাসের জীবন কি সফল নয়?

জীবনে দুঃখদৈন্য ব্যর্থতার ভার বহন করে' মরণের পরপারে তিনি অমৃত লাভ করেছেন। তাঁর মত সাফল্য কজনের ভাগ্যে ঘটে!

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবেস্তা-প্রসঙ্গ

(১)

সোম-যজ্ঞ

বোধ হয় বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথমে শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ই অ সু রো পা স ক ও আ সু রী ভা ষা নামে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া (প্রবাসী, ১৩১৩ ও ১৩১৪ সাল) বঙ্গবাসীদের নিকট অ বে স্তা র ধর্ম ও ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে বুঝা গিয়াছিল সংস্কৃতের সহিত অবেস্তার সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ। তখনই ভাষাটিকে একবার আলোচনা করিয়া দেখিবার জন্য হৃদয়ের এক কোণে একটু ইচ্ছার উদ্রেক হইয়াছিল; কিন্তু সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায় এতদিন তাহা লীনভাবেই ছিল। সম্প্রতি সেই প্রথম লেখক মহাশয়েরই সমৃদ্ধ পুস্তকশালার সহিত পরিচয় হওয়ায় ঐ পূর্ব্ব ইচ্ছা পুনর্ব্বার নবভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছে এবং আমার সদানুকূল এক মহাপুরুষ নিজের করুণা বর্ষণ করিয়া বহুপ্রকারে তাহাকে আরো বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্য এই অবেস্তা-সম্বন্ধে আমার প্রথম আলোচনার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে মনে না করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

অবেস্তায় আমি এখনো প্রবেশ করি নাই, প্রবেশ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছি। এ অবস্থায় লেখনী ধারণ শোভা পায় না। তথাপি আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের এ দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি ইহা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া কবে কি লিখিতে পারিব কি না-পারিব বলা যায় না, তাই উপস্থিত যাহা পাইতেছি তাহাই কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া দিতেছি, কেননা, বঙ্গদেশে এই সাহিত্যটি এখনো অত্যন্ত উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। এই অবেস্তা-সম্বন্ধেই যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রাশি রাশি নানাবিধ গ্রন্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেদের দিকে চক্ষু ফিরাই, তখন লজ্জায় ও দুঃখে ম্লান হইয়া পড়ি। তাঁহারা কত পরিশ্রম করিয়াছেন, কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। বেদের ন্যায় অবেস্তাকেও তাঁহারাই উদ্ধার করিয়াছেন। সংস্কৃতের সহিত এত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ ভাষাকে আমরা একেবারে উপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি মনে করিলে বস্তুতই একটা তীব্রবেদনা অনুভূত হয়। অন্যের কথা বলিতে পারি না, পারসিকদের এই ভাষা ও সাহিত্যের সহিত স্বল্পমাত্র পরিচয়েই তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বের ধারণা একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এবং সেই স্থানে একটি মধুর সম্বন্ধের আবির্ভাব দেখিতে পাইতেছি, তাঁহাদিগকে কত নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হইতেছে, মনে হইতেছে, কেমন করিয়া এই বিচ্ছেদ ঘটিল যাহাতে আমরা পরস্পরকে এত ভিন্ন বলিয়া ভাবিতেছি। সমগ্র আর্য্যজাতির ঐক্য প্রতিপাদনের অন্যতম প্রমাণ ভাষার ঐক্য। পূর্ব্বেও বিচ্ছিন্নভাবে অবেস্তার শব্দাবলী না দেখিয়াছিলাম তাহা নহে, কিন্তু আজ ভাষার সহিত সাহিত্যের সহিত এক স্থানে তাহাদের পরিচয় হওয়ায় যেন সেই শব্দগুলিই এক নবীন আকার ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মনে হয় যাহারা সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষা গভীর ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে অবেস্তা অধ্যয়ন করিতেই হইবে। এরূপ অনেক শব্দ সংস্কৃতের মধ্যে পাওয়া যাইবে যেগুলিকে অবেস্তার সাহায্য ভিন্ন ব্যাখ্যা করা যায় না, অথবা করিলেও তাহা গায়ের জোরে একটা কিম্ভূতকিমাকার করিয়া ফেলা হয়। অবেস্তার শব্দ সমালোচনা-প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। অপর পক্ষে সংস্কৃত না হইলে অবেস্তাও ঠিক বুঝা যায় না। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা অন্য-অপেক্ষা অনেক সহজে ও অনতিরিক্ত পরিশ্রমে অবেস্তা শিখিতে পারেন; যদি অধ্যাপকের কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য পান, তবে খুবই সুবিধা হয়, অন্যথা অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্যে পড়িতে হইলে উপযুক্ত শ্রম না করিলে হয় না। অবেস্তার ব্যাকরণ

অংশ ঠিক সংস্কৃত, শব্দও অনেক সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক। এইমাত্র দেখিয়া আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃতজ্ঞের নিকট অবেস্তা খুবই সহজ মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বকীয় শব্দাবলীর সহিত যখন পরিচয় আরম্ভ হয় তখন তাহা তত সহজ মনে হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অন্য অপেক্ষা অনেক অল্প আয়াসে ঐ-সকল শব্দ আয়ত্ত করিতে পারেন। ফারসীও জানা থাকিলে অবেস্তা পড়ার অনেক সুবিধা হয়, কেননা উভয়ের মধ্যে প্রচুর শব্দসাম্য আছে। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিশেষত বঙ্গবাসীদের দৃষ্টি যাহাতে এইদিকে একটু আকৃষ্ট হয় কেবল তাহাই লক্ষ্য করিয়া অবেস্তার কয়েকটী কথা এখানে লিখিত হইতেছে; এবং সংস্কৃতের সহিত তাহার সম্বন্ধটি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। এই জন্যই অবেস্তার মূল পাঠ, তাহার আক্ষরিক সংস্কৃত অনুবাদ এবং তাহার পর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ দিতেছি। যে অংশ এখানে আলোচিত হইতেছে তাহা গদ্যে লিখিত। সংস্কৃতে ইহাকে যজুঃ (যশ্‌ত্‌) বলা যাইতে পারে। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন ব্রাহ্মণের গদ্যের সহিত অবেস্তার এই গদ্যের কিরূপ সাম্য আছে। ব্রাহ্মণের সংস্কৃতে বৈদিক প্রয়োগ প্রচুর, এই জন্য এখানে অবেস্তার যে মূল অংশের অনুবাদ করা যাইতেছে, তাহার সহিত আক্ষরিক সাদৃশ্য রক্ষার জন্য সংস্কৃত অনুবাদেও কোনো কোনো স্থলে আবশ্যক-মত বৈদিক প্রয়োগ করা হইবে, এবং তাহার সুস্পষ্টভাবে অর্থবোধের জন্য বন্ধনীর মধ্যে লৌকিক প্রয়োগও দেওয়া হইবে। তবে সহজ বলিয়া মূলের উপসর্গ ও ধাতুর ব্যবধানটা নষ্ট না করিয়া যথাযথ ভাবেই রাখা হইবে, ইহাতে ব্রাহ্মণের ভাষার সহিত সাদৃশ্যটা বুঝিবার অনেক সুবিধা হইবে। এবং এই জন্যই কোনো কোনো স্থলে লৌকিক সংস্কৃতের নিয়ম ঠিক অনুসরণ করা হয় নাই। সংস্কৃতের সাদৃশ্য-প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বত্র সংস্কৃত দিয়া অবেস্তাকে ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না, ইহাতে অনেক স্থানে ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে। একই শব্দ উভয় ভাষায় প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ দুই স্থানে দুই প্রকার হইয়া গিয়াছে। যেমন নিম্নে দেখা যাইবে, সং দেব = অং দএব; কিন্তু অর্থ একেবারে বিপরীত। অবেস্তার দএব মানে দানব। সংস্কৃতের প্রসিদ্ধ উর্বরা অবেস্তায় ভূমিকে না বুঝাইয়া বৃক্ষকে বুঝায়। এই জন্য ইহার জেন্দ বা পহ্লবী ভাষায় লিখিত আগমিক (traditional) ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অর্থ করা আবশ্যক।

নিম্নে অবেস্তার যশ্‌ত(= যজ্ঞ) নামক অংশ হইতে সোম-স্তুতি উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠকগণ ইহার মধ্যে বৈদিক যম, আপ্ত্য, ত্রিত, ত্রৈতান, ও অহি (বৃত্র) প্রভৃতির সুসদৃশ উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।

যস্ন (যজ্ঞ)

৯

হোম্ যশ্‌ত (সোম-যজুঃ)

১। হাবনীম্ আ রতূম্ আ হওমো উপাইৎ জরথুশ্ত্রেম্ আত্রেম্ পইরি-যওজ্দথেন্তেম্ গাথাওস্‌চ স্রাবযন্তেম্। আ দিম্ পেরেসৎ জরথুশ্ত্রো—কো নরে অহি, যিম্ অহেম্ বীস্পহে অঙ্‌হেউশ্ অস্তবতো স্রএশ্‌তেম্ দাদরিস খ্বহে গএহে অমেষহে।

সংস্কৃত অনুবাদঃ

১। সবনীম্[২] আ ঋতুম্[৩] আ (= সবন সময়ে) সোমঃ উপৈৎ জরথুস্ত্রম্ হুতাশম্‡ পরিযজন্তং† (= সংস্কুর্ব্বন্তম্) গাথাশ্চ শ্রাবয়ন্তম্। আ তম্ (অ-) পৃচ্ছৎ জরথুস্ত্রঃ—কো নরঃ অসি, যম্ অহম্ বিশ্বস্য অসোঃ (ভুবনস্য) অস্থন্বতঃ (= অস্থিমতঃ, = ভূতময়স্য) শ্রেষ্ঠম্ দদর্শ স্বস্য গয়স্য (= জীবনস্য) উজ্জ্বলস্য * অমৃতস্য।

বঙ্গানুবাদ

১। অভিষবের সময়ে সোম জরথুস্ত্রের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি (জরথুস্ত্র) তখন গাথা-সমূহ উচ্চারণ করিয়া হুতাশনকে সংস্কৃত করিতেছিলেন। তখন জরথুস্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোন্ ব্যক্তি—যাহাকে আমি ভূতময় বিশ্বভুবনের, ও নিজের উজ্জ্বল ও অমৃত জীবনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দর্শন করিলাম?"

১। সাঙ্কেতিক চিহ্ন :—
* সংস্কৃত প্রতিশব্দ নাই।
† সন্নিকৃষ্ট।
‡ সন্দিগ্ধ।

২। দিনের পাঁচ ভাগের দ্বিতীয় ভাগ, এই সময়ে সোম অভিষব করা হয়, সূর্যোদয় হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, বেলা ৬টা হইতে ১০টা।

৩। সাধারণ সময় অর্থে বৈদিক সাহিত্যেও ইহার প্রয়োগ আছে।

মূল

২। আঅং মে অএম্ পইতি অওখ্‌ত হওমো অষব দূরওষো—অজেম্ অহ্মি জরথুস্ত্র, হওমো অষব দূরওষো, আ' মাংম্ যাসঙুহ স্পিতম, ফ্রা মাংম্ হুনঙুহ খ্‌বেরেতেএ, অওই মাংম স্তওমইনে স্তূইধি যথ মা অপরচিৎ সওষ্যন্তো স্তবাংন্।

সংস্কৃত অনুবাদ

২। আং মে অয়ং প্রত্যবোচত সোমঃ ঋতাবা (=ঋতবান্=পবিত্রঃ) দূরৌষঃ (=দূরমৃত্যুঃ) অহম্ অস্মি জরথুস্ত্র, সোমঃ ঋতাবা দূরৌষঃ। আ মাম্ যাচস্ব স্পিতম২, প্র মাং সুনুষ পানায়, অভি মাম্ স্তোমে স্তুহি যথা মাম্ অপরেঽপি চ সওষ্যন্তঃ (=উপদেশকাঃ) (অ) স্তবন্।

বঙ্গানুবাদ

২। অনন্তর এই পবিত্র ও দূরমৃত্যু সোম উত্তর করিলেন—জরথুস্ত্র আমি সোম, আমি পবিত্র এবং আমি মৃত্যুকে দূরে করি। হে স্পিতম২, তুমি আমাকে প্রার্থনা কর, এবং পানের জন্য আমাকে অভিষব কর ; এবং অপর সওষ্যন্তগণ (অর্থাৎ উপদেশকেরা) যেরূপ স্তব করিয়াছেন, সেইরূপ তুমি (নিজের) স্তবের মধ্যে আমাকে স্তব কর।

মূল

৩। আঅং অওখ্‌ত জরথুস্ত্রো—নেমো হওমাই, কসে থ্বাংম্ পওইর্যো, হওম, মষ্যো অস্তইথ্যাই হুনূত গএথ্যাই। কা অহ্মাই আষিশ্ এরেণাবি, চিৎ অহ্মাই জসৎ আবপ্তেম্।

সংস্কৃত অনুবাদ

৩। আং অবোচত জরথুস্ত্রঃ—নমঃ সোমায়। কঃ ত্বাং পৌর্যঃ৩ (প্রথমঃ), সোম, মর্ত্যঃ অস্থন্বত্যৈ (=অস্থিমত্যৈ =ভূতময়ৈ) (অ-) সুনুত জগত্যৈ *? কা অস্মৈ আশীঃ অর্পিতা *? কিম্ অস্মৈ (অ-) গচ্ছৎ আপ্তব্যম্ †?

বঙ্গানুবাদ

৩। অনন্তর জরথুস্ত্র বলিলেন—সোমকে নমস্কার! হে সোম, কোন্ মর্ত্ত্য প্রথমে ভূতময় জগতের জন্য তোমাকে অভিষব করিয়াছিলেন? কোন্ আশী (শুভ) ইহাকে অর্পিত হইয়াছিল? এবং কোন্ ফল ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল (ইঁনি কি ফল পাইয়াছিলেন)?

মূল

৪। আঅং মে অএম্ পইতি অওখ্‌ত হওমো অষব দূরওষো—বীবঙ্‌হাএ মাংম্ পওইর্যো মষ্যো অস্তইথ্যাই হুনূত গএথ্যাই, হা অহ্মাই আষিশ্ এরেণাবি, তৎ অহ্মাই জসৎ আবপ্তেম্ যৎ হে পুথ্রো উসজয়ত যো যিমো খ্‌শএতো হ্বাংথ্বো খ্‌রেনঙ্‌হস্তেমো জাতনাংম্ হ্বরে-দরেসো মষ্যানাংম্ যৎ কেরেনওৎ অইঙ্‌হে খ্‌শথ্রাৎ অমরেষিংত পসু-বীর অনহ্‌ওষেমে আপ-উর্বইরে খুইষংন্ খ্‌রেথেম্ অজ্যম্নেম্।

সংস্কৃত অনুবাদ

৪। আং মে অয়ম্ প্রত্যবোচত সোমঃ ঋতাবা দূরৌষঃ—বিবস্বান্ মাং পৌর্যো মর্ত্ত্যঃ অস্থিমত্যৈ (অ-) সুনুত জগত্যৈ*। সা অস্মৈ আশীঃ অর্পিতা *, তৎ অস্মৈ অগচ্ছৎ আপ্তব্যম্ † যৎ তস্য পুত্রঃ উদজায়ত যো যমঃ ক্ষিৎ (=শাসকঃ=ঐশ্বর্য্যশালী=সম্রাট্=সমুজ্জ্বলঃ) সু (-জীব-) গণ* ১ স্বরণ-তমঃ† (জ্যোতিষ্মত্তমঃ) জাতানাং স্বর্দৃশঃ (সূর্য্যসদৃশঃ) মর্ত্তানাম্ যৎ (অ-) করোৎ অস্য ক্ষত্রাৎ অমরিষ্যন্তৌ পশু-বীরৌ অশুষ্মাণৌ (অশোষণৌ) আপ্ (ব্) উর্বরে২ (=অপঃ, উর্বরাম্=তরুং চ) খাদেরন্ † খাদ্যম্ অক্ষয়ম্*।

বঙ্গানুবাদ

৪। অনন্তর এই পবিত্র ও মৃত্যুর অপনয়নকারী সোম উত্তর করিলেন—ভূতময় ভুবনের জন্য প্রথম মর্ত্ত্য বিবস্বান্ আমাকে অভিষব করিয়াছিল, এবং ইহাকে সেই আশী অর্পিত হইয়াছিল ও সেই ফল ইহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল যে, ইহার (একটি) পুত্র জাত হইয়াছিলেন, যিনি

১। অবেস্তায় অ ও ষ=মৃত্যু বা ব্যাধি, √উষ্ 'দগ্ধ করা' হইতে হইয়াছে, সং √উষ্ দাহ ও হনন উভয় অর্থেই হয়। অতএব আং অওষ=সং ওষ। দূরৌষ=যিনি মৃত্যুকে দূরে রাখেন।

২। জরথুস্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী দশমপুরুষের নাম। এই বংশে জন্মগ্রহণ করায় তাঁহাকেও স্পিতম বলা হয়। স্পিতম=শ্বেততম, অর্থাৎ বিশুদ্ধতম। সং শ্বেত=আং স্পিত। ইহার উত্তর ম প্রত্যয়, অথবা শ্বেততম হইতেই স্পিতম।

৩। সংস্কৃতে এই অর্থে এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হয় না, কেবল অবেস্তার সহিত সাদৃশ্য রক্ষার জন্য লিখিত হইল। সংস্কৃতে সম্মুখ অর্থে পুরস্ ও পুর দুইই দেখা যায়। যথ পুরস্+ঈস্=পুবরস্। তুলঃ—অবস্ ও অধ, অধস্। র=অধর।

১। যাহার পশুদল ও বীরদল (=মানবগণ) সুন্দর। পরবর্ত্তী "পশুবীরৌ" দ্রষ্টব্য।

২। অবেস্তার 'উবর' শব্দ বৃক্ষবাচী।

যম (নামে প্রসিদ্ধ); (ইনি) শাসনকারী (সমুজ্জ্বল) ইঁহার (জীব-) গণ সুন্দর ; (ইনি) অত্যন্ত জ্যোতিষ্মান্ ও জাত মর্ত্ত্যগণের মধ্যে সূর্য্যসদৃশ। ইনি ইঁহার রাজ্যে (অথবা শক্তি হইতে বা শক্তি দ্বারা) পশু ও বীর (অর্থাৎ মানবকে) (সৃষ্টি) করিয়াছেন যাহারা মরিবে না ; এবং জল ও তরুকে (সৃষ্টি করিয়াছেন) যাহারা শুষ্ক হইবে না —যাহাতে (ঐ পশু ও বীরগণ) অক্ষয় খাদ্য খাইতে পারে।

মূল

৫। যিমহে থ্ষথ্রে অউর্বহে নোইৎ অওতেম্ আএঙ্হ নোইৎ গরেমেম্, নোইৎ জ্উর্ব আত্রঙ্হ নোইৎ মরেথ্যুশ্, নোইৎ অরস্কো দএব-দাতো। পংচদস ফ্রচরোইথে পিত পুথ্রস্-চ রওধএষ্ব কতরস্-চিৎ যবত খ্ষয়োইৎ হ্বংথ্বো যিমো বীবঙ্হতো পুথ্রো।

সংস্কৃত অনুবাদ

৫। যমস্য ক্ষত্রে অর্বতঃ (=দ্রুতগতেঃ) নেৎ উত্তম্ (=আর্দ্রত্বম্=শীতম্) আস নেৎ ঘর্ম্ম্ (ঃ), নেৎ জরা [illegible] মৃত্যুঃ, নেৎ দ্বেষঃ* দেব-ধাতঃ (ধাত= √ধা+ত =হিত, =বিহিতঃ)। পঞ্চদশৌ (=পঞ্চদশবর্ষীয়ৌ)[১] প্রচরেয়াতাম্ পিতা পুত্রশ্চ কতরঃ রোহেষু (=বৃদ্ধিষু) যাবৎ ক্ষয়েৎ (অথবা ক্ষিয়েৎ ; √ক্ষি 'শাসন করা') সুগণঃ* যমঃ বিবস্বতঃ পুত্রঃ।

বঙ্গানুবাদ

৫। দ্রুতগামী (দ্রুতকর্ম্মা-কর্ম্মঠ) যমের ক্ষেত্রে শীত নাই, গরম নাই ; জরা নাই, মৃত্যু নাই ; এবং দৈব (অর্থাৎ দৈত্য-) বিহিত (কৃত) দ্বেষ নাই। (সেখানে) পঞ্চদশবর্ষীয় (পরিপুষ্ট ব্যক্তির ন্যায়) পিতা ও পুত্র প্রত্যেকে (নিজের) বৃদ্ধিতে (অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আকারে) চলিয়া বেড়াইবেন-- যতদিন বিবস্বানের পুত্র সুগণ (অর্থাৎ পশু-ও বীর-গণ-যুক্ত) যম (সেই ক্ষেত্রকে) শাসন করিবেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

১। স্ত্রীলোকদের ন্যায় পুরুষগণকেও এখানে পঞ্চদশ বৎসরে পরিপুষ্ট বলা হইতেছে।

শেষ-পড়া

(গল্প)

[১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে-জর্ম্মনযুদ্ধে ফ্রান্সের অন্তর্গত আলসাস প্রদেশ জর্ম্মনসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আলসাস প্রদেশবাসীরা অধিকাংশই ফরাসী, জর্ম্মনসম্রাটের আয়ত্তাধীনে যাইতে তাহারা সকলেই অনিচ্ছুক। আলসাস প্রদেশবাসী প্রত্যেক জনসাধারণের জর্ম্মন সম্রাটের উপর জাতিগত ঘৃণা ও ক্রোধ ছিল। আর এদিকে জর্ম্মনসম্রাট উক্ত প্রদেশবাসীকে নিজ আয়ত্তাধীনে আনিয়া আলসাসে যাহাতে জর্ম্মনভাষার প্রচলন হয়, তদ্বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন। আলসাস-প্রদেশবাসী জনসাধারণ জর্ম্মনীকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিত নিম্ন অনূদিত গল্পচিত্রে তাহা পরিস্ফুট।]

সে দিন প্রাতে আমার পাঠশালায় যাইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবার ভয়ে আমার বুক দুরুদুরু কাঁপিতেছিল। আমাদের শিক্ষক মিঃ হ্যামেল অতিশয় গম্ভীর ও কড়াপ্রকৃতির লোক। ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। সে দিন আমাদের ব্যাকরণের সাপ্তাহিক পরীক্ষার দিন ; জটিল ব্যাকরণের একটি সূত্রও আমার মুখস্থ হয় নাই। একে বিদ্যালয় যাইতে বিলম্ব হইয়াছে, তাহার উপর পাঠ মুখস্থ হয় নাই। বেত্রাঘাতের ভয়ে আমার শরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল। একবার মনে করিলাম পৃষ্ঠে বেত্রাস্ফালন সহ্য করা অপেক্ষা পাঠশালাকে ফাঁকি দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। ইহাতে মাষ্টার মহাশয়ের তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে না। আর সে দিনের প্রকৃতিও বেশ মধুর বোধ হইতেছিল। দূরে শ্যাম বনভূমির অন্তরে শিহরণ জাগাইয়া শ্যামা, দোয়েল প্রভৃতি প্রকৃতি-শিশুরা উন্মুক্ত উদার আকাশতলে নিশ্চিন্ত শিশ দিতেছিল। ময়দানে বিজয়গর্ব্বোদ্ধত প্রুসিয়ান সৈন্যগণ প্রফুল্লমনে মল্লক্রীড়ায় রত। আর দেখিলাম মধুর শান্তপ্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ করিয়া আমার মত শিষ্টশান্ত পাঠে অতিশয় মনোযোগী কতকগুলো বালক সিগারেটের ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে, প্রীতিব্যঞ্জক হাস্যধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া যাইতেছে। মনে করিলাম, কি হইবে পাঠশালায় যাইয়া!—ইহাদিগের সহিত ময়দানে ফড়িং ও প্রজাপতি ধরিতে যাই! তখনো মশায় হ্যামেলের করধৃত বেত্রাস্ফালনের শব্দগুলি আমার উভয় কর্ণের নিকট বোঁ বোঁ আওয়াজ করিতেছিল। কিন্তু কি জানি, সেদিন

কেমন আমার ইহাদের সহিত যাইতে মন সরিল না। আমি অতিকষ্টে এই-সকল প্রলোভন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া দ্রুতবেগে বিদ্যালয়-অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

মেয়রের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র দেখিলাম পুরাতন বোর্ডে একটি নূতন বিজ্ঞাপন আঁটা রহিয়াছে; রাস্তার প্রত্যেক লোকই যাইবার সময় এই নূতন বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া যাইতেছে আর বেশ জনতাও হইয়াছে। আমি ইহাতে নূতন কিছু মনে করিলাম না; আজ কয় বৎসর হইতে এই বোর্ডখানি দেশের অনেক দুঃসংবাদ, অভাব, অভিযোগ, যুদ্ধবার্ত্তা, দেশবাসীর নিকট যুদ্ধের জন্য অর্থ ও সৈন্য প্রার্থনা প্রভৃতির সংবাদ নিবেদন করিয়া আসিতেছে। আজও এইরূপ মামুলি একটা কোন কিছু মনে করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি এমন সময়ে আমাদের গ্রামের একজন প্রৌঢ় কর্ম্মকার মিঃ গিলটন্ বলিল "অত তাড়াতাড়ি যাবার দরকার নেই ফ্রাঞ্জ, পাঠশাল যাবার যথেষ্ট সময় আছে।" আমি মনে করিলাম গিলটন আমার সহিত রহস্য করিতেছে; আমি আরও অধিকতর দ্রুতবেগে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিদ্যালয়ে চলিলাম।

পাঠশালার ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে পৌঁছিয়া কোনপ্রকার গুনগুন শব্দ, বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে বালকগণের চীৎকার, করতালি অথবা মাষ্টার মহাশয়গণের টেবিলের উপর ছাত্রগণের মধ্যে ভীতিসঞ্চারকারী বেত্রাস্ফালন-শব্দ কিছুই শুনিতে না পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। আমি অত্যন্ত ভীত ও আশ্চর্য্য হইলাম। এই মৌন নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া চিন্তিতমনে নিজের অজ্ঞাতসারে দরজা ঠেলিয়া আমাদিগের পাঠগৃহে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে আমাদের শিক্ষক মহাশয় মিঃ হ্যামেল আমাকে দেখিয়া করুণস্বরে বলিলেন, "ফ্রাঞ্জ তুমি শীঘ্র তোমার আসন গ্রহণ কর। আজ আমরা তোমাকে ছাড়িয়াই কার্য্য আরম্ভ করিবার উপক্রম করিতেছিলাম।" আমি আমার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। মিঃ হ্যামেলের করুণ সম্বোধন শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কোথায় মাষ্টার মহাশয়ের রুদ্রমূর্ত্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমি ভীতিকম্পিত বক্ষে বেত্রাস্ফালনের আশঙ্কায় আসিতেছিলাম আর আজ একি অভাবনীয় মধুর ধীর করুণ সম্বোধন। একবার সলজ্জবদনে মাষ্টার মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া আরও আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি আজ সুন্দর মূল্যবান সবুজবর্ণ কোট ও কৃষ্ণবর্ণের টুপি পরিধান করিয়া আসিয়াছেন। সে-সমস্ত মূল্যবান পরিচ্ছদ তিনি সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ অথবা পরীক্ষার দিনই পরিধান করিতেন।

আর একটি দৃশ্য দেখিয়া আমি আরও অধিকতর বিস্মিত হইলাম যে, যে সমস্ত বেঞ্চ আমাদিগের পাঠগৃহের এককোণে সাধারণতঃ শূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, আজ দেখিলাম দেশের আপামর সাধারণ, ভদ্র ও অভদ্র, সম্ভ্রান্ত, অসম্ভ্রান্ত প্রৌঢ় ব্যক্তিরাই সেই-সমস্ত শূন্যবেঞ্চ অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। এমন কি বিচারালয়ের বৃদ্ধ চাপরাশি—সেও আজকার এই বিরাট মৌনসভায় জানুর উপর ফরাশী ভাষার প্রথমভাগখানি খুলিয়া চশমার মধ্য দিয়া অভিনিবেশ সহকারে অক্ষর-সমষ্টির দিকে উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।

মিঃ হ্যামেল সাধারণতঃ গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু আজ তাঁর গভীর চিন্তাপূর্ণ বিষাদ-খিন্ন বদনমণ্ডল দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন তাঁর হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে কোন্ এক নিগূঢ় ব্যথা জমাট বাঁধিয়া তাঁহাকে পীড়া দিতেছে। আর মনে হইতেছিল আজ তাঁর হৃদয়-বীণা করুণতানে ভরিয়া উঠিয়াছে।

তিনি তাঁর আসন গ্রহণ করিয়া আমাকে যেরূপ করুণ স্বরে সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ করুণ অথবা বেদনা-পূর্ণ স্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আজ আমার অধ্যাপনার শেষ দিন! বার্লিন হইতে পরওয়ানা আসিয়াছে যে, আমাদের আলসাস প্রদেশে জর্ম্মন্‌ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে না। আগামী কল্য হইতে তোমাদিগের নূতন শিক্ষক আসিবেন। আজ তোমাদের ফরাশীভাষা পাঠের শেষ দিন! আমি অতিশয় মিনতি করিয়া বলিতেছি, সকলেই অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

এতক্ষণে বুঝিলাম, কেন তিনি আজ বহুমূল্য পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া আসিয়াছেন! কেন আজ দেশের

আপামরসাধারণ আসিয়া জড় হইয়াছে! আর এতক্ষণে বুঝিলাম, সেই বোর্ডস্থ বিজ্ঞাপনে কি দুঃসংবাদই লেখা ছিল! ওঃ আজ আমার ফরাসীশিক্ষার শেষ দিন! হায়! হায়! কি করিয়াছি! হায় আমার প্রিয় মাতৃ-ভাষা! ওহো! পূর্ব্বে জানিলে কে পাঠে অবহেলা করিয়া পক্ষীশাবক এবং প্রজাপতির সন্ধানে ফিরিত! পূর্ব্বে জানিলে কে ক্রীড়ামত্ত হইয়া অমূল্য সময় নষ্ট করিত! অনুতাপে আমার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল! হায়! আমার প্রিয় ফরাশী-ভাষা! আহা! এতদিন যে-সমস্ত পুস্তক আমার নিকট অতিশয় অপ্রিয় ছিল, যাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া পাঠশালা যাইবার সময় ভার বোধ করিতাম, আজ তাহারাই—সেই আমার পুরাতন বন্ধুরাই আমাকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে! ওহো! আমার উপেক্ষিত বন্ধুগণকে চিরবিদায় দিতে আমার বেদনা-বিধুর হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল!

অনুশোচনায় আমার হৃদয় যখন ভরিয়া উঠিয়াছে, অনুতাপের তপ্ত অশ্রু যখন আমার গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িতেছিল, তখন শিক্ষক মহাশয় আমাকে আহ্বান করিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে আমি তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম; সাহসে ভর দিয়া জটিল ব্যাকরণের সূত্র আবৃত্তি করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলাম। জানি না কোন্ এক অজ্ঞাত শক্তিবলে সে দিন ব্যাকরণের সমস্ত সূত্রগুলিই নির্ভুল ও পরিষ্কার করিয়া আবৃত্তি করিলাম! প্রথম শব্দগুলি উচ্চারণ করিবার সময় আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আমি নিজে আশ্চর্য্য হইলাম, যে কিরূপে আমি এরূপ নির্ভুলভাবে ব্যাকরণের সূত্রগুলি আবৃত্তি করিলাম! আমি ত কখনও এরূপ সুন্দরভাবে আবৃত্তি করি নাই! আবৃত্তি শেষ করিয়া উদ্বেলিত বিহ্বলচিত্তে নীরবে অবনত মস্তকে সম্মুখস্থ টেবিলের নিকট আমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া, মিঃ হ্যামেল অতিশয় বিষণ্ণ ও করুণ স্বরে বলিলেন, "প্রিয় ফ্রাঙ্ক! আজ আমি তোমাকে তিরস্কার করিব না। তোমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে—তোমার অন্তরে যেরূপ অনুশোচনার ঢেউ উঠিয়াছে দেখিতেছি, ইহার সহিত কোন শাস্তির তুলনা হইতে পারে না। তুমি প্রতিদিনই বলিয়া আসিতেছ, আমার যথেষ্ট সময় আছে, আগামী কল্য পাঠ মুখস্থ করিব বলিয়া অনাবশ্যক কালহরণ করিয়াছ! কল্যকার অপেক্ষায় ফেলিয়া রাখার কি শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত! মূঢ়! তা দেখ! তোমার আর দোষ কি ফ্রাঙ্ক! তোমাকে বৃথা তিরস্কার করিতেছি। ইহা আমাদের—ফরাশীদের মজ্জাগত হইয়াছে; আর বিজয়ী জর্ম্মানরা আমাদিগকে উপহাস করিয়া বলিতেছে, 'তোমরা নিজ মাতৃ-ভাষাই জান না, তোমরা নিরক্ষর, তোমরা আবার ফরাশী বলিয়া কিসের গর্ব্ব কর! দেখ, বুঝ, আমরা কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! অদৃষ্টচক্রের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন!"

মিঃ হ্যামেল ফরাশীভাষা সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন—এই ফরাশী ভাষা, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুন্দর, ও সুসংস্কৃত ভাষা। এই ভাষার সহিত কোন ভাষারই তুলনা হইতে পারে না। আমরা সযত্নে আমাদের জননীস্বরূপা মাতৃভাষাকে রক্ষা করিব, যতই কেন আমাদের বিপদ আসুক—কদাচ আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা ফরাশী ভাষাকে বিস্মৃতির অতল জলে নিক্ষেপ করিব না। পরাধীন জাতির পক্ষে জাতীয় ভাষাই তাহার মুক্তির সোপান, এবং ইহাতেই মুক্তির অক্ষয় বীজ নিহিত।

অনন্তর তিনি ব্যাকরণ গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন; নীরস ব্যাকরণের জটিল সূত্রগুলি এত সহজভাবে আমার বোধগম্য হইতেছে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমি এরূপ আগ্রহসহকারে কখনও পাঠ শ্রবণ করি নাই। বোধ হয় মিঃ হ্যামেলও কখনও এতদূর ধীরতার সহিত উপদেশ দেন নাই। আমার মনে হইতেছিল, যেন তিনি আজ তাঁর সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত পাণ্ডিত্য আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দিবেন সঙ্কল্প করিয়া বক্তৃতা দিতেছেন।

আমাদের ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হইল। আমরা হস্তলিপি লিখনে মনোনিবেশ করিলাম। তিনি আজ আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ-লিপি ধরিলেন। তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। "ফ্রান্স আলসাস্! ফ্রান্স আলসাস্! ফ্রান্স আলসাস!" সকলেই কিরূপ আগ্রহে গভীর প্রযত্নে এই নূতন আদর্শ-লিপির অনুকরণে হস্তাক্ষর লিখিতে লাগিল। পাঠগৃহ নীরব, গৃহমধ্যে কাগজের উপর কলমের

আঁচড়ের খস্ খস্ শব্দ ব্যতীত আর কোনপ্রকার শব্দ গৃহমধ্যে শ্রুত হইতেছিল না। গুটিকতক প্রজাপতি ও বোল্‌তা বোঁ-বোঁ শব্দ করিতে করিতে নীরব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; কেহই তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না। সকলেই নিজ নিজ হস্তলিপি লিখনে ব্যস্ত। খাতা হইতে মাথা তুলিয়া একএকবার চতুর্দ্দিক তাকাইয়া দেখিয়া লইতেছিলাম। ছাদের উপর কপোত কপোতী স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে চুম্বনের আদানপ্রদান করিতে করিতে গলা ফুলাইয়া অব্যক্ত মধুর শব্দ করিতেছিল। আমার মনে হইল, বোধ হয় ইহাদিগকেও জর্ম্মনভাষায় শব্দ করিবার আদেশ হইয়াছে, এই ইহাদের নিজের ভাষায় শেষ সম্ভাষণ!

মিঃ হ্যামেল নিজ আসনে গম্ভীরভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন; যে আসনে তিনি আজ বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া উপবেশন করিয়া আসিতেছেন—আগামী কল্য তাঁহাকে এই শতসুখস্মৃতিপূর্ণ প্রিয় কাষ্ঠাসন চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে!

এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক জিনিষ তাঁহার সুখ-স্মৃতি-বিজড়িত, এই প্রিয়স্মৃতিপূর্ণ কোলাহলময় পাঠগৃহ পরিত্যাগ করিতে তিনি বিরহবেদনাকাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। আহা! তিনি আজ বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন, এই শতসুখময় আনন্দ-নিকেতন বিদ্যালয়ের নিকট চিরবিদায় লইতে তাঁর প্রাণ যে কাঁদিবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? শতশত ছাত্র তাঁর অধ্যাপনাগুণে পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে—আজ তাহারাও মিঃ হ্যামেলের নিকট ফরাশীভাষার শেষপাঠ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে!

পাঠগৃহের শান্তসমাহিত মৌনভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল, মিঃ হ্যামেলের সযত্নরক্ষিত ও সজ্জিত প্রত্যেক পদার্থই যেন তাদের প্রভুকে চিরবিদায় দিতে কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তারা যেন শোকমৌন হইয়া নীরবে ক্রন্দন করিতেছে! পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে তাঁহার ভগ্নী বিষণ্ণ উদাস অন্তরে ট্রাঙ্ক গুছাইতে ব্যস্ত ছিলেন। ভগ্নীর ব্যস্ততায় সুগোল সুকুমার হস্তের চুড়ির ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ শুনিতে পাইয়া তিনি যেন আরও বেদনাবিধুর হইয়া পড়িতেছিলেন। তত্রাচ তিনি ধীরতার সহিত বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া চলিতেছিলেন। বেলা বারটা বাজিল। প্রুশিয়ান সৈন্যগণ বংশীধ্বনি করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ের জান্‌লার নিকট আসিল। মিঃ হ্যামেল অমনি আসন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার বদন শুষ্ক, বিবর্ণ অথচ কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় পূর্ণ। তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন "প্রিয় বন্ধুগণ! আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমি—আমি—" আর তাঁহার মুখ হইতে কোন বাক্য নির্গত হইল না। কে যেন তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া দিল। তিনি একখণ্ড খড়ি হস্তে লইয়া বোর্ডের নিকট যাইয়া বড় বড় অক্ষরে সমস্ত বোর্ডখানি ঘিরিয়া হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া লিখিলেন,

"ভগবান, ফ্রান্সের মঙ্গল করুন।"

তিনি লেখা শেষ করিয়া খড়িহস্তে প্রাচীরগাত্রে মস্তক স্থাপন করিয়া নীরবে অশ্রুসিক্ত নয়নে দণ্ডায়মান রহিলেন। হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক ইঙ্গিতে জানাইলেন,

"সব শেষ, তোমরা যাও!" *

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

ব্যবসায়-ভেদে বর্ণভেদ

[Emiles Senartএর ফরাশী হইতে]

একজন সূক্ষ্মদর্শী ও বিশেষজ্ঞ বিচারক-কর্ত্তৃক পরিপোষিত একটা হালের মতবাদ এইরূপ প্রতিপন্ন করিতে চাহে যে, ব্যবসায়-সাম্যই বর্ণভেদের মূল-ভিত্তি ও মূলসূত্র। সম্ভবতঃ এই কথাটা তাহাদিগের মনেই ভাসিয়া উঠিয়াছে যাহারা এই বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি কাছা-কাছি ধারণা হইতে একটা মোটামুটি জ্ঞানলাভেই সন্তুষ্ট। কিন্তু কথাটা নিতান্ত অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইবে যদি বলা যায় যে, প্রত্যেকের ব্যবসায় অনুসারে, দাবা-বড়ের ছকের কতকগুলা নিশ্চল ও অলঙ্ঘনীয় ঘরের মধ্যে, হিন্দুসমাজ আবদ্ধ। এ কথা সত্য, সাধারণত যে-জাতের যে-ব্যবসায়, তদনুসারে সেই-জাতের নামকরণ হইয়া থাকে। যথা:—কুমোর, কামার, জেলে, মালী ইত্যাদি। কিন্তু এই কথাটিতে ইহাই

* আলফঁস দোদের গল্পের মর্ম্মানুবাদ। লেখকের যন্ত্রস্থ ছোট গল্পের বই "পূরবী" হইতে গৃহীত। পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

স্মরণ করিতে হইবে যে, যে-সকল ব্যবসায়ের নাম জাতের নাম বলিয়া প্রদর্শিত হয়, তাহা জাত অপেক্ষা আর-একটি বৃহত্তর ভূমিকে ঘিরিয়া আছে;—জাতটা বিবাহের নিয়মাদির দ্বারা পরিস্ফুচিত ও সীমাবদ্ধ এবং বারণ-বাধার দ্বারা আরো বেশী সংযত; তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিই,—পঞ্জাবে (১) বণিক বা বণিকেরা কতকগুলি উপবিভাগে বিভক্ত যথা, আগ্‌গরওয়াল (Aggarwul), অসোয়াল (Oswal) ইত্যাদি—(ভৌগোলিক নাম); ইহারা অন্তর্বিবাহ নিয়মাধীন (endogam) হওয়া প্রযুক্ত, অতগুলি স্বতন্ত্র জাতরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব কোন এক ব্যবসায়ের নামে পরিচিত সমস্ত লোকই কোন এক ব্যবসায়িক জাতির একটিমাত্র কাঠামের অন্তর্ভুক্ত নহে। এমন-কি অনেক সময় দেখা যায়, একটি মাত্র ব্যবসায়ের নামে, অনেকগুলি স্বতন্ত্র জাত বা শাখা সমুত্থিত হইয়াছে। (২)

ইহার বিপরীতে, একই জাতের লোকেরা জীবিকার বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পারে। যাহারা অনার্য্য বলিয়া খ্যাত সেই-সকল অস্পৃশ্য নীচ বর্ণগুলিকে সর্ব্বপ্রথমে ধরা যাক। সর্ব্বপ্রকার দাসত্বের কাজে নিযুক্ত—উহারা, অবস্থানুসারে সর্ব্বপ্রকার হীনতর ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের "বারী"রা, মশাল তৈয়ারী করে, কৃত্রিম দাড়ী তৈয়ারী করে (৩)। "বঞ্জরা"দিগের অন্তর্ভূত—বেণিয়া, ভাট, পশুপালক, কৃষক (৪)। অন্যত্র, একই জাতের ভিতর—ধুহুরি, তেলী, কসাই ঠেলাঠেলি করিয়া চলিয়াছে (৫)। এইরূপ অশেষ দৃষ্টান্ত আছে। এই-সকল দৃষ্টান্ত শুধু. নীচজাতের মধ্যেই বদ্ধ নহে। নেসফীল্ড্ নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, বেণিয়াদের মধ্যে কার্য্যতঃ ব্যবসায়িক পার্থক্য আদৌ নাই, উহাদের কোন-প্রকার বাণিজ্যের বিশেষাধিকার না থাকিলেও, উহাদের সব জাতই সদাগরী কাজে ব্যাপৃত হইতে পারে।

ইহাও নিশ্চিত,—যত অসংখ্য জাত কৃষিকর্ম্মে রত, তাহাদের অনুরূপ ততগুলা পৃথক ব্যবসায় নাই—তা সে কি আধুনিক, কি প্রাচীন। এই পর্য্যায়ের জাতগুলা ক্রমাগত নিজের এলাকা বাড়াইয়া চলিয়াছে। যে পরিমাণে অনার্য্য শাখাজাতিরা হিন্দু সভ্যতার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সেই পরিমাণে তাহারা বিশেষ ভাবে কৃষক হইয়া পড়িয়াছে; যে পরিমাণে ব্রিটিশ-শাসন শান্তিস্থাপন করিয়া যুদ্ধ-ব্যবসায়কে নিরুৎসাহিত করিয়াছে, সেই পরিমাণে কৃষকের দলপুষ্টি আরও বেশী হইয়াছে।

যে-সকল উপাদান সমাজের মধ্যে চাঞ্চল্য আনিয়াছে, উপরিউক্ত উপাদান শুধু তাহাদের মধ্যে একটি।

প্রথমে সোপানের সর্ব্বোচ্চ ধাপে আরোহণ করা যাক। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কর্ম্মের মিশ্রণ, ব্যবসায়ের গোলযোগ যার-পর-নাই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের যদি সেই পুরাতন ধারণাটি এখনও থাকে যে, ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রালোচনাতেই নিযুক্ত, ধর্ম্মানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত, তপশ্চর্য্যা ও ধ্যানধারণাতেই নিমগ্ন, তাহলে ব্রাহ্মণদের বর্ত্তমান আচরণের সহিত সে ধারণার মিল হইবে না। যাঁহারা উপবীতধারী ব্রাহ্মণদিগকে ষ্টেশনে রেল-যাত্রীদিগকে পানীয় জল দিতে দেখিয়াছেন, ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যমণ্ডলী সিপাহীদিগকে শারীরিক শ্রমের কার্য্য করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই-প্রকার অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে বিস্মিত হইবার জন্য প্রস্তুতই আছেন। ফলতঃ, যাহারা সগর্ব্বে ব্রাহ্মণের উপাধি ধারণ করে এবং সেই উপাধির জন্য সর্ব্বত্র প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সকল-প্রকার কাজেই লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—পুরোহিত, ও ও তাপস; পণ্ডিত ও ভিক্ষু; তা ছাড়া, পাচক, ও সৈনিক, লিপিকর ও বণিক, কৃষক ও রাখাল, রাজমিস্ত্রী ও পাল্কী বেহারা (৬)। আরও ভাল যথা—বুন্দেলখণ্ডে (৭) সনৌরিয়দিগের মধ্যে চৌর্য্যই কৌলিক বৃত্তি। একথা সত্য

(১) Ibbetson.

(২) সংতরালদের—দৃষ্টান্ত Nesfield, 'Caste System—Ibbetson। পুণায়, "শালি" ও "সঙ্গর" উভয়ই তাঁতী, Poona Gazette ইত্যাদি।

(৩) Elliot.

(৪) Elliot কুনবীদিগের সম্বন্ধে প্রবন্ধ।

(৫) Ibbetson.

(৬) হান্টার সাহেব এই সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতূহলজনক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন, (তথ্যের সহিত তিনি যে মতবাদ মিলাইয়াছেন, সে মতবাদের মূল্য এখানে ধরিতেছি না)—Orissa। ব্রাহ্মণ কৃষক সম্বন্ধে ইবেটসনের লেখাও মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে—ব্রাহ্মণের ব্যবসায়-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ডুবোয়ার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য Moeurs and Nesfield "Caste System" ইত্যাদি।

(৭) Nesfield.

তাহারা দিবালোকেই চুরী করে। এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতি হিন্দুদের ভক্তির দৌড় এত বেশী যে একটা চলিত প্রবাদ আছে (সম্ভবতঃ প্রবাদটা বিদ্রূপাত্মক),—ব্রাহ্মণের দ্বারা চুরী হইলে সেটা দেবতার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিতে হইবে। অন্যান্য জাতের মধ্যেও চোরের অভাব নাই, যদিও তাহাদের পদ-মর্য্যাদা অতটা উচ্চ নহে (৮)।

ব্রাহ্মণজাতের মধ্যে এই ব্যবসায়-বৈচিত্র্য একটা নূতন জিনিস নহে। ঠিক এই ধরণের বৈচিত্র্য মনু ও মনুর ন্যায় সমান প্রামাণ্য অন্যান্য শাস্ত্রকারগণও বহুপূর্ব্বেই অনুমোদন করিয়াছিলেন। এইখানে আর একটা কথা যোগ করিয়া দিই ;—অনেক স্থলে, এই-সকল ব্যবসায়-পার্থক্য হইতে নূতন নূতন উপ-জাতের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা আসলে আমার মতে স্বতন্ত্র জাত। কিন্তু এই পরিণামটা আদৌ একটা নিত্য নিয়মিত ঘটনা নহে।

যাহারা আর্য্য-বর্ণদিগের তুলনায় নিকৃষ্ট সেই-সব অসংখ্য লোকের অনধিকার প্রবেশ, বর্ণভেদ-প্রণালীর মধ্যে কতকটা চঞ্চলতা ও তরঙ্গ-বিক্ষোভ উৎপন্ন করিলেও উহা মূল নিয়মের কঠোরতার উচ্ছেদপক্ষেও কতকটা সাহায্য করিয়াছে। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি একথা স্বীকার করি,—ব্যবসায়ের বিশেষত্ব ও কুলক্রমিকতা বর্ণ-ভেদের পক্ষে শুধু একটা সুদৃঢ় বন্ধনমাত্র নহে ;—উহা একটা আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল যাহার চারি পাশে নূতন নূতন দল আসিয়া দলবদ্ধ হয়। এ সমস্ত সত্ত্বেও, স্পষ্টই দেখা যায়,—বর্ণভেদপ্রণালীর অন্তর্গত কুলক্রমাগত ব্যবসায়-সাম্য নীতিটা কতকগুলা দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চাওয়া ও পাওয়া

তোমায় আমি চাইগো পেতে, তাইত তোমায় চাইনে—
পাওয়ার পরে চাওয়ার ধনকে কোথাও খুঁজে পাইনে।
তুমি আমার অমনি থাক, না পাই নাগাল—
কল্পনা মোর তোমায় ধরার বুনুক রঙিন জাল !

শ্রী—

(৮) Dubois ; Steele "Hindoo Castes" ; Poona Gazette ইত্যাদি।

নির্ব্বোধ

এক ছিল নির্ব্বোধ।

বহুকাল ধরিয়া সে শান্তিতে সন্তুষ্ট চিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার কাছে জনশ্রুতি আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিল—চারিদিকের সকলে তাহাকে সামান্য সাধারণ বোকা মাত্র বলিয়া জানে !

নির্ব্বোধ ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত এবং ক্ষুণ্ণ হইল। সে গম্ভীর বিষণ্ণমুখে ভাবিতে বসিয়া গেল,—কি করিলে এই অপ্রিয় জনশ্রুতিটাকে থামাইয়া দেওয়া যায়।

অনেক ভাবনার পর একটা আইডিয়া তাহার ক্ষুদ্র অস্বচ্ছ মস্তিষ্কটিকে অকস্মাৎ আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল।...সে আর কালবিলম্ব না করিয়া এটিকে কাজে পরিণত করিতে লাগিয়া গেল।

রাস্তায় এক বন্ধুর সঙ্গে তাহার দেখা হইল। বন্ধুটি কথা-প্রসঙ্গে একজন সুবিখ্যাত চিত্রকরের খুব প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন...

নির্ব্বোধ বলিয়া উঠিল "কি বকছ বল ত !—ও চিত্রকর ত কোন্‌কালে বাতিল হয়ে গেছে !...এ খবরটাও তুমি রাখতে না হে ? আশ্চয্য !—যাই বল, তোমার কাছে এ আমি প্রত্যাশা করিনি ! তুমি কোথায় পিছিয়ে পড়ে আছ হে ?"

বন্ধুটি সন্ত্রস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বোধের সহিত নিজের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে বলিলেন। "তবে কি না"—ইত্যাদি।

অন্য একজন বন্ধু বলিতেছিলেন "কাল যে বইটা পড়্‌ছিলুম, সে যে কি আশ্চয্য চমৎকার..."

শুনিয়া নির্ব্বোধ বলিয়া উঠিল "অবাক করলেন মশায় !—আমি আশ্চয্য হচ্ছি, এই কথাটা আপনি অসঙ্কোচে বলতে পারলেন ! বইটা একেবারে বাজে, কোনও কাজের নয় ! সকল লোকেই ত ওকে নেড়ে চেড়ে দেখে কোন্‌ কালে দূর করে ফেলে দিয়েছে !—আচ্ছা, সত্যই এ আপনি জানতেন না !—কোথায় পিছিয়ে পড়ে আছেন !"

বন্ধু ভয় পাইয়া অবিলম্বে নির্ব্বোধের মতে মত দিলেন।

"আমার বন্ধু ‍র কি চমৎকার লোক ! মহানুভবত্ব

যদি কারও থাকে ত ওঁর আছে..."—তৃতীয় এক বন্ধু নির্ব্বোধকে বলিতেছিলেন।

নির্ব্বোধ বলিয়া উঠিল "আরে ছিঃ, এ কি বকছেন!—র—সে ত নামজাদা বদমাস—তার আত্মীয় স্বজন সকলকে ঠকিয়েছে!—এ ত বিশ্বসংসারের সবাই জানে! কোনও খবর রাখেন না! যে যুগে বাস করছেন তার সঙ্গে আপনার কোনওই যোগ নেই দেখছি!"

এই তৃতীয় বন্ধুটিও অত্যন্ত ভয় পাইয়া গিয়া নির্ব্বোধের সহিত একমত হইলেন এবং বন্ধু র'র সংশ্রব ত্যাগ করিলেন।

এমনি করিয়া যে-কোনও ব্যক্তির, যে-কোনও বিষয়ের কোনওরূপ প্রশংসা তাহার সম্মুখে হইত, নির্ব্বোধ তাহার উত্তরে এই একই বুলি খুব জোরের সহিত আওড়াইয়া যাইত।

কখনও কখনও সে অত্যন্ত ধিক্কার দিয়া বলিত "আচ্ছা, আজও তোমাদের 'authorities'এ বিশ্বাস গেল না!"

তাহার বন্ধুবান্ধবেরা তাহার সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিল "লোকটা নিন্দুক, বিদ্বেষী।—কিন্তু কি মাথা!"

অন্যেরা যোগ দিত, "আর কি জিভ! বলতেই হবে, ক্ষমতা আছে!"

ফলে এক মাসিক পত্রের সম্পাদক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া পড়িলেন—তাঁহাদের সমালোচনার ভার তাঁহাকে লইতেই হইবে।

এবং নির্ব্বোধও তাহার বুলি এবং বিস্ময় প্রকাশের ভঙ্গীর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া সকল লোক এবং সর্ব্ববিষয়ের ধারাবাহিক সমালোচনা করিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন যে authoritiesএর বিরুদ্ধে এত বক্তৃতা করিয়াছিল, এমনি করিয়া আজ সে নিজেই একজন অথরিটি হইয়া উঠিল—এবং যুবকেরা তাহাকে ভক্তি করে, ভয়ও করে।

বেচারী যুবকের দল—এ না করিয়া তাহাদের কি উপায় আছে!—যদিও কাহাকেও ভক্তি না-করাই হইতেছে সাধারণ নিয়ম......কিন্তু এক্ষেত্রে ত সে নিয়ম চলে না—তাহা হইলে যে তাহারা "সেকেলে" হইয়া যাইবে—কোথায় পিছাইয়া পড়িয়া থাকিবে।

ভীরুর দলে নির্ব্বোধের পসার কি চমৎকার জমে!

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

* তুর্গেনিভের গল্প হইতে অনুবাদিত।

গোয়ালিয়র ভ্রমণ

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি গোয়ালিয়র ভ্রমণে গিয়াছিলাম, ইহা মধ্যভারতের অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য। ইহার ভৌগোলিক চৌহদ্দি এই,—পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ড ও সাগর জেলা, দক্ষিণে ভূপাল ও ধার রাজ্য, পশ্চিমে রাজগড়, ঝালবার ও কোটা রাজ্য ও উত্তর পশ্চিমে চম্বল নদী ঢোলপুর ও কেরৌলী নামক দেশীয় রাজ্য। কলিকাতা হইতে ৮৬৫ মাইল। গোয়ালিয়র ষ্টেশনটি জি, আই, পি রেলওয়ের লাইন যাহা বোম্বাই হইতে দিল্লি গিয়াছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন। কলিকাতা হইতে এখানে যাইবার তিনটি রাস্তা—(১) ই, আই রেলওয়ের জব্বলপুর ব্রাঞ্চে মাণিকপুর যাইতে হয়, মাণিকপুর হইতে ঝান্সী, ঝান্সী হইতে

গোয়ালিয়রের মহারাজা।

গোয়ালিয়র যাইতে হয়। (২) পূর্ব্বোক্ত রেলওয়ের টুণ্ডলা ষ্টেশন হইতে আগ্রা ফোর্ট হইয়া যাইতে হয়। (৩) কানপুর হইতে ঝান্সী হইয়া যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে কালকা এক্স্প্রেশ সকাল দশটার সময় হাওড়া হইতে ছাড়ে; তাহাতে উঠিয়া তারপর দিন বৈকাল প্রায়

চারিটার সময় টুণ্ডলায় উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে আগ্রা ব্রাঞ্চের গাড়ীতে উঠিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আগ্রা কাণ্টনমেণ্টের গাড়ীতে চড়িয়া প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটার সময় গোয়ালিয়র ষ্টেশনে পৌছিলাম। প্রথমে ষ্টেশনটি দেখিয়া মনে কতই নিরাশার উদয় হইল, কারণ ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত হইলেও সামান্য রকমের তৈলের আলোর দ্বারায় আলোকিত। ইহা একটি জংশন ষ্টেশন—গোয়ালিয়র সিপরী, গোয়ালিয়র ভিণ্ড, গোয়ালিয়র কলান, গোয়ালিয়র লাইট রেলওয়ের তিনটি শাখা আছে। ইহা গোয়ালিয়র মহারাজার নিজের রেলওয়ে।

গোয়ালিয়র দুর্গ।

ষ্টেশনটি ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম, তখন স্থানটি বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত দেখিলাম। ইহার নিকটে "গোয়ালিয়র হোটেল", ইহা ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। কিছুদূর যাইলে "লস্কর হোটেল"—ইহা সর্ব্বজাতীয় ভারতীয় ভদ্রলোকদিগের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। নিকটে একটি ধর্ম্মশালাও আছে, ইহার নাম "শ্রীকৃষ্ণ-ধর্ম্মশালা"; লালা রামজী দাস বৈশ এবং বালকিশন নামক ভদ্রমহোদয়গণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে সকল-প্রকার বিদেশী হিন্দুরা বিনা মাশুলে থাকিতে পারেন।

এখানে টংগা ছাড়া আর কোন যান না থাকায় টংগা ভাড়া করিলাম। সহরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে "চুঙ্গি" গাড়ী আটক করিল, কারণ আমি বিদেশী, কোন নূতন দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছি কি না দেখিবার জন্য; কিন্তু কিছু দেখিতে না পাইয়া নিরাশ মনে প্রস্থান করিল। টংগা যোগে প্রায় চার মাইল দূরবর্ত্তী দৌলতগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড পাহাড় দেখিলাম। তাহার উপর "গোয়ালিয়র দুর্গ" অবস্থিত। ইতিহাসে ইহা দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে গোয়ালিয়রের রাজধানী গোয়ালিয়র ছিল, এক্ষণে লস্কর। পুরাতন গোয়ালিয়র পরিত্যক্ত হওয়ায় এক্ষণে একটি নগণ্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

লস্কর একটি সুন্দর সহর। বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত। কিন্তু জ্যোৎস্না রজনীতে আলো জলে না, খরচ বাঁচানো হয়। বাড়ী ঘর সমস্তই প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহার বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা ৮৮,০০০। খাদ্য দ্রব্য খুব সস্তা। রোহিত মৎস্য দুই আনা সের, মাংস তিন আনা সের, শীতকালে আঙ্গুর আট আনা সের। ১২ সের খাঁটি দুগ্ধ ১৲ একটাকায় পাওয়া যায়। বাড়ীভাড়া খুব সস্তা, বড় ত্রিতল বাটী পাঁচ ছয় টাকায় ভাড়া পাওয়া যায়। এখানে দোকান করিলে লাইসেন্স দিতে হয় না। এই সহরে একটি বড়বাজার আছে, তাহাকে ভিক্টোরিয়া মার্কেট বলে; ইহা স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে।

লস্করের জেনারল পোষ্ট অফিস, হাইকোর্ট, থিয়েটার হল, গভর্মেণ্ট প্রেস, জয়াজী মেমোরিয়াল হস্পিটাল প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর অট্টালিকা। এখানে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে, তাহাকে ভিক্টোরিয়া কলেজ বলে। সহরটি চতুর্দ্দিকে গিরিমালায় বেষ্টিত, ইহাই প্রাচীরের কাজ করিতেছে। এখানে বিজয়া দশমীর দিন "দশরা" উৎসব হইয়া থাকে, এইদিন সরকারী অফিস, আদালত, দোকান-পাট সমস্ত বন্ধ থাকে। প্রাতঃ-কালে মহারাজ বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ "জয়বিলাস" হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরবর্ত্তী "গোখরী" নামক মন্দিরে আইসেন; নূতন রাজবাটী হইবার পূর্ব্বে ইহাই রাজবাটী ছিল। সঙ্গে

উচ্চপদস্থ সর্দ্দার ও রাজকর্ম্মচারীগণ, অশ্বারোহী ও পদাতিকের দল থাকে। মহারাজ মন্দিরে প্রবেশ করিলে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। রাজা প্রথমে অস্ত্রপূজা করেন, তারপর "গোখরী" ঠাকুরের পূজা করেন। "গোখরী"-মন্দিরে বাইজীদের গান হয়। এই দেশে সকল কার্য্যেই বাইজীদের গান হয়,—শ্রাদ্ধে, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, এমন কি তত্ত্ব পাঠাইতে হইলেও বাইজীগণ গান করিতে করিতে যায়। এই দিনে বৈকালে প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময় মহারাজ হাতীর উপর আরোহণ করিয়া সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করেন। তাঁহার পশ্চাতে রেসিডেণ্ট সাহেব হাতীর উপর আরোহণ করিয়া আইসেন, তবে মহারাজার হাওদা বহুমূল্য স্বর্ণনির্ম্মিত, সাহেবের হাওদা রৌপ্যনির্ম্মিত। তৎপরে অমাত্যবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজন সকলেই হাতীর উপর আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান। কলেজের কিছুদূরে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সন্ধ্যাকালে সেই কালীকে পাণ্ডারা নীচে আনয়ন করেন, মহারাজ তাঁর পূজা করেন, তৎসঙ্গে কেল্লা হইতে ঘন ঘন তোপধ্বনি হইতে থাকে। পরদিবস রাজবাটীতে "দরবার" হয়। এই রাজপ্রাসাদটি অতীব মনোরম। এই রাজবাটীর নাম "জয়বিলাস", বাগানের নাম "ফুলবাগ"। এই ত্রিতল রাজবাটী সুন্দর শ্বেতমর্ম্মরে প্রস্তুত। প্যারিস হইতে মিস্ত্রি আনাইয়া ভূতপূর্ব্ব মহারাজের আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই রাজবাটী ও তাহার সংলগ্ন বাগান প্রায় একমাইল ব্যাপী।

প্রথমে রাজবাটীর বিলিয়ার্ডরুমে উপস্থিত হইলাম। বিলিয়ার্ড-মাষ্টারটি রাজপুত, তাঁহার ভদ্রতায় আমরা প্রীত হইলাম, তাঁহার পিতা জয়পুর মহারাজার বিলিয়ার্ড-মাষ্টার। তাহার পরে খাবার ঘরে গেলাম, এখানে মহারাজ তাঁহার বন্ধুবান্ধবের সহিত নৈশভোজন করিয়া থাকেন। প্রায় তিনশত গদি দিয়া মোড়া চেয়ার আছে, এখানে একটি প্রকাণ্ড টেবিলের উপর একটি ইঞ্জিন ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ী লাগান আছে, তাহাতে নানারূপ খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ থাকে, যাহার যাহা আবশ্যক তাহা চলমান গাড়ী হইতে তুলিয়া লন, ইহা বৈদ্যুতিক প্রভাবে চলিতে থাকে। গৃহের চারিদিকে বেলোয়ারী কাচের আঙ্গুরের গাছ, নাসপাতি ও আপেলের গাঁছ বৈদ্যুতিক প্রভাবে প্রজ্বলিত হয়। তারপর দেখিলাম মহারাজার রান্নাঘর, এখানে মহারাজার খাদ্যাদি প্রস্তুত হয়, দুঃখের বিষয় সমস্তই সাহেবী ধরণে। একজন

গোয়ালিয়র দুর্গে মান-মন্দির।

ইংরেজ রাঁধুনী আছেন, তাঁহার বেতন মাসিক নয়শত মুদ্রা! দরবার-গৃহের সোপানগুলি মার্ব্বল প্রস্তরে মণ্ডিত ও তাহার রেলিঙগুলি স্বচ্ছ কাচে নির্ম্মিত। ইহাকে Crystal railing বলে। এই কাচের-রেলিং-যুক্ত সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া "দরবার-গৃহে" উপস্থিত হইলাম। এই প্রকাণ্ড গৃহের কারুকার্য্য দেখিতে দেখিতে নয়নের পলক পড়িল না। সোনালী কাজ করা, পাঁচশ ডালের দুইটি ঝাড়, দরবার ও অন্যান্য উৎসবের সময় বৈদ্যুতিক প্রভাবে আলোকিত হয়। ঘরের এক দেয়ালে বর্ত্তমান মহারাজার পিতা বাজিরাও সিন্ধিয়ার বা জয়াজী রাও

সিন্ধিয়ার প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং ছবি। দশরার পরদিবস দরবার হইল,—এই দিনে মহারাজার অধীনস্থ যাবতীয় সামন্ত রাজা ও সর্দ্দার এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে কুর্নীশ করেন এবং মোহর ও গিনি উপঢৌকন প্রদান করেন। এই সমস্ত রাজারা সিন্ধিয়াকে বার্ষিক কর দিতে বাধ্য। কিন্তু শাসন সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার অধিকার নাই। দরবারে নাচগানের খুব ধুমধাম। গোয়ালিয়রের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা মন্নু বাইজী ও তাঁহার কন্যাদ্বয় এবং অন্যান্য বাইজীগণ দরবারী সঙ্গীত করে। আতর গোলাপে গৃহ পূর্ণ থাকে। সর্দ্দারগণের বহুমূল্য দরবারী পোষাক দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম।
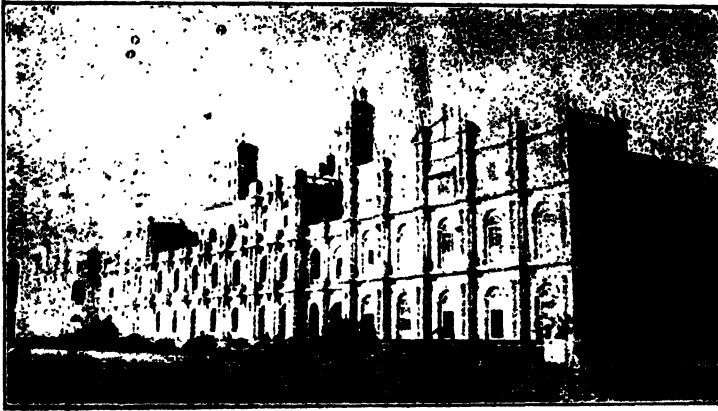
গোয়ালিয়রের জয়বিলাস রাজপ্রাসাদ।

মহারাজের দরবারের পর, মহারাণীর দরবার হয়, তবে চিক ফেলিয়া দেওয়া হয়, কারণ মহারাজের অন্তঃপুরের রমণীগণ সকলেই পর্দ্দানসীন। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে একজন বাঙ্গালীকে দরবারী পোষাকে আসিতে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, তিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জীনিয়ার। প্রাসাদের এক অংশকে মন্নুমহল বলে। ইহা মহারাজার প্রিয়তমা ভগিনী মন্নুবাইয়ের নামে নির্ম্মিত হইয়াছে, এই মহলে মহামান্য ভারতসম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ যখন যুবরাজরূপে গোয়ালিয়র ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তখন এই গৃহে বাস করিয়াছিলেন। এই গৃহের প্রতিকার্য্যই সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং গৃহটি নানারূপ আসবাবে পূর্ণ। এই গৃহে রাজপ্রতিনিধি বড়লাট হার্ডিং প্রায় একমাসকাল বাস করিয়াছিলেন। আমরা যে দিন রাজবাটী দেখিতেছিলাম তখনও মহারাজা ও মহারাণীরা গ্রীষ্মবাস সিপরী হইতে আইসেন নাই। সুতরাং আমরা সৌভাগ্যক্রমে রাজার ও রাণীর শয়নগৃহ পর্য্যন্ত দেখিতে সুবিধা পাইয়াছিলাম। বর্ত্তমান মহারাজার দুই রাণী, বড় রাণী সাতারা দেশের একজন সর্দ্দারের কন্যা। কিন্তু প্রথমা রাজ্ঞীর সন্তানাদি না হওয়ায় রাজমাতার বিশেষ অনুরোধে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—প্রথম, বরোদার রাজকুমারী শ্রীমতী ইন্দিরার সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কিন্তু সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার পর অন্য স্থানে দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। ছোট রাজমহিষীর গর্ভে এক্ষণে একটি কন্যাসন্তান হইয়াছে। নওতলাও কোঠি—ইহাতে এক সময়ে নয়টি সরোবর ছিল। এই প্রাসাদে মহারাজের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে থাকিতে দেওয়া হয়। মোতি-মহল—এককালে মহারাণীদের আবাসস্থল ছিল, এক্ষণে "দপ্তর" বা অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

একদিন অতি প্রত্যুষে গোয়ালিয়র দুর্গ দেখিতে গিয়াছিলাম। টংগা ঘণ্টাহিসাবে ভাড়া করিলাম, প্রথম ঘণ্টা ছয় আনা, দ্বিতীয় ঘণ্টা চারি আনা। এখানে পাল্কীগাড়ী নাই, টংগা এক্কাগাড়ী হইতে ঢের ভাল, তবে তিন জনের বেশী আরোহণ করিবার উপায় নাই—গাড়োয়ানের পার্শ্বে একজন, পশ্চাতে দুইজন। টংগা দুর্গাভিমুখে ছুটিল; তাহার পর খাড়া উঁচু রাস্তা, আর টংগা চলে না, আমরা পদব্রজে অতিকষ্টে উঠিতে লাগিলাম। যখন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীরূপে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্গে গমন করিয়াছিলেন। তারপর দুই আনা করিয়া দর্শনী দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুর্গটি উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে দীর্ঘ প্রায় দেড় মাইল, প্রস্থে প্রায় তিনশত গজ, চতুর্দ্দিকে ৩৫ ফুট খাড়া

গোয়ালিয়র দুর্গের তোরণ, ফটকের সম্মুখে টংগা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

প্রাচীর বেষ্টিত, দুর্গটি কয়েকটা ফটকে সুরক্ষিত—তাহাদের নাম আলমগিরি ফটক, হিন্দোল ফটক, বাগেশ্বর ফটক, গণেশ ফটক, লক্ষ্মণ ফটক ও হাতীয়া ফটক। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ঔরাঙ্গজেবের নামানুসারে আলমগিরি ফটক নির্ম্মিত হয়; কথিত আছে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে, সূরজসেন নামক কোন হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। সুলতান মামুদ ইহা কিছুতেই অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই, মহম্মদ ঘোরী যদিও জয় করেন তথাপি বেশী দিন নিজ অধীনে রাখিতে সক্ষম হন নাই। হিন্দু, জৈন, মুসলমান, সর্ব্বশেষে মহারাষ্ট্রীয়রা ইহা জয় করিয়া লন। দুর্গ-মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত অনেক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন আদিনাথের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত; ইহা ছাড়া বৌদ্ধ ও জৈনদিগের কত মূর্ত্তি আছে, তাহা বলা যায় না; কিন্তু দুঃখের বিষয় মূর্ত্তিপূজার বিরোধী মুসলমান সম্রাট বাবর ইহাদের [illegible] করিয়া দেন। দুর্গমধ্যে মহারাজ মানসিংহের মানমন্দির, [illegible] আছে, এখানে ইংরেজীতে এরূপ লেখা আছে, Man Mandir Palace built in the reign of Raja Man Singh (1486-1516)। এই প্রাসাদ দেখিলে হিন্দুরাজাদের সময়ে তাঁহাদের কিরূপ সুন্দর গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী ছিল তাহা জানাইয়া দেয়। এই প্রাসাদে এমন গুপ্ত স্থান আছে, যেখানে শত শত লোক লুকাইয়া থাকিতে পারে। এই প্রাসাদ এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া বাদুড় ও পেচকের আবাসস্থল হইয়াছে, এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে। দুর্গমধ্যে অনেকগুলি মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটিকে শাশবাহু-মন্দির বলে। একাদশ শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মিত হয়। দ্বিতীয়টি তেলিকা লাট মন্দির—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মন্দির। এই মন্দিরগুলি শ্রীভ্রষ্ট করিবার জন্য মুসলমানেরা উক্ত মন্দিরগাত্রে চুন লেপিয়া দিয়াছেন। শাশবাহু মন্দিরে ইংরেজীতে এরূপ লেখা আছে This temple was cleaned and stripped of the chuna with which the Mahamedans had defaced it for centuries.

আদিনাথ-মূর্ত্তি।

আদিনাথ-মূর্ত্তির সন্নিহিত জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি

ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ঐ মন্দিরদ্বয় মেরামত করিয়া দিয়াছেন। ইহার সংস্কারার্থ গোয়ালিয়রের মহারাজ ৪০০০ চারি হাজার টাকা ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ৭৬০৫ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৬১ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুর্গটি ইংরেজদের হস্তে ছিল, কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়র দুর্গটি গভর্মেণ্ট মহারাজের হস্তে দেন এবং মহারাজ ইংরেজ গভর্মেণ্টের হস্তে ঝান্সী ছাড়িয়া দেন। এক্ষণে দুর্গে আর সৈন্যেরা থাকে না, এখানে সরদারগণের ছেলেদের পড়াইবার জন্য স্কুল হইয়াছে। শুনিলাম, রেসিডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞা ব্যতীত মহারাজ দুর্গটি সংস্কার করিতে পারেন না। কালের কি মহিমা! যে সিন্ধিয়ার প্রভাবে এক সময়ে উত্তর ভারত কম্পিত হইত, এমন কি দিল্লির বাদশাও যাঁহাকে চৌথ ও সরদেশমুখী দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা ব্রীটিশ সিংহের নিকট আজ শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন। দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া গোয়ালিয়রের প্রধান জেল দেখিতে যাইলাম, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব জয়াজী মহারাজ এই জেল নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। ইহাতে ভাল ভাল সতরঞ্চী, কার্পেট, কম্বল, আসন প্রস্তুত হয়। লস্কর সহরের তিন মাইল দূরে মোরার নামে সহর। ইহাই মহারাজার সৈন্যনিবাস। এখানে রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য ইংরেজেরাও বাস করেন। এখান থেকে গোয়ালিয়রের দুর্গে যাইবার একটি রাস্তা আছে। এখানকার জলবায়ু লস্কর অপেক্ষা ভাল।

একদিন পুরাতন গোয়ালিয়রে সঙ্গীতাচার্য্য মিয়া তানসেনের সমাধি দেখিতে যাওয়া গেল। পুরাতন গোয়ালিয়রের পূর্ব্বগৌরব নষ্ট হইয়া একটা নগণ্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বে ইহাই গোয়ালিয়র রাজধানী ছিল। তানসেনের সমাধির কোন জাঁকজমক নাই, কিন্তু নিকটে তাঁহার গুরু গায়স উদ্দীনের সমাধি খুব জাঁকজমকের সহিত নির্ম্মিত। এই সমাধিগুলি সম্রাট আকবরের রাজত্ব-কালে নির্ম্মিত। তানসেনের কবরের উপর একটি তেঁতুল-গাছ আছে, দূর দেশান্তর হইতে গায়ক গায়িকারা আসিয়া এই বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করেন; এরূপ প্রবাদ আছে, তাহাতে গলা মিষ্ট হয়। একদিন ছত্রী দেখিতে
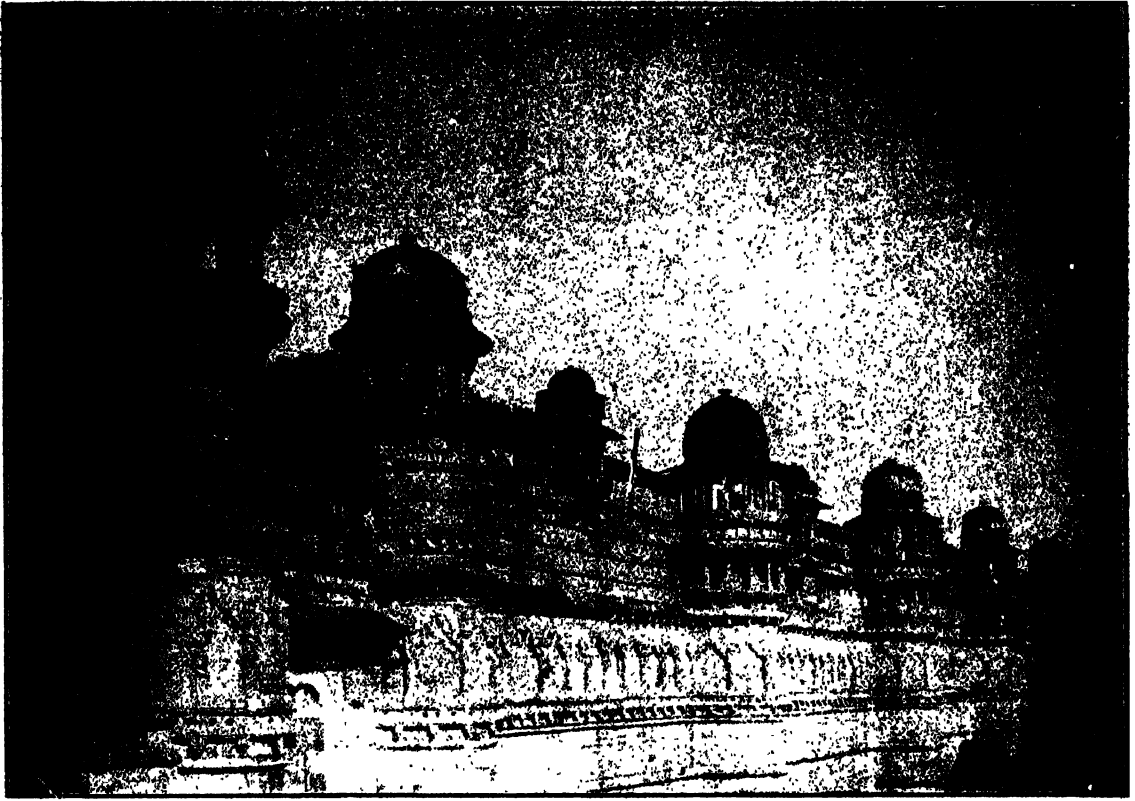
গোয়ালিয়র দুর্গে মানসিংহের প্রাসাদ মান-মন্দির, ইহার গায়ে অনেক মূর্ত্তি খোদিত আছে।

যাইলাম। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের সমাধি। প্রকাণ্ড মন্দিরের মধ্যে ইঁহাদের সমাধি। প্যারিস হইতে ইঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি কষ্টিপাথরে প্রস্তুত করিয়া আনা হইয়াছে; যাঁহার যে কয়টি রাণী, তাঁহার সেই সেই রাণী পার্শ্বে আছেন। মহারাজদের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। রাত্রি কালে ছত্রীতে ভজনগান হইয়া থাকে। লস্করে তিন জন রাজার ও একজন রাণীর সমাধি আছে—বর্ত্তমান রাজার পিতা বাজিরাও সিন্ধিয়া বা জয়াজী রাও সিন্ধিয়া, দৌলতরাও সিন্ধিয়া, জনকজীরাও সিন্ধিয়া এবং বাইজী বাই সিন্ধিয়া। শেষোক্ত মহিলার নাম ইতিহাসে খুব প্রসিদ্ধ, ইনি দৌলত রাও সিন্ধিয়ার পত্নী, এবং আসাই যুদ্ধে স্বামীকে লইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। এই-সকল মন্দিরের মধ্যে জয়াজী মহারাজের মন্দির অতীব সুন্দর এবং কারুকার্য্যপূর্ণ, কারণ ইঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান মহা-রাজার মাতা এখনও জীবিতা। প্রতিদিন এই ছত্রীতে একশত জন ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়া থাকে, ইঁহার পিতার আমলে একহাজার জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ভোজন করিত। ইঁহার পিতার আমলে এখানে স্বকীয় রৌপ্য মুদ্রা, তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে কেবল তাম্রমুদ্রা চলে। তাম্র-মুদ্রায় রাজার প্রতিমূর্ত্তি আছে।

মহারাষ্ট্রবীর রণজী সিন্ধিয়া বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ। ইনি বালাজী পেশোয়ার পাদুকাবাহক এবং ইঁহার পিতা দাক্ষিণাত্যের কোন গ্রামের পাটেল মাত্র ছিলেন। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইনি গোয়ালিয়র রাজ্যের অধিকারী হন। ইঁহার মৃত্যুর পর মাধোজী সিন্ধিয়া নামেমাত্র পেশোয়ার অধীন ছিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইনি যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়া-ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতার পৌত্র দৌলত রাও সিন্ধিয়াকে রাজ্যভার দিয়া পরলোক গমন করেন। ইনি ভয়ানক যোদ্ধা ও বীরপুরুষ ছিলেন, রাজপুত রাজারা

গোয়ালিয়রে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত জৈন মূর্ত্তি।

কেহই তাঁহার সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠিত না। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লসবরীর যুদ্ধে লর্ড লেক সিন্ধিয়ার সৈন্যগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই সময় এক সন্ধি হয় যাহাতে সিন্ধিয়া হিন্দুস্থানের প্রদেশসমূহ, আগ্রা, দিল্লি প্রভৃতি ও অজন্তা পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে দৌলতরাওয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্ত্রী একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ইনি জনকজী সিন্ধিয়া নামে খ্যাত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জনকজী অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী একটি অষ্টম বর্ষীয় শিশুকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইনি বাজিরাও সিন্ধিয়া বা জয়াজীরাও সিন্ধিয়া নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার সময়ে সিপাইবিদ্রোহ হয়। যখন গোয়ালিয়রের সিপাই সৈন্যেরা বিদ্রোহে যোগদান করে, তখন ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী রাজা দিনকার রাওয়ের পরামর্শে জয়াজীরাও সিন্ধিয়া কিছুতেই ইংরেজপক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই; মুষ্টিমেয় মহারাট্টা সৈন্য লইয়া বিদ্রোহী সৈন্যদের সম্মুখীন হন, কিন্তু বিদ্রোহীদল ঝান্সীর রাণী ও তান্তীয়া তোপীর দ্বারায় পরিচালিত হইয়া মহারাজাকে পরাজিত করে, গোয়ালিয়র দুর্গ বিদ্রোহীদের হস্তে পড়ে, মহারাজ ও তাঁহার মন্ত্রী আগ্রায় পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। পরে সার হিউ রোজ সসৈন্যে যাইয়া গোয়ালিয়র দুর্গ পুনরায় অধিকার করিয়া রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্রোহ নিবারিত হইলে মহারাজের এই রাজভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ ইংরেজ গভর্মেণ্ট তিনলক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। পবিত্র তীর্থস্থান বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা রাজধানী ছিল, তৎপরে দৌলত রাও সিন্ধিয়া গোয়ালিয়রে রাজধানী লইয়া আইসেন। এক্ষণে উজ্জয়িনী মালবের মধ্যে প্রধান সহর। বর্ত্তমান মহারাজ মাধব রাও সিন্ধিয়া কৃতবিদ্য, প্রজাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া থাকেন, প্রজার

গোয়ালিয়রে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত মূর্ত্তি ও মন্দির।

উন্নতিকল্পে অনেকগুলি স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রা জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচারকল্পে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন। যদি মহারাষ্ট্রা সর্দ্দারেরা তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে না দেন, তাঁহাদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন এরূপ ভয় দেখাইয়া থাকেন। ইনি সম্রাট বাহাদুরের একজন এডিকং। ইঁহার সম্মানার্থ ব্রিটিশরাজ্যে ১৯টি তোপ, নিজরাজ্যে ২১টি তোপ হয়। ইঁহার নিজের জেল, আদালত, ডাকঘর আছে, এমনকি ইনি নিজের প্রজাদের ফাঁসী পর্য্যন্ত দিতে পারেন। মহারাজকে ইংরেজ সৈন্যদের ভরণপোষণ জন্য বাৎসরিক ১৮ লক্ষ টাকা কর-স্বরূপ প্রদান করিতে হয়।

এই রাজ্যের পরিধি ২৯০৪৬ বর্গমাইল, এই রাজ্যে ন্যূনাধিক ১০৪৩৬ গ্রাম ও সহর আছে, প্রজাসংখ্যা ৩০ লক্ষ, আয় ১॥০ কোটি হইতে দুই কোটি টাকা। ইনি ভারতীয় দেশীয় নরপতিগণের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ইনি চীনযুদ্ধে গিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। এই জারমান যুদ্ধে মহারাজ সিন্ধিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, ভারতের কোন মিত্ররাজা এরূপ সাহায্য করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। Loyalty Ship, মোটর অাম্বুলেন্স, হাজার হাজার অশ্ব, প্রভৃত সৈন্য দান করিয়াছেন। স্বয়ং মহামান্য সম্রাট বাহাদুর তাঁহাকে বার বার ধন্যবাদ দিয়া পত্র দিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

গোয়ালিয়রে খোদিত জৈনশিল্প

ভারতে দ্রষ্টব্য স্থানের অভাব নাই। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্যগরিমায় ভারত ভরপুর। ভারতবর্ষ ধর্ম্মকে চিরদিনই বড় করিয়া দেখিয়াছে ও ভক্তিকে বাহিরে একটা রূপদানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছে—সে মন্দির গড়িয়াছে, মঠস্থাপন করিয়াছে, তীর্থযাত্রাকে পুণ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। ভারতের প্রায় সকল ধর্ম্মই এ বিষয়ে

গোয়ালিয়রে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত মূর্ত্তি ও মন্দির।

একরূপ একমত। দেবালয় নির্ম্মাণে ভারতের শিল্পপদ্ধতি উন্নতিলাভ করিয়াছে—বিশেষতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের ভারতশিল্পের উন্নতির প্রধান কারণই দেবনিকেতনের নির্ম্মাণচর্চ্চা। পর্ব্বতের গুহায় গুহায় প্রাচীন শিল্পীরা শিল্পের কত অনুপম নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বলা যায় না। কত গুহায় একএকটি বিভিন্ন ধর্ম্মের দেবালয় গঠিত হইয়াছিল, আবার কত গুহায় নানা ধর্ম্মের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। কোনও গুহায় শুধু বৌদ্ধশিল্পেরই পরিচয় পাওয়া যায়, আবার কোথাও বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ও জৈন সকলেরই সুনিপুণ হস্তের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া আছে। ইলোরার গুহামন্দির পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে কেমন করিয়া পরে পরে তিনটি ধর্ম্মবিশ্বাসের ভাব তথায় বহিয়া গিয়াছে। প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞানবার্ত্তা সেখানে প্রচারিত হইয়াছিল; তারপর আসিল সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, সকলের পরে আসিল তীর্থঙ্কর জৈনরা। সকল ধর্ম্মের শিল্পীরাই তাঁহাদের হাতের ছাপ গুহাগাত্রে রাখিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মের গুহাতেই একটা স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হয় যদিও তাহাদের উপর পূর্ব্ব শিল্পীগণের প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয়ও পাওয়া যায়। বিজাপুরের নিকট বাদামীগিরিগুহা দেখিলেও তিনটি বিভিন্ন ধর্ম্মের অভিব্যক্তির পরিচয় চারিটি গুহাতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আবার হস্তীগুম্ফা শুধু শৈব ধর্ম্মের ও অজন্তা বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়ডঙ্কা সশব্দে নিনাদিত করিয়াছে। এই-সকল গিরিগুহা হইতে দেখা গিয়াছে বৌদ্ধ ও হিন্দুরাই এই কার্য্যে বেশী ওস্তাদ ছিলেন। ইলোরার কৈলাস নামক গুহায় যে-শ্রেণীর শিল্প আছে তাহা বোধ হয় জগতে অদ্বিতীয় ও শিল্পীর কলানৈপুণ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। হিন্দু ও বৌদ্ধদের পাশাপাশি ভারতের অপর প্রধান ধর্ম্ম জৈনধর্ম্ম জন্মিয়া এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল না, অবশ্য বিস্তৃতিতে ও সংখ্যার অনুপাতে ইহা যে হঠিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। তথাপি তাহাদের শিল্পও নিজের একটা পথ নির্ব্বাচন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইলোরার জৈনমন্দিরে কতকগুলি সুন্দর প্রস্তর-তক্ষণশিল্পের পরিচয়

পাওয়া যায়, কিন্তু বাদামী গিরিগুহা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা চলে না। ইলোরাতে চিত্রগুলি যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে বাদামীতে সেরূপ নহে—সেখানে যে যেরূপ পাইয়াছে সেইরূপ চিত্রের সন্নিবেশ করিয়াছে (যাঁহারা বাদামী গিরি-গুহা সম্বন্ধে জানিতে চাহেন তাঁহারা ১৩৩০ সালের ভাদ্রমাসের প্রবাসী পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন)। জৈন মন্দিরগুলির প্রধান একটি বিশেষত্ব এই যে তাহাতে বহু দিগম্বর তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক কানিংহাম সাহেবের গোয়ালিয়রের তীর্থঙ্কর-মূর্ত্তি ও অন্যান্য খোদিত প্রস্তরশিল্পের বর্ণনা পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয় ও স্বতঃই মনে হয় যে যাই একবার মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া আসি। পর্য্যটকগণও এখানে আসিয়া বহু মূর্ত্তির কোনটি ফেলিয়া কোনটি আগে দেখিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না।

গোয়ালিয়র দুর্গে প্রবেশ করিয়া পর্য্যটক মানসিংহের ভবনের প্রাচীর-গাত্রে খোদিতশিল্পের পরিচয় খুব কমই পান, কিন্তু ইহা দেখিয়াই নিরুৎসাহ হইয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি ঠকিবেন। উত্তর-পশ্চিমেও তক্ষণশিল্পের নমুনা কম এবং দেখিবারও উপায় নাই, কারণ মহারাজার আদেশে সেদিকে যাইবার হুকুম নাই। দক্ষিণ-পশ্চিমের অবস্থাও তদ্রূপ, দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছুই নাই। দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও উরবাহী উপত্যকায় গেলে পর্য্যটক এইরূপ তক্ষণশিল্পের বিশেষ পরিচয় পাইবেন। যিনি ইহা না দেখিয়া আসিবেন গোয়ালিয়র ভ্রমণ তাঁহার সার্থক হইবে না। দুর্গের মধ্য-স্থলে পশ্চিমদিকে উরবাহী উপত্যকায় উঠিবার জন্য পাথরের সিঁড়ি পাহাড় কাটিয়া তৈরী করা হইয়াছে। এই পথ লস্কর ও নগরের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় চারিদিকের দৃশ্য ভারী মনোহর বোধ হয় এবং দুই ধারের পর্ব্বতগাত্রে খোদিত মূর্ত্তিগুলি পর্য্যটকের বিস্ময় উৎপাদন করে। জৈন শিল্পের পরিচয় পাইয়া দর্শক আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। দ্বাবিংশটি বৃহদাকার দিগম্বর তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ছয়টি শিলালেখও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে তক্ষণের তারিখ জানা যায়। এই তারিখ হইতে বুঝা যায় যে তোমর রাজাদের সময় (১৪৯৭-১৫১০ সংবৎ বা ১৪৪০-১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) এই মূর্ত্তিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তক্ষণের সময় ইহাদের এরূপ হীনাবস্থা ছিল না, মূর্ত্তিপূজা-বিরোধী মুসলমানদের অত্যাচার হইতে মূর্ত্তিগুলি রক্ষা পায় নাই। বাবরের আদেশে মূর্ত্তিগুলির এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। বাবর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন "পর্ব্বত-গাত্রে জৈনেরা ছোটবড় বহু মূর্ত্তি খোদাই করিয়াছিল। দক্ষিণদিকে একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে, ইহা উচ্চতায় বোধ হয় ৪০ ফুট হইবে। মূর্ত্তিগুলি সম্পূর্ণ দিগম্বর, এমন একখানি বস্ত্রও জুটে নাই যদ্দ্বারা দেহ ঢাকা যায়। এই আদওাগিরি অতি মনোহর। এই স্থানটি আরও মনোহর হইত যদি না এখানে এই মূর্ত্তিগুলি থাকিত। আমি এইগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে আদেশ দান করিয়াছি।" সম্রাট নিজেই মূর্ত্তির প্রতি তাঁহার বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি মূর্ত্তি-গুলিকে শিল্পের হিসাবে বজায় রাখিতেও তাঁহার ধৈর্য্য ছিল না। যদিও এগুলিকে ধ্বংস করিতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল তথাপি ইহার অধিকাংশকেই দেখিলে পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গ ত্যাগ করিবার সময় বাম পার্শ্বের আদিনাথের মূর্ত্তি প্রত্যেক পর্য্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বাবর বলিয়াছেন যে ইহার উচ্চতা ৪০ ফুট, কিন্তু সম্রাট এখানে ভুল করিয়াছেন—বর্ত্তমানে মাপিয়া দেখা গিয়াছে ইহার উচ্চতা ৫৭ ফুট; উচ্চতার হিসাবে দেহের অন্যান্য ভাগ ও সমগ্র মূর্ত্তিটি কিরূপ বিশাল মনে করুন। আকৃতিটি শুধু স্থূলতার জন্যই বিখ্যাত, সৌন্দর্য্যের মাত্রার ইহাতে যথেষ্ট অভাব আছে। যাঁহারা মহীশূরের শ্রাবণবেলগোলার মূর্ত্তিগুলি দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করিতে পারিবেন। পর্ব্বতগাত্র খুদিয়া মূর্ত্তিটি তৈরী। আদিনাথের পায়ের পাতা আট ফুট লম্বা ও গোলাকৃতি ও সমস্ত মূর্ত্তিটি পায়ের সাত গুণ উচ্চ। একদিক হইতে দেখিলে সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটি দেখা যায় না, কারণ পিছনের পর্ব্বত-গাত্র হইতে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া কাটিয়া গড়া হয় নাই, পিছনের পর্ব্বতগাত্রটি রহিয়াই গিয়াছে। সব মূর্ত্তিগুলিই ঐরূপ পর্ব্বতগাত্রে খোদিয়া রাখা হইয়াছে। পশ্চিম দিকে আর একটি বৃহদাকার মূর্ত্তি আছে। এইটি

দ্বাবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর নেমনাথের প্রতিরূপ। ধ্যানী বুদ্ধদেবের প্রতিরূপের অনুরূপ কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি হইতে এইগুলির পার্থক্য এই যে ইহাদের কাহারও নিকটে বৃষ, কাহারও নিকটে চক্র, পদ্ম, অর্দ্ধচন্দ্র, অশ্ব, সিংহ প্রভৃতির মূর্ত্তি খোদিত আছে। আদিনাথের নিকট বৃষের মূর্ত্তি আছে।

উপত্যকার দক্ষিণদিকে আর এক অধ্যায়ের চিত্রসমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। এই-সকল মূর্ত্তির প্রায় সকলগুলিই ত্রয়ী বলিতে হয়, একাকী কেহই নহে। একটু দূরে একটি কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরপ্রাচীর আছে, এখানে পূজা হইত। মূর্ত্তিগুলির উপরের ছাদেও নানারূপ কারুকার্য্য আছে ও নিকটেও বহু জৈন ধর্ম্মের চিত্র আছে।

দক্ষিণ পূর্ব্বের মূর্ত্তিশ্রেণী উরবাহীর প্রাচীরের বহির্ভাগে অবস্থিত। ইহার মধ্যে দুই একটি দ্রষ্টব্য চিত্র আছে। আট ফুট লম্বা একটি নারীর মূর্ত্তিই প্রধান। রমণীটি কাৎ হইয়া শুইয়া বিভোর নিদ্রা যাইতেছেন। উরু দুইটি বেশ সোজা হইয়াই আছে কিন্তু বামপদ বাঁকা হইয়া দক্ষিণ পদের নীচে পড়িয়াছে। আর একটি চিত্রে তিনটি আকৃতি একসঙ্গে তক্ষণ করা হইয়াছে—শিশু মহাবীর ও তাঁহার পিতা সিদ্ধার্থ ও মাতা ত্রিশালা।

দক্ষিণ-পূর্ব্বের চিত্রগুলি দেখিতে যাইতে হইলে দুর্গ হইতে বরাবর যাওয়া চলে না, বাগান ঘুরিয়া উপরে উঠিতে হয়। এখানে কতকগুলি অতি সুন্দর মূর্ত্তি আছে। কারুকার্য্যের গৌরবে তাহারা ঝলমল করিতেছে। এখানে অষ্টাদশটি এরূপ মূর্ত্তি আছে যাহাদের উচ্চতা ২০ হইতে ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত; প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপিয়া মূর্ত্তিগুলি সগৌরবে অবস্থান করিতেছে। কিছুদিন হইল এখানে কতকগুলি বৈরাগী আসিয়া ডেরা বাঁধিয়াছে, তাহারা পর্য্যটকগণকে সবগুলি গুহাই দেখিবার জন্য বিরক্ত করিয়া তোলে ও পারিশ্রমিক আদায়েরও সবিশেষ চেষ্টা না করিয়া সহজে ছাড়িতে চায় না।

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

পরগাছা

(১০)

বিহারের সীমানার ধারেই পাহাড়পুর পরগণার জমিদার রাজা ধনেশ্বর চৌধুরী। তাঁহারা বাঙালী রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদের চালচলন বাঙালী অপেক্ষা বিহারীদেরই অধিকতর অনুরূপ। এই পরিবারে রাখাল বিবাহ করিয়াছে।

আজন্মের অভ্যস্ত পরিবেষ্টন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। শুধু লোকগুলাই যদি অপরিচিত হইত এবং তাহাদের আচার ব্যবহার যদি রাখালের পরিচিত হইত, তাহা হইলে সে সহজেই লোকগুলির সহিত পরিচয় করিয়া লইয়া তাহাদের মধ্যে হয়ত মিশিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু কিছুই এখানকার তাহার জানা নয় বলিয়া সে প্রতিপদে ঠোক্কর খাইয়া খাইয়া কিছুতেই কাহারও সহিত সহজে চলিতে পারিতেছিল না।

সে জন্মিয়া বড় হইয়াছিল কুঁড়ে ঘরে; এখানে এই প্রকাণ্ড নয় মহল বাড়ীর অরণ্যের মধ্যে তাহাকে আরব্য উপন্যাসের কোন্ দৈত্য রাতারাতি আনিয়া ছাড়িয়া দিয়া গেল? সে আজন্ম যে ভাষা তাহার চারিদিকে শুনিয়া আসিয়াছে, যে ভাষায় সে ষোল সতর বৎসর কথা কহিয়া অভ্যস্ত, সে ভাষা এখানকার লোকেরা বলে না, সে ভাষা ইহারা বুঝে না। সে আজন্ম বৈষ্ণব গোস্বামীর ঘরে মানুষ; সে-বাড়ীতে কাটা বলিতে নাই, বলিতে হয় বনানো, ঝোল বলিতে নাই, বলিতে হয় রসা; আর ইহারা বামাচারী শাক্ত, এ বাড়ীতে বিবিধ পশুপক্ষীর প্রাণহনন ও মাংস ছেঁড়াছেঁড়ি নিত্য দুবেলা চলিতেছে; দেখিয়া দেখিয়া রাখালের মনে হয় তাহার জন্মগ্রামখানি শান্ত অহিংসাপরায়ণ মায়ের কোলের মতন ছিল, এ যেন তাহাকে কসাইখানায় আনিয়া বন্দী করিয়াছে। মদ্য তাহার কাছে অপেয় অগ্রাহ্য, কিন্তু মদ্য ইহাদের পূজার অঙ্গ। এখানকার পুরুষেরা ঢিলা পাজামা ইজের চাপকান পরে, মাথায় পাগড়ী বাঁধে; আর স্ত্রীলোকেরা ঘাগরার মতন করিয়া কোঁচা দিয়া চুনট করিয়া চুনারি কাপড় পরে; অসঙ্কোচে সকলের সামনে বসিয়া বাঁধানো হুঁকায়, রূপা সোনায়

গড়গড়া ফরসীতে জরি-জড়ানো লম্বা শটকা নল লাগাইয়া গদিয়ান চালে তামাক খায়। উপকথার রাজপুত্র রাক্ষসের পুরীতে গিয়া যেমন বোধ করিয়াছিল, রাখালের তেমনি বোধ হয়,—চারিদিকের সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা প্রকাণ্ড বীভৎস অশুচি কাণ্ড।

বিবাহের কিছুদিন পরেই একদিন রাজা ধনেশ্বর ও তাহার রাণী জগদ্ধাত্রী দেবী পালঙ্কে সাটিনের গদির উপর কিংখাবের বড় বড় তাকিয়া ঠেসান দিয়া বড় বড় রূপার গুড়গুড়িতে তাওয়া-দেওয়া অম্বুরী তামাক খাইতেছিলেন; তাঁহাদের একমাত্র কন্যা মণিমালা কতকগুলি গুড়িয়া অর্থাৎ পুতুল লইয়া খেলা করিতেছিল; এমন সময় রাখাল খালি পায়ে খালি গায়ে কোঁচার কাপড় কোমরে বাঁধিয়া সেই ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিল। ধনেশ্বর দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ডাকিলেন—এই চাষার বেটা রাখাল, শুনে যাও।

রাখাল লজ্জিত স্মিতমুখে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

ধনেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার জামা জুতো নেই? তোষাখানার ছোট দেওয়ান দীনদয়ালকে বলগে জবু দর্জিকে ডেকে জামা চাপকান ইজের তোয়ের করিয়ে দেবে; আর ভাণ্ডার থেকে তোমার পায়ের মাপের চার জোড়া জুতো বার করে দেবে।

রাখাল বলিল—আমার জামা জুতো আছে, এখন আর চাইনে।

ধনেশ্বর বলিলেন—তোমার খানসামা কুকুরাকে বল তোমার বাক্স নিয়ে আসবে, আমি দেখব তোমার কি আছে না-আছে।

কুকুরা খানসামা সেই তুষ্টু গয়লাদের দেওয়া পটপটে টিনের তোরঙ্গটি আনিয়া ধনেশ্বরের সম্মুখে সন্তর্পণে রাখিল।

ধনেশ্বর ঠাট্টার স্বরে বলিলেন—বাঃ! বহুৎ খুবসুরৎ মজবুত বাক্স আছে! খোল্ ত কুকুরা, ওর মধ্যে কি আছে দেখি!

বাক্সর ডালা উদ্‌ঘাটিত হইতেই ধনেশ্বর হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, রাণী জগদ্ধাত্রী মুখে অঞ্চল দিয়া খুলখুল খুলখুল শব্দ করিতে লাগিলেন, মণিমালা বালুচরী চেলীর ঘোমটার ভিতর হইতে লজ্জিত স্মিতমুখে রাখালের দিকে একবার চুরি করিয়া চাহিয়া মাথা নত করিল, কুকুরা মুখ ফিরাইয়া একবার কাশিয়া হাসি দমন করিল, রাখাল মুখ লাল করিয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

ধনেশ্বর হাসিয়া হাসিয়া বাক্স হইতে এক-একটা জিনিষ তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং পরম বিস্ময়ের ভান করিয়া করিয়া বলিতে লাগিলেন—বাঃ!......বাঃ! ......তোফা!......

রাখালের চোখ ফাটিয়া জল পড়িবার মতন হইতেছিল, কিন্তু সে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সবলে আপনাকে সামলাইয়া রাখিল—এইসব হৃদয়হীন ধনগর্ব্বিত বর্ব্বরদের কাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া খাটো হওয়া কিছুতেই নয়।

রাখাল যথাসাধ্য ধীর স্বরে বলিল—দেখা ত হল, এখন রেখে দিন।

ধনেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—কুকুরা, ঘিসু খানসামাকে বল্ জামাইবাবুকে একটা কর্পূরকাঠের বাক্সয় করে কাপড় জামা জুতো ভাণ্ডার থেকে এনে দেবে। আর এ সব গন্ধয়া মেথরকে ডেকে বকশিশ করে দিগে যা।

কুকুরা বাক্স তুলিতে যাইতেছিল। রাখাল সিংহের মতন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—খবরদার! এসব আমার দিদিমার দেওয়া, এসব আমার থাকবে।

তারপর রাখাল কাহারও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপনি সেই বাক্সটি উঠাইয়া লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। কুকুরা খানসামা পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে বলিতে লাগিল—জামাইবাবু, আমাকে দিন, আমি নিয়ে যাচ্ছি......আমাকে দিন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।—কিন্তু রাখাল সে কথা কানে না তুলিয়া একেবারে আপনার ঘরে আসিয়া তবে থামিল। মেঝেতে বাক্স নামাইয়া রাখাল একখানা কৌচের উপর বসিয়া পড়িল এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ধনেশ্বর হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—হাঃ জাত্-সাপের বাচ্চা বটে! মা মণি, তোমাকে একটু সমঝে চলতে হবে!

মণিমালা সলজ্জ স্মিতমুখখানি নত করিল।

ক্ষণেক পরেই ঘিসুখানসামা দুই হাতে দুটা বড় বড় বাক্স ঝুলাইয়া ও গুরুয়া ভাণ্ডারীর মাথায় একটা প্রকাণ্ড

সিন্দুক চাপাইয়া রাখালের ঘরে আনিয়া নামাইল। রাখাল তাড়াতাড়ি দুই হাতে চোখের জল একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল—সিন্দুকটি কর্পূরকাঠের, তিন তলা; একতলায় অনেকগুলি কোঁচানো কাপড় ও চাদর গোলাপের রুঃ দিয়া সুগন্ধি করা; দ্বিতীয় তলায় বিবিধপ্রকারের জামা, মেরজাই, পিরাণ, রুমাল, তোয়ালে, গামছা, নীচের তলায়, চাপকান চোগা ইজের জোব্বা আচকান প্রভৃতি কত কি, চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে, জরির, রেশমের, যাহা কস্মিনকালেও রাখাল চক্ষে দেখে নাই, নামও শুনে নাই। একটা বাক্সের মধ্যে নানান আকারের পাগড়ী, আমামা, মুরেঠা, টুপি, তাজ, অসংখ্য; নানানপ্রকারের জুতা—জরির দিল্লিওয়াল, বিলাতী বুট, শু, চটি।

খানসামারা আলমারীতে দেরাজে বাক্সে আলনায় তেপায়ায় টুলে চৌকীতে যেখানে যাহার স্থান একে একে সমস্ত সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাখাল একটা কৌচের উপর আড়ষ্ট নির্বাক হইয়া বসিয়া বসিয়া দেখিল। দিদিমার ছেঁড়া তসরের জামাদুটি পাইয়া তাহার যে আনন্দ হইয়াছিল, তুষ্টগয়লাদের দেওয়া ছেটো জিনিসগুলি পাইয়া তাহার যে উল্লাস হইয়াছিল, এই রাজসজ্জা পাইয়া তাহার তেমন কোনো খুসীর লক্ষণ ধরা পড়িল না।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া রাখাল উঠিল। পুরনের কাপড়খানি ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীর দেওয়া কাপড় পরিল। ছাড়া কাপড়খানি সযত্নে পাট করিয়া আপনার টিনের বাক্সটিতে ভরিয়া চাবি বন্ধ করিল। তারপর প্রকাণ্ড সিন্দুকটার নীচের তলার সমস্ত জিনিস টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া সেখানে টিনের বাক্সটি লুকাইয়া রাখিল। সিন্দুক বন্ধ করিতে করিতে সে এমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল যেন অতীত জীবনের সমস্ত স্নেহ ভালবাসার স্মৃতিচিহ্নকে কবর দিয়া তাহার উপর মাটি চাপা দিতেছে। যে জিনিসগুলাকে টানিয়া বাহির করিয়াছিল, সেগুলাকে দেরাজে আলমারীতে চারাইয়া রাখিয়া দিল।

রাখাল ফক্‌রে পোষাক ছাড়িয়া রাজবাড়ীর যোগ্য পোষাক পরিয়াছে দেখিয়া রাজারাণী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকারদার অভাবে চাকর দাসী পর্য্যন্ত সকলেই সুখী হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কেবল মণিমালা দেখিল তাহার স্বামীর বিষণ্ণ মুখ আরও বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে। সে স্বামীর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কাঁধে হাত রাখিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার সে বাক্সটি কোথায় গেল?

রাখাল আহত সিংহের মতো উগ্র হইয়া উঠিয়া চোখ পাকাইয়া রূঢ় কর্কশ স্বরে বলিল—কেন? ফেলে দেবার হুকুম হবে নাকি?

মণিমালা কম্পিতকণ্ঠে সান্ত্বনা ও মিনতি ভরিয়া ধীরে ধীরে বলিল—ঠিক বলেছ জামা তুমি রাত্তিরে আমার কাছে পোরো।

রাখালের রূঢ় দৃষ্টি কোমল হইয়া গেল, মণিমালার ম্লান ব্যথিত মুখের দিকে দেখিতে দেখিতে কোমল দৃষ্টি তরল হইয়া চোখের জলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। রাখালের মনে হইতে লাগিল প্রসাদী হইলে এমনি করিয়াই বুঝি তাহাকে সান্ত্বনা দিত। তাহার আজন্মের সকল প্রিয়জনের প্রিয়স্থানের যে নিদারুণ বিচ্ছেদ-বেদনা তাহার মনের মধ্যে জমা হইয়া দুর্য্যোগ পাকাইতেছিল তাহা কোনো দিন হয়ত কাহারও রূঢ় আঘাতে বিষম ঝড়ে ভাঙিয়া চুরিয়া বাহির হইত, তাহা আজ এই কিশোরীর স্নেহকোমল শীতলস্পর্শে জল হইয়া গলিয়া পড়িল; সে জুড়াইল, বিশ্বসংসার বাঁচিয়া গেল। মণিমালা স্বামীর মাথাটি বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মাথার কোঁকড়া চুলগুলির মধ্যে আঙুল বুলাইতে লাগিল। এতটুকু মেয়েকে এতখানি যত্ন করিতে কে শিখাইল? আজ রাখালের মনে প্রসাদীর পাশে মণিমালা একটুখানি জায়গা করিয়া লইল।

রাখালকে শান্ত করিয়া মণিমালা বলিল—তুমি যাও, একটু বাইরে বেড়িয়ে এস; রাতদিন ঘরের মধ্যে বসে থেকে থেকে তোমার আরো মন খারাপ হচ্ছে।

রাখাল কাতর দৃষ্টিতে মণিমালার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—আমি কোথায় যাব মণি? আমার কি কোথাও যাবার জো আছে, না যেয়ে সোয়াস্তি আছে? ঘর থেকে বেরিয়ে সাত দেউড়ি পার হয়ে যদি বা খোলা জায়গায় পৌছাতে পারি

তবু কি নিশ্চিন্ত হবার জো আছে? আমাকে দেখলেই লোকে তটস্থ হয়ে ওঠে; দুধারি লোকেদের কোমর নুয়ে পড়ে, সেলাম, প্রণাম, নমস্কার কুড়ুতে কুড়ুতে আমার মন হাঁপিয়ে ওঠে; যারা আমার সমবয়সী তারাও মুখ কাচুমাচু করে দাঁড়ায়, পালাতে পারলে বাঁচে! আমাকেও তোমাদের মর্য্যাদার দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়! এখানে আমি জামাইবাবু, আমি মানুষ নই! আর আমার দিদিমার কাছে যখন থাকতাম তখন আমার কোনো বালাই ছিল না;—কুঁড়ে ঘরখানিতে শুয়ে শুয়ে ছেঁড়া খড়ের ফাঁক দিয়ে তারার চোখ মটকানি দেখতে পেতাম, চাঁদের হাসি আমার মুখে এসে পড়ত, মেঘের হাসি-কান্নার খবর আমি ঘরে বসেই পেতাম; ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেই রাজ এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরত, খোলা মাঠের মধ্যে খোলা প্রাণ নিয়ে রাখাল ছেলেদের সঙ্গে জুটে আমরা যা খুসী তাই করে বেড়াতাম। সেখানে এক প্রধান অবলম্বন ছিল লেখাপড়া, এখানে এসে ত সে পাঠ তুলেই দিয়েছি।

মণিমালা বলিল—তুমি একবার বাবাকে বল না কেন? এখানেও ত ফিরিঙ্গিবাজারে স্কুল আছে।

রাখাল বলিল—হ্যাঁ, বলব ঠিক করেছি।

মণিমালা স্বামীকে একটু অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত করিবার জন্য বলিল—তাই যাও, কাছারীতে বাবা গেছেন, বাবাকে বলগে।

(১১)

পাহাড়পুরের রাজবাড়ীর একেবারে সদরে কাছারী-বাড়ী—তাহার দুধারে দুটি খুব বড় পুকুর, পুকুর-পাড়েই দুটি ফুলের বাগান বিচিত্র কেয়ারীতে ফোয়ারাতে সজ্জিত। কাছারী-বাড়ীর ঘরে ঘরে জমানবিশ সেহানবিশ তৌজিনবিশ মহাফেজ খাজাঞ্চি ও তাহাদের কর্ম্মচারীরা কেহ ঠিক দিতেছে, কেহ কানে কলম গুঁজিয়া নথি উল্টাইতেছে, কেহ সমাগত প্রজার উপর তদ্বি করিতেছে;—মহারাজ কাছারীতে আসিয়াছেন, সকলেই আপনাদিগকে কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া বহু প্রজা আসিয়া কাছারীর প্রাঙ্গণে একএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল করিয়া বলির পশুর মতন সভয়ে অপেক্ষা করিতেছে।

রাজা ধনেশ্বর কাছারীর দরবারঘরে মসলন্দের উপর কিংখাবের তাকিয়া ঠেসান দিয়া সোনার গুড়গুড়িতে জরির শটকা নল লাগাইয়া মৃগনাভি-গন্ধী অম্বুরী তামাক খাইতেছেন, পারিষদ দেওয়ান মোসাহেব মৌলভী মুন্সী মুসলমানী দরবারী কায়দায় হাঁটু মুড়িয়া বীরাসনে তটস্থ হইয়া সম্মুখে বসিয়া আছে, পেশকার একে একে জরুরী আরজী দাখিল করিতেছে। দ্বারে দ্বারে আসা-বরদার দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে; মহারাজের ঠিক পশ্চাতে দুজন রক্ষী তরোয়াল খুলিয়া সটান দাঁড়াইয়া আছে; দুই পাশে দুজন উর্দ্দিপরা আরদালি হুকুম অনুসারে কাজ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এমন সময় সমস্ত দরবারের ছন্দ যতি ভঙ্গ করিয়া রাখাল কাছারীতে গিয়া বিনা ভূমিকায় ধনেশ্বরকে বলিল—আমি এবার এণ্ট্রান্স এগজামিন দেবো; আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিন।

ধনেশ্বর এ কথার কিছুমাত্র মূল্য আছে মনে না করিয়া বলিলেন—তোমার আর পড়ার দরকার কি? তোমায় ত আর চাকরী করে খেতে হবে না? তুমি এখন মণিমায়ের কাছে-কাছেই থাকবে।

রাখাল গোঁ ধরিয়া বলিল—আমি পড়ব।

তাহার মনে পড়িয়া গেল ভূতো ও তেতো তাহাকে বলিয়াছিল—

ঘর-জামায়ের আদর কতক্ষণ?
না, তার বৌ-মনিবটি যতক্ষণ।

তারপর মনে পড়িল তাহার দিদিমার কথা, যে, যদি বৌ মরিয়াই যায় তবে সে লেখাপড়া শিখিলে আপনার উপায় আপনি করিয়া লইতে পারিবে। তাই সে জোর করিয়া গোঁ ধরিয়া বলিল—আমি পড়ব।

ধনেশ্বরও জোর দিয়া বলিলেন—না, তোমায় পড়তে হবে না। অনর্থক পণ্ডশ্রম!

রাখালের চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, দিদিমা যে বলিয়াছিলেন রাজার বাড়ী বিবাহ হইলে তাহার পড়ার সুবিধা হইবে, এই কি সেই সুবিধা! সে যে কত যত্নে প্রাণপণে লেখাপড়া করিত, তাহার সব বন্ধ! যে ভূতো, ননে তেতো ফটিককে সে মূর্খ বলিয়া ঘৃণা

—আমার এই-রকম দেরীই হবে; আমার খাবার ঢেকে রেখে সকলকে খেয়ে নিতে আমি কতদিন বলেছি।

—না, ওরকম একগুঁয়েমি এখানে চলবে না; তোমাকে ঠিক সময়ে এসে খেতে হবে; সময়ে খেয়ে-দেয়ে তোমার যা খুসী তুমি কোরো।...

রাখালকে কোনো উত্তর করিবার অবসর না দিয়াই ধনেশ্বর বলিতে লাগিলেন—তোমার যা খুসী তাই করাটা কিন্তু বড্ড বেড়ে উঠেছে। আজকে ঘরের পাখা কেটে ফেলেছ কেন?

রাখাল দৃঢ় স্বরে বলিল—আমার ঘরে পাখার দরকার নেই বলে।

—তোমার ঘর? ও ত আমার ঘর! তোমাকে থাকতে দিয়েছি। ঘরের আসবাবপত্তর যেমন আছে তেমনি থাকবে, তুমি শুধু ব্যবহার করবে; তুমি ব্যবস্থা উল্টে দেবার কে? তোমার টানা-পাখার হাওয়া খাওয়া অভ্যাস ছিল না, তোমার চলতে পারে; কিন্তু মণিমায়ের তো চলবে না।

রাখাল বলিল—না চলে, মণির ঘর মণিরই থাক। আমাকে যদি এখানে রাখতে হয় তা হলে আমাকে এমন একটা ঘর দিন যে ঘরের মালিক হব আমিই।

ধনেশ্বর অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঐ প্রসঙ্গ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—রোজ রোজ তুমি নাকি কাশী মাষ্টারের বাড়ী যাও?

—হাঁ যাই।

—আর যাবে না। সে আমার প্রজা; ঝিরিঝিগঞ্জের ইস্কুলের ইংরেজি-পড়াবার মাষ্টার, বৈ ত নয়; তার বাড়ীতে তুমি আমার জামাই হয়ে যাও কোন্ আক্কেলে? ওতে আমার অপমান হয়, জানো?

—না, তা জানতাম না। আমি কাশীবাবুর কাছে পড়তে যেতাম। আপনার অপমান হয় জানলে যেতাম না।

ধনেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—আচ্ছা আমি কাশী মাষ্টারকে ডেকে বলে দেবো সে যদ্দিন বাড়ীতে থাকবে রোজ তোমাকে তোমারখানায় এসে পড়িয়ে যাবে।

যে কাজ রাখাল লুকাইয়া-লুকাইয়া করিতেছিল, তাহা প্রকাশ্যে করিবার অনুমতি ও সুযোগ পাইয়া রাখালের মন খুসী হইয়া গেল।

রাখালের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ধনেশ্বরও প্রীত হইয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—যাও, আর পাগলামি কোরো না। মনে রেখো তুমি রাজার জামাই, রাজ-কায়দায় চলতে হবে।......মা মণি, এই পাগলটাকে চটপট একটু শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম করে নিস।—বলিয়া ধনেশ্বর হাসিতে লাগিলেন। রাণী জগদ্ধাত্রীও ঠোঁট চাপিয়া হাসি ঢাকিতে চেষ্টা করিলেন। মণিমালার মাথা মায়ের পায়ের উপর অত্যন্ত নত হইয়া পড়িল। রাখাল ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

(১৪)

রাখালকে বিদায় দিয়া মাধবী শয্যা লইয়াছেন। কোনো দিন বা উঠিয়া একবার ভাতে বসেন, কোনো দিন বা অমনিই যায়। রাখাল যে-বালিশটি মাথায় দিয়া ভাঙা তক্তপোষের উপর ছেঁড়া কাঁথার যে দিকটিতে শুইত, মাধবী সেই দিকটিতে সেই বালিশটি বুকে করিয়া পড়িয়া থাকেন—সেই বিছানা বালিশে তাহার রাখালের গায়ের গন্ধ আজও যে লাগিয়া আছে। রাখাল "তোমরা আমার দিদিমাকে দেখো" বলিয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রসাদী ব্রজ ও তাহাদের মা প্রত্যহ আসিয়া মাধবীকে জোর করিয়া তুলিয়া তেল মাখাইয়া নাওয়াইয়া কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দিয়া খাওয়াইয়া যাইত; প্রায়ই নিজেদের বাড়ী হইতে কিছু-না-কিছু খাবার করিয়া আনিত।

একদিন নারাণদাসী নথ ঘুরাইয়া জনান্তিকে বলিল—মায়ের চেয়ে যে দরদী তাকে বলে ডান! নাতি ত আর মরে নি, তবে অত শোকের ধ্যান কেন? আর বলিহারি যাই পাড়ার লোকদের যারা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে আসে! পাড়া বয়ে আত্তি জানাতে আসা, তার মানে, লোককে জানানো বাড়ীর লোকে কেউ কিচ্ছু করে না, ভাগ্যিস যাই আমরা ছিলাম!

ইহার পর প্রসাদীদের মাধবীর যত্ন করা দুষ্কর হইয়া উঠিল এবং মাধবীর দুঃখ দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল।

একদিন খুব ঘটা করিয়া তিলক-সেবা করিয়া ভাত জল খাইয়া, ঝুঁড়িটি ফুলাইয়া বৃন্দাবন রকে বসিয়া তামাক খাইতেছেন; নাকে সূক্ষ্ম রসকলি কাটিয়া নারাণদাসী পাশে বসিয়া পান সাজিতেছে; এমন সময়ে অঘোর

পিয়ন আসিয়া একখানা মনিঅর্ডার দিল—এক শত টাকার। রাখাল পাঠাইয়াছে; পঞ্চাশ টাকা গোসাঁই-দাদাকে লইতে লিখিয়াছে এবং বাকী পঞ্চাশ টাকা ব্রত-নিয়ম করিবার জন্য দিদিমাকে দিতে লিখিয়াছে। বৃন্দাবন সই করিয়া টাকা লইয়া নারাণদাসীর দিকে আটখানি নোট বাড়াইয়া ধরিয়া স্নেহগদ্‌গদ স্বরে বলিলেন—দাস্থ, তুলে রাখ গে।

নারাণদাসী চুন-খয়েরের হাত গামছায় চট করিয়া মুছিয়া নোট কখানি বৃন্দাবনের হাত হইতে লইল। গণিতে গণিতে বলিল—এত টাকা কে পাঠালে? জামগাঁয়ের নন্দীরা বুঝি? ও টাকা কি বাইরে রাখবে, অত টাকা কি হবে?

বৃন্দাবন তাহার কোনো জবাব না দিয়া ডাকিলেন—মাধবী, রাখালের চিঠি এসেছে। রাখাল টাকা পাঠিয়েছে।

ইহা শুনিবামাত্র নারাণদাসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরে গিয়া নোট কখানি বাক্সর মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া আসিয়া আবার একাগ্র মনে পান সাজিতে বসিল।

বৃন্দাবনের ডাক শুনিয়া মাধবী দারুণ দুঃখের উপর আনন্দের হাসি মাখাইয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন—রাখাল আমার চিঠি দিয়েছে! ভালো আছে দাদা? রাখালের নিজের হাতের লেখা ত? কই দেখি দাদা, একবার দেখি। হ্যাঁ রাখালের নিজের হাতের লেখা! কি লিখেছে দাদা একবার পড় ত! কত টাকা পাঠিয়েছে? রাখাল আমার রাজরাজেশ্বর হয়েছে!

মাধবীর মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। চোখ দিয়া দরদরধারে জল পড়িতেছিল।

বৃন্দাবন মনিঅর্ডারের কুপনে লেখা সংক্ষিপ্ত চিঠিটুকু পড়িয়া শুনাইলেন; কেবল পঞ্চাশ টাকার স্থানে পড়িলেন কুড়ি টাকা এবং রাখাল তাহাকে যে কিছু দিয়াছে সে কথার উল্লেখ মাত্র করিলেন না।

মাধবী নোট দুখানি হাতে করিয়া লইয়া পরম স্নেহে তাহাদিগকে চুম্বন করিলেন—সে চুম্বন যেন তাঁহার রাখালকেই। এ টাকা ত রাখালেরই স্নেহের নিদর্শন। নোট দুখানিকে ঠোঁটে ঠেকাইয়া বুকে চাপিয়া ক্ষণেক কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া মাধবী বলিলেন—এত টাকা নিয়ে আমি করব কি? বৌ একখানা নিক, আমি একখানা নি।—এই বলিয়া একখানি নোট নারাণদাসীর দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—এই নাও বৌ, আমিও যেমন, রাখালের তুমিও তেমনি!

নারাণদাসী কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া গম্ভীর ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাধবীর হাত হইতে নোটখানি লইয়া ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া ছোট্ট করিয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিল।

মাধবী বৃন্দাবনকে বলিলেন—দাদা, রাখালের চিঠিটা আমাকে দাও, আমি সকলকে দেখাব। ও চিঠি ত নয়, আমার বুকের নিধি।

বৃন্দাবন গম্ভীর হইয়া বলিলেন—রাখালকে টাকা পাওয়ার খবর দিতে হবে। চিঠিতে রাখালের ঠিকানা আছে। চিঠি এখন আমার কাছে থাক; নইলে রাখাল ভাববে কি।

মাধবী তাড়াতাড়ি বলিলেন না না, দাদা, রাখাল আমার যেন না ভাবে, তুমি আজই চিঠি লিখে দাও। ও চিঠি তোমার কাছেই থাক এখন, চিঠি-লেখা হলে আমায় দিয়ো।

রাখাল যাওয়ার এতদিন পরে আজ মাধবী পাড়ায় বাহির হইলেন। সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া জানাইতে লাগিলেন—তাঁহার রাখাল রাজ্যেশ্বর হইয়া তাহার দিদিমাকে দু-দুখানা নোট পাঠাইয়া দিয়াছে!

মাধবী বাড়ী হইতে বাহির হইতেই বৃন্দাবন মনিঅর্ডারের কুপনখানি কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরশ্চরণ

তোমারি নাম জপের লাগি সময় সে মোর জপের মালা,
প্রতিটি ক্ষণ মালার দানা, রাত্রি দিবা জপের পালা;
যে মুহূর্ত্তে তোমার দেখা ভাগ্যে ঘটে তপস্যায়
সেই ক্ষণটি হয় সুমেরু অনন্ত সেই জপ-মালায়।
জীবন-যজ্ঞে কখন হবে সাঙ্গ আমার পুরশ্চরণ?
হোমের পূর্ণাহুতির তরে অপেক্ষিছে পুরুত মরণ!

—বিশ্রী।

বিংশ শতাব্দীর নারীসমস্যা

রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে সকলপ্রকার অধিকার লাভ করিবার জন্য আজকাল পাশ্চাত্য রমণীগণ বিশেষ ব্যস্ত। মহিলাসমাজের এই আন্দোলন বিলাতেও দেখা গিয়াছে—আমেরিকাতেও দেখিতেছি। "প্রদেশশাসন, নগরশাসন, বিচারকার্য্য, রাষ্ট্র-পরিচালনা, খাজনা আদায় এবং আইন-সমালোচনা ইত্যাদি একমাত্র পুরুষজাতিরই কার্য্য নয়। স্ত্রীজাতিও এই সকল কর্ম্ম করিতে পারগ—তাহাদিগকেও এই সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রমণ্ডলে পুং-স্ত্রীভেদ বাঞ্ছনীয় নয়।" এইরূপ চিন্তা ইয়োরোপ ও আমেরিকার রমণী-সমাজে বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে।

অনেক রমণী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"মহাশয়, ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকেরা রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভের জন্য কি করিতেছে? তাহারা ইয়োরোপ ও আমেরিকার রমণী-রাষ্ট্র-পরিষদের সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিতে ব্রতী হইবে কি?" বলা বাহুল্য ভারতীয় পুরুষজাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার কতখানি এই-সকল প্রশ্নকর্ত্রীদের তাহাই জানা নাই!

ভারতবাসীরও এই-সকল প্রশ্ন শুনিবামাত্র থতমত খাইবার কথা। কোন সদুত্তর দেওয়া ত কঠিনই—বরং প্রশ্নটা বুঝিয়া উঠাই অনেকটা দুরূহ। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—"ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ" অথবা "ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির সম্পত্তি-বিষয়ক আইনকানুন কিরূপ" তাহা হইলে প্রশ্নগুলি আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত বোধ হইবে না। কিন্তু রাষ্ট্রমণ্ডলে স্ত্রীজাতির স্থান সম্বন্ধে আমরা কেহ কখনও ভাবিয়াছি কি? এই সমস্যা আমাদের সমাজে একেবারেই উপস্থিত হয় নাই। অথচ পাশ্চাত্য দেশে এই সমস্যাই মহিলাসমাজের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—এমন কি এই সমস্যার মীমাংসা না হইলে ইহাদের উদ্ধার নাই। কাজেই এখানকার স্ত্রীলোকেরা অন্য কোন দেশের রমণীসমাজের অবস্থা জানিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমেই তাহাদের রাষ্ট্রীয়ক্ষমতার কথা জিজ্ঞাসা করে।

কোন কোন রমণীকে বলিয়াছি—"দেখুন, আপনাদের সমাজে স্ত্রী-সমস্যা এই আকারে দেখা দিবার যথেষ্ট কারণ আছে। নানা ঘটনাচক্রে আপনাদের পরিবার ও পারিবারিক জীবন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র শ্রমজীবী কোন স্তরেই যথার্থ পরিবার আর নাই। গৃহস্থালি, ঘরকন্না, বাস্তভিটা ইত্যাদি বলিলে যে-সকল ভাব মনে আসে সে-সমুদয় পাশ্চাত্যচিত্ত হইতে তিরোহিত হইয়াছে। অবশ্য আপনাদের কোন কোন নগরে দু-চার দশ ঘর নর-নারী পারিবারিক আদর্শে জীবনযাপন করিতেছেন না—এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। কিন্তু সমগ্র সমাজের আধুনিক ঝোঁক ও গতি বর্ণনা করিতে হইলে, বিশেষতঃ নগর-জীবনের একটা সত্য চিত্র আঁকিতে হইলে, বলিব যে-পাশ্চাত্যজগতে পারিবারিক বন্ধন নিতান্তই দুর্ব্বল ও শিথিল। ইহা ক্রমশই আরও দুর্ব্বল ও শিথিল হইবে। পরিবার ভাঙ্গিয়া গেল—থাকিল কি? ব্যক্তি Citizen বা রাষ্ট্রীয় জীব। আপনাদের দেশে আজকাল কোন ব্যক্তি পিতা বা মাতা, কিম্বা ভাই বা বোন, অথবা স্ত্রী বা স্বামী ইত্যাদি রূপে বিবৃত হয় না। আপনারা বিবেচনা করিতেছেন যে রমণী রমণী মাত্র। তাহাকে অন্য কোন লোকের মাতা বা ভগ্নী বা স্ত্রীরূপে বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সেইরূপ আপনাদের পুরুষেরাও কতকগুলি ব্যক্তিমাত্র। তাহাদিগকে অন্য কোন পুরুষ বা রমণীর বাপ বা দাদা বা স্বামী ইত্যাদিরূপে বিবেচনা করা হয় না। কাজেই রাষ্ট্রমণ্ডলে পরিবারহীন ব্যক্তির অধিকার; ক্ষমতা ও দায়িত্ব ইত্যাদিই একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? পুরুষেরাও যেরূপ মানুষ, স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপই মানুষ। মানুষ দুই প্রকার বা দুই জাতীয়—স্ত্রী ও পুরুষ। কাজেই রাষ্ট্রের পরিচালনায় দুই-প্রকার মানুষেরই অধিকার না থাকিলে অন্যায় অত্যাচার অবিচার ঘটিতে বাধ্য। কিন্তু পারিবারিক জীবনের আদর্শ যদি ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে চলিয়া না যাইত তাহা হইলে স্ত্রী-সমস্যা বর্ত্তমান আকারে দেখা দিত না। ভারতবর্ষে পরিবার এবং পারিবারিক আদর্শ এখনও বর্ত্তমান—কাজেই আমাদের স্ত্রী-সমস্যা অন্যবিধ।"

আধুনিক পাশ্চাত্য পরিবার

" পাশ্চাত্য সমাজের বর্ত্তমান লক্ষণ সম্বন্ধে মেঙ্কেন (Mencken) তাঁহার The Philosophy of Friedrich

Nietzsche নামক গ্রন্থের Women and Marriage অধ্যায়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন—

"We see about us that women are becoming more and more independent and self-sufficient, and that as individuals, they have less and less need to seek and retain the good will and protection of individual men,............this tendency is fast undermining the ancient theory that the family is a necessary and impeccable institution and that without it progress would be impossible."

পারিবারিক-জীবনপ্রথা যে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বিলুপ্ত হইতেছে তাহার সাক্ষ্য এইরূপ অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যদেশের যে-কোন নগরের কোন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবনযাত্রা-প্রণালী লক্ষ্য করিলেই বিষয়টা বেশ বুঝিতে পারি। লণ্ডন, ম্যাঞ্চেষ্টার, নিউইয়র্ক ইত্যাদি স্থানের নরনারীগণ সাধারণতঃ কি উপায়ে ২৪ ঘণ্টা কাটাইয়া থাকে তাহার আলোচনা করিলে সমাজের চিত্র স্পষ্ট হইবে। একটা Type বা ছাঁচের পরিচয় দিতেছি—ব্যক্তি ও পরিবার বিশেষের যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ এই-সকল লোকজনকে গৃহস্থ কোন মতেই বলা চলে না। ইহাদের কাহারও 'গৃহ'ও নাই—এবং কেহই বেশীক্ষণ কোন গৃহে 'থাকে'ও না। নিউইয়র্কের একএকটা প্রকাণ্ড ব্যারাকের মধ্যে অন্ততঃ দুইশত নরনারী বাস করে—এক-একজন একএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী ভাড়া করিয়া লয়। ভাড়াটিয়ার সঙ্গে কুঠরীর সম্বন্ধ অতি সামান্য মাত্র। রাত্রিকালে শয়ন-গৃহস্বরূপ কুঠরীগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ইহাদের আর কোন ব্যবহার নাই। দিবাভাগের সমস্ত সময় এবং রাত্রিকালের ⅓ অংশ পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই কুঠরীর বাহিরে কাটায়। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রমজীবী উভয়েরই নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি প্রায় এইরূপ। কেবল প্রভেদ এই যে, মধ্যবিত্ত নরনারীগণ কিছু উচ্চ অঙ্গের কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকে এবং শিক্ষিত মহলে ও কর্ম্ম-কেন্দ্রে ঘুরাফিরা করে, আর শ্রমজীবী নরনারীরা কথঞ্চিৎ নিম্নস্তরের আবহাওয়ায় জীবিকা অর্জ্জন করে এবং চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়।

প্রায় গৃহেই রন্ধনের ব্যবস্থা থাকে না। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে ঘরে জল গরম করিয়া চা কিম্বা কাফি প্রস্তুত করা হয়। স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই নিদ্রাভঙ্গের পর যার যার কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া যায়। সকাল বেলার খাওয়া এবং মধ্যাহ্নভোজন দুইই কর্ম্মক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী কোন হোটেলে নিষ্পন্ন হয়। সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরিবার কথা—তখন কোন কোন স্থলে গৃহে, ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে—অবশ্য অধিকাংশ দ্রব্যই নিকটবর্ত্তী কোন হোটেল হইতে কিনিয়া আনা হয়—সময়ে সময়ে কুঠরীতে মাংস সিদ্ধ বা দগ্ধ করিয়া লওয়া হয় মাত্র।

হোটেলে খাওয়ায় লাভ মন্দ নয়। কারণ সেখানে এক-সঙ্গে বহুলোকের জন্য খাবার প্রস্তুত করা হয়—বহু-প্রকার দ্রব্যও সর্ব্বদা তৈয়ারী থাকে। লোকেরা পছন্দসই জিনিস পায়। হোটেলওয়ালারাও বহু খরিদদার পায় বলিয়া খাদ্যদ্রব্য সস্তায় দিতে পারে। এই জন্য গৃহস্থেরা ইচ্ছা করিয়াই হোটেলে খাইতে আসে। অধিকন্তু রন্ধন-শালার কাজকর্ম্ম হইতে নারীজাতি অব্যাহতি পায়।

গৃহকর্ম্ম, গৃহস্থালি, রান্নাবাড়া, ঘরঝাড়া, বাসনমাজা ইত্যাদি কোন কাজই রমণীগণকে করিতে হয় না। এই-সকল বিষয়ে দায়িত্ব বা বন্ধন ইহাদের কিছুমাত্র জন্মে না। কিন্তু মানুষের সময় ত কম নয়—চিত্ত ত ক্ষুদ্র নয়। কাজেই পাশ্চাত্য মহানগরীসমূহে সময় কাটাইবার এবং মনকে কর্ম্মঠ রাখিবার জন্য নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রের কাজ শেষ হইবামাত্র নরনারীরা সেই-সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে যায়। নানাপ্রকার সভাসমিতি, নাচগৃহ, চিত্রগৃহ, থিয়েটার, লাইব্রেরী, গ্রন্থ-শালা, প্রদর্শনী ইত্যাদি সময় কাটাইবার কতকগুলি প্রধান সুযোগ। এই-সকল লোকসমাগমের কেন্দ্রে নিত্য নূতন বস্তুর সংস্পর্শে আসা যায়—নিত্য নূতনধরণের নরনারীসম্বন্ধে গল্পগুজব আলোচনা বা হাসিঠাট্টা চলিতে পারে। মোটের উপর প্রতিদিন ৫।৬ ঘণ্টা করিয়া এই উপায়ে অতি সহজেই কাটিতে পারে।

তাহার পর রাত্রি ১১।১২ টার সময়ে স্ত্রীপুরুষ নিজ নিজ আড্ডা হইতে কুঠরীতে ফিরিতে থাকে। স্ত্রী তাহার নিজ বন্ধুবান্ধব ইত্যাদির চিন্তায় মগ্ন—স্বামীও তাহার নিজ নিজ সঙ্গীসহকারীদিগের কথা ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন। এ দিকে পরদিন প্রত্যূষেই দুইজনকে আবার

ছুটিতে হইবে। যে পরিবারে দুই একটি শিশুসন্তান আছে তাহার ঘরকন্নাও প্রায় এইরূপ। শিশুর লালনপালনের ভার মাতা গ্রহণ করিতে অনেক সময়েই অসমর্থ—কেননা তাহাকেও পিতার ন্যায় খাটিয়া খাইতে হয়। আলগা কোন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহার হাতে শিশুকে সমর্পণ না করিলে কাজ চলিতেই পারে না।

পরিবার ও নব্য দর্শন।

গৃহস্থালির কোন অনুষ্ঠানই পাশ্চাত্য রমণীর নাই—না গৃহরক্ষা না সন্তান রক্ষা। যাহারা অবিবাহিত তাহাদের জীবনযাপনও এইরূপ। বিবাহিত এবং অবিবাহিত নরনারীতে পাশ্চাত্য দেশে কোন প্রভেদ আছে কি না সন্দেহ। প্রভেদ এই যে, বিবাহিত জীবনে কতকগুলি অনর্থক দায়িত্ব আসিয়া জুটে। অবিবাহিতগণ সেই সমুদয় দায়িত্ব এড়াইতে পারে। কাজেই বিবাহ-প্রথা উঠিয়া গেলে সমাজের কোন ক্ষতি হয় না—এইরূপ চিন্তা আজকাল বেশ প্রবল হইতেছে। প্রায় স্ত্রীপুরুষই বিবাহের বিরোধী। স্ত্রীস্বামীর সম্বন্ধ কেহই পছন্দ করিতেছে না—সকলেই পুরুষ ও রমণীতে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্দ্যের সম্বন্ধ মাত্র চাহে। কোন আফিসের পুরুষকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যেরূপ ভ্রাতৃত্ব বা সখ্যভাব আছে, সমাজের সকল পুরুষে রমণীতে সেইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াই সকলে বাঞ্ছনীয় মনে করে। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী, উকীল, কেরাণী, অধ্যাপক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই এই মত পোষণ করিতেছে। যাহারা প্রকাশ্যভাবে মত প্রচার করে না তাহারাও হৃদয়ে হৃদয়ে এই মতেরই পক্ষপাতী। ফলতঃ সমাজে রমণীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে নূতন ধারণা সৃষ্ট হইতেছে—ইহাই বর্ত্তমান রমণীসমস্যা।

নরওয়ের জগৎপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন, জার্ম্মানির পোল দার্শনিক নীট্‌শে এবং বিলাতের সমসাময়িক কবি বার্ণার্ডশ এই পরিবার-ভঙ্গ-বিষয়ক নীতির নামজাদা প্রচারক। ইঁহারা দার্শনিকভাবে বুঝাইয়াছেন—পারিবারিক জীবনই মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবন নয়;—আবার সমাজের আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থাও আলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে—পারিবারিক আদর্শ সংসারে আর টিকিতে পারে না, একটা সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। মোটের উপর নূতন ধরণের সমাজগঠন ইঁহারা কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পনার প্রভাব আজকালকার পাশ্চাত্য সমাজে নিতান্ত কম নয়। এতদিন ঘটনাচক্রে "Industrial Revolution" বা বৈষয়িক বিপ্লবের ফলে পরিবার ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি জাগিতেছিল। এক্ষণে এই-সকল চিন্তাবীরগণের উপদেশ মাথায় লইয়া, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত সকলেই পরিবার-ভঙ্গ-নীতি, বিবাহ-বর্জ্জন-নীতি ইত্যাদি মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া বেড়াইতেছে। বৈষয়িক বিপ্লবের চরমফল এতদিনে দেখা দিয়াছে। এতদিন যাহারা কিছু সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল তাহারা এক্ষণে জোরের সহিত প্রচার করিতেছে যে "বিবাহ-প্রথা উঠিয়া গেলে সমাজের কোন ক্ষতি হইবে না—পরিবার ভাঙ্গিয়া গেলে রাষ্ট্র অবনত হইবে না—Divorce বা স্ত্রীবর্জ্জন ও স্বামীবর্জ্জন ইত্যাদি সুপ্রচলিত হইলে মানব দুর্নীতিপরায়ণ হইবে না। বরং এইরূপ না হইলেই সমাজে দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতা, কপটতা ও প্রবঞ্চনা স্থায়ী ঘর করিয়া বসিবে।" বার্নার্ডশ প্রণীত The Quintessence of Ibsenism গ্রন্থ এই সামাজিক নববিধানের অনুষ্ঠান-পত্রস্বরূপ। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার Subjection of Women গ্রন্থে যে-সকল বিষয় ভাবিতে পারেন নাই তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের একজন সমাজতন্ত্রবাদী সেই-সকল তত্ত্ব অতি সহজে সাহসের সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নারীজাতির অধিকার এবং স্ত্রীস্বাধীনতার বাইবেলস্বরূপ এই গ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে।

আমেরিকায় ইবসেন, নীট্‌শে অথবা বার্ণার্ড শ ইত্যাদির ন্যায় কোন ধুরন্ধর চিন্তাবীর এই নব্যনীতির প্রচারক হন নাই। কিন্তু এই দেশে ঐ নীতি কার্য্যতঃ বেশী সুপ্রচলিত। পরিবারভঙ্গের দৃষ্টান্ত, স্ত্রীবর্জ্জন, স্বামীবর্জ্জন ইত্যাদির পরিচয়, বিবাহ-প্রতিরোধের সাক্ষ্য এখানকার সমাজে ইয়োরোপের সমাজ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে রমণীজাতির স্বাধীনতা, স্ত্রী-নায়কতা, মহিলাপ্রাধান্য আমেরিকায় যত দেখিতে পাই বিলাতে তত দেখিতে পাই নাই—ইউরোপের অন্য কোথাও বোধ হয় এত আছে কি না সন্দেহ। নিউইয়র্কের অনেক বড় বড় আন্দোলনের কর্ত্তা স্ত্রীলোকেরা। শিল্পকর্ম্মে,

সাহিত্যসেবায়, ধনবিজ্ঞানের আলোচনায়, পরোপকার এবং লোকহিতের অনুষ্ঠানে, শিক্ষাপ্রচারে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে কর্ম্মীগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

বিশ্ব-নারী-পরিষদের ধুরন্ধর।

একদিন এখানকার একজন মহিলা-ধুরন্ধরের সঙ্গে আলাপ করিলাম। ইনি জগতের সকল দেশের মহিলা-রাষ্ট্র-সম্মিলনীর সভাপতি। এই সম্মিলনীর নাম International Woman Suffrage Alliance। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, চীন, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফিন্‌ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, গ্রেটব্রিটেন, হাঙ্গারী, আইস্‌ল্যাণ্ড, ইতালী, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, পর্ত্তুগাল, রুমেনিয়া, রুশিয়া, সার্ভিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন, সুইজর্ল্যাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রিয়া, বোহিমিয়া, ও গ্যালিশিয়া, এই সকল দেশে রমণী-সম্মিলনী আছে। এই সম্মিলনীগুলি বিশ্ব-নারী-পরিষদের অধীনে ও নায়কতায় দেশে দেশে কর্ম্ম করিয়া থাকে। কোন স্থানে সম্মিলনীর নাম 'Union of Defenders of Women's Rights', কোন স্থানে 'Women's Enfranchisement Association,' কোন স্থানে 'Women's Political Association,' কোনস্থানে 'National Woman Suffrage Association' ইত্যাদি। স্ত্রীজাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য এই-সকল সম্মিলনী নানা-প্রকার আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে।

নিউইয়র্কে যাহার সঙ্গে দেখা হইল তিনি এই-সকল সমিতির বর্ত্তমান পরিচালক, নাম Mrs. Catt। ইনি সম্প্রতি একবার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ভারতবর্ষেও গিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী মিত্রের নাম করিলেন। নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা, আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রী-নায়কতা ইত্যাদির পরিচয় ত যথেষ্টই আছে। কিন্তু এই সমুদয়ের প্রচারক বা পাণ্ডা বেশী আছে কি? নামজাদা লেখক কিম্বা বক্তারা এই-সকল বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া ত মনে হয় না। আমেরিকায় জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, ইবসেন, বা বার্নার্ডশ ইত্যাদির ন্যায় কোন সাহিত্য-ধুরন্ধর এই-সকল প্রশ্ন আলোচনা করিয়া থাকেন কি?"

ক্যাট বলিলেন, "মহাশয়, যে দেশে কোন বিষয়ে কথা প্রথম উঠে সেই দেশেই তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা, আন্দোলন বা লেখালেখি চলিতে থাকে। আমেরিকায় স্ত্রী-স্বাধীনতা বা রমণীর উচ্চ মর্য্যাদা সম্বন্ধে নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আর নাই। আমাদের আবালবৃদ্ধবনিতা এই ধারণা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। এজন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা ঐ সকল বিষয়ে লোকমত প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। কিন্তু ইংল্যাণ্ড বা জার্ম্মানি ইত্যাদি দেশে রমণী জাতির অধিকার অনেকটা কম। ইংরেজ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় নরনারী রমণীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে এখনও উচ্চ ধারণা পোষণ করে না। কাজেই ঐ-সকল দেশে গলাবাজি, লেখালেখি, প্রচারকার্য্য, আন্দোলন ইত্যাদির আবশ্যকতা আছে। এইজন্য প্রতিভাবান্ লেখকেরা এই বিষয়ে মাথা খাটান আবশ্যক বোধ করেন। কিন্তু আমাদের গাড়োয়ান এবং কুলীরাও এই-সকল তত্ত্ব নিঃশ্বাসের সহিত প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রহণ করে। কাজেই আমাদের সাহিত্যে Subjection of Women নামক গ্রন্থ অথবা বার্নার্ড শ'র ন্যায় বিপ্লববাদী সমাজনায়কের উদ্ভব হয় নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমেরিকা ত মাত্র ২০০।৩০০ বৎসরের দেশ। ইতিমধ্যে এইরূপ সমাজ গড়িয়া উঠিল কিরূপে? ইয়োরোপের নানা দেশ হইতে নরনারী আসিয়াই ত এখানকার সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ ঐ-সকল দেশ অপেক্ষা এই নূতন দেশে রমণী-স্বাধীনতা রমণী-প্রাধান্য রমণী-নায়কতা ইত্যাদি বেশী কেন?" ক্যাট বলিলেন—"ব্যাপার আর কিছুই নয়। আমেরিকায় দেশগঠন, সমাজগঠন, রাষ্ট্রগঠন ইত্যাদি কার্য্যে পুরুষের ন্যায় রমণীরাও যথেষ্ট কষ্টস্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছে। আমেরিকার বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসতি-স্থাপন, উপনিবেশস্থাপন, পল্লীস্থাপন, নগরস্থাপন ইত্যাদি কার্য্য করিতে ইয়োরোপীয় নরনারীদিগের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইয়াছিল। সেই কঠোর পরিশ্রমে রমণীজাতির সাহায্য যথেষ্টই ছিল। শারীরিক কষ্ট, নৈতিক বল, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি কোন বিষয়েই রমণী পুরুষের পশ্চাতে ছিল না। বরং সর্ব্বত্র সকল বিভাগে রমণীর

সাহায্য এবং আনুকূল্য পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই আমেরিকায় প্রতিকূল শক্তিসমূহের ভিতর একটা প্রবল সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। তাহা না হইলে আমেরিকায় ঔপনিবেশিকগণের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। তাহা না হইলে আটলান্টিকের অপর পারে একটা উচ্চ অঙ্গের উৎকর্ষপূর্ণ মানবজীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইত না। রমণীজাতি পুরুষের সঙ্গে একত্রযোগে সমানভাবে আমেরিকাসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। কাজেই প্রথম হইতে স্ত্রী ও পুরুষ আমেরিকায় বন্ধু ও সুহৃৎ—প্রথম হইতেই কোন বিষয়ে অনৈক্য এখানে নাই। প্রথম উপনিবেশিকদিগের সন্তানসন্ততিরা চক্ষু উন্মীলন করিয়াই দেখিল—তাহাদের আবেষ্টনে রমণীর মর্য্যাদা অতি উচ্চ। এক্ষণে বংশপরম্পরা-ক্রমে আমেরিকায় রমণী-স্বাধীনতা এবং রমণী-প্রাধান্য নিতান্তই স্বাভাবিক বোধ হয়। ইয়োরোপে ইহা এত সহজ ও নৈসর্গিক নয়।"

আমেরিকার রমণীসমাজ।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি চাল্‌স্ এলিয়ট তাহার American Contributions to Civilisation নামক গ্রন্থের এক প্রবন্ধে ফ্রান্স, ইংল্যণ্ড, আমেরিকা এবং মধ্যযুগের স্ত্রীস্বত্ববিষয়ক আইন আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থায় রমণী-স্বাধীনতা বেশী। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

Under the Feudal system it was almost necessary to the life of that social organisation that, when the father died, the real estate should go to the eldest son over the head of the mother. ....The son, not the wife, was the husband's heir. In France to-day, if a man dies leaving a wife and children, a large share of his property must go to his children. He is not free, under any circumstances, to give it all to his wife. ....The children are his children, and the wife is not recognised as an equal owner.............Again we see in public law an assertion of the lower place of the woman. But how is it in our own country? In the first place, we have happily adopted a valuable English measure, the right of dower; but this measure, though good so far as it goes, gives not equality but a certain protection. Happily American law goes farther, and the wife may inherit from the husband the whole of his property............On the other hand, the wife, if she has property, may give the whole of it to the husband. Here is established in the law of inheritance a relation of equality between husband and wife."

বাস্তবিকপক্ষে সামান্য মাত্র পর্য্যালোচনা করিলেই ইংল্যণ্ড ও আমেরিকায় প্রধানতঃ দুই বিষয়ে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ রমণীপ্রাধান্য এবং স্ত্রীনায়কতা। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকায় জাতিভেদ নাই—ইংল্যণ্ডে জাতিভেদ বিশেষ পরিমাণেই আছে। দরিদ্রের সামাজিক উন্নতি লাভ করা আমেরিকায় বেশী কঠিন নয় কিন্তু ইংল্যণ্ডে নিতান্তই কঠিন। এলিয়টের গ্রন্থ হইতে পুনরায় কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Nothing can be more striking than the contrast between the mental condition of an average American belonging to the laborious classes, but conscious that he can rise to the top of the social scale, and that of a European mechanic, peasant or tradesman who knows that he cannot rise out of his class, and is content with his hereditary profession."

আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে স্বচক্ষে যাহা দেখিতেছি ক্যাট এবং এলিয়টের কথায়ও তাহারই প্রমাণ পাইলাম। গৃহস্থালি উঠিয়া যাইতেছে—সন্তানপালন উঠিয়া যাইতেছে—সন্তানপ্রসবও বর্জ্জনীয় বিবেচিত হইতেছে—বিবাহের দায়িত্ব দুর্ব্বহ বোধ হইতেছে—স্ত্রী পুরুষের সমকক্ষ হইতেছে - রমণী স্বাধীন হইতেছে—স্ত্রী-লোকেরা ব্যক্তিমাত্রে পরিণত হইতেছে—মোটের উপর পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত ৪০ বৎসরের ভিতর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১,২৭৪,৩৪১ ক্ষেত্রে স্ত্রী-বর্জ্জন অথবা স্বামী-বর্জ্জন ঘটিয়াছে। এই divorce ব্যাপারগুলি বিচারালয়ে মীমাংসিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিনা আইনের সাহায্যে বর্জ্জনব্যাপার কত ঘটিয়াছে তাহার প্রমাণ নাই। এই-সকল তথ্য আলোচনা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল দরবার দুইখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন—গ্রন্থদ্বয়ের নাম Report on Marriage and Divorce (1867-1906)। এই রচনা পাঠ করিলে পরিবারভঙ্গ এবং স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ সাক্ষ্যই পাওয়া যাইবে। কয়েক বৎসর হইল কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Divorce : A Study in Social Causation নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহাতেও রমণী-স্বাধীনতা এবং গৃহস্থালি-বর্জ্জন ইত্যাদির বিস্তৃত আলোচনা আছে। লেখক ইব্‌সেন, নীট্‌শে এবং বার্ণার্ড শ ইত্যাদির কথাই নূতনভাবে বলিতেছেন।

"There is no necessity for concluding that the increasing divorce rate is due to degeneracy and a decline in social morality. On the contrary, the divorce movement in certain of its aspects is the sign of a healthy discontent with present moral conditions and marks the struggle toward a higher ethical consciousness in regard to external relations."

এই নব্যনীতি যে যে সমাজে প্রচলিত হইবে সেই সেই সমাজে রমণীজাতির রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভ সম্বন্ধে আন্দোলন প্রবল হইবে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে এই নীতি এখনও প্রচলিত হয় নাই—কাজেই Suffragette আন্দোলন ভারতবর্ষে এখনও দেখা দেয় নাই। যাহা কিছু দেখা দিয়াছে তাহা পাশ্চাত্যের ভাসা ভাসা অনুকরণ মাত্র—কোন গভীর বেদনার অভিব্যক্তি নয়। ভারতবর্ষে পারিবারিক জীবন এখনও ভাঙ্গিল না কেন? ইয়োরোপে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর Industrial Revolution বা শিল্পবিপ্লব সাধিত হইয়াছিল। তাহার ফলে ফ্যাক্টরী-প্রতিষ্ঠা, ব্যারাকজীবন, স্বামিনিয়োগ, কুলীনির্য্যাতন, ধর্ম্মঘট, শ্রমজীবী-সমস্যা ইত্যাদি পাশ্চাত্য সমাজে দেখা দিয়াছে। তাহারই এক ফল বা লক্ষণ রমণীর বৈষয়িক স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু ভারতবর্ষে সেইরূপ ফ্যাক্টরী-চালিত শিল্প, যোজন-ব্যাপী বিরাট কারখানা, মহাজন-শ্রমজীবী-সংঘর্ষ, ব্যারাক-জীবন ইত্যাদি এখনও পৌঁছে নাই। কাজেই স্ত্রীসমস্যা এখনও ভারতবর্ষে অন্যপ্রকার—কাজেই ইব্‌সেন, বার্ণার্ড শ, ইত্যাদির উৎপত্তি এখানে এখনও আশা করা যায় না।

প্রায় একশত বৎসর হইল পাশ্চাত্যজগতে শিল্পবিপ্লবের প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়। তাহার পূর্ব্বে এবং সেই সময়েও ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমাজজীবন কিরূপ ছিল?

"At the beginning of the modern economic era the family was the economic unit of society. It was an institution of expediency. It was usually large and lived close to the soil. It was an economic necessity. Its function involved not only the essential elements of race-maintenance and individual well-being, but of economic life as well. Children were reared in the home. Their education and training were accomplished there. This had reference not only to the intellectual, moral and religious development, but to the training for a gainful occupation, and usually included a start in life. Production, necessary to family maintenance, to which each member of the family contributed according to his ability, was carried on within the household. Food was produced from the soil and came direct from garden and field to the table. Flax, cotton and wool were transformed into family clothing through the dexterity of the housewife. Shoes were cobbled and furniture was made by the husband on rainy days. If these occupations were a tax on physical strength they were carried on with a minimum of nervous expenditure. Women were of economic necessity home-keepers. Their time and skill were required to the utmost. If there existed incompatibility between husband and wife, the care of children and the economic necessities of the family afforded the strongest possible incentive for adjusting or suffering the difficulties."

ভারতীয় রমণীর ভবিষ্যৎ।

দেখা যাইতেছে যে, পল্লীসভ্যতা, পারিবারিক জীবন, যৌথপরিবার ইত্যাদি ভারতবর্ষেরই নিজস্ব নয়। বাষ্পচালিত এঞ্জিন আবিষ্কারের পূর্ব্বপর্য্যন্ত পাশ্চাত্যজগতে এই-সমুদয়ই বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনের লক্ষণ ছিল। তখন বর্ত্তমান যুগের স্ত্রীসমস্যা উপস্থিত হয় নাই। ভারতবর্ষ এখনও শিল্প সম্বন্ধে সেই অবস্থায় আছে—এবং ভারতের ভাবুক সমাজ-ধুরন্ধরেরা অনেকটা সেই বৈষয়িক আদর্শই বজায় রাখিতে চাহেন। কিন্তু সেই অবস্থা অথবা সেই আদর্শ জগতে আর থাকিতে পারিবে কি না তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। "বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি গ্রহণ করিব অথচ সেই পল্লীসভ্যতা যৌথপরিবার ইত্যাদিও রক্ষা করিব"—ইহাই নব্য ভারতের আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যা অতি দুরূহ। যাহা হউক, যদি সেই অবস্থা এবং সেই আদর্শ না থাকে তাহা হইলে পাশ্চাত্য সমাজের পরিবার-ভঙ্গ, স্ত্রীবর্জ্জন, স্বামীবর্জ্জন, গৃহস্থালি-বর্জ্জন, বিবাহ-বর্জ্জন, সন্তান-পালন-বর্জ্জন, সন্তান-প্রসব-বর্জ্জন, ব্যারাকজীবন, হোটেল, রেস্তরাঁ, কাফে, "Bachelor Apartment," Ibsenism, বার্ণার্ড্ শ, সাফ্রেজিট আন্দোলন, রমণী-প্রাধান্য ইত্যাদি সবই ভারতবর্ষে দেখা দিবে।

সেই সময়কার ভারতসমাজ কিরূপ দেখাইবে? বর্ত্তমান

যুগের পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে জার্ম্মান পণ্ডিত August Bebel যে চিত্র আঁকিয়াছেন ভারতবাসীরও সেই চিত্র হইবে। বেবেলের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

Both husband and wife go to work. The children are left to themselves or to the care of older brothers and sisters who themselves need care and education. At noon hour the luncheon is eaten in a great hurry, provided that the parent have at all time to hasten home, which in thousands of cases is not possible on account of the shortness of the recess and the distance of the place of work from home. Weary and exhausted they return home at night. Instead of a friendly and agreeable habitation, they find a small unhealthful dwelling, often devoid of light and air and most of the necessary comforts. The increasing tenement house problem with the revolting improprieties that grow therefrom, constitutes one of the darkest sides of our social order, which leads to countless evils, to vices and crimes.

এই হইবে ভারতীয় দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থা। মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র কিরূপ হইবে Howard প্রণীত History of Matrimonial Institutions হইতে তাহার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদত্ত হইতেছে :—

"With them marriage tends to become a species of purchase-contract in which the woman barters her sex-capital to the man in exchange for life support."

আমেরিকায় রমণী-স্বাধীনতা এবং রমণী-প্রাধান্যের পরিচয় বেশী দিবার প্রয়োজন নাই, জীবনের এমন কোন কার্য্য নাই যাহাতে ইয়াঙ্কি রমণীর স্থান নাই দেখিতেছি। কোন কোন কর্ম্মক্ষেত্রে তাহারা পূর্ব্বে প্রবেশ করিতে পারিত না। এক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল রাষ্ট্রমণ্ডলে পুরাপুরি অধিকার পাইলেই রমণী-স্বাধীনতা ষোল কলায় পূর্ণ হয়। আমেরিকায় বোধ হয় তাহা না হইয়া যাইবে না। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র এক্ষণেই অনেকটা রমণী-প্রধান। কিছুকাল পরে ইহা একটা রমণী-শাসিত স্বরাজে পরিণত হইবে। ইতিমধ্যে স্ত্রীবর্জ্জন, বিবাহবর্জ্জন ইত্যাদিও প্রবল বেগেই চলিতে থাকিবে। ক্যাটকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহার পর কি হইবে?" ক্যাট বলিলেন—"ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উত্তর দেওয়া কঠিন। বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য করিয়া চলিতেছি, দেখা যাউক কোথায় গিয়া ঠেকি।"

হুইটম্যানের আদর্শ।

ব্যক্তিত্ববাদের পুরোহিত, স্বরাজাত্মার বাণীমূর্ত্তি কবিবর হুইটম্যান তাঁহার Leaves of Grass কাব্যে নবভূখণ্ডের অনুরূপ নবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ এবং নবশক্তিসম্পন্ন রমণী গড়িতে চাহিয়াছিলেন। আয়র্ল্যাণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ডাউডেনের নিকট লিখিত এক পত্রে হুইটম্যান তাঁহার আদর্শ বিবৃত করিয়াছেন :—

"I would say that (as you of course see) the spine or vertebra principle of my book is a model or ideal (for the service of the new world and to be gradually absorbed in it) of a complete healthy, heroic, practical modern *Man*—emotional, moral, spiritual, patriotic—a grander better son, brother, husband, father, citizen than any yet—formed and shaped in consonance with modern science, with American Democracy, and with requirements of current industrial and professional life—model of a *Woman* also, equally modern and heroic—a better daughter, wife, mother, citizen also, than any yet. I seek to typify a living Human personality immensely animal with immense passions, immense amativeness, immense adhesiveness—in the woman immense maternity—and then, in both, immenser far a moral conscience, and in always realising the direct and indirect control of the divine laws through all and over all forever."

আমেরিকার এই বৈচিত্র্য, বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব ও বিপুলতার আদর্শ বাঙ্গালী কবিও চিত্রিত করিয়াছেন :—

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়
পৃথিবী শাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

সম্প্রতি ইয়াঙ্কিস্থানের নরনারীগণ Citizen ও ব্যক্তি-মাত্রে পরিণত হইতেছে। এই পরিবারহীন বিবাহবিরোধী পুরুষ রমণী লইয়া কিরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়া হয় জগদ্বাসী তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। ইয়োরোপ এই experimentএর দৃশ্য দূর হইতে দেখিতেছে এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। ভারতবর্ষ এই নূতন ধরণের ভাঙ্গা-গড়া এখন বুঝিতে পারিবে না।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মনের বিষ

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বসন্ত-উৎসব প্রধান আনন্দ-পর্ব্ব; ধনী, নির্ধন, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সমভাবে উৎসবে মাতিয়াছে। আমার মনের সে অবস্থা নহে, হৃদয়ের আনন্দ পূর্ব্ব জীবনের সহিত হারাইয়াছি; তবুও আমাকে বাহ্যত তাহাতে যোগ দিতে হইয়াছে। অদ্য গোবিন্দর তাম্রলিপ্তিতে ফিরিবার দিন। আমাকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছে। আমি নিজে উৎসাহ প্রকাশ করি নাই; ভিতুর গৃহখানি পত্র পুষ্প পতাকায় সুসজ্জিত করিয়াছে। সে অদ্য অন্তরে বাহিরে সুখী; আমি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিহিংসার তীব্র অনলে জ্বলিতেছি। এবারের বসন্ত-উৎসব আমার অন্য-প্রকারের; নূতনের জন্মদিন আমার জীবনে আজ নবভাবে দেখা দিয়াছে।

সমস্ত দিন নানা চিন্তায় অতিবাহিত হইয়াছে। মনে সর্ব্বদা ভয়, পাছে কোন সূত্রে ত্রুটী আমার কার্য্যে অজ্ঞাতে প্রবেশ করিয়া আমার সঙ্কল্প ও চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। মুখে কিছু প্রকাশ করি নাই; প্রতি বস্তু আয়োজন অনুষ্ঠান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। ভিতুরের কোন কার্য্যে ত্রুটী নাই; গৃহের সাজ সজ্জা, আহারের বন্দোবস্ত সে আশাতিরিক্ত সুন্দরভাবে সম্পাদন করিয়াছে। বিকাল না হইতেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি, সন্ধ্যা হইলেই গোবিন্দ স্মিতহাস্যমুখে শত্রুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে; তাহার পর কি হইবে কে জানে।

জানি, ভিতুরকে যে আদেশ দিয়াছি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইবে; তথাপি তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। তাহাকে আবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "ভিতুর যাহা বলিয়াছি, মনে আছে ত?"

"কোন্ কথা প্রভু, আজ রাতের ভোজের সময়ের কথা কি?"

"হাঁ।"

"দাসের তাহা স্পষ্ট স্মরণ আছে।"

"জানি—তোমাকে সাবধান করিবার জন্যই আবার বলিলাম। গোবিন্দর দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। সে আমার ঠিক দক্ষিণ ধারে বসিবে। খুব সাবধানে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিবে। ভোজের সময় অনেক বাক বিতণ্ডা হইবার আশঙ্কা আছে—তাহাতে বিচলিত হইও না যেন। তোমার কাজ তুমি করিয়া যাইও।"

"যে আজ্ঞা হুজুর।"

"ছোরাখানা কি ঠিক করিয়াছ?"

"হাঁ প্রভু, পরিষ্কার করিয়া দেরাজে রাখিয়াছি।"

"ভাল—তুমি যাইতে পার।"

তাহাকে বিদায় দিয়া উৎসবের উপযুক্ত বেশ পরিধান করিলাম। বাহিরে গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। গোবিন্দ আসিতেছে। পরক্ষণেই সে সহাস্য মুখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল; সানন্দে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "প্রিয় বন্ধু! পরম সৌভাগ্য—আবার আপনার সাক্ষাৎলাভ করিয়া কত সুখী হইলাম। ভাল আছেন ত? আপনাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছে।"

আমিও হাসিয়া বলিলাম "ঐ কথা আমারও। স্থান পরিবর্ত্তনে আপনার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।"

গোবিন্দ হাসিতে হাসিতে আমার পার্শ্বে উপবেশন করিল; বলিল "টাকার মানুষকে বোধ হয় স্ফূর্ত্তিশীল করে; নইলে কম ভুগি নাই। যা হোক বুড়া চারি দিক রক্ষা করিয়াছে। যাক আপনি উৎসব-বেশ পরিয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন, দেখিতেছি। আমি আপনার অনুরোধে বরাবর এখানে আসিয়াছি। পোষাকটা পরিবর্ত্তন করিয়া লই; অতিথিদের আসিবার বেশী দেরী নাই বোধ হয়!"

আমি বলিলাম, "অত তাড়াতাড়ি কি? এখনো অনেক সময় আছে, সবে সন্ধ্যা। এক প্রহর রাত্রে ভোজ। শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন—আগে সুস্থির হোন।"

সে সহাস্যে আমার হস্ত ধারণ করিল। আমি হাসিয়া বলিলাম "আজ আপনাকে অভ্যর্থনা করিতে আমার কি আনন্দ। আমি আপনার পথ চাহিয়া ছিলাম, যেমন "

গোবিন্দ আমার বাক্য শেষ হইতে না দিয়া বলিল "যেমন সে পথ চাহিয়া আছে! মহাশ্রেষ্ঠী আপনাকে আর কি বলিব—তাহাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ কি করিতেছে। কেবল আপনাকে কথা দিয়াছি বলিয়া আপনার ন্যায় সম্মানিত বন্ধুর অনুরোধ রাখিতে আমি এতক্ষণ এখানে আছি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। কবি কি বলেন নাই, রমণী, নক্ষত্রের মত, রজনীতেই সুন্দর। কবির উক্তির সার্থকতা অনুভব করিবার অবসর হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিব না। শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, আপনার অনুপস্থিত কালে, আমি ব্যতীত অন্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই।"

"শত ধন্যবাদ! বলুন এখন, কে কে আজ রাত্রে নিমন্ত্রিত। প্রেম-প্রসঙ্গ অপেক্ষা আহারের প্রসঙ্গটাই এখন যথেষ্ট প্রীতিকর।"

"নিশ্চয়ই! বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিরকালই উত্তম স্ত্রীলোক অপেক্ষা উপাদেয় আহারীয়কেই বেশী পছন্দ করে। নিমন্ত্রিতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তাহাদের সকলেই আপনার পরিচিত। যথাকালে দেখিতে পাইবেন।"

গোবিন্দ বলিল "আচ্ছা, মহাশ্রেষ্ঠী, এত আয়োজন কি একা এই অযোগ্যের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্য করিয়াই করিয়াছেন?"

উত্তর করিলাম "অন্য উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে? আপনি এতদিন পরে, আমাকে আনন্দিত করিবার জন্য, আমার নিরূপিত দিনে আমার ভবনে প্রথমেই দেখা দিয়াছেন—আপনার সম্বর্দ্ধনার জন্যও কি যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিব না?"

সে আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া আমার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিল; বলিল, "বলুন, আপনি কেন আমাকে এত অনুগ্রহ করেন, আমি আপনার কি করিয়াছি!"

আমি গম্ভীরস্বরে বলিলাম, "উপকার অপকার তুলনা করিয়া কেহ কাহাকেও পছন্দ করে না;—করিলে অনেক মিত্রকেও শত্রু মনে করিতে হইত, অনেক শত্রুও মিত্র হইত। আপনাকে আমার ভাল লাগে এই যথেষ্ট। আমি কি একা এই প্রথম আপনাকে পছন্দ করিতেছি? আপনিই ত বলিয়াছেন,—আপনার মৃত বন্ধু হেমরাজ আপনাকে কিরূপ ভালবাসিতেন।"

গোবিন্দ ধীরে ধীরে আমার স্কন্ধ হইতে তাহার হস্ত উঠাইয়া লইল। কতক্ষণ নীরব থাকিয়া, উদাসভাবে বলিল "আবার তাহার নাম। চেষ্টা করিয়াও তাহার স্মৃতি আমি মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই। সে নির্ব্বোধ ছিল সত্য, কিন্তু আমাকে প্রকৃতই ভালবাসিত,—কতবার এবারে তাহার কথা স্মরণ হইয়াছে।"

বলিলাম "কেন?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে উত্তর করিল, "খুড়ার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিলাম—কি ভয়ানক! বুড়ার শরীরে শক্তি ছিল না—তবুও মৃত্যুর সহিত তাহার কি ভয়ানক সংগ্রাম—ভয়ানক—অতি ভয়ানক! প্রাণ কি সহজে বাহির হইতে চায়! একদিকে যম টানিতেছে,—অন্য দিকে বুড়ার বাঁচিবার চেষ্টা—সে কি কম যন্ত্রণা!"

বলিলাম, "সে দৃশ্য ভুলিয়া যান! সকলকেই একদিন মরিতে হইবে—মৃত্যু বলিয়া আর ভয় কি?"

গোবিন্দ বলিল "ভয় হয়—মৃত্যুটা অত ভয়ঙ্কর না হইলে ভাল হইত। লোকে কেন ভুল করিয়া মৃত্যুকে নিদ্রার সহিত তুলনা করে। বৃদ্ধের মৃত্যুই যখন এত ভয়ঙ্কর, যুবকের না জানি আরো কত ক্লেশকর!"

বলিলাম "যুবকের মৃত্যুর কথা কিসে আপনার মনে উঠিল; গৌড়ের বায়ু আপনাকে স্ফূর্ত্তিহীন করিয়াছে।"

"সত্যই আমি মৃত্যুর বিষয় এবারে অনেক ভাবিয়াছি। সকল সাধের অবসান ঐ মৃত্যুতে। হেমরাজের নাম বার বার আমার মনে পড়িয়াছে; তাহার শরীর দৈত্যের মত ছিল—শক্তি অপরিমিত—প্রাণ কি তাহার সহজে গিয়াছে—না জানি শেষ মুহূর্ত্তে সে কত কষ্টই পাইয়াছে। নির্ব্বোধটার মৃত্যুতে আমার দুঃখ ছিল না, কিন্তু মড়কের সময় বাহিরে গিয়া কেন আকস্মিক ভয়ঙ্কর মৃত্যু টানিয়া আনিল; ছিল বেশ—সেই ভাবে আরও কয়েক দিন বাঁচিয়া গেলে, আমার সুবিধা বৈ অসুবিধা কি ছিল। বিবাহ? বিবাহ বা না-ই হইত!"

আমার হৃদয়ে যে একবিন্দু সহানুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল, নরাধমের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মুহূর্ত্তে তাহা অন্য আকার ধারণ করিল। আমি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম, "বন্ধু, মৃত্যু-চিন্তার এ সময় নয়; কে জানে কি সূত্রে সে কখন কাহাকে গ্রাস করিবে—সে বিষয় ভাবিয়া কি ফল! জীবন যতক্ষণ আছে উপভোগ করুন। আপনিই না বলিতেন—যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। তাহারই অনুসরণ করুন। আপনার ভবিষ্যৎ

সুখের আশা মুকুলিত। ভোজের পূর্ব্বে মৃত্যু-চিন্তা প্রীতিপদ কি ?"

গোবিন্দ আমার বাক্যে যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইল, বলিল, "ঠিক। মাথাটা আমার কেমন হইয়া গিয়াছে। সময় সময় নির্ব্বোধের ন্যায় বৃথা চিন্তায় অধীর হইয়া পড়ি। বুড়ার মৃত্যু-দৃশ্য আমাকে এমন করিয়াছে, নহিলে চিরদিনই ত আমার মস্ত ফূর্ত্তি—ফূর্ত্তি—ফূর্ত্তি। মহাশ্রেষ্ঠী! আপনি আজ আমার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য এত আয়োজন করিয়াছেন,—পূর্ণ প্রাণে তাহাতেই যোগ দেই। ভুলিয়া গিয়াছি—আমার এখনো কাপড় ছাড়া বাকী আছে!"

ভিতুরকে ডাকিলাম। গোবিন্দর হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলাম। তাহারা কক্ষ পরিত্যাগ করিল; আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাহার বা আমার খেলারাশেষ হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যু কি, আমি একবার অনুভব করিয়াছি—গোবিন্দ আজ অনর্থক মৃত্যুর প্রভাব স্মরণ করে নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

এক প্রহর হইতেই নিমন্ত্রিতগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ নূতন ধনীর উৎসববেশে শোভিত হইয়া আমাদের সহিত মিলিত হইল; সকলেই তাহাকে সমভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। নব পরিচ্ছদে তাহাকে সুন্দর মানাইয়াছিল। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তিকে আমি বহুবার প্রশংসা করিয়াছি; আজও তাহাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া পারিলাম না, কিন্তু প্রশংসা করিলাম না। অতিথিগণ তাহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন, তাহার ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ লইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

প্রহর বাজিল। প্রধান ভৃত্য ভিতুর যথাবিহিত সম্মান-সহকারে নিবেদন করিল,—"আহার প্রস্তুত।" উদর তৃপ্তির অনুরোধে অপর প্রসঙ্গ সেইখানেই চাপা পড়িল। নিমন্ত্রণ-আসরে গল্প কোন ধারা ধরিয়া অগ্রসর হয় না; টলিয়া টুলিয়া চলাই তাহার স্বভাব। বন্ধুগণ সুসজ্জিত ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া, যিনি যাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। গোবিন্দ আমার দক্ষিণ পার্শ্বে। আহারের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যকৌতুক, গল্পপ্রসঙ্গ আবার চলিতে লাগিল। ভিতুর গোবিন্দর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। খাদ্যের সদ্ব্যবহার করিয়া অনেকেই আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। আসরটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "বন্ধুগণ! আমি মুহূর্ত্তের জন্য আপনাদের গল্পগুজবের অন্তরায় হইতেছি, আপনাদের আনন্দে বাধা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং আমি তাহা বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আমাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত ও আনন্দিত করিয়াছেন। বন্ধুবর গোবিন্দ আমাদের সকলেরই বন্ধু; তিনি কার্য্যানুরোধে কিছুকালের জন্য আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার অভাব অনুভব করিয়াছি; তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়াছি, আজ তিনি আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আমরা সকলেই প্রফুল্ল, তাঁহার সঙ্গ সকলেরই বাঞ্ছিত, আপনাদের আগমনেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। আপনাদের কার্য্য আমি করিয়াছি, আমার এ ক্ষুদ্র আয়োজন অনুষ্ঠিত না হইলে, আপনাদের কেহ অবশ্য উহার অনুষ্ঠান করিতেন। বন্ধুবর গোবিন্দ, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, তিনি আজ প্রভূত অর্থের অধীশ্বর,—এ সংবাদে আমরা কত সুখী হইয়াছি। এই আনন্দের দিনে, আমি আর একটা সুসংবাদ, আপনাদের ন্যায় বন্ধুবর্গের নিকট প্রকাশ না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।—আশা করি এ বিষয়েও আমি আপনাদের আশীর্ব্বাদ ও সহানুভূতি লাভ করিয়া সুখী হইব।" আমি একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলাম, "যাহা আমি বলিতে যাইতেছি তাহা শুনিয়া আপনারা বিস্মিত হইবেন। আপনারা আমাকে কেবল বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত বৃদ্ধ বলিয়াই জানেন,—বাক্যালাপে আমি পটু নই।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "না—না, আপনার ন্যায় মধুরভাষী, সমাজের বন্ধু অতি বিরল।"

আমি বিনীত ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলাম, "অন্ততঃ আমি মহিলাদের নিকট মূক বলিয়া পরিচিত—তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার মত গুণ আমাতে অতি অল্পই আছে। বৃদ্ধ আমি, ক্ষীণদৃষ্টি অর্দ্ধ-অন্ধ আমি—আমার

প্রতি প্রেম-কটাক্ষপাত রমণীর পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু দেখিতেছি, সংসারে অসম্ভবও সম্ভব হয়; নহিলে কেন একজন মহিলা—অপ্সরা—আমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিবেন? তাঁহার মতে আমি নাকি প্রকৃত প্রেমিক—তিনি আমাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত,—কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে,—আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব।"

আমার মুখে বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া সহসা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যেন। সকলেই নীরব। গোবিন্দ চমকিয়া উঠিল—সে বিস্ময়ে, আতঙ্কে উৎকণ্ঠিত। অচিরে বন্ধুবর্গের বিস্ময়ভাব দূর হইয়া তাঁহাদের হাস্য কৌতুক আনন্দের ঐকতান উত্থিত হইল; এককালে বহুকণ্ঠের ভাষার অর্থ-বোধ হইল না; আনন্দ-উচ্ছ্বাস মুখরিত হইয়া উঠিল মাত্র। গোবিন্দ কেবল বিমর্ষ, সে চেষ্টা করিয়াও সঙ্গীগণের হর্ষকোলাহলে যোগদান করিতে পারিল না।

তাহার কণ্ঠ কম্পিত হইতেছিল, চক্ষুতারকা তাহার রক্তবর্ণ।

একজন ধীরে ধীরে বলিলেন "মহাশ্রেষ্ঠী, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি—কে সেই সৌভাগ্যবতী, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, যাঁহার মঙ্গল-উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা,—শুভ-ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি?"

গোবিন্দ জড়িতকণ্ঠে বলিল "আমিও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম। আমরা বোধ হয় সেই সৌভাগ্যবতীর সহিত পরিচিত নই।"

আমি মৃদু হাস্যের সহিত উত্তর করিলাম "বন্ধু! ঠিক তাহার বিপরীত; আপনারা সকলেই তাঁহার সহিত সুপরিচিত। আমার ভাবী স্ত্রী মহাশ্রেষ্ঠিনী নীলা!"

"মিথ্যাবাদী"—গোবিন্দ শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া চীৎকার করিল—"মিথ্যাবাদী।" সঙ্গে সঙ্গে সে স্বর্ণঘটী তুলিয়া আমার মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল। আমার গাত্রের পরিচ্ছদ সিক্ত করিয়া ঘটীটি মর্ম্মর মেঝের উপর পতিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা ভয়ানক দৃশ্যের অবতারণা; আগন্তুকগণের মধ্যে গোরগোল পড়িয়া গেল,—স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। আমি নিশ্চলভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলাম। একজন অতিথি ত্বরিত গোবিন্দর বাহুদ্বয় সবলে ধারণ করিয়া বলিলেন, "ছি! ছি! গোবিন্দ একি! তুমি কি মাতাল না পাগল হইয়াছ? তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, তুমি কতদূর গর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছ,—তুমি শুধু নিজকে হেয় কর নাই—আমরাও তোমার ব্যবহারে নিতান্ত লজ্জিত!"

গোবিন্দ আনায়বদ্ধ ক্ষুধিত শার্দ্দূলের ন্যায় তাহার দিকে কটমট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় অগ্নি-গোলকের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছে; ললাটের শিরাগুলি স্থূল রজ্জুবৎ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসকষ্টে তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইতেছে; তাহার তৎকালীন মূর্ত্তি অতি ভীষণ! গ্রীবা বক্র করিয়া রোষ-কষায়িত নেত্রে সে অতিথির দিকে চাহিয়া বলিল "হাত ছাড়িয়া দাও বলিতেছি—নহিলে ভাল হইবে না।"

তাহার বাহুপাশ ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গোবিন্দ অসহিষ্ণু অস্থিরভাবে দ্বিগুণ রোষে ফুলিতে লাগিল; দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া পৈশাচিক কণ্ঠে বলিল "অধঃপাতে যাও—যেও বন্ধু, তোমার হৃদপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইব—তবে ছাড়িব—নিশ্চয়, নিশ্চয়—ক্ষমা নাই।"

অপর একজন গোবিন্দর ধৃত হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে দ্বিগুণ বদ্ধ করিয়া, ধীর স্বরে বলিলেন "গোবিন্দ, হৃদপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করিবার পূর্ব্বে নিজের ব্যবহারটার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয় না কি? হৃদপিণ্ড বিদারণটা এখন বা নাই হইল,—এখানে এখন যাঁহারা যাঁহারা উপস্থিত আছেন, সকলেই ত রক্ত-পিপাসু রাক্ষস নন; তাঁহাদিগকে মেষও মনে করিবেন না। বলুন ত কোন্ অপদেবতা সহসা আপনার স্কন্ধে ভর করিল? আপনি অতিথি হইয়া, কোন নীতিতে গৃহস্থকে অপমান করিতে সাহসী হইলেন? বর্ব্বরেও ত পারে না।"

গোবিন্দ তাঁহাদের বাহুপাশ হইতে বিমুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিল; কর্কশ স্বরে বলিল, "কেন অপমান করিয়াছি? উহাকেই জিজ্ঞাসা করুন,—ওর পাপের তুলনায় এ অপমান লঘু কি না!"

সকলেই আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি নীরব।

একজন বলিলেন, "গোবিন্দ, জিহ্বা সংযত করুন, আপনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে মাননীয় মহাশ্রেষ্ঠী কখনই কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন; বলুন, কেন আপনি নীতিভঙ্গ করিয়া আমাদের সকলকে এরূপভাবে লজ্জিত করিলেন। ইহার জন্য আপনিই কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য!"

আমি বলিলাম, "বন্ধুগণ, উঁহার বিরক্তির কারণ আমি কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না; হইতে পারে, উনি যুবকোচিত চাঞ্চল্যবশে কল্পনা করিয়া বসিয়াছিলেন, যে ভদ্রমহিলার নাম করিবা মাত্র উনি বুদ্ধিহারা—তিনি উঁহাকে বিবাহ করিবেন।"

গোবিন্দ গর্জ্জিয়া বলিল, "কল্পনা! শুনুন সকলে, হেয় পাষণ্ড কি বলে!"

একজন অতিথি বলিলেন "এখনও আপনি সাবধান হইলেন না? কি বলিতেছেন? স্থির হোন। ছি! সামান্য কারণে এমন বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ, বন্ধু বিচ্ছেদ, ছি! ছি!"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম "আমি এখনও উঁহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি; কাল্পনিক সুখে নিরাশ হইয়া মানুষ এতদূর ক্ষিপ্ত হইতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। উনি যুবক,—রক্ত গরম; এখনও ঠাণ্ডা হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করুন, আমি সন্তুষ্ট মনে উঁহার সকল অপরাধ মাপ করিব।"

অতিথিরা আপনা-আপনিই বলিতে লাগিলেন। "বন্ধু হইতে হয় ত এই—কি উদারতা! আমি এমনটি আর দেখি নাই,—ইহার পরেও নিজ মুখে ক্ষমার কথা! গোবিন্দ এখনো সময় আছে।"

গোবিন্দ রোষে ফুলিতে লাগিল; চঞ্চল হইয়া উঠিল; প্রাণপণ শক্তিতে সকলের হস্তমুক্ত হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল; চীৎকার করিয়া বলিল, "বুঝিলাম, পাষণ্ডগণ সকলেই এক জোট; আমাকে অপমান করিবার জন্যই এত আয়োজন; আর না—প্রতিফল হাতে হাতে দিতে হইতেছে!"

আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী, প্রতারক, ভাবিয়াছ আমার হৃদয় হইতে তাহাকে সবলে ছিন্ন করিয়া লইবে; তা হইতেছে না; আমি তোমার হৃদপিণ্ড ছিন্ন করিয়া ছাড়িব; যদি নিতান্ত হেয় কাপুরুষ না হও, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বল, প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রস্তুত আছ কি না?"

আমি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলাম, "সন্তুষ্টচিত্তে। সকলে সাক্ষী থাকুন, ইনি জীবনের বিপদ স্বইচ্ছায় গ্রহণ করিলেন; আমি কিন্তু এখনও বুঝিতে পারি নাই, আমার অপরাধটা কি, আমি তাহার কি অন্যায় করিয়াছি। ভদ্রমহিলাটি যিনি আমার ভাবী পত্নী, তাঁহার হৃদয়ে উঁহার জন্য একবিন্দুও স্নেহ নাই, তিনি নিজে আমাকে সে কথা জানাইয়াছেন। তাহা যদি থাকিত, আমি সরিয়া দাঁড়াইতে প্রস্তুত ছিলাম; উনি যাহাই কল্পনা করুন না কেন, তাঁহার মনোভাব অন্য-প্রকার।"

"কি লজ্জা, কি লজ্জা।" বলিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। "ছি! ছি! গোবিন্দ ইহার জন্য এত! ছায়া দেখিয়া প্রাণ দিতে যাইতেছ,—সেই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার। মহাশ্রেষ্ঠী নিতান্ত ভদ্র; তাই তিনি আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে কৈফিয়ৎ দিলেন। কেন বৃথা আশায় উন্মত্ত হইয়াছ?"

গোবিন্দ কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া আমার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "কি? কি বলিলে? তাহার হৃদয়ে আমার জন্য বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই? চিঠিগুলা সবই জাল—কেমন? মিথ্যাবাদী চোর বিশ্বাসঘাতক- এই ক্ষমা ভিক্ষার ভাষা—ইহাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ কর; এই লও—" বলিয়া আমার গণ্ডে চপেটাঘাত করিল। সকলেই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। আমি হস্তসংকেতে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, "ইহার আর উত্তর নাই। ইতরের সঙ্গে ইতরামি করা ভদ্রলোকের উচিত নয়। কাল অস্ত্রের মুখে জবাব দেওয়া যাইবে।"

গোবিন্দ সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আমার পক্ষ সমর্থন করিবার কি কেহ নাই?"

সকলে সমস্বরে উত্তর করিলেন "না,--ইহার পরেও মানুষের সহানুভূতি আপনার প্রতি থাকিতে পারে না—আপনার পক্ষ অন্যত্র অনুসন্ধান করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে। আপনি আমাদের মুখ রাখেন নাই,—আপনার ব্যবহারে আমরা সকলেই অতি লজ্জিত—অপমানিত!"

গোবিন্দ ঝড়ের মত দ্রুতগতিতে কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

দর্শকগণের মধ্যে মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল,—সকলে স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিতে ব্যস্ত ছিলেন; শ্রোতা বড় কেহ ছিল না। আমি ইশারা করিয়া ভিক্টরকে ডাকিলাম, তাহাকে চুপে চুপে বলিলাম "অলক্ষ্যে গোবিন্দর অনুসরণ কর। সাবধান, ঘুণাক্ষরেও সে যেন সন্দেহ করিতে না পারে।"

বিশ্বস্ত ভৃত্য প্রস্থান করিল।

সকলেই নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই যে আমার পক্ষে প্রকারান্তরে তাহা প্রমাণ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমি নীরবে, সহাস্যে তাঁহাদের সহানুভূতির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিলাম, আমার অন্তরে কি হইতেছিল, আমিই জানি। যাহার জন্য আমার এত আয়োজন, এত চেষ্টা, আজ তাহা সফল হইয়াছে। এ আমার অপমান নহে; যে অপমানে আমি জর্জ্জরিত, তাহা প্রতিশোধের প্রথম সোপান, করে শত্রুর শোণিত-তর্পণে তাহার শান্তি হইবে!

বন্ধুবর্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, তাঁহারা সকলেই উৎকণ্ঠিত। সহাস্যে বলিলাম, "বন্ধুগণ, আজ আমাদিগকে এরূপ ভাবে বিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে বলিয়া আমি দুঃখিত, কিন্তু দুঃখের মধ্যেও আমি যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিয়াছি, আপনারা আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি, এ গৃহে এ সম্মিলনীই শেষ সম্মিলনীতে পরিণত হইবে না; যদি বিধাতার মনে তাহাই থাকে, আমি অসুখী হইব না; আপনাদের সুখস্মৃতি জীবনের পরপারে বহন করিয়া লইয়া যাইব। আর যদি কল্য আততায়ীর হস্তে রক্ষা পাই, আর একদিন, আমার বিবাহ-দিনে আপনাদের সঙ্গ-সুখে ধন্য হইব, তখন আমাদের আনন্দ-উৎসব বিফল করিবার কেহ থাকিবে না।"

সকলে সমস্বরে বলিলেন, "সে শুভ দিন নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে। গোবিন্দ বিশ্বস্ত বন্ধুর সম্মান রক্ষা করে নাই, তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে,—আজকার ঘটনা দৈব-বাণীর ন্যায় তাহাই প্রকাশ করিতেছে।"

বলিলাম, "বন্ধুগণের বাক্য সত্য হোক; ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।"

একে একে সকলে বিদায় সম্ভাষণান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি আমার কক্ষে একা। নানা চিন্তা আসিয়া হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। কল্য আমাদের দুইজনের মধ্যে এক জনের মৃত্যু নিশ্চিত; জীবন ও মরণের মধ্যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করিতেছে। শরীর শিহরিয়া উঠিল; মৃত্যু যে কি যন্ত্রণার আমি তাহা অবগত আছি। পরক্ষণেই মনে হইল—জীবনের আশা পরিত্যাগ করিব কেন? মৃত্যু আমার জন্য নহে; পাপীর শাস্তি না দেখিয়া মরিব যদি, তখনই মরিতাম; গোবিন্দর মত বিশ্বাসঘাতক জগতে আর কয়টি আছে? তাহারই ডাক পড়িয়াছে। প্রতিহিংসায় শেষ আহুতি প্রদান না করা পর্য্যন্ত ভগবান আমাকে রক্ষা করিবেন। এই আমার সাফল্যের সূচনা; কিন্তু গোবিন্দর আজ কি শোচনীয় মনের অবস্থা, একদিন আমিও এই বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছিলাম; আজ সে সেই বিষে জ্বলিতেছে। চরিত্রহীনা রমণী সর্পিণী হইতেও ভয়ঙ্কর,—তাহার হলাহল কি তীব্র!

এক খণ্ড কাগজ টানিয়া লইয়া দুই কথায় আমার মরণোত্তরব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিলাম। যদি মৃত্যুই হয়; অনেকের প্রতিই আমার কর্ত্তব্য আছে। দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ডাকিলাম "ভগবান, এ দলিল যেন নিরর্থক হয়, এখনো আমার কার্য্য শেষ হয় নাই।" এমন সময় দেবালয়ে আরতির ঘণ্টা শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। এই শুভক্ষণে আমার প্রার্থনা নিষ্ফল হইবে না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নয়নে নিদ্রা নাই; চিন্তার পর চিন্তা; দ্বার উদ্ঘাটনের শব্দে আমার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল। চাহিয়া দেখিলাম, ভিক্টর উপস্থিত। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "খবর কি?"

"প্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। গোবিন্দ মহাশয় এখন তাহার চিত্রশালায়। তিনি এখান হইতে বাহির হইয়া বরাবর শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদে গেলেন; প্রাসাদের সদর ফটকে উপস্থিত হইয়া বার বার ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেহই তাহার আহ্বানের উত্তর দিল না। চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। প্রাসাদে আলোকচিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছিল

না ; জানালা কপাট বন্ধ ; ভিতরে কেহ জাগ্রত ছিল না বোধ হয়। তিনি মহা উত্তেজিত হইয়া দ্বারে সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিলেন ; সাধারণ কপাট হইলে নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া যাইত। অবশেষে, একটা লণ্ঠন হস্তে বৃদ্ধ জিতকাম দেখা দিল। দ্বার খুলিবামাত্র গোবিন্দ মহাশয় এক লম্ফে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "শ্রেষ্ঠিনীর সঙ্গে এখনি সাক্ষাৎ না করিলেই নয়,—এত শব্দেও কি তোদের ঘুম ভাঙ্গে না, মরিয়া ছিলি কি ?"

জিতকাম বংশপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। বলিল "তিনি নাই,—চলিয়া গিয়াছেন।"

মহাশয় বৃদ্ধের ঘাড় ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিয়া পাগলের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গিয়াছেন,—কোথায় গিয়াছেন ? সে কথা কি মুখ দিয়া বাহির হয় না ? বেটা, বদ্‌মাস্, বোকা—ঘাড়টা মুচড়িয়া ছিঁড়িয়া না ফেলিলে কি তোর আক্কেল হইবে না ?"

সঙ্গে-সঙ্গে জিতকামকে এমন জোরে ধাক্কা দিলেন যে বৃদ্ধ মাটীতে পড়িতে-পড়িতে সামলাইয়া লইল ; আর্ত্তস্বরে বলিল, "প্রভু ক্ষমা করুন—কর্ত্রী গিয়াছেন, ভিক্ষুণী মঠে ; সেখানে তিনি নাকি বাল্যকালে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, কিছুদিন সেখানে কাটাইবেন,—দুই দিন হইল গিয়াছেন— আর বেশী আমি জানি না।"

মহাশয় বৃদ্ধকে মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিলেন, "জানি না ! ন্যাকা ! নরকে যা তোরা। তোদের কর্ত্রীরও সেই উপযুক্ত স্থান। বলিস তাহাকে, আমি আজ সেইজন্যই আসিয়াছিলাম, আজ তাহার দেখা পাইলে তাহার রক্ষা ছিল না— শুধু তাহাকে খুন করিয়া ক্ষান্ত হইতাম না—তাহার রক্তে, বৃদ্ধ প্রতারক ওড্রের রক্তে একাকার করিতাম—আজ হইল না, দুই দিন পরে সে সাধ মিটাইব—কিছুতেই এই গৃহের একটি প্রাণীকেও ক্ষমা করিব না—শুন্‌লি বোকা বুড়া শুন্‌লি—যম তোদের শিয়রে—যম এই আমি !"

মহাশয় ব্যাঘ্রের ন্যায় বৃদ্ধের উপর লাফাইয়া পড়িলেন, তাহার গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করিলেন, বেচারী সে আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, ভূমিশায়ী হইল ; তাহার হস্তের লণ্ঠনটি দশ হাত দূরে ছট্‌কাইয়া পড়িল, চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। মহাশয়ের ব্যবহার আমার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল ; ইচ্ছা হইতেছিল, তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দান করি ; কেবল আপনার আদেশ স্মরণ করিয়া সেই অমানুষিক অত্যাচার নীরবে দেখিয়াছি। শরীরে যাহার এক বিন্দু রক্ত আছে, সেও কি দুর্ব্বলের প্রতি এরূপ অত্যাচার চক্ষে দেখিতে পারে ?

আলোক নির্ব্বাপিত হওয়ায় আবার অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়া ফেলিল। তিনি আর তথায় দাঁড়াইলেন না ; একবার রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাড়াতাড়ি কূপ হইতে জল আনিয়া বৃদ্ধের চোখে মুখে ছিটা দিলাম। সে গোঁডাইয়া উঠিল। তাহার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভের কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার সুযোগ আমার ছিল না, মহাশয় দ্রুতপদে ছুটিতেছিলেন ; আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। অন্ধকার রাত্রি। জ্যোৎস্নার আলোকে তাঁহার মূর্ত্তি কখন ছায়ার ন্যায় দেখা যাইতেছিল, কখন অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছিল ; ক্রমে তিনি একটা আলোকহীন সংকীর্ণ গলিতে প্রবেশ করিলেন ; প্রায় এক রশি পথ অতিক্রম করিয়া একটা অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারে থামিলেন। দ্বারে আঘাত করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা উদ্ঘাটিত হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রায় এক দণ্ড পরে পুন দ্বার উদ্ঘাটনের শব্দ পাইলাম। কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম, এবারে তিনি একা নন,—আরও দুই ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী। তাহাদের কথোপকথন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। মহাশয় গোবিন্দকে বিদায় দান কালে তাহাদের একজন অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল 'কল্য প্রাতে ৮টায় আমরা নিশ্চয় উপস্থিত থাকিব, ভীত হইও না, বৃদ্ধের আর কতটুকু শক্তি।' বিকট হাস্যে অন্ধকারময় পথ কম্পিত হইল। তিনি আবার ছুটিলেন। বরাবর চিত্রশালার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; দ্বারের কুলুপ খুলিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আমি ফিরিলাম, সেখান হইতে প্রভুর নিকট একটানা চলিয়া আসিয়াছি।"

এতক্ষণ চিত্রপুত্তলিকাবৎ ভিদুরের বর্ণনা শ্রবণ করিতেছিলাম। সহসা সে নীরব হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম "এই কি সব ?"

সে নমস্কার করিয়া বলিল "হাঁ, প্রভু। তাহার গৃহে প্রবেশ করিবার আমার অধিকার কি ?"

আমি তাহার মন্তব্যে জাগ্রত হইয়া বলিলাম "অবশ্য,—তুমি যথেষ্ট করিয়াছ ভিদুর! স্বচক্ষেই ত দেখিলে হতভাগা আমাকে আজ কি অপমানটাই করিয়াছে। কেন সহ্য করিয়াছি আমিই জানি থাক, সে অন্যায় অপমানের প্রতিশোধের উপায় হইয়াছে—বিধিমত ব্যবস্থায় তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে, জীবনে সে যেন আর কাহাকেও কখনও অত্যাচার করিতে না পারে। ভিদুর! তরবারি ঠিক করিয়া রাখিয়াছ ত?"

সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল "হাঁ, প্রভু, কিন্তু আজ যে বসন্ত-উৎসব!"

আমি গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলাম, "তা আমি সম্পূর্ণ অবগত আছি, বিশ্বাসঘাতকের রক্ত-ফাগে বসন্তের উত্তরীয় রঞ্জিত করিয়া দিব।"

ভিদুর শির অবনত করিয়া বলিল "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

বলিলাম, "তোমার শুভ ইচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। প্রত্যুষে আমাকে ডাকিয়া দিও। বিদায়।"

ভিদুর কক্ষ পরিত্যাগ করিল। আমি শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম। বস্ত্র পরিবর্তন করিলাম না, সেই বেশেই শয্যায় আশ্রয় লইলাম। নিদ্রার ইচ্ছা ছিল না, সে রাত্রে সে আশা বৃথা; কেবল চিন্তা; সে যে কি চিন্তা তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারি নাই। সে যেন স্বপ্ন। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান মিলিয়া মিশিয়া একটা অজ্ঞাত অব্যক্ত যুগের মধ্যে আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল। বাল্যের সরলতা, অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, যৌবনের প্রেম-মোহ, বার্দ্ধক্যের মৃত্যু জড়িত হইয়া আমার হৃদয়ে এক ভাব-তরঙ্গ উত্থিত করিয়াছিল। বাল্য-সখা গোবিন্দর জন্য প্রাণ কেমন করিতেছিল। তাহার জন্য দুঃখ হইতেছিল, দয়া হইতেছিল। মুখে যাহাই বলি না কেন, বাল্য-বন্ধুত্বের মোহ সহজে কাটান সহজ নহে; গত জীবনের স্মৃতি, প্রীতি—গোবিন্দ যাহাই হউক না কেন, তাহার দোষ নম্র করিয়া দিতেছিল; অবশেষে কিনা আমার হস্তেই তাহার মৃত্যু! পরক্ষণেই ভাবিতেছিলাম, সেও কোন্ আমাকে রেহাই দিয়াছে; একবার নয়, দুইবার নয়, তিন তিনবার সে আমাকে বধ করিয়াছে;—সেই লতাকুঞ্জে, চম্পার মৃত্যুতে, ভোজের আসরে। তাহাকে আবার দয়া—মৃত্যু তাহার যত সত্বর হয়, যত ভয়ঙ্কর হয়, প্রায়শ্চিত্ত তাহার ততই উপযুক্ত হইবে। এতদিন তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি, দশের সমক্ষে লাঞ্ছিত হইয়াও তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করি নাই—সে কেবল তাহার এই চরম শাস্তি লক্ষ্য করিয়া! সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন তাহাকে বুঝিতে দিতে হইবে আমি কে, আমার কি মহা অনিষ্ট সে করিয়াছে, কি পাপে তাহার এ প্রায়শ্চিত্ত।

কখন্ তন্দ্রা আসিয়াছিল জানি না। কপাটের কড়া নাড়ার শব্দে জাগ্রত হইলাম। দ্বার খুলিয়া দিলাম। ভিদুর উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বড় দেরী হইয়া গিয়াছে কি?"

"না প্রভু, সবে ভোর হইতেছে। আপনি কি উৎসব-বেশ পরিবর্ত্তন করিবেন না?"

আমি মস্তক সঞ্চালনে সম্মতি জানাইলাম। ভৃত্য পরিচ্ছদ আনয়ন করিলে যথাসত্বর বেশ পরিবর্ত্তন করিলাম। আমি গমনোদ্যত হইলাম; বিশ্বস্ত ভৃত্য করুণ স্বরে প্রার্থনা করিল, "আমি কি প্রভুর সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইতে পারি?"

বলিলাম, "আচ্ছা। কিন্তু সাবধান, তুমি যেন আমার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া গোলমাল বাধাইও না।"

"না—প্রভু।"

আমার মনে হইতেছিল, দীর্ঘপথ আর ফুরায় না। আশা, ভরসা, সহানুভূতি প্রভৃতি প্রবৃত্তি প্রতিহিংসায় কেন্দ্রীভূত করিয়াছি; তাহার বিষয়ই চিন্তা করিতে-ছিলাম; তাহাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। অবশেষে প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া নিম্নগামী বেলা-পথে নামিতে লাগিলাম।

আমি কাঁপিতেছিলাম; ঠাণ্ডার জন্য নহে; একদিন যাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহার প্রাণ লইতে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া। আমার মন বলিতেছিল, আমার জয় নিশ্চয়, কিন্তু তাহাতে সুখ কি? আমার জীবনে, গোবিন্দর জীবনে পাপীয়সী কি যন্ত্রণা ঢালিয়া দিয়াছে। ঘৃণায় প্রাণ পূর্ণ; ক্রোধে শরীরের রক্ত ফুটিতেছিল, তাই কাঁপিতেছিলাম।

গোবিন্দ অদূরে দেখা দিল। সে ধীর পদে অগ্রসর

হইতেছিল। সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না। ধীরে ধীরে আসিয়া একটা বৃক্ষে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইল। আমি চক্ষু হইতে আবরণ খুলিয়া ফেলিলাম। আমি তরবারি কোষমুক্ত করিয়া দাঁড়াইলাম।

গোবিন্দ মস্তক উত্তোলন করিল; তাহার ঠিক সম্মুখেই আমি। চক্ষে চক্ষে মিলন হইল। হায় ভগবান, আমার দৃষ্টি মুহূর্ত্তে তাহার বদনে কি এক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। শরীর তাহার কম্পিত; তাহাকে যেন মূর্চ্ছা-রোগে আক্রমণ করিতেছে।

গোবিন্দ লক্ষ্য স্থির করিবার উদ্দেশ্যে আমার প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। আবার নয়নে নয়নে সাক্ষাৎ! বেচারীর হস্ত কাঁপিতেছে; আমার ভয় হইতেছিল, সে পাছে বা পড়িয়া যায়!

আমি গোবিন্দকে আক্রমণ করিলাম। কিন্তু গোবিন্দ নিশ্চল। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। সে যথাস্থানে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার নয়নদ্বয় জ্বলিতেছে, তরবারি তাহার হস্ত হইতে মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে। আমাকে পুনঃ দেখিবামাত্র সে লম্ফ প্রদান করিয়া অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইল। আমি তরবারি প্রসারিত করিয়া ধরিলাম। সে একেবারে তরবারির উপর আসিয়া পড়িল। তারপর বেচারী টলিতে টলিতে দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল; গোঙ্গাইতে লাগিল। ভিহুর দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইল; তাহার তখন চৈতন্য লোপ পাইয়াছে, বক্ষের সম্মুখের পরিচ্ছদ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। আমরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম।

চোখে মুখে জলের ছিটা দেওয়া হইল, গোবিন্দ নয়ন মেলিল; একটা বিলম্বিত দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বক্ষ কম্পিত করিয়া নিপতিত হইল; অবশেষে আমার উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কথা বলিতে চেষ্টা করিল। ভিহুর তাহার মুখে জল দিল। ক্ষণেক পরে গোবিন্দ অতিকষ্টে বলিল, "উহার সঙ্গে আমায় কথা বলিতে দাও—কেবল উহার একার সঙ্গে—তুমি সরিয়া যাও— এই দয়াটুকু কর—সময় যে ফুরাইয়া আসিল।"

ভিহুর দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দ আমার মুখের দিকে ভয়বিহ্বল, বিস্ময়ক্লিষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "বল তুমি—তুমি কে?"

আমি স্থির ধীর স্বরে বলিলাম "গোবিন্দ, তুমি আমাকে চিনিয়াছ—আমি হেমরাজ, যাহাকে তুমি একদিন বন্ধু বলিতে। আমি সেই যাহার স্ত্রীকে তুমি প্রণয়িনী মনে করিয়াছ। আমি সেই যাহার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা কথায় কথায় বলিয়াছ—সম্মান যাহার পদদলিত করিয়াছ! ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ বন্ধু, তোমার নয়ন তোমার অন্তরই বলিয়া দিবে আমি কে।"

সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "হেম—হেমরাজ! কতবার আমি সন্দেহ করিয়াছি, বিশ্বাস করিতে পারি নাই।—হেম যে মরিয়াছিল। আমি তাহাকে স্বচক্ষে শবাধারে দেখিয়াছি।"

আমি তাহার আরও সন্নিকটে সরিয়া বসিলাম, বলিলাম, "হাঁ, আমার অজ্ঞান অবস্থাকে মৃত্যু বলিয়া ভ্রম করিয়া, আমাকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়াছিল। এখন বুঝিলে গোবিন্দ? আমি সে ভীষণ স্থান হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলাম,—কেমন করিয়া শুনিয়া কাজ নাই। তোমাদের জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া গৃহে ফিরিলাম—কিন্তু কি দেখিতে? তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা,—আমার আত্ম-সম্মানের মৃত্যু—আর কি শুনিতে চাও?"

গোবিন্দর বিবর্ণ বদনমণ্ডল যন্ত্রণায় বিকৃত হইল; মস্তক লুণ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল; ললাটে ঘর্ম্ম ছুটিল। আমি উত্তরীয় দিয়া তাহা মুছাইতে লাগিলাম, মুখে জল দিলাম। বলিলাম, "তারপর তুমি সমস্তই জান।' বড় আশা করিয়া,—বিস্ময়ে, আনন্দে আত্মহারা করিব বলিয়া অন্যের অজ্ঞাতে, সন্ধ্যার অন্ধকারে গৃহে ফিরিয়াছিলাম। সেই লতাবর্গ দিয়া। কি দেখিয়াছিলাম, তুমি ও সে উদ্যানে দাঁড়াইয়াছিলে,—সে তোমার বাহুপাশে— তোমরা বলিতে-ছিলে—আমার মৃত্যুতে তোমরা নিষ্কণ্টক হইয়াছ। তুমি তাহার বক্ষে বিলম্বিত রত্নহারের ধুকধুকি লইয়া হাসিয়া হাসিয়া ক্রীড়া করিতেছিলে।—আমার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করিতে হইবে কি? আমার তৎকালের যন্ত্রণা তোমার এ যন্ত্রণা হইতে কম নয়।—তারপর, তারপর তুমি তাহার গণ্ডে যখন—"

গোবিন্দ গোঙ্গরাইয়া উঠিল, অস্পষ্ট স্বরে বলিল "বল বল, শীঘ্র বল—সে কি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে?"

"না—আজও নয়—কিন্তু শীঘ্রই সে জানিতে পারিবে আমি কে—আমাদের দ্বিতীয়বার বিবাহের পর।"

গোবিন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিল; বলিল "তোমার হাতে আমার মৃত্যু—অন্যায় নহে—পূর্ব্বে বলিলে না কেন—আমি অন্য ব্যবস্থা করিতাম—কি ভয়ানক নীলা পরম শত্রু—সত্যই শয়তানী!"

আমি বলিলাম "গোবিন্দ, বিপথগামী বন্ধু,—শত্রু! আমার প্রতিহিংসা কি বুঝিলে? আজই ইহার শেষ ভাবিও না—তাহাকেও ইহাতে জীবন দিতে হইবে। সে আমাদের উভয়েরই বিশ্বাসহন্ত্রী; তাহার সহিত আমার দ্বিতীয়বার বিবাহ, বিবাহ নহে,—প্রতিহিংসা চরিতার্থের নির্ম্মম ফাঁদ! তাহার শেষ দিন অতি নিকট।" একটু থামিয়া বলিলাম, "গোবিন্দ, আমি তোমাকে যেমন ক্ষমা করিয়াছি, ভগবান তোমাকে তেমনি ক্ষমা করুন, তোমার আত্মার কল্যাণ হোক।"

গোবিন্দ অতি কষ্টে বলিল, "শেষ, সব শেষ—ভগবান—হেমরাজ—ক্ষমা!"

আর বলিতে পারিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সমস্ত শরীর আকুঞ্চিত করিয়া সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। ক্ষতমুখ হইতে সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে শোণিতস্রাব হইতে আরম্ভ হইল। আমি ক্ষতস্থান সজোরে চাপিয়া ধরিলাম। তাহার দেহ নিস্পন্দ হইয়া গেল।

আমি মৃতের হস্ত চুম্বন করিলাম, বিন্দু বিন্দু অশ্রুও বুঝি আমার নয়নে জন্মলাভ করিয়াছিল।

গোবিন্দর শেষ বাক্য আমাকে বিহ্বল করিয়াছিল।

(ক্রমশ)

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

পরস্পর ভক্তি

বাণী কহে—তোমায় যখন দেখি কাজ,
আপনার শূন্যতায় বড় পাই লাজ।
কাজ শুনি কহে—অয়ি পরিপূর্ণা বাণী,
নিজেরে তোমার কাছে দীন বলে জানি।

(কণিকা) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চশস্য

বিপন্ন বেলজিয়মের কৃতজ্ঞতা—

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের কঠিনতম অগ্নিপরীক্ষা বীর বেলজিয়মের উপর দিয়াই হইয়া গিয়াছে। সত্যকে রক্ষা করিতে গিয়া সে "নপ্রাণে মজিয়াছে। বেলজিয়ম এখন পরাধীন; তাহার জেতা প্রভু এখন মরীয়া হইয়া যুদ্ধ করিতেই ব্যস্ত, জিত দেশের দিকে তাকাইবার অবসর

বেলজিয়মের কৃতজ্ঞতা
এক চিত্রকর ময়দার থলের উপর এই ভাবটি অঙ্কিত করিয়াছেন যে ছন্নছাড়া বেলজিয়ম তাহার নিরন্ন শিশুগুলিকে স্তন্য-দানের জন্য আমেরিকার সম্মুখে আনিয়া ধরিতেছে।

তাহার নাই এবং দেশের নিজের এমন শক্তি নাই যে অন্নবস্ত্রের সংস্থান নিজেই করিতে পারে। ধনী আমেরিকা এই বিপন্নের সেবার ভার লইয়া জাহাজ জাহাজ ময়দা কাপড় এমন কি ছেলেদের খেলনা পর্য্যন্ত পাঠাইতেছে। এই দয়ার পরিচয়ে বীর দেশের নরনারী কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যে-সব মোটর গাড়ীতে করিয়া গ্রামে গ্রামে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়, তাহাতে আগে আমেরিকার নিশান

বেলজিয়মের মনে আমেরিকার ছবি।
এক চিত্রকর কল্পনা করিয়াছেন শান্তির অগ্রদূত পারাবতবাহিত মরাল-রথে দেবী আমেরিকা বেলজিয়মে আসিতেছেন, তাহার করুণার ভরা অঞ্চল পরীরা বহন করিয়া আনিতেছে।

উড়িত; একদিন একটি ধনীঘরের মহিলা এইরূপ একখানি গাড়ী যাইতে দেখিয়া তাহার সামনে হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া চালককে গাড়ী থামাই-বার ইঙ্গিত করিলেন; চালক আশ্চর্য্য অবাক হইয়া গাড়ী থামাইলে

মহিলাটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া আমেরিকার পতাকা চুম্বন করিয়া সরিয়া গেলেন। এখন খাদ্য বিতরণের গাড়ীতে আমেরিকার নিশান উড়ানো জার্ম্মানী বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন C. R. B.—Commission for Relief in Belgium—চিহ্নিত গাড়ী দেখিলেই আবালবৃদ্ধবনিতা সম্ভ্রমমুগ্ধ হৃদয়ে নীরবে দাঁড়াইয়া সেই বিদেশীর দয়াকে কৃতজ্ঞতা জানায়; ছেলে মেয়েরা চুপিচুপি গিয়া বিদেশীর জামার কিনার ছুঁইয়া শ্রদ্ধা জানাইয়া আসে। বেলজিয়মের পথ ঘাট বাগান আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ও বদান্য দাতাদের নামে অভিহিত হইয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্থায়ী করিতেছে। যাহারা বিতরণের কাজ সারিয়া দেশে ফিরিতেছে তাহাদিগকে বেলজিয়মের লোকেরা যাহার যেমন সাধ্য উপহার দিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যেসব বস্তায় ময়দা আসিতেছে সেইগুলি দিয়া বেলজিয়মের ছেলেদের অন্তর্বাস তৈয়ারি হইয়া থাকে। বেলজিয়ম শিল্পীর দেশ—চিত্রকর, চিকণগড় এদেশের প্রসিদ্ধ। তাহারাও দেশের কৃতজ্ঞতা নানা আকারে প্রকাশ করিতেছে। ময়দার থলের গায়ে যে কলকারখানা আড়ত বা দাতার নাম লেখা থাকে, তাহার চারিধারে বেলজিয়মের শিল্পীরা লাল নীল সবুজ রঙের রেশমের ফুল বুনিয়া সাজাইয়া দিয়া বস্তাগুলি ফেরত দিতেছে; কত পটু অপটু পটুয়া থলের গায়ে কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক ছবি আঁকিয়া দিতেছে। এই রিলিফ কমিশনের হেড আপিস লণ্ডনে। সেখানে কৃতজ্ঞ বেলজিয়মের এইরূপ নিদর্শন সংগৃহীত হইয়া একটি মিউজিয়াম হইয়া উঠিয়াছে। একজন শিল্পী উপহার পাঠাইয়াছেন একটি ছোট পাল-তোলা জাহাজ—পালগুলি রেশমের, জাহাজে রেশমী বস্তা বোঝাই, বস্তার গায়ে লেখা আছে 'ময়দা', জাহাজের মাস্তুলে আমেরিকার নিশান। একজন শিল্পী পাঠাইয়াছেন বেলজিয়মের চাষাদের পয়জারের আকারের একটা প্রকাণ্ড কাঠের জুতো 'সাবো', তাহার গায়ে ছবি আঁকা, সমুদ্রের ঝিনুক গুগ্‌লি শামুকের খোলা আর পিতলের খুঁটি দিয়া সাজানো; একটি ছবির বিষয়—সমুদ্রতীরে একটি পরিবার উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের সম্মুখে দুটি ছেলে অস্তগামী সূর্য্যের কোলে স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে আগন্তুক দুখানি আমেরিকার জাহাজ দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

*

* *

ডুবো জাহাজে মেরুভ্রমণ—

মেরু প্রদেশে পৌছিবার চেষ্টা অনেকে অনেকদিন হইতে করিতেছেন; তাঁহাদের মধ্যে ন্যানসেন, শ্যাকলটন, স্কট প্রধান। মেরু যাত্রার প্রধান অন্তরায় যানের অসুবিধা। দারুণ শীতের মধ্যে বরফ-জমা সমুদ্রে জাহাজ চালানো এক দুষ্কর ব্যাপার। এজন্য খুব ভারী ও শক্তিশালী জাহাজের দরকার হয়; কিন্তু সময়ে সময়ে বরফের চাপ এমন বেশী হয় যে শক্ত জাহাজও চাপে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যায়। তা না হইলেও বরফ কাটিয়া জাহাজকে অগ্রসর করা কঠিন হয়। ন্যানসেন তাঁহার মেরুভ্রমণের বিবরণে লিখিয়াছেন, তিনি আঠারো মাস ধরিয়া মেরু পৌছিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি রোজ গড়ে পৌনে মাইল পথ মাত্র অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। এই-সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমেরিকার বিখ্যাত কারিগর সাইমন লেক একপ্রকার ডুবো জাহাজ তৈয়ার করিয়াছেন; ইহাতে করিয়া মেরুতে পৌঁছা সহজ হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। ন্যানসেন লিখিয়াছেন যে মেরুপ্রদেশেও সমুদ্রের সমস্ত জল জমিয়া যায় না, ১৪ ফুটের চেয়ে পুরু বরফের সর কোথাও পড়িতে তিনি দেখেন নাই। সুতরাং বরফের সরের তলা দিয়া ডুবো জাহাজ স্বচ্ছন্দে বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে পারিবে। ডুবো জাহাজের মধ্যেকার তাপ সমুদ্রের জলের তাপের চেয়ে শীতল হইবে না, অর্থাৎ জমিয়া যাইবার মতন ঠাণ্ডা বোধ হইবে না। ডুবো জাহাজে ভাণ্ডারী ব্যাটারী থাকিবে—তাহাতে একবার বিদ্যুৎ সঞ্চয় করিয়া লইলে এক দমে ১৫০ মাইল অনায়াসে চলিয়া যাওয়া যাইবে; ইতিমধ্যে মাথার উপর বরফহীন খোলা জল পাইলে জাহাজ ভাসাইয়া তুলিয়া পুনঃ সঞ্চয় করিয়া লওয়া চলিবে; যদি খোলা জল না মিলে এবং যদি বরফের সর বেশী পুরু না হয় তবে বরফের ও ডুবো জাহাজের মধ্যেকার জলটাতে ধাক্কা দিয়া সেই ধাক্কায় বরফের সর ভাঙিয়া জাহাজ উপরে ভাসাইয়া তুলিতে পারা যাইবে। বরফের সর পুরু হইলে বোমা মারিয়া বরফ ভাঙিবার বা বরফে সুড়ঙ্গ করিয়া চোঙের ভিতর দিয়া উপরে মানুষ উঠিবার ব্যবস্থাও এই ডুবো জাহাজে আছে; বরফ উপর হইতে চাপ দিয়া ভাঙা বা খুঁড়িয়া গর্ত্ত করার চেয়ে সমুদ্রের জলের দিক হইতে ধাক্কা দিয়া ভাঙা বা খুঁড়িয়া সুড়ঙ্গ করা ঢের সহজ। এইরূপে সুড়ঙ্গ করিয়া ডুবো জাহাজ বায়ু গ্রহণ করিয়া ব্যাটারীতে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করিয়া লইতে পারিবে। এই ডুবো জাহাজ কম্পাস দেখিয়া দিক ঠিক রাখিয়া চালানো হইবে; এবং কত পথ চলিল তাহার হিসাব একটা দাঁতি চাকা বরফের তলায় ঘসিয়া ঘসিয়া ঘুরিয়া ঠিক রাখিবে। দিনে একশত মাইল অক্লেশে অগ্রসর হওয়া চলিবে। এই মেরুযাত্রী ডুবো জাহাজেও টর্পেডো থাকিবে—যদি বরফের পাহাড় বা অসম্ভাব্য বাধা দূর করা দরকার হয়; তলায় চাকা থাকিবে,—যদি কোথাও সমুদ্রের তলে ঠেকিয়া ডাঙা পথেই হাঁটিতে হয়। বরফ জমিয়া সমুদ্র আড়ষ্ট কঠিন হইয়া পড়িলে উপরে জাহাজ চলার যেমন ব্যাঘাত ঘটে, ডুবো জাহাজের মাথায় চাকা থাকিলে বরফের মসৃণ তলা দিয়া ডুবো জাহাজ চালাইবার তেমনি সুবিধা হয়। এইসব সুবিধা থাকায় কারিগর লেক মনে করেন দশ দিনে মেরু-প্রদেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসা চলিবে। অধিকন্তু এই ডুবো জাহাজের সাহায্যে শত্রুর বরফ-রুদ্ধ বন্দরে ঢুকিয়া তাহার জাহাজগুলির তলা ফাঁসাইয়া দেওয়া খুব সহজ কাজ হইবে।

মেরুযাত্রী ডুবো জাহাজ বরফের সরের গায়ে সুড়ঙ্গ করিয়া বাতাস ও বিদ্যুৎ সঞ্চয় করিয়া লইতেছে।

বেলজিয়মে বিষের ভয়—

ঠাট্টা করিয়া লোকে বেলজিয়মকে Cockpit of Europe য়ুরোপের মোরগ লড়াইএর আখড়া বলিয়া থাকে; যত বড় বড় দেশের দাঙ্গা-ফসাদ ঐ বেচারার ঘাড়ের উপরেই ঘটে। এবারও শত্রু-মিত্রের গোলাগুলি আর বিষাক্ত গ্যাসের উপদ্রবে দেশের লোকের নিশ্চিন্ত

বেলজিয়মের স্কুলের ছাত্র বিষের ভয়ে মুখোস পরিয়া স্কুলে যাইতেছে।

হইয়া নিশ্বাস লইবারও জো নাই। বেলজিয়মের ছেলেবুড়ো স্ত্রীপুরুষ সবাই নাকে ঠুলি লাগাইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে—স্কুল পাঠশালার ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী রাহী পথিক সকলেরই সাবধান হইতে হইয়াছে।

জগতের মধ্যে ব্যয়বহুল গির্জ্জা—

নিউ ইয়র্কে একটি নূতন গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা হইতেছে; তাহাতে খরচ হইবে এককোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা। ইহা রক্ষা করিতে বৎসরে প্রায় দশলক্ষ টাকা খরচ লাগিবে। আমেরিকার সকল তাতেই টাকার খট। কিন্তু এই-সব অমিতব্যয়ী গির্জ্জা আপ্তগরজে নহে; ইহারা নিজের জন্য যদি এক টাকা খরচ করে ত সেখানে পরার্থে পাঁচটাকা উৎসর্গ করে; ইহা হইতে বুঝা যাইবে আমেরিকার গির্জ্জার আয় কত বিপুল। এই গির্জ্জার বাড়ীটি আমেরিকার স্থপতি বারট্রাম জি গুডহিউ পরিকল্পনা করিয়াছেন—ইহাতে সৌন্দর্য্য ও পবিত্রভাবের সমাবেশ হইয়াছে। ইহার রেখা-বৈচিত্র্য, ছায়ালোকের সামঞ্জস্য, উঁচু নীচু খাঁজ খাটালের সমতা, এই বাড়ীটিকে একসঙ্গে সৌন্দর্য্যে মহিমায় শান্ত-পবিত্র-ভাবে মণ্ডিত করিয়াছে। ইহা আধুনিক যুগের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।
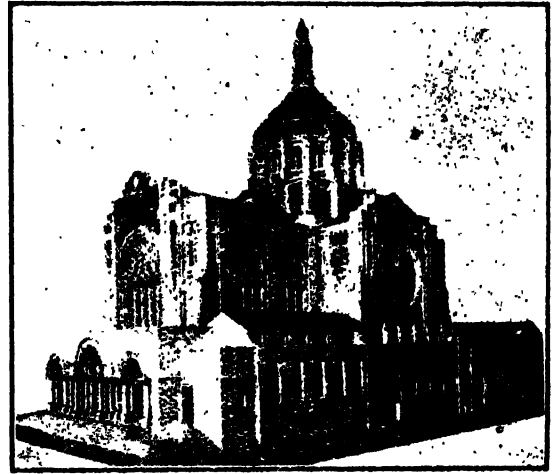
পৃথিবীর মধ্যে ব্যয়বহুল গির্জ্জা।

শামুক-খোল সিঁড়ি—

আমেরিকার কালিফর্ণিয়া ষ্টেটের প্রধান শহর লস এঞ্জেলেস মিউজিয়মে একটি সিঁড়ি গড়া হইয়াছে, যেমন ধরণের সিঁড়ি জগতে এই তৃতীয়। সিঁড়িটি প্যাঁচালো, উপর হইতে দেখিলে সিঁড়ির

শামুক-খোল পেঁচাও সিঁড়ি।

দেয়ালটাকে শামুক-খোলের মতন দেখায়। সিঁড়িটি ১২৫ ফুট উঁচু। এই সিঁড়িটি তাহার পূর্ব্বজ দুটি সিঁড়ি অপেক্ষা সুন্দর ও উৎকৃষ্ট; এবং ইহাই প্রথম কংক্রীটে তৈরি। অপর দুটি সিঁড়ির একটি আছে সেণ্টপল ক্যাথিড্রালের মিনারে ও একটি আছে মেকসিকোর ক্যাথিড্রালের মিনারে।

ইচ্ছামত বৃষ্টি নামানো—

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামাইতে পারিবার বিশ্বাস সকল দেশেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই থাকিতে দেখা যায়। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে বৃষ্টি নামাইবার জন্য ইন্দ্রের স্তুতি ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। প্লুটার্কের বিশ্বাস ছিল যে মহাযুদ্ধের পর খুব বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার কারণ সে কি—দেবতারা কলুষিত পৃথিবীকে বৃষ্টির দ্বারা ধৌত করেন অথবা রক্ত বাতাসে শোষিত হইয়া ভারী হইয়া গলিয়া বৃষ্টির আকারে পড়ে—তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই। প্লুটার্কের এই বিশ্বাস এই বিজ্ঞানের যুগেও সমর্থিত হইতেছে বিশেষত আধুনিক যুদ্ধে বড় বিস্ফোরক গোলা শেল ও অতিকায় কামানের আওয়াজে বাতাসে বিরাট ধাক্কা লাগিয়া বৃষ্টি হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করা হইতেছে। গত ৫০ বৎসর ধরিয়া এ সম্বন্ধে পরীক্ষা ও সন্ধান চলিতেছে। বাতাস আমাদের গায়ে যতই শুষ্ক ঠেকুক না কেন, ও আকাশ যতই পরিষ্কার থাকুক না কেন, বাতাসে জলবাষ্প প্রচুর থাকে; সাগর হইতে নদী বৃষ্টির জল পর্যন্ত ক্রমাগত বাষ্প হইয়া বাতাসে জমা হয় এবং তাহাই গলিয়া বৃষ্টি হয়; কিন্তু জল যেমন নিয়মিতভাবে বাষ্প হইয়া যায়, বাষ্প তেমন যেন নিয়ম মানিয়া চলে না, কেমন খামখেয়ালে কোথাও অতিবৃষ্টি এবং কোথাও অনাবৃষ্টি ঘটায়। বৃষ্টির সময় মেঘগর্জ্জন হয়, তাই লোকের বিশ্বাস খুব শব্দ করিতে পারিলে বৃষ্টি নামানো যায়। এই বিশ্বাসের সমর্থনে দুএকটা ঘটনাও আছে—১৮৮২ সালে জুলাই মাসে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধকালে বড় কামান দাগার পর অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল, এসময় সে দেশে কখনো বৃষ্টি হয় না। কিন্তু শব্দের সঙ্গে বৃষ্টিপাতনের কি সম্পর্ক তাহা ঠিক হয় নাই।

বিষম অগ্নিকাণ্ডের পর বৃষ্টি হওয়ার বিশ্বাসও প্রচলিত দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম কালে লোকেরা বড় বড় ঘাসের বনে আগুন লাগাইয়া বৃষ্টি নামাইত। আমেরিকার ফ্লোরিডা দেশে ১৮৪৪ সালে এক জরিপকর এক জায়গায় শুষ্ক-শুকনা গাছপালায় আগুন লাগাইয়া অতি গরম রৌদ্রময় দিনেও বৃষ্টি নামাইতে সক্ষম হইয়াছিল। জঙ্গলে আগুন জ্বলিয়া উঠিলে গরম বাতাস বহিল, আগুনের উপর ধোঁয়ার মাথায় মেঘ জমিল, মেঘগর্জ্জন হইল, বিদ্যুৎ চমকিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেইখানে বৃষ্টি পড়িল, যদিও তাহার আশে পাশে রৌদ্রে কাঠ ফাটিতেছিল। মিঃ জে পি এস্পে চার মাইলের মধ্যে এক মাইল অন্তর দশ এগার বা ত্রিশ বিঘা পরিমাণ কতকগুলি জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া বৃষ্টি নামাইতে পারিবার সম্ভাবনা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। ১৮৯১ সালে শিকাগোতে একজন লোক বৃষ্টি নামাইবার উপায় এইরূপ স্থির করিয়াছিল—একটা বড় বিস্ফোরক শেল বা টোটার মধ্যে তরলীকৃত কার্বন-ডাইঅক্সাইড ভরিয়া ঐ শেলটাকে বেলুনে চড়াইয়া উঁচুতে তুলিতে হইবে; সেই শেলটিতে বিদ্যুৎ চালনা করিলে শেলটি হঠাৎ সশব্দে ফাটিয়া যাইবে ও তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে; তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড অতি দ্রুত বাষ্পাকার ধারণ করিতে গিয়া বৃষ্টি ঘটাইবে। সেই ব্যক্তি ৬০০ ফুট ঊর্দ্ধে ঐরূপ একটি শেল বিদারণ করিয়া মেঘ সঞ্চার করিয়া দেখাইয়াছিল যে তাহার ফন্দি কল্পনা মাত্র নয়। তৎপরে মার্কিন রাজ্যের কংগ্রেস প্রায় ৭২ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া কৃষিবিভাগকে ইহার পরীক্ষায় নিযুক্ত করেন। পরীক্ষায় কোনো নির্দ্দিষ্ট ফল পাওয়া যায় নাই।

বাতাস যত গরম হয় ততই তাহার বাষ্প বহনের ক্ষমতা বাড়ে। ১১২ ডিগ্রি তাতে হাজার ঘনফুট বাতাস প্রায় আড়াই সের বাষ্প বহন করে, জমিবার মতন শীতে এক পোয়ারও কম বহিতে পারে। মেঘ বাষ্পভারে উপচিয়া উঠিলে ও ঠাণ্ডা পাইলে নিজের বাড়তি ভাগটুকু গলাইয়া ঢালিয়া দায়, এবং তাহা খরচ হইয়া গেলেই থামিয়া যায়, কখনো নিজেকে নিঃশেষে দান করে না। গ্রীষ্মকালে যখন মেঘ জমে না তখনও বিস্তৃত স্থানের বাতাস হঠাৎ ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারিলেই বৃষ্টি করা যায়। সেই বিস্তৃত স্থান কতবড় হইবে তাহার আন্দাজ এই হিসাব হইতে পাওয়া যাইবে যে হাজার ঘনফুট (অর্থাৎ দশ ফুট লম্বা দশ ফুট চওড়া ও দশ ফুট খাড়াই) স্থানের বাতাসে যে আড়াই সের আন্দাজ বাষ্প থাকে তাহা গলিয়া বৃষ্টি হইলে সেই দশফুট জায়গায় এক ইঞ্চির একশত ভাগের একভাগ গভীর জল হইবে এবং বৃষ্টি হইয়া মাটিতে পড়িবে তাহারও সামান্য ভাগ মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এরূপ উপায়ে বৃষ্টি নামানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। ন মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না। সুতরাং আমাদিগকে ইন্দ্র ও বরুণদেবের কৃপার উপর ও আমাদের আত্মশক্তিতে জলাশয় হইতে জল সেচনের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের কৃষিকার্য চালাইতে হইবে।

গাছের স্বকীয় আঘাত চিকিৎসা—

জীব যত নিম্নস্তরের হয় তাহার ক্ষত আরোগ্য করিয়া তুলিবার শক্তি তত বেশী থাকে। আতরল এমিবার গায়ের কাটা জলের উপর দাগ কাটার মতন তখনই তখনই জুড়িয়া যায়। কাঁকড়ার দাড়া ভাঙিয়া দিলে তাহার অসুবিধা হয় অল্প দিনের জন্য, কারণ শীঘ্রই সে আর এক জোড়া নূতন দাড়া গজাইয়া তোলে। কিন্তু মানুষের হাত কাটা পড়িলে সে চিরজীবন নুলো হইয়া থাকিয়া যায়।

গাছের আঘাত সারাইয়া তুলিবার অসাধারণ শক্তি আছে। এমন কি, অনেক সময় গাছের গায়ে ক্ষত হইলে তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির ও সুপ্ত অঙ্গের স্ফূর্তির সাহায্য হয়। গাছের মধ্যে কতকগুলি সুপ্ত মুকুল থাকে; গাছ সুস্থ অনাহত থাকিলে তাহারা কখনোই জাগে না, কিন্তু গাছের একটা ডাল কাটিয়া তাহার একাঙ্গ বিকল করিয়া তাহার বৃদ্ধিতে বাধা দিলে সুপ্ত মুকুলগুলি অমনি জাগ্রত হইয়া নূতন কচি পাতা আর কেঁকড়ি ডালের আকারে বাহির হইয়া পড়ে, এবং গাছ যে অঙ্গ হারাইয়াছিল তাহার সেই ক্ষতি পূরণে আপনাদের উৎসর্গ করিয়া দায়। গাছের গায়ের ক্ষত যদি আংশিক ও উপরউপর হয় তবে কতকগুলি কোষ কঠিন কাঠ হইয়া ক্ষত সারাইয়া আনে। কোনো বাহিরের বস্তু গাছের অঙ্গে বিদ্ধ হইয়া গেলে গাছ যদি তাহা ত্যাগ করিতে না পারে তবে তাহারই চারিদিকে ঢাকা গজাইয়া ক্ষতমুখ রুদ্ধ করিয়া দায়। এইরূপে গাছের গায়ে গুলি কি পেরেক বিদ্ধ হইলে তাহা গাছের মধ্যেই থাকিয়া যায়, তাহাকে ঢাকিয়া গাছের কোষ ও ত্বক জন্মে এবং সেস্থানটা একটু উঁচু হইয়া থাকে, বহুকাল পরে গাছ কাটিলে ঐ সব জিনিস পাওয়া যায়। পাছে ক্ষতস্থান হইতে অধিক রসস্রাব হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বা বিষাক্ত পদার্থ বা অপকারক কীটপতঙ্গ ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করে এই ভয়ে গাছ চটপট একরূপ আঠা দিয়া ক্ষতস্থান ঢাকিয়া দায়, তারপর সেই ক্ষতমুখ বন্ধ করিতে থাকে—ইহা যেন ডাক্তারের এন্টিসেপ্টিক ব্যাণ্ডেজ! এই আঠার সঞ্চারের জন্য ক্ষতস্থান প্রথমে হলদে ও পরে বাদামী রং ধরে। ক্ষত গভীর হইলে সেই ক্ষতস্থানে মরা কাঠ ও আবরক আঠা জমিয়া

গাছের গায়ের ক্ষত আরোগ্যের ক্রমপদ্ধতি।

গাছের গায়ে কিছু বিঁধিয়া গেলে গাছের তাহা ঢাকিবার চেষ্টা।

থাকে, তাহার উপরে কাঠ ও ছাল ঢাকা পড়ে, একজন্য সেই জায়গাটা আবের মতন উচু হইয়া থাকে; ইহা কুদৃশ্য হইলেও ইহার দ্বারা গাছের প্রচুর জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

চাক।

দেশের কথা

দেশে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা কিছু কিছু চলিতেছে। কখনো কখনো নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, দরিদ্র নিরক্ষর শ্রেণীর ছেলেদের পড়াইবার ব্যবস্থাও কোনো কোনো স্বদেশপ্রেমিক করিতেছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা অতি অল্পই হইতেছে, এক রকম না হওয়ারই সামিল। কেবল পুরুষের শিক্ষা দ্বারাই দেশ জাগিবে না, কারণ দেশ তো কেবল পুরুষেই পূর্ণ নয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলিয়া ছিলেন :—

স্মৃতি ফৃতি লিখে, নিয়ম নীতিতে বদ্ধ ক'রে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে Manufacturing machine (পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র) মাত্র ক'রে তুলেছে। এই-সকল মেয়েদের এখন না তুল্লে বুঝি আর উপায়ান্তর আছে?

আমাদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ, এই-সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা। যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখন উন্নতির আশা নাই। এইজন্য এদের আগে তুলতে হবে।

ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়।

শিক্ষা বলতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে। উহাকে আমাদের বৃত্তি বা শক্তিসমূহের বিকাশ বলা যেতে পারে, অথবা শিক্ষা বলতে—ব্যক্তি-সকলকে এমন ভাবে গঠিত করা, যাতে তাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হলে আমাদের ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থা নির্ভিকহৃদয়া মহীয়সী রমণীগণের অভ্যুদয় হবে।—

মেয়েদিগকে ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, শেলাই, শরীর পালন—এই সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্ম্মগুলি আগে শেখাতে হবে। কেবল পূজা-পদ্ধতি শেখালেই হবে না। সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। তবেই তারা পবিত্র, স্বার্থগন্ধশূন্য ও বীর রমণী হবে—তারা বীর-প্রসবিনী হবার যোগ্যা হবে।

লাট-প্রতিনিধি-সভায় সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য খুব ঘোর গোল পড়িয়াছে। ভোটপ্রার্থী অনেকে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া ভোট প্রার্থনা করিয়া ফিরেন জানি। এ কথাও জানি, যে-সব লোকের খোসামোদ এঁরা করেন, ভোটের দায়ে অবশ্য, অন্য সময়ে তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেও এঁরা কুণ্ঠিত হন। লাট-সভার-অরণ্যে রোদন করিবার জন্য এত অর্থব্যয় এত কষ্ট স্বীকার কেন? দেশের মঙ্গল যদি কামনা করেন কাজে লাগিয়া যান। দেশকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দিন, আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা দিন, ভোট সংগ্রহের জন্য যে-অর্থ ব্যয় করেন তা দিয়া দরিদ্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিন। মহাত্মা গোখলের মত দেশের স্বপ্নে বিভোর হউন। দেশ প্রধানত স্বচেষ্টায় জাগে, পরের সাহায্যে নয়। "মোহাম্মদী"ও এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন—

কনফারেন্স বল, লিগ বল, কংগ্রেস বল, সকলেরই আর্ত্তনাদ একই শ্রেণীর। এই নাই, এই চাই, গবর্ণমেণ্ট এই দিন এই দিন এই করুন ইত্যাদি। অনেক অভাব অভিযোগ এরূপ আছে যে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করা ব্যতীত সেগুলির প্রতিকারের আর উপায়ান্তর নাই বটে, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ অভিযোগ এরূপ যে, আমরা মিলিয়া মিশিয়া চেষ্টা করিলে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও তাহার প্রতিকার করতঃ স্বদেশ ও স্বসমাজের বহু মঙ্গলসাধন করিতে পারি।

আসল কথা এই যে, একদল মানুষ যতদিন তৈরী করিতে না পারিবে, ততদিন কিছুই হইবে না। একদল মৌলবী, একদল গ্রাজুয়েট, আর একদল সাধারণ কর্ম্মী চাই। ইহাদের জীবনের আর কোন লক্ষ্য থাকিবে না, কোন Ambition থাকিবে না। তাহা হইলে স্কুল কর, কলেজ কর, মিশন কর, সাহিত্য সমিতি কর, যা কর তাই হইবে, নতুবা বড় মুস্কিল। দুই একজন লোকের প্রাণান্ত পরিশ্রম আপাততঃ এমন কোন সুফল প্রসব করিতে পারিবে না যা দেখিয়া সমাজে একটা বড় দরের রোমাঞ্চ জাগিয়া উঠিবে। তবে ইহাও সত্য যে, এগুলি হইতেছে ভিত্তির ইট, মাটীর তলে থাকিবে, নিতান্ত উপেক্ষিত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে চিরকাল তাহাদিগকে অবস্থান করিতে হইবে, কিন্তু ভাই, যে বুঝিবার সে বুঝিবে এবং বুঝিতেছে যে, সমাজের

সেই অভিপ্সীত কল্যাণ-সৌধ ঐ উপেক্ষিত ইটগুলির বুকের উপরেই নির্ম্মিত হইবে। ভাব জাগিয়াছে, সুর উঠিয়াছে, স্রোত ফিরিয়াছে, কোথা হইতে একটা চোরা বেদনা আসিয়া সমাজের বুকের কোন এক অজ্ঞাত কোণে যেন উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। আমাদের যুবক মৌলবী ও গ্রাজুয়েটদিগের মধ্যে—অবশ্য খুব সামান্য আকারে—একটু একটু করিয়া অনুভূতি জাগিয়া উঠিতেছে, সমাজের জন্য কিছু একটা করিতে হইবে। এই যে উন্মাদনা এই যে কর্ত্তব্যবুদ্ধির উন্মেষ, ইহা কল্পনা হইতে কথায় আসিতে আরম্ভ হইয়াছে যখন, তখন কথা হইতে কাজের সূত্রপাতও শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

"নয়শো রুপেয়া" বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার একখানি নাটক। এখন যেমন পুত্রবিক্রয় করিয়া "বিবাহ" হয় তখন তেমনি কন্যাবিক্রয় করিয়া তাহার "বিবাহ" দেওয়া হইত। কন্যা বিক্রয় উপলক্ষ্য করিয়াই নাটকখানি রচিত হইয়াছিল। "চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ" এই সংবাদ দেওয়ার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই নাটকখানি বঙ্গীয় সমাজ ও বঙ্গ সাহিত্যে শক্তি সঞ্চালিত করিয়াছিল। "নয়শো রুপেয়" বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে—বাঙ্গালার একমাত্র নাটক ছিল।

"নয়শো রুপেয়া" একখানি সাংঘাতিক সত্যমূলক সামাজিক নাটক। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনে" ইহার স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন।

কন্যাবিক্রয়কারী বেহায়া ব্রাহ্মণের পাংশুল চিত্ত বিচলিত করিবার জন্য, নয়শো রুপেয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎকালের সমাজে অনেকেই কন্যাবিক্রয়ব্যবসায়ী ছিলেন। এই সমাজ-কলঙ্ক সংশোধনের জন্য—"নয়শো রুপেয়া" নাটবন্দী নিলামের পরিচয় দিয়াছিল।

আমাদের বঙ্গদেশে—কন্যাবিক্রয়ব্যবসা এখনও একেবারে লোপ পায় নাই, তবে অনেক কমিয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গে, পূর্ব্ববঙ্গে—এখনও উক্ত ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ হইতে অশিক্ষিত শূদ্র—সকল সম্প্রদায় হিন্দুর মধ্যেই এক সময় কন্যা বিক্রয়ের আধিক্য পরিদৃষ্ট হইত। অশিক্ষিত লোকে অশিক্ষিত কন্যার বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ পাইত,—সে অর্থের অতুচ্ছ পরিমাণ—"নয়শত রুপেয়া"। এই প্রথাকে অর্থনীতির অপরিহার্য্য সম্বন্ধ বলিতে পার। যে পিতা অর্থ দিয়া একদিন পত্নী ক্রয় করিয়াছিল, সে পিতা যে দুহিতা বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ লইবে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে! যাহার স্ত্রী-উৎপন্ন সম্ভাব্য মূলধন, সে ব্যক্তি পত্নী-প্রসূত কন্যাধনের বিনিময় করিয়া, পত্নী-ক্রয়ের অর্থ নিশ্চয়ই তুলিবার চেষ্টা করিবে, ইহা তত দূর দোষাবহ নহে।

এখন কিন্তু সমাজের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। কন্যাবিক্রয়ী—"গাঁটা-বেচার" দলে পড়িয়া এখন ঘৃণিত, কিন্তু সমাজে এখন রীতিমত পুত্র বিক্রয়ের ব্যবসায় চলিতেছে। বিবাহের অর্থ এখন—বিক্রয়, বাণিজ্য বা বিনিময়। কন্যা বিক্রয়ে সমাজনীতিক নীচতা যথেষ্ট প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু পুত্র বিক্রয় করা নীচতার পরাকাষ্ঠা। বঙ্গদেশের বরের বাপেরা একথা ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন আর নিলামের ডাক "নয়শো রুপেয়া" সার্থক হয় না, এখন "নয় হাজার রুপেয়ায়" বর কিনিতে হয়। এই সামাজিক পাপ প্রতিকারের ঔষধ—আমরা খুঁজিয়া পাই না। সেকালে কন্যাবিক্রয়ীকে লোকে ঘৃণা করিত, একালে পুত্র-বিক্রয়ী সমাজের বুকের উপর রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট। পিতা শিক্ষিত, পুত্র ততোধিক শিক্ষিত,—দুইই পুরা পুণ্যশ্লোক, প্রথম পুণ্যশ্লোক, দ্বিতীয় পুণ্যশ্লোকের বিবাহ-বাণিজ্যে অর্থ-ব্যবহারের মৌলিক আদেশে পদাঘাত করিয়া, দীন কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে যে বিপুল অর্থরাশি আকর্ষণ করিতেছেন, অশিক্ষিতের কন্যা-নিলাম ইহার চেয়ে অনেক গৌরবের বস্তু। বরের বাপের বাণিজ্য—অবৈধ বাণিজ্য, ইহা বিক্রয় নয়, বিনিময়ও নহে, ইহার নাম উৎপীড়ন, ইহার দ্বিতীয় অভিধান—মর্ম্মান্তিক প্রতারণা! বঙ্গদেশের জল বায়ুর পক্ষে—ইহা ধর্ম্মের বন্ধন নামে মৃত্যুর ফাঁস! এক কথায় এইরূপ বিবাহের নাম—অসংযম ও অশ্লীলতা। সুতরাং সকলের পক্ষেই অসহ্য!

আমাদের দরিদ্র দেশবাসী নানান্ অত্যাচারে প্রপীড়িত, তার মধ্যে মহাজনের অত্যাচার বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সুদের হার নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে মহাজনেরা দুর্ব্বৎসরে টাকা ধার দিয়া যথেচ্ছা সুদ আদায় করে। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য "নীহার" লিখিয়াছেন—

এ অঞ্চলে গত দুই তিন বৎসর বন্যাদিতে উপর্য্যুপরি শস্যহানির ফলে লোকের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে। কৃষক, মধ্যবিত্ত, প্রভৃতি অধিকাংশ লোকেরই ঋণ করা ব্যতীত দিন চালান কঠিন হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশের স্বার্থান্ধ মহাজনেরা সুদের হার যথেচ্ছ বাড়াইয়া দিয়া দুঃস্থ ব্যক্তিদের সর্ব্বস্ব গ্রাসের জন্য লাগিয়াছে। মহাজনেরা ঋণদান-সময়ে অধমর্ণদিগকে আইনের কঠোর নিগড়ে এমন ভাবে আবদ্ধ করিয়া লইতেছে যে তাহারা তাহাদের সেই জাল হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অনেকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও ঋণদায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। সুদের সুদ তস্য সুদ ধরিয়া আসলের ৮।১০ গুণ বেশী আদায় করিয়াও মহাজনেরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই।

সুদের হার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট না থাকায় তাহারা যেখানে যাহার যেমন দায় ঠেকিতে দেখিতে পায়, সেখানে সেরূপ উচ্চ সুদে ও কঠোর ভাবে খত লিখাইয়া লইয়া ঋণ দিয়া থাকে। দাও পাইলে ইহারা মাসিক সুদের হার শতকরা সাড়ে বার টাকা পর্য্যন্তও করিয়া লইতে ছাড়ে না। দরিদ্র প্রজা একবার এই শ্রেণীর মহাজনদের কবলে পড়িলে বৎসর বৎসর কিছু কিছু শোধ করিয়া আজীবন শোধ দিলেও কিছুতেই ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এইরূপ সুদে টাকা কি ধান্য পরিশোধ করা এক বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

গত আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে এতদঞ্চলে ধান চাউল দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল, সেই সময় নিরন্ন প্রজারা নিরুপায় হইয়া যখন ধান্যের মহাজনদের দ্বারস্থ হইয়াছিল, তখন মহাজনেরা অতিরিক্ত লাভের একটা কৌশল জাল বিস্তার করিয়া ধান্যের বাএড় দাদন করিয়াছিল। এই বাএড় ধান্যের বেশী বা সুদ মণ-প্রতি অর্দ্ধমণ হিসাবে ধরিয়া এবং আসল ও সুদ মোট ধান্যের মূল্য তখনকার অর্থাৎ আশ্বিন মাসের চলিত বাজার-দরের উপর মণ প্রতি ॥০ আনা অধিক দর হিসাবে মোট টাকায় এবং উহার পরিশোধ-কাল পর্য্যন্ত মাসিক সুদ টাকা-প্রতি এক আনা হিসাবে লিখাইয়া লইয়া ধান্য দাদন দিয়াছিল। সে সময় অধিকাংশ স্থানেই নিরুপায় ব্যক্তিরা বাধ্য হইয়া অগ্রে এইরূপ লিখিয়া দিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। আশ্বিন কার্ত্তিকে ধান্যের মণ ৩৷০ টাকা, কোন কোন স্থলে ৪ হইয়াছিল। ইহার উপর মহাজনেরা ॥০ আনা অধিক লইয়াছে। সুতরাং উক্ত উপায়ে তাহারা গরীবের রক্ত শোষণ করিয়া নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন পরিচালনা সম্বন্ধে "খুলনাবাসী"

সমীচীন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিপ্রয়াসী সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। "খুলনা-বাসী"র নিম্নে উদ্ধৃত মতের সঙ্গে আমাদের মতের অনৈক্য নাই—

পূর্ব্বে সাহিত্য সম্মিলনে দুইজন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও প্রধান সভাপতি। এখন ইহার উপর আরও তিনজন বিভাগীয় সভাপতি বাড়ান হইয়াছে। কাজের আড়ম্বর যতই বাড়িতেছে, বোধ হয় প্রকৃত কাজের ততই ক্ষতি হইতেছে।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই সভাপতির একটি বক্তৃতা করিবার নিয়ম ছিল, এখন তাহা প্রবন্ধ পাঠে পরিণত হইয়াছে,—বক্তৃতা করা আর প্রবন্ধ পাঠ করা এক নহে। সভাপতিরা যখন বক্তৃতাই করিতে পারেন না বা করেন না, তখন আর এই প্রবন্ধ পাঠের বিড়ম্বনা কেন? বিশেষ যখন বক্তৃতা মুদ্রিত করিয়া বিতরিত হয়। ঐ সমস্ত মুদ্রিত বক্তৃতা সাহিত্যিকগণ অবসর মত পড়িয়া দেখিতে পারেন। ইহাতে উভয় পক্ষেরই বিশেষ সুবিধা, সভাপতি মহাশয়কেও বিদ্যালয়ের বালকের মত দণ্ডায়মান হইয়া আবৃত্তি ও উচ্চারণের পরীক্ষা দিতে হয় না, শ্রোতৃগণেরও নানা-প্রকার অপ্রাসঙ্গিক অবান্তর কথা শুনিয়া বা ক্ষীণকণ্ঠ সভাপতির অনুচ্চ স্বর শুনিতে না পাইয়া ম্রিয়মাণ হইতে হয় না, অথবা কর্কশ কণ্ঠ ভয়ঙ্কর সভাপতির কর্কশ স্বর শ্রবণে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয় না। সময়েরও অযথা অপব্যয় হয় না। যে সময়টা অভিভাষণ পাঠে অযথা অপব্যয়িত হয় সেই সময়টা অন্য অনেক কাজে লাগান যাইতে পারে।

আরও একটি কাজ করিলে বোধ হয় ভাল হয়। সাধারণ সভাপতির অভিভাষণের মূল্য ৵০ আনা এবং অপর প্রবন্ধপাঠকগণের প্রবন্ধের মূল্য ৴০ আনা করিয়া শ্রোতৃদের নিকট বিক্রয় করিলে বিক্রয়লব্ধ অর্থে সভার তহবিল পুষ্ট হইতে পারে।

বাজে প্রবন্ধ পড়িয়া সময় নষ্ট না করিয়া সেই সময়টা সাহিত্যিকগণের পরস্পর আলাপ পরিচয়ে ও সাহিত্যাদি সম্বন্ধে পরামর্শে ক্ষেপণ করিলে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়।

আরও একটি কথা, এই সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির উপর "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ"এর কোনওরূপ আধিপত্য থাকা আমরা কোনও মতে যুক্তিযুক্ত মনে করি না। সম্মিলনে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে না হইবে, তাহা অভ্যর্থনা-সমিতিই বিবেচনা করিবেন, সে বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ যদি কিছু বলিতে যান, তাহা আমরা অনধিকার চর্চ্চা বলিয়াই মনে করি। সম্মিলনের ব্যয়ভারের কোনও অংশ কি "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ" বহন করিয়া থাকেন? তাহা যদি করেন, তবে তাঁহার ঐরূপ অসঙ্গত আবদার শুনা যায়।

কাঁথির "নীহার" সংবাদ দিয়াছেন, সেখানকার স্কুলের ছাত্রেরা অবসর-সময় দেশসেবায় অতিবাহিত করিয়া ধন্য হইতেছেন। নিম্নলিখিত সংবাদ পড়িয়া আমরা খুব সুখী হইলাম—

স্থানীয় মডেল ইনষ্টিটিউশনের কতিপয় ছাত্র পরম উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে নানারূপে বিপন্নের সেবাকার্য্যে তাহাদের অবসর কাল কাটাইতেছে। তাহাদের এই সদৃষ্টান্তে স্থানীয় পুরাতন হাই স্কুলের কয়েক জন ছাত্রের যোগদানের কথা শুনা যাইতেছে। সদভ্যাস হইতে প্রকৃতি সুমার্জ্জিত হয়। এই সকল সহৃদয় ছাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যে দেশের ও দশের মহোপকারী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে কয়েকজন দূরগ্রামনিবাসী অসহায় ছাত্রের কলেরা রোগ হইলে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া ও একটি ছাত্রের মৃত্যু হইলে তাহার শবদেহের যথাবিধি সৎকার করিয়া এই ছাত্রগণ সাহসিকতার ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিল। সেদিন স্থানীয় মডেল ইনষ্টিটিউশনের পুরাতন মালীর মৃত্যু হয়। গ্রামের দলাদলির ফলে ঐ ব্যক্তি গ্রামে রুদ্ধ ছিল। গ্রামবাসী কেহই তাহার শবদেহ স্পর্শও করিল না। তাহার নিকট আত্মীয়গণ যখন চিন্তায় মাথায় হাত দিয়া পড়িল, তখন এই-সমস্ত ছাত্র পরমোৎসাহে তাহার শবদেহ শ্মশানে বহন করিয়া তাহার যথাবিধি সৎকার করিয়া আসিল। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে মডেল ইনষ্টিটিউশনের অন্যতম সহৃদয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মাইতি মহাশয় এই সমস্ত ছাত্রের সকল-রূপ সেবাকার্য্যে উৎসাহ দিতেছেন ও সহযোগিতা করিতেছেন।

বাংলার অনেক বর ভাবেন শ্বশুরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মহোপকার করিলেন। "নোয়াখালি সম্মিলনী"তে প্রকাশ—

গত ১৩ই বৈশাখ রংপুর জেলার কোন গ্রামে একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরটি এবার বি, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছে। রীতিমত পণ ও দানাদির ত্রুটী হয় নাই। বিবাহ শেষে বর যখন ভোজনে বসিলেন, তখন তিনি শাশুড়ীকে বলিলেন যে মোটর সাইকেল না দিলে তিনি কিছু আহার করিবেন না। বিধবা শাশুড়ীর অনেক কাদাকাটিতে গুণবান জামাতা বাবাজী আপাততঃ শান্ত রহিয়াছেন।

এমন ঘটনায় সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই কি শিক্ষার ফলের পরিচয়?

পুরাতন গ্রীসে ভারতের ভারতীয় অজ্ঞাত বাস

"Ion = Ya-va n = যবন" এ-বিষয়ে ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা একবাক্য। Livingston নামক একজন সুবিখ্যাত আধুনিক ইংরাজ পণ্ডিত তাঁহার প্রণীত Greek Genius নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন

"Ionian philosophers were the prospectors: but Athens made roads and opened the country. Ionians conceived of Thought, Athens developed it."

তবে তো দেখিতেছি পুরাতন গ্রীসের জগৎপ্রথিতা আথেন্স্ নগরী ভারতের চিরপরিচিতা যুনানীরই আদরের কন্যা! আশ্চর্য্য! ধী'র কন্যা শ্রী! আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে তাই গ্রীক জাতি যবন নামে প্রসিদ্ধ। বঙ্গীয় ভট্টাচার্য্য-শাস্ত্রে কিন্তু—অর্থাৎ যে শাস্ত্রে তিন বিভিন্ন শ-এর,

দুই বিভিন্ন ন-এর, দুই বিভিন্ন ব-এর, একই অভিন্ন উচ্চারণ সেই অপূর্ব্ব বা অ-পূর্ব্বক শব্দে—পশ্চিম-এসিয়া-নিবাসী বিভিন্ন জাতির একই অভিন্ন নাম **যবন**। রঘুবংশের অধ্যাপক-শিরোমণিদিগের অন্ততঃ এটা জানা উচিত ছিল যে, কালিদাস পারসীক জাতিকে পারসীকই বলিয়াছেন —যবন জাতিকে যবনই বলিয়াছেন; তা বই, পারসীক জাতিকেও যবন বলেন নাই—যবন জাতিকেও পারসীক বলেন নাই। এ-সকল দুঃখের হাসি-কান্নায় অনর্থক কাল-বিলম্ব না করিয়া আমাদের দেশের পূর্ব্বতন কালের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যদিগের সহিত পুরাতন গ্রীসের তত্ত্বান্বেষী সুধীগণের কিরূপ গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ ছিল সেই কৌতুকাবহ রহস্য-বার্ত্তাটির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্। উহার রীতিমত সন্ধান পাইতে হইলে কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিবরণ পরে পরে দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন গ্রীসের আইওনিয়া প্রদেশ যে, প্রাচীন ভারতের আর্য্য-সন্তানদিগের নিকটে যথেষ্ট পরিচিত ছিল তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ এই যে, রামায়ণ মহাভারতে পৃথিবীস্থ জাতিগণের যেখানেই সমস্ত মোট বাঁধা হইয়াছে, তাহার একটি স্থানেও যবন জাতির নামোল্লেখ বাদ পড়ে নাই।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

ঐ যে ভারতবর্ষের ক্রোড়পোষা **আইওনিয়া**, উহাই পুরাতন গ্রীসদেশীয় সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধির (Livingston মহোদয় যেমন বলিয়াছেন—Thoughtএর) আদিম সূতিকাগার ছিল, এ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহলে চিরপ্রসিদ্ধ।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববেত্তারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে আইওনীয় তত্ত্বজ্ঞ সম্প্রদায়ের (Ionian school-of-philosophy'র) জন্মদাতা যিনি থেলীস (Thales), তিনিই ছিলেন-গ্রীস দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের আদি গুরু। কিন্তু —কি আশ্চর্য্য! আমাদের দেশের বড় পুরাতন যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতার এই যে একটি কথা—"আপো বা ইদ-মগ্র আসীৎ" "আদিতে এ-সমস্ত নিশ্চয়ই জলে জলময় ছিল"—ভারতের এই পুরাতন ঋষিবাক্যটি থেলীসের **বড্ড একটা** অনন্য-ভাবিত-পূর্ব্ব নূতন আবিষ্কার বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহলে সুপ্রসিদ্ধ! তার সাক্ষী—কিয়ৎপূর্ব্বে যাহার নামোল্লেখ করিয়াছি সেই Greek Geniusএর গ্রন্থকর্ত্তা Livingston মহোদয় মহাস্ফূর্ত্তির সহিত রসনার দৌড় দিয়া বলিতেছেন "But now Thales and Anaximander are inquiring how the world is really composed, and instead of (বাবিলোনিয়া'র বেচারী দেবতা-দুটি) Tiamat and Nuit, find only Water (or some indefinite element at work) (এই or-পূর্ব্বক বিকল্প বচনটি নিশ্চয়ই গ্রন্থকারের প্রক্ষিপ্ত গুপ্তচর, তাই তাহাকে আমি paranthesesএর ফাটকে পুরিলাম)। * * * So these naive speculation of Thales are among the great events of human history. A new thing has come into the world (কি? না—পূর্ব্বে এ সমস্ত জলে জলময় ছিল, এই মহা new thing) such as is not to be found in the ancient homes of civilization. **সাবাস ওকালতি!** গ্রন্থকারের বক্তৃতার তোড়ের মুখে যজুর্ব্বেদের পাতা খুলিয়া তাহাকে আমি "আপো বৈ" অংশটি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে সাহস করি না এই জন্য—যে হেতু তাহা দেখিবা-মাত্র তিনি তেলেবেগুনে জ্বলিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন "Yayurveda is an immense forgery from top to toe"।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

আমাদের দেশীয় পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানীরা অচেতন প্রকৃতিকে কোথাও বা বলিয়াছেন "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়া" অর্থাৎ এস্থিতির একটা অনির্ব্বচনীয় কিম্ভূত ব্যাপার যে, তাহাকে সৎও (Beingও) বলা যাইতে পারে না—অসৎও (Non-beingও) বলা যাইতে পারে না; কোথাও বা ঐ কথাটিকেই প্রকারান্তরিত করিয়া বলিয়াছেন "সদ-সদাত্মিকা" অর্থাৎ সৎও বটে—অসৎও বটে—দুইই এক-যোগে। সুবিখ্যাত জর্ম্মান্ দর্শনকার হেগেল ঐ দরণের অনির্ব্বচনীয় সত্তা'র নাম দিয়াছেন "Becoming"। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন কালের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরা সত্তের

(অর্থাৎ ধ্রুব সত্তা'। নাম দিয়াছেন "**অক্ষর**", আর, সদসদাত্মিকা প্রাকৃত সত্তা'র নাম দিয়াছেন "**ক্ষর**"। তার সাক্ষী—ভগবদ্‌গীতায় আছে "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" "অক্ষর কে? না পরম ব্রহ্ম" এবং তাহার একটু পরেই আছে "অধিভূতঃ ক্ষরো ভাবঃ" "আধিভৌতিক ভাব" (অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ-সকল) ক্ষর (কিনা জলস্রোতের ন্যায় ক্ষরণশীল—fluent)। এই সদসদাত্মিকা চলধর্ম্মিণী প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিমা যদি কিছু থাকে, তবে তাহা **অগ্নি**। ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে সপ্তম ঋকে তাই অগ্নিকে বলা হইয়াছে "অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্। দক্ষস্য জন্মন্ অদিতে রুপস্থে। অগ্নির্হ নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব্বে আয়ুনি। বৃষভশ্চ ধেনুঃ।" ইহার অর্থ :—অগ্নি সৎও বটেন, অসৎও বটেন। 'পরম ব্যোমে তিনি। তিনি অদিতির অর্থাৎ অখণ্ড আকাশের গর্ভে (অদিতির পুত্র আদিত্য-রূপে) জন্মিয়াছেন। আমাদের সকলের মধ্যে প্রথমজাত সেই যে, অগ্নি, তিনি ঋতেরও অর্থাৎ বিশ্ব-ব্যাপারের অলঙ্ঘনীয় বিধি-ব্যবস্থারও পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ছিলেন। বৃষও তিনি—ধেনুও তিনি।

ইহার টীকা।

ঋত এবং ঋতু এ-দুই সহোদর-শব্দ যে একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ঋ-ধাতু হইতে—তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। ঋ-ধাতুর অর্থ অভিধানে দেখিলাম "**গতি**" এইমাত্র। আমার কিন্তু ধ্রুব বিশ্বাস যে, ঋ-ধাতুর অর্থ—ছান্দস গতি (rythmical motion) বা পর্য্যায় (periodical motion—পরি + আয় = peri + od) অথবা স্পন্দন (যেমন—প্রাণস্পন্দন = নিশ্বাসপ্রশ্বাস, আহ্নিক স্পন্দন = সূর্য্যের উদয়াস্ত, পাক্ষিক স্পন্দন = পূর্ণিমা-অমাবস্যা, বার্ষিক স্পন্দন = শীতগ্রীষ্ম)। ঋত শব্দের মুখ্য অর্থ হ'চ্চে—ঋতু-পর্য্যায়ের ন্যায়—বিশ্বব্যাপারের অখণ্ডনীয় বিধিব্যবস্থা; যেমন—একটি ব্যাপার সূর্য্যের আহ্নিক উদয়াস্ত, আর একটি ব্যাপার উহার বার্ষিক উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, তৃতীয় একটি ব্যাপার চন্দ্রকলার পাক্ষিক হ্রাসবৃদ্ধি, এই সকল বিশ্ব ব্যাপারের অখণ্ডনীয় বিধিব্যবস্থা। এসকল মৌলিক বিধিব্যবস্থা যেহেতু জগতের স্থিতিকালের মধ্যে কোনো কালেই মিথ্যা হইবার নহে, এইহেতু ঋতশব্দের গৌণ অর্থ—অব্যভিচারী সত্য। বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে এক সময়ে যখন পূর্ব্বসৃষ্ট সমস্ত চরাচর সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির উদরসাৎ হইয়া একপ্রকার নাস্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রলয়াগ্নিগ্রস্ত বুদ্‌বুদ্ অবস্থায়—জলস্থল চন্দ্রসূর্য্যাদির পরস্পরের সহিত পরস্পরের বাধ্যবাধকতামূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া'র এক্ষণে যেরূপ ব্যবস্থা-পারিপাট্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না—অগ্নিই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল—তাই বলা হইয়াছে "অগ্নি ঋতের কিনা বিশ্বব্যাপারের অখণ্ডনীয় বিধিব্যবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে ছিলেন।" দুঃখের কথা কী আর বলিব—বেদের এতবড় একটা বিজ্ঞান-সঙ্গত **জাজ্বল্যমান সত্যকথা** ভাষ্যকারের লেখনীরূপী মরণ-কাঠির সংস্পর্শে প্রাণশূন্য ধড়মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভাষ্যকার "অগ্নি ঋতের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ছিলেন।" এই সরল বেদবাক্যটির অর্থ করিয়াছেন "অগ্নি যজ্ঞের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে ছিলেন।" একথা'র কী-যে ভাব তাহা তিনিই জানেন! উদ্ধৃত বেদ-বাক্যটির সর্ব্বপ্রথমে যেমন আছে "অগ্নি সৎও বটেন অসৎও বটেন", সর্ব্বশেষে তেমনি আছে "বৃষভও তিনি—ধেনুও তিনি" অর্থাৎ অগ্নি পুরুষও বটেন প্রকৃতিও বটেন। উপক্রমণিকা এবং উপসংহার স্থানীয় এ দুইটি কথার ভাব আমার বুদ্ধিতে আমি এইরূপ বুঝি যে, অগ্নি যখন নির্ব্বাণ অবস্থায় বা শক্তি-লীন (potential) অবস্থায়, অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি প্রকৃতি, আর, তখন তিনি অদৃশ্য বলিয়া দর্শকের চক্ষে অসৎ; আবার যখন তিনি জলন্ত অবস্থায়, বা কার্য্যকরী (kinetic) অবস্থায় বাহিরে বাহির হ'ন, তখন তিনি পুরুষ, আর, তখন তিনি দৃশ্যমান বলিয়া দর্শকের চক্ষে সৎ। ইতি টীকা সমাপ্ত।

ঋক্‌বেদে আর এক স্থানে আছে "বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাং"। ইহার অর্থ:—হে অগ্নি বৈশ্বানর তুমি ক্ষিতি-সকলের অর্থাৎ ভুবন-সকলের নাভি।

ইহার টীকা।

ক্ষিতি শব্দের উৎপত্তি ক্ষি-ধাতু হইতে। ক্ষি ধাতুর অর্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া। "সমস্ত প্রাকৃত জগৎ ক্ষর-ধর্ম্মী বা ক্ষয়শীল" এই কথাটি শ্রোতার মনশ্চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইবার জন্য ভুবন'কে ভুবন না বলিয়া বলা হইয়াছে

"ক্ষিতি।" বলা হইয়াছে "অগ্নি তুমি ক্ষিতিসকলের নাভি" অর্থাৎ "অগ্নি তুমি ক্ষয়শীল প্রাকৃত বস্তু-সকলের—ভুবন-সকলের নাভি কিনা **কেন্দ্রস্থান**।" পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋক্-মন্ত্রটিতে অগ্নিকে বলা হইয়াছে অদিতির গর্ভজাত আদিত্য এবং এখানে বলা হইতেছে "সর্ব্বজগতের কেন্দ্রস্থান"। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মন্ত্রপ্রণেতা ঋষিরা আদিম অগ্নি এবং সূর্য্যকে একই দৃষ্টিতে দেখিতেন। বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে একসময়ে অগ্নি যে, নিখিল আকাশে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল একথা দেশীয় সকল শাস্ত্রেরই অভিপ্রায়-সম্মত; তা ছাড়া, এখনও যে, অগ্নি সর্ব্বজগতের সর্ব্বস্থানে নিগূঢ় থাকিয়া আপনার দেবসেনাপতি পুত্রটির সহায় সাধনার্থে সূক্ষ্ম পরমাণুরূপী দেবসেনার দলবল'কে স্থূল পিণ্ডরূপী অসুর সেনা'র দলবলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অষ্টপ্রহর নাচাইয়া দিতেছে—ইহা জগৎশুদ্ধ লোকের একপ্রকার দেখা কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আইওনিয়া সম্প্রদায়ের আচার্য্যকুলতিলক হিরাক্লিটস্ (Heraclitus) ভারতবর্ষের ঐ দুইটি চিরপ্রসিদ্ধ পুরাতন কথার—অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃত জগৎ জলস্রোতের ন্যায় ক্ষরধর্ম্মী এই একটি কথা, আর, অগ্নি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থান এই একটি কথা—এই দুইটি চিরকেলে ভারতবর্ষীয় কথার **মস্ত একজন নূতন আবিষ্কর্ত্তা** বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে সুবিখ্যাত।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

পুরাতন গ্রীসের পিথাগোরাস্ খুব একজন উঁচুদরের তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। ইঁহারও জন্মস্থান আইওনিয়া। পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তারা সকলেই বলেন যে, পিথাগোরাসের পূর্ব্বে Philosophy শব্দের বিশেষ কোনো অর্থ-গৌরব ছিল না—পিথাগোরাসই ঐ সুন্দর শব্দটির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা সুতরাং পিতানামের যোগ্য! Philosophy শব্দের গোড়া'র অর্থ—জ্ঞানের প্রতি প্রাণের ভালবাসা। জ্ঞানের প্রতি এই যে প্রাণের ভালবাসা, এইটিই ছিল আমাদের দেশের পূর্ব্বকালের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদিগের—মুখের কথা শুধু না পরন্তু নয়নের ধ্রুবতারা এবং হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন। ভগবদ্গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কি বলিতেছেন শ্রবণ কর :—

"শ্রেয়া'ন্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেন দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥
অপিচেদসি সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎকুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥"

ইহার অর্থ।

"দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়, পরন্তপ। সমস্ত কর্ম্ম পূর্ণ জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। **জানিও তাহা** প্রণিপাত দ্বারা, জিজ্ঞাসা দ্বারা, সেবা দ্বারা! জ্ঞানের উপদেশ দিবেন তোমাকে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা; যাহা জানিয়া আর-তুমি এমনতর মোহে জড়াইয়া পড়িবে না পাণ্ডব—যাহার গুণে সমস্ত জীবজন্তু চরাচর দেখিবে তুমি আপনাতে আর সেইযোগে আমাতে। যদি তুমি পাপীদিগের সকলের অপেক্ষা অধম পাপীও হও—সমস্ত পাপ তুমি তরিয়া যাইবে জ্ঞানতরীকে সহায় করিয়া। উদ্দীপ্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠচয়কে ভস্মসাৎ করে অর্জ্জুন—জ্ঞানাগ্নি তেমনি সমস্ত কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে। জ্ঞানের মতো পবিত্র বস্তু জগতে নাই। যোগ-সিদ্ধ ব্যক্তি কালে তাহা আপনা হইতেই আপনাতে প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাবান্ নিষ্ঠাবান্ এবং সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে—জ্ঞানলাভ করিয়া পরমা শান্তি হাত বাড়াইয়া পায়।"

পিথাগোরাসের জীবন-চরিত সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে এই আরেকটি কথা রাষ্ট্র যে, তিনি তাঁহার মধ্যবয়সে নানা সম্প্রদায়ের জ্ঞানিজনের নিকট হইতে তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের প্রবর্ত্তিত তত্ত্বজ্ঞানের মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মন কিন্তু আমার বলিতেছে "**তাহা** তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন **একটি জায়গা** হইতে; তিন দিকে যাহার মকরালয় এবং এক দিকে যাহার হিমালয়—ভারতী দেবীর সেই প্রধানতম পীঠস্থান হইতে—অন্যত্র কোথা হইতেও নহে।" এ বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্তটির সন্ধান পাইতে হইলে ভারতান্ধশ্রেণীর ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের পুঁথির পাতা

উল্টানো নিতান্তই বিড়ম্বনা। এই শ্রেণীর পণ্ডিতেরা পুরাতন ভারতবর্ষকে কী-চক্ষে দেখেন—তাহার একটা নমুনা দেখাইতেছি।

পণ্ডিত-চূড়ামণি George Johnston Allman L. L. D. একখানি নব্য ইংরাজি বিশ্বকোষে (অর্থাৎ Encyclopediaতে) পিথাগোরাসের জ্ঞাননেত্র পরিস্ফুটনের গোড়া'র বৃত্তান্তটির সমাচার জ্ঞাপন করিয়াছেন এইরূপ:—

"The accumulated wisdom, as well as most of the tenets of the Pythagorian school was attributed in antiquity to the extensive travels of Pythagoras, which brought him in contact (so it is said) not only with the Egyptians, the Phoenicians, the Chaldeans, the Jews and the Arabians but also with the Druids of Gaul, the Magi of Persia and (সকলের পশ্চাতে) the Brahmins."

এই শ্রেণীর ইংরাজ পণ্ডিতদিগের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে **এইটিরই** সম্ভাবনা সব-চেয়ে বেশী যে, পিথাগোরাস্ মিসর দেশীয়, ফিনীসীয়, ইহুদী এবং আরব-দেশীয় জ্ঞানীদিগের নিকট হইতে তাঁহার ভবিষ্যতের কাজে-লাগিবার মতো তত্ত্বজ্ঞানের নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তবে, হইতেও পারে (কেননা so it is said) যে, তিনি Gaul দেশের Druidদের নিকট হইতে, পারস্য দেশের Magiদিগের নিকট হইতে, এমন কি—কে জানে কোন্ দেশের—ব্রাহ্মণদের নিকট হইতেও জ্ঞানের টুক্‌রা টাক্‌রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইন্‌সাইক্লোপীডিয়ার ভাণ্ডারপূরক পণ্ডিতচূড়ামণিকে আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি—পিথাগোরাস্ তাঁহার সাধের পুনর্জন্মবাদটা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন? ফিনীসীয়দিগের নিকট হইতে—না মিসরবাসীদিগের নিকট হইতে—না ইহুদীদের নিকট হইতে? সকলেই জানে Magi সম্প্রদায়ের জ্ঞানীরা পারস্য-দেশীয় অগ্নিপূজকদিগের প্রধান পুরোহিত ছিলেন; কিন্তু তথাপি—আমরা যেমন একটু পূর্ব্বে পণ্ডিতচূড়ামণির নামোল্লেখ করিবার সময় শুধু Allman না বলিয়া George Johnston Allman LL.D. বলা শ্রেয় বোধ করিয়াছিলাম—তিনি তেম্নি শুধু Magi বলাটা ভাল দেখায়-না বিবেচনা করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বলিয়াছেন Magi of Persia; এমন কি, Druid নামক জঙ্গলা জাতীয় পুরোহিতদিগের নামোল্লেখ করিবার সময়েও তিনি শুধু Druids না বলিয়া বলিয়াছেন Druids of Gaul। এতো খুব ভাল কথা—কিন্তু তাহার পরেই একি দেখি বিপরীত! পণ্ডিতচূড়ামণির নিক্তির ওজনের ন্যায়-বিচারে প্রাচীন ইণ্ডিয়া একটা আকাশ-কুসুম! **ব্রিটিশ** ইণ্ডিয়াই ষোল-আনা ইণ্ডিয়া! ইণ্ডিয়ার প্রতি যাঁহার বৈড়ালিক প্রেমদৃষ্টি এতাধিক প্রখর, তিনি কোন্ প্রাণে প্রাচীন ইণ্ডিয়ার নামোল্লেখ করিয়া আপনার সাধের ষোলআনা হইতে আটআনা হাতছাড়া করিবেন? কাজেই, তিনি ব্রাহ্মণদিগের নামোল্লেখ করিবার সময়—ইণ্ডিয়া বলিয়া একটা **দেশ** যে, পূর্ব্বে কোনোকালে ছিল, তাহা যেন জানেনই না এইরূপ ভান করিয়া—Brahmins of India'র পরিবর্ত্তে শুধু-Brahmins বলিয়া সংক্ষেপে সারিয়াছেন। ফলে, ইণ্ডিয়া তিনি জানুন্ বা না জানুন—তাহাতে কাহারো কিছুমাত্র আইসে যায় না, পরন্তু তাহার মতো **অত বড়** একজন বিশ্বকোষের ভাণ্ডারপূরক পণ্ডিতচূড়ামণির **এটা** জানা খুবই উচিত ছিল যে, পুনর্জন্মবাদ ফিনীসীয়, ইহুদী, আরব্য প্রভৃতি **সেমীয়** জাতিদিগের কোনো শাস্ত্রেই লেখে না; আর সেই সঙ্গে এটাও তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, **শবদেহ-পরায়ণ** প্রাচীন মিশরবাসীদিগের **পুনরুত্থান-বাদ**, এবং **শবদাহ-পরায়ণ** ভারতবাসীদিগের **পুনর্জন্মবাদের** মধ্যে উত্তর-মেরু দক্ষিণ-মেরুর ব্যবধান। প্রকৃত কথা এই যে, পিথাগোরাস্ যদি মিসর-দেশীয় জ্ঞানীদিগের নিকটে জ্ঞানশিক্ষা করিতে যাইতেন, তাহা হইলে তিনি পুনর্জন্মবাদী না হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের আদিম প্রচারক সেন্টপাউলের ন্যায় পুনরুত্থান-বাদী হইতেন। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, সেন্টপাউল ছিলেন অন্ধভক্তির পূর্ণাবতার—পিথাগোরাস্ ছিলেন জ্ঞানের অনন্যভক্ত সেবক; কাজেই, মিসর-দেশীয় পুনরুত্থান-বাদ সেন্টপাউলের **ইহুদীপ্রকৃতির** সহিত খাপ খাইবে ইহাও **বিচিত্র** নহে, আর, ভারতবর্ষীয় পুনর্জন্মবাদ পিথাগোরাসের **আর্য্যপ্রকৃতির** সহিত খাপ খাইবে ইহাও **বিচিত্র** নহে।

পণ্ডিতচূড়ামণিকে আমি আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি এই যে, ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম সর্গের ৪৭শ সিদ্ধান্তটি সত্যসত্যই কি পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাগ্রে পিথাগোরাসের ধ্যান-নেত্রে সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল? পণ্ডিতচূড়ামণির দলের লোকেরা বলেন বটে তাই; কিন্তু তাহা হইতে পারে না এইজন্য যেহেতু পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-মহলে এক্ষণে আর এ কথাটি কাহারো নিকটে অপ্রকাশ নাই যে, পিথাগোরাসের জন্মিবার বহুপূর্ব্বে আমাদের দেশে ইউক্লিডের ঐ ৪৭শ সিদ্ধান্তটিকে যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণের কাজে লাগানো হইত। এ সম্বন্ধে বারাণসী কালেজের ইংরাজিসংস্কৃত অধ্যাপক Dr. Thibaut এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালের ৪৪শ বল্যুমে লেখেন এই ;—

Whatever is closely connected with the ancient Indian religion must be considered as having sprung up among the Indians themselves, unless positive evidence of the strongest kind points to the contrary.

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাত্মা এইরূপে তাঁহার নবাবিষ্কৃত রহস্যটির ভূমিকা করিয়া বৌধায়ন আচার্য্যের শুল্ব সূত্রের দুইট সূত্র ইংরাজি অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। *

সূত্র দুইটি এই—

(১)

সমচতুরস্রস্য অক্ষয়া রজ্জুঃ দ্বিস্তাবতীং ভূমিং করোতি।

সমচতুরস্র (সংক্ষেপে স) কিনা Square
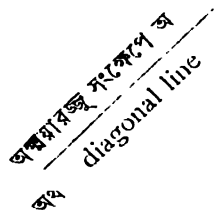
বাঙ্গলা অনুবাদ

সমচতুরস্রের অক্ষয়ারজ্জু (যখন বর্গফল উৎপাদন করে তখন) সেই (সমচতুরস্র পরিমাণ) ভূমিকে দ্বিগুণ করে। সংক্ষেপে, অএর বর্গফল = ২ স

ইংরাজী অনুবাদ

The cord which is stretched across—in the diagonal of—a square produces an area of double the size.

(২)

দীর্ঘ চতুরস্রস্য অক্ষয়া-রজ্জু পার্শ্বমানী তির্য্যঙ্মানী চ যৎ পৃথগ্‌ভূতে কুরুতঃ তদুভয়ং করোতি।

দীর্ঘচতুরস্র অর্থাৎ oblong rectangle
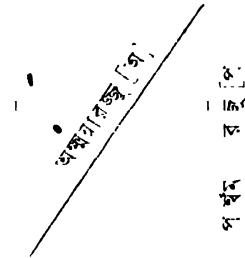
বাঙ্গলা অনুবাদ।

দীর্ঘ চতুরস্রের পার্শ্বমানী রজ্জু এবং তির্য্যঙ্মানী রজ্জু পৃথক্ ভাবে যাহা করে (অর্থাৎ বর্গফল যাহা উৎপাদন করে)— অক্ষয়ারজ্জু সেই উভয় করে (অর্থাৎ সেই উভয় বর্গফল একসঙ্গে উৎপাদন করে)। অর্থাৎ অ-এর বর্গফল = পা এবং তি উভয়ের বর্গফল একাধারে।

ইংরাজী অনুবাদ।

The cord stretched in the diagonal of an oblong produces both (areas) which the cords forming the longer and the shorter sides of the oblong produce separately.

ভারতবর্ষের নিকটে পিথাগোরাসের ঋণীত্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া এ যাহা দেখাইলাম—ইহা এক-প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—ইহার উপরে কাহারো দ্বিরুক্তি চলিতে পারে না। প্রত্যক্ষপ্রমাণ পাওয়া গেলে তো কথাই নাই; কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল সময়েই কিছু আর পুরাতত্ত্ব-গবেষণ-কর্ত্তাদিগের হাতের কাছে উপস্থিত থাকে না—তা বলিয়া শেষোক্ত অবস্থায় তাঁহারা কি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিবেন? শাস্ত্রে কি বলে? এই-প্রকার অভাবপক্ষে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান এই যে, "মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" "মধুর অভাবে গুড় দিয়া কাজ সারিবে"; সাংখ্য-শাস্ত্রের বিধান এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে

* পাঠকগণের বোধসুলভার্থে প্রদর্শিতব্য সূত্র-দুইটির সহিত মানক্ষেত্র-সমন্বিত (অর্থাৎ diagram যুক্ত) বাঙ্গলা অনুবাদ জুড়িয়া দেওয়া গেল।

অনুমান দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবে। অতএব তাহাই এক্ষণে করা যাক্।

এটা সকলেরই জানা কথা যে, দুইটি বিদ্যা আমাদের দেশে বহুপূর্ব্বে রীতিমত অনুশীলিত হইয়া যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিল—সঙ্গীত-বিদ্যা এবং সংখ্যাগণিত। A. H. Fox-strangways তাঁহার প্রণীত Music of Hindustan নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রে গ্রাম বিভাগ এবং মূর্চ্ছনা প্রকরণের পারিপাট্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন

The scheme as a whole is much earlier than Bharata. The theory of consonance (সম্বাদিতা), or at least the terminology which that theory uses (সম্বাদী, অনুবাদী, বিবাদী) is alluded to in the মহাভারত * * * The author gives as the 'ten elements of sound' the seven notes of the scale, and three others, ইষ্ট, অনিষ্ট, এবং সংহত ('[illegible] agreeable' 'disagreeable', and 'struck together'). These last are described as 'classificatory' (প্রবিভাগবান্); and it is tempting, therefore, to see in them the terms 'assonant', 'dissonant', and 'consonant' with which we are familiar. But a much more important passage is to be found in the ঋক্প্রতিশাখ্য, which is probably not later than 400 B. C. It is there said that there are twenty-one notes in all, seven for each voice-register (স্থান)—the lower (মন্দ্র), the middle (মধ্য), and the upper (উত্তম). These seven notes (of the octave, or of course twenty-one of the three octaves of the gamut) are described as twins (যম=যমক). Each twin is separated from its fellow by such a small distinction that from one point of view the difference is hardly perceptible; yet, from another, the two are distinct things * * *. This highly elaborate system may, then, be dated back beyond the time of Aristoxenus, to the fifth century B. C., and, like his, points to a long antecedent period of development.

টীকা।

যে-সময়ের কথা হইতেছে, সেই বহুপুরাকালে সঙ্গীতের গ্রাম ছিল দুইটি মাত্র—(১) ষড়্‌জ গ্রাম, (২) মধ্যম গ্রাম। একই সপ্তক দুই গ্রামে ঈষৎ বিভিন্ন দুই মূর্ত্তি ধারণ করে বলিয়া—সপ্তকের সেই যুগল মূর্ত্তিকে যমকের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। সপ্তকের যুগলমূর্ত্তি ব্যাপারখানা কি তাহা দেখাইবার ইচ্ছায় শ্রুতিব্যবধানের সংকেত ধার্য্য করা গেল এইরূপ—

বড় একটা ঘরের মাঝখানে দেয়াল বসাইয়া যেমন্ সেই বড়-ঘরটাকে ছোটো দুইটি ঘরে বিভক্ত করা হয়, তেম্নি (গা • মা)'র মাঝখানে একটি ফুট্‌কুনি বসাইয়া, গা-মা'র মধ্যবর্ত্তী স্বর-ব্যবধান'কে দুইটি শ্রুতি ব্যবধানে বিভক্ত করা হইল। (গা • মা)'র মধ্যবর্ত্তী ফুট্‌কুনি তীব্রগান্ধারের সাঙ্কেতিক প্রতিনিধি; আর সেই জন্য, ফুট্‌কুনি একটি বই না অথচ তাহাতে বুঝাইতেছে যে, গা-মা'র মধ্যে দুইটি শ্রুতিব্যবধান:—(গা-তীব্রগা)ব্যবধান এবং (তীব্রগা-মা)ব্যবধান, এই দুইটি শ্রুতিব্যবধান। (নি • সা)র মধ্যবর্ত্তী ফুট্‌কুনিতেও ঐ কারণে দুইটি শ্রুতিব্যবধান সূচিত হইতেছে যথা:—(নি-তীব্রনি) ব্যবধান এবং (তীব্রনি-সা) ব্যবধান, এই দুইটি শ্রুতি ব্যবধান। এমতে দাঁড়াইতেছে—

(গা • মা) ব্যবধান=(গা-তীব্রগা) ব্যবধান
+(তীব্রগা-মা) ব্যবধান
(নি • সা) ব্যবধান=(নি তীব্রনি) ব্যবধান
+(তীব্রনি-সা) ব্যবধান

তেমনি (রে • • গা)'র মধ্যবর্ত্তী দ্বিতীয় ফুট্‌কুনিটি কোমল গান্ধারের এবং প্রথম ফুট্‌কুনিটি কোমলতর গান্ধারের সাঙ্কেতিক প্রতিনিধি। (রে • • গা)'র মধ্যে ফুট্‌কুনি দুইটি বই না, কিন্তু সেই দুইটি ফুট্‌কুনিতে তিনটি শ্রুতি ব্যবধান সূচিত হইতেছে; যথা

(রে • • গা) ব্যবধান=(গা-কোমলগা) ব্যবধান
+(কোমলগা-কোমলতরগা) ব্যবধান
+(কোমলতরগা-রে) ব্যবধান।

তেমনি আবার (সা • • • রে)'র মধ্যবর্ত্তী তৃতীয় ফুট্‌কুনিটি কোমল রে'র, দ্বিতীয় ফুট্‌কুনিটি কোমলতর রে'র, প্রথম ফুট্‌কুনিটি কোমলতম রে'র সাঙ্কেতিক প্রতিনিধি। পুনশ্চ, (মা • • • পা)'র মধ্যবর্ত্তী প্রথম ফুট্‌কুনিটি তীব্র মধ্যমের, দ্বিতীয় ফুট্‌কুনিটি তীব্রতর মধ্যমের, তৃতীয় ফুট্‌কুনিটি তীব্রতম মধ্যমের সাঙ্কেতিক প্রতিনিধি। (সা • • • রে)'র মধ্যেও যেমন—(মা • • • পা)'র মধ্যেও তেম্নি—ফুট্‌কুনি তিনটি বই না, কিন্তু সেই তিনটি ফুট্‌কুনিতে চারিটি শ্রুতি-ব্যবধান সূচিত হইতেছে এইরূপ—

(সা • • • রে) ব্যবধান=(রে-কোমলরে) ব্যবধান
+(কোমলরে-কোমলতররে) ব্যবধান

+(কোমলতর রে-কোমলতম রে) ব্যবধান
+(কোমলতম রে-সা) ব্যবধান
(মা...পা) ব্যবধান = (মা-তীব্রমা) ব্যবধান
+(তীব্রমা-তীব্রতরমা) ব্যবধান
+(তীব্রতরমা-তীব্রতমমা) ব্যবধান
+(তীব্রতমমা-পা) ব্যবধান।

অতঃপর সপ্তকের যুগল মূর্ত্তি কিরূপ তাহা দেখাইতেছি প্রণিধান কর—

ষড়্জ গ্রামে ॥ সা • • • রে • • গা • মা • • পা • • • ধা • • নি • সা

মধ্যম গ্রামে ॥ সা • • • রে • • গা-মা • • • পা • • ধা • • • নি • সা

মধ্যম গ্রামই পাশ্চাত্য দেশে সাধারণত প্রচলিত, আমাদের দেশেও বোধ করি বা তাই। উপরে প্রদর্শিত দুই গ্রামের পাধা এবং নিধা ব্যবধানের প্রতি ঠাহর করিয়া দেখিলেই দর্শকের এটা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, মধ্যম গ্রামের ধা'কে অ্যাক-শ্রুতি উপরে চড়াইলেই মধ্যম গ্রাম সেই দণ্ডে ষড়্জ গ্রাম হইয়া যাইবে। এই জন্য বলা হইয়াছে

"Each twin is separated from its fellow by such a small distinction that from one point of view the difference is hardly perceptible, yet, from another, the two are distinct things." ইতি টীকা সমাপ্ত।

গ্রন্থকার Fox-strangways মহোদয় আর একস্থানে লিখিয়াছেন

"It seems possible, at least, that as the Greek and Indian systems were alike in so many other respects, they were alike also in deriving their enharmonic tones (অর্থাৎ কোনো কোনো রাগরাগিণীতে যেরূপ অনন্যসাধারণ তারতম্য-বিশিষ্ট কড়ি-কোমল স্বর ব্যবহৃত হয়—সেই রকমের কড়ি-কোমল স্বর) from a persistence in just intonation and a refusal to compromise, i. e., to temper (অর্থাৎ ঐকতানিক সঙ্গীতের কৃত্রিম ঠাট বজায় রাখিবার জন্য পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্রে স্বরগণের যেরূপ ঈষৎ পরিমাণে বিস্বরতা ঘটানো হয়—স্বরের সেরূপ বিস্বরতা সাধন প্রাচীন গ্রীস এবং ভারতবর্ষ উভয় দেশেরই সঙ্গীত-শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ)।

এই-সকল কথার ইঙ্গিত আভাসে এটা বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বে সঙ্গীত-বিদ্যার রীতিমত পাকা করিয়া গোড়া বাঁধা হইয়াছিল, আর এটাও সেই সঙ্গে কতক কতক বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পুরাতন গ্রীসের সঙ্গীতবিদ্যা ভারতবর্ষীয় ছাঁচে পরিগঠিত হইয়াছিল। নব্য Encyclopedia Britannicaর Musicএর কোটায় এক স্থানে তাই

"The stability of the diatonic scale (অর্থাৎ of the প্রসিদ্ধ স্বরসপ্তকের বিন্যাস-ব্যবস্থা) was assured as early as the 6th century B. C when Pythagoras discovered (if he did not learn from Egypt or India) the extremely simple mathematical proportions of its intervals,"

এই কথাটি লেখা আছে দেখিয়া আমার একজন পরম আত্মীয় (বলিতে হানি কি?—**আমার মন**) "if not" "যদি না!" "or" "অথবা!" বলিয়া হো হো করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল—হাসি আর তাহার থামে না! তাহার হাস্যের কারণ আর কিছু না—"(if he did not learn from Egypt or India)" এই জোড়া-অর্দ্ধচন্দ্র-বেষ্টিত ক্ষুদ্র টিপ্পনীটি। বাস্তবিকই উহা হাসিবার কথা, কেন না, Encyclopediaর পৃষ্ঠাপূরক মহোদয় ঐ সত্যকথা বেচারীটিকে অ্যাকে তো পারান্থীসীসের (paran-theses এর) জেল্‌খানায় পুরিয়াছেন, তাহাতে আবার, জেল্‌খানা'র দরজা'র গোড়ায় বুড়া-পালোয়ান এক্‌টাকে, if-notকে, পাহারা বসাইয়াছেন; আবার; তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া India-বেচারীর পিছনে গোয়েন্দা লাগাইয়াছেন "Egypt or" এই বহুরূপী প্রতারকটা'কে। গোয়েন্দাটা বহুরূপীই বটে:—উহা যখনযেমন-তখনতেমন বেশ ধারণ করিয়া অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে ধূলি দিবার ওস্তাদ। কোথাও বা উহা "Egypt-or" বেশ ধারণ করে—যেমন এখানে; কোথাও বা "Phœnicia-or" সাজে; কোথাও বা "Chaldæa-or" সাজে; এইরূপ তরো-বেতরো সাজ সাজিয়া অভাগিনী India'র পিছনে পিছনে ফেরে। আমার ঐ পরম আত্মীয়টির অকস্মাৎ হাস্যোদ্রেকের কারণ বুঝিতে পারিয়া ন্যায্য অনুমান-নামক বিচারপতি—কোণে দণ্ডায়মান "if not" এবং "Egypt or" এই দুটা পুলিসের কর্ম্মচারীর প্রতি মর্ম্মভেদী তীব্র কটাক্ষ করিয়া কয়েদীর প্রতি বেকসুর খালাসের আদেশ জারি করিলেন। ন্যায্য অনুমানের জয় হো'ক্—তাঁহার সুবিচারের মন্ত্রের চোটে পক্ষপাতের আজ্ঞানুবর্ত্তী মিথ্যা সংশয়ের বাক্‌জালের মধ্য হইতে সম্ভবানুরূপ প্রকৃত সত্য বাহির হইয়া পড়িল এইরূপ:—

কৃত্রিম অর্থাৎ সাজানো সংশয়	অকৃত্রিম সত্য
Pythagoras discovered (if he did not learn from Egypt or India) the mathematical proportions &c.	Pythagoras *did* learn from India the mathematical proportions &c.

সঙ্গীত-বিদ্যার ন্যায় আর একটি বিদ্যা আমাদের দেশে বহু পুরাতন-কালে রীতিমত অনুশীলিত হইয়া যথোচিত পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিল, সে বিদ্যাটি হ'চ্চে সংখ্যাগণিত-বিদ্যা। এমন কি—সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন বীজ-গণিতের **ক-খ**'র সঙ্গেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সাক্ষাৎকার ঘটে নাই—আমাদের দেশে তখন **চাতুরশ্রিক** (কি না quadratic) সমীকরণের প্রকরণ পদ্ধতি গণিতবেত্তা-দিগের নিকটে অপরিজ্ঞাত ছিল না। পিথাগোরাস্‌ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত তত্ত্বজ্ঞানে সঙ্গীত-বিদ্যার পার্শ্বে সংখ্যাগণিত-বিদ্যাকে বহুমাননা-পূর্ব্বক মহার্ঘ্য আসনে বসাইয়াছিলেন। পিথাগোরীয় সাংখ্য দর্শনের বা সংখ্যা-মূলক দর্শনের * মতে প্রকৃতির বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোড়া'র তত্ত্ব দুইটি—(১) জোড়, আর (২) বিজোড়। পিথাগোরীয় সাংখ্যের এই হেঁয়ালি ধরণের কথাটি'র প্রকৃত তাৎপর্য্য যে, কি, তাহা ইংরাজী পণ্ডিতদিগের অনেকের নিকটেই **গ্রীক্**; তবুও তাঁহাদের মধ্যেকার দুই একজন মাথালো-গোচের উপাধিধারী অধ্যাপক উহার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই;—কিন্তু তাহা তাঁহারা পারিবেন কেমন করিয়া? পিথা-গোরীয় সাংখ্যের রহস্য-ভাণ্ডারের চাবি যে রহিয়াছে ভারত-বর্ষীয় সাংখ্যের তত্ত্বাগারে গুরুপরম্পরাগত তান্ত্রিকী ভাষার পেটিকার মধ্যে সঙ্গোপিত। আমি যদিচ তাঁহাদের মতো পণ্ডিত নহি, কিন্তু **আমাদের** দেশের সাংখ্য দর্শনে **আমার** ব্যুৎপত্তি তাঁহাদের অপেক্ষা **ঢের বেশী** এ বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই; আমি তাই ভারতবর্ষীয় সাংখ্য দর্শনের চতুর্বিংশ এবং ত্রয়োবিংশ তত্ত্বের চস্‌মার মধ্য দিয়া পিথাগোরীয় সাংখ্যের ঐ দুইটি গোড়া'র তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্য চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখিতেছি এইরূপ :—

সকলেই জানেন যে, **আদি বিজোড়**=১; এটাও কিন্তু সেই সঙ্গে জানা উচিত যে, **আদি জোড়**=০। যদি বল' যে, শূন্য যে জোড় সংখ্যা তাহার প্রমাণ কি? তবে তাহার উত্তর এই যে, উহার প্রমাণ গণিতের একটি গোড়া'র তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে; গোড়া'র তত্ত্বটি-সে এই যে, বিজোড় হইতে ১ কাটিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা জোড় বই আর কিছুই হইতে পারে না; তার সাক্ষী; ৯-১=৮, ৭-১=৬, ৫-১=৪, ৩-১=২। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, আদি-বিজোড় হইতে ১ কাটিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই আদি জোড়। তবেই হইতেছে যে,

১— আদি বিজোড়

০=১—১= আদি জোড়।

এখন দেখিতে হইবে এই যে, আমাদের জ্ঞানে সর্ব্ব-প্রথমে যাহা **একটা কিছু রূপে** প্রকাশ পায়, তাহা "একটা কিছু" এই অর্থে ১ বা আদি বিজোড়। পক্ষান্তরে, যাহা একান্ত-পক্ষেই আমাদের জ্ঞানে **অব্যক্ত**, তাহা আমাদের নিকটে "কিছুই না" এই অর্থে ০, কি না আদি জোড়। এইরূপে আমরা পাইতেছি

আদি জোড়=০=অব্যক্ত=সুষুপ্তি=প্রলয়=Chaos।

* খুব সম্ভব যে, পিথাগোরাসের সাংখ্যদর্শন আমাদের দেশীয় সাংখ্যদর্শনের একটা ফ্যাকড়া ডাল। সাংখ্য শব্দের অর্থ সংখ্যা-সম্বন্ধীয়। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সংখ্যা-নির্ব্বাচনের প্রাচুর্য্য সাংখ্যদর্শনে যেমন—এমন আর কোনো দর্শনেই নহে। তত্ত্ব পাঁচিশ, গুণ তিন, ইন্দ্রিয় একাদশ, ভূত পঞ্চ, বিকার ষোড়শ, সিদ্ধি আট, তুষ্টি নয়, এইরূপ আরো নানাবিধ বিষয়ের সংখ্যা—এমন কি মোহান্ধকার প্রগাঢ়তা ভেদে কত সংখ্যক তা পর্য্যন্ত—সাংখ্যদর্শনে গুনিয়া গাঁথিয়া স্থিরস্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এটা যদিচ সত্য যে, গুণ, ইন্দ্রিয়, ভূত প্রভৃতি গোটাচারপাঁচ বিষয়ের সংখ্যা নির্ব্বাচন বেদান্তাদি-দর্শনেও আছে, কিন্তু এটাও তেম্নি সত্য যে, সাংখ্যদর্শন আমাদের দেশের সকল-দর্শনের গোড়া'র দর্শন; আর সেইজন্য এইটিরই সম্ভাবনা সব-চেয়ে বেশী যে, ঐপ্রকার সংখ্যানির্ব্বাচন-পদ্ধতিটি সাংখ্য-দর্শন হইতে বেদান্তদর্শনে সংক্রামিত হইয়াছে, তা ছাড়া, সংখ্যা নির্ব্বাচনের পারিপাট্য সাংখ্যদর্শনে যেমন গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সবতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনায়—অন্যান্য দর্শনে গোটাচার বিষয়ের সংখ্যানির্ব্বাচন যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। সংখ্যা-নির্ব্বাচন সাংখ্য দর্শনের এমনি একটি মুখ্য মর্ম্মগত ব্যাপার যে, সাংখ্যের কথা-প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের উপর্যুপরি তিন চারি অধ্যায়ে, প্রকৃতিকে প্রকৃতি না বলিয়া বলা হইয়াছে চতুর্বিংশ (The twenty-fourth); আত্মাকে আত্মা না বলিয়া বলা হইয়াছে পঞ্চবিংশ। অতএব এরূপ অনুমান শুধুই কেবল একটা অনুমান মাত্র নহে যে, পুনর্জ্জন্মবাদের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাবাদটিও, পিথাগোরাস্, ভারত-সরস্বতীর জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে চুপিচুপি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

আদি বিজোড় = ১ = প্রথমব্যক্ত = মহান্ = হিরণ্যগর্ভ = Logos। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে। আমরা যাহা জানি, তাহা অপেক্ষা আমরা যাহা জানি না তাহার ব্যাপ্তি অপরিসীম বেশী; আর সেই জন্য "০-জ্ঞানের গর্ভ হইতে ১-জ্ঞান উদ্ভূত হয়" বলিলে প্রকারান্তরে বলা হয় "**অসীম** অজ্ঞানের গর্ভ হইতে **সসীম** প্রথম জ্ঞান উদ্ভূত হয়।" এখানে কিন্তু একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে এই যে, তাহা যদি হয়—অসীম অজ্ঞানের গর্ভ হইতে সদ্য-উৎপন্ন প্রথম জ্ঞান যদি সসীম হয়, তবে সাংখ্য দর্শনে প্রথম জাত মহত্তত্ত্বকে "পরিমিত" না বলিয়া "মহান্" বলা হইল কেন? ইহার উত্তর সংক্ষেপে এই:—মনে কর অসীম মহাকাশের মধ্যে একটি মাত্র অণ্ডাকৃতি প্রকাণ্ড জ্যোতির্মণ্ডল উদ্ভূত হইয়াছে আর তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে "ব্রহ্মাণ্ড"। পুরাণে অসীম আকাশব্যাপী অব্যক্তের অধিদেবতাকে অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে আর বলা হইয়াছে যে অণ্ডাকৃতি জ্যোতির্মণ্ডলটা প্রসুপ্ত নারায়ণের নাভিপদ্ম, আর সেই নাভিপদ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ ফুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন;—কিন্তু এখানে সে-সকল কথার প্রয়োজন নাই। এখানে আমি কেবল বলিতে চাই এই যে; মহাশূন্য-ব্যাপী অব্যক্ত দেশীয় সাংখ্যের ভাষায় মূল প্রকৃতি এবং পিথাগোরীয় সাংখ্যের ভাষায় আদি-জোড়। আর সেই মহাশূন্যের নাভিস্থিত জ্ঞান এবং ক্রিয়া শক্তি সমন্বিত (শাঙ্কর ভাষায়—বোধাবোধাত্মক) জ্যোতির্মণ্ডল দেশীয় সাংখ্যের ভাষায় অধ্যবসায়াত্মিকা মহতী বুদ্ধি সংক্ষেপে মহান্, এবং পিথাগোরীয় সাংখ্যের ভাষায় আদি বিজোড় = আদি unit = ১। এখন দেখিতে হইবে এই যে, সেই যে আদি-বিজোড় মহান্ তাহা একদিকে যেমন মহাকাশব্যাপী অব্যক্তের তুলনায় অসীম ছোটো, আর এক দিকে তেমি তাহার মধ্য হইতে ভবিষ্যতে যাহা দশ দিকে দশধা ছট্‌কিয়া বাহির হইবে তাহার তুলনায় তাহা অসীম বড়; আর, এই হিসাবে—অর্থাৎ যে-হিসাবে তাহা ভবিষ্যৎ প্রকাশ্য জীবজন্তু চরাচর অপেক্ষা অসীম বড় সেই হিসাবে—তাহা সত্যসত্যই মহান্। উপনিষদে স্পষ্টই লেখা আছে "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ—মহতঃ পরমব্যক্তং" "বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা বড়—মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত বড়।" শাঙ্কর ভাষ্যে ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এইরূপ:—

"সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ আত্মা।" "সর্ব্বমহত্বাৎ অব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্ত্বং বোধাবোধাত্মকং মহান্ আত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে।" ইহার অর্থঃ—"হৈরণ্যগর্ভ তত্ত্বকে আত্মা বলা হইয়াছে এই জন্য—যেহেতু তাহা সমস্ত জীবগণের বুদ্ধির অধ্যাত্মা; মহান্ বলা হইয়াছে এইজন্য—যেহেতু তাহা সর্ব্বমহত্ত্ব স্বরূপ (অর্থাৎ সব-চেয়ে বড়—অপরিসীম মহান্) অব্যক্তের প্রথম জাত অভিব্যক্তি। এইরূপ যে বোধাবোধাত্মক (অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া সমন্বিত। হৈরণ্যগর্ভতত্ত্ব তাহাই বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ মহান্ আত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।" তবেই হইতেছে যে, সর্ব্বমহত্ত্ব-স্বরূপ অব্যক্ত—মহত্তত্ত্বের **উপরে**; জীবগণের পরিমিত বুদ্ধি—মহত্তত্ত্বের **নীচে**. মহত্তত্ত্ব উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সেতু। পরে দেখিব যে, জগদ্বিখ্যাত আরিষ্টটেল্ পিথাগোরীয় আদি-বিজোড়কে—মহত্তত্ত্বকে—limited বা unlimited না বলিয়া বলিয়াছেন শুধু "Limit", কিনা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পর্য্যন্ত-সীমা। অর্থাৎ যেমন কলস-একটা'র মৃণ্ময় বা ধাতুময় গাত্র তাহার সসীম অন্তরাকাশ এবং অসীম বহিরাকাশের মধ্যবর্ত্তী পর্য্যন্তসীমা, মহান্ তেমি সসীম অহঙ্কারাদি তত্ত্ব এবং অসীম অব্যক্ত তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী পর্য্যন্ত-সীমা। অথবা যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন দৃশ্য এবং অদৃশ্যের—দাহ্যকাষ্ঠ এবং তাহার বাষ্পীভূত পরমাণু-চয়ের—মধ্যবর্ত্তী সেতু, মহান্ তেমি ব্যক্ত অব্যক্তের মধ্যবর্ত্তী সেতু। পিথাগোরীয় সংখ্যা-দর্শনের গোড়া'র তত্ত্ব-দুইটির সম্বন্ধে বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন সুবিজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত (James Adam, Litt.D.) তাঁহার প্রণীত Religious Teachers of Greece নামক গ্রন্থে পিথাগোরাসের বৈজ্ঞানিক মতামতের সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এই জায়গাটিতে প্রদর্শন করা শ্রেয় বোধ করিতেছি। ইংরাজি বাগ্‌জাল দেশীয় লোকের চক্ষে পাছে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে এই ভয়ে উদ্ধর্ত্তব্য ছত্র-গুলির স্থানে স্থানে টিপ্পনীর পাহারা বসাইয়া দিলাম। উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন এইরূপ—

"What then was the scientific doctrine of Pythagoras? A brief consideration of one or two points in Aristotle's account of Pythagorian Physics

may enable us to give at least a conjectural answer to the question. The Pythagoreans, Aristotle says, reared as they were in mathematical studies, imagined that the elements of mathematical existences are also the elements of the Universe. Now, the naturally first and simplest form of mathematical existence is number and the elements of number are the odd and the even, whereof the former is "limited" and the latter "unlimited." On what grounds the Pythagoreans declared the odd to be limited and the even unlimited we need not at present enquire: it is enough for our purpose to note that having arrived, apparently in this way, at the conception of Limit and the unlimited, they proceed to evolve the universe from these two principles.

" ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, পিথাগোরীয় পণ্ডিতেরা অসীম মহৎ অব্যক্ত তত্ত্ব 'এবং' তাহার প্রথমজাত মহত্তত্ত্ব—এ দুইটি গোড়ার তত্ত্ব যে, কোথা হইতে পাইলেন—গ্রন্থকার সেই গোড়া'র কথাটিকে ঘাঁটাইতে চাহেন না; তিনি কেবল বলিতে চা'ন এই যে, ঐ দুইটি তত্ত্ব তাঁহারা যেখান হইতে পাইয়া থাকুন না কেন—এটা স্থির যে, ঐ দুইটি তত্ত্ব হইতেই তাঁহারা সমস্ত জগতের উৎপত্তি ঘটাইয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন। আমরা কিন্তু নিশ্চিত জানি যে, দেশীয় সাংখ্য মতেও অব্যক্ত মূল প্রকৃতি (যাহা অসীম) আর অব্যক্তের প্রথমজাত মহত্তত্ত্ব (যাহা অসীম হইতে সসীমে নামিবার মাঝের সোপান), এই দুইটি গোড়ার তত্ত্ব হইতেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়াছে। গ্রন্থকারের কিন্তু এইরূপ ধারণা যে, জগদুৎপত্তির ঐ প্রকার প্রকরণ-পদ্ধতি পিথাগোরাসের **বড়** একটা অনন্যভাবিতপূর্ব্ব নূতন আবিষ্কার—যেন পিথাগোরাসের জন্মিবার পূর্ব্বে সাংখ্যদর্শন বলিয়া একটা দর্শন কোনো জন্মে কোথাও ছিল না। ইহার কিয়ৎ পরে গ্রন্থকার বলিতেছেন

"Elsewhere he (Aristotle) informs us that in the Pythagorean cosmogony as soon 'as the limit was composed, the nearest parts of the Unlimited immediately began to be drawn in and limited by the Limit.' The 'unit which Aristotle here maintains is probably to be identified with the central fire of the universe [**এই** central fire**এর কথা ঋক্‌বেদে উক্ত হইয়াছে এইরূপ ;—"বৈশ্বানর নাভি রসি ক্ষিতীনাং" ইহার অর্থ এই যে, হে বৈশ্বানর অগ্নি তুমি সমস্ত বিশ্বভুবনের নাভি (কিনা কেন্দ্রস্থান)**] which according to the Pythagoreans was the first object to take shape in the evolution of the cosmos; but the point which alone concerns us is that, according to this passage, Limit appears to play the part of an active or formative principle [**মহত্তত্ত্ব অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—কাজেই** formative] whereas the unlimited, being merely attracted and defined by Limit, is something purely passive.

[গ্রন্থকার বর্ত্তমান শতাব্দীর ডাহা ইংরাজ; পিথাগোরাস্ ভারতবর্ষের জ্ঞাতি-সম্পর্কীয়া আইওনিয়া প্রদেশের শিরস্থানীয় সাংখ্যাচার্য্য; অতএব পিথাগোরাস্ কোন্ কথা কী ভাবে বলিয়াছেন—গ্রন্থকার যে তাহা আপনার বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে সম্যক্‌রূপে বাগাইয়া আনিতে পারিয়াছেন তাহা অপেক্ষা তাহাতে যে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই এইটিরই সম্ভাবনা পোনেরো আনা মাত্রা বেশী। গ্রন্থকার অব্যক্ত মূলপ্রকৃতিকে ঠাওরাইয়াছেন passive, আর, আদিম unitকে অর্থাৎ মহত্তত্ত্বকে ঠাওরাইয়াছেন সর্ব্বতোভাবে active। এরূপ একটা অবৈধ অনুমান গ্রন্থকারের নিজের না-বুঝিবার ফল ছাড়া আর-যে কিছু তাহা আমার বোধ হয় না। গ্রন্থকার আরিষ্টটেলের এই যে একটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

"As soon as the unit was composed, the nearest parts of the unlimited immediately began to be drawn in and limited by the Limit."

ইহাতে কী বুঝাইতেছে? Aristotle যখন বলিয়াছেন "as soon as the unit was composed" অথবা, যাহা একই কথা—formed, তখন তাহাতেই বুঝাইতেছে যে, Unit-সেটি composite Unit, formed Unit; নচেৎ unitটি যদি সর্ব্বাংশে formative হইত তাহা হইলে তাহাকে formed বলা যাইতে পারিত না; কেন না, যে-কোনো বস্তু যে-কোনো অংশে formed, সেই অংশে তাহা passive। সূর্য্য যে অংশে জ্যোতি এবং প্রাণের মূল আকর সেই অংশে তাহা formative—এ কথা খুবই সত্য; এ কথাও খুবই সত্য যে সূর্য্য যে অংশে গ্রহাদির চালক সে অংশে তাহা active; এটাও কিন্তু **তেমনি-সত্য** যে, সূর্য্য যে অংশে গ্রহাদি কর্তৃক প্রতিচালিত (বা re-acted apon) সে অংশে তাহা passive। অতএব এটা যদিচ সত্য যে, সূর্য্য পোনেরো আনা পরিমাণে formative এবং active,

কিন্তু তাহা বলিয়া এটা সত্য নহে যে, সূর্য্য এক আনা পরিমাণেও passive নহে। আমাদের দেশের সাংখ্য-শাস্ত্রে তাই লেখে যে, প্রাকৃত বস্তু মাত্রই ত্রিগুণাত্মক। কি-বস্তুতে কি-তিনটি গুণ মাত্রাবিশেষে প্রাদুর্ভূত—মাত্রা-বিশেষে অভিভূত। যে-বস্তুতে সত্ত্বগুণ যে অংশে প্রাদুর্ভূত সে বস্তু সেই অংশে formative; যে-বস্তুতে রজোগুণ যে-অংশে প্রাদুর্ভূত সে বস্তু সেই অংশে active; যে-বস্তুতে তমোগুণ যে-অংশে প্রাদুর্ভূত সে বস্তু সেই অংশে passive। সুষুপ্তি-কালে সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণ একসঙ্গে প্রাদুর্ভূত হয়—রজোগুণ দমনে থাকে; আর সেই জন্য সুষুপ্তির অবস্থা এক দিকে যেমন formative এবং passive দুইই একাধারে, আর-এক দিকে তেমনি inactive : সুষুপ্তি কালের সাত্ত্বিক আনন্দ formative বলিয়া সুষুপ্তির অবস্থায় সুপ্ত-জনের শরীর মন নবীভূত হয়, আর তামসিক অজ্ঞানান্ধকার passive বলিয়া শরীর মন অসাড় হয়; তেমনি আবার সুষুপ্তি-কালে রাজসিক কর্ম্মচেষ্টা দমনে থাকে বলিয়া সুষুপ্তির অবস্থায় শরীর মন নিশ্চেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে দ্রষ্টা পুরুষ যখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট ভাবে রাত্রিযাপন করিয়া নবীভূত শরীর মন লইয়া প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন, তখন তাঁহার নবোন্মেষিত বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণ একসঙ্গে প্রাদুর্ভূত হয়—তমোগুণ দমনে থাকে; আর সেই জন্য সুষুপ্তি-ভঙ্গ-কালীন জাগরিতাবস্থা এক দিকে যেমন formative এবং active দুইই একাধারে, আর-এক দিকে তেমনি জড়তা-মুক্ত। এই অবস্থার সাত্ত্বিক প্রকাশ formative (তার সাক্ষী—কাহারো বা মনে কবিত্বের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, কাহারো বা মনে আরাধনা-জনিত দেবপ্রসাদ-লব্ধ স্বর্গীয় উপকরণে শুভ সংকল্প পরিগঠিত হয়, ইত্যাদি); রাজসিক স্ফূর্ত্তি active [তার সাক্ষী পঠদ্দশার বালকেরা প্রাতঃভ্রমণ (morning walk) করে, ভৃত্যেরা গৃহমার্জ্জন করে, পাচক ব্রাহ্মণেরা অগ্নি প্রজ্বলন করে, দোকানীরা পসরা সাজায় ইত্যাদি]; আর, তমোগুণ দমনে থাকে বলিয়া সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির শরীর মনে উদ্যমের স্ফূর্ত্তি হয়। [কিন্তু তা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, শরীর মাত্রই জড়ধর্ম্মী; আর সেই জন্য, দ্রষ্টাপুরুষের যতকাল পর্য্যন্ত শরীর বর্ত্তমান ততকাল পর্য্যন্ত জড়ত্বের সংস্রব হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে সাধ্যসুলভ নহে। দেশীয় শাস্ত্রের অভিপ্রায়-মতে হিরণ্যগর্ভের যদিচ স্থূল শরীর নাই—কিন্তু সূক্ষ্ম তৈজস শরীর আছে; আর সেইজন্য হিরণ্যগর্ভও কিয়ৎ পরিমাণে passive]। ইহার পরে গ্রন্থকার বলিতেছেন

> We are to conceive, apparently, of an infinitely extended substance, on which, at a particular point of time, the principle of Limit, which is itself eternal like the other, begins to work, exactly how or why, the Pythagoreans did not attempt to explain.

[গ্রন্থকার যদি এই-সকল বিষয়ের explanation সত্য সত্যই পাইতে ইচ্ছা করেন তবে St Paul-এর চসমা চক্ষু হইতে সরাইয়া ফেলিয়া কপিল পাতঞ্জল ব্যাস এবং তাঁহাদের পূর্ব্বতন বৈদিক কালের ঋষিদিগের চসমা ধীরে ধীরে চক্ষে সওয়াইয়া সওয়াইয়া ব্যবহার করিতে অভ্যাস করুন]। অতঃপর পিথাগোরাসের সাংখ্য বিদ্যা সম্বন্ধীয় কয়েক ছত্র লম্বা চওড়া কথা 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা'র সখের বাজারের দোকান-সাজানিয়া পণ্য দ্রব্যের ডালি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাই।

> "The scientific doctrines of the Pythagorean school have no apparent connection with the religious mysticism of the society. They have their origin in the same disinterested desire of knowledge which gave rise to the other philosophical schools of Greece."

এই ধরণের পক্ষপাত-দূষিত রসনা-স্ফূর্ত্তিকে আমার ভাষায় আমি বলি "লম্বা-চওড়া কথা।" পণ্ডিতচূড়ামণি বলিতে চা'ন এই যে disinterested desire of knowledge পুরাতন কালে শুধু কেবল গ্রীসের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল— পুরাতন ভারতবর্ষে কপিল-মুনি যেন "ঈশ্বরা-সিদ্ধেঃ" এই লোকবিরুদ্ধ কথাটি interested motive-এ মনের ভিতরে চাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন! তা শুধু না— পিথাগোরীয়দিগের disinterested desire of knowledge কেমন যে পূরামাত্রা disinterested ছিল, তাহার তিনি মস্ত একটা মাতব্বর-গোছের প্রমাণ দেখাইয়াছেন এই যে,

> "Scientific doctrines of the Pythagorean school have no apparent connection with the religious mysticism of the society."

একটু পরেই আমরা দেখিব যে ইংরাজ পণ্ডিত-চূড়ামণির আপনারই লেখনীর খড়্গাঘাতে তাঁহার শেষোক্ত বক্তৃতার মুণ্ড মাটিতে পড়িয়া ধরাবলুণ্ঠিত হইয়াছে। ইন্সাইক্লোপীডিয়ার গ্রন্থাপূরক পণ্ডিতচূড়ামণি ইহার পরেই বলিতেছেন

"The discourses and speculations of the Pythagoreans all connect themselves with the idea of number. An unimpeached tradition carries back the Pythagorean theory of numbers to the teaching of the founder himself. Recent investigators have shown that the discoveries attributed to Pythagoras connect themselves with a primitive numerical symbolism, according to which numbers were represented by dots arranged in symmetrical patterns. The 'holy tetractys' (স্তূপাকৃতি বিন্দু-দশক) by which the later Pythagoreans used to swear, was a figure of this kind representing the number 10 as the triangle of 4.

.
. .
. . .
. . . .

"Holy tetractys" "পবিত্র দশক" এই বচনটির অন্তর্ভূত 'Holy' বিশেষণের প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে উপরি-উক্ত লম্বা-চওড়া কথাটির মুণ্ড—অর্থাৎ 'The scientific doctrines of the Pythagorean school have no apparent connection with the religious mysticism of the society' এই বক্তৃতা-মুণ্ড বৃন্তচ্যুত তাল-ফলের ন্যায় ধরাবলুণ্ঠিত হইতে বাকি রহিল না। পণ্ডিতচূড়ামণি যদি আপনার জেদ্ বজায় রাখিবার জন্য এইরূপ বলিবার উদ্যোগ করেন যে,'later Pythagorean'-দের কথা স্বতন্ত্র, আর Pythagorasএর নিজের কথা স্বতন্ত্র, তবে তাহা তিনি বলিতে পারেন না এইজন্য—যেহেতু একটু পূর্ব্বে তিনি আপনিই বলিয়াছেন An unimpeached tradition carries back the Pythagorean theory of numbers to the teaching of the founder himself. সুতরাং তাঁহার আপনারই কথা-মতে এইটিরই সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী যে, later Pythagoreanদিগের দশক-ভক্তির Tetractys-ভক্তির আদিগুরু Pythagoras স্বয়ং। পুনশ্চ, পণ্ডিতচূড়ামণি এই যে একটি কথা বলিয়াছেন—যে, Recent investigators have shown that the discoveries attributed to Pythagoras connect themselves with a primitive numerical symbolism, according to which numbers were represented by dots arranged in symmetrical patterns, ইহাতে প্রকারান্তরে এই সত্য কথাটি বলা হইয়াছে that the discoveries attributed to Pythagoras প্রকৃত পক্ষে Pythagorasএর নিজের নূতন আবিষ্কার নহে, পরন্তু তাহা এক রকমের primitive numerical symbolism হইতে ধার করিয়া পাওয়া। পণ্ডিতচূড়ামণি সাবধানী কম না! পাছে কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়ে—এই ভয়ে তিনি—ঐ primitive symbolism ব্যাপারখানা যে, কী, সে বিষয়টির সম্বন্ধে স্বল্পমাত্র একটিও কোনো কথা'র উচ্চবাচ্য করেন নাই। ফল কথা এই যে, সত্য দুই প্রকার—(১) সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সত্য, আর (২) ল্যাজা-মুড়া-বিহীন সত্য;—পণ্ডিতচূড়ামণির শেষোক্ত কথাটি শেষোক্ত শ্রেণীর সত্য, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। পণ্ডিতচূড়ামণির ঐ অঙ্গহীন কথাটির অঙ্গপূরণ করিয়া তাহার মৃত দেহে জীবন সঞ্চার করিতে হইলে নাড়ীজ্ঞান-শূন্য আসুরিক ডাক্তারদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নাড়ীজ্ঞান-মুখ্য দিশী কবিরাজি চিকিৎসার পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়। অতএব তাহাই এক্ষণে করা যাক্! কঠোপনিষদে আছে "লোকাদি মগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতী র্বা যথা বা" "যমরাজ নচিকেতাকে—লোকাদি অগ্নি কিরূপে চয়ন করিতে হয়—কী-রকমের কত সংখ্যক ইষ্টক কেমন করিয়া সাজাইতে হয়, তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন।" খুব সম্ভব যে, কঠোপনিষদের কালে—৫০০ হো'ক্ বা ৭০০ হো'ক্ B. C. শতাব্দীতে—বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান-উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ আকারের বেদী নির্ম্মাণের জন্য যখন বিশেষ বিশেষ সংখ্যক ইষ্টক সংগ্রহ করা হইত, তখন দৃষ্টি মাত্রেই ইষ্টক-রাজির সংখ্যা গুণিয়া পাইতে-পারিবার সুবিধার জন্য দশ দশ করিয়া এইরূপে—

. . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

ভোজ্য তণ্ডুলান্ন সাজাইবার চিরকেলে দিশী প্রথানুযায়ী

—স্তূপাকারে সারি সারি সাজানো হইত :—primitive কাগজ ছিল ভূতল, আর primitive ফুট্‌কুনি ছিল ইষ্টক ; আর, কালক্রমে এই রকম ইষ্টকদণ্ড বিন্যাসপূর্ব্বক primitive সংখ্যাগণনা-পদ্ধতিটাই দশাত্মিকা সংখ্যাগণনা-পদ্ধতিতে (decimal system of notationএ) পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এ কথাটি সর্ব্ববাদিসম্মত যে, দশাত্মিকা অঙ্কবিন্যাস-পদ্ধতি আমাদের দেশে সর্ব্ব প্রথমে বিজ্ঞানের উদয়-গিরি-শিখরে উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল! পরে তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা-সূত্রে আরব্য জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতদিগের চক্ষে পড়িয়াছিল; তাহার পরে, ইউরোপীয় গণিতবেত্তারা আরব্য বিজ্ঞান-দর্পণের মধ্য দিয়া তাহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন কি ইন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে,

"What is quite certain is that our present decimal system is of Indian origin. From the Indians it passed to the Arabians probably along with the astronomical tables brought to Bagdad by an Indian ambassador in 773 A. D.

ইন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা হইতে একটু পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, তাহার অব্যবহিত পরে পিথাগোরীয় সংখ্যা গণিতের আর একটি প্রকরণ পদ্ধতি দেখানো হইয়াছে এইরূপ :—

"The sums of the series of successive odd numbers are called 'square (সমচতুরস্র) numbers' and those of successive even numbers 'oblong (দীর্ঘ চতুরস্র) numbers', thus

(1) Square Number

৩ + ১ = ৪   ৫ + ৩ + ১ = ৯

(2) Oblong Number

৪ + ২ = ৬   ৬ + ৪ + ২ = ১২

Such a (ইটসাজানো) method of representing numbers in areas leads naturally to problems of a geometrical nature and as the practical use of the right-angled triangle was already familiar in the arts and crafts, there is no reason to dispute (?) the well established tradition which assigns to Pythagoras the discovery of the proposition that in such a triangle the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides.

ইতি ইনসাইক্লোপীডিয়ার লম্বা চওড়া লেখনীর দৌড় সমাপ্ত।

ভারতবর্ষীয় পুরাতন শাস্ত্রের একজন পাকা ডুবিরী শুল্ব-সূত্রের ভিতরে ডুব দিয়া যাহা করতলে পাইয়াছেন তাহা আমি অনতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়া চুকিয়াছি। আবার তাহা এখানে পুনরুল্লেখ করিতে আদবেই আমার মন চাহিতেছে না—বলিতেছে যে এই যে Dr Thibaut এর আবিষ্কৃত অমন একটি বহুমূল্য পুরাবৃত্ত-মুক্তা ইন্‌সাইক্লোপীডিয়ার পৃষ্ঠাপূরক ভারতান্ধ গতানুগতিক জীবদিগের সুমুখে ছড়াইবার জন্য হয় নাই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গভাষায় অতিচার

আজি-কালি বাঙ্গালা মাসিক পত্রে এক এক লেখায় অতিচার দেখিতে পাইতেছি। ইহাকে উচ্ছৃঙ্খলতা, উদ্দামতা, পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা, স্বেচ্ছাচারিতা, কিংবা অজ্ঞতা বলিতে চাহেন, বলুন। কথাটা সত্য, কেহ কেহ প্রচলিত বাঁধন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অনেককে ফাঁপরে ফেলিতেছেন। যাহারা বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়া বাঁধন ভাঙ্গিতেছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাহারা গতানুগতিক ন্যায়ে বড়-র অনুকরণ করিতেছেন, তাঁহাদেরও কথা ধরিব না। কিন্তু যাহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও সজীবতা কামনায় অতিচার করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট অতিচারের হেতু আশা করিতে পারি। কারণ অতিচারের সূত্র পাইলে অপরে তাহা ধরিলেও ধরিতে পারে, এবং গ্রাহ্য হইলে তাহা আর অতিচার থাকিবে না। তখন তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধও হইতে পারিবে। আমি কি করিতেছি তাহা দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন করিতেছি তাহাও বলা আবশ্যক। নতুবা পাঠক দিশাহারা হইয়া পড়েন।

শব্দের বানানে, রূপে, ও প্রয়োগে অতিচারের দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতে পারে। শব্দের বানানের কথা পাড়িলে কেহ কেহ এই লেখকের প্রতি উপহাস-বাণ নিক্ষেপ করিতে পারেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটু দেখিলে ভাল হয়, বাস্তবিক বানান-পরিবর্ত্তন কি অক্ষর-পরিবর্ত্তন, কোন্‌টা সত্য। আমি দুই দশটা অক্ষরের আকার-পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি; কেন করি তাহা বারম্বার বলিয়াছি। দুঃখের বিষয়, আমার সমালোচক বর্গ সে দিকে না গিয়া "বর্ণমালার অভিযোগ" শুনিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছেন। আমি বানান-পরিবর্ত্তন করি নাই, কারণ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন দেখি নাই; বিশেষতঃ বুঝি, বানান-পরিবর্ত্তনে শব্দ পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়। মুখে কি ধ্বনি প্রকাশ করি, সেটা কথা কহার সময়

বিচার্য হইলেও লেখায় অগ্রাহ্য। লিখিয়া আঁকিয়া এক এক শব্দের যে মূর্তি দি-ই, সে মূর্তির পরিবর্তনে শব্দ বুঝিতে বিঘ্ন হয়। একটা দৃষ্টান্ত দি-ই। একবার বিদ্যাসাগর-মহাশয় প্রায় সাত হাজার বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে সংগ্রহ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে "আগাস" দেখিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিয়াছিলাম, বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের দেশবাসী হইয়াও শব্দটা বুঝিতে পারি নাই। কিছুদিন পরে এক বন্ধু সে তালিকা দেখিতেছিলেন, যেমনই "আগাশ" পড়িলেন অর্থ বুঝিতে পারিলাম। রাঢ়ে গ্রাম্যজন আকাশ-কে "আগাশ" বলে, কিন্তু "আগাস" বলে না। আমার বন্ধু পড়িয়াছিলেন, আগাশ। মুখের ধ্বনির একটু আধটু অন্তরে মূল শব্দ বুঝিতে বিঘ্ন প্রায় হয় না। হইলে বঙ্গের নানাস্থানের লোকের কথাবার্তা অসম্ভব হইত। কারণ যোজনান্তে ভাষা পরিবর্তিত হয়; সে ঈষৎ পরিবর্তিত ভাষার নাম "ভাখা"।

কিন্তু শব্দের রূপ বা মূর্তি শব্দকে অ-ক্ষর করে। দুর্গার যে প্রতিমা দেখিয়া আসিতেছি, তাহা না দেখিলে দুর্গা বুঝিতে পারি না। দুর্গা না বলিয়া দুগ্‌গা বলি, বাঙ্গালী দুই-ই বুঝিতে পারে। কিন্তু দুগ্‌গা লিখিলে বোধ সহজ হয় না। দুর্গা, দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, বানান পড়িতে পড়িতে ক্রমে তিন অভিন্ন জ্ঞান হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন একটা মূর্তি শিখিলে চলিতে পারে তখন ত্রিমূর্তির উপাসনা অনাবশ্যক, পরন্তু ক্লেশকর হইয়া পড়ে।

ঠিক এই কারণে আমি কয়েকটা বাঙ্গালা অক্ষরের রূপান্তর উপস্থান করিয়াছি। যদি শ্‌ গ্‌ রু লিখিলে শু গু রু প্রভৃতি রূপ অনাবশ্যক হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত অক্ষর শিখিব কেন? যদি "দুর্গ্গা" না লিখিয়া "দুর্গা" লিখি, "স্বর্ণ" না লিখিয়া "স্বর্ণ" লিখিলে চলে, তবে "সর্ব্ব কর্ম্ম চর্চ্চা" না করিয়া "সর্ব কর্ম চর্চা" লিখিয়া পঠন-পাঠন সুগম করিব না কেন? "সর্ব্ব" স্থানে "সর্ব" একটু বানান পরিবর্তন বটে, কিন্তু সে পরিবর্তনে মূল শব্দের ব্যতিরেক হয় না, পড়িবার সময় নূতন ঠেকিতে পারে, কিন্তু বুঝিতে পারা যায়। কারণ সদৃশ রূপ জানা আছে। আমরা সাদৃশ্য অনুসন্ধান করি, অনুমোদন করি; বিশেষ-বিধি, নিষেধ, নিপাতনে প্রীত হই না। কারণ নিপাতনে শ্রমগৌরব ঘটে।

শ্রম-লাঘব সকলেরই অভিপ্রেত। এক বিষয়ে নহে; কেবল লিখনে নহে; পঠনে, অর্থগ্রহণে শ্রমলাঘব, ব্যাকরণের সূত্র-অভ্যাসে শ্রমলাঘব যিনি ঘটাইতে পারেন, তিনি ভাষায় পদাঙ্ক রাখিয়া যান, শ্রম-গৌরবে নহে। মানুষ যে স্বভাবতঃ অলস, শ্রমকাতর।

ভাষার ধ্বনির দ্যোতকের নাম অক্ষর। এক ধ্বনির একটি দ্যোতক ভাল কি মন্দ? যদি ভাল বিবেচিত হয়, তাহা হইলে নূতন ধ্বনির নিমিত্ত নূতন দ্যোতক বা অক্ষরও ভাল বিবেচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ধ্বনি-বিশেষের নিমিত্ত দ্যোতক বিশেষ নির্দিষ্ট রাখা যুক্তিযুক্ত। ক্যা লিখিয়া কখন পড়িব "কিয়া" বা "কিআ," কখন পড়িব "কা," কখন পড়িব যেমন ইংরেজী Ca-t; এই-প্রকার এক দ্যোতকের বহু ধ্বনি নির্দেশ করিলে বাঙ্গালার বানান-রীতি ইংরেজীর তুল্য দুঃসহ হইয়া উঠিবে। যাহারা বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করেন, মাতৃভাষা সুন্দর সংযত রাখিতে অভিলাষ করেন, বাঙ্গালী ব্যতীত অন্যেরও শিক্ষণীয় হউক কামনা করেন, তাঁহারা কথাটা প্রণিধান করুন।

ভাষার পরিবর্তন হইতেছে, হইবেই। প্রত্যেক অঙ্গের, শব্দের উচ্চারণে লিখনে বানানে পঠনে অর্থে প্রয়োগে পরিবর্তন হইতেছে। জগতের অপর দশটার যেমন হইতেছে, মানুষেরও তেমন হইতেছে, মানুষের চেষ্টিত ভাষারও হইতেছে। সভা বসিয়া সভ্যের মতামত গণিয়া অকারান্ত বিশেষ্য শব্দের শেষের অ কার গ্রস্ত হয় নাই; শনৈঃ শনৈঃ হইয়াছে, কেহ জানিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, বিদেশী ভাষার সম্পর্কে ও সাদৃশ্যে ভাষার যত পরিবর্তন হয়, ভিতরে ভিতরে তত হয় না। বাহ্য বলের আধান না হইলে যেমন জড়ের গত্যন্তর ঘটে না, তেমন জীবের ঘটে না, মানুষেরও ঘটে না। আমার মনে হয়, ফার্সীর প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় বহু পরিবর্তন হইয়াছিল। বোধ হয়, অকারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণ, ণ ন-কারের উচ্চারণ-সাম্য, য় র অক্ষরের তলে বিন্দু লেখা, ফার্সী-প্রভাবে হইয়াছে। ইংরেজী-প্রভাবে ভাষায় অন্য পরিবর্তন হইতেছে। কত বিরামচিহ্ন আসিয়াছে, হাতের লেখার ছাঁদ বাঁকিয়া যাইতেছে, নূতন নূতন বাক্‌পদ্ধতি প্রচলিত হইতেছে; নূতন শব্দের ত কথাই নাই। ভাষা কতক পরিবর্তন গ্রহণ করিয়াছে; কতক করে নাই। যেখানে করে নাই সেখানে সাধারণ সূত্রে বাধা দিয়াছে। ইংরেজী "কোলন" চিহ্ন বাঙ্গালায় চলিতে পারে নাই; যাঁহারা এই চিহ্ন লেখায় দিতেছেন, ছাপায় তাহা বিসর্গ চিহ্ন [ঃ—] হইয়া উৎকট দেখাইতেছে। কত পণ্ডিত লেখক "মনুষ্য-সকল," "বৃক্ষ-সকল," লিখিতেছেন, তাহা স্মরণ হইলে আশ্চর্য জন্মে। "আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়," অমুক স্থানে "পুস্তক প্রাপ্তব্য," "আপনি বাধিত করিবেন," ইত্যাদি ইংরেজীতে অনুবাদ না করিলে অর্থ বোধ হয় না। "কবিতার ভিতর দিয়া কবির চিন্তা দেখা"য় অলঙ্কার থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষাটা কি বাঙ্গালা হইল? "তাহাদের ভিতরে একজনও শিক্ষিত নহে," ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিলে কথাটা আরও হাস্যাস্পদ হয়। কারণ "ভিতর" অর্থে অভ্যন্তর (inside), "মধ্যে" নহে। "বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃতের 'মধ্য দিয়া' সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে"- ইহা ইংরেজের অনুবাদ; আ-নাড়ীর অনুবাদ। কারণ "মধ্য দিয়া" মধ্যস্থান দিয়া বুঝায়, ইংরেজী through শব্দের অর্থ বুঝায় না। আর একটা শব্দ "ব্যবহার" ইংরেজী use শব্দের স্থানে বসিতে গিয়া বঙ্গভাষার দুরবস্থা করিতেছে। কেহ কেহ ভাত কাপড় "ব্যবহার" করেন, চশমা ছাতা জুতা "ব্যবহার" করেন; শুনিয়াছি পা "ব্যবহার" না করিয়া হাতী ঘোড়া "ব্যবহার" করেন। ইঁহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় দ্রব্যের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন। কেহ কেহ মস্তিষ্কের "অপব্যবহারে" দুঃখিত; কিন্তু ভাবিয়া দেখেন না, ভাষার "অপ-ব্যবহারে" দীনা বঙ্গভাষা আর্তরব করিতে থাকেন। একথা লেখায় হয়ত সময়ের "অপব্যবহার" হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার বাক্‌পদ্ধতি ইংরেজীর মতন নহে যে একের পরিবর্তে অন্য বসিতে পারে।

ইংরেজ শিক্ষক; ইংরেজী ভাষা আমাদের দোসর হইয়াছে। ইংরেজীর অনুকরণ বুঝিতে পারি। কিন্তু যে শিক্ষক নহে, যাহার সাহিত্য পড়ি না জানি না, তাহারও ভাষার প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় পরিবর্তন ঘটিতেছে। হিন্দী ভাষা অল্পই শুনিতে পাই, শিখিয়া থাকি। তথাপি শত শত বিজ্ঞাপনে দেখি, "পুস্তকের বাঁধাই সুন্দর।" ইহা বাঙ্গালা না ইংরেজী? "বাঁধাই" বাঙ্গালা না হিন্দী? চোলাই ধোলাই সেলাই, বাঙ্গালা না হিন্দী? "আজ-কাল," "চাল-ডাল" বাঙ্গালা না হিন্দী? আজিকালি, স্বরসংক্ষেপে "আজ কাল," "চাউল ডাইল" সংক্ষেপে "চাল-ডাল" হয়। কিন্তু কে "আজ-কাল" "চাল-ডাল" বলে? আর এক শব্দ, "তামাক", দেখুন। হিন্দী তম্বাকু হইতে তামাক হয় নাই কি? বাঙ্গালায় "তামুক" শুনি। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ সব গ্রামে লোকে "তামুক" খায়; শহরের লোকে "তামাক" খায়।

এখানে শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার নহে। দেখা যাইতেছে, লোকে একটা আদর্শ ধরিয়া চলে, নিজের খেয়ালে প্রায় চলে না। আমরা শব্দের মূল

রূপের সহিত মিলাইয়া বানান করিয়া থাকি; অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তি সহজে বিস্মৃত হইতে চাই না। প্রাচীনের সহিত নবীনের যোগ যথা-সাধ্য রক্ষা করিতে চাই; মানুষের স্বভাব এই। কারণ যোগসূত্র ছিন্ন হইলে দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। হঠাৎ নূতন কিছু করা চলে না; যিনি করেন তাঁহাকে আমরা দুর্বৃত্ত কিংবা দুর্বিদগ্ধ বলি। আমরা সুবোধ কি নির্বোধ, কে জানে। আমরা কি করিয়া থাকি, তাহাই বিবেচ্য। নূতনে কিছু সুবিধা দেখিলে পরে তাহা গ্রহণ করি; কদাচিৎ সম্পূর্ণ গ্রহণ করি; কারণ নূতন যত ভাল হউক, তাহাতে অসুবিধাও কিছু থাকে।

কলহের কারণও এই। সুবিধা অসুবিধা তৌলাইতে পারা যায় না, এ মতের সে মতের সীমা ভাগ করিতে পারা যায় না। কাজেই সকলকে স্বাধীনতা দিতে হয়; যেটা সমাজের মঙ্গলকর তাহা গ্রাহ্য হয়, যেটা মঙ্গলকর হয় না, সেটা গ্রাহ্য হয় না। অতএব যাহাকে আমরা প্রথমে দুর্বৃত্ত ও বৈরী ভাবিয়াছিলাম, সে না থাকিলে মঙ্গলামঙ্গল-বিবেচনাও চলিতে পারিত না। সমালোচকের অভাব হইলে অতিচারে সমাজের ক্লেশ জন্মে। দেশে যথোচিত সমালোচনা হইতেছে না; সমালোচনা ব্যতীত ভাষা ও সাহিত্য কাম্য পথে চলে না। সত্য অথচ প্রিয় বাক্য যে সে বলিতেও পারে না।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর কয়েকটা বানানে অতিচারের দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। গত বর্ষের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের প্রবাসী-তে শ্রীবীরেশ্বর সেন মহাশয় কয়েকটা বানান বিচার করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি, ওা। বুঝিতেছি, এটি পড়িতে হইবে, ও-আ। কেন হইবে, ভাষায় কি সুবিধা হইবে, তাহা সেন-মহাশয় কিংবা প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় জ্ঞাপন করেন নাই। কাজেই ওা এই অপূর্ব মূর্তির আবির্ভাবের হেতু অনুমান করিয়া লইতে হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে সেন-মহাশয় ওা মূর্তি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। হয়ত হেতু দেখাইয়াছিলেন; এখন মনে নাই। কিন্তু মনে আছে এই দ্যোতকের প্রয়োজন কিংবা যুক্ততা বুঝিতে পারি নাই। সেন-মহাশয় আমার লিখন বলিয়া "ঢাকা-সম্মিলন" পত্র হইতে যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, বোধ হয় তাহা আমার নহে। তিনি বলেন, আমি লিখিয়াছিলাম, "ও-কারের গায়ে আকার দিয়া অশিক্ষিত লোকেরাই লিখিয়া থাকে, সুতরাং সেরূপ বানান করা কখনই উচিত নহে।" উদ্ধৃত বাক্যে "সুতরাং" শব্দটা এবং "কখন" শব্দের পরের "ই"টা আমার মনে হয় না। কারণ যুক্তিটা বালকেরও অযোগ্য।

দুঃখের বিষয়, সেন-মহাশয় এবারেও (ফাল্গুনের প্রবাসী) তাঁহার হেতু প্রদর্শন করেন নাই। লিখিয়াছেন, "বাস্তবিক ওকারের গায়ে আকার জুড়িয়া দেওয়ায় কি দোষ হয় তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে এ, ঐ, ও এবং ঔ এই চারিটি যুক্ত স্বর অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকটাই দুইটা স্বরের সংমিশ্রণ। লাটিন ভাষায়ও এরূপ সংমিশ্রণ আছে। * * তাহা হইলে বাঙ্গালায় সেরূপ বানান প্রচলনের ত কোন যুক্তিমূলক আপত্তি হইতে পারে না।"

এই কথায় বোধ হইতেছে ওা লেখা তাঁহার নিকট এত স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত বোধ হইয়াছে যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন ওা বানান বাঙ্গালায় নূতন, এবং যিনি নূতন কিছু করিতে চাহিবেন, হেতু ও যুক্তি তাঁহাকে দিতে হয়। সেন মহাশয়ের প্রদত্ত দৃষ্টান্ত এবং প্রবাসী সম্পাদক-মহাশয়ের মন্তব্য হইতে অনুমান হইতেছে, (১) (খা)ওয়া (দা)ওয়া প্রভৃতি শব্দের ওয়া স্থানে, এবং (২) আকারান্ত অন্তস্থ ব স্থানে ওা লিখিবার প্রস্তাব হইতেছে। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "ও কখনো স্বর, কখনো ব্যঞ্জন, কখনো যুক্তস্বর উচ্চারিত হইবে। প্রাচীন বাংলায় এরূপ ব্যবহার ছিল।"

আমার ভাগ্যে প্রাচীন বাংলা পুথী দেখা ঘটে নাই। স্বীকার করিলাম, প্রাচীন বাঙ্গালায় ও অক্ষরের ত্রিবিধ উচ্চারণ ছিল। কিন্তু সবাই জানি সে সে উচ্চারণ নবীন বাঙ্গালায় চলে নাই। অতএব প্রস্তাবটা নূতন ভাবিয়া বিচার করিতে হইবে। প্রথমে দেখি, "ওয়" এই ধ্বনির দ্যোতক ওা করা চলে কি না। "ওয়া" বাস্তবিক "ওআ", বঙ্গভাষার গ্রহবৈগুণ্যে আ স্থানে য়া লিখিত হইতেছে। আমরা বলি, খাও আ, লিখি খাওয়া। ওা তবে "ওআ"। আ না লিখিয়া আ অক্ষরের সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনে-যোগ-যোগ্য া লিখিবার প্রস্তাব। যে মূর্তি কেবল ব্যঞ্জনাক্ষরে জুড়িবার নিমিত্ত চলিয়া আসিতেছে, সেটা স্বরাক্ষরে জুড়িতে পারা যায় কি? যদি নূতন বিধি করা যায়, তাহা হইলে সে বিধি অন্য স্বরাক্ষরেও প্রযোজ্য না হইবে কেন? "ইউরোপ" না লিখিয়া "ইুরোপ" লিখিব কি? "আইন" না লিখিয়া "আিন" লিখিলে লোকে বুঝিবে কি? ক + ই = কি নহে, কি লেখা হয়। া ী ু ূ অক্ষর ব্যঞ্জনাক্ষরের পরে বসে; কিন্তু ি ে ৈ বামে বসে। ো ৌ ব্যঞ্জনাক্ষরের দুই পাশে বসে। বাঙ্গালার এই অবিধি সংশোধন করিতে পারিলে হয়ত অনেক সুবিধা হইত। কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র। একটা "ওআ" নিমিত্ত, সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত সাধারণ বিধি ভঙ্গ করিতে পারি না। লাভই বা কি? ওআ লিখিতে যে সময় লাগে, ওা লিখিতে কিছু কম লাগে সত্য। কিন্তু সময়লাঘব নিমিত্ত বোধ-গৌরব ঘটান কর্তব্য কি?

যদি বলেন, ওা উচ্চারণে "ওআ" নহে, হ্রস্ব ও সহিত হ্রস্ব আ যোগ করিলে যাহা হয় তাহার দ্যোতক ওা। কিন্তু, স্বরের এইরূপ মাত্রাভেদ আরও অনেক করিতে হয়। যেমন, কাল (=সময়), কাল (=কৃষ্ণবর্ণ); কালা (=বধির), কালা (=কৃষ্ণবর্ণ); ইত্যাদি। প্রত্যেক স্বরের নানা মাত্রা আছে, সব মাত্রা অক্ষরে দেখাইতে হইলে বাঙ্গালা অক্ষর অনেক বাড়াইতে হইবে।

যদি বলেন, ইহাও নহে; "সংস্কৃতে এ ঐ ও ঔ যুক্তস্বর, প্রত্যেকটাই দুইটা স্বরের সংমিশ্রণ" যেমন, ওা তেমন। কিন্তু সংমিশ্রণ কথাটা বুঝিতে পারিতেছি না। বুঝিতে পারি, "ধন-ঈশ" বলিতে বলিতে অ ঈ মিশিয়া একটা কিঞ্চিৎ পৃথক স্বর এ হইয়া পড়িত। সংস্কৃত-ব্যাকরণে সন্ধির সূত্রে জানিতেছি। কিন্তু এ এই ধ্বনিতে অ ঈ থাকিত কি? সংস্কৃত-ভাষাবিৎ কি বলেন, জানি না। কিন্তু জানি, এ স্বর উচ্চারণে কণ্ঠ ও তালুর সাহায্য লাগে। অ ই যেমন ধ্বনি এ তেমন ধ্বনি হইলে, এ ই লেখা হইত, একটা পৃথক দ্যোতক এ আবশ্যক হইত না। ও উচ্চারণ করিতেও দুই স্থানের সাহায্য আবশ্যক হয়। ঐ ঔ স্পষ্ট যুক্তস্বর। ইহাদের নাগরী অক্ষরেও সংমিশ্রণের চিহ্ন আছে। জানি না, এই অনুমান ঠিক কি না। কিন্তু জানি, বাঙ্গালায় এ একটা মূলস্বর। অ-ই মিশাইয়া পড়িতে গেলে বাঙ্গালা উচ্চারণে ঐ হয়, এ হয় না। ইহার প্রমাণ, অনেকে অই না লিখিয়া ঐ, কই না লিখিয়া কৈ, এমন কি সৈ (সই), দৈ (দই) ইত্যাদিও লেখেন। আমরা লিখি, "কৈলাস," পড়ি "কইলাস।" কত লোক যে "বউ" না লিখিয়া "বৌ" লেখেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইংরেজী ভাষায় দুই তিন স্বর মিলিত হইয়া যে এক মাত্রার স্বর

হয়, ইংরেজী ব্যাকরণ অনুসারে তাহাকে যুক্তস্বর বলে। ইংরেজীতে যুক্তস্বর আছে (যেমন oil, bean), কিন্তু যুক্তাক্ষর নাই। লাটিন ভাষায় অক্ষরও যুক্ত হইত। কিন্তু অন্য ভাষায় কি আছে কি নাই, তাহার প্রতিমান দেখিয়া বাঙ্গালা ভাষার হিসাব নিকাশ হইতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক। সংস্কৃতমূলক অন্য ভাষার দৃষ্টান্ত বরং হেতু হইতে পারিত।

বাস্তবিক, ও। দ্যোতকের প্রয়োজন দেখিতে পাইতেছি না। এটা কি ধ্বনির দ্যোতক? যদি ও আ ধ্বনির দ্যোতক হয়, তাহা হইলে ওআ এই রূপ লিখিলেই তউদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যদি সেন মহাশয়ের মতে ও আ জুড়িয়া সংস্কৃতের তুল্য একটা যুক্ত স্বর করিতে হয়, তাহা হইলে সংস্কৃতের ব্যাকরণও মানিতে হইবে, ও + আ = অবা করিতে হইবে।

বোধ হয়, এতক্ষণ অন্ধকারে ঢিলছোড়া হইল। আসল প্রয়োজন অন্তস্থ ব অক্ষরের। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও কোষ লিখিবার সময় ইহার প্রয়োজন আমাকে যত অনুভব করিতে হইয়াছে, বোধ হয় আর কাহাকে তত করিতে হয় না। প্রথমে নাগরী ব লইয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গালা সরল অক্ষরের সঙ্গে গোল অক্ষর মিশিল না। পেটকাটা ব কাহার হাতে স্বতন্ত্র, কাহারও হাতে বর্গীয় হইয়াছে। দুই বিরোধের মধ্যে না গিয়া অদ্যাপি প্রচলিত আসামী ও মৈথিলী ব অক্ষর গ্রহণ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস এক কালে আসামী মৈথিলী বাঙ্গালা ওড়িয়া ভাষা এক ছিল, এক অক্ষরও ছিল। সে ভাষার যে ভাষা ছিল না, এমন নহে। বিস্তীর্ণ দেশের বহু লোকের ভাষায় ভাষা থাকেই থাকে। বাঙ্গালা ওড়িয়ায় দুই ব আকারে ও উচ্চারণে এক হইয়া পড়িয়াছে, আসামীতে প্রভেদ কিঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়াছে, মৈথিলীতে পূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু আসামী লেখক ব লিখিয়া তলে রেখা দেন, মৈথিলী লেখক রেখা ছোট করিয়া বিন্দুতে পরিণত করেন। মৈথিলী অক্ষরে র ব পৃথক বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালায় র ব একাকার হইয়া অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতিকারের দুই পথ আছে, হয় র অক্ষরের পরিবর্তন, না হয় ব অক্ষরের প্রচলন। প্রথম কল্প ভাল, কিন্তু এখন অসাধ্য। ব অক্ষর যে উত্তম তাহা বলিতে পারি না। কারণ র ফলা দিয়া উ ঊ ঋ যোগ করিতে হইলে তির্যক রেখা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে না। যাঁহার উদ্ভাবন-শক্তি আছে, তিনি বাঙ্গালার এই অভাব মোচন করুন।

যদি কেবল ব্বা এই ধ্বনি লেখা আবশ্যক হইত, তাহা হইলে ওা -এই অক্ষরের যৎকিঞ্চিৎ সার্থকতা থাকিত। ব, বি, বু, বে ইত্যাদিও আবশ্যক হয়। তখন ওি ওু ওে লেখা চলিবে না, র ফলার র স্থানেও ও লেখা চলিবে না। আর এক কথা ওা লিখিলে লোকে হঠাৎ ত্তা পড়িবে, কারণ কেবল ব্যঞ্জনাক্ষরের গায়ে া ি ইত্যাদি বসে।

এখন "খাওয়া দাওয়া"র চর্চা করি। এই-সকল শব্দের ওয়া কেমন করিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। খা ধাতু হইতে খাওয়া, যা হইতে যাওয়া, পা হইতে পাওয়া, দি হইতে দেওয়া, নি হইতে নেওয়া, ইত্যাদি আছে। এই রূপ, হওয়া, লওয়া। অর্থাৎ স্বরান্ত ধাতু হইতে যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হয়, তাহাতে ওয়া লেখা হয়। বাস্তবিক, আ হইবার কথা। যেমন, কর হইতে করা, জান হইতে জানা। তেমন খা-আ, যা-আ, পা-আ, দা-আ, দে-আ, নে-আ, থো-আ শো-আ, হইবার কথা। কেহ কেহ শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন, আমি বাল্যকালে গ্রামে এই এইরূপ শিখিয়াছিলাম, অদ্যাপি রাঢ়ের বহু লোকে, খাআ যাআ দেআ নেআ শোআ, বলে; মাঝে ওকার আনে না। আমার স্মরণ হইতেছে, পাবনা জেলাতেও এইরূপ চলিত আছে। কলিকাতা ও বড় বড় শহর ছাড়া রাঢ়ের বহু স্থানে ও শোনা যায় না, খাআ খাআ দেআ থোআ শোনা যায়। মাঝে ও আসিবার দুই কারণ অনুমান হয়। (১) খা পরে আ মিশিয়া খা হইয়া পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় মাঝে ও বসিয়া ধাতুর আ হইতে প্রত্যয়ের আ পৃথক রাখিয়াছে। হআ, সআ, লআ, কিংবা দেআ নেআ থোআ শোআ প্রভৃতি শব্দে সে আশঙ্কা নাই; এইরূপ সচ্ছন্দে লিখিতে পারা যায়, আমরা অধিকাংশ এইরূপ বলি। অথচ যখন, দেওয়া নেওয়া, বলিতেছি, ও লিখিতেছি, তখন অন্য কারণ থাকিবে। অতএব দ্বিতীয় কারণ অনুমান করিতে হইতেছে। (২) করা জানা শোনা খাওয়া লওয়া, প্রভৃতি শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বোধ হয়। দুইশত বৎসর পূর্বে ছিল কি না সন্দেহ। বিশেষণ রূপে দুই পাঁচটা প্রচলিত থাকিলেও সাধারণ সূত্র হয় নাই। পূর্বের রূপ, করিবা, খাইবা দিইবা শুইবা, ছিল। বহু পূর্বে ছিল, করিবাকু পরে করিবাক—করিবার নিমিত্ত। অর্থাৎ ধাতুর উত্তর "ইব" প্রত্যয় হইয়া, করিবা, তাহার উত্তর নিমিত্তার্থে "কু" প্রত্যয়। অদ্যাপি ওড়িয়াতে "ইব" প্রত্যয় একমাত্র আছে, "অ" প্রত্যয় নাই। করিবাতে খাইবাতে, প্রভৃতি পদ বাঙ্গালা ভাষা হইতে উঠিয়া যায় নাই। করিবার, খাইবার, প্রভৃতি এখনও চলিতেছে। করিবা, খাইবা, প্রভৃতি শব্দের শেষে "অ", শব্দে তিন অক্ষর। বাঙ্গালা ব্যাকরণ অনুসারে এস্থলে মাঝের "ই" ক্ষীণ হইতে হইতে লুপ্ত হইয়াছে। থাকে, করবা, খাবা। এই ব উৎপত্তিতে, ব ছিল। ব-টা ব্যঞ্জন বটে, স্বরও বটে। স্বর বলিয়া উচ্চারণ সম্ভব হইল, দাঁড়াইল, করা। খাআ। কেহ কেহ পূর্বের ব ভুলিতে পারিল না, স্বরান্ত ধাতুতে ব স্থানে ও বসাইয়া পরবর্তী আ হইতে ধাতু পৃথক রাখিল। এইরূপে, খাআ খাওআ, লআ লওআ, দেআ দেওআ, শোআ শোওআ, ইত্যাদি দুই প্রকার আসিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা একটা স্বরের পরেই আর এক স্বর বসাইতে চায় না; খাওআ—ও পরে আ—পর পর দুই স্বর। এরূপ স্থলে দ্বিতীয় স্বরের গ্রহণ সরূপ য় আগম হয়। খাওআ, রূপ পরিবর্তন করিয়া, খাওয়া, হইল।

যদি এই ইতিহাস সত্য হয়, তাহা হইলে, দেআ নেআ শোআ থোআ, যেমন সচ্ছন্দে লিখিতে বলিতে পারি, তেমন, খাআ যাআ নাআ লআ হআ, ইত্যাদিও পারি। বাঙ্গালা-শব্দকোষে আকারান্ত ধাতু ব্যতীত অন্য স্বরান্ত ধাতু হইতে উৎপন্ন শব্দে ওয়া বাদ দিয়া আ লিখিয়াছি। বোধ হয় বিধি ভঙ্গ করি নাই। দুই এক জেলা ছাড়া সর্বত্র, হআ লআ নেআ দেআ শোআ, বলে। নদীয়া জেলাতেও, যাআ-আসা, আছে। দেআ শোআ, না বলিয়া কয়জন, দেওয়া শোওয়া, বলে? যদি বা বলে, মাঝের ও অনাবশ্যক।

আ স্থানে ওয়া লিখিলে ধাতুর প্রযোজক রূপ (ণিজন্ত রূপ) এত দীর্ঘ হইয়া পড়ে যে সে জন্যও ওয়া পরিবর্তে আ সুবিধাজনক মনে হয়। লই লওয়াই, খাই খাওয়াই, দি-ই দেওয়াই, শুই শোওয়াই, ইত্যাদিতে বাস্তবিক ধাতুর উত্তর আ যুক্ত হইলে প্রযোজক ধাতু হয়। কিছুদিন পূর্বে এক লেখায় পড়িয়াছিলাম, 'আর লোক হাসিও না।' 'এখানে "হাসাইও না" হইবে। ইহার বিপরীত, "দেশে ধান জন্মায়।" হইবে "জন্মে।" কারণ জন্মা ধাতু সকর্মক হইয়াছে। একারণ এ-

সকল ধাতুর আন্ত সংজ্ঞা করিয়াছি। কর্ ধাতু হইতে করা, ল ধাতু হইতে লয়া; তেমন দি ধাতু হইতে দেয়া, শু ধাতু হইতে শোয়া, আন্ত ধাতু। এই সূত্রানুসারে খা ধাতু হইতে খায়া, যা ধাতু হইতে যায়া অনুরূপ মনে করিলে দোষ হইবে না। লোক খাইয়াছে, লোক খায়াইয়াছে। ইহার পরিবর্তে খাওয়াইয়াছে অনেক বড়। দুইপাঁচটা, খাওয়াইয়াছে দেওয়াইয়াছে, লিখিতে হইলে পাতা জুড়িয়া যাইবে। যদি ওয়া স্থানে আ লিখিতে প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে ব্বা লিখিলেও চলে। "খাব্বা শেষ হইয়াছে, খাব্বাইতে দেরি আছে।"

ওয়া-র আরও ক্ষেত্র আছে। সেটা ওয়ালা প্রত্যয়। যেমন কাপড়-ওয়ালা, ফেরি-ওয়াল। ওয়ালা হিন্দী ব্বালা হইতে নবাগত; ওড়িয়াতে বালা হইয়াছে। হিন্দী ব্বালা-র মূলে আল বোধ হয়। রাঢ়ে অনেকে ওয়ালা না বলিয়া আলা বলে। কাপড়-আলা, ফেরি-আলা, ইত্যাদি। ওয়ালা পরিবর্তে আলা বলিলে লিখিলে দোষ হইবে না। শহরে হিন্দীর প্রভাব অধিক। শহরের লোক ব্বালা না বলিয়া আলায় সন্তোষ পাইবে কি না, সন্দেহ।

কিন্তু আরবী ফার্সী শব্দে এবং ইদানী বহু ইংরেজী শব্দে ব্ব আবশ্যক হয়। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কর্ণআলিশ হইতে পারে, কিন্তু ওয়ারিশ—আরিশ, হইতে পারে না, ওয়াশিংটন—আশিংটন হইতে পারে না। অর্থাৎ শব্দের আদির ব্ব ব্বা ইত্যাদি স্থানে অ আ লিখিলে ধ্বনির প্রভেদ হয়। ব্ব ব্যতীত কাজ চালাইবার উপায় নাই, এমন নহে। "উইল" দেখুন।

বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত লিখিতে হইলে ব্ব অক্ষর ব্যতীত উপরের কৌশল প্রযোজ্য নহে। সংস্কৃতে ব্ব অধিক, ব অত্যল্প। বাঙ্গালায় ব দ্বারা ব্ব-এর কাজ সারায় অনেক দোষ ঘটিতেছে। সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ বানান অশুদ্ধ হইতেছে, চণ্ডীপাঠ বাস্তবিক অশুদ্ধ হইতেছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্রের দোষ ঘোষিত হইতেছে। আমরা একটা স্বরের উচ্চারণ ভুলিয়া যাইতেছি; মফস্বল, শিখিতেছি, মফঃস্বল! সংস্কৃত-লেখক টীকাকার প্রভৃতি একটু মনোযোগী হইলে এই দোষ অল্পেই সারিয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষণীয় রহিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক বিদ্যার্থীর বানান ভুল ধরিতেছেন, কিন্তু ব ভুল উপেক্ষা করিতেছেন। ইংরেজী অক্ষরে কিন্তু ব্ব স্থানে ব লিখিলে, ব্বেদ শব্দ বেদ লিখিলে ভুল হইতেছে।

বাঙ্গালাতেও ব্ব-ফলার উচ্চারণ বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। "স্বামী" শব্দ "সামী" হইতেছে; কিন্তু ভূভারতে কেহ "সামী" বলে না। ওড়িয়াতে দুই ব একাকার হইলেও ব্ব-ফলার উচ্চারণ শুদ্ধ আছে। গ্রাম্য নিরক্ষর লোকেও "সামী" বলে না, যাহারা পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয় করিয়াছে তাহারা সচ্ছন্দে ব্ব-ফলায় ব্ব উচ্চারণ করিতেছে। বাঙ্গালা পাঠশালাতে বর্ণ-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না; শিশুকে স্বরের অ স্বরের আ, হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ, হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ, বর্গীয় জ বর্গীয় ব; অন্তস্থ য অন্তস্থ ব; মূর্ধণ্য ন দন্ত্য ন, তালব্য শ, মূর্ধণ্য ষ, দন্ত্য স, বলিতে শিখাইয়া পণ্ডিত করিয়া তুলিতেছি। শিক্ষার এমন অস্বাভাবিক পদ্ধতি চলিতে পারে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। "বিদ্বান" শব্দ "বিদ্দান" লিখিলে শিশুর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত হইতেছে; কিন্তু বেত্রাঘাত-নিবারণের উপায় করিতেছি না। আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয় যথোচিত আলোচনা করিয়াছি, এখানে পুনরুক্তি করিব না। ভাষা শিখিতে হয়; ক্ষুধা-তৃষ্ণার তুল্য আপনি শেখা হয় না। আমরা এক ব উচ্চারণে অভ্যস্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু ব্ব উচ্চারণ অভ্যাস করিতে প্রয়াস অধিক হয় না। এই অভ্যাস সহজে আনিবার প্রধান উপায় দ্যোতক প্রচলন। কোন কোন পাঠক ব্ব দেখিলে ব পাড়িতে পারেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে প্রভেদও শেখা হইয়া যাইবে।

অতএব দেখা গেল কেবল ওয়া-র সংক্ষেপে ব্বা লিখিলেই ভাষার অভাব দূর হইবে না। অন্তস্থ ব জ্ঞাপক একটা অক্ষর চাই। সেটা ব্ব করা মন্দ নয়।

য, য়, য ফলা।

বাঙ্গালী য়-ফলাও হারাইতে বসিয়াছে। বাল্যকালে পাঠশালায় ক কিঅ পড়িয়াছি, এখন পাঠশালায় শিশু ক কিঅ পড়ে না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিম্বা অন্যের বর্ণপরিচয়ে ক ক্ক পড়ে। বাক্য পক্ব, এখন বাক্ক পক্ক, হইতেছে। বিদ্বান, বিদ্যান, বিদ্দান, যাহা হউক, কোন রকমে কাজ চলিয়া যাইতেছে। কাজটা কোন রকমে চলিতেছে, সুচারু চলিতেছে না। কারণ কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষার শৃঙ্খল কাটিয়া শূন্যে উড়িয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিলেও ঘুরিয়া ফিরিয়া পিঞ্জরে প্রবেশ করিতেছেন। শিকল কাটিবার জো আছে কি? বিদ্বান না লিখিলে চলে না।

একদিকে, বিদ্যা বিদ্দা-য় দাঁড়াইতেছে, অপর দিকে "দ্যাখ দেখি এ্যাক এ্যাক অক্ষরের এক হস্ততা, চীনেম্যানের পৃষ্ঠে লম্বিত বেণীর তুল্য না হইয়া সম্মুখে সাপের ল্যাজের মতন ঝুলিতে থাকে যেন ব্যাঙ তল্লাশ করে। সাপের মুখে কার্বলিক এ্যাসিড দিলে সাপ মরিয়া যায়, কিন্তু এ্যাক্‌টিং য়্যাডভোকেট স্যার হ্যামিল্‌টন য়্যুনিভার্সিটিতে এণ্ড্রুল সাহেবকে বলিয়াছেন অ্যামোনিয়ার গন্ধে আরও উপকার হয়।" কথাটা মিথ্যা নয়, একটা নূতন ধ্বনি যেটা bat hat প্রভৃতি ইংরেজী শব্দে প্রকাশিত হয়, সেটা প্রকাশের একটা দ্যোতক আবশ্যক হইয়াছে। নতুবা অ্যা, এ্যা, য়্যা প্রভৃতি বিকট মূর্তিতে বঙ্গভাষা আচ্ছন্ন হইবে। এই ধ্বনিকে বাঁকা এ বলা যাউক। বাঙ্গালায় বাঁকা এ ছিল না, এমন নহে; অনেক স্থানে, কেবল কেন এক পেট লেপ টাকা বাঁকা বাখারি, প্রভৃতি শব্দের আদ্যস্বর বাঁকা এ উচ্চারিত হয়। কিন্তু, সে উচ্চারণ ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি; লিখিয়া দেখাইতেছি সে উচ্চারণই ভুল, প্রকৃত উচ্চারণ এ কিম্বা আ। অন্যদিকে, "ব্যবহার" শব্দ অপভ্রংশে "বেভার", "ব্যাপারী বেপারী", "ব্যঙ্গ বেঙ্গ" বহু কাল হইতে চলিতেছে। ব্যয় ব্যথা ব্যক্তি প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালীর উচ্চারণে বেয় বেথা বেক্তি হইয়াছে। কেহ কেহ নব্যশিক্ষিত, বয় বথা বক্তি, উচ্চারণ করেন, কিন্তু সেটা ভুল, বাঙ্গালার অনুযায়ী নহে। এই সমুদয় দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতেছি, বাঙ্গালায় আদ্যবর্ণের য়-ফলার উচ্চারণ এ। ঠিক এ নহে, বাঁকা এ। বাঁকা এ ধ্বনিতে এ সহিত আ মিশ্রিত হয়। যে যুক্তিতে ওা-র প্রস্তাব, সে যুক্তিতে এা হইতে পারিত।

কিন্তু, ওা দ্বারা সব অভাব দূর হইবে না, এা দ্বারাও হইবে না। শব্দের আদিতে এা বসিতে পারিত, কিন্তু ব্যঞ্জনের সহিত লাগাইতে পারা যায় না। এাসিড লেখা যাইতে পারিত, ম্এানেজার হএাট লিখিতে গেলে বাঁকা একারের ফলাত্ব লুপ্ত হইবে।

কিন্তু কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আদিতে বাঁকা একারের আকার যাহাই হউক, ম্যানেজার লিখিলে দোষ কি? প্রধান দোষ এই যে, ্যা-এই দ্যোতক য়া দ্যোতকের সংক্ষিপ্ত রূপ। কাজেই ম্যা লেখা

চলে না। "ব্যাপার" শব্দের উচ্চারণ, বিআপার। অর্থাৎ য় উচ্চারণে ইঅ। প্রতিপক্ষ বলেন, আমরা ত এমন উচ্চারণ করি না, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও করেন না। আমরা সবাই বলি "বএপার"। সেই দৃষ্টান্তে, "ম্যানেজার" লিখিতে পারি। কিন্তু ভুল করি বলিয়া সে ভুল ছড়াইতে পারা যায় কি? ভারতের মধ্যে কেবল বাঙ্গালীর এই ভুল উপহসনীয় হয় নাই কি? বাঙ্গালী কি সংস্কৃত ত্যাগ করিতে পারিবে, একটা নূতন ভাষা গড়িয়া লইবে? বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী বানান-সমস্যা লঘু করিবে না কি? তা ছাড়া, এক ধ্বনির দ্বিবিধ অক্ষর করা বাঞ্ছনীয় কি? আদিতে এ, এা, এ্যা, অ্যা, য়্যা প্রভৃতি যথেচ্ছ লিখিব, মধ্যে য়্যা লিখিব; এরূপ লেখা ভাষায় অতিচার হইবে না কি? অ্যা র বিরুদ্ধে যে যুক্তি এা-র বিরুদ্ধেও সেই। নূতন ধ্বনির নূতন দ্যোতক আবশ্যক; পুরাতন দ্যোতকের সংজ্ঞা বাঁধা আছে।

অতএব হয় নূতন অক্ষর করাইতে হইবে, নচেৎ এ অক্ষরে কাজ চালাইতে হইবে। একটিং এড্‌ভোকেট এসিড মেনেজার হেট বেট, লিখিলে ধ্বনিটা ঠিক থাকিবে না। ধ্বনি ঠিক না রাখিলে প্রথম প্রথম অর্থগ্রহ হইবে না। হেট, লেখা পড়িবার সময় হ এতে পূর্ণ এ কার চলিয়া আসে। যদি বাঁকা একার মত করি, তাহা হইলে অন্য দোষ ঘটে, এক অক্ষরের বহু ধ্বনি স্বীকার করিতে হয়। অতএব নূতন অক্ষর নির্মাণ কর্তব্য।

ভ্যাৎ, এ্যাক, ব্যাট, ঝ্যাঁ, প্রভৃতি বানান সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিতে হইবে না। এসব ভাষায় অতিচারও নহে, কুব্যচার। যাঁহাদের চিত্ত ল্যাজ, ব্যাঙ, লিখিয়া প্রসন্ন হয়, তাঁহারা ভাষা লইয়া খেলা করেন, ভাষা ও ভাষার প্রভেদ ভুলিয়া যান।

আমার ব্যাকরণের শব্দশিক্ষাধ্যায়ে বাঁকা একার জ্ঞাপক অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছিল। ছাপাখানার প্রচলিত অক্ষর লইতে হইয়াছিল। কারণ বঙ্গদেশে এক একটা অক্ষর করাইতে এক এক বৎসর লাগে। যাহা আছে, তাহা দিয়া যেমন তেমন শেষ করিতে হইয়াছিল। আমি ১ উলটাইয়া ২ লইয়াছিলাম। ইহা ব্যঞ্জনের গায়ে বসিতে পারে, কিন্তু আদৌ সুন্দর দেখায় না, ৎ বলিয়া ভ্রম হয়। এখা জুড়িয়া এমন অক্ষর চাই যাহা শব্দের আদৌ কিংবা মধ্যে বসিতে পারিবে।

বঙ্গভাষায় য় লইয়া আরও অতিচার হইতেছে। একটা সামান্য, সহজে সংশোধিত হইতে পারে। য়ুরোপ, য়ুনিভার্সিটি, লেখা চলিতে পারে না। এক সময় আমিও য়ুরোপ লিখিয়াছি। কিন্তু কোষ লিখিবার সময় জ্ঞান হইল, য় আদ্যক্ষর নাই। য আছে, য় নাই। সুতরাং য়িহুদী লিখিতে হইলে ইহুদী, য়ুরোপ লিখিতে হইলে ইয়ুরোপ লেখা কর্তব্য। ইউরোপ লেখা আরও ভাল; কিন্তু বাঙ্গালায় দুই স্বরাক্ষর পরে পরে বসে না। আমার বিশ্বাস, এই এক বিরাগে "হইআ" "হইয়া" আকার পাইয়াছে; এবং সাদৃশ্যে "করিয়া", "করিয়াছে", ইত্যাদির য় আসিয়াছে। পূর্বকালে ইয়া প্রত্যয়ান্ত শব্দ ই প্রত্যয়ান্ত ছিল; তখন ছিল "হই", "করি" ইত্যাদি অনন্তরার্থে ই। কিন্তু পরে বর্তমানকালের উত্তম পুরুষে ই বিভক্তি প্রচলিত হইল। দুই ইর মধ্যে ভ্রম হইবার আশঙ্কায় একটা ই, ইআ বা ইয়া, হইয়া থাকিবে। আসামী মৈথিলী ও ওড়িয়াতে অনন্তরার্থে ই প্রত্যয় আছে, ইআ হয় নাই। কারণ ই ক্রিয়াবিভক্তি নাই।

এখন আর এক য় আগমের দৃষ্টান্ত দিতেছি। "মা-র", না "মায়ের"? "মায়ের"—ইহা বাঙ্গালা ভাষা; "মা-র" সে ভাষার ভাষ্য, স্থানবিশেষে প্রচলিত। বোধ হয় যাবতীয় ভাষার একটা বিধি এই যে যাঁহাকে শ্রদ্ধা করি ভক্তি করি, তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে হইলে স্বর দীর্ঘ করা হয়; শব্দ দীর্ঘ না করিলে যেন অবহেলা অনাদর প্রকাশ পায়। "মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত" পাঠ যে সর্বত্র মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। বোধ হয় 'শ্রী' পরিবর্তে 'শ্রীযুক্ত' লেখার কারণ এই। কিন্তু 'শ্রী' ও 'শ্রীযুক্ত' অর্থে একই। 'শ্রী' লিখিলে যেমন সম্মান বুঝায়, 'শ্রীযুক্ত' লিখিলেও তেমন। "মা-"কে "মা" বলিয়া ডাকি; "মায়ের" কথা বলিতে গেলে কিন্তু শব্দেও শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইতে হয়। কিন্তু "মা" ক্ষুদ্র শব্দ; ইহা বাড়াইবার উপায় নাই; যদি "মায়ের" বলিতে পারি, শব্দটি একটু দীর্ঘ একটু মধুর হয়।

"মায়" পাইবার কারণও আছে। সংস্কৃত "মাতৃ" হইতে "মাই" শব্দ। মাই-এর=মায়ের। "মাতৃ" হইতে "মাতা", "মাতা"="মাআ" হইতে মাআ-এর =মায়ের। এই রূপ, ভাই-এর=ভায়ের লেখা চলিতেছে। মাতৃসদৃশ=মাই+ইয়া=মাইয়া; ই লোপে মায়া; ইহার রাঢ়ীয় বিকারে মেয়ে। এই রূপ, ভাইয়া=ভায়া; রাঢ়ীয় বিকারে, ভেয়ে, যেমন বাবু-ভায়া, বাবু-ভেয়ে।

শুধু "মাতৃ ভ্রাতৃ" সম্বন্ধে এই রূপ, তাহা নহে। "গাত্র" শব্দ হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা "গাত"; "ত" লোপে "গাঅ"। এই হেতু, "গা-র ব্যথা" হয় না, "গায়ের ব্যথা" বলিতে হয়। অর্থাৎ গাঅ-এর =গায়ের। কত+এক=কতেক; "ত" লোপে, কয়েক। "ক-এক" অপেক্ষা "কয়েক" শুদ্ধ বলা যাইতে পারে। এই রূপ, শতেক= শয়েক। "শএক" অপেক্ষা "শয়েক" লিখিলে "শত" শব্দ মনে পড়িতে পারে, অর্থে সন্দেহ থাকে না।

যাবতীয় প্রাচীন পুস্তকে "মায়ের"; কোথাও "মা-র" পাওয়া যায় না। যাঁহারা "মা-র" বলেন, তাঁহারা আ স্বর নিশ্চয় দীর্ঘ করেন। কিন্তু "মার" পাঠ আধুনিক, তাহাও অল্প স্থানে চলিত আছে। যাঁহারা "মা-র" বলেন না, যাঁহাদের মুখ দিয়া "মা-র" বাহির হইবে না, তাঁহাদের নিকট "মা-র" যে কত অবিনীত অশিষ্ট ও গর্হিত বোধ হয় তাহা অনুমান হইতে পারে। এইরূপ, বউ এর বা বৌয়ের, ঝি-এর বা ঝিয়ের। বউর, ঝির, আদরব্যঞ্জক নহে। কারণও আছে। "বউড়ী" শব্দে গৌরব ও পূজা প্রকাশ পায়; "ঝিউড়ী" শব্দেও তাই। "বধূটী" হইতে "বউড়ী"; এখানে "উ" আসিবার কারণ পাওয়া যাইতেছে। "ঝিড়ী" না হইয়া "ঝিয়ড়ী"। "ঝি" শব্দের প্রাচীন রূপ "ঝিয়", আর একরূপ "ঝিআ"। সংস্কৃত "দুহিতা" হইতে "ঝিতা", "ঝিতা" হইতে "ঝিআ", আবার "ঝিয়" অর্থাৎ ভাষা প্রাচীন রূপ সহজে ভুলিতে চায় না। "মায়ে ঝিয়ে" কথা; "মা-ঝিয়ে" কথা কদাচিৎ হয়।

ভাষার আর এক বিধি, পরে পরে দুই স্বর যেমন বসে না, তেমন দুই য় বসে না। "কথা কহায়" যেমন মিষ্ট, "কথা কওয়ায়" তেমন নহে। এইরূপ, "ভাষাতেও" যেমন মিষ্ট, "ভাষায়ও" তেমন নহে। বহু লেখক এই সামান্য কথা ভুলিয়া যান, নিজ ভাষাকে অকারণে শ্রুতিকটু করেন।

ঙ্গ ংঙ।

শ্রীবীরেশ্বর সেন মহাশয় "বাঙ্গালা" বানান অশুদ্ধ বলিয়াছেন। আমার দোষও ধরিয়াছেন। সকলেই মানিবেন, শব্দটা "বাঙ্গালা"। আমরা কিন্তু প্রায়ই বলি "বাঙ্‌লা"। অর্থাৎ মধ্যের আ লোপ করি। সেন মহাশয় বলেন যখন লোপ করি, তখন আ-দর্শন অশুদ্ধ। তিনি বলেন যখন "বাঙ্গলা" বলি, তখন "বাঙ্গালা" লিখিলে শব্দটা অশুদ্ধ হয়।

তিনি যে সূত্রের প্রচার করিয়াছেন, হয়ত তাহার শেষ দেখেন

নাই। আমরা যে শব্দ যেমন উচ্চারণ করি, সে শব্দ কি তদনুযায়ী বানান করি? ইহা একটা বৃহৎ কথা। এখানে ইহার আলোচনা করিব না। আমার "বাঙ্গালা ভাষা" পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যৎকিঞ্চিৎ করিয়াছি। একটা কথা স্মরণ করাইতে চাই। কাহার উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করা যাইবে? এই প্রশ্ন অনেকে করিতেছেন, সেন মহাশয় ইহার উত্তর দিবার পর সূত্র করিলে ভাল হইত। ইহাতেও কাজ শেষ হইবে না। যাহার কিংবা যাহাদের উচ্চারণ মানিয়া বানান করিতে হইবে, তাহার কিংবা তাহাদের কৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রচার করিতে হইবে। নতুবা অপরে সে উচ্চারণ জানিতে ও শিখিতে পারিবে না, যেখানে-সেখানে "অশুদ্ধ" লিখিয়া ফেলিবে।

আমরা অনেক শব্দের মধ্যের স্বর উচ্চারণ করি না। আমার ব্যাকরণ হইতে সূত্রটা উদ্ধার করিতেছি। "তিন ব্যঞ্জন-জাত শব্দের শেষ বর্ণে অ ভিন্ন স্বর থাকিলে মধ্যবর্ণের অ। ভিন্ন স্বর প্রায়ই গ্রস্ত বা লুপ্ত হয়।" যথা, কাটনা—কাট্‌না, চাকরি—চাক্‌রি, সরিষা—স'ষ, উলুটা—উল্‌টা, গামোছা—গাম্‌ছা। এইরূপ, বলিলে—ব'ল্‌লে, হইলে হ'লে। ইত্যাদি। [' এই চিহ্ন দ্বারা ঈষৎ উ বুঝিতে হইবে।]

এই সূত্রদ্বারা "বাঙ্গালা" হইতে "বাঙ্গ্‌লা" সিদ্ধ হইতেছে না। কিন্তু, কাঙ্গাল হইতে কাঙ্গ্‌লা উদাহরণ মনে আসিতেছে। অতএব বোধ হইতেছে বাঙ্গ্‌লা, কাঙ্গ্‌লা শব্দ ঠিক নহে। "বাঙ্গালা" ঠিক। ব্যুৎপত্তিতেও "বাঙ্গালা" ঠিক।

"বাঙ্গ্‌লা" বানান চলিত ভাষায় ঠিক। চলিত অর্থাৎ কথাবার্ত্তার ভাষায় অনেক শব্দের একটা স্বর লুপ্ত বা গ্রস্ত হয়, লিখিবার সময় কিন্তু হসন্ত চিহ্ন দেওয়া হয় না। বহু বহু শব্দের অন্ত্য অ-কার লুপ্ত হয়, কিন্তু হসন্ত চিহ্ন দেওয়া হয় না। লোক-লোক্‌, মানুষ-মা'নুষ্‌, ইত্যাদি হসন্ত উচ্চারণ শুদ্ধ; কারণ বাঙ্গালা ভাষার নিয়মে হসন্ত হয়। কিন্তু, কেহই হসন্ত চিহ্ন দেয় না। এইরূপ, যে-সকল শব্দের মাঝের ব্যঞ্জনের স্বর লুপ্ত হয়, কিংবা ব্যঞ্জনে স্বর নাই, সে-সকল স্থলেও হসন্ত চিহ্ন প্রায় দেওয়া হয় না। না দেওয়া দোষ। 'বাঙ্গ্‌লা" শব্দ লিখিতে হইলে ঙ্গ্‌ লেখা উচিত; "বাঙ্গলা" লেখা উচিত নহে। কারণ কেহ "বাঙ্গলা" বলে না, বলে "বাঙ্গ্‌লা।" "বাঙ্গালা" মূল শব্দ; অতএব "বাঙ্গালা" লেখা অশুদ্ধ হইতে পারে না। "বাঙ্গলা" অশুদ্ধ, কারণ ইহা মূল শব্দ নহে, কথাবার্ত্তার শব্দও নহে। প্রকৃত মূল, "বঙ্গাল"। বঙ্গ + আল = বঙ্গাল; বঙ্গাল + আ = বঙ্গাল। ভাষায় আ-কারের প্রতি ঝোঁক থাকাতে হইয়াছে 'বাঙ্গালা"।

সেন মহাশয় বলেন "বাঙ্গালা" লেখা উচিত নহে, কারণ 'মধ্যাক্ষরের আকারের উচ্চারণ আমরা মোটেই করি না।" তাহা হইলে থাকে "বাঙ্গ্‌লা", "বাঙ্গলা" হয় না। অতএব তিনি নিজেও সঙ্গতি রক্ষা করিতেছেন না। আরও লিখিয়াছেন, "বাঙলা শব্দটা বাংলা রূপে লেখা উচিত নহে।" কিন্তু কোথায় 'বাঙ্গ্‌লা," আর কোথায় "বাঙলা"! "বাঙলা" শব্দের কুলশীল অজ্ঞাত। শব্দটা অজ্ঞাত।

কেহ কেহ "বাঙলা," "বাঙালী" লিখিতেছেন বটে, কিন্তু নিজের ভাষার মোহে লিখিতেছেন। কারণ ঙ্গ আর ঙ এক নহে। "বাঙ্গ্‌লা," "বাঙ্গালী" শব্দ কি কারণে "বাঙ্‌লা" "বাঙালী" আকার পাইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে বহু দিন লাগিয়াছে। যে অঞ্চলে বাঙ্গালী—বাঙালী, গঙ্গা—গঙ্‌ঙা, সঙ্গে—সঙ্‌ঙে, হাঙ্গর—হাঙর উচ্চারিত হয়, সে অঞ্চলে ভাঙিয়া, রঙীন, কাঙালী, বেঙ প্রভৃতি বানান উচ্চারণ-সম্বাদী হইতে পারে, বাঙ্গালা-ভাষা-সম্বাদী হইতে পারে না।

বাঙ্গালা ভাষা ভার স্বীকার করে না। করিলে ভাষার স্থৈর্য থাকে না। তা ছাড়া, লোকবিশেষের বাগ্‌-যন্ত্রের দোষ স্বীকার করিলে ভাষা পঙ্গু হয়। অনেক স্থানে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে, গ্রাম্য-জন ড় উচ্চারণ করে না; "কাপড়"কে বলে "কাপর"। "কাপর" শব্দ ভাষা বলিয়া ভাষায় গৃহীত হয় নাই। কেহ পৈতৃক সম্পত্তি সহজে ত্যাগ করিতে চায় না। যাহা আছে, তাহার রক্ষায় যত্নবান্‌ হওয়া স্বাভাবিক।

ত ছাড়া, ঙ টা অনুনাসিক বর্ণ, অন্য ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হওয়াই ইহার ধর্ম, অন্য ব্যঞ্জনের তুল্য পৃথক্‌ আসন পায় না। সংস্কৃতে এই বিধি। প্রাচীন বাঙ্গালায় ঙ একটু স্বাধীনতা পাইয়াছিল; ম স্থানে বসিতে পারিত। যেমন, কুমার-কুঙার, গমাইনু-গোঙাইনু। "পাখী জাতি যদি হঙ পিয়া পাশ উড়ি যাঙ, সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশ"—বিদ্যাপতির এই উক্তিতেও ম্‌ স্থানে ঙ বসিয়াছে। যদি প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে সেন মহাশয় ঙ্গ স্থানে ঙ দেখাইতে পারেন, সেটা নূতন আবিষ্কার হইবে।

এখন "বাংলা" বানান দেখি। বঙ্গের বহু স্থানে অনুস্বারের উচ্চারণে ঙ আসে। ঙ আসে বলিয়া বাংলা, রং বেং, দার্জ্জিলিং, প্রভৃতি বানান চলিত হইয়াছে। মনে হইতেছে, পুরানা ইংরেজীতে Sungskrita দেখিয়াছি। ইহা প্রমাণ নহে বটে, কিন্তু বুঝিতেছি অনুস্বারের উচ্চারণে গ্‌ শুনিয়া ইংরেজী বানানটা হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষার দিনে অনুস্বারের উচ্চারণ কি ছিল, তাহা জানি না। পুরীর বেদ-বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক মহাশয় বেদের প্রাতিশাখ্য হইতে এক সূত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, বৈদিক সংস্কৃতে অনুস্বারে গ্‌ শুনিতে পাওয়া যাইত। [আমার বাঙ্গালা ভাষা পুস্তকের প্রথম ভাগের ১০০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।] তাহা হইলে "বাঙ্গ্‌লা" স্থানে "বাংলা" লেখা অশুদ্ধ অর্থাৎ নূতন বলিতে পারা যায় না।

সেন মহাশয় বলেন, "সংস্কৃত অনুস্বারের উচ্চারণ মোটেই সুসাধ্য নহে।" কে জানে, এক কালে নিশ্চয় সুসাধ্য ছিল। এখন আমাদের সুসাধ্য না হইলেও অনুস্বার-বর্জ্জন করা চলিবে না। সমস্ত রাঢ়ে অনুস্বারের উচ্চারণে ঈষৎ গ্‌ শুনিতে পাই। দুই পাঁচটা শব্দে গ্‌ বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু, বাংলা, রং, প্রভৃতি শব্দে পারা যায়।

ইহা প্রচলিত উচ্চারণের কথা। অনুস্বারের উচ্চারণ কি হওয়া উচিত, কিংবা ইহার প্রাচীন উচ্চারণ কি ছিল, সে কথা নহে। অনেক সংস্কৃত ধাতুপাঠে কেবল ন দেখিতে পাই, অনুস্বার পাই না। ইহাতে বোধ হয় কোন কোন ব্যাকরণের মতে সংস্কৃতের অনুস্বারের উৎপত্তি ন্‌। "অংশ" শব্দ "অনশ" ধাতু হইতে, "বঙ্গ" শব্দ 'বনগ" ধাতু হইতে, "দম্ভ" শব্দ দনভ" ধাতু হইতে, লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হইতেছে শব্দের এক অনুনাসিক ন স্বীকৃত হইত। ম্‌ স্থানেও যে অনুস্বার হইত, তাহা বলা বাহুল্য। ওড়িয়া উচ্চারণে, অংশ, কংস, প্রভৃতি অন্‌শ, কন্‌স, শোনায়। কেহ কেহ অনুস্বারের স্থানে ঙ উচ্চারণ করে। বোধ হয় বাঙ্গালাতেও পূর্ব্ব কালে ঙ উচ্চারণ হইত। ইহার প্রমাণ পাঠশালায় পাই। যেখানে, ংয, ংর, ংল ইত্যাদি সেখানে হইত, ঙ্‌য, ঙ্‌র, ঙ্‌ল ইত্যাদি। কিন্তু ইহা অন্য কথা।

দেখা গেল, "বাঙ্গ্‌লা" স্থানে "বাংলা" লেখা গায়ের জোর বলিতে পারি না। কারণ বাঙ্গালায় অনুস্বারের উচ্চারণে ঈষৎ গ্‌ আসে। যে যে স্থানে আসে না, সে সে স্থানে স্পষ্ট ঙ্গ স্থানেও আসে না। "বাঙ্‌লা" লেখা গায়ের জোর, কারণ "বাঙ্গলা" শব্দে গ্‌ আছে।

"বাঙ্গালী" শব্দ তেজোব্যঞ্জক, "বাঙালী" যেন নাকালী—মেয়েলী-মেয়েলী শোনায়। আশ্চর্য এই, ইহার সংক্রামতা গুণ আছে। দশ পনর বৎসরের মধ্যে বহু লেখককে আক্রমণ করিয়াছে। হয়ত ইহাতে বাঙ্গালা ভাষা একটু মধুর হইতেছে; কিন্তু তেজের সহিত মাধুর্য যুক্ত না হইলে পুরুষোচিত হয় না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কষ্টিপাথর

আর্টের আধ্যাত্মিকতা।

কলাবিদ্যার সহিত ধর্ম্মজীবনের কোন স্বাভাবিক বিরোধ আছে কি? পিউরিটানগণ (Puritan) কাব্যসঙ্গীত বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহুদির ধর্ম্মশাস্ত্রে (Talmud) মানুষ হউক দেবতা হউক কাহারও প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা একেবারে নিষেধ। প্লেটো তাঁহার আদর্শ মনুষ্যসমাজে (Republic) কবিকে আসন দিতে চাহেন নাই। আধুনিক জগতেও কাব্যে সঙ্গীতে চিত্রে ভাস্কর্য্যে আমরা চাহিতেছি Idealism, অর্থাৎ যাহা উচ্চভাবের উদ্বোধক—যাহা অধ্যাত্মবোধের সহায়, ধর্ম্মজীবনের উদ্দীপক। ইহসর্ব্বস্ব যে চারুকলা তাহা ছাড়িয়া আমরা চাহিতেছি সেই কলা যাহা ভগবানের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করাইয়া দেয়। মানুষের অধোমুখী প্রবৃত্তিসকলের মূর্ত্তি যে কলা ফুটাইয়া তুলে তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে চাহিতেছি উচ্চতর মহত্তর শুদ্ধতর প্রেরণার চিত্র।

অধ্যাত্ম-বিদ্যাই পরাবিদ্যা, আর সব অপরাবিদ্যা। ধর্ম্মজীবনই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র স্পৃহনীয় বস্তু। ইহাই যদি সত্য, তবে যে বস্তু ধর্ম্মের সহায়, মানুষ শুধু তাহাই চাহিবে—ধর্ম্মের যাহা পরিপন্থী তাহা হইতে মানুষ দূরে থাকিবে। সকল অপরাবিদ্যা সেই এক পরাবিদ্যারই সোপানস্বরূপ সৃজন করিতে হইবে। জগতের যদি কিছু মহিমা বা সৌন্দর্য্য থাকে তাহা ভগবানে, তাই অপরাবিদ্যার সার্থকতা একমাত্র পরাবিদ্যার অনুগত হইয়া। এই সূত্রটি আমরা আজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছি। কিন্তু এই সূত্রটি কতদূর সত্য, ইহার প্রকৃত অর্থই বা কি?

প্রথমেই আমরা বলিতে চাই চারুকলা বা আর্টের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। ভগবৎ-উপলব্ধিতে এক রস, বিষয়সম্ভোগে আর এক রস। শিল্পী এই দুই বিষয়ের যে কোনটি লইয়া এক রসপূর্ণ সৃষ্টি করিতে পারেন। বিষয়-সম্ভোগের চিত্র ধর্ম্মজীবনের পক্ষে হানিকর হইতে পারে, কিন্তু শুধু রসসৃষ্টির দিক দিয়া দেখিলে তাহার মূল্য যে কম হইবে এমন বাধ্যবাধকতা আছে কি? প্রতিপক্ষ উত্তরে বলিবেন ভগবানই একমাত্র পূর্ণরসের আধার। সাধারণ জাগতিক জীবনে রসের বা সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু সে রস সে সৌন্দর্য্য ভগবানেরই অংশ বা ছায়া, বেশীর ভাগই তাহা বিকৃত অংশ বিকৃতছায়া মাত্র। বিষয়-সম্ভোগের কাহিনী অতি মনোমুগ্ধকর হইতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে যদি এমন কিছু না পাই যাহা ভগবানের দিকেই আমাদের দৃষ্টি পরিচালিত করে, তাঁহারই রসমূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলে, তবে রসসৃষ্টির দিক দিয়াও উহার পূর্ণ সার্থকতা নাই। যেমন-তেমন ভাবে রসসৃষ্টি করিলেই যদি আর্ট হয়, তবে শিল্পী যে-কোন বিষয় লইয়া যে-কোন প্রকারে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠরস, রসের পূর্ণতা যদি কিছু দেখাইতে চাহেন, তাহা হইলে শিল্পী যেন ভগবানকেই বাক্যে, শব্দে, চিত্রপটে, প্রস্তরখণ্ডে ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু সমস্যা হইতেছে ভগবান কি, ভগবানের রসমূর্ত্তিই বা কি? ভগবান বলিলে একটা নির্দ্দিষ্ট অবিকল্প বস্তুবিশেষ বুঝায় না। ভগবানের বহুমূর্ত্তি—কে যে কতভাবে দেখিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রথমেই তাই আমাদের সন্দেহ আসিতে পারে, সাধুর ভগবান ও শিল্পীর ভগবান কি একই, না উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? সাধু যে চক্ষে ভগবানকে দেখেন, শিল্পী ভগবানকে সেই চক্ষে নাও দেখিতে পারেন। সাধু ভগবানের যে রসমূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন, শিল্পী ঠিক তদ্রূপ পূর্ণভাবেই অন্য এক রসমূর্ত্তির পরিচয় পাইতে পারেন।

বস্তুতঃ সাধু বা ধার্ম্মিক দেখেন সেই ভগবান যিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ—ইহলোকের প্রেরণাদি যাহাকে কলঙ্কলিপ্ত করে না। মানুষে যে মলিনতা, যে ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ, যে স্থূলত্ব দেখিতে পাই, সে সকলের নিতান্ত অভাব যেখানে, শুধু সেইখানেই সাধুর ভগবান প্রকট। জগতের সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক লীলার পশ্চাতে, জগতের সকল পাপ হইতে মুক্ত মঙ্গলময় এই ভগবানকেই যে শিল্পী লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই শিল্পীই তাঁহার কাছে প্রকৃত শিল্পী। সাধুর কাছে সেই শিল্পীরই আদর মানুষকে যিনি দুঃখদৈন্য ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের অতীত করিয়া এক মহত্ত্বের আভায় রচিত করিয়াছেন। সাধুর কাছে ভগবান সদাচারী মুক্তপুরুষ হইলেও হইতে পারেন; শিল্পী কিন্তু তাঁহাকে শরীর মন প্রাণের দাস বলিয়াও জানে। ত্যাগের মধ্যে, শুচির মধ্যে সাধুর আনন্দ—শরীরের ভোগের মধ্যে, এমন কি যাহাকে আমরা অশুদ্ধভোগ বলি তাহার মধ্যেও যে আনন্দ রহিয়াছে, সে আনন্দ যে ভগবানেরই আনন্দ, তাহা যে হীনতর নয়, ইহা শিল্পীই দেখাইতে পারেন; এইখানেই শিল্পীর শিল্প। শান্ত শুদ্ধ আনন্দে সাধু যদি ডুবিয়া থাকেন, নরজীবনের উদ্বেলিত স্রোতের মধ্যেই শিল্পী যে অমৃতরস পাইয়াছেন তাহা যদি তিনি উপভোগ না করিতে পারেন, তবে ভগবানকে তিনি খণ্ডীকৃত করিয়াই দেখেন নাই? মানুষের মহত্ত্ব, উদারতা, অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে ভগবান আছেন, আবার মানুষের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, ইন্দ্রিয়পরতার মধ্যেও সেই একই ভগবান। সাধু চাহেন প্রথমটি। শিল্পী কিন্তু দুইটিকেই সমানভাবে সত্যরসপূর্ণ করিয়া দেখাইতে পারেন।

সাধু ও শিল্পীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এক নহে। সাধু এবং সংস্কারক জগৎকে মানুষকে একটা বিশেষ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহেন। সতীধর্ম্ম, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি এইরূপ এক একটি আদর্শ। সাধু চাহেন জগতে সকল স্ত্রীই চিরকাল সতী হইবে, সকল মানুষই সত্যবাদী হইবে। অসতী স্ত্রীর চিত্র, মিথ্যাচারী মানুষের চিত্র তাই তিনি দেখিতে ও দেখাইতে চাহেন না। কারণ উহা মিথ্যাচারকে, অসতীত্বকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। চাহি না যাহা তাহা বাস্তব জীবনেও যেমন চাহি না, সেইরূপ শিল্পকলাতেও তাহাকে চাহি না, কোনক্ষেত্রে কোথাও তাহাকে চাহি না। শিল্পী কিন্তু বলেন, না চাহিতে পারি বটে, কিন্তু যাহা পাইতে চাহি না, হইতে চাহি না তাহার মধ্যেও ভগবানের, অনন্তের অনন্তমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি, তাহার মধ্যেও সত্যবস্তু রহিয়াছে, তাহারও "কেন" "কি" আছে, আমি তাহা বুঝিব, লোকচক্ষে ধরিয়া দেখাইব। পাপ না চাহিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া উহার প্রতি অন্ধদৃষ্টি হইব কেন? বাস্তব জীবনে না হয় পুণ্যবানই হইলাম, জগতে পুণ্য প্রতিষ্ঠা করাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়। কিন্তু পুণ্যবান হইয়াও পাপের মধ্যে কি খেলা কি উদ্দেশ্য কি তত্ত্ব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিরত থাকিব কেন? বৃদ্ধ হইতে কেহ চাহে না। চিরযৌবন পাওয়াই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেবগণ চিরযুবা। কিন্তু সেই জন্য বলিতে হইবে কি বৃদ্ধত্বে কোন সত্য নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই?

না, বৃদ্ধকে শুধু এই ভাবেই আঁকিতে হইবে যাহাতে লোকের মনে বৃদ্ধত্বের উপর একটা ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা জন্মায়, যাহাতে বৃদ্ধত্বকে ছাড়িয়া লোকে যৌবনের উপরই অধিকতর আকৃষ্ট হয়?

অতএব আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিল্পী তাঁহার শিল্পকে নিয়োজিত করেন না; সে আদর্শ যতই মহান হউক না কেন। আদর্শ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কোন্ আদর্শ কোন্ যুগে ফুটিয়া উঠিয়া জগতের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে সেই অনুসারে শিল্পী তাঁহার প্রতিভা প্রচালিত করেন না। আর্ট দেশকালের অতীত। শিল্পী দেখেন শুধু চিরন্তন সত্য। উদাসীনভাবে ধ্যান করেন পাপপুণ্যে, ক্ষুদ্রে বৃহতে, অন্যের মধ্যে কল্যের মধ্যে ভগবানের বিচিত্র সত্তা। তাহাই তিনি ফলাইয়া লোকের নয়নগোচর করান। জগতের কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনকল্পে শিল্পীর শিল্প পরম সাহায্যকারী হইতে পারে, কারণ তিনি সেই উদ্দেশ্যটির সত্য সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতে সক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু এই কর্ম্মেই যদি শিল্পী আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন তবে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধই থাকিবে, জগতের রহস্য অনেকখানি আবরিত রহিয়া যাইবে, ভগবানের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যে যে কত রস উৎসারিত হইতেছে তাহার কোনই আস্বাদ পাইব না।

আর্টের বিচারকালে এই অনন্তরসবোধের কথা অনেক সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই। তৎপরিবর্ত্তে সাধুর ন্যায় ভগবানের এক বিশেষরূপ কল্পনা করিয়া, কখন বা ধার্ম্মিকের ন্যায় নৈতিক কল্যাণের মানদণ্ডদ্বারা আমরা আর্টের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাই। সামাজিক বা রাজনৈতিক মঙ্গলসাধনেও আর্টকে সময়ে সময়ে নিযুক্ত করি। মনুষ্যজাতির উন্নতির দিক দিয়া, ব্যবহারিক হিসাবে, দেশকালপাত্র হিসাবে ভগবানের এক বিশেষ মূর্ত্তির আরাধনা প্রয়োজন হইতে পারে। সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক কল্যাণসাধনেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু এসকল কিছু আর্টের অন্তরঙ্গ কথা নয়।

আমর বলিয়াছি আর্টের মূল কথা হইতেছে চিরন্তন অনন্ত সত্য। এই সত্য হইতেছে বৃহৎ—সর্ব্বত্র বিস্তৃত। চক্ষুর কাছে যাহা সুন্দর বা অসুন্দর, সংস্কারের কাছে যাহা প্রিয় বা অপ্রিয়, বুদ্ধির কাছে যাহা ভাল বা মন্দ, সেই সকলের মধ্যেই একটা নিগূঢ় সত্য রহিয়াছে। বস্তুর যে গুণ, যে নিজস্বত্ব, যে বৈশিষ্ট্য, জগতের রঙ্গমঞ্চে তাহাকে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সেই বস্তুর সত্য। এই সত্যটিই নিত্য, ইহাই রসপূর্ণ—এই জিনিষটকেই শিল্পী দেখাইতে চাহেন। জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান, ধার্ম্মিক সংস্কারক বা সাধুর কাছে সে সমস্তই মঙ্গলকর প্রিয় বা সুবিধাজনক না হইতে পারে। কিন্তু কিছুই নিতান্ত অসত্য নয়। একটা কিছু সত্যপ্রাণকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক বস্তু প্রকাশিত হইতেছে। এই সত্যটিই তাহার আনন্দ-ঘন-স্বরূপ, ইহাই তাহার সৌন্দর্য্য, ইহাই তাহার মধ্যে ভগবান। শিল্পীর লক্ষ্য এই ভগবান। সাধুর বিরাট বৈরাগ্য ফুটাইয়া তুলিতে শিল্পীর যেমন কৃতিত্ব, কর্ম্মীর কর্ম্মপিপাসা ফুটাইয়া তুলিয়া তাঁহার ঠিক সেই একই কৃতিত্ব। কোন নিকৃষ্টভাব দেখাইয়াও তাঁহার মর্য্যাদার কোন হানি নাই। প্রকৃত অধ্যাত্মের সহিত আর্টের কোনই বিরোধ নাই। বরং অধ্যাত্মই আর্টের জীবন, তাহার প্রথম ও শেষ কথা। অধ্যাত্ম অর্থ আত্মা-সম্বন্ধীয়। যোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার যোগে। ভোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার ভোগে। যোগীর যোগিত্ব, ভোগীর ভোগিত্ব, দেবের দেবত্ব, পশুর পশুত্ব প্রকটিত করিতে পারিলেই শিল্পীর শিল্পের পরাকাষ্ঠা। এই হিসাবে শিল্পীই প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী। করুণা-বতার ভগবান তথাগতকে শিল্পী আঁকিয়া দেখাইতে পারেন। তাই বলিয়া রুদ্র-আত্মা নাদির সাহের প্রতিমূর্ত্তিকে শিল্পজগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে কেন? কালিদাস আদিরসের অধ্যাত্মচিত্র দিয়াছেন। এই চিত্র যদি পাঠকের মনে আদিরসের ভাব জাগাইয়া তুলে তাহাতে কালিদাসের দোষ কি? কালিদাসের উদ্দেশ্যই ত এই ভাবটিকে গোচর করিয়া ধরা। মানুষের পক্ষে কোন অবস্থায় এই ভাবটি ধর্ম্মসাধনের বাধাস্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু সেই জন্য উহা যে মূলতঃ অসত্য বা অসুন্দর তাহা কে বলিবে?

নগ্ননারীর চিত্র আমাদের চক্ষুকে যে পীড়িত করে তাহা শুধু আমাদের নীতিবোধের জন্য নহে, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের জন্যও বটে। কারণ সচরাচর যে চিত্র দেখি, তাহা চিত্র নয়, ফটোগ্রাফ মাত্র, প্রকৃতির স্থূল নকল। অসুন্দর কাহাকে বলি? অসুন্দর তাহাই যাহা বস্তুর বাহিরের চেহারাটি শুধু দেখায়, বস্তুর অন্তরের রহস্যটি যাহা বুঝাইয়া দিতে পারে না। ফটোগ্রাফ কুৎসিত. তাহা নগ্ননারীরই হউক আর সাধুপুরুষেরই হউক। কারণ ফটোগ্রাফে নগ্ননারীই দেখি, নগ্ননারীত্ব দেখি না, সাধুপুরুষের জটাবল্কল দেখি কিন্তু সাধুত্বের ব্যাখ্যা পাই না। আর্টের দিক দিয়া বিচার করিলে বটতলার উপন্যাস যেমন কুৎসিত, রবিবর্ম্মার দেবদেবীর মূর্ত্তিও ঠিক তেমনি কুৎসিত। শুধু শরীর যেখানে, শরীরের পশ্চাতে গভীরতর কোন সত্যের মধ্যে শরীরের অর্থটি যেখানে পাই না, সাধুর অতী-ন্দ্রিয়পরতা, নীতিবাদীর শ্লীলতাবোধের দিক হইতেও যেমন তাহা হেয়, শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধের দিক হইতেও তেমনি।

উলঙ্গ রমণীর আত্মার কথাটিকে ব্যক্ত করিয়া যে শিল্পী উলঙ্গ রমণীর চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনি উলঙ্গ রমণীকে দুষ্ট দৃষ্টি দিয়া দেখেন নাই, সাধুর দৃষ্টি দিয়াও দেখেন নাই; তিনি দেখিয়াছেন ঋষির দৃষ্টি দিয়া, তিনি উলঙ্গ করিয়াছেন ভাগবত এক সত্য। অপরে মনের খেলার দাস হইয়া বলিতেছে, ইহা শুদ্ধ, উহা অশুদ্ধ, ইহা পুণ্য, উহা পাপ। কিন্তু ঋষিকল্প শিল্পী দেখিতেছেন, সত্য কি? বস্তুর নিগূঢ় তথ্য কি? কোথায় রসের সহস্রধারার উৎস?

কবি যিনি দ্রষ্টা যিনি তিনি সৃষ্ট করেন সিদ্ধ অবস্থার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া। এ ভাব ভাল-মন্দ শুদ্ধ-অশুদ্ধ মঙ্গল-অমঙ্গলের অতীত। সিদ্ধের পূর্ণ সত্যানুভূতি অপরিণত সাধকের পক্ষে তাহার সাধনের দিক দিয়া দেখিলে সকল সময়ে স্পৃহনীয় না হইলেও হইতে পারে। তবুও সিদ্ধেরই অনুভূতি প্রকৃত সত্য। সাধকের জন্য যে সত্য তাহা ক্ষণিক, সাময়িক, তাহার মূল্য সার্ব্বজনীন অথবা চিরন্তন নহে। কবির কথা সিদ্ধপুরুষের কথা। সাধন অবস্থার কোন মানদণ্ড লইয়া সে কথা বিচার করিতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া আবার এসব কথা যে সাধকের কাছ হইতে লুকাইয়া রাখিতে হইবে, সাধককে এ সকল বিষয় হইতে যে দূরে দূরে রাখিতে হইবে তাহারও আবশ্যকতা কিছু নাই। উলঙ্গ নারীর চিত্র আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে। কিন্তু সেই জন্য উহাতে যে সত্য যে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহার উপভোগ হইতে বিরত থাকিব কেন? ইন্দ্রিয়কে দমনে রাখিতে যাইয়া ইন্দ্রিয়ের সত্যভোগকে নির্ব্বাসিত করিব কেন? ইন্দ্রিয়ের যে বাহ্যবিক্ষোভ তাহার ভয়ে ইন্দ্রিয়ের দেবতাকে অস্বীকার করা সত্যানুভূতিরই অন্তরায়।

কিন্তু সাধনার দিক হইতেও আর্টের যে মূল্য নাই এমন নহে। তবে শিল্পীর পথ ও সাধু বা ধার্ম্মিকের পথ এক নহে। সাধুর পথ 'ইহা নয়' 'ইহা নয়', শিল্পীর পথ 'ইহাই', 'ইহাই'। সাধু চাহেন ইন্দ্রিয়কে দমনে রাখিয়া, ইহাকে দূর করিয়া শুধু অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে অথবা ইন্দ্রিয়ের কোন এক নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী বা প্রকরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে। শিল্পী চাহেন ইন্দ্রিয়ের বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অতীন্দ্রিয়কে

বোধ করিতে। আচার নিয়মের মধ্য দিয়া সাধু ধর্ম্মজীবন গঠিত করিতে চাহেন; শিল্পীর আচার নিয়ম নাই। প্রথম হইতেই তিনি আপনাকে মুক্ত বলিয়া মানিয়া লন। এই শ্রদ্ধাটুকু সর্ব্বদার জন্য ধরিয়া রাখিলে জীবনেও তিনি মুক্তসিদ্ধ হইতে পারেন। সাধু তাঁহার সাধুত্বের, ধার্ম্মিক তাঁহার ধর্ম্মশীলতার পরিমাপ করেন কোন্ বিষয়ে কোন্ বস্তুতে তাঁহার মতি বা অমতি, সেই বিষয় সেই বস্তুর রূপ বিচার করিয়া দেখিয়া। শিল্পী কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচনে মনোযোগ দেন না। তিনি জানেন বিষয়ে কিছু দোষ নাই। তিনি দেখেন শুধু তাঁহার অন্তর, তাঁহার সহজ সত্য প্রেরণা ও সেই অনুসারে যে বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন তাহা হইতেই সত্য সুন্দর মঙ্গলকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন। আচরণ, উদাহরণ, শিক্ষা, ব্যাপার সাহায্যে সাধু ধর্ম্মের সহিত, অধ্যাত্মের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে চাহেন, শিল্পী কিন্তু চাহেন শুধু ভাবের মধ্য দিয়া। ম্যাডোনার (Madonna) ছবিই তুমি অঙ্কিত কর, আর বারনারীর ছবিই অঙ্কিত কর, তোমার বিষয়টির কোন প্রকৃতিগত দোষ নাই। প্রশ্ন শুধু, সত্যভাবটিকে পাইয়াছ কি?

আর্টের প্রভাব প্রসার সূক্ষ্ম। স্থূলপ্রকৃতি আমরা তাহা সহজে অনুভব করি না। আমরা চাই স্থূলপ্রভাব—স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া না দিলে আমরা বুঝি না, লাঠৌষধি না হইলে আমাদের চৈতন্য হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের তাই সৃষ্ট হইয়াছে। আর্টের মধ্যেও তাই নীতিবাদ প্রভৃতি মতবাদ প্রবেশ করাইতে চাহিতেছি। নীতির প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে পারে, মানুষের স্থূলভাগটির পরিবর্ত্তনের সাহায্যের জন্য। কিন্তু মানুষের সূক্ষ্ম যে অন্তরের প্রকৃতি, তাহার অধ্যাত্মসত্তা কোন দিনই নীতির দ্বারা প্রবুদ্ধ হইবে না। আর্ট হইতেছে দৃষ্টির Revelation। এই দৃষ্ট বস্তুর অন্তরতম রহস্যের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবেই আমাদের এক সহজ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। অনেক সময়ে অজানিত ভাবেই আর্টের সাহায্যে বস্তুর প্রাণের সহিত আমরা মিলিত হইয়া যাই। এই সম্বন্ধই রসের সম্বন্ধ। ইহাকেই ধর্ম্মসাধনের ভাষায় ভগবৎপ্রসাদ নামে অভিহিত করিতে পারি। এই ভগবৎপ্রসাদ যিনি পাইয়াছেন, ব্যবহার-শাস্ত্রের, এমন কি সাধনারই বা তাঁহার প্রয়োজন কি? এই ভগবৎপ্রসাদের ফলে শিল্পী সহজেই কৃচ্ছ্রসাধনা ব্যতিরেকে, ভোগের মধ্য দিয়া, ইন্দ্রিয়লীলার সত্য সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে করিতেই নির্ম্মল শুদ্ধচিত্ত, আধ্যাত্মিকভাবে পরিপ্লুত হইতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে আর্ট ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই—ধর্ম্ম অর্থে নৈতিক আচার-বিচার বা সাধুজীবন না বুঝিয়া, বুঝি যদি সত্যধর্ম্ম, যাহা অধ্যাত্মদৃষ্টিগোচর। আত্মার সহিত পরিচিত হওয়াই যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য, আর্টেরও তবে উহাই লক্ষ্য। অধ্যাত্মদৃষ্টি আত্মাকে দেখিতে যাইয়া যদি আবার শরীরকে অথবা শরীরের কোন ভাগকে বাদ দিয়া না রাখেন, তবে শিল্পীও স্বচ্ছন্দে শরীরমধ্যে সকলরূপে আত্মার মহিমাকে বর্ণে শব্দে বাক্যে প্রস্তরফলকে মূর্ত্তিমান করিয়া পরম আধ্যাত্মিকতারই কাজ করিবেন।

(নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ) শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

হিন্দুজাতি ও শিক্ষা

(সমালোচনা)

ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার কাহিনী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পর্য্যন্ত। প্রণেতা শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, ডি। প্রকাশক শ্রীশ্রীকালী ঘোষ। ৫৬ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম ভাগ মূল্য ১৲ টাকা, দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ১৲ টাকা। দুই ভাগে ৬৩২ পৃষ্ঠা।

লেফ্‌টেনেণ্ট-কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তাহার মত একটি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইহাতে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পর্য্যন্ত বাঙালী হিন্দুদের শিক্ষার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ভারতীয় অন্যান্য হিন্দুদের শিক্ষার কথা প্রসঙ্গতঃ কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙালী মুসলমান বা অন্য মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়ও তাঁহার পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নহে; সুতরাং তাহারও উল্লেখ আনুষঙ্গিক ভাবে মাত্র আছে। তাঁহার পুস্তক-প্রসঙ্গে বাঙালী বা হিন্দু বলিতে বাঙালী হিন্দু বুঝিতে হইবে।

পুস্তকখানির প্রধান বর্ণনীয় ও আলোচ্য বিষয় তিনটি (১) পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মিশনারীগণ, (২) বাঙালীর ও শিক্ষা; এবং (৩) গবর্ণমেণ্ট ও শিক্ষা। গ্রন্থকার মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, "এদেশে বর্ত্তমান শিক্ষার যে প্রচলন হইয়াছে তাহা খৃষ্টান মিশনারীগণের পরিশ্রম ও যত্নের ফল," এইরূপ ধারণা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অমূলক। শিক্ষাদান-কার্য্যে মিশনারীদের কৃতিত্ব অবশ্যই কিঞ্চিৎ আছে কিন্তু আরম্ভ বাঙালীরাই করিয়াছিল, এবং শিক্ষার জন্য শিক্ষাদান মিশনারীরা করেন নাই, "শিক্ষাবিস্তার মিশনারীগণের ধর্ম্মপ্রচারের অঙ্গমাত্র।" তাঁহারা যে "এদেশে স্কুল খুলিয়া ইংরেজী শিক্ষা দিবার কথা বলিতেন," তাহার কারণ "Because the natives considered that language is the key to their fortune." এ বিষয়ে মেজর স্কট ওয়ারিং (Major Scott Waring) লিখিয়াছেন—

'We are, therefore, by deception of the basest kind to allure the children of these Brahmins to our schools that we may shake their ill-founded ridiculous principles: but still to keep up the mark of friendly regard to their temporal interests by merely offering to teach them a language which will be the key to fortune. No disciple of Loyola ever proposed a scheme more repugnant to every principle of justice and true morality."

"১৮৩০ সালের পূর্ব্বেই মিশনারীগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এদেশের লোকেরা ইংরেজী শিখিবে স্থির করিয়াছে; নিজেরা কলিকাতা নগরে অসংখ্য ইংরেজী স্কুল খুলিতেছে ও খুলিবে, ও সহস্র সহস্র বাঙালী যুবক ইংরেজী শিখিতেছে; এ অবস্থায় এদেশের লোকদিগকে খৃষ্টান করিতে পূর্ব্বে যে পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন সে পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে।" "১৮৩১ সালে জুন মাসে কলিকাতাস্থিত সকল সম্প্রদায়ের পাদ্রী লইয়া ইউনিয়ান চাপেলে (Union Chapel) এক সভা হয়। তাঁহারা এই সভায় স্থির করেন যে ভারতবর্ষে খৃষ্টান ধর্ম্ম বিস্তারের নিমিত্ত এদেশীয় কনকতক আশাপ্রদ নেটিভকে উচ্চ ধরণের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ও সেই কারণে ইংরেজী সাহিত্য ও

খৃষ্টানী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি কলেজ খোলা আবশ্যক। ডাফ্ সাহেব বলেন "Let us so far as regards education adopt and pursue this indirect method as a means." যাহাকে এখন Scottish Churches College বলে পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল The General Assembly's Institution. তাহার সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে লেখা আছে যে ইহা ১৮৩০ সালে স্থাপিত হয়, এবং "It is the oldest institution of the kind in India." কিন্তু ইহার ১৪ বৎসর আগে বাঙালীরা নিজে হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়াছিল, এবং হিন্দু কলেজ যেমন করিয়া বাংলাদেশকে ভাঙিয়াছে ও গড়িয়াছে, এমন আর কোন কলেজ করে নাই।

মিশনারীদের শিক্ষাদানের মূলে যেমন ছিল খৃষ্টিয়ান করিবার ইচ্ছা, তেমনি আবার খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার সুবিধা পাইবার জন্য এবং টাকা যোগাড় করিবার জন্য তাহারা "নানা-প্রকার লোভ ও ভয় প্রদর্শন করিতে ছাড়িত না। বিলাতি জিনিষ বিক্রয় হইবে, ভারতবর্ষীয় লোক শিক্ষার ফলে ইংরেজভক্ত হইবে, শাসনকার্য্যের সুবিধা হইবে, এই-সকল কারণে শিক্ষাদান আবশ্যক, শিক্ষিত হইলে তাহারা খৃষ্টান হইবে।" ১৮১৩ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আবার ২০ বৎসরের জন্য ভারত শাসন করিবার সনদ দান উপলক্ষে পার্লেমেণ্টে যে তর্কবিতর্ক হয়, তখন ইহাও একটি বিবেচ্য বিষয় ছিল যে মিশনারীদিগকে অবাধে ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে দেওয়া হইবে কি না। এ বিষয়ে অনেকের সাক্ষ্য লওয়া হয়। প্রথম সাক্ষী ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন "On hearing this allusion to the dress of the converts some members from the manufacturing districts enquired whether the clothes they wore were of European manufacture !"

"১৮২৩ সালে ওআর্ড নামক শ্রীরামপুরের পাদরী ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশায় তিনি তৎকালীন রাজ-সচিব জে, সি ভিলিয়ার্সকে এদেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি পত্র লেখেন।" মূল পত্রখানি হইতে গ্রন্থকার অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার অনুবাদও দিয়াছেন। শিক্ষা দিবার ও খৃষ্টিয়ান করিবার মূলে তখন যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ একটি অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। "ভারতবাসীদিগকে শিক্ষাদান করিলে আর এক ফল হইবে; ইহারা মিতব্যয়িতা শিখিবে। এখন যে-সকল অর্থ ইহারা বৃথা ক্রিয়াকাণ্ডে ও উৎসবে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে অপচয় করে ও যাহার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক ভিক্ষুক হয়, সেই-সব অর্থ তখন সাংসারিক আরামের নিমিত্ত ব্যয় হইবে, ভাল ভাল বাড়ী নির্ম্মাণ হইবে। ভাল ভাল আসবাব কিনিবে ও এমন সখও স্পৃহা বৃদ্ধি হইবে যাহার ফলে পরিণামে এ দেশের (ইংলণ্ডের) বিস্তর উপকার হইবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুরা (নিম্ন শ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিলাম) ইংলণ্ডজাত কোন বস্তুই ব্যবহার করে না। ছয় কোটী বিজিত প্রজা বিজেতৃদিগের দেশ হইতে একটি সামগ্রীও গ্রহণ করে না। তাহাদের বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করুন; তখন তাহারা শিখিবে যে কত কত উপায়ে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত উপভোগগুলি বর্দ্ধিত হইতে পারে, ও সেই উপভোগের উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে তাহাদের পরিশ্রমশক্তি উত্তেজিত হইবে এবং তাহারা অতি উন্নত সামাজিক সোপানে আরোহণ করিবে।"

শিক্ষা দিয়া মিশনারীরা ভারতবর্ষের যতটুকু উপকার করিয়াছেন, অন্যদিকে তাহার শোধ তুলিয়া লইয়াছেন। প্রথম প্রথম কোম্পানী ব্রিটিশ ভারতে পাদ্রীদিগকে প্রচার করিতে দিতেন না; ভয় ছিল, যে তাহাতে লোকেরা অসন্তুষ্ট হইবে এবং তাহা হইলে কোম্পানীর রাজস্বে ও বাণিজ্যে ব্যাঘাত জন্মিবে। কোম্পানী লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য কালীপূজা ও অন্যান্য পূজা করিতেন (পৃঃ ৪২, ৪১১)। পাদ্রীদের প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অবাধে প্রচার করিবার অনুমতি আবশ্যক হয়; দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডীয় ও অপর পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয়ানদের নিকট হইতে প্রচার-কার্য্যের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন ছিল। এই দুই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য মিশনারীরা ও তাহাদের বন্ধুরা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, সমাজ ও ভারতবাসীদের চরিত্র এমন জঘন্যভাবে চিত্রিত করিত, তাহাতে এমন কালিমা লেপন করিত, এবং অনেকে এখনও করে, যে, ভারতবর্ষে ও ভারতবাসী এখনও অসংখ্য পাশ্চাত্যদেশীয়দিগের নিকট অতিশয় হেয় বিবেচিত হইতেছে। কোন কোন মিশনারীও এখন স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে এই-প্রকারে অনেক মিথ্যা নিন্দা রটনা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে গ্রন্থকার অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

বাঙালীরা যে বিদ্যানুরাগী, বিদ্যার জন্য স্বাবলম্বনপ্রয়াসী, এবং বিদ্যার জন্য অর্থ ও সময় দিতে ইচ্ছুক, তাহা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক পড়িলে বেশ বুঝা যায়, বাঙালীদের এই সব সদ্গুণ থাকা সত্ত্বেও তাহাদের অনেক আয়োজন ও প্রয়াস যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার কারণ,—শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, দেশের লোক কিরূপ শিক্ষা চায় বা কিরূপ শিক্ষা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানের অভাব; শিক্ষায় অগ্রসর বিদেশবাসীদের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষালয়সমূহ ও তাহা চালাইবার প্রণালী কিরূপ, তদ্বিষয়ে তত্ত্বনির্ণয় চেষ্টার অভাব; ইত্যাদি আমাদের এ-সকল ত্রুটি এখনও আছে। বর্ত্তমান সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকের একটি প্রধান উপযোগিতা এই যে ইহা পড়িয়া যেমন আমাদের নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস কমে, তেমনি আমাদের ত্রুটিগুলিও বুঝিয়া আমরা তাহা দূর করিতে সমর্থ হইতে পারি। ইহাতে এত জ্ঞাতব্য জিনিষ আছে, যে, অল্পের মধ্যে সার-সংগ্রহ করিয়া দেওয়া অসম্ভব।

"যখন শ্রীরামপুরের পাদরীগণ এদেশে বালকদিগকে সাধারণ শিক্ষা-দিবার সঙ্কল্প করেন, তখন এদেশে শিক্ষার অথবা পাঠশালার বিশেষ অভাব ছিল না। লেখাপড়া জানে এইরূপ ব্যক্তিও অপ্রতুল ছিল না।" ইংরেজীতে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যাদান-চেষ্টাও বাঙালীরা প্রথমে করে। ১৮১৭ সালে তাহার জন্য বাঙালীরাই এক লক্ষ তের হাজার একশত উনিশ টাকা সংগ্রহ করিয়া হিন্দুকলেজ স্থাপন করেন। ইহার মধ্যে ৩০০্ টাকা ইংরেজদের দান, বাকী সব বাঙালীর টাকা। "এদেশে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হিন্দুকলেজ তাহার মূল। হিন্দুকলেজ স্থাপিত না হইলে ইংরেজী শিক্ষা যে প্রচলিত হইত না, তাহা এককালে বলা যায় না। কিন্তু দেশে ইংরেজী শিক্ষার যে এত অধিক প্রচলন হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ হিন্দু কলেজ।...ইংরেজী শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে বাঙালীরা নিজেরাই আপনাদিগকে দিতে চেষ্টা করে; সেই চেষ্টার প্রধান ফল হিন্দুকলেজ।"

"১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত এদেশের গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না—গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না তাহাই স্থির ছিল। এ সময় বাঙ্গালীরা নিজেরাই অসংখ্য ইংরেজী স্কুল খুলিয়াছিল।" "১৮৩০ সালে যখন পাদরীগণ এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রদানের প্রস্তাব করেন, তাঁহারা স্বীকার করেন যে তখন কলিকাতা নগরে অন্যূন দুই সহস্র বাঙ্গালী ছাত্র বাঙ্গালীদের স্থাপিত স্কুলে পড়িতেছে। তাঁহারা আরও বলেন যে সমগ্র ভারতবর্ষে তখন যাঁহারা ইংরেজী পড়িতেছে তাহাদের সংখ্যা এরূপ হইবে না। ১৮৩৫ সালে ট্রেভিলিয়ান সাহেব (Sir Charles Trevelyan)

হিসাব করেন যে কলিকাতায় অন্যূন ছয় সহস্র বাঙ্গালী-বালক ইংরেজী শিখিতেছিল।” “১৮৩৪-৩৫ সালে কলিকাতা স্কুলবুক ডিপজটরী হইতে ৩১,৬৪৯ খণ্ড ইংরেজী পুস্তক বিক্রয় হয়।” “কলকারখানার শ্রমজীবীদের পর্য্যন্ত ইংরেজী শিক্ষালাভের নিমিত্ত আগ্রহ জন্মিয়াছিল।” ইহার প্রমাণ গ্রন্থকার দিয়াছেন (পৃঃ ৩১৫)। “অনেক বৎসর হইতে বাঁকুড়ায় একটি স্কুল ছিল। ইহা বাঙালীরা স্থাপন করিয়াছিলেন ও প্রতিপালন করিতেন। কোনপ্রকার মাহিনা গ্রহণের প্রথা ছিল না।” “এই সময়ে (১৮৩০ হইতে ১৮৫২) বারাসতে অনেকপ্রকার স্কুল খোলা হয়, সকলগুলিই বাঙ্গালীদের চেষ্টায় ও যত্নে হইয়াছিল। শিক্ষা প্রভৃতি মঙ্গলকর কার্য্যে কালীকৃষ্ণ মিত্র বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। বারাসত বালিকাবিদ্যালয় কৃষিবিদ্যালয় বোর্ডিং এই সব ইহাঁদের চেষ্টায় স্থাপিত হয়।...বোর্ডিংএ থাকিতে আহার ও বাসার খরচ দুই টাকা করিয়া দিতে হইত। ১৮৫৭।৫৮ সালে ২॥০ করিয়া হয়।”

“১৮৫৫ সালে সাহায্যপ্রদান প্রথা (grants-in-aid) আরম্ভ হয়। সেই সময় যে-সকল স্কুল সাহায্য পায় তাহাদের তালিকা যথাস্থানে দিয়াছি। মিশনারী স্কুলের কথা ছাড়িয়া দিলে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গলাদেশে সকল স্কুলগুলিই বাঙ্গালীরা নিজ যত্নে ও পরিশ্রমে স্থাপন করিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক জেলা-স্কুল, প্রত্যেক সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বাধীন (private) স্কুল সম্বন্ধে একই কথা খাটে; যেস্থানেই শিক্ষিত বাঙ্গালী বাস করিত, সেই স্থানেই তাহারা স্কুল স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।......স্থূলতঃ বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক স্কুলই বাঙ্গালীরা স্থাপন করে।”

“কথাগুলি এক করা যাউক। বাঙ্গলা দেশে যে-সকল স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালীরা নিজেদের চেষ্টায়, পরিশ্রমে ও অর্থে স্থাপন করে। তবে অভিভাবকগণের স্কুল সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ছিল না; সমবেত চেষ্টা কাহাকে বলে, সে কথার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত, কেহ জানিত না, অর্থের অভাব সকল স্থানেই বোধ হইত। চাকরী ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। পুস্তক নির্ব্বাচন বা পাঠার্থীদিগের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেহ যে চিন্তা করিত অথবা কাহারও চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি বা শক্তি ছিল, তাহা বোধ হয় না। জেলার সদরে স্কুলগুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইত। উকীল আমলা ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের পুত্রেরাই প্রধানতঃ এই সব স্কুলে লেখা পড়া শিখিত। ভবিষ্যতে উকীল, আমলা ও কর্ম্মচারী হইবে এই ছিল অভিভাবকগণের প্রধান আশা। শেষ কথা, দেশের লোক হিসাবে অতি সামান্য (নগণ্য বলিলেও চলে) মাত্র বালকই লেখাপড়া শিখিত। লেখাপড়া শিখিতে বালকদিগের যে আগ্রহ ছিল না তাহা বলা যায় না। গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতুতে দুই ক্রোশ বিস্তৃত পদ্মা পার হইয়া প্রাতঃকাল ও অপরাহ্নে বালকেরা ফরিদপুর স্কুলে পড়িতে আসিত।” আমরা যখন বাল্যকালে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে পড়িতাম তখন আমরা অনেক বালককে এইরূপ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে স্কুলে আসিতে দেখিয়াছি।

গ্রন্থকার ইংরেজ-রাজত্বকালের যে অংশটির শিক্ষার ইতিহাস লিখিয়াছেন, তখন গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য কি করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের উদ্যোগে মুসলমানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় মাদ্রাসা অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

“ইংরেজ-শাসনের পূর্ব্বে সংস্কৃত অথবা আরবী ও ফারসী শিক্ষার বাঙ্গলা দেশে যথেষ্ট প্রচলন ছিল। টোল চতুষ্পাঠী এবং মক্তব মাদ্রাসা প্রতিপালনের নিমিত্ত দেশের লোক প্রচুর সাহায্য করিত, অনেক স্থলে জমী, জায়গীর বরাদ্দ ছিল। ইংরেজ-অধিকার-ফলে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র এই শিক্ষা প্রদানের বিঘ্ন ঘটে। কোথাও বা সাহায্যদাতৃগণের উচ্ছেদ হয়; কোথাও বা তাঁহাদের প্রদত্ত জমিজমা অবং... হস্তান্তর হয়। পূর্ব্বে অধ্যাপক ও মৌলভীগণ দেশমধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। তাঁহাদিগকে সাহায্য করা তখন ইংরেজদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় বোধ হইয়াছিল। ফারসী তখন দেশে আদালতের ভাষা। বিচার ও অপরাপর শাসনবিভাগে ফারসীর সাহায্যে কাজ হইত। কাজী ফারসী ভাষায় আইন বুঝাইত, মুফ্‌তি ঐ ভাষায় ফতোয়া দিত। সুতরাং তখন আরবী ও ফারসী ভাষার চর্চ্চা বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপ নানা কারণে কলিকাতায় মাদ্রাসা খোলা হইল।”

যে যে কারণে কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপিত হয়, সেই সেই কারণে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাশীতে বেনারস্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তথায় সংস্কৃত নানা বিদ্যা, এবং আরবী ও ফারসী পড়ান হইত। ১৮২৮ সালে কলেজের সংলগ্ন একটি ইংরেজী স্কুল খোলা হয়। ১৭৮১তে কলিকাতা মাদ্রাসা এবং তৎপরে ১৭৯২ সালে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় বটে; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত হিন্দু বাঙ্গালী বালকদের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গে কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। “এদেশে শিক্ষার ইতিহাসে মারকুইস অফ্ হেষ্টিংসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় মাদ্রাসা ও কাশীর হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার অথবা কোনও প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিশেষ সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালীন কোর্ট অব্ ডিরেক্টরদিগের অথবা এদেশীয় ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের ভারতবর্ষে ইংরেজী বা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রদানের বিশেষ আগ্রহের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ এ সম্বন্ধে প্রথম উদারনীতি অবলম্বন করেন। প্রধানতঃ তাঁহার পত্নীর চেষ্টায় ১৮১৭ সালে কলিকাতায় স্কুলবুক সোসাইটী স্থাপিত হয়। এই মহিলাটি বাঙ্গালী বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বারাকপুরে একটি স্কুল স্থাপন করেন। বালকেরা কি পড়িবে তিনি নিজহস্তে তাহার তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৮১৫ সালের ৩০শে জুলাই কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসের হলে তিনি প্রকাশ্যসভায় ভারতের রাজা-রাজড়া ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে বলেন :—

“This Government never will be influenced by the erroneous—shall not rather call it the designing position—that to spread information among men is to render them less tractable and less submissive to authority. If an abuse of authority be planned, men will be less tractable and submissive in proportion as they have the capacity of comprehending the meditated injustice. But it would be treason against British sentiment to imagine that it ever could be the principle of this government to perpetuate ignorance in order to ensure paltry and dishonest disadvantages over the blindness of the multitude.”

১৭৮১ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৮২৪ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ খোলা হয়। তখন পর্য্যন্ত বঙ্গে গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত এই দুটি মাত্র কলেজ ছিল। এতদ্ভিন্ন ১৮১৫ সালে গবর্ণমেণ্ট গুটিকতক পাদ্রী-পরিচালিত স্কুলের নিমিত্ত বার্ষিক দশ-হাজার টাকা খরচ নির্দ্ধারিত করেন। এ দেশের লোকদের ইংরেজী

শিখিবার দরকার আছে, এ কথা তখনকার ইংরেজ কর্ম্মচারীরা ভাবিতেন না। ১৮১৩ সালে পার্লেমেন্ট এদেশে শিক্ষার নিমিত্ত বার্ষিক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে আদেশ করেন। তৎকালীন বাংলা গবর্ণমেন্ট কিন্তু শিক্ষার জন্য ঐ টাকার এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না। উহা জমা থাকিত।

১৮২৩ সালে বাঙ্গলাদেশে গবর্ণমেন্ট দেশের জনসাধারণের শিক্ষার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনের নিমিত্ত স্থির করেন যে একটি সাধারণ শিক্ষাসমিতি (General Committee of Public Instruction) গঠিত হইবে। এই কমিটির দ্বারা কিছু কাজ হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহারা গরীব লোকদের চেয়ে "ভদ্র" লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। "সাধারণের শিক্ষা (mass education) সম্বন্ধে সমিতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।" ১৮৪২ সালে উহা General Council of Educationএ পরিণত হয়। ১৮৩০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ভারত-গবর্ণমেন্টকে লেখেন যে "এক শ্রেণীর এরূপ লোক প্রস্তুত হওয়া উচিত যাহারা বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে দেশের দেওয়ানী সংক্রান্ত কাজ করিতে পারিবে," তাহা করিতে গেলে ইউরোপীয় বিদ্যার সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তাহাতে এদেশে গবর্ণমেন্ট-পরিচালিত স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সঙ্কল্প স্থাপিত হয়। সাধারণ শিক্ষাসমিতিও তাহাতে সায় দেন। ফলে দেশে হুগলি কলেজ, ঢাকা কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হয়। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজও এই সময় স্থাপিত হয়। ১৮৪০ সালে গবর্ণমেন্ট-সাহায্যকৃত স্কুল ও কলেজ পরিচালনার নিমিত্ত প্রথম নিয়মাবলী প্রকাশ করেন।

বইখানির সামান্য একটু পরিচয় দিতে গিয়া এত কথা লিখিতে হইল। স্কুলবুক সোসাইটির কথা; রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি কি করিয়াছিলেন, তাহার কথা; হিন্দুকলেজের ও অন্যান্য কলেজের বিশেষ বৃত্তান্ত; স্ত্রীশিক্ষার কথা; পাদ্রী কেরী সাহেবের নীলকর রূপ; তৎকালে ইংরেজ বাঙ্গালীর পরস্পর সম্পর্ক; আসামী ভাষা কিরূপে বাংলা হইতে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া পরিণত হইল, তাহার বৃত্তান্ত; প্রভৃতি নানা কথা বলা হইল না; পাঠকেরা তাহা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক হইতে পড়িবেন। অনেক কৌতুকজনক জিনিষও ইহাতে আছে।

তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। নানা পুস্তক পুস্তিকা রিপোর্ট আদি হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক সন্ধান রাখিতে ও লইতে হইয়াছে। পুস্তকখানি যাহাতে আরও সকলের কাজে লাগিতে পারে, তজ্জন্য কয়েকটি কথা বলা দরকার মনে করিতেছি। গ্রন্থে ইংরেজীতে যে-সব কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি কোথা হইতে গৃহীত তাহার উল্লেখ নাই। সর্ব্বত্রই মূল বহি, রিপোর্ট, প্রভৃতির, পৃষ্ঠাসহ, উল্লেখ থাকা উচিত। ইংরেজী কোন কোন অংশের অনুবাদ আছে, কোন কোন অংশের নাই। অনুবাদ সর্ব্বত্র দিতে পারিলে ভাল হয়; গ্রন্থশেষে একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী দিলে ভাল হয়, নতুবা প্রয়োজনীয় বিষয় খুঁজিয়া বাহির করিতে অসুবিধা হয়। বহিখানি বোধ হয় গুছাইয়া আরও একটু সুশৃঙ্খল ও সংহতভাবে লেখা যাইতে পারিত। ছাপার ভুলও, বিশেষতঃ দ্বিতীয়ভাগে, কিছু আছে। কিন্তু গুরুতর ভুল একটিও চোখে পড়ে নাই।

এমন মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়া এরূপ সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙালীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পুস্তক-পরিচয়

মালা—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশিশিরকুমার দত্ত, ২৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সুন্দর সুদৃশ্য। মূল্য বারো আনা।

এই মালাতে একত্রিশটি কবিতা-খণ্ড গ্রথিত হইয়াছে।

অন্তর্যামি—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত। প্রকাশক, মূল্য, সৌষ্ঠব পূর্ব্বোক্ত বইখানিরই সমান। ইহাতে ৪২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে। এই কবিতাগুলিতে পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য আত্মার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

দশানন বধ মহাকাব্য—শ্রীহরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী প্রণীত। সাহিত্যসভা হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

এই মহাকাব্যখানি বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ ইহাতে বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলায় উচ্চারণে সর্ব্বত্র সংস্কৃত দীর্ঘস্বর দীর্ঘ বা হ্রস্ব স্বর হ্রস্বই থাকে না; এজন্য ইঁহার আগে যাহারা বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা বাংলা উচ্চারণের ধাত বুঝিয়া না লেখাতে সে সব ছন্দ কৃত্রিম হইয়া পড়ে—অনেক স্থলে দীর্ঘস্বরগুলিকে অকারণ টানিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা হয় না। এরূপ রচনার উদাহরণ ভারতচন্দ্র, বলদেব পালিত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কাব্যে মিলিবে। লস্কর চৌধুরী মহাশয় এই ত্রুটি ধরিতে পারিয়া বাংলা উচ্চারণের ধাত বুঝিয়া কেবলমাত্র যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বের অক্ষর গুরু হয় এই নিয়ম অনুসারে এই ৪০০ পৃষ্ঠার প্রকাণ্ড কাব্যখানি বিবিধ সংস্কৃত ছন্দে রচনা করিয়াছেন। ইহার ফলে অসাবধান পাঠকেরও ছন্দপতন ও যতিভঙ্গের আশঙ্কা থাকে নাই। কিন্তু অকারান্ত শব্দ হলন্ত করিয়া উচ্চারণ করা বাংলার ধাত, এই পুস্তকে সেই দিকে লক্ষ্য না রাখাতে অকারান্ত শব্দের শেষ অকার অনাবশ্যক টানিয়া পড়িতে হয়। সকল দিক বজায় রাখিয়া বাংলায় সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনায় সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এই কাব্যে তবলা পাখোয়াজের তালে গ্রন্থকারের স্বরচিত একুশটি ছন্দও হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রায় রচিত হইয়াছে। এইরূপ মাত্রা রক্ষা করিতে গিয়া বইখানি যুক্তাক্ষরবহুল শব্দে ও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদে আকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে পাঠকের অর্থবোধে একটু বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। তৎসত্ত্বেও রচনা নিতান্ত দুর্বোধ বা কর্কশ বা কবিত্বহীন হয় নাই। কিন্তু হইলে কি হইবে এরূপ রচনা বাংলা পদ্যের ধাতসই নহে; তাহাতে পাঠকের মন বাহ্য সৌষ্ঠব ও কারিগরির দিকেই নিবিষ্ট থাকে, কাব্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়া রসসম্ভোগজনিত আনন্দ অর্জ্জন করিবার অবসর সে পায় না। এই মহাকাব্যখানি লেখকের ছন্দের উপর অসাধারণ দখল, শব্দসম্পৎ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমপটুতার সাক্ষীরূপে ধনী সাহিত্যসেবীর গ্রন্থভাণ্ডারে রক্ষিত থাকিবে, কাব্যামোদী সাধারণের সহচর হইতে পারিবে না।

রিক্তা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র নাগ, টাউন ক্লব, খুলনা। ৭৭ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

কবিতার বই। নবীন লেখক বিনয় করিয়া রচনার নাম রিক্তা রাখিলেও ছন্দের পারিপাট্য, ভাষার সরসতা ও ভাবেরও অদৈন্য দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের পূর্ণারই আভাস আমাদিগকে দিয়াছেন।

গুঞ্জন—শ্রীসুধাংশুমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। সোণপুর মোহন প্রেস হইতে প্রকাশিত। ছাপা কাগজ খারাপ। মূল্য চার আনা ২৩ পৃষ্ঠা বইয়ের পক্ষে খুব বেশী।

কবিতার বই। কবিতাগুলি লেখকের ১৫।১৬ বৎসর বয়সের লেখা। বেশী কবিত্ব না থাকিলেও এবং মিল ও ছন্দে অল্প খুঁত থাকিলেও, বয়সেরপক্ষে রচনা মন্দ হয় নাই। সরস ও পাঠযোগ্য হইয়াছে। রচনা ভবিষ্যৎ পরিণতিতে সুন্দরতর হইবার সূচনা ইহাতে আছে।

পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী প্রণীত। মূল্য চার আনা। পদ্যের বই।

হজরৎ মহম্মদ—শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ, ২৯ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য কাগজের মলাট ১, ও বাঁধাই ১।০। ছাপা কাগজ বাঁধাই উত্তম। এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। ইহাতে পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে হজরত মহম্মদের জন্মকাহিনী, বাল্যলীলা, মাহাত্ম্যকথা, পয়গম্বরী প্রাপ্তি, ও ইসলাম প্রচার বর্ণিত হইয়াছে।

মন্দির—শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কাপড়ে বাঁধা, মলাটের উপরে মন্দিরের রঙিন ছবি আঁটা। মূল্য দেড় টাকা। কবিতার বই।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভূমিকায় পরিচয় দিয়াছেন—"কবিতাগুলি ভক্তিপথের পথিকের জন্য—মন্দির-পথে যাত্রীকে যে-সকল ধাপ উত্তীর্ণ হইতে হয় সেই ধাপগুলির পরিচয় ইহাতে আছে।" এই ধাপগুলি লেখক গ্রন্থসূচীতে এইরূপ বিভাগ দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন—মন্দির-বাহিরে (জড়ত্ব—নীতি), মন্দির-পথে (মনুষ্যত্ব—সেবা); মন্দির-তোরণে (জীবত্ব—সঙ্গ); মন্দির-প্রাঙ্গণে (মনুষ্যত্ব—অনুষ্ঠান), মন্দির-সোপানে (দেবত্ব—ব্রহ্মজ্ঞান); মন্দিরে (ব্রহ্মত্ব—যোগ); অন্দরে (ভক্ত—লীলা)। ভক্তের নিকট ভগবান কত বিচিত্র রূপে কতবিধ উপায়ে প্রকাশ পান; তাহারই বিরহ-মিলনের আনন্দরস ও তত্ত্বকথা এই কবিতাগুলির প্রাণ। এই কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যের আদর্শে লেখা। ছন্দ ও ভাব বিচিত্র হইলেও মৌলিকতা নাই; অপকৃষ্ট মিল বহু কবিতাতেই আছে। ছন্দ-পতনও আছে। কবিত্বের চেয়ে তত্ত্বকথা যাঁহাদের ভালো লাগে তাঁহারা এই বই পড়িয়া প্রীত হইবেন।

বল্লরী—শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত; প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,। ৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

ছাপা কাগজ ভালো। আসল জিনিস কবিতাগুলিও মন্দ নয়। লেখকের প্রথম বয়সের বই কুন্দ ও কিসলয় হইতে বাছাই করিয়া পরবর্ত্তী কালের রচনার সহিত মিলাইয়া এই বল্লরী হইয়াছে। এই কবিতা-গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"কয়েকটি ব্যতীত কবিতাগুলি সমস্তই ছোট—সাধারণতঃ এক একটি কবিতা একটি মাত্র সহজ সরল ভাব অল্প কথায় অথচ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় নিপুণতা-সহকারে প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে, বিষয়ভেদে কবিতাগুলি মোটামুটি পাঁচটি পর্য্যায়ে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। প্রথম, পারমার্থিক—ভগবানকে আহ্বান ও তাঁহাকে লাভের জন্য ব্যাকুলতা; দ্বিতীয়, তাত্ত্বিক—সত্য, মায়া, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি তত্ত্ববিষয়ক কবিতা; তৃতীয়, নীতিমূলক; চতুর্থ, নারী, প্রেম ও শিশু সম্বন্ধীয়; পঞ্চম, বিবিধ—প্রধানতঃ প্রাকৃতিক বিষয়ই এ শ্রেণীর কবিতাগুলির উপাদান হইয়াছে।" কবিতাগুলির ছন্দপারিপাট্য, শব্দনির্ব্বাচন উৎকৃষ্ট; কিন্তু কোথায় একটি কি সূক্ষ্ম অনির্ব্বচনীয় প্রাণরসের অভাব পড়িয়াছে, যাহাতে কবিতাগুলি রস-মধুর ও মনোরম হইয়া উঠিতে পারে নাই; এ যেন কারিগরের কৌশল, প্রকৃতির আনন্দের সৃষ্টি নয়। এই দীনতাটি আধুনিক বহু কবির কাব্যে লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হই; অতি ফলন কি ইহার জন্য দায়ী? এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে অনেক অনুবাদ আছে; সেগুলিও এই ত্রুটির হাত এড়াইতে পারে নাই।

ভুবনেশ্বর—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক অতুল লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা।

উৎকল দেশে ভুবনেশ্বর হিন্দুর একটি প্রধান তীর্থ; স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধির জন্য ইহা বহু লোকের দর্শনীয় স্থান। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ভুবনেশ্বর ও সন্নিহিত স্থানের দর্শনীয় মন্দিরাদি ও তাহাদের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিবরণ, কিম্বদন্তী, হিন্দুর তীর্থকর্ম্ম প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। কৌশল্যা-গঙ্গা সরোবর ও কেদার গৌরীর যুগল মন্দিরের লোকপ্রবাদ ওড়িয়ার কবি রাধানাথকে কাব্যের উপকরণ জোগাইয়াছিল; বাঙালী কবিরাও ইহা কাব্যে উপন্যাসে নাটকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এই পুস্তিকাখানি ভুবনেশ্বর-যাত্রীর পাণ্ডার কাজ করিবে।

হাসন-হোসেন—শ্রীরামকানাই দত্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমানেন্দ্রলাল দত্ত, ৪৮ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, ৫৯ পৃষ্ঠা। মূল্য চার আনা।

এই পুস্তকে হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হাসন ও হোসেনের ইসলাম প্রচারের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনের অবদান-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

প্রমীলা—শ্রীঅবনীকান্ত সেন প্রণীত। প্রকাশক "বার্ত্তাবহ-প্রেস" ২৬ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। রেশমী কাপড়ে বাঁধা। সচিত্র। দুরঙে ছাপা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে বর্ণিত প্রমীলার চরিত্র ও উপাখ্যান গদ্যে বিস্তারিত করিয়া কাহিনীর আকারে এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। প্রমীলার চরিত্র বীরত্ব ও কোমলতায় মিশিত আদর্শ নারী চরিত্র; তাহাকে মাইকেলের কাব্য-গহন হইতে চয়ন করিয়া বঙ্গনারীর সহজ-প্রাপ্য করিয়া গ্রন্থকার ভালোই করিয়াছেন।

কর্ণ—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক দাসগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সচিত্র। ৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তকে মহাবীর কর্ণের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মহাভারতীয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বইখানি বালকদের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত।

লক্ষ্মণ—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক সিটীবুক সোসাইটী, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন আনা।

রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া এই আদর্শ ভ্রাতার শৈশব হইতে দেহাবসান পর্য্যন্ত কাহিনী এই পুস্তিকায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বালকদের পড়িতে দিবার উপযুক্ত।

কাশ্মীরী উপকথা—শ্রীশ্যামাচরণ দে রচয়িতা। প্রকাশক সিটিবুক সোসাইটী। ১৫৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র। মূল্য বারো আনা।

নামেই পুস্তকের পরিচয়। গ্রন্থকার বিভিন্ন জাতির উপকথা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গের শিশুদের আনন্দ ও শিক্ষা লাভের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন এবং বঙ্গসাহিত্যকেও সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। রচনার ভাষা হাল্কা, উপকথা বলিবার উপযুক্ত; একটু আড়ষ্ট প্রাদেশিকতাদুষ্ট।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩২৩

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

যুদ্ধক্ষেত্রে-শুশ্রূষার্থী দলের পরিণাম।

যে-সকল বাঙ্গালী যুবক যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবাশুশ্রূষা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাজ সন্তোষজনক হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট আরও শুশ্রূষাকারী চাহিয়াছিলেন। তদনুসারে একশতের কিছু কম যুবক কাজ শিখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে গত ৩০শে জুন বিদায় দেওয়া হইয়াছে। কি কারণে শুশ্রূষাকারীর দল ভাঙিয়া দেওয়া হইল, তাহা দেশের লোকের ঠিক জানা দরকার। যে কমিটি দল গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা, গবর্ণমেণ্টর সহিত যে-সব চিঠি লেখালেখি হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করুন। ব্যাপারটা চাপা দিবার কোন চেষ্টা হইতেছে কিনা, ঠিক্ জানি না। এ রকম একটা সংবাদ কলিকাতার বাঙ্গালীচালিত কোনও দৈনিক প্রথম প্রথম কয়েক দিন প্রকাশ করেন নাই, যদিও তাঁহারা জানিতেন। সাপ্তাহিক পত্র হইলেও প্রথমে সঞ্জীবনী ইহা মুদ্রিত করেন। পরে দৈনিকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

দল ভাঙিয়া দিবার কারণ কাগজে এইরূপ লেখা হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে শুশ্রূষার্থীরা যদি ডুলি-বেহারা এবং অনুচর কুলির (camp-followers) কাজ করিতে রাজী হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে লওয়া যাইতে পারে, নতুবা তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হউক; তাহাদিগকে ডুলি-বেহারা, ঝাড়ুদার, ঘাসিয়াড়া, প্রভৃতির কাজ করিতে পাঠাইতে কমিটির মত না হওয়ায় দল ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কারণ সত্য কি না, ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করিয়া স্থির করা হউক। কমিটিও সমুদয় চিঠিপত্র ছাপাইয়া দেশের লোককে সত্য জ্ঞাপন করুন। তাঁহারা অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে, তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কোন যুবককে ভর্ত্তি করিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের এবং অভিভাবকদের জানিবার অধিকার আছে যে কি কারণে, যে উদ্দেশ্যে ছেলেরা লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল না।

শুশ্রূষার্থীদের দল ভাঙিয়া দিবার যে কারণ কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই,—ডুলি-বেহারা, ঝাড়ুদার, ঘাসিয়াড়া, কাহারও কাজ অনাবশ্যক বা অসাধু নহে; তথাপি শুশ্রূষার্থীদিগকে এই-সব কাজে না পাঠাইবার কারণ কি? কমিটি কেন শুশ্রূষার্থীদিগকে এই-সব কাজ করিতে পাঠাইতে রাজী হন নাই, জানি না, কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁহারা ঠিকই করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে কাজের জন্য লোক চাহিয়াছিলেন, কমিটি তাহার জন্যই লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন যদি গবর্ণমেণ্ট নিজের কথা না রাখিয়া থাকেন, যদি শুশ্রূষাকারীদিগের দ্বারা অন্য কাজ করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কমিটি তাহাতে সম্মত না হইয়া ভালই

করিয়াছেন। শুশ্রূষার্থী যুবকেরা ভদ্রলোকের ছেলে। আমাদের দেশের সামাজিক প্রথা-অনুসারে ডুলি বহা, ঝাঁট দেওা, ঘাস কাটা, বাসন মাজা, তাহাদের কাজ নয়।

বাঙ্গালীর ঘরে যিনি জননীরূপে কর্ত্রীত্ব করেন, তিনি আবার প্রয়োজন হইলে পুত্রকন্যার, অপর সকলের, এমন কি দাসদাসীরও, মলমূত্র পর্য্যন্ত পরিষ্কার করেন। রাঁধা, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওা, কাপড় কাচা, এ-সব ত তিনি দরকারমত করিয়াই থাকেন। তাহাতে তাঁহার কোন অগৌরব হয় না। কিন্তু তাঁহাকে যদি বলা হয় যে তিনি বাড়ীর কর্ত্রীত্বের উপযুক্ত নন, কেবল দাসী বা মেথরানী হইবারই উপযুক্ত, তাহা হইলে তাঁহার অপমান হয়। রুশিয়ার লোকে সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি হইতে পারে, ঘাসিয়াড়া মেথরও হইতে পারে; সুতরাং রুশিয়ার কোন জায়গা হইতে মেথর ঘাসিয়াড়া চাহিলে অধিবাসীরা অপমান বোধ করে না। ইংরেজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, সবই হইতে পারে; সেইজন্য সৈন্যদের শিবিরে সাধারণ চাকর মজুর মেথরের কাজ করিলেও তাহার অগৌরব হয় না। আমাদের দেশের যে-সব জাতি যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত, তাহাদের মধ্য হইতেও কেহ নিম্নতম সেনানায়ক হইতে পারে না। বাঙ্গালী সাধারণ সিপাহী হইতেও পারে না। বেতনের জন্য নহে, স্বেচ্ছায় শুশ্রূষাকারী হইয়া কতকগুলি বাঙ্গালী যুবক যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়াছে। অন্য কতকগুলি সেইরূপ কাজের জন্য ভর্ত্তি হইয়া, শিক্ষা পাইয়া, এখন যদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত কারণে নিজের নিজের বাড়ী যাইতে আদিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা গবর্ণমেন্টের পক্ষে সুখ্যাতির কারণ হইবে না। যদি গবর্ণমেন্টের কোন কর্ম্মচারী গবর্ণমেন্টের অঙ্গীকারভঙ্গের কারণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি রাজনৈতিক ভুল ত করিয়াইছেন অধিকন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষারূপ যে সাধারণ ভদ্রতার নিয়ম তাহাও পালন করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেন্টের তাঁহাকে ইহা বুঝাইয়া দেওা উচিত।

আমরা ইহাকে একটা জাতীয় দুর্ভাগ্য মনে করিতেছি না। বাঙ্গালীর চরিত্রে যদি বস্তু থাকে, তাহা হইলে এরূপ ঘটনায় তাহার মহত্ত্বের পথে অগ্রসর-হওয়ায় বাধা পড়িবে না। ভারতপ্রবাসী কোন একজন, দশজন, বা সমুদয় ইংরেজ আমাদিগকে বড় করিয়া দিলে তবে আমরা বড় হইব, নতুবা হইতে পারিব না, আমাদিগকে যোগ্য বলিয়া মানিলে আমরা যোগ্য হইব ও হৃদয়ে বল বিশ্বাস পাইব, নতুবা নয়;—স্বপ্নেও কেহ এরূপ ভাবিবেন না।

যাহা হউক, কারণটা আগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা যাউক; তাহার পর যথোপযুক্ত মন্তব্য প্রকাশের সময় আসিবে।

এইপর্য্যন্ত লিখিবার পর একখানা দৈনিক কাগজে দেখিলাম যে শুশ্রূষার্থীদলের সম্বন্ধে এখনও গবর্ণমেন্টের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি হইতেছে, এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই, অতএব সর্ব্বসাধারণের এবিষয়ে রায় দিবার এখনও সময় আসে নাই। ভাল কথা; কিন্তু এপর্য্যন্ত কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে তাহাকে ত মিথ্যা বলা হয় নাই? শুশ্রূষার্থী যুবকেরা বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, ইহাও ঠিক। এখন কমিটি বা উহার সম্পাদক, বা সহযোগী সম্পাদক, যে-কেহ সর্ব্বেসর্ব্বা, তিনি বা তাঁহারা, গবর্ণমেন্টের সঙ্গে যে-সব চিঠি লেখালেখি হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতে যেসব চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন, সমস্তই প্রকাশ করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতিত্ব।

এইরূপ একটা অশ্রদ্ধেয় গুজব শুনা যাইতেছে যে বাঁকিপুরের সাহিত্যসম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতি কোন কোন ধনী সাহিত্যসৌখীনকে সম্মিলনের ও সাহিত্যশাখার সভাপতিত্ব দিবার প্রস্তাব করিয়া তদ্বিনিময়ে সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিছু অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছেন। সমিতিতে অনেক শ্রদ্ধাভাজন লোক আছেন। সুতরাং এরূপ গুজব বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইতেছে না।

মূল সাহিত্যসম্মিলনের এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যাঁহারা সভাপতি হইবার উপযুক্ত, সংবাদপত্রে এরূপ লোকদের নাম করা রীতিবিরুদ্ধ নহে। সেইজন্য আমরা কয়েক জনের নাম করিতেছি।

এবার বাংলাদেশের বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের উদ্যোগে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। যাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর জীবনের অধিকাংশ সময় বঙ্গের বাহিরে

কাটাইয়াছেন, কিম্বা এখনও বঙ্গের বাহিরেই বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে উপযুক্ত লোকের অভাব নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নানা ভাষাবিৎ, সুপণ্ডিত। আমরা যখন জন্মি নাই, তিনি তখন হইতে বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। মূল নাটক ও কবিতা লিখিয়া এবং ফরাসী, সংস্কৃত ও ইংরেজী হইতে বিস্তর ভাল বহির অনুবাদ করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাকে সভাপতির পদে বরণ করা যাইতে পারে। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় যে-সব বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক, এবং আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী, রত্নপরীক্ষা, প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার দ্বারা, এবং পত্রালীর মত সর্ব্বসাধারণের সুখপাঠ্য বহির দ্বারা বাংলা সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে। তিনি বাংলার শব্দকোষ লিখিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যেরূপ উপকার করিয়াছেন, এপর্য্যন্ত আর কেহ সেদিকে ততটা করিতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রন্থের ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া দেওা, অসম্পূর্ণতা পূরণ করা,—এসব অপেক্ষাকৃত সোজা কাজ। আসল কাজটা খুব কঠিন; তাহা তিনি করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধেও অনেক সারগভ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহাকে সভাপতি মনোনয়ন করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াও সাহিত্য-সেবা ছাড়েন নাই। যতদিন দৃষ্টিশক্তি ছিল, ততদিন ত তাঁহার লেখনী অশ্রান্তভাবে চলিয়াইছিল। তাঁহার পেশা ছিল ওকালতী, তাহাতে পসারও এক সময়ে বেশ জমিয়াছিল। কিন্তু, শুনিয়াছিলাম, বিদ্যাচর্চ্চা ও সাহিত্যসেবায় অতিরিক্ত মন দেওয়ায়, আয় কমিয়া গিয়াছিল। তিনি নানাভাষাবিৎ; সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, প্রভৃতির জ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ লোক বাঙালীদের মধ্যে খুব বেশী নাই। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভাও নানাদিকে খেলে। মূল ও অনূদিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাট্য, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, প্রভৃতি নানা রকমের রচনা তাঁহার হাত হইতে বাহির হইয়াছে। তাঁহার কোন রকমের লেখাই ব্যর্থ হয় নাই। বরং আমাদের ইহাই মনে হইয়াছে, যে, এরূপ বিদ্বান শক্তিশালী লোক এতগুলা বিষয়ে মন না দিয়া যদি নিজের সাহিত্যিক চেষ্টা সংকীর্ণতর সীমায় আবদ্ধ রাখিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশ হয়ত তাঁহার নিকট হইতে এমন সব উৎকৃষ্ট জিনিষ পাইতে পারিত, যাহা অন্য লেখকেরা দিতে পারিতেছেন না। বাঁকীপুরের অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করিতে পারেন।

প্রবাসে যাঁহাদের দ্বারা সাহিত্যসেবা হইয়াছে বা হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে তিন জনের নাম আমরা করিলাম। ইঁহারা ছাড়া যে আর লোক নাই, তাহা নয়। কিন্তু একটা সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে অভ্যর্থনাসমিতি ইঁহাদিগকে, ইঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে, কিম্বা ইঁহাদের চেয়ে বিদ্বান এবং অক্লান্ত ও কৃতী সাহিত্যিকদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিলে বিবেচক লোকেরা সন্তুষ্ট হইবে।

তাঁহারা যদি প্রবাসী সাহিত্যসেবকদিগকে মনোনীত করিতে না চান, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত লোককে নির্ব্বাচন করুন।

বরপণ।

টেনিসনের "উত্তরাঞ্চলের চাষী—হাল ফ্যাশন" (Northern Farmer—New Style) নামক কবিতায় আছে—

> "But I knaw'd a Quaaker feller as often 'as towd ma this
> 'Doant thou marry for munny, but goa wheer munny is !"

"আমি একটা কোএকার লোককে জানতাম সে আমাকে অনেকবার বলেছে, 'টাকার জন্য বিয়ে কোরোনা, কিন্তু যেখানে টাকা আছে, সেইখানেই যেয়ো' !"

স্নেহলতা পুড়িয়া মরিলেন, "ধর্ম্মের কথা" অনেক বলা হইল ও শুনা হইল, কিন্তু বর এবং বরের বাপমা ব্যবসাটা বেশ চালাইতেছেন। পাওনার চুক্তিটা পাকা করিয়া ছেলের বিয়ে দেওা চলিতেছে। এরকম চুক্তি আগেকার চেয়ে বেশী কি কম চলিতেছে, জানিনা; কিন্তু তাহাতে বড় একটা আসে যায় না। টেনিসনের কবিতাটি বেশী লোকে

না পড়িলেও উহার দামী নীতিটির অনুসরণ বরের বাপ-মায়েরা খুব করিতেছেন। "আপনারা ছেলের বিয়েতে টাকা নেবেন নাকি?" জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিবেন —"রামঃ, ও-সব কথা আমরা মুখে আনি না।" ঠিক্ কথা; মুখে আনার দরকারই নাই, উহ্য আছে।

এই উহ্যটার উচ্ছেদ হয় কেমন করিয়া? বড় শক্ত সমস্যা। যেখানে হয়ত অর্থসম্বন্ধে প্রকাশ্য চুক্তি কিম্বা অর্থপ্রাপ্তির অপ্রকাশিত নিশ্চিত সম্ভাবনা বিবাহের কারণ নয়, সেখানেও অর্থপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকিলে, বরপণ লওয়া হয় নাই বলিয়া ঢাক বাজান ঠিক্ নয়। কিছুদিন আগে একজন বিখ্যাত লোকের পুত্রের সঙ্গে অন্য একজন বিখ্যাত লোকের একমাত্র কন্যার বিবাহ হয়। দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে বরপণ লওয়া হয় নাই বলিয়া বরের বাবার খুব প্রশংসা বাহির হইয়া গেল। ইহা সত্য যে বরের বাবা পণ চান নাই এবং পণ বলিয়া কিছু লন নাই; কিন্তু ইহাও সত্য যে পিতৃগৃহ হইতে কন্যার সঙ্গে অলঙ্কারে ও কোম্পানীর কাগজে ২৫।৩০ হাজার টাকার সম্পত্তি গিয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিয়া গরীবের ঘরের সৎপাত্রী দেখিয়া যদি নিজ পুত্রের সহিত বিনা পণে বিবাহ দেন, তাহা হইলে অসঙ্কোচে নিঃসন্দেহে তাঁহার প্রশংসা করা যায়। অন্য সব স্থলে, অর্থাৎ যেখানে জমী, বাড়ী, গাড়ী, দেশে বা বিদেশে শিক্ষার ব্যয়, অনেক অলঙ্কার, নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ,—যে-কোন আকারে বা প্রকারে অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, সেখানে প্রশংসা করার ব্যাঘাত আছে। কারণ, চুক্তি ছিল কি না, কে বলিতে পারে? চুক্তি না থাকিলেও "উহ্য" কিছু ছিল কি না, কে জানে? চুক্তি কিম্বা "উহ্য" কিছু না থাকিলেও, টেনিসনের চাষীর অনুমোদিত নীতি অনুসৃত হইয়াছিল কি না, কে নির্ণয় করিবে?

ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হন অল্পসংখ্যক লোকে, সামাজিক নিন্দা প্রশংসা দ্বারা আচরণ নিয়মিত হয় তদপেক্ষা বেশী লোকের; কিন্তু বরপণ উঠাইতে হইলে কেবল এই দুটি উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। দেশবাসীর সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস, পাত্র ও পাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা, পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র উপার্জ্জনের পথ, পুত্র ও কন্যার পিতৃধনে অধিকার, প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে।

হিন্দুর সামাজিক রীতি অনুসারে প্রত্যেক কন্যার বিবাহ হওয়া চাই-ই, এবং তাহা প্রাপ্তবয়স্কা হইবার আগেই চাই। এই সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন না হইলে বরপক্ষ কন্যা-পক্ষকে বিপন্ন জানিয়া মোচড় দিয়া বেশ দুপয়সা আদায় করিবার চেষ্টা করিবেই। কন্যা অধিক বয়স পর্য্যন্ত, এমন কি চিরজীবন কুমারী থাকিলেও যদি সামাজিক নিন্দা না হয়, এবং তাহার বাপমার এ কথা মনে না হয় যে তাহার পিতৃপুরুষেরা নিরয়গামী হইতেছে, তাহা হইলে বরপক্ষের জোর অনেকটা কমে। কিন্তু কন্যাকে বেশী বয়স পর্য্যন্ত কুমারী রাখিতে হইলে তাহাকে তদুপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাকে সাধুজীবন যাপনে সমর্থ করিবার জন্যই যে শিক্ষার দরকার তা নয়। তাহাকে যদি পিতামাতার এবং তাঁহাদের মৃত্যুর পর ভ্রাতাদের গলগ্রহ হইতে হয়, তাহা হইলে এখনকারই মত কোন-প্রকারে তাহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্রতা ও ব্যস্ততা থাকিয়া যাইবে। এই জন্য তাহাকে উপার্জ্জনক্ষম হইতে শিখাইতে হইবে। বাংলা দেশে এবং বাংলা দেশের বাহিরে এত শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন যে শিক্ষিতা নারীর উপার্জ্জনের উপায়ের অভাব বহুকাল হইবে না।

দেখা যাইতেছে, যে ছেলে ইংরেজী শিখিয়া যত পাস্ করে, বিয়ের বাজারে তাহার দর তত চড়া হয়। ইংরেজি-জানা ছেলের সংখ্যা দেশে বড় কম। তাহাদের সংখ্যা বাড়িলে কাজে-কাজেই দরটা কমিতে পারে। আষাঢ়ের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি যে বাংলাদেশে কলেজের ছাত্র এখনকার চারিগুণ অর্থাৎ মোটামুটি ৭২০০০ হইলে তবে উচ্চশিক্ষার বিস্তার স্কটল্যাণ্ডের সমান হইবে। শিক্ষিতের সংখ্যা চারিগুণ হইলে বরপণ হয়ত কমিতে পারে।

বরপণের সপক্ষে বলিবার একটা কথা আছে। বঙ্গে হিন্দুর পুত্রেরা সমুদয় পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, পুত্র থাকিতে কন্যারা কিছুই পায় না। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ইহা যে প্রাচীন হিন্দু আইনের অনুযায়ীও নহে, তাহা রাজা রামমোহন রায় একখানি পুস্তিকায় দেখাইয়াছেন। যাহারা পুত্রের বিবাহ দিয়া পাত্রীর পিতার নিকট

হইতে টাকা আদায় করে, তাহারা সে টাকা পুত্রবধূকে দেয় না বটে ; তথাপি, পিতার সম্পত্তির কোন অংশ পাইতে কন্যা যে অধিকারী নয়, বরপণ প্রকারান্তরে এই অন্যায় ব্যবস্থার এক-প্রকার প্রতিফল ও শাস্তি। কন্যারা চলিত আইন বা সামাজিক রীতি অনুসারে যদি পিতার ধনের আংশিক উত্তরাধিকারী হইত, তাহা হইলে বরপক্ষ পণের জন্য হয়ত এত কষাকষি করিত না। তখনও অবশ্য ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিবার একটা লোভ থাকিত। কিন্তু ধনীর কন্যার বিবাহিত হইবার এই সুবিধা সব দেশেই আছে। নারীত্বের আকর্ষণ, নারীর রূপ ও হৃদয়মনের উৎকর্ষের আকর্ষণ, সাংসারিক সুবিধার লোভ অপেক্ষা যেমন প্রবল হইতে থাকিবে, ধনের জন্য বিবাহ সেই পরিমাণে কম হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু সমাজের এ অবস্থা আনিতে হইলে পুরুষের দেহের মনের হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের পথ যেমন পরিষ্কার থাকা চাই, নারীর দেহের মনের হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের পথও তেমনি পরিষ্কার থাকা চাই ; এবং পুরুষ ও নারীর পরস্পরকে জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিয়া বিবাহ করা চাই। এরূপ বিবাহ ভারতবর্ষে নাই বা চলিবে না, ভাবিয়া, আঁৎকিয়া উঠিলে চলিবে না। ইহাকে "পাশ্চাত্য" বলিয়া উড়াইয়া দিলেও চলিবে না। এরূপ আদর্শ বিবাহ আগে ভারতবর্ষে কোন কোন স্থলে হইত; পাশ্চাত্য দেশেও অনেক স্থলে হয়, কিন্তু সকল স্থলে নয়। বরপণ ও কন্যাপণ-রূপ নীচতা ও বর্ব্বরতা নাশের ইহাই একমাত্র অমোঘ মন্ত্র। এই অস্ত্র লাভ ও প্রয়োগ করিবার জন্য সকল সমাজের লোক প্রস্তুত ও অগ্রসর হউন। সকল সমাজের কথা এই জন্য বলিতেছি যে ব্রাহ্মসমাজেরও প্রত্যেক বিবাহই পূর্ব্বোক্ত আদর্শের অনুযায়ী, একটিও ঘটকালীর বিবাহ নয়, এবং একটি বিবাহেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বরপণ দেওয়া হয় না, ইহা বলা যায় না।

কেরোসিনের কৃপা।

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসী-দের মত ভাল জাতি আর নাই, এবং আমরা বাঙালীরা আবার ভারতবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ভারতবাসীরা কোন গুণেই শ্রেষ্ঠ নহে, কিম্বা বাঙালীরা কোন বিষয়েই ভারত-বর্ষীয়দের মধ্যে অগ্রণী নহে, ইহা আমাদের মত নয়। আমাদের কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। কিন্তু আমাদের অহঙ্কার আমাদিগকে আমাদের দোষের প্রতি যে অন্ধ করিয়া রাখে, ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর, ও দুঃখের বিষয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বাংলাদেশে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেই অনেক নারী কেরোসিন তেলে পরিধানের কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করিতেছে। ইহাতে কি আমাদের কোন দোষ নাই ? আমরা কি এই-সব নারীহত্যার জন্য দায়ী নহি ? পুড়িয়া মরাটা একটা সুখের ব্যাপার নয়, ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। কোন পুরুষের যদি সন্দেহ হয় তিনি ধুতিতে পিরানে কেরোসিন ঢালিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন ; অন্ততঃ উনানের আগুনে বা প্রদীপের শিখায় একটা আঙুল ঢুকাইয়া দিয়া দেখিতে পারেন। জীবন নিতান্ত অসহ্য না হইলে মানুষ পুড়িয়া মরে না।

কেহ কেহ ভাবিতে পারেন যে ২।৪টা মেয়ে মরিল, তাহাতে কিবা আসিয়া যায় ? জীবনটাকে এত তুচ্ছ মনে করা, ইহাই যে ভীষণ ব্যাধি ; আর, ২।৪টা যে মরে, সে-ত কেবল রোগের বাহ্যলক্ষণ মাত্র। সমাজ যে পচিতেছে, ইহা তাহারই চিহ্ন। বহুমূত্র-রোগীর শরীরের কোন একটা জায়গায় একটা দুষ্ট ব্রণ হইলেই সুচিকিৎসক বুঝেন যে রোগীর শরীরের রক্ত দূষিত হইয়াছে, এবং তদনুসারে চিকিৎসা আরম্ভ করেন ; তিনি সমস্ত শরীরটা পচিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন না।

যাহারা এইরূপে আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা করে, তাহারা প্রায়ই অল্পবয়স্কা। সম্প্রতি কেবল একটি ৪০ বর্ষবয়স্কা মহিলার আগুনে পুড়িয়া মরার খবর কাগজে বাহির হইয়াছে। বালিকাদের জীবন আনন্দে আশায় পূর্ণ হইবারই কথা ; মানুষের বয়স বাড়িলে তবে দুঃখে নৈরাশ্যে জীবন একান্ত দুর্বিষহ বোধ হইবার কথা। বালিকা বা তরুণীরা যে আত্মহত্যা করে, তাহার কেবল দুটি কারণ থাকিতে পারে। তাহাদের অল্পবয়সে বিবাহ হয়। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরও বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে

হইলে মন কেমন করে; নূতন জায়গায় মন বসে না, মনটা পালাই-পালাই করে। বালিকারা শ্বশুরবাড়ী গেলে পিতা মাতা ভাই ভগ্নী সঙ্গীদের বিরহে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া থাকে। অনেক শ্বাশুড়ী ননদ ও স্বামী এসব কথা ভুলিয়া যান। শ্বাশুড়ীর নিজের মেয়েটির উপর টান থাকে, কিন্তু বধূরূপিণী অন্য বাড়ীর মেয়েটিও যে তেমনি একটি স্নেহের পাত্রী বালিকা, তাহা অনেক শ্বাশুড়ীর মনে স্থান পায় না। বরং বধূর বাপমায়ের সত্য বা কল্পিত (অধিকাংশস্থলেই কল্পিত) যত দোষ-ত্রুটি বধূ বেচারীর নানা গঞ্জনা লাঞ্ছনা ও শাস্তির কারণ হয়। তাহার উপর অনেকস্থলে অপূর্ণদেহা স্ত্রীর উপর স্বামীর অত্যাচার আছে। এই-সমস্ত কারণে অনেক বালিকা বধূ বড় দুঃখিনী। শিক্ষা পাইলে এবং মুক্ত বাতাসে নানা কাজের মধ্যে বড় হইলে, মানুষের মন শক্ত হয়, দুঃখ সহ্য করিতে পারে। সংসারটা যে কত বড় জায়গা, জীবন যে কিরূপ অমূল্য জিনিস ও কত বৈচিত্র্যপূর্ণ হইতে পারে, তাহা জানা থাকিলে, কোন না কোন উপায়ে দুঃখমুক্তির আশা থাকে, এবং এই আশা মানুষকে আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করে। কিন্তু বঙ্গের অনেক গৃহে বালিকাবধূরা উৎপীড়িত হয়, জীবন আঁধার দেখে, আশার আলোকের একটি কিরণও তাহাদের চোখে পড়েনা, তাহাদের মনও এমন শক্ত নয় যে দুঃখ সহিতে পারে। সুতরাং তাহারা কেরোসিনের শরণ লয়।

শৈশবে ও বাল্যে বিবাহ বন্ধ করা আরো নানা কারণে উচিত। তাহার উপর বালিকাদের আত্মহত্যা নিবারণের জন্য এপ্রথা উঠাইয়া দেওা অবশ্য কর্ত্তব্য। অপ্রাপ্ত-যৌবনা বধূর শ্বশুরালয়ে যাওা ত এখনই উঠাইয়া দেওা কর্ত্তব্য; ইহাকে একটা গুরুতর সামাজিক নিন্দার কারণ বলিয়া গণ্য করা উচিত। তাহার পর শিক্ষা দ্বারা মেয়েদের মনটাকে সবল প্রশস্ত করা চাই। তাহা হইলে তাহারা সামান্য বা গুরুতর কারণে আত্মহত্যাই একমাত্র গতি মনে করিবে না। ভাল বই পড়িতে পারিলে মানুষ অনেক দুঃখদৈন্যে সান্ত্বনা পায়, ও তাহা ভুলিয়া থাকিতে পারে। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারিলেও দুঃখিনীদের মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তাহাদিগকে নিজেদের ক্লেশ ভুলিয়া থাকিতে সমর্থ করে, এবং জীবনের যে অন্ততঃ একটা সার্থকতা আছে তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ করে।

শরীরের সহিত মনের খুব সম্বন্ধ। বাঙালী অন্তঃপুরিকা-দের মধ্যে হিষ্টীরিয়া রোগের এত প্রাদুর্ভাবের একটি কারণ এই যে তাঁহাদের মুক্ত বাতাসে চলাফিরা কাজ করার সুযোগ না থাকায় শরীর সুস্থ সবল নয়, স্নায়ুমণ্ডল (nervous system) প্রকৃতিস্থ নয়। একটু কষ্ট হইলেই, একটু বিরক্তির কারণ হইলেই অনেকেই মূর্চ্ছা যান, অজ্ঞান অবস্থায় হাত পা ছুড়িতে থাকেন। ক্লেশ অবসাদ ও বিরক্তি সহ্য করিবার এই যে অক্ষমতা, ইহা আত্ম-হত্যারও কারণ। সেইজন্য মেয়েদের মুক্ত বাতাসে চলিবার ফিরিবার কাজ করিবার সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিশিয়া চিত্তবিনোদন করিবার সুযোগ করিয়া দেওা একান্ত আবশ্যক। নারীদের যতটুকু স্বাধীনতা মহারাষ্ট্রে পঞ্জাবে ও অন্য কোন-কোন প্রদেশে আছে, তাহা বাঙালীর মেয়ে-দিগকে কেন যে দেওা হয় না, বুঝিতে পারি না। তাহাদের স্বভাব চরিত্র ঐ-সব প্রদেশের নারীদের চেয়ে নিকৃষ্ট, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। তবে কি ইহাই বলিতে হইবে, যে, বাঙালী পুরুষেরা ঐ-সব প্রদেশের পুরুষদের চেয়ে এত দুর্বৃত্ত যে বাঙালীর মেয়ে রাস্তা ঘাটে বাহির হইলেই তাহাদের লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা বেশী? কিম্বা বাঙালী পুরুষেরা ঐ-সব প্রদেশের পুরুষদের চেয়ে এত কাপুরুষ ও ভীরু যে তাহারা নারীদিগকে পথে ঘাটে মাঠে লাঞ্ছনা ও বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে না? এ কথাই বা কেমন করিয়া বলি? নারীদের স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের একটা বাধা দেশাচার। কিন্তু তাহাও দার্জ্জিলিং, কার্সিয়ং, মধুপুর, গিরিডি, বৈদ্যনাথে ভাঙিয়া গিয়াছে। ঐসব জায়গায় ভদ্র সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলারা সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করেন। নারীদের মঙ্গলের জন্য, দেশের কল্যাণের নিমিত্ত, নারীদিগকে আকাশ, মাঠ, ঘাট, নদী, মানুষের মুখ, প্রকৃতির নানা রূপ দেখিতে দেওা হউক। যাঁহাদের গাড়ী জুড়ী মোটর আছে, তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েরাই পথ দেখান। তাঁহাদের পক্ষে ইহা করা সোজা; কারণ তাঁহাদের সম্বন্ধে এ কথা কেহ বলিতে

পারিবে না যে পয়সা নাই বলিয়া তাঁহারা পায়ে হাঁটিতেছেন। যাঁহাদের পয়সা নাই, গাড়ী ঘোড়া নাই, তাঁহারাই বা এরূপ নিন্দা গ্রাহ্য করিবেন কেন? ভগবান হাঁটিবার জন্য পা দিয়াছেন। টাকা আছে বলিয়া, কিম্বা দারিদ্র্য গোপন করিবার জন্য, পা দুখানার ব্যবহার না করিয়া অসুস্থ হইব ও দুর্ব্বল থাকিব, ইহার মত অদ্ভুত বোকামি আর কি হইতে পারে?

শতবর্ষ পূর্ব্বে নারীদের আত্মহত্যা।

আমাদের দেশে নারীদের আত্মহত্যা নূতন নহে। শতবর্ষ পূর্ব্বে গবর্ণর-জেনারেল মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস্ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তখন অনেক মেয়ে কূয়োতে লাফ দিয়া প্রাণত্যাগ করিত। মার্কুইস্ তাঁহার রোজনামচায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

"An extraordinary confirmation has just occurred of the persuasion entertained by me respecting the melancholy tone of life which is the lot of women in this country......Some momentary impulse of vexation acting on minds sick of a vapid nothingly existence has most likely been the cause of this strange circumstance. Incapacitated from mental resources by want of education and want of intercourse with others, at the same time debarred from corporeal activity by their inflexible customs, they feel so oppressive a void that the superaddition of any incidental disgust renders the facility of indulging despondency irresistible."

তাঁহার মন্তব্যের তাৎপর্য্য এই যে, শিক্ষার অভাবে, অপরের সহিত সাহচর্য্য এবং তদ্দ্বারা ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদানের অভাবে, এবং সামাজিক প্রথাবশতঃ গতিবিধি বা অন্যপ্রকারের অঙ্গসঞ্চালনের সুযোগ না থাকায়, নারীদের জীবনে এমন একটা বিষাদ ও শূন্যতা অনুভূত হয়, যে, তাহার উপর কোন বিরক্তি বা বিতৃষ্ণার কারণ ঘটিলেই তাহারা সম্পূর্ণরূপে নৈরাশ্য অবলম্বন করে।

মার্কুইস্ অন্যত্র আমাদের নারীগণের অনেকের জীবন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"The existence of the women is at all times dreary. They have none of that society with their nearest neighbors which cheers even the lowest classes in Europe. They have not either mental food or domestic occupation to fill their time in their almost unbroken confinement within their dark, inconvenient dwellings. Their incapacity to instruct their children precludes the amount of resource which that would afford, so that their minds are in complete stagnation, and suffer all the irksome lassitude of such a state."

অর্থাৎ এই-সব স্ত্রীলোকদের জীবন সব সময়েই নিরানন্দ। তাহারা প্রায় সব সময়েই তাহাদের অল্পালোক অসুবিধাপূর্ণ গৃহে আবদ্ধ থাকে; লেখা পড়া না জানায় পুস্তক পড়িয়া কালক্ষেপ করিতে পারে না; সময় কাটাইবার মত বাড়ীর কাজও যথেষ্ট থাকে না। সন্তানদের শিক্ষা দিবার শক্তি না থাকায় সেদিক দিয়াও জীবনে বৈচিত্র্য আসে না। কাজেই একটা অবসাদ অনিবার্য্য।

এই মন্তব্য সকল-শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে সত্য না হইলেও, এবং অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ না হইলেও, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক নহে।

ভ্যাঙান।

ছেলেমেয়েদের জন্য খৃষ্টিয়ানদের "বালক" নামে একটি মাসিক কাগজ আছে। তাহার বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ্চ সংখ্যায়, "দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন," শীর্ষক ধর্ম্মসঙ্গীতটির একটা "রঙ্গানুকৃতি" দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রচলিত কবিতার ব্যঙ্গ অনুকরণ রচনা করিবার একটা রীতি আছে বটে; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ধর্ম্মসংগীতগুলিকে না ভ্যাঙাইলেই ভাল হয়;—বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের জন্য প্রকাশিত কাগজে।

মুদ্রাযন্ত্র আইন।

১৯১০ সালের ১নং আইনকে ১৯১০ সালের ভারতবর্ষীয় মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন বলা হইয়া থাকে। এই আইনটা ইহার রচয়িতা রিজলী অষ্ট্রিয়ার একটা আইনের নমুনা অনুসারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার ভিন্ন ভিন্ন ধারা অনুসারে, যে প্রেস্ চালায় তাহার নিকট হইতে এবং যে সংবাদপত্র প্রকাশ করে তাহার নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট জামিন লইতে পারেন। এই আইন অনুসারে জামিনের পরিমাণ বাড়াইবার, জামিনের টাকা বাজেআপ্ত করিবার, এবং ছাপাখানা, ও প্রকাশিত সংবাদপত্রাদি বাজেআপ্ত করিবার ক্ষমতাও গবর্ণ-

মেণ্টের আছে। আইনটির মুসাবিদা এরূপ মুন্শিয়ানার সহিত করা হইয়াছে, যে, যে-কোন সংবাদপত্রকে ইহার জালের মধ্যে আনা যায়। "কম্‌রেড্‌" কাগজের মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি সার্ লরেন্স জেঙ্কিন্সও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশী লোকদের চালিত সব কাগজের কাছ থেকে যে জামিন লওয়া হয় নাই, এবং সব কাগজ যে বাজেআপ্ত হয় নাই, তাহা গবর্ণমেণ্টের দয়া মাত্র; প্রকৃত প্রস্তাবে কেহই আপনাকে নিরাপদ বা নিরপরাধ মনে করিতে পারেন না।

জামিন লইবার ও বাজেআপ্ত করিবার, এবং সংবাদপত্র ও ছাপাখানা বাজেআপ্ত করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট খুব মানবচরিত্রজ্ঞান ও চতুরতা দেখাইয়াছেন। কারণ সব্ দেশেই দেখা যায়, মানুষ স্বাস্থ্য, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা, এমন কি প্রাণের চেয়েও, কার্য্যতঃ, সম্পত্তিকে বেশী মূল্যবান্ মনে করে। ডাক্তারকে ২ টাকার জায়গায় ৪ টাকা দিতে, ঔষধ কিনিতে, জলবায়ু পরিবর্ত্তনার্থ স্থানান্তরে যাইতে, লোকে কত ইতস্ততঃ করে, অনেকে চিকিৎসা-বিষয়ে কৃপণতা ও বিলম্ব করায় প্রাণ হারায়; কিন্তু সামান্য সম্পত্তির মোকদ্দমায় ঐ-সব লোকই সাধারণ উকীল মোক্তারকে শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের চেয়ে বেশী টাকা দেয়। বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টারের ত কথাই নাই। তাদের সমান টাকা কোন ডাক্তারই পান না। সুতরাং সম্পত্তিনাশের ভয় দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালকদিগকে খুব জব্দ করিয়াছেন। ইহাতে বেশ বুদ্ধিমত্তাও প্রকাশ পাইয়াছে। এই আইন হইবার আগে একজন সম্পাদক জেলে গেলে আর একজন তাহার আসন গ্রহণ করিত। কিন্তু এখন একবার জামিনের টাকা বা ছাপাখানা বাজেআপ্ত হইলে তাহার জায়গায় আবার টাকা জোগান বা ছাপাখানা স্থাপন করা সম্ভবপর হয় না। তা ছাড়া অনেকস্থলে ছাপাখানার ও সংবাদপত্রের মালিক স্বতন্ত্র। সম্পাদক হয়ত তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি আগেকার আইন অনুসারে হয়ত জেলে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু নিজের প্রকৃত মত লিখিয়া ১৯১০এর আইন অনুসারে, সংবাদপত্রটির মালিকের এবং ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীর সম্পত্তিটি নষ্ট করিতে চান না। এইসব কারণে গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রটি বেশ কার্য্যকর হইয়াছে। অবশ্য ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের কাগজগুলার কথা স্বতন্ত্র। তাহারা বরাবর এমন অনেক কথা লিখিয়া আসিতেছে যে নিরপেক্ষভাবে আইনটির প্রয়োগ করিলে তাহাদের সমুদয় কাগজই এতদিন উঠিয়া যাইত। কিন্তু জা'তভাই সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে বেশ নির্ভয় অবস্থায় রাখিয়াছেন।

এই আইন্ যখন পাস্ হয়, তখন এইরূপ বলা হইয়াছিল যে রাজনৈতিক হত্যা, সশস্ত্র বিদ্রোহ, ইত্যাদি কাজে যে-সব কাগজ মানুষকে প্রবৃত্ত ও উত্তেজিত করে, তাহাদের দমনের জন্য ইহা প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ অন্য কারণেও কোন দেশী কাগজ ইংরেজ রাজপুরুষদের বিরক্তিভাজন হইলে তাহার উপর আইনের অস্ত্রনিক্ষেপ বরাবর করা হইতেছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকিলে দেশের শাসন-প্রণালীর উন্নতি হওয়া অসম্ভব। কোন মানুষই অভ্রান্ত নয়। নিজের অভিসন্ধি ও কাজ অকাজ ত্রুটি অবহেলা সম্বন্ধে অপরের সত্য নির্ভীক মত জানিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। ইহা প্রীতিকর নয়, কিন্তু ইহা আবশ্যক।

যে দেশে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নাই, সেখানে সকল রকমের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভবপর নয়। কারণ, সাহিত্য মানুষের আত্মার একপ্রকার বাহ্যপ্রকাশ। অসঙ্কোচে নির্ভয়ে সত্য বলিতে লিখিতে যে পারে না, সে প্রকারান্তরে সত্য চিন্তা করিতে ভাবিতেও অনভ্যস্ত ও অক্ষম হইয়া যায়। এমন মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আশা করা যায় না। প্রেস-আইনের দ্বারা কেবল যে শাসনের উৎকর্ষের ব্যাঘাত হইয়াছে, ছাপাখানা- ও সংবাদ-পত্র-পরিচালকদের অসুবিধা হইয়াছে, তাহা নহে; দেশের মানুষগুলাও বড় হইতে পারিতেছে না, সাহিত্যও অবাধে বিকশিত হইতে পারিতেছে না।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ।

বাঁকুড়ার অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের শেষ রিপোর্ট এই যে, অবস্থা পূর্ব্ববৎ আছে। চাল সেই টাকায় ৮ সেরই আছে। রোআ পোঁতা চলিতেছে বলিয়া এখন অনেক লোক কাজ পাওয়ায় সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা কমিয়াছে।
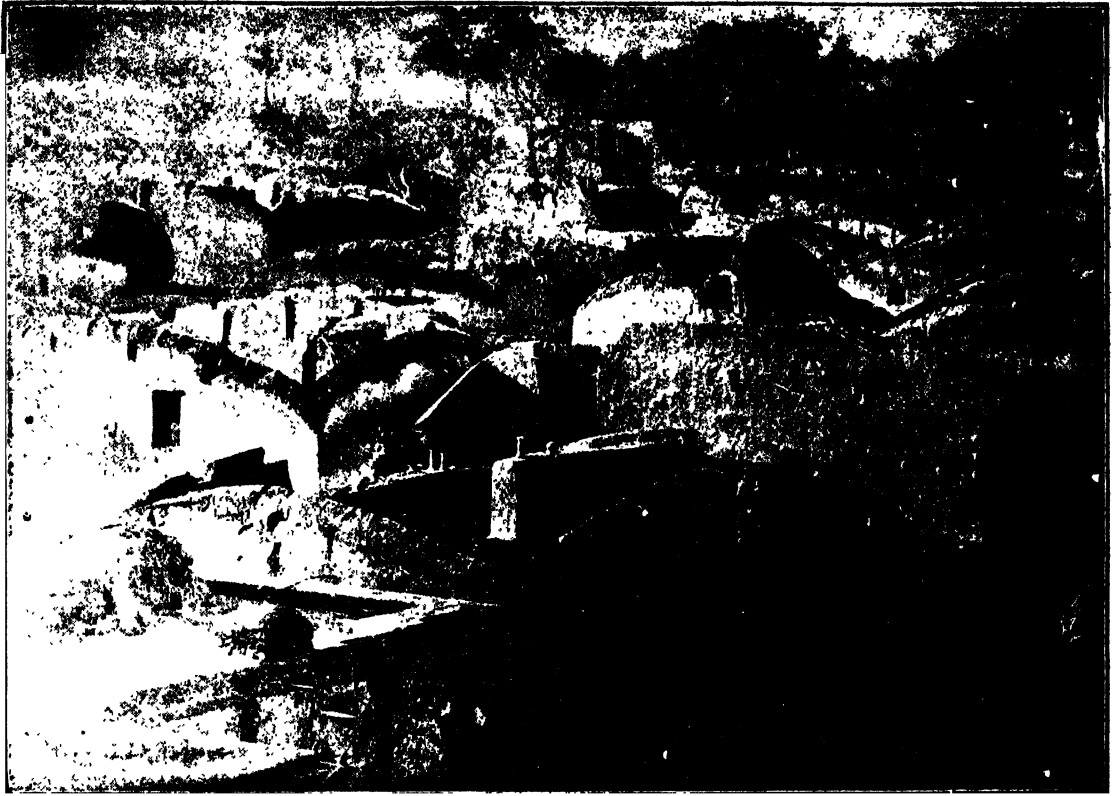
অগ্নিকাণ্ডের পর তিলুড়ীর একটি দৃশ্য। বাঁকুড়া সম্মিলনীর জন্য গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে।

রোআ পোঁতা শেষ হইয়া গেলেই আবার সাহায্য-প্রার্থীর সংখ্যা পূর্ব্ববৎ হইবে। কয়েক মাস পরে ধান কাটা ও মাড়া হইয়া গেলে আর সাহায্যের দরকার না হইতে পারে। তাহার আগে পর্য্যন্ত সকলে টাকা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

ধান কিরূপ হইবে, এখনও বুঝা যাইতেছে না। বাঁকুড়া-দর্পণ বলিতেছেন :—

মধ্যে কয়েক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় চাষ আবাদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর আর সকলস্থানব্যাপী সুচারু বৃষ্টি হয় নাই। এজন্য সকল স্থানে এখন ধান্য রোপণ কার্য্য চলিতেছে না। গত বৎসর বৃষ্টির অভাবে অনেক জমি আবাদ হয় নাই, তাই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এবারও যদি সর্ব্বত্র সুচারু বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে স্থানে স্থানে প্রজার কষ্টের অবধি থাকিবে না। কেবল নিম্নভূমিগুলি আবাদ হইতেছে, উচ্চ ভূমির জন্য আরও বৃষ্টির আবশ্যক। কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও নাই। কোন কোন স্থানে ধান্য রোপণ কার্য্য চলিতেছে, আর কোন কোন স্থানে বৃষ্টির অভাবে ধান্য রোপণ বন্ধ আছে। ছাতনা থানার কোন কোন স্থানে বৃষ্টির বড়ই অভাব। অচিরাৎ একটা বৃষ্টি না হইলে বীজগুলি মরিয়া যাইবার আশঙ্কা। ভগবানের নিকট সকাতরে প্রার্থনা যে এবার যেন সর্ব্বস্থানব্যাপী বৃষ্টি হয়।

অনেকগুলি গ্রামে আগুন লাগায় লোকেরা নিরাশ্রয় হইয়াছে। তিলুড়ীগ্রামে আগুন লাগায় গ্রামের ও লোকদের কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য বাঁকুড়া-সম্মিলনী একজন স্বেচ্ছাসেবককে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দুখানি ফোটোগ্রাফ আনিয়াছেন; তাহা মুদ্রিত হইল। যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করা হইয়াছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে বর্দ্ধমানের মহারাজা দুর্ভিক্ষে কেবল ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। ৮ই জুলাইএর বাঁকুড়া-দর্পণে দেখিয়া সুখী হইলাম যে তিনি আরও ২৫০০ দান করিয়াছেন।

ফোটোগ্রাফিক সমালোচনা।

দেশের লোকদের ও গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা সচরাচর কথিত, লিখিত ও মুদ্রিত কথার দ্বারা করা হয়। কিন্তু

তিলুড়ীর কতকগুলি দুর্ভিক্ষপীড়িত গৃহহীন অধিবাসী। বাঁকুড়া-সম্মিলনীর জন্য গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে।

ছবি দ্বারাও করা যাইতে পারে। আমরা এ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নরনারী বালকবালিকাদের যে-সব ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়াছি, তাহা সমালোচনার জন্য করি নাই; তাহা দেখিয়া উপবাসী ক্ষুধিত মানবের প্রতি দয়ার উদ্রেক হইতে পারে, এই মনে করিয়া ছবিগুলি ছাপিয়াছি। কিন্তু সমালোচনা করিবার কোন অভিপ্রায় আমাদের না থাকিলেও, এই ছবিগুলি নীরবে দেশবাসী জ্ঞানী ধনী মানী ক্ষমতাশালী লোকদের ও সর্ব্বসাধারণের এবং শাসন-কর্ত্তাদের যে সমালোচনা করিতেছে, তাহার কোন জবাব নাই। মানুষগুলির এমন দশা কেন হইল? দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাসকলের কোন দোষ ত্রুটি অসম্পূর্ণতা পক্ষপাতিত্ব একদেশদর্শিতা কি ইহার মূলে নাই? বৃষ্টি না হইলেই দুর্ভিক্ষ হইবে, ইহা একটা অলঙ্ঘ্য অনিবার্য্য প্রাকৃতিক নিয়ম নয়। রুশিয়া ছাড়া ইউরোপের কোন দেশে এখন আর দুর্ভিক্ষ হয় না, আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ হয় না; কিন্তু সেই-সব দেশেও অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি হইয়া থাকে। আমাদের দেশের লোকেরা ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, খাইতে না পাইয়া মরণোন্মুখ হইলেও দাঙ্গাহাঙ্গামা করে না, ধনীদের রাজপুরুষদের ঘরদুআর ভাঙে না; তাহাদিগকে যে-পথে চালাইবে সেই পথেই চলিতে তাহারা প্রস্তুত। তাহারা পরিশ্রমী, ও মোটের উপর মিতব্যয়ী, এবং বুদ্ধিমান্। দেশে উর্ব্বরা জমি আছে, এবং নানাপ্রকার শস্য ফল মূল জন্মে। এহেন দেশে নিরক্ষর, অর্দ্ধনগ্ন, গৃহহীন বা প্রায় গৃহহীন, আজীবন বা আমরণ বুভুক্ষিত শীর্ণদেহ কঙ্কালসার মানুষ যে দেখা যায়, তাহার জন্য আমরা দায়ী এবং আমাদের শাসনকর্ত্তারা দায়ী। অনশনে মৃত্যু হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য সামান্য কিছু টাকা খরচ করিয়া আমাদের ও শাসনকর্ত্তাদের নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না; বিবেকের চোখে এমন করিয়া ঠুলি দেওয়া যায় না। দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভ-কাল হইতে প্রতি সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা গেজেটে পড়িয়া আসিতেছি, "the relief measures are adequate," "দুর্ভিক্ষক্লেশ নিবারণের ব্যবস্থাসমূহ পর্য্যাপ্ত বা যথেষ্ট"। তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে এই-সব জীবিত সঞ্চরমান কঙ্কাল কোথা হইতে আসে?

শাসননীতির, শাসনপ্রণালীর, শিক্ষানীতির, শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক ব্যবস্থার, রেলওে-নীতির, দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার, ভূমিকরবিষয়ক আইনের, আমূল কি কি পরিবর্ত্তন করিলে দুর্ভিক্ষের কারণগুলি বিনষ্ট হইতে পারে, গবর্ণমেন্টের তাহা স্থির করিয়া তদনুসারে কাজ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা শিক্ষিত, জ্ঞানী, ধনী, ক্ষমতাশালী তাঁহারাও দেশের লোককে শিক্ষিত, সুস্থ, উপার্জ্জনক্ষম করিতে চেষ্টা করুন।

দু একজন রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে বিদেশে পাঠাইয়া আমরা প্রমাণ করিতে পারিব না যে আমরা উন্নত জাতি। ছবিগুলি দেখাইতেছে, আমরা এখনও সম্যক্ উন্নত, হৃদয়বান্, ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হই নাই। বড় বড় রিপোর্ট এবং বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশীর সাক্ষ্য দ্বারা ইংরেজেরা প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রতি কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় করিতেছেন। ছবিগুলি তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহারা জাগুন, আমরা জাগি। এখনও সময় আছে।

রাজনৈতিক হত্যা।

সম্প্রতি তিনজন পুলিশ কর্ম্মচারী গুলির আঘাতে হত হওয়ায়, কিরূপে রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। এপর্য্যন্ত যতগুলি রাজকর্ম্মচারী হত হইয়াছেন, সকলেরই হত্যা "রাজনৈতিক" কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে। নির্য্যাতিত উত্তেজিত লোকেরা প্রতিহিংসাবশেও খুন করিতে পারে। হত্যা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে ইংরেজদের কাগজগুলি প্রায় একমত। তাঁরা চান আরও কড়া আইন, আদালতে বিচারের আরও হ্রাস, পুলিশের ও মাজিষ্ট্রেটদের আরও ক্ষমতাবৃদ্ধি। লর্ড কারমাইকেলেরও বোধ হয় মত কতকটা এইরূপ। কারণ তিনি ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই মনে হয়, যে, আইন পুলিশকে ও গবর্ণমেন্টকে বিনা অভিযোগে ও বিনা বিচারে সন্দেহভাজন লোকদিগকে আটক বা নির্ব্বাসন করিবার যে ক্ষমতা দিয়াছে, সে ক্ষমতা না থাকিলে দেশের অবস্থা আরও মন্দ হইত, এবং যদি আরও বেশী ক্ষমতা আইন অনুসারে গবর্ণমেন্ট ও পুলিশ পান, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। ভারত-রক্ষা-আইন (Defence of India Act) অনুসারে এইরূপ ক্ষমতা যখন পুলিশের ছিল না, তখনকার চেয়ে এখন দেশের অবস্থা কিসে যে ভাল হইয়াছে, বুঝিতে পারি না। ডাকাতি, "রাজনৈতিক" খুন ঠিক্ পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। গবর্ণমেন্ট বলিতে পারেন, "আমরা ১৯০ জনকে নজরবন্দী এবং ২১ জনকে নির্ব্বাসন না করিলে এসব উপদ্রব আরও বাড়িত।" কিন্তু ইহা ত একটা উক্তি মাত্র; ইহা কিরূপে প্রমাণ করা যাইবে? বিনা প্রমাণে কাহারও উক্তি ভ্রমহীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তা তিনি যত উচ্চপদস্থই হউন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যুদ্ধে ব্যাপৃত বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে যুদ্ধকালীন সঙ্কট অবস্থা (state of war) ঘটে নাই; তাহার প্রমাণ, সামান্য কয়েক হাজার সৈন্য দেশে থাকা সত্ত্বেও সাড়ে একত্রিশ কোটি লোক ঠাণ্ডা হইয়া চুপ করিয়া আছে। অপরাধী ধরিতে না পারায় পুলিশের অক্ষমতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এহেন ঠাণ্ডা দেশে যুদ্ধের ওজুহাতে পুলিশের ও মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা বাড়াইয়া দিবার কোন কারণ দেখা যায় না। সরকারপক্ষ হইতে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, ভারত-রক্ষা আইন বিলাতী দেশরক্ষা আইনের (Defence of the Realm Act) মত। কিন্তু বিলাতে যাহারা যুদ্ধে ব্যাঘাত দেয়, বা শত্রুর সুবিধা করিয়া দেয়, বা শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, এই আইন তাহারই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। এখানে তাহা হইতেছে না। কোন বাঙালী যুদ্ধে ব্যাঘাত দিয়াছে বলিয়া শুনি নাই; বরং বাঙালীরা সিপাই হইয়া ইংরেজের সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেন্ট বাঙালীকে সিপাই হইতে দিলেন না। যে সব লোককে নজরবন্দী করা হইয়াছে, তাহাদের অনেকের সহিত যে জার্ম্মেনদের কোন সংস্পর্শ বা সম্পর্ক ঘটে নাই তাহা লর্ড কারমাইকেল নিজেই বলিয়াছেন। এদেশীয়ের সঙ্গে জার্ম্মেনদের কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল কি না সে বিষয়ে আমাদের খুব সন্দেহ আছে। ভারত রক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ হইতেছে কি না গবর্ণমেন্ট ধীর ভাবে বিচার করুন। পুলিশের প্রকৃত অপরাধী ধরিবার ক্ষমতা কিসে বাড়ে, পুলিশের লোকদের দ্বারা নির্দ্দোষী লোকেরা উৎ-

পীড়িত কম হইতে পারে কেমন করিয়া, তাহার উপায় চিন্তা করাই বেশী দরকার। যাহারা আইনভঙ্গ করে, তাহাদিগকে ধরিয়া শাস্তি দিতে হইবে বটে; কিন্তু দেশের শাসননীতি ও শাসনব্যবস্থা এরূপ করিতে হইবে যাহাতে অসন্তুষ্ট, বা কর্ম্মহীন, বা সাহসের কাজ করিতে ব্যগ্র লোকেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া বিপ্লবপ্রয়াসীদের দলে না যায়। দেশী সম্পাদকেরা যে সন্তোষিণী নীতি (conciliatory policy) অবলম্বন করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন, তাহার মানে এ নয় যে রাজনৈতিক হন্তা ও ডাকাতদিগকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগকে রসগোল্লা খাওাইয়া এক-একটা জায়গীর দিয়া ছাড়িয়া দেওা হউক। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, আদালতে বিচার করিয়া অপরাধীদিগের দণ্ড দেওা হউক, এবং রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে ব্যবস্থা এরূপ করা হউক, যাহাতে তীব্র অসন্তোষ লোকের মনে স্থান না পায়। কারণ, তীব্র অসন্তোষ থাকিলে যাহাদের বয়স অল্প ও রক্ত গরম তাহারা কেহ কেহ বিপ্লবপ্রয়াসীদের দলে যায়; বয়োজ্যেষ্ঠদের উপদেশ এবং আইনের ভয় তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। কিন্তু যদি তীব্র বিরক্তি না থাকে, তাহা হইলে বিপ্লবপ্রয়াসীদের দল পুষ্ট হইতে পায় না, সুতরাং কালে তাহা লোপ পাইতে পারে। কেবল কড়া আইন করিয়া এবং তাহাদিগকে ধরিয়া ফাঁসী দিয়া তাহাদের উচ্ছেদসাধন দুঃসাধ্য, হয় ত অসাধ্য।

দেশে যোগ্য লোক থাকিতে বিদেশ হইতে কর্ম্মচারী আমদানী করিলে দেশে অসন্তোষ বাড়ে, কর্ম্মহীন লোকের সংখ্যাও বাড়ে। নানা রকমে দেশী লোকদের শিল্প-বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে। তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে গবর্ণমেণ্ট অন্তরের সহিত তৎপর হইলে বেকার লোকের সংখ্যা কমিয়া যায়। ক্ষুধা ও বিপ্লববাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; ভরা-পেটে বিপ্লব কোন দেশের লোক করে নাই, ইতিহাস ভাল করিয়া না ঘাঁটিয়া এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ক্ষুধিত মানুষ বেশী উত্তেজিত হয়, ইহা সবাই জানে।

ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের কাগজে আমাদিগকে কখন রাজদ্রোহী কখন মিথ্যাবাদী কখন বা ভীরু বলা হয়। গবর্ণমেণ্ট কোন উচ্চবাচ্য করেন না; গত বৎসর পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সরকারী রিপোর্টে সমস্ত বাংলা দেশের লোককে কাপুরুষ বলিলেন; গবর্ণমেণ্ট তাহার উপর কোনই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। এই-সব কারণে দেশময় একটা ঠাণ্ডাভাব খুব বাড়িতে থাকে, বলিলে, সত্য বলা হয় না। লণ্ডনস্থ ভারতসচিব, গবর্ণর জেনারেল, গবর্ণর, লেফটেনেণ্ট গবর্ণর, প্রভৃতি রাজপুরুষেরা কখন কখন ভারতবাসীদের রাজভক্তি আদির প্রশংসা করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের জা'তভাই সম্পাদকেরা ভারতবাসীদিগকে রাজদ্রোহী বলিলে তাঁহারা চুপ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইংরেজের আসল মনের কথা যে কোন্‌টা, তাহা সরল ভারতসন্তানেরা স্থির করিতে পারে না।

আমাদের দেশের ছেলেরা মানুষ খুন করে ও ফাঁসী যায়, ইহা আমরা চাই না; দেশের প্রতি প্রীতি হইতে সমুদ্ভূত কঠিন কাজে তাহাদের দীর্ঘ জীবন যাপিত হয়, ইহাই আমরা চাই। কিন্তু হত্যা নিবারণের উপায়-স্বরূপ যদি গবর্ণমেণ্ট বলেন, "তোমরা পুলিশের হাতে ধন প্রাণ সমর্পণ করিতে রাজী হও", তাহাতে আমরা সায় দিতে পারি না। সব মানুষের ভুলচুক, লোভ, ক্রোধ হইতে পারে। যে কাজের জন্য প্রকাশ্য জবাবদিহি করিতে হয় না, এরূপ কাজ করিবার ক্ষমতা কোনও লোককে যত কম দেওা হয়, ততই ভাল।

পুলিশের অপরাধী ধরিবার ক্ষমতা।

পুলিশের যে-সব কর্ম্মচারী বিপ্লবপ্রয়াসীদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাঁহারা সবাই বাঙালী; বন্দুকের গুলিতে তাঁহাদেরই প্রাণ যায়। কিন্তু, অপরাধী ধরিবার সাক্ষাৎ চেষ্টা যদিও তাঁহারাই করেন, প্রাণও যায় তাঁহাদের, তথাপি পদে বেতনে তাঁহারা ইংরেজের নীচে থাকেন। ইহা পুলিশের অপরাধী ধরিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত না হইবার একটি কারণ। কাজের দায়িত্ব, গুরুত্ব, ও বিপদ অনুসারে যদি মানুষের পদ ও বেতন বাড়ে, তাহা হইলেই সেই কাজে বুদ্ধি ও সাহস-সম্পন্ন লোকে বেশী যায়, এবং যাহারা সে কাজে আছে, তাহাদেরও বুদ্ধি ও সাহস খোলে বেশী।

পুলিশের সর্ব্বোচ্চ কাজগুলিতে ইংরেজরা অধিষ্ঠিত। কিন্তু কালা আদমির দেশে ইংরেজ নিজবেশে নিজমূর্ত্তিতে

চোর ডাকাত নরহন্তা ধরিতে গেলে নিজেই আগে চেনা পড়িবেন, সুতরাং পাখী পলাইবে। রং মাখিয়া পোষাক বদলাইয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও, দেহের আকৃতি আয়তন, নাকমুখের গড়ন, চোখের রং, কথার উচ্চারণ ও ভঙ্গী তাঁহাদিগকে চিনাইয়া দিবে। স্টীম্যান পথে ঘাটে গাছে গাছে চলে না। ইংরেজের দ্বারা এদেশে সাক্ষাৎ ভাবে অপরাধী ধরা সহজ নয়। অথচ বাঙালীরাও একাজে যথেষ্ট উৎসাহ পায় না।

বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ।

বাংলাদেশ ইংলণ্ডের মত স্বাস্থ্যকর নয় বলিয়া এখানে বিলাতের চেয়ে বেশী শিক্ষিত চিকিৎসক থাকা দরকার, চিকিৎসা শিখাইবার বিদ্যালয়েরও বেশী দরকার। কিন্তু অবস্থাটা ঠিক্ তার উল্টা।

বাংলার লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ, গ্রেটব্রিটেন-আয়র্লণ্ডের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৫২ লক্ষ,—প্রায় সমান সমান। বাংলা দেশে এপর্যন্ত ছিল একটি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও দুটি সরকারী মেডিক্যাল স্কুল, এবং দুটি কি তিনটি বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুল। আমরা এলোপ্যাথিক শিক্ষালয়গুলিই ধরিতেছি। মোট ধরুন ছয়টি কি সাতটি। ইহার মধ্যে বেলগাছিয়ার বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুলটি কলেজে পরিণত হইয়াছে।

অন্যদিকে বিলাতে শুধু লণ্ডনেই চিকিৎসা শিখিবার ২০টি স্থান আছে, এবং লণ্ডনের বাহিরে দেশের নানা স্থানে আরও ২৮টি আছে। এ সমস্তই যে গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছেন, তাহা নহে; দেশের ধনী লোকেরা বিস্তর টাকা দিয়া হাঁসপাতাল ও তৎসংসৃষ্ট শিক্ষালয় খুলিয়াছে।

বঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর পীড়িত হয়। তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত ডাক্তারের সাহায্য পায় না বলা যাইতে পারে। সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুলগুলিতে যত ছাত্র ভর্ত্তি হইতে চায়, তাহার সিকিরও স্থান হয় না। গত বৎসর ৭২৫ জন ছাত্র মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইতে চায়; তন্মধ্যে কেবল ১৩৭ জন স্থান পাইয়াছিল। এ অবস্থায় যে-সকল মহানুভব ডাক্তার ও ধনী লোক বেলগাছিয়া স্কুলটিকে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহারা যে দেশের কি উপকার করিতেছেন বলা যায় না। ইহাতেও চিকিৎসাশিক্ষার্থী সমুদয় ছাত্রের স্থান হইবে না। ইহাকে আরও বড় করিতে হইবে, এবং আরও মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট বেলগাছিয়া কলেজে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। আশা করি প্রয়োজনমত আরও টাকা গবর্ণমেণ্ট দিবেন। প্রজাদের স্বাস্থ্য ও প্রাণ রক্ষা সরকারের অন্যতম কর্ত্তব্য। দেশের লোকদের মধ্যে জমিদারদেরই এই কলেজে সকলের চেয়ে বেশী টাকা দেওয়া উচিত। তাঁহারা পল্লীগ্রামের লোকদের পরিশ্রমে-উৎপন্ন ধনে ধনী। পল্লীগ্রামগুলি শহর অপেক্ষা এখন বেশী অস্বাস্থ্যকর ও বাসের অযোগ্য হইয়াছে; চিকিৎসকের অভাবও সেখানে বেশী। এই অভাব দূর করিবার চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে; কিন্তু যাঁহারা পল্লীগ্রামসমূহ হইতে বিনা শ্রমে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপকার পান, এ বিষয়ে তাঁহাদেরই দায়িত্ব বেশী।

ধনী ও দরিদ্র।

ধন ও ধনীর নিন্দা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক ধন ও ধনী যেমন নিন্দার্হ নহে, দরিদ্রতা ও দরিদ্রও তেমনি প্রশংসার্হ নহে। ধনের সদ্ব্যয় যে করে না, সে নিন্দার্হ; যে অপব্যয় করে সে নিন্দাভাজন, যে পাপকার্য্যে ব্যয় করে, সে অতি অধম। বড় বড় পুকুরে জল জমিয়া থাকিলে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ, স্নান, শস্যক্ষেত্রে জলসেচন, কত কাজ হয়। তদ্রূপ এক একজন মানুষের হাতে প্রভূত ধন সঞ্চিত থাকিলে দেশের খুব উপকার হইতে পারে। কোনও সৎকাজের জন্য ১০।২০ লক্ষ টাকার দরকার হইলে দুএক পয়সা করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে বিস্তর শ্রম ও সময় লাগে; দেশে দানশীল ধনী থাকিলে কাজটি সহজে হইয়া যায়। ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হইলে, খাল বা পুকুর হইতে জল সেচন, কূপ হইতে জল সেচন, এবং গ্রামের প্রত্যেক গৃহ হইতে এক এক বাটী জল আনিয়া সেচন, ইহার মধ্যে কোন্ কোন্ উপায়ে কাজ সহজে হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে।

প্রতিবেশীর নিন্দা।

কটকে "উৎকল-সাহিত্য" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয় উদারচেতা ধীর দেশহিতৈষী বলিয়া ওড়িশায় প্রসিদ্ধ। আষাঢ় মাসের "উৎকল-সাহিত্যে" তিনি কি লিখিয়াছেন, পড়ুন।

"একজন বঙ্গীয় ভ্রমণকারী (শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়) স্বীয় পুস্তকে ওড়িআ জাতি সম্বন্ধে নানা অকথ্য নিন্দা রটনা করিয়াছেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি এত বড় জাতিটার প্রকৃতি রীতি নীতি এক পলকে বুঝিয়া গেলেন ও অকুণ্ঠিতভাবে নিজের অভিজ্ঞতা পুস্তকনিবদ্ধ করিয়া দিলেন; এই শ্রেণীর অদূরদর্শী লেখকগণের উক্তিকে আমরা অনায়াসে উপেক্ষাদৃষ্টিতে অগ্রাহ্য করিতে পারি। কিন্তু ইহাই ত মাত্র নহে; অনেক খ্যাতনামা বঙ্গীয় লেখকও ওড়িআ এবং অপরাপর জাতি সম্বন্ধে অকুণ্ঠিতভাবে কত ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন,—নির্বিবাদে তাহা বঙ্গসাহিত্যে স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ভারতীয় মহাজাতি গঠনে বঙ্গীয়গণ অগ্রবর্ত্তী বলিয়া

দাবি করিয়া থাকেন। এই কি তাহার সুগম পন্থা? আমরা জানি, বঙ্গীয় নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে বহু উদারচেতা উন্নতহৃদয় ব্যক্তি আছেন; এপ্রকার ক্ষুদ্রত্ব তাঁহাদিগের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। কিন্তু এপ্রকার মূঢ়তার তীব্র প্রতিবাদ করা কি তাঁহাদিগের উচিত নহে? তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার প্রতীকার হইবে না। এত সহজ কথাটা বুঝাইতে বেশী বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গের উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি ইহার প্রতি না পড়া নিতান্ত ক্ষোভের কথা। কখন পড়িবে কি না কে জানে?"

গঞ্জাম হইতে "আশা" নামে একখানি ওড়িআ সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতে বঙ্গীয় ভ্রমণকারীর ওড়িআ জাতির নিন্দার প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে "উৎকল-সাহিত্য"-সম্পাদক লিখিয়াছেন,

"আশার" লেখক প্রতিবাদ করিতে যাইয়া স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গের কুলবালাগণের প্রতি যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহা আদৌ অনুমোদন করিতে পারি না। মাতৃজাতি সর্ব্বত্র মাতৃসম্মানার্হ। তাঁহাদের সম্বন্ধে অসংযত ভাষা প্রয়োগ সর্ব্বথা গর্হিত। মূঢ়তার প্রতিবাদ করিতে মূঢ়তা প্রকাশ করা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে।"

"উৎকল-সাহিত্যে"র সম্পাদক মহাশয় এই-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। তিনি ভ্রমণকারীর মূঢ়তা ও অবিবেচনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্। বহিখানা আমরা দেখি নাই বোধ হয়, লেখককেও চিনি না।

পূর্ব্ববঙ্গের নিন্দুক।

"ইংলিশম্যান" কাগজ লিখিয়াছে, ডাকাতি, পুলিশ-হত্যা প্রভৃতি কাজ পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরাই করে; তাহাদিগকে পূর্ব্ববঙ্গেই আবদ্ধ রাখা উচিত। এমন সহজসাধ্য সুপরামর্শ আর কেহ দিতে পারিত না। জার্ম্মেনীর সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ হইতেছে; অথচ এখনও ইংলণ্ডে অনেক জার্ম্মেন রহিয়াছে। ইংলিশম্যান এমন বুদ্ধিমান যে এক-ভাষাভাষী একদেশবাসী কতকগুলি লোককে তাহাদের প্রতিবেশীদিগের হইতে পৃথক করিয়া রাখা সম্ভব মনে করে। সমুদয় পূর্ব্ববঙ্গের লোককে আণ্ডামানে পাঠাইবার পরামর্শ দিলে আরও সুবুদ্ধির কাজ হইত। দুঃখের বিষয় আণ্ডামানে জায়গা হইবে না। "ইংলিশম্যান" একটা বিস্তৃত ভূখণ্ডের লোকদিগের এইরূপ মিথ্যা কুৎসা করিয়া তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রেস আইন অনুসারে তাহার নিকট গবর্ণমেণ্টের জামিন লওয়া উচিত।

সাহিত্যসম্মিলনের নারীবিভাগ।

বাঁকিপুর সাহিত্যসম্মিলন সম্বন্ধে কাগজে যাহা বাহির হইতেছে, তাহা অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে বাহির হইতেছে, তাহা আমরা ধরিয়া লইতেছি না। কিন্তু তাঁহারা যাহা স্থির করিয়া প্রকাশ করিবেন, তাহার পরিবর্ত্তন সহজ হইবে না বলিয়া, যাহা শুনিতেছি তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। নারীবিভাগ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আষাঢ়ের কাগজে বলিয়াছি। যদি মূল অধিবেশন এবং অন্যান্য অধিবেশনে নারীদের বসিবার পৃথক স্থান এবং যাইবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে একদিন স্বতন্ত্র সভানেত্রীর অধীনে কেবল নারীদের জন্য একটি সভার অধিবেশনে কোন আপত্তি দেখা যায় না।

নজরবন্দী ও নির্ব্বাসিত কাহারা?

যখন অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতিকে বিনা অভিযোগে বিনা বিচারে তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহ হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তখন দেশে একটা স্বল্পকালস্থায়ী আতঙ্ক হইয়াছিল এবং হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু খবরের কাগজে এই কাজের প্রতিবাদ এবং ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনও হইয়াছিল, এবং দেশের লোকে সভা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু এখন দেশের ভাব অন্য-প্রকার দেখিতেছি। ১৯০ জনকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং ·১ জনকে নির্ব্বাসিত (deport) করা হইয়াছে, বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় লর্ড কারমাইকেল সেদিন একথা বলিবার আগে দেশের লোকে জানিতই না যে বিনা অভিযোগে ও বিনা বিচারে এতগুলি লোকের স্বাধীনতা লোপ করা হইয়াছে। কিন্তু জানিবার পরও দেশে কোন আন্দোলন হয় নাই, আতঙ্ক জন্মে নাই, হুলস্থূল পড়িয়া যায় নাই। যাহা বার বার ঘটে, তাহা ক্লেশকর ভয়াবহ হইলেও, গা-সহা মামুলী জিনিষ হইয়া যায়। তা ছাড়া, আগে বোধ হয় লোকদের ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা ছিল, এখন তাহা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে; আগে লোকে যাহা অসম্ভব মনে করিত, এখন তাহা সম্ভব বলিয়া দেখিতেছে, এবং আন্দোলনের ফল যাহা হয়, তাহাও দেখিতেছে। এইজন্য চুপ করিয়া আছে। যাহা হউক, ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করিয়া যদি কেহ নজরবন্দী ও নির্ব্বাসিত লোকদের নামধাম গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জানিতে পারেন, তাহা হইলে লোকের বুঝিবার সুবিধা হয় যে সরকার কিরূপ লোকদিগকে ভয়ঙ্কর মনে করিতেছেন।

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব।

এ বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি কাহাকে করা হইবে, তাহার বিচার চলিতেছে। কংগ্রেস প্রধানতঃ রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ের আলোচনা ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবী করেন। সকলের চেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় অধিকার হোম-রুল অর্থাৎ স্বরাজের অধিকার। আমরা যে এই স্বরাজ লাভের

উপযুক্ত এবং স্বরাজ-লাভ যে একান্ত আবশ্যক, ইহা যিনি বিশ্বাস করেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইবার পরেও ইহার জন্য যিনি চেষ্টা করিতে পারিবেন, এমন লোককেই সভাপতি করা উচিত। সভাপতিত্বের যোগ্যতা এই ভাবে নির্দ্দেশ করিলে স্বতই মনে হয় যে শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু আমরা আমাদের নিজের সাহস, শক্তি ও যোগ্যতা দ্বারাই বড় হইতে পারি, বিদেশীর সাহস, শক্তি ও যোগ্যতা দ্বারা নহে। 'স্ব"-রাজ চাই, অথচ "বিদেশী"র নেতৃত্ব স্বীকার করিতেছি, ইহাতে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ দোষ ঘটে। কারণ আমরা নিজেদের দেশের সব কাজ নিজেরা করিতে পারি, এই দাবী করিয়া স্বরাজ চাহিতেছি, অথচ সেই দাবীটা যে-সভা হইতে ইংরেজের কাছে যাইবে, তাহার নেত্রী হইবেন একজন বিদেশিনী। আমাদের মধ্যে একটা সভার কাজ চালাইবার মত লোকও যদি না থাকেন, তবে সমস্ত দেশের কাজ চালাইবার লোক আছেন বলিয়া ইংরেজকে কেমন করিয়া বুঝাইব? এই জন্য আমরা একজন দেশী সভাপতি চাই; নতুবা হোম-রুল-লাভার্থ প্রচেষ্টায় কর্ম্মিষ্ঠতার বিচারে শ্রীমতী বেসাণ্ট যে যোগ্যতমা, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশী লোকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলকও এই বিষয়ে খুব উদ্যোগী। কিন্তু তাঁহার কথা এ বৎসর তুলা যায় না। তিনি সবে আবার নূতন করিয়া কংগ্রেসে যোগ দিবার সংকল্প করিয়াছেন। দেশভক্ত ত্যাগী লালা লাজপৎরায় ডিসেম্বর মাসে দেশে আসিতে পারিবেন কি না, টেলিগ্রাফ করিয়া তাহা জানা উচিত। তিনি আসিতে পারিলে তাঁহাকেই এবার সভাপতি করা উচিত। নতুবা মান্দ্রাজের বিজয় রাঘব আচার্য্যকে কিম্বা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদারকে নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। একটা কথা উঠিয়াছে যে গত দুবার বাঙালী সভাপতি হইয়াছেন, এবার বাঙালীকে করা উচিত নয়। কংগ্রেসে এরূপ একটা নিয়ম নাই, থাকিতে পারে না। কিন্তু বাংলা দেশের প্রতি অনেকের একটা ঈর্ষ্যার ভাব আছে; এই জন্য এরূপ কথা উঠার পর অম্বিকাবাবুকে সভাপতি করিবার জন্য বাঙালীদের জীদ প্রকাশ করা জাতীয় ঐক্যের অনুরোধে অনুচিত।

শ্রীমতী বেসাণ্টের বোম্বাই প্রবেশ নিষেধ

সকৌন্সিল বোম্বাই-গবর্ণর এই আদেশ করিয়াছেন, যে, যেহেতু ইহা মনে করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে যে, শ্রীমতী বেসাণ্ট সাধারণের নির্বিঘ্নতার প্রতিকূল কাজ করিয়াছেন এবং আবার করিতে উন্মুখ আছেন, অতএব দ্বিতীয়বার আদেশ বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাই প্রদেশে প্রবেশ, বাস বা অস্থায়ীভাবে অবস্থিতি যেন না করেন। তিনি জ্ঞাতসারে এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তাঁহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাসদণ্ড ও জরিমানা হইতে পারিবে।

শ্রীমতী বেসাণ্টের উপর এই হুকুম জারী হওয়ায় আমরা বিস্মিত হই নাই। কারণ, তিনি সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ এবং ব্রিটিশরাজত্বের একটুও বিরুদ্ধাচরণ না করিলেও, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর ও অন্যায়কারী রাজকর্ম্মচারীদের নির্ভীকতম সমালোচক; এবং তিনি ভারতবর্ষের স্বরাজলাভার্থ প্রচেষ্টার সর্ব্বাপেক্ষা অক্লান্ত, স্পষ্টবাদী, উদ্যোগী ও নির্ভীক কর্ম্মী। ভারত স্বরাজ পাইলে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের প্রভুত্ব কমিবে, অনেকের অন্নও যাইবে। এ অবস্থায় শ্রীমতী বেসাণ্টের উপর ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের সর্ব্বদা কোপদৃষ্টি থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আদেশের কারণটা কিন্তু কাল্পনিক বলিয়াই আমাদের মনে হইতেছে। কিন্তু বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যখন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলিতেছেন, তখন কারণগুলা খুলিয়াই বলুন না? তাহা হইলে আমাদের ভ্রম দূর হয়। আমরা ত জানি, শ্রীমতী বেসাণ্ট "রাজনৈতিক" ডাকাতি করিতে পারেন না, রাজকর্ম্মচারীদের প্রতি বোমা বা বন্দুকের গুলি নিক্ষেপ করিতে পারেন না, সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ ও ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে পারেন না। এসব কাজের বিরুদ্ধে তিনি অতি তীব্রভাবে বক্তৃতা ও লেখনী-চালন করিয়া আসিতেছেন। অন্যদিকে তিনি যুদ্ধে নানা-প্রকারে সাহায্য করিবার জন্য টাকা তুলিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ডের ধন্যবাদ পাইয়াছেন, জার্ম্মেনদিগকে যে-কোন ইংরেজ সম্পাদকের সমান তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন ও গালি দিয়াছেন, এবং ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের ভাগ্য অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহা বারবার প্রচার করিয়াছেন, এবং উভয়দেশের সম্বন্ধকে স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দুখানা কাগজে যাহা বাহির হয়, তাহাই যদি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের আদেশের কারণ হইত, তাহা হইলে কাগজ দুখানাই আগে বন্ধ করা হইত, অন্ততঃ বোম্বাই প্রদেশে তাহাদের প্রচার বন্ধ হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। আমাদের বোধ হয়, হোমরুল বা স্বরাজলাভের জন্য ভারতবাসীদিগকে উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত তিনি যে-সব বক্তৃতা করেন, তাহাই তাঁহার বোম্বাইপ্রবেশ নিষেধের কারণ। কিন্তু লর্ড হার্ডিং হোম-রুল দূর ভবিষ্যতের ব্যাপার মনে করিলেও, তাহা যে একটা ন্যায্য আইনসঙ্গত আদর্শ তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীমতী বেসাণ্টের প্রতি এই হুকুম জারী হওয়ায় আমরা দুঃখিত হই নাই। বিনা বিচারে ১৯০ জন

বাঙালীকে নজরবন্দী করা হইয়াছে, ২১ জনকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে; তাহাতে দেশে একটা টুঁ শব্দ হয় নাই, বিলাতে ত খবরটাই ইংরেজ জনসাধারণের কাছে পৌঁছিবে না। শ্রীমতী বেসাণ্ট বিখ্যাত লোক, তাহার উপর শ্বেতকায়া। তাঁহার উপর বোম্বাইয়ের আদেশটা দেশে বিদেশে আলোচিত হইবে। ইহাতে কিছু সুফল হইবেই হইবে। সূর্য্যালোকের যেমন রোগবীজ ও দুর্গন্ধ নাশ করিবার ক্ষমতা আছে, তেমনি সর্ব্বসাধারণের নিকট একটা কোন ব্যাপারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার এই গুণ আছে, যে, তদ্দ্বারা কালক্রমে মানবের স্বাধীনতার ও মানুষের ন্যায্য অধিকারের অনুকূল যাহা তাহাই বদ্ধমূল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিকূল যাহা তাহা লোপ পায়।

শ্রীমতী বেসাণ্টের প্রতি আদেশটা দেশে বিদেশে আলোচিত হইবে মনে করিবার কারণ আছে। দেশী লোকের কত ছাপাখানার কাছে ত গবর্ণমেণ্ট জামিন লইয়াছেন, কত খবরের কাগজ ছাপাখানা উঠিয়া গিয়াছে বাজেআপ্ত হইয়াছে; কিন্তু কোনস্থলেই সেরূপ দেশব্যাপী আন্দোলন হয় নাই, যেরূপ আন্দোলন শ্রীমতী বেসাণ্টের নিউইণ্ডিয়া ছাপাখানার নিকট জামিন লওয়ায় হইয়াছে।

পরলোকগত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

পরলোকগত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বহুবৎসর শিক্ষাবিভাগে যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া অবসর গ্রহণপূর্ব্বক ওড়িশায় বাস করিতেছিলেন। তিনি "মানবপ্রকৃতি" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এবিষয়ে বাংলাভাষায় কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাস একদা বাংলা বিদ্যালয়সকলের পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ে এবং জাতিবিজ্ঞান (ethnology) সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি কটক হইতে একখানি বাংলা মাসিক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ষ্টার অব্ উৎকল নামক ইংরেজী সংবাদপত্র দ্বারা ওড়িশার উপকার হইতেছিল, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে জামিন চাওয়ায় তিনি প্রেস বন্ধ করিয়া কাগজখানি উঠাইয়া দেন। তাহার পর তিনি একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন।

একজন রাসায়নিক আবিষ্কারক।

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অন্যতম ছাত্র শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত নানা রাসায়নিক আবিষ্কারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে ডি-এসসী উপাধি পাইয়াছেন। আবিষ্ক্রিয়ার জন্য এই উপাধি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম পাইলেন। তিনি সম্প্রতি ক্লোরোপিক্রিন নামক যৌগিকপদার্থ প্রস্তুত করিবার নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জিনিষটি ব্যবসাবাণিজ্যে কোন কাজে লাগে না, কিন্তু ইহা খুব কম পরিমাণেও কোন জনতাপূর্ণ বৃহৎ হলের মেজেয় ছড়াইয়া দিলে তথাকার সকলে অশ্রুপাত করিতে আরম্ভ করে। এই গুঁড়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। শত্রুপক্ষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে অশ্রুমোচনে ব্যাপৃত রাখিলে তাহারা লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারে না। ইহাকেই বলে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

প্রবাসী বাঙালী ছাত্র।

বিহার-ওড়িশা-ও-ছোটনাগপুর-প্রবাসী বাঙালী ছাত্রেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষায় কতজন উত্তীর্ণ হইয়াছে, বাঁকিপুরের বেহার হেরাল্ড তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। তালিকাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ বিহারী হিন্দু, ওড়িআ এবং মুসলমান ছাত্রদেরও সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস হইয়াছে বাঙালী ৩৩০, বিহারী হিন্দু ৪৬৯, মুসলমান ১৯১, ওড়িআ ৮৭; আই-এ পরীক্ষায় বাঙালী ৯৭, বিহারী হিন্দু ১৬৭, মুসলমান ৪৭, ওড়িআ ২০; আই-এস্‌সীতে বাঙালী ৩১, বিহারী হিন্দু ১৭, মুসলমান ৬, ওড়িআ ৮; বি-এস্‌সীতে বাঙালী ৯, বিহারী হিন্দু ৭, মুসলমান ১, ওড়িআ ৩; বি-এতে বাঙালী ছাত্র ৫১ ও ছাত্রী ২, বিহারী হিন্দু ৮০, মুসলমান ২১, ওড়িয়া ২২।

বিহার-ওড়িশা-ছোটনাগপুরের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ছয় জনের কিছু কম বাঙালী।

স্ত্রীশিক্ষার জন্য দান।

স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয় স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কলিকাতার ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ের জন্য একটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম দিয়াছেন দুর্গামোহনভবন। ইহাতে মোটামুটি ৭০,০০০, টাকা খরচ হইয়াছে। অর্দ্ধেক টাকা গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বহু লক্ষ টাকা দান বঙ্গে কেহ কেহ করিয়াছেন, কিন্তু ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য দানের কথা বড় শুনা যায় না, অথচ তাহার প্রয়োজন খুবই বেশী। দাস মহাশয়ের পুত্রকন্যাগণ পিতার স্মৃতি যথাযোগ্যরূপে রক্ষার উপায় করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়।

হায়দরাবাদের স্বর্গীয় ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় কেম্ব্রিজের নিউনহাম কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আনন্দের সংবাদ।

পরজাতিবিদ্বেষ ও নৃতত্ত্ব

মানবের স্বাভাবিক কুসংস্কার।

শ্বেতাঙ্গ লোকেরা কৃষ্ণাঙ্গদিগকে ঘৃণা করে। আবার কৃষ্ণাঙ্গেরাও শ্বেতাঙ্গদিগকে কম ঘৃণা করে না। সাদা-চামড়াওয়ালা নরনারীগণকে কাল-চামড়াওয়ালা লোকেরা খোসা-ছাড়ান জীব অথবা ভূত প্রেত পিশাচ ইত্যাদি মনে করে। ভাল মন্দ, সুন্দর অসুন্দর ইত্যাদির মাপকাঠি জগতে একটা মাত্র নয়—অনেক। জাতিগত সংস্কার বহুবিধ—দেশহিসাবে, ধর্ম্মহিসাবে, বর্ণহিসাবে, ভাষাহিসাবে পৃথক্। এই সংস্কারগুলি ছাড়াইয়া উঠা এক-প্রকার অসম্ভব। দুনিয়ার নরনারীকে কাল সাদা লাল পীত অথবা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান অথবা চীনা ভারতবাসী ইংরেজ নিগ্রো ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া হস্ত-পদ-চিত্ত-মস্তিষ্কবিশিষ্ট মানবমাত্র বিবেচনা করা সাধারণতঃ সম্ভবপর হয় না। আমি আমার নিজের পরিচিত এবং নিজের অভ্যস্ত স্বভাব ও ধারণাগুলির বাহিরে যাহা কিছু দেখি শুনি তাহা পছন্দ করি না। তুমিও তোমার জানা শুনা রীতি নীতি কায়দা কানুন ছাড়া যাহা কিছু দেখ তাহা পছন্দ কর না। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। কেবল তাহাই নয়—অপরিচিত অজানা বস্তুমাত্রই ঘৃণা, নিন্দা ও অবজ্ঞার পদার্থ। পরজাতিবিদ্বেষ মানুষের স্বধর্ম্ম। আমার জ্ঞান গণ্ডী ও সংস্কারের বাহিরে সবই "barbarian" বা "ম্লেচ্ছ" বা "কাফের" বা "pagan" বা "নিগার" ইত্যাদি পদবাচ্য। পাঁচ হাজার বৎসরের মানবেতিহাস এই কুসংস্কারের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

১৯১১ সালে লণ্ডনে Universal Races Congress বা "বিশ্বমানব-পরিষদে"র প্রথম সভা আহূত হয়। সেই সভায় পশ্চিম-আফ্রিকাবাসী ডাক্তার আগ্‌বেবি (Dr. Majola Agbebi) শ্বেতাঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণ আফ্রিকাবাসীর ঘৃণা বিবৃত করিয়াছিলেন—

The unsophisticated African entertains aversion to white people, and when on accidentally or unexpectedly meeting a white man he turns or takes to his heels, it is because he feels that he has come upon some unusual or unearthly creature, some hobgoblin, ghost or sprite, and when he does not look straight in a white man's face, it is because he believes in the 'evil eye', and that an aquiline nose, scant lips and cat-like eyes affect him. The Touriba word for a European means a peeled man and to many an African the white man exudes some rancid odour not agreeable to his olfactory nerves.

অর্থাৎ—অজ্ঞ আফ্রিকাবাসীরা শ্বেতাঙ্গ লোকদিগকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না। হঠাৎ কোনো আফ্রিকাবাসী শ্বেতাঙ্গের সম্মুখে পড়িয়া গেলে তাহাকে গায়ের চামড়া ছাড়ান ভূত প্রেত পিশাচ দৈত্য দানা মনে করিয়া ও তাহার চোখা নাক, পাতলা ঠোঁট ও কটা চোখ অপার্থিব মনে করিয়া নজর লাগিবার ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দায়। তাহারা শ্বেতাঙ্গের গায়ের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না।

শ্বেতাঙ্গ ইযোরোপীয়দিগের গায়ের দুর্গন্ধ কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকাবাসী সহ্য করিতে পারে না। চীনাম্যানেরাও নাকি ইয়ুরোপীয় নরনারী দেখিলে নাক বন্ধ করিয়া চলে। কেম্ব্রিজবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যাডন এইরূপ জাতিগত সংস্কার ও ধারণা সম্বন্ধে বলেন :—

"Practically all peoples look upon their own physical characters as constituting the normal type and consequently regard those that differ from them as being strange and even repulsive."

জগতের প্রত্যেক জাতিই নিজেদের শারীরিক সৌষ্ঠবকেই সঙ্গত মনে করিয়া অপরের শরীরে সেই আদর্শের ব্যতিক্রম দেখিলেই তাহাকে অদ্ভুত ও উপহাস্য, এমন কি বর্জ্জনীয় মনে করে।

এই ত গেল শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য্যের কথা। মস্তিষ্কের বিকাশ, চরিত্রবল, নৈতিক উৎকর্ষ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ইত্যাদি লইয়াও জাতিতে জাতিতে বিবাদ ও মনোমালিন্য কম নয়। প্রত্যেকেই নিজের মাপ-কাঠিতে নিজকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে এবং অপরকে ৵০, ।০, ।৵০, ॥৵০ ইত্যাদি রকমের সভ্য বিবেচনা করে। কোন জাতিই অপর কোন জাতিকে ষোল-আনা সভ্যতার অধিকারী ভাবিতেই পারে না। তাহার পর আবার সভ্যতার আদর্শ লইয়া কলহ। প্রত্যেক সমাজই বিবেচনা করে যে তাহার উদ্ভাবিত আদর্শই সর্ব্বোচ্চ। বিলাতের Sociological Review পত্রে একটি প্রবন্ধের প্রারম্ভে Spiller লিখিতেছেন :—

"If we ask a Chinese, an Indian, a Negro, or an American Indian, whether he admits the white man's claim to superiority, we must invariably receive as a reply a good-natured smile, as if the proposition were too absurd to be seriously entertained. In other words, each race or division of mankind appears to regard itself as at least the equal of all others, and

accordingly it would presume an unscientific attitude of mind to accept the dictum of the white, or any other, man's superiority without cool and thorough investigation."

চীনা হিন্দুস্থানী নিগ্রো লাল-আমেরিক যাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক কেহই শ্বেতাঙ্গ লোককে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে না। প্রত্যেক জাতি অপরকে নিজের অপেক্ষা হীন না হোক ত সমান-সমান মনে করে। সুতরাং শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী প্রমাণ ব্যতীত মানিয়া লইলে অবৈজ্ঞানিকের কাজ করা হইবে।

লণ্ডনের বিগত বিশ্বমানব-পরিষদের সভায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ হইতেই বক্তা আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহই নিজ জাতির হীনতা স্বীকার করেন নাই—সকলেই নিজ নিজ মহত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। সাদা-চামড়ার ও রাঙ্গা-চামড়ার ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জের ভিতরও সভ্যতার আদর্শ লইয়া এইরূপ কলহ দেখা যায়। জার্ম্মান-আদর্শ বড় কি ইংরেজ-আদর্শ বড়, আমেরিকার সভ্যতা উচ্চতর কি ইংরেজ-সভ্যতা উচ্চতর, রুশিয়ার সমাজকে ইয়োরোপীয় বিবেচনা করা উচিত কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক এবং পণ্ডিত-মহলে আলোচিত হইয়া থাকে। ফরাসীরা বিবেচনা করেন তাঁহারাই ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ জাতি, আবার জার্ম্মানেরা প্রচার করেন যে জগতে সভ্যতা বিস্তারের জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব, ইত্যাদি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি এলিয়ট প্রচার করিলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জগৎকে পাঁচটা নূতন সত্য দান করিয়াছে। অমনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ম্মান-জাতীয় অধ্যাপক মুন্‌ষ্টারবার্গ তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থ লিখিলেন "ঐ পাঁচটি সত্য আমেরিকাবাসীর আবিষ্কৃত নিজস্ব দান নয়—জার্ম্মান জাতিও ঐ-সকল গুণে ভূষিত। মানবজাতি জার্ম্মানের নিকটও এই সম্বন্ধে ঋণী।" এদিকে ওলন্দাজ জাতির মহিমা কীর্ত্তন এবং জার্ম্মানির নিন্দা প্রচার করিয়া আর-একজন অধ্যাপক বলিতেছেন—

"The Dutch mind cannot conceive of a military system like Germany's. In Holland you will find a quintessential love of liberty. * * * In Germany the people are trained to act like one gigantic machine. * * * The Germans are not inventive nor creative. * * * It was a native of Holland that invented the window glass, the microscope, the mariner's compass etc. Why, even Edison and Walt Whitman are of Dutch descent."

ওলন্দাজের মন জার্ম্মানির মতন অমন সমর-তন্ত্র নহে। হল্যাণ্ডে স্বাধীনতা-প্রিয়তার চরম পরিচয় পাওয়া যায়। জার্ম্মান লোকগুলাকে একটা দানবীয় কলের অংশ করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। তাহারা না গঠন করিতে না উদ্ভাবন করিতে পারে। ওলন্দাজেরা শার্সি, অণুবীক্ষণ, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, আবিষ্কার করে। এমন কি এডিসন ও ওয়াল্ট হুইটম্যানও ওলন্দাজ-বংশীয়।

বর্ত্তমানযুগের কুসংস্কার।

এইরূপ পরজাতিবিদ্বেষ প্রাচীন এবং মধ্যযুগেও ছিল। তবে তখন বিদ্বেষ ও কলহের ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কীর্ণ ছিল, এবং বিদ্বেষ ও কলহের ফল বেশী বিষময় হইত না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জাতিগত কুসংস্কার এবং পরজাতি-বিদ্বেষ বিস্তৃত ক্ষেত্রে এবং নূতন আকারে দেখা দিয়াছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, ইয়োরোপের এবং ইয়োরোপীয় উপনিবেশ-সমূহের নরনারী বর্ত্তমান কালে জগতের অন্যান্য সকল ধর্ম্মাবলম্বী এবং ভাষাভাষী নরনারীদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে। ইয়োরোপীয় রক্তমাংসবিশিষ্ট যে-কোন লোক এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার স্বদেশী লোকজনকে সকল বিষয়ে অবনত ও নিন্দনীয় জ্ঞান করে। "বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতাই জগতে একমাত্র সভ্যতাপদবাচ্য বস্তু,—অন্যান্য স্থানের লোকেরা অসভ্য, অথবা অর্দ্ধসভ্য। তাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অধীনে না আসিলে কখনও উন্নত হইবে না"—এই ধারণাই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পরজাতিবিদ্বেষ-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। খ্রীষ্টানে খ্রীষ্টানে এখনও লড়াই চলে, ইংরেজ ও ফরাসীতে যথার্থ বন্ধুত্ব এখনও হয় নাই, রুশ এবং ইংরেজ চিরশত্রু সন্দেহ নাই। তথাপি গত শতাব্দীর চিন্তা ও সাহিত্যের ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইয়োরোপীয় লোকেরা দুনিয়ার অন্যান্য লোককে মানুষ জ্ঞান করে না, ইহাদের বিবেচনায় মুসলমান, চীনা জাপানী নিগ্রো আমেরিকান ইত্যাদি অর্দ্ধমানব মাত্র।

এইরূপ কুসংস্কারের কারণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জ জগতের নানাস্থানে স্বকীয় সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে। যে জাতি মনিব হয় সে কখনও তাহার গোলাম জাতিকে সম্মান করে না।' কাজেই বিশ্বসাম্রাজ্য ও বিশ্ববাণিজ্যের অধিকারী জাতিরা অধীনস্থ নরনারীগণকে

কুকুর বিড়ালের ন্যায় বিবেচনা করিতে শিখিয়াছে। সফলতার উন্মাদনা বড় বেশী। সফলতাপ্রাপ্ত জাতি শীঘ্রই তাহার অতীত ভুলিয়া যায়। ১৮১৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহা উনবিংশ শতাব্দীর কোন শ্বেতাঙ্গ মনে রাখে নাই। মনে রাখিলে ইহারা সহজেই বুঝিত যে, এশিয়ায় ও ইয়োরোপে, অথবা কৃষ্ণাঙ্গে ও শ্বেতাঙ্গে, অথবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জাতিগত এবং সভ্যতা-গত তারতম্য এবং উচ্চনীচ বিচার করা অসম্ভব; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত কোন ইয়োরোপীয় জাতিই প্রাচ্যদেশীয় জাতিপুঞ্জ হইতে উন্নত ছিল না। কিন্তু বিজয়ের গৌরব ও গর্ব্ব মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখে। কাজেই আজ জগতে ইয়োরোপীয় সভ্যতার আস্ফালন এবং হিন্দু মুসলমান চীনা জাপানীর নির্য্যাতন চলিতেছে। অথচ ষোড়শ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সকল পর্ত্তুগীজ, ইতালীয়, ফরাসী ও ইংরেজ পর্য্যটক এশিয়া বেড়াইতে আসিতেন তাঁহারা এশিয়ার কিরূপ চিত্র আঁকিয়াছেন? তখন তাঁহারা এশিয়াবাসীকে অর্দ্ধসভ্য, অর্দ্ধমানব, অসভ্য, বর্ব্বর বা "arrested development"এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবেচনা করিতেন কি? কখনই না। তখন তাঁহারা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধকে ভয় সম্মান ও পূজা করিয়া চলিতেন—অন্ততঃ সমানে সমানে কথাবার্ত্তা চলিত। তখনও ইয়োরোপের যথার্থ expansion বা বিস্তার সাধিত হয় নাই। তখনও প্রাচ্য তাহার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। কাজেই ইয়োরোপীয় শ্বেতাঙ্গেরা জুতা টুপি না খুলিয়া এবং "কুর্নিশ" না করিয়া এশিয়াবাসীর সঙ্গে কথা বলিতে পারিত না। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।" মাত্র ১০০ বৎসরে এই পরিবর্ত্তন।

রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক আধিপত্যের প্রভাবে চিন্তার ধারা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানও বিকৃত হইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা অধিকাংশই পাশ্চাত্য। ফলতঃ এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য আধিপত্যের আবহাওয়ায় বাস করিয়া সমাজ-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য আদর্শেরই মহত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন—অন্যান্য আদর্শের মহত্ত্ব স্বীকার ত দূরের কথা, তাহা বুঝিতেও বেশী চেষ্টা করেন নাই। এই যুগে ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ এশিয়ায় ও আফ্রিকায় যে-সমুদয় নূতন তথ্য দেখিয়াছেন সেইগুলি নিজেদের পরিচিত মাপ-কাঠিতে বিচার করিয়াছেন মাত্র। কাজেই বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন হৃদয়কথা বুঝিতে পারেন নাই।

পাশ্চাত্য কুসংস্কার নিবারণের উপায়।

এদিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইয়োরোপীয়দের ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ স্থাপিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ নূতন নূতন জাতির সঙ্গে আদান-প্রদান এবং ভাববিনিময় ও কর্ম্ম-বিনিময় চলিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন নরনারীপুঞ্জের জন্য তাহাদের মনোমত পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার প্রয়াস আরব্ধ হইল। দুনিয়ার অলিগলিতে ইয়োরোপের বাজার সৃষ্ট হইতে থাকিল। ফলতঃ, নব নব মানবচরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া ইয়োরোপীয়েরা মানবাত্মার বিরাট রূপ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিল। তাহার ফলে চিন্তারাজ্যে "তুলনামূলক আলোচনাপ্রণালী" বা Comparative Methodএর সূত্রপাত হইল। ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারুইন ও হার্ব্বার্ট স্পেন্সার আবির্ভূত হইয়া জড়জগৎ ও জীবজগতের বৈচিত্র্যময় তথ্যসমূহের মধ্যে নিয়ম আবিষ্কার করিলেন। তাহার প্রভাবেও বিশ্বের বৈচিত্র্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা-সমূহের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু বৈচিত্র্যের মর্য্যাদা রক্ষা অথবা সম্মান করিবার কথা ইয়োরোপে শীঘ্র উঠে নাই। তথা-কথিত অবনত জাতিপুঞ্জ হইতে ধাক্কা খাইবার পূর্ব্বে ইহারা নিজেদের মাপকাঠি বদলাইতে শিখে নাই—অথবা নূতন নূতন মাপকাঠির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ভিতরেই এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইয়োরোপীয়েরা জগতের নানা স্থানে কথঞ্চিৎ ধাক্কা খাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণাঙ্গ, লোহিতাঙ্গ, বর্ব্বর, নিগ্রো, অর্দ্ধ সভ্য ও অসভ্য ইত্যাদি সমাজের ভাগবাটোয়ারা লইয়া ইয়োরোপীয় শ্বেতাঙ্গ-মহলে নানা বিসম্বাদ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার ফলে এই-সকল অবনত জাতি অনেকটা মাথা তুলিতে পারিয়াছে। পরে ১৯০৫ সালে জাপান যেদিন প্রবল রুশকে পদানত করিল সেইদিন ইয়োরোপের চেতনা আসিল। পাশ্চাত্য বুঝিতে শিখিল—"প্রাচ্য জগতেও সভ্য জাতি আছে।"

তখন হইতে Comparative Method বা তুলনাত্মক প্রণালীর অবলম্বন পণ্ডিতমহলে বেশী হইতেছে। অপরিচিত বস্তুও যে সম্মানার্হ এই ধারণা সুধী-জগতে প্রচারিত হইতেছে। "সমাজবিজ্ঞানের" গতি নূতন দিকে চলিয়াছে। নৃতত্ত্বের আলোচনায় একটা Reformation বা সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

মধ্যযুগে ইয়োরোপের লোকেরা ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে রোমীয় পোপের অধীনতায় জীবন যাপন করিত। পোপ খৃষ্টান-মাত্রের গুরু পুরোহিত ও দেবতাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বিচার অগ্রাহ্য বা বর্জ্জন করিবার অধিকার কোন ব্যক্তিরই ছিল না। পোপের বিবেচনা যে কখনও ভ্রমাত্মক হইতে পারে, পোপ যে রক্তমাংসবিশিষ্ট সাধারণ মানুষের ন্যায় কোন স্থানে ভুল বা অন্যায় আচরণ করিতে পারে, এরূপ সন্দেহ করিলে পর্য্যন্ত লোকেরা নির্য্যাতিত হইত। বিনা-বাক্যে অবনতমস্তকে পোপের আজ্ঞা পালন করা খৃষ্টান-মাত্রের ধর্ম্ম বিবেচিত হইত। লোকেরা পোপের এই ক্ষমতা ও অধিকারকে Infallibility বা চরম পরিপূর্ণতা বলিয়া জানিত। এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে ক্রমে মানবচিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। অবশেষে ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তি এবং স্বাধীন ধর্ম্মজ্ঞান ইয়োরোপীয় মানবকে পোপের অত্যাচার হইতে মুক্তি দান করে। এই মুক্তির নাম পাশ্চাত্য ইতিহাসে "রিফর্ম্মেশন" বা ধর্ম্মসংস্কার।

এশিয়া এবং ইয়োরোপের (অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের) পরস্পর সম্বন্ধও উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপই ছিল। প্রাচ্য ভক্ষ্য এবং প্রতীচ্য ভক্ষক—এশিয়া ইয়োরোপের বাজার, এশিয়া ইয়োরোপীয়দিগের উপনিবেশক্ষেত্র—এই ধারণা পাশ্চাত্য জনসমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দী জগতের ইতিহাসে Expansion of Europe বা ইয়োরোপ বিস্তারের যুগ—এশিয়ায় এবং সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ-সমাজের উপর ইয়োরোপীয় শ্বেতাঙ্গদিগের প্রভাব বিস্তারের যুগ। এই যুগে ইয়োরোপের ক্ষমতা ও অধিকার এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-বল সবই পরিপূর্ণতার চরমসীমায় অবস্থিত বলিয়া মানবসংসারে প্রচারিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের পোপের ন্যায় উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপ সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে অভ্রান্ত বিবেচিত হইত। ইয়োরোপীয়দিগের সমাজ, সভ্যতা, আদর্শ, চিত্রকলা, সাহিত্য, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, ইত্যাদিই জগতের এই-সকল বস্তুর মধ্যে সেরা—ইয়োরোপের মাপকাঠিই জগতের চিন্তারাজ্যে একমাত্র মাপ-কাঠি এই ধারণা কেহই ছাড়াইয়া উঠিতে পারিত না। ক্রমশঃ মানবাত্মার বৈচিত্র্য, মানবচিন্তার স্বাধীনতা, মাপ-কাঠির বিভিন্নতা ইত্যাদি এই ইয়োরোপীয় অভ্রান্ততার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জাপানের রাষ্ট্রীয় জয়লাভে ইয়োরোপের সিংহাসন টলিয়াছে। এক্ষণে ইয়োরোপীয়েরাই জগতের চিন্তামণ্ডলে একমাত্র পোপ বা বিচারক বা হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা জ্ঞানে পূজিত হয় না। "Interest in the East" নূতন ভাবে আরব্ধ হইয়াছে। মধ্যযুগের ধর্ম্মসংস্কার ইয়োরোপীয় মানবের চিন্তাশক্তিকে মুক্তি দান করিয়াছিল। বিংশশতাব্দীর এই বিপ্লব বা সংস্কার সমগ্র মানব-মণ্ডলকে স্বাধীন করিয়াছে। ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার আওতা ছাড়াইয়া দুনিয়ার মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান আলোচনা করিতেছে। ইয়োরোপের পণ্ডিত-মহলেও পুরাতন বুলি আওড়ান বন্ধ হইতেছে।

নৃতত্ত্বে নূতন সুর।

আজকাল নৃতত্ত্বের (Anthropology) আলোচনা ইয়োরোপে অনেক হয়। এই আলোচনাগুলির সুর নূতন ধরণের। সেদিন লণ্ডনে Universal Races Congressএর আহ্বান হইল। ইহা এই "রিফর্ম্মেশনে"র প্রধান লক্ষণ ও ফল। সকলদেশের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরাই বুঝিয়াছেন যে ধরাকে সরা জ্ঞান করিলে আর চলিবে না—তথাকথিত অবনত জাতিপুঞ্জ জাগিয়াছে—তাহাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, সম্মান করাও কর্ত্তব্য। আজকালকার আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রমণ্ডলে এই নূতন লক্ষণ বেশ দেখা যায়। অধিকন্তু যাঁহারা বৈজ্ঞানিক মাত্র তাঁহারাও ক্রমশঃ নূতন ধরণের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেছেন। জার্ম্মানির লুশান, ইংলণ্ডের হ্যাডন, আমেরিকার জর্ম্মান পণ্ডিত বোয়াজ নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিতেছেন তাহা নবযুগের কথা। বোয়াজ-প্রণীত "Mind of Primitive Man এই হিসাবে নৃতত্ত্বে একটা বিপ্লবের প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

অধ্যাপক বোয়াজ।

অধ্যাপক বোয়াজ জগৎপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ। এক্ষণে ইঁহার বয়স প্রায় আশী বৎসর। ইনি সর্ব্বসমেত কয়শত প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইনি পি-এইচ ডি উপাধি লাভের পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিলে

অধ্যাপক বোয়াজ।

জগতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় মিলিত হইয়া ইঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। সেই উপলক্ষে ইঁহার রচনাবলীর একটা নির্ঘণ্ট-পত্র প্রস্তুত হয়—নাম Bibliography of Frank Boas। সেই সঙ্গে কতিপয় প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ নৃতত্ত্বসম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ রচনা করিয়া বোয়াজ-সম্বর্দ্ধনা-উৎসবে যোগদান করেন।

নৃতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ।

নৃতত্ত্ব বা Anthropology নামটা আমাদের দেশে ও সাহিত্যে বোধ হয় সুপরিচিত নয়। ভারতবর্ষের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিদ্যাসংক্রান্ত কোন গ্রন্থ পাঠ্যতালিকায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে আমাদের সুধীগণ এই বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। মানবের শারীরিক গঠন, বসতিস্থাপন, শিল্পকর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞান, রীতিনীতি, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সংস্কার, অভ্যাস ইত্যাদি এই বিদ্যার অন্তর্গত আলোচ্য বিষয়। বিশেষতঃ প্রাচীন কালের মানবসম্বন্ধে এই বিষয়ক জ্ঞান Anthropology বিজ্ঞানের অংশস্বরূপ বিবেচিত হয়। অধিকন্তু বর্ত্তমান কালে যে-সমুদয় জাতি অবনত, অনুন্নত, সুতরাং বর্ত্তমান সভ্যতার মাপকাঠি অনুসারে অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য, তাহাদের জীবন-যাপন-প্রণালী আলোচনা করাও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের উদ্দেশ্য। মোটের উপর, মানুষ সম্বন্ধে অতীত ও বর্ত্তমান, যে-কোন তথ্যই "য়্যান্থ্রোপলজি" (মানববিজ্ঞান) বা নৃতত্ত্বের অধীন।

বলা বাহুল্য এই হিসাবে ভারতবর্ষে একাধিক নৃতত্ত্ববিৎ আছেন। রাঁচির শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মুণ্ডা এবং ওরাঁও জাতিদ্বয়ের নানাবিধ তথ্য সঙ্কলন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সেইরূপ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ চাকমাজাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের 'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থও নৃতত্ত্ববিষয়ক সাহিত্যের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার সাময়িক পত্রে লোকসাহিত্য, প্রবাদ, প্রবচন, সংস্কার, ধর্ম্মকর্ম্ম, জাতিতত্ত্ব, বংশতত্ত্ব, কুলুজীগ্রন্থ, পূজাপাঠ ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। বাঙ্গালার বাহিরেও ভারতবাসীরা এইরূপ নৃতত্ত্ব বিষয়ক বহুবিধ তথ্য সঙ্কলন করিতেছেন।

বিদেশীয় পণ্ডিতদের লিখিত কয়েকখানা ইংরেজী গ্রন্থের তালিকা দিতেছি। পুস্তকের নাম হইতেই নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়-সমূহ কথঞ্চিৎ স্পষ্টতর হইবে :—

1. History of Human Marriage,
2. The Magic Art and the Evolution of Kings.
3. Taboo and the Perils of the Soul.
4. Totemism and Exogamy.
5. The Kacharis.
6. The Naga Tribes of Manipur.
7. The Todas.
8. The Religious and Political System of the Torabd.
9. Life, Legends and Religion of the Blackfeet Indians.

এই তালিকার অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের আলোচনা-প্রণালী অনুসারে আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণা সাধারণতঃ চলিয়া থাকে। কিন্তু নৃতত্ত্বের একটা বড় বিভাগে আমরা এখনও হাত দিই নাই। অস্থিবিদ্যা (Anatomy) এবং প্রাণ-বিজ্ঞান (Biology) এই দুই বিদ্যার সাহায্যে মানবের শরীর এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া "জাতি", "বংশ", "শ্রেণী", "সম্প্রদায়" ইত্যাদি স্থির করা এই বিভাগের কার্য্য। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ বা লোহিতাঙ্গ, অথবা "ককেশিয়ান," "মঙ্গোলিয়ান," "আর্য্য" অথবা "অনার্য্য" ইত্যাদি জাতি-ভেদ এই বিভাগের আলোচনায় সিদ্ধ হয়। অধ্যাপক বোয়াজ এই বিভাগেই বিশেষ সিদ্ধহস্ত। ইনি মাথা মাপিয়া জাতি নির্ণয় করিয়া থাকেন। জল বায়ু খাদ্য-দ্রব্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনের প্রভাবে নরনারীর শারীরিক গঠন কিরূপ হয়, বিশেষতঃ মস্তকের আকৃতি কোন্ আকার ধারণ করে, তাহার আলোচনা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।

য্যান্থ্রপলজির এই বিভাগের আলোচ্য বিষয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে ;—

1. A Racial Peculiarity in the Brain of the Negro.
2. Several Anatomical Characters of the Human Brain said to vary according to race and sex
3. The Skull of the Australian Aboriginal.
4. The Relationship of Intelligence to size and shape of head and to other physical and mental characters.
5. Head growth in students at Cambridge.
6. Physical characters and Morbid proclivities.
7. Changes in the bodily form of Descendants of Immigrants.
8. The Cephalic Index.
9. Heredity of Eye-colour in man.
10. Heredity of Hair-form in man.
11. Relation of Race-crossing to Sex-ratio.
12. Geographical Distribution of the chief modification of mankind.

এই রচনা-সমূহ সবই প্রাণ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। ভারতবর্ষে এখনও এই বিদ্যার আলোচনা অল্প মাত্র। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মাঝে মাঝে আমাদের মাথা মাপিয়া জাতি স্থির করিবার সঙ্কেত দিয়া থাকেন। অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ Universal Races Congressএর সভায় সভাপতির আসন হইতে "Definition of Race, Tribe and Nation" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ এই তালিকার অন্তর্গত করা যাইতে পারে। এই তালিকা পারিভাষিক শব্দ অনুসারে Anthropometry বিষয়ক।

প্রাচীন ও আদিম এবং "অসভ্য" সমাজের বিবরণও নৃতত্ত্বের অন্তর্গত। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এইরূপে বুঝা যায়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Anthropology বিভাগের ছাত্রেরা এইজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখিয়া থাকে :—

1. Primitive Man and his physical environment.
2. Technology and Primitive Art: (i) A study of industries—pottery, weaving, basketry, wood-carvings, work in skins etc; division of labour; industry and sex; industry and physical environment: (ii) A study of designs, realistic and geometrical conventionalisation; symbolism; relation of art to industries; theories of evolution of art.
3. Types of Primitive Religion and Mythology: A study of animism, magic, taboo, totemism, ancestor-worship, animal and plant worship; myths, religion and social organisation, theories of religion and evolution.
4. Types of Primitive Social Organisation.
5. Primitive Institution—Paganism and Christianity.
6. Social Evolution: Civilisation, Ethnic and Civil origins.
7. Social Evolution: Civilisation, Liberty and Democracy.
8. Historical Type of Society, Ancient: The Theory of Progress.

এই-সকল বিষয় নিম্নলিখিত রচনায় আলোচিত হইয়াছে :—

Primitive Culture—Researches into the Early History of Mankind—Taylor.
2. The Principles of Sociology—Spencer.
3. Basketry Designs of the Indians of Northern California.
4. Introduction of Maize into Eastern Asia.
5. Introduction of Tobacco into Eastern Asia.
6. The Origins of Invention—Mason.
7. The Beginning of Zoo-culture.
8. Polynesian Ornament a Mythology.
9. The Origin and Sacred character of certain Ornaments of the S. E Pacific.
10. The Decorative Art of British New Guinea,
11. Conventionalism in Ancient American Art.
12. The Meaning of Ornamental, or its Archaeology and Psychology.

13. The Origin and Development of Moral Ideas—Westermarck.

এই ধরণের রচনা ভারতবর্ষে অপ্রচলিত নয়। প্রকৃত পক্ষে Anthropometry বিভাগীয় নৃতত্ত্ব আমাদের দেশে নাই।

অধ্যাপক বোয়াজ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ইঁহার "সেমিনার" বিভাগে ছাত্র হইবার অনুমতি পাইলাম। কোন দিন প্রাচীন আমেরিকার লোহিতাঙ্গ নরনারীদিগের ভাষা এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। কোন দিন রুশিয়ার বর্ত্তমান সমাজের চিত্র প্রদত্ত হইল। কোন দিন মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকার জনগণ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা করিলেন। একদিন জার্ম্মানির প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক লুশান (Von Luschan) তাঁহার নূতন অনুসন্ধানের ফল বিবৃত করিলেন।

অধ্যাপক লুশান।

লুশান সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছেন। এবার গ্রীষ্মাবকাশে ইয়োরোপের নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অষ্ট্রেলিয়ায় এক কংগ্রেস করিয়াছিলেন। সেই সভায় কেম্ব্রিজের অধ্যাপক হ্যাডন এবং অক্‌সফোর্ডের ম্যারেটও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

লুশানের পত্নীও সঙ্গে আছেন। ইনিও নৃতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন। শুনিলাম ১৫০০০ মৃত নরনারীর মাথা ইঁহারা দুইজনে সংগ্রহ করিয়াছেন। তুরস্ক এবং পাশ্চাত্য এশিয়ার নরসমাজেই ইঁহারা বেশী সময় কাটাইয়াছেন। আমাদের অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথের ইঁহারা সুখ্যাতি করিলেন।

সস্ত্রীক লুশান এক্ষণে আমেরিকার নিগ্রো-মহলে নৃতত্ত্ব বিষয়ক অনুসন্ধানে লিপ্ত রহিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নানা প্রদেশে যাইয়া খাঁটি নিগ্রো নরনারীর সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। ইনি বলেন—"নিগ্রো-সমাজ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য কিছুমাত্র সংগৃহীত হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে তাহা বৈজ্ঞানিকের পাতে দেওয়া যায় না। সবই ভাসা-ভাসা, খানিকটা অলীক এবং কল্পনামূলক—অধিকাংশই উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার জন্য ব্যবহৃত হইবার যোগ্য—বিজ্ঞানসেবীর গ্রহণীয় নয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি উপায়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের সূত্রপাত করিবেন?" ইনি বলিলেন—"আমি ও আমার স্ত্রী অন্ততঃ ১০০ নিগ্রো পরিবারের জন্মবৃত্তান্ত এবং বংশবৃত্তান্ত ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া যাইব। এইটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট। বেশী কার্য্য করিতে চাহি না।" কেম্ব্রিজের হ্যাডনও এইরূপ intensive study বা সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে গভীর অনুসন্ধানের পক্ষপাতী। আজকাল দেখিতেছি পণ্ডিতেরা মানব বিষয়ক সকল বিজ্ঞানেই এইরূপে ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র করিয়া তাহার ভিতরকার সকল কথা বিশ্লেষণ করা পছন্দ করেন। এতদিন বিস্তৃত ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা এবং অগভীর আলোচনা চলিত। (ফ্রেজার Fraser) প্রণীত The Golden Bough গ্রন্থ নৃতত্ত্ববিষয়ক বিশ্বকোষ-স্বরূপ। কিন্তু হ্যাডন বলিয়াছিলেন "এই গ্রন্থ আমাদের নূতন আলোচনা-প্রণালী অনুসারে টিকিবে না।" লুশান তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী। তথ্যসমূহ যথাযথ সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীর অবলম্বন এবং বিজ্ঞান রচনার প্রলোভন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। পুরাতন "Extensive study"র অসম্পূর্ণতা এক্ষণে ধরা পড়িতেছে। কাজেই আলোচনা-প্রণালীর সংস্কার সুরু হইয়াছে।

প্রথমেই একটা সুবিস্তৃতক্ষেত্র সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিলে অতি সহজে ভুল হইবার সম্ভাবনা। অনুসন্ধানকারী সহিষ্ণুতার সহিত গভীরভাবে কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে সময় পান না। তাঁহার জানা এবং বুঝা সত্যগুলি তাঁহাকে কুসংস্কারপূর্ণ করিয়া রাখে। দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে যে-সমুদয় নূতন বস্তু তিনি দেখিতেছেন সেগুলি নিজের পরিচিত বস্তুসমূহের সঙ্গে তুলনা করিতে শীঘ্রই তিনি প্রবৃত্ত হন। যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না তাহাও অনেক সময়ে কল্পনা দ্বারা তিনি সৃষ্টি করিয়া লইতে প্রলুব্ধ হন। মোটের উপর একটা স্বকপোলকল্পিত "সাধারণ-নিয়ম"-বিশিষ্ট "বিজ্ঞান" খাড়া হইয়া উঠে। এইরূপ ভাসা-ভাসা অগভীর "extensive" আলোচনার ফলেই ইয়োরোপীয়

পণ্ডিতেরা উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য মানবসমাজকে জগতের আদর্শ সমাজ বিবেচনা করিয়াছেন। এই সমাজকেই মাপ-কাঠি জানিয়া জগতের অন্যান্য প্রাচীন ও নবীন সকল সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে—প্রচুর তথ্য সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা না করিয়া পণ্ডিতেরা Anthropology, Sociology, Economics, Comparative Mythology, ইত্যাদি নানা বিজ্ঞান গড়িয়া বসিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই-সকল বিদ্যা "পক্ষপাত-দোষশূন্য "বিজ্ঞান" নামে প্রচারিত হইতেছে—কিন্তু কোন পণ্ডিতই নিজের স্বজাতীয় গৌরবপ্রচার বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ফলতঃ নানা দিক হইতে ইয়োরোপের একশত-বর্ষ-ব্যাপী সমাজ-জীবন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে।

একে ইয়োরোপীয় বিস্তার এবং আধিপত্যের যুগ—তাহার প্রভাবে কোন পণ্ডিতই মাথা ঠিক রাখিয়া অন্য জাতীয় মানবজীবন সম্যক্ বুঝিতে অসমর্থ। অধিকন্তু, বিস্তৃতক্ষেত্রে আলোচনা। তাহার ফলে অল্পমাত্র তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া মত প্রচার এবং জাতীয় চরিত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ-বিষয়ক যে-সকল গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই বর্জ্জনীয়। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা এক্ষণে তাঁহাদের ভুলগুলি সংশোধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় Intensive studyর অবলম্বন এবং নূতন তথ্য সংগ্রহের প্রয়াস এই সংশোধন ও সংস্কারের লক্ষণ ও ফল।

নৃতত্ত্ববিদের নূতন সিদ্ধান্ত।

অধ্যাপক বোয়াজ আজীবন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবন পূর্ব্বোক্ত intensive studyর জলন্ত দৃষ্টান্ত। ২।৩ বৎসর হইল তিনি বষ্টন নগরের Lowell Instituteএ বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। সেই-সমুদয় বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের নাম The Mind of Primitive Man। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সমাজ-বিজ্ঞানে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে বলিতে পারি। সভ্যতা এবং অসভ্যতা, উচ্চ জাতি এবং নিম্ন জাতি ইত্যাদি বিষয়ক মামুলি সকল-মতই ইহার প্রভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে।

উপসংহার হইতে সামান্য মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"First of all we tried to understand the reasons for our belief in the existence of gifted races and of others less favourably endowed, and found that it was based essentially on the assumption that higher achievement is necessarily associated with higher mental faculty, and that therefore the features of those races that in our judgment have accomplished most are characteristics of mental superiority. We subjected these assumptions to a critical study, and discovered little evidence to support them So many other causes were found to influence the progress of civilisation, accelerating or retarding it, and similar processes were active in so many different races, that on the whole, hereditary traits, more particularly hereditary higher gifts, were at best a possible, but not a necessary element determining the degree of advancement of a race.

The second part of the fundamental assumption seemed even less likely. Hardly any evidence could be adduced to show that the anatomical characteristics of the races possessing the highest civilisation were phylogenetically more advanced than those on lower grades of culture. The various races differ in this respect; the specifically human characteristics being most highly developed, some in one race, some in another. Furthermore, it appeared that a direct relation between physical habitus and mental endowment does not exist.

আমাদের মধ্যে যে বিশ্বাস আছে যে যে-জাতির মনন শক্তি বেশী সেই বেশী রকমের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে, এবং তাহাদেরই মুখসৌষ্ঠব সুন্দর হইয়া মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দ্যায়, তাহার সত্যতা বিচার করিয়া দেখা গেল যে তাহার সপক্ষে প্রমাণের অভাব। সভ্যতার উন্নতি বা অবনতি এত রকম বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে যে মোটের উপর বলিতে হয় বংশগত প্রকৃতি—বিশেষ করিয়া সদ্গুণ—হয়ত জাতির উন্নতির সম্ভবপর কারণ বলা যাইতে পারে—কিন্তু তাহাই একমাত্র বা প্রয়োজনীয় কারণ নহে। কোনো জাতির শারীর-সংস্থান ও অস্থি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে জাতির প্রাচীনতাই উন্নত সভ্যতা লাভের কারণ নয়। অধিকন্তু বাহ্য অবস্থানের সহিত মানসিক পরিণতির কোনো সম্পর্ক নাই; মানবীয় ধর্ম্ম কোনোটা কোনো জাতিতে স্ফূর্ত্তি পায়, কোনো জাতিতে সুপ্ত থাকে।

সুতরাং কোনো বিশেষ গুণ বা সভ্যতার কোনো বিশেষ অবস্থা কোনো জাতির নিজস্ব বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে না। যাহার আছে তাহার গর্ব্ব করা সাজে না, কারণ এক দিন তাহাকে তাহা হারাইতে হইবে; এবং যাহার নাই তাহার হতাশ হওয়া উচিত নয়, কারণ কোনো

গুণ বা সভ্যতার কোনো বিশেষ অবস্থা কোনো জাতিতে চিরকালই থাকিতে দেখা যায় না এবং অপরে যাহা অর্জ্জন করিয়াছে সেও তাহা ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেই অর্জ্জন করিতে পারিবে।

ভারতে নৃতত্ত্ব।

বোয়াজকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভারতবর্ষে Anthropometry বিদ্যার প্রবর্ত্তন কি উপায়ে হইতে পারে?" ইনি বলিলেন—"ভারতবর্ষে প্রাণ-বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা প্রদান নিশ্চয়ই হয়। এই দুই বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণকে ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয়ে পাঠান আবশ্যক। ইহাদিগকে এই-সকল কেন্দ্রে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পরে অথবা আনুষঙ্গিক ভাবে কোন প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগে ইঁহারা শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে এই বিদ্যা নূতন প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এইরূপ কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। অবশ্য সাধারণভাবে নৃতত্ত্ব শিখিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় Anthropology course গ্রহণ করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে একজন অগ্রণী বা pioneer হইবার যোগ্যতা জন্মিবে না।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

আকবরের নিদাঘনিবাস

অতীত ভারতের ইতিহাসের সাক্ষী কত নগর, কত অট্টালিকা কত দেবালয়, প্রমোদনিকেতন, সমাধি-মন্দিরাদি শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে আর কেহ বা শত্রুর কারুণ্য লাভ করিয়া এখনও ভগ্নদেহে জরাগ্রস্ত পঙ্গুর মত দাঁড়াইয়া আছে আর কেহ বা এখনও কালের নির্ম্মম গতিকে উপেক্ষা করিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া রহিয়া রচয়িতা শিল্পীগণের অসাধারণ নৈপুণ্যের বিজয়ডঙ্কা নিনাদিত করিতেছে। অতীতের সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান এই-সকল নগরের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বতঃই নয়নসম্মুখ হইতে দীর্ঘকালের যবনিকা সরিয়া যায় ও অতীত যেন বর্ত্তমানের মতই প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, প্রতি শিলাখণ্ডই যেন আপনার নিদারুণ কাহিনী বলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। পরিত্যক্ত তাহারা বহুদিন পরে একজন লোকের মুখ দেখিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া জাগিয়া উঠে। অধুনা পরিত্যক্ত সম্রাট আকবরের নিদাঘ-নিকেতন ফতেপুর-সিক্রিতে গেলে বোধ হয় লোকবিরল রাজধানীটি যেন অতীতের জনকোলাহলকে স্মরণ করিয়া নীরবে রোদন করিতেছে। বহু প্রাসাদাদি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এইগুলিকে রক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ও হইতেছে।

নগরে এখন আছে শুধু আকবর বাদসাহের কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ প্রাসাদ মস্‌জিদাদির ধ্বংসাবশেষ। এখানে নগরের অন্যান্য অঙ্গ দরিদ্রের কুটীর, দোকানপাট প্রভৃতি যে ছিল তাহার অস্তিত্ব কোথায় ডুবিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। টিকিয়া গিয়াছে শুধু ঐশ্বর্য্যের দম্ভ, শিল্পীর নৈপুণ্য ও অতীতের অর্দ্ধ-বিলুপ্ত ইতিহাস ও দীর্ঘশ্বাস।

জনৈক দেশীয় ঐতিহাসিকের নিকট ফতেপুর-সিক্রির স্থাপন সম্বন্ধে এইরূপ কাহিনী শুনা যায় যে, আকবর বাদসাহের কএকটি পুত্র জন্মিল কিন্তু কেহই বাঁচিল না। এজন্য সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটের দুঃখের অন্ত নাই; তাঁহাকে এই চিন্তা সদাই বিব্রত করিয়া ব্যথিত। সাহানসার এই কষ্টে ব্যথিত হইয়া পরম সাধু সেলিম চিস্তি তাঁহাকে পুত্রলাভের বর দান করেন। সাধুপ্রবর আগ্রা হইতে ১২ ক্রোশ দূরে এই ফতেপুর-সিক্রিতে বাস করিতেন। আকবর বাদসাহ মাঝে মাঝে সাধুদর্শনে আসিয়া হেথায় ১০।১২ দিন করিয়া অবস্থান করিতেন। বাদসাহের আদেশে সেখ চিস্তির মঠের নিকটে পর্ব্বতচূড়ার উপরে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সিক্রিতে অবস্থানের কালেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। বাদসাহ যে সাধুর অনুকম্পায় ও বরে সন্তান লাভ করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সেই সাধুর নামে সন্তানের নাম সেলিম রাখিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনারোহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ নামেই বিখ্যাত ছিলেন। সাধুর বাসস্থান এই সিক্রিকে আকবর স্বীয় নূতন রাজধানীতে পরিণত করিলেন। সাধুর পবিত্র
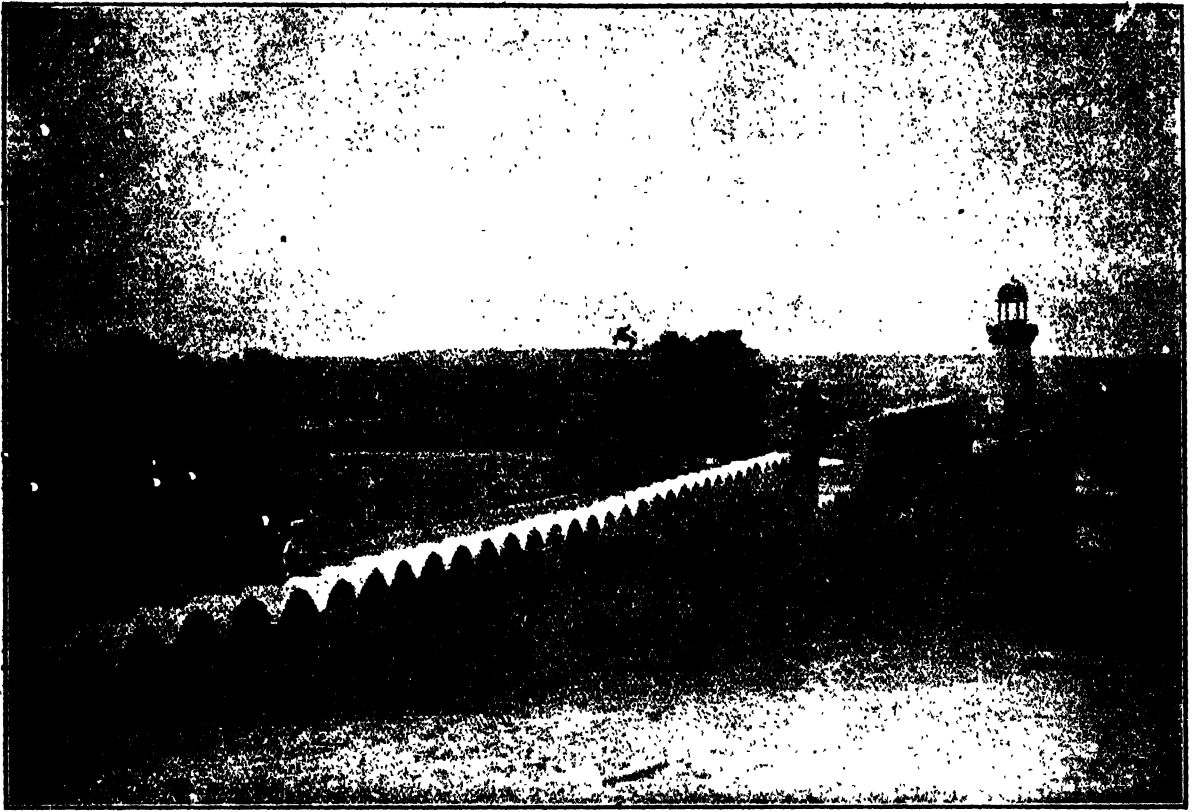
ফতেপুর-সিক্রির গড়বন্দী প্রাচীর।

আশ্রমে থাকিলে নিজের ও ভবিষ্য বংশীয়দের মঙ্গল হইবে বিবেচনায় সম্রাটের মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পুত্র জাহাঙ্গীর সম্রাটের এই মঙ্গল ইচ্ছা বুঝিতে পারেন নাই; তিনি এখান হইতে অনায়াসে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গেলেন। ক্ষণেকের জন্য ফতেপুর মোগল ঐশ্বর্য্যের প্রদীপ্ত শিখায় আলোকিত হইয়া আবার অন্ধতমসায় ডুবিয়া গেল, শুধু পড়িয়া রহিল তৈলহীন শিখাহীন প্রদীপাধারের জীর্ণ কঙ্কাল। জাহাঙ্গীর তবুও নিকটে ছিলেন, কিন্তু সাজাহান সরিয়া গেলেন আরও দূরে—ঐশ্বর্য্য ও প্রমোদের তুফান লইয়া গেলেন দিল্লীর প্রমোদালয়ে। কথিত হয় যে ফতেপুর হইতে রাজদরবার উঠাইয়া লইবার প্রধান কারণ স্থানের অস্বাস্থ্য ও পানীয় জল সরবরাহে অসুবিধা। রাজধানী পরিবর্ত্তনের যে কারণই হউক, অযথা কতকগুলি যে অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বাদসাহদের ক্ষণিক খেয়াল তৃপ্তির জন্য শত শত দরিদ্রের অর্থ কিরূপ জলের ন্যায় ব্যয় হইত ইহা তাহার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। অবশ্য তাহাতেও বহু দরিদ্র উপকৃত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কারণ নির্ম্মাণকালে বহু মজুর শিল্পী ইত্যাদি বহু অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল—তখন দেশের অর্থ যেরূপেই ব্যয় হউক দেশেই থাকিত। কিন্তু বহু দরিদ্রের আজন্ম-পরিচিত অতিপ্রিয় বাস্তুভিটারও উচ্ছেদসাধন হইয়াছিল।

সেলিমচিস্তির সমাধিমন্দিরটি শিল্পের উৎকর্ষের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। একটি প্রকাণ্ড তোরণ পার হইয়া একটি প্রকাণ্ড চৌকোঠায় পড়িতে হয়। এই চৌকোঠাটির প্রতিদিক ৫০০ ফুট লম্বা ও চারিদিকে উচ্চ সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী দণ্ডায়মান। পাদ্রী হিবার তাঁহার "উত্তরভারতভ্রমণ-কাহিনী"তে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি এতবড় চৌকোঠা অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখেন নাই।
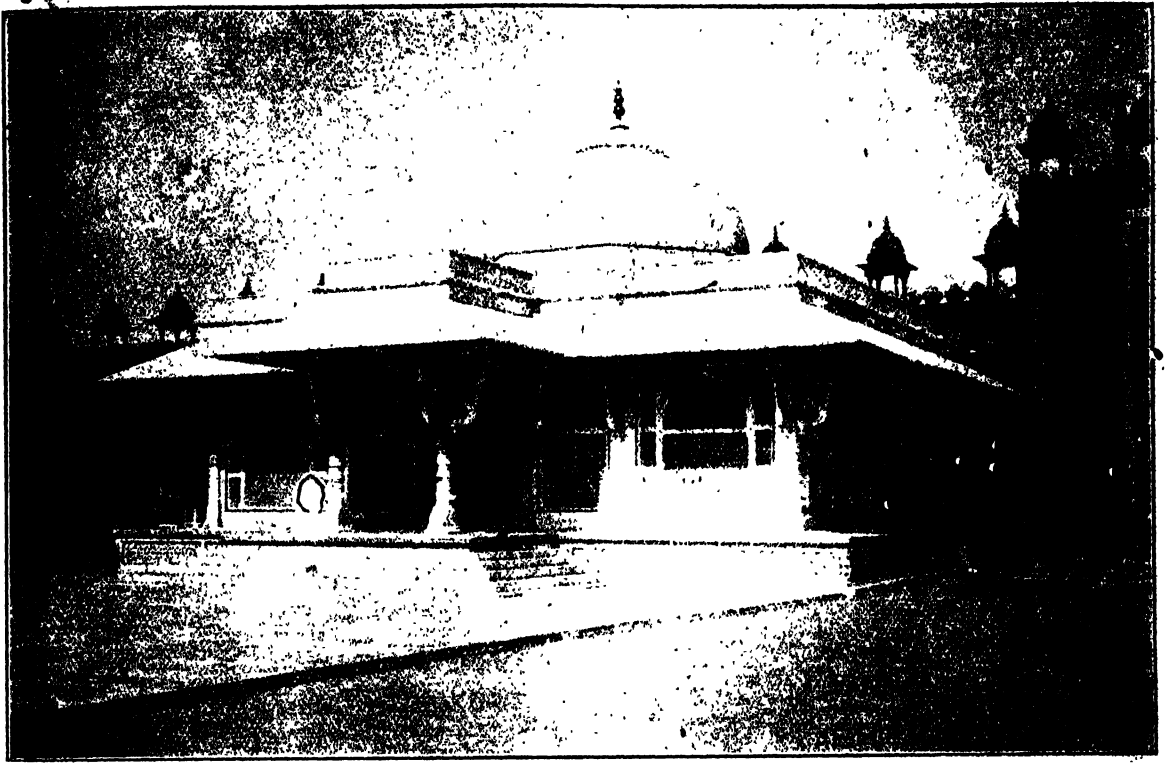
শেখ সেলিম-চিস্তির মর্ম্মর সমাধি মন্দির

তিনি শুধু ইহার বৃহদাকারেরই প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই—ইহার কারুশিল্পনৈপুণ্যেরও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। চৌকোঠায় আসিলেই সর্ব্বপ্রথমে শ্বেতপাথরের রত্নসদৃশ সাধুর সমাধিটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্বেতপাথরের এই সমাধিটি একটি মর্ম্মরজালায়নের প্রাচীরবিশিষ্ট ছাদ-দেওয়া ঘরের মধ্যে অবস্থিত। মর্ম্মরজালায়নগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা বায়ুভরে দুলিতেছে। হিন্দুস্থাপত্যের চিহ্নও এখানে পাওয়া যায়—যেমন মর্ম্মরের বৃহৎ কার্ণিশ। হিন্দুরা সূর্য্যরশ্মি প্রতিরোধ করিতে এইরূপ কার্ণিশ গঠন করিতেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে সমাধির উপর মুক্তাখচিত একটি চন্দ্রাতপ লম্বিত আছে। উপরে মাঝখানে মন্দির নির্ম্মাণের ও সাধুর মৃত্যুর তারিখ খোদা আছে। মন্দিরটি ঘুরিয়া দেখিলে দেখা যায় পুত্রলাভার্থ সমাগত বহুনারী ফকিরের সহিত সংযোগের আশায় বহু সূত্র প্রাচীরের জালায়নে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

সমাধিমন্দিরটির নিকটেই একটি প্রকাণ্ড মসজিদ আছে। কেহ কেহ বলেন সৌন্দর্য্যগরিমায় এই মসজিদটি ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। ১৫৭১ খৃঃ ইহা নির্ম্মিত হয়। মসজিদটিতে তিনটি গম্বুজ আছে। মসজিদের মধ্যস্থানে যাইতে হইলে একটি সুন্দর খিলানের তলা দিয়া যাইতে হয়। মেঝেটি মর্ম্মর পাথরে মোড়া। ছাদটি নানারূপ রঙ্ দিয়া বহু জ্যামিতিক চিত্রে পরিশোভিত। সুউচ্চ চতুষ্কোণ হিন্দুস্তম্ভের উপর এই বৃহদাকার মসজিদটি স্থাপিত। মসজিদের নিকটেই আকবর বাদসাহের খান্দেশ বিজয়ের নিদর্শন-স্বরূপ জয়স্তম্ভ বর্ত্তমান। নিত্য ভগবানের মসজিদের নিকটে অনিত্য জয়গর্ব্বের সমাবেশ! তোরণটির উপরে লিখিত আছে "যিশু বলিলেন—তাঁহার শান্তি হউক—পৃথিবী একটা সেতুবিশেষ—ধীরে ধীরে ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাও কিন্তু স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে যাইও না। যে ক্ষণেকের জন্য আশা করে তাহার আশা চিরকালের জন্য থাকিয়া
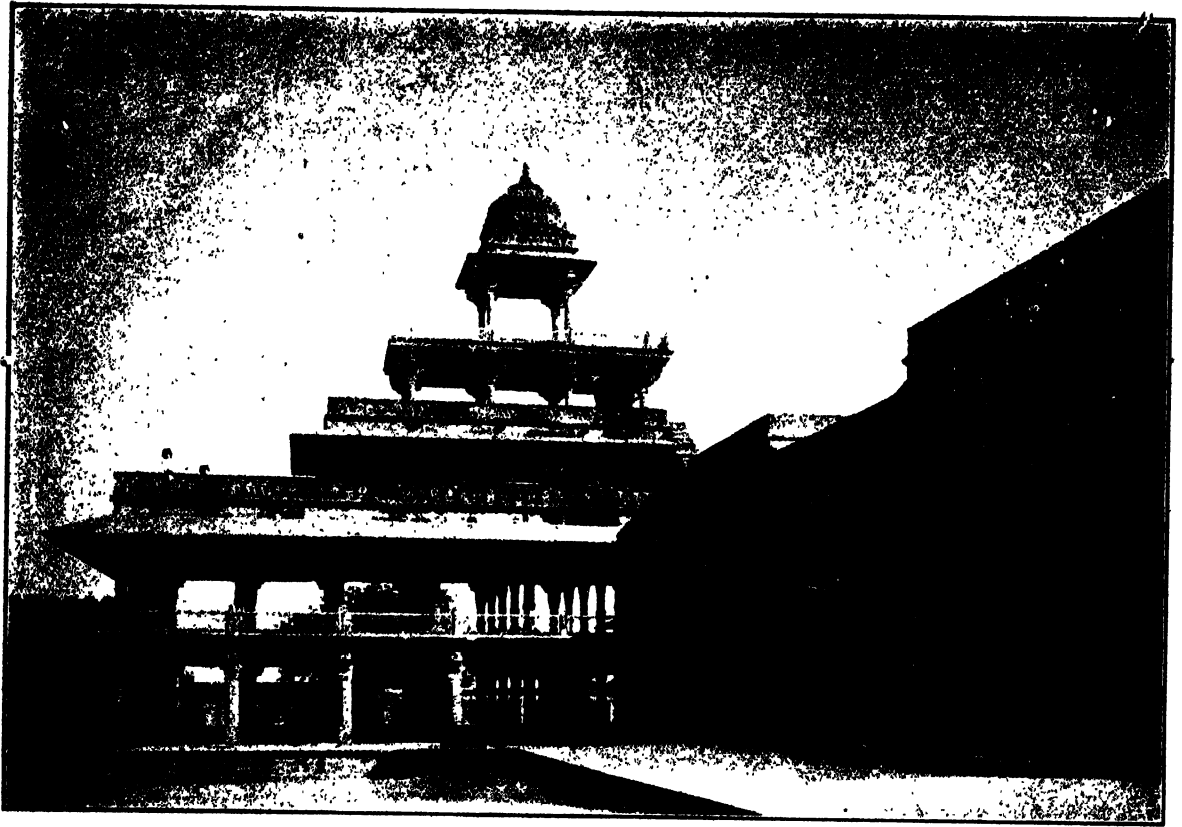
পঞ্চমহল।

যায়। অনন্তের তুলনায় সংসার অনুপলের চেয়েও ক্ষুদ্র, সুতরাং ভক্তি করিয়া জীবন অতিবাহিত কর, বেশী দেখিতে যাইও না।" এই তোরণের উপরে উঠিলে ভগ্ন সমগ্র নগরটি দৃষ্টিগোচর হয়। নগরের প্রাচীরের বাহিরের চারণ ভূমি ও ক্ষেতগুলি এখান হইতে বেশ সুন্দর দেখা যায়। প্রবেশপথের উপরের খিলান সম্বন্ধে বলা হয় যে, শিল্পী ইহার উদ্বোধনে নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার সম্যক পরিচয় দিয়াছেন। ধূসর ও রক্তাভ বেলে পাথরের স্তম্ভশ্রেণী, শ্বেতপাথরের অনুপম শিল্পকার্য্যসমূহ, ও সুস্পষ্ট খোদিত আরবী অক্ষরগুলি দেখিলেই বলিতে ইচ্ছা হয় নৈপুণ্যে ও সুষমায় কেহই কম নহে।

বাদসাহের আমীর ওমরাহরাও অনেকে এখানে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তাঁহাদের দুই একটা বাড়ী এখানে এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। রাজা বীরবলের গৃহটি ইহার অন্যতম। রক্তাভ বেলে পাথরে এই দ্বিতল অট্টালিকাটি নির্ম্মিত। একটা বৃহৎ চত্বরের উপর গৃহটি অবস্থিত। সমগ্র বাড়ীটিতে চারিটি ঘর ও দুইটি ঢুকিবার পথ। নীচের ছাদটি কতগুলি সুন্দর অতিনিপুণ-নক্সা-কাটা ব্র্যাকেট-ওয়ালা কার্ণিশের উপর অবস্থিত ও দরওয়াজা, দেওয়াল, প্রভৃতি অতি সুন্দর অঙ্কিত বহু জ্যামিতিক আকৃতিতে পরিপূর্ণ। কোথায়ও কাঠের ব্যবহার করা হয় নাই। গৃহটিকে একটি রক্তাভ পাথরের কৌটা বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

একটি ভবনকে যোধাবাইএর ভবন লোকে বলিয়া থাকে। সম্ভবতঃ ইহা সম্রাটের প্রধানা মহিষী সুলতানা রুকিয়ার বাসভবন। ভিতরের উঠানে অভ্যর্থনাগৃহ আছে। এই দ্বিতল অট্টালিকার ছাদটি ত্রিকোণাকৃতি ও এনামেল-করা টালি দিয়া আবৃত। মরিয়ম-ভবনটি আকবরসাহের
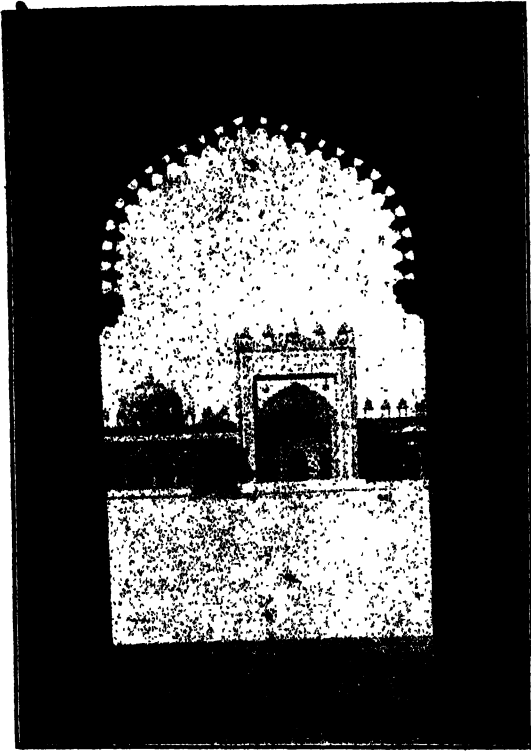
ফতেপুর সিক্রিতে প্রবেশের তোরণ, মসজিদের সম্মুখ।

পর্তুগীজ খৃষ্টানী পত্নীর বাসভবন বলিয়া বোধ হয়। ইহার দেওয়ালে কতকগুলি অস্পষ্ট ফ্রেস্কোচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। দেওয়ানি খাসে ও দেওয়ানি আমে সুনিপুণ খোদিত শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। দেওয়ানি আমের প্রধান স্তম্ভের মাথার মুকুটাকৃতি কারুকার্য্যের ছটা শিল্পীর যশোভাতি বিকীর্ণ করিতেছে। কথিত হয় সম্রাট এই স্তম্ভটির উপর স্বয়ং ও চারিজন মন্ত্রী ইহার সহিত সংযুক্ত চারিধারের চারিটি সাঁকোর উপর বসিয়া দরবার করিতেন।

পঞ্চমহল একটি পাঁচতালা বাড়ী। প্রতিতলই কতক-গুলিস্তম্ভশ্রেণীর উপর অবস্থিত। প্রতিতলের গৃহই অপরটি অপেক্ষা ছোট হইতে হইতে একেবারে সর্ব্বশেষটি অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। খুব সম্ভব ইহা দরবারে উপস্থিত নারীগণের প্রমোদভবনরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শত্রুর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষার ব্যবস্থার নিদর্শন এখনও পরিদৃষ্ট হয়। উত্তর-পূর্ব্ব দিকের তোরণ "হাতী-পোলে"র নিকট ইহার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। খিলানের উপর দুইটি অধুনা অস্পষ্ট হস্তীর চিত্র খোদিত আছে। নিকটস্থ হিরণ-মিনারে প্রস্তরের হস্তীর দীর্ঘ উদ্‌গত দন্ত গুলি বাস্তবিকই মনোহর। হিরণ মিনারটি আকৃতিতে গোল, ও উচ্চতায় ৭ ফুট। কথিত হয় আকবরের কতকগুলি প্রিয় হস্তীর সমাধির উপর স্মারক চিহ্নরূপে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ লোহিত রশ্মি যখন
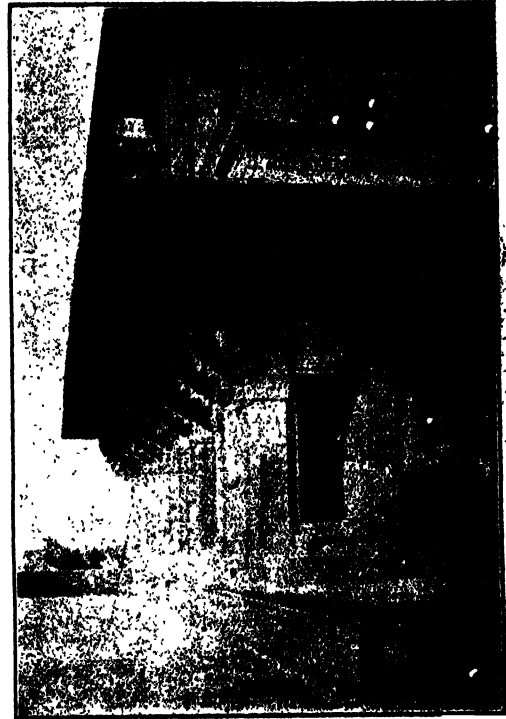
ফতেপুর-সিক্রিতে রাজা বীরবলের প্রাসাদ।

আসিয়া নীরব নগরটির পরিত্যক্ত অট্টালিকাগুলির প্রাচীরে প্রতিফলিত হইয়া উঠে তখন সেই অপূর্ব্বদৃশ্য হইতে নয়ন সরাইয়া লইতে ইচ্ছা হয় না। ফরেষ্ট সাহেব বলেন, "সন্ধার সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য তারকায় সুনীল নির্ম্মল গগন খচিত হইয়া উঠে—মনে হয় যেন ইটালির সুমিষ্ট সন্ধ্যায় ভ্রমণ করিতেছি। ধীরে ধীরে চাঁদ উঁকিঝুঁকি দিতে দিতে উদিত হয় ও যতদূর চক্ষু যায় বোধ হয় যেন সমগ্র দেশটি রঙীন জ্যোৎস্নার ওড়না পরিয়া গরবে ঝলমল
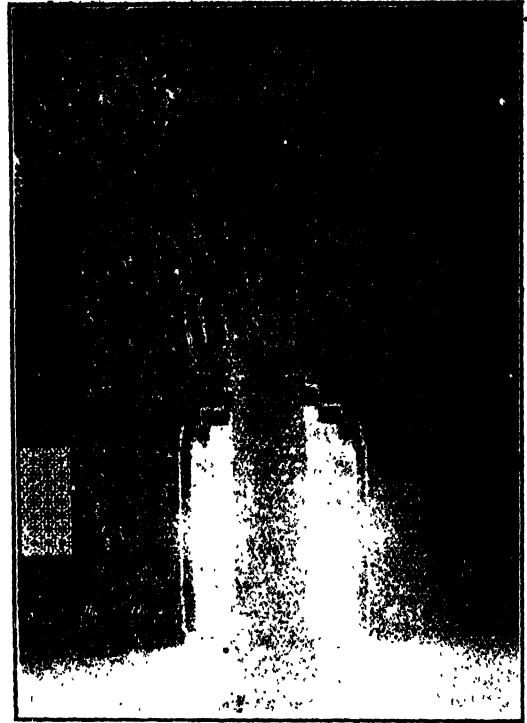
ফতেপুর-সিক্রির মসজিদের অভ্যন্তরের খিলান-বীথি।

এক-থাম্বা।

করিতেছে। সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার এই আড়ম্বর দেখিলে বিদেশী পর্য্যটকের মনে হয় না যে সে বহুদূরদেশাগত ও পরিশ্রম-কাতর। সমস্ত ক্লান্তি সমস্ত চিন্তা যেন মায়াকাঠির সহসা স্পর্শে ডুবিয়া যায় ও আনন্দে প্রাণ পরিপ্লুত হইয়া উঠে। তখনই আবার পরিত্যক্ত নগরের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া যায়।"

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

জাত ও আহারের নিয়ম

(Emile Senartএর ফরাসী হইতে)

যাহারা মনে করে ব্যবসায় লইয়াই জাত, নিম্নলিখিত প্রবচনটি তাহাদের মুখের উপর এই উত্তর দেয়:—"ভাত লইয়াই জাত"।

অতীব জটিল ও বাধাজনক দুইটি নিয়ম হিন্দুরা যেরূপ সতর্কতার সহিত সযত্নে পালন করে, তাহা দেখিয়া আমাদের যেরূপ বিস্ময় হয়, উহাতে যাহারা চিরাভ্যস্ত সেই হিন্দুরাও সেই বিস্ময়ের হাত অতিক্রম করিতে পারে নাই; অন্তত উক্ত প্রবচনটি ইহাই সপ্রমাণ করে। সেই নিয়ম দুইটি এই:—

প্রথম নিয়ম,—অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কোন জাতের লোকের তৈয়ারী বা ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ না করা; দ্বিতীয় নিয়ম, নিকৃষ্ট জাতের লোকের সহিত একত্র আহার না করা। নিকৃষ্ট জাতের লোকেরাও আপনাদের জাতের লোক ছাড়া আর কাহারও সহিত আহার করে না। এইরূপ অন্যোন্য ব্যবহার স্বাভাবিক। এইরূপ নিয়মে অবশ্য আমাদের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ভারতের পক্ষেও যে ইহার অসুবিধা নাই এ কথা বলা যায় না। এই সম্বন্ধে উহাদের যেরূপ সঙ্কোচ তাহাতে য়ুরোপীয়দিগের সহিত উহাদের মেলামেশা খুবই বিরল হইয়া পড়িয়াছে, খুবই জটিল হইয়া পড়িয়াছে, সমুদ্রযাত্রা করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল-উৎস হইতে সভ্যতা গ্রহণ করিবার পক্ষে বিষম প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

হিন্দুরা বড়ই উৎসব ভক্ত। সব ক্রিয়াকর্ম্মের উপলক্ষেই উহাদের ভোজ হয়। এই ভোজে উহারা সকলে মিলিয়া একত্র আহার করিতে বসে। (১) এই বিষয়ের বারণ-বাধাগুলি হইতে ভিতরের কথাটা বুঝা যায়। উহার প্রভাব এতই বলবৎ, যে দেখা গিয়াছে, বঙ্গদেশের অতীব নীচজাত সাঁওতালেরাও শুকা-হাজার সময় বরং মরিবে তবু ব্রাহ্মণের রাঁধা অন্ন স্পর্শ করিবে না। (২)

সাধারণত এইরূপ বলা যাইতে পারে, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে, তাহারাই একসঙ্গে আহার করিতে পারে। অতএব এখানেও জাতটাকে সংকীর্ণ অর্থে বুঝিতে হইবে। বঙ্গকায়স্থদিগের ১২ বিভাগ পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করে না, সুতরাং একসঙ্গে আহার করিতেও পারে না। (৩) তথাপি, সমস্ত ধরিয়া দেখিতে গেলে, এক্ষেত্রে নিষেধের নিয়মটা তেমন কড়াক্কড় নহে; জাতের অনেকগুলি উপবিভাগ যাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ অবৈধ, তাহারা একসঙ্গে আহার কবিতে ছাড়ে না। তাছাড়া, এসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন জেলায় একই জাতের মধ্যে বিভিন্ন আচার দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) এবিষয় সম্বন্ধে আইন সর্ব্বত্রই সমান। কিন্তু সর্ব্বত্রই কতকগুলি উদ্ভট আকারের পার্থক্য থাকায় ব্যাপারটা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। যাই হোক, ইহা হইতে আমাদের প্রভূত জ্ঞানলাভ হয়।

ইবেটসন একটা রিপোর্ট হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়,—"সাধারণভাবে, কোন এক বংশের লোক কোন নিকৃষ্ট বংশীয় লোকের হাত হইতে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে না। কিন্তু অগ্নিতে শোধনী শক্তি আরোপিত হওয়ায় (বিশেষত ঘৃত ও শর্করার উপর অগ্নির এই শোধনী ক্রিয়া বিশেষরূপে প্রকটিত হওয়ায়) এবং ধাতব পাত্র মৃৎপাত্র অপেক্ষা বেশী শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এই অগ্নি ও ধাতব পাত্র উক্ত পার্থক্যের এক-প্রকার পত্তনভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল খাদ্যই দুই ভাগে বিভক্ত। এক—"পক্কী রোটি," (ঘি ও নুনে ভাজা); আর এক উহার বিপরীত "কচ্চি রোটি"। কোন গুজরাটি ব্রাহ্মণ,—গৌড় ব্রাহ্মণের হাতে, কোন গৌড় ব্রাহ্মণ একজন টাগার হাতে, কোন ব্রাহ্মণ কিংবা টাগা—রাজপুতের হাতে, কোন রাজপুত—জাট বা ররের হাতে, "পক্কি রোটি" খাইবে কিন্তু "কচ্চি রোটি" খাইবে না। যাহাদের সহিত একসঙ্গে "পক্কী রোটি" খাওয়া যাইতে পারে, তাহাদের হস্ত হইতে ধাতব পাত্রের জলও গ্রহণ করা যাইতে পারে—কিন্তু গোড়ায় সেই ধাতব পাত্রটি মাটি দিয়া মাজা-ঘসা চাই। কিন্তু তাহারা মৃৎ-পাত্রের জল শুধু তাহাদেরই হস্ত হইতে গ্রহণ করিবে যাহাদের সহিত "কচ্চি রোটি" খাইবার ব্যবহার আছে। জাট্, গুজর, রর্, কাবারী, আহির—ইহারা নিঃসঙ্কোচে একসঙ্গে আহার করে। উহারা একজন স্বর্ণকারের হস্ত হইতে "পক্কী রোটি" গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার গৃহে গ্রহণ করিবে না।...একজন মুসলমান, হিন্দুর হস্ত হইতে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করিবে, কিন্তু একজন হিন্দু, মুসলমানের হস্ত হইতে, কি কচ্চি, কি পক্কী—কোন খাদ্যই স্পর্শ করিবে না এবং অনেক সময়, সেই খাদ্যের উপর মুসলমানের ছায়া পড়িলেও তাহা ফেলিয়া দিবে।...কিন্তু মুচিই হউক, ঝাড়ুবর্দ্দারই হউক,—তাহাদের ছোঁয়া চিনি ও প্রায় সর্ব্বপ্রকার মিষ্টান্ন গ্রহণ করিতে বাধা নাই। কিন্তু এস্থলে ঐ সকল মিষ্টান্ন অখণ্ড অবস্থায় থাকা চাই—খণ্ডিত হইলে চলিবে না।" এই খুঁটিনাটি-বর্ণনাটি বোধ করি একটা দৃষ্টান্তের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে। আমি যে এই-সকল তথ্য সম্বন্ধে একটা পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিনা তজ্জন্য পাঠকেরা আমাকে আশা করি ক্ষমা করিবেন অথবা আশীর্ব্বাদ করিবেন।

এই আহার সম্বন্ধীয় মর্য্যাদাবিচার পথভ্রষ্ট হইয়া কিপ্রকার অদ্ভুত ও উদ্ভট ব্যাপারে পরিণত হইতে পারে তাহাই উপরে প্রদর্শিত হইল। চুরা ও ধানক এই দুই অতীব হেয় ও অবজ্ঞেয় জাতের উল্লেখ করা হইয়া থাকে যাহারা আপনাদের পরস্পরের উচ্ছিষ্ট আহার করিবে না, কিন্তু "শাঁসি" জাত ছাড়া আর অন্যান্য জাতের উচ্ছিষ্ট আহার করিবে! আবার পক্কান্ন ও অন্যান্য

(১) Jogendra Chandra Ghose—Cal. Review.
(২) Barth—Revue Critique.
(৩) Guru Proshad Sen. Calc—Review.
(৪) দুই একটি দৃষ্টান্ত Elliotএর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

খাদ্যের মধ্যে যে কতকটা প্রভেদ আছে তাহারও উল্লেখ না করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব না। বঙ্গদেশে, আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণের হাতে প্রস্তুত খাদ্য সকল জাতই গ্রহণ করে; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে, অনেক জাত ব্রাহ্মণের হাতের রান্না এবং আপনার জাতের লোক ছাড়া আর কাহারও হাতের রান্না খায় না। এই ক্লান্তিকর বৈচিত্র্যের কথা আর কত বলিব।

অন্তত একটি প্রভেদের কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক—সে প্রভেদটি বিশেষ লক্ষণপরিচায়ক ও খুব সাধারণ ধরণের। সেই প্রভেদটি মাদ্রাজ ব্যতীত, ভারতের অধিকাংশ স্থানেই জাতগুলাকে দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া থাকে, যথা;—যে-সকল জাতের হাতে জল গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং যে-সকল জাতের স্পর্শে জল কলুষিত হয়; এই পর্য্যায়গুলি বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। এই সম্বন্ধে—ভারতের অন্যান্য হিন্দুরা, কতকগুলি বিরল ব্যতিক্রমস্থল ছাড়া, সমস্ত বাঙ্গালীকে (ব্রাহ্মণেরাও ইহার অন্তর্ভুক্ত) বর্জ্জনীয় জাতের মধ্যে ধরিয়া থাকে। এই জল-আচরণের বিভাগটা বড়ই অদ্ভুত। এইরূপ বিভাগে, জলের একটা বিশেষ মাহাত্ম্য বা গুরুত্ব পরিসূচিত হয়। শুষ্ক মুড়ি ও জলমিশ্রিত ভাতের প্রভেদের মত অদ্ভুত প্রভেদগুলা ঐ একই মনোভাব হইতে কি উৎপন্ন নহে? আর একটা দৃষ্টান্তেও এই কথাটার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পঞ্জাবে হিন্দুরা গোশী নামক মুসলমান-জাতির নিকট হইতে অমিশ্র খাঁটি দুধ অসংকোচে গ্রহণ করিবে, কিন্তু যদি কোন কারণে উহাদের সন্দেহ হয়, উহাতে জল মিশান হইয়াছে,—তখনি উহারা ঘৃণার সহিত উহা ঠেলিয়া ফেলিবে। একথা সত্য, কতকগুলি অস্পষ্ট হেতু বশতঃ,—হয়ত কতকগুলি সাধাসিধা ব্যবহারিক প্রয়োজনবশতঃ, অনেকস্থলে এই নিয়মটাকে শিথিল করা হইয়াছে। পঞ্জাবে সকলেই অত্যন্ত নীচ জাত "জিন্বর"দের হস্ত হইতে জল গ্রহণ করে; কিন্তু এই যে জিন্বর-জাত,—এই জাত বিশেষ-রূপে গৃহ-ভৃত্যেরই যোগান দেয়। অনেক গ্রামে, কুমোর সকলকেই জল বিতরণ করে; কিন্তু একটা সর্ত্ত এই-থাকে যে, প্রত্যেক জাতের জন্য এক-একটা পৃথক্-নির্দ্দিষ্ট ঘড়া থাকিবে। গ্রামের সাধারণ ভোজে, সকল জাতকেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রত্যেকে পৃথক্‌ভাবে আহার করে। সাধারণের সুবিধার জন্য এই যে একটু রফার ভাব ইহা হইতেও আসল নিয়মটার জীবনীশক্তি সপ্রমাণ হয়। বাহ্য শুচিতা সম্বন্ধে এই নিয়মের খুবই আঁটাআঁটি।

এই-প্রকারের সঙ্কোচ বশতই, উচ্চ জাতের লোকেরা নীচজাতের লোকদিগের গাত্রস্পর্শ সযত্নে বর্জ্জন করে। কতকগুলি জাতের ব্যবসায়কে উচ্চজাতের লোকেরা এরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখে যে তাহাদিগকে গ্রামের অভ্যন্তরে বাস করিতেও দেয় না। গৃহভৃত্যের হিসাবেই হউক, ব্যবসায়ী লোকের হিসাবেই হউক, উহারা গ্রামের যতই উপকার করুক না কেন, উহাদিগকে গ্রামের বসতিপুঞ্জের বাহিরে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। গ্রামের সাধারণ ভোজ হইতেও উহাদিগকে কঠোরভাবে বাদ দেওয়া হয়। আবার, কতকগুলি ব্রাহ্মণগ্রাম আছে যেখান হইতে অন্য সকল জাতের লোক কঠোরভাবে অপসারিত হয়। একথা বলা অনাবশ্যক যে এইরূপ মনোভাব সকল জাতের মধ্যেই আছে। ইহা বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হয়; ইহার অসদ্ভাব কোথাও নাই।

একটা পঞ্জাবি প্রবচন;—"যদি কোন বিষ্ণোই একটা উটের উপর আরূঢ় থাকে, এবং তাহার পশ্চাতে আরো ১০টা উট থাকে,—যদি অন্য জাতের লোক শেষের উটটাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলেও সে তখনি সমস্ত অন্ন দূরে নিক্ষেপ করিবে।" অপেক্ষাকৃত সামান্য লোকদের মধ্যে নিয়মের অত প্রকারভেদ প্রত্যাশা করা যায় না। তথাপি, হণ্টার সাহেব আমোদ করিয়া একটা ঘটনার কথা বলেন, সেটা তাঁর নিজের ঘটিয়াছিল। উড়িষ্যা দেশে—তাঁর পাল্কী বহিবার জন্য অনেক জাতের লোক হইতে তিনি বাহক সংগ্রহ করেন। বাহকদের মধ্যে, দুই জাতের লোক একসঙ্গে কাজ করিতে অস্বীকৃত হইল; শুধু তাহা নহে, বাহক বদলি হইবার সময় যখন একজাতের লোক, অন্যজাতের লোকের স্থান অধিকার করিত তখন প্রত্যেকবার পাল্কীটাকে মাটিতে রাখা তাহারা আবশ্যক মনে করিত। এমন কোন হিন্দুপরিবার নাই পারতপক্ষে যাহারা, কোন গুরুতর ব্যাপারে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্‌বাণী ও মতামত লইয়া কাজ না করে। ভাল! কিন্তু তাঁহার

এই কাজের গৌরব সত্ত্বেও, তিনি যদি গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করেন—অমনি তাড়াতাড়ি ঘরের মাদুর উঠাইয়া লওয়া হয়, পাছে ঐ দৈবজ্ঞঠাকুরের স্পর্শে মাদুরটা কলুষিত হয়।

অশুচিতা যে শুধু মানুষের গাত্রস্পর্শেই আবদ্ধ তাহা নহে ? উহা পদার্থ সমূহের মধ্যবর্ত্তিতাসূত্রেও সংক্রামিত হয়। আবার এই কতকগুলি নূতন ভেদাভেদ উপস্থিত হইয়া ব্যাপারটার গুরুত্ব আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তার সাক্ষী:—আমরা একবার পুণায় চিৎপাবন ব্রাহ্মণের গৃহাভ্যন্তরে ছিলাম। সেখানে কতকগুলি কড়াক্কড় নিয়ম আছে, সেই নিয়মানুসারে কোন শূদ্রশ্রেণীর ভৃত্য, কতকগুলি জিনিস ছুঁইতে পারে, আর কতকগুলি জিনিস ছুঁইতে পারে না। ইহার দরুণ সমস্ত বন্দোবস্তই জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কোন কুন্‌বি জাতের ভৃত্য,—পূজা ঘরে, রান্না-ঘরে বা খাবার ঘরে ঢুকিতে পারে না। সে বিছানা ছুঁইতে পারে, পশমি কাপড় ছুঁইতে পারে, কিন্তু সদ্যোধৌত কার্পাসবস্ত্র ছুঁইতে পারে না। সে শস্যের ভিক্ষা দানা ছুঁইতে পারে। ব্রাহ্মণজাতীয় ভৃত্যেরাও নানাপ্রকার নিয়মের ভারে ভারাক্রান্ত। যখন তাহারা স্নান করিয়াছে, পট্টবস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছে, তখনি তাহারা শুচী, তখন তাহারা সকল জিনিসই ছুঁইতে পারে। যদি তাহারা কোন অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করে, যথা—গদি, পরিচ্ছদের কোন অংশ, উত্তরীয় বা পাগড়ী, তখনি তাহারা অশুচি হয়। জুতা বা চর্ম্মখণ্ড স্পর্শ করিলে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে স্নান করিতে হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রের একবার স্নান হইয়া গেলে যদি তাহার কেতাবের পাতা উল্টাইবার দরকার হয়, সে তখন ভৃত্যকে, ভাইকে, ছোট বোন্‌কে ডাকিতে বাধ্য হয়। তাহারা আসিয়া পাতা উল্টাইয়া দেয়। কেননা, কেতাবের মলাট চামড়া দিয়া প্রস্তুত।"*

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* Poona Gazette

পরগাছা

(১৫)

রাখাল যে মনিঅর্ডার করিয়াছিল তাহার রসিদ ফিরিয়া আসিল। রাজার খাস চিঠির সঙ্গে সে রসিদও রাজার কাছে কাছারীতে বিলি হইল। ধনেশ্বর মনিঅর্ডারের রসিদ দেখিয়াই ডাক-ঘণ্টার চাবি টিপিলেন; ঘণ্টা কিড়িং-কিড়িং করিয়া উঠিল।

চাপরাসী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

ধনেশ্বর বলিলেন—জামাই-বাবুকে ডাক্।

চাপরাসী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

রাখাল আসিয়া দাঁড়াইল।

ধনেশ্বর মনিঅর্ডারের রসিদখানা রাখালের সামনে সরাইয়া দিয়া বলিলেন—এ কি ?

—মনিঅর্ডারের রসিদ।

—তা আমি জানি। আমি বলছি কি, দাদামশায়কে টাকা পাঠানো হয়েছিল কেন ? পিছটান আছে যার এমন জামাই ত আমি চাইনি। টাকা পেলে কোথায় ?

—আমার হাতখরচের জন্যে যে টাকা দেওয়া হয় তাই আমি পাঠিয়েছি।

—সে টাকা ত তোমাকে দেওয়া হয়েছিল; তোমার দাদামশায়কে ত দেওয়া হয়নি।

—আমাকে খরচ করতে দেওয়া হয়েছিল; আমি এই রকমে খরচ করেছি।

—এ রকম করে তুমি সে টাকা খরচ করতে পারবে না। আমি চাইনা যে এ বাড়ীর সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে তোমার যোগ থাকে।

রাখাল দৃপ্তস্বরে বলিল—যে যোগ জন্ম দিয়ে ভগবান করে দিয়েছিলেন সে যোগ মানুষের হুকুমে ত আর বন্ধ হবে না। তবে যে-টাকায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার নেই সে টাকা পাঠিয়ে আমার আপনার লোক কাউকে আমি আর অপমান করব না; আর সে রকম টাকাও আমার চাইনে।—বলিয়া রাখাল শ্বশুরের আর কোনো কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

আবার ডাক-ঘণ্টার চাবিতে মোচড় পড়িল, আবার ঘণ্টা ডাকিল, চাপরাসী আসিয়া যথারীতি সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

ধনেশ্বর বলিলেন—ডাকমুন্সিকে তলব কর।

কিছুক্ষণ পরে পোষ্টমাষ্টার বেচারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া প্রণাম করিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। রাজার হুকুম হইল, জামাই-বাবুর নামের চিঠিপত্র যা-কিছু আসিবে তাহার সমস্তই যেন তাঁহাকে না দেখাইয়া জামাইবাবুকে বিলি করা না হয়, এবং জামাইবাবুও যে-সমস্ত চিঠিপত্র ডাকে দিবে তাহা যেন ডাকে রওনা করিবার আগে তাঁহাকে দেখাইয়া লওয়া হয়।

পোষ্টমাষ্টার "যে আজ্ঞে" বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া পলায়ন করিল।

রাজা-শ্বশুরের এ হুকুম রাখালের অজানা রহিল না। রাখাল চিঠিপত্র লেখা একেবারে বন্ধ করিল।

খাজাঞ্চি মহারাজকে এত্তেলা করিয়া রাখিল—জামাই-বাবু হাতখরচের তন্‌খা লইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

রাজা খানিকক্ষণ ভাবিয়া হুকুম লিখিলেন সে টাকাটা মণি-মায়ের তন্‌খার সামিল করিয়া মণি-মায়ের কাছে যেন দেওয়া হয়।

ধনেশ্বর কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন - বাবুর-বেটার রাগ হয়েছে; তন্‌খার টাকা নেওয়া হয়নি; তোমার কাছে সেই টাকা আসবে, ওর দরকার মত ওকে দিও।

মণিমালা মাথা নত করিয়া শুনিল। তারপর আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(১৬)

মণিমালা নিজের ঘরে আসিয়া দেখিল রাখাল দুই হাতের মধ্যে মাথা ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মণিমালা ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া তাহার স্বামীর হাত দুখানি দুই হাতে ধরিয়া মাথা হইতে নামাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। সে হাসির প্রতিবিম্ব রাখালের মুখে পড়িল না। দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। মণিমালার হাসিমুখও ম্লান হইয়া উঠিল। সে স্বামীর মাথাটি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কথায় আদর ঢালিয়া বলিল—লক্ষ্মী আমার, বাবা-মা'র কথায় রাগ কোরো না! বাবা-মা বুঝতে পারছেন না যে তোমার হাত পা বেঁধে আমার পায়ের কাছে এনে ফেললেই তুমি অমনি আমার আপনার হয়ে যাবে না। এতে তোমার মন আমার ওপর বিষ হয়ে উঠছে। ঘিসু খানসামা একদিন বল্‌ছিল 'যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ!' আমার হয়েছে তাই। জোর করে ভালো বাসাতে গিয়ে বাবা মা আমারই কপালে ভালো করে আগুন ধরিয়ে তুলছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে তোমার যাতে মনে ব্যথা লাগছে সেটা আমাকেও কতখানি বাজছে, আমাকে সেটা কতখানি অপমান করছে। আমি ত বাবা-মাকে এসব কথা বলতে পারি না, আমি তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাচ্ছি, লক্ষ্মীটি, তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না। মা-বাবার কথা তুমি গায়ে মেখো না।

রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া মণিমালার সমস্ত কথা শুনিল। তারপর আস্তে আস্তে বাঁ হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া রাখাল স্নেহমুগ্ধ স্বরে বলিল—তোমার জন্যেই আমি এ বাড়ীতে এখনো টিঁকে আছি মণি। কতদিন মনে হয়েছে ছুটে পালিয়ে গিয়ে আমাদের সেই কুঁড়েঘর-খানিতে দিদিমার কোলের মধ্যে আশ্রয় নি। কিন্তু পেরে উঠিনা শুধু তোমার জন্যে।

মণিমালা ব্যথিত হইয়া সহানুভূতিভরা স্বরে বলিল—কিন্তু গোসাঁইগঞ্জেও ত তুমি সুখে ছিলে না বল।

—সেখানেও সুখে ছিলাম না মণি। সেখানকার দানও এমনি অহঙ্কারে ভরা, এমনি তাচ্ছিল্যের, সেখান-কার ব্যবহারও এমনি কঠোর। তবে কি জানো, সেখানকার জিনিসে একটা জন্মগত অধিকার ছিল। তাই সে জায়গাটা এর চেয়ে কতক সহ্য হয়। এখানে আমার কিসের অধিকার মণি?

মণিমালা লজ্জিত স্মিতমুখ নত করিয়া বলিল—আমি যে তোমার, সেই অধিকার।

রাখাল মণিমালাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিল। সুখাবেশে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তুমিই আমার, এ-বাড়ীর আর কিছু আমার নয়।

মণিমালা বলিল—আমি যদি তোমার তবে আমার যা-কিছু তোমারই ত।

রাখাল আর কিছু কথা বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

স্বামীকে একটুখানি প্রফুল্ল করিয়া তুলিবার জন্য মণিমালা বলিল—আমি গাড়ী আনতে বলি, চল একটু বেড়িয়ে আসি। চল পিসিমাদের বাড়ী যাই।

রাখাল শুনিয়াছিল তাহার পিস্‌শ্বশুর শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি তাহার দেশ হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার পৈতৃক বাসগ্রাম বাণেশ্বরপুর গোসাঁইগঞ্জের পার্শ্ববর্ত্তী। তাঁহার কাছে গোসাঁইগঞ্জের, বিশেষ করিয়া দিদিমার, খবর পাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়া রাখাল সহজেই যাইতে রাজি হইল। বলিল—তোমার সঙ্গে বন্ধ গাড়ীতে যাওয়া বড় কষ্টকর; তুমি গাড়ীতে চল; আমি তোমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ায় যাব।

মণিমালা হাসিয়া বলিল—বন্ধ গাড়ীতে যেতে তোমাদের কষ্ট হয়; আমাদের কিচ্ছু কষ্ট হয় না, না?

রাখালও হাসিল, বলিল—তুমিও তাহলে ঘোড়ায় চল।

—ঘোড়া কেন, খোলা গাড়ীতে ত যেতে পারি।

রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল—তুমি কেবলমাত্র আমার স্ত্রী হলে নিয়ে যেতাম। কিন্তু তুমি যে আগে রাজার মেয়ে। রাজবাড়ীর আব্‌রু নষ্ট করবার সাহস আমার আর নেই।

মণিমালা দেখিল আবার অপ্রিয় প্রসঙ্গ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। সে তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য ডাকিল—ইচ্ছা-নানি, এগো ইচ্ছা-নানি।

বৃদ্ধা দাসী ইচ্ছা আসিয়া বলিল—কেনে গে মায়ো?

—দেউড়িতে জমাদারকে বলে আয়, আমার জন্যে একটা গাড়ী, আর জামাইবাবুর ঘোড়া তোয়ের করে নিয়ে আসুক, আমরা বাঁশতলীতে পিসিমার বাড়ী যাব।

পাহাড়পুর হইতে মাইল-দুই দূরে বাঁশতলী মৌজা। বিবাহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই তালুক যৌতুক পাইয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর হইতে পাহাড়পুর রাজবাড়ী ছাড়িয়া নিজের তালুকে নিজের বাড়ীতে গিয়া বাস করিতেছেন।

মণিমালা গাড়ীতে চড়িল; ইচ্ছাদাসী সঙ্গে চলিল; একজন আরদালি গাড়ীর কোচবাক্সে উঠিল। রাখাল ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে একবার মণিমালার জানলার কাছে ঘেঁসিয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল—আমি রাজকুমারীর তুরুকসোয়ার।

মণিমালা ভ্রূ নাচাইয়া শাসাইয়া হাসিয়া বলিল—চল না বাড়ী, মজা দেখাব।

এমনি আনন্দে তাহারা পথ চলিতেছে। পাহাড়ে-দেশের খোলা মাঠের বুকের উপর দিয়া বাঁধা লাল রাস্তা—যেন সিঁদুর-পরা সিঁথির মতো চলিয়া গিয়া দূর দিগন্তে মিশিয়াছে। সন্ধ্যা হব-হব; চারিদিকের লালের উপর অস্তসূর্য্যের লাল আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আজ যেন ধরণীর কুশণ্ডিকা, তাহার বর সূর্য্য তাহার লজ্জারক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহার সীমন্তে সিন্দূর দান করিতেছে। প্রান্তরের মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে দূরে দূরে দুএকটা গাছ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; মাঝে মাঝে সারি বাঁধিয়া পাখী উড়িয়া আসিয়া তাহাদের পত্রকুঞ্জে রাত্রির আশ্রয় খুঁজিয়া লইতেছে। মাঝে মাঝে রাখালেরা গরু মহিষ তাড়াইয়া লইয়া, হাটুরে লোকেরা হাটের বেসাতি ঘোড়া-গোরুর পিঠে চাপাইয়া বা মাথায় বহিয়া লইয়া সেই পথ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছে; মজুরেরা সমস্ত দিনের পর ঝুড়ি কোদাল বাশ কুড়ুল কাঁধে করিয়া আসিতেছে যাইতেছে। রাখাল ও মণিমালা মনের আনন্দে সেই সব দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল; মণিমালার হুকুমে গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতেছিল। এমন সময় একজন ভিক্ষুক তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়িতে দৌড়িতে রাখালের কাছে একটি পয়সা চাহিতে লাগিল। রাখাল ব্যথিত অভিমানের স্বরে মণিমালাকে শুনাইয়া ভিক্ষুককে বলিল—আমার এক পয়সাও সম্বল নেই, ভাই; থাকলে দিতাম।

ভিক্ষুক বলিল—আপনি ত রাজা, আপনার হাত ঝাড়লে আমাদের পর্ব্বত।

রাখাল বলিল—আমার পোষাক পরিচ্ছদ রাজার মতন দেখতে বটে কারণ আমি রাজকন্যার বর। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত ভাই, আসলে আমি তোমার চেয়েও গরীব। তোমার নিজের বলতে একটা কুঁড়ে কি একটা গাছতলাও আছে, আমার তাও নেই।

ভিক্ষুক এ-কথার কিছুই বুঝিতে পারিল না; ক্রমাগত কাকুতি মিনতি করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল; আরদালি ধমকাইল; কোচমান চাবুক উঁচাইল; তবু সে নিবৃত্ত হইল না।

মণিমালা উহাকে কিছু দিবে কি না ঠিক করিতে পারিতেছিল না; দিলে যদি তাহার স্বামী নিজেকে অপমানিত মনে করে। কিন্তু ভিক্ষুকটা কিছুতেই যায় না দেখিয়া সে গাড়ীর খড়খড়ির ফাঁক দিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিল। সে কুড়াইয়া লইয়া হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

মণিমালার মন ম্লান হইয়া রহিল। স্বামীকে যে সে কিছুতেই সুখী করিতে পারিতেছে না সেই বেদনা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

বাঁশতলীতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা হইলে রাখাল জিজ্ঞাসা করিল,—পিসেমশায়, আপনি ত বাড়ী গিয়েছিলেন, আমাদের গোসাঁইগঞ্জের খবর জানেন কি?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হ্যাঁ জানি বৈ কি। আমি ত রোজই প্রায় বৃন্দাবন জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তোমার দিদিমা বোধ হয় আর বাঁচেন না। আহা বুড়ি 'হা-রাখাল জো-রাখাল' করে একেবারে শয্যে নিয়েছে; তোমার মাথার বালিশটিকে অষ্টপ্রহর বুকে করে থাকে, বলে এতে আমার রাখালের গায়ের গন্ধ লেগে আছে!

রাখালের চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বলিয়া উঠিল—দিদিমার দুঃখ ঘুচবে বলে রাজার বাড়ীতে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁর সকল দুঃখ ঘুচিয়েছি! মরবার সময় সেবা করা দূরে থাক, একবার দেখতেও পাব না! চিঠি লিখে খবর নেবারও হুকুম নেই!

রাখালের চোখ দিয়া অশ্রুর বন্যা ছুটিল। কিন্তু তখনও সে বর্ষা কালের গিরিশিখরের ন্যায় স্তব্ধ গম্ভীর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মাধী-পিসির সেবা যত্নের ত্রুটি হচ্ছে না, মথুরের স্ত্রী আর মেয়ে প্রসাদী দুজনে খুব সেবা করছে। কিন্তু চিকিৎসা পথ্য ঠিক হচ্ছে না। এ সময় তুমি যদি কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও ত ভালো হয়।

রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—টাকা! টাকা কোথায় পাব পিসেমশায়! আমার নিজের এক পয়সা নেই! দুঃখ ঘুচবে বলে দিদিমা আমার এখানে বিয়ে দিয়েছিলেন। পরের ধনে পোদ্দারী করবার অতিলোভের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের এখন করতে হবেই।

শ্রীকৃষ্ণ রাখালের কথার মানে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মণিমালার মুখের দিকে চাহিলেন। মণিমালা ঘোমটার ভিতর হইতে দুটি অশ্রুপ্লাবিত চোখ তুলিয়া পিসে-মহাশয়ের জিজ্ঞাসার নীরব উত্তর দিল।

রাখাল ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—গাঁয়ের আর-সব খবর কি? প্রসাদীর বিয়ে হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আহা! প্রসাদীর বড় দুর্ভাগ্য! বিয়ের পরই বিধবা হয়েছে। ব্রজটিও মারা গেছে। এইসব শোক পেয়ে মথুর কেমন জবুথবু হয়ে গেছে, সেও আর বেশীদিন বাঁচবে না।

রাখাল জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কথায় জোর দিয়া বলিল—এ সমস্তই আমাকে সুখী করবার ফল!

মণিমালা যেজন্য পিসিমার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল তাহার বিপরীত ফল হইল দেখিয়া সে বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইল। সে রাখালকে লইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া গেল।

বাড়ী আসিয়াই রাখাল তাহার নিজের টিনের তোরঙ্গটি সিন্দুক হইতে বাহির করিল। তাহার মধ্য হইতে দিদিমার পরণের তসর-কাটা জামা দুটি বাহির করিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। তাহার দিদিমা তাহার জন্য মরিতে বসিয়াছেন, সে নিজে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া আছে, আর অর্থাভাবে তাহার দিদিমার ঔষধ পথ্য জুটিতেছে না; তাহার জন্য প্রসাদী বিধবা হইয়াছে; সে বাঁচিয়া থাকিয়াও প্রসাদীর পিতামাতাকে বুঝাইতে পারিতেছে না যে ব্রজ মরিয়াছে তবু তাঁহারা অপুত্রক হন নাই, একবারে এতগুলো দারুণ দুঃখের আঘাত রাখালের চিত্ত বিমথিত করিয়া ফেলিতেছিল।

মণিমালা দেরাজ খুলিয়া পাঁচশত টাকা বাহির করিয়া রাখালের সামনে রাখিয়া তাহার পিঠের উপর স্নেহের ও মমতার স্রোতে বেণুশাখার মতো লতাইয়া পড়িয়া বলিল—এই টাকা দিদিমাকে পাঠিয়ে দাও, লিখে দাও চিকিৎসার কোনো ত্রুটি যেন না হয়।

রাখাল জোর দিয়া বলিল—ও টাকা আমি নিতে পারব না।

মণিমালা দুহাতে স্বামীর পা ধরিয়া বলিল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কথা শোনো। এ টাকা তোমার।…

আমার টাকাও ত তুমি নিতে পার।...টাকা না নাও আমার গহনা নাও, সেই স্বত্ব ত বাবা আমায় তোমাকে দান করেছেন।...

এই বলিয়া মণিমালা উঠিয়া গিয়া গহনার বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া রাখালের পায়ের কাছে গহনাগুলি ঢালিয়া দিয়া দাঁড়াইল। বলিতে লাগিল—আমি মেয়েমানুষ, কেমন করে টাকা পাঠাতে হয় আমি জানিনে; নইলে আমিই পাঠিয়ে দিতাম। তুমি আমার হয়ে পাঠিয়ে দাও!

মণিমালার কাতর সহৃদয়তা দেখিয়া রাখালের জেদ খুব নরম হইয়া আসিয়াছিল; দিদিমার শেষ অবস্থায় তাঁহাকে একটুও সুখী করিতে পারার সুযোগ ফস্কাইতে না দিবারও প্রলোভন খুবই হইতেছিল। কিন্তু রাখাল হতাশ হইয়া বলিল—টাকা নিলেই বা কি হবে মণি; টাকা পাঠাবার উপায় নেই। আমার চিঠিপত্র পাঠানো পোষ্ট-আপিসে বারণ আছে।

মণিমালা একটু ভাবিয়া বলিল—তবে এই টাকা নিয়ে তুমি নিজে গোসাঁইগঞ্জে চলে যাও।

রাখাল বিস্মিত হইয়া মণিমালার মুখের দিকে তাকাইল। মণিমালার মুখ হইতে সে এই কথা শুনিয়াছে তাহা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

রাখালও এতক্ষণ এই কথাই ভাবিতেছিল—সে কি কোনো রকমে এই কারাগার হইতে পলায়ন করিতে পারে না? তাহার বিষম বন্ধন মণিমালা। পলাইয়া যাওয়া মানে এবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক উচ্ছেদ। কিন্তু মণিমালাকে ত্যাগ করিবে সে কি বলিয়া, কেমন করিয়া?

যাহার জন্য রাখালের দ্বিধা সেই মণিমালাই প্রস্তাব করিতেছে তাহার যাইবার কথা! রাখাল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তারপর?

মণিমালা সহজ ভাবেই বলিতে লাগিল—তুমি চলে গেলে বাবা খুব রাগ করবেন। কিন্তু সে রাগ আর ক'দিন থাকবে? যদি শিগ্‌গির রাগ না পড়ে, তিনি আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারবেন না।

রাখাল উৎফুল্ল হইয়াও হতাশভাবে বলিল—এখান থেকে রেল-ষ্টেসন অনেক দূর, আমি এতখানি পথ যাব কেমন করে? রাজার ভয়ে ত কোনো গরুর-গাড়ী আমায় নিয়ে যেতে চাইবে না।

মণিমালা ক্ষণকাল চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিল—আপাতত চুপিচুপি টাকাগুলো নিয়ে গিয়ে পিসে-মশায়কে দিয়ে এসো। তিনি গোসাঁইগঞ্জে পাঠিয়ে দেবেন। এদিকে আমি তোমার যাবার জোগাড় দেখছি।

রাখাল শূন্যদৃষ্টিতে মণিমালার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল চুরি! শেষকালে চুরি করতে হবে মণি! দাও টাকা, দিদিমার জন্যে আমি চুরিও করব!

রাখাল আবার কাঁদিতে লাগিল। তারপর সে টাকার তোড়াটি জামার তলে কোমরে বেশ করিয়া লুকাইয়া বাঁধিয়া লইয়া আবার ঘোড়ায় চড়িয়া বাঁশতলীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

(১৭)

মাধবী রাখালকে বিদায় দিয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্যে রাখাল যে "কুড়ি" টাকা পাঠাইয়াছিল সেই সূত্রে রাখালের সুখ কল্পনা করিয়া ও তাহার নিজের হাতের লেখায় তাহার কুশল-সংবাদ পাইয়া তিনি আবার বুকে বল করিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু যে উত্তেজনা তাহাকে তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার আর পুনরাবৃত্তি না হওয়াতে মাধবী আবার ভাঙিয়া পড়িয়াছেন এবং উত্তেজনার পর অবসাদ দ্বিগুণ হইয়াছে। তাহার এতদিনকার দুঃখ-শোকে-ক্লিষ্ট দেহ অনাহারে চিন্তায় একেবারে জীর্ণ হইয়াই ছিল, এখন রোজ ঘুষঘুষে জ্বর হয়। এক-একদিন জ্বর প্রবল হইয়া উঠে। সেদিন আর জ্ঞান থাকে না। সঙ্গে-সঙ্গে কাসি আছে, তাহাতে বুকে পিঠে বেদনা হইয়াছে। ডাকের সময় হইলে নিত্য তিনি একবার জিজ্ঞাসা করেন, রাখালের চিঠি আসিল কি না। চিঠি আসে নাই শুনিয়া হতাশ হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকেন। ইহার উপর প্রমদা বিধবা হওয়া অবধি তাহার দুঃখ দ্বিগুণ হইয়াছে, তিনি থাকেন থাকেন কাঁদিয়া বলেন—আমার পাপেই এই দুধের বাছাকে দুঃখ সইতে হল; এমন সোনার প্রতিমার এমন দুর্দ্দশা চক্ষে দেখতে হল। কেন বৌমা, তুমি তখন জোর করে জেদ

করে আমার রাখালের সঙ্গে পেসাদীর বিয়ে দিলে না? তা হলে রাখাল আমার কাছেই থাকত, আর পেসাদীরও এমন দশা হত না!

আজ মাধবীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটের হইয়া উঠিয়াছে; এই একটু জ্ঞান হইতেছে, এই আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছেন। হাতপা নাড়িবারও আর শক্তি নাই; কথা জড়াইয়া অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে; ঘন ঘন জোরে জোরে শ্বাস বহিতেছে; মাঝে মাঝে হেঁচকিও উঠিতেছে। সকাল হইতে প্রসাদীরা মায়ে ঝিয়ে আসিয়া সেবা করিতেছে। মাঝে মাঝে নারাণদাসীও আসিয়া ঘরে এক-একবার উঁকি মারিয়া প্রশ্ন করিয়া অবস্থা জানিয়া যাইতেছে। বৃন্দাবন ঘরের দাওয়ায় দুই হাতের মধ্যে মাথা ধরিয়া বসিয়া আছেন আর দুই চোখের জলে তাঁহার মুখ ভাসিয়া যাইতেছে। জন্মিয়া অবধি যে ভগিনী এক-দিনও বাড়ী ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীও যায় নাই, সেই ভগিনী আজ বুঝি একেবারেই যাইতেছে, এই মনে করিয়া ভাইএর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ মাধবী চোখ মেলিয়া শূন্য ঘোলাটে দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। প্রসাদীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন—পিসিমা, কি খুঁজছ?

মাধবী ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—রাখালকে।

প্রসাদী ও তাহার মাতার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাঁহাদের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া মাধবী বলিলেন—ঐ দেখ বৌমা, আমার ভীমরতি ধরেছে; আমি রাখালকে খুঁজছি। দাদাকে ডাক, জিজ্ঞেস করি রাখালের চিঠি এল কি না...

বৃন্দাবন আসিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতেছে ও মুখে কথা নাই দেখিয়া মাধবীর নিশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—পেসাদী, রাখালের মাথার বালিশটা আমার বুকে দে ত ভাই...

প্রসাদী বালিশটি তুলিয়া আস্তে আস্তে বুকের উপর রাখিয়া স্পর্শ মাত্র করাইয়া ধরিয়া রহিল, পাছে বালিশের চাপে স্বল্প-অবশিষ্ট শ্বাসটুকুও রুদ্ধ হইয়া যায়।

বালিশের স্পর্শ বুকে অনুভব করিয়া মাধবী বলিলেন—আঃ! রাখাল আমার সুখে আছে! আমি পোড়াকপালী শুধু-শুধু ভেবে মরি!

মাধবীর চোখ দিয়া দু ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তারপর চোখ বুজিয়া আসিল। খুব ঘন ঘন হেঁচকি উঠিতে-উঠিতে হঠাৎ সকল স্পন্দন থামিয়া গেল।

প্রসাদী ও তাহার মা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃন্দাবন কাঁদিতে কাঁদিতে দাওয়ায় আসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিলেন। নারাণদাসীও একবার চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো ঠাকুরঝি গো, আমাদের ছেড়ে কোথায় গেলে গো! ওরে রাখাল, তুই ত মথুরায় গিয়ে রাজা হয়ে সব ভুলে রয়েছিস, এখানে যে মা-যশোদার মতন কেঁদে-কেঁদে তোর দিদিমার প্রাণ গেল রে, ওরে রাখাল!...

নারাণদাসীর চীৎকার শুনিয়া একে একে পাড়ার বহু পুরুষ ও স্ত্রী আসিয়া জুটিল। অকেজো ছেলের দল কোমরে গামছা বাঁধিয়া বাঁশ কাটিয়া মেচকো বাঁধিতে কাঠ ফাড়িতে লাগিয়া গেল; চার পাঁচ জনে ধরাধরি করিয়া মাধবীর দেহ বাহিরে আনিয়া তুলসী-তলায় শুয়াইয়া দিল; রাখালের বালিশটি তাঁহার বুক হইতে কেহ নামাইল না।

এমন সময় অঘোর পিয়ন পাঁচ শত টাকার একখানি মনি-অর্ডার আনিয়া বৃন্দাবনকে দিল। শ্রীকৃষ্ণ পাঠাইয়াছেন। চিঠিতে লিখিয়াছেন এ টাকা রাখাল তাহার দিদিমার চিকিৎসা পথ্যের জন্য দিয়াছে। বৃন্দাবন চিঠি আর মনি-অর্ডার হাতে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—সেইত চিঠি এল, আর একটু আগে এল না! মাধবী একবার জেনে যেতে পারলে না যে তার রাখাল তার জন্যে কত ব্যস্ত হয়েছে! এ টাকা আমি এখন নিয়ে আর করব কি? অঘোর, এ টাকা তুমি ফিরিয়ে দিয়ো।

নারাণদাসী দোয়াত কলম আনিয়া বৃন্দাবনের পাশে রাখিয়া আধ-ঘোমটার ভিতর হইতে ফিস-ফিস করিয়া বলিল—টাকা নিয়ে রাখ, শ্রাদ্ধে খরচ হবে।

সমবেত লোকেরা সেই কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ শ্রাদ্ধতে খরচ করলেই ত হবে। পরকালের পিণ্ডিটা রাখালের টাকা হতে পেলেও বুড়ীর বড়কটা তৃপ্তি

হবে। ও টাকা সই করে নিয়ে রাখ।···টাকা কি কখনো হস্তছাড়া করে হে...

বৃন্দাবন মনিঅর্ডার সই করিয়া দিয়া কাঁদিতে বসিলেন। নারাণদাসী টাকা গণিয়া লইয়া সিন্দুকে তুলিতে গেল। তখন মাধবীর শব কাঁধে তুলিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—বল হরি হরিবোল!

রাখাল টাকা পাঠাইয়া দিয়া দিদিমার কাছে পলাইয়া

(১৮)

যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছে। যাইবার সুযোগ যতদিন না হইতেছিল ততদিন দিদিমার খবরের জন্য ব্যস্ত হইয়া রোজই সে বাঁশতলীতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যায়।

এতকাল পরে রাখালকে নিত্য পোষাক পরিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইতে দেখিয়া রাজা ধনেশ্বর মনে মনে খুব খুশী হইতেছিলেন—যাক! এতকাল পরে বন্য জামাইটা একটু পোষ মানিয়া সায়েস্তা হইয়া আসিতেছে।

রাখাল প্রত্যহ বেড়াইতে বাহির হয় দেখিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীও খুশী হইয়াছিলেন। যে জামাই পান-তামাক খায় না, একটু নেশা-ভাঙ করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে জানে না, তাহার সামনে পুরুষালি ধরণে তামাক টানিতে রাণী জগদ্ধাত্রীর নিতান্তই লজ্জা বোধ করিত, বাধবাধ ঠেকিত—তাঁহাকে তামাক, দোক্তা, সিদ্ধি প্রভৃতি নেশার দ্রব্য খাইতে দেখিলেই রাখাল যে-রকম নাক সিঁটকাইয়া মুখে অসন্তোষ ফুটাইয়া তুলিত তাহাতে তাহাকে সমীহ না করিয়া রাণী পারিতেন না; তাঁহাকে এখন জামাইএর ভয়ে লুকাইয়া চুরাইয়া নেশা করিতে হইত। এবং সেই জামাই এখন বেশীক্ষণ অন্দরে না থাকাতে রাণী জগদ্ধাত্রী বিশেষ আরাম অনুভব করিতেছিলেন।

চাকরদাসীরা পর্য্যন্ত খুসী হইয়াছিল, কারণ তাহারা পাগলা জামাইবাবুর খেয়াল কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। যেদিন লুচির ব্যবস্থা হইয়াছে সেদিন সে বলিত ভাত খাইব, যেদিন ভাতের ব্যবস্থা হইত সেদিন সে বলিত লুচি খাইব; সে যেন সংসারের বাঁধা ব্যবস্থা উল্টা-পাল্টা করিয়া দিবার জন্যই আছে, তাহার খেয়ালের অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া চাকরদাসীদের পক্ষে ভার হইয়া উঠিয়াছিল। এবং তাহাতে যে রাজা-রাণীর মনও অধিকতর অপ্রসন্ন হইয়া উঠে নাই তাহা নহে।

মণিমালা একদিন রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, তুমি অমন কর কেন?

রাখাল হাসিয়া বলিল—আমি যে নিতান্ত পরাধীন দাস নই, আমারও যে একটু স্বাধীনতা আছে, তাই জানবার জন্যে নিজের চারিদিকে একটু একটু চিমটি কেটে দেখি!

মণিমালা ম্লানমুখে বলিল—আমি তা বুঝেছি; কিন্তু লোকে না বুঝে তোমায় পাগল, গোঁয়ার, কত কি বলে।

রাখাল হাসিয়া বলিল—তা বলুকগে। তুমি আমাকে বুঝতে পারলেই হল।

মণিমালা বলিল—কিন্তু তাতে আমার যে বড় কষ্ট হয়। আমি কাউকে কিছু বলতেও পারি না, সইতেও পারি না।

রাখাল তেমনি হাসিয়া বলিল—আর বেশী দিন সইতে হবে না; তোমার বাবা মা আমাকে শিগগিরই দূর করে দেবেন—তাঁদের কাছে আমি অসহ্য হয়ে উঠেছি। এমনি করলেই আমি এখান থেকে শিগগির যেতে পাব!

মণিমালার চোখ দিয়া মুক্তার মালা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

রাখাল অপ্রস্তুত ও ব্যথিত হইয়া স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—ছি মণি, কাঁদছ? তুমিই ত আমাকে যেতে বলেছ। তুমি কাঁদলে যে আমি দিদিমাকে দেখতে যেতে পারব না।

মণিমালা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিল—না, আমি কাঁদব না। কিন্তু লোকে তোমায় তাড়িয়ে দেবে সে আমি দেখতে পারব না, তার আগে আমিই তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু আমি যে তোমার যাবার কোনো ব্যবস্থাই করে উঠতে পারছিনে।

রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সবই আমার অদৃষ্ট মণি।

মণিমালার অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, কিন্তু সে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল—তুমি পিসে-মশায়কে গিয়ে বল, তিনি যদি কোনো রকমে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

রাখাল বাহিরে-বাহিরে বেড়ায় দেখিয়া বাড়ীর লোকে যে পরিমাণ আরাম বোধ করিতেছিল, মণিমালা ঠিক ততখানি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সকলের অগোচরে পুষ্পপুটে কীটের মতো একটি কঠিন দুঃখ তাহার অন্তর জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু তাহাকে সকলের কাছে সেই বেদনা হাসি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইত এবং ইহাই তাহার আরো অসহ্য। তাহার দুঃখ, যে, তাহার স্বামী সুখী নয়; তাহার দুঃখ, যে, সে স্বামীর দুঃখ দূর করিতে পারিতেছে না! এ তাহার নিজের প্রতি ধিক্কারের দুঃখ, এ তাহার নিজের অক্ষমতার জন্য দুঃখ।

রাখাল যখন দিনের পর দিন দিদিমার সংবাদ বা পলায়নের উপায় না পাইয়া নিরাশ হইয়া শুষ্ক মুখে বাড়ী ফিরিয়া আসে, তখন তাহার প্রাণ যে কি তীব্র বেদনায় পীড়িত হইতেছে, তাহা বাড়ীর কেহ বুঝে না, মণিমালা বুঝে। সে বুঝে বলিয়া তাহার কষ্ট, বাড়ীর আর-কেহ বুঝে না বলিয়া তাহার কষ্ট! সে-ই ত তাহার স্বামীর বন্ধন, সে-ই তাহার স্বামীর বন্দীশালার পায়ের বেড়ি! সে আপনাকে শত টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া স্বামীকে মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু সে যে তাহার স্বামীকে বড় ভালো বাসে! স্বামীও যে শুধু তাহারই মুখ চাহিয়া এই বন্দীদশার দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন—নহিলে তিনি ত বীর, তিনি অনায়াসে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেন।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল যখন হতাশ ভাবে বলে—মণি, আজও কোনো খবর পেলাম না, হয়ত আমার দিদিমা বেঁচে নেই!—তখন মণিমালা সান্ত্বনার কোনো কথা খুঁজিয়া পায় না, ছলছল চোখে সমবেদনা ভরিয়া শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

তারপর রাখাল যখন অতি গোপন লুকানো স্থান হইতে অতি সন্তর্পণে অতি-লজ্জার অতি-আদরের ধন টিনের তোরঙ্গটি বাহির করিয়া তাহার দিদিমার পরণের পুরানো ছেঁড়া তসরের জামা দুটিকে একবার মাথায় রাখে একবার বুকে মুখে চাপিয়া ধরে, তখন মণিমালার বুক ফাটিয়া যাইবার মতন হয়।

(১৯)

একদিন ধনেশ্বর ডাকে-আসা চিঠির মধ্যে রাখালের নামে এক চিঠি দেখিলেন। দ্বিধামাত্র না করিয়া তাহা খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন—বৃন্দাবন গোসাঁই রাখালকে খবর দিয়াছেন, তাহার দিদিমা মারা গিয়াছেন, তাহার প্রেরিত পাঁচ শত টাকায় তাঁহার শ্রাদ্ধ হইবে।

রাখাল যে তাঁহাকে ঠকাইয়া আবার ধূর্ত্তামি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মারফতে তাহার দিদিমাকে টাকা পাঠাইয়াছিল তাহাতে ধনেশ্বরের মন রাখাল ও শ্রীকৃষ্ণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনই তাঁহার সে রাগ পড়িয়া গেল এই ভাবিয়া, যে, গর্ব্বিত রাখালের পরাজয় হইয়াছে—সে তনখার টাকা লইবে না বলিয়াছিল, তাহাকে তাহা লইতে হইয়াছে, এবং তাহার একটা যে পিছটানের কারণ ছিল সেটা একেবারে দূর হইয়াছে—এখন দিদিমার মৃত্যুর পর রাখাল নিশ্চিন্ত ও শান্ত হইয়া থাকিবে।

রাজা ধনেশ্বর খুসী হইয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান ঘিসু খানসামাকে রাখালকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

রাখাল আসিয়া দাঁড়াইল। ধনেশ্বর হাসিতে হাসিতে তাহার হাতে চিঠি দিলেন।

তাহার নামের চিঠি, খোলা; দেখিয়াই রাখালের ত আপাদমস্তক জলিয়া গেল, তাহার উপর শ্বশুরের মুখে একটা ক্রূর নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি! রাখাল চিঠি পড়িয়া খুব জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল—যাক, এতদিনে ভাবনা ঘুচল! দিদিমা রাজার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দুঃখ ঘুচবে বলে; এতদিনে ঘুচল!

রাখাল মাথা ঘুরাইয়া সিংহের কেশরের মতো বড় বড় কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি ফুলাইয়া দুলাইয়া দৃপ্ত ভাবে জোর করিয়া পা ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। ধনেশ্বর অবাক হইয়া তাহার দিকেই চাহিয়া রহিলেন, তিনি তাঁহার জামাইকে বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিতে-ছিলেন না।

রাখাল নিজের ঘরে গিয়া টান মারিয়া জামা জুতো ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—মণি, সব ভাবনা ঘুচে গেল, দিদিমার আমার সকল দুঃখ ঘুচেছে!—

এইবার তাহার রুদ্ধ ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া তাহাকে তোলপাড় করিতে লাগিল। মণিমালা তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসিয়া তাহারই মতন কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু ভয়ে ভয়ে, পাছে তাহার কান্না কেহ দেখিতে পায়—ঘরজামায়ে স্বামীর কোনো আত্মীয়ের জন্য রাজকন্যার যে কাঁদিতে নাই! তাহার কান্না স্বামীর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতেও পারে চাই কি!

রাখাল পড়িয়া-পড়িয়া কাঁদিতেছে, কুকুরা খানসামা আসিয়া ডাকিল—জামাই-বাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে।

রাখাল কোনো উত্তর দিল না। কুকুরা অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আবার বলিল—জামাই-বাবু, মহারাজ আপনার জন্যে বসে আছেন, খেতে চলুন।

রাখালের কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। কুকরা চলিয়া গেল।

ঘিসু খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল মহারাজ ডাকিতেছেন। রাখাল তাহাকেও কোনো জবাব দিল না। মহারাজের ডাক অমান্য হইয়া ফিরিয়া যায় আজ এই নূতন দেখিয়া এবং জামাইবাবুর বুকের পাটা দেখিয়া বাড়ীর চাকরদাসীরা স্তম্ভিত হইয়া সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল—না জানি এই পাগলাটার কপালে কি দুর্গতি আছে।

মণিমালা ভয়ে এতটুকু হইয়া মিনতি করিয়া বলিল—লক্ষ্মীটি ওঠ, খেতে চল; অনেক রাত হল ··

রাখাল রুদ্ধ স্বরে বলিল—আজ আর আমি কিছু খাব না মণি। আমার অশৌচ হয়েছে; কাল স্নান করে হবিষ্যি রেঁধে খাব।

—তবে তাই মাকে বলিগে?—বলিয়া মণিমালা তাড়াতাড়ি রাজরোষ শান্ত করিতে চলিয়া গেল।

রাণী জগদ্ধাত্রী সর্ব্বাঙ্গের গহনায় আর চেলীর কাপড়ে মহা কলরব তুলিয়া হনহন করিয়া রাখালের ঘরে আসিয়া তীব্র কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—রাখাল, তোমার যে দেখছি সব অনাছিষ্টি, সকল বাড়াবাড়ি। দিদিমা মরলে আবার অশুচ হয় নাকি? দিদিমা হলগে ভিন্ন গোত্তর!···ওঠ, খাবে এস। মহারাজ এসে আসনে বসে রয়েছেন।

রাখাল চোখ মুছিয়া বলিল—মা, আমাকে মাপ করুন, আমি আজ আর খেতে পারব না। দিদিমা যে গোত্রেরই হোন, আমি জানি তিনি আমার বড় আপনার, আমার মায়ের মা, তাঁর অশৌচ আমাকে নিতেই হবে।

রাণী জগদ্ধাত্রী হনহন করিয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন—তখনি বলেছিলাম মহারাজকে যে দক্ষিণ-দেশী ছেলের সঙ্গে মণির বিয়ে দিয়ো না, তা ত শুনলেন না, এখন বুঝুন। জানা ছিল' মণির কপালে এত দুঃখও ছিল!

যাহা কখনো কেহ দেখে নাই আজ তাহাও হইল। রাজা ধনেশ্বর স্বয়ং ডাকিতে আসিলেন। রাখাল মিনতি করিয়া তাঁহার আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করিল। রাজরোষ উগ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু হুকুমে লোককে পীড়ন করা চলে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কাজ করানো যায় না। সমস্ত বাড়ীভরা লোকের মাঝে আজ রাজা ধনেশ্বর হুকুম করিয়া বিফল অমান্য হইয়া ফিরিয়া গেলেন! বাড়ীর সকল লোক ভয়ে আকাট, বাড়ীতে টুঁ শব্দটি নাই, আজ না জানি কার কপালে কি আছে, কোথাকার রাগ না জানি কাহার উপর গিয়া পড়িবে এই ভয়ে সকলে ত্রস্ত আড়ষ্ট!

রাখাল সারা রাত মেঝের গালিচার উপরই পড়িয়া রহিল, বিছানায় শুইল না, কাজেকাজেই মণিমালাকেও সেইরূপই করিতে হইল। রাখালের ভাগ্য ভালো যে রাজকন্যাকে কুটকুটে কম্বলের উপর শোয়াইয়া রাখার অপরাধটা তাহাদের স্বামীস্ত্রীর গোপনমন্দিরে আড়ি পাতিয়া দেখিয়া গিয়া কেহ রাজ-দরবারে নালিশ রুজু করে নাই।

প্রভাতে উঠিয়া রাখাল খালি পায়ে, খালি গায়ে একখানা মোটা চাদর জড়াইয়া বাহিরে মুন্সিজীর কাছে পড়িতে চলিল, দেখিয়া ত সকলে অবাক! রাজার জামাইএর এ কী ফকিরী বেশ!

রাণী জগদ্ধাত্রী দেখিয়া রূঢ় স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা রাখাল, তুমি পাগল না কি? এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু অসহ্য বাপু।

রাখাল একবার শুধু তাঁহার দিকে তাকাইল, কিছু বলিল না, যেমন যাইতেছিল তেমনি যাইতে লাগিল।

জগদ্ধাত্রী আবার ডাকিয়া বলিলেন—আজ খাবে দাবে কি না বলে যাও।

রাখাল বলিল—আমি নেয়ে এসে নিজে হবিষ্যি রেঁধে খাব।

জগদ্ধাত্রী তীব্র ঝাঁঝের সহিত বলিয়া উঠিলেন—না না, সেব পাগলামি কোরো না বলছি।...বরজগাটির দিদির ত নিরামিষ রান্না হয়ই, সেই সঙ্গে খেয়ো না হয়।

রাখাল বিনীতভাবে জোর দিয়া বলিল—আমি হবিষ্যিই করব মা।

রাখাল চলিয়া গেল। জগদ্ধাত্রী বকিতে লাগিলেন—ভালো এক জ্বালাতন হয়েছে বাপু! কড়িব বিষ!—ফেলবারও জো নেই, গেলবারও জো নেই!

অমনি বরজগাটির দিদি ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আহা! রাজার মেয়ে মণি! তার কপালে এত দুঃখও ছিল! মোমের পুতুল আগুন-আঁচে পড়েছে! আহা বাছারে!

অমনি সকলের সমবেদনা-ভরা করুণ দৃষ্টি মণিমালার মুখের উপরে পড়িল। চারিদিকের এই 'আহা'র জ্বালায় মণিমালা অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার দুঃখটা যে কি তাহা সে নিজে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

অনেক বেলায় রাখাল একেবারে স্নান সারিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিল। রাজার জামাই স্নান করিয়া আসিল—কিন্তু না গামছা লইয়া গিয়াছিল, আর না তেল মাখিয়াছিল—ইহা দেখিয়া ত সকলের চক্ষু স্থির। কিন্তু কেহ কোনো কথা বলিল না। কেবল ঘরে আসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে মণিমালা বলিল—এত বেলা করে এলে?

রাখাল বিমর্ষমুখে বলিল—এক বেলাই ত খাব, তাই একটু বেলা পড়িয়েই এলাম।

মণিমালা মিনতি করিয়া বলিল—তুমি হুকুম কর আমি হবিষ্যি রেঁধে দি।

রাখাল স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে নিষেধ করিয়া বলিল—না মণি, তোমার কষ্ট হবে। তোমার অভ্যেস নেই, আমার অভ্যেস আছে; সেখানে দিদিমার অসুখ হলে কতদিন আমাকে রাঁধতে হত।

মণিমালা বলিল—না, আমার কিছু কষ্ট হবে না, তুমি বস, আমি চট করে বেঁধে নিয়ে আসছি।

খাওয়ার পর বাঁধিয়া দিলে সে রান্নায় হবিষ্য হয় না, রাখাল ভাবিয়া পাইতেছিল না এই রূঢ় কথাটা মণিমালাকে সে কেমন করিয়া বলিবে যে তুমি খাইয়াছ, তোমার হাতের রান্নায় আমার হবিষ্য হইবে না। সে ইতস্তত করিতেছে। এমন সময় ইচ্ছা ঝি আসিয়া কড়া স্বরে বলিল—নাতিন-জামাই, তোমার কেমন আক্কেল, খেতে দেতে হবে না? বাড়ীর সকলের খাওয়া হয়ে গেল, শুধু তোমার জন্যে এই দুধের ছেলে এতখানি বেলা পর্য্যন্ত ঠায় উপোষ করে রয়েছে!

রাখাল মণিমালার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার সুন্দর টুলটুলে মুখখানি রৌদ্রতাপে ফুলের মতন শুকাইয়া আমলিয়া পড়িয়াছে। দুঃখী ও ব্যথিত হইয়া রাখাল বলিল—তুমি এখনো খাওনি মণি!

মণিমালা ম্লানমুখে হাসিয়া বলিল—তুমি এখনো খাওনি, আর আমি খেয়ে বসে থাকব! তোমার দিদিমা, আমার কি তিনি কেউ নন!

রাখালের মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলিল—তবে চল, আমরা দুজনে রাঁধিগে। স্বর্গ থেকে দেখে দিদিমা আজ সুখী হবেন।

রাখালের বিবাহের গাঁটছড়া ক্রমশই কঠিন করিয়া কসিয়া বাঁধা হইতেছিল, কিন্তু সে বুঝিতে পারিতেছিল না যে তাহার জন্য মণিমালাকে কতখানি বেদনা নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হইতেছে।

আজ মণিমালা খায় নাই বলিয়া মায়ের কাছে তাহাকে কত গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে। রাণী জগদ্ধাত্রী হুকুম করিয়া, ধমকাইয়া, মিনতি করিয়া, আদর করিয়া, কিছুতেই যখন তাহাকে খাওয়াইতে পারিলেন না, তখন তিনি রাজার কাছে নালিশ করিলেন। রাজা গম্ভীর হইয়া মুখ দারুণ অন্ধকার করিলেন, কিন্তু কন্যাকে কিছু বলিলেন না। মণিমালা বুঝিল যে তাহার পিতার দারুণ রাগ হইয়াছে, তাহা প্রকাশেরও অতীত। রাণীও রাগে গনগন করিতেছিলেন। ক্রোধ দুঃখ অভিমান মিশাইয়া তিনি বলিলেন—

ঘি দিয়ে মল
আর তেল দিয়ে ডল
কুকুরের ল্যাজ ব্যাঁকা;
আর মোষের শিং ব্যাঁকা
কিন্তু যুঝবার বেলা একা!

মেয়ে কি কখনো আপন হয়? পেটে যদি একটা ছেলে ধরতাম ত সে কখনো আমার কথা ঠেলতে পারত না। কথায় বলে—বাপ পিতামর নাম গেল, হিদে জোলার নাতি!—মণির হয়েছে তাই।

মণিমালা মা-বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে শুধু চোখের জল ফেলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কঠিন মন ভিজিল না।

মা রাগ করিয়া খাইয়া-দাইয়া ঘরে গিয়া শুইলেন; রাজারাণীর হুকুমে বাড়ীর চাকর দাসী সকলের খাওয়া হইয়া গেল; কেহ আর খোঁজ লইল না রাজকন্যার খাওয়ার কি হইবে বা রাজার জামাই কি খাইবে।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তেলিয়াগড়ি

লুপ লাইনস্থ সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনের ৭ সাত মাইল পশ্চিমে রাজমহলের পর্ব্বতমালার পাদদেশে বিখ্যাত তেলিয়াগড়ি অবস্থিত। ইহার স্থিতিস্থান খুবই উপযুক্ত ও সুন্দর। একদিকে পর্ব্বতমালা তাহাদের বিশাল দেহ লইয়া আকাশ চুম্বন করিতেছে ও অন্যদিকে বীচিবিক্ষুব্ধা বিশালবক্ষা ভাগীরথী কলনাদে ছুটিয়া চলিয়াছে,—মধ্যপথে তেলিয়াগড়ি শত্রুর পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। ইহাই বঙ্গ-প্রবেশের একমাত্র পথ, তাই এখনও ইহাকে "A Key to Bengal" বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে ভাগীরথী ঠিক গড়ের প্রাচীর-গাত্র বাহিয়া প্রবাহিত হইত; এক্ষণে অল্পদূরে সরিয়া গিয়াছে। ইহার ঠিক নিম্ন দিয়া রেলপথ গিয়াছে। গাড়ি হইতে ইহার বহির্দৃশ্য অতীব সুন্দর দেখায়।

এই গড়টি অতি প্রাচীন। সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং যখন (৬৩৫ খ্রীঃ) এদেশে আসেন তখন তিনি প্রাচীন চম্পারাজ্যও পরিদর্শন করেন। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে এই রাজ্যের উত্তর-সীমায় গঙ্গাতীরে ইষ্টক-ও প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড স্তুপ আছে। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহামের মতে তাহাই বর্ত্তমান তেলিয়াগড়ি। ইহার গঠন-প্রকৃতি ও গাত্রখোদিত প্রতিমূর্ত্তি হইতে জানা যায় যে এককালে ইহা একটি বৌদ্ধমঠ ছিল। বঙ্গপ্রবেশের গিরিপথের উপর স্থাপিত এই তেলিয়াগড়ি যে একটি বহু-কালের প্রাচীন দুর্গ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্থানে প্রাপ্ত বুদ্ধ ও অন্যান্য প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যে হয়ত বা এককালে ধর্ম্মজগতেও ইহার স্থান ছিল। এখান হইতে অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি কহলগাঁর জৈন-মন্দিরে নীত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অনেকগুলি আবার অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

এই বৌদ্ধমঠটি কখন এবং কেইবা গড়ে পরিণত করেন তাহা বলা যায় না। তবে মোগল বাদসাহদের সময় হইতে ইহার একটা ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মতে এই দ্বার-পথে অনেক যুদ্ধ হয়। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শূর-বংশীয় সেরসাহ সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এই স্থানেই সৈন্যসমাবেশ করেন।

তারপর ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দায়ুদখাঁ পাঠান সৈন্যের প্রভাবে বাদসাহের অধীনতা তুচ্ছ করিয়া আপনাকে বাংলার স্বাধীন-রাজারূপে প্রচার করেন। বঙ্গবিজয়-মানসে আকবর তাঁহাকে পাটনায় পরাজিত করেন। পাঠানরাজ তখন ভাণ্ডার অভিমুখে ধাবমান হন ও পথে তেলিয়াগড়ির সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু শীঘ্রই মুনায়েম খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলাইতে বাধ্য হন ও উড়িষ্যায় পরাভব স্বীকার করেন।

মুনায়েম খাঁর মৃত্যুর পর দায়ুদ খাঁ আবার বিদ্রোহী হন। আকবর বিদ্রোহ-দমনার্থ হোসেন কুলি খাঁ ও রাজা তোড়লমল্লকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তেলিয়া-গড়ির নিকট তুমুল যুদ্ধ হয় ও দায়ুদখাঁ পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলায় স্বাধীন পাঠান-রাজ্যের অবসান হয়।

সাজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বাংলা আক্রমণ করেন তখন ঢাকা হইতে নূরজাহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ সসৈন্যে অগ্রসর হন ও তেলিয়াগড়িতে সৈন্য-সমাবেশ করেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর সাজাহান প্রাচীরের অংশবিশেষ চূর্ণ করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন ও জয়ী হইয়া অল্প দিনের জন্য বাংলার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

তেলিয়াগড়ি।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিবাদ উপস্থিত হইলে সাহসুজা ঔরংজেবের পুত্র মহম্মদ ও সেনাপতি মিরজুমলা কর্ত্তৃক মুঙ্গেরে পরাজিত হইয়া রাজমহলের পথে তেলিয়াগড়িতে আশ্রয় লয়েন কিন্তু দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করেন।

ইহার পর এইস্থানে আর কোন যুদ্ধাদি হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় না। পরে এই দুর্গ মালদস্যুদের গুপ্ত 'আড্ডা'য় পরিণত হয়। তাহারা এই স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া আপনাদের দস্যুবৃত্তি চরিতার্থ করিত। যে কোন নৌকা ইহার পার্শ্ব দিয়া যাইত এই দস্যুরা তাহা আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত। এমনকি মধ্যে মধ্যে গভর্মেণ্টের ডাকও মারা যাইত।

শ্রীসুধাংশুশেখর মজুমদার।

মনের বিষ

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহে ফিরিবার আমার ইচ্ছা ছিল না; অদ্যই তাম্রলিপ্তি পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমার পূর্ব্বতন পুরাতন ভৃত্য জিতকামের কি দশা হইল, একবার দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। ভিচুর আমার দ্বার-সন্নিধানে উপস্থিত ছিল। আমাকে দেখিয়া বিশ্বস্ত ভৃত্য মস্তক নত করিয়া বলিল "হুজুরের আদেশ।"

আমি বলিলাম অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি তাম্রলিপ্তি ছাড়িয়া দণ্ডভুক্তি যাত্রা করিব, নিরিবিলি পল্লীর মাঝে কিছু দিন কাটাইবার ইচ্ছা;—এখন আমি শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদে চলিলাম।

ভিচুর বিনীত ভাবে বলিল "আমাকেও কি দণ্ডভুক্তিতে যাইতে হইবে?"

উত্তর করিলাম, "তুমি বা নাই গেলে—নগরে বসন্তোৎসবের আমোদ, কিছুদিন তুমি স্বাধীনভাবে উপভোগ কর।"

সে বলিল "হুজুর ক্ষমা করিবেন; আমোদে আমার প্রবৃত্তি নাই। আপনার মনের অবস্থা এখন ভাল নাই, এসময় আমি আপনাকে ছাড়িয়া আমোদ করিবার জন্য নগরে থাকিতে পারিব না। বিশেষ আপত্তির কারণ না থাকিলে প্রভু দয়া করিয়া ভৃত্যকে সঙ্গে লইবেন।"

বলিলাম "তোমার ইচ্ছা। যাহাতে তোমার আনন্দ তাহাই কর; আমি তোমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতেছি। কোথায় যাইতেছি কাহাকেও জানাইয়া দরকার নাই। যে যে ব্যবস্থা করা দরকার তুমিই করিও। দেখিও আজ রাত্রে যেন আমাকে তাম্রলিপ্তিতে থাকিতে না হয়। দণ্ডভুক্তির পথে আমার আরও অন্য কাজ আছে, কাল তুমি সেখানে যাইও। আমার সময় অতি অল্প।"

ভিদুর "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। আমি আমার অভিশপ্ত প্রাসাদ অভিমুখে চলিলাম। প্রাসাদে পৌছিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কি স্থান কি হইয়া গিয়াছে! সে গৃহের আর সে শ্রী, সে সৌন্দর্য্য নাই,—অত বড় বাড়ীখানি নিৰ্জ্জন, নিরালা। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম, জনমানব নাই; রেশমী পরদাগুলি ঝুলান রহিয়াছে, আসবাবপত্রও অনেকটা বিশৃঙ্খল। দাসদাসী অবসর বুঝিয়া আমোদ করিতে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। আমার নিত্যব্যবহার্য্য গৃহখানির সে দশা দেখিয়া মন কেমন হইয়া গেল। নিজে-নিজেই বলিলাম, কেন এ গৃহের এ দশা,—কিসের অভাব ঘটিয়াছে? গৃহস্বামী কি বৰ্ত্তমান নাই?—নাই,—নাই—সে মরিয়াছে,—আমি মরিয়াছি;—যে ইহার লোভে আমাকে হত্যা করিয়াছিল সেও মরিয়াছে,—যাহার জন্য এ রক্তগঙ্গা সেও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী-মঠে গিয়াছে; শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদ এখন সত্যই জনমানব-পরিত্যক্ত শ্মশান,—মৃতের বিচরণ-ক্ষেত্র।

সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। দ্বারদেশে ফিরিয়া আসিলাম; কাহারও সাক্ষাৎ পাইলাম না। চাকরদের ডাকিবার ঘণ্টায় বার বার শব্দ করিতে লাগিলাম। অবশেষে অশান্তা আসিয়া দেখা দিল। আমাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—"মহাশ্রেষ্ঠী, আপনি?—আপনি কি জানেন না—কর্ত্রী বাড়ীতে নাই!"

বলিলাম "তোমাদের কর্ত্রীকে আমার আবশ্যক নাই—জিতকাম কোথায়?"

অশান্তা আৰ্ত্তস্বরে উত্তর করিল "প্রভুকে আর কি বলিব—আপনি এ পরিবারের বন্ধু,—গেল রাত্রে মহাশয় গোবি—ন্দ—কে একজন তাহাকে গুরুতররূপে আঘাত করিয়াছে—বেচারী আতুরাশ্রমে।"

শুনিয়া বড় দুঃখ হইল, ক্রোধ হইল কিন্তু ক্রোধের কারণ ত শেষ হইয়াছে। আতুরাশ্রমের ঠিকানা জানিয়া লইয়া জিতকামকে দেখিবার উদ্দেশ্যে চলিলাম। মহাশ্রেষ্ঠী শেষাদ্রি ওড়কে রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত হইতে বেগ পাইতে হইল না। বৈদ্যকে রোগীর অবস্থা চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আঘাত গুরুতর,—বৃদ্ধ ইহা সহ্য করিতে পারিবেনা,—প্রায় হইয়া আসিয়াছে—বাকী মাত্র কয়েক ঘণ্টা।"

বৈদ্য কার্য্যান্তরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

জিতকাম আমাকে দেখিয়া বলিল "আপনি আসিয়াছেন, আপনি আমার প্রভুর মত,—তিনিও যেমন গরীব বলিয়া ভৃত্যকেও ঘৃণা করিতে জানিতেন না, আপনিও তাহাই! প্রভু আমার ফিরিয়া আসিবেন, কেবল আমারই আর তাঁহাকে দেখিবার ভাগ্য হইল না!"

আর্দ্র কণ্ঠে উত্তর করিলাম "যদি তা' ভাগ্যই মনে কর তাহা হইলে সে সময় তোমার উপস্থিত—আমিই তোমার সেই হেমরাজ।"

চক্ষের আবরণ খুলিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ আনন্দে রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া বলিল, "কি বলিব,—ও চোখ কি ভুলিবার,—সকল কথা বলিবার শক্তি নাই। প্রভু, এতদিনে পরিচয় কেন দিলেন! এতদিন কেন আপনাকে চিনিয়াও চিনি নাই!"

অতিশয় উত্তেজনায় তাহার পর বৃদ্ধ ভুল বকিতে লাগিল, "হইয়াছে—মরিয়াছে—না আমারি প্রাণের কথা কি মিথ্যা হয়,—চম্পা কোথায় তুমি,—আসিয়াছে হেমরাজ—আর আমি যাইতেছি!"

বৈদ্যকে ডাকাইলাম। মনোযোগ সহকারে রোগীকে

পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "প্রায় শেষ—আর দেরী নাই।"

কিছুকাল পরে, জানিনা ঔষধের গুণে না আপনা হইতে, বৃদ্ধের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। আমাকে শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিল, "প্রভু, এখনও আমার জন্য বসিয়া আছেন? অনেক দুঃখে, আপনাকে মাতৃহীন অবস্থায় মানুষ করিয়াছিলাম।"

বৃদ্ধ থামিল।

আমি বৈদ্যকে বলিলাম "আমার উপস্থিতিতে রোগীর অপকার হইতেছে কি? আমি তাহা হইলে সরিয়া যাই।"

বৈদ্য বলিলেন, "কিছু না—ডুবা নৌকা,—দেখিতেছেন না ঊর্দ্ধশ্বাস উঠিয়াছে—আশা থাকিলে মহাশয়কে আমি তাহা পূর্ব্বেই বলিতে ভুলিতাম না।"

জিতকাম বলিতে লাগিল, "গোবিন্দ—রাক্ষস,—আমি তার কি করিয়াছিলাম,—সে আমাকে—"

বৈদ্য বলিলেন, "ঘোর বিকার।" একটা ঔষধ আনিতে তিনি কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম, "গোবিন্দ মরিয়াছে,—তোমার অপমানের প্রতিশোধ হইয়াছে।"

বৃদ্ধ অত যন্ত্রণার মধ্যেও হাস্য করিল, বলিল "তবে আমি সুখে মরিতে পারিব। বিশ্বাসঘাতক, নারকী—শুধু আমাকে নহে, প্রভুর আমার প্রত্যেক চিহ্ন বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে—বাঘা, পশু—তাহাকেও সে ছাড়ে নাই—সে যে আমার প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিল—তাই বুঝি তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিল।"

হায়! প্রিয় প্রভুভক্ত কুকুর তবে ইহজগতে নাই।

বৈদ্য ফিরিয়া আসিলেন। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; বলিলেন "আর ঔষধপ্রয়োগ বৃথা—রোগী চিকিৎসার বাহিরে।"

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে বৃদ্ধ সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া চিরশান্তিধামে চলিয়া গেল। আমি তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া আতুরাশ্রম পরিত্যাগ করিলাম। আমার মনে আর দুঃখ নাই। বাল্যবন্ধুর অসহ্য মৃত্যু-যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিয়া,—আমার হস্তে তাহার সে দশা ভাবিয়া—মনটা কেমন দমিয়া গিয়াছিল—সে ভাব এখন অন্তর্হিত হইল। গোবিন্দ আমার হৃদয়ে একটুও দয়ার স্থান রাখে নাই। আমার সুখ, শান্তি, অর্থ, ঐশ্বর্য্য, সম্মান সকলই সে হরণ করিয়াছে—অবশেষে আমার একটা বিশ্বস্ত ভৃত্য, কুকুরটা পর্য্যন্ত জগৎ হইতে অপসারিত করিল। এমন শত্রুর জন্যও আবার দুঃখ? গোবিন্দ বন্ধুরূপে শয়তান;—শয়তানের শাস্তিবিধান না করিলেই পতিত হইতে হইত। এখনও আর একটি বিদ্যমান,—নীলা, সর্ব্বনাশী, তোর শেষ কবে হইবে!"

নীলার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ ভিক্ষুণী-মঠে যাত্রা করিলাম। তথায় পৌঁছিতে দুইদণ্ডের বেশী লাগিল না। ধীরে ধীরে মঠের সদর ফটকে উপস্থিত হইলাম। স্থানটি নির্জ্জন, মনোরম। একখণ্ড সুবিস্তৃত উন্মুক্ত জমীর উপর মঠ-সৌধাবলী নির্ম্মিত; চতুর্দ্দিকে তাহার উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর, প্রাচীরগাত্রে পুষ্পিত লতা,—স্তবকে স্তবকে নানাবর্ণের পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত থাকিয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। বৃহৎ দ্বারের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র অন্তর্দ্বার উন্মুক্ত হইল; জনৈক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী মস্তক বহির্গত করিয়া আমার আবশ্যক বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। আমি অভিবাদন অন্তে আমার নাম জানাইয়া বলিলাম, "আমি মঠের কর্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থী।" তিনি আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মঠে প্রবেশ করিলাম। নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ হইল। তিনি আমার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। একটি সুসজ্জিত কক্ষে উপনীত হইয়া বৃদ্ধা আমাকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন; জানাইলেন, মাতা সঙ্ঘমিত্রার সহিত অচিরে সাক্ষাৎ ঘটিবে।"

এইরূপ মঠে আমার সেই প্রথম প্রবেশ। ঔৎসুক্যের সহিত বসিবার কক্ষটি দেখিতে লাগিলাম। দেওয়ালে, মহাত্মা বুদ্ধদেবের নানা অবস্থার সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ও চিত্র; ধর্ম্মপুস্তক হইতে উদ্ধৃত নীতিবাক্য-সকল; সেগুলি পাঠ করিয়া হৃদয় শান্ত হইল; মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহারা হইলাম; মনে হইল, কাহার উদ্দেশ্যে বৃথা ছুটিয়া চলিয়াছি! সে জীবন ত খুঁজিয়া পাইলাম না! পদশব্দ হইল; একটি দীর্ঘকায় প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসিনী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমি ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি মস্তক ঈষৎ নত করিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন।

স্মিতমুখে, ধীর গম্ভীর অথচ স্পষ্টস্বরে বলিলেন, "আমি বোধ হয়, মহাশ্রেষ্ঠী ওড্রকে সম্ভাষণ করিতেছি।"

আমি মস্তক নত করিয়া তাঁহার অনুমানের সার্থকতা জ্ঞাপন করিলাম। মাতা, আমার আপাদমস্তক অচঞ্চল ভাবে নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহার নয়নে সৌম্যদৃষ্টি প্রদীপ্ত। বলিলেন, "আপনি বোধ হয় শ্রেষ্ঠিনী নীলার সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

বলিলাম "হাঁ,—যদি আপনার আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া হয়—।"

সন্ন্যাসিনীর ওষ্ঠে হাস্য রেখা দেখা দিল; সৌদামিনীর ন্যায় তখনি আবার মিশিয়া গেল। তিনি বলিলেন "আপত্তি নাই; আজ উৎসবের দিন, বন্ধু সম্মিলনে বাধা নাই, কিন্তু এ তাহার সময় নয়; উপাসনার কাল উপস্থিত, সকলেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি, আপনি তাহার ভাবী স্বামী, আপনার সহিত তাহার সাক্ষাতে আপত্তি হইতে পারে না। উপাসনান্তে সাক্ষাৎ হইবে। আপনি ইচ্ছা করিলে, উপাসনায় যোগদান করিতে পারেন।"

আমি বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। আমরা মন্দির অভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে তাঁহাকে বলিলাম, "আমার অন্যায় ঔৎসুক্যের জন্য ক্ষমা করিবেন। আপনার পুরাতন ছাত্রী কি রীতিমত ব্রত নিয়ম করিতেছেন? তাঁহার ধর্ম্মভাব কিরূপ?"

আবার সেই সৌম্যদৃষ্টি আমার বদনে স্থাপন করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল আরও গম্ভীর হইল। তিনি উত্তর করিলেন "বাছা, ধর্ম্ম প্রাণের বস্তু, তাহার গভীরতা প্রাণে; কেবল ব্রত নিয়মে তাহার পরিচয় হয় না। নীলা সংসারের জীব; সংসারকে অনুকরণ করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। প্রথমে সে যখন শ্রেষ্ঠী হেমরাজের সহিত পরিণীতা হইয়াছিল, আমরা প্রীত হইয়াছিলাম,—আশা করিয়াছিলাম, হেমরাজের ন্যায় বিশুদ্ধচরিত্র ব্যক্তি তাহাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিতে পারিবে। সেই পবিত্র মুক্ত আত্মার মঙ্গল হউক। কিন্তু বলিতে কি নীলা আবার এত সত্বর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবে, আমি ভাবিতেও পারি নাই। এরূপ ব্যাপারে বিবেকের প্রতি অবিচার করা হয়; আত্মসুখ ব্যতীত জগতে আরও এমন বস্তু আছে, যাহাকে মনুষ্য-নামধারী প্রত্যেকেরই মান্য করিয়া চলা উচিত। মহাশ্রেষ্ঠী কিছু মনে করিবেন না, আপনি আমার মত প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি মনোভাব ঢাকিতে জানি না।"

তাহার বাক্যে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল; তাঁহার উক্তি আমার অন্তরের বাক্যের প্রতিধ্বনি। আমি বিনীত ভাবে বলিলাম, "মাননীয়া মাতা যাহা বলিলেন যথার্থ। কিন্তু সংসারী যে, তাহার সংসারের হিসাবে একজন রক্ষকের প্রয়োজন আছে।"

সন্ন্যাসিনী আমার বক্তব্য ইঙ্গিতেই বুঝিয়া বলিলেন, "বয়স ও সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছেন? জগতে সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোগ্য ব্যাধিই ঐ দুইটি; যেখানে আত্মা বিকশিত হয় নাই, সেখানেই ঐ দুইটি ব্যাধি—যত অনর্থের মূল,—শত রক্ষকেও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। আর যে ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছে; আত্মা যাহার তাঁহার জন্য পিপাসিত,—সুরূপা বা কুরূপাই হৌক, বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধাই হৌক, তাহার রক্ষক তাহার ধর্ম্ম—ভগবান —সে আপনার শক্তিতে বলীয়ান।"

মাতা নীরব হইলেন। তিনি ভক্তিভরে মস্তক নত করিয়া, বোধ হয় মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে আমাকে বলিলেন "আমার মন্তব্যের জন্য দুঃখিত হইবেন না; ভগবান আপনাদের ধর্ম্ম-বন্ধনে সুখী করুন।"

অতি কষ্টে একটি দীর্ঘশ্বাস গোপন করিয়া তাঁহার শুভ ইচ্ছার জন্য বিনয় প্রকাশ করিলাম। মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইলাম। উপাসনার দেরী নাই। মন্দির-অভ্যন্তর হইতে বাদ্যযন্ত্রের গম্ভীর মধুর নিনাদ হইতেছে। মাননীয় মাতা ভক্তিভরে সুমধুর কণ্ঠে স্তোত্রগীতি গাহিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার নির্দ্দেশমত মন্দিরের একপার্শ্বে আগন্তুকদিগের বিশিষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। সম্মুখে সুন্দর দৃশ্য। সুসজ্জিত বেদীপার্শ্ব হইতে সুগন্ধি ধূম নির্গত হইতেছে; পুষ্পের সুবাস ভাসিয়া আসিতেছে। প্রথম পংক্তিতে পীতবসনপরিহিতা, অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিতা সন্ন্যাসিনীগণ যুক্ত করে নতজানু হইয়া উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় পংক্তিতে যুবতী ছাত্রীগণ শুভ্র পরিচ্ছদে শোভিতা,

মস্তক নত করিয়া প্রার্থনায় রত। সর্ব্বশেষে একটি রমণী,—একান্তে—তাহার পরিধানে শোকের পরিচ্ছদ—সঙ্গিনীগণের অনুকরণে সেও যুক্তকর, নতজানু। আমার চিনিতে দেরী হইল না সে কে! নীলা। কীটদষ্ট, বৃন্তচ্যুত স্বর্গীয় কুসুম, আবার কোন্ পুণ্যবলে পবিত্র কুসুমের সহিত দেবচরণপ্রান্তে নীত হইয়াছে! অনুতাপের পূতসলিলে সর্ব্বকলঙ্ক ধৌত না হইলে দেবতা তাহাকে গ্রহণ করিবেন কি? সর্ব্বদর্শীর তীক্ষ্ণচক্ষে কিছুই লুক্কায়িত থাকিবে না! নীলা, তাহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে তাঁহার উপযুক্ত করুন। মাননীয়া মাতা উপাসনা-ব্যপদেশে বলিলেন, "সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই স্মরণ লও যিনি জগতের সমস্ত পাপ হরণ করেন।" তাঁহার বাক্য কি নীলার কর্ণে প্রবেশ করিবে! না-না, সাক্ষাৎ মনুষ্যের উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, সে কি করিয়া অশরীরী দেবতার শক্তিতে আস্থা স্থাপন করিবে? ভণ্ড যে, প্রতারণা তাহার মজ্জাগত স্বভাব—সে তাহা কি করিয়া পরিত্যাগ করিবে? নীলা, মূর্ত্তিমতী কপটতা, তাহার এ সকল ধর্ম্মের ভান, মন্দির তাহার স্থান নহে; পবিত্র মন্দির সে কলঙ্কিত করিতে আসিয়াছে—ভগবান কবে তাহাকে তাহার উপযুক্ত স্থানে প্রেরণ করিবেন।

চিন্তাস্রোতে নিমজ্জিত হইয়া বুঝিতে পারি নাই, উপাসনা কখন শেষ হইয়াছে। কোমল করস্পর্শে জাগ্রত হইলাম। মাতা সঙ্ঘমিত্রা চুপে চুপে বলিলেন "আসুন, তাড়াতাড়ি করিতেছি, দোষ লইবেন না—মঠবাসিনী ছাত্রীদের অপরিচিত আগন্তুকের সাক্ষাতে বাহির হইবার নিয়ম নাই।"

যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ তাঁহার অনুগমন করিলাম। তাহার বাক্যে একটা কিছু বলা উচিত মনে করিয়া বলিলাম, "এ ত ছুটির সময়—এখন আপনাদের এখানে কয়টি ছাত্রী আছে?"

"মাত্র চৌদ্দজন। যাহাদের পিতা মাতা আত্মীয়েরা দূরদেশে তাহারাই আছে। না থাকিয়া তাহাদের গত্যন্তর নাই। তাহাদের স্ফূর্ত্তির জন্য ব্যবস্থার ত্রুটী নাই। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আত্মীয় স্বজনের নিকট যাইতে না পারিয়া তাহারা বড় নিরাশা মনে করে। অন্য সময়ে ৫০।৬০ জন ছাত্রী সাধারণতঃ মঠে থাকে, তাহার উপর স্থানীয় ছাত্রী আছে।"

বলিলাম "এতগুলি ছাত্রী, দায়িত্ব ত কম নয়!"

"দায়িত্ব সে আর বলিবার নয়—অত্যন্ত, ভয়ানক বলিলে হয়। বালিকাদের ভবিষ্যৎ-জীবন বাল্যশিক্ষার উপর নির্ভর করে, তাহাদিগকে সুশিক্ষিতা, সুশীলা করিবার জন্য চেষ্টা কম হয় না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। নীচতা তাহাদের মধ্যে কি করিয়া প্রবেশ করে, বুঝা যায় না। অনেক আশাপ্রদ বালিকাই আমাদিগকে হতাশ করে; যেটি তাহাদের গুণ বলিয়া ভাবা গিয়াছিল, অবশেষে সেইটিই তাহাদের দোষের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের শিক্ষা বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে, অন্যদত্ত উপদেশই চরিত্র গঠনের চরম সহায় নহে, প্রত্যেকেরই নিজের মধ্যে ভাল হইবার জন্য পিপাসা থাকা চাই, সে চেষ্টা না থাকিলে স্বয়ং ভগবানও তাহাকে হাতে ধরিয়া সুপথে লইয়া যাইতে পারেন না। তাহা না হইলে ছাত্রীদের জন্য মঠবাসিনীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আন্তরিক চেষ্টা নিষ্ফল হইত না।"

"তবে বলুন—শিক্ষার ফল আশানুযায়ী আপনারা প্রাপ্ত হইতেছেন না!"

"অনেকটা! উপরে উঠিতে হইলে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিন্তু আত্মশক্তিই প্রধান সহায়,—যে দুর্ব্বল তাহাকে কতক্ষণ টানিয়া উঠান যায়; তবে দশজনের দেখিয়াও ত ভাল হইবার একটা ইচ্ছা হওয়া অনেকটা স্বাভাবিক, সেই এক ভরসা।"

বলিলাম "ঠিকই ত। তবে যাহা বলিলেন, মূল সংশোধিত না হইলে ফল ফুলও তেমনি হইবেই ত—সময়-সময় পাণ্ডিত্য ও চরিত্রবলের এই জন্যই বোধ হয় বিরোধ দেখা যায়।"

মাতা উত্তর করিলেন "মিথ্যা নয়! বিপদে পড়িলে আমরা ভগবানকে দোষ দেই কিন্তু সে বিপদের কারণ যে আমরা নিজে—আমরা নিজেই চেষ্টা করিয়া তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছি তাহা ত' সহজে বুঝি না। কার্য্য করি এক-রকম, তাহার ফল আশা করি অন্য প্রকারের।—সুখ দুঃখের সমস্যাই ত ঐটা!"

কথাবার্ত্তায় আমরা একটি ক্ষুদ্র সুসজ্জিত কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মাননীয়া মাতা বলিলেন, "এটি আমাদের পুস্তকাগারের মধ্যে একটি। নীলার সহিত এখানে আপনার সাক্ষাৎ হইবে। আপনাকে শ্রান্ত বোধ হইতেছে—একটু প্রসাদ পাইবেন কি ?"

আমি ধন্যবাদের সহিত আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি অবশেষে বলিলেন "আশা করি, আপনাদের বিবাহ সম্বন্ধে আমার মন্তব্যের জন্য দোষ লন নাই।"

আমি বলিলাম "না—না, আপনি ও-কথা বলিবেন না। সরলতার ন্যায় গুণ নাই; আমি আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি আপনাকে অন্য ভাবে ভাবিতে পারি, সে চিন্তা যে আপনার মনে হইয়াছে, ইহাতেই আমি দুঃখিত।"

মাতা প্রফুল্ল হইলেন; বলিলেন, "সুখী হইলাম, সংসারে সকলে একপ্রকার নয়, কাজেই ও-কথা বলিতেছিলাম; আপনি আমাদের অতিথি, আপনার সন্তুষ্টি বিধান আমাদের কর্ত্তব্য। আমি তবে আসি; নীলাকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

তিনি মস্তক সঞ্চালনে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া চলিয়া গেলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করিলাম। ভাবিলাম, "কি সুন্দর ব্যবহার! নিশ্চয়ই ইনি পুণ্যশীলা।" পরক্ষণেই আমার সন্দেহাকুল আস্থাহীন হৃদয়ে সন্দেহ হইল, ইঁহার বিগত জীবনের ইতিহাস কি—কে জানে? চিরকালই কি ইনি এরূপ ধর্ম্মপ্রাণ? না যৌবনের ইতিহাস অন্য? না—তাহা নহে। নয়নের এমন প্রশান্ত ভাব, বিমল হাস্য, সৌম্য মূর্ত্তি, ধর্ম্মের জন্য আন্তরিক উচ্ছ্বাস, স্বভাবগত না হইলে, অনুতপ্ত হৃদয়ে কখনও প্রকাশ পাইতে পারে না। জীবনে যদি তাঁহার অন্য ইতিহাস থাকেও, তাহা হইতে এতদূর উন্নত হইতে পারিয়াছেন, সেজন্য আরও ধন্য। মহিমাময়ী মাতা রমণীরত্ন; বিধাতা রমণীকে যে উচ্চ স্থান দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সঙ্ঘমিত্রা তাহার অধিকারিণী। তাঁহার ন্যায় রমণী জগতের শান্তি, পুণ্য। তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নীলা দেখা দিল, নয়নে তাহার সেই লাস্য; অধর ওষ্ঠে তাহার সেই হাসি; মঠবাসিনীর পবিত্র সঙ্গ তাহার উপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আলিঙ্গন-প্রয়াসে বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া সে বলিল "তাহা হইলে তুমি আমাকে ভুল নাই, দয়া করিয়া দেখা দিয়াছ—বসন্তোৎসবের আনন্দ-দিনে।"

আমি তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলাম না, আবেগহীন গম্ভীর মূর্ত্তিতে নিশ্চল রহিলাম। নীলা আমার ভাব লক্ষ্য করিয়া আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি—কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে কি ?"

আমি তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলাম মাত্র; দেখিলাম সে ভীত হইয়াছে। আমি তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম না, পার্শ্বস্থ আসনের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলাম "বসো, আমি একটা দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছি।"

সে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া পড়িল। আশঙ্কায় তাহার বদন বিবর্ণ, শরীর কম্পিত, বেশ বুঝিতে পারিলাম, আতঙ্ক আশঙ্কায় তাহার অন্তর আন্দোলিত হইতেছে। কিছু বলিলাম না। তাহার যন্ত্রণা, আমার আনন্দ!

অবশেষে অতি কষ্টে ওষ্ঠে হাসি ফলাইয়া সে বলিল "দুঃসংবাদ! তুমি আমাকে অবাক করিলে,—দুঃসংবাদ কি হইতে পারে? গোবিন্দর সঙ্গে কথান্তর হইয়াছে কি? তাহার সঙ্গে তবে দেখা হইয়াছে।"

"হাঁ, এইমাত্র আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি! সে তোমাকে এইটা দিয়াছে।"

আমি আমার পূর্ব্বের সেই হীরক অঙ্গুরীটি মৃতের অঙ্গুলী হইতে খুলিয়া লইয়াছিলাম; নীলাকে তাহা প্রদান করিলাম। সে যদি ইহার পূর্ব্বে বিবর্ণ হইয়া থাকে অঙ্গুরীটি দেখিয়া বিবর্ণতর হইল। এতক্ষণ বাহ্যিক প্রফুল্লতা প্রকাশ করিবার প্রয়াস ছিল; এখন সে নিশ্চেষ্ট, ভীত, বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে; তাহার সন্দেহ, গোবিন্দ সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছে! আমি তেমনি নীরব রহিলাম। সে উদাস ভয়বিহ্বল দৃষ্টি অন্য দিকে

নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে বলিল "কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি গোবিন্দকে অঙ্গুরিটি তাহার পরলোকগত বন্ধুর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দান করিয়াছিলাম, সে কেন ফিরাইয়া দিল ?"

আমি উত্তর দিলাম না; সহসা সে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল, "শেবাদি, কিসে তোমাকে এত নিষ্মম করিল ? মুখ এমন অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিও না; তোমার ভাবীপত্নীকে নিশ্চিন্ত কর,—বল কি হইয়াছে।"

আমি নড়িলাম না—যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেখানেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

নীলা বাধ-বাধ স্বরে বলিল "হায়, তুমি আমাকে ভালবাস না—বাসিতে যদি তাহা হইলে কি এরূপভাবে নীরব থাকিতে পারিতে? কোন দুঃসংবাদ থাকিলে তোমার কি তাহা সহানুভূতির সহিত বলা উচিত নহে? আমার বিশ্বাস ছিল,—আমার দুঃখ তোমারও, তুমি আমাকে সকল সময় সকল বিপদ, সকল দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে।"

বলিলাম "করিয়াছিও তাহাই! তোমার কথাবার্ত্তা হইতেই বুঝিয়াছিলাম, তোমার ভ্রাতৃস্থানীয় গোবিন্দ তোমর সুখশান্তির কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে, আমি তাহার কণ্ঠ রোধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছি—সে নীরব,—চিরতরে।"

নীলা চমকিয়া উঠিল; বলিল "নীরব? কেমন করিয়া? কি বলিতেছ?"

আমি তাহার ঠিক সম্মুখে যাইয়া বসিলাম, নয়নে নয়নে চাহিয়া বলিলাম, "আমি বলিতে চাহিতেছি—সে মরিয়াছে।"

নীলা উদ্বেগে আসন হইতে উচ্চ হইয়া বলিল "মরিয়াছে? অকস্মাৎ মৃত্যু—না, তুমি তাহাকে খুন করিয়াছ?"

আমি দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলাম "হাঁ, আমার হস্তেই তাহার জীবনলীলা শেষ হইয়াছে; হত্যাকারীর ন্যায় তাহাকে খুন করি নাই,—যথারীতি দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী তাহাকে বধ করিয়াছি। গত রাত্রে সে আমাকে মর্ম্মান্তিক অপমান করে, আজ প্রাতে আমাদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদের মনোমালিন্য দূর হইয়াছিল, একে অন্যকে ক্ষমা করিয়াছি।"

অতি মৃদুস্বরে নীলা বলিল "সে কিজন্য তোমাকে অপমান করিল?"

আমি সংক্ষেপে তাহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তথাপি তাহার উৎকণ্ঠার হ্রাস হইল না। সে সন্দেহাকুল নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "সে কি আমার নাম করিয়াছিল?"

আমি আন্তরিক অবজ্ঞার সহিত তাহার বদনে দৃষ্টিপাত করিলাম। পাপীয়সীর ভয়—হয়ত গোবিন্দ মৃত্যুকালে আত্মকৃত অপরাধ অকপটে আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছে; তাহা হইলে তাহার চরিত্র-কথাও লুক্কায়িত নাই। আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি—এই চিন্তায় তখন সে অস্থির! পাপ গোপন কর—জ্বালা গোপন থাকিবে না; তাহার তৎকালের চেহারা তাহার কি অসীম নরক যন্ত্রণা জ্ঞাপন করিতেছিল।

উত্তর করিলাম "না, আমাদের বিবাদের পরে সে তোমার নাম করে নাই। শুনিয়াছি, তোমার হতাশ প্রেমিক উন্মত্ত হইয়া, তোমাকে খুন করিতে তোমার গৃহে গিয়াছিল; সাক্ষাৎ না পাইয়া গালাগালি, অভিসম্পাত দিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।"

সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার রক্তিম ওষ্ঠে আবার হাস্যরেখা দেখা দিল। বলিল "ইতরামি! কেন সে আমাকে অভিসম্পাত দিল বুঝিতে পারি না; আমি ত তাহার সহিত বরাবরই সদয় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।"

ভাবিলাম, সদয় ব্যবহার বটে! সেই সদয় ব্যবহারের ফলে সে আজ মৃত। তুমি তাহার মৃত্যুতে আনন্দিত। জগতে এরূপ সদয় ব্যবহারের আধিক্য হইলে সংসার আর নরকে পার্থক্য থাকিবে না।

বলিলাম "তাহার মৃত্যুতে তবে তুমি দুঃখিত হও নাই?"

"দুঃখিত! একটুও নয়। গোবিন্দ আমার স্বামীর জীবনকালে বন্ধুর মতই ছিল বটে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার অবিমৃষ্যকারিতা অযাচিত কর্ত্তৃত্ব আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।"

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম, "আমি তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, তাহার মৃত্যু-সংবাদ তোমাকে অত্যন্ত কাতর করিবে। তাই সংবাদটা তোমাকে বলিতে সাহস হইতেছিল না। এখন দেখিতেছি, আমি তাহার ভবলীলা শেষ করিয়া তোমাকে অসুখী করি নাই।"

নীলা উৎসাহে আসন হইতে উঠিয়া বলিল "নিশ্চয়, নিশ্চয়!—তুমি বীরের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, অপমানকারীকে হত্যা করা ব্যতীত তাহার অন্য দণ্ড আর কি হইতে পারে? সম্মান রক্ষার আর কি উপায় ছিল? এই গুণেই আমি তোমাকে আরও ভালবাসিব!"

মনে মনে বলিলাম,—"অপমানকারীর হত্যা ব্যতীত অন্য দণ্ড নাই,—শেষ পর্য্যন্ত এ কথা মনে থাকে যেন; তোমাকেও এই সম্মানের জন্য প্রাণপাত করিতে হইবে।"

নীলা বলিতে লাগিল, "আঃ! সংবাদটা আমাকে দুঃখিত করিবে সন্দেহ করিয়া তুমি প্রথমে কথা বলিতে পার নাই; তাহাতে আমি যে সে সময় কি কষ্টে কাটাইয়াছি, বলিয়া কি বুঝাইব, তোমার স্নেহের একটু-মাত্রও ব্যতিক্রম হইয়াছে,—ভাবিতেই মরণের অধিক কষ্ট হয়,—বুঝিবে না তুমি, তোমাকে আমি কত ভালবাসি। গোবিন্দ আমার কে? তুমিই আমার সব। শুনিলে এখন —আর কেন? আনন্দ কর, তোমার হাসিমুখ প্রাণ ভরিয়া দেখি। এই সুখের দিনের একটা স্মৃতিচিহ্ন তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

আমার সেই অঙ্গুরীটি আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল "এ আংটিটা আবার আমাকে দিলে কেন?—এটি তোমারই অঙ্গুলীর উপযুক্ত! সত্য, আমাকে তুমি যে জহরত উপহার দিয়াছ, সেগুলির তুলনায় এটা কিছুই নয়; কিন্তু অন্যভাবে নিশ্চয়ই তোমার নিকট ইহার একটা মূল্য আছে,—ইহা হেমরাজের—হয়ত তাহার পিতা এটা ব্যবহার করিয়া থাকিবেন,—তিনি তোমার বন্ধু ছিলেন, বন্ধুর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এটা তোমার লইতে আপত্তি আছে কি?"

নীলা আমার অঙ্গুলীতে আমারই অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল। ইচ্ছা হইতেছিল, হাহা করিয়া হাসি। আমি বলিলাম "এটা তোমার স্নেহের চিহ্ন—কিন্তু—কিন্তু—।"

"কিন্তু কি?"

"ইহার সহিত একটা আরও ভয়ানক স্মৃতি জড়িত আছে, সহজে কি আমি তাহা ভুলিতে পারিব? গোবিন্দর হস্ত হইতে এটা আমি খুলিয়া আনিয়াছি—বেচারী যখন শেষ শ্বাস—"

নীলা বাক্যে বাধা দিয়া বলিল "তা বটে! হাঁ—জানি আমি মৃত্যুর স্মৃতি কি ভয়ানক! আমার মনে আছে, পাঠ্যাবস্থায় একজন সন্ন্যাসিনীকে মরিতে দেখিয়াছিলাম, সেই ভয়ানক চিত্র স্মরণ হইলে এখনও শরীরে কাঁটা দেয়। আমি তোমার মনোভাব বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু ওকথা ভুলিয়া যাও।"

বলিলাম "বয়সের একটা ধর্ম্ম আছে—তাহাই মধ্যে অনেকটা আঘাত করিয়াছে। মনটাকে ঠিক করিতে সহরের হৈ-চৈ ছাড়িয়া কয়টা দিন পল্লীবাসে অতিবাহিত করিব মনস্থ করিয়াছি—কয়টা দিন দণ্ডভূকিতে কাটাইব।"

"দণ্ডভূকি! আমি দণ্ডভূকি খুব জানি,—আমাদের বিবাহের পর আমি ও হেমরাজ সেখানে অনেক দিন ছিলাম।"

সেই দিন স্মরণ করিয়াই দণ্ডভূকিতে যাইতেছিলাম। নীলার কথায় বিগত জীবনের সুখস্মৃতির নিবিড় আবেশ আমাকে আপ্লুত করিয়া ফেলিল। আমি তোমার সেই সঙ্গী,—সেই স্বামী—না সঙ্গী—অথচ আজ তাহা প্রকাশ করিবার পথ নাই;—কি পরিতাপ! জীবনে যাহা হারাইয়াছি—শত চেষ্টাতেও তাহা ফিরিয়া আসিবে না। সত্যই আমি মরিয়াছি। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি সেখানে সুখী হইয়াছিলে কি?"

"সুখী? খুব সুখী হইয়াছিলাম। তখন আমার চক্ষে সকলই নূতন,—মধুময়, আনন্দদায়ক, স্বাধীনতার সেই প্রথম আস্বাদন, মঠের কঠোর শাসন হইতে সেই সবে মুক্তি,—জীবন তখন কত সুখের।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "মঠের শাসন কঠোর? সন্ন্যাসিনীগণ তবে কি ছাত্রীদের সহিত ভাল ব্যবহার করেন না?"

"মঠের নিয়ম এক হিসাবে কঠোর বৈ কি! সে নিয়মে বাধ্য হইতে হইলে কেহই জীবনকে সুখের ভাবিতে পারে না। সকল তাতেই ওদের সন্দেহ দৃষ্টি,—অপ্রবাধ

থাক-থাক ভাব,—মানুষের মন অত নীরস হইতে পারে কি? অত সাবধানতা কাহার ভাল লাগে, না কেহ উহা মানিয়া চলিতে পারে! আমার ত একবারে অসহ্য বোধ হইত। মাননীয়া মাতাকে বরং সহা যায়; তাঁর মাধ্য নরম গরম দুই আছে, কিন্তু চেলা সন্ন্যাসিনীগুলি বিষম! অথচ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গেই সম্পর্ক সর্ব্বক্ষণ! কেহ যদি একটা প্রেমের কথা বলিল—ওরা অপবিত্রতার ভয়ে অস্থির। বাপু, অত করিয়াও ত প্রেম ছাড়াইতে পার না—কেহ আগে,—কেহ না হয় পাছে! ওরাই বা কে কেমন তাও ত অজানা নাই।"

"কেন, এখানেও কি প্রেমাভিনয় আছে?"

নীলা হাসিয়া বলিল "সে কথা আজ নয়—যেদিনে শুনিতে হয় ভাল করিয়া শুনিও।"

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে তুমি তাম্রলিপ্তে ফিরিতেছ? সেখানে ত আর কোন বাধা দেখিতেছি না।"

নীলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল "এক সপ্তাহ থাকিব বলিয়া মাতাকে বলিয়াছি, তাহার পূর্ব্বে যাওয়া ভাল দেখাইবে না। কিন্তু তাড়াতাড়ি না ফিরিলেও নয়।"

'কেন, এমন কি কাজ?"

সে সহাস্যে বলিল "গোবিন্দের সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে সে গৌড়ে রওনা হইবার পূর্ব্বে তাহার যাহা কিছু আছে তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী আমাকে করিয়া গিয়াছিল!"

প্রতারিত প্রেমিক! তুমি কি হৃদয়হীন অযোগ্য পাত্রে তোমার প্রেম ন্যস্ত করিয়াছিলে! সে যে সর্ব্বপ্রকার প্রেমের অনুপযুক্তা। আমি আমার উচ্ছ্বাস দমন করিয়া বলিলাম, "আমি তোমার সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সে তাহা হইলে তোমাকে ভালবাসিত?"

নীলা কটাক্ষ হানিয়া হাসিল, বলিল, "বুঝিতেই পারিতেছ—কিন্তু তাহাতে আর এমন বিশেষত্ব কি? অনেকেই আমাকে ভালবাসিয়াছে, আমি তাহাদিগকে ভালবাসি নাই এই যা।—অনেক নির্ব্বোধই আমার ভদ্রতা, সদাশয় আচরণকে প্রেম বলিয়া ভুল করিয়া বৃথা আশা পোষণ করিয়াছে। আচ্ছা, তাহার মৃত্যুর পর তাহার যাহা কিছু—ইহাতে কি তাহার খুড়ার সম্পত্তিটা বুঝাইবে না?"

ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ করিয়াছিল; আমি মস্তক সঞ্চালনে উত্তর করিলাম।

নীলা নিজে-নিজেই বলিতে লাগিল, "তাহার সমস্তই এখন আমার। তাহার চিঠি পত্র দলিল দস্তাবেজ সমস্তেতেই তবে আমার অধিকার।" নীলা নীরব হইল। তাহার চিন্তার বিষয় বুঝিলাম, পাপীয়সী তাহার প্রেমপত্রগুলি ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে,—পাছে সেগুলি অন্য কাহারও হস্তগত হইলে তাহাদের প্রেমকাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বলিলাম, "বিদায়ের সময় উপস্থিত,—আমি সন্ন্যাসিনীর নিকট শুনিয়াছি এক ঘণ্টার উপর এখানে সাক্ষাৎ করিবার নিয়ম নাই, সে সুখ মুহূর্ত্তগুলি অতি দ্রুত অতিবাহিত হইয়াছে,—দুঃখিত হৃদয়ে বিদায় ভিক্ষা করিতেছি। দণ্ডভুক্তি হইতে ফিরিয়া তোমার গৃহে অভ্যর্থিত হইবার আশা রাখিতে পারি কি?"

সে তরল হাস্যলহরীতে কক্ষ কম্পিত করিয়া, আমার স্কন্ধে তাহার হস্ত স্থাপন করিল, উচ্ছ্বসিত আবেগের স্বরে বলিল, "নূতন করিয়া ও কথা কেন,—তুমিই নিজেই তাহা ভাল জান। প্রিয়তম, দেরী করিও না,—আমি তোমার অদর্শন সহ্য করিতে পারিব না।"

অতি কষ্টে হাসিয়া বলিলাম, "লোকে বলে, বিরহে প্রেম বৃদ্ধি করে। আমাকে তাহা জীবনে অনুভব করিতে দাও। বিদায় তবে। আমার জন্য প্রার্থনা করিও,—এখানে ত তোমাদের সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতে হয়।"

"হাঁ—এখানে উপাসনা ও প্রার্থনা বিনা আর কি আছে?"

আমি তাহার হস্ত গ্রহণ করিলাম। আজও তাহার অঙ্গুলীতে বিবাহের অঙ্গুরীটি শোভা পাইতেছে। আমি বলিলাম, "গোবিন্দর জন্য, আশা করি প্রার্থনা করিবে। বেচারা! তুমি তাহাকে ভাল না বাসিলেও সে তোমাকে ভালবাসিত। তোমার জন্যই সে প্রাণ দিয়াছে। কে জানে, অশরীরী আত্মা প্রেমাস্পদের সন্নিকটে অবস্থান করে কি না। হয়ত তোমার মৃত স্বামী হেমরাজের ও তোমার প্রেমাভিলাষী গোবিন্দর আত্মা এখানে উপস্থিত

আছে,—তাহাদের কথা ভুলিও না ; এই উৎসবের দিনে তাহাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য তুমি প্রার্থনা করিতে বাধ্য। হেমরাজ ও গোবিন্দ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, তুমিই জান, কেন তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। বন্ধুদ্বয়ের নাম একত্র সংযুক্ত করিয়া ভগবানকে ডাকিও। তিনি সমস্তই দেখিয়াছেন, সমস্তই দেখিতেছেন ; সমস্তই জানিতেছেন,—তাহার নিকট ঢাকিবার উপায় নাই,—অকপটে তাঁহাকে ডাকিও,—মঙ্গল হইবে।"

নীলা আমার বাক্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল না, স্তম্ভিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, বলিল "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

আমি তাহার হস্ত পরিত্যাগ করিলাম, বলিলাম, "তবে আসি,—সময় হইয়াছে—মঠের নিয়ম ভঙ্গ করিব না।"

নীলা বলিল "সত্যই কি সময় হইয়াছে? বিদায়! কি কঠিন কথা! ভুলিয়া থাকিও না, মনে রাখিও—আমি তোমার বিরহে পাগল হইব।"

নীলা হাসিল।

বিদায় লইলাম, চিরবিদায় দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

ওস্তাদ মৌলা বক্স

এককালে আমাদের দেশে সঙ্গীতের আদর খুবই ছিল। কিন্তু সে-সব দিন আর নাই। ভারতীর পুঁথি বাড়িতেছে বটে, কিন্তু বীণা এখন ধূলায় লুণ্ঠিতা। এই অনাদৃতা বীণাকে আবার মুখরিত করিয়া তুলিবার জন্য যাঁহারা চিরজীবন চেষ্টা করিয়াছেন, মুসলমান ওস্তাদ মৌলাবক্স তাঁহাদের অন্যতম।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর অন্তর্গত ভিওানীর কোন সঙ্গতিপন্ন জমিদারবংশে ইঁহার জন্ম হয়। বড়লোকের ছেলের অবসরের অভাব ছিল না। খেলা কুস্তি প্রভৃতিতেই দিনের বেশীভাগ কাটিয়া যাইত। কোন বিদেশী তাঁহাদের শহরে বেড়াইতে আসিলে তাহার যথাসাধ্য সেবা ও সাহায্য করা মৌলাবক্সের একটি কাজ ছিল। কুস্তিগীর হইবার তাঁহার খুব সখ ছিল। একবার এক বিদেশী ফকির শহরে আসিলে মৌলাবক্স যথারীতি তাঁর সেবা করিতে গেলেন। ফকির ছিলেন চিস্তিয়া দলের সুফী, কাজেই মৌলাবক্সকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। মৌলাবক্স বলিলেন যে, তিনি কোন সঙ্গীত শিক্ষা করেন নাই; তবে কয়েকটা গান তাঁর জানা আছে। ফকির তাঁহার গান শুনিয়া এমনই মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে তাঁহাকে তখনই খেলা কুস্তি সব ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন কুস্তি খেলা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্যে তাঁহার জন্ম। তাঁহার অমন সুন্দর আত্মা সঙ্গীতের মত স্বর্গীয় বিদ্যা ভিন্ন অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। মৌলাবক্সের নাম ছিল চোলে খাঁ, ফকিরই তাঁহার নাম মৌলাবক্স রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি যে-খানেই থাক না কেন, তোমার নামের মহিমা দিগ্বিদিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।" ফকিরের উপদেশ অনুসারে মৌলাবক্স সঙ্গীত চর্চ্চাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে ভারতবর্ষের গুণীরা বাহিরের লোকদের নিকট তাহাদের বিদ্যা প্রকাশ করিতেন না। যে দুই চারিজন শিষ্য ওস্তাদের সেবায় সমস্ত জীবনটাই উৎসর্গ করিয়া যাইতেন, কেবল তাহাদেরই ইঁহারা গোপনে আপনাদের বিদ্যাটুকু দান করিয়া যাইতেন। কিন্তু এই সুযোগলাভও বড় সোজা ব্যাপার ছিল না। সেই সময়ে এক শহরে ঘাসিটখাঁ নামে এক খুব বড় ওস্তাদ ছিলেন, তাঁহার নাম শুনিয়া মৌলাবক্স সেই শহরে চলিলেন, সেখানে পৌছিয়া শুনিলেন, ওস্তাদজি সমস্ত বিদ্যার্থীদের ফিরাইয়া দেন। মৌলাবক্স কিন্তু নিরাশ হইবার পাত্র নন। তিনি খোঁজ করিয়া জানিলেন যে দুপুর রাত্রি হইতে ভোর পর্য্যন্ত ওস্তাদ সঙ্গীত অভ্যাস করেন। ওস্তাদজির এক দরোয়ান ছিল আফিংখোর, রাত্রিবেলা পাহারা দিতে হইত বলিয়া সে ঘুমাইত না। মৌলাবক্স তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিলেন। দুপুররাত্রে বসিয়া গল্প করিবার একজন সঙ্গী পাইয়া দরোয়ান ত' মহাখুসী। কয়েক মাস ধরিয়া এই রকম আড়ালে বসিয়া তিনি ওস্তাদের সঙ্গীত আলাপ শুনিতে লাগিলেন। রাত্রে যাহা চুরি করিয়া শুনিতেন দিনে আবার তাহাই অভ্যাস করিতেন। প্রতিদিন এই-

ওস্তাদ মৌলা বক্স।

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কিন্তু ওকথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। ওটি আমার একান্ত গোপন কথা।" ওস্তাদজি বলিলেন, "ওস্তাদের নাম বলাতে আবার তোমার কি আপত্তি থাকিতে পারে?" মৌলাবক্স বলিলেন, "ও-কথা প্রকাশ করিলে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, এই কথা মনে করিয়া শুধু আমার উন্নতির জন্য প্রার্থনা করুন, আমার ওস্তাদের পরিচয়টি গোপনেই থাকিতে দিন।" ওস্তাদ কিন্তু মৌলাবক্সের ব্যবহার ও বিদ্যায় অত্যন্ত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৌলাবক্স নাম বলিতে যতই আপত্তি করেন, তিনি ততই না-ছোড়বান্দা হইয়া উঠেন। অগত্যা মৌলাবক্স বলিলেন, "ওস্তাদের নাম প্রকাশ করিলে তিনি যদি আমার উপর রাগ করেন, তবে আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন বলুন, তা না হইলে আমি বলিতে পারিব না।" ওস্তাদ রাজি হইলে মৌলাবক্স বলিলেন, "আপনিই আমার ওস্তাদ।" ওস্তাদজি ত' অবাক্!

রকম করিয়া কাটানর কিছুদিন পরে তিনি ওস্তাদজির গানের অবিকল নকল করিতে লাগিলেন। তাহার গান ওস্তাদের গানের প্রতিধ্বনি হইয়া দাড়াইল। তাঁহার কুটিরের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে পথিকেরা ওস্তাদ ও মৌলাবক্সের গানের ধরণের আশ্চর্য্য মিল দেখিয়া থমকিয়া দাড়াইত। শহরে তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে শুনিয়া ওস্তাদজি একদিন ইচ্ছা করিয়া মৌলাবক্সের কুঁড়ের ধার দিয়া চলিলেন। ঠিক নিজের মত গান শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন।

ঘরে ঢুকিয়া মৌলাবক্সের তারিফ না করিয়া এবং তাঁহার ওস্তাদের পরিচয় না লইয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। মৌলাবক্স বলিলেন, "আমার আর-সবই হয়

তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "জীবনে আমি তোমাকে এই সবেমাত্র প্রথম দেখিতেছি; সুতরাং ও-কথা ঠাট্টা করিয়া বলাও যে চলে না।" মৌলাবক্স বলিলেন, "আমি আবার সত্য-সত্যই বলিতেছি, আপনিই আমার ওস্তাদ!" তারপর এই বিদ্যালাভের জন্য তাঁহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে সে সব কথাই খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার এই সুযোগটুকুও হয়ত এইবার কাড়িয়া লওয়া হইবে সে ভয় প্রকাশ করিতেও তিনি ছাড়িলেন না। অন্য সময় ওস্তাদ শিষ্য গ্রহণ করিতে কিছুতেই রাজি হইতেন না, কিন্তু মৌলাবক্স তাঁহাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে সেই দিন হইতেই মৌলাবক্সকে তিনি শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

কয়েক বৎসর পরে মৌলাবক্স একজন অসাধারণ গায়ক হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ওস্তাদের মৃত্যু হওয়াতে তিনি উত্তর ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দক্ষিণে চলিয়া গেলেন। এক দিনের জন্যও তিনি নিজেকে যথেষ্ট জ্ঞানী মনে করেন নাই; কাজেই দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় তাঁহার উপর যে অজস্র প্রশংসা ও স্তুতিবাদ বর্ষিত হইত, তাহার দিকে তিনি ফিরিয়াও তাকান নাই।

ব্যবসাদার ওস্তাদ কি সাধারণ লোক, যাহার সঙ্গেই তাঁহার দেখা হইত, ভাল লাগিলে সকলের কাছ হইতেই তিনি কিছু কিছু শিখিতেন। এমন কি ক্ষুদ্র শিশুর কাছে যে-কোন উপায়ে কিছু শিখিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র সকলের সঙ্গেই তিনি নির্ব্বিচারে আলাপ করিতেন। মানবজীবনের সকল দিকই দেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

উত্তরভারত সঙ্গীতের কি ধন হারাইয়াছে, দাক্ষিণাত্যে গিয়া তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন উত্তর-ভারত গভীরভাবে সঙ্গীতচর্চ্চা ছাড়িয়াই দিয়াছে, এদেশে মোগলরাজত্বের কালে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক দিকটাকে একেবারে অবহেলা করা হইয়াছে। আরব ও পারস্যদেশীয় সঙ্গীত যে উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের উপর যথেষ্ট রঙ্ ফলাইয়াছে, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন। দ্রাবিড়দের কর্ণাটীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, তাহাতে কোন-প্রকার বিদেশী-হস্তস্পর্শের চিহ্ন নাই, ইঁহাদের সা রি গা মার উপর দখলও আশ্চর্য্য রকমের। ইহা দেখিয়া মৌলাবক্স ত্যাগরাজ ও দীক্ষিতার প্রভৃতি দক্ষিণ-দেশীয় সঙ্গীতরচনাকারীদের 'কৃতি'র অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। মৌলাবক্স মহীশূরের রাজদরবারে গিয়া খুব একটা নাড়া দিয়া আসিয়াছিলেন; হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে উত্তরভারত হইতে দক্ষিণ-ভারতের পথে অগ্রসর তিনিই প্রথম করিয়াছিলেন। সে সময় রেলপথ না থাকতে ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার যোগ ছিল না। রাজদরবার হইতে মৌলাবক্সকে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছিল; ইতিমধ্যে তিনি সেখানকার দরবার-বক্সীর গৃহে গিয়া তাঁহার কন্যার অপূর্ব্ব বীণাবাদন গীত ও গাইবার সময়েই সঙ্গীত রচনা শুনিয়া এমনই মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে তাহা শিখিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। কুমারী বলিলেন, "সঙ্গীত আমাদের ব্রাহ্মণজাতির বংশগত সম্পত্তি, অন্য কোন বাহিরের লোকের ইহার বিজ্ঞান ও ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব শিখিবার অধিকার নাই। আপনার যদি একান্তই শিখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আগামী জন্মে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভ করিবেন।" কথাগুলি মৌলা-বক্সের মনে চিরকালের মত গাঁথিয়া গেল। এ অপমান তাঁহার এমনই তীব্র লাগিয়াছিল যে রাজদত্ত পুরস্কার হেলায় ফেলিয়াই তিনি মহীশূর হইতে চলিয়া গেলেন। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহারও আত্মার অধিকারী হইবার দাবী আছে কি না, এই সমস্যাটি তাঁহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তিনি বলিয়া গেলেন ব্রাহ্মণ্য বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া মহীশূরে আবার আসিবেন। না পারিলে আর এদেশে মুখ দেখাইবেন না। এই সংবাদ শুনিয়া মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দীনতম ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত তাঁহার সকল ভক্তই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মৌলাবক্স বাঙ্গালোর, মালাবার প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তাঞ্জোরের এক ব্রাহ্মণের নিকট একটি সঙ্গীতের ভাণ্ডার আবিষ্কার করিলেন। ব্রাহ্মণ এত বাচ্‌বিচার করিতেন যে স্বজাতীয়দেরই শিক্ষা দিতে চান না, আর পুঁথিখানি ত' দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতেও বিশ্বাস করিয়া দ্যান না।

ইঁহার সহিত পরিচয় করিয়া এবং অল্পে অল্পে ইঁহার বিশ্বাসী বন্ধু হইয়া উঠিয়া মৌলাবক্স ইঁহার নিকট হইতে সঙ্গীতশাস্ত্রের অমূল্য রত্নসকল সংগ্রহ করিয়া লইলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের রচিত শ্রেষ্ঠ রচনা-সকল পড়িলেন, এবং রাগপ্রস্তার, তালপ্রস্তার, স্বরপ্রস্তার, গমক, কলা, যতি, লয়, সন্ধি প্রভৃতি সঙ্গীত বিজ্ঞানের নানা অংশও অধ্যয়ন করিলেন। তিনি অত্যন্ত নিরাশ হইয়া, যে মহী-শূর ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, এই-সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া আবার সেই মহীশূরে দেখা দিলেন। মহারাজা কৃষ্ণরাজ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া এক সভা করিলেন। মৌলাবক্স গান, রচনা প্রভৃতিতে ত' সকলকে হারাইলেনই; —স্বর- ও তাল-বোধেও সকলের শ্রেষ্ঠ হইলেন। ক্রমাগত এগার মাস পরীক্ষা দিয়া তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ বলিয়া

প্রমাণিত হইলেন। এই সময় প্রাচীন হিন্দু প্রথামত ছত্র, চামর, কলাগী, শিরপেচ, মশাল প্রভৃতি দিয়া তাঁহাকে মহা সম্মান দেখান হয়। তাহার পরে তিনি কোন প্রাচীন রাজবংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই গৌরবের সময় দেশবিদেশে তাঁহার খুব খ্যাতি রটিয়া গেল। নানা-দেশের রাজারাজড়ারা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন; তিনি সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই, কিন্তু বড়োদার মহারাজা খাণ্ডেরাওএর অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই মহারাজার রাজ্যে গিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কারণ সেখানে গিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে মহারাজা তাঁহাকে তাঁহার নৈপুণ্যের জন্য ডাকেন নাই, কেবলমাত্র সভা অলঙ্কত করিতে ডাকিয়াছেন। মহারাজাও মৌলাবক্সের স্বাধীন-চিত্ততা দেখিয়া কিছু নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন অন্যান্য গায়কদের মত কেবল মহারাজের পদানত হইয়া থাকিতে ইনি রাজি নন।

একদিন মহারাজা তাঁহার সভাসদদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, কেবলমাত্র একজন গায়ক হইয়া মৌলাবক্স কোন্ অধিকারে রাজচিহ্ন ধারণ করেন! মৌলাবক্স বলেন, শাসনকর্ত্তার মান কেবল তাঁহার এলাকার মধ্যে, রাজার সম্মান কেবল তাঁহার রাজ্যে, কিন্তু বিদ্বান সর্ব্বত্রই পূজিত, কাজেই তিনি যত খুসী রাজচিহ্ন ধারণ করিতে পারেন।

তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য মহারাজা আর একটি সঙ্গীতের লড়াইয়ের সভা আহ্বান করিলেন। নিজরাজ্যে তেমন লোক না পাইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে কদমহোসেন, আলিহোসেন, কানাই, নসিরখাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত ওস্তাদদের আনিলেন। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ চর্চ্চিত বিদ্যায় খুব পণ্ডিত, কিন্তু কেহই মৌলাবক্সের মত সর্ব্বশাস্ত্রে কুশল নন। ভারতবর্ষের ওস্তাদদের একটা মস্ত দোষ যে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আর্টে দক্ষ তাঁহারা বিজ্ঞানের ধার ধারেন না, আবার যাঁহারা খুব বড় বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা অন্য দিকে ফিরিয়াও তাকান না। যাঁহার গলা আছে, তিনি গাহিতে জানেন না; যিনি মস্ত গাইয়ে তার সুকণ্ঠের সঙ্গে সম্পর্ক নাই। মৌলাবক্সের এই-সকল দোষ ছিল না, কাজেই তিনি এবারেও জয়লাভ করিলেন এবং ওস্তাদদের এই-সকল দোষ ধরিয়া ফেলিলেন। একদেশে সঙ্গীতচর্চ্চার দোষে যে ভারতীয় সঙ্গীতের কত উচ্চ হইতে কত নীচে পতন হইয়াছে তাহা তিনি এই সভার পরীক্ষার ফলে জানিতে পারিলেন। ইহাতে সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে বটে কিন্তু শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি হিন্দুস্থানী ও কর্ণাট দেশীয় সঙ্গীতের পার্থক্যটা ধরিতে পারিয়াছিলেন। আর্য্য সঙ্গীতের উপর আরব ও পারস্যের প্রভাব বিস্তৃত হওয়াতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুকুমার শিল্প হিসাবে খুবই উন্নতি হইয়াছে, ইহাতে ইহার মোহিনী শক্তি খুবই বাড়িয়াছে। কিন্তু কর্ণাটের সঙ্গীত ছন্দ, তাল, লয় ও নিয়ম শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়ে উত্তর-ভারত অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। দাক্ষিণাত্যে সঙ্গীত একটি পবিত্র বিদ্যা ও সঙ্গীতকারী তাহার পূজারীরূপে সম্মানিত; কিন্তু উত্তরভারতে সঙ্গীতাদি আমোদপ্রমোদের অঙ্গরূপেই বিবেচিত। ইহারই ফলে সঙ্গীত ও তাহার ভক্তগণকে এদেশের লোকে এমন হীন চক্ষে দেখে। মৌলাবক্স উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চলের সঙ্গেই যুক্ত থাকাতে তাহাদের মিলন ঘটাইয়া একটি নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে ভারতের গভর্নর-জেনারেলের সহিত পরিচিত হন ও দিল্লি-দরবারে আপনার দক্ষতা দেখাইয়া অনেক সম্মানলাভ করেন। তিনি যে সঙ্গীতের উন্নতির জন্য কিছু করিতে পারেন নাই, এত সম্মান ও শক্তি পাইয়াও সে কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার বিফলপ্রযত্ন হইবার একটা কারণ দেশের লোকের আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব। বড়োদার মহারাজা সয়াজিরাও গায়কবাড় ইয়োরোপ হইতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিবার ইচ্ছা লইয়া ফিরিয়া আসিলে মৌলাবক্সের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার একটু আশা দেখা দ্যায়। তিনি মহারাজার নেতৃত্বে একটি শিক্ষালয় স্থাপন করেন। মৌলাবক্স ভারতীয় খামখেয়ালী সঙ্গীতকে স্বরলিপির শাসনে আনা দরকার বুঝিয়া এক সঙ্কেতমালার সৃষ্টি করিলেন। সঙ্গীতভক্তগণ তাঁহাকে এ বিষয়েও যথেষ্ট বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন ভারতীয় সঙ্গীতের সৌন্দর্য্যকে নিয়মের অধীন করা যায় না। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তাঁহার সঙ্কেত-মালা শিক্ষা করিয়া নূতন নূতন সঙ্কেতমালার সৃষ্টি আরম্ভ

করিলেন। প্রত্যেকেই নিজ রচিত সঙ্কেতগুলিকে প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইয়া মৌলাবক্সকে এক নূতন বিপদে ফেলিলেন। সেই জন্য মৌলাবক্সের অনেক অনুবর্ত্তী থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কিম্বা অন্য কাহারও সঙ্কেতমালাই সর্ব্ব-সাধারণে ব্যবহৃত হয় না।

মৌলাবক্স সঙ্গীত ছাড়া কবীর নানক দাদু প্রভৃতির কবিতার প্রবর্ত্তনও করিয়াছিলেন।

ইঁহার আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ছিল। তিনি প্রতিদিন ছয় হইতে নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত বীণা-বাদন ও সঙ্গীত অভ্যাস করিতেন। ষাট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে চালাইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীতের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে এমনই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন যে বীণাতে সুন্দর রাগ রাগিণী আলাপ করিবার সময় তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত।

মৌলাবক্স অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন; সঙ্গীত তাঁহার এই প্রবৃত্তিকে দিন দিনই বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। ইঁহার খুব জমকাল চেহারা ছিল এবং লোকে সহজেই ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। ইঁহার কথাবার্ত্তাতেও গানের মত একটা মাধুর্য্য ছিল। ইনি সঙ্গীত-শিক্ষাবিষয়ে অনেক বই লেখেন এবং প্রায় সকল রাগ ও তালেই কিছু-না-কিছু রচনা করেন। ইনি একজন প্রকৃত সুফী ছিলেন। তাঁহার মতে সকল ধর্ম্মেই এক অন্তর্নিহিত সত্য আছে এবং সেইজন্য সকল ধর্ম্মই সত্য। ইনি সকলেরই বন্ধু ছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার দুই পুত্র পৌত্রেরা ও পরিবারস্থ সকলেই সঙ্গীতে খুব নিপুণ। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মর্ত্তুজা খাঁ বড়োদার রাজসভার গায়ক ও বড়োদার সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয়। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র ডাঃ এ, এম, পাঠান লণ্ডনের Royal Academy of Musicএ ইয়োরোপীয় সঙ্গীতে পটু হইয়াছেন; ইনি নেপালরাজ্যে সঙ্গীতের অধ্যাপক।

মৌলাবক্সের শিষ্যগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ; ইঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুত্থানকার্য্যে খুব দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

"সুফী" নামক ইংরেজী ত্রৈমাসিক হইতে সঙ্কলিত।

৪৭—৮

নিখিল বিজ্ঞানশাস্ত্রের গোড়ার শাস্ত্র

প্রাচীন গ্রীসের তত্ত্বজ্ঞান-ভাণ্ডারের গোড়ার সম্বল এ-দেশীয় পুরাতন শাস্ত্রসকলের মধ্যে এরূপ অজস্র পরিমাণে ছড়ানো রহিয়াছে যে, তাহার কোন্‌টা গ্রাহ্য, কোন্‌টা ত্যাজ্য, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পরাভব মানিয়া উদাহরণ-সংগ্রহীতাকে অনেক সময় বাঁশবনে-ডোম-কাণা'র ন্যায় নিখিল শাস্ত্রারণ্যময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা হইতে হয়। এরূপ স্থলে, উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর এবং সকল হইতে উৎকৃষ্টতম উদাহরণের জন্য শাস্ত্রারণ্য খুঁটিয়া না বেড়াইয়া উদাহরণ-সংগ্রহীতা'র উচিত—যাহা যখন তাঁহার হাতের কাছে উপস্থিত হয় তাহা দিয়াই অভীষ্টকার্য্য যথাসাধ্য সুচারুরূপে সম্পাদন করা। আমি এক্ষণে আমার হাতের কার্য্যটি সেইরূপ সংপরামর্শ-সিদ্ধ প্রণালী অনুসারে চুকাইয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পৃথিবীস্থ সমস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গোড়া'র উপাদান-গুলির ছোটোখাটো একটি কল্পতরু যাহা আমি আমাদের দেশের শাস্ত্রারণ্যের একটি সুনিভৃত স্থানে সহসা খুঁজিয়া পাইয়াছি **সেইটি-আগে দেখাই**—তাহা হইলেই কোন্ গ্রীকাচার্য্য তাহার কোন্ শাখা-হইতে কোন্ তত্ত্বটি চুপি-চুপি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহা আপনা-আপনি ফাঁস হইয়া পড়িবে, তা বই, তাহা পাঠক-মহোদয়গণের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইবার জন্য আমাকে বেশী-মাত্রা কষ্ট পাইতে হইবে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সুন্দর-একটি আখ্যায়িকা আছে এইরূপ :—

উপমন্যু-তনয় প্রাচীনশাল, পুলুষ-তনয় সত্যযজ্ঞ, ভল্লবা-তনয় ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষ-তনয় জন, ও অশ্বতরাশ্ব তনয় বুড়িল, এই পাঁচ বড়-ঘরের মহাশ্রোত্রিয় একত্র সমবেত হইয়া "আমাদের আত্মাই বা কে—ব্রহ্মই বা কি" এই প্রশ্নটির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে তাঁহারা তাঁহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির আর-কোন উপায় হাতের কাছে না পাইয়া বলিলেন, "সম্প্রতি অরুণ-তনয় উদ্দালক বৈশ্বানর আত্মার সাধন করিয়া থাকেন—চল' আমরা তাঁহার নিকটে যাই", এইরূপ যুক্তি করিয়া তাঁহারা উদ্দালকের নিকটে গমন করিলেন। তাঁহারা আসিতেছেন দেখিয়া উদ্দালক মনে মনে ভাবিলেন "এই মহা-ঘরের মহাশ্রোত্রিয়েরা

নিশ্চয়ই আমার নিকটে নানা-বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন; ইহাদের সকল-প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি যে পারিয়া উঠিব এমন ভরসা হয় না;—ইহাদিগকে অন্য কাহারো নিকট ভিড়াইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃকল্প"; তাঁহাদিগকে তাই বলিলেন "ভগবন্ত সবে, কৈকেয়াধিরাজ অশ্বপতি সম্প্রতি বৈশ্বানর আত্মা সাধিয়া থাকেন; চলুন্ আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে যাই"। গেলেন তাঁহারা তাঁহার নিকটে।

কৈকেয়াধিরাজ অশ্বপতি অভ্যাগত মহাত্মা-ছয়জনা'র সেবা'র জন্য যথাযোগ্য পৃথক পৃথক বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন; প্রাতে উঠিয়া তিনি বলিলেন "আমার জনপদে চোর নাই, নীচাশয় নাই, মদ্যপায়ী নাই, অগ্নি না রক্ষা করে এমন গৃহস্থ নাই, স্বেচ্ছাচারী পুরুষই নাই তা'র আবার স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রী! ভগবন্ত-সবে এক্ষণে আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের চেষ্টায় আছি। এক এক করিয়া ঋত্বিগ্‌গণকে যেরূপ ধন দেওয়া হইবে—আপনাদিগকেও সেইরূপই দেওয়া হইবে; অতএব আপনারা এখানে থাকিয়া যজ্ঞ দর্শন করুন্।" তাঁহারা বলিলেন "যে-মনুষ্য যে-অর্থের সাধন করে, তাহার নিকট হইতে সেই অর্থই লোকে চায়; সম্প্রতি আপনি বৈশ্বানর-আত্মার সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারই বিষয় আমাদিগকে বলুন্"। রাজা বলিলেন "কাল্ প্রাতে বলিব"। প্রাতঃকালে তাঁহারা সমিৎ হস্তে করিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার না করিয়াই বলিতে আরম্ভ করিলেন এইরূপ :—

রাজা॥ ঔপমন্যব, কোন্ আত্মাকে তুমি উপাসনা কর।

ঔপমন্যব॥ দ্যৌ'কে মহারাজ।*

রাজা॥ এ-যাঁহাকে তুমি উপাসনা কর, ইনি সুতেজা বৈশ্বানর-আত্মা। সেইজন্যই তোমার কুলে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের এতাধিক প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। দ্যৌ কিন্তু আত্মার মস্তক-মাত্র।

তাহার পরে রাজা পুলুষ-তনয় সত্যযজ্ঞ'কে প্রাচীনযোগ্য নামে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—প্রাচীনযোগ্য, **তুমি** কোন্ আত্মাকে উপাসনা কর।

সত্যযজ্ঞ॥ আদিত্য'কে মহারাজ।

রাজা॥ এ-যাঁহাকে তুমি উপাসনা কর, ইনি বিশ্বরূপ বৈশ্বানর-আত্মা। সেইজন্যই তোমার কুলে বিশ্বের জীবন্ত প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়:—অশ্ব-রথ, দাস-দাসী, সোণা-রূপা কত-যে তাহার সংখ্যা নাই। আদিত্য কিন্তু আত্মার চক্ষু-মাত্র।

তাহার পরে রাজা ভল্লবী-তনয় ইন্দ্রদ্যুম্ন'কে বৈয়াঘ্রপদ্য-নামে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বৈয়াঘ্রপদ্য, **তুমি** কোন্ আত্মাকে উপাসনা কর।

ইন্দ্রদ্যুম্ন॥ বায়ুকে মহারাজ।

রাজা॥ এ-যাঁহাকে তুমি উপাসনা কর, ইনি পৃথগ্‌বর্ত্মা বৈশ্বানর-আত্মা। সেইজন্যই তোমার নিকটে পৃথক্ পৃথক্ নানাবিধ সেবা'র সামগ্রী নিত্য নিত্য উপস্থিত হয়, আর, তোমার প্রয়াণ-কালে পৃথক্ পৃথক্ রথশ্রেণী তোমার আগু পাছু যায়। বায়ু কিন্তু আত্মার প্রাণমাত্র।

তাহার পরে রাজা শর্করাক্ষতনয় জন'কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—শার্করাক্ষ্য, **তুমি** কোন্ আত্মার উপাসনা কর।

জন॥ আকাশ'কে মহারাজ।

রাজা॥ এ-যাঁহাকে তুমি উপাসনা কর, ইনি বহুল বৈশ্বানর আত্মা। সেইজন্যই তুমি পুত্রপৌত্রে ধনে-ঐশ্বর্য্যে বহুল হইয়া উঠিয়াছ। আকাশ কিন্তু আত্মার দেহ-মাত্র।

তাহার পরে রাজা অশ্বতরাশ্বতনয় বুড়িল'কে বৈয়াঘ্রপদ্য-নামে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বৈয়াঘ্রপদ্য, **তুমি** কোন্ আত্মার উপাসনা কর।

বুড়িল॥ অপ্'কে মহারাজ।

রাজা॥ এ-যাঁহাকে তুমি উপাসনা কর, ইনি রসরূপী বৈশ্বানর-আত্মা। সেইজন্য তুমি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ। অপ্ কিন্তু আত্মার জঘন মাত্র

তাহার পরে রাজা অরুণ-তনয় উদ্দালক'কে গৌতম-নামে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—গৌতম, **তুমি** কোন্ আত্মাকে উপাসনা কর।

উদ্দালক॥ পৃথিবীকে মহারাজ।

রাজা॥ এ-যাঁহাকে তুমি উপাসনা কর, ইনি প্রতিষ্ঠা-রূপী বৈশ্বানর-আত্মা। সেইজন্যই তুমি পুত্রপৌত্র এবং

* "দ্যৌ" কিনা দ্যুতিমান্ নক্ষত্রালয় বা নাক্ষত্রিক্ জগৎ।

পশুগণে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছ। পৃথিবী কিন্তু আত্মার পদদ্বয় মাত্র।

অতঃপর রাজা সকলকে বলিলেন—তোমরা সকলেই বৈশ্বানর আত্মার এক-একটি অবয়বের জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার প্রসাদে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বদেহে অন্ন ভোজন করিয়া থাক' এবং সর্ব্বত্র প্রিয় দর্শন করিয়া থাক'। এইরূপে যিনি বৈশ্বানর আত্মার প্রাদেশ-পরিমাণও কোনো-একটি অবয়বের মধ্যে তাঁহাকে উপাসনা করেন, ভোজন করেন তিনি **অন্ন**, দর্শন করেন তিনি **প্রিয়**, কুলে তাঁহার হয় **ব্রহ্মতেজ দেদীপ্যমান।**

সেই যে এই বৈশ্বানর আত্মা, ইঁহার মস্তক—সুতেজা দ্যৌ; ইঁহার চক্ষু আদিত্য, ইঁহার প্রাণ—বায়ু, ইঁহার দেহ—আকাশ; ইঁহার জঘন—জল, ইঁহার পদদ্বয় পৃথিবী, ইঁহার হৃদয়-মন ও আত্মা—অগ্নি।

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটি আদিম বিজ্ঞান-শাস্ত্র, অথবা যাহা একই কথা—সকল **বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গোড়া'র শাস্ত্র।**

প্রতিবাদী॥ ঐ অজ্ ছেলেমানুষীগোচের আখ্যায়িকাটি সে কেলে ঋষিদিগের আদো-আদো বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় শুনায় **অতি মনোহর অমৃতং বাল-ভাষিতং**, কিন্তু আপনি যেরূপ গম্ভীরভাবে উহার বাংলা অনুবাদ করিয়া আমাকে শুনাইলেন, আবার তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া ততোধিক গম্ভীরভাবে বলিলেন "উহা সকল-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গোড়া'র শাস্ত্র" তাহা দেখিয়া আমি কিছুতেই হাস্য সাম্‌লাইতে পারিতেছি না। আমার মনে হইতেছে—ভয়ে বলিব, না নির্ভয়ে বলিব?

অনুবাদী॥ তুমি তো জানো যে, আমার কাছে তোমার সাতখুন মাপ! তবে আর তোমার ভয় কিসের?

প্রতিবাদী॥ আমার মনে হইতেছে যে, "old age is second childhood" এই ইংরাজি খনা'র বচনটি আপনাতে পুরামাত্রায় ফলিয়াছে।

অনুবাদী॥ না ফলিবে কেন? "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"—"সংসর্গজনিত দোষগুণ অনিবার্য্য"। বেদোপনিষদের কৃত্রিমতা-শূন্য ঋষিবাক্যের অমৃত সমীরণ গায়ে লাগিলে আমা'র-বয়িসী লোকেরা কাঁচিয়া শিশু হইবে ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, আর, কৃত্রিমতাপূর্ণ ইংরেজি বাগাড়ম্বরের উষ্ণ বাটিকার (hot houseএর) উত্তাপ গায়ে লাগিলে তোমা'র-বয়িসী লোকেরা ইঁচড়ে পাকিয়া জ্যেষ্ঠতাত হইবে ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তোমার প্রবীণ ঢঙের টিপ্পনীটা'র বাহিরের সাজগোজ বাদে, **ভিতরের কথাটি** যদি তা'র এই-শুধু হয় যে, সে-কালের ঋষিদিগের অন্তঃকরণ দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় কৃত্রিমতাশূন্য ছিল, তবে সে কথা খুব ঠিক্; কিন্তু তা' বলিয়া এটা তুমি তোমার মনের অ্যাক্ কোণেও স্থান দিও না যে, তাঁহাদের বুদ্ধি-বিবেচনা অধুনাতন কালের খ্যাতনামা বড় বড় উপাধিধারী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা কোনো অংশে কম সূক্ষ্ম বা কম তীক্ষ্ণ ছিল। আমার এ কথাটা যে তোমার মনে ধরিল না—তোমার মুখের ভাব দেখিয়াই তাহা আমি বুঝিয়াছি। আচ্ছা—তোমাকে আমি একটি সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার তুমি উত্তর আমাকে দ্যাও। দৃশ্যবস্তু কোন্ দর্পণে যথাবৎ (অর্থাৎ যেমনটি তেম্নি অবিকল) প্রকাশ পায়? সমতল দর্পণে না অবুড়া-খাবুড়া দর্পণে?

প্রতিবাদী॥ সমতল দর্পণে!

অনুবাদী॥ নির্ম্মল সমতল দর্পণে না মলিন সমতল দর্পণে?

প্রতিবাদী॥ নির্ম্মল সমতল দর্পণে।

অনুবাদী॥ এটা যখন তুমি জান' যে, দৃশ্যবস্তু-সকল সুবিমল সমতল দর্পণে যেমন যথাবৎ প্রকাশ পায়—মলিন দর্পণেও তেমন না—আবুড়া-খাবুড়া দর্পণেও তেমন না, তখন এটাও তেম্নি তোমার জানা উচিত যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোড়া'র সত্য-সকল বিশুদ্ধ সরল অন্তঃকরণে যেমন যথাবৎ প্রকাশ পায়—কলুষিত অন্তঃকরণেও তেমন না—কুটিল অন্তঃকরণেও তেমন না। পুরাকালের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদিগের নিখুঁত সরল অন্তঃকরণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোড়াঘ্যাঁসা মোটু মোটু সত্যের সুন্দর সুন্দর প্রতিবিম্ব যাহা নিপতিত হইত, তাহা তাঁহারা উপসন্ন বিদ্যার্থী সাধুসজ্জন'কে অকপটচিত্তে বিবৃত করিয়া শুনাইতেন; আর সেই জন্য, তাঁহাদের বচনের মূল্য আর আর শাস্ত্র-বচনের অপেক্ষা ঢের বেশী। তোমাকে আমি যে-কএক ছত্র উপনিষদবাক্য অনুবাদ

করিয়া শুনাইলাম, তাহার মূল্য না-যদি তুমি জানিতে পারিয়া থাক,—তাহার জন্য তোমাকে আমি দোষ দিই না; কিন্তু তাহার মূল্য তুমি আমার নিকটে যাচাই করিতে পারিতে। তুমি যখন জহরী নহ, তখন তাহাই তোমার সর্ব্বাগ্রে করা উচিত ছিল। তাহার পরিবর্ত্তে ঐ শ্রদ্ধাস্পদ বচন-গুলির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তোমার শিক্ষার অসম্পূর্ণতার পরিচয় প্রদান করিতে তুমি যে লজ্জাবোধ করিলে না, সেইটিই তোমার মহৎ দোষ।

প্রতিবাদী ॥ "বৈশ্বানর আত্মার মস্তক—দ্যৌ" এইরূপ একটা কাচের বেলোয়ারি জহরীর নিকটে যাচাই করিতে যাইতে লজ্জা-বোধ করা'তে আমার যদি অপরাধ হইয়া থাকে, তবে দীনের সে অপরাধ কি এতই গুরুতর অপরাধ যে, আপনার মতো মহাত্মা ব্যক্তিও তাহা ক্ষমা করিতে অক্ষম?

অনুবাদী ॥ ক্ষমা আমি যেন করিলাম, কিন্তু তুমি যে, বাস্তবিকই ঋষিদিগের নিকটে অপরাধী, তাহা তোমার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও তুমি তাহা দেখিবে না, আর সেইজন্য আমার সহস্র ক্ষমাও তোমার কোনো উপকারে আসিবে না। সে কথা যা'ক্! সেদিন আমি একটা ইংরাজি পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তাহার একস্থানে লেখা আছে দেখিলাম "The starry heaven is the controlling head of the universe." এ কথাটাকে তোমার কিরূপ মনে হয়?

প্রতিবাদী ॥ কথাটি আমার অতি সুন্দর মনে হইতেছে। গ্রন্থকারের নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

অনুবাদী ॥ আমারও যে-নাম, গ্রন্থকারেরও সেই নাম।

প্রতিবাদী ॥ আপনার মতো একজন প্রবীণ ব্যক্তি যে আমাকে এরূপ ছলনা করিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই।

অনুবাদী ॥ প্রবীণ চিকিৎসক যদি বালক-রোগীকে "চিনি খাও" বলিয়া হাঁ করিতে বলিয়া এক-পুরিয়া কুইনাইন-চূর্ণ তাহার মুখমধ্যে নিক্ষেপ করেন, তবে তাহাকে **ছলনা বলে না**—তাহাকে বলে **হিতৈষণা**। বৎসরেক পূর্ব্বে তোমার পিতার সহিত যখন আমি দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তখন আমি তোমাকে তোমার নাম জিজ্ঞাসা করাতে, চট্ করিয়া তুমি তোমার পকেট হইতে একটি পরিচয়পত্রিকা (visiting card) বাহির করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলে—তোমার মনে পড়ে কি? তাহার শ্বেত পৃষ্ঠায় নীল অক্ষরে লেখা ছিল দেখিয়াছিলাম "শ্রীজনার্দ্দন শাস্ত্রী M. A. বিদ্যাবৃহস্পতি"। উহার সর্ব্বশেষে আর-একটি উপাধি আমি হাতের অক্ষরে লিখিয়া দিতে চাই;—তোমার পরিচয়-পত্রিকাখানি আমাকে দ্যাও। বিদ্যাবৃহস্পতির অন্তে লিখিয়া দিলাম, এই দেখ, "**জহরী-চূড়ামণি**।"

এমি তুমি সেরা জহরী যে, আমি যখন সে-কালের একটা পুরাতন গেঁজে'র মধ্যে করিয়া একগাছি মুক্তার মালা তোমার সাম্‌নে ধরিলাম, তখন তুমি বলিলে "এ পুঁতির মালা তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে"; আবার, সেই বস্তুটিই যখন একজন সুবিখ্যাত ইংরেজ-কারীকরের নামাঙ্কিত গয়নার বাক্সের মধ্যে করিয়া তোমার সাম্‌নে ধরিলাম,, অম্নি তুমি বলিয়া উঠিলে "বা! কি চমৎকার মুক্তার মালা! মূল্য না জানি **কত**?"

শোনো তবে বলি:—দ্যৌ-এর নামই starry heaven, বৈশ্বানরের নামই universe, মস্তকের নামই head! এখন বুঝিলে?

প্রতিবাদী ॥ না বুঝিলে আপনি আমাকে ছাড়েন কই? একটি বিষয়ে কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত আমার মনের ধন্দ মিটিতেছে না। যদি অভয় দ্যা'ন তবে বলি—নচেৎ চুপ করিয়া থাকাই আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

অনুবাদী ॥ আমার কাছে তোমার ভয়ের কোনো কারণ নাই। একটিও কথা পেটে না রাখিয়া তোমার অন্তরের সমস্ত কথা তুমি সুনির্ভয়ে বল'!

প্রতিবাদী ॥ সকল দেশের জ্ঞানি-জনেরাই স্ব স্ব দেশের শাস্ত্রের মধ্য হইতে সত্যান্ন সংগ্রহ করিয়া আপন আপন জ্ঞানের ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং পুষ্টি-সাধন করিয়া থাকেন;—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করেন; ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করেন। এখন, কথা হইতেছে এই যে, বেদোপনিষদ্ আমা'দের দেশের সকল-শাস্ত্রের গোড়া'র শাস্ত্র, আর সেইজন্য

বলা যাইতে পারে যে, উহা আমাদের দেশের যাবতীয় শাস্ত্রবৃক্ষের বীজ। সেই বীজগুলি যখন সবেমাত্র অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল—"বৈদিক ঋষিরা তখনকার কালের নবপ্রণীত ঋকমন্ত্র-সকলের মধ্য হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন" এ কথা বলাও যা, আর, "কৃষকেরা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের নবাঙ্কুরিত ধান্যবৃক্ষ হইতে ধান্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গোলাঘরের পুষ্টিসাধন করিতেছে" এ কথা বলাও তা. দুইই সমান হাস্যাস্পদ! অতএব পুরাতন বৈদিক কালের ঋষিরা তাঁহাদের জ্ঞানের পুষ্টিসাধক সত্যান্ন যেখান হইতে যতই কেন সংগ্রহ করিয়া থাকুন্ না কেন - এটা স্থির যে, তাঁহাদের সময়ের কোনো শাস্ত্র হইতে তাহা সংগ্রহ করেন নাই; কাজেই বলিতে হয় যে, বৈদিক কালের ঋষিদিগের সকল কথাই স্বকপোলকল্পিত; তা বই, তাঁহাদের কোনো কথাই শাস্ত্রের কোনো ধার ধারে না। আপনি কিন্তু বলিতেছেন যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটি সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রের গোড়া'র শাস্ত্র;—তবে কি সমস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মূল—বৈদিক ঋষিদিগের স্বকপোলকল্পিত এলো-মেলো প্রলাপ বাক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত? আমার এই প্রশ্নটির যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটা সদুত্তর আপনি আমাকে দিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে আমি ছাড়িতেছি না।

অনুবাদী॥ তোমার এই বৈঠক ঘরে ঢুকিবামাত্র আমার সহসা মনে হইয়াছিল—যেন এ ঘর'টি এখন অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রশস্ত, আর, যেন দর্পণ বলিয়া একটা সামগ্রী ইহার ত্রিসীমার মধ্যে নাই। এ যে তিরস্করিণী-বিদ্যাকে হারাইয়া দিয়াছে।* দর্পণখানি তুমি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছ?

প্রতিবাদী॥ আমার একজন পরম বন্ধুর নিকট হইতে উহা আমি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

অনুবাদী॥ তা কি আর আমি জানি না? অমন একটা মহার্ঘ সামগ্রী মূল্য দিয়া ক্রয় করা কি তোমার আমার মতো সামান্য শ্রেণীর গৃহস্থ লোকের কর্ম? সে যা হো'ক্—উহাকে অমনতর ঝক্‌ঝ'কে পরিষ্কার করিলে কিরূপে?

প্রতিবাদী॥ প্রথমে খড়ি-মাটি দিয়া মাজিয়া ঘসিয়া, তাহার পরে এক-টুক্‌রা পরিষ্কার ভিজা ন্যাকড়া দিয়া ধুইয়া মুছিয়া।

অনুবাদী॥ পুরাকালের ঋষিরা তেম্নি তাঁহাদের সরল অন্তঃকরণ পাইয়াছিলেন **বিশ্ববন্ধুর নিকট হইতে বিনা-মূল্যে**; এবং তাহার পরে তাহাকে পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন কঠোর সাধনের খড়িমাটি দিয়া মাজিয়া ঘষিয়া এবং অকৃত্রিম প্রীতিভক্তির সুকোমল আর্দ্র বস্ত্র দিয়া ধুইয়া মুছিয়া। তাঁহাদের সমতল ধী-দর্পণের এইরূপ নির্ম্মল স্বচ্ছ অবস্থায় আধ্যাত্মিক এবং প্রাকৃতিক জগতের গোড়াঘেঁসা মোট্ মোট্ সত্যের পরিষ্কার প্রতিবিম্ব যাহা তাহাতে নিপতিত হইত, তাহার কল্যাণে একদিনের জন্যও তাঁহাদিগকে শাস্ত্রের অভাব অনুভব করিতে হয় নাই;—তাঁহাদের বিজ্ঞান-শাস্ত্র ছিল প্রকৃতি স্বয়ং, ধর্ম্ম-শাস্ত্র ছিল অন্তরাত্মা স্বয়ং! এ যাহা বলিলাম—উদ্ধৃত ছান্দোগ্য-উপনিষদের আখ্যায়িকাটি তাহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

উদ্ধৃত আখ্যায়িকাটির টীকা।

(১)

বলা হইয়াছে "বৈশ্বানর আত্মার মস্তক দ্যৌ"। "দ্যৌ" কিনা আকাশের মূর্দ্ধাস্থিত দ্যুতিমান্ নাক্ষত্রিক জগৎ। পৃথিবীর উপরে নাক্ষত্রিক জগৎ তলে তলে কতদূরপর্য্যন্ত কিরকম কার্য্য করিতেছে, তাহার গুপ্ত সমাচার নক্ষত্রেরা আজ পর্য্যন্ত কোনো জ্যোতির্ব্বেত্তার নিকটে রশ্মি-করে লিখিয়া প্রকাশ করে নাই **যদিচ**, কিন্তু তা বলিয়া পৃথিবীর উপরে তাহার অধ্যক্ষতাকার্য্য যে এক মুহূর্ত্তও ক্ষান্ত আছে এরূপ মনে করিবার স্বল্প-মাত্রও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবী হইতে শত কোটি যোজন দূরে থাকিয়াও সূর্য্য পৃথিবীর জন্য না করিতেছে এমন কার্য্যই নাই;—ইহা দেখিয়া কাহার না মনে এইরূপ একটা ধ্রুব-প্রতীতি জন্মে যে, দূরত্বের আধিক্য-প্রযুক্ত জ্যোতিষ্ক-জগতের কার্য্যকারিতার ন্যূনতা হয় না.? তা ছাড়া, নাক্ষত্রিক জগতের অধিবাসী জ্যোতির্ম্মণ্ডল-গণের দূরত্ব যেমন, 'এক

* তিরস্করিণী বিদ্যা যাঁহার জানা আছে, তিনি তাহার গুণে ইচ্ছামাত্রেই অদৃশ্য হইতে পারেন।

দিকে, মাত্রাতীত অধিক,—তাহাদের দলপুষ্টিও তেম্নি, আর এক দিকে, মাত্রাতীত অধিক। অতএব, দূরত্ব-হেতু তাহাদের কার্য্যকারিতা'র ন্যূনতা যদি স্বীকারও করা যায়, তবে দলপুষ্টি হেতু তাহাদের কার্য্যকারিতা'র মাত্রাধিক্যও সেই-সঙ্গে স্বীকার না করিব কেন? এই-সকল দুরূহ বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া তোমার আমার পক্ষে নিতান্তই বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়ানো—অতএব তাহাতে কাজ নাই! সোজাসুজি আমি যাহা বুঝি তাহা এই:—আমি যখন এই প্রবন্ধটা লিখিতেছি, তখন আমার হস্ত অপেক্ষা আমার মস্তক লেখনী হইতে দূরে থাকা সত্ত্বেও "আমার হস্ত লিখিতেছে" বলা অপেক্ষা "আমার মস্তক লিখিতেছে" বলা বেশী সত্য, তাহাতে আর ভুল নাই। হাত'ই লিখুক, মুখই বলুক, আর পা'ই চলুক—**মাথা** থাকা চাই সকলের মাথার উপরে বর্ত্তমান। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন্‌খানটা তাহার মাথা? সৌর জগতের মাথা যে, সূর্য্য, তাহা অতি সহজে প্রমাণ করা যাইতে পারে এইরূপ:—

মূল কথা।
(Major premise)
যে যাহার নিয়ামক, সে'ই তাহার **মাথা**।

দেখা কথা।
(Minor premise)
সূর্য্য সৌর জগতের নিয়ামক।

ফল কথা।
(Conclusion)
অতএব সৌর জগতের মাথা—সূর্য্য।

এই যুক্তি-সোপানটির এইখানেই থামিয়া না দাঁড়াইয়া উহার আর-কয়েকটি ধাপ উচ্চে উঠিলেই—সর্ব্বজগতের মাথা যে তাহার কোন্‌খানটায়—তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে এইরূপ:—

বর্ত্তমান শতাব্দীর জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের এটা একটা ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, এ-সূর্য্যের মাথার উপরে রহিয়াছে **আর এক সূর্য্য**, আবার, সে সূর্য্যের মাথার উপরে রহিয়াছে **তৃতীয় আর এক সূর্য্য**। এখন দেখিতে হইবে এই যে, আমাদের এই চিরপরিচিত ঘরের-সূর্য্যটির মাথার উপরে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি যত-গুলা সূর্য্য যত-দূর হইতে যত-দূরে যেখানেই অবস্থিতি করুক্ না কেন—এটা স্থির যে, সবাই তাহারা নাক্ষত্রিক **জগতের পুরবাসী**। কাজেই বলিতে হয় যে, আমাদের এই চির-পরিচিত বাল্যসখা-সূর্য্যটি যেমন সৌর জগতের নিয়ামক, তেম্নি আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর নাক্ষত্রিক জগদ্‌বাসী সূর্য্য-সমষ্টি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক। অতএব এ-কথা একটুকুও মিথ্যা নহে যে, নাক্ষত্রিক জগদ্‌বাসী সূর্য্যাতি-সূর্য্যেরা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মস্তিষ্ক-কোষাবলী (brain-cells); আর নাক্ষত্রিক জগৎ সেই মস্তিষ্ক-কোষাবলীর আধার-ভূত মস্তক। ইহা হইতে আমরা অধিকন্তু আর-একটি কথার সন্ধান পাইতেছি এই যে, সকল সূর্য্যের গোড়া'র সূর্য্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মরন্ধ্র।

পজিটিবিষ্ট্ সম্প্রদায়ের আদি গুরু কোঁতে এম্নি পাগল ছিলেন যে, তিনি তাহার মস্তিষ্কের জোরে সৌর জগতের প্রান্ত সীমা বিজ্ঞানের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার শিষ্য-সৈন্যগণকে জাঁদরেলি-স্বরে হাঁকিয়া বলিলেন "এই জয়স্তম্ভের বক্ষপটে বড় বড় অক্ষরে দেখ আমি **কী লিখিয়া দিলাম**:—

☞ Thus far shalt thou go and no farther। কিন্তু হায়! কোঁতের মর্ত্ত্য-লীলা-সম্বরণের অনতিপরে রশ্মিলেখা-বিভাজনী বিদ্যা (spectrum analysis) বিদ্বজ্জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কোঁতের ঐ সিংহনাদসদৃশ প্রচণ্ড হুকুমটাকে নক্ষত্র-করাঙ্গুলির **অ্যাক্‌-টোকায়** উড়াইয়া দিল! নবাবিষ্কৃত রশ্মিবিভাজনী বিদ্যার আশীর্ব্বাদে বর্ত্তমান শতাব্দীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা দ্যৌ-দেবতার পরমাশ্চর্য্য মর্য্যাদা-মাহাত্ম্য কোঁতে'র চেলা-দিগের অপেক্ষা ঢের বেশী বুঝিতে পারিয়াছেন **স্বীকার্য্য**, কিন্তু ভারতবর্ষের আদিম ঋষি-মনীষীরা তাহা যেমন শেষপর্য্যন্ত তলাইয়া বুঝিয়াছিলেন—পাশ্চাত্য-দেশীয় পণ্ডিতেরা অদ্যাপি তাহার সিকি'র সিকি বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা ধ্যানযোগে দেখিতে পাইয়া-ছিলেন **সেই সূর্য্যাতিসূর্য্য পরম সূর্য্য**—অধুনাতন কালের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যাহার **নামো-চ্চারণ করিতে পর্য্যন্ত** সাহস করেন না।

সেকালের শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি ব্যতিরেকে এমন-একটি শব্দাড়ম্বর-শূন্য সাক্ষাৎজ্ঞানের কথা মুখে উচ্চারণ করে কাহার সাধ্য—যে, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং।" "বিষ্ণুর সেই পরম স্থান সূরীরা সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন—গগন-মূর্দ্ধে চক্ষু যেন আতত" ?

শেষোক্ত শ্লোকটির টীকা।

ছান্দোগ্য উপনিষদের আখ্যায়িকাটিতে একটু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু—সূর্য্য। কিন্তু এখানকার এই যে "দিবীব চক্ষুরাততং" এ চক্ষু বিষ্ণুর অপর স্থান নহে—এ চক্ষু এ সূর্য্য নহে। এ-চক্ষু বিষ্ণুর পরম স্থান! এ চক্ষু সেই জ্যোতির জ্যোতি সূর্য্যাতিসূর্য্য পরম সূর্য্য—সেই central sun of the universe—যাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনিরুদ্ধ এবং অপরাজিত প্রভাব নিখিল আকাশে নিরন্তর ভরা রহিয়াছে।

(২)

বলা হইয়াছে "বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু—সূর্য্য। একদিকে পৃথিবী সুদ্ধ সমস্ত জীবের **একচক্ষু**—আর একদিকে অসংখ্য জীবের অসংখ্য চক্ষু। কোনো জীবের কোনো চক্ষু কোনো কার্য্যেরই হয় না—যদি সেই **একচক্ষু** আকাশে উন্মীলিত না হয়। **একচক্ষু** সে কে? **সূর্য্য** সে—তাহা কি আবার বলিতে হইবে? প্রশ্ন॥ সূর্য্য যদি জীবমণ্ডলীর চক্ষু হয়—চন্দ্র তবে কী দোষ করিল? প্রজ্বলিত দীপমালাই বা কী দোষ করিল? উত্তর॥ চন্দ্রালোকও সূর্য্যালোক, দীপালোকও সূর্য্যালোক। সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে নিপতিত হইয়া তথা-হইতে প্রতিফলিত হইলেই তাহার নাম হয় চন্দ্রালোক, তেমি আবার, রূপান্তরিত সূর্য্যালোক তৈলাক্ত বর্ত্তিকার মধ্যে (কিনা তেনা সোল্‌তের মধ্যে) যাহা অনুত্তেজিত অবস্থায় প্রসুপ্ত থাকে, তাহা জলন্ত অগ্নির উত্তেজনায় সুপ্তি-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেই তাহার নাম হয় দীপালোক!

বলিতেছিলাম—সূর্য্য পৃথিবীস্থ সমস্ত চক্ষুষ্মান্ জীবগণের সাধারণ (কি না সরকারি) চক্ষু। সেই মহা চক্ষু যখন অদিতি মাতার (কি না অখণ্ড আকাশের) গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল—তখন পৃথিবী হয় নাই। তেজই বা তাহার কি—স্ফূর্ত্তিই বা তাহার কি! তাহার তেজ **আকাশে** ধরে না—স্ফূর্ত্তি **কালে** বিরাম জানে না। তাহার রশ্মি-মণ্ডলের অন্তস্তরে তৈজস পরমাণু-সকল প্রমত্ত বেগে অনবরত নৃত্য করিতেছে, আর দশদিকের ঈথর-মণ্ডল তাহাদের সহিত নৃত্যে যোগ দিতেছে। পথিমধ্যে আবার ঈথরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন তালের নৃত্য আরম্ভ করিতেছে। এক দল নাচিতেছে ঢিমা তালে—ইহারা লাল রঙের দল; আর এক দল নাচিতেছে জলদ্ তালে—ইহারা বেগ্‌নি রঙের দল; তৃতীয়-আরেক দল নাচিতেছে মধ্যম তালে—ইহারা জরদা রঙের দল,—আকাশের রঙ্গশালায় এইরূপ রকমওয়ারি তালের নৃত্য চলিতেছে পৃথিবী-সৃষ্টির কত যে যুগযুগান্তর পূর্ব্ব হইতে তাহা কেবা না জানন্তি মনুষ্যাঃ। পৃথিবী সৃষ্টির যুগযুগান্তর পরে ভূমণ্ডলস্থিত আদিম জীবরাজ্যের প্রধান অধিবাসীদিগের দেহ-ক্ষেত্রে ছোটো ছোটো চক্ষুর বীজ-বুনানি আরম্ভ হইল। সেই ছোটো চক্ষুগুলি কালক্রমে যখন বড় হইয়া উঠিল, তখন তাহাদের পর্দার আড়ালে ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ু-তন্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন দলের ঈথরের হাত ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন তালে নাচিতে আরম্ভ করিল। স্নায়ুতন্ত্রীদিগের এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন তালের নৃত্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের দৃশ্য বেশে দ্রষ্টা জীবদিগের সম্মুখে সাজিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। যদি সূর্য্যের তৈজস পরমাণুগণের নৃত্যলীলা বন্ধ হইয়া যায়, তবে ঈথরের নৃত্যলীলা সেই দণ্ডে বন্ধ হইয়া যায়; ঈথরের নৃত্যলীলা বন্ধ হইলে সেই দণ্ডে জীবগণের চাক্ষুষ স্নায়ুতন্ত্রীর নৃত্যলীলা বন্ধ হইয়া যায়; জীবগণের চাক্ষুষ স্নায়ুতন্ত্রীর নৃত্যলীলা বন্ধ হইলে সেই দণ্ডে দৃশ্যদর্শন বন্ধ হইয়া যায়। তবেই হইতেছে যে, সূর্য্যের তৈজস পরমাণুগণের নৃত্যলীলা বন্ধ হইলেই সেই দণ্ডে পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত জীব অন্ধ হইয়া যায়। অতএব এ-কথা একটুও মিথ্যা নহে যে, সূর্য্য বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু; অথবা যাহা একই কথা—পৃথিবীস্থ সমষ্টি জীবাত্মার চক্ষু।

বুভুৎসু॥ আপনার গোড়া'র কথাটির সঙ্গে শেষের সিদ্ধান্তটির যুক্তির বাঁধুনি যে, কিরূপ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, অতএব তাহা যদি আর-একটু স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলেন তবে ভাল হয়।

প্রবোধয়িতা॥ না-যদি তাহা বুঝিতে পারিয়া থাক'—

তবে তাহা যার পর নাই স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলিতেছি—প্রণিধান কর :—

মূল কথা

যাহার অভাবে যে অন্ধ হয়, তাহাই তাহার চক্ষু।

দেখা কথা।

সূর্য্যের অভাবে পৃথিবীসুদ্ধ জীব—সংক্ষেপে সমষ্টিজীব—অন্ধ হয়।

ফল কথা।

অতএব সূর্য্য পৃথিবীস্থ সমষ্টি-জীবাত্মার, অথবা যাহা একই কথা—বৈশ্বানর আত্মার, চক্ষু।

বুভুৎসু ॥ আমি, তুমি, তিনি প্রভৃতি সকল আত্মাই তো জানি ব্যষ্টি আত্মা। সমষ্টি-আত্মা আবার কোন্ আত্মা?

প্রবোধয়িতা ॥ পরমাত্মা কোনো ব্যষ্টি-আত্মার আকলার জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, সমষ্টি-আত্মার ভোগ-মোক্ষ-সাধনের জন্যই, অথবা যাহা একই কথা—প্রেম এবং জ্ঞানের চরিতার্থতা-সাধনের জন্যই, জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যখন সমস্ত ব্যষ্টি-আত্মা সদ্ভাবে মিলিয়া একাত্মা হইবে, আর সেই গতিকে যখন তাহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সৎসঙ্গ সদালাপ এবং সাধু-ব্যবহারের গুণে তাহাদের সমবেত জ্ঞানপ্রেমের উৎস পরমাত্মার প্রতি অবাধে উন্মুক্ত হইয়া যাইবে, তখনই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করিবে। সেই যে একীভূত সমষ্টি-জীবাত্মা—যাহা সুদূর ভবিষ্যৎ কালে কোনো-না-কোনো সময়ে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবে—তাহা কি বর্ত্তমান কালে আবির্ভূত হইতে বাকি আছে? ভগবদ্-গীতায় আছে—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আপনার বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া বলিয়াছিলেন "এই যে দেখিতেছ দুর্য্যোধনের মহা দলবল—

"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥"

"আমা কর্ত্তৃক ইহারা পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছে—নিমিত্ত মাত্র হও সব্যসাচি।" তেমনি, সেই যে একীভূত সর্ব্বজীবাত্মা যাহার আবির্ভাব ভবিষ্যতে কোনো-না-কোনো সময়ে ঘটিবেই ঘটিবে—পরমাত্মাতে তিনি পূর্ব্ব হইতেই আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন—তাঁহার আবির্ভাব ঘটাইয়া তুলিবার জন্য সাধু মহাত্মাগণের সমবেত প্রার্থনা এবং সাধনা নিমিত্ত মাত্র।

সেই যে পরমাত্মার হৃদয়স্থিত **একীভূত সর্ব্ব-জীবাত্মা**—বৈশ্বানর আত্মা তাঁহারই নাম; তাঁহারই মস্তক—দ্যৌ; চক্ষু—সূর্য্য; প্রাণ—বায়ু; দেহ—আকাশ; জঘন—জল; পদদ্বয়—পৃথিবী; হৃদয় মন ও মুখ—অগ্নি। ইতি টীকা সমাপ্ত।

পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের উপাস্য বৈশ্বানর আত্মার কথা এখানে এই যাহা গাহিয়া রাখিলাম, তাহার আলোকে—পুরাতন গ্রীসে কোন্ কোন্ গ্রীকাচার্য্য সতীদেহের ছিন্না-বয়বের ন্যায় ভারতের ঐ বৈশ্বানর দেবতার কোন্ কোন্ ছিন্ন অবয়বের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার পূজার প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন—কোন্ গ্রীকাচার্য্যই বা স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণাবয়ব বৈশ্বানর দেবতার পূজার প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন—পরবর্ত্তী অধ্যায়-দুটিতে সেই গুপ্ত রহস্যটি ব্যক্ত হইয়া পড়িতে বিলম্ব হইবে না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যুগলা

(কিম্বদন্তী)

ই, আই, রেলওয়ের গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনের ধারে হাজারীবাগ রোড্ ষ্টেসন। এখানে নেমে হাজারীবাগ যেতে হয়। ষ্টেসনের প্রায় এক মাইল দূরে, সরিয়া গ্রাম, সেখানে বিজয় বাবুর বাঙ্গলা। আশে পাশে জনমানব নাই—চারিদিকে কেবল কাঁকর ও পাথর। গাছে পাতা নাই, জমীতে ঘাস নাই। বাংলাদেশের মত প্রকৃতিরাণীর এখানে স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চল নাই। এখানকার প্রকৃতি যেমন নিরাভরণা—রমণীরাও তেমনি নিরাভরণা। বাহির হতে দেখতে উভয়েরই কোথায়ও কোমলতার লেশটুকুও দেখা যায় না। কিন্তু এখানকার ভিতর ও বাহিরের সম্বন্ধটা নিতান্তই খাপ্-ছাড়া বেমানান্। যেখানে কঠোর শিলাখণ্ড—তার নীচে এমন স্নিগ্ধ সুপেয় জল—যার তুলনা বাংলায় নাই; যে ক্ষুদ্র গিরিনদীটি শুষ্ক বালুকাকঙ্করময়ী—সে অন্তঃসলিলবাহিনী।

কয়েক মাস হলো বিজয়বাবুর বাঙ্গলায় এসে রয়েছি। প্রায় একমাইল দূরে বরাকর নদী। মধ্যে মধ্যে বিকালে সেখানে বেড়াতে যাই। নদীটির দুইপাশে ছোট ছোট শালবন; যেখানে শালবন নাই—সেখানে আমলকী, হরিতকী, ধাত্রীপুষ্প, লোধ্র, এবং পলাশ গাছের ভিড়। সব গাছই ছোট। মহুয়া গাছ এখানে বনস্পতি। বন বড় নির্জ্জন—পাখীর স্বরটিও শুনতে পাওয়া যায় না। নদীতে একটুকুও জল নাই—কেবল বালি ও মধ্যে মধ্যে পাথর। যে দিন বৃষ্টি হয়—সেই দিন বহুদূরের ক্রমসঞ্চিত জলরাশি একটা শৃঙ্খলমুক্ত দৈত্যের মত, এক দিনের জন্য তাণ্ডবনৃত্যে নদীটিকে বিধ্বস্ত করে চলে যায়। একদিনের জন্য মাত্র বরাকরে যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা ফেনিল হয়ে ওঠে—সেই দিনটি শেষ হয়ে গেলে—তার বালুকা-পঞ্জরের মধ্যে বেদনাকাতর স্পন্দনের মত অতি শীর্ণ একটা জলের ধারা বয়ে যেতে থাকে।

একদিন বিকালে বরাকরের ধারে একটা আমলকী গাছের নীচে বসে আছি। একদিকে সূর্য্য ডোবে-ডোবে—অন্যদিকে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে-ওঠে। অদূরে শালবনে একটা নীরব মলিনতা ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ছে। এমন সময় কএকটি রাখাল গরুর দল নিয়ে ওপারে যাচ্ছিল। সঙ্গে একটি বৃদ্ধ—সেও রাখাল। অনেকক্ষণ একা চুপ করে থেকে—রাখালদের দেখে—তাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে ইচ্ছা হলো। একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেম—"তোর বাড়ী কোথায়?" সে বল্‌লো "দেলাঙ্গি।" আমি জিজ্ঞাসা করলেম "দেলাঙ্গি কোথায়?" সে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্‌লো যে "ঐ যুগ্‌লা কা ভিঁড়ে"—অর্থাৎ ঐ যুগ্‌লার কাছে। যুগ্‌লাটা যে কি তা না জানাতে—এ পরিচয়ে আমার কিছু মাত্র সাহায্য হলো না। আমি বল্‌লেম "যুগলা কোথায়?" বালকটি হেসে বল্‌লো "বাবু যুগ্‌লা কভিও নাহি দেখ্‌ল্যা! ঐ বর্‌করিয়া-কা ভিতরকা পাথ্‌লা"—যুগলা কখনো দেখ নাই বাবু; ঐ বরাকরের মধ্যের পাথরটি। একটা জায়গায় দেখি বড় বড় পাথর নদীর মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বাঁধের মত হয়ে প্লাবনের জলকে বাধা দিতে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকের বালুরাশি সমতল- তার মধ্যে ঐ পাথরগুলি এক-একটি দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা পাথর খুব বড়। সে দিকে তাকালে, দৃষ্টি প্রথমে তার উপরেই যেয়ে পড়ে। সকলের উপরে তার যেন একটা বিশেষত্ব রাজত্ব কচ্ছে।

মনে করলেম বালকটি আমার অজ্ঞতা দেখে ঠাট্টা কচ্ছে—তাই বৃদ্ধটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেম। সে বল্‌লো "বাবু অহি বড়কা পাথ্‌লা— ওক্‌রা নাক যুগ্‌লা—" বাবু ঐ বড় পাথরটা—ওর নাম যুগলা। মনে হলো এত পাথর থাক্‌তে ও-পাথরটার কেন নামকরণ করা হলো। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেম। সে বললো—"শুনবে বাবু?" এই বলে ছোঁড়াদের বললো "তুহনি যা"—তোরা যা। বালকেরা চলে গেল। বৃদ্ধ এসে আমার পাশে বসলো। তখন পূর্ণিমার চাঁদ অনেক উপরে উঠেছে। জ্যোৎস্না বালুকার উপর ছড়িয়ে পড়েছে—গাছের অন্ধকারের ফাঁক দিয়ে হাজার হাজার জোনাকীর মত জ্বলে উঠেছে। এ পাথরের দেশেও কোকিল আছে। জ্যোৎস্নার প্লাবন দেখে সেও ডেকে উঠ্‌লো। ডাক শুনে একটি রাখাল গেয়ে উঠলো:—

> কোনে বাটে বোলেরে কারি কোইলিয়া,
> কোনে বাটে বোলে বাঁশুলিয়া।
> দেশা বাটে বোলেরে কারি কোইলিয়া,
> বনা বাটে বোলে বাঁশুলিয়া।

"কোন্ পথে কাল কোকিল ডাকে—কোন্ পথেই বা বাঁশি বাজে। গ্রামের পথে কোকিল ডাকে—আর বনের পথে বাঁশি বাজে।" বড় সুন্দর শোনাতে লাগলো। একটা যেন অজানা বেদনার সুর মনের মধ্যে বেজে উঠলো। আমাকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাক্‌তে দেখে বুড়ো বললো—"শুনবে বাবু?" আমি বললেম "শুনবো—বল।" সে বলতে আরম্ভ করলো—

সে অনেক দিনের কথা। আমার বয়স হয়েছে তিন কুড়ি সতের বছর। ছেলে বেলা আমরা আমাদের ঠাকুরদাদার কাছে গল্প শুনেছি। ঐ যে ওপারে ছোট গ্রামখানি—দেখছো—ওর নাম দেলাঙ্গি। এক সময়ে ঐ গাঁয়ে একটি ছেলে ছিল,—তার নাম গুল্‌রা—আর একটি মেয়ে ছিল—তার নাম রুকিয়া। তারা নাকি বড় সুন্দর ছিল। তারা জাতিতে ছিল ঘাটোয়ার। দুজনে

এক-সঙ্গে ছাগল চরাতে যেত—সমস্ত দিন বনে বনে কাটিয়ে দুটিতে একসঙ্গে ঘরে ফিরতো। ফাল্গুন মাসে যখন বন খাইরা ফলে (খাদী পুষ্প) লাল হয়ে যেত, পলাশের ফুলে গাঁছ ছেয়ে যেত, গাছের কচি লাল পাতা ঝালরের মত ঝুলে ঝুলে পড়তো, তখন গুল্‌বা ফল আর পাতা দিয়ে রুকিয়ার কানে এমন "তারপাং" গড়ে দিত—গলায় এমন "হাঁসুলি" ও "খাম্বিয়া" গড়ে দিত—বাহুতে এমন "টাড়," হাতে এমন "কাঙ্গনা" এবং পায়ে এমন সুন্দর "গোড়হা" তৈয়ারি করে দিত—তেমন নাকি সোনা চাঁদিতেও হয় না। এমনি করে দুজনে বড় হয়ে উঠলো। গুল্‌বা যখন জোয়ান হয়ে উঠলো তখন সে একদিন রুকিয়ার বাবার কাছে যেয়ে বল্‌লো যে রুকিয়াকে আমি বিয়ে করবো। রুকিয়ার বাবা বল্লে—"বেশ ত, সে পণের জন্য তিন কুড়ি সাত রুপেয়া—আর একটা গাই—দুইটা খাসি, দুখানা শাড়ী—একখানা কনিয়ার আর একখানা কনিয়ার মার—আর দশ বোতল দারু।" গুলবা বেচারা এত দিন ভেবে এসেছিল—চাহিলেই সে রুকিয়াকে পাবে—কেননা রুকিয়া যে তারই। টাকা, গাই, খাসি, শাড়ী এবং দারুর কথা তার এক দিনও মনে আসে নাই। তার বাপ নিতান্ত গরিব। সম্বল কএকটি গরু ও ছাগল। তার দামই বা কত—বড় জোর কুড়ি টাকা। বেচারা গুলবা একেবারে শুনিয়ে গেল। সে বল্লে, এত টাকা তার তো নাই—এত সে কোথায় পাবে? রুকিয়ার বাবা বললো—তুই না পারিস - কত-জনে পাবে। রুকিয়া দেখতে কেমন সুখাব (সুন্দর)। হতাশ হয়ে গুলবা বললো—আচ্ছা আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করি। রুকিয়ার বাবা বললো—আচ্ছা। সেদিন রাত্রে বাবাকে বলতেই সে বললো—"গুলবা, তুই পাগল হয়েছিস্—এত টাকা কোথায় পাবো। এ বিয়ে হবে না।" তার সারা জীবনের ভালবাসায় যে রুকিয়াকে পাওয়া যাবে না—তা সে একবারও ভাবে নাই। এত ভালবাসার উপরেও যে একটা জিনিষ আছে, যার নাম "রুপেয়া"—যা না হলে রুকিয়াকে পাওয়া যাবে না—এটা তার কাছে বড় অন্যায় বলে মনে হতে লাগলো। একটা দুঃস্বপ্নের মত কথাটা তাকে চেপে বস্‌লো। কিন্তু এটা যে একেবারেই স্বপ্ন নয়—সত্য—অতি কঠোর সত্য।

রুকিয়াও জোয়ান হয়ে উঠেছে। বয়সের সঙ্গে তার রূপও বেড়ে উঠেছে। কত কত জন রুকিয়ার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব কচ্ছে। তারা সকলেই গুলবার চেয়ে ধনী। গুলবা বড় অস্থির হয়ে উঠলো। তার টাকা নাই—সে কেবল ভাবতো কোথায় পাব টাকা। কিন্তু টাকা তো বনে আমলকী হরিতকী যেমন ফলে—তেমন ফলে না। সুতরাং গুলবা কোথায় পাবে? সে ভাবলো—কতজন ঝরিয়া, বরাম্‌, রাণীগঞ্জে কয়লার খাদে রোজগার করতে যায়। তারা কত টাকা আনে। আমিও যাবো—টাকা আনবো। তা হলে তো তাকে পাব। কিন্তু একদিনে তো অত টাকা পাবো না। তিনকুড়ি সাত টাকা—সে কত টাকা—কতদিনের রোজগার তা কে জানে। আমি রোজগার করতে যাব—এর মধ্যে যদি রুকিয়ার অন্যের সাথে বিয়ে হয়ে যায়? বেচারা বড় অস্থির হয়ে উঠলো। সেদিন ছাগল চরাতে যেয়ে সে রুকিয়াকে সব কথা বললো। রুকিয়া বললো যে, বেশ তো—তুমি বেটা ছেলে, যাও না টাকা রোজগার করে আন। গুলবা বললো—তিনকুড়ি সাত টাকা—সে কত দিনে রোজগার হবে? হয়তো এক বৎসরে—হয়তো দুই বৎসরে—এর মধ্যে যদি কেউ তাকে বিয়ে করে নিয়ে যায়। রুকিয়া তার হাতখানি ধরে বললো—তুমি সে ভাবনা করো না। তুমি ফিরে না এলে আমাকে কেউ বিয়ে দিতে পারবে না। যদি জোর করে—তবে কুঁইয়াতে ডুবে মরবো। গুলবা নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো। রুকিয়ার কথায় তার খুব বিশ্বাস। সে সেই দিনই রাণীগঞ্জ চলে গেল।

এক মাস দুইমাস করে একটা বছর কেটে গেল—গুলবা ফিরলো না। রুকিয়া মনে মনে ভাবতো এখনো তার তিনকুড়ি সাত রুপেয়া হয় নাই। কিন্তু এ দিকে কৈরিডির হরখুরাম, সবলপুরার নেমাসিংহ, উরুরোর ভিখিরাম—সকলেই রুকিয়ার পিতার কথামত টাকা ও জিনিষ দিতে প্রস্তুত—হরখুরাম দশ বোতলের উপর আরো সাত বোতল দারু দিতে সম্মত। বুড়া মনে করলো এ সুযোগ ছাড়া হবে না। কিন্তু রুকিয়া একেবারে বেঁকে বসলো। সে বললো, সে এখন কিছুতেই বিয়ে করবে না। সে যখন বিয়ে করবে, তখন করবে। জোর করলে

সে কুঁইয়াতে ডুবে মরবে। মেয়ের ভাব দেখে বুড়ো বুঝলো কথাটা একেবারে অসম্ভব না হতেও পারে। শেষে আঁটা-আঁটি করতে যেয়ে হয়তো সমূলেই যাবে। কাজেই সেও বিয়ের কথা বন্ধ করে দিলো। বরের দল হতাশ হয়ে ফিরে গেলো।

শ্রাবণ মাস—আকাশ মেঘে ঢাকা—থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। গাছপালা সবুজ রংএ সেজে উঠেছে—সবুজ ঘাসে কাঁকরগুলি ঢেকে ফেলেছে। এমনি দিনে গুলবা আবার দেশে ফিরে এলো। তার কোমরে গেঁজে ভরা টাকা! গুলবা বাড়ী গেল না। আগে গেল রুকিয়াদের বাড়ী। রুকিয়ার বাবা তখন জোনরা তুলছে। গুলবা বললো—তুমি যা চেয়েছ সব দেব! সেই সময়েই বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল।

বুধবারে সরিয়াব হাট। দুদিন হতে বৃষ্টি হচ্ছে—তেমন বৃষ্টি কতকাল হয় না। বৃষ্টি হ'লে কি হয়—সপ্তাহে এক দিন হাট—তা না করলে গৃহস্থের চলে না। তাই বৃষ্টি মাথায় করে সকলে হাটে যাচ্ছে। বরাকরে তখনও বান নামে নাই—কিন্তু আসারও দেরি নাই। যারা পার হয়ে যাচ্ছে তারা বলাবলি কচ্ছে, যে, যদি ফেরবার আগে বান এসে পড়ে, তা হ'লে সরিয়াতে আটকা পড়তে হবে। এই ভয়ে সকলেই তাড়াতাড়ি হাট করে ফিরছে। গুলবার বিয়ের হাট—অনেক জিনিষ কিনতে হবে। চাল, ডাল, নুন, তেল, হলদি, মশলা, শাড়ী সব কিনতে হবে। সাথে যাচ্ছে রুকিয়া। আজ তাদের কত আনন্দ।

অনেক জিনিষ কিনতে হলো—তাই হাট করে ফিরতে তাদের দেরি হয়ে গেল। ওপারের প্রায় সব লোকই চলে' গেছে। আর তারা ইচ্ছা করেই দল ছেড়ে দুটিতে যাচ্ছে। যেতে যেতে গুলবা তার দু'বৎসর বিদেশবাসের কত কাহিনী রুকিয়াকে শোনাতে লাগলো। দুজনে নদীতে নেমে বালুর উপর দিয়ে ঠিক মাঝখানে যখন এসেছে—তখন একটা ভয়ঙ্কর শব্দ তাদের কানে গেল। চেয়ে দেখে বাঁকের মাথায়, প্রায় ১০০ হাত দূরে, বান এসে পড়েছে। দশহাত উঁচু একটা দেয়ালের মত হয়ে, লাল জল, গাছ পাথর মুখে করে, তাদের গ্রাস করতে ছুটে আসছে। তখন এ-পারে ফিরে আসবারও সময় নাই, ওপারে যাবারও সময় নাই। রুকিয়া গুলবার হাত ধরে বললো, "গুলবা, মলেম।" গুলবা বললে "ভয় নাই—চল ঐ পাথরের উপর উঠি।" দুজনে দৌড়ে গিয়ে যেই একটা উঁচু পাথরের উপর উঠলো, অমনি বানের জল—তাদের পাথরটি ঘিরে, গর্জ্জন করতে লাগলো। পাথরে ঠেকে জলগুলি ভেঙ্গে, চুরে, ছিটিয়ে, ফেনিয়ে, তাদের দুটিকে গ্রাস করবার জন্য ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। দুটিতে হাত ধরাধরি করে, মরণের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, ভাবতে লাগলো, এ জন্মের মত বিয়ে বুঝি এখানেই। কিন্তু জল অত করেও তাদের কাছে পৌঁছাতে পারলো না।

বৃষ্টি আর ধরে না। যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। পারাপার বন্ধ—কার সাধ্য জলের সে তোড়ের মুখে দাঁড়ায়? ক্রমে দুই পারে লোক জমতে লাগলো। এদেশে নৌকা নাই, লোকে সাঁতারও জানে না। জানলেই বা কার সাধ্য, সাঁতার দিয়ে যেয়ে তাদের কোন সাহায্য করে! দিনটুকু কেটে গেল—রাত্রি এল। সেই দুই বন্দী সেখানেই সারা রাত বসে বসে ভিজে শীতে অবসন্ন হয়ে পড়লো। ভোরে আবার সব গ্রামের লোক এসে জুটলো। গুলবা ও রুকিয়ার বাবারাও এলো। কিন্তু সকলেই নিরুপায় হয়ে কেবল বসেই থাকলো। বৃষ্টি পড়তেই লাগল—বানের জল তেমনি ফুলে ফুলে, গর্জ্জে গর্জ্জে যেতে লাগলো। আবার দিন শেষ হয়ে রাত এল। শীতে রুকিয়া প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, গুলবা জোয়ান—সে এখনও তত কাতর হয় নাই। রাত্রি ভোর হয়ে গেল,—তবু বৃষ্টি থামে না। গ্রামের লোক আবার এসে জুটলো। তখন পরামর্শ হলো, এ বৃষ্টি যে-সে বৃষ্টি নয়—এ কোন দেবতার রোষে হচ্ছে। জলদেবতাকে সন্তুষ্ট না করলে এ বৃষ্টি বা বান যাবে না। দেবতা ও ভূতের বিষয়ে পণ্ডিত—গ্রামের "চেটি"কে ডাকা হলো। সে এসে বললো জলদেবতার পূজা দিতে হবে। পূজা দেওয়া হলো কিন্তু বৃষ্টি থামলো না। চেটি ডেকে বললো "গুলবা, যদি বাঁচতে চাস্, তবে নূতন কাপড়গুলি জল-দেবতাকে দে।" গুলবা তৎক্ষণাৎ কাপড়গুলি জলে ফেলে দিল। কিন্তু তবু বৃষ্টি থামে না। চেটি আবার বললো, "তোর চাল ডাল সব দে যদি বাঁচতে চাস।" গুলবা সব

জলে ফেলে দিল কিন্তু তবু বৃষ্টি সমানে পড়তে লাগলো। সকলে হতাশ হয়ে পড়লো—কিন্তু চেটি হলো না। সে বললো "এ বড় কঠিন দেবতা, প্রাণ না দিলে এর কাছে প্রাণ বাঁচবে না।" সে আবার ডেকে বললো, "গুলবা যদি বাঁচতে চাস্—তা হলে রুকিয়াকে নদীতে ঠেলে ফেলে দে।" ঘৃণায় গুলবার মুখ লাল হয়ে উঠলো। সে রুকিয়ার সংজ্ঞাহীন শরীর জোরে বুকে এঁটে ধরলো। রুকিয়া একবার চোক মেলে চেয়ে বললো, "কি হয়েছে গুলবা?" চেটির কথা মিথ্যা হয় না—গুলবাও তা জান্তো। সে বললো "চেটি বলে একজন জলে ডুবে না মরলে, আর একজনের রক্ষা নাই। তা রুকিয়া আমিই ডুবে মরবো। আমিই তোকে বলে গিয়েছিলাম, তাই তুই দুই বৎসর আমার অপেক্ষায় ছিলি। তা না হলে, তোর কবে বিয়ে হয়ে যেত। তোকে তো তা হলে আমার সঙ্গে এসে এমন বিপদে পড়তে হতো না। আমারি মরা চাই। আমি মলে তুই হরখুবামকে বিয়ে করিস্—তার অনেক টাকা।" রুকিয়া শীতে অনাহারে একেবারে অবসন্ন—গুলবার কথার উত্তরে কথাটি বলবাব তার শক্তি নাই। সে কেবল তার দুর্ব্বল ঠাণ্ডা হাতখানি দিয়ে গুলবার হাতখানি ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। গুলবা ধীরে ধীরে তার হাতখানি খুলে নিল। নিয়ে বললো "হে দেবতা, আমাকে নাও—ওকে বাঁচাও।" তারপর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। এক মুহূর্ত্তের জন্য রুকিয়া সবল হয়ে উঠলো। সে বললো, "দেবতা যদি নেবে, তবে দুজনকেই নাও।" এই বলে সেও জলে গিয়ে পড়লো। গুলবা জলে পড়েই ডুবে গিয়েছিল। যখন উঠলো তখন দেখে রুকিয়া জলের মধ্যে। অমনি সে রুকিয়াকে ধরে ফেল্লো। কেউ সাঁতার জানে না—সুতরাং প্রাণের আশা কারো থাকলো না। জলের দেবতা একটির জায়গায় দুটি বলি পেয়ে যেন পাগল হয়ে উঠলো—দুটিএর মাথার উপরে তুলে—তাদের এ-পাথর হতে ও-পাথরে ছুড়ে ফেলতে লাগলো। একটু পরে আর কাহাকেও দেখা গেল না—তীরের লোকেরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যার যার ঘরে ফিরে গেল।

চেটির কথা কখনো মিথ্যা হয় না। তারপর দিন সত্যসত্যই বৃষ্টি থেমে গেল—বরাকরের বান সরে গেল! কঙ্কালের মত বালি ও পাথর বাহির হয়ে পড়লো। গ্রামের লোকেরা এসে দেখলে, ঐ বড় পাথরটার উপরে তারা দুজনে হাত ধরাধরি করে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখে গুলবা মরে গেছে, রুকিয়া তখনো বেঁচে আছে কিন্তু তার জ্ঞান নাই। চেটির কথা একেবারে সত্য হয়ে গেল। রুকিয়াকে নিয়ে সকলে বাড়ী গেল—কিন্তু তার আর জ্ঞান হলো না। অজ্ঞান অবস্থায় সে কেবল তাদের শেষ কথাগুলি ফিরে ফিরে বলতে লাগলো। দু'দিন পরে রুকিয়াও মরে গেল। তারা যে দুজনে ঐ পাথরটার উপর পড়েছিল—সেই জন্য, সে দিন হতে সকলে ও-পাথরটাকে "যুগলা" বলে। শুনতে পাই জ্যোছনা রাত্রে তারা দুজনে কখনো কখনো নাকি এসে ঐ পাথরের উপর বসে থাকে।

বুড়োর কথা আর আমার কানে গেল না। আমার চোখের সামনে—বরাকরের সেই উন্মাদনৃত্যের মধ্যে—সেই প্রেমিক যুগলের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো।

বুড়ো বল্লো "রাত অনেক হয়েছে বাবু, তুমি ঘরে যাও—আমিও যাই।" বুড়ো চলে গেলো।

আমিও ঘরে ফিরে এলাম। কএকদিন ধরে বুকের মধ্যে একটা করুণ বেদনা ঘুরে ফিরে কাঁদতে লাগলো।

শ্রীকিশোরীলাল দাসগুপ্ত।

আওরঙ্গজেবের টাঁকশাল

মুহীউদ্দীন মহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর গাজী বাদশাহের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য অপর সমস্ত মোগল বাদসাহের রাজ্যকাল অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, আফ্‌গানিস্থানের কিয়ৎ অংশ পারস্যের সাফাবি রাজবংশ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও মোগলসাম্রাজ্যের বিশেষ কোন হানি হয় নাই, কারন দক্ষিণাপথে গোলকন্দা ও বিজাপুর রাজ্য আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের নানাস্থানে বাদসাহের নামে সুবর্ণ রজত ও তাম্র মুদ্রাঙ্কিত হইত। আওরঙ্গজেবের

সুবা বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায় নিম্নলিখিত স্থানে টাঁকশাল ছিল ;—

১। আকবরনগর। আকবর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইলে রাজমহল আকবরনগর নামে অভিহিত হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বকাল হইতে আওরঙ্গজেবের পুত্র প্রথম শাহ্ আলমের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত আকবরনগরে টাঁকশাল ছিল।

২। ইস্‌লামাবাদ বা চট্টগ্রাম। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাঙ্গালার সুবাদার সায়েস্তা খাঁ ফিরিঙ্গী-জলদস্যুগণের সাহায্যে আরাকান-রাজের নিকট হইতে চট্টগ্রাম জয় করিয়া লইয়া দক্ষিণ বঙ্গে মগ জলদস্যুগণের পথরোধ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে চট্টগ্রাম ইস্‌লামাবাদ নামে অভিহিত হইতেছে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল হইতে দ্বিতীয় শাহ্ আলমের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে টাঁকশাল ছিল।

৩। কটক-উড়িষ্যায় এই একটিমাত্র টাঁকশাল ছিল, সাজাহানের রাজত্বকাল হইতে আহমদ সাহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এই টাঁকশালে মুদ্রাঙ্কন হইয়াছিল।

৪। জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকা মুসলমান-অধিকারকালে ইতিহাসে জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল হইতে দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ঢাকায় টাঁকশাল ছিল।

বঙ্গালা অর্থাৎ গৌড়। আকবর বাদসা বঙ্গালাদেশ জয় করিবার পরে বঙ্গালা নামে গৌড়নগরে মুদ্রা মুদ্রিত হইত, আইন্-ই-আকবরীতে এই নামের টাঁকশালের উল্লেখ আছে। গৌড় হইতে ঢাকা এবং ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে গৌড়ে মুদ্রাঙ্কন বন্ধ হইয়া যায়।

৫। পাটনা বা আজিমাবাদ। আকবরের রাজত্বকাল হইতে দ্বিতীয় শাহ্ আলমের রাজত্বকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব সংগ্রহের ভার প্রদানকাল পর্য্যন্ত পাটনায় টাঁকশাল ছিল।

৬। মখসুসাবাদ বা মুর্শীদাবাদ। দেওয়ান মুর্শীদ কুলীখাঁ আওরঙ্গজেবের পৌত্র বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার আজীম উস্‌সানের সহিত বিবাদ করিয়া ঢাকা হইতে মখসুসাবাদে চলিয়া আইসেন। এই সময় হইতে মখসুসাবাদে টাঁকশাল স্থাপিত হয়। ১১১৫ হিজিরাব্দে আওরঙ্গজেবের ৪৮ রাজ্যাঙ্কে (১৭০৩ খৃষ্টাব্দে) মখসুসাবাদে মুদ্রিত একটিমাত্র রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮১৭ ও ১১১৮ হিজিরাব্দে (১৭০৫—৬ খৃঃ অঃ) মুদ্রিত মুদ্রায় মুর্শীদাবাদ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭০৫ হইতে ১৭৬৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মুর্শীদাবাদই বাঙ্গালার প্রধান টাঁকশাল ছিল। ১৭৬৪ খৃঃ অঃ পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার টাঁকশাল হইতে যে-সমস্ত মোহর টাকা বা পয়সা মুদ্রিত হইত তাহাতে কলিকাতার পরিবর্ত্তে মুর্শীদাবাদই লেখা থাকিত। ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মোহর ও টাকায় সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ও মুর্শীদাবাদ টাঁকশালের নাম মুদ্রিত হইত।

গত বৈশাখ মাসে লালবাজারে এক পোদ্দারের দোকানে দুই আনা মূল্য দিয়া দুইটি নারায়ণী পয়সা খরিদ করিয়াছিলাম। কোচবিহার রাজ্যের প্রাচীন মুদ্রার নাম নারায়ণী মুদ্রা। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজা নরনারায়ণ এই মুদ্রা প্রচলন আরম্ভ করেন। নারায়ণী মুদ্রা সুবর্ণ রজত পিত্তল ও তাম্র সকল-প্রকার ধাতুতে মুদ্রিত হইয়া থাকে। নরনারায়ণ, তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, ও নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবনারায়ণের পুরা টাকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোচবিহার রাজ্যের বিবরণ প্রণেতা স্বর্গীয় রায় কালিকাদাস বাহাদুর বলিয়া গিয়াছেন যে মোগল সম্রাট আকবরের আদেশে কোচবিহারের টাঁকশালে পুরা টাকা মুদ্রণ বন্ধ হইয়াছিল। সেই অবধি কোচবিহারের টাঁকশালে কেবল নিমমোহর (Half-Muhar) ও আধুলি মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। লালবাজারে যে দুইটি মুদ্রা খরিদ করিয়াছিলাম সে দুইটি কোচবিহারের নারায়ণী আধুলি। একটি কোচবিহারের বর্ত্তমান মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের টাকা, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। দ্বিতীয়টি নূতন প্রকারের মুদ্রা, ইহার আকার ও ওজন নারায়ণী মুদ্রার ন্যায় কিন্তু ইহাতে কোচবিহারের

কোন রাজার নাম নাই। ইহার ব্যাস ০·৫ ইঞ্চি।
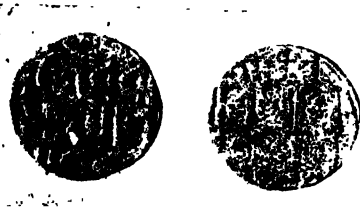
ইহাতে প্রত্যেকদিকে চারি পংক্তি লেখা আছে—

প্রথম দিক।

১। [আ] ওর
২। ঙ্গজেব ব[া]
৩। [দ] সাহ আল
৪। [ম]গির

দ্বিতীয় দিক।

১। জরব
২। [আ]লমগি
৩। [র] নগর
৪। [সং] বং

লিপি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে মুদ্রাটি মোগল বংশের ষষ্ঠ বাদসাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহের মুদ্রা। অদ্যাবধি ভারতবর্ষে আওরঙ্গজেবের যত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটিতে বাঙ্গালা নগরী অথবা কোন দেশীয় বর্ণমালা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এই মুদ্রাটি ব্যতীত আওরঙ্গজেবের সমস্ত মুদ্রাই পার্শী অক্ষরে লিখিত। মুদ্রাটির দ্বিতীয় দিকে প্রথম যে শব্দটি লিখিত আছে তাহা আরবিক ভাষার শব্দ। "জরব" অর্থ আঘাত করা (Struck), তাহা হইতে পরবর্তী পারসিক ও আরবিক ভাষায় ইহার অর্থ হইয়াছে "মুদ্রাঙ্কিত"। মুসলমান বিজয়ের পরে ভারতবর্ষে আরবিক ও পার্শী ভাষায় যত মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে সেই সমস্ত মুদ্রাতেই টাঁকশালের নামের পূর্ব্বে এই শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিয়ম অনুসারে যে টাঁকশালে এই মুদ্রাটি মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার নাম আলমগীরনগর। অদ্যাবধি আলমগীরনগর টাঁকশালে মুদ্রাঙ্কিত কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে শাহ সুজা দিল্লির সিংহাসন অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ মোগলসম্রাটের দূতকে অপমান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রী ভবনাথকে সসৈন্যে একজন বিদ্রোহী জমিদারকে ধরিয়া আনিতে মোগল সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রাণনারায়ণের মন্ত্রী ভবনাথ এবং আসামের রাজা জয়ধ্বজ সিংহ কামরূপ অধিকার করিয়া কামরূপের ফৌজদার মীর লুৎফ-উল্লা সিরাজীকে গৌহাটী হইতে ঢাকায় পলাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃবিরোধে আওরঙ্গজেব জয়লাভ করিলে ১৬৬১ শালে বাঙ্গালার সুবাদার নবাব মীরজুমলা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা প্রাণনারায়ণ ভুটানে পলায়ন করেন এবং কোচবিহার রাজ্য নবাব মীরজুমলা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। এই সময়ে কোচবিহার নগরের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া আলমগীরনগর হইয়াছিল।

"Koch Bihar was thus annexed. The name of the town was changed to Alamgirnagar. Isfandiar Beg received from his Majesty the title of Khan and was to officiate as Faujdar of the country till the arrival of Askar Khan, who had been appointed to that office."—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1872, Pt I, page 68.

Mir Jumla made his way into Kuch Bihar by an obscure and neglected highway. The advance was very slow, as the dense bamboo groves had to be cleared to make a way. In six days the Mughal army reached the capital (19th December), which had been deserted by the Rajah and his people in terror. The name of the town was changed to Alamgirnagar, the Muslim call to prayer, so long forbidden in the city, was chanted from the lofty roof of the palace, and a mosque built by demolishing the principal temple.—Prof. J. N. Sarkar's History of Aurangzib, Vol. III, page 180.

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরজুম্লা কোচবিহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। কোচবিহার জয়ের পরে ১৬ দিন তথায় অবস্থান করিয়া তিনি ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে কোচবিহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে এক বৎসর কাল মাত্র কোচবিহার রাজ্য মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। নবাব মীরজুম্লা যখন আসাম হইতে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন কোচবিহারের পরাজিত মোগল-সৈন্য নবাবের জন্য ঘোড়াঘাটে অপেক্ষা

করিতেছিল। ইহার পরে কোচবিহার রাজ্য আর কখনও মোগলসাম্রাজ্য-ভুক্ত হয় নাই। সুতরাং আলমগীরনগর টাকশালের এই মুদ্রাটি ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে ১৬৬৩ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছিল। অতএব হিজরি ১০৭২ অথবা ১০৭৩ অব্দে এই মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল। মুদ্রার দ্বিতীয় দিকে "সংবৎ" শব্দটির পরে এই দুইটি অঙ্কের একটি লিখিত ছিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্জিকা সংস্কার

পৃথিবীর বিষুবরত্তের সমতল, যে দুই বিন্দুতে দৃশ্যমান রবিমার্গকে ছেদ করিয়াছে, তাহাদিগকে দুই ক্রান্তি বলে, যথা মহাবিষুব ক্রান্তি ও জলবিষুব ক্রান্তি। অধুনা ৮ই চৈত্র সূর্য্য মহাবিষুবক্রান্তিতে উপস্থিত হইলে, সমুদায় দেশে সমদিবারাত্র হয়। এই বিন্দু এখন মেষরাশি হইতে ২১°।১৫ একুশ অংশ পনর পল পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়া মীনরাশির নবম অংশে আসিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের অয়নাংশ ২১।১৫ পল। এই বিন্দু হইতে পাশ্চাত্য দেশসকলে গ্রহ-নক্ষত্রগণের দূরত্ব লিখিত হয়। আমাদের পঞ্জিকায় মেষরাশি হইতে গ্রহগণের দূরত্ব দেখান হয়। পাশ্চাত্যদেশের মানমন্দিরে মহাবিষুবক্রান্তি মাধ্যাহ্নিক রেখা (Meridian) পার হইলে, কতক্ষণ পরে কোন্ গ্রহ বা নক্ষত্র উক্ত রেখায় আগমন করে তাহা দেখান হয়। ইহাকেই তাহাদের বিষুবাংশ (Right Ascension) বলে; যথা গ্রীনউইচের নাবিক-পঞ্জিকায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই বা ১৩২৩ সালের ৪ শ্রাবণ, বুধগ্রহের বিষুবাংশ দেওয়া আছে ৭ ঘণ্টা ১৯ মিনিট। এই সময়কে স্থূলতঃ ডিগ্রি বা অংশে পরিণত করিয়া, তাহা হইতে অয়নাংশ (Precession of Equinoxes) বাদ দিলে ২ রাশি ২৮ অংশ ৫৬ পল পাইব। আর গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকায় ১৩২৩ সালের ৪ঠা শ্রাবণ বুধের অবস্থান দেওয়া আছে ২ রাশি ২৯ অংশ ৩২ পল। নাবিক-পঞ্জিকা ও গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকার গণনায় এস্থলে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য গ্রহের অবস্থান তুলনা করিয়া দেখা যাইতেছে:—

গ্রহ ১৯১৬ সালের ২০শে জুলাই। ৪ঠা শ্রাবণ ১৩২৩

	নাবিক-পঞ্জিকার মতে অবস্থান	গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকার মতে—
বুধ	২।২৮।৫৬	২।২৯।৩২
শুক্র	২।১২।৫১	২। ৬। ৭
মঙ্গল	৫। ৭।৪২	৫। ৫। ৯
বৃহস্পতি	০।১০। ৮	০।১১।৩৮
শনি	৩। ১।৪৮	৩। ০।২২

বুধ বৃহস্পতি ও শনির অবস্থান সম্বন্ধে উভয় মতে কিয়ৎ-পরিমাণ সাদৃশ্য আছে; কিন্তু শুক্র সম্বন্ধে উভয় মতে সাড়ে ছয় অংশের অধিক প্রভেদ দেখা যাইতেছে। মঙ্গল সম্বন্ধে আড়াই অংশের অধিক প্রভেদ। কোন্ গণনা ঠিক্; নাবিক-পঞ্জিকার, না গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার?

শুক্র গ্রহের গতি সহজদৃষ্টিতেই আমরা জানিতে পারি। গত জ্যৈষ্ঠমাসে অতিশয় গরম পড়িয়াছিল ও সেই সময় আকাশ বেশ মেঘশূন্য থাকিত। তখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া রাত্রিতে বাহিরে থাকিতে হইত। সন্ধ্যাকালে পশ্চিমাকাশে শুক্র ও শনি দুই উজ্জ্বল গ্রহ পরিদৃষ্ট হইত। প্রথমে শুক্র শনির পশ্চিমে ছিল, শুক্র ক্রমে ক্রমে শনি-গ্রহের নিকটবর্ত্তী হইয়া অবশেষে ১০ই জ্যৈষ্ঠ বা ২৩শে মে উভয়ে একত্র হয়। নাবিক-পঞ্জিকায় ঐ দিনই উভয়ের একত্র হইবার কথা লেখা আছে, কিন্তু গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিলাম যে শুক্রগ্রহ ঐ দিন শনিগ্রহের সাড়ে তিন অংশের অধিক পশ্চিমে অবস্থান করিতেছে। আমরা আরও দেখিতে পাইলাম যে শুক্র দিন দিন শনিকে ছাড়াইয়া পূর্ব্বদিকে আসিতে লাগিল, আমাদের পঞ্জিকাতে দেখি শুক্রের অবস্থান শনির পশ্চিমেই আছে; তাহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতেছে, কিন্তু একত্র হইল না। আমরা যাহা চক্ষে দেখিলাম, নাবিক-পঞ্জিকাতেও সেইরূপ গণনা আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সহিত আমাদের পঞ্জিকার পার্থক্য এবার অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বেঙ্গলী সংবাদপত্রে এসম্বন্ধে দুইখানি পত্র দেখিতে পাইলাম। উভয় পত্রেই আমাদের পঞ্জিকা সংস্কার করা আবশ্যক বলা হইয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের পঞ্জিকায় অনেক ভ্রমপ্রমাদ প্রবেশ করিয়াছে।

পঞ্জিকা কিরূপে সংস্কার হইবে? যাহারা পঞ্জিকা লিখেন, তাঁহারা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। তাঁহাদের মূলগ্রন্থে যাহা আছে, তাহাই ধ্রুবসত্য মনে করেন।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে গ্রহগণের যে ভগণকাল দেওয়া আছে তাহার সহিত পাশ্চাত্য জ্যোতিষের গ্রহগণের সূর্য্য-প্রদক্ষিণকালের প্রায় মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মতে শুক্রের ভগণকাল ২২৪.৬৯৮৯১ সৌরদিন, আর পাশ্চাত্যমতে ২২৪.৭০০৭৮৬৯ সৌরদিন। প্রভেদ অতি সামান্য। তবে পঞ্জিকার গণনায় এত প্রভেদ কোথা হইতে আসিল?

জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিবাদ বা মতভেদ অধিকদিন থাকিতে পারেনা, কেননা, এস্থলে প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র। যথা,

"বিফলান্যন্যশাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলম্।

সফলং জ্যোতিসং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥"

জ্যোতিষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করা চলে। এই উপদেশবাক্য অবলম্বন করিয়া পঞ্জিকার সংস্কার করা আবশ্যক হইয়াছে। এ শাস্ত্রে দেশাচার বা প্রথার কোন সম্মান নাই। পূর্ব্বসিদ্ধান্তগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সংশোধন করিতে হইবে। আমাদের জ্যোতিষের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। এখন কি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিব যে পৃথিবী স্থির আর সূর্য্য রাশিচক্র-পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। উরেনাস ও নেপ্‌চুন নামে দুইটি গ্রহ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা কিরূপে আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান। শনির চক্র ও বৃহস্পতির উপগ্রহগণকে আমরা সামান্য দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পাই, কিন্তু আমাদের জ্যোতিষে ইহাদের উল্লেখ নাই। গ্রহগণের দূরত্ব ও পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে, অনেক নক্ষত্রেরও দূরত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে; এই সব সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা দেশে জ্যোতিষের সবিশেষ আলোচনা নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে, কবিত্বে, রাজনীতি-শাস্ত্রে, আইন-শাস্ত্রে, পদার্থ-বিজ্ঞানে, এবং বাগ্মিতায় বাঙ্গলাদেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; কিন্তু আমাদের জ্যোতির্বিদ্যার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। মান্দ্রাজে ও বম্বেতে মান-মন্দির আছে, কলিকাতায় মানমন্দির নাই। কলিকাতায় একটি জ্যোতিষ-সমিতি (Astronomical Society of India) আছে। এই সমিতি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্থাপিত হইয়াছে। জ্যোতিষের দিকে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এই সমিতি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। প্রধানতঃ ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক এই সমিতি পরিচালিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা আমাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সংস্কারের সম্ভাবনা নাই। গত বৎসর বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কথা উঠিয়াছিল; এই বিদ্যার উন্নতিকল্পে নানারূপ জল্পনা কল্পনা হইয়াছিল। কিন্তু পরিষদ বা সম্মিলন কি প্রণালীতে জ্যোতিষের সংস্কার বা উন্নতি সাধন করিবেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ এখনও সাধারণে জানিতে পারে নাই। অঙ্কশাস্ত্র বা গণিত বা জ্যোতিষের জাতিধর্ম্ম স্বদেশ বা বিদেশ নাই। বার্লিন, চিকাগো, প্যারিস বা গ্রীনউইচে যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা সমুদায় পৃথিবীতে প্রচলিত হইতেছে। ইটালীবাসী খৃষ্টান গ্যালিলিও কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যদি ব্যবহার করি, তাহাতে আমাদের উপকার বই অপকার হইতে পারে না। গণিত জ্যোতিষের যতটুকু উন্নতি ভিন্ন দেশে সাধিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করায় আমাদের ক্ষতি কি? তার পর যদি সম্ভব হয়, আমরা আরও ইহার উন্নতি করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারি। জ্যোতিষশাস্ত্র ভারতের সীমায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষে অ-দৃষ্ট বলিয়া বর্ত্তমান সনের ৩১শে আষাঢ়ের চন্দ্রগ্রহণ এবং ১৪ই শ্রাবণের সূর্য্যগ্রহণের উল্লেখ আমাদের পঞ্জিকায় নাই। আর নাবিক-পঞ্জিকায় সমগ্র পৃথিবীর খবর আছে।

জ্যোতিষ বলিলে, আমরা ফলিত জ্যোতিষ বুঝি; সেইজন্যই আমাদের এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, আমরা বিদেশীর নিকট যাইতে পারিতেছি না। আমাদের পঞ্জিকার ফলিত জ্যোতিষ ছাড়িয়া দিলে, তাহাতে বড় কিছু অবশিষ্ট থাকে না। পশ্চিম ভারতে ও উড়িষ্যায় ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা বাপুদেব ও মহাত্মা চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক দেশীয় ভাবে জ্যোতিষের কিছু কিছু সংস্কার হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে নূতন ধরণের পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে;

কিন্তু সে পঞ্জিকা আমরা অগ্রাহ্য করিতেছি। আমাদের পূর্ব্বাপর যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল মনে করিতেছি।

কিরূপে আমাদের জ্যোতিষের সংস্কার করা যাইতে পারে, ইহা এক জটিল সমস্যা হইয়াছে। সত্বর ইহার মীমাংসা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সহিত যখন গণনার ফল মিলিতেছে না, তখন সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। যদি নাবিক-পঞ্জিকার গণনা লইয়া হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র সংশোধন করিতে আমাদের আপত্তি থাকে, তবে এদেশে ত্বরায় মানমন্দির নির্ম্মাণ করা ও আকাশ পর্য্যবেক্ষণের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়াছে। বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে বিদ্যোৎসাহী বদান্য মহারাজা সার মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী বাহাদুর পঞ্জিকা-সংস্কারের জন্য মানমন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাহার কি উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে?

শ্রীকৃষ্ণলাল সাধু।

পঞ্চশস্য

গোর্কির বাল্যজীবন—

প্রসিদ্ধ রুস-উপন্যাসিক ম্যাক্সিম গোর্কির স্বরচিত বাল্যজীবনী 'My Childhood' নিউইয়র্কের 'The Century Company' কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের অতি শিশুকাল হইতে সতেরো বৎসরের জীবনকাহিনী পাঠ করিলে তাঁহার সরলতা, রুস-জীবনের আচার-ব্যবহার-নির্ম্মমতা ও বিষাদভারাক্রান্তদিগের খোলা সত্য চিত্র দেখিয়া প্রাণে ভীতি জাগে, অথচ এমন কৌতূহলোদ্দীপক যে, এতবড় একখানি পুস্তক পাঠে আগ্রহ কোথাও এতটুকু সঙ্কুচিত হয় না। গোর্কি বলিতেছেন "রুসজীবনের এইসব ভীতি বেদনা ও লজ্জাকর ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলাই সঙ্গত; কারণ এ সত্য— সমাজ হইতে এখনো ইহার উচ্ছেদ হয় নাই—এ ঘটনার মূল অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্মৃতি মন ও যাপিত সঙ্কীর্ণ জীবন হইতে ইহাদের সমূলে উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।"

আরো একটি কারণ আছে যাহাতে বাধ্য হইয়া লেখককে এইসব ভীতির কথা বর্ণনা করিতে হইয়াছে। যদিও এত জঘন্য এই-সব প্রথা, যদিও ইহাতে কত উৎসাহভরা প্রাণকে একেবারে দমাইয়া ফেলে, তবুও রুসেরা অন্তরে এমন স্বাস্থ্যপূর্ণ ও সরস যে, তাহারা এই বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়া উঠিতে পারে ও ওঠে।

'আমাদের এই বিচিত্র জীবনে শুধু যে পশুভাবই ফুটিয়া ওঠে তাহা নহে, সেই সঙ্গে উজ্জ্বল সুস্থ এবং বিচিত্র ধরণের মানবতা আমরা পাই—তাহা আশার সঙ্কেতে সম্মুখে মুক্তির মুক্ত ক্ষেত্র দেখাইয়া দেয়, যথায় আমরা মানুষের মতো শান্তিতে বাস করিতে পারিব।' বই-খানির মধ্যে গোর্কির দিদিমার চরিত্র প্রধান—গোর্কির জীবন তাঁহার সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ—তিনি গোর্কিকে গল্প শুনাইতেন, প্রায়ই পানে মত্ত হইয়া পড়িতেন, তবু সেই প্রেম-হিংসা-দ্বেষ-নির্ম্মমতা-জনম-মরণ-ভরা সংসারের সর্ব্বরসের উৎস ছিলেন তিনি।

অনেক স্থানে পাঠক খোলাখুলি সত্য চিত্র দেখিয়া চমকিয়া উঠিবেন, কিন্তু এই-সমস্ত নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ চিত্তচমকপ্রদ কাহিনী পাঠ করিতে একবারও চোখের ও মনের পর্দ্দা সঙ্কুচিত করিতে পারিবেন না। বইখানি পাঠ শেষ হইলে রুসচরিত্র আমরা অনেকটা স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

* *
*

জর্ম্মান সাহিত্যের ইংরেজী সংস্করণ—

নিউইয়র্কের 'The German Publication Society' কুড়ি ভলুমে খ্যাতনামা জর্ম্মান সাহিত্যিকগণের পুস্তকগুলির ইংরেজী অনুবাদ বর্ত্তমান বর্ষে প্রকাশ শেষ করিয়াছেন। এই কার্য্যে প্রধান সম্পাদক ছিলেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক; সহযোগীদিগের মধ্যে হুগো মুণ্ডাবার, এডমণ্ড ভনম্যাক, ক্যালভিন টমাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম ভলুমে প্রকাশিত হয় গেটের গ্রন্থাবলী। বার্লিন ইউনিভার্সিটির রিচার্ড মেয়ার সমস্ত সংস্করণের সাধারণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, এবং কলোম্বিয়ার অধ্যাপক টমাস, কবি গেটের সুন্দর জীবনী লিখিয়াছেন।

সম্পাদকগণ ভূমিকায় লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য এ নহে যে সমস্ত জর্ম্মান সাহিত্য তাঁহারা দেশবাসীকে উপহার দিবেন—শুধু যাহা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জর্ম্মান সাহিত্য নামে পরিচিত তাহারই সহিত দেশবাসীর পরিচয় করিয়া দেওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা। সেইজন্য এ সিরিজ আরম্ভ হইয়াছে গেটে ও সিলারকে লইয়া,—পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগকে এ সিরিজভুক্ত করা হয় নাই।

সম্পাদকগণের বিশ্বাস যে, এই সিরিজেই সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় এ যুগের জর্ম্মান সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। উনবিংশ শতাব্দীর জর্ম্মান সাহিত্যিকদিগের মধ্যে গেটে, সিলার, হাইনি, হামবোল্ট, ফ্রেটোগ, সোপেনহাওয়ার, নিটসে, সাদারম্যান প্রভৃতি জনকয় ছাড়া অপর জর্ম্মান সাহিত্যিকগণ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেইজন্য গত পঞ্চাশ বৎসরের সমস্ত সাহিত্যিকদিগের রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই কুড়ি ভলুমের মধ্যে দশভলুম পর্য্যন্ত মল্টকে ও বিসমার্কের যুগ শেষ হইয়াছে, শেষ দশভলুম আধুনিক লেখকদিগকে লইয়া। আধুনিক জর্ম্মান নাট্য, ছোটগল্প ও লিরিক কবিতা যথেষ্ট সংগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। শেষের তিন ভলুম নাট্য কবিতা ও গল্পে শেষ হইয়াছে।

জার্ম্মানির বাহিরে নিউইয়র্ক ছাড়া অপর কোথাও জার্ম্মান সাহিত্যের এমন সুনির্ব্বাচিত সুসংস্কৃত সংস্করণ সম্ভবতঃ বাহির হয় নাই। প্রত্যেক ভলুমের মুখপাতে হাতে-আঁকা রঙ্গীন ছবি দেওয়া হইয়াছে। আরো বহু চিত্র আছে, কতক সমসাময়িক চিত্রকরদিগের অঙ্কিত—কতক বা আধুনিক। কাগজ ছাপা বাঁধাই সমস্তই চমৎকার। জর্ম্মান সাহিত্য ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে বয়সে ছোট হইলেও দ্রুত বাড়িয়া ইহা এমন শক্তিশালী ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইয়াছে, যে, যে-সমস্ত সাহিত্যের ছায়ায় ইহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল সেগুলিকেও অনেকটা ম্লানজ্যোতি করিয়া ফেলিয়াছে। কার্লাইল সর্ব্বপ্রথমে এ সাহিত্যের রস তাঁহার স্বদেশবাসীর সম্মুখে ধরেন। কার্লাইল, কোলরিজ, এন্টনিফ্রুড, লর্ড লিটন প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণের অনুবাদ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

আহত শিখ সৈন্য নেটলী হাসপাতালে।

বিচিত্র আহার বা অদ্ভুত পাকস্থলী—

একটা কথা চলিত আছে এবং লোকে বলিয়া থাকে যে "মানুষে কি না খায়? সব খায়।" ইহা দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে পৃথিবীতে যত খাদ্যদ্রব্য আছে তাহা মানবজাতির কেহ না কেহ আহার করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে মানুষকে এ হিসাবে সর্বভুক্ বলা চলে না। কিন্তু যাহা কখনও মানবের খাদ্য নহে এবং রসনার তৃপ্তিকর নহে বলিয়া যাহা ভক্ষণে মানুষের প্রবৃত্তি কখনই উত্তেজিত হয় না এরূপ দ্রব্য ভক্ষণকারীকে সর্বভুক নামে অভিহিত করিলে বোধ হয় বেশী দোষের কথা হয় না। এইরূপ সর্বভুক একজন লোকের কথা কিছুকাল পূর্বে ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসের ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনে পাঠ করিয়াছিলাম। তাঁহার সেই অদ্ভুতকাহিনী আজ প্রবাসীর পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি।

তাঁহার নাম মিষ্টার হেনরি হ্যারিসন। তিনি আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড ষ্টেটের সিরাকিউজ নামক স্থানের অধিবাসী। তাঁহার সুদৃঢ় বলিষ্ঠ দেহে কখনও কোন রোগ হইয়াছিল এরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি আলপিন, পেরেক, ছুরীর ফলা, কাঁচখণ্ড প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া আমেরিকাবাসীদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। এই-সকল দ্রব্য ভক্ষণে তাঁহার পাকস্থলীতে কোনরূপ বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই এবং আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসকগণ তাঁহাকে অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহার শরীরে অস্ত্রপ্রয়োগ ও রঞ্জন আলো (X-Rays) দ্বারা নানারূপ পরীক্ষা করিয়াও এ রহস্যভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কাহাকেও এরূপ নিরাপদে অব্যাহতি লাভ করিতে দেখা যায় নাই এবং আমেরিকার সমগ্র চিকিৎসকমণ্ডলী এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

মিঃ হ্যারিসনের বয়স যখন ৬ বৎসর তখন তিনি দৈবাৎ একটা আলপিন গলাধঃকরণ করেন। তাহাতে কোন বিঘ্ন বা অস্বস্তি বোধ না করায় তিনি আরও কতকগুলি পিন ভক্ষণ করেন। তাঁহার জননী অত্যন্ত ভীত হইয়া কোন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলে তিনি বালকের পাকস্থলী হইতে ৪০টি পিন নিষ্কাসিত করেন। পুনরায় এইরূপ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বালকটি নিশ্চয়ই স্বল্পায়ু হইবে স্থির করিয়া উক্ত চিকিৎসক মহাশয় দেহান্তে বালকের দেহপ্রাপ্তির জন্য ৩০০০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। মিঃ হ্যারিসনের শরীর এরূপ সুস্থ ও সবল ছিল যে তাঁহার সমগ্র জীবিত কালের মধ্যে একবার মাত্র রঞ্জন আলোক (X-Rays) প্রয়োগে তাঁহার পাকস্থলীর প্রতিকৃতি গ্রহণের সময় ভিন্ন আর কখনও তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হয় নাই।

আলপিন ভক্ষণের অল্পদিন পরেই একদিন বালক হ্যারিসন দৈবাৎ একটা ল্যাম্পের চিমনী ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার মাতা কর্তৃক ভর্ৎসিত হইলে তিনি তাঁহার মাকে উত্যক্ত করিবার জন্য সেই ভগ্ন চিমনীর ক্ষুদ্র কাঁচখণ্ডগুলি এবং তৎসহ আরও কতকগুলি মরিচাধরা পেরেক উদরসাৎ করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি গৃহ হইতে
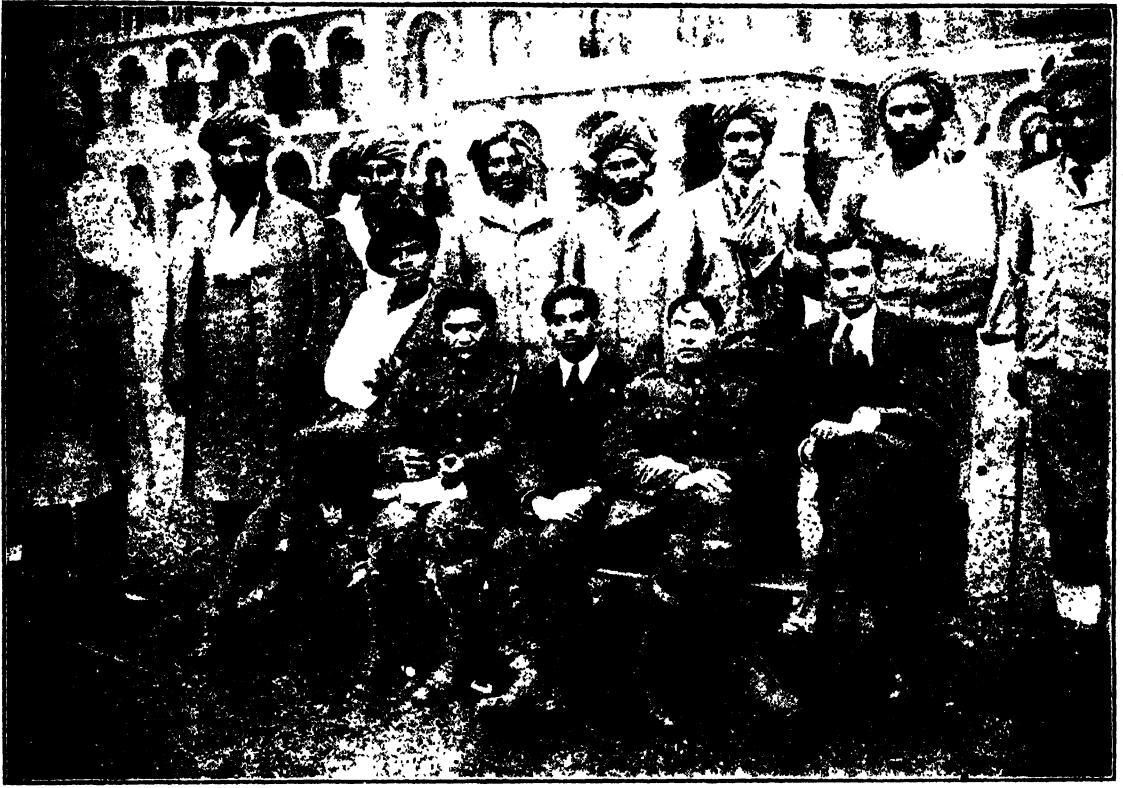
ভারতীয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত শুশ্রূষাকারীর দল ও নেটলী হাসপাতালে আহত ভারতীয় সৈন্য।

পলায়ন করিয়া এক সার্কাসের দলে যোগ দিয়া আমেরিকার সর্ব্বত্র তাঁহার অদ্ভুত আহারপ্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতে থাকেন।

ইংলণ্ডে বড়দিনের সময় যেমন মহাভোজ (Dinner) সমন্বিত উৎসব হইয়া থাকে, আমেরিকায় সেইরূপ ধন্যবাদ প্রদানের দিনে (Thanksgiving Day) বিশেষ ভাবে উৎসব হইয়া থাকে। এইরূপ একটি উৎসব উপলক্ষে ফিলাডেলফিয়া মেডিক্যাল কলেজের ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মহাভোজ-সভায় মিঃ হ্যারিসন তাঁহার অসাধারণ আহার-প্রক্রিয়া প্রদর্শনের নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার আহারের জন্য যে-সকল দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা আমরা তাঁহার ভোজ্য-তালিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

৪০ টি কারপেট ট্যাক (পেরেক বিশেষ)
৬ খানা ভগ্ন কাঁচখণ্ড
২০ টা বড় বড় পেরেক
১টা ছোট কাঁচের কুঁজা
৬ টা ঘোড়ার নাল বাঁধিবার পেরেক (৩ ইঞ্চ)
৫ টা স্ক্রুপ (২ ইঞ্চি)
১ টা ল্যাম্পের ভগ্ন চিমনী

ভোজের (Dinner) পর ফল কিম্বা মিষ্টান্ন খাইবার নিয়ম (Dessert)। তদনুসারে মিঃ হ্যারিসনের জন্য যে দুইটি অদ্ভুতপূর্ব্ব খাদ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা শুনিতেও অপূর্ব্ব এবং ভাবিতেও ভয়াবহ। দুখানা হাড়ের বাঁটযুক্ত উৎকৃষ্ট ছুরি (Pocket-knife) এবং ৩ খানা ক্ষুদ্র কলম-কাটা ছুরির ফলা অদ্ভুত মিঠাইরূপে তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। মিঃ হ্যারিসন ছুরিগুলি খুলিয়া তাহার বাঁটগুলি দন্তদ্বারা পৃথক করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে উহা তাঁহার মুখবিবরে অন্তর্হিত হইল।

এই-সকল প্রক্রিয়ায় কখনও কোন বিভ্রাট ঘটে নাই, তবে একবার কতকগুলি কারপেট ট্যাক ভক্ষণকালে উহার অংশবিশেষ তাঁহার উদর-মধ্যে রহিয়া যায়। উহাতে তাঁহার ভোজনের কোন বাধা হয় নাই কিন্তু কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করায় অস্ত্রপ্রয়োগে উহা বাহির করিয়া দিতে হইয়াছিল। এই-সকল অপূর্ব্ব খাদ্য ভক্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে তিনি প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসারবিশিষ্ট খাদ্য ভোজন করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক বস্তু গলাধঃকরণের পর একবার করিয়া জলপান করেন। এইরূপে উভয় খাদ্যের মধ্যে পড়িয়া বোধ হয় পিন পেরেক প্রভৃতি তাঁহার পাকস্থলীকে বিদ্ধ করিতে পারে না। আর পিন পেরেক ও স্ক্রুপ প্রভৃতির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগগুলি তিনি হস্তদ্বারা কথঞ্চিৎ ভোঁতা করিয়া লইয়া মুখ-মধ্যে প্রদান করেন।

তাঁহার এই ভোজনব্যাপার সর্ব্বত্র অনন্যসাধারণ বলিয়া বিবেচিত হইলেও তিনি ইহার মধ্যে কিছুমাত্র অসাধারণত্ব দেখিতে পান না। তিনি বলেন যে যে-কোন সুস্থ সবল দৃঢ়কায় ব্যক্তি অনায়াসে এই সকল প্রক্রিয়া সাধন করিতে পারেন, তবে এই-সকল অপূর্ব্ব খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ গ্রহণে রুচি জন্মাইবার জন্য কিঞ্চিৎ অভ্যাসের প্রয়োজন হয় মাত্র।

মিঃ হ্যারিসন ইংলণ্ডে অথবা পৃথিবীর অন্যত্র গিয়া তাঁহার অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন কি না আমরা অবগত নহি কিন্তু তিনি

ভারতীয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত শুশ্রূষাকারীর দল, ইহারা যুদ্ধের আরম্ভ হইতে নেটলী হাসপাতালে আহত ভারতীয় সৈন্যের সেবা করিতেছেন।

যেখানেই যান না কেন সর্ব্বত্রই জনসাধারণ ও চিকিৎসকমণ্ডলী যে তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক।

* *
*

য়ুরোপের যুদ্ধে ভারতবাসীর সাহায্য

য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইটুকু সম্পর্ক যে ব্রিটিশ শক্তি এই যুদ্ধের এক পক্ষ এবং ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শক্তির অধীন দেশ—Dependency। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যেরূপ প্রাণের টানে এই যুদ্ধে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে তাহা ভারতবর্ষে আশা করা যায় না—কারণ ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটিশের রক্তের সম্পর্ক নাই। তা ছাড়া দেশে বিদেশে ভারতবাসী ব্রিটিশ বা উপনিবেশীদের সমকক্ষ সম্মান সুবিধা অধিকার পায় না। ভারতবাসীকে গোলন্দাজ সৈন্য করা হয় না। তথাপি ভারতবাসী যে অসাধারণ তৎপরতার সহিত নিজের ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রাজশক্তির সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে তাহা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। এক বৎসর হইল দুর্ভিক্ষে জলাভাবে অগ্নিদাহে বাঁকুড়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে; বাংলার অন্যত্র ও ভারতের বহু প্রদেশে দুর্ভিক্ষ, শিক্ষার অভাব, জলের স্বাস্থ্যের অব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে, তাহা সত্ত্বেও দরিদ্র ভারতবাসীর দত্ত [illegible] গভর্ণমেণ্ট ও প্রজারই অর্থে ধনী রাজা জমিদারেরা অকাতরে বিদেশের বিপন্নদের ও সৈন্যসামন্তের সুখ সুবিধার জন্য অর্থ বিতরণ করিতেছেন। অপ্রস্তুত অবস্থায় ফ্রান্সকে যখন জার্ম্মানী আক্রমণ করিয়া গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল তখন এই ভারতবর্ষের সেনারা গিয়াই দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মানীর মোহাড়া আগলাইয়াছিল; ডার্ডেনেলিস ও মেসোপোটেমিয়াতে অবস্থা যখন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল তখনও মিত্রপক্ষের লোকেরা আশায় ছিল Oh! but everything will be all right. The Indian troops are there.—আচ্ছা! সব ঠিক হইয়া যাইবে, ভারতীয় সৈন্য সেখানে যখন আছে তখন কোনো ভয় নাই। যখন ডার্ডেনেলিস হইতে প্রত্যাগমন ও জেনারেল টাউনশেণ্ডকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল তখন সকলে বলাবলি করিয়াছিল—নিশ্চয় অবস্থা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, নহিলে ভারতের সৈন্যও পারিল না!

ভারতের এই অসাধারণ দান বীরত্ব ও ধৈর্য্য ব্রিটিশ জনসাধারণের শ্রদ্ধা উদ্রেক করিয়াছে; তাই অনেককে বলিতে শোনা যাইতেছিল যে The angle of vision has changed অর্থাৎ এতদিন ভারতকে যে চোখে দেখিত এখন আর তাহারা সে চোখে দেখিতেছে না। দীর্ঘকায় শিখ, সাজোয়ান জাঠ, বলিষ্ঠ পাঠান, মঙ্গোল ছাঁচের গাঁটাগোটা খাটো-খোটো গুরখা তাহাদের বিচিত্র বেশ রীতিনীতি ভাষা প্রভৃতিতে জড়াইয়া আপনাদের চারিদিকে যে একটি নূতন পরিবেষ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া ব্রিটিশারদের দৃষ্টি ভারতের দিকে ফিরিয়াছে—পরিচয় ক্রমশঃ [illegible] আত্মীয় হইয়া উঠিতেছে।

আহত ভারতীয় সেনারা দাবা খেলিতেছে।

ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট সেই "ম্লেচ্ছ" দেশেও ভারতের সৈন্যদের জাত বাঁচাইবার ব্যবস্থা ও আহতদের সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই। ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের এই ব্যবস্থা করা কঠিন হইত যদি বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেবকদলে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিতেন। ইহাতে ফল বড় চমৎকার হইয়াছে -সেনারা দেখিতেছে যে তাহাদেরই দেশের উচ্চ জাতের উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা আনন্দ ও আগ্রহের সহিত নীচ জাতের নিম্ন শ্রেণীর লোকের সেবা করিতে পারিতেছেন; তাহারা কুণ্ঠিত হইতেছে কিন্তু সেবকেরা অকুণ্ঠিত। ইহাতে উচ্চ নীচ ভেদ ঘুচিয়া আসিতেছে এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে। ইংরেজ রমণী ও পুরুষেরাও ভারতীয় সৈন্যের সেবায় নিযুক্ত আছে, তাহাতে শ্বেতাঙ্গভীতি দূর হইয়া মানবের সহিত মানবের সমান ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইবার অবকাশ ঘটিয়াছে।

ইহা হইতে অনেকে আশা করিতেছেন যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষ নিজের অজস্র ধনপ্রাণের বিনিময়ে তাহার সত্য স্বত্ব ও ন্যায্য অধিকার লাভ করিতে পারিবে। ব্রিটিশ শক্তি জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ করিতেছেন দুর্ব্বল জাতির স্বাধীনতা স্বত্ব ও ন্যায় রক্ষার জন্য। সুতরাং ভারতবর্ষের নিকট কৃতজ্ঞতার জন্য ভারতকে স্বতন্ত্রতা দান না করিলে ব্রিটিশ শক্তির কথায় কাজে অসামঞ্জস্য ঘটিবে।

* *
*

সাহিত্যিক মিথ্যাচার—

অনেক সময় অনেকে বই না পড়িয়া হয় তাহার সমালোচনা, বাজার-খ্যাতি বা ফ্যাশান দেখিয়া সেই বইএর প্রশংসা করিয়া থাকে। আমাদের পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক পার্সিভ্যাল সাহেব মহাকবি মিল্‌টনের মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লষ্ট' উপলক্ষে বলিয়াছিলেন এই মহাকাব্য আগাগোড়া খুব কম লোকেই পড়ে, প্রত্যেক সর্গের চুম্বক পড়িয়াই অনেকে পণ্ডিত এবং প্রশংসা করিতে হয় বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে।

নিউইয়র্কের 'ইভনিং সান' পত্রের একজন লেখক ইংরেজি সাহিত্যের উৎকৃষ্ট পুস্তকের তালিকা দিবার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে সার জন লাবক, ফ্রেডেরিক হ্যারিসন হইতে আরম্ভ করিয়া আমি পর্য্যন্ত বিজ্ঞ সাজিয়া উৎকৃষ্ট বইএর ফর্দ্দ ত দিলাম, কিন্তু অকপটে স্বীকার করিলে দেখা যাইবে যে ঐ-সমস্ত বইএর অনেকগুলি আমরা পড়ি নাই, কেবল কিম্বদন্তীতে খ্যাতি শুনিয়া আসিতেছি বলিয়া উহাদের নাম করিয়াছি। যেমন -টম জোন্স (ফীল্ডিংএর নভেল) চার বার পড়িতে চেষ্টা করিয়াছি, পাঁচ পাতার বেশী অগ্রসর হইতে পারি নাই, (গোল্ড স্মিথের) ভিকার অব ওয়েকফীল্ড ছয় বার পড়িবার চেষ্টা করিয়াছি, দান্তের ডিভাইন কমেডি কুড়ি বৎসর ধরিয়া বৎসরে একবার পড়িবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, তাহাতে মন বসাইতে পারি নাই; কিন্তু বরাবর ভান করিয়া আসিতেছি যেন সমস্তটাই পড়িয়াছি আর কী ভালো।

লাগিয়াছে! (সার্ভান্টিসের নভেল) ডন কুইক্সো আমাদের টানিয়া বোনা অবধৃজং লাগে, পড়িতে গেলে হাই ওঠে, তবু তাহার প্রশংসা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ২৫ ডলার (প্রায় ৮০ টাকা) উপার্জ্জন করিয়াছিলাম! বসওয়েলের লিখিত জনসনের জীবনকথা আমরা কখনো পড়ি নাই, তথাপি উহার প্রশংসা করিতে বা উহার দুই চারিটা শুনিয়া-শেখা ঘটনার কথা উল্লেখ করিতে আমাদের বাধে না; ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতাও আমরা পড়ি নাই, তবু প্রশংসা করি ফ্যাশানের খাতিরে।

* *
*

অভ্যাস ত্যাগ—

কোনো একটা কাজ বারবার করিতে করিতে তাহা সম্পন্ন করিবার যে একটা বিশেষ ধরণ আয়ত্ত হইয়া যায় এবং যাহা সুপ্তচেতন অবস্থাতেও সহজে করিয়া যাওয়া যায় তাহাকে অভ্যাস বলে। যে অভ্যাস অপর লোকের খারাপ ঠেকে তাহা বদ অভ্যাস, যাহা লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে না তাহাই সু অভ্যাস। লোকের সামনে বসিয়া পা নাচানো, আঙুল মটকানো, লিখিবার সময় মুখভঙ্গি করা, গান গাহিবার সময় মাথা নাড়া প্রভৃতি মুদ্রাদোষ বদ অভ্যাস; নেশার দ্রব্যে আসক্ত হওয়াও বদ অভ্যাস। কিন্তু লেখা, পড়া, চলা, কথা বলা সমস্তই অভ্যাসের ফল—তাহা সকল লোকের মধ্যে একই রকমে সম্পন্ন হইলে লোকের চোখে বিসদৃশ লাগে না।

নিউইয়র্কের মেডিক্যাল রেকর্ড পত্রিকায় একজন শরীর ও মনের তত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার বলিতেছেন যে সকল-পদার্থেরই অভ্যাস আছে। কল চলিতে চলিতে তাহার চলার একটি ধরণ হয়, তাহাই তাহার অভ্যাস। জুতো জামা পরিতে পরিতে গায়ের সঙ্গে তাহাদের যে মিল হয় তাহাই তাহাদের অভ্যাস। পাহাড়ের গা বহিয়া বৃষ্টির ধারা ঝরিতে ঝরিতে যখন অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহাকে আমরা ঝরণা বা নদী বলি। অভ্যাস ছাড়া বস্তু বা জীব নাই, অভ্যাস প্রকৃতিগত। সুতরাং অভ্যাস বদ হইলেও তাহা ছাড়াইবার জন্য কাহাকেও তিরস্কার বা শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। তাহাকে ঐ অভ্যাসের কদর্য্যতা অপকারিতা বুঝাইয়া তাহার নিজের সচেতন ইচ্ছাযুক্ত চেষ্টায় উহা ছাড়িয়া দিতে সাহায্য করা উচিত। অভ্যাস মানে কতকটা মস্তিষ্কক্রিয়া ও পেশীক্রিয়া দেহ ও মনের প্রত্যেক অংশে বদ্ধমূল হইয়া উঠা, সুতরাং তাহা ত্যাগ করিতে হইলে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সুস্থ স্নায়ু শিরা লাভ করিবার অনুকূল অবস্থা পাওয়া দরকার। তাহার জন্য খোলা জায়গায় ব্যায়াম ও প্রচুর নিদ্রা আবশ্যক। অনেক সময় স্থান ও অবস্থানের পরিবর্ত্তনে বদ অভ্যাস ছাড়িয়া যায়। অভ্যাস প্রতিকারের চেয়ে অভ্যাস হওয়া প্রতিরোধ করা ঢের সহজ ও বুদ্ধিমানের কার্য্য।

* *
*

তামাক ছাড়া—

মেডিক্যাল রেকর্ড কাগজে আর-একজন ডাক্তার তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছাড়া যে কত সহজ তাহা দেখাইয়াছেন। তামাক খাওয়া যে স্বাস্থ্যহানিকর ও পরমায়ু হ্রাসের কারণ সে বিষয়ে সকল ডাক্তার একমত। তাহার উপর অনাবশ্যক অপব্যয়। ইহা একটা সামাজিক ব্যাধি; লোককে অল্প খরচে খাতির করিবার জন্য পান তামাক চলিতেছিল, এখন উপরন্তু চা জুটিয়াছে। বাড়ীতে অভ্যাগত সংকারের জন্য ঐসব উপকরণ জোগাড় করিয়া রাখিতে হইলে নিজেকে ঐসব সেবন করিতে হয়; আমি জানি একজন ভদ্র লোক অধিক বয়সে তামাক ধরিয়া কৈফিয়তে বলিয়াছিলেন বাড়ীতে কেউ তামাক খায় না, এজন্য হুঁকার নিয়মিত জল ফেরানো না হওয়াতে নলচা খুলিয়া যায়, তামাকের গুড় শুকাইয়া উঠে, অভ্যাগত আসিলে বিব্রত হইতে হয়, তাই ব্যবস্থা ঠিক থাকিবে বলিয়া তামাকটা অভ্যাস করিতে হইয়াছে। এইরূপে দশজনের দেখাদেখি সংসর্গে পড়িয়া উপরোধ অনুরোধে তামাকখোর হইয়া উঠিতে হয়। আবার তেমনি সহজেই এই বদ-অভ্যাস ছাড়িয়া দেওয়াও যায়। সংখ্যা-তালিকা সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে যেসব কেরানী কারকুন ছাত্র তামাক খায় না তাহারা তামাকখোরদের অপেক্ষা কর্ম্মকুশলতায় ও বুদ্ধিতে উৎকৃষ্টতর। তাহাতে আজকাল আমেরিকার অনেক আপিসে স্কুলে কর্ম্মচারী ও ছাত্রদের পাহারা দিয়া তামাক খাইতে দেওয়া হয় না; তাহার ফলে অনেকেই অক্লেশে তামাক খাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে।

* *
*

দাঁতন শোধন—

আজকাল য়ুরোপ-আমেরিকায় ডাক্তারদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিতেছে যে দাঁতন একবার ব্যবহার করিয়া তাহা আবার ব্যবহার করা উচিত কি না। আমাদের দেশে গাছের কচা ডাল ভাঙিয়া দাঁতন করার প্রথার এই সুবিধা যে বিনা খরচে বা অল্প খরচে নিত্য নূতন দাঁতন পাওয়া যায়, সুতরাং উচ্ছিষ্ট মুখে দেওয়া উচিত কি না সে ভাবনা আমাদিগের না ভাবিলেও চলিত। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশের অনেকেই দাঁতের বুরুশ ব্যবহার করে আর অনেক মুসলমান কাঠির দাঁতনও একটাই অনেকদিন ধরিয়া চালায়। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদেরও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। য়ুরোপ-আমেরিকার ডাক্তারেরা একমত যে দাঁতন বা দাঁতের বুরুশ খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার; কারণ শরীরের মধ্যে মুখে সঙ্করমাণ রোগবীজাণু যত সহজে ও বেশী বাসা বাঁধিয়া থাকে এমন আর কোথাও নহে; অতএব মুখে কোনো জিনিস দিবার আগে সতর্ক হওয়া উচিত যে সে জিনিসটা শুদ্ধ থাকে। তাজা গাছের ডাল এই কারণে দাঁতনের পক্ষে উপযোগী সব চেয়ে বেশী। বুরুশ ব্যবহার করিতে হইলে তাহা নিত্য শোধন করিয়া লওয়া উচিত। এই হাঙ্গামাটুকু অনেকেই পোহাইতে চাহেন না; ফলে নানারূপ রোগ ভোগ করেন। আমেরিকার একজন দাঁতের চিকিৎসক দি ডেণ্টাল সামারী নামক কাগজে শোধনের একটি সহজ উপায় জানাইয়াছেন। প্রত্যহ দাঁত মাজিবার আগে গরম জলে নুন গুলিয়া সেই জলে কুলকুচা করিয়া নিজের প্রিয় মাজন দিয়া দাঁত বুরুশ করিলে মুখে আর রোগ-বীজাণু বাসা বাঁধিতে পারে না। তারপর দাতের বুরুশটিকে বেশ করিয়া ধুইয়া সেই ভিজা বুরুশের কুচির উপর গুঁড়া নুন বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়; জলে নুন গলিয়া বুরুশের কুচির গোড়ায় পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পরে। সেই অবস্থায় বুরুশ রাখিয়া দিলে জল শীঘ্রই শুকাইয়া যায় এবং ক্রব নুন দানা বাঁধিয়া কুচির ও বুরুশের ডাঁটির যে অংশটা মুখে যায় তাহার গায়ে জমাট হইয়া লাগিয়া থাকে। এই নুনের পাহারায় লোকের বিশ্বাস ডাইনির বা ভুতের নজর লাগে না, রোগ-বীজাণু ভিড়িবে কোন্ সাহসে? পরদিন সেই নুন-ঢাকা বুরুশ ও মাজন দিয়া দাঁত মাজিলে আর কিসের ভয়! বুরুশ বেশী নোন্‌তা লাগিলে শক্ত জায়গায় একটা টোকা মারিলেই নুনের দানা সব ঝরিয়া পড়িবে, তখন বুরুশ দিয়া দাঁত মাজিলে আর বেশী নোন্‌তা লাগিবে না।

* *
*

খোকার পল্‌কা পরমায়ু—

ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে দেখানো হইয়াছে যে খোকারা জন্মের সময় খুকীদের চেয়ে আকারে ও ওজনে বেশ বড় থাকে, কিন্তু সংসারের ঝঞ্ঝাট সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিবার বেলা খোকারা খুকীদের কাছে হার মানে, এবং এইজন্য খোকারা খুকীদের চেয়ে মরে বেশী। যত্নের তারতম্যে যে এমন হয় তা বলা যায় না, কারণ মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের অনেক দেশেই বেশী যত্ন আদর করা হয়। সুতরাং রোগ প্রতিরোধের শক্তিই ছেলেদের কম, মেয়েদের বেশী, বলা ছাড়া আর কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সংখ্যাতালিকা হইতে দেখা যায় যে খুকীদের মৃত্যু ১০০ হইলে সে ক্ষেত্রে খোকাদের মৃত্যু হয় ইংলণ্ডে ১২৩, ফ্রান্সে ১২১, সার্ভিয়া ও জাপানে ১১০, ভারতবর্ষে অনেক বেশী। ভারতবর্ষের ন্যায় যে-সব দেশে শিশুমৃত্যু খুব বেশী সেসব দেশেও দেখা যায় যে শিশুদের মধ্যে খোকাদের প্রাণই বেশী পল্‌কা। ০-৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খোকারাই বেশী মরে; ৫-১৫ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়ের মৃত্যুসংখ্যা সমান; ২০ বৎসর বয়সের পরে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরাই বেশী মরে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে শীঘ্র রোগে আক্রান্ত হয়, শীঘ্র কাবু হইয়া পড়ে, এবং শীঘ্র রোগ ঝাড়িয়া সারিয়া উঠিবার শক্তিও তাহাদের নাই।

* *

স্ত্রীলোকের দীর্ঘ পরমায়ু—

সংখ্যাতালিকা হইতে দেখা গিয়াছে যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশী দিন বাঁচে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের লোকগণনা বিভাগ ও ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এই কারণগুলি স্থির করিয়াছে -

(১) পুরুষেরা তামাক খায়, মেয়েরা প্রায়ই খায় না।

(২) পুরুষেরা মদ প্রভৃতি মাদক সেবন করে, মেয়েরা বেশী করে না।

(৩) আত্মহত্যা খুন যুদ্ধ আকস্মিক-মৃত্যু প্রভৃতি অপঘাতে পুরুষরাই বেশী মরে।

রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও পুরুষদের বেশী এবং সে-সমস্ত রোগ বা অপঘাত মাদক সেবনেরই ফল দেখা যাইতেছে। এইসব দেখিয়া স্থির হইয়াছে যে পুরুষ যেখানে ৬০ বৎসর বাঁচিবার আশা করে সেখানে স্ত্রীলোক ৬৪ বৎসর বাঁচিবে ধরিয়া রাখিতে পারে। যে দ্রব্য সেবনে স্বাস্থ্য ও পরমায়ু নষ্ট হয় সেরূপ দ্রব্য কাহারও স্পর্শ করা উচিত নয়। তামাক, মদ অপেয় অগ্রাহ্য।

* *
*

সর্প-জাতিকে মানুষের ভয়ের কারণ—

আমেরিকার সায়ান্স পত্রে একজন প্রশ্ন করিয়াছেন যে শীতপ্রধান দেশে ত বিষধর সর্প প্রায় নাই তবে সেখানেও লোকে সাপ বা সাপের মত একটা কিছু দেখিলেই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠে কেন? উত্তরে তিনি অনুমান করেন যে আদিম মানব-জাতি যখন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে নাই, যখন তাহারা পরিচ্ছদ ও আগুন জানিত না, তখন তাহারা যে-জায়গায় ছিল তাহা এশিয়া মহাদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলে এবং খুব সম্ভব সেই দেশ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে সকল দেশের চেয়ে বিষধর সর্প বেশী এবং এক সর্পাঘাতেই যত লোক মরে এমন কোনো দেশে কিছুতে মরে না। এই যে আদিমকালের সর্পভীতি মজ্জাগত হইয়া পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইতেছে তাহাতেই লোকে ঢোঁরা সাপকেও ডরায়, রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটায়। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় সয়তান সর্পের বেশে আদিমাতা ইভকে কুপরামর্শ দিয়াছিল বলিয়া বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে। এবং সর্পের উপর আদিমকালের বিদ্বেষ সয়তান-বিদ্বেষের সঙ্গে মিশিয়া খ্রীষ্টীয় সমাজে প্রবলতর হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নীরিহ সর্পও লোকের ভীতি ও জিঘাংসা উদ্রেক করে।

অপর একজন জবাবে বলিয়াছেন এ অনুমান সর্বৈব অতথ্য। ছোট ছোট ছেলেরা সাপ লইয়া খেলা করিতে একটুও ভয় করে না, বরং আমোদ পায়। পাছে ঢোঁরা ধরিতে কেউটে ধরিয়া বসে এই ভয়ে পিতামাতারা ছেলেমেয়েদের মনে সর্পভীতি সঞ্চারিত করিতে থাকেন; ক্রমে বয়সের সঙ্গে সেই ভয়ের ভাব সুপ্তচেতন অবস্থাতে সাপ বা সাপের মতন কিছু দেখিলেই যথাকিম রকমে প্রকাশ পায়।

হারামণি

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর ব স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন, কবিওয়ালা তর্জ্জাওয়ালা জারিওয়ালা বাউল দরবেশ ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের।]

৩কার গান।

সরোবরে আসন ক'রে রয়েছেন আনন্দময়,
ও তার জীবন শূন্য, সদাই মান্য, স্বয়ং ব্রহ্ম
তাঁর মাথায় (দেখ)।
চক্ষু আছে নাহি দেখে,
তিন মড়া একত্র থাকে,
মুখ দিয়ে সে পরের মুখে
মর্ম্মের কথা কয়;
(ওরে) একে মড়া, নাই তার জীবন,
ও তার পেটের মধ্যে জ্যান্ত একজন,
সাধকেতে সাধে যখন,
ডাক্‌লে মড়া কথা কয় (দেখ)।
কর্‌ছে লীলা ভবের পরে,
দেবের দেব পূজেছেন যারে,
পদ নাই, সে চলে ফেরে,
রসিকের সভায়;
(ওরে) সবে মজে সেই পীরিতে,
বিলাচ্ছে প্রেম হাতে হাতে,
লালন বলে সেই পীরিতে
মজেছে সর্ব্ব আপন ইচ্ছায় (দেখ)।

—লালন ফকীর।

সংগ্রাহক—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

চীনে বৌদ্ধ ও কন্‌ফিউসিয়ান ধর্ম্ম

দেবতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, পাপতত্ত্ব, পুণ্যতত্ত্ব, স্বর্গ-নরকতত্ত্ব ইত্যাদির আলোচনা বর্ত্তমান জগতের কোথাও নাই। বৈষয়িক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেই নব্য মানবের চরম বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, ব্রহ্ম ইত্যাদি জীব শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত। ইঁহাদের প্রভাবে কোন ব্যক্তির বা জাতির জীবন বিশেষ নিয়ন্ত্রিত হয় না। ধর্ম্মচর্চ্চা গতানুগতিক ভাবে চলিয়া যাইতেছে। তবে ইয়োরোপ-আমেরিকার জাতিগুলি জীবিত, এইজন্য উহাদের মন্দির গির্জ্জা ইত্যাদিতে সকল-প্রকার জীবন্ত অনুষ্ঠানের প্রভাব পড়ে। এশিয়ার জাতিপুঞ্জ নির্জ্জীব, কাজেই এখানকার মসজিদ মন্দির মঠে অনেক সময়ে ঘর ঝাড়িবার লোকও দেখা যায় না। এই যা প্রভেদ। পাশ্চাত্য দেশীয় জনগণের জীবন হয় পার্লিয়ামেণ্টে, না হয় বিজ্ঞান-মন্দিরে, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই; অবনত এশিয়ার জীবন না দেব-মন্দিরে, না বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রকটিত। ইয়োরোপ-আমেরিকায় মানব-জীবনের ধারা কোন-না-কোন কেন্দ্রে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু পরাধীন এশিয়ার মানব জীবনহীন অস্থিকঙ্কালসার নিস্পন্দ "ফসিল" মাত্র। এই জনপদের যেখানে সেখানে খানিকটা চৈতন্য, কর্ম্মপ্রবণতা, বা উদ্দীপনা বা জাগরণ লক্ষ্য করি সেখানে ইয়োরোপ-আমেরিকারই খানিকটা ছায়া দেখিতে পাই মাত্র। স্বদেশী এশিয়ার কোথাও জীবনবত্তা নাই। নব্য জাপান এই হিসাবে এশিয়ার বহির্ভূত।

চীন একটা প্রকাণ্ড "ফসিল"। লেগেশন-মহাল্লায় ইয়োরোপ-আমেরিকা এবং জাপানের জীবন অনুভব করিতেছি। এই বিদেশী মুলুক পার হইয়া একবার স্বদেশী পিকিঙে পদার্পণ করিলে চীনাদের যে তিমির সেই তিমিরই দেখিতে পাই। নবজীবনের উষা কোথাও-কোথাও কিছু-কিছু উঁকি মারিতেছে সত্য, কিন্তু মোটের উপর একটা নিঝুমের পালা। পিকিঙের সর্ব্বত্র মধ্যযুগই বিরাজমান। ধর্ম্মমন্দিরগুলিতে সেই মধ্যযুগ ঘনাইয়া রহিয়াছে। যথাকালে এই-সমুদয় কেন্দ্রেই মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইত। আজ এখানে কেবল ইট কাঠ চুন সুরকি মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক মন্দিরে মাত্র ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাই—সকল মন্দিরেই আগাছা-পরগাছা বনজঙ্গল জন্মিয়াছে। মন্দির সংস্কার করিবার জন্য লোকজন এবং অর্থব্যয় অনাবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকে। এইজন্যই বলিতে হয় মন্দিরগুলি প্রাচীন জীবনের স্মৃতিস্তম্ভ মাত্র—পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচ্য বিষয় মাত্র। প্রাণতত্ত্ববিদ্‌গণ এখানে কিছুই পাইবেন না।

পিকিঙে এইরূপ দুইটা বড় ফসিল দেখিয়া আসিলাম। একটার নাম লামা-মন্দির অপরটার নাম কন্‌ফিউসিয়ান মন্দির।

চীনা-মন্দিরের প্রবেশদ্বারে তিনটা করিয়া পথ থাকে। এই হিসাবে চীনা ফটকগুলির সঙ্গে অন্য দেশীয় ফটকের সাদৃশ্য নাই। লামা-মন্দিরের ফটকে তিনটা স্বতন্ত্র ছাদ, মধ্যবর্ত্তী ছাদ উচ্চতর। ইনামেলের টালিতে ছাদ নির্ম্মিত। মুক্‌ডেনেও এই টালির ব্যবহার দেখিয়াছি। ছাদের কিনারায় সয়তান-বিদ্বেষী জীবজন্তুও দেখিলাম। ড্রেগন-চিত্র চীনের সর্ব্বত্রই অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

মন্দিরটা পূর্ব্বে প্রাসাদ ছিল। তৃতীয় মাঞ্চু সম্রাট ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে প্রাসাদকে মন্দিরে পরিণত করেন। তিব্বত হইতে সমাগত লামা পুরোহিতগণের জন্য ইহা প্রদত্ত হয়। সুপ্রশস্ত মেজে-বাঁধান ৫।৬ প্রাঙ্গণে এই অট্টালিকা সম্পূর্ণ। বলা বাহুল্য, প্রাচীরের প্রাধান্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রত্যেক ফটক পার হইবার সময়ে দ্বাররক্ষকেরা দশ পয়সা করিয়া আদায় করে।

বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে ঘণ্টাগৃহ এবং ঢাক-গৃহ অত্যাবশ্যক। এখানেও আছে। পিত্তলের সিংহ প্রস্তর-মঞ্চের উপর দ্বাররক্ষকস্বরূপ।

মন্দিরের গৃহগুলি আমাদের সুপরিচিত শিখরবিশিষ্ট উচ্চ অট্টালিকা নহে। প্যাগোডার আকারও নহে। জাপানে যেরূপ বাসগৃহ-সদৃশ সৌধগুলিই মন্দিরের জন্য ব্যবহৃত হয়, পিকিঙেও তাহাই। জাপানীদের মন্দির রচনা চীনাদেরই অনুকরণ। তবে জাপানী গৃহের ছাদগুলি ত্রিভঙ্গিম ও বক্রাকৃতি—চীনা ছাদসমূহের রেখা সোজা ও অবক্র।

মন্দিরের ভিতর বুদ্ধমূর্ত্তি। সোনালি কলাই করা
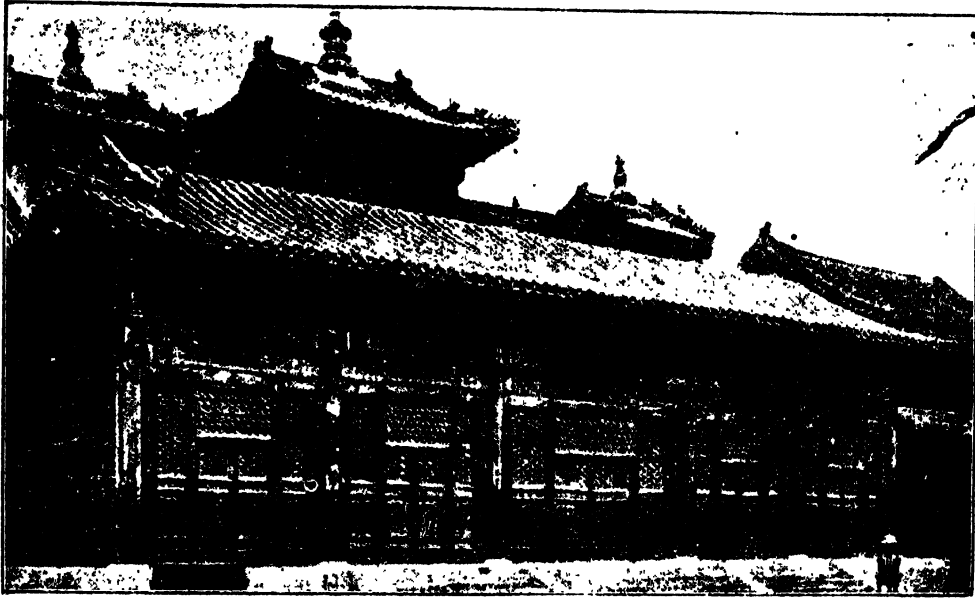
পিকিঙের লামা মন্দির।

পিত্তলে এইগুলি নির্ম্মিত। ভারতীয় বুদ্ধের নাকচোখ দেখিলাম না। দেখিলেই মঙ্গোলীয় জাতির মুখশ্রী বুঝা যায়। প্রধানতঃ তিন-প্রকার বুদ্ধের কল্পনা চীনা মন্দিরে দেখিতে পাই। দীর্ঘ আয়ু দান করিবার জন্য এক-প্রকার বুদ্ধ আছেন। সৌভাগ্যবিধাতা বুদ্ধ দ্বিতীয়-প্রকার, তৃতীয়-প্রকার বুদ্ধ চিকিৎসক। এতদ্ব্যতীত অমঙ্গল নাশ করিবার জন্য এবং সয়তানকে দূরে রাখিবার জন্য দ্বার-রক্ষক, গৃহরক্ষক ইত্যাদি বুদ্ধ বা বুদ্ধবাহনও চীনা মন্দিরে বিরাজমান। মন্দিরের ভিতর পূজাপাঠ স্তোত্র গীত ইত্যাদি হইয়া থাকে। একটা গৃহে তিব্বতী ভাষায় লিখিত পুঁথি দেখিলাম। চীনা পুঁথি সেলাই করা হয়—তিব্বতী পুঁথির পত্রগুলি দুইখানি কাঠের ভিতরে আলগাভাবে রক্ষিত থাকে। ভারতীয় পুঁথির আকারও এইরূপ। মন্দিরগুলির কড়ি বর্গায় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"। অক্ষরগুলি কিছু স্বতন্ত্র। মাঞ্চুরা তিব্বতী বৌদ্ধ প্রভাব পিকিঙে রক্ষা করিতে যত্নবান্ ছিলেন। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ ও উত্তরতন্ত্র চীনে প্রচারিত হইত। চীনের সকল যুগেই তিব্বতের স্থান চীনাধর্ম্মে অতি উচ্চ রহিয়াছে।

একটা বড় মন্দিরে প্রায় ৪০০ শিশু যুবক ও প্রৌঢ় লামা উপবিষ্ট হইয়া স্তোত্র পাঠ করিতেছে। জাপানের কোয়সোন পাহাড়ে কোবো দাইসির মন্দিরেও এই ধরণের সামগানই হইয়া থাকে। কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ—সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রার্থনা, উপাসনা, সঙ্গীত, স্তোত্র, service hymns, নামাজ তপ্‌সির, মন্ত্র ইত্যাদি একপ্রকার। খৃষ্টান মহোদয়গণ বৌদ্ধ মন্দিরের বাক্যাড়ম্বরে বিস্মিত হন। অখৃষ্টানেরাও খৃষ্টমন্দিরের উপাসনাপদ্ধতিতে কেবল বক্তৃতা, গলাবাজি এবং কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত মাত্র শুনিতে পান! খৃষ্টানের ভক্তি অখৃষ্টান বুঝে না। অখৃষ্টানের ভক্তি খৃষ্টান বুঝে না।

অধ্যাপক ডিকিন্‌সন পিকিঙে এই মন্দির দেখিয়া বলিতেছেন—

"But neither here nor anywhere have I seen anything that suggest vitality in the religion. I entered one of the temples yesterday at dusk and watched the monks chanting and processing round a shrine. ** They began to giggle like children at the entrance of the foreigner and never took their eyes off us. Later, individual monks came running round the shrines, beating agony as though to call the attention of the deity, and shouting a few words of perfunctory praise or prayer. Irreverence more
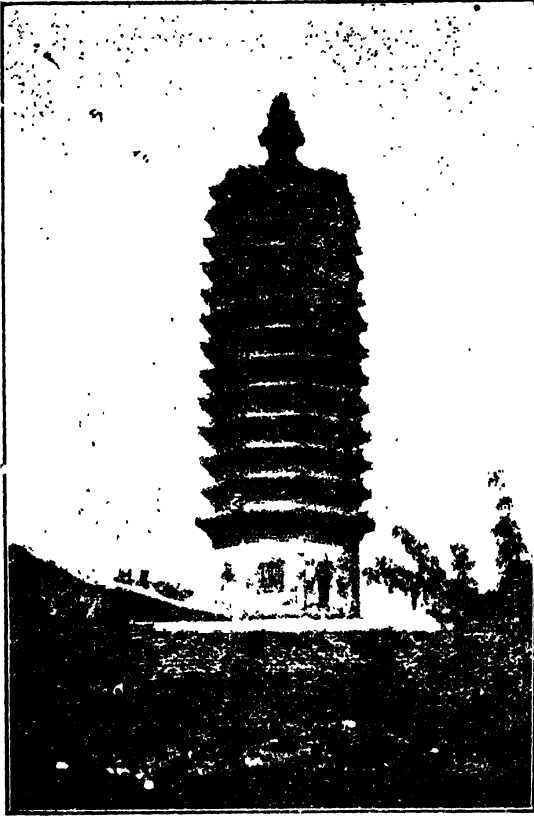
তেরো তলা বৌদ্ধ প্যাগোডা।

complete I have not seen even in Italy, not beggary more shameless."

ভিক্ষুকের উপদ্রব দরিদ্র দেশমাত্রেই আছে। সুতরাং চীনা মন্দিরে ভিক্ষুকসংখ্যা দেখিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপহাস না করাই সঙ্গত। কিন্তু খৃষ্টান পণ্ডিত বৌদ্ধ উপাসনা-পদ্ধতি দেখিয়া যে মত প্রচার করিলেন কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত খৃষ্টান মন্দিরের ভিতর বাহির দেখিয়া সেইরূপ মতই প্রচার করিবেন না কি? চোখ বুজিয়া ধর্ম্মবক্তৃতা শুনিলে অথবা উচ্চকণ্ঠে বাইবেলের গৎ গাহিতে পারিলে এবং রবিবার সুন্দর পোষাক পরিয়া গির্জ্জায় যাইবার নিয়ম থাকিলেই কি ভক্তি-প্রবণতা প্রমাণিত হয়? ভক্তি আর ভণ্ডামি বাহির হইতে বুঝা বড় সহজ নয়। অখৃষ্টান দর্শকেরা খৃষ্ট-মন্দিরে ভণ্ডামিই হয়ত লক্ষ্য করিবে।

একটা মন্দিরে সুবৃহৎ মৈত্রেয়ী মূর্ত্তি। শুনিলাম তিব্বত হইতে এই কাষ্ঠমূর্ত্তি আনীত হইয়াছিল। উচ্চতা ৭২ ফুট—গৃহের মেজেতে দাঁড়াইয়া সম্পূর্ণ অবয়ব দেখিবার জো নাই। বিভিন্ন মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধের চিত্র দেওয়ালে ঝুলিতেছে।

মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যেই লামাদিগের বাসগৃহ রহিয়াছে। এই সমুদয়ে প্রায় ৫০০ পুরোহিত বাস করে। ইহারা সকলেই অবিবাহিত। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া এবং অন্যান্য স্থান হইতে এই-সকল মঠবাসীর আগমন হইয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্মে দেবতত্ত্ব, পূজাতত্ত্ব, আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম ইত্যাদির প্রভাব যথেষ্ট। জাপানের ও চীনের বৌদ্ধ ধর্ম্মে আর আমাদের পৌরাণিক ধর্ম্মে বেশী প্রভেদ পাই না। তবে ক্রিয়াকলাপ হিন্দুপূজাপদ্ধতিতে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বিকশিত হইয়াছে।

পিকিঙের ঘণ্টাঘর।
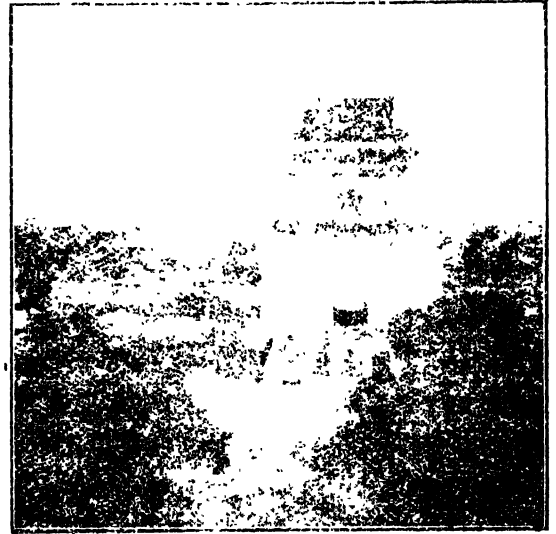
জাপানে একটা নূতন ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়াছি—তাহাতে বাহ্য অনুষ্ঠানের আড়ম্বর অত্যল্প। তাহার নাম শিন্টো ধর্ম্ম। চীনে একটা নূতন ধর্ম্মতত্ত্বের পরিচয় পাইতেছি। তাহার নাম কন্‌ফিউসিয়ান। ইহাতেও দেবতত্ত্ব একেবারেই নাই। ভারতবাসী চীনাসমাজের আর কোন কথা না জানিলেও কন্‌ফিউসিয়াসের নাম শুনিয়া থাকেন। সেইরূপ বিদেশীয়েরা ভারতবর্ষের আর কোন তত্ত্ব না শুনিলেও মনুর নাম জানেন। আমরা

মনু-বাক্য বলিলে যাহা বুঝি চীনারা কনফিউসিয়াস্‌-বাক্য বলিলে ঠিক সেইরূপ বুঝে।

এই চীনা মনুর পুস্তকাদি পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এতদিনে তাঁহার উপদেশানুযায়ী মন্দির দেখিবার সুযোগ ঘটিল। লামা-মন্দিরের অনতিদূরেই এই কনফিউশিয়ান মন্দির অবস্থিত।

ফটক ও কয়েকটা প্রাঙ্গণ পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইল। প্রত্যেক প্রবেশপথেই বকশিশ দিতে হয়। প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ এক বৃক্ষ দণ্ডায়মান। বহুসংখ্যক প্রস্তরস্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। দোভাষী বলিলেন— "এইগুলির উপর খোদিত লিপি দেখিতেছেন। মাঞ্চু সম্রাটগণের আমলে যত ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

চীনা পোর্সেলেনের ড্রাগন।

ঢাকের ঘর।

হইয়া কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম লেখা রহিয়াছে। আজকালকার স্বরাজ-প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান-শি-কাইয়ের নামও একটা প্রস্তরফলকে দেখিতে পাইবেন।" ফটকের সম্মুখেই দুইটা গৃহে বিশাল প্রস্তরকূর্ম্মের উপর এই ধরণের প্রস্তর-স্তম্ভ দেখা গেল। মুকডেনের রাজভবন দেখিতে যাইয়াও এইরূপ স্মারকলিপি-সংযুক্ত কূর্ম্ম-স্তম্ভ সাক্ষাৎ করিয়াছি। শুনিলাম মাঞ্চুসম্রাটগণ কনফিউসিয়াসের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য এই-সকল স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন।

মাঞ্চুরা পিকিঙে রাজধানী বসাইবার পর মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, তুর্কীস্থান ইত্যাদি প্রদেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করেন। এই জন্য যুদ্ধে বহু সেনাপতির জীবন নষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কতকগুলি স্তম্ভ আছে। এই-সমুদয় দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে দেখিলাম।

কনফিউশিয়ান মতাবলম্বীরা অনেকটা শিন্তো মতাবলম্বীদিগের মত পিতৃপুরুষগণের পূজা করিয়া থাকে। পূজার অনুষ্ঠান বিশেষ কিছু নয়—কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহাদের নাম স্মরণ করা অথবা কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা এই ধর্ম্মের অঙ্গ। এই জন্য চীনা মনুর মন্দিরে tablets, inscriptions, monuments ইত্যাদির বাহুল্য দেখিতেছি। কোন কোন প্রস্তরে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জ্ঞানীপ্রবর কনফিউসিয়াসকে মাঝে মাঝে সংবাদ প্রদান করা সম্রাটগণ কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। আজও জাপানের মিকাডো ইসে (Ise)র শিন্তোমন্দিরে পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া

এই মন্দির অতি পুরাতন—প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে মোগল সম্রাটগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নব্য জাপানে যেরূপ শিন্টো মন্দিরগুলি সুরক্ষিত হইতেছে—পিকিঙেও দেখিতেছি, কন্‌ফিউশিয়ান্ মন্দির প্রতিবৎসর সংস্কার করা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ মন্দিরগুলির দুরবস্থা জাপানে যেরূপ চীনেও তেমন।

দোভাষী বলিলেন—"প্রতিবৎসর সম্রাট এই মন্দিরে পূজা করিতে আসেন। সেই সময়ে শূকরের মাংস, ভাত, শাক শব্জী ইত্যাদির ভোগ চড়ান হয়।" ভোগের জন্য মন্দিরের ভিতর টেবিল দেখিলাম, তাহার সম্মুখে বাতিদান এবং ধূপদান অবস্থিত।

চীনা পুরোহিত।

কোন মূর্ত্তি দেখিলাম না। কাষ্ঠফলকে কন্‌ফিউসিয়াসের নাম লেখা রহিয়াছে। এই নামের সম্মুখেই ভোগ বাতি ইত্যাদির আয়োজন হইয়া থাকে। ঘরের ভিতর দুইধারে এই ধরণের নাম-সংযুক্ত কাষ্ঠফলক আরও অনেকগুলি আছে। দোভাষী বলিলেন—"এই সমুদয় কন্‌ফিউসিয়াসের শিষ্য এবং প্রশিষ্যগণের নাম।" তাহাদের স্মৃতিফলকের সম্মুখেও ভোগবাতি ইত্যাদির সরঞ্জাম দেখিলাম।

কন্‌ফিউসিয়াসের নামফলকে চীনাভাষায় যাহা লেখা আছে তাহার ইংরেজী অনুবাদ—"Soul of the Most Holy Ancestor Confucius." ঘরের ভিতর আরও কতকগুলি রচনা দেখিলাম। দোভাষী সেই সমুদয়ের ইংরেজী অনুবাদ বলিতে লাগিলেন।—

(১) Confucius is a perfect man

(২) No such man in the world as Confucius

(৩) Confucius is the ancestor of all Chinese sages

(৪) Confucius is a Chinese teacher for 10,000 generations

(৫) Virtues and tenets of Confucius cannot be compared with heaven and earth

(৬) Education of Confucius as deep as water in ocean.

কন্‌ফিউশিয়ানেরা কোন দেবদেবীর ধার ধারে না—তাহাদের মতপ্রবর্ত্তক ঋষিবরের নাম স্মরণ করে মাত্র। এই ধর্ম্মকে বীরপূজা বলা কর্ত্তব্য। হিন্দুরা বৃদ্ধ মনু সম্বন্ধে এইরূপ বীরপূজক নহে কি? কন্‌ফিউসিয়াস সম্বন্ধে চীনাদের যে স্তোত্র, মনু সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণায়ও সেই স্তোত্রই পাইব। মনু সম্বন্ধে যদি সূত্রাকারে বলা হয়—

(১) মনু একজন আদর্শ মানব

(২) মনুর সমান মানব জগতে দ্বিতীয় নাই

(৩) মনু ভারতীয় জ্ঞানিবর্গের আদিপুরুষ

(৪) মনু দশ হাজার পুরুষকাল হিন্দুজাতির ঋষি থাকিবেন

(৫) মনু-প্রবর্ত্তিত মতবাদের স্বর্গে মর্ত্ত্যে তুলনা নাই

(৬) মনুর পাণ্ডিত্য সাগরাম্বুর ন্যায় গভীর।

তাহা হইলে হিন্দুমাত্রই বুঝিবে যে তাহারা মনুকে এই চোখেই দেখিয়া থাকে। সমাজসংস্থাপক নীতিপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মোপদেষ্টা মনুকে যাহারা গুরু বিবেচনা করে তাহারা চীনা কন্‌ফিউশিয়ানদের আদর্শানুযায়ী ধর্ম্মেও আস্থাবান্। সুতরাং হিন্দুত্বে কন্‌ফিউশিয়ান মতবাদও পাইতেছি বলিতে হইবে।

ঋষি কন্‌ফিউসিয়াস যে-সমুদয় উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেগুলি প্রধানতঃ চারিশাখায় বিভক্ত :—

(১) কর্ত্তব্য ব্যক্তিগত ও সমাজগত (২) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক ধনোৎপাদনের নিয়ম (৩) রাষ্ট্র-

কন্‌ফিউসিয়ান-ধর্ম্মী চীনাদের শবযাত্রা।

শাসন ও আইন-বিজ্ঞান (৪) প্রচার-কার্য। ভারতীয় শুক্রাচার্য্য-প্রচারিত নীতিশাস্ত্রেও এই সকল কথার আলোচনাই আছে, তবে কন্‌ফিউসিয়াস তাহার মত সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত করিবার জন্য মেন্‌সিয়াসাদি শিষ্যবর্গকে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। শুক্রাচার্য্য তাহা করেন নাই। কিন্তু হিন্দুসাহিত্যের যে-কোন নীতিশাস্ত্র পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে সেগুলিকে প্রচার করা পাঠকগণের একটা মহা কর্ত্তব্যই বিবেচিত হইত।

শিন্তো মন্দিরে যেরূপ, কন্‌ফিউশিয়ান মন্দিরেও সেইরূপ, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, লামা সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কন্‌ফিউশিয়ান মতাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা হাঁটু পাতিয়া মাথা নোয়াইয়া প্রার্থনা করে। সম্রাট হয়ত মাঝে মাঝে কন্‌ফিউসিয়াসের গুণকীর্ত্তন করিয়া গীতরচনা করিতে পারেন। এই-সকল গীত গাহিয়াও ভক্তেরা আদি গুরুর বন্দনা করে।

পিকিঙের বৌদ্ধমন্দিরে এবং কন্‌ফিউশিয়ান মন্দিরে সর্ব্বত্রই ড্রেগন-চিত্র দেখিতেছি। ড্রেগন সর্প চীনাদের কল্পনায় স্বর্গস্থ সম্রাটের আত্মা। সম্রাজ্ঞীর আত্মা ফিনিক্স পক্ষীর আকার গ্রহণ করে। এই দুই জীব চীনে অমর জীবনের চিহ্ন। সেইরূপ কূর্ম্ম এই দেশে দীর্ঘ আয়ুর লক্ষণ। এই জন্য চীনা শিল্পে কূর্ম্ম ড্রেগন ও ফিনিক্স বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডকে ঢাক বলিয়া দেখান হইল। তাহাদের গাত্রে লিপি খোদিত আছে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তরের ঢাকগুলিতে খৃষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দীর সম্রাটগণের কীর্ত্তিকলাপ বিবৃত রহিয়াছে। এই সমুদয়কে ঐতিহাসিক শিলা-লিপি বিবেচনা করা উচিত।

বিকালে তাতারপ্রাচীরের দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণ হইতে সমস্ত নগরের দৃশ্য দেখিতে গেলাম। এইখানে একটা মান-মন্দির রহিয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম মোগল সম্রাট কুব্‌লা খাঁ এই Observatory প্রস্তুত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মাঞ্চু সম্রাটের অনুরোধে একজন ইয়োরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ এই যন্ত্র-গৃহের উন্নতি বিধান করেন। গত পর্য্যবেক্ষণালয়ের কতিপয় পিত্তলনির্ম্মিত যন্ত্র প্রাচীরের

ছাদে রক্ষিত হইতেছে—কয়েকটা যন্ত্র প্রাঙ্গণেও দেখিলাম। দোভাষী বলিলেন —"১৯০০ খৃষ্টাব্দে বক্সারেরা বিদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। সেই সময়ে বিদেশীয়েরা পিকিঙের নানা স্থান দখল করিয়া বসে। জার্ম্মানেরা এই মানমন্দির হইতে কয়েকটা যন্ত্র বার্লিনে লইয়া গিয়াছে।" ফরাসী নরপতি চতুর্দ্দশ লুই একটা যন্ত্র চীন সম্রাটকে উপহার দিয়াছিলেন।

এই মান-মন্দিরে চীনা সরকারের গণিতজ্ঞ বিভাগ কার্য্য করেন। এইখানে চীনা জ্যোতির্ব্বিদ্গণ পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এক গৃহে কতকগুলি আরবী অক্ষরে লিখিত বড় বড় কাগজ দেখিলাম। অনুসন্ধানে জানা গেল মধ্যযুগে বহুকাল পর্য্যন্ত আরব্য পণ্ডিতগণ এই Mathematical Facultyর কর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জেস্যুটেরা নিযুক্ত হইতে থাকেন। একজন ফরাসী পাদ্রী কিছুকালের জন্য এই বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

পিকিঙ মান-মন্দিরের যন্ত্র।

রাত্রিকালে একটা বাজার দেখিয়া আসিলাম। বিশেষত্ব কিছু নাই। পরে একটা বাগানে বেড়াইতে গেলাম। স্বরাজ বা রিপাব্লিক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই বাগানে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। বস্তুতঃ ইহা উদ্যান নয়- মাঞ্চু সম্রাট্গণের একটা মন্দির এইখানে ছিল। রাজ-প্রাসাদের বাহিরেই এই স্থান।

পয়সা দিয়া বাগানে প্রবেশ করিতে হয়। বাগানের ভিতর হোটেল চিত্রগৃহ ইত্যাদি রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই গৃহগুলি মন্দির ছিল। দলে দলে যুবক ও প্রৌঢ়গণ বাগানের নানা স্থানে বসিয়া পান ভোজন করিতেছে। বিলিয়ার্ড খেলার ঘরও আছে। শিক্ষিত চীনা ব্যক্তিবর্গের ইহা একটা সম্মিলন-স্থান বুঝা গেল। বাগানের বাহিরে বহুসংখ্যক রিকশ দাঁড়াইয়া আছে। ল্যাণ্ডো এবং ট্যাক্সিগাড়ীও কয়েকখানা দেখিলাম। ধনবান্ জনগণেরও সমাগম হইয়া থাকে বুঝিতেছি।
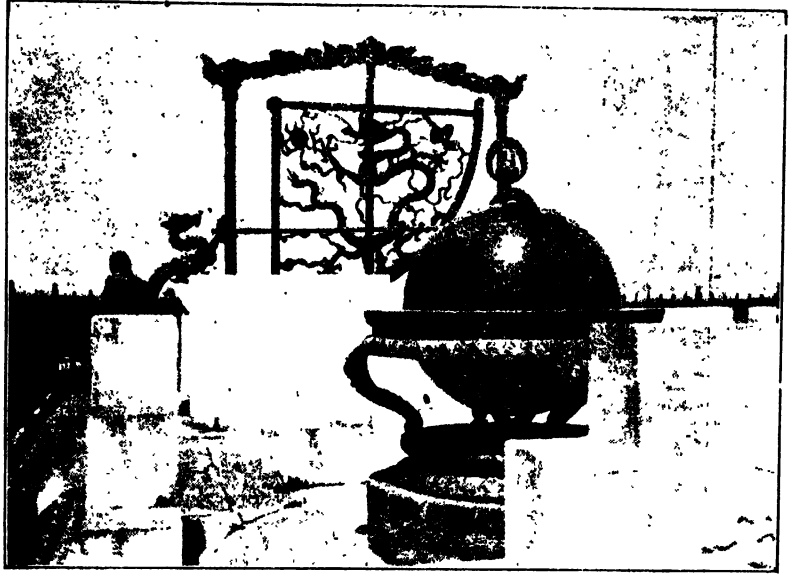
পিকিং। শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

দেশের কথা

দেশকে শক্তিশালী সভ্য ও উন্নত করিতে হইলে দেশবাসীর শক্তি ব্যর্থ হইতে দিলে চলে না। যাহার যে-টুকু দেয়, যাহার যেদিকে শক্তি তাহাকে সেই দিকে খাটাইলেই আশানুরূপ সাফল্য পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা চাই সকলেই একই বাঁধি-পথে চলুক। আমাদের সমাজ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজনেরা, সকলেই এর জন্য অল্পবিস্তর দায়ী। অন্যত্র সকল উন্নত দেশে বিশ্ববিদ্যালয় আছে ছাত্রেরা তাহাদের ঈপ্সিত কোনো একটা বিশেষ বিদ্যা শিখিবে বলিয়া, যে বিজ্ঞান ভালোবাসে সে বিজ্ঞান শিখে, যে সাহিত্য ভালোবাসে সে সাহিত্য পড়ে, যে ভাস্কর্য্য ভালোবাসে সে ভাস্কর হয়, সঙ্গীতপ্রিয় সঙ্গীতের অনুশীলন করে, মনে যার রঙের নেশা ধরিয়াছে সে ছবি আঁকে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো লাগুক চাই না লাগুক সকলকেই পাঁচ-সাতটা বিষয় পড়িতে হইবে, পরীক্ষা পাশ করিতেই হইবে, নিস্তার নাই। ভালো-না-লাগার দরুন হয় তো একই বিষয়ে একজন দশবার অকৃতকার্য্য হইতেছে, কিন্তু তবুও তাহাকে একজামিন পাশ করিবার জন্য জীবনের বহু অমূল্য সময় নষ্ট করিতে হইবে। এইরূপে তাহার স্বাভাবিক শক্তি যেদিকে, সে শক্তি ফুটিতে

পাইল না। দেশকে সে যা দিতে পারিত তা সে দিতে পারিল না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে Round Boys in Square Holes। আমাদের অধিকাংশ ছেলেদের অবস্থাও তাই। যে বৈজ্ঞানিক হইলে উন্নতি করিতে পারিত সে ওকালতি পাশ করিয়া দিনের পর দিন হাইকোর্টের লাইব্রেরিতে বসিয়া সময় কাটাইতেছে, যে চিত্রকর হইতে পারিত সে কণ্ট্রাকটারি করিতেছে, যে বলিষ্ঠ দুর্দ্ধর্ষ লোক নাবিক হইবার উপযুক্ত সে শিক্ষকতা করিতে লাগিয়াছে, এক কথায় যে যাহা হইতে পারিত সে তাহা না হইয়া আর-একটা কিছু হইতে গিয়া দেশকে সেই অনুপাতে পিছাইয়া রাখিয়াছে। দেশ চারিদিকে ব্যর্থতায় ভরিয়া উঠিতেছে, দেশ পঙ্গু শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। দেশে সকলকেই উকীল, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক বা আর কিছু হইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। লোকের প্রাণ যা চায় তাহারা যদি সেই দিকে আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করে তবেই কাজ সুসম্পন্ন হইবে। দেশে নব নব বিজ্ঞান দর্শন কাব্য সঙ্গীত চিত্র শিল্প গড়িয়া উঠিবে—দেশ উন্নত ও শক্তিশালী হইবে। এই প্রসঙ্গে "জ্যোতিঃ" লিখিয়াছেন—

জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সময় আত্মদৃষ্টির অভাবে অনেকে ভুল করিয়া বসে। তাহার কুফল ভোগ করিতে করিতে সারাজীবন তাহারা অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। এই হতভাগ্যেরা দেশের কোন মঙ্গল সাধনের পরিবর্ত্তে নিজেরাই দেশের ভারস্বরূপ ও অধঃপাতের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহারা মেট্রিকিউলেশন পাশ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কি ইণ্টারমিডিয়েট পড়িবার যোগ্য? কাহারো কাহারো যে তেমন মস্তিষ্ক-শক্তি নাই তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু সে কথা কে বুঝে, কে চিন্তা করে? শক্তি থাক্, আর নাই থাক্, তাহারা যদি নিতান্ত অর্থাভাবে বাধ্য না হয় তবে কলেজে পড়িবেই। তাহারা পিতামাতার অর্থধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকেও নষ্ট করিয়া বসিবে। প্রত্যেক মানবের এক-একটা বিশিষ্ট শক্তি আছে। তিনি যদি সেই শক্তির সাধনা করেন তাহাতেই তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে। আমার ইণ্টারমিডিয়েট পড়িবার শক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু বনজঙ্গলে ঘুরিবার মতন, বা সমুদ্রজাহাজে খাটিবার মতন শারীরিক শক্তি ও সাহস বেশ আছে। কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করিবার চেষ্টায় পুনঃ পুনঃ বিফল হইয়া হতাশায় জীবন আহুতি দেওয়ার পরিবর্ত্তে বনের গাছ-পালার সন্ধান লইয়া যদি একটা নূতন ব্যবসায়ের, নূতন শিল্পের আবিষ্কার করিতে পারি, তাহাতে শুধু আমার নহে আরো দশ জনের অর্থাগমের সুযোগ ঘটিতে পারে। বালবুদ্ধিতে কেহ কেহ ঐরূপ উদ্যমকে মূর্খ লোকের কার্য্য বলিয়া হেয় করিতে পারে, কিন্তু ঐরূপ মূর্খ উদ্যমশীল লোকেরাই সমগ্র পৃথিবীর প্রাণস্বরূপ।

ইংরেজী শিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'একটি পরীক্ষা পাশ করিয়া আমাদের দেশের মুসলমান যুবকেরা সরকারী চাকরীর জন্য লালায়িত হয়। হিন্দুদের অনুকরণেই যে তাহাদের এই রোগ দেখা দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, দু'এক জন উচ্চবেতনভোগী ছাড়া অধিকাংশ কেরাণী-জীবীর শরীর রোগজীর্ণ, মুখ চির-বিষাদপূর্ণ। তাহাদের সাংসারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ততোধিক করুণ চিত্রের আভাস পাইয়াছি। কোন মুসলমান কৃষকের গৃহ ঐরূপ বিষাদের ছায়ায় নিত্য আবরিত দেখা যাইবে না। সমুদ্রপথে বিচরণ করিয়াছি, মুসলমান নাবিকদের খবর জানি। তাহারা যেন এক অপূর্ব্ব সুখের রাজ্যে বাস করিতেছে। এই চট্টগ্রামের লক্ষাধিক মুসলমান সমুদ্রপথে নাবিকের কর্ম্মে নিয়োজিত আছে। ইহারা যেমন নিজেরা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কালযাপন করিতেছে তেমন তাহাদের পরিবার পরিজনও স্বচ্ছন্দে আছে। ইহারা এদেশের সমাজে এক উজ্জ্বল স্তর সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'একটা পরীক্ষা পাশ করিয়া সরকারী আফিসের দ্বারে ২০।২৫ টাকার চাকুরীর জন্য কতজন ধন্না দিয়া বসিয়া আছে। আর নাবিকের কর্ম্মে নিরক্ষর লস্করেরাও ২৫।৩০ টাকা পায়; অনেকের বেতন ৪০।৫০ টাকারও অধিক। সারঙ্গেরা ৩০০।৪০০ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চ্চায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন এমন অনেকে কর্ম্মক্ষেত্রে বিফল হইয়া স্বীয় স্বীয় জীবনকে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত করিয়া ফেলেন। একজন ইংরেজী সাহিত্যে এম এ পাশ করিলেন, গবর্ণমেণ্ট কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বেশ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য যদি গ্রন্থাদি প্রণয়নে নিয়োজিত হইত তবে তাহা দেশের কত গৌরব বর্দ্ধন করিত। কিন্তু তিনি সেই পদ ছাড়িয়া অধিকতর অর্থোপার্জ্জনের আশায় ওকালতি আরম্ভ করিলেন। সংসারে তিনি যে নিতান্ত দুঃখভোগী হইয়াছেন এমন নহে; কিন্তু তাঁহার ওকালতি ব্যবসা নিশ্চয়ই সফল হয় নাই। অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর লইলে আজ তিনি যে পেন্সন পাইতেন, তাঁহার ওকালতিতে সেই পরিমাণ আয়ও হয় কি না সন্দেহ।

আপনার শক্তি সামর্থ্যের পরিমাণ না বুঝিয়া, আপনার জীবনের লক্ষ্য নিরূপিত না করিয়া অন্যেরা যে পথে যাইতেছে আমিও সেই পথে যাইব, এই ভাবে যাহারা চলে তাহারা নিশ্চয়ই পদে পদে বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। এই জন্য আমরা আমাদের যুবকদেরে বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করিতেছি,—এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের কোন্ দিকে আপনাকে চালিত করিবে, কোন্ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবে, স্থির ধীর ভাবে চিন্তাপূর্ব্বক তাহা নির্ণয় করিবে। আপনার অন্তরের ভিতরে মন যেখানে স্থির হইয়া দাঁড়ায় সেখানে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিবে,—'আমি কোন্ পথে যাইব?'—যতক্ষণ মন স্থির হইয়া না দাঁড়াইবে, ততক্ষণ কোন সাড়া পাইবে না, ততক্ষণ তোমাকেও অপেক্ষা করিতে হইবে।

এই তো গেল পুরুষদের কথা। সমস্ত মেয়েদের আমরা অকর্ম্মণ্য জড় করিয়া রাখিয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মেয়েদের জন্য আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি ঘরকরনার কাজ করা, নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করা, সারাজীবন অব-গুণ্ঠন টানিয়া গৃহ-কোণে বদ্ধ থাকা। তর্কের সময় বুক ফুলাইয়া আমরা বলি অমুক পুরাকালের হিন্দুরমণী সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন, অমুক হিন্দুরমণী অঙ্ক কষিতেন, অমুক হিন্দু-

রমণী দর্শন আলোচনা করিতেন ইত্যাদি, কিন্তু কার্য্যকালে বলিয়া থাকি মেয়েরা লেখা পড়া শিখিয়া কি চাকরি করিবে? বাড়ীর ভিতরে তাদের কাজ, বাহিরে তাহারা কেন যাইবে? বাহিরের কাজ মেয়েরা কত করিতে পারে; উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে যে মেয়েরা কাব্য দর্শন ইতিহাস শিখিয়া, ছবি আঁকিয়া, জনসেবা করিয়া, দেশকে সমৃদ্ধ শক্তিশালী করিতে পারে; দেশের শুষ্ক জীবনে মধুধারা ঢালিতে পারে; দেশের পুরুষকে উৎসাহ দিয়া অসাধ্য সাধন করাইতে পারে; তা যাঁরা নিরপেক্ষ ভাবে য়ুরোপ আমেরিকা জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশের সামাজিক জীবন পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারাই বুঝিবেন। দেশের নারীসমাজকে অধঃপতিত রাখিয়া আমরা দেশকে হীনবল ও অনুন্নত করিয়া রাখিয়াছি।

তারপর ভাবিতে হইবে মূক, বধির অন্ধ ও অন্যান্য অঙ্গহীনদের কথা। তাহাদের বাতিল করিয়া দিলে চলিবে না, তাহাদিগেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে; দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেরই প্রয়োজন আছে। সকল সভ্যদেশে মূক বধির অন্ধদের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। অন্ধের দুঃখ মোচন করিতে হইলে অন্ধের অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা ফুটাইতে হইবে। কলিকাতায় একটি মাত্র মূক-বিদ্যালয় ও একটিমাত্র অন্ধবিদ্যালয় আছে। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? অন্তত বাংলার প্রধান প্রধান শহরে একটি করিয়া অন্ধ মূক ও বধিরদিগের বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। কলিকাতা অন্ধবিদ্যালয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ মফঃস্বলের অনেক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে—গত মাসের প্রবাসীর বিবিধ-প্রসঙ্গেও এ সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল—

অন্ধদিগকে লেখাপড়া ও জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী শিল্প ও গীত-বাদ্যাদি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রায় ২০ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত লালবিহারী শাহ কর্ত্তৃক কলিকাতাতে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রগণ প্রাথমিক ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারে। এতদ্ব্যতীত শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ্ রাইটিং শিক্ষা দেওয়া যায়। লেখাপড়া শিক্ষার পর অধিক বয়সে যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা হীন হইয়াছে তাঁহারাও টাইপ্‌রাইটিং বিভাগে যোগ দিয়া পুনরায় উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারেন। সাধারণ ছাত্রের জন্য মাসিক বেতন ৩৲ তিন টাকা। বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটী ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে; অধিকাংশ শিক্ষকগণ ছাত্রাবাসেই থাকেন। ছাত্রাবাসের মাসিক ব্যয় ১০৲ দশ টাকা। কোন কোন ডিঃ বোর্ড স্থানীয় বালকদের এই ছাত্রাবাসে অবস্থিতি ও পাঠের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। দরিদ্র বা নিরাশ্রয় ছাত্রের ভার বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে "পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী" লিখিয়াছেন—

বঙ্গদেশে অন্ধের সংখ্যা প্রায় ৩২০০০। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এইরূপ একটি স্কুল বর্ত্তমান থাকিতেও মাত্র ২৪ জন অন্ধ এই স্কুলে শিক্ষা লাভ করিতেছে। আমাদের দেশে অন্ধগণ দুর্ব্বিষহ ক্লেশে জীবনপাত করে তাহা প্রতিদিন সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। অথচ আমরা এই স্কুলের কোনও সন্ধান লইতেছি না। বাঁকুড়া বীরভূম বগুড়া বাখরগঞ্জ হুগলি ও চব্বিশ পরগণা জেলার ডিঃ বোর্ড এবং কুষ্টিয়া মিউনিসিপালিটী এই স্কুলে শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গের অন্যান্য ডিঃ বোর্ড এই সম্বন্ধে কিছুই করিতেছেন না। অথচ কার্য্যের অভাবে তাঁহারা প্রতি-বৎসর যাঁহাদের বহু টাকা গবরমেণ্টকে ফেরৎ দিয়া থাকেন। যে কয়েকটী ডিঃ বোর্ড বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন তন্মধ্যে মাত্র চব্বিশ পরগণা ও বাখরগঞ্জ জেলার বৃত্তি এ পর্য্যন্ত কেহই গ্রহণ করে নাই। ইহাতে মনে হয় এই স্কুলের বৃত্তান্ত মফঃস্বলবাসীগণের নিকট বিশেষ পরিজ্ঞাত নহে। ডিঃ বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী সমূহ এই স্কুল ও ইহার অধ্যাপনার বৃত্তান্ত সকলের নিকট বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত করিলে জনসাধারণ ইহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হইতে পারে।

"মোসলেম হিতৈষী"তে প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠে আমরা খুব আনন্দিত হইলাম—

ঢাকা নগরে মূক ও বধিরদিগের শিক্ষার নিমিত্ত একটা স্কুল স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে তথাকার নেতৃবৃন্দের একটী সভা হইয়া গিয়াছে। সেই সভায় উক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হার্ট মহোদয় উক্ত প্রস্তাবিত স্কুল কমিটীর সভাপতি পদে মনোনীত হইয়াছেন।

ঢাকার দৃষ্টান্ত বাংলার অন্যান্য প্রধান প্রধান শহরের অনুসরণীয়।

কিন্তু দেশের সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা ভিক্ষুক-সম্প্রদায়ই দেশের শক্তি অপব্যয় করে বেশী। বাংলাদেশে কেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সুস্থ সবল হৃষ্টপুষ্ট "সাধু সন্ন্যাসী"রা ঘুরিয়া ফিরিতেছে। ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা। তাহারা সাধারণের অন্নে পরিপুষ্ট অথচ তারা সমাজ বা দেশের কোনো কাজই করে না। তাহাদিগকে কিরূপে কাজে লাগানো যায়, কিরূপে তাহাদের ভিক্ষা করিয়া উদরান্ন সংস্থানের হেয় প্রবৃত্তি নিবারণ করা যায়, এ-সমস্ত কথা সকল দেশহিতৈষীরই ভাবা কর্ত্তব্য। দেশবাসীকেও বুঝানো দরকার, অলস কর্ম্মকুণ্ঠ স্বাস্থ্যবান লোকদিগকে ভিক্ষা দিলে পুণ্যসঞ্চয় হয় না।

"মোসলেম-হিতৈষী" সংবাদ দিয়াছেন—

ভারতে সাড়ে এগার লক্ষ মুসলমান ভিক্ষুক। ইহারা হিন্দু মুসলমান

উভয় সম্প্রদায়ের অর্থে প্রতিপ্রালিত হইতেছে। ইহারা এই দরিদ্র ভারতের প্রায় দুই কোটী টাকা নষ্ট করিতেছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই যে প্রকৃতপক্ষে দানের পাত্র তাহা নহে। কানা খোঁড়া প্রভৃতি ভিক্ষা পাইবার উপযুক্ত, তাহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়া উচিত। সবল লোকদিগকে ভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুকের স্রোত বৃদ্ধি করিয়া সমাজ ধ্বংস করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এইরূপ ভিক্ষাজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধিই ভারতের দরিদ্রতার অন্যতম কারণ।

"স্বরাজ" পাবনা জেলার যে শোচনীয় সংবাদ দিয়াছেন তাহাই আমাদের প্রায় সমস্ত দেশের কথা বলিয়া তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবত পাবনা জিলার সর্ব্বত্রই বারিপাত আরম্ভ হইয়াছে। পল্লীগ্রামে পয়ঃপ্রণালীর সম্পূর্ণ অভাববশতঃ আবাস-ভবনের চতুর্দ্দিকেই কর্দ্দম ও আবর্জ্জনা বেশ জমিয়া উঠিতেছে।

বর্ষা আগতপ্রায় কিন্তু জলকষ্টের কিছুমাত্র বিরাম নাই। সমগ্র জেলার কোন স্থানে কোন প্রকার পানীয় জলের সুব্যবস্থা আছে কিনা তাহা আমরা জানিনা। প্রাচীন কালের ২।১টী পুকুর জেলার কোন কোন স্থানে থাকিতে পারে কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় তাহাদের জলও পানের অযোগ্য। বলাবাহুল্য জনসাধারণ অনন্যোপায় হইয়া এই জলই পান করিয়া থাকে। লোকাল বোর্ড পুকুরের পরিবর্ত্তে ইন্দারার ব্যবস্থা করিতেছেন কিন্তু একার্য্য এত মন্থর গতিতে চলিতেছে যে ইহা দ্বারা দেশব্যাপী জলকষ্ট যে কোনদিন দূর হইতে পারিবে আমাদের এমন ভরসা হয় না।

কলেরা বা তত্তুল্য কোন সংক্রামক ব্যাধি জেলার মধ্যে এখন নাই বটে কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিলক্ষণই আছে। বৃষ্টির জল খাল নালায় জমিয়া যাইতেছে, পয়ঃপ্রণালীর অভাবে সেগুলি বাহির হইতে পারিতেছে না, কাজেই আগাছা ও আবর্জ্জনাদি তাহাতে পচিয়া দূষিত বাষ্প ও ম্যালেরিয়া উৎপাদন করিতেছে। গ্রামের জমিদারবর্গ হীনবিত্ত, বোর্ডের কর্তৃপক্ষ উদাসীন, অন্নক্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত জনসাধারণ নিঃসম্বল, সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতে ঔষধাভাব, কাজেই জনসমাজ একরূপ নিরুপায় ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ষার আগমনে পল্লীগ্রামের রাস্তাসমূহ চলাচলের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। জল কাদার জন্য এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইবার উপায় নাই। শুনিতে পাই লোকেল বোর্ডের তহবিলে অনেক টাকা এই কাজের জন্য মজুত থাকে; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, সময়োচিত ব্যয়ের অভাবে এই টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইতেছে।

দেশের অন্নকষ্ট ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। প্রত্যেকেই ঋণগ্রস্ত দারিদ্র্য-পীড়িত। দেশের বারো আনা লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। তন্মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক। ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ আয়ের পথ দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। সামান্য জোতজমিতে এখন আর সংসার চলে না, চাকুরীও দুষ্প্রাপ্য, জাতিগত ব্যবসায়ও লোপ পাইয়াছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পূর্ণই নিরুপায় ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে আয়ে সংসার চলিত, এক্ষণে তাহার চতুর্গুণ আয়েও দুবেলা ভাত জুটে না। এই জেলার যে-সমুদয় গ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাহাদের বারো আনা পরিমাণ গ্রাম উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্টগুলিও কঠোর সংগ্রামে যেরূপ ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইতেছে, তাহাতে তাহারাও যে আর বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে এমন ভরসা হয় না। দেশের লোকের এ বিষয়ে উদাসীনতা ভাঙ্গিবার সময় এখনও কি উপস্থিত হয় নাই?

এই সমস্ত অভাব প্রতিকারের একমাত্র উপায় দেশের সমস্ত নরনারীকে শিক্ষিত করিয়া তোলা। যাঁহারা লোক-শিক্ষার সাহায্য করেন তাঁহারা দেশহিতৈষী, নমস্য। "ত্রিপুরা হিতৈষী" এইরূপ এক বদান্য ব্যক্তির সংবাদ দিয়াছেন—

টাঙ্গাইল-নিবাসী বাবু গোপেশ্বর সাহা সেখানকার ইউনিয়ন স্কুল রক্ষার জন্য এককালীন ২৫০০০টাকা দান করিয়াছেন। পরন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন, যে, অতঃপর উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য যখন যে টাকার প্রয়োজন হইবে তিনিই তাহা দান করিবেন।

ইঁহার দৃষ্টান্ত দেশের সকল ধনী অনুকরণ করিলে দেশ অচিরে সক্ষম হইয়া উঠিবে।

স্বপ্ন-দর্শন

(বানান-বিষয়ক)

ডালহারাদের মেয়েটাকে ছাগলছুধের দাম চুকিয়ে দিয়ে সেদিন দুপুর বেলার গুমোটে, মিন্‌মিনে বর্জ্জাইস হরফে ছাপা একটা দেড়গজী প্রবন্ধ পড়তে পড়তে চোখের ভিতর যখন ক্রমাগত কর্‌কর্ করতে লাগল, তখন অগত্যা চোখ বুজ্‌লুম। কিন্তু এই ল্যালানোতেই যে ল্যালানো তা বুঝ্‌তে পারিনি। চোখ যে বুজেছি এই-টুকুই জানি, সঙ্গে সঙ্গে নাক যে ডেকেছে তার খবর রাখিনি।

হঠাৎ মনে হ'ল, কাঁচা বয়সের কাঁচা-মিঠে গলায় কে যেন বলে উঠ্‌ল, "হলো, হলো সখীও!" আরে! এ যে চেনা গলা! এ যে শকুন্তলার কথা। কল্পনা-লোকের এই অনিন্দ্যসুন্দরীকে চোখে দেখ্‌বার লোভে, যে দিক থেকে গলার আওয়াজ শুনেছিলুম সেই দিকটা লক্ষ্য করে একটু জোরে চল্‌তে চেষ্টা করলুম, কিন্তু কেন জানি না, পারলুম না; আওয়াজ মিলিয়ে গেল, কাউকে দেখ্‌তে পেলুম না।

যখন শকুন্তলার আশা ছাড়লুম, তখন খেয়াল হল যে, যে-রাস্তা দিয়ে চলেছি সে একটা অচেনা রাস্তা, অজানা নগরের এক প্রান্তে তার অবস্থিতি। পথে জনমানব নেই। খানিক চলেই যেমন মোড় ফিরেছি, দেখি সামনে একটি ছোট্ট নদী ঝিরঝির ক'রে বয়ে যাচ্ছে, আর তার ধারে-ধারে সার-বাঁধা যজ্ঞি-ডুমুরের গাছ। আরে! এ তবে শিপ্রা!

উজ্জয়িনীর শিপ্রা! "শিপ্রাবাতঃ পরিণময়িতা কাননো-দুম্বরাণাম্।" ঠাণ্ডা হাওয়া মিহি ঢেউয়ের জাল বুনে সুন্দরী শিপ্রার বুকের উপর খেজুরছড়ি ওড়না জড়িয়ে দিচ্ছে —"শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা চাটুকারঃ।"

হায়! এমন জায়গায় এসেও শকুন্তলাকে দেখতে পেলুম না; এখন করা যায় কি? উজ্জয়িনীর কোন্ "রসবৎ ফলের" আস্বাদ গ্রহণ করি? সাম্‌নে তো কেবল ডুমুর গাছ; ভাল, যজ্ঞিডুমুরের ফল, শুনেছি, খেতে খুব মিষ্টি, সেটা এক্সপার্মেন্ট—এই কাননোদুম্বরের বনেই পরখ করে দেখ্‌লে কেমন হয়? চল্লুম ফল খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে গ্রীষ্মবিরল-পাদপচ্ছায়া সেই পথ ধরে। কিন্তু একটা গাছেও কি ফল আছে? নাঃ। হয়রান হ'য়ে পড়া গেল। উজ্জয়িনীতে লেমনেড্ পাওয়া যায় না? কিম্বা বরফ-জল? অন্ততো ডাব? ঐ যে একটা বাড়ী, মস্ত বাগান বাড়ী। দরজায় আবার কি যেন লেখা রয়েছে! ও! তাই নাকি?......"বররুচির বৃক্ষবাটিকা!" হন্‌হনিয়ে দরজার কাছে গিয়ে ডাক্‌লুম, "বেয়ারা।"

ভিতর থেকে স্নিগ্ধগম্ভীর আওয়াজ এল, "কে বাপু?"

"পথচল্‌তি লোক। একটু বরফ-জল খাওয়াতে পাবেন? ডাব হ'লেও হয়।"

"ভিতরে এস"।

ভিতরে গিয়ে দেখি একজন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ আধা বয়সী লোক এক রাশ শিরীষ ফুল আর একরাশ ভূর্জ্জপাতার পুঁথির মাঝখানে বসে আছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি বল্লেন,—"বরফ এখানে দুর্লভ হ'লেও এবং হিমালয় সুদূর হ'লেও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রসাদে বররুচির ঘরে বরফজলের অভাব নেই। কিন্তু তার চেয়ে কর্পূর-দেওয়া মহিষের কাঁচা দুধ আমি উপাদেয় মনে করি। বিশেষতো পথশ্রমের পর।..এখন তোমার যা অভিরুচি।"

আমি বল্লুম, "বররুচির যা' রুচি-রোচন, অন্ততো সেটা পরখ ক'রে দেখ্‌তে কোনো ভদ্রলোকের আপত্তি থাক্‌তে পারে না।" খুসী হ'য়ে বররুচি ঈষৎ হেসে বল্লেন "তোমার নাম কি বাপু?"

"আজ্ঞে, নবকুমার কবিরত্ন।"

"কবিরত্ন? বেশ, বেশ, তা হ'লে আজ খানিক কাব্যা-লাপ হবে। তোমার বাড়ী কোথায়?"

"মাফ করবেন, ঐটি বল্‌তে পারব না।"

"সেকি? কেন?"

"আজ্ঞে আমার দেশের নাম বাংলা, কি বাঙ্গলা, কি বাঙ্গালা তা কিছুই আজ পর্য্যন্ত ঠিক হয়নি, সুতরাং কোন্‌টা বলব ঠাউরে উঠ্‌তে পারছিনি।"

বররুচি হো-হো শব্দে হেসে উঠে বল্লেন —"আচ্ছা, লিখে বল।"

—"আজ্ঞে মুখে বলায় ত্রিবিধ দুঃখ, লিখে বলায় ততোধিক—পঞ্চবিধ—এই দেখুন—বাংলা, বাঙ্‌লা, বাংগলা, বাঙ্গলা, বাঙ্গালা।"

"অতো হাঙ্গামায় প্রয়োজন কি? যেমন বলে থাক ঠিক তাই লেখ।"

"আজ্ঞে, তা হ'লে যে ভাষায় অতিচার হয়।"

"আর তা না হ'লে যে লেখনীর মিথ্যাচার হয়, তার কি? মুখ যা উচ্চারণ করছে হাতের আঙুলগুলো তা লিপিবদ্ধ না ক'রে হঠাৎ গুরুমশায় সেজে কান মলার মতন করে জিভ্ মলে দিতে আস্‌বে সেটাই বা কি রকম? আমরা বাক্‌কেই দেবতা বলে স্বীকার করি, হংসপুচ্ছ তো আর দেবতা নয়। সে দেবতার ইঙ্গিত লিপিবদ্ধ ক'রে যাবে, এই তার কাজ। কোথায় হংস সরস্বতীর পায়ের তলায় থাকবে, না বাক্-দেবতাকে তোমরা হংসপুচ্ছের তলায় রাখ্‌তে চাও?"

—"আজ্ঞে তা না হ'লে প্রাচীনের সঙ্গে যোগ থাকে না যে,—আমাদের ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা—অর্থাৎ কিনা দেবভাষার দুহিতা কিম্বা দৌহিত্রী কিম্বা প্রদৌহিত্রী তা ঠিক লোকে চিনে উঠ্‌তে পাববে না। তার উপায়?"

—"দেখ বাপু! এটা তোমার কবিরাজ-কবিরত্নের মতন কথা হল;—আমি শুধুই কবি, কাজেই স্বভাবের দোষে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতের ভক্ত। প্রাকৃতের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে তার ভক্ত হয়ে পড়েছি, আর তার রস-বোধে অন্যের সুবিধা হবে বলে প্রাকৃতের ব্যাকরণও রচনা করা গেছে। তাতে সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতের যোগ বাগ্‌দেবতা যতটুকু রক্ষা করেছেন, সেইটুকুই রক্ষা করে চলেছি। আমি আমার লেখনীর বেড়া দিয়ে দুটোকে এক খোঁয়াড়ে ধরে রাখ্‌বার চেষ্টা করিনি। কারণ

ব্যাকরণে বৈয়াকরণের নিজের করণীয় কিছুই নেই। জ্যোতির্ব্বিদ যেমন গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে লিপিবদ্ধ করে থাকেন, বৈয়াকরণ তেম্‌নি বাণীর চরণাঙ্ক ভূর্জ্জপাতায় ধরে নেবেন, তার উপর কোনো কারিগরি ফলানো তাঁর এলাকার বাইরে। আর পুরোণোর সঙ্গে নতুনের যোগ? তাও কি জোর ক'রে রাখা চলে? প্রসবের পরে প্রসূতির সঙ্গে সন্তানের নাড়ীর যোগ যত শীঘ্র ছিন্ন হয় ততই মঙ্গল। নইলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। সেইজন্যে শিশুর নাভি থেকে সদ্য নাড়ী কেটে ফেলার ব্যবস্থা আছে।"

"আচ্ছা, মার যদি পটল-চেরা চোখ হয়, তবে মেয়েরও চোখ কি সেইরকম পটল-চেরা হবে না?"

"উচ্ছে-চেরাও হতে পারে, আটক নেই। দশভুজার মেয়ে লক্ষ্মী সরস্বতীর দুটো দুটো বই হাত নয়; সংস্কৃতের সাতটা বিভক্তির জায়গায় প্রাকৃতে মোটে গোটা দুতিন। তবে মা পদ্মপলাশ-লোচনা বলে, যে-পোটো কুক্কুটনয়না মেয়েকে পদ্মপলাশলোচনা-রূপে অঙ্কিত করে সে মিথ্যাচরণ করে। সে মিথ্যাবাদীর অধম। কারণ একশোটা মিথ্যে বলা আর একটা মিথ্যে লেখা তুল্যমূল্য। সংস্কৃতের দর্প-গর্ব্বিত ভৃত্য বাক্‌-দেবতার অলঙ্ঘ্য অনুজ্ঞায় প্রাকৃতে দব্বগব্বিদ ভিচ্চ হয়ে পড়ে, তার রেফ ঋফলা, তার শিখা উপবীত স্খলিত হয়ে পড়ে, প ব হয়, ত চ হয়, স্বয়ং ব্রহ্মাও তা আটক করতে পারেন না।"

"আপনি এ বল্‌ছেন কি? আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

"কেন সন্দেহ কিসের? সন্ধির নিয়মগুলো কি করে হয়েছে তা জানো? মানুষের চিরচঞ্চল জিভ কথা কইবার সময় জিহ্বামূল থেকে দন্ত পর্য্যন্ত দৌড়োদৌড়ি করে বেড়ায়; সেই সময়ে বর্ণে বর্ণে ধাক্কা লেগে যে-সব ভাঙ্‌চুর আপ্‌নি হয়ে পড়ে এবং যে-সমস্ত মাঝামাঝি রফা অনিবার্য্য হয়ে ওঠে সেইগুলোকেই সূত্রের আকারে লেখা হয়েছে বই ত নয়? এ-সব যে রসায়নের নিয়মের মতন বৈজ্ঞানিক নিয়ম। এখনো কি সন্দেহ ঠেকছে। পাণিনিকে ডাক্‌ব? না পদ্মযোনির কাছে যাবে? কার কথায় তোমার সন্দেহ ভঞ্জন হবে?......অবাক্‌ কাণ্ড!......এই যে মহাত্মা পাণিনি! স্মরণ করবামাত্রেই উপস্থিত হয়েছেন। আসুন, আসুন, আসনে সুখাসীন হোন। আপনি অনেক দিন বাঁচবেন দেখ্‌চি।"

পাণিনি হেসে বল্লেন, "বাঁচব কিহে? আমি যে ঢের দিন মারা গিয়েছি?"

বররুচি। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

"ভাল, ভাল কিন্তু 'মরে বেঁচে কিবা ফল ভাই!' বছরে গণ্ডূষকয়েক জল আর গোটাকতক তিল ছাড়া তো কিছু খাদ্যপানীয় পাবার জো নেই। এখন, অসময়ে স্মরণ করেছ কেন? তা বল।"

"এই অভ্যাগতের সন্দেহ মোচন করতে হবে।"

"কি সন্দেহ?"

'এঁর জিজ্ঞাস্য,—যা বলি তাই লিখব? না, যা বল্‌তুম বা আমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ বল্‌তেন বলে শুনেছি বা যা কেবলমাত্র আর্য্য এম্পারাণ্টো অর্থাৎ যা কেউ কস্মিনকালে বলেন নি তাই লিখ্‌ব?"

"এ সম্বন্ধে তুমি তো আমার মতামত জানো। প্রপিতামহের বুলিই যদি লিখ্‌তে লিখ্‌তে নখের ছন্দ খোয়াব তবে আমার বুলি লিপিবদ্ধ করবে কে? প্রপৌত্র? সম্রাট সর্ব্বদমন যখন সিংহাসনে তখন দুষ্যন্তের নাম কি স্বর্ণমুদ্রায় উঠবে? না রামচন্দ্রী মোহরে ককুৎস্থের বলদ-ছড়া মূর্ত্তি অঙ্কিত কর্ত্তে হবে? মনুষ্যজন্মের পূর্ব্বে মানুষের গোজন্ম হ'য়ে থাকে, তাই বলে সেই পুরাতনের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্যে কেউ কি মুকুটের বদলে একজোড়া গরুর শিং মাথায় পরে?"

"তবে?"

"তবে আর কি? কানে যা শুনছ চোখে তাই দেখ্‌তে হবে। চক্ষু-কর্ণের বিবাদ রাখ্‌লেই গোলে পড়বে। পুরাতনের সঙ্গে যোগ বিয়োগ বুঝিনি। আমি যখন লৌকিক সংস্কৃতের ব্যাকরণ লিখ্‌ছিলুম, তখন বৈদিক সংস্কৃতের পাণ্ডা স্বয়ং লোক-পিতামহ যদি চতুর্মুখে 'হাহাহা' করে হাম্বার হ'য়ে আমাকে মানা করতেন তাহ'লেও আমি তাতে কর্ণপাত করতুম না। যাকে ভগবানের ভাষা বলে মেনে থাকি সেই বেদের ভাষাকেও যখন রেয়াৎ করিনি তখন 'অন্যে পরে কা কথা?' "

বররুচি বল্লেন, "আমিও যখন প্রাকৃতের ব্যাকরণ রচনা

করি তখন "হেতুচক্র-ডমরু"-রচয়িতা তার্কিকচূড়ামণি দিঙ্নাগও আমাকে বাধা দেন নি। তাঁর উপাস্য শাক্য বুদ্ধ প্রাকৃতের পক্ষপাতী ছিলেন বলে তিনিও আমায় অতিচারী বলতে সাহস করেন নি।"

পাণিনি কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়ে হঠাৎ দ্বাদশ সূর্য্যের মত উজ্জ্বল আলোয় দশদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল। দেখলুম একজন দিব্যকান্তিবিশিষ্ট পুরুষ অনিমেষ চক্ষে বররুচির দিকে চাইতে চাইতে হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছেন। নিকটে এসে তিনি বল্লেন "তোমরা অতিচারের কথা কি বল্‌ছ? এবারকার পাঁজী দেখেছ? আমি বৃহস্পতি, দেবতাদের গুরু, এবার আমিও যে অতিচারী হয়েছি। যে রাশিতে এক বৎসর থাক্‌বার কথা সেখানে চার মাস থেকেই সরে পড়েছি। অতিচারের কথা কি হচ্ছিল?"

আমি অভিবাদন করে সহসা সাহসভরে বল্লুম—"আপনি অতিচারী হয়েছেন বলে আমরা অতিচারী হ'লে লোকে গতানুগতিক বল্‌বে। যদিচ ফোর্ট উইলিয়মের বাংলা অতিচারী হ'য়ে পঞ্চাশ বছরের ভিতর খোল নল্‌চে দুই বদ্‌লেছে তরি তাঁ সবাই জানে, তথাপি দূষ্‌তে কেউ ছাড়বে না। কথা হচ্ছে এই, বাংলা বানান সম্বন্ধে গুটিকতক আমার প্রশ্ন আছে আপনি তার সদুত্তর দিলে কৃতার্থ হব; আপনি বৃহস্পতি, বাচস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই, সুতরাং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে প্রশ্নের উত্তর দিন।"

তখন তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ সুরগুরু অগ্নিশিখার মতন ঋজুভাবে অবস্থিত হয়ে বল্‌লেন—"তোমার প্রশ্ন করবার প্রয়োজন নেই, তোমার যা যা জিজ্ঞাস্য তা সবই আমি জানি। একে একে তোমার মানস প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছি, অবহিত হও।—

একটি কথা বানাতে বাক্‌যন্ত্রের যে যে পর্দ্দার ব্যবহার হয় তারি বর্ণনা হ'ল বানান। যে যে হরফ দিয়ে কথাটি বানানো হয়েছে, কথাটি বানিয়ে, কিনা, চিরে চিরে তাই দেখিয়ে দেওয়াকেও বানান বল্‌তে পার।

(১) গোড়ার কথা এই, তোমরা বর্ণমালা ঠিকমত চেন না, সেইজন্যে, গোড়ায় গলদ থেকে গেলে যা' হয় তোমাদের তাই ঘটেছে। উচ্চারণস্থান সম্বন্ধে পাকা-রকম জ্ঞান থাক্‌লে আর বর্গীয় জ অন্তস্থ্য-য দন্ত্য স তালব্য-শ, বলবার দরকার হয় না। সেই সেই জায়গা থেকে বর্ণগুলির উচ্চারণ করতে পারলেই বানান ঠিক হয়। তখন যা বাংলার নয় তা আর বাংলায় লাগাতে যাবে না। এমন কি লাগাতে পারবে না। যা বাংলার ধাতে খাপ খায় না তা আপনি অদর্শন হবে, বেঙাচির লেজের মতন খসে পড়ে যাবে। তখন সংস্কৃত আর তোমাদের হাতে পড়ে বিকৃত হবে না। বাংলাও বানানের গোলযোগে জংলা হয়ে উঠ্‌বে না। উচ্চারণ সম্বন্ধে কাশীও তোমার গুরু নয়, দাক্ষিণাত্যও নয়। বাক্‌-যন্ত্রই হচ্ছে উচ্চারণের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। কোন্‌টা মূর্দ্ধা কোন্‌টা তালু সেইটে চিন্‌লে সকল গোলই মিটবে।

(২) তোমরা জিহ্বামূলীয় পঞ্চমকে উঁঅা বল। তালব্য পঞ্চমকে ইঁয়ো বল। 'ঋ'কে ইঅ বল, 'ক্য'কে 'কিঅ' বল, 'ক্ষ'কে 'খিয়ো' বল, একী অদ্ভুত? এক হরফের নাম একাধিক অক্ষরে প্রকাশ করবার মূঢ়তা, আর যে-দেশেই থাক ভারতবর্ষে ছিল না, অবশ্য ইকার উকার ইত্যাদি স্বরচিহ্ন বাদে। অন্যদিকে একই ধ্বনি বোঝাবার জন্যে কখনো একাধিক চিহ্নও চলিত ছিল না। কিন্তু তোমরা আধুনিকেরা কেন এরকম কর? জিহ্বার জড়তা এর জন্যে দায়ী, না শিক্ষকের মূঢ়তা? 'ঋ'র মধ্যে ই এবং অ দুইই আছে, সত্য, কিন্তু আধ আধ মাত্রা। যার জিভ চট্‌পটে সে ঠিক উচ্চারণ করবে, যে জবড়জং সে 'ইঅ' বলে হাস্যাস্পদ হবে।

'ঙ'র উচ্চারণ 'তিঙন্তে' রয়েছে, লুঙে, লঙে, বিধিলিঙে রয়েছে, ব্যাকরণের অনেক সূত্রে রয়েছে। তোমাদের কৃত্তিবাস লিখেছেন—"ছাড়িলাঙ বিষ্ণুপদে বসতের সাধ।" শূন্যপুরাণ লিখেছেন—"কাত্তিকের সোলুঙেতে নাহিক আফুলা, অঘ্রাণে পাকয়ে শিষ নামিএ পড়ে কলা॥" 'ঙ'র প্রকৃত উচ্চারণ তোমাদের রাঙায় রয়েছে, ডাঙায় রয়েছে। যদি রাঙ্গা লেখ, ভুল লিখ্‌বে। কারণ তা হ'লে দাঙ্গা হাঙ্গামা লিখে শেষে দাঙা হাঙামা পড়ে ফেল্‌বে। তালব্য পঞ্চমের উচ্চারণ তালু থেকেই করতে হয়, বলা বাহুল্য। মূর্ত্তিমান "ঞ" ভূস্বর্গ কাশ্মীরে প্রচুর, যেমন—মানে=মাঞি, বোন্

=ব্যঞ ; পোঞু=জল, পণ্ডিতানী=পণ্ডিতাঞ্ ; বেনেবউ =বাঞ্যঞ। ধান=দাঞ্ ; কুঞ=কুকুর ; তঞর=তন্বতা, কৃশতা। স্বাধীন 'ঞ' আসামেও আছে, যেমন—চিঞবিলে=চেঁচাইলে। প্রাচীন বাংলায়ও প্রচুর—"একঠাই হঞাছেক পর্ব্বত অপার", "মুঞি ব্রহ্মা, মুঞি বিষ্ণু, মুঞি মহেশ্বর"—কৃত্তিবাস। "মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাঞি, সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞি।"—চৈতন্য-ভাগবত। এখন, বোধ হয়, বুঝ্‌তে পেরেছ ঙ ঞ অন্য ব্যঞ্জনের তুল্য পৃথক আসন পেয়ে থাকে, অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এর একমাত্র ধর্ম্ম নয়।

(৩) বাংলায় দুই স্বরাক্ষর যে পরে পরে বসে এবিষয়ে তোমার যে সন্দেহমাত্র হয়েছে এইটেই আমার অদ্ভুত মনে হচ্ছে। দেখ্‌তে চাও?—এই 'এই'ই দেখ, 'আইরী' ক্ষেতে দেখ, 'আইলে' ফকিরের 'আওন'-যাওনে দেখ। 'ওই' দেখ—"ইন্দ্র 'আউল' ঐরাবতে"। আবার, আইনে দেখ, বে-আইনীতে দেখ, পরে পরে দুই স্বর বসে কি না। তুমি উড়িয়ে দিলে কি হবে, ওই দেখ—"হাসিয়া চায় 'আউদড়' দিষ্টি, ডাক বলে ওই সে নষ্টি"। যারা "দুধ আউটে ক্ষীর করে" তারাও যে একথা জানে। যারা আওতার চারা ফাঁকে বসায় তাদেরও এ অবিদিত নেই। যারা আউড়ে আউড়ে পড়া মুখস্থ করে তাদের ত কথাই নেই। এর গোড়া কোথায় জান? ওই শোন কালিদাস কি বল্‌ছেন—

"অঅং মিও, অঅং বরাহো, অঅং সদ্দূলোত্তি"

"কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেধ!"

(৪) অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু আর জিহ্বামূলীয় পঞ্চমের মাঝামাঝি। বাংলায় প্রায় 'ঙ'র মতন হয়ে পড়েছে। সুতরাং হসন্ত 'ঙ'র জায়গায় অনুস্বার দিলে মারাত্মক হয় না। তবে ওর ভিতর যদি 'গ'এর গন্ধ পাও তা' হলে প্রহ্লাদের 'ক' দেখে কেঁদে অজ্ঞান হওয়া হবে। মারাঠিতে অনুস্বার ত্রিবিধ ; (ক) বর্গস্থানোদ্ভূত—অর্থাৎ 'ং'=ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্। যেমন শঙ্কা=শংকা... (খ) নাসিক্য, প্রণবে এর প্রকৃত উচ্চারণ দেখ্‌তে পাবে। (গ) ং=ব্ঁ, যেমন—সংহার=সব্ঁহার (দন্তোষ্ঠ্য)।

(৫) এখন স্বরবর্ণের গায়ে আবার ইকার দেওয়া যায় কিনা এই তোমার জিজ্ঞাস্য? আচ্ছা প্রথমে বিচার ক'রে দেখ যে বাংলায় যাকে স্বরবর্ণ বলা হয় সেগুলি খাঁটি স্বর না বর্ণমালার বর্ণসঙ্কর? না হিন্দুর মতন সমস্তই তোমাদের ব্যঞ্জন মাত্র, কখনো কখনো 'া' 'ি' 'ী' 'ে' প্রভৃতি স্বর তন্মাত্রের সাহচর্য্যেও শব্দিত হয়ে থাকে। তোমাদের 'গাওনা' 'পাওনা' 'নওলা' 'দওলা', দেখ্‌লে তো তাই মনে হয়। ভাউলে, আউলে, সাউখুরি দেখ্‌লেও তাই মনে হয়। তোমাদের 'আইরী ক্ষেতের' 'পাইরী আমের' 'ই' কি স্বরবর্ণ, না বর্ণচোরা ব্যঞ্জন? না হসন্ত স্বর? পাইট বোতলে 'ই'কারের যে ওজন 'পাইরী' আমের 'ই'ও কি তাই? হসন্ত 'ও'র জায়গায় অন্তঃস্থ ব চল্‌তে পারে, কিন্তু ডাইনীর ইকার কোন্ স্বর্গে পড়ায় বশ করবে?

(৬) সংস্কৃতের স্বরমালা যদি বাংলায় এসে সত্যই কতকটা ব্যঞ্জন ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়ে থাকে, তবে তার গায়ে ফলা দিতে হানি কি? বিশেষতো যখন বিবৃত 'এ'কার অর্থাৎ অ্যাকারটার দরকার রয়েছে, তখন ঠ্যাকার ক'রে ঠেকিয়ে রেখে লাভ কি? হাদে দ্যাখো, বাপু, ব্যাকরণকে না হয় বেআকরণ বা ব্‌য়াকরণ পড়লে, কিন্তু 'হ্যাদে'টা পড় কি ক'রে? হেআদে? না হিআদে? ওটা কিন্তু খাঁটি বাংলা কথা।

(৭) বিসর্গকে বিসর্জ্জন দেবে ভাব্‌ছো? ভালো। মুখে দুক্খ বলে, লেখ্‌বার বেলায় দুঃখ লিখে আর মায়া বাড়ানো কেন? শেষের বিসর্গ উঠিয়ে দিয়ে প্রাকৃতের নিয়মে ওকার যোগ করা সমীচীন, যেমন—'ক্রমশো'—নইলে ক্রমশ লিখ্‌লে লোমশ শব্দের সঙ্গে মিল দিতে ইচ্ছা হ'তে পারে। সংস্কৃতে বিসর্গ অনেকটা ফার্সীর হে-হাওয়াজ্, অর্থাৎ হাওয়ার মত হাল্‌কা 'হ'। তাই বলে নমোনমঃ=নমোনমহ নয়। র-জাত স-জাত বিসর্গে 'ঃ'এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। খাটতে-নারাজ বাক্-যন্ত্র 'র্' বা 'স্' স্পষ্ট উচ্চারণ করার পরিশ্রমটুকু বাঁচাবার জন্যে কণ্ঠের উপর বরাত দিয়ে দ্যায়, আর কণ্ঠও বেগারের কাজ বেগার ঠেলার মত করে অর্থাৎ সিকিমাত্রা হসন্ত 'হ' বলেই ছুটি নেয়। দুর্ভিক্ষে ভিখিরীরাই আগে মারা যায়, যে আশ্রয়-স্থানভাগী তার উপর কারো দরদ নেই। তার মরণই মঙ্গল।

(৮) তোমার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে ভাষাকে কট্‌মটে করলে তেজব্যঞ্জক হয় কিনা। তার সোজা উত্তর এই, যে, প্রাণে তেজ না জন্মালে বাণীতে তেজ আস্‌বে না, তা পুরোণো হাঁড়িকুঁড়ি ফেলে হেঁসেল ঘরটা যুক্ত অক্ষরের হাঁড়ি কুঁড়ি দিয়েই সাজাও আর বাঙালীকে বাঙ্গালীই বল আর যাই কর। বাংলা বলা ও বাংলা লেখার এক রকম চেহারা হলে তোমাদের সংস্কৃত উচ্চারণও খাঁটি হবে, চণ্ডীও আর অশুদ্ধ হবে না, নইলে "জা দেবি শর্ব্বভুতেশু ত্রিশ্‌টাঁ-রূপেন শংস্থিতা নমস্তশ্‌শৈ নমস্তশ্‌শৈ নমস্তশ্‌শৈ নমোনমহ" বলে চণ্ডীপাঠ করলে চণ্ডী রাগে উগ্রচণ্ডী হয়ে তোমাদের মুণ্ডে প্রচণ্ডবেগে চপেটাঘাত কর্বেন, এটা স্থির নিশ্চয়, জেনো।"

বৃহস্পতির এই বাক্যে ঘনীভূত আশঙ্কার উদ্বেগে অকস্মাৎ ঠক করে টেবিলে মাথাটা ঠুকে গেল। চট্‌কা ভেঙে চেয়ে দেখি আমি সেখানকার ঠিক সেইখানেই বসে আছি, কোথায় বা বররুচির বৃক্ষবাটিকা আর কোথায় বা সুরগুরু বৃহস্পতি। রাস্তা দিয়ে ফিরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে "রুটি-ই-ইস্কে—পো ও উরুটি-ই!"

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

আলোচনা

অবেস্তা-প্রসঙ্গ।

আষাঢ়ের প্রবাসীতে "অবেস্তাপ্রসঙ্গে" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে 'বোধ হয় বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথমে প্রজ্ঞান্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ই অসুরোপাসক ও আসুরী ভাষা নামে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া (প্রবাসী ১৩১৩ ও ১৩১৪ সাল) বঙ্গবাসীদের নিকট অবেস্তার ধর্ম্ম ও ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করেন।' ইহা ঠিক নহে, কারণ তৎপূর্ব্বে ১৩১২ সালের 'সাহিত্যে' (৭৫১ পৃঃ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'হিন্দু ও পারসীক জাতির সাদৃশ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বেদ ও অবেস্তার ভাষা, দেবতা, উপাসনা, স্তোত্র ও জ্যোতিষতত্ত্বের সাদৃশ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অবেস্তার ধর্ম্ম ও ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম কিনা জানিনা, কিন্তু তিনি যে এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পূর্ব্বগামী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনুঙ্গাক্ষ সরকার।

বাংলা বানান।

আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় "বঙ্গ-ভাষায় অতিচার" সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে আমি প্রধানতঃ 'ও' এ "া"-কার দেওয়া সম্বন্ধে কিছু বলিব। কারণ, সম্ভবতঃ এই "অতিচার" বা "ক্রূরাচারে" প্রবাসীই প্রধান আসামী।

ইংরেজীতে v এবং w এই দুটি অক্ষর আছে। ইহাদের মধ্যে অন্তস্থ ব-এর উচ্চারণ v-এর মত করা ঠিক, না w-এর মত করা ঠিক, তাহার ব্যবস্থা দিবার মত বিদ্যা আমার নাই। কিন্তু হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রীয়দের মুখে অন্তস্থ ব-এর যেরূপ উচ্চারণ শুনিয়াছি, তাহা vএর মত, wএর মত নয়। অন্তস্থ ব-এর উচ্চারণ যাহাই হউক, উহা v এবং w উভয়েরই ধ্বনিবিশিষ্ট নহে। আমার মনে হয়, বাংলাতে যদি অন্তস্থ ব চালান যায়, তাহা হইলে তাহা vএর সমধ্বনিব্যঞ্জক বলিয়া চালানই ভাল। কিন্তু "হওয়া", "খাওয়া" প্রভৃতি শব্দের শেষে যে ধ্বনি পাওয়া যায় তাহা wএর ধ্বনি, vএর নহে। অর্থাৎ ঐ বাংলা কথাগুলির উচ্চারণ hawa, khawa; hava, khava নহে। এই জন্য, বাংলায় ব চালাইলেও w-এর সমধ্বনিসূচক আর-একটি অক্ষরের অভাব অনুভূত হইবে ভাবিয়া, আমি বাংলা কথাগুলি "হওা," "খাওা" এইরূপ লিখিতে চাই। আমি "হওআ," "খাওআ"ও লিখিয়াছি; কিন্তু তাহা দ্বারা ঠিক্ উচ্চারণটি পাওয়া যায় না। কারণ বাংলা কথা-গুলির উচ্চারণ hawa, khawa; "হওআ," "খাওআ" লিখিলে কথা দুটি, ha-o-a, kha-o-a, এইরূপ উচ্চারিত হইতে পারে, এবং "হওআ," "খাওআ" বানানের এই প্রকার উচ্চারণই শুদ্ধ ও সঙ্গত।

এখন কথা উঠিতে পারে, যে, যদি w-এর উচ্চারণ বুঝাইবার মত একটি অক্ষর দরকার হয়, ত, নূতন একটি অক্ষর সৃষ্টি করিয়া লওা ভাল, না, চলিত "ও"টিকেই তাহার প্রচলিত কাজ ছাড়া এই কাজেও লাগান ভাল? আমি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিতে চাই না। বাংলার চেয়ে ইংরেজীতে অক্ষর কম আছে বলিয়া ইংরেজী বর্ণমালা অপেক্ষাকৃত অবৈজ্ঞানিক বটে; কিন্তু ছাপার কাজের ও টাইপরাইটারের কাজের সুবিধা ইংরেজীতে খুব বেশী। বাংলায় স্বরগুলির দুই রূপ এবং বিস্তর যুক্তাক্ষর থাকায় অক্ষরনির্ম্মাণ এবং ছাপার জন্য অক্ষর-যোজনা ইংরেজীর চেয়ে বেশী সময়সাধ্য ও কঠিন। এইসব কারণে আমি আর অক্ষর বাড়াইতে চাই না, বরং কমাইতেই চাই। সে বিষয়ে কিছু লিখিবার ইচ্ছা বহু বৎসর হইতে আছে, কিন্তু এখনও ঘটিয়া উঠে নাই।

নূতন অক্ষর সৃষ্টি, ও পুরাতন অক্ষর দ্বারা কাজ চালান, উভয় পক্ষেই কিছু বলিবার আছে। আমি পুরাতনের দ্বারা কাজ চালাইবার পক্ষপাতী। "ওা" এবং "ঔ" এ ভ্রম হইতে পারে বটে; কিন্তু ষ ও য, ক্র ও ক্র, এ ও ত্র, প্রভৃতি অক্ষরেও ভ্রমের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কাজ চলিতেছে।

"ও" একটা স্বর, তাহাতে একটা "া"কার জুড়িয়া দেওা কি ঠিক্? আমি বলি "দেওা" কথাটির "ও" "w"এর মত একটি স্বরব্যঞ্জনের যোগ-জাত মিশ্র বর্ণ। ইহা যে অবৈজ্ঞানিক নহে, তাহার প্রমাণ যোগেশ বাবুর প্রবন্ধেই পাওা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "ব-টা ব্যঞ্জন বটে, স্বরও বটে।" আমি তাঁহার কথার অনুসরণ করিয়া যদি বলি, "'ও'-টা স্বর বটে, ব্যঞ্জনও বটে," তাহা হইলে "অতিচার" বা "ক্রূরচার" না হইতেও পারে। "ও"-তে "া-"কার জুড়িবার বিরুদ্ধে যোগেশ বাবুর একটি আপত্তি এই যে, "া" চিহ্নটি "া-"কারের ব্যঞ্জনে-যোগ-যোগ্য মূর্ত্তি, "যে মূর্ত্তি কেবল ব্যঞ্জনাক্ষরে জুড়িবার নিমিত্ত চলিয়া আসিতেছে, সেটা স্বরাক্ষরে জুড়িতে পারা যায় কি?"

উত্তরে আমি বলি—"ও"-টিকে আমি আধারস্বর-আধারাক্ষর বলিয়া ধরিয়া তাহাতে "া"কার লাগাইতেছি, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তা ছাড়া, "া"-চিহ্নটি "কেবল ব্যঞ্জনাক্ষরে জুড়িবার নিমিত্ত চলিয়া আসিতেছে," ইহাও ঠিক নয়; কেন-না "অ" নামক স্বরবর্ণে "া" চিহ্ন লাগাইয়া "আ" নামক স্বরবর্ণ লিখিত হইতে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। আমার জন্মের অনেক আগে লেখা ও ছাপা পুঁথিতেও দেখিয়াছি।

যোগেশবাবু লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালায় দুই স্বরাক্ষর পরে পরে বসে না।" কিন্তু ইহার ত ব্যতিক্রম রহিয়াছে। যথা,—আইল, উই, এই, অই, ওই, অগ্নী, আই, আইমা, আইবড়, আউল, আউস, আওটান, আওড়ান, আওতা, ওআড়।

আমি যে যে কারণে "হওা," "খাওা," "পাওা" লিখিতে চাই, তাহা বলিলাম। তবে, এ বিষয়ে আমার কোন জেদ নাই। বানানের পরিবর্ত্তন সব দেশেই হয়; আমাদের দেশেও হইয়াছে, হইতেছে, হইবে। বানানের শুদ্ধতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু ইহাকে মস্ত একটা গুরুতর ব্যাপার বলিয়া আমি মনে করি না। শেক্সপিয়রের নামের ভিন্ন ভিন্ন রকম বানান আছে; এবং তাঁহার নাটকগুলির প্রাচীন সংস্করণ সমূহে একই ইংরেজী শব্দের নানা রকম বানান দৃষ্ট হয়। এইরূপ বৈসাদৃশ্য ও বৈচিত্র্যে তাঁহার কবিত্ব কমিয়া যায় নাই। আমাদের বাংলা প্রাচীন পুঁথিতেও একই শব্দের নানা রকম বানান আছে। তাহাতে রামায়ণ, মহাভারত, আদির মূল্য কমিয়া যায় নাই। বানান প্রসঙ্গে "অত্যাচার" কথার প্রয়োগ আমার বিবেচনায় সঙ্গত নহে; "ক্রূরচার" কথাটির প্রয়োগ আরও অসঙ্গত। এসব কথা কেবল নৈতিক (moral) অপরাধের বা দুর্ব্যবহারের নিন্দা করিবার জন্য প্রযুক্ত হইলেই ভাল হয়।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পৃথ্বীরাজ

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার এই মহাকাব্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, "কবিতা-রসবিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য; মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।" আমরা তাঁহার এই কথা মনে রাখিয়া তাঁহার গ্রন্থখানির কিছু পরিচয় দিব।

কেবল গল্প পড়িবার জন্য, কাব্য পড়িবার জন্য, এই বহি পড়া যায়; কেবল ইহার গল্পটি পড়িতেও মন আকৃষ্ট হয়, এবং কাব্যরসপিপাসুর তৃপ্তির জিনিষও ইহাতে আছে। কিন্তু গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হইতে হইলে পাঠককে উপক্রমণিকাটি এবং পাদটীকাগুলিও মন দিয়া পড়িতে হইবে। যোগীন্দ্রবাবু উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন:—

"পৃথ্বীরাজের এবং তাঁহার সঙ্গে হিন্দু স্বাধীনতার পতন এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। যে যে কারণে এই পতন ঘটিয়াছিল, আমি, যথা-শক্তি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদিগের দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে মুসলমান-অধিকার স্থাপন হইতে, এবং প্রকারান্তরে তাহারই ফলে, সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুজাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে, রাম, যুধিষ্ঠিরের কালের পরেই মুসলমান রাজত্ব আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণোক্ত ও মহাভারতবর্ণিত কালের পর বহুশত বৎসর বিগত হইলে যে মুসলমান-স্পর্শ ঘটিয়াছিল এবং সেই মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল উৎসাদিত হইবার এবং পরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত ও বিধ্বস্ত হইবার ফলে, ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহারে, মানসিক ভাবে এবং প্রবৃত্তিতে যে মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহারা চিন্তা করেন না। যাঁহারা সংস্কৃত ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিবেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, মুসলমানেরা এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অধঃপতিত হই নাই, আমরা অধঃপতিত হইয়াছিলাম বলিয়াই তাঁহারা এ দেশে আসিতে ও স্থায়ী ভাবে বসিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ভারতবর্ষের উর্ব্বরতা, স্মরণাতীত কাল হইতে, বিদেশীগণকে আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছে। পারস্যরাজ দরায়ুস হইতে সিকন্দর, সিলিউকস, কাসিম, সবুক্তজীন, মামুদ প্রভৃতি বহু বৈদেশিক বীর, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভারতবর্ষকে উপদ্রুত করিয়াছিলেন। কিন্তু মিতাচারে অভ্যস্ত, সবল দেহে রোগের ন্যায় তাঁহাদিগের আক্রমণ হিন্দুর জীবনী শক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। অমিতাচারে ভগ্ন দেহে রোগের ন্যায় বর্ত্তমান কাব্যে আলোচ্য আক্রমণ সেই শক্তিকে, একবারে নষ্ট না করুক, নষ্টপ্রায় করিয়াছিল।

"সাধারণতঃ সামরিক শক্তির ন্যূনতার জন্যই একটি জাতি অপর একটি জাতির অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হন। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসংখ্য লোক, মুষ্টিমেয় লোকের অধীন হইয়া, সুদীর্ঘকাল অতিবাহন করেন, তখন মনে হয়, কেবল সামরিক শক্তিতে নিকৃষ্টতা নয়, তাহার পশ্চাতে অধীন জাতির অন্যবিধ দুর্ব্বলতা বিদ্যমান আছে এবং তাহাই তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ। আমার কাব্যে আমি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

"রাষ্ট্রীয় দুর্ব্বলতার সঙ্গে জাতীয় নৈতিক দুর্ব্বলতাই যে ভারতবর্ষে মুসলমান-অধিকার স্থাপনের কারণ তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি। পূজ্যপাদ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মুসলমান-আক্রমণ বৌদ্ধ দুর্নীতির ও অসদাচারের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'এক একবার মনে হয়, তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া, বৌদ্ধেরা, ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্ম্মান্বিত ও ভূত-প্রেতের উপাসক হইয়া যে, নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকেও শুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা, যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য, মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন।' কিন্তু বৌদ্ধগণ যে যে অপরাধে অপরাধী ছিলেন, হিন্দুগণ যে তাহাদের মধ্যে কোনওটি হইতে নির্ম্মুক্ত ছিলেন না, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হইলে, 'ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠা, মূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধি লাভের চেষ্টা, ভূত, প্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তি' প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যে তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলিয়াই ধারণা হয়। কে কাহার শিক্ষক তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। পরস্পরের সম্বন্ধ যাহাই হউক, কোন কোন স্থলে, ছাত্র শিক্ষককে পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নয়। বিধাতা যদি শাস্তি দিবার জন্যই পাঠাইয়া থাকেন, তবে কেবল বৌদ্ধদিগকে শাস্তি দিবার জন্য নয়, হিন্দু, বৌদ্ধ উভয়কেই শাস্তি দিবার

* পৃথ্বীরাজ। ঐতিহাসিক মহাকাব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিতলেখক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বিএ বিরচিত। কলিকাতা। ১৩২২। মূল্য দুই টাকা। ৩০২+২২ পৃষ্ঠা। সাতখানি চিত্র আছে। তাহার মধ্যে তিনখানি কল্পিত ও তিনরঙে ছাপা। চারিখানি ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি। বহিখানি উৎকৃষ্ট পুরু চিক্কণ কাগজে নূতন অক্ষরে সুমুদ্রিত, এবং কাপড়ে বাঁধান। মলাটের উপর বহির ও গ্রন্থকারের নাম সোনালী অক্ষরে লেখা।

জন্ম মুসলমানকে পাঠাইয়াছিলেন। এক দিকে হিন্দু, অপর দিকে মুসলমান উভয়ের পেষণে অপেক্ষাকৃত ন্যূনসংখ্যক বৌদ্ধগণ বিচূর্ণ হইয়াছিলেন; তাদৃশ কারণের অভাবে সংখ্যাধিক হিন্দুগণ হন নাই। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ও হিন্দু জাতির শক্তিক্ষয়ের 'একাধিক কারণের' মধ্যে 'রাজপ্রজাসাধারণ-ব্যভিচারই' এক 'প্রধান কারণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'মৌর্য্যবংশের পতনের পর হইতেই ভারতে রাজশক্তির বিলোপ আরম্ভ হয় ও উপর্য্যুপরি রাজবিপ্লব ও বৈদেশিক আক্রমণে উত্তর ভারত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। এই শক্তিক্ষয় একাধিক কারণে সংঘটিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তবে রাজপ্রজাসাধারণ-ব্যভিচারই যে ইহার এক প্রধান কারণ তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে প্রতিভাত হইবে।'

"ইহার পর শাস্ত্রী মহাশয় বাৎস্যায়ন প্রণীত কামশাস্ত্রের পারদারিক অধিকরণ অবলম্বনে তৎকাল-প্রচলিত যে সকল প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য ব্যভিচার-রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে আমাদিগের অধঃপতনের কারণ বুঝিতে কালব্যাজ হয় না। উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগের প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহা বলা আবশ্যক তাহাই মাত্র বলিয়াছেন; অপ্রাসঙ্গিক বোধে অপর কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। আমাকে, প্রয়োজনানুবোধে, এতদতিরিক্ত কারণ অনুসন্ধান ও নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে। দুর্নীতির ও অসদাচারের ফলে যে দৌর্ব্বল্য অবশ্যম্ভাবী তাহার উল্লেখের সঙ্গে আমি দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মগত ও প্রদেশগত পার্থক্যের জন্য ভারতবাসিগণ সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম ছিলেন; ঔদাসীন্যের, অজ্ঞতার ও অদূরদর্শিতার জন্য ভারতীয় জনসাধারণ মুসলমান-আক্রমণের পরিণাম বুঝিতেন না; উত্তর ভারতের দুইটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য পারিবারিক কারণে বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান হইয়া শত্রুর পথ সুগম করিয়াছিল; তাহার উপর হিন্দুগণ উদ্‌যোগিতায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়, সামরিক শিক্ষায়, এবং কূটরাজনীতি-কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বিদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন।* এই সকল কারণেই, বীর্য্যে ও বুদ্ধিমত্তায় হীন না হইলেও, তাঁহাদিগের পতন ঘটিয়াছিল। উপরিউক্ত কারণগুলির মধ্যে যেটি মুখ্য এবং আমার কাব্যের বর্ণনীয়, আমি তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি; গৌণ কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছি।

"আমার পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে সামরিক শিক্ষার অভাব এবং অসদাচার জাতীয় পতনের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ত পৃথীরাজে লক্ষিত হয় না, তবে তাঁহার পতন হইল কেন? ইহার উত্তর প্রথমতঃ এই যে, কাহারও পতন একটিমাত্র কারণে ঘটে না; কারণবিশেষের অভাব হইলেও অপর কারণসমূহের সমবায়ে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ এই যে, মনুষ্য কেবল নিজের কার্য্যের ফলভোগী নহেন; সামাজিক জীবরূপে তাঁহাকে অন্যকৃত কার্য্যের জন্য দণ্ডপুরস্কারের অংশভাগী হইতে হয়। পৃথীরাজ, স্বয়ং বীর ও নির্ম্মলচরিত্র হইলেও, যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলি অর্পিত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, এই জগৎ কেবলমাত্র ভৌতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। আধ্যাত্মিক শক্তি, ভৌতিক শক্তির পশ্চাতে থাকিয়া, ইহা শাসন ও পালন করিতেছে। হিন্দুজাতির দুষ্ক্রিয়ার ও পাপের শাস্তির জন্য বিধাতা যে দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিহত করিবার শক্তি, পৃথীরাজই হউন বা অপর কেহ হউন, মনুষ্যের আয়ত্ত ছিল না। যে ঘটনাসমবায়ে পৃথীরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে পাঠক ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন।"

দুর্নীতি ও অসদাচার ব্যতীত গ্রন্থকার হিন্দুজাতির অধঃপতনের আর যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক্। কেবল ক্ষত্রিয় বা তদ্রূপ শ্রেণীর যুদ্ধব্যবসায়ী কতকগুলি লোকের উপর নির্ভর করিলে দেশরক্ষা করা যায় না। বিদেশ যাতায়াত না থাকিলে অন্য দেশ হইতে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় সামরিক বিদ্যারও নূতন কিছু শিখা যায় না; এবং কূপ-মণ্ডূকের মত একটা আত্মতৃপ্ত ভ্রান্ত অহঙ্কার জন্মে। তা ছাড়া, "উচ্চ" বর্ণের হিন্দুরা "অনাচরণীয়" ও "অস্পৃশ্য" জাতিদিগকে বহু শতাব্দী হইতে অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন; অনেক স্থলে মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নও যে করেন নাই, তাহা নয়। এ-সব কথা ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাই সর্ব্বাগ্রে এবং বেশী করিয়া বলিয়াছেন; কিন্তু ভূদেববাবু ও বিবেকানন্দ স্বামীর মত হিন্দুও হিন্দুসমাজের এই সব দোষের উল্লেখ ও নিন্দা করিয়াছেন। বাস্তবিক, হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট স্বধর্ম্মীপ্রেম আগেও ছিল না, এখনও জন্মে নাই। এবং ভারতবাসী হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টিয়ান মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই স্বদেশবাসীর প্রতি ধর্ম্মনির্বিশেষে প্রেম যথেষ্ট প্রবল হয় নাই। তাহার উপর আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রীতি ও এক-স্বার্থতার বন্ধন এখনও যথেষ্ট দৃঢ় হয় নাই। এই সব কারণে যোগীন্দ্রবাবুর কাব্যখানি খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীরা উপকৃত হইবেন। কাব্য হিসাবে ইহার উৎকর্ষ অপকর্ষ কতটুকু ও কিরূপ তাহা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহা যে একটি সুলিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তক এবং স্বদেশহিতৈষী মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য, ইহা বলিতে আমরা কোন দ্বিধা বোধ করিতেছি না।

স্বদেশপ্রেম জাগাইবার জন্য ঐতিহাসিক কাব্য বা উপন্যাস লেখায় অনিষ্টের সম্ভাবনাও খুব আছে এবং অনিষ্ট হইয়াছেও। এই সব পুস্তক প্রায়ই হিন্দুমুসলমানের বিবাদ অবলম্বন করিয়া লেখা হয়। অধিকাংশ লেখক হিন্দু; তাঁহারা মুসলমানদিগকে যেরূপ করিয়া আঁকেন, তাহা মুসলমানদের পক্ষে প্রীতিকর হয় না। অযথানিন্দা বা অতিরঞ্জনের কথা বলাই বাহুল্য; খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য লিখিলেও তাঁহাদের প্রীত না হইবারই সম্ভাবনা। স্কটল্যাণ্ডবাসীরা তাঁহাদের জাতীয় বীর ওয়ালেসের গুণ কীর্ত্তন করিয়া ইংরেজের অখ্যাতি করিলে এখন আর স্কচে ইংরেজে মারামারি বা মনোমালিন্য হয় না। সমস্ত গ্রেট-ব্রিটেন-ব্যাপী স্বদেশপ্রেম এখন আর-সব ভাবকে ডুবাইয়া দিতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষের এখনও সে অবস্থা হয় নাই; কিন্তু হইবার আশা যে নাই, তাহা মনে করি না। যোগীন্দ্রবাবু মুসলমানদের সম্বন্ধে খুব নিরপেক্ষ ভাবে লিখিয়াছেন। "যাহাতে হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ কোনও শ্রেণীর

"* রামায়ণ, মহাভারতের যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠে অভ্যস্ত হিন্দুর নিকট মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু সামরিক শিক্ষায় নিকৃষ্ট ছিলেন, এ কথা অপ্রীতিকর এবং তজ্জন্য অনাস্থাযোগ্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, কাসিমের আলোর জয় হইতে আহম্মদ সা আব্দালির পানিপথ জয় পর্য্যন্ত, হিন্দুমুসলমানের জয়, পরাজয় গণনা করিলে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। তবে এ কথা সত্য বটে যে, হিন্দুরা, পরাজিত হইলেও, মুসলমানকে প্রবল বাধা দিতে পারিয়াছিলেন এবং যখন পৃথীরাজ, প্রতাপ বা শিবাজীর ন্যায় প্রতিভাশালী বীর হিন্দুর নেতা হইয়াছেন, তখন তাঁহারা, মধ্যে মধ্যে, মুসলমানকে পরাজিতও করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে সামরিক শিক্ষার প্রচার ও উৎকর্ষ না হওয়ায় তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সাহস ও বীর্য্য যে পরশক্তি-প্রতিরোধে সম্যক্ কৃতকার্য্য হয় নাই, তাহা অবিশ্বাস করিলে চলিবে না।"

পাঠক ব্যথিত হইতে পারেন, মনঃকল্পিত এরূপ কোন কথা" তিনি বলেন নাই। মুসলমানদিগকেও এই কাব্য পড়িতে অনুরোধ করি। ভারতাক্রমণকারী মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মবিস্তারের জন্য, কেহ কেহ রাজ্যস্থাপন ও ধর্ম্মবিস্তার উভয় উদ্দেশ্যে, এবং কেহ কেহ লুণ্ঠন ও তদপেক্ষা জঘন্য উদ্দেশ্যে যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্যের দ্বিতীয় ও সপ্তম সর্গে মহম্মদ ঘোরীর প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রণা পড়িলে বুঝা যায়। এই দুই সর্গে তখনকার হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব ও দুর্ব্বলতা কিসে ছিল, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। মহম্মদ ঘোরী কেন ভারত আক্রমণে সফলকাম হইবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা তিনি এইরূপে বলিয়াছেন :—

"প্রকৃতি তাদের
বুঝেছি উত্তম আমি। বীরত্বে, বিক্রমে
যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তারা; ধরে বহুগুণ,
কিন্তু জাতি-জ্ঞাতি-বৈরে জর্জ্জরিত তারা;
ভ্রষ্ট সত্যধর্ম্ম হ'তে; পতন তাদের
অনিবার্য্য। শিলাখণ্ড বাঁধা পরস্পর
রোধ করে গিরিস্রোত, তরঙ্গ উত্তাল;
কিন্তু অনাবদ্ধ হ'লে, উলটি পালটি,
হয় ক্রমে রেণুশেষ। হিন্দু বটে দৃঢ়,
বন্ধনী না আছে কিন্তু তাহাদের মাঝে।
শত জাতি, শত ধর্ম্ম, শত রাজ্য যেথা
ধ্বংসে রত পরস্পর, কেমনে তথায়
বন্ধন, মিলন হবে? কিন্তু মোরা সবে
এক জাতি, এক ধর্ম্মী, এক ভূপতির
আজ্ঞাধীন; মোরা যবে হ'ব অগ্রসর,
স্রোত-মুখে বালুসম যাবে ভাসি তারা।
আর(ও) শুন গূঢ় কথা, মূঢ় হিন্দুজাতি
গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশিতে না হয় বিমুখ।
চিরদিন এই রীতি শুনিতেছি আমি,
যখন(ই) বিদেশী কেহ প্রবেশে ভারতে
স্বদেশ-স্বধর্ম্মদ্রোহী হিন্দু কোন জন
আসি পক্ষ লয় তার। সিকন্দর বীর
পশিলা পঞ্জাবে যবে, তক্ষশিলাপতি
অশ্ব, অর্থ, খাদ্য সনে শিবিরে তাঁহার
পাঠাইয়া দিল দূত। সুলতান মামুদে
লয়ে অশ্বসৈন্য দুই শিবানন্দ রায়
করিল সাহায্য দান। প্রবেশিলে মোরা
হিন্দুস্থানে, সাহায্যের না হবে অভাব।
জান সবে হিন্দুস্থানে ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে
অগ্রগণ্য দিল্লী। আমি পেয়েছি সংবাদ,
বিবাদের বিষবীজ হয়েছে রোপিত
দিল্লীরাজ্যে। বৃদ্ধ রাজা গেলে তীর্থবাসে
বাধিবে বিবাদ ঘোর ভ্রাতায় ভ্রাতায়;
একে করি হস্তগত নাশিব অপরে।
দিল্লী যদি একবার হয় অধিকৃত,
ইসলাম প্রভুত্ব স্থায়ী হবে হিন্দুস্থানে।"

সংযুক্তা রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্যের সম্মুখে স্বীয় পতির শবের সহিত চিতারোহণ করেন। উভয়ের দেহ ভস্মীভূত হইলে—

বদ্ধাঞ্জলি তুঙ্গাচার্য্য, নতজানু হয়ে,
চাহিয়া আকাশপানে কহিলেন পুনঃ;
"হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-পতি! অন্তর্য্যামী তুমি.
জানিছ অন্তর-কথা। ছিল অভিমান,
পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তারে লয়ে, পুনর্ব্বার,
রাম-সীতা-বশিষ্ঠের দেখাব মিলন.
ভাঙ্গিলে সে দর্প, দেব! দর্পহারী তুমি।
কিন্তু যদি কর্ম্মার্জ্জিত থাকে পুণ্য কোন(ও),
তবে, এ বাসনা মোর পূর্ণ কোরো, দেব;
পতিতপাবন তুমি, করেছ উদ্ধার
কতই পতিত জাতি, পতিত ভারতে
উদ্ধার করিও তবে। হিন্দু নর, নারী
দ্বিধাহীন হয়ে যেন পারে বুঝিবারে,
হিন্দুর দুর্গতি-মূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর;
প্রায়শ্চিত্ত-অন্তে দুঃখ, দৈন্য হ'বে দূর।"

ইহাই গ্রন্থের শেষ কথা। পৃথ্বীরাজের সময়ে ভারতবর্ষকে মোটের উপর হিন্দুরই দেশ বলা যাইতে পারিত। এই জন্য কবি, তাহাদেরই প্রায়শ্চিত্ত-অন্তে দুঃখদৈন্য দূর হইবার কথা বলিয়াছেন। এখনকার ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর দেশ নয়। এখন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান শিখ আদি সকলের সম্মিলিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের উদ্ধার হইবে না। এই প্রায়শ্চিত্তের কথা অন্য কোন কবি হয়ত লিখিবেন।

কবির শব্দসম্পদ আছে এবং তিনি বিবিধ ছন্দে রচনা করিতে দক্ষ। ভাব প্রকাশার্থ কথার জন্য, বা ছন্দের মিলের জন্য তাঁহাকে হাতড়াইতে হয় নাই। কষ্টকল্পনার আশ্রয় তাঁহাকে লইতে হয় নাই। তাঁহার যুদ্ধের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে পাঠকের রণোন্মত্ততা না জন্মিলেও, সকল সর্গেই তাঁহার কবিতার স্রোত অবাধগতিতে প্রবাহিত। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায়, এবং সীমাহীন দিশাহীন ব্যোম ও নক্ষত্রলোকের অসীমতার ভাব মনের মধ্যে মুদ্রিত করিতে তিনি নিপুণ। মনের মধ্যে শান্ত পবিত্র উচ্চ ভাব উদ্রেকে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। দুই এক স্থানে সেকেলে রুচির অনুযায়ী নারীদেহের বর্ণনা তাঁহার পুস্তককে বিকৃত করিয়াছে।

পৃথ্বীরাজ, গোবিন্দ, মহম্মদ ঘোরী, প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র চিত্রণ কবি নৈপুণ্যের সহিত করিয়াছেন। সংযুক্তাকে, সম্ভবতঃ ইতিহাসের খাতিরে, কবি পৃথ্বীরাজের অন্যতমা পত্নী করিয়াছেন। বহুপত্নীকের পত্নী হইতে সম্মত হওয়াতে নারীর নারীত্বের অগৌরব হয়। সীতা খুব পতিব্রতা হইলেও তিনি যদি রামচন্দ্রের অন্যতমা পত্নী হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে যে চোখে দেখি, যে ভাবে পূজা করি, তাহা করিতে পারিতাম না। সংযুক্তার সপত্নীদের সহিত ব্যবহার অশোভন হয় নাই। তাহাতে যে কৃত্রিমতা ছিল, তাহাও বলা যায় না। সামাজিক রীতি, শিক্ষা, নারীকে সপত্নীসহ, সপত্নীর সহিত শিষ্টাচারে অভ্যস্ত করিতে পারে। কিন্তু দাম্পত্যপ্রেমের একনিষ্ঠ আদর্শে অনুরাগী মানবহৃদয় এ সকলের মধ্যে কেমন একটা অস্বাভাবিকতার গন্ধ পাইয়া চঞ্চল ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। বহুপত্নীক প্রৌঢ়ের সঙ্গে সতী তরুণীরও প্রেমের লীলা এরূপ হৃদয়ের ভাল লাগে না। কালিদাসের দুষ্মন্তকে আমাদের ভাল লাগে না। শকুন্তলা কণ্বমুনির আশ্রমে যখন তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন তখন তাঁহাকে একটা বহুবিবাহিত রাজা বলিয়া জানিতেন না। সেই ঋষিকন্যা রাজার অন্তঃপুরে সপত্নীদের মধ্যে একজন হইয়া বাস করিতেছেন, এবং প্রৌঢ় রাজার সঙ্গে তাঁহার প্রেমের খেলা চলিতেছে, কালিদাস এরূপ একটা দৃশ্য না দেখাইয়া ভালই করিয়াছেন। আমরা যোগীন্দ্র বাবুর দোষ দিতেছি না। তিনি তাঁহার প্রধান পাত্রপাত্রীকে দেশকালের অনুযায়ী করিতে গিয়া উচ্চতম আদর্শের অনুরূপ করিতে পারেন নাই, তাহাই বলিতেছি। কিন্তু পৃথ্বীরাজের সংযুক্তার প্রতি প্রেমে আর কোন খুঁত নাই। বহুপত্নীকতা যে পাপ, তাহা পৃথ্বীরাজ মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বতঃ অনুতাপের সহিত স্বীকার করেন। তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার রাজধর্ম্মপালন শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। সংযুক্তাও তেজস্বিতায়, প্রজাদের প্রতি বাৎসল্যে ও তাহাদের হিতসাধনে পৃথ্বীরাজের উপযুক্ত মহিষী। অষ্টাদশ সর্গে রাজার মৃত্যুর দৃশ্য, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার সমুদয় উক্তি পাঠকের মনকে ধর্ম্মের ও স্বদেশপ্রেমের পুণ্যলোকে লইয়া যায়। এই শেষ সর্গে সংযুক্তার সহমরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাকে আমরা যেমনটি দেখিতে চাই, এই সর্গে তাঁহার সমুদয় কাজ ও কথা তাহার অনুরূপ হইয়াছে। পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত এই শেষ ছবির সঙ্গে ভারতপূজিতা সংযুক্তার মানসীমূর্ত্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। মনে হয়, যে দেশে এমন রাজারাণী জন্মে, তাহার দুর্গতি হয় কেন? তাহার উত্তর কবি উপক্রমণিকা হইতে উদ্ধৃত অংশে এবং "স্বপ্নাভাসে" দিয়াছেন।

"দেশব্যাপী বিষবায়ু হইলে সঞ্চিত
মহা ঝঞ্ঝা বিনা কভু নাহি হয় দূর।
সঘনে গরজে বজ্র, বহে ঝঞ্ঝাবায়ু,
উৎপাটিত হয় তরু, ছিন্ন হয় লতা;
ভাঙ্গে দেবালয়, ভাঙ্গে শৌণ্ডিক-বিপণি,
তপোবন, উপবন, চূর্ণ হয় দুই।
প্রাসাদ, কুটীর ভাঙ্গে, মরে পশু, পাখী,
বাল, বৃদ্ধ, সাধু, চোর মরে অবিভেদে,
কিন্তু পরিণামে হয় পরম কল্যাণ;
ধ্বংসশেষে নব সৃষ্টি বিধি বিধাতার।
জেন স্থির, ঋষিগণ! বিপ্লব মহান্
যদি নাহি করে চূর্ণ, ভূমি বিলুণ্ঠিত
মোহান্ধ, মদান্ধ যত আর্য্যসুতগণে;
জ্ঞাননেত্র যদি নাহি হয় উন্মীলিত
কশাঘাতে তাহাদের, নূতন সমাজ,
ভ্রাতৃস্নেহে সুদৃঢ়, ধর্ম্মে জাতিগর্ব্বহীন,
উপেক্ষিতে, অনাদৃতে কর্ত্তব্য-নিরত,
না হ'বে গঠিত কভু। পুণ্য আর্য্যভূমি,
বৈরাগ্যে, সংযমে, প্রেমে অতুল ভূতলে,
কখন না পা'বে ধ্বংস; কিন্তু মুক্তি তরে
চাহি প্রায়শ্চিত্ত তার। শুন ভবিষ্যৎ,
সমাগতপ্রায় কাল। ঘনীভূত অই
পশ্চিমে অমোঘ মেঘ; আসিছে ঝটিকা;
দেখ নিরখিয়া সবে।" নীরবিলা বাণী।

প্রধান প্রধান পাত্রপাত্রীর কথা বলিতে গিয়া অজ্ঞাত-কুলশীল নামহীনদের কথা ভুলিলে চলিবে না। বিজন উষর প্রান্তরে অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় নির্ম্মিত কুটীরে পৃথ্বীরাজ মৃত্যুশয্যায় শয়ান।

মধ্যাহ্ন বিগত। ভূপ মেলিয়া নয়ন
দেখিলেন চতুর্দ্দিক। নেত্র উভয়ের
হ'ল সম্মিলিত। গুরু মধুর বচনে
কহিলেন; "রহ, বৎস! স্থির ক্ষণকাল।"
হেনকালে আসি এক কৃষক-রমণী,
মৃদ্ভাণ্ডে লইয়া দুগ্ধ, দাঁড়াল দুয়ারে।
তুঙ্গাচার্য্য, লয়ে দুগ্ধ, অতি সাবধানে,
ভূপের অধর, ওষ্ঠ করি প্রসারিত,
অঙ্গুলির অগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু করি
লাগিলা ঢালিতে, কিন্তু সৃক্কণী বহিয়া
পড়িতে লাগিল দুগ্ধ; অল্প মাত্র তার
পশিল উদরে। বীর ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
কহিলা, অঙ্গুলি হ'তে খুলি অঙ্গুরীয়,
দিতে পুরস্কার সেই কৃষক-নারীরে।
কহিলা রমণী;
"রাজা! না চাই অঙ্গুরী,
চরণের ধূলি শুধু দাও একটুকু,
লয়ে যাব, দিব মোর পৌত্রের মাথায়,
যেন সে বাপের মত পারে প্রাণ দিতে
রাজকার্য্যে; এই তুমি কর আশীর্ব্বাদ।"
প্রহরী, লইয়া ধূলি, লইয়া অঙ্গুরী,
দিল রমণীরে; নারী গেল গৃহে চলি।

যে দেশের জননীদের এই কৃষকরমণীর মত হইবার বাধা নাই, তাহার পতন সহজে হয় না।

কাব্যোক্ত প্রধান পাত্রপাত্রীদিগের মধ্যে রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য ও তন্ত্রোপাসিকা মেধা কবির কল্পিত। উভয়েরই চরিত্র যথাযোগ্যরূপে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া কল্পিত ও বর্ণিত হইয়াছে। মেধার নামের সহিত, পুস্তক পাঠান্তে, পাঠকের মনে ভয় ও ঘৃণা জড়িত হইয়া থাকিয়া যায়। তাহার মাতৃস্নেহ ও ভীষণ প্রতিহিংসার সংমিশ্রণ কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তুঙ্গাচার্য্য সাধুচেতা, দূরদর্শী, স্বদেশপ্রেমিক, ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ। পঞ্চদশ সর্গে তাঁহার "অগস্ত্য-দর্শন" হৃদয়কে বিচলিত করে। ইহাতে কবির শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিগত তৃতীয় যাম; তবু স্থির আঁখি
আচার্য্য যোগাসনে। চিন্তাক্লিষ্ট তনু
ক্রমে হ'ল অবসন্ন, এল তন্দ্রাবেশ।
হেরিলেন গুরু দূর তারালোক হ'তে
শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি এক পুরুষপ্রবর
হইছেন অবতীর্ণ। আসিয়া সমীপে
কহিলেন তিনি ধীর মধুর বচনে।
"তুঙ্গাচার্য্য! ধ্যানে তব হয়ে বিচলিত
আসিলাম মর্ত্ত্যলোকে। জ্ঞানী, সাধু তুমি,
নহে অবিদিত তব, না পারি আমরা,
বিধির আদেশ বিনা, করিতে প্রকাশ
ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান পারি দেখাইতে।
দেখাইব তাহা; তুমি বিচারিয়া মনে,
কি সম্বন্ধ পরস্পর কার্য্যকরণের,
ভবিষ্যৎ অনায়াসে পারিবে বুঝিতে।
বল, এবে, কি দেখিছ সম্মুখে তোমার।"
কহিলেন তুঙ্গাচার্য্য;
"দেখিতেছি; দেব!
হিমাচল হ'তে অই রজতপ্রবাহে
নামিছেন ভাগীরথী।" লক্ষ নর, নারী
দাঁড়াইয়া উভ তটে; স্তব করে কেহ,
কেহ বাজাইছে শঙ্খ, কেহ দেয় দীপ,
কেহ দাঁড়াইয়া জলে করিছে তর্পণ।
পরশি সলিল অই মাতর্গঙ্গে বলি
করে লোক জয়ধ্বনি। কিন্তু একি, দেব!
কোথা হ'তে উঠে এই বিকট হুঙ্কার—
কে ওরা আসিছে ছুটে হর হর হর
নমো নরসিংহরূপ গর্জ্জি ভীম রবে।
উত্তোলি ত্রিশূল তীক্ষ্ণ, আস্ফালি কৃপাণ,
সহস্র সহস্র অই আসিয়া সন্ন্যাসী
দাঁড়াইল শ্রেণীবদ্ধ জাহ্নবীর তটে।
কার(ও) কণ্ঠে শোভা পায় মাল্য তুলসীর,
অঙ্গে হরিনাম-ছাপা; শোভে কণ্ঠে কার(ও)
রুদ্রাক্ষের মালা, দেহ বিভূতি-ভূষিত।
মাতিছে সে দুই দল তুমুল সংগ্রামে;
অসিঘাতে ছিন্ন কেহ, বিদীর্ণ ত্রিশূলে,
পড়িছে ধরণী 'পরে, রুধিরের ধারা
বরষার স্রোত সম চলেছে বহিয়া;
ভাসিতেছে শব কত জাহ্নবী-সলিলে।
পরাজিত হ'ল ক্রমে বৈষ্ণবের দল,
শৈবগণ, মহা হর্ষে, বিঁধিয়া ত্রিশূলে
নরমুণ্ড, নাচে অই হর হর রবে।"
কহিলা অগস্ত্য;
"বৎস! বুঝিলে ত তুমি
কেন এই রক্তপাত? কুম্ভযোগদিনে
ব্রহ্মকুণ্ড-স্নানে কার অগ্রে অধিকার,
শ্রেষ্ঠ কেবা, হরি হর উভয়ের মাঝে,
এই লয়ে বিসংবাদ। কহে হিন্দুশাস্ত্র
নাহি ভেদ হরি হরে; ভক্ত উভয়ের
কি ভেদ সৃজেছে দেখ। ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত
বিশ্বপ্রেমে; নাহি প্রেম হিন্দুতে হিন্দুতে।
কি দেখিছ বল এবে?" কহিলেন গুরু।
"দেখিতেছি শ্রাদ্ধসভা, ঘিরি যজ্ঞবেদী,
বসেছেন বিপ্রগণ, দ্রব্য নানাবিধ
রহিয়াছে সুসজ্জিত। মুণ্ডিত-মস্তক,
কৌষেয়বসনধারী, শ্রাদ্ধকর্ত্তা দ্বিজ
করিছেন মন্ত্রপাঠ, নাহি যার পিতা,
নাহি মাতা, নাহি বন্ধু, অন্ন, অন্নসিদ্ধি,
তার তৃপ্তিহেতু এই পিণ্ড করি দান।
কিন্তু একি! অকস্মাৎ উঠি অই রোষে
দাঁড়াইলা শ্রাদ্ধকর্ত্তা; স্থূল লোষ্ট্র লয়ে
নিক্ষেপিলা, বসি যথা চণ্ডালিনী এক
তরুতলে, পুত্রে তার লয়ে ক্রোড়দেশে।
পাপিনীর পাপদৃষ্টি শ্রাদ্ধদ্রব্যে যদি
পড়ে দৈবে, অপবিত্র হইবে সকল;
তাই উত্তেজিত বিপ্র খেদাইছে তারে।
তরুস্কন্ধে বাজি লোষ্ট্র, বিচূর্ণ হইয়া,
মাতাপুত্র উভয়ের বিদ্ধিল ললাট;
চীৎকার করিয়া শিশু উঠিল কাঁদিয়া;
অশ্রুসিক্তা চণ্ডালিনী, ত্যজি তরুতল,
বসিল সুদূরে গিয়া প্রখর আতপে।
শ্রাদ্ধ শেষ; দলে দলে বিপ্রগণ অই
বসিছেন ভোজনার্থী। সুখাদ্য, সুপেয়
পরিচর্য্যাকারী যত ছুটিতেছে লয়ে;
নিরখিয়া দূর হ'তে, মাতৃমুখপানে

চাহিছে ক্ষুধার্ত্ত শিশু, সান্ত্বনিছে নারী।
উঠিলেন একদল, ভৃত্যগণ অই
করে স্থান সম্মার্জ্জন; পাত্রশেষ লয়ে
নিক্ষেপ করিছে গর্ত্তে। করজোড় করি
ইঙ্গিতে চণ্ডালী সেই উচ্ছিষ্ট হইতে
মাগিছে কিঞ্চিৎ; ভৃত্য কহিছে প্রভুরে।
মহারোষে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কহিছে কিঙ্করে;
এখনও অভুক্ত বিপ্র রহেছেন কত,
চণ্ডালীরে দিবি অগ্রে? ধিক্ ধিক্ ধিক।
সান্ত্বনা করিতে আর না পারি তনয়ে,
তাড়ায়ে কুক্কুরদলে, অই অভাগিনী
কুড়ায়ে লইছে খাদ্য। পরিতুষ্ট শিশু,
কিন্তু তৃষ্ণা নিবারিতে করে জল জল।
সম্মুখে নির্ম্মল বাপী; ত্যজি তবু নারী,
না জানি কি হেতু, অই বুকে তুলি সুতে,
ছুটেছে বালুকাপথে মধ্যাহ্ন-আতপে
দূরবর্ত্তী কদ্দমাক্ত নদী অভিমুখে।"
কহিলা মহর্ষি,

"বৎস! অস্পৃশ্যা পারিয়া
বিপ্রগ্রামে কিবা শক্তি স্পর্শে বাপী, কূপ,
তাই ছুটিয়াছে নারী নদী-জল-পানে।
জান কি এ পারিয়ায়? এই জাতি মাঝে
জন্মেছিল তিরুবল, জ্ঞানে ঋষি সম,
এই জাতি-সমুদ্ভূতা, ভক্তি মূর্ত্তিমতী,
আবেয়া, কবিতামৃত বিতরি, দ্রবিড়
করেছিল মধুময়, তবু দশা হেন।
দয়ামূল ধর্ম্ম এই শাস্ত্রের বচন;
কিন্তু বল কোথা দয়া? কুক্কুর-ভোজন
নহে দূষ্য, দূষ্য নরশিশুর ভোজন;
বিশ্ববন্ধু বিপ্র, হের ব্যবহার তার।
সর্ব্ব জীবে আত্ম-রূপে বিরাজিত যিনি,
দেখ ভাবি, কি বেদনা লাগে তাঁর প্রাণে
হেন বৃথা জাতিদর্পে, নির্ম্মম আচারে।
দর্পহারী তিনি, বৎস! মহাগদা তাঁর,
হয়ত, কখন্ আসি পড়িবে সহসা
চূর্ণিতে দর্পীরে, বংশ-পরম্পরাক্রমে।
দেখিয়াছ হরিদ্বার ভারত উত্তরে;
দেখিলে দ্রবিড় এই ভারত দক্ষিণে,
দেখাব পশ্চিম। হের গুর্জ্জর প্রদেশ,
বল সেথা কি দেখিছ?" কহিলেন গুরু।
"দেখিতেছি, দেব! এক বিশাল মন্দির,
সন্ধ্যার আরতি এবে আরব্ধ তথায়,
ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধ আমোদিছে পুরী,
বিগ্রহ শৃঙ্গারবেশে কিবা সুশোভিত;
পূজকে, দর্শকে পূর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণ।
সুবেশা, সুরূপা কত রমণী তথায়
করিতেছে নৃত্যগীত, কিবা তান, লয়,
কি মধুর রস গীতে। মুগ্ধ শ্রোতৃগণ,
ফেলিছে প্রেমাশ্রুধারা, ভাবাবেশে কেহ
মাতিতেছে বাহুতুলি। সমাপ্ত আরতি,
নিবিল আলোক। হায়! একি দৃশ্য, দেব!
দর্শক, পূজক আর নর্ত্তকীর দল,
জোড়ে জোড়ে, অন্ধকারে মিলাইল কোথা।"
কহিলা মহর্ষি,

"বৎস! দেবদাসী এরা,
চির ব্রহ্মচর্য্য লয়ে সেবা দেবতার
ব্রত ইহাদের। কিন্তু পাপাসক্ত নর
ডুবিতেছে নিজে, আর ডুবাইছে এই
অভাগিনী নারীগণে। শাস্ত্র আমাদের
শিখায়েছে সুকঠোর ইন্দ্রিয়-সংযম,
প্রতিপদে, প্রতিশ্বাসে, বাক্যে কার্য্যে মনে,
কিন্তু দেখ পরিণাম কি হয়েছে তার।
বল, এবে, ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে তুমি
যা দেখিছ, বঙ্গ আর বিহারের মাঝে।"
বিষাদে কহিলা গুরু।

"কি বর্ণিব দেব!
বিদরে হৃদয় খেদে, দেখিতেছি আমি
সুপ্রশস্ত সঙ্ঘারাম, অদূরে তাহার
দেখিতেছি শক্তিপীঠ। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ,
গুপ্ত সিদ্ধি তরে অই বসেছে বিরলে
চণ্ডালকুমারী লয়ে, করিছে মিশিত,
কি বীভৎস! বিষ্ঠা, মূত্র আহার্য্যের সনে।
অদূরে তাদের অই চক্র বিরচিয়া
ভৈরব, ভৈরবীদল বসেছে গোপনে,
কি যে পূজাবিধি, দেব! পারিনা বর্ণিতে;
নাহি লজ্জা, নাহি ভয়। অই অন্য দিকে
ঢালিতেছে সুরা কেহ কপাল ভরিয়া,
বীরাচারে কেহ নরমুণ্ড-ধৃত করে,
রক্তের তিলক ভালে নাচিছে উল্লাসে।
বুঝিয়াছি দেব! তব কিবা অভিপ্রায়,
চাহিনা দেখিতে আর, বিদরে হৃদয়।"
কহিলা মহর্ষি,

"বৎস! হয়োনা অধীর,
না চিনিলে রোগ বল কি দিবে ঔষধ?
আচারে রক্ষিত ধর্ম্ম এই শাস্ত্রবাণী;
অনাচারে, কদাচারে রক্ষিত তা' এবে।
স্বভাব-করুণ দেব সহেন সতত
সেবকের অপরাধ, কিন্তু না সহেন
অধর্ম্ম, ধর্ম্মের নামে। আর্য্য-সুতগণ
আচরিছে দেবদ্রোহ, না হ'বে মঙ্গল।
স্বদেশবৎসল তুমি, স্বধর্ম্মনিরত:
বুঝিতেছি প্রাণ তব হ'তেছে ব্যাকুল
উভয়ের দশা হেরি; কিন্তু না দেখিয়া
কি করিবে? মর্ম্মদেশ বেদনয়ে যদি
স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব তবু উপযুক্ত নয়।
ক্লেশ যদি হয়, তব শেষ দৃশ্য দেখ।"
কহিলেন গুরু।

"আমি দেখিতেছি, দেব!
শোভাময় দেশ এক সম্মুখে আমার,
নন্দনকানন সম। বহে প্রবাহিনী
কল কল রবে অই; বিলাস-তরণী
শোভে কত নদী-বক্ষে পতাকা-শোভিত।
দেখিতেছি নদীতটে রাজ-অন্তঃপুর,
রাজ্ঞী, রাজসুতাগণ নিবসেন তাহে।
কিন্তু একি, দেব! সেই শুদ্ধান্তের মাঝে
গণিকা, পুনর্ভূ আর নাটকীয়া তরে,
শোভে গৃহ সারি সারি! রাজা রাজসুত
রঙ্গরসে, হাস্যে রত তা' সবারে লয়ে।
দেখিতেছি, দেব! আমি সম্মুখে আমার
মৃত্যু উদ্বন্ধনে কার(ও), কার(ও) শিরশ্ছেদে।
কি গভীর আর্ত্তনাদ বিদারে শ্রবণ:
অশ্রুপূর্ণ নেত্র, দৃষ্টি নাহি চলে আর।"
কহিলা মহর্ষি —

"বৎস! দেখিলে যে দেশ,
কাশ্মীর উহার নাম, সৌন্দর্য্যে, শোভায়
অনুপম ধরামাঝে! কিন্তু পাপাচারে
নরক হইতে ঘৃণ্য। যে লালসা-বহ্নি
জ্বলিয়াছে, এক দিন, এ দেশের মাঝে,
কি ভীষণ! নাহি ভাষা পারি বর্ণিবারে।
বিমাতা, সোদরা, সুতা, স্নুষা, কুটুম্বিনী
পায় নাই রক্ষা তাহে। কিন্তু কি বলিব,
শত রাজ-অন্তঃপুর আছে এ ভারতে
কলঙ্কিত এইরূপ। হেরিলে ত তুমি
ভারতের পূর্ব্বোত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম,
রাজ-অন্তঃপুর, তীর্থ, মঠ, সঙ্ঘারাম?
বুঝ, বিচারিয়া মনে, কি দশা দেশের,
ধর্ম্মের কি গতি এবে, প্রবৃত্তি লোকের।
ধর্ম্মসংস্থাপক বিপ্র, রক্ষক ক্ষত্রিয়
আছিলা এ আর্য্যভূমে। উভয়ের দশা
নিরখিলে, পরিণাম করহ গণনা।
ব্যথিত হৃদয় তব, তা' না হলে আমি
দেখাতাম, রাজকুল-দৃষ্টান্ত লক্ষিয়া,
মহামাত্র, সভাসদ, রাজকর্ম্মচারী
কি ভাবে যাপিছে দিন। ভাবে তারা মনে
অনাথার, দরিদ্রার, সতীত্ব রতন
মূল্যহীন, বাক্যমাত্রে লভ্য তাহাদের।
ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যে, গুপ্ত, ব্যক্ত ব্যভিচারে
সারশূন্য হইয়াছে আর্য্যসুতগণ।
দশ হ'তে দুইবার লহ যদি পাঁচ
কিবা রহে শূন্য বিনা? মানব হইতে
যায় যদি নীতি, ধর্ম্ম কিবা রহে তায়?
উপেক্ষিত, অশিক্ষিত হীনবর্ণ হেথা,
পরিণাম, হিতাহিত না পারে বুঝিতে,
হারাইয়া জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, সম্মান
আছে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ। উচ্চবর্ণ যারা
কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, শত সম্প্রদায়ে
বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন, নাহি প্রেম পরস্পরে;
জাতিগর্ব্বে, জাতিবৈরে, ইন্দ্রিয়জ সুখে
নয়ন থাকিতে অন্ধ! বল, বৎস! তুমি,

কেমনে কল্যাণ তবে হবে এ দেশের ?
জ্ঞানী তুমি, অনায়াসে পারিবে বুঝিতে,
ভৌতিক প্রকৃতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের ;
রহি অন্তরালে তার শক্তি আধ্যাত্মিকী
শাসন, পালন নিত্য করেন সতত।
কদাচারে, পাপাচারে সঙ্কুচিত যথা
বিধিরোষ, নিঃসন্দেহ, জানিও তথায়
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান।
স্বজাতিবৎসল তুমি, হৃদয় তোমার
হইবে ব্যথিত শুনি নিন্দা স্বজাতির,
কিন্তু যদি নিরপেক্ষ না কর বিচার
জাতিগত দোষ হবে শোধিত কেমনে ?
নিরখিলে বর্ত্তমান, স্মরহ অতীত !
দেখ ভাবি হতশেষ অনার্য্য-সন্তানে,
কে বাঁধিল হীনতার দুর্ম্মোচ্য শৃঙ্খলে
অযাজ্য, অস্পৃশ্য করি ? অসংখ্য মানবে
অবজ্ঞায়, ঔদাসীন্যে কে রাখিল হেন
পঙ্গু, জড়বৎ করি, বাঁধি জ্ঞানসীমা
মুষ্টিমেয় নরমাঝে ? নিরুত্তর তারা
আহ্বানে তোমার, নাহি বুঝে ধর্ম্ম, দেশ ;
কি বিস্ময় ভাষাহীন রহে মূক যদি ?
বল তুমি, বিচারিয়া, বীরত্বাভিমানে,
রাজসূয়ে, অশ্বমেধে, স্বয়ংবরকালে
অকারণে সর্ব্বধ্বংসী বিগ্রহ-অনল
জ্বালিয়াছে কারা হেন ? যুগ যুগ কাল
যে দারুণ দ্বেষানল জ্বলিয়াছে প্রাণে,
কেমনে সহসা তাহা হ'বে নির্ব্বাপিত ?

সত্য বটে এ ভারত ছিল, একদিন,
গুণে, জ্ঞানে অদ্বিতীয়, কিন্তু অভ্যন্তরে
স্বার্থ দ্বেষ-পাপ-বীজ ছিল লুক্কায়িত।
বিরচি কুসুমোদ্যান গৃহস্থ যদ্যপি
কণ্টকীগুল্মের বীজ রাখেন প্রমাদে,
বংশধর তাঁর বিদ্ধ হইবে কণ্টকে।
জাতিগত কর্ম্মফল, পাপপুণ্যময়,
হইবে ভুঞ্জিতে, তার না হ'বে অন্যথা।
নির্ব্বেদ, নৈরাশ্য কিন্তু আনিও না মনে।
আছে পাপ সত্য ; কিন্তু পায় নাই লোপ
পুণ্য এ ভারত হ'তে। সাধু, সাধ্বী কত,
তীর্থে, তপোবনে, গৃহে, রাজসভা মাঝে,
এখন(ও) নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধিছেন হেথা।
এখনও পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তার সম
জন্মিতেছে রাজা, রাণী, তোমার সদৃশ
জন্মিতেছে বিপ্র। বৎস ! বিশ্বপাতা যিনি
ন্যায়বান, দয়াময়। একাধারে তিনি
শাস্তিদাতা, পরিত্রাতা। সুনিয়মে তাঁর
না ঘটে অনন্ত শাস্তি সান্ত পাপ তরে।
আছে প্রায়শ্চিত্ত আবা্যশাস্ত্রের বিধান,
পাপ অনুসারে, বৎস ! রাখিও স্মরণে,
সুদীর্ঘ সঞ্চিত এই মহাপাপরাশি,
জ্ঞানাজ্ঞানকৃত, কভু না পাইবে ক্ষয়
তুষানল বিনা। যাবে চলি বহু যুগ,
বহু অন্তর্দ্দাহ, বহু মর্ম্মনিকৃন্তন
ঘটিবে ; উঠিবে বহু ত্রাহি ত্রাহি ধ্বনি।
গুণে, জ্ঞানে ভারতের শ্রেষ্ঠ নরনারী,

যুগে যুগে বলিরূপে দিবে শির পাতি,
তবে হ'বে প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু যেই ক্ষণে
হ'বে শুদ্ধ, পাপমুক্ত আর্য্যসুতগণ,
আবার নূতন সৃষ্টি ঘটিবে এদেশে।
ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, রণবীর কত
জন্মিবে আবার, পুনঃ জ্ঞানে, শৌর্য্যে, প্রেমে
সূচীভেদ্য তম এই করি দূরীকৃত
উদিবে তরুণ রবি ভারত-আকাশে,
যথা দিনমণি, এবে, পূর্ব্বাচল-ভালে,
হইছেন সমুদিত ;—চলিলাম আমি।"
হেরিলেন তুঙ্গাচার্য্য ত্যজি ভূমিতল,
উঠি সে পুরুষবর নীলাম্বর-পথে
অদৃশ্য হইলা ক্রমে ; ক্ষীণরশ্মি যত
তারাদল, একে একে, মিলাইল সাথে।
সুপ্তোত্থিত রাজগুরু, উন্মীলি নয়ন।
দেখিলেন রবিকর, মহীরুহ-শির
করি আরঞ্জিত, করি মুক্তা ভূষিত
দূর্ব্বাদল, উজলিছে সুনীল আকাশ।
ভাবিলেন গুরু, এ কি নিশার স্বপন,
অথবা মহর্ষি, সত্য হয়ে আবির্ভূত,
দেখাইলা স্বপ্নছলে দশা ভারতের।
স্বপ্ন হ'ক, সত্য হ'ক, কর্ত্তব্য আপন
সাধিব, বিধাতঃ ! বিশ্বে ফলদাতা তুমি।
যাইব কনোজে ; পুনঃ, দেখিব বুঝায়ে
জয়চন্দ্রে, যদি তাহে ফলে কিছু ফল।
"নমঃ শ্রী নারায়ণ" ! বলি ভক্তিভরে
প্রণমি চলিলা গুরু স্নান অভিলাষে।

কবি যে-সব দৃশ্য আঁকিয়াছেন, তাহা যে ইতিহাসমূলক, তাহা তিনি পাদটীকাগুলিতে দেখাইয়াছেন।

যে-সকল ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে, তাহা সুনির্ব্বাচিত ও সুন্দর। রঙীন ছবিগুলির মধ্যে "দেবী শুভঙ্করী" ও "পুষ্পমালারচনা-ব্যাপৃতা সংযুক্তা" এই দুই চিত্রের রং ও মূর্ত্তি নয়নরঞ্জক হইয়াছে। কিন্তু চিত্রের সার্থকতা শুধু তাহাতে হয় না। মালা গাঁথা সংযুক্তার মত তেজস্বিনী নারীর চরিত্রের বিশেষত্বব্যঞ্জক (characteristic) কাজ নয়। মালা যে-সে নারী গাঁথিতে পারে। তাঁহাকে তাঁহার চরিত্রানুযায়ী কোন কার্য্যে নিরতা আঁকা উচিত ছিল। তা ছাড়া, তেজস্বিনী, মনস্বিনী, তরুণী ও সুন্দরী যিনি তাঁহাকে স্থূলকায়া করিয়া আঁকাটা মহা ভুল। তাঁহাকে সঞ্চারিণী দীপশিখার মত, বজ্রের সঙ্গিনী বিদ্যুতের মত করিয়া আঁকিতে হয়। "পৃথ্বীরাজের দিল্লীলাভ" নামক ছবিতে অনঙ্গপালের জ্যেষ্ঠা কন্যার পরিহিত সাড়ীটি আঁকিতে চিত্রকর মোটেই পারেন নাই। এইজন্য রাজনন্দিনীকে খর্ব্বকায়া সৌন্দর্য্যহীনা দেখাইতেছে।

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ—

প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বর্দ্ধমানশাখা। মূল্য দুই টাকা।

এই বিবরণ-গ্রন্থে সাহিত্য-সম্মিলনের বর্দ্ধমান অধিবেশনে যে-সমস্ত প্রবন্ধাদি পঠিত হইয়াছিল সে সমস্তই আছে ; সমস্ত বর্দ্ধমান জেলার বিবরণ ও দ্রষ্টব্য স্থান ও বিষয়-সকলের বর্ণনা ও চিত্র আছে ; সম্মিলনের উপলক্ষ্যে অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনার কি কি আয়োজন ছিল তাহা সাড়ম্বরে বর্ণিত হইয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ প্রতিনিধিগণের সেবার সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন ; সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদা হইতে এই প্রকাণ্ড বিবরণ-গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবর ও জ্ঞাতব্য তথ্যসম্ভারের তুলনায় মূল্য স্বল্প হইয়াছে। সাহিত্য-সম্মিলনের এরূপ বহুল তথ্যপূর্ণ বিবরণ ইতিপূর্ব্বে আর বাহির হয় নাই।

এই বিবরণ-গ্রন্থে একত্র সংগৃহীত প্রবন্ধগুলি আলোচনা করিলে আমাদের দেশের সাহিত্যরসবোধের দীনতা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। কোনো কোনো প্রবন্ধ কবিতা যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে কোন্ গুণে পঠিত হইতে পারিয়াছিল তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। সাহিত্য-সম্মিলনে সেইরূপ প্রবন্ধই পঠিত হইবার যোগ্য যাহার মধ্যে বলিবার কিছু নূতন কথা আছে, যাহা বিদেশীদের সমক্ষে ধরিতে লজ্জা বোধ

না হয়; অন্তত যাহার মধ্যে সাহিত্যরস আছে। উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্রেরও অযোগ্য প্রবন্ধ, সঙ্কলন প্রভৃতি সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত হইতে পারা উচিত নহে।

কাশীর কিঞ্চিৎ—(বাঙ্গালীর গাইড), প্রণেতা শ্রীনন্দী শর্ম্মা। প্রকাশক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫৪ রামাপুরা, বারাণসী শহর। দক্ষিণা পাঁচ আনা।

এই পুস্তকে তিনটি দফা ও একটি দফা-রফা আছে। এই চার ভাগে রেলের কুলি হইতে আরম্ভ করিয়া কাশীর ষাড় বানর পাণ্ডা গুণ্ডা প্রভৃতি সকল বিশেষত্ব ও বিশিষ্টতা রঙ্গরসের ভিতর দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রচনা পদ্যে, ছড়ার ছন্দে। কিন্তু ছন্দের তাল কাটিয়াছে পদে পদে; এবং লেখকের রসিকতার রুচি সব সময় শুচিতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। তৎসত্ত্বেও লেখকের বর্ণনাভঙ্গী ও চোখ চাহিয়া খুঁটিনাটি দেখিয়া লইবার শক্তি এবং প্রত্যেক ব্যাপারের ভিতরকার হাস্যরসটিকে টানিয়া প্রকাশ করিয়া ধরিবার ক্ষমতা প্রশংসার যোগ্য। রচনার রকম দেখিয়া মনে হয় শ্রীনন্দী শর্ম্মা শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেহ নন।

মহর্ষি মনসুর—শ্রীমোজাম্মেল হক-প্রণীত। প্রকাশক মখদুমী লাইব্রেরী, ৫এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ। উৎকৃষ্ট বাঁধা এক টাকা। সাধারণ সংস্করণের মূল্য বারো আনা।

যে মহর্ষি আনাল হক—অহং ব্রহ্ম প্রচার করিয়া অজ্ঞ কুসংস্কারান্ধ লোকের হাতে অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া প্রাণ হারাইয়াও আপনার বিশ্বাস ও ধারণার পরিবর্ত্তন বা অপলাপ করেন নাই এই পুস্তকে সেই আশ্চর্য্য পুরুষের জীবন-কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

মাধবী—শ্রীহেমন্তবালা দত্তের প্রণীত। প্রকাশক চট্টগ্রাম ছনহরা যতীশ লাইব্রেরী। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। প্রায় সকল কবিতার ছন্দে গতি আছে, বৈচিত্র্য আছে। সমস্ত কবিতার মধ্যে একটি হতাশা ও বেদনার সুর বাজিয়াছে। ভাব স্বচ্ছ লঘু প্রবাহিত। কিন্তু ভাবের নূতনত্ব বা প্রকাশের কবিত্ব নাই।

পল্লী-স্বাস্থ্য—শ্রীচুনীলাল বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, ২৫ মহেন্দ্র বসু লেন, কলিকাতা। মূল্য চার আনা মাত্র।

বহুদর্শী বিচক্ষণ ডাক্তার মহাশয় এই পুস্তকে পল্লীগ্রামে বাস করিয়া কি উপায়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। জল বায়ু বাসগৃহ খাদ্য দূষিত হইলে এবং বাহির হইতে কোনো-প্রকারে রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে মানুষ পীড়িত হয়। অতএব কি কি কারণে জলবায়ু বাসগৃহ খাদ্য দূষিত হয় বা রোগের বীজাণু শরীরে বাসা বাঁধিবার সুযোগ পায় এবং তাহাদের প্রতিকারেরই বা কি উপায় তাহাই ডাক্তার মহাশয় সরল ভাষায় বিশদ করিয়া ছবি আঁকিয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পল্লী-স্বাস্থ্য উন্নত করা মানে দেশকে রক্ষা করা, দেশে পুনর্জীবন সঞ্চার করা। এ সম্বন্ধে শিক্ষিত গ্রামবাসীর কর্ত্তব্য কি তাহাও আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তার সকল অমঙ্গল দূর করিবার প্রধান ও মূল উপায় বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত। এই স্বল্পমূল্যের পরম মূল্যবান পুস্তকখানি পড়িতে-সক্ষম সকল স্ত্রীপুরুষ বালবৃদ্ধ যুবার ক্রয় করিয়া পড়িয়া ইহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলি পালন করিয়া আপনাদের ও উত্তর বংশীয়দের বাঁচিবার উপায় করা উচিত।

অনার্য্যের উপকথা—শ্রীশ্যামাচরণ দে রচয়িতা। প্রকাশক সিটিবুক সোসাইটী। ২২০ পৃষ্ঠা। সচিত্র। মূল্য বারো আনা।

এই পুস্তকে আসাম অঞ্চলের পার্ব্বত্য বন্য কুকি গারো ও সাঁওতাল ভীল প্রভৃতি অসভ্য অনার্য্য জাতির বহু উপকথা সংগৃহীত হইয়াছে। উপকথাগুলি কৌতুকাবহ। ইহা উপকথাপ্রিয় বালকবালিকা হইতে নৃতত্ত্বজিজ্ঞাসু সুধী ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলের নিকটই সমাদৃত হইবে। রচনা চলতি হাল্কা ভাষায় হওয়াতে বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে।

বিদেশী পৌরাণিকী—শ্রীহেমচন্দ্র বর্ম্ম প্রণেতা। প্রকাশক সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা। ৮৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র। আট আনা।

পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যে রসবৈচিত্র্য থাকে তাহা অপরিণত-বুদ্ধি শিশু হইতে বিজ্ঞ বৃদ্ধকে পর্য্যন্ত নানা ভাবে আনন্দ দিতে পারে। এজন্য সকল দেশেই পৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ আদর। বাঙালী-হৃদয়কে বিশ্বের চিন্তাধারার সহিত যুক্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে বিদেশী পুরাণের কাহিনীগুলি কম সাহায্য করে না। সেই সাধু উদ্দেশ্য লইয়া লেখক য়ুরোপের প্রসিদ্ধ পুরাণ-কথা বাংলায় সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে আমাদের পৌরাণিক কাহিনীর সহিত বিদেশী-কাহিনীর সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিচার করিয়া নব নব ভাব ও চিন্তা পাঠকের মনে জাগিবে, শিশুদের কল্পনা ও ভাব পুষ্ট হইবে; পরবর্ত্তী জীবনে বিদেশী সাহিত্য পড়িবার সময় এই-সমস্ত কাহিনীর উল্লেখ বুঝিবার সুবিধা হইবে। এইসব কৌতুককর কাহিনী যাহারা পড়েন নাই শুনেন নাই তাঁহারা পড়িয়া আনন্দ ও শিক্ষা পাইবেন; পাঠে আগ্রহ জন্মিবার মতন চমৎকারিত্ব ইহাদের মধ্যে আছে।

লায়লী-মজনু—শ্রীশেখ ফজলল করিম-প্রণীত। প্রকাশক নব লাইব্রেরী, ১২।১ সারেঙ্গ লেন, তালতলা কলিকাতা। রেশমী কাপড়ে বাঁধা, মূল্য পাঁচ সিকা। সচিত্র।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। লায়লী ও মজনুর প্রসিদ্ধ প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাস বিরচিত হইয়াছে।

সিতিমা—আলো ও ছায়া প্রণেতৃ-প্রণীত গদ্য নাটিকা। প্রকাশক রায় এম সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স। ৮৮ পৃষ্ঠা। ।৵০ আনা।

এই নাটিকাখানি প্রসিদ্ধ লেখিকার লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই, না প্লটের কোনো সৌন্দর্য্য বাধুনি বা পরিণতি আছে, না কোনো চরিত্র বিকাশ পাইয়াছে, না রচনায় ভাষার মাধুর্য্য লালিত্য কবিত্ব আছে, গানগুলিও অতি সাধারণ রকমের হইয়াছে।

নাটিকার প্লটটি মোটামুটি এই—গিরিপদের রাজা বীরভদ্রের সভায় নর্ত্তকী চন্দ্রা ও গায়িকা সিতিমা থাকে। ইহারা রাজারই গ্রামদ্যে পরিগণিত। সিতিমার মধুর স্বরে সকলে মুগ্ধ হয়, কিন্তু চন্দ্রার বিলাসকলায় সকলে আকৃষ্ট হয়। মধুরস্বভাবের সিতিমা নিজের অবস্থাকেই মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রার দুরাকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই, তাহার পাটরাণী হইবার সাধ, কিন্তু রাজার রাণী থাকিতে তাহার সে সাধ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাই সে প্রধান সেনাপতি দুর্জ্জয় সিংহ ও দ্বিতীয় সেনাপতি উজ্জ্বলসিংহকে বিলাস-কলায় আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে যাহাকে দিয়া সুবিধা তাহাকে দিয়া রাজাকে অপহৃত করিয়া নিজে তাহার রাণী হইবার উদ্যোগে ফিরিতেছে। উজ্জ্বলসিংহ চন্দ্রার ছলনা ভালোবাসা-বলিয়া ভুল করিয়া আসন্ন শত্রুর সহিত যুদ্ধে যাইবার পথ হইতে চন্দ্রার ডাকে লুকাইয়া অন্তঃপুরে আসিয়া ঈর্ষান্বিত দুর্জ্জয়সিংহের লোকের হাতে ধরা পড়িল। রাজা এই অপরাধে তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। সিতিমা অন্তঃপুর হইতে পলাইয়া গিয়া সন্ন্যাসীর বেশে উজ্জ্বলসিংহকে কারামুক্ত করিল এবং পাছে কারাধ্যক্ষের অনিষ্ট হয় এই আশঙ্কায় নিজে কারাগারে রহিল। মুক্ত উজ্জ্বলসিংহ দেশের শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া রাজার প্রশংসা পাইল, দুর্জ্জয়সিংহ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, কারাগার হইতে

পীড়িতা সিতিমাকে রাজসকাশে আনা হইলে উজ্জ্বলসিংহ তাহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে চাহিল। সিতিমা উজ্জ্বলসিংহকে অত্যন্ত ভালোবাসিত বলিয়া উজ্জ্বলসিংহকে কলঙ্কিত করিতে বা রুগ্নশরীরের ভারে পীড়িত করিতে স্বীকৃত হইল না, মুমূর্ষু সিতিমা তীর্থযাত্রা করিল। এই শেষবিদায়ের সময়কার প্রণয়ী-যুগলের কথা কয়টিই এই বইএর মধ্যে উৎকৃষ্ট, সেই কয়টি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

উজ্জ্বল। কিন্তু একদিনের জন্যও তোমাকে আমার বলতে না পেলে আমার ক্ষোভ থাকবে।

সিতিমা। এই ক্ষোভটুকু আমার জন্য চিরকাল রেখো, ঐটুকুই আমার পুরস্কার।

উজ্জ্বল। আমি তোমাকে মরতে দিব না, আমার ভালবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

সিতিমা। যুবরাজ, তুমি কি বলছ। পূজার ঘট ভেঙে যায় সেই ভাল। দেবপ্রতিমা জলে বিসর্জ্জন করাই ঠিক। ঘরে নিয়ে স্ত্রী করলে দেখবে মাটি, মাটি—কেবল মাটি। তার চেয়ে অল্পক্ষণের একান্ত মিলন—পূর্ণ মিলন, এই ভাল।......আমাকে একেবারে মরতে দিওনা। আমাকে তোমার মধুর চিন্তায়, তোমার গানে, তোমার সকল কথায়, তোমার সকল কাজে একেবারে মিশিয়ে রাখ। এমনি করে আমি চিরকাল তোমার হই, আমার দেহের মৃত্যুর পরও তোমার মধ্যে বেঁচে থাকি।

এই ভাবের কথা সাহিত্যে নূতন না হইলেও এখানে ফুটিয়াছে ভালো। থিয়েটারে সাধারণতঃ যে সব বই অভিনয় হয়, এখানি তাদের অনেকের চেয়ে ভালো।

দই-খই—শ্রীরাধাবিনোদ সাহা প্রণীত। প্রকাশক মানসী প্রেস। মূল্য দুই আনা।

গানের বই, ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া লেখা। বইএর নাম সম্বন্ধে লেখক পরিচয় দিয়াছেন—শ্বেতবরণী মাকে ভক্তি করিয়া শাদা দই খই দিলেই মা সন্তুষ্ট হন; তাই গরিব ছেলের এই ক্ষুদ্র আয়োজন—কালো খই, জলো দই।

প্রবাসীর উচ্ছ্বাস—শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত, লক্ষ্ণৌ। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা। ১১৪ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

এই বইএ পদ্যে নানাবিধ ফুল ফল তরু লতা গুল্ম শস্য কীট পতঙ্গ ইত্যাদির নাম গুণ উপকারিতা জন্মস্থান ও সময় এবং উহারা মানুষের কি কাজে লাগে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বস্তু পরিচয়ে সাহায্য করিতে পারে।

তাপসী—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণেতা ও প্রকাশক। গিরিডি। কাগজের মলাট এক টাকা ও কাপড়ে বাঁধা পাঁচসিকা।

এই বইএ প্রাচীনকালের ও আধুনিক দশজন তাপসীর জীবন ও সাধনার কাহিনী নানা স্থান ও জনের নিকট হইতে বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে এই কয়টি তাপসীর জীবনকথা আছে—(১) মীরাবাই (২) সংঘমিত্রা (৩) রাবেয়া (৪) সেণ্ট টেরেসা (৫) সেণ্ট এলিজাবেথ (৬) সেণ্ট ক্যাথেরিন (৭) ম্যাডাম গেয়োঁ (৮) কুমারী কবু (৯) রাণী শরৎসুন্দরী (১০) দেবী অঘোরকামিনী। এই বইখানি সকল সম্প্রদায়ের লোকের, বিশেষতঃ মহিলাদের, পাঠের যোগ্য, ইহাতে তাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধনের অনেক উপদেশ নিদর্শন ও সাহায্য পাইবেন।

শতদল—শ্রীশচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের প্রণীত। প্রকাশক জগৎ আর্ট প্রেস, ২৭ বেচারাম দেউড়ি, ঢাকা। মূল্য দশ আনা।

ভগবৎ-প্রসঙ্গে লিখিত ১০০ টি কবিতার সমষ্টি।

ওঁ পিতা নোঽসি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধির প্রণীত। ৬১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। আট আনা।

পরমেশ্বরের সহিত জীবের যে পিতা ও পালিত সম্পর্ক কতবিধ ভাবে প্রকাশ পায় তাহাই এই বইএ বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রাণের কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি কর্তৃক পরিব্যক্ত। মূল্য ছয় আনা। ছাপা অতি পরিষ্কার, ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের দি ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেটের ছাপা।

এই বইএ ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রাণের বিরহ মিলন সম্পর্কে বিষাদ হর্ষ ইত্যাদি নানা অবস্থার কথা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধির প্রণীত। আট আনা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভূমিকায় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের আভাস ও অনেক বিষয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য সংক্ষিপ্ত করিয়া ভূমিকার স্থূল কথা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"বাস্তবিক বর্তমান যুগের প্রধান সমস্যা শিক্ষা। এ দেশের শুভাশুভ প্রধানতঃ সুশিক্ষা ও সৎশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। অথচ শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ, অনেক মতদ্বন্দ্ব। ক্ষিতীন্দ্র বাবু এই গ্রন্থে তাহার সামঞ্জস্য করিয়াছেন।

"তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 'ছাত্রদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। যে শিক্ষাপ্রণালীর ফলে ছাত্রদের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি যথাসামঞ্জস্য সাধিত হয়, সেই শিক্ষাপ্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।' ঐ শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত গ্রন্থকার তাহারই আলোচনা করিয়াছেন এবং শিক্ষাকে শৈশব-শিক্ষা, বাল্য-শিক্ষা, যৌবন-শিক্ষা এবং প্রৌঢ়-শিক্ষা—এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক যুগের উপযোগী শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট কথার অবতারণা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান প্রচলিত বিকৃত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন। ব্যায়ামশিক্ষার অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া তিনি ছাত্রদিগকে ব্যায়াম করিতে বাধ্য করিবার উপদেশ দিয়াছেন; শৈশবে ও বাল্যে ছাত্রদিগকে ব্যায়াম না করাইয়া 'ড্রিল' ও খেলা করান ভাল। ইহাতে শরীরে বলাধান হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা স্বেচ্ছায় ও আনন্দে অঙ্গ সঞ্চালন করিবে। মনস্বী হারবার্ট স্পেনসারও তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"Play is better than exercise."

"চাণক্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। সুশিক্ষায় তাড়নার স্থান কোথায়? এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ বলেন, Spare the rod and spoil the child—ইঁহারা চাণক্যের শিষ্য। অপরে বলেন বিদ্যালয় হইতে তাড়নাকে বিতাড়িত করিতে হইবে। শুধু বেত্রাঘাতরূপ পাশব আচার নহে, সর্ব্ববিধ পীড়ন, যদ্দ্বারা বালকদিগকে আত্মমর্য্যাদা ও পৌরুষের পরিবর্ত্তে মিথ্যাচার শিক্ষা দেয়। শিক্ষক নিজে আদর্শের সজীব প্রতিমূর্ত্তি হইবেন, যেন ছাত্র বিস্ময় ও ভক্তির বশে সেই আদর্শের অনুকরণ করিতে পারে। যাঁহারা জানেন, অনাবিল শিশুহৃদয় কেমন সহজে উচ্চ আদর্শের প্রতিধ্বনি করে, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন যে, যে শিক্ষক মহৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা ছাত্রদিগকে প্রণোদিত করেন এবং ভয়ের বেত্রাঘাতে নহে, প্রেমের রাজদণ্ডে শাসিত করেন, সেরূপ শিক্ষকের প্রভাব কত শক্তিশালী হয়। এই

মতদ্বন্দ্বের মধ্যে গ্রন্থকার কাহার পক্ষপাতী? আমি নিজে তাড়নার বিরোধী।

"শিক্ষাসমস্যার একটী গুরুতর সমস্যা—ছাত্রশিক্ষকের সম্বন্ধ। শিক্ষক কি ভাবে ছাত্রকে শিক্ষা দিবেন? গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এ প্রশ্নের বিশেষ আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। আমার মনে হয় যে, বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর যদি সংস্কার সাধন করিতে হয়, তবে প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষক যে আসন অধিকার করিতেন, তাঁহাকে সেই সম্মানের আসনে আবার বসাইয়া শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে প্রাচীন গুরুকুলের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়কে এক একটা সদ্ভাব ও আনন্দের প্রস্রবণে পরিণত করিতে হইবে।

"স্থূল জগতে প্রেমের নানা মূর্ত্তি—পতি-পত্নীর প্রেম, পিতা-পুত্রের প্রেম, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রেম, আত্মীয় বন্ধুর প্রেম। কিন্তু শিষ্যের প্রতি গুরুর যে প্রেম, উহাতে ঐ সমস্ত প্রেম পুঞ্জীভূত ও সংবর্দ্ধিত হয়। গুরু শিষ্যকে মাতার স্নেহময় রক্ষণ, পিতার উদগ্র বল, ভ্রাতা ভগ্নীর সহৃদয়তা এবং আত্মীয় বন্ধুর উৎসাহ দান করেন। তিনি শিষ্যের সহিত একাত্মা, শিষ্য তাঁহার অংশ কলা। কবে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে এই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিব?"

এই বইএ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

(১) শিক্ষাসমস্যায় মীমাংসার সাধারণ ভূমি:—মুখবন্ধ, শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজের কর্ত্তব্য, মতদ্বন্দ্বের উৎপত্তি, মিলনের সাধারণ ভূমি, ত্রিবিধ উন্নতির সামঞ্জস্যবিধায়ক শিক্ষাপ্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (২) শৈশবশিক্ষার প্রণালী:—প্রণালী নির্দ্ধারণে প্রকৃতির অনুসরণ কর্ত্তব্য, শৈশবশিক্ষার মূল ভাব শরীরগঠন, শৈশবশিক্ষায় মানসিক-বৃত্তিচালনা, শৈশবশিক্ষায় অধ্যাত্মজ্ঞানের ব্যবস্থা, শিক্ষাসম্বন্ধে প্রবাদবাক্য ও কালবিভাগ। (৩) বাল্যশিক্ষার প্রণালী,—শিক্ষার দ্বিতীয় সোপান গৃহের বাহিরে হওয়া উচিত, বাল্যশিক্ষার ত্রিবিধ অঙ্গ, বাল্যশিক্ষাতে কৃষিশিক্ষা, কৃষিকর্ম্মে আর্থিক উন্নতি, কৃষিকর্ম্ম ও কেরাণীগিরি, কৃষি-শিক্ষা ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ, বাল্যশিক্ষার কাল ও নিয়মাধীনতা বাল্যশিক্ষাতে ব্যায়াম অবশ্যকর্ত্তব্য, ব্যায়ামের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিষয়ে আপত্তিখণ্ডন, শরীররক্ষার মত ব্যায়াম অবশ্যকর্ত্তব্য। (৪) যৌবন-শিক্ষা,—যৌবনশিক্ষা ও তাহার কাল, যৌবনশিক্ষার মূলমন্ত্র মানসিক উন্নতি, মানসিক উন্নতির সহায় গণিত প্রভৃতি, যৌবনকালের ব্যায়াম ও ক্রীড়া, যৌবনশিক্ষাতে আত্মরক্ষা শিক্ষা, যৌবনশিক্ষায় দর্শনশাস্ত্র। (৫) প্রৌঢ়শিক্ষার প্রণালী:- প্রৌঢ়শিক্ষার কেন্দ্র আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং তাহার কাল, সর্ব্ববাদসম্মত ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা। (৬) শিক্ষা-নিয়ামক কে। (৭) ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিতব্য। (৮) ভাষা ও বর্ণমালার ঐক্যসাধন। (৯) কৃষিকর্ম্মের অন্তরায়—সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম অত্যাবশ্যক, কৃষিকর্ম্মের অন্তরায় ধনী সম্প্রদায়। (১০) জনসাধারণের সহরপ্রীতির কারণ ও তাহার কুফল। (১১) কৃষিকর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সহায় কিসে:—কৃষিকর্ম্মই অর্থাগমের মূল ও নিশ্চিন্ত উপায়, কৃষিকর্ম্মে শারীরিক উন্নতি, কৃষিকর্ম্মে মানসিক উন্নতি, কৃষি-বিদ্যার আনুসঙ্গিক বিদ্যা বিষয়ে ইঙ্গিত, কৃষিকর্ম্মে আধ্যাত্মিক উন্নতি, পল্লীবাসীর মঙ্গলে দেশের মঙ্গল, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম প্রবর্ত্তনে গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল। (১২) কৃষিকর্ম্মে কৃতকার্য্যতার তিনটী মূলমন্ত্র, জমীর উপর ভালবাসা, শৃঙ্খলা, অন্যোন্যসাহায্য। (১৩) কৃষিকর্ম্মের শিক্ষাপ্রণালী। (১৪) কৃষিকর্ম্মে সমবায় প্রণালী। (১৫) জমীদারের সহায়তা।

চিন্তা করিয়া দেখিবার উপযুক্ত বহু কথা এই ১৫ দফায় আলোচিত হইয়াছে; শিক্ষাসমস্যা প্রত্যেক নরনারীর চিন্তার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত। সুতরাং সকলেরই এই বইখানি ক্রয় করিয়া পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচারী—শ্রীরাজেশ্বর গুপ্ত প্রণেতা। প্রকাশক শ্রীব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, চট্টগ্রাম। ৮৭ পৃষ্ঠা। মূল্য লিখিত নাই।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হইলে বালককে তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া কি ভাবে কি কি মানিয়া চলিতে হয়, তাহারই কতকগুলি উপদেশ ফর্দ্দ ধরিয়া নিম্নলিখিত অধ্যায়ে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—

ঈশ্বর, পিতা, মাতা ও অভিভাবক, ভাই ভগ্নী, আচার্য্য, রাজা ও রাজপ্রতিনিধি, ইংরেজ জাতি ও বৃটিশ সাম্রাজ্য, পরিদর্শক, সতীর্থ বন্ধু, দীন দুঃখী, বিদ্যা-মন্দির, আমার গৃহ, আমার গ্রন্থাবাস, আহ্নিক কৃত্য, আহার পান, শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য, অধ্যয়ন, বেশভূষা, ভ্রমণ, প্রকৃতি-অধ্যয়ন, অভ্যর্থনা ও আলাপ, সেবা, সাধুসঙ্গ, ব্রতানুষ্ঠান, প্রতিরূপ ও সাধুবাক্য, ছাত্রাবাস।

জাতিধর্ম্ম দেশকাল-নিরপেক্ষ যে-সকল শাশ্বত সত্য ও নীতি সকল-দেশের সকল-জাতির সকল-কালের লোক মানিয়া চলিয়া থাকে সেই রকম উপদেশই ইহাতে অধিকাংশ। সুতরাং ইহা সকল-সম্প্রদায়ের বালকদের হাতে দেওয়া যায়। এই উপদেশ-সাহস্রীর কিছুও যদি কোনো বালকের মর্ম্মে গাঁথিয়া যায় তবে তাহার কল্যাণ হইবে।

আশ্রমে—শ্রীনিতাইচাঁদ শীল প্রণেতা, চুঁচুড়া। ২০ পৃষ্ঠা। তিন আনা।

অমিত্র পদ্যে বলা হইয়াছে যে সংসারাশ্রমে সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া বাস করাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সনাতন নীতি ও ধর্ম্ম—নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুলের সাহায্যকল্পে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

ভূমিকায় লেখক শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দেবশর্ম্মা বইখানির পরিচয় দিয়াছেন এইরূপ—

"মানুষের শিক্ষা ত্রিবিধ, যথা - শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। পিতা মাতা বা অভিভাবক বালক-বালিকাগণকে উক্ত ত্রিবিধ শিক্ষা দিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য। আমাদের স্কুল কলেজে শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়ামচর্চ্চার ও মানসিক উন্নতির কল্পে বিদ্যালোচনার ব্যবস্থা থাকিলেও, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকায়, বালক-বালিকাগণের শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ অপূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা দ্বিবিধ,—নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা। সমাজকে পবিত্র ও জীবন্ত রাখিতে হইলে, যাহাতে সমাজে নীতির বন্ধন শিথিল না হয়, ও ধর্ম্মভাব জাগ্রত থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা সমাজহিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বালকবালিকাগণের হৃদয়ে শৈশব হইতেই যাহাতে নীতি ও ধর্ম্মের মূল মূল সূত্রগুলি গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে পারে, তৎপ্রতি প্রত্যেক পিতা মাতা বা অভিভাবকের সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। বাল্যকাল হইতে নীতি ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে অনেক তরুণবয়স্কের জীবন উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করে এরূপ দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্রের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তত্ত্ব অবগত হওয়া ও শাস্ত্রানুমোদিত উপাসনা-প্রণালী নির্ণয় করিয়া লওয়া অল্পবয়স্কের পক্ষে সহজ নহে। অথচ ধর্ম্ম-সাধন সম্বন্ধে বাল্যকালেই কতকটা সাধারণ জ্ঞান লাভ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। হিন্দু বালকবালিকাগণ অগাধ শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিবার পূর্ব্বে যাহাতে হিন্দুর নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এবং হিন্দুর নীতি ও ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ যাহাতে সর্ব্বদা তাহাদের মনে জাগরূক থাকিয়া তাহাদের মানসিক সদ্বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া

দেয়, তদুদ্দেশ্যে শাস্ত্র এবং সাধু- ও সুধীবাক্য অবলম্বনে নীতিবিষয়ক ও ধর্ম্মতত্ত্বমূলক উপদেশাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সঙ্কলন করা হইল। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রথম খণ্ডে নীতি সম্বন্ধে ও দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বালকবালিকাগণের বাল্যকাল হইতেই যাহাতে নিয়মনিষ্ঠার অভ্যাস হয়, এবং তাহাদের মনে ভগবদ্ভক্তির স্ফুরণ হয়, তদভিপ্রায়ে নীতি সম্বন্ধীয় প্রথমখণ্ডের শেষভাগে তাহাদের দৈনিক কর্ত্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত সাধারণ নিয়ম লিপি করা গেল।"

বালকবালিকাদিগকে এই বই পড়াইলে তাহাদের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার সাহায্য হইবে।

সাধক-সহচর—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মিত্র সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান শ্রীরামকৃষ্ণ দাস ১৯।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রেশমী কাপড়ে বাঁধা; সচিত্র; ১৫২ পৃষ্ঠা। মূল্যমাত্র দশ আনা।

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন-সম্প্রদায়-ভুক্ত অবতার ও মুক্ত-পুরুষগণ ব্রহ্মলাভের একই প্রকার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাই দেখাইবার জন্য এই বইএ গীতা, Imitation of Christ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশের ঐক্য প্রতিপন্ন করিয়া নবীন ধর্ম্মসাধকের সন্দেহভঞ্জন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সমস্ত মত ও উপদেশ বিভিন্ন দেশের আখ্যায়িকা দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বহু বিচিত্র রকমের মনোহর কাহিনী জানার সঙ্গে-সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম মনের মধ্যে ছাপ রাখিয়া যায়। ছবিগুলিতেও দেখানো হইয়াছে সকল দেশের সকল ভক্ত সাধক একই পথের পথিক এবং সকলের গন্তব্য স্থানও একই।

আশাচন্দ্রে শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন - শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা কর্ত্তৃক ঢাকা মাতৃনিকেতন হইতে প্রকাশিত। এই বইএর কোনো নির্দ্দিষ্ট মূল্য নাই; যিনি যাহা দিবেন তাহারই বিনিময়ে একখণ্ড বই পাইবেন; এইরূপে লব্ধ অর্থ মুদ্রাঙ্কন-ব্যয় বাদে মাতৃনিকেতনের অনাথ বালক বালিকা বিধবা ও সাধুর সেবায় ব্যয়িত হইবে।

অসাধারণ মনস্বী ও ভক্ত সাধক কেশবচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী শ্রদ্ধার সহিত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের জীবন ধর্ম্মের জন্য ভগবানের জন্য আকুলতায় ভরা। তাঁহার জীবনকথা পড়িলে পাঠকের চিত্তও তৎভাবে ভাবিত হয়। ইহার জন্য সকলের তাঁহার জীবনী পাঠ করা উচিত।

ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার প্রতিকার — শ্রীআদীশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এসসির প্রণীত। ২৭ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর। ছয় আনা।

লেখক ছাত্রদের বিবিধ কু-অভ্যাস ও কু-প্রবৃত্তি স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মোটকথা এই বলিয়াছেন যে আজ যাহারা বালক ও যুবক ছাত্র তাহারাই পরে সমাজের সংসারের পরিবারের প্রধান ও নেতা হইবে; সুতরাং তাহাদের চরিত্রগঠনের উপরই সমাজ ও দেশের এবং ভবিষ্য বংশীয়দের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মচারী হইয়া জ্ঞানানুশীলন করাই ছাত্রগণের কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্যব্রতী হইলে মেধা আত্মপ্রত্যয় সত্যনিষ্ঠা তেজ বর্দ্ধিত হয়; এবং তাহারই ফলে দেশ উন্নত হয়। লেখক স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিগর্ভ বাণী উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন—Young men of Bengal, your country requires it. The world requires it. Call up the divinity within you which will enable you to bear hunger and thirst, heat and cold. Say not that you are weak. The spirit is omnipotent, you are the descendants of the Devas.—হে বঙ্গের যুবক-সম্প্রদায়, দেশ তোমাদের কাছে এই চায়, জগৎ এই চায়। তোমাদের অন্তরবাসী সেই দেবতার উদ্বোধন কর যাঁহার বলে তোমরা ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতাতপ অনায়াসে সহ্য করিবে। বলিও না তুমি দুর্ব্বল। তুমি অনন্তশক্তি। তোমরা সব অমৃতের পুত্র, দেবসন্ততি!

লেখক অতি সাধু উদ্দেশ্য লইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন; কিন্তু যে-সমস্ত কদর্য্য পাপের কথা তাঁহাকে আলোচনা করিতে হইয়াছে তাহার উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য ও তেজ তাঁহার ভাষার ভঙ্গিতে নাই; বালকদের পাপ-প্রবৃত্তিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে গিয়া স্থানে স্থানে উপদেষ্টার ভাষায় ফেবলামির আভাস ফুটিয়াছে; ইহা বর্জ্জন করিতে না পারিলে আশানুরূপ ফললাভে বিঘ্ন ঘটা সম্ভব। ভাষায় মুখের চলতি কথার ধরণ ও কৃত্রিম কেতাবী ভাষার ধরণে খিচুড়ি হইয়া যাওয়াটাও একটা দোষ। লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন—"সেই ভীষ্ম আর দেশে হয় না—সে সীতা সাবিত্রীও অন্তর্দ্ধান। কেবল অন্তঃপুরের পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনভিজ্ঞা জননীদের জন্যই যা কিছু মনুষ্যত্ব আজও বজায় আছে।" লেখক কি বলিতে চান যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অভিজ্ঞা জননীদের জন্য মনুষ্যত্ব নষ্ট হইতেছে? শিক্ষারও আবার জাতিভেদ আছে নাকি? সুশিক্ষা যাহা তাহা স্বদেশের বা বিদেশের হোক তাহা সু—এবং কুশিক্ষা স্বদেশের বা বিদেশের যেখানকারই হোক কু। পাশ্চাত্য শিক্ষাই খারাপ মনে করিলে গ্রন্থের পুরোভাগে নিজের নামের পাশে "গ্রেট" হরপে বি-এসসি উপাধিটি জুড়িতে লেখকের কুণ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। অশিক্ষা যে শিক্ষার চেয়ে ভালো এই ভুল ধারণা উপাধিওয়ালা শিক্ষিতরাও বড় গলা করিয়া বলিতে লজ্জা বোধ করেন না ইহার চেয়ে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে যে-সব কদাচারের কথা লেখক আলোচনা করিয়াছেন সে-সব তবে আসে কোথা হইতে? দেশের শতকরা সাড়ে-নিরানব্বইজন ছেলে ত পাশ্চাত্যশিক্ষায় অনভিজ্ঞা জননীদেরই স্নেহ-ছায়ায় "মানুষ" হইয়া উঠিতেছে, তবু তাহারা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারে না কেন? কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে সাধারণ ভাবে নিন্দা করিবার পূর্ব্বে একটু ভাবিয়া বলা উচিত, নতুবা লোকের অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয়।

যাহাই হোক বইখানি ছাত্রদের ও শিক্ষক অভিভাবকদের পড়িয়া দেখা উচিত। রোগ ও ঔষধ সম্বন্ধে মতভেদ ত নাই, এখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

মুদ্রা-রাক্ষস।

হাম্বির—ঐতিহাসিক উপন্যাস, শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ও ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ২০০ পৃঃ মূল্য এক টাকা।

বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই ভালো। মামুলি ধরণের উপন্যাস, কৃতিত্বের পরিচয় কোথাও নাই। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"দুই একজন বিশিষ্ট বন্ধুর দৃষ্টির উত্তাপ যেন দক্ষিণে বাতাসের মত গ্রন্থের অঙ্গে লাগিয়াছিল। তাই ইহা পাকিয়া উঠিবার শক্তি ও সুযোগ পাইল।" পুস্তকের স্থানে স্থানে অতিমাত্রায় কবিত্ব করিতে গিয়া দয়াল বাবু ভাষাকে অস্পষ্ট ও কৃত্রিম করিয়া ফেলিয়াছেন।

সু।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩২৩

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশের হিতসাধন।

শতশত যুবক দেশের হিতসাধনের জন্য ব্যগ্র। দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে, জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। পথ কি, উপায় কি, তাঁহারা জানিতে চান।

পথ একটি নয়, উপায়ও একটি নয়। সোজা কথায় পরিষ্কার করিয়া পন্থা বুঝাইয়া দেওয়াও কঠিন।

একজন প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, there is no royal road to geometry, জ্যামিতি শিখিবার সোজা কোন পথ নাই। অন্যান্য বিদ্যা শিখিবারও সোজা পথ নাই; পরিশ্রম করিতে হয়, বুদ্ধি খাটাইতে হয়। তথাপি বীজগণিত প্রভৃতি শিখাইবার জন্য Algebra Made Easy প্রভৃতি বহি লেখা হইয়াছে; তাহাতে নানা প্রকারের প্রশ্নসমাধানের কৌশল বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যত রকমের প্রশ্নসমাধানের যতরকম ফিকিরই শিখাও না কেন, স্মরণশক্তির উপর যত বোঝা-ই চাপাও না কেন, বুদ্ধির উন্মেষে যে কাজ হয়, সে কাজটি শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া হইতে পারে না।

দেশকে শুদ্ধ, উন্নত, বড়, শক্তিশালী করিতে হইলে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে বটে; একজন সুপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, হাজার হাজার লোককে সেই পথে চলিতে হইবে বটে; কিন্তু না বুঝিয়া কোন একটি পথে চলা অপেক্ষা বুঝিয়া চলা অধিক ফলপ্রদ। অপরের নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে পারা অপেক্ষা উপায় আবিষ্কার করিবার শক্তির মূল্য ও প্রয়োজন অধিক। এই যে মহাযুদ্ধ ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকায় হইতেছে, ইহাতে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন হইতেছে বটে, কিন্তু সেনাপতিদের যুদ্ধকৌশলের উপরও জয় খুব বেশী নির্ভর করিতেছে। ইহাও ঠিক যে উভয়পক্ষের লোকবল যদি সমান হয়, পরিমাণে উভয় পক্ষের সৈনিকদের শারীরিক শক্তি যদি সমান হয়, উভয়পক্ষের গোলাগুলি সরঞ্জাম যদি সমান হয়, তাহা হইলে যাহাদের সেনাপতিরা অধিক বুদ্ধিমান ও অধিক কৌশলী, যাহাদের সৈনিকেরা অধিক বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত, তাহাদেরই জিত হইবে।

নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন আছে, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার মত বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। যাঁহারা দেশের মঙ্গল চান, তাঁহাদের হৃদয়ে দেশপ্রীতির প্রদীপ যেমন সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকিবে, অবস্থানুযায়ী উপায় অবলম্বন করিবার জন্য বুদ্ধিও তেমনি সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবে।

নেতার প্রয়োজন আছে; কিন্তু যদি নেতা না থাকেন, তাহা হইলে, এবং নেতা থাকিলেও, নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বড় বড় বা ছোট ছোট দলের নায়ক আহত বা হত হন, তখন যে-সব সিপাহী দিশাহারা না হইয়া বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।

ছোট ছোট বিষয়ে যেমন দেশের হিতসাধন আবশ্যক, পল্লী, গ্রাম, নগরাদি দেশের ছোট ছোট অংশের মঙ্গলসাধন যেমন আবশ্যক, সমগ্র দেশের মহত্তম হিতসাধনও তেমনি প্রয়োজনীয়। এরূপ হিতসাধনে সকল দেশবাসীর এক যোগে কাজ করা চাই; অন্ততঃ খুব বেশী লোকের সহযোগিতা চাই। কিন্তু তার আগে চাই, **আমাদের দেশ** বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, **আমরা যে একটা জাতি**, এই বোধ জন্মান। এই বোধ, এই

চৈতন্য, অস্পষ্ট হইলে চলিবে না। জলন্ত রকমের হওয়া চাই। নানা উপায়ে এই বোধ জন্মান যায়, কিন্তু সব উপায়েরই গোড়াপত্তন ভাল করিয়া করা যায় যদি দেশের লোকে পড়িতে ও লিখিতে পারে। স্থলবিশেষে অসুবিধা হইলেও, এমন কি কুফল ফলিলেও, সকলকে পড়িতে লিখিতে শিখানই এখন সকলের চেয়ে বড় দেশের কাজ।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভা।

গত ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের অন্য কোন কোন প্রদেশের নানাস্থানে তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক সভায় তাঁহার সম্বন্ধে আর অনেক কথা বলা হয়, কিন্তু তিনি যে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। ইহা রামবিহীন রামায়ণের মত। কলিকাতার ইউনিভার্সিটী ইন্‌স্টিটিউটে যে সভা হয়, তাহাতে কোন কোন বক্তা তাঁহার প্রধান কীর্ত্তির উল্লেখ ও প্রশংসা করেন, এবং বালিকা বিধবাদের বিবাহের সমর্থন করেন। কিন্তু বাঙালীদের চালিত ইংরেজী দৈনিকগুলিতে এই সভার যে বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছিল, তাহাতে বিধবা বিবাহ কথাটি পর্য্যন্ত ছিলনা। বেঙ্গলীর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বালিকা বিধবাদের বিবাহের বিরোধী নহেন। কিন্তু রিপোর্টার ও সহকারীদের মধ্যে অন্য রকমের লোক থাকায় এইরূপ অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিজনক বৃত্তান্ত তাঁহার কাগজে বাহির হইয়া থাকিবে।

ভারতবর্ষে ও বঙ্গে হিন্দুবিধবার সংখ্যা।

হিন্দু বালিকা বিধবাদের বিবাহ বাংলাদেশে এখন প্রায় হয় না বলিলেই হয়, সুতরাং তাঁহার যে-সব স্মৃতিসভা করা হয়, তাহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রকাশ প্রায় মৌখিক বলিলেও দোষ হয় না। হিন্দু বাঙালীরা তাঁহার মহত্ত্ব অস্বীকার করিতেও পারেন না, আবার তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতেও পারেন না। অগত্যা তাঁহার অন্য নানাবিধ কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করেন। বিধবাবিবাহের কথা নিতান্তই যদি উত্থাপিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নানা অসার যুক্তির অবতারণা করিয়া বলা হয় যে উহা চলা উচিত নয়। এরূপ তর্ক যে নিতান্তই বাজে কথা, তাহা অনেকবার দেখান হইয়াছে। বালিকা বিধবাদের বিবাহ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। বাস্তবিক তাহাদিগকে বিধবা মনে করাই, অনুচিত। কুমারীদের যেমন বিবাহ হয়, তাহাদেরও বিবাহ সেইরূপ হওয়া উচিত।

হিন্দু বিধবাদের মধ্যে যে অনেক নিতান্ত অপোগণ্ড শিশুও আছে, তাহা ১৯১১ সালের সেন্সস হইতে উদ্ধৃত নীচের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

বয়স।	বিধবার সংখ্যা।
০-১	৫
১-২	১৬
২-৩	৭৬
৩-৪	২০৮
৪-৫	৬৪১
মোট ০-৫	৯৪৬
৫-১০	৮৪৩৮
১০-১৫	৩১৩৭০
১৫-২০	৯৩১৬৭
২০-২৫	১৪০৭২১
২৫-৩০	২০৯৩১৮

পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সমুদয় বিধবাকে নিশ্চয় বালিকা বলিতে পারা যায়। তদূর্দ্ধ বয়সের যত বিধবা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কত হাজার যে শৈশবে বা বাল্যকালে বিধবা হইয়াছিলেন, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

বঙ্গে সমুদয় হিন্দু বিধবার সংখ্যা ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৮০৭। বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে সাড়ে বত্রিশ লক্ষ বেশী। তাহা সত্ত্বেও মুসলমান বিধবার সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ২২৭, অর্থাৎ হিন্দুবিধবার চেয়ে ৭ লক্ষ কম। বঙ্গে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের দ্রুততর সংখ্যাবৃদ্ধির একটি কারণ হিন্দুসমাজ অপেক্ষা মুসলমান-সমাজে বিধবাবিবাহের অধিকতর প্রচলন। বঙ্গে হিন্দু বিপত্নীকের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬ হাজার ৮৯৩, অর্থাৎ বিধবাদের চেয়ে ২০ লক্ষ কম; মুসলমান বিপত্নীকের সংখ্যা ২৮৮০৪৪, অর্থাৎ বিধবাদের চেয়ে ১৫ লক্ষ কম। মুসলমান-সমাজে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও যে এত বেশী বিধবা আছে, তাহার কারণ, (১) পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক একনিষ্ঠ, এবং (২) বাঙালী মুসলমান-সমাজ অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন।

সমগ্রভারতে মোট হিন্দু বিধবার সংখ্যা ২ কোটি ১৯ হাজার৫১। কম বয়সের বিধবাদের সংখ্যা নীচে দেওয়া গেল।

বয়স।	বিধবার সংখ্যা।
০— ১	৮৬৬
১— ২	৭৫৫
২— ৩	১৫৬৪
৩— ৪	৩৯৮৭
৪— ৫	৭৬০৩
মোট ০— ৫	১৪৭৭৫
৫—১০	৭৭৫৮৫
১০—১৫	১৮১৫০৭
১৫—২০	৩৬২৯৬৬
২০—২৫	৭০২০১৩
২৫—৩০	১০৭১৮৪৫

কারাগারে বিধবা।

চিরবৈধব্যের জন্য অনেক স্ত্রীলোক নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে। ইহা যে অনেকের চরিত্রভ্রংশের কারণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পতিতা নারীদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে অনেকে বাল্যে বিধবা হইয়াছিল; তাহার পর দুষ্টলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ ও প্রতারিত হইয়া এক্ষণে পাপব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এসব কথা অনেকেই জানেন বা অনুমান করিতে পারেন; কিন্তু ইহা অনেকের জানা নাই যে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহারা আইনভঙ্গ করিয়া কারাগারে অবরুদ্ধ হয়, তাহাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা খুব বেশী।

বাংলা দেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা ৩২ ½ লক্ষ বেশী; সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৫২.৩ জন মুসলমান এবং ৪৫.২ জন হিন্দু। কিন্তু ১৯১৫ সালে যে ২৯,১৮৮ জন আসামী বাংলাদেশে জেলে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে শতকরা ৫৬.৪২ জন মুসলমান, এবং ৪০.২২ জন হিন্দু। সুতরাং, যে কারণেই হউক, মোটের উপর হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা বেশী আইন ভঙ্গ করিয়াছিল।

কিন্তু যদি শুধু স্ত্রীলোক অপরাধীর হিসাব ধরা যায়, তাহা হইলে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা বেশী দৃষ্ট হয়। বাংলাদেশে ১৯১৫ সালে আদালত হইতে মোট ৭০২ জন স্ত্রীলোককে জেলে পাঠান হয়। তাহার মধ্যে ৩২২ জন হিন্দু, ১৯৫ জন মুসলমান, ৮ জন বৌদ্ধ ও জৈন, ৯১ জন খৃষ্টিয়ান, এবং ৮৬ জন অন্য নানা সম্প্রদায়ের। মোট হিন্দু স্ত্রীলোক বঙ্গে আছে ১০,০৯৭,১৬২ জন, এবং মোট মুসলমান স্ত্রীলোক আছে ১২,৩৭৭,২১৫; কিন্তু হিন্দু স্ত্রীলোকদের মোট সংখ্যা কম হইলেও হিন্দু অপরাধিনীদের সংখ্যা মুসলমান অপরাধিনীদের সংখ্যার চেয়ে বেশী। ইহার কারণ কি? ইহা আরও চিন্তার বিষয় বলিয়া মনে হয় যখন দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে মোটের উপর হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে আইনভঙ্গ কম করিয়াছিল (যাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে)।

তার পর আবার দেখুন মোট অপরাধিনী ৭০২ জনের মধ্যে ২৩৫ জন বিবাহিতা, ৭ জন অবিবাহিতা, ২৭৩ জন বিধবা, এবং ১৮৭ জন পতিতা নারী। এই পতিতাদের অনেকেও যে বিধবা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে অপরাধিনীদের মধ্যে বিধবাদের সংখ্যা কুমারী ও বিবাহিতাদের চেয়ে বেশী। দেশের সমগ্র অধিবাসিনীদের মধ্যে মোট অবিবাহিতা বিবাহিতা ও বিধবার সংখ্যা বিবেচনা করিলে এই ন্যূনাধিক্য মনকে আরও পীড়া দেয়। বঙ্গে মোট অবিবাহিতা ৭৫,৬০,৮২৫ জন, বিবাহিতা ১,০৪,২৪,৩২২ জন এবং বিধবা ৭৫,১৬,৯০২ জন; অর্থাৎ বিধবাদের মোট সংখ্যা বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের মোট সংখ্যার সিকি মাত্র। কিন্তু অপরাধিনী বিধবাদের সংখ্যা অপরাধিনী বিবাহিতা অবিবাহিতাদের চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং ইহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকে না যে বৈধব্য আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগকে এমন অবস্থায় ফেলে যে তাহাদের মধ্যে অনেক বেশী স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকদের চেয়ে আইনভঙ্গ করে। হিন্দু অপরাধিনীদের সংখ্যা যে মুসলমান অপরাধিনীদের চেয়ে বেশী, তাহারও অন্ততঃ অন্যতম কারণ যে হিন্দুনারীর চিরবৈধব্য, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে। যাহার বিশ্বাস হয় না, তিনি অন্য কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করুন।

কলিকাতার রঙ্গালয়।

কলিকাতার দেশী থিয়েটারগুলির বিরুদ্ধে এই আপত্তি অনেকবার করা হইয়াছে, যে সেখানে অভিনয় দেখিতে শুনিতে গিয়া অনেকের নৈতিক অবনতি হয়। যাঁহাদের নৈতিক শুচিতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আছে তাঁহারা ওরূপ জায়গায় অভিনয় দেখিতে যাইতেই পারেন না। এইরূপ আপত্তির বিরুদ্ধেও অবশ্য নানা কথা শুনা যায়; কারণ মানুষ আমোদের পথে বাধা সহ্য করিতে পারে না। আমরা এসব কথার যুক্তিযুক্ততা এখন আলোচনা করিব না। অন্য এক দিক্ দিয়া থিয়েটারগুলির বিচার করিব।

দিয়াশলাই প্রধানতঃ দু রকমের পাওয়া যায়। এক রকম দিয়াশলাইয়ের কাঠী যেখানেই ঘস, জলিয়া উঠিবে। আর এক রকমের দিয়াশলাইয়ের কাঠী কেবল উহার বাক্সের পাশে ঘষিলে জলে। প্রথম প্রকারের দিয়াশলাই হঠাৎ জ্বলিয়া যাইতে পারে বলিয়া উহা বিপজ্জনক; এই জন্য উহার ব্যবহার আজ-কাল কম। তা ছাড়া উহা যাহারা প্রস্তুত করে, তাহাদের এক রকম অতি ভীষণ ব্যাধি হয়; তাহাকে ইংরেজীতে চলিত কথায় "ফসী জ" (phossy jaw) বলে। এই পীড়ায় চোয়ালের হাড়খানা নষ্ট হইয়া যায়। আমরা যখন অধ্যাপক পেড্‌লারের নিকট রসায়ন পড়িতাম, তখন তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে মানবহিতৈষী কাহারও, যেখানে-সেখানে জ্বলে, এরূপ দিয়াশলাই ব্যবহার করা উচিত নয়; কারণ উহা ক্রয় করিলে মানুষের "ফসী জ" নামক ভীষণ ব্যাধি উৎপাদনে সাহায্য করা হয়।

বঙ্গের পেশাদারী রঙ্গালয়ে যাহারা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কাজ করে, সাধারণতঃ বলিতে গেলে তাহাদের নৈতিক অধঃপতনের সম্ভাবনা খুবই বেশী। একথা ত নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে সাধুশীলা কোন নারী এইসব রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী হয় না, হইতে পারে না। তাহাদের নৈতিক অধোগতি অনিবার্য্য। সুতরাং এরূপ রঙ্গালয়

যত বাড়িবে, অভিনেত্রীর কাজ করিবার জন্য ততই বেশীসংখ্যক ভ্রষ্টচরিত্রা স্ত্রীলোকেরও দরকার হইবে। এরূপ তর্ক উঠিতে পারে, যে, কলিকাতার থিয়েটারের অভিনেত্রী কি ভাল হইতে ও থাকিতে পারে না? তর্কস্থলে ইহা স্বীকার করা যায় যে ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায় কি? দেখা যায় এই যে অভিনেত্রীরা যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক এবং যে অবস্থায় তাহারা কাজ করে, তাহাতে চরিত্র ভাল হওয়া ও থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং যাঁহারা আমোদের জন্য থিয়েটারে যান, তাঁহারা, অজ্ঞাতসারে, পরোক্ষভাবে, নিজেদের সুখের জন্য, কতকগুলি স্ত্রীলোককে অপবিত্র জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিতেছেন, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অভিনেত্রীদের নৈতিক দুর্গতিই একমাত্র চিন্তার বিষয় নহে। তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্যনাশ এবং আয়ুর হ্রাসও অবশ্যম্ভাবী। ইহার জন্যও থিয়েটারের দর্শকেরা পরোক্ষভাবে দায়ী।

অধ্যাপক গেড্‌সের যেরূপ কারণে আমাদিগকে যেখানে-সেখানে-জ্বলনশীল দিয়াশলাই কিনিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আমরা তার চেয়ে অনেক গুরুতর কারণে সর্ব্বসাধারণকে কলুষিতচরিত্রা অভিনেত্রীদের অভিনয় না দেখিতে অনুরোধ করি। অবশ্য শুধু ইহাতেই প্রতিকার হইবে না। নারী-গণকে, বিশেষতঃ বিধবাদিগকে, দুর্দশাগ্রস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে আরও অনেক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা আলোচ্য নহে।

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ।

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, বাঁকুড়া জেলার সর্ব্বত্র ভাল করিয়া বৃষ্টি না হওয়ায় ধানের চারা রোপণের কাজ সর্ব্বত্র এখনও হয় নাই। এই কাজ সর্ব্বত্র চলিলে অনেক লোক মাঠে মজুরী করিয়া দুমুঠা খাইতে পাইত। কিন্তু সে সুবিধা না ঘটায় ফল এই হইয়াছে, যে, সাহায্য-কেন্দ্র-গুলিতে আবার সাহায্য-প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে। দুর্ভিক্ষের কবে যে অবসান হইবে, জানি না। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সর্ব্বসাধারণকে বলিতে হইতেছে, এখনও সাহায্যের প্রয়োজন আছে, যিনি যাহা পারেন সাহায্য করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি এবং শাখা-সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাঁকিপুরের অভ্যর্থনাসমিতি একজন প্রধান সভাপতি এবং চারিজন শাখা সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। নাম ধরিয়া, কে যোগ্য কে অযোগ্য, বলা সুশোভন ও প্রীতিকর নহে, এবং এখন তাহা করিয়া কোন লাভও নাই। আর, যোগ্যতার কথা বলাও বড় কঠিন। সাহিত্য-সম্মিলন বরাবর কোন একটা আদর্শ অনুসারে যদি সভাপতিগণকে মনোনীত করিতেন, তাহা হইলে তাহাই মাপকাঠী মনে করিয়া তদনুসারে যোগ্যতার বিচার করা চলিত। কিন্তু সেরূপ কোন আদর্শ ত কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, সাধারণ ভাবে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। ব্যবস্থা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সে শক্তিও নাই।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য-সম্মিলনের এই চারিটি শাখা। যিনি যে শাখার সভাপতি হইবেন তাঁহার সে বিষয়ে বিশেষ রকমের কৃতিত্ব থাকা দরকার। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি যদি কিছু সফল বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভাল হয়। প্রতি বৎসর আচার্য্য বসুর মত, কিম্বা আচার্য্য রায়ের মত একজন সভাপতি চাই, এমন দাবী করিবার মত সুদশা আমাদের এখনও হয় নাই। কিন্তু অল্পস্বল্প গবেষণা আরো ২।৪ জন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানশাখার সভাপতি করা যাইতে পারে। প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন অধ্যাপক দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া অবসর লইয়াছেন। গবেষণা-ক্ষেত্রে তাঁহার কিছু কৃতিত্ব আছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের সফলতা ও উন্নতির মূলে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছাড়া, তাঁহারও বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক জ্ঞান এবং বুদ্ধি ছিল। রসায়নে এইরূপ অনেকের নাম করা যায়, প্রাণিবিদ্যায় নাম করা যায়, ভূতত্ত্বে নাম করা যায়, উদ্ভিদ-দেহ-তত্ত্বে নাম করা যায়, খনিজবিদ্যায় নাম করা যায়। আমরা সকলের নাম জানি না, কিন্তু যাহারা সম্মিলন-পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অনুসন্ধান করিয়া সমুদয় কৃতী লোকের কৃতিত্বের খবর রাখা উচিত। গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া দরকার। বৈজ্ঞানিক বহি কে কত-গুলি পড়িয়াছেন, তাহা বলা কঠিন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কৃতিত্বের খবর রাখা তত কঠিন নয়।

আজকাল ঐতিহাসিক গবেষণার ভারি ধূম পড়িয়া গিয়াছে। পুরাতন কীটদষ্ট পুঁথি, পুরাতন মন্দিরের একখানা ভাঙা ইট, বা পুরাতন খোদিত একটা পাথর, ইট বা ধাতুফলক সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিতে পারি-লেই কাহারও কাহারও মতে জবরদস্ত ঐতিহাসিক হওয়া যায়। কিন্তু এসব গবেষণার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা এখনও আমাদের দেশের বেশী লোকের জন্মে নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিন্দা যতই করি না কেন, তাঁহাদের বিচারই অগত্যা আমাদিগকে কষ্টিপাথর জ্ঞান করিতে হয়। তাঁহাদের বিচারে কাহার "গবেষণা" কিরূপ টিকিয়াছে, জানা ও দেখা দরকার। গবেষণার

পরিমাণ, মূল্য ও গৌরবও বুঝিতে পারা চাই। নতুবা গবেষণাটা অনেক সময় ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থে গোরু এবং তাহার সঙ্গের দক্ষিণা ও চালকলার অন্বেষণে পরিণত হইতে পারে।

অন্যান্য বিদ্যার মত দর্শনেও নূতন চিন্তা, নূতন আবিষ্ক্রিয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালেও, দার্শনিক প্রতিভা ভারতবর্ষকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়া গিয়াছে, এমন বলা যায় না। এদেশেও এখনও দার্শনিক বিষয়ে স্বতন্ত্র চিন্তা চলিতেছে। তাহার খবর রাখা উচিত। নিজের স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত দার্শনিক তত্ত্ব কোন্ কোন্ বাঙালী বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় সর্ব্বসাধারণের গোচর করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য ত নহেই, দুঃসাধ্যও নয়। দর্শন শাখার সভাপতি এইরূপ লোককে করিলে ভাল হয়।

সাহিত্য-শাখার সভাপতির যোগ্যতাও একটু বেশী রকমের চাই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে, যাঁহাদের রচনা ৫০০ বৎসর পরেও লোকে পড়িবে, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। যাঁহাদের লেখা একশত বৎসর পরেও পড়িবে, এমন লেখক তার চেয়ে কিছু বেশী মিলিতে পারে। ২০ বৎসর পরে বিস্তর লেখকের নাম পর্য্যন্ত শুনা যাইবে না, অনেকের নাম ২।১০ বৎসরেই লুপ্ত হইবে; বঙ্গীয় সাহিত্যের সুবৃহৎ ইতিহাস ভবিষ্যতে কেহ লিখিলে, হয়-ত কেবল তাহাতে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইবে।

কেবল খ্যাতির বা প্রসিদ্ধির দ্বারা বিচার করিলেও অনেক সময় ঠিক্ নির্ব্বাচন হয় না। মানবজীবন, মানবচরিত্র, মানবহৃদয়, কাহার রচনায় কি পরিমাণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এ সকলের স্থায়ী শ্রেষ্ঠ দিকটির চিত্র কে কি পরিমাণে কিরূপ শিল্পনৈপুণ্যের সহিত আঁকিয়াছেন, মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আনন্দসংশ্লিষ্ট হইয়া কাহার রচনায় কিরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান মানবসমাজ ও চরিত্রের সমালোচনা সাহিত্যে পরোক্ষভাবে কে কে ভাল করিয়া করিয়াছেন, মানব-প্রকৃতির ভবিষ্য বিকাশ, মানবসমাজের ভবিষ্যৎ গতি, পরিণতি ও আদর্শ, কাহার রচনায় কি ভাবে কতটা সূচিত হইয়াছে, স্থির করা সহজ নয়। অথচ তাহা স্থির করিতে না পারিলে সাহিত্যিক সভাপতির আসন যোগ্যপাত্রে অর্পিত হয় না।

যিনি যে শাখারই সভাপতি হউন, তাঁহার হাজার জনের মত একজন, বা একশত জনের মত একজন হইলে চলিবে না। তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী হওয়া দরকার।

এ ত গেল শাখাসভাপতিদের কথা। মূল সম্মিলনের সভাপতির আরও যোগ্য লোক হওয়া চাই। তিনি হয় একজন শ্রেষ্ঠ বাংলা লেখক হইবেন, কিম্বা তাহা না হইলে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার যাঁহার দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে, এরূপ লোক হইবেন। তেমন লোক না থাকিলে, কিম্বা তেমন লোককে সভাপতি করিতে করিতে দেশের পুঁজি ফুরাইয়া গেলে, তার পর অন্য লোকের পালা আসিবে।

আমরা আগে আগে অনেক লোকের নাম করিয়াছি। যোগ্য লোকের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়, সে চেষ্টাও করি নাই, সমুদয় যোগ্য লোককে আমরা জানিও না। দৃষ্টান্তস্বরূপ নামের উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। যাঁহাদের নাম করিয়াছি, তাঁহারা ছাড়া আর যোগ্য লোক নাই, এরূপ মনে করা বাতুলতা।

বিজ্ঞান, দর্শন বা ইতিহাস শাখার সভাপতি শ্রেষ্ঠ-বাংলা-লেখক না হইলেও চলিতে পারে। মূল সম্মিলনের সভাপতি যদি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্যিক না হন, তাহা হইলেও চলিতে পারে, যদি বিদ্যার কোন শাখায় তাঁহার অসাধারণ স্বাধীন কৃতিত্ব থাকে।

কিন্তু সম্মিলনটি যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-বিষয়ক, তখন বাংলা সাহিত্যের খবরটা সকল সভাপতিরই রাখা দরকার। এমন বলিলে চলিবে না, যে, "আমি আধুনিক বাংলা কবিতা পড়ি না বা পড়িবার যোগ্য মনে করি না, কিন্তু অমুক শিশু-পাঠ্য বহিটির মত পদ্য যদি আধুনিক বাঙ্গলা কাব্যে থাকে তাহা হইলে আমার মত বদলাইব।" বাংলা সাহিত্যের উপর এরূপ মুরুব্বিয়ানা করিবার সময় আর নাই। কাব্যই সকল দেশের সাহিত্যের প্রাণ, জাতির মর্ম্মস্থলে পৌঁছিতে হইলে তাহা কাব্যের মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হয়। বাংলাকাব্য ও বাঙালী এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নয়। বাংলাকাব্যের খবর যে নানা সভ্য-দেশে পৌঁছিয়াছে, তাহা একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। ইহাতে কিছু মূল্যবান জিনিষ আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। অতীতকালে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান যেরূপই থাক্ না কেন, কোনও সাহিত্যিক-সভায় বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে বক্তা জানিয়া শুনিয়া পড়িয়া ওয়াকিব-হাল হইয়া আসিবেন, এরূপ আশা করা দুরাশা না হইতেও পারে।

জাপানে রবীন্দ্রনাথ।

জাপানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব আদর অভ্যর্থনা হইয়াছে। জাপানী কোন কোন কাগজে দেখা যাইতেছে যে জাপানীরা তাঁহার কোন কোন বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়াছে। দি হেরাল্ড অব্ এশিয়া অর্থাৎ এশিয়া-দূত নামক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার একটি বক্তৃতার উপদেশ জাপানীদের মনে গভীর ও স্থায়ীরূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে, ভাব ও চিন্তা

জাপানে, ওসাকা শহরে সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক সভায় বক্তৃতা করিতেছেন।

রাজ্যে, ভারতবর্ষের নিকট জাপানের ঋণ অনেক জাপানী কাগজে স্বীকৃত হইতেছে। তাহারা বলিতেছে, "ভারতবর্ষের ঋণ আমাদের শোধ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।"

জাপানের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র-পরিচালকেরা রবীন্দ্রনাথকে ভোজ দিয়াছিলেন।

উয়েনো উদ্যানে জাপানের প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট ওকুমা প্রভৃতি দুইশতাধিক প্রধান প্রধান লোক রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা করেন। অভিনন্দনপত্রের উত্তরে কবি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই বাংলা বক্তৃতা অধ্যাপক কিমুরা জাপানীতে অনুবাদ করিয়া জাপানী শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন। কিমুরা অনেক দিন কলিকাতায় থাকিয়া বাংলা ও সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন।

ওকুমার বিদেশীভাষায় অজ্ঞতা।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা বক্তৃতাকে জাপানের প্রধান মন্ত্রী ওকুমা ইংরেজী মনে করিয়াছিলেন; কারণ তিনি ইংরেজী কিম্বা অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষা জানেন না। অবশ্য জাপান স্বাধীন দেশ বলিয়া, আমাদের যতটা বিদেশী ভাষা জানা দরকার, তাহাদের ততটা দরকার নয়। কিন্তু অনেকে চোস্ত ইংরেজী বলা ও লেখা এত বেশী দরকারী বলিয়া মনে করেন যেন উহা মোক্ষলাভের উপায়। ইংরেজেরাও সকলে বিশুদ্ধ ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে পারে না। আমরা সুলেখক ও সুবক্তা ইংরেজদের মত ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে না পারিলে তাহা লজ্জার বিষয় মনে করা যায় না। খুব ভাল ইংরেজী লিখিবার ও বলিবার চেষ্টায় জীবন ক্ষয় করা সুবুদ্ধির কাজ নয়।

গত বৎসর পৌষমাসের প্রবাসীতে আমরা "শিক্ষার ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে, বাংলায় সমস্ত বিষয় শিখাইয়া ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা করিবার বিরুদ্ধে নানা আপত্তি-খণ্ডন উপলক্ষে লিখিয়াছিলাম :—

তৃতীয় আপত্তি, নানাবিধ চাকরী, আইন-ব্যবসায়, ডাক্তারী, বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য এখন ছাত্রেরা যতটা উপযুক্ত হয়, ইংরেজী কেবল দ্বিতীয় ভাষা রূপে শিখিলে ততটা উপযুক্ত হইবে না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা মাত্র হইলেও ছাত্রেরা যথেষ্ট ইংরেজী শিখিতে পারিবে, সুতরাং এই-সকল নানা কার্য্যে সিদ্ধি ইংরেজী-জ্ঞানের উপর যে পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা তাহাদের
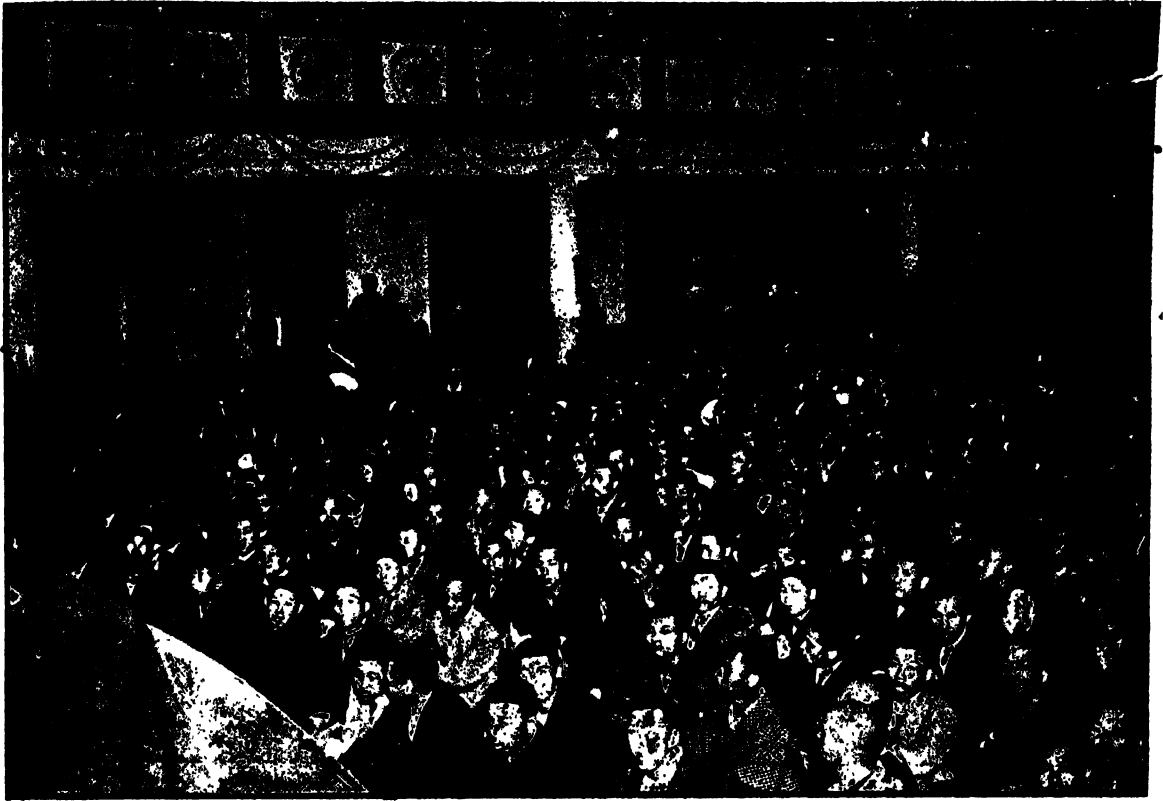
জাপানে, ওসাকা শহরে, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতার শ্রোতৃমণ্ডলী।

অধিকৃত হইবার সম্ভাবনা। তাহার পর ইহাও বিবেচ্য যে সাংসারিক উন্নতির জন্য ইংরেজীর কিরূপ জ্ঞান দরকার। আমাদের ত মনে হয় ইংরেজী ভাষার সমস্ত ধরণধারণ খুঁটিনাটি তন্নতন্ন করিয়া না জানিলেও চলে। অন্য চাকরী দূরে থাক, দেশী হাইকোর্টের জজদের, সেশ্যান জজদের, মাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে সকলেই যে বিশুদ্ধ ইংরেজী লিখিতে পারেন, এরূপ বলা যায় না। বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার ও অধ্যাপকদের সম্বন্ধেও ইহা সত্য নহে যে তাঁহারা সকলেই ভাল ইংরেজী লেখেন, বলেন বা জানেন। খুব পসার ও রোজগার আছে এরূপ উকীল ইংরেজীর ভুল করেন, ইহাও জানা কথা। ভাল ভাল ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ারদেরও এই ত্রুটি আছে। বাণিকদের ত কথাই নাই। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বণিকদের মধ্যে অধিকাংশ ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ। জার্মেন ও জাপানীরা সামান্য ইংরেজী জানিয়াও আমাদের দেশের ব্যবসা দখল করিয়াছিল ও করিতেছে, আর আমরা এক-একজন বিদ্যার জাহাজ হইয়া উপবাস করিতেছি। বাণিজ্যে খুব কৃতিত্ব লাভের জন্য পৃথিবীব্যাপী কোন ভাষা কিছু জানা দরকার বটে, কিন্তু বাণিজ্যে সিদ্ধিলাভ ভাষাজ্ঞান অপেক্ষা অন্যবিধ যোগ্যতা ও গুণের উপর নির্ভর করে। আমরা নিশ্চয়ই ইহা মনে করি যে ইংরেজী ভাল জানা এবং ভাল লিখিতে ও বলিতে পারা বাঞ্ছনীয়। যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা চূড়ান্ত রকমে করাই আদর্শ। কিন্তু চাকরীতে ও নানা ব্যবসায়ে পয়সা রোজগার, অতি উৎকৃষ্ট ইংরেজী বলিতে বা লিখিতে না পারিলে হয় না, ইহা মহা ভ্রম। ইংরেজীতে বাহাদুরী দেখাইবার প্রয়াস একটা কুসংস্কার মাত্র। যাহার কোন বিষয়েই গভীর জ্ঞান নাই, এরূপ লোকও ফড়ফড় করিয়া ইংরেজী বলিতে এবং খচ খচ করিয়া ইংরেজী লিখিতে পারে। কিন্তু তাহার মূল্য কি?

ইংরেজী কাগজের সম্পাদক, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কংগ্রেসের নেতা, মিউনিসিপালিটির সভাপতি, প্রভৃতিদের মধ্যে সবাই ইংরেজীতে মহাপণ্ডিত নহেন। নাম করা ভাল দেখাইবে না, নতুবা লেখার দৃষ্টান্ত সহ নাম করা অসম্ভব হইত না।

কাউণ্ট ওকুমা ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিদ্যার কঠিনতম অংশও জাপানী পুস্তক ও জাপানী ভাষার সাহায্যে শিখান হয়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে ও চেষ্টায় এই-সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে।

জাপান ও ভারতবর্ষ।

বিদেশে আমাদের দেশের অগ্রণী কাহারও কাহারও আদর অভ্যর্থনায় আমরা যেন অসাবধান না হই। সকল দেশেই কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা ঠিক দেশের লোকদের প্রতিনিধি নহেন, দেশের লোকদের চেয়ে অধিক

জাপানে সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে প্রেসের পক্ষ হইতে জাপানী রীতিতে ভোজ দেওয়া হইতেছে।

অগ্রসর; অবশ্য কেহ কেহ ভণ্ডও আছেন। মোটের উপর প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির সহিত ব্যবহারে পূর্ণমাত্রায় স্বার্থপর। জাপানে রবীন্দ্রনাথের খুব অভ্যর্থনা হইয়াছে বলিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে জাপানী শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্পবাণিজ্যের খুব ক্ষতি হইতেছে। ভারতবর্ষের বাণিজ্য দখল করিতে জাপানীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে ও করিবে। এ বিষয়ে তাহাদের গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে খুব সাহায্য করিতেছে। কোন কোন স্থলে ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে জাপানের বাণিজ্যবিস্তারের সহায় হইয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ভারতসাম্রাজ্যের বার্ষিক আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন রাজস্ব-মন্ত্রী বড়লাটের সভায় উপস্থিত করেন, তখন দেখা যায় যে লবণের ট্যাক্স এবং অন্যান্য অনেক জিনিষের ট্যাক্স বাড়িয়াছে, এবং কোন কোন জিনিষের উপর নূতন করিয়া ট্যাক্স বসান হইয়াছে। বিদেশ হইতে আমদানী কাপাসের সুতা ও কাপড়ের উপর কেন ট্যাক্স বসান হয় নাই, তাহার কারণ সম্বন্ধে রাজস্ব-মন্ত্রী এইরূপ আভাস দেন যে যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষের সহিত বিলাতের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, এবং তাহাতে ভারতবর্ষের সুবিধা হইতে পারে; এখন সুতা-ও-কাপড়-নির্ম্মাতা লাঙ্কেশায়ারের বণিক্‌দিগকে ঘাঁটাইলে ফল ভাল হইবে না; কিন্তু আমদানী সুতা ও কাপড়ের উপর ট্যাক্স না বসাইবার একটি কারণ যে জাপানকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। ইহা আমরা পরে জাপান ম্যাগাজিন নামক ইংরেজী জাপানী কাগজ হইতে জানিতে পারিয়াছি। জাপান ম্যাগাজিন বলেন:—

"When England increased her customs tariff to meet war needs, she thoughtfully provided rules for special treatment of certain exports from Japan; and likewise, when the Indian Government was proposing to levy a cotton export duty as well as one on imports of cotton, Britain had the proposal dropped owing to the serious effect it would have on Japan's cotton industries."

ইংলণ্ড যখন যুদ্ধের খরচ জোগাইবার জন্য পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক বাড়াইলেন, তখন তিনি সুবিবেচনা পূর্ব্বক জাপান হইতে বিলাতে

রপ্তানী কয়েকটি জিনিষের সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম প্রণয়ন করেন, আবার যখন ভারত-গবর্ণমেণ্ট আমদানী ও রপ্তানী কার্পাস সূত্র ও বস্ত্রের উপর কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন ইংলণ্ড এই প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেণ্টকে পরিত্যাগ করাইলেন এই জন্য যে ইহা দ্বারা জাপানের কার্পাস শিল্পের গুরুতর অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে।"

ভারতবর্ষ হইতে ছাত্রেরা শিল্প শিখিবার জন্য জাপানে গেলে যদি জাপানীরা তাহাদিগকে শিল্পশিক্ষালয়ে ও কারখানায় ঢুকিতে দেন, তাহা হইলে আমরা যথেষ্ট মিত্রতা করা হইয়াছে মনে করিব। শিল্পবাণিজ্যে প্রতিযোগিতা জাপান পরিত্যাগ করিবে, এ আশা আমরা করি না। জাপানকে শত্রুও মনে করি না। আমরা শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারি, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি আত্মরক্ষা বিষয়ে আমাদের সাহায্য না করেন, তাহা জাপানের দোষ নয়। "আর কারো দোষ নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।"

বিলাতী শিশুর এশিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান।

বিদেশের শিশুদের আমাদের সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা নানা রকম ধারণা আছে। তাহা তাহারা তাহাদের পঠিত বহি হইতে লাভ করে। তাহারা আমাদিগকে কি মনে করে, তাহা জানা ভাল। তাহারাই ত বড় হইলে কর্ম্মকর্ত্তা হইবে। তাহাদের সঙ্গেই আমাদের দেশের লোকদের নানা সম্পর্ক ঘটিবে ও বুঝা পড়া করিতে হইবে।

টমাস্ নেল্‌সন এণ্ড সন্সদের প্রকাশিত Highroads of Geography নামক সচিত্র পুস্তিকাবলীর উপক্রমণিকা খণ্ডে ভারতবর্ষের লোকদের কিছু বৃত্তান্ত আছে। এদেশের লোকেরা মাথার উপর ঝুড়ি কলসী রাখিয়া বহন করে, লিখিয়া, বলা হইতেছে:—

"From childhood the women carry jars of water or baskets of earth in this way. They hold themselves very upright and walk like queens."

"স্ত্রীলোকেরা খুব সোজা হইয়া রাণীদের মত হাটে।"

"Not only Bombay but all India belongs to Britain."

"শুধু বোম্বাই নয়, সমুদয় ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সম্পত্তি।" *

"When Indians grow up they are rather grave and sad. The children, however, are always bright and merry. Indian fathers and mothers are very fond of their boys. They care very little for their girls."

"ভারতবাসীরা বড় হইলে গম্ভীর ও বিমর্ষ হয়। শিশুরা কিন্তু খুব স্ফূর্ত্তিবাজ ও প্রফুল্ল। ভারতীয় পিতামাতারা পুত্রদিগকে খুব ভাল বাসে। কন্যাদের দেখিতে পারে না। †"

পাল্কীর বর্ণনাটা বেশ মজার। মেয়েদের কুপ্রথা বলিতে গিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন:—

Sometimes they are carried from place to place in a closely shut box on poles." "মেয়েদিগকে কখন কখন একটা সিন্দুকে বন্ধ করিয়া তাহার দুদিকে ডাণ্ডা লাগাইয়া বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।"

"I think Indian boys are much fonder of their lessons than our boys." "আমার ধারণা ভারতবর্ষের ছেলেরা আমাদের ছেলেদের চেয়ে পড়িতে বেশী ভাল বাসে।"

এই জন্যই শাস্ত্রে বলে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী," সংস্কৃত বচনটি, শাস্ত্র শব্দটা ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে।

চীনদের সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে, চীনা বাপ মা ছেলে খুব ভালবাসে, কিন্তু তারা মেয়ে চায় না।

"Girls, however, are not welcome. Sometimes they are called 'Not wanted" or Ought-to-have-been-a-boy."

"বালিকার জন্ম হইলে কেহ আনন্দিত হয় না। কখন কখন তাহাদের নাম রাখা হয়, "চাই-না,"কিম্বা "বালক হওয়া-উচিত-ছিল।"

আমাদের দেশেও উপর্যুপরি কন্যা হইলে লোকে নাম রাখে "ক্ষান্ত", "আর-না-কালী।" কিন্তু কাহারও দশ দশটা পুত্র হইলেও কেহই শেষ ছেলেটার নাম রাখে না, "বহুৎ-হুআ-রাম," "বাস্-বাস্-রাম," কিম্বা "আর-না-হরি।" কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে, এবং বালিকা বয়সেই দিতে হইবে, এইরূপ সামাজিক প্রথা থাকায়, এবং নারীর সদুপায়ে স্বাধীন জীবিকা অর্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবার উপায় না থাকায় লোকে কন্যার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে না। নতুবা, মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক; আমাদের দেশের লোকেও কন্যাকে খুব স্নেহ করে। তাহা না হইলে আগমনী গানের করুণ সুর এত মর্ম্মস্পর্শী হইত না। যাহাই হউক, বরপণ, শৈশব-বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা, প্রভৃতি যে-সব কারণে আমাদিগকে কন্যার জন্মে ভীত করে, সেই সব প্রথার উচ্ছেদসাধনে আলস্য করা উচিত নয়। এই সব প্রথায় আমাদিগকে অমানুষ করিতেছে।

বাঙালী সিপাই।

দেশরক্ষা ও দেশের অন্য সমস্ত ব্যাপার চালাইবার জন্য যত প্রকারের সরকারী কাজ করিবার প্রয়োজন, দেশের লোকদের সেই-সমুদয় কাজ করিবারই অধিকার থাকা

* মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বারা প্রচারিত এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের দ্বারা সমর্থিত ঘোষণা-পত্র অনুসারে কিন্তু আমরা ইংরেজের সমান সমান, কেবল ইংলণ্ডের রাজার প্রজা; অর্থাৎ লর্ড মর্লীর কথায়, "equal subjects of the King." অনেক দেশী রাজ্যের রাজা ইংলণ্ডেশ্বরের মিত্র রাজা বা Allies। অন্ততঃ তাদের রাজ্যগুলি ব্রিটেনের সম্পত্তি নয়। সম্পাদক।

† হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।—সম্পাদক।

বিয়ে দেওয়া কঠিন বলিয়া। সম্পাদক।

স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। সৈনিক বিভাগে এই অধিকার হইতে আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলাম; ভারতবর্ষের যে-সব জাতি সাধারণ সিপাহী হইতে পায়, তাহারাও উচ্চতর ও উচ্চতম সেনানায়ক হইতে পায় না। গবর্ণমেণ্ট বাঙালীকে সামান্য পরিমাণে এই অধিকার দিতে রাজী হইয়াছেন, ২২৮ জন বাঙালী সিপাহী লইবেন বলিয়াছেন। যে ন্যায্য ও স্বাভাবিক অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত ছিলাম, অতি অল্প পরিমাণেও তাহা আমাদিগকে দিয়া গবর্ণমেণ্ট সুবুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধবিষয়ক অভিজ্ঞতা-লাভের এবং সংগ্রামক্ষমতা প্রমাণ করিবার এই সামান্য সুযোগকে তুচ্ছ মনে না করিলেও, আমরা ইহাকে অনুগ্রহ মনে করিতে পারি না; ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরাও যেন তাহা মনে না করেন।

ইংরেজসৈন্যেরা উচ্চ হারে বেতন পায়; এমন কি সৈন্য হইবার অধিকার যাহারা এই সে-দিন পাইয়াছে, সেই ফিরিঙ্গীরাও তাহাদের সমান বেতনাদি পাইবে। শিখ, গুর্খা, পাঠান, ডোগ্রা, জাট, প্রভৃতি শৌর্য্যের জন্য বিখ্যাত। ফিরিঙ্গীদের এরূপ কোন খ্যাতি নাই। এই জন্য দেশী সিপাহীদের বেতন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলেরা চাষী ও শ্রমজীবী শ্রেণীর শিখ, জাট, প্রভৃতির বেতনে সৈন্য হইবে না, এরূপ কথা উত্থাপন করা ঠিক নয়। কারণ, কাজের বেতন কাজ অনুসারে হয়, সামাজিক স্তর বা শ্রেণী অনুসারে হয় না। বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলে যদি সিপাহী হইতে চায়, তাহাকে জাট চাষার বেতনেই হইতে হইবে, অথবা সঙ্গতি থাকিলে সে বেতন না লইতেও পারে। সমুদয় দেশী সিপাহীর বেতন বৃদ্ধি হওয়া উচিত, ফিরিঙ্গী সৈনিকের বেতন দেশী সৈনিকের বেতন অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত নয়, দেশী লোকদেরও উচ্চতর এবং উচ্চতম সেনানায়কের পদ পাওয়া উচিত, এইরূপ দাবী করিয়া আন্দোলন করা খুব কর্ত্তব্য; কিন্তু শুধু বাঙালীর জন্য করা যাইতে পারে না। সত্য বটে, আজকালকার যুদ্ধে শারীরিক বল অপেক্ষা বুদ্ধিরই প্রয়োজন ও প্রাধান্য বেশী, এবং শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীর বুদ্ধি অশিক্ষিত জাট পাঠান চাষার চেয়ে বেশী; সেই জন্য বাঙালী সৈনিকের অধিক বেতনের দাবী একেবারে অযৌক্তিক নহে। কিন্তু অন্য দিকে দেখিতে হইবে, যে, বাঙালী অতীতকালে রণদক্ষতার যেরূপ পরিচয়ই দিয়া থাক্ বা না থাক্, বর্ত্তমানে তাহাকে নিজের রণসামর্থ্য প্রমাণ করিতে হইবে। তাহা প্রমাণিত হইবার আগেই শিখ গুর্খা অপেক্ষা অধিক বেতনের দাবী উত্থাপন সঙ্গত নয়। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে জাতিতে জাতিতে ঈর্ষ্যার কারণ যাহাতে না জন্মে, সে বিষয়ে খুব সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। বাঙালী বিদ্যায় ও বিদ্যাসাপেক্ষ কাজকর্ম্মে, যে কারণেই হউক, একটু অগ্রসর হইয়া পড়ায়, ঈর্ষ্যাভাজন হইয়াছে; এখন আবার একটা নূতন ঈর্ষ্যার কারণ, খুব ছোট হইলেও, জন্মিতে দেওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়।

বাস্তবিকও এখন বাঙালী যাহারা সিপাহী হইবে, তাহারা বেতনের জন্য হইবে না, অন্য কারণে হইবে। আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। আমরা লিখিয়াছি:—

চন্দননগরের যে কয়টি লোক সেনাদলে ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহারা বেতনাদি ঠিক্ ফরাসী সৈন্যদের মত পাইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পল্টনের সিপাহীরা গোরাদের সমান বেতন পায় না, কম পায়। বাংলা-দেশে শারীরিক শ্রমের কাজ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে হিন্দুস্থানী, বিহারী ও উড়িয়ারা করিতেছে। সুতরাং যে-বেতনে ভারতবর্ষের শিখ, গুর্খা, আদি জাতিরা সিপাহী হয়, সেই বেতনের জন্য বাংলা দেশ হইতে দৈহিক শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক না পাইবারই কথা, এবং তাহা পাওয়া না গেলে এদেশ হইতে বেশী সৈন্য মিলিবে না। "ভদ্র" শ্রেণী হইতে কিছু লোক পাওয়া যাইতে পারে। সিপাহীদের বেতন বাড়িলে পরে "নিম্ন" শ্রেণীর বাঙালীও পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু যে সামান্য বেতনে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে না, তাহার জন্য "ভদ্র" বঙ্গবাসী কেন যুদ্ধ করিতে যাইবে?

কেন যাইবে, তাহা বলিতেছি। বাঙালীকে অপরেরা ভীরু বলে, এই অপবাদটা এখনও অনেককে ক্লেশ দেয়। আমরা ইহা গ্রাহ্য করি না, কারণ আমরা জানি ভীরুতা জাতিগত নহে। কিন্তু যাহারা ক্লেশ পান তাঁহারা অপবাদ স্খালন করিতে চান, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেক যুবক আছেন। বিপদের, নূতন দেশের, বিচিত্র ঘটনার, সাহস সামর্থ্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইবার ক্ষেত্রের, একটা মোহিনী শক্তি আছে, যাহা স্বস্থপ্রকৃতির মানুষ মাত্রকেই আকর্ষণ করে। তরুণবয়স্ক এরূপ মানুষ বাংলা দেশেও আছে। তাহারা ঐ আকর্ষণে যুদ্ধে যাইতে পারে। অনেকের এই অটল বিশ্বাস আছে যে আমরা স্বরাজ লাভ করিব। কিন্তু অধিকার ও দায়িত্ব একই জিনিষের দুই পিঠ। যাহাকে স্বদেশের কাজ চালাইবার অধিকার পাইতে হইবে, তাহাকে বাহ্যশত্রু ও অন্তর্বিপ্লব হইতে দেশরক্ষার সামর্থ্যও অর্জ্জন করিতে হইবে। জলে না নামিলে সাঁতার শিখা যায় না, যুদ্ধ না করিলে যুদ্ধের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের যুদ্ধশিক্ষার একমাত্র প্রশস্ত ক্ষেত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে-পরিমাণে মনুষ্যোচিত অধিকার দিয়া মানুষের দায়িত্বের বোঝাও আমাদের দেশের লোকের ঘাড়ে চাপাইবে, সেই পরিমাণে তাহাদের মনের ভাব উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুকূল হইবে। এই ভাবের দ্বারা চালিত হইয়াও অনেকে পল্টনে ঢুকিতে পারে।

আমাদের প্রদেশ রক্ষা অন্য দেশের ও প্রদেশের লোকেরা করিবে, আমরা করিতে পারিব না, ইহা আমাদের পক্ষে লজ্জা ও অপমানের বিষয়। এরূপ অবস্থার উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টাও বাঙালীকে সিপাহী হইতে প্রবৃত্ত করিবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্রিটিশ জাতির গৌরবের ও লাভের বস্তু। এইজন্য বিলাতে সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম কত কত লোককে সৈন্যদলে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর সৈনিক হইলে উপযুক্ত বেতন আছে, পেন্‌শন আছে, স্বজাতীয়ের প্রশংসা আছে, যুদ্ধান্তে কাহারও কাহারও ভাল চাকরীর আশা আছে। এ-সকল সত্ত্বেও যথেষ্ট লোক স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে ভর্ত্তি না হওয়ায় সমর্থবয়স্ক প্রত্যেক "পুরুষকে অ-বশ্যক হইলে যোদ্ধা হইতে বাধ্য করিবার জন্য বিলাতে

আইন করা হইতেছে। অতএব মানবচরিত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান কোন ইংরেজ এরূপ আশা করেন না যে বাংলা বা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশ হইতে কেবলমাত্র ব্রিটিশসাম্রাজ্যানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া লোকে দলে দলে পল্টনে প্রবেশ করিবে। বিলাতে যেমন, এখানেও তেমনি, নানা লোকে নানা কারণে ও নানা উদ্দেশ্যে সৈনিক হইতে চাহিবে। বৈধ সর্ব্ববিধ কারণ ও উদ্দেশ্য বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের নিকট উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

বৈশাখের প্রবাসীতে আমরা মার্কুইস অব্ হেষ্টিংসের দৈনন্দিন লিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, যে, ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্কালে ভারতবাসীদের অবনতির একটি কারণ এই ছিল, যে, অনেকের দৈহিক সাহস ও সামর্থ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে মানসিক শক্তির মণিকাঞ্চন যোগ হয় নাই। এখনও যে-সব ভারতীয় জাতি দৈহিক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহারা মানসিক শক্তি ও ঐশ্বর্যে শ্রেষ্ঠ নহে; আবার যাহারা মানসিক শক্তিসম্পদে অগ্রণী, তাহাদের দৈহিক উৎকর্ষের খ্যাতি নাই। কিন্তু উভয়ের সম্মিলন ভিন্ন দেশের উন্নতি হইবে না। আমরা চাই, যোদ্ধা জাতিরা মানসিক সম্পদেও ঐশ্বর্য্যশালী হউন, এবং বঙ্গের অধিবাসীরা সুস্থ সবল ও পৌরুষসম্পন্ন হউন।

যদি কোন আশা না থাকে, সে একরকম ভাল, কিন্তু আশার পর নৈরাশ্যে কুফল ফলে। এইজন্য বাঙালী সিপাহীদের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ঠিক্ কি অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া রাখা ভাল। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে এখন তাহারা বালুচীস্থানের কোহাটে শিক্ষা পাইবে, তাহার পর যুদ্ধ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইতে পারে। প্রেরিত হইবে, এরূপ অঙ্গীকার গবর্ণমেণ্ট করেন নাই। সুতরাং ইহা যেন কেহ ধরিয়া না রাখেন যে গবর্ণমেণ্ট বাঙালী সিপাহীদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চয় পাঠাইবেন বলিয়াছেন। তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইতে পারে (যদিও তাহার সম্ভাবনা কম), কিম্বা আরও নানা কারণে তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে পাঠান না হইতে পারে।

বাঙালীদের সম্বন্ধে আশঙ্কা।

বাংলাদেশ ও বাঙালীর সম্বন্ধে খুব বড়াই করিতে পারিলে লোকপ্রিয় হইতে পারা যায়, কিন্তু তাহা না করিয়া যদি কেহ বাঙালীর দোষ ত্রুটি দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার উপর দেশের লোকে চটিতে পারে। তাহা হইলেও কর্তব্য যাহা তাহা করিতে হইবে। আমরা এ-কাজ আগেও করিয়াছি, আবার করিতে যাইতেছি। বাঙালী ভারতবর্ষের অন্য কোন কোন প্রদেশের লোকদের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে অগ্রসর; কিন্তু সে-সব কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক।

আমরা শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজে পরাঙ্মুখ। দরিদ্র অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এই রোগ ঢুকিয়াছে। সেই জন্য, যদিও বাংলাদেশের সাধারণ লোকদের অবস্থা সচ্ছল নয়, তথাপি গৃহস্থের চাকর, মাঠের মজুর, রাস্তার ও রেলের কুলি, বাজারের মুটিয়া, নদীর মাঝি মাল্লা, প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইতেছে। দেখিয়া মনে হয়, বাংলার সাধারণ লোক সব যেন হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জলের কল, গ্যাস, ড্রেন, বৈদ্যুতিক তারের বসান, প্রভৃতি কাজের বেশীর ভাগ মিস্ত্রী বাঙালী নয়। শ্রেষ্ঠ ছুতার মিস্ত্রী চীনা। রাজমিস্ত্রী এবং অন্যান্য রকম মিস্ত্রীর কাজে বাঙালীর সংখ্যাধিক্য বা প্রাধান্য নাই। মুদি ময়রা দোকানী পসারী পর্য্যন্ত এখন বিস্তর অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়া বাজার জুড়িয়া বসিয়াছে। কাপড়ের ও অন্যান্য জিনিষের বড় বড় কারবার ত মাড়োয়ারী পঞ্জাবী প্রভৃতির একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ সওদাগরদের বেনিয়ান মুৎসুদ্দি, বড় বড় দালাল, এসব আগে বাঙালীই হইত। এখন মাড়োয়ারী প্রভৃতিরা, তাহাদিগকে হটাইয়া দিতেছে। সামান্য নয় লক্ষ টাকা মূলধনের ছোট বাগেরহাট খুলনা রেলওয়ে আহমদাবাদের গুজরাটি বণিকেরা নির্ম্মাণ করিতেছে। পাট বঙ্গের একচেটিয়া জিনিষ। কিন্তু বাঙালীর পাটের কল একটিও নাই।

শুধু শারীরিক শ্রম, দোকানদারী, কারিগরী, কলকারখানা ও বড় বড় বাণিজ্যের কাজেই যে বাঙালী হটিয়া গিয়াছে, তাহা নহে; অন্যদিকেও বাঙালীর পরাজয় হইতেছে। অন্যান্য প্রদেশের লোকদের উন্নতি যে আমরা চাই, তাহা বলাই বাহুল্য; কেন চাই, তাহা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে "ভারতের সকল প্রদেশের সাম্যের প্রয়োজন" শীর্ষক নিবন্ধিকায় বলিয়াছি। কিন্তু আমরা বাঙালীর অবনতি ও পরাজয় চাই না।

আমাদের কাছে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের দেশী সংবাদপত্র আসে। আমরা এংলোইণ্ডিয়ান কাগজগুলির কথা বলিতেছি না, ভারতবাসীদের হিতসাধনার্থ প্রকাশিত ইংরেজী কাগজগুলির কথাই বলিতেছি। নানা প্রদেশের প্রধান প্রধান কাগজ দেখিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে, যে, মোটের উপর মান্দ্রাজ বোম্বাই আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাব হইতে বাংলা দেশের চেয়ে উৎকৃষ্ট ইংরেজী খবরের কাগজ বাহির হয়। দু এক জন খবরের-কাগজ-ওয়ালাকে বাদ দিলে বলা যায় যে বাঙালী সম্পাদকেরা কোন একটা বিষয় ভাল করিয়া অধ্যয়ন ও চর্চ্চা করিয়া খুঁটিনাটি সব কথা জানিয়া লিখিতে চান না; ফাঁকা আওয়াজ ও বাগাড়ম্বরে তাঁহারা পারদর্শী। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও রাজস্ব-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব এবং ষ্ট্যাটিষ্টিক্স অর্থাৎ সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত নানা লৌকিক তথ্য অধিকাংশ বাঙালী সম্পাদকের বাধ। ঠিক্ এই কারণে এবং শ্রমবিমুখতায় বা শ্রম করিবার মত অবসরের অভাবে বড়লাটের সভায় বাঙালী সভ্যদের বিশিষ্ট প্রভাব থাকিলে ফল না, এখনও নাই।

গোখলের স্থান খালি রহিয়াছে। উহা যদি পূর্ণ হয়; মান্দ্রাজী বা দক্ষিণী সভ্যের দ্বারা হইবে, বাঙ্গালীদের দ্বারা হইবে না; কারণ বাঙ্গালীদের মধ্যে একনিষ্ঠ একাগ্র রাজনৈতিক নেতা দেখিতেছি না। যাঁহারা এ-কাজে আছেন, তাঁহাদের প্রধান কর্ম্ম অর্থ-উপার্জ্জন। সুরেন্দ্রবাবু বড়লাটের সভায় না যাওয়ায় বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি নিজের কাগজে ভূপেন বাবুকে অপদস্থ করিতে গিয়া কেবল লোক-হাসি করিতেছেন ও শত্রু হাসাইতেছেন। তাঁহার ও ভূপেন বাবুর ক্ষমতা নাই, এমন নয়; কিন্তু তাঁহারা দেশের কাজকে জীবনের প্রধান কাজ করেন নাই। সুরেন্দ্র বাবুর পরাজয়ে, দোষ ভূপেন বাবুর বা তাঁহার, দেশের লোকের তাহা জানিয়া কোন লাভ নাই। বঙ্গের তথাকথিত কোন নেতাই অন্যান্য প্রদেশের লোকে যাহা করিতেছেন, তাহা করিতেছেন না। প্রেস-আইনের বিরুদ্ধে, ভারতশাসনসম্বন্ধীয় নূতন বিলাতী আইনের বিরুদ্ধে, অন্যান্য জায়গায় প্রতিবাদ-সভা হইয়াছে, বঙ্গে হয় নাই। হোমরুল বা স্বরাজের জন্য খবরের কাগজে লেখা, সভায় বক্তৃতা, পুস্তিকাপ্রচার, অন্যত্র যেরূপ হইয়াছে, বঙ্গে সেরূপ হয় নাই। অন্যান্য প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা যেরূপ পরিশ্রম করিয়া নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশ্ন করেন, প্রস্তাব উপস্থিত করেন, ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, বাঙালী প্রাদেশিক সভার সভ্যেরা তেমনটি করেন না। আবার যদি বা কেহ কিছু করেন, তাহা হইলে দৈনিক কাগজগুলির সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক বা রিপোর্টারদের খোসামোদ না করিলে, তাহার বক্তৃতা ছাপা হয় না। যিনি "খাতির জমাইতে" পারেন, তাঁহার বক্তৃতাই ছাপা হয়।

বাঙালীর দৈনিক ইংরেজী কাগজে গ্রন্থকার বা প্রকাশক বহি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাঁহাকে নিজে সমালোচনা লিখিয়া বা লিখাইয়া লইয়া গিয়া সম্পাদকের বা তদীয় নন্দীভৃঙ্গীদের খোসামোদ করিয়া তাহা ছাপাইতে হইবে। মাসিক পত্রের সমালোচনা এই-সব কাগজে যাহা বাহির হয়, তাহাও এই রকমের। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বেশ হাস্যকর ব্যাপার হয়; দেখা যায় যে অনেকগুলি কাগজই প্রথমস্থানীয়! কারণ, কোন সম্পাদকই নিজের কাগজের সমালোচনা নিজে লিখিবার বা লিখাইবার সময় প্রশংসার সুর সপ্তমে চড়াইতে কসুর করেন না।

বাংলার বাহিরে ইংরেজী দৈনিক কাগজে নানা ইংরেজী মাসিকপত্রাদি হইতে যে সব ভাল ভাল জিনিষ উদ্ধৃত হয়, অধিকাংশ বিজ্ঞ বাঙালী খবরের-কাগজওয়ালাদের কাছে সেগুলা বড় তুচ্ছ।

বাঙালী ছাত্রেরা কেহ কেহ এখনও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সকলে পারদর্শিতা দেখাইতেছে বটে; কিন্তু তাহাদের আপেক্ষার প্রাধান্য রক্ষিত হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এবং সিবিল্ সার্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের যে-সব তালিকা বাহির হয়, তাহা দেখিলে আমাদের কথা সত্য কি না বুঝা যাইবে।

বাঙালী ছাত্রদের এবং দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আর-একটি দুর্লক্ষণ এই দেখিতেছি যে তাঁহারা ইংরেজী বহি ও ইংরেজী ভাল মাসিকপত্র অন্যান্য প্রদেশের ছাত্র ও শিক্ষিত লোকদের চেয়ে অনেক কম পড়েন। হইতে পারে যে মাতৃভাষার আদর আমরা বেশী করি, যদিও ইহা সন্দেহস্থল যে মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাতীদের চেয়ে বেশী করি কি না। কিন্তু ১২টি ইতিহাস ও জীবনচরিত এবং কতকগুলি ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতার বহি ও প্রবন্ধের বহি বাদ দিলে, বাংলা হাজার হাজার বহির মধ্যে এখনও এমন কিছু লিখিত হয় নাই, যাহা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে। নানা বিষয়ের সম্যক্, উচ্চ, এমন কি সাধারণ রকমের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, পাশ্চাত্য গ্রন্থ ভিন্ন এখনও উপায় নাই। কিন্তু বাঙালীর সে দিকে দৃষ্টি কম। সেই জন্য ইতিমধ্যেই জ্ঞানশালিতায় বাঙালী নিম্নস্থানীয় হইতে আরম্ভ করিয়াছে; কয়েকটি নামের জোরে এখনও ইহা সুস্পষ্ট হয় নাই। কিন্তু বাঙালীর অজ্ঞতা প্রকাশিত হইতে বেশী দেরী হইবে না। বাঙালী যেরূপ সবজান্তা ও বিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের বড় ভয় হইয়াছে। ছাত্রেরা গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানলাভে মনোযোগী হউন। তাহা হইলে আশঙ্কা অমূলক হইয়া যাইবে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যুবকদের মধ্যে যেমন মহৎ-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা দেখা যাইত, এখন তাহা দেখা যায় না। বয়োবৃদ্ধদের মধ্যেও দেখা যায় না বটে; কিন্তু তাঁহাদের আশা ভরসা কেহ করে না, যুবকদের উপরই ভরসা।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে নারীদের মধ্যে সার্ব্বজনিক কাজে যে উৎসাহ, এবং সেরূপ কাজ করিতে তাঁহাদের যেরূপ ক্ষমতা দেখিতে পাই, বাংলায় তাহার অর্দ্ধেকও দেখা যায় না। মহারাষ্ট্রে নারীকে দেশহিতসাধনের উপযুক্ত করিবার যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, বঙ্গে তাহার সিকিও হইতেছে না। মহারাষ্ট্রে দেশভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহাতে গোঁড়া হিন্দু এবং প্রার্থনা-সমাজের লোক উভয় দলই যোগ দিয়াছে। মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য; কিন্তু বোম্বাই, মান্দ্রাজ, আগ্রা-অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশের যত লোক ইহার সহায় হইয়াছে, বঙ্গে তাহা হয় নাই। বাঙালী "শিক্ষিত" লোকে এখনও মাসিক পত্রে লিখিতে "সাহস" করে যে মেয়েদিগকে সামান্য লেখাপড়াও শিখান উচিত নয়!

বাঙালী যে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে উৎসাহ কম

দেখাইয়াছে, তাহার আর একটি কারণ এই যে ঐ প্রতিষ্ঠানটি বাঙালীর দ্বারা স্থাপিত নয়। এই রোগটি আমাদের আছে—নিজেও ভাল কাজ করিব না, অন্য প্রদেশের লোকে করিলে তাহাতেও যোগ দিব না। আমাদের "নেতা"রা যে হিংসুটে তাহাতে সন্দেহ নাই। গোখলের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবক সমিতি (Servants of India Society)র শাখা মান্দ্রাজ, মধ্যভারত, আগ্রা-অযোধ্যায় আছে, বঙ্গে নাই। যদি বঙ্গের নেতারা গোখলের কীর্ত্তিকে সমুজ্জ্বল করিতে নারাজ, তাহা হইলে নিজেরাও ত ঐরূপ একটা সমিতি স্থাপন করিতে পারিতেন। অনন্যকর্ম্মা একদল দেশসেবকের অন্য প্রদেশে যেমন, বঙ্গেও তেমনি প্রয়োজন আছে। গোখলের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবক সমিতির যে একজনও বাঙালী সভ্য নাই, তাহা শুধু বাঙালীর দোষ নয়, জানি; জানি যে অন্য সভ্যেরা অনেকে বাঙালীকে দেখিতে পারেন না। কিন্তু বাঙালী নিজেই স্বার্থত্যাগী হইয়া কেন একটি অনন্যকর্ম্মা দেশসেবকের দল গড়িতে পারিলেন না? বঙ্গের ভারতসভা বোম্বাইয়ের প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশনের সমকক্ষ নয় কেন?

বাঙালী "অনাচরণীয়," "অস্পৃশ্য" জাতিদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য বোম্বাই মান্দ্রাজের লোকদের মত সমবেত চেষ্টা করিতেছে না। অল্পস্বল্প কাজ যাহা হইতেছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ও রামকৃষ্ণশিষ্যদের চেষ্টায় হইতেছে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত, ধনী, মানী লোকদের তাহাতে কোন যোগ বা উৎসাহ নাই। যখন মাননীয় শ্রীযুক্ত দাদাভাই বড়লাটের সভায় এবিষয়ে বক্তৃতা করেন ও শিক্ষিত সর্ব্বসাধারণকে অনুযোগ করেন, তখন বাঙালী সুরেন্দ্রনাথ উত্তর দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ও তাঁহার দলের লোকেরা এবং অধিকাংশ শিক্ষিত লোক এরূপ কাজের সাহায্য কিছুই করেন না।

সমাজসংস্কারের চেষ্টা বাংলাদেশ হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে। গালাগালিবাজ খবরের-কাগজওয়ালাদের গালি ও কুৎসা কীর্ত্তনেরই বঙ্গদেশে জিত হইয়াছে। ইহা বাঙালীর পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়।

বাঙালীর বিদ্যানুরাগ আছে বলিয়া ছাত্রদত্ত বেতনেই অনেক বেসরকারী কলেজ চলিতেছে। কিন্তু পুণার ফার্গুসন কলেজের মত ত্যাগী অধ্যাপকদের দ্বারা চালিত কলেজ বাংলা দেশে নাই। বাঙালী যে স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন না, তাহা নয়। কিন্তু বঙ্গে প্রথম হইতে কাজের প্রণালীটা হইয়াছে এরূপ যে তাহাতে এই-প্রকারের কলেজ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কতকগুলি কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের নিজস্ব সম্পত্তি রূপে স্থাপিত হইয়াছিল ও উপার্জ্জনের উপায় হইয়াছিল; এখনও, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে নামে তাহা না থাকিলেও, কাজে সেইরূপই আছে। কোনটি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হইলেও, যাহারা পরিচালক তাহারা নিজেই কলেজের জন্য ত্যাগী অধ্যাপক না হওয়ায় তাহাদের স্বার্থত্যাগের আহ্বান কেহ শুনে নাই।

শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে ছাত্র-নির্ব্বাসন।

"ছাত্রদের সাতখুন মাপ" এরূপ সুপারিস কেহ করে নাই, কিন্তু ছাত্রদের নামে কোন রকম নালিশ হইলেই সাজা দিতে হইবে, কর্ত্তৃপক্ষের মনের ভাব যেন অনেক স্থলে এইরূপ হইয়াছে। শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের বাঙালী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু রাত্রে ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিতে বাহির হন। তাঁহার গায়ে কে নাকি ঢিল ছুড়ে। তিনি ছাত্রদের রেজিষ্টরী ডাকিয়া ৭জনকে স্বস্ব কক্ষে না পাইয়া তাহাদের নামে রিপোর্ট করেন। তাহারা তাড়িত হয়। কলেজের অন্য হিন্দু ছেলেরা আবেদন করে যে ইহার পুনরায় বিচার হউক। বিচার না হওয়ায় তাহারা সকলে অনুপস্থিত হয়। ফলে তাহারা সকলেই তাড়িত হইয়াছে। লর্ড হার্ডিং এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর চেয়ে নিশ্চয়ই বড় লোক ছিলেন এবং সাম্রাজ্যের রক্ষা ও কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য তাঁহার বাঁচিয়া থাকাও বেশী প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দিল্লীতে যখন তাঁহার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং একজন লোক হত হয় ও তিনি গুরুতর আঘাতে অনেক দিন শয্যাশায়ী থাকেন, তখন রাস্তার যেখানটিতে বোমা ছোঁড়া হয়, তার দুই পার্শ্বের অধিবাসীদের মধ্যে ঘটনার অব্যবহিত পরে যাহারা অনুপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া ত ফাঁসি দেওয়া হয় নাই। বহু অনুসন্ধান, বহুদিনব্যাপী সাক্ষ্যগ্রহণ, অভিযুক্তের আত্মপক্ষসমর্থন, কৌশুলির বাদানুবাদ, প্রভৃতির পর কয়েকজনের দণ্ড হয়। শিবপুরে কিন্তু ঢিলছোঁড়া হইয়াছিল কি না, তাহারও প্রমাণ লওয়া হয় নাই, যে চারিজন ছাত্রের বিরুদ্ধে রিপোর্ট হয়, তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাদের কি বলিবার আছে শুনা হয় নাই, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগই তাহারা পায় নাই, অথচ এইরূপ অদ্ভুত বিচারে এতগুলি যুবকের শিক্ষার সুবিধা লুপ্ত হইল। কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ অবিচার করিলে অন্ততঃ হাইকোর্টে তাহার আপীল চলিত। কিন্তু এস্থলে কোন আপীল নাই। যে খুনে বদমায়েস তাহার যে আত্মপক্ষসমর্থনের অধিকার আছে, ছাত্রদের ততটুকু অধিকার কি থাকিবে না?

প্রেসিডেন্সী কলেজের ওটেন-প্রহার ব্যাপারেও এইরূপ গোপনে গোপনে অনেক ছেলের সর্ব্বনাশ হইল। ছোট-আদালতে পাঁচসিকা সাতসিকার নালিশ চলে, উকীল দেওয়া চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে ছাত্রদিগকে শিক্ষার সুবিধা ও উপার্জ্জনের উপায় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের হাজার হাজার টাকা ক্ষতি করা হইল। অথচ ইহার কোন

প্রতিকার নাই। কি সাক্ষ্য, কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রদের এরূপ গুরুতর ক্ষতি করা হয়, তাহা কেহ জিজ্ঞাসাও করে না, জানিবারও উপায় নাই।

অধিকন্তু পুলিশের হাতে খুব একটা ব্রহ্মাস্ত্রও আসিয়াছে—ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে যাহাকে ইচ্ছা গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখা যায়। কোন আদালতে যাইতে হয় না, বিচারের প্রয়োজন হয় না। কাগজে লিখিলে গবর্ণমেণ্ট বলেন, প্রমাণ আছে। কিন্তু সেই প্রমাণ যে নির্ভরযোগ্য, তাহার প্রমাণ কি? পুলিশের সংগৃহীত প্রমাণ ত? তাহা কোন কোন মোকদ্দমায় সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সাক্ষ্য হাইকোর্টের নিকট উপস্থিত করা হইবে জানিয়াও পুলিশ যদি মিথ্যাসৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে যাহা চিরকাল আঁধারেই থাকিবে, এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা যে খুব বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য। পুলিশ যত লোককে ধরিতেছে, তাহার একজনকেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই, ইহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু একজনও যে দোষী, শুধু পুলিশের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহাও বলিতে পারি না। বলি কেমন করিয়া? মানুষ গ্রেপ্তার হইল খুনের অভিযোগে; তাহা অমূলক মনে হওয়ায় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহার পর ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে সেই মানুষকে আবার ধরা হইল। কাহাকেও কাহাকেও তারপরও ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সবই রহস্যাবৃত।

প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তাড়িত একটি ছেলে বহির দোকান খুলিয়াছিল। তাহাকে ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে ধরিয়া বন্ধ করা হইয়াছে। সে পুস্তক বিক্রী করিয়া থাকিলে ভারত-সাম্রাজ্য কি পরিমাণে অরক্ষিত ও বিপন্ন হইত বলিতে পারি না।

বানান ও ভাষার কথা।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের শব্দের অর্থ এবং বানান সম্বন্ধে মন্তব্য "আলোচনা" বিভাগে পাঠক দেখিতে পাইবেন। শব্দের অর্থ নানাপ্রকার হয়। আমরা "অতিচার," "বক্রচার" কথা দুটির অর্থ চলিত ভাষায় যেরূপ হওয়া সম্ভব, তাহাই বুঝিয়াছিলাম। নভোমণ্ডলের ব্যাপারে প্রযুক্ত শব্দের যে অর্থ হয়, ভূমণ্ডলের ব্যাপারে তাহা বুঝিতে হইতে পারে, এরূপ মনে করি নাই।

"আ" যে "অ"এরই বিবর্তনে জন্মিয়াছে, বিজয়বাবু তাহা বুঝাইয়াছেন। ইহা বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু 'আ'’র উদ্ভব লইয়া তর্ক হয় নাই। "া"-কার চিহ্নটি যে স্বরে লাগান যায়, আমরা তাহাই বলিয়াছিলাম। এই চিহ্নটি, "া"-কারে লাগাইয়া "বে"-কারও হয়। সুতরাং ঐ চিহ্নটি "ও"-তে লাগাইলে বেদ অশুদ্ধ হইবে না বলিয়া আমাদের ধারণা এখনও রহিয়াছে। বিশেষতঃ যখন "ও"কে অর্দ্ধ-ব্যঞ্জন বলিয়া ধরা হইতেছে। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান অনুসারে ফুল পাতারই রূপান্তর; কিন্তু তাহা হইলেও পাতা বাদ দিয়া, পাতা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে, ফুলের ব্যবহার হয়, শুধু ফুলের মালা গাঁথা হয়। চতুষ্পদের সামনের দুটা পা, মানুষের দুটা হাত, পাখীর দুটা ডানা ও মাছের পাখনা, একই মূল অঙ্গের নানা রূপ বটে, কিন্তু ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রকমে হয়। উদ্ভবতত্ত্ব যাহাই হউক, ব্যবহার নানা রকমের হইতে বাধা নাই।

যাহা হউক, বানান লইয়া আর আলোচনা করিবার ইচ্ছা নাই। আমরা কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখাইতে চাহিয়াছিলাম, তাহা দেখাইয়াছি। এখন আমাদের বা অন্য কাহারও দ্বারা ওয়া, ওআ, বা ো লিখিত হউক বা না হউক, তাহাতে বাংলাভাষার বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

বাপ-মার সবে ধন নীলমণি একটি যদি ছেলে থাকে, তাহা হইলে কখন তাহার বালক বেশ কখন বা বালিকা-বেশ হয়, চুলের প্রসাধন নানা রকমের হয়। সন্তানের মধ্যে যদি কেবল একটি মেয়ে থাকে, তাহা হইলে তাহারও বালক-বেশ, বালিকা-বেশ হয়। কিন্তু অনেক ছেলেমেয়ে থাকিলে বাপমার এইরূপ বেশ লইয়া নাড়াচাড়া করিবার অবসর হয় না। বাঙালীর ভাবদৈন্য ও চিন্তাদৈন্য আছে বটে, কিন্তু সেই দীনতাটা এত বেশী নয় যে ভাষা ও-বানান-রূপ বেশ লইয়াই আমরা ক্রমাগত নাড়াচাড়া করিতে থাকিব। দরিদ্র-আমাদেরও বলিবার অনেক কথা থাকিতে পারে; ভাষার লালিত্য ও বানানের বিশুদ্ধতা না থাকিলেও, তাহা বলিতে চেষ্টা করা ভাল। বেশটা তুচ্ছ নয় বটে, "আগে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারী।" কিন্তু বলিবার ও লিখিবার বস্তুটাই প্রধান। অতএব বানান ও ভাষার ঝগড়া আপাততঃ ধামা-চাপা থাক্। যখন কাজ থাকিবে না, তখন কেহ না হয় আবার ধামাটা লাথি মারিয়া উল্টাইয়া দিবেন।

শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ।

আধুনিক সভ্যতার শক্তি ও সমৃদ্ধ বহিরঙ্গ কোন না কোন প্রকারের এঞ্জিনীয়ারিংএর উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈজ্ঞানিক কৃষি, রেলওএ, টেলিগ্রাফ, কৃত্রিম খাল, সেতু, রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্প-দ্রব্যের কারখানা, খনি হইতে নানা ধাতু তৈল প্রভৃতি উত্তোলন, জাহাজ ও নানাবিধ কল নির্ম্মাণ, সহরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও কার্য্যসৌকর্য্যার্থ রাস্তা ড্রেন প্রভৃতি নির্ম্মাণ, স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও শিক্ষালয়াদি নির্ম্মাণ, দুর্গাদি নির্ম্মাণ,—সমুদয়ই কোন না কোন

রকমের এঞ্জিনীয়ারের কাজ। এঞ্জিনীয়ার ব্যতীত কোন দেশ আধুনিক প্রধান সভ্য দেশ-সকলের সমকক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা খুব কম; নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এ বিষয়ে অঙ্গহীন। শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে কেবলমাত্র ৪০টি ছাত্র প্রতি বৎসর লইবার কথা, কিন্তু তাহাও লওয়া হয় না। তার চেয়ে অনেক বেশী ছেলে ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্ত করে, কিন্তু ১৯১২ সালে ২৮ জনকে লওয়া হয়, ১৯১৩য় ৩২, ১৯১৪য় ২৪ এবং ১৯১৫তে ২৬। ছাত্রাবাসের এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে মাত্র ৭৮ জনের জায়গা আছে। কলেজে আরও ছেলে লওয়া উচিত; ছাত্রাবাসেরও আয়তন বাড়ান উচিত। অনেক দরখাস্তকারীর মধ্যে বাছিয়া আঙুলে-গুন্তি কয়েকটি ভাল ছেলে লওয়া হয়; তাহাদেরও মধ্যে শেষ পরীক্ষায় ৫।৭টি বা ৮।১০টিকে পাস করা হয়। পরীক্ষক প্রধানতঃ কলেজের অধ্যাপকেরাই হন। এ রকম করিয়া ছেলে ফেল করা অন্যায়। এদিকে শিক্ষিত শ্রেণীর ও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট কলেজের মতই মোটামোটা বেতনের অধ্যাপক রাখিয়া মিউজিয়ম ও অনেক ল্যাবরেটরী রাখিয়া বৎসরে জন কয়েক এঞ্জিনীয়ার পাস্ করা বড়ই নিন্দার কথা। বড় বড় বাঙালী এঞ্জিনীয়ারদের সংযোগে ধনীরা একটা বেসরকারী এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ খুলুন না। এঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা যতদিন শিবপুরের অধ্যাপকেরা কম রাখিতে পারিবে, ততদিন এক দিক্ দিয়া দেশের উন্নতি বন্ধ থাকিবে, সকলে ইহা বুঝুন।

রাজনৈতিক নাড়ীটেপা।

কৃষ্ণদাস পাল স্মৃতিসভায় বঙ্গের মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী লায়ন সাহেব বলিয়াছিলেন যে সকলে (অর্থাৎ ইংরেজ-মহলে) বাংলা দেশকে রাজদ্রোহী মনে করে। তাহার পর ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে বঙ্গের গবর্ণর বলিয়াছেন, বাঙালীরা রাজভক্ত। লায়ন সাহেবের কথা শুনিয়া যাঁহাদের নাড়ী ছাড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তাঁহারা এখন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রাজনৈতিক কবিরাজ ডাকিয়া হাত দেখান, তাহা হইলে নাড়ীর অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

কংগ্রেসের সভাপতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস-কমিটিগুলি এখন কেবল মাত্র একজন করিয়া রাজনৈতিক নেতাকে কংগ্রেসের সভাপতির পদে নিযুক্ত করিবার সুপারিস করিতেছেন। শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশের মতে যিনিই নির্ব্বাচিত হউন তিনি জানিয়া রাখুন, দেশের লোকে হোমরুল বা স্বরাজ চায়। তার চেয়ে কম যিনি যাহা চাহিবেন, তাহা দেশের লোকের মতের, অর্থাৎ দেশের মুখ্য শিক্ষিত চিন্তাক্ষম লোকদের মতের, বিরুদ্ধ হইবে। পরিষ্কার ভাষায় বলিতে হইবে যে আমরা হোমরুল চাই।

বাল গঙ্গাধর টিলক।

শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর টিলককে এক বৎসরের জন্য খুব ভাল মানুষের মত থাকিতে হুকুম করা হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহার নিকট হইতে চল্লিশ হাজার টাকার মুচলেকা লওয়া হইয়াছে। তিনি অবশ্য চোর বদমায়েস নহেন, কিন্তু নাকি রাজদ্রোহসূচক বক্তৃতা করার অপরাধে এই শাস্তি পাইয়াছেন। রাজদ্রোহসম্বন্ধীয় আইন যেরূপ, তাহাতে যে-কোনও রাজনৈতিক বক্তা বা লেখককে শাস্তি দেওয়া খুব সোজা, কেহ যদি সম্পূর্ণ সত্যমূলক রাজনৈতিক সমালোচনাও করে, তাহা হইলেও নিস্তার নাই। আমরা টিলককে মোটেই রাজদ্রোহী মনে করি না, কারণ তিনি ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বলেন নাই। আইনের পরিবর্ত্তন বা শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তনের জন্য কোন কোন রাজকর্ম্মচারীর বা রাজকর্ম্মচারী-শ্রেণীর দোষ দেখান বাস্তবিক রাজদ্রোহিতা নহে, যদিও এই-সকল রাজকর্ম্মচারীদের প্রণীত আইন অনুসারে তাহা রাজদ্রোহিতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিলাতে নূতন আইন।

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রবাসীতে যে আইনের কথা লিখিয়াছিলাম, তাহার একটি ধারা এইরূপ ছিল যে কোন কোন স্থলে বিলাতস্থ ভারতসচিবের নামে এখনকার মত মোকদ্দমা করা চলিবে না। ভারতপ্রবাসী ইংরেজরা স্বকীয় অধিকার সম্বন্ধে খুব সজাগ বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে ইহাতে আপত্তি করেন। তাহার পর ভারতবাসীরা করেন। ঐ ধারা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে,—অবশ্য ইংরেজদের আপত্তিতে। আর একটি ধারা এই ছিল, যে, ব্যবসাতে ব্যাপৃত লোকে, ব্যবসা না ছাড়িয়াও, মন্ত্রীসভার সভ্য হইতে পারিবে। ইহাতেও প্রথমে ভারত-প্রবাসী ইংরেজ এবং তৎপরে ভারতবাসীরা আপত্তি জানায়। ইহাও উঠিয়া গিয়াছে; অবশ্য ইংরেজদের আপত্তির প্রভাবে। কিন্তু নিম্নলিখিত ধারাটি উঠিয়া যায় নাই, কারণ ইংরেজরা তাহাতে আপত্তি করেন নাই। আমাদের দেশের সব জায়গার লোকেরাও, রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন না থাকায়, সময়ের ইহার বিরুদ্ধে চীৎকার করেন নাই। ধারাটি এই—

"ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল, সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের অনুমোদন সহকারে, যে-কোন কাজে ব্রিটিশভারতজাত ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইতে পারে, তাহাতে ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের শাসনকর্তা বা প্রজাদিগকে বা ভারতসন্নিহিত কোন রাজ্যের প্রজাদিগকে, বা ভারতসন্নিহিত দেশবাসী স্বাধীন জাতির ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।"

ইহার সম্ভাবিত সমুদয় কুফল আমরা জ্যৈষ্ঠের কাগজে ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহার ফলে ব্রিটিশসাম্রাজ্যবহির্ভূত এশিয়াবাসী বহু সৈন্য ও সেনানায়ক নিযুক্ত হইতে পারে। তাহা আমাদের দ্বিগুণ পরাধীনতার কারণ হইতে পারে। কিন্তু সব কথা তলিয়া বুঝিবার লোক দেশে কম। হাম্-বড়ারা আবার অহঙ্কারে ও ঈর্ষায় এমন বধির, যে, বুঝাইয়া দিলেও শুনিতে পান না।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তক-নির্দ্দেশ।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যের এই প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের মতে ধার্য্য হইয়াছে, যে, (১) স্কুলের হেডমাষ্টারেরা নিজেই স্বীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক মনোনীত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ কোন নির্ব্বাচিত পুস্তক শিক্ষাবিভাগ কেবল রাজনৈতিক, নৈতিক ও সাধারণ কারণে পড়ান নিষেধ করিতে পারিবেন, কিন্তু নিষেধের কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া দিতে হইবে। শিক্ষাবিভাগ, কোন্ কোন্ পুস্তক পড়াইবার উপযোগী, তাহা বলিতে পারিবেন, কিন্তু কেবল সেই পুস্তকগুলিই পড়াইতে কাহাকেও বাধ্য করিতে পারিবেন না।

বঙ্গেও এইরূপ নিয়ম হওয়া উচিত। এখানেও কতকগুলি প্রকাশক এবং লেখক পাঠ্য পুস্তকের ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া করিয়াছে, এবং কয়েকজন বিশেষ-অজ্ঞ বিশেষজ্ঞের অহঙ্কারে ও উপদ্রবে এখন বিদ্বান ও শক্তিশালী লোকে পাঠ্য পুস্তক লেখা অপমানকর মনে করেন। বাঙালী কিন্তু এখন সদুদ্দেশ্যে আন্দোলন ভুলিয়া গিয়াছে। এখন গুরুবাদ সার হইয়াছে।

শুশ্রূষাকারীর দল।

শুশ্রূষাকারীর দ্বিতীয় দল কেন ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে গবর্ণর ব্যবস্থাপক সভায় অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতে কিছুই বুঝা গেল না। একটা ভ্রমের জন্য এইরূপ হইয়াছে, এতটুকু বুঝা গেল; কিন্তু ভ্রমটা কাহার, কি ভ্রম, কেন উহা সংশোধিত হইল না, অন্যের ভ্রমে যুবকদের কয়েক মাস সময় কেন নষ্ট হইল, কিছুই বুঝা গেল না। একজন বিখ্যাত ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ সত্যই বলিয়াছিলেন, "মানুষ বাক্‌শক্তি পাইয়াছে মনের কথা গোপন করিবার নিমিত্ত"।

শিল্প-কমিশন।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল বা শিল্প কমিশন হইতে, আমাদের বিনা চেষ্টা ও উদ্যোগে, সুফলের আশা যেন কেহ না করেন। ইহা দ্বারা সম্ভবতঃ ইংরেজদের মূলধন ভারতবর্ষে কল-কারখানায় আরও ভাল করিয়া খাটাইবারই সুবিধা হইবে। ইহার সভাপতি সার টমাস হল্যাণ্ড মান্দ্রাজে স্পষ্টই বলিয়াছেন, ইহা বিশেষ করিয়া ভারতীয় মূলধনীদের সুবিধার জন্যই নিযুক্ত হয় নাই।

"Sir Thomas Holland took it for granted the Commission was in no sense a movement for the benefit of Indians as opposed to Europeans or *vice versa*. It was intended to find out exactly in what direction there was scope for industrial development, regardless as to whether a European or an Indian undertook the work."

কমিশন কেবল অন্বেষণ করিয়া বলিয়া দিবেন, কোন্ কোন্ দিকে কিরূপ শিল্প-কারখানা আদি হইতে পারে, ভারতবাসী বা ইউরোপীয়, কে কাজে নামিবেন, তাহা দেখা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়। এমন স্থলে ধনী, উদ্যোগী, প্রভাবশালী খাতিরবিশিষ্ট ইউরোপীয়দেরই যে জিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কমিশনের ব্যয়টা কিন্তু আমাদেরই পকেট হইতে আসিতেছে।

প্রতিনিধিরা দেশের কাগজ পড়ুন।

দেশের ক্ষুদ্রতম বাংলা ও ইংরেজী সাপ্তাহিক এবং মাসিকেও শিখিবার ও ভাবিবার জিনিষ থাকে। ইংরেজী দৈনিকে সব দরকারী কথা থাকে না। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের সমুদয় কাগজ পড়া উচিত। অন্ততঃ এক একজন লোক রাখিয়া সারসংকলন করান উচিত। নতুবা তাঁহারা দেশের প্রতিনিধি হইবেন কিরূপে? সব কাগজ যদি কিনিতে না পারেন, সম্পাদকদিগকে চিঠি লিখিলেই তাঁহারা পাঠাইয়া দিবেন।

ধন-বিজ্ঞান-চর্চ্চা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পরানুবাদের যুগ।

হুইটম্যানের Leaves of Grass আমেরিকার সর্ব্বপ্রথম "খাঁটি স্বদেশী" কাব্যগ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে আমেরিকার বিশেষত্ব কোন কাব্যে চিত্রিত হয় নাই। সাহিত্যের সকল বিভাগেই ইয়োরোপ, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডের, ছায়া পড়িত। আমেরিকা বস্তুতঃ সকল বিষয়েই ইংরেজের উপনিবেশ মাত্র ছিল। আমেরিকাবাসীর স্বাতন্ত্র্য কোন বিষয়ে লক্ষিত হইত না। ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত The Good Gray Poet নামক পুস্তিকায় লেখক কবিবর হুইটম্যানের গুণ-কীর্ত্তন করিতে যাইয়া আমেরিকানের এইরূপ সর্ব্বতোমুখী পরতন্ত্রতার উল্লেখ করিয়াছেন।—

Intellectually, we are still a dependency of Great Britain and one word—colonial—comprehends and stamps our literature. In no literary form except our newspapers, has there been anything distinctively American. I note our best books—the works of Jefferson, the romances of Brockden Brown, the speeches of Webster, Everett's Rhetoric, the divinity of Channing, some of Cooper's novels, the writings of Theodore Parker, the poetry of Bryant, the masterly law arguments of Lysander Spooner, the miscellanies of Margaret Fuller, the histories of Hildreth, Baucroft and Motley, Ticknor's History of Spanish Literature, the political treatises of Calhoun, the rich benignant poems of Longfellow, the ballad of Whittier, the delicate songs of Philip Pendleton Cooke, the weird poetry of Edgar Poe, the wizard tales of Hawthorne, Irving's Knickerbocker, Delia Bacon's splendid sibyllic book on Shakespeare, the political economy of Carey, the prison letters and immortal speech of John Brown, the lofty patrician eloquenc of Wendell Phillips, and those diamond of first water, the great clear essays and greater poems of Emerson. This literature has often commanding merits, and much of it is very precions to me, but in respect of its national character, all that can be said is that it is tinged, more or less deeply with America; and the foreign model, the foreign standards, the foreign culture, the foreign ideas, dominate over it all.

চিন্তা ও বুদ্ধির দাসত্ব স্বীকার করিয়া আমরা এখনো গ্রেট ব্রিটেনের অধীন হইয়াই আছি; এবং উপনিবেশ-সম্পর্কীয়—এই একটি কথাতেই আমাদের সমস্ত সাহিত্য ছাপমারা হইয়া আছে। খবরের কাগজ ছাড়া আর কোনো রকম সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় আমেরিকাত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট বই যেগুলি, সেগুলির জাতীয়তা অবশ্য আমেরিকার দ্বারাই অনুরঞ্জিত, তথাপি বিদেশী আদর্শ বিদেশী ভাব তাহাদের মধ্যে আধিপত্য করিতেছে।

চিন্তামণ্ডলে এইরূপ পরতন্ত্রতার যুগ ল্যাটিন আমেরিকায়ও বহুকাল চলিয়াছে। শেপার্ড বলেন :—

As conditions in one state or another became relatively free from internal disturbance, constitutional and international law, political economy and education were the subjects that occupied a position of prominence. Written mainly from an external or abstract point of view, the various treatises on these matters were apt to lack definiteness of application to purely national concerns. Descriptive only too often of institutions and practices in Europe their presentation could not exercise a direct and potent influence on the life and thought of those to whom they were addressed.

Since 1876, however, when the Latin American nations in general began to be brought into closer contact with the world at large, a keen interest has been aroused among them in social and economic problems of a concrete character. Journalist, essayist, novelist, poet and historians have come to take an active part in the discussion of the principles and measures that may tend to solve these problems, so far as they have arisen in their own countries. Instead of dealing with what concerns Europe, many of the authors have sought inspiration in the characteristics and environment of their own people.

এক এক প্রদেশরাজ্য যেমন যেমন আভ্যন্তর গণ্ডগোলের হাত হইতে যে-পরিমাণে মুক্ত হইয়া উঠিতেছিল সেখানে সেই পরিমাণে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় আইন কানুন, অর্থাগমের উপায় ও শিক্ষাদানের কথা প্রাধান্য লাভ করিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই-সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে লিখিত বিবিধ পুস্তক পুস্তিকাই বিদেশী ভাবে বা কেবলমাত্র তত্ত্ব হিসাবে লিখিত হওয়াতে জাতীয় ব্যাপারে তাহাদের উপযোগিতা ও নিগূঢ় বিশিষ্টতা অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল। ইউরোপের রীতিনীতি বা প্রতিষ্ঠানের বর্ণনামাত্র হওয়ায় যাহাদের উদ্দেশ করিয়া লেখা তাহাদের জীবন ও চিন্তাপ্রণালীর উপর উহাদের প্রভাব পড়িতেছিল না। ১৮৭৬ সাল হইতে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত ল্যাটিন আমেরিকার ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হইতে লাগিল, তখন ইহাদের মধ্যে বস্তুতন্ত্র রকমের সামাজিক ও আর্থিক সমস্যার আলোচনার দিকে মনোযোগ পড়িল। তখন নিজের দেশের সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কারের চেষ্টায় কাগজওয়ালা, প্রবন্ধলেখক, ঔপন্যাসিক, কবি, ঐতিহাসিক সকলেই লাগিয়া গেল। অনেক লেখক ইউরোপ সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়িয়া নিজের ঘরের ব্যাপার দিয়া সরস্বতীর সাধনা করিতে লাগিল।

ঊনবিংশশতাব্দীর ভারত ও ধন-বিজ্ঞান।

শেপার্ড ল্যাটিন আমেরিকা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন আমরাও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঠিক তাহাই বলিতে পারি।

ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সকল বিষয়েই পরানুবাদ ও পরানুকরণের যুগ চলিয়াছে। কি চিত্রশিল্প, কি সমাজ-সংস্কার, কি লোকহিত, কি শিক্ষাপ্রচার সর্ব্বত্রই আমরা বিদেশকে নকল করিয়াছি। ক্রমশ আমরা একটা চিন্তা-স্বরাজ খুঁজিয়া পাইয়াছি। ১৯০৫ সালে এই নূতন চিন্তামণ্ডলের বিকাশ বিশেষরূপে দেখা দিয়াছে। সকল চিন্তাক্ষেত্রে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে এক্ষণে আমরা ভারতীয় বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্মান করিয়া চলিতেছি।

অধ্যাপক সেলিগম্যান।

ভারতীয় আর্থিক অবস্থার আলোচনা এবং ভারতবর্ষে ধন-বিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক সেলিগ্-ম্যানের সঙ্গে কয়েকদিন কথাবার্ত্তা হইল। আমি বলিলাম—"উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আধুনিক জ্ঞান প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই-সকল কেন্দ্রে ইয়োরোপের কয়েকটি অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি শিখান হয়। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষার ফলে কলেজে বসিয়া ভারতীয় ছাত্রেরা কেবলমাত্র জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্ব্বার্টস্পেন্সার এবং সিজ্‌উইকের নাম শুনিয়াছে। ইঁহাদের শিষ্যবর্গের গ্রন্থাবলী ছাড়া অন্য কোন-প্রকার গ্রন্থ পাঠ্যতালিকায় নির্দ্দিষ্ট হইত না। ইঁহাদের মতবাদসমূহ বেদবাক্যস্বরূপ ছাত্রগণকে মুখস্থ করান হইত। বলাবাহুল্য ইঁহাদের রচনায় ভারত-বর্ষের উল্লেখ অতি সামান্য মাত্র। কাজেই ভারতীয় ছাত্রেরা ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান শিখিতে যাইয়া ইয়োরোপের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের, রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য ও মতবাদ জানিতে পারিত। অধিকন্তু, কোন এক সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য বিদেশী পণ্ডিতেরা যে-সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন ভারতবর্ষে তাহার প্রচলন হইত না। একচোখো ভাবে সকল প্রশ্নের বিচার শিখান হইত। ফলতঃ, একে বিদেশী তথ্যরাশির তালিকা, তাহার উপর তৎসম্বন্ধে আংশিক এবং অসম্পূর্ণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা—ইহাই ভারতীয় ছাত্রের জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল।

ভারতবর্ষে যে-সকল সমস্যা সর্ব্বদা বিদ্যমান তাহা কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জানিতে পারিত না—অধ্যাপকগণও জানিতেন না। ভারতীয় ছাত্র কখনও ফ্যাক্টরী দেখে নাই—Entrepreneur, Middle man ইত্যাদির সংস্পর্শে আসে নাই—ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী, শ্রমজীবীর নির্য্যাতন ইত্যাদি কিছুই জানিত না। তথাপি এই-সমুদয় সম্বন্ধে বিলাতী গ্রন্থ-কারেরা যে-সকল মত প্রচার করিয়াছেন সেগুলি অব-লম্বন করিয়া ভারতীয় ছাত্র ইংরেজিতে প্রবন্ধ রচনা করিত। Currency Theory, Bank of Englandএর Issue Department সম্বন্ধীয় মতামত, রিকার্ডোর Rent-তত্ত্ব, য়্যাডামস্মিথের Free Trade নীতি, Representative Governmentএর প্রশংসা, Federation-তত্ত্ব ইত্যাদি কোন বিষয়ই অজানা থাকিত না। অথচ বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু কি কি, তাহার আলোচনা হইত না। ভারতবর্ষের পক্ষে "স্বাধীন বাণিজ্য" নীতি ভাল কি "সংরক্ষণ-নীতি" মঙ্গলকর, ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইতে পারে কি না, ভারতবর্ষে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা

বর্ত্তমান আকার কেন ধারণ করিল, ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি বিধানের জন্য বিলাতী মত অবলম্বন করা উচিত কি জার্ম্মান, বা আমেরিকান প্রণালী অবলম্বন করা উচিত কি একটা স্বতন্ত্র ভারতীয় প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত —এই-সমুদয় প্রশ্ন ছাত্র বা শিক্ষকের চিত্তে স্থানই পাইত না।

সত্যকথা—যথার্থভাবে ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভারতীয় ছাত্রের চিত্তে স্থানই পাইত না। কতকগুলি নীরস মতবাদ ও তথ্যতালিকার সাহিত্যস্বরূপ এই-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থগুলি অধীত হইত। প্রকৃত বাস্তবজীবনের সঙ্গে এই বিদ্যার কোন সংশ্রব আছে ভারতবাসী বুঝিতই না। অথচ Land, Labour, Capital, Value, Diminishing Returns, Large Scale Production, Incidence of Taxation, Nationality, Constitution, Constitution-making Power, Responsible Government ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যা সকলেই জানিত!

১৯০৬—৯ সালের ভিতর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কথঞ্চিৎ সংস্কার সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেবলমাত্র বিলাতী মতবাদ যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহাদের গ্রন্থ অধীত হয় না। আমেরিকান, জার্ম্মান, অষ্ট্রিয়ান, ফরাসী ইত্যাদি সকল দেশীয় গ্রন্থকারগণের রচনা পাঠ্যতালিকায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ছাত্রেরা কোন একখানা বা দুইখানা গ্রন্থের দাসত্ব খানিকটা কাটাইতে পারিতেছে। কিন্তু এখনও শিক্ষাপ্রণালী সরস, সজীব ও কার্য্যকরী হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভারতীয় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পল্লী, নগর, জাতীয়তা, একরাষ্ট্রীয়তা, কৃষক, শ্রমজীবী, দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, শিশুজীবন, স্বাস্থ্যহানি ইত্যাদি আলোচিত হয় না। ভারতবর্ষের প্রায় কোন তথ্য না শিখিয়াই ছাত্রেরা এখনও ধনবিজ্ঞানাদি বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতেছে। ভারতীয় অভাব নিবারণের উপায় আলোচনা করা ত দূরের কথা ভারতবাসীর পরিচিত বৈষয়িক এবং রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধেই কিছুমাত্র জ্ঞান প্রচারিত হয় না। ধনবিজ্ঞানের আলোচনা এখনও "abstract" ও শুষ্কভাবে হইয়া থাকে। প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে মিলাইয়া এই বিদ্যার অধ্যাপন হয় না।

দেশের কথা।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে আমাদের সুধীগণ দেশের কথা দেশবাসীকে জানাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ফলে সংবাদপত্র, মাসিক পত্র, সাময়িক সাহিত্য ইত্যাদি কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে। তাহার প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর না পৌঁছিলেও সাধারণ জনগণের উপর খানিকটা পড়িয়াছে বলিতে পারি। রাণাডে, গোখলে, রমেশ দত্ত, কংগ্রেসের নেতৃবর্গ, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এই বিষয়ে "স্বদেশী" ধনবিজ্ঞানের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। ১৯০৫ সালের পর এই নূতন পথ আরও বিস্তৃত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবর্ষে এখনও স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয় নাই।"

আমেরিকায় স্বদেশী ধন-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ।

সেলিগ্‌ম্যান বলিলেন—"মহাশয়, আমরাও আমেরিকায় বহুকাল পর্য্যন্ত বিলাতের অনুবাদ ও অনুকরণ করিয়া মরিয়াছি। আমরা আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা এবং বৈষয়িক সমস্যাগুলি স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতাম না। মামুলি য়্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাসের মতবাদগুলি আওড়াইয়া আমেরিকার অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের বিশ্লেষণ না করিয়া বিলাতী সমাজের নিয়মগুলি অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিতাম। আমাদের এই মোহ বহুকাল পর্য্যন্ত ছিল। ১৮৬৬-৭০ সালের গৃহ-বিবাদের পর যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক গোড়াপত্তন হয়। সেই সঙ্গে নূতন নূতন প্রদেশ-রাষ্ট্র স্থাপন, নগর স্থাপন, রাস্তা নির্ম্মাণ, রেলপথ নির্ম্মাণ, লৌহকারখানা স্থাপন, বড় বড় কারবার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সূত্রপাত হয়। তখন আর পূর্ব্বপরিচিত বিলাতী গ্রন্থকারদের প্রণীত ধনবিজ্ঞান পাঠ করিয়া স্বদেশের অবস্থা বুঝা কোনমতেই সম্ভবপর হইল না। আমরা বাধ্য হইয়া দেশের মাটির দিকে তাকাইলাম। নিজেদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ফ্যাক্টরী, কারখানা, ব্যবসাদার, মহাজন, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা আরব্ধ হইল। সেই আলোচনার ফলেই আজ-কালকার "আমেরিকান ধনবিজ্ঞান" গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা আমাদের সমস্যাসমূহ আলোচনা করিয়া যে-সমুদয়

সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি সে-সমুদয় বিলাতী ধনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হইতে অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসর আমেরিকায় প্রকৃত স্বদেশী ধন-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার যুগ।"

হুইটম্যানের Leaves of Grass এই যুগের প্রবর্ত্তক। এই সময়টাকে বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রের জন্মকাল বলা যাইতে পারে। তবে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। ইংরেজের সঙ্গে ইয়াঙ্কির রাষ্ট্রীয় কলহ যখন বাধিয়াছিল তখন হইতেই আমেরিকার আর্থিক ও বৈষয়িক স্বাতন্ত্র্য স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছিল। সুতরাং আর্থিক ও বৈষয়িক সমস্যা সম্বন্ধীয় চিন্তারাশি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই আমেরিকায় অনেকটা স্বতন্ত্র পথে চলিয়াছে। আমেরিকাবাসীরা কৃষি-শিক্ষা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং এই বিষয়ক বিদ্যায় পুরা-পুরি বিলাতের নকল কখনই করিত না। আমেরিকার ধন-বিজ্ঞানে এইরূপ স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতা আর-এক কারণে বিশেষ প্রবল হয়। জার্ম্মান পণ্ডিত ফ্রিডরিক্‌ লিষ্ট স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কিছুকাল আমেরিকায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক প্রসিদ্ধ ইয়াঙ্কি বন্ধু জুটিয়াছিল। লিষ্ট বাল্যাবধিই তাঁহার জন্মভূমির বৈষয়িক উন্নতি বিধানের জন্য স্বদেশিকতা, স্বাতন্ত্র্য ও সংরক্ষণ-নীতি প্রচার করিতেছিলেন। আমেরিকায় আসিয়াও ইনি বিলাতী ম্যাডামস্মিথ-প্রবর্ত্তিত Free Trade নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। তাহার প্রভাব অতিশয় গভীর ও ব্যাপক হইয়াছিল বুঝিতে পারিতেছি।

লংম্যান্‌স্‌ গ্রীন কর্ত্তৃক প্রকাশিত The National System of Political Economy গ্রন্থের Memoirএ গ্রন্থকার লিষ্ট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য প্রচারিত হইয়াছে। আমেরিকায় লিষ্টের প্রভাব ইহা হইতে বুঝা যাইবে।—

"The tariff disputes between Great Britain and the United States were at that time (1822-24) at their height, and List's friends urged him to write a series of popular articles on the subject in his journal. He accordingly published twelve letters addressed to J. Ingersoll, President of the Pennsylvanian 'Association for the Promotion of Manufacturing Industry.' In these he attacked the cosmopolitan system of free trade advocated by Adam Smith, and strongly urged the opposite policy based on protection to native industry, pointing his moral by illustrations drawn from the existing economical conditions of the United States.

The Association, which subsequently republished the letters under the title of "Outlines of New System of Political Economy (1827), passed a series of resolution affirming that List, by his argument, had laid the foundation of a new and sound system of Political Economy, thereby rendering a signal service to the United States, and requesting him to undertake two literary works, one a scientific exposition of his theory, and the other a more popular treatise for use in public schools."

১৮২২-২৪ সালে গ্রেট ব্রীটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যশুল্ক লইয়া ঝগড়া চরমে উঠিয়াছিল। তখন লিষ্টের বন্ধুরা তাঁহাকে তাঁহার কাগজে এই বিষয়ে সাধারণ-বোধ্য প্রবন্ধধারা লিখিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি গঠন-শিল্প সম্বন্ধে বারো খানি চিঠি প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি আডাম স্মীথের অবাধ বিশ্ববাণিজ্যতত্ত্বকে আক্রমণ করিয়া দেশীয় বাণিজ্যের সংরক্ষণনীতি সমর্থন করেন। এই মতবাদ প্রচার দ্বারা লিষ্ট যে অর্থশাস্ত্রের একটি নূতন সত্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাহার দ্বারা তাঁহার স্বদেশ উপকৃত হইল তাহা স্বীকৃত হইল এবং তাঁহার তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একখানি বইএ লিপিবদ্ধ করিতে এবং স্কুলে পাঠ্য হইবার উপযুক্ত একখানি সরল সকল-বোধ্য বই লিখিতে তিনি অনুরুদ্ধ হইলেন।

অধ্যাপক হানে (Haney) প্রণীত History of Economic Thought গ্রন্থের Recent Economic Thought in the United States and its Background অধ্যায়ে আমেরিকার সংরক্ষণ-নীতি ও বৈষয়িক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রথম হইতেই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু Civil War অর্থাৎ গৃহবিবাদের (১৮৬৬-৭০) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—

"All the time, however, English Economics formed the basis for such small teaching as there was. Men had little interest in Political Economy. But in the generation following Civil War times, there came a rush of great economic problems—notably the tariff and monetary matters—a considerable growth of interest in economics, and with these, a dominance of the English classical theories. * * * About the year 1885 however the beginning of a new era in American economic thought appeared. Among the more general grounds for the change were great industrial development like the rise of railway and corporation problems, and the very narrowness and dogmatism of the current economics, which invited reaction."

যে অল্প কিছু ধনবিজ্ঞান শিখানো হইত তাহা ইংরেজি বার্ত্তা-শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই হইত। অর্থশাস্ত্রের প্রতি লোকের

বেশী আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু গৃহবিবাদের পরের লোকদের সম্মুখে বিষম অর্থসঙ্কট ভিড় করিয়া উপস্থিত হইলে লোকের মন ঐ সমস্তার সমাধানের দিকে ঝুঁকিল। ১৮৮৫ সাল বরাবর আমেরিকার অর্থচিন্তায় একটা নবযুগের আবির্ভাব হইল। পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ রেলওয়ে ও সমবায় প্রথার প্রবর্ত্তন এবং চলতি অর্থতত্ত্বের সঙ্কীর্ণতা ও বাঁধি-পথে চলিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।

দেখা যাইতেছে অল্পকাল হইল ধন-বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তা এবং ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রচার বিস্তৃত ও গভীর-ভাবে আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকায় যে প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে তাহা প্রত্যেক দেশেরই অনুকরণীয়। ইয়াঙ্কিরা ধন-বিজ্ঞানের তথাকথিত "সাধারণ" নিয়ম প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বদেশের বাস্তব অনুষ্ঠানসমূহের বিশ্লেষণে এবং বৈষয়িক তথ্যসমূহের সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে American Economic Association নামে এক বৈষয়িক-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—(১) ধনবিজ্ঞান বিষয়ক অনুসন্ধানের সাহায্য প্রদান (২) ধনবিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য প্রচার (৩) ধনবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা (৪) নানাবিধ বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা। পরিষৎ প্রচার করিলেন :—

"We believe that political economy as a science is still in its early stage of its development. While we appreciate the work of former economists, we look not so much to speculation as to the historical and statistical study of actual conditions of economic life for the satisfactory accomplishment of that development."

আমাদের বিশ্বাস যে বার্ত্তাশাস্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে এখনো অপরিণত। পূর্ব্বজ বার্ত্তাশাস্ত্রীদের প্রচেষ্টার মূল্য অনুভব করিয়াও আমরা তত্ত্বপ্রচার অপেক্ষা বিষয়ের ও ঘটনার ইতিহাস ও তালিকা সংগ্রহ করিয়া বাস্তব জীবনের আর্থিক অবস্থার তত্ত্বনির্ণয় দ্বারা শাস্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গঠনের দিকে বেশী ঝোঁক দিতেছি।

আমরা আমাদের ১৯০৫ সালকে আমেরিকার ১৮৭০ অথবা ১৮৮৫ সালের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। বলা বাহুল্য যাঁহারা বাঙ্গালাদেশের এবং বঙ্গের বাহিরে সমগ্র ভারতের বৈষয়িক চিন্তাধারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও আমাদের সাহিত্যসেবীগণের চিন্তা ও গবেষণা অধিকাংশই বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমাদের ধনবিজ্ঞানবিৎ লেখক ও কর্ম্মীরা আর বিলাতী অথবা অন্যকোন ইয়োরোপীয় জাতির প্রচারিত ধন-বিজ্ঞান গ্রন্থের দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন না। তাহার পরিবর্ত্তে ইঁহারা American Economic Associationএর ন্যায় স্বদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, পারিবারিক আয়ব্যয়, পল্লীজীবন, ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য ও তালিকা এবং ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আমাদের চিন্তা abstract, অলীক ও নীরস না থাকিয়া ক্রমশঃ concrete, সরস, যথার্থ ও বাস্তব হইতেছে। লিষ্টের The National System অনুযায়ী "ভারতীয় স্বদেশী ধন-বিজ্ঞান" প্রণীত হইবার উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে বলা যাইতে পারে।

বিগত ৩০ বৎসরের ভিতর আমেরিকায় এইরূপ Concrete সমস্যা এবং বাস্তব ঘটনা লইয়া চিন্তাশীল লেখকেরা গবেষণা করিয়াছেন। কোনপ্রকার Theory বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র না হইয়া ইঁহারা প্রত্যেক সমস্যা ও তথ্য স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানবিৎ (Cliffe Leslie) লেসলি যুক্তরাজ্যের আধুনিক ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ১৮৮০ সালে লিখিয়াছিলেন :—

"The men best qualified to stand in the front rank of American Economists are not the authors of systems or general theories or text-books of principles, but writers on special subjects. Only since the Civil War has America begun seriously to apply its mind to economic questions. * * * Many of the best economic essays the last decade has produced will be found in the pages of American periodicals. * * * In the perfection of its economic statistics America leaves England behind."

আমেরিকার বার্ত্তাশাস্ত্রীদের পুরোবর্ত্তী হইবার উপযুক্ত তাঁহারা নহেন যাঁহারা একটা প্রণালী বা সাধারণ তত্ত্ব বা মতবাদ সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যাঁহারা একটা বিশেষ বিষয়ে অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গৃহবিবাদের পর হইতে আমেরিকা ধনবিজ্ঞানের দিকে মন ফিরাইয়াছে। এসম্বন্ধের অধিকাংশ প্রবন্ধ সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। ধনবিজ্ঞান সম্পর্কীয় বিষয়ের ঘটনা-তালিকা সংগ্রহে আমেরিকা ইংলণ্ডকে পিছে ফেলিয়া চলিয়াছে।

বৈষয়িক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহের যুগ।

কেবল আমেরিকা কেন, আজকাল জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতেছি "abstract specualative economics" এর

পরিবর্ত্তে "historical" এবং "statistical" আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল আলোচনাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকেও শিখান হয়। কিন্তু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্য্যন্ত ভারতীয় আর্থিক অবস্থার ইতিহাস অথবা বর্ত্তমান ভারতের আর্থিক অবস্থা শিখান হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রেরা দেশের যাবতীয় কৃষিবিষয়ক, ব্যবসাবিষয়ক এবং শিল্পবিষয়ক অনুষ্ঠান ও কর্ম্মকেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ধন-বিজ্ঞান যথার্থ ভাবে জাতীয়জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। সঙ্গে-সঙ্গে কি কি ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া আমাদের আর্থিক অবস্থা বিগত ৩০০ বৎসরে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে আমাদের ছাত্রেরা তাহা না বুঝিলে ধন-বিজ্ঞান শিক্ষায় রস ও আনন্দ পাইবে না। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের আলোচনা এবং বর্ত্তমান অবস্থার তালিকা ও তথ্যসংগ্রহ প্রথমেই আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিবার জন্য এই ভাবেই অগ্রসর হইতে হয়।

বিলাতে দেখিয়াছি বুথ সাহেব Life and Labour in London গ্রন্থে লণ্ডনের প্রত্যেক শ্রমজীবীর পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তাশীল কর্ম্মী ও লেখক বিলাতে আজকাল অনেক। আমেরিকায় এইরূপ কর্ম্মপ্রণালীর প্রভাব বিশেষরূপেই লক্ষ্য করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন-বিজ্ঞান চর্চ্চায় এই লক্ষণ দেখিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে যাঁহারা দেশের কথা আলোচনা করিতেছেন তাঁহারাও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বিস্তৃত ক্ষেত্রের আলোচনা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র Intensive Study অর্থাৎ সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে গভীরতর বিশ্লেষণ সুরু হইয়াছে। Value, Rent, Utility, ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের বিশ্লেষণ এবং দার্শনিক তত্ত্বের প্রভাব প্রায়ই দেখিতে পাই না।

"রাসেলসেজ ফাউণ্ডেশ্যন" নামক এক পরিষৎ নিউইয়র্কে কয়েক বৎসর হইতে কর্ম্ম করিতেছেন। ইঁহারা জনগণের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা আলোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রকাশিত কয়েকখানা গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ইহা হইতে চিন্তার ধারা বুঝা যাইবে।—

1. Women in the Book-binding Trade.
2. Artificial Flower makers.
3. Saleswomen in mercantile stores.
4. The Standard of Living among Workingmen's Families in New York City.
5. Medical Inspection of Schools.
6. One thousand Homeless Men.
7. The Almshouse.
8. Women and the Trades.

Women in the Book-binding Trade গ্রন্থের বিস্তৃত সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

1. Introductory.
2. The Book-binding Trade.
   The Process of Binding.
   Branches of the Trade.
   The Trade in New York.
   Nativity of Bindery Women.
3. Women's work in the Binderies.
4. Wages and Home Conditions.
5. Irregularity of Employment.
6. Overtime and the Factory Laws.
7. Collective Bargaining in the Bindery Trade.
8. Teaching girls the trade.
9. Summary and outlook.

সেমিনার ও পরীক্ষা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রণালী বুঝিবার জন্য অধ্যাপক সেলিগম্যান এবং অধ্যাপক সীগারের অধ্যাপনা দেখিলাম। ইঁহাদের সেমিনার-বিভাগের পিএইচ-ডি-ছাত্রগণের মৌলিক অনুসন্ধান এবং স্বচিন্তিত প্রবন্ধ রচনার প্রণালীও বুঝিবার চেষ্টা করা গেল। সেমিনার-বিভাগে দেখিলাম—ছাত্রেরা যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় বর্ত্তমান বৈষয়িক সমস্যা বাছিয়া লইয়াছে। সেই সম্বন্ধে মত সংগ্রহ, মত সমালোচনা এবং স্বচিন্তিত মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলিতেছে। রেলওয়ে, দোকানদারী, মূল্যবৃদ্ধি, খাজনা আদায়, ভূমিস্বত্ব, ঋণদান, মাখন তৈয়ারী করিবার প্রণালী, ইত্যাদি বিষয় একএকজন ছাত্র স্বকীয় thesis বা প্রবন্ধ রচনার জন্য গ্রহণ করিয়াছে। দেখিলাম বর্ত্তমানে—Legislative Council, Municipal Board অথবা অন্য কোন

রাষ্ট্রশাসন বিষয়ক সভার সভ্যগণ যে-সমুদয় প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও ঠিক সেই-সকল সমস্যাই সমাধান করিবার ভার লইয়াছে। কাজেই ধন-বিজ্ঞান আর নীরস নয়—প্রকৃত বাস্তবজীবনের সহায়।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা হইয়া গেল। একখানা প্রশ্নপত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান কি উপায়ে সরস ও সজীবভাবে শিখান যাইতে পারে তাহার পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়।—

1. State the leading principles of the Democratic platform of 1908 and compare it with the doctrines of the Progressive platform of 1912.

2. Review "The Struggles for Emancipation" as described by Ostro Gorski in his "Democracy and the Organisation of Political Parties."

3. Discuss the use of money in the campaigns of 1896 and 1904 and enumerate the chief types of legislation as designed to control the use of money in elections.

4. What, in your opinion, is the underlying doctrine of "The New Freedom," and how is it applied to the tariff, the trust, and banking?

বর্ত্তমান সমস্যার আলোচনা, সমস্যাসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশ নির্দ্ধারণ করা, তথ্যসংগ্রহ, তালিকাসংগ্রহ, সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে গভীরতর বিশ্লেষণ, theory বা তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র না হওয়া—এই সমুদয় লক্ষণ আমেরিকার সকল চিন্তা-ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক গিডিংসের তত্ত্বাবধানেও এইরূপ আলোচনা বিশেষরূপেই হইয়া থাকে। একব্যক্তি নিউ-ইয়র্ক নগরের কোন এক রাস্তার উপর যতগুলি গৃহ আছে তাহার অধিবাসীদিগের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণের ফল The Sociology of a New York City Block নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

বাদাগা

উত্তর ভারতের ইতিহাস ও জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে যতটা জানা গিয়াছে দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে ঠিক ততটা জানা যায় নাই, কারণ দাক্ষিণাত্যের সভ্যতার আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি আর্য্য-সভ্যতা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। সে দেশের সভ্য মানবের ইতিহাসই যখন এতটা অজ্ঞাত তখন বন-জঙ্গলবাসী আদিম অধিবাসীদের ইতিহাস তো আরও অজ্ঞাত হইবেই।

দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে নীলগিরির টোডাদের কথা মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায় ও তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাতও হওয়া গিয়াছে। নীলগিরির অপর আদিম জাতি বাদাগারা যদিও টোডাদের মত বিখ্যাত নহে তবুও তাহাদের ইতিহাস, আচার ব্যবহার প্রভৃতি কৌতূহল উৎপাদন করে এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহা জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। গ্রীষ্মকালে বহুলোক গ্রীষ্ম যাপনের জন্য এই পাহাড়ে আসেন ও বহুদিন যাপন করিয়া যান, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোককেই দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা বাদাগাদের গ্রামে যান ও তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিয়া লইতে সচেষ্ট হয়েন। নীলগিরি পাহাড়ের অধিবাসীদের অধিকাংশই এই বাদাগা শ্রেণীভুক্ত।

বনজঙ্গলের মধ্যে বাস করিলেও উৎসব-আনন্দের অমৃত স্বাদ হইতে তাহারা নিজেদের বঞ্চিত রাখে না। বিবাহে ও শ্রাদ্ধে তাহারা উৎসবের জন্য বিপুল আয়োজন করে—যেমন সে আয়োজনের ঘটা তেমনি তাহাদের উৎসাহ। বাদাগাদিগের আকৃতিতে এমন একটা স্বতন্ত্রভাব আছে যাহা স্পষ্টই বলিয়া দেয় যে, এই বাদাগা। নীলগিরির পথে ঘাটে রেলষ্টেসনে ক্ষেতে খামারে সর্ব্বত্রই বাদাগাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টির নিমেষেই স্ত্রী পুরুষ সকল বাদাগাকেই চেনা যায়। দেখিতে তাহারা খর্ব্বাকৃতি, ক্ষীণকায়, গৌরবর্ণ ও সদা প্রফুল্ল? মুক্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতির আনন্দের মধ্যে তাহারা যেন নিরানন্দকে জানে না। সরু-পেড়ে সাদা কাপড় তাহাদের লজ্জানিবারক বসন। পুরুষেরা সাধারণত একখানা কাপড় পরে ও একখানা গায়ের উপর ফেলিয়া দেয়—মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধে।

কিন্তু এখনকার কোটের প্রচলন তাহাদের মধ্যে বেশ হইয়া উঠিতেছে ও গায়ে চাদর জড়ান দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে। উজ্জ্বল হলুদ বা লালবর্ণের পশমের বোনা টুপীও কখনও কখনও পাগড়ীর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। মেয়েরা যে কাপড়

একজন বাদাগা, ইহার হাতে পায়ে ছয়টা করিয়া আঙুল।

পরে তাহা চওড়ায় ছোট—কাপড় পরার পরও পায়ের অনেকটা খালি থাকে। বুকের উপর দিয়া যে কাপড় দেয় তাহা পরার কাপড় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই কাপড়খানি কোমর হইতে তেরছা করিয়া বুকের উপর ও ঘাড়ের উপর দিয়া না লইয়া দুই হাতের তলা দিয়া লইয়া বুকের উপর জড়ান হয়। তামিলদের সঙ্গে কাপড় পরায় তাহাদের এই বিষয়ে পার্থক্য। কেহ কেহ মাথায় একখণ্ড কাপড়ের টুকরাও বাঁধিয়া থাকে। বিবাহোপযোগী প্রত্যেক রমণীরই কপালে ও হাতের উপরিভাগে উল্কি।—উল্কির বিশেষত্ব এই যে কোনওরূপ চিত্রাদি অঙ্কিত হয় না, শুধু কতকগুলি রেখা ও বিন্দুর সমষ্টি।

প্রাচীন ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা বাদাগাদিগকে "বারগার" বলিতেন—বাদাগা অপভ্রংশে বারগারে দাঁড়াইয়াছিল। বাদাগা অর্থে বুঝায় উত্তরাঞ্চলবাসী—অর্থাৎ বাদাগারা উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া বর্ত্তমানে এদেশে বসবাস করিতেছে। কথাও ঠিক—কারণ এই বাদাগারা উত্তরে মহীশূর হইতে কএক শতাব্দী হইল আসিয়া এখানে বাসা বাঁধিয়াছে। ঠিক কবে কোন্ শতাব্দীতে তাহারা আসিয়াছে তাহা ঠিক জানা যায় না; তবে ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহা ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন তাহাদের ভাষা তাহাদের উপনিবেশ স্থাপনের সাক্ষ্য দেয়। ইহাদের ভাষার সহিত কানাড়ীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে—ইহা অনেকটা প্রমাণ বটে। এবং বাদাগাদের ভাষা ও কানাড়ী ভাষার সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিচার করিয়া সহজেই নির্দ্ধারণ করিতে পারা যাইতে পারে যে কবে ঐ একই-ভাষাভাষী লোকেরা পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হয় যে, সাত ভাই ও তাহাদের ভগ্নীরা তালমালই পর্ব্বতে বাস করিত। কিন্তু নির্জ্জন স্বাধীন পার্ব্বত্য প্রকৃতির মধ্যে বাস করা তাহাদের ভাগ্যে বেশী দিন ঘটিল না। জনৈক দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান রাজা তাহাদের এক ভগ্নীর উপর কুব্যবহার করিল। আরও অত্যাচার ও অপমানের ভয়ে তাহারা প্রিয় স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান বেথেলাধা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। তারপর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া নীলগিরির বিভিন্ন স্থানে পৃথক ভাবে বসবাস আরম্ভ করিল ও বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং তাহারই ফলে এখন এই প্রকাণ্ড বাদাগা সমাজের সৃষ্টি। দ্বিতীয় ভ্রাতা হেথাপ্পা এদিকে আর এক বিপদে জড়িত হইয়া পড়িল। হেথাপ্পার স্ত্রীর উপর টোডারা অত্যাচার করায় হেথাপ্পা দুইজন বালিয়াড়ুর সাহায্যে টোডাদের বধ করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইল।

বাদাগা গ্রামের প্রবেশ-পথ।

বালিয়াড়ু দুইজন এই সর্ত্তে সাহায্য দান করে যে হেথাপ্পা তাহাদিগকে তাহার দুই কন্যা সমর্পণ করিবে। হালিকাল্লু গ্রামের বর্ত্তমান অধিবাসীগণ সেই বালিয়াড়ুদের বংশধর বলিয়া পরিচিত। পূর্ব্বপুরুষ সাত ভ্রাতাকে এখনও তাহারা হেথাপ্পার নামে পূজা করিয়া থাকে।

গ্রামে সবই একতালা ঘর—সারিবন্দী করিয়া বাড়ীগুলি নির্ম্মিত। এখন মাঝে মাঝে দুই একখানা বাড়ীতে লাল টালির ছাদ দেখা যায় এবং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বাদাগাদের ঐশ্বর্য্য দিন দিন বাড়িতেছে। সাধারণতঃ দেখা যায় প্রতি গ্রামই কোনও একটি ছোট পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। গ্রামের প্রবেশ-পথে অনেক খাড়া পাথর দেখা যায়—সবগুলির একএকটা ধর্ম্মব্যাখা আছে।

একটা বাড়ী হইতে আর একটা বাড়ীর চাল সম্পূর্ণ পৃথক নহে। একটা প্রকাণ্ড লম্বা চাল দেওয়ালের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—ও মাঝে মাঝে দেওয়াল দিয়া উহাকে পৃথক করিয়া একএকটা বাড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক সময় এইরূপ দুই তিনটি গৃহশ্রেণীও দেখা যায় ও তাহাদের দুইসারির মাঝখানের সুঁড়ি জায়গা পথ হয়। প্রত্যেক বাড়ীতেই সদর ও অন্দর মহল আছে। যদি কোনও পরিবারের দুধাল গরু কিম্বা মহিষ থাকে তাহা হইলে বাড়ীর কিয়দংশকেই গোহাল করা হয়। এই গোহালে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ। কোনও কোনও গৃহে বাঁশ পুতিয়া উঁচু একটা জায়গা করিয়া ভাঁড়ার তৈরী করা হয়। প্রত্যেক বাদাগা গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায় একটা বৃহৎ অথবা কতকগুলি ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের উপর আর একখণ্ড পাথর চাপাইয়া মঞ্চের ন্যায় উঁচু বসিবার স্থান তৈরী হইয়াছে। কাদা দিয়া গাঁথা ইটের বেদী বা মঞ্চও থাকে। এখানে বসিয়া কর্ম্মহীন বাদগারা গল্পগুজব করে। লোকে ওখানে শুধু গল্পগুজবেই রত থাকে না,—সেখানে বসিয়া তাহারা খবর রাখে গ্রামে কে আসিল ও গ্রাম হইতে কে বাহিরে গেল।

তাহাদের কৃষিকার্য্যপটুতা সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ মত

বাদাগা মন্দিরের দেওয়ালে চিত্র।

প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে তাহারা ইহাতে বিশেষ পটু নহে—জমি হইতে আপনি যাহা হয় তাহার চেয়ে তাহাদের কৃষিকার্য্যের চেষ্টায় সামান্য একটু বেশী ফলে। ক্ষেত্রের কাজ স্ত্রীলোকেরাই বেশীর ভাগ করিয়া থাকে। পাইওনীয়র পত্রের জনৈক লেখক তাহাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বলেন—

"চীনা মালীরা ব্যতীত পৃথিবীর এমন কোনও কৃষক কোথাও নাই যে ভূমি হইতে বাদাগাদের মত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আদায় করিয়া লইতে পারে। আজ গিরিগাত্রে যে জায়গা পাথরের নুড়িতে বোঝাই দেখিয়া আসিলাম হয়তো দুইএক সপ্তাহ পরেই যাইয়া দেখিব শত শত কর্ম্ম-কুশলী বাদাগা তাহা পরিষ্কার করিয়া এক সুচারু ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। বৃহৎ অনতিবৃহৎ পাথরের চাঁইগুলি ক্ষেত্রের পাশে সরাইয়া বেড়া করা হইয়াছে যাহাতে গরু-বাছুর ঢুকিয়া শস্য নষ্ট না করিতে পারে। ক্ষেত্র চষিয়া চষিয়া উর্ব্বর করা হয়, এবং সেখানে যখন শস্য গজাইয়া উঠে তখন বিস্তৃত অসমতল সবুজ ক্ষেত্রগুলি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।"

ফসলের যাহাতে কোনওরূপ অনিষ্ট না হয় সেজন্য পূজাদিও হইয়া থাকে। বপন বৃদ্ধি কর্ত্তন সব সময়ই এইরূপ পূজা হইয়া থাকে। বাদাগাদের পূজাপার্ব্বণ সম্বন্ধে থারস্টন সাহেব তাঁহার নৃতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "সাধারণতঃ শুক্ল পক্ষের এক মঙ্গলবারে দেবীমন্দিরের পূজারী রাত্রি ৫।৭ ঘণ্টা থাকিতে ডালা ভরিয়া পাঁচ-সাত রকম শস্যবীজ কাস্তে ও লাঙ্গল হাতে করিয়া একজোড়া বলদ তাড়াইতে তাড়াইতে একজন কুরুম্বাকে সঙ্গে লইয়া রওনা হন। ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া শস্যগুলি কুরুম্বার কাপড়ে ঢালিয়া দিয়া গরু হালে জুড়িয়া পূজারী ক্ষেতে তিনটা জুলি কাটেন। কুরুম্বা হাল বন্ধ করিয়া পশ্চিমে তাকাইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিয়া হাত দিয়া চক্ষুদুইটি চাপিয়া ধরিয়া তিনবার "ধো" "ধো" বলে। তারপর উঠিয়া শস্যগুলি তিনবার ছিটাইয়া দেয়। ইহার পর

কুরুম্বা ও পূজারী গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাকী শস্যগুলি ভাঁড়ারে রাখিয়া দেয়। গোয়ালে একটি নবপাত্রে জল রাখা হয় এবং পূজারী দক্ষিণহস্ত সেই জলে ডুবাইয়া বলে "নেরাথুবিত্তা" অর্থাৎ "পরিপূর্ণ ভব।" তারপর শস্য কর্ত্তনের সময় প্রভৃতিতেও এইরূপ পূজাপার্ব্বণ আছে।

মন্দিরগুলির মধ্যে নির্ম্মাণকৌশলের বাহাদুরী বিশেষ কিছুই নাই। তবে দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত জীবজন্তুর চিত্রগুলির অঙ্কনে বিশেষত্ব দেখা যায়। চিত্রে প্রদর্শিত

বাদাগা মন্দিরের দেওয়ালে চিত্র।

দুইটি নমুনা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে যে তাহারা কিরূপ সুন্দর চিত্র অঙ্কনে পটু। এই চিত্রগুলি সাধারণতঃ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকে। কোনও উৎসবাদিতে লোকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া আগে দেবদেবীর পূজা সমাপন করিয়া নানারূপ ক্রীড়ায় মত্ত হয়।

ইহাদের বিবাহপদ্ধতি অতি সোজা। বিবাহ বরের বাড়ীতেই হইয়া থাকে। কন্যা জল আনিতে যায় অর্থাৎ

বাদাগা শ্মশান।

এইরূপে সে দেখায় যে সে স্বামীর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এবং তারপর বরের পরিবার পরিজনকে প্রণাম করে। তাহাতেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহে নাচগানবাদ্যের ও ভোজনের অবশ্য অভাব ঘটে না।

মৃতদাহের প্রথা তাহাদের সবচেয়ে জটিল। নীলগিরি গেজেটিয়ারে লেখা হইয়াছে যে, কাহারও অসুখ হওয়ায় মৃত্যু ধ্রুব নিশ্চিত জানা গেলে একটি ছোট সোনার মোহর একটি সিকি রোগীকে গলাধঃকরণ করিতে দেওয়া হয়। মৃত্যু ঘটিলেই তরিয়া সর্বাড়িবিসনের একজন লোককে নিকটস্থ গ্রামসমূহে মৃত্যুসংবাদ প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সন্দেশবহ এক এক গ্রামে পৌঁছিয়া মাথার পাগড়ী খুলিয়া মৃত্যুসংবাদ রটনা করে।

মৃত সৎকারের দিন মৃতদেহ খাটে বহন করিয়া মাঠে লইয়া যাওয়া হয়। দেহ মাটিতে রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে তিনবার একটা মহিষকে প্রদক্ষিণ করান হয় ও মৃতের হাত

তুলিয়া মহিষের মাথায় রাখা হয়। মৃতবহনের জন্ম নূতন গাড়ী গড়ে; শবকে নূতন কাপড় পরাইয়া ও কপালে দুইটি রূপার টাকা আঁটিয়া সেই গাড়ীতে উঠাইয়া দেয়। তারপর কান্নাকাটির রোল পড়ে। কান্নাকাটি থামিলে মৃতকে প্রণাম করিয়া সকলে কোটা বাজাইতে বাজাইতে চারিদিকে নাচিতে থাকে। এই সময় লোকে এক নূতনপ্রকারের পাগড়ী ও জমকাল কুর্ত্তা পরে। গাড়ী শ্মশানে লইয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। মৃতের সদ্যবিধবা পত্নী এইবার খাটের উপর তাহার কিছু গহনা রাখিয়া স্বামীর নিকট বিদায় লয়। তারপর সেই জাতির জনৈক বৃদ্ধ মৃতের মাথার কাছে দাঁড়াইয়া মৃতব্যক্তির যে-সব পাপ করিবার সম্ভাবনা ছিল, হয়তো বা করিয়াছিল, সেইগুলি তিনবার সুর করিয়া মন্ত্র পড়ার ন্যায় আবৃত্তি করে ও বলে যে এই পাপগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট বাছুরের স্কন্ধে চাপিয়াছে এবং তারপর সেই বাছুরকে গ্রাম হইতে বিদায় দেওয়া হয়।

বাদাগা ইংরেজী সভ্যতায় পড়িয়া তাহাদের মতিগতি বিশেষ পরিবর্ত্তন করে নাই। কিন্তু পার্ব্বত্যজাতির নামের সঙ্গে যে আদিমতার ভাব মনে পড়ে তাহা যেন. অনেকটা নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

জাত রক্ষা

(গল্প)

(১)

পাড়াগেঁয়ে হরিশ মুখুজ্যের ছেলে সুরেশ যে বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া "মোচা"কে "কেলাকা ফুল" বলিবে, বাপ-মাকে চিনিতে পারিবে না, দিন রাত ইজের পরিয়া পিতার সমক্ষে চুরুট টানিবে, গোমাংস অন্ততঃ মুরগী যে তাহার একমাত্র আহার হইবে, গ্রামের লোকের সহিত কথা কহিতে ঘৃণা বোধ করিবে, এবং খুব সম্ভব বিলাত হইতে একটা মেম বিবাহ করিয়া আসিবে (বিশেষতঃ সে যখন অবিবাহিত অবস্থায় বিলাত গিয়াছে তখন সেটা স্থির ধরিয়া রাখিলেও হয়)—তাহা কোন্নগরের বৃদ্ধ দীননাথ বাঁড়ুজ্যে, হরিনাথ ভট্টচাজ, রমেশ গাঙ্গুলি, রামীর পিসী, নলুর দিদিমা, হালদার বাড়ীর ছোট গিন্নি, পাঁচুদা, খিবু খুড়ো, প্রভু ওস্তাদ—ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কানাই জেলে, উদ্ধব কাওরা ও ক্যাংলা মুচি পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই স্থির জানিত।

সেই জন্ম বিলাত হইতে আই-এম-এস পাশ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পরদিন প্রাতে সুরেশ যখন ধুতি পরিয়া পিরাণ গায়ে খালি পায়ে সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া প্রণাম করিয়া আলিঙ্গন করিয়া বেড়াইতে লাগিল তখন সকলের মনে হইল—অসম্ভব! সুরেশ কখনই বিলাত ফেরত নহে। সে বিলাত যায় নাই। ফাঁকী দিয়া কোথায় দুই বৎসর ইয়ারকি দিয়া বাটী আসিয়া বিলাত গিয়াছিল বলিয়া চাল ঝাড়িতেছে। হাঁ এই সত্য কথা, আর তাহা যদি না হয়, সুরেশ যদি সত্য-সত্যই বিলাত গিয়া থাকে এবং তাহা সত্ত্বেও এমন ভাবে ব্যবহার করে তবে জগতে ইহা 'অষ্টম আশ্চর্য্য'!

দিন পনর মধ্যে সুরেশকে সেনা-বিভাগে কার্য্যের জন্ম যখন লক্ষ্ণৌ যাইতে হইল তখন অবশ্য তাহার বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু একদিকে বিলাত-ফেরতের সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে সুরেশের প্রত্যক্ষ ব্যাপার এই দুইএর মাঝে পড়িয়া সমস্ত গ্রামবাসীকে প্রায় মাসাধিককাল অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইতে হইল।

কোন্নগরের হরিশ বাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তিনি রংপুর জেলার কামারপাড়ার স্কুলে হেডমাষ্টারী করিতেন। পুত্র সুরেশকে কলিকাতায় ডাক্তারী পড়িতে পাঠাইয়া অবধি তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল কোন-রকমে তাহাকে একবার বিলাত পাঠাইয়া আই-এম্-এস্ পরীক্ষা দিবার সুযোগ করিয়া দেন। বিলাত পাঠাইয়া সেখানে পাঠের সমস্ত ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করা হরিশ বাবুর আর্থিক অবস্থার অনুকূল ছিল না; কিন্তু সুরেশ যে-বৎসর মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি পাস করিয়া বাহির হইল সেই বৎসরই ঋণ ও নানাবিধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার নিজের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ও স্থিরসঙ্কল্পের জোরে তাহাকে বিলাত পাঠাইয়া দেন।

বিলাত হইতে সুরেশ ফিরিয়া আসিলে গ্রামে যে একটা ঘোঁট বসিবে তাহা হরিশ বাবু পূর্ব্বেই জানিতেন। কিন্তু

সুরেশ বাটী আসিয়া যে নেহাৎ ভাল মানুষের মত ব্যবহার করিবে ইহা কেহ আশা করে নাই, কাজেই তাহার যে-সমস্ত দোষ দেখাইয়া তাহাকে একঘরে করিবার বন্দোবস্ত করিতে গ্রামের সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল তাহা না পাইয়া তাহারা হঠাৎ এই অভাবনীয় ব্যাপারে থত-মত খাইয়া প্রথম দিন-কত কোন কথা উত্থাপন করিবার অবসর পাইল না। যে গোমাংস খাইবে বলিয়া ধরিয়া রাখা হইয়াছিল সে আসিয়া কলাপাতে করিয়া কলায়ের ডাল ও ভাত খাইতে লাগিল, ইজেরও পরিল না বা এমন একটা কিছুই করিল না যে সেইটা ধরিয়া তাহাকে আক্রমণ করার সুবিধা হয়। কিন্তু কথাটা একেবারে চাপা পড়িল না—তাহারা স্থির করিল এখন কোন কথা তুলিলে বড় সুবিধা হইবে না—ঠিক সুযোগ-মত চাপিয়া ধরিতে হইবে। এবং সুরেশের বিবাহের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল।

(২)

হরিশ বাবু যখন রংপুরে প্রথম হেডমাষ্টারী করিতে যান তখন সেখানকার ডাক্তার জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়। আজ প্রায় বছর দশ হইল তিনি রংপুরে কাজ করিতেছেন, বিদেশের সেই প্রথম পরিচয় এখন বন্ধুত্বের সীমা ছাড়াইয়া যথার্থ আত্মীয়তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনবাবুর একটিমাত্র কন্যা বাসন্তী তখন বছর-তিনেকের। সুরেশের বয়স তখন বছর-পনর, সে তখন কামারপাড়ার স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। তারপর কতদিন গত হইয়াছে সুরেশ কলিকাতায় আসিয়া ফাষ্ট আর্ট পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে পাঁচ বৎসর কাটাইয়াছে, তাহার পর দুই বৎসর হইল সে বিলাত গিয়াছিল সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছে মাত্র। সে যখন মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ হইল তখন বাসন্তীর বছর-এগার বয়স। জীবনবাবুর আন্তরিক কামনা হরিশ বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহার বাসন্তীর সহিত সুরেশের বিবাহ দেন। বাসন্তী সুন্দরী। তাহার স্নিগ্ধ মুখচ্ছবিখানি হরিশবাবু ও সুরেশের মাতা উভয়কেই যথেষ্ট মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। সুরেশ যেবার বিলাত যায় সেইবারেই বাসন্তীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যাইত, কিন্তু হঠাৎ জীবনবাবু পত্নী ও কন্যা বাসন্তীকে যথার্থ অসহায় ভাবে রাখিয়া মারা গেলেন।

সুরেশ খুব কম বাটী যাতায়াত করিত। বাসন্তীকে সে যে দেখে নাই এমন নহে, তবে তাঁহার মনে আধুনিক ধরণের পূর্ব্বরাগ কিছুমাত্র স্থান পায় নাই। কলেজে পড়িয়া পাশ করাই তখন তাহার একমাত্র কাজ বলিয়া সে জানিত। শুনিয়াছিল তাহার বিবাহের কথা হইতেছে দু একবার সে-বিষয়ে একটু আধটু চিন্তা করিলেও সে বিষয়টা তাহার ছাত্রজীবনে তত আবশ্যক বলিয়া বোধ হইত না। বাসন্তীর পিতা জীবনবাবুকে সে খুব ভক্তি করিত। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে সে খুবই শোক পাইল। শুধু সেইজন্যই বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাহার মনে হইয়াছিল—বাসন্তীকে বিবাহ করিয়া যাওয়া উচিত; জীবনবাবুর আন্তরিক কামনা যে তাহাই ছিল। কিন্তু এক বৎসর কাল অশৌচ বলিয়া বিবাহ হইল না, অথচ সময় নষ্ট করা অনুচিত দেখিয়া তাহাকে বিলাত যাইতেই হইল। তাহাকে অবিবাহিত অবস্থায় বিলাত পাঠানর ইহাই কারণ।

সুরেশ বিলাত যাওয়ার পর হইতে অর্থাৎ জীবনবাবুর মৃত্যুর পর হইতে জীবনবাবুর স্ত্রী বাসন্তীকে লইয়া নদীয়া জেলায় নিজগ্রামে বাস করিতেছেন। জীবনবাবু অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিলেও কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। কন্যাদায়গ্রস্তা তাঁহার বিধবা পত্নী সেজন্য সাতিশয় চিন্তান্বিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সুরেশ লক্ষ্ণৌ চলিয়া যাইবার পর হরিশবাবু একদিন পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন "সুরেশের বিয়ের কি করা যায়?"

সুরেশের মা বলিলেন "কেন? সে ত ঠিকই রয়েছে। সেই জীবনবাবুর মেয়েটি—আহা জীবন বাবু!"

হরিশবাবু বলিলেন "বাসন্তী?—সে আর আমি জানিনা? কিন্তু সে কি হবে?"

"কেন হবে না?"

হরিশ বাবু বলিলেন "অনেক কারণ আছে।"

"কি অনেক কারণ আছে? শুনি।"

"প্রথমতঃ সুরেশ যতই ভাল ছেলে হোক না, সে বিলাত ঘুরে এসেছে—গবর্ণমেণ্টের ভাল সম্মানের চাকরী করে—

আমার ইচ্ছা থাকলেও তার সে-বিবাহে ইচ্ছা আছে কি না জানি না।"

সুরেশের মা বলিলেন "তার খুব ইচ্ছে আছে—সে কথা দিয়ে গিয়েছিল, বিলেত থেকে এসে বাসন্তীকে বিয়ে করবে। সুরেশ আমার তেমন ছেলে নয় যে এখন অমত করবে।"

হরিশ বাবু বলিলেন "আচ্ছা সে না হয় মত দিলে; জীবনবাবুর স্ত্রী বিধবা, তিনি কি সাহস করে' বিলেত-ফেরতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অগ্রসর হবেন?"

সুরেশের মা বলিলেন "এ-ছাড়া আর কোন আপত্তি আছে?"

"না।"

"মেয়ে ভাল ত?"

"সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করছো?—সে রকম মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি।"

"আর কোন আপত্তি নেই ত?"

"না।"

"তবে এই দেখ" বলিয়া সুরেশের মা বাক্স হইতে একখানা মাসপাঁচেক আগেকার চিঠি বাহির করিয়া হরিশবাবুর সামনে ধরিয়া দিলেন। পত্রে জীবনবাবুর স্ত্রী বাসন্তীর সহিত সুরেশের বিবাহের জন্য বিশেষ করিয়া কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন। বাসন্তীর মা লিখিয়াছেন—

দিদি,

আমার ভাগ্যের কথা আর নূতন কি লিখিয়া জানাইব। বাসন্তী বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিবাহ না দিলে আর চলে না। বাসন্তীর পিতার জীবিতাবস্থায় তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল সুরেশের হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিয়া যান। আজ তিনি নাই। সুরেশও এখন একজন বড়লোক; আমার এমন সাহস হয় না যে সে প্রস্তাব আপনার নিকট পুনরায় উত্থাপন করি। এখানে গ্রামে আমাদের আত্মীয় কেহ নাই। আমার দুই ভাসুর আছেন, কিন্তু তাঁরা একবার ফিরিয়াও তাকান না। মেয়েটার বিবাহের জন্য চিন্তা করিবার ভার সমস্তই আমার উপর। আমার যে সাধ্য কি তাহা ত আপনারা খুবই জানেন। গ্রামের লোকে সে বিষয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং মেয়ে বড় হইয়াছে, তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছি না, বলিয়া নানাবিধ কুৎসা রটাইতেছে। এক্ষেত্রে আপনার ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীচরণে আমার নিবেদন, যদি এই অনাথা সহায়হীনা বিধবাকে কন্যাদায় হইতে রক্ষা করেন। সুরেশের মত জামাতা পাইলে আমি ধন্য হইব—বাসন্তী ধন্য হইবে—বাসন্তীর পিতার মৃত্যুকালের বাসনা সফল হইবে। গ্রামে আমার যথার্থ বন্ধু কেহ নাই একথা বুঝিয়াও যদি আপনারা আমার ন্যায় বিপন্নার দিকে কৃপা কটাক্ষপাত না করেন তাহা হইলে বুঝিব ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। নিবেদন ইতি।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী ছোটবোন।

পত্রখানা বারংবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া হরিশবাবু বলিলেন "তাইত! এঁর ত খুবই ইচ্ছে আছে দেখছি। সুরেশকে তা হলে এ সম্বন্ধে লিখতে হবে।"

কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই হরিশবাবু পুত্রকে সমুদয় জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন।

বাসন্তীকে বধূরূপে পাইবার কল্পনায় সুরেশের মাতার আনন্দের সীমা রহিল না।

(৩)

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া লক্ষ্ণৌতে কাজে নিযুক্ত হইয়া সুরেশ বিবাহের জন্য বেশ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। জীবনবাবুর কন্যা বাসন্তীর কথা সে ভোলে নাই। বাসন্তীর সহিত বিবাহে তাহার খুব ইচ্ছা ছিল। তবে বাসন্তী বড় ছোট মেয়ে—দেখিতে মন্দ না হইলেও ঐ নোলক-পরা মুখখানা যখন তাহার মনে পড়িত তখনই যেন তাহার মনটা কেমন নারাজ হইয়া বসিত—নোলক-পরা ঘোমটা-দেওয়া পাড়াগেঁয়ে মেয়েটাকে সে যে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিবে তাহা তাহার বিশ্বাস হইত না। তবে হাজার হোক বাসন্তীর রূপ-গৌরব প্রচুর ছিল; সকাল সন্ধ্যায় অবসর-মুহূর্তগুলি সেই নোলকপরা মুখের স্মৃতিতে ভরিয়া উঠিয়া তাহাকে খুব ব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

একদিন বিকালে সুরেশ নিজের বাংলার বারান্দায় একখানা ইজি-চেয়ারে অন্যমনস্ক ভাবে শুইয়া খবরের

কাগজ পড়িতেছে—পাশে টিপাইএর উপর এক পেয়ালা চা অনেকক্ষণ হইতে ঠাণ্ডা হইতেছে তাহা খাইবার কথা মনেই নাই। সেই বিকালটা যেন বিশেষ ভাবে তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া তুলিয়াছে। সে ভাবিতেছিল "বাসন্তীর হয় ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তা হয় হোক তাহাতে আমি খুব সুখী হইব।" আবার ভাবিল "না। তাহা হইলে আমি সে সংবাদ পাইতাম না কি? যদি তাহার বিবাহ না হইয়া থাকে আর যদি বাবা সেইখানে আমার বিবাহের স্থির করেন তবে কি ভাল হইবে? বোধ হয় হইবে না।" আবার ভাবিল "খুব খারাপই বা কেন হইবে? মন্দ হইবে না—বেশ হইবে।" এই রকম সাতপাঁচ অসংলগ্ন চিন্তা তাহাকে আজকাল অনবরতই ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। লক্ষ্ণৌ চলিয়া আসার পর পিতার পত্র পাইয়াছিল কিন্তু তাহাতে বিবাহের কিছু উল্লেখ ছিল না। এ অবস্থায় সুরেশ একটু বিপদগ্রস্ত বলিয়া বোধ করিতেছিল। পিতার নিকট এ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সাহসও হয় না সবুরও সয় না।

এমন সময় ডাক-পিয়ন একখানা চিঠি দিয়া গেল। সে চিঠি সুরেশের বাবা লিখিয়াছেন। তিনি বাসন্তীর মাতার লিখিত চিঠিখানি পাঠাইয়া পুত্রের মত জানিতে চাহিয়াছেন।

(৪)

রাণাঘাটের কাছাকাছি বেগুনঘাটা একখানা ছোট গ্রাম। এইখানেই বাসন্তীর পিত্রালয়। গ্রামের মধ্যে মোট মাট ভদ্রলোকের বাস ঘর-দশেকের বেশী নহে। এই দশ-ঘরের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক লোক প্রতি ঘরে এক-একজন করিয়া পাওয়াও দুষ্কর। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইলে সংখ্যা পূরণের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকের সাহায্য প্রায়ই লইতে হয়। গ্রামের লোকের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। তিন ঘর ভট্টাচার্য্য কোনরকমে বাপদাদার মন্তর আওড়াইয়া ও বাড়ীর উঠানে উৎপন্ন শাক বেগুন বিক্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তিন ঘর মুখোপাধ্যায়রা বাড়ীতে থাকেন না—বসন্তের কোকিলের মত শনিবারের সন্ধ্যার পর হইতে রবিবার রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহারা আসিয়া বাটীতে থাকেন, তারপর কলিকাতায় পাড়ি মারেন। পাঠক মহাশয় বৃদ্ধ, কিছু জমাজমি আছে তাহাতেই কায়ক্লেশে দিন গুজরান করেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠসহোদর ম্যালেরিয়ার ভয়ে বাটী ত্যাগ করায় তাঁহার বিষয়ের সামান্য আয় আর দুইভাগ করিতে হয় না। আর দু ঘর যাঁহারা আছেন তাঁহাদের দরিদ্র অবস্থার কোন বিশেষত্ব নাই। গ্রামের মধ্যে জীবনবাবুরই সর্ব্বাপেক্ষা সচ্ছল অবস্থা ছিল, তাঁহার জীবিতাবস্থায় তিনি কর্ম্মস্থল হইতে প্রায়ই বাটী যাওয়া আসা করিয়া যথাসাধ্য নিজগ্রামের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। গ্রামের লোকে তাঁহার আর্থিক অবস্থার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তাঁহাকে পরোক্ষে ভয় করিত এবং প্রত্যক্ষে সম্মান করিত। তাহার মৃত্যুর পর সেই সাহসেই বাসন্তীকে লইয়া তাহার মা বেগুন-ঘাটায় আসিযাছিলেন; কিন্তু সেদিন আর নাই, গ্রামের লোকে এখন তাঁহার বিপদ আপদে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। ছ-মাস ছ-মাস অন্তর নিজের দরকারে ভিন্ন কেহ তাঁহাদের খোঁজখবর লয় না। তবে ইদানী বাসন্তীর বিবাহের বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গ্রামের লোক খুব একটা আন্দোলনের সূত্রপাত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

সে দিন রবিবার। মধু ভট্টাচার্য্যের আটচালার হাত-নেয় গ্রামের যুবা বৃদ্ধ সকলেই উপস্থিত। শনিবারের বাবুরাও উপস্থিত। বাসন্তীর বিবাহের কথা লইয়া সকলেই খুব নিবিষ্ট মনে আলোচনা করিতেছে।

ইন্দু বলিতেছিল "শুনেছো বিষ্টুদা—জীবনকাকার মেয়ের খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছে। তোমরা যে একেবারে থুক্‌-থু করে দিয়েছিলে। খুড়িমাকে নাকি বলেছিলে তোমার জামাই যে হবে সে এখনও লাঙ্গল চষ্‌ছে—বড় ঘরে বিয়ে দেবার আশা কেন অত? এখন শুনচো কি? হুগলীজেলায় তাদের বাড়ী - একপয়সা নেবে না—পাত্রটি ১০০্ টাকা মাইনের চাকরী করে!"

হরিপদ বলিল "কি? কি? খুব আরব্য-উপন্যাস জুড়ে দিয়েছিস্ যে? তিলকে তাল করতে তোর মত আর কাউকে দেখিনি!"

ইন্দু বলিল "কেন? ও-কথার মানে কি? কোন্‌টা তিল? আর কোন্‌টা তাল?"

হরিপদ হাসিয়া বলিল "ওর সবই তিল—তুই সব তাল করেছিস। আচ্ছা কি বল্‌ছিস্‌ আবার বল দেখি, এখুনই আমি ধরে দিচ্ছি।"

ইন্দু বলিল "শোন আমি যা বলেছি আবার বলছি—পাত্রটির হুগলিজেলায় বাড়ী—"

মধু ভট্ট এতক্ষণ একমনে তামাক টানিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও জানি। হুগলী জেলায় বাড়ী বটে, সত্যি কথা কেন ঢাকবো?"

ইন্দু বলিতে লাগিল "হুগলীজেলায় বাড়ী—এক পয়সা নেবে না—"

রমানাথ বাধা দিয়া বলিল—"শুধু তাই নয়, জীবন কাকার বাড়ীর পশ্চিমের ঘরের ছাদটা সারিয়ে দেবে—একটা পুকুর কেটে দেবে—বাগান কেনবার জন্যে টাকা দেবে। দেখছো কি?"

ইন্দু রাগিয়া বলিল "আমি যা শুনেছি তাই বলছি। আমার কথাটা শেষ করতেই দাও না। অত শ্লেষ করবার দরকার কি? তোমাদের কারুর ভাগ্যে ঘটেনি বলে কি আর কারুর ভাল কুটুম্ব হতে নেই?"

মধু ভট্ট বলিলেন "বল্‌ বল্‌ তুই বল্‌—ওহে তোমরা ওকে বলতেই দাও না।"

ইন্দু আবার বলিল "এক পয়সা নেবে না—চাকরী করে পশ্চিমে, সাতশ টাকা মাইনে পায়—"

মধু ভট্ট আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "ওটা ভাই তোমার বাড়াবাড়ি। যে সাতশ টাকা মাইনে পাবে সে আর জীবনের মেয়েকে বিয়ে করতে আসবে না।"

মুখুয্যে-বাড়ীর শশী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে কলিকাতায় থাকে, কাজেই তাহার মতামত অন্য লোকের অপেক্ষা দামী। সে দেখিল, ইন্দু বাস্তবিকই বাড়াবাড়ি করিতেছে, তাই সে তাহাকে কি একটা জেরা করিতে যাইতেছিল; হঠাৎ হরিপদ বাধা দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "আচ্ছা ইন্দু বাবু, তুমি ত সব ঠিক খবর জান। বল দেখি কি চাকরী করে?"

ইন্দু বলিল "কে? সে? সে ত ডাক্তার।"

এই কথায় হরিপদ আর হাসির ফোয়ারা থামাইতে পারিল না, বলিল "আচ্ছা বেশ ধেশ—খুব বোকা বুঝিয়েছে তোকে—ডাক্তার নাকি সাতশ টাকা মাইনে পায়! দূর বোকা!"

ইন্দু ত থতমত খাইয়া গেল।

বিষ্টু খানিক পরে বলিল "না, আমি শুনেছি ডাক্তারী করে বটে ছেলেটি—তবে ৭০০৲ টাকা নয় এই ২৫০৲ না ৩০০৲ টাকা মাইনে পরে হবে এমন চাকরী পেয়েছে।"

শশী দেখিল একদল পাড়াগেঁয়ে মূর্খ কি পাগলের মত কথা বলিয়া যাইতেছে। সে হাসিয়া বলিল "কি সব পাগলামি হচ্চে! ডাক্তারের কখনও অত মাইনে হয়? ডাক্তারের মধ্যে বড় চাকরী ত তোমার এ্যাসিষ্ট্যাণ্টসার্জ্জন, তার ৮০৲ টাকা থেকে আরম্ভ আর সেই মরবার সময় শ'-দুই টাকা মাইনে হয়। তোমার ঐ জীবনদা কত মাইনে পেতেন? ১২৫৲ না কত?"

এ-রকম expert opinionএর সম্মুখে ইন্দু আর দাঁড়াইতে পারিল না।

তারপর অনেক আলোচনার পর স্থির হইল "পাত্রটি ৭০৲ টাকা মাহিনা পায়—এবং নগদ ৩০০০৲ টাকা ও ২০০০৲ টাকার গহনা চাহিয়াছে। সে টাকা দেওয়া জীবনের স্ত্রীর দ্বারা কখনও সম্ভব হইবে না। অতএব ঐ বিবাহের কথাটা একটা উড়ো গুজব মাত্র।"

বেলা যখন বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত মন লইয়া স্নানার্থে গমন করিল। বিষ্টু বাড়া যাইতে যাইতে রাস্তা হইতে চেঁচাইয়া বলিল—"শশীদা! ভাত-টাত খেয়ে আমাদের বাড়ী এসো আজ, একটা মজা আছে!"

শশী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, বলিল "কি বল্‌। দুপুর বেলা একটু ঘুমুতে হবে আমাকে। কি দরকার বল্‌ না।"

"তুমি এসো ত—তখন সব শুনবে।"

"কি না বল্‌লে যাব না?"

"তুমিই ঠক্‌বে—মস্ত মোরগ।"

"মোরগ—এঁ্যা? কোথায় পেলি?"

"সেই হানিফ গাজির একটা মোরগ আর একটা মুরগী কাল বিকেলে মধুদাদের উঠানে চরতে এসেছিল—"

"বাঃ বাঃ গ্র্যাণ্ড! ভাগ্যি হরিপদ আমাকে টেনে নিয়ে এলো—আমি ত এ শনিবার বাড়ী আসতুমই না।"

"আজ রাত্রিতে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পেছনে ও-দুটোকে ঠিক করে ফেলা যাবে?"

"কাল যদি খোঁজ করে?"

"দুর! কত খাসি মুরগী পার হয়ে গেল—খোঁজ করবে? বামুন-পাড়ায় খাসী মুরগী গেলে আর ফেরে না সবাই জানে।"

(৫)

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। সারা বেগুনঘাটার লোকের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুরেশের সহিত বাসন্তীর বিবাহ স্থির হইয়াছে। সেই ফাল্গুনমাসে তার বিবাহ। গ্রামের লোক যখন দেখিল কোনমতেই তাহাদের ইচ্ছা পূরণ হইল না তখন মিছামিছি লুচির ভোজটা কেন বাদ যায় ভাবিয়া সকলে মিলিয়া আজ কয়দিন ধরিয়া কোমর বাঁধিয়া বাঁড়ুয্যেবাড়ী খুব খাটিতেছে। সন্দেশ পানতুয়া তৈয়ারী করার জন্য হালুইকরের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া তাহাদের মনে হইল না, বাসন্তীর মার কাছে গিয়া খুড়িমা জেঠাইমা বলিয়া আত্মীয়তা দেখাইয়া বিষ্ণু, হরিপদ, শশী ইত্যাদি খুব ফফরদালালি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

ফাল্গুন মাস। শীতের হিমস্পর্শে ম্রিয়মাণ প্রকৃতির দেহ তখন সবেমাত্র বসন্তের সমীরস্পর্শের পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছে। বাসন্তীর এই মধুবসন্তে বিবাহ। গ্রামে খব ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। বহু অনুরোধেও বাসন্তীর মাতুল বিবাহের পর দিন ভিন্ন আসিতে পারিবেন না লিখিয়াছিলেন; জেঠামহাশয় দুইজনকে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষ্যে দিনদুই হইল কলিকাতায় যাইতে হইয়াছে, কাজেই বাসন্তীর মাতাই বিবাহের কন্যাকর্ত্তা।

বিবাহের দিন। সন্ধ্যার সময় বিবাহের লগ্ন। বর রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে পাল্কীতে আসিবে এইরূপ বন্দোবস্ত।

বিকাল ৪॥ টার গাড়ীতে হরিশবাবু সদলবলে রাণাঘাট ষ্টেশনে নামিয়া সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে বেগুনঘাটায় পৌছিলেন। বিলাতফেরত সুরেশ চেলীর কাপড় পরিয়া মাথায় সোলার টোপর দিয়া বর সাজিয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছে। বরযাত্রের কোলাহল, ঢোল সানাইএর শব্দ তাহার কানে আজ কিছুই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, শুধু একখানি অস্পষ্ট ছায়ার মত মাধুরীমণ্ডিত কার মুখ তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে একটা কিসের মোহে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অজস্র শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনির মধ্যে যখন সে গিয়া বরের আসনে বসিল তখন তাহারি বোধ হইল জীবনের সমস্ত দিনগুলা যদি এমনি আনন্দের পসরা লইয়া প্রভাত হইত তাহা হইলে বোধ হয় স্বর্গের জন্য আর মানবের মন কিছুতেই ব্যাকুল হইত না।

লুচিভাজার গন্ধ, প্রীতি-উপহার বিতরণ ও বর ও কন্যাযাত্রের কোলাহলে বিবাহ-সভা বেশ মশ্‌গুল হইয়া উঠিল। হঠাৎ বাটীর মধ্যে একটা যেন কিসের কোলাহল সকলের মন আকর্ষণ করিল।

বিষ্টু লুচি ভাজিতে-ভাজিতে হঠাৎ ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত—তাহার মুখে কেবল "কি সর্ব্বনাশ! আরে রাম রাম! ভদ্রলোকের এই কাজ?"

আর একজন বলিল "কি হয়েছে রে?"

শশী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "পাঠকদা কই? পাঠকদা কই? শীঘ্র ডাক; সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

"কি সর্ব্বনাশ রে?"

বাহিরের উঠানে একটা খুব ভিড় হইয়াছে। হরিশবাবু ব্যাপারটা কি বুঝিতে চেষ্টা করিতে গিয়া ভিড়ের পিছনে অনর্থক ঠেলাঠেলি করিতেছেন মাত্র। বরের সভা হইতে সকলে উঠিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ একটা ঘোর গণ্ডগোল যেন তাণ্ডবমূর্ত্তিতে নাচিয়া উঠিয়াছে।

পাঠক মহাশয় গ্রামের কর্ত্তা ব্যক্তি। চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বৃদ্ধের স্বরভঙ্গ হইয়াছে তবু প্রাণপণে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ওরে বিষ্টু, ব্যাপার কি আমাকে বল্‌না?"

"এইযে পাঠকদা এয়েছেন—সর্ব্বনাশ হয়েছে! এ বিয়ে ত হবে না?"

"কি হল রে?"

"বিলাত ফেরত—বিলাত-ফেরত—জাত নেই!"

"এ্যা—কে? সর্ব্বনাশ! কে বললে?"

"ঐ নবীন কাকা কলকাতায় গিয়েছিলেন, শুনে এসেছেন।"

ভিড়ের মধ্য হইতে তখন নানা লোকে নানা-রকম

কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কেহ বলিল—"কিছুতেই না। এ ঘিয়ে হ'তে দেবো না; ব্রাহ্মণের বংশে দোষ? আমরা থাক্‌তে?" আর একজন মেজাজ গরম করিয়া বলিল "কোনো শালার সাধ্যি হবে না যে আমাদের গাঁয়ে এসে বামুনের জাত মারে?—নিয়ে যাক্‌ বর ফিরিয়ে, এক্ষুনি নিয়ে যাক্‌, নইলে—"

আর একজন বলিল—"খুড়িমারই বা কাণ্ড কি? জীবনকাকা থাকলে কি আজ তাঁর এতটা সাহস হত? আজ কাকা নেই বলে আমাদের সামনে তার বংশে এত বড় একটা দোষ আমরা দেখতে পারি না। বিলাত-ফেরতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হয় তিনি অন্য গাঁয়ে গিয়ে দেবেন। এখানে নয়। ভাগ্যি নবীন কাকা কলকাতায় গেছল!"

কে কার কথা শোনে—তখন চারিদিকে ছুটাছুটি হুটাপুটি লাগিয়াছে। সুরেশ বরের আসনে চোরটির মত বসিয়া। হরিশ বাবু পাগলের মত যাহাকে সম্মুখে পান তাহাকেই হাতে ধরিয়া বলেন "মশায় একটু স্থির হয়ে শুনুন। সমস্ত বিষয় না বুঝে একটা গণ্ডগোল করার মানে কি?" কে বা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে। যাহারা বা একটু আধটু উত্তর দেয় তাহাদের সে উত্তর কেবল শ্লেষ ও গালিতে পূর্ণ—"মশায়ের এখানে জোচ্চুরি চল্‌বে না" ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে গোলমালটা বাড়ীর মধ্যে গিয়া পড়িল। তখন স্ত্রী-আচারের আয়োজন হইতেছে। হঠাৎ দুইজন ছুটিয়া গিয়া মেয়েদের ভিড় ঠেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল—"খুড়িমা কই—খুড়িমা? ওগো খুড়িমা এই দিকে একবার শোন দেখি।"

বাসন্তীর বিবাহে যে এতবড় একটা গণ্ডগোল হইবে তাহা বাসন্তীর মা পূর্ব্বে ভাবেন নাই। তাঁহার সুখ দুঃখে যখন কেহ তাঁহার প্রতি তাকাইয়া দেখে না তখন বিলাত ফেরতের সঙ্গে কন্যার বিবাহে কাহারও আপত্তি থাকিলেও তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না এইরূপ মনে করিয়াই তিনি এতটা সাহস করিয়াছিলেন। তাঁহার আরও ভরসা ছিল কথাটা প্রকাশ পাইবে না; যাহাদের পরের পাঠা চুরি করিয়া খাইয়া ধরা না পড়িলে দোষ হয় না, প্রকাশ্যে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াও মুখে অস্বীকার করিলে জাত যায় না, তাহারা এ বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইলে তাহাদের জাতিনাশের কোন সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া তিনি বর যে বিলাত-ফেরত তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ বিবাহের রাত্রে যে গণ্ডগোলটা এতদূর পাকাইয়া উঠিবে তাহা কে জানিত? এবং ইহা ঘটিল তাঁহারই ছোট ভাসুর নবীন হইতে! বাসন্তীর মা তাড়াতাড়ি গৃহাভ্যন্তর হইতে ছুটিয়া আসিলেন। একজন বলিল—"আপনি একি করছেন খুড়িমা? জাত দিতে বসেছেন?"

বাসন্তীর মায়ের তখন মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। তিনি সে অবস্থায় কি করা উচিত ঠিক করিতে না পারিয়া উচ্চ-স্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পাঠক-মশায় ইতিমধ্যে বাটীর ভিতর আসিয়া বাসন্তীর মাতাকে নানা রকম ভাবে বুঝাইলেন যে সে বিবাহ দেওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত—বিলাত-ফেরতের সঙ্গে মেয়ের বিবাহে কখনই তাঁহারা অনুমতি দিতে পারেন না। বাসন্তীর মাতার মুখে কোন কথা নাই। পাঠক-মশায় আবার বলিলেন "কাঁদলে হবে না—বল তোমার কি ইচ্ছে?"

কাঁদিয়া তিনি বলিলেন "তাহলে বাসন্তীর বিয়ে হবে না? তাতেও ত জাত যাবে?"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "কেন হবে না? এখনই বর খুঁজে আনছি। ভাবনা কি তোমার খুড়িমা?"

আর একজন বলিল "ওরে রমানাথের বিয়ের কথা হচ্ছিল—শীঘ্র জন কত যা তাকে ধরে' নিয়ে আয়?" ইত্যাদি।

এই রকমে গণ্ডগোল বেশ পাকাইয়া উঠিল। পাঠক-মশায় মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়াছেন, ঘন ঘন তাঁহার শ্বাস বহিতেছে। হরিপদ, বিষ্টু, ইন্দু সব মালকোঁচা মারিয়া আদেশের অপেক্ষা করিতেছে—আবশ্যক হইলে লাঠালাঠি পর্য্যন্ত তাহারা করিবে তবু এ বিবাহ হইতে দিবে না। বাসন্তীর মায়ের অবস্থা তখন শোচনীয়; মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। এমন একজন কেহ নাই যে সে সময়ে আসিয়া বলে "কোন ভয় নাই—বাসন্তীর বিবাহে কে বাধা দেয় দেখি?" একটা মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা তাঁহাকে রুদ্ধবাক্

করিয়া দিয়াছে—তিনি মাটিতে বসিয়া কেবল রুদ্ধস্বরে কাঁদিতেছেন।

গ্রামের সকলে তখন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছে। পাঠক-মশায় হরিশ বাবুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন "মহাশয়, বর ফিরাইয়া লইয়া যান, আমরা মেয়ের অন্যত্র বিবাহ দিব।"

(৬)

পল্লী নিস্তব্ধ। গভীর রাত্রি। বাসন্তীর বিবাহ হইল না। সুরেশ ফিরিয়া গিয়াছে। অন্য যে পাত্রের সন্ধানে সকলে গিয়াছিল তাহারা নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

লোকের হুড়াহুড়িতে ঠেলাঠেলিতে ভাঙ্গা ঝাড়লণ্ঠন হুকা কলিকা ছেঁড়া ফুলের মালায় বিবাহের সভা যেন শ্মশানের মত একটা বিকট মূর্ত্তি ধরিয়াছে। কতকগুলা কুকুর ও শেয়াল লুচির গন্ধে একত্র হইয়া বিকট ধ্বনিতে কেবল কলহ করিতেছে।

সমস্ত অন্ধকার পল্লীর বক্ষে ঈষৎ আলোকিত সেই বিবাহ-বাসর যেন এক মূর্ত্তিমান বিপদের প্রাণহীন দেহের মত পড়িয়া আছে। আর শৃগাল কুকুরের চীৎকার, ঝিল্লীরব, আর দু-একটা নিশাচর পক্ষীর আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে বাসন্তীর মাতার করুণ বিলাপধ্বনি গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটা শ্মশান-দৃশ্যের সৃজন করিয়াছে।

রাত্রি তখন প্রায় দুইটা। গ্রামের লোক গণ্ডগোল পাকাইয়া বিবাহটা কোনরকমে পণ্ড করিয়া দিয়া তখন নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে নিজের নিজের গৃহে গমন করিয়াছে।

বাসন্তীকে কোলে করিয়া তাহার মাতা একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহাদের চক্ষের জলে ঘুম কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। বাহিরের আলোকটা নিভিয়া গিয়াছে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। রাত্রি শেষ প্রায়।

কে একজন বাহিরে জানালার নীচে হইতে ডাকিল "বাসন্তী!"

গৃহাভ্যন্তরে সমাজনিপীড়িতা কুসুমকোমলা বাসন্তীর কথা কেহ একবার মনেও করে নাই। এখন তাহাকে কাহার মনে পড়িল! তাহারই চোখের সম্মুখে সব ঘটিয়া গেল। সে শুধু কাঁদিয়াছে—রুদ্ধ হৃদয়াবেগ তাহার অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। হঠাৎ তাহার কানে গেল কে বাহিরে ডাকিতেছে "বাসন্তী"।

বাসন্তী ধীরে ধীরে উঠিল—মাকে বলিল "মা! কে ডাকছে।"

"কই?"

"বাইরে?"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?—"

চাপা গলায় উত্তর হইল "আমি সুরেশ—"

"আয় বাবা আয়—"

মাতা পুত্রী বাহিরে গিয়া দেখেন—বরবেশী সুরেশ ও তাহার পিতা দাঁড়াইয়া আছেন।

(৭)

তখন উষার ঈষৎ কনকরেখা দূরদিগন্তে সবে ফুটিয়া উঠিতেছে। বিষ্টুদের চণ্ডীমণ্ডপে তখন একটা ছোটখাট সভা বসিয়াছে। নিমের ডাণ্ডা দিয়া সিদ্ধি ঘোঁটা হইতেছে।

শশী বলিল "যাক্ খুব রক্ষে করা গেছে—বামুনের জাতটা গেছল আর কি?"

ইন্দু বলিল "তোমরা ত ছাই করেচ। মিছে গণ্ড-গোল করে মরছিলে। আমি সেই গোলমালে যে লুচি আর পানতুয়াটা সরিয়েছি তা এখন সাতদিন জলখাবার কিনতে হবে না।"

বিষ্টু বলিল "আমি বুঝি আনি নি—তুমিই চালাক আর সব বোকা!"

হরিপদ তখন সিদ্ধি খাইয়া বেশ চুর হইয়া বসিয়া ছিল—সিদ্ধির ঝোঁকে সে বলিল—"বাস্তবিক সমাজটা খুব উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। ভাগ্যি আমরা ছিলুম!"

সদর রাস্তায় তখন একখানা পাল্কী হেঁই-ও হেঁই-ও করিয়া ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিতেছিল।

এমন সময় রমানাথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"ওরে! ওরে! শিগগির ছুটে আয়। জীবন ডাক্তারের মেয়েটা সেই বিলেত-ফেরতটার সঙ্গে বেরিয়ে গেল!"

সিদ্ধির নেশায় চুর ইন্দু বিষ্টু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে, বেরিয়ে যেতে দে, বিয়েটা বন্ধ করে বামুনের জাত ত বাঁচিয়েছি!"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

জাত ও আনুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠান

(Emile Senartএর ফরাসী হইতে)

এইখানে আমরা তথ্যসমূহের আর এক পর্য্যায়ের কথা বলিব। বর্ণভেদ-সংক্রান্ত যে-সকল নিয়ম খুব সাধারণ, যাহা জাতকে শাসন করে, যাহা জাতের পক্ষে,—বলিতে গেলে,—একান্ত প্রয়োজনীয়, যাহা জাতের লক্ষণ-পরিচায়ক এবং যাহা জাতের গঠনপ্রণালীকে রক্ষা করে, যাহা বিবাহ-সম্বন্ধের সীমা নির্দ্ধারণ করে, আটকের বেড়া স্থাপন করে, যাহা ব্যবসায়ের কৌলিকতাকে বজায় রাখে, যাহা অতীব সহজসাধ্য মিশ্রণ নিবারণ-কল্পে প্রত্যেক জাত-বিভাগের বিশেষত্ব সতর্কতার সহিত রক্ষা করে—ঐ-সকল নিয়মের পাশাপাশি, আবার কতকগুলি নিষেধ-নিয়ম, কতকগুলি ব্যবহার,—যাহা খুব বিস্তৃত কিন্তু সার্ব্বভৌম নহে,—প্রত্যেক জাতের ভিতর আধিপত্য করিয়া থাকে। এই-সকল উপনিয়মগুলি স্বভাবতই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কোন-না-কোন মুখ্য মূল নিয়মের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ। সমস্ত মিলিয়া, উহা ব্যবহার-নিয়মের একটা সংহিতারূপে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যে গণ্ডীর মধ্যে উহা প্রচলিত, সেই গণ্ডীর মধ্যে উহার খুবই আঁটাআঁটি। উহার প্রয়োগ সব সময় একরূপ না হইলেও এবং উহার পরিণামও ততটা গুরুতর না হইলেও উহার প্রামাণ্য কম নহে। এই-সকল উপনিয়ম, বিভিন্ন জাতের প্রত্যেকের একটা বিশেষত্ব চিহ্নিত করিয়া দেয়। এই সম্বন্ধে অন্তত আমাদের কতকটা ধারণা থাকা আবশ্যক।

যখন একসঙ্গে আহার করাটা নিষিদ্ধ, তখন একসঙ্গে এক হুকায় ধূমপান করাও যে নিষিদ্ধ হইবে, তাহা ত খুব স্বাভাবিক। এটাও স্বাভাবিক যে, এই আহারের নিষেধটা যে ভূমির উপর স্থাপিত, ধূমপানের নিষেধটা সেই ভূমির উপর স্থাপিত হইবে না। তাই একপক্ষে, উভয় স্থলেই একই জাত বা উপজাতদিগের মধ্যে, সংমিশ্রণ বা ছোঁয়া-ছুঁয়ি বর্জ্জন করা হয়; পক্ষান্তরে, প্রথম স্থলটি অপেক্ষা দ্বিতীয়স্থলে, অর্থাৎ ধূমপানের স্থলে অনেক সময়েই এই নিয়ম উপেক্ষিত হইয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্ত—একই কল্কের ব্যবহার সাধারণের গ্রাহ্য করিতে হইলে হুকার নলিচাটা (যদি ধাতব হয়) সাধারণের ব্যবহারের জন্য না রাখিলেই যথেষ্ট। তথাপি, ইহাতেও ছোঁয়াছুঁয়ির খুব ভয়। কোন কোন প্রদেশে, সকলপ্রকার গোলযোগ এড়াইবার অভিপ্রায়ে,—যে-সকল হুকা মাঠে কিংবা কোন সম্মিলনের স্থানে রাখা হয়, উহা চিনিয়া লইবার জন্য, সেই-সকল হুকার নলিচায়, মুসলমানের জন্য নীল রংএর ন্যাকড়া, হিন্দুর জন্য লাল রংএর ন্যাকড়া, চামারের জন্য একটুকরা চামড়া, ঝাড়ুবর্দ্দারের জন্য একটা দড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হয় (১)। দেখা যাইতেছে, উহারা এই সম্বন্ধে ভাবী-সম্ভাবনা পর্য্যন্ত ভাবিয়া রাখে। যে-সকল জাতের ভিতর সকলেই সমান অস্পৃশ্য, তাহাদের মধ্যেও এই ভাবনাটা জাগরূক আছে।

যেমন অশুচিস্পর্শে খাদ্যসামগ্রী যাহাতে কলুষিত না হয় তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, সেইরূপ আবার খাদ্য-সামগ্রীর শুদ্ধাশুদ্ধতা অনুসারে কোন্‌টা নিষিদ্ধ ও কোন্‌টা সেব্য তাহা স্থির করা হয়। সকলেই জানে, গরুর প্রতি হিন্দুদের কতটা ভক্তি, এবং কাহাকে গোমাংস খাইতে দেখিলে তাহাদের কিরূপ ঘৃণা ও আতঙ্ক হয়। জীবের প্রতি দয়া—ইহা অতীতকালের সমগ্র ভারতের একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল; বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম এই ভাবটিকে শেষসীমায় লইয়া যায়। উক্ত দুই ধর্ম্মের ন্যায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত না হইলেও, এই ভাবটি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মধ্যেও বেশ অনুপ্রবিষ্ট। কি বৌদ্ধ কি হিন্দু উভয়ের মধ্যেই মদ্যপান কঠোররূপে নিন্দিত হইয়াছে; ইহার ব্যবহার মহা-পাতকের মধ্যে ধর্ত্তব্য। ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, কোন যুক্তি না থাকিলেও, কোন-কোন খাদ্য, প্রথা ও শাস্ত্র অনুসারে বিশেষরূপে নিন্দনীয়; যথা পেঁয়াজ, রসুন, "ব্যাঙের ছাতা"। তথাপি, স্থানীয় আচার ব্যবহারের মধ্যে পরস্পর-বিরোধ এত বেশী, একই গ্রন্থের বচনসমূহের মধ্যে এত গোলযোগ ও অস্পষ্টতা, বৈদেশিকদের দৃষ্টান্তে প্রাচীন আচার-ব্যবহারগুলি এত আঘাত পাইয়াছে, এবং আজও পাইতেছে যে, একজন সাবধানী বিবরণ-লেখক সাধারণভাবে কোন কথা প্রতিপাদন করিবার পূর্ব্বে, একটু ইতস্তত করিয়া থাকে। কে সাহস করিয়া একথা বলিবে যে, আজিকার দিনে,—যজ্ঞের মাংস ও শ্রাদ্ধভোজে প্রদত্ত

(১) Ibbetson.

শাস্ত্রানুমোদিত মাংস ব্যতিক্রম-স্থলের হিসাবে ধরিলেও,—ব্রাহ্মণেরা যতই কুলীন হউক না কেন, মাংসাহারে একেবারেই বিরত ?

আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি, "গাঁজাইয়া-তোলা" কোন পানীয়ের ব্যবহার এখনো উচ্চ ও নিম্ন জাতির মধ্যে ভেদের সীমা-চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হয়। কেমন করিয়া ঠিক জানা যাইবে, প্রত্যেক প্রদেশে এই নিয়ম কতটা প্রচলিত ?

আসল কথাটা এই—প্রত্যেক জাত অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তর্বিবাহ-মণ্ডলী এই সম্বন্ধে যে-সকল নিয়ম পালন করে তাহা একান্তপক্ষে নিশ্চল না হইলেও কতকটা বংশানুক্রমে সাধারণে প্রচলিত ; এবং ঐ-সকল নিয়ম যতদিন সাধারণভাবে বলবৎ থাকে, ততদিন লোকে উহা খুব আঁটাআঁটির সহিত পালন করিয়া থাকে। কখন কখন এই সম্বন্ধে এক-একটা বিশেষ নিয়মও দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন মনে কর,—পুণার অতীব অস্পৃশ্য "হালালখোর" জাতের লোকেরা, আহারের সম্বন্ধে কোন-প্রকার সঙ্কোচ না থাকিলেও খরগোসের মাংস খায় না। তাহার কারণ, উহারা বলে, উহাদের কুল-প্রতিষ্ঠাতা "লাল-বেগ", শশকীর স্তন্যে মানুষ হইয়াছিল। (২)

কোন কোন ব্রাহ্মণ মাংস খায়, কোন কোন ব্রাহ্মণ খায় না, কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা শূকর বা মুরগীর মাংস খায়—এই-সকল খুঁটিনাটি বিবরণ সম্বন্ধে—সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের বিশেষ কোন ঔৎসুক্য নাই। আমাদের শুধু এইটুকু প্রতিপাদন করা আবশ্যক যে, প্রত্যেক জাতের মধ্যে, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে,—আমাদের চোখে অদ্ভুত ঠেকিলেও—কতকগুলি বিধি নিষেধ আছে, এবং ঐ বিধি নিষেধের প্রামাণ্যগৌরব খুবই বেশী এবং উহার অপরাধ-দণ্ড কখন কখন, খুবই কঠোর। এবং এটাও ভাল করিয়া জানিয়া রাখিবে যে, মার্জ্জিত-রুচি-শ্রেণী-সুলভ ইহা শুধু একটু সূক্ষ্ম বাছ-বিচারের বিষয় নহে। কোন কোন স্থূল-রুচি অসভ্য আদিম জাতির লোকেরা নিঃসঙ্কোচে উপস্থিতমত' মৃত পশুর মাংস আহার করিবে, কিন্তু মৃত পশুর গলিত শব-মাংস অথবা কোন বিশেষ-বন্যপশু বা ঘৃণিত পশুর মাংস আহার করিবে না। এইরূপেই জাতের উপবিভাগের একটা গোড়া পত্তন হয়। যাহারা পচা মাংসাদি খায় তাহাদিগকে উহারা নিম্নতর জাতের লোক মনে করিয়া, উহাদের সহিত বিবাহের ব্যবহার সগর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করে। যে-জাতীয় তথ্যগুলি আমাদের নিকট প্রয়োজনীয় তাহা এই :—যে-সকল তথ্যে প্রদর্শিত হয় যে, জাতটা কতকগুলি আচার-ব্যবহারের সূত্রে আবদ্ধ, এবং ঐ-সকল আচার ব্যবহার জাতের চিরাগত গঠনপদ্ধতির একটা অংশমাত্র—একটা মূল-উপাদান মাত্র যাহার উপর জাতের ক্রিয়া প্রকটিত হয়, যাহার দ্বারা জাত নিজ প্রভুত্ব ও নিজ একতা বৈধরূপে প্রকাশ করে। আহারের বিষয়টা আমরা এই হিসাবেই দেখি।

যে-সকল বিভিন্ন ব্যবহার ও অনুষ্ঠান বিবাহের মত অমন একটা গুরুতর ব্যাপারের সহিত অনুস্যূত, এবং যাহা অনেক স্থলে, অন্তর্ব্বিবাহ ও বহির্ব্বিবাহের মূল-নিয়মগুলির সহিত সংযোজিত, তাহাও আমরা এই হিসাবে বিচার করিয়া থাকি।

অতীব জটিল অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারের খুঁটিনাটি বিবরণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা এস্থলে অসম্ভব। (৩)

আমি পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি, কতকগুলি জাত,—পিতৃগোত্র-ধারার খুব কঠোর বহির্বিবাহ-নিয়মের পাশাপাশি, মাতৃগোত্রধারার অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি আত্মীয়ের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনের অনুকূলে একটা অপূর্ব্ব প্রবণতা প্রকাশ করিয়া থাকে। (৪)

বহুবিবাহের দণ্ডস্বরূপ কেহ জাত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে এরূপ ঘটনা খুবই বিরল (৫)। "নিয়োগ" প্রথা অনুসারে পুত্র-সন্তানের অভাবে,—স্বামীর ভ্রাতা বা, তাঁহার অবর্ত্তমানে, একজন খুব নিকট আত্মীয়, স্বামীর মৃত্যুর পর, কিংবা তাঁর জীবদ্দশাতেই, উত্তরাধিকারী প্রদান করিবার জন্য, স্বামীর স্থান অধিকার করিয়া থাকে। এই প্রথাটা এরূপ বহুলব্যাপ্ত যে আশ্চর্য্য হইতে হয় ; এবং প্রাচীন সামাজিক পদ্ধতিতে,

(২) Poona Gazette.

(৩) নারায়ণ মণ্ডলিক একটা বিশেষ বর্ণনার মধ্যে কতকগুলি তথ্য একত্র করিয়াছেন। 'ব্যবহার-ময়ূখ"—পৃষ্ঠা ৩১৫।

(৪) Dubois—মণ্ডলিক।

(৫) মণ্ডলিক।

পুরুষ-উত্তরাধিকারী-পরম্পরায় গার্হস্থ্যধর্ম্মের ধারাবাহিকতা রক্ষণের যে একটা অপরিসীম মূল্য ছিল, এই প্রথা হইতে তাহারও বেশ পরিচয় পাওয়া যায় (৬)। ভারতের এই বহুপ্রাচীন প্রথাটি, (৭) আদিম অর্থ হইতে পথভ্রষ্ট হইয়া, ক্ষীণ আকারে ভারতে এখনো বর্ত্তিয়া আছে। এই প্রথা অনুসারে, স্বামীর মৃত্যুর পর, দেবরের সহিত বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ হইয়া থাকে। এই আচারেই অনেক জাতের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সচরাচর, উহাদের মধ্যে বিধবার দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ।

বিধবার সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের কি কড়াক্কড় নিয়ম তাহা আমাদের জানা আছে। সতীদাহ নিবারণের জন্য ইংরেজ সরকারের কিরূপ, কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহা স্মরণ হয়। স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত না করিলেও, যে প্রথা এইরূপ বলিদানের উৎসাহ দিয়াছিল, বিধবার পুনর্বিবাহের প্রতি সে প্রথার কখনই স্নেহদৃষ্টি থাকিতে পারে না। আদিম যুগ পর্য্যন্ত আরোহণ না করিলেও, এই নিষেধটি যে অতীব প্রাচীন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; সাহিত্যিক কিংবদন্তী হইতে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়; সমস্ত ভারতময় এই নিষেধের অসাধারণ আধিপত্য। ভারতের সর্ব্বত্রই যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ এই কথাই যথেষ্ট, ইহার উপর আর কথা নাই। উচ্চ বর্ণদিগের মধ্যে এই নিষেধটি সাধারণ (৮)। মনে হয়, ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টান্ত ও পরামর্শে, এই নিষেধটি আগ্রহের সহিত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া জাতের সামাজিক সমতল পরীক্ষার যেন একটা "পরশ-পাথর" হইয়া দাড়াইয়াছে; যে-সকল জাত এই নিষেধ পালন করে, লোকে তাহাদিগকেই শ্রদ্ধা করে। এই নিষেধ পালন না-করা-প্রযুক্তই, গোড়ায় যাহারা উচ্চজাত বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহারা পতিত হইয়াছে। (৯) খুব নীচ জাত উন্নীত হইবার ও হিন্দুসমাজের ভিতর একটা স্থান অধিকার করিবার এই নিষেধ-বিধিগ্রহণই একটা উপায়। ভাল ভাল বিচারকের মতে এই নিয়মটি বৈদিক না হইলেও, উৎপত্তির হিসাবে ব্রাহ্মণ্যিক (১০) এবং ইহা ক্রমশ বিস্তার লাভ করিয়াছে। সে যাহাই হোক্, ইহাও একটা জাতের নিয়ম; ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রত্যেক জাত, বহুপ্রাচীন কৌলিক প্রথা মনে করিয়া ইহার অনুসরণ করিয়া থাকে।

উহার সহিত কতকগুলি বিশেষ-আকার অনুবন্ধ। যেমন মনে কর—বিবাহবন্ধনচ্ছেদ;—ধর্ম্মানুরক্ত প্রকৃত হিন্দুর মতে ইহা বৈধ না হইলেও, অনেকগুলি নিকৃষ্ট জাতের মধ্যে, বিধবাবিবাহের সঙ্গে সঙ্গে, এই বিবাহভঙ্গের প্রথা দেখা যায়। (১১) ইহার বিপরীতে, যোগ্যকালের পূর্ব্বে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়া, সামাজিক শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। এ স্থলেও, জাতের চিরাগত প্রথা, সমাজের উপর যারপরনাই চাপ দিয়া থাকে। একজন হিন্দু, নৈপুণ্য সহকারে এই প্রথাটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জাতের অখণ্ডতা ঠিক রাখিবার ইহা একটা উপায় মাত্র। যে বয়সে যৌন-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, সে বয়সে ধর্ম্মভয় অপেক্ষা প্রবৃত্তির জোর বেশী হইবার আশঙ্কা থাকে। (১২) আর এক স্থলে, একটা প্রথায় জাতের স্বার্থ নিশ্চিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা সেই প্রথার উল্লেখ করিব;—উহা উল্লেখযোগ্য, বিস্তারের হিসাবে ততটা নয়, যতটা কিরূপ প্রবণতা উহার দ্বারা প্রকাশ পায় তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য।

শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে, কোন বিবাহার্থী পুরুষের পক্ষে, নিজ জাত ছাড়া আর কোন জাতের ভিতর, পাত্রী অন্বেষণ করা বৈধ নহে। তথাপি ইহাও নিশ্চিত, বহু বিবাহের সুযোগে, ব্যবহার-ক্ষেত্রে ইহার অনেক ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। বস্তুত যে আদিমকালের মনোভাবটি এখনো বিদ্যমান আছে, সেই মনোভাব-বশত কোন পুরুষ, যে রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাকে সহধর্ম্মিণী-রূপে নিজ পদবীতে উঠাইয়া লইয়া, নির্ব্বাচনের অধিকতর স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। ব্রাহ্মণিক মতবাদের অনুমোদিত

(৬) Hearn—"Aryan Household" দ্রষ্টব্য।

(৭) Henry Maine—Hindu Law and Usage. Grant—Central Prov. Gazeteer. Mandlik, Lyall, Berar Gazette. Risley—Ethno Gloss.

(৮) H. Maine.

(৯) Ibbetson Dubois Mandlik.

(১০) H. Sumner Maine—"Village Communitees."

(১১) H. Maine.—Mandlik.

(১২) J. Chandra Ghose—Calcutta Review

হইলেও, নীচ জাতের পুরুষের সহিত, উচ্চ জাতের রমণীর বিবাহে, সেই পুরুষের ভাবী বংশ এতদূর নীচে পতিত হয় যে, পত্নীর সহধর্ম্মিত্বও তাহা উল্টাইতে পারে না। কন্যাকে জাত্যংশে নিম্নতর বংশের সহিত বিবাহ না দেওয়া এবং—তদপেক্ষা আরো ভাল,—উহাকে উচ্চতর বংশীয়ের সহিত বিবাহ দেওয়া—ইহাই অনেক জাতির লক্ষণ-পরিচায়ক স্বাভাবিক মনোভাব ও মনের গতি। এই ভাবটি এতটা প্রবল ও শক্তিশালী যে উহা একটা স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে—"Hypergamy" অতিবিবাহ—অর্থাৎ রীতি-বহির্ভূত বিবাহ।

অনেক বিষয়ে উহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। (১৩) বিশেষতঃ কুলীন নামধেয় বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবহমানকাল পর্য্যন্ত উহার সুস্পষ্ট পরিণাম এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে যে, অন্তত ঐ জাতির সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে,—উহাই উহাদের পরিচায়ক লক্ষণ।

যাহাদের কৌলীন্য-মর্য্যাদা ততটা বেশী নাই, তাহারা ভাল কুলীনদের কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য লালায়িত;—এদিকে, একেবারে অকুলীন ব্রাহ্মণদের সহিত উচ্চশ্রেণীর কুলীন-কন্যার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। তাই কুলমর্য্যাদায় যাহারা অপেক্ষাকৃত হীন, উচ্চ কুলীনেরা তাহাদের ঘরে কন্যা দিলে পতিত হইবার বড় একটা আশঙ্কা থাকে না, অথচ উচ্চ কুলীনেরা সেই-সব ঘর সহজে পাইতে পারে। ইহারই ফলে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ-রূপ নিতান্ত একটা "সৃষ্টিছাড়া" ব্যাপার পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। (১৪) ইহার পরিণামে, নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে কত লোকে তাহার জন্য আক্ষেপও করিতেছে;—আর এ আক্ষেপ ন্যায্য আক্ষেপ।

আমি জাতের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দিক্‌টা এখনো ধরি নাই দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন। হিন্দু-সমাজের ন্যায় যে-সমাজের আদর্শ, মোটের উপর খুব আদিম ধরণের, সে সমাজে কোন তথ্যই, কোন কার্য্যই, ধর্ম্মের অপরিচিত নহে এবং ব্রাহ্মণ্যিক সভ্যতার বিশেষত্বই এই যে, ধর্ম্মের প্রেরণা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, সকল কর্ম্মই ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে-সকল উপাদান বিশেষরূপে ধর্ম্মঘটিত এবং যে-সকল উপাদান, ন্যূনাধিক দূরবর্ত্তী ধর্ম্মের প্রভাবাধীনে, সামাজিক গঠনপ্রণালী হইতে সমুত্থিত, এই উভয়ের ভেদনিরূপণ আমাদের বিশ্লেষণ-কার্য্যের ততটা অধিকারভুক্ত নহে।

আসলে জাত জিনিষটা নিজে ধর্ম্মের আলোকে প্রকাশ পায় না। সকল-প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসই প্রায় বিনা-বৈরীভাবে ও অবাধে জাতের সহিত আসিয়া মিলিত হয়। ধর্ম্মান্তরগ্রহণ করিলেও শুধু উহার দরুন জাতের অন্তর্ভূত কোন ব্যক্তির অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না (১৫)। এইরূপ মিশ্র জাত জৈন ও হিন্দু লইয়া গঠিত হইয়াছে। মত-বৈচিত্র্য কখনই বিবাহের প্রতিবন্ধক হয় না। বর্ণভেদ-প্রণালীর উপর, এমন কি ইসলাম ধর্ম্মও যে প্রভাব প্রকটিত করিতে পারিয়াছে, তাহাও বিলম্বিতভাবে ও পরোক্ষভাবে। বিরুদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা কতকগুলি শুদ্ধাচারের নিয়ম লঙ্ঘন বা খর্ব্ব করিবার দরুনই এ স্থলে জাত ভাঙ্গিয়াছে, কোন নূতন ধর্ম্মমতের দরুন নহে। যে-সকল পতিত ব্রাহ্মণ অনার্য্য জাতিদিগের পৌরোহিত্য করে, সেই ব্রাহ্মণদিগের মতবাদের সহিত ঐ অনার্য্যদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের ততটা মিল না থাকিলেও, ঐ অনার্য্যেরা জাতের নিয়ম রীতিমত পালন করে। (১৬) আমার মনে হয়, জাতের উপর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশের, ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের কোন প্রভাব নাই এ কথা বলা আর এখন চলে না; তবে প্রত্যক্ষ দেখা যায়, এইরূপ প্রভাব মোটের উপর কদাচিৎ প্রকটিত হয় এবং যাহা প্রকটিত হয় তাহাও অতীব ক্ষীণ।

বিবাহ অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনের ব্যাপার হইতে যে-সকল অবস্থা সমুত্থিত হয়, সেই-সকল অবস্থায় বিভিন্ন জাত প্রায়ই অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহাদের মধ্যে বহুকাল হইতে একটা প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের নিকট এই-সকল অনুষ্ঠান অতীব প্রিয়; ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত, ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত উহাদের পরোক্ষ সম্বন্ধ। এই-সকল অনুষ্ঠানের বর্ণনা বেশ একটু মশলাদার

(১৩) Nesfield, Ibbetson.

(১৪) Ward,—View of the history &c., of the Hindus —Mandlik.

(১৫) Ibbetson.

(১৬) Ibbetson.

হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে জাত-বস্তুটা কোন নূতন আলোক প্রাপ্ত হইবে না। বড় জোর, ঐ-সকল অনুষ্ঠানের নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য, আরও অন্যান্য নিদর্শনের ন্যায়, জাতকে পুনর্ব্বার আমাদের নিকট একটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ গঠনপ্রণালী-রূপেই প্রকাশ করিবে,—যাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের জালে পরিবৃত হইয়াও, বেশ স্বতন্ত্র; এবং এই-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে, জাতের নিজত্ব বরং কিয়ৎপরিমাণে পরিচিহ্নিত ও দৃঢ়ীকৃত হয়।

সকল জাতেরই ভিতর, ন্যূনাধিকপরিমাণে ছোটখাটো সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিধান সমন্বিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে; প্রত্যেক জাত সেই পদ্ধতি অনুসারে, স্বকীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই-সকল অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ হইতে, সকল দেশেই, মানবজাতির ক্রমোন্নতির ধাপ নির্ণীত হয়। তথাপি, এই-সমস্ত এক এক জাতের বিশেষ-অনুষ্ঠান, যাহার অস্তিত্ব অন্য জাতের ভিতর নাই এবং যাহার আদিম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তাৎপর্য্যার্থ সুনিশ্চিত,—ইহা আমাদের আবিষ্কার করিবার যোগ্য; এই আলোচনার পথে যাত্রা করিয়া আমরা শেষে ব্রাহ্মণিক শিক্ষাদীক্ষার সম্মুখে আসিয়া পড়িব। এক্ষণে, আমরা উপনয়নের কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

বিচারের হিসাবে (theory) সকল হিন্দুই দুই বড় পর্য্যায়ে বিভক্ত, যথা—শূদ্র ও দ্বিজ। দ্বিজ অর্থাৎ যাহার দুইবার জন্ম হইয়াছে। তিন উচ্চ বর্ণের সকল লোকই এই দ্বিজশ্রেণীর অন্তর্ভূত। (উচ্চ বর্ণের বিষয় পরে বলিতেছি)। এই তিন উচ্চবর্ণ, যাহারা উপনয়ন-দীক্ষার দ্বারা, উপবীত ধারণ করিয়া, একপ্রকার নব জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহারা সকলেই এই দ্বিজশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে যাহাই হউক, এক্ষণে এই তিন উচ্চ বর্ণের আর শাস্ত্রীয় অস্তিত্ব নাই। এখনো ভারতে অনেক লোক দেখা যায় যাহারা "কাঁধে-ঝোলানো চাপ্‌রাসের" মতো একটা সরুসুতার গোচ্ছা ধারণ করে। ইহা তিন-তিন ফের করিয়া বিহুনিকরা ৯টা সুতার গুচ্ছ। ইহা বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ উরুদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। উহারা ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান একটা উচ্চাধিকারের নিদর্শন বলিয়া মনে করে। ফলতঃ উহার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, উহারা বিধিমতে ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়াছে, বেদপাঠের অধিকার লাভ করিয়াছে, পূজার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সমর্থ হইয়াছে,—এক কথায় পুরাপুরী হিন্দু হইয়াছে বলিলেও চলে।

সচরাচর, ৭, ৮, বা ৯ বৎসরের কাছাকাছি এই উপনয়নদীক্ষা প্রদত্ত হয়। এই দীক্ষা পুরুষদের প্রতিই প্রযুজ্য। প্রাচীন পারিবারিক গঠন-ব্যবস্থার মধ্যে, প্রায়ই ন্যূনাধিক পরিমাণে "নাবালগের" অবস্থায় অবস্থিত নারী, বিবাহের পূর্ব্বে, পিতার অধীনে ব্রাহ্মণসমাজভুক্ত এবং বিবাহের পরে, শ্বশুরকুলের অধীনে স্বামীর সহধর্ম্মিণী। অতএব এই উপনয়ন-দীক্ষা একটা গুরুতর ব্যাপার। এই দীক্ষা-ব্যাপারটি কিয়ৎদিবস-ব্যাপী ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসবে পরিবৃত।

এই প্রথাটির প্রসার সম্বন্ধেই বিশেষরূপে আমাদের ঔৎসুক্য হয়। পুরাকালে যাহাই হউক, কিন্তু তখন হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার বর্ত্তমান অবস্থার খুব পরিবর্ত্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই। আজিকার দিনে এই দীক্ষা ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যেই ন্যায্যতঃ বদ্ধ থাকিবার কথা। কিন্তু অন্যশ্রেণীর লোকেরাও সামাজিক অভিমানের স্পর্দ্ধায় ইহাকে দখল করিয়া বসিয়াছে।

শুধু ব্রাহ্মণেরা নহে—পতিত ব্রাহ্মণেরাও, এবং যাহারা আপনাদিগকে প্রাচীন বৈশ্যশ্রেণীর উত্তরাধিকারী মনে করে, শুধু সেই বেণিয়ারা নহে, আরও নিম্নতরশ্রেণী কায়স্থরাও (১৭) উপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পঞ্জাবের এক নীচশ্রেণী "সোদে"রাও উপবীত ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহার দরুন উহাদের মাংসাহারে, সুরাপানে, বা বিধবা-বিবাহে বাধা হয় না। সাধারণতঃ এইরূপ অতিমাত্র আচার-শৈথিল্য ও উপবীত ধারণ,—এই দুইয়ের মধ্যে বিলক্ষণ অসংলগ্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে আরো অনেক অনিয়ম বা নিয়মের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইবে। একটা দৃষ্টান্ত—পঞ্জাবে "কনেট" নামক এক নিতান্ত নীচ জাতের মধ্যে, উহার এক বিভাগ উপবীত ধারণ করে, আর এক বিভাগ উপবীত ধারণ করে না। যেখানে-যেখানে এই প্রথাটি প্রচারিত হইয়াছে, সেইখানেই উহাকে খুব আঁটাআঁটি

(১৭) বিদেশী গ্রন্থকার এইস্থলে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন—অনুবাদক।

ভাবে বজায় রাখা হইয়াছে, উহা একটা মস্ত অধিকারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; এবং উহার নিয়ম-পালন-পক্ষে খুব কড়া নজর রাখা হইয়া থাকে।

এই-সমস্ত নিয়ম (প্রায়ই খুব খুঁটিনাটি রকমের) প্রত্যেক জাতের মুখাকৃতি অঙ্কিত করিয়া দেয়। প্রত্যেক জাতের মধ্যেই একটা সংহতির ভাব আছে - একটা ঐক্য-বোধ আছে, যাহাতে করিয়া সেই জাত বল ও স্থায়িত্ব লাভ করে। কখন-কখন এই ঐক্যবোধ একটা বিশেষ-পূজাপদ্ধতির আকার ধারণ করে; এবং সেই পূজা কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে কিংবা কোন পৌরাণিক মহাপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত হয়। লিপিকর কায়স্থ জাতির মধ্যে নরকের কেরানী—চিত্রগুপ্ত; ঝাড়ুবর্দ্দারদের মধ্যে 'লাল-গুরু", বা "লাল-বেগ"; কোন কোন ধীবরজাতির মধ্যে "রাজা কিদার" ইত্যাদি। তাছাড়া, কোন বিশেষ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা না থাকিলেও, সাধারণ হিন্দুদেবতাদের মধ্যে কোন এক দেবতার পূজার প্রতি বিশেষ-বিশেষ জাতের একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে যাহাকে পৈতৃক পূজা বলা যাইতে পারে, তাহার নিদর্শন অতীব বিরল বলিয়াই মনে হয়। এই তথ্যের উপর কেহ কেহ ধ্রুব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া ভুল করিয়াছেন। কারণ, যেখানেই আমরা তথ্যসকল একটু তন্নতন্নভাবে অবগত হইয়াছি, সেইখানেই দেখিতে পাই—প্রত্যেক জাতের মধ্যেই, স্বকীয় উৎপত্তি সম্বন্ধে, স্বকীয় স্থানান্তর যাত্রা সম্বন্ধে কতকগুলি স্মৃতি বা কাহিনী আছে; ঐ-সকল স্মৃতি বা কাহিনীর দ্বারা প্রকাশ পায় উহারা কোন এক বিশেষ বংশের লোক। এবং এই বংশসাম্য-বোধ হইতেই যে উহাদের একএকটা সাধারণ জাতিবাচক নামের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিলাতী লাঙ্গল

এমন এক সময় ভারতবর্ষের ছিল যখন প্রতিযোগিতার বিরাট ক্ষেত্রে তাহাকে আসিয়া দাঁড়াইতে হয় নাই, তখন নিজের গ্রামের এবং চারিপাশের গ্রামগুলির অন্ন সরবরাহ করিতে পারিলেই লোকে যথেষ্ট মনে করিত; তাহার বেশী শস্য উৎপাদন করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা বা আন্তরিক আগ্রহ তখনকার মানুষের ছিল না, সুতরাং পাশ্চাত্য জগতে কৃষিবিদ্যা যেরূপ উচ্চ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইয়াও তাহার কণা মাত্র করিতে পারে নাই। প্রকৃতই ইউরোপ আমেরিকায় যে-রকম বিচিত্র কৃষি-যন্ত্রের উদ্ভাবনা হইয়াছে ও প্রতিদিন হইতেছে তাহারই পার্শ্বে আমাদের মামুলি কৃষি-যন্ত্রাদি নিতান্তই হাস্যকর। ইউরোপের লোকের বিশ্বাস ভারতবর্ষের জমির উর্ব্বরতাই ভারতবর্ষের কৃষির একমাত্র শত্রু। সত্য-সত্যই এত অল্প চেষ্টায় এত সামান্য মূলধনে এ-রকম প্রচুর শস্য পৃথিবীর আর কোন দেশে জন্মায় কিনা সন্দেহ; কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর চলিবে না, পাশ্চাত্যের প্রতি-যোগিতায় দাঁড়াইবার সুযোগ আমাদেরই বরং বেশী। শুধু প্রতিযোগিতা নয়, এই কথা সর্ব্বদা এবং প্রথমেই মনে করা উচিত যে আমাদের দেশে শতকরা ৭২ জনেরও বেশী লোক প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কৃষির উপর নির্ভর করে।

ইউরোপ আমেরিকায় জমি চষিবার জন্য অনেক-প্রকার লাঙ্গল বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে একপ্রকার লাঙ্গল ভারতবর্ষের সাধারণ জমির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও কার্য্যকর। সেই বিষয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইংরেজীতে এই লাঙ্গলের নাম Rajah Plough বা Punjab Plough, বাঙ্গালায় ইহাকে বিলাতী লাঙ্গল বলিলে বিশেষ কিছু ভুল হয় না। আমাদের পুরাতন দেশী লাঙ্গল হইতে ইহার প্রধান প্রভেদ এই যে ইহাতে দেশী লাঙ্গলের অপেক্ষা ঢের বেশী চওড়া ও গভীর চাষ হয় এবং মাটীর চাকলাগুলি (furrow slices) আপনাআপনিই উল্টাইয়া যায়। ফালের (share) সম্মুখে যে ছোট চাকা আছে তাহাকে উঠাইয়া নামাইয়া নালীগুলিকে (furrows)

ইচ্ছামত গভীর অগভীর করা যায়; লাঙ্গলের সম্মুখের অগ্রভাগের Briddle নামক অংশের সাহায্যে নালীগুলি চওড়ায় প্রয়োজনানুযায়ী বাড়ান কমান যায়। দেশী লাঙ্গলে চাষ দিবার সময়ে লাঙ্গলটাকে হাত দিয়া মাটির উপর চাপিয়া ধরিলে নালীগুলি অপেক্ষাকৃত গভীর হয়; কিন্তু বিলাতী লাঙ্গলে সেরূপ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না, বরং দেশী লাঙ্গলের ন্যায় চাপ দিলে ফাল উঠিয়া পড়ে এবং নালীর গভীরতা কমিয়া যায়; বিলাতী লাঙ্গলে চাষ দিবার সময় হাতল দুটা ভাল করিয়া ধরিয়া থাকিলেই ঠিক চাষ হয়।
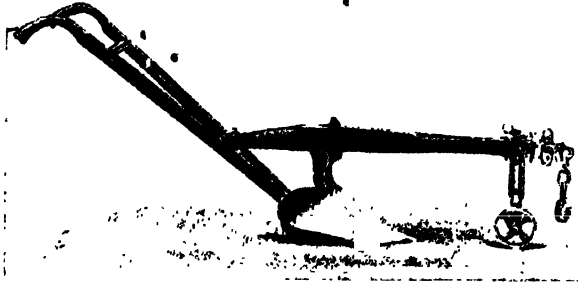
বিলাতী লাঙ্গল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিলাতী লাঙ্গলে মাটী আপনাআপনিই উল্টাইয়া যায়। জমি আলগা করাই শুধু চাসের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, জমির উর্ব্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করাও চাষের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। নীচের মাটী উপরে আসিলে হাওয়া আলোর সংস্পর্শে উর্ব্বর হইয়া উঠে (weathering); নীচের মাটীর অপেক্ষা উপরের মাটীর উর্ব্বরতা বেশী, সুতরাং উপরের মাটী নীচে যাইলে গাছের শিকড় বেশী করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে, অতএব মাটী উল্টাইয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমাদের দেশী লাঙ্গল নালী কাটিয়া জমি শুধু আলগা করিয়া দেয়, বিলাতী লাঙ্গলের ন্যায় মাটী উল্টাইয়া দিতে পারে না।

জমিতে যখন কোন সার প্রয়োগ করা হয় তখন সেটাকে মাটীর সঙ্গে ভাল করিয়া মিশাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ মাটীর উপরে পড়িয়া থাকিলে সূর্য্যের উত্তাপে সারের প্রধান এবং মূল্যবান উপকরণ নাইট্রোজেন্ নষ্ট হইয়া যায়; জমিতে যখন সব্জী-সার (green manure) দেওয়া হয় তখন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মাটী-চাপা দেওয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এইসব কার্য্যের পক্ষে বিলাতী লাঙ্গল যেমন বিশেষ উপযোগী দেশী লাঙ্গল তাহার তুলনায় কিছুই নয়।

কার্য্যের পরিমাণ হিসাব করিলেও একই সময়ে বিলাতী লাঙ্গল দেশী লাঙ্গলের অপেক্ষা ঢের বেশী চাষ করে। সাধারণ জমিতে দেশী লাঙ্গল খুব বেশী ত ৪ ইঞ্চি গভীর নালী কাটিতে পারে, ঐ নালী উপরে প্রায় ৫ ইঞ্চি ও নীচে ১ ইঞ্চি চওড়া; সুতরাং ঐ-সকল নালী গড়ে ৩ ইঞ্চি চওড়া এবং Sectionএ ১২ বর্গ ইঞ্চি। অতএব দেশী লাঙ্গল এক বিঘা জমি চাষ করিতে প্রায় ১৮০ ঘন গজ জমি নাড়িয়া দেয়। এই মাত্র বলিয়াছি দেশী লাঙ্গলের নালী উপরে প্রায় ৫ ইঞ্চি চওড়া, সুতরাং এক বিঘা জমি চাষ করিতে বলদকে প্রায় ৬॥০ মাইল হাঁটিতে হয় এবং ৬॥০ মাইল হাঁটিতে ৪ ঘণ্টার উপর সময় লাগে। দেশী লাঙ্গলে জমি চলন-সই করিয়া তৈয়ারী করিতে হইলে অন্ততঃ তিনবার চাষ দিতে হয়, সুতরাং বলদের প্রায় ২০ মাইল হাঁটা উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ দেশী লাঙ্গলে চাষ দিবার সময়ে নালীর মধ্যে মধ্যে কিছু-না-কিছু জমি অ-চষা পড়িয়া থাকে, সুতরাং বলদকে কার্য্যতঃ প্রায় ১৪ মাইল হাঁটিতে হয়; এই ১৪ মাইল হাঁটিতে অন্ততঃ একদিন সময় লাগে। অতএব দেখা যাইতেছে দেশী লাঙ্গল একদিনে খুব বেশী এক বিঘা জমি তৈয়ারী করিতে পারে।

অপর পক্ষে বিলাতী লাঙ্গল অনায়াসে ৭ ইঞ্চি চওড়া ও ৫ ইঞ্চি গভীর নালী কাটিতে পারে। উপরোক্ত ভাবে হিসাব করিলে এক বিঘা জমি চসিতে বিলাতী লাঙ্গল প্রায় ২২৪ ঘন গজ জমি নাড়িয়া দেয়। বিলাতী লাঙ্গলে এক বিঘা জমি চাষ করিতে বলদকে প্রায় ৪॥০ মাইল হাঁটিতে হয় এবং ৪॥০ মাইল হাঁটিতে ২॥০ ঘণ্টা সময় লাগা উচিত, কিন্তু বিলাতী লাঙ্গল ফিরাইতে কিছু সময় নষ্ট হয়, সুতরাং এই ৪॥০ মাইল হাঁটিতে ৩ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগে। অতএব বিলাতী লাঙ্গল একদিনে প্রায় ১॥০ বিঘা জমী চাষ করিতে পারে।

দুই প্রকার লাঙ্গলে কিরূপ খরচ পড়ে এইবার তাহাই দেখা যাক।

একটি বিলাতী লাঙ্গলের দাম ২৫৲ টাকা, বাৎসরিক

১২৲ টাকা হিসাবে সুদ ধরিলে এক বৎসরে ২৫৲ টাকার সুদ ৩৲ টাকা। এই সুদ চাষের খরচের মধ্যে গণ্য। সাধারণতঃ শুষ্ক জমীতে বৎসরে দুই মাস অর্থাৎ ৬০ দিন জমি চষার কাজ চলে, সুতরাং একদিনে লাঙ্গলের দামের সুদ ১০ পাই। বিলাতী লাঙ্গল ভারী বলিয়া ইহার জন্য অপেক্ষাকৃত বড় ও বলিষ্ঠ বলদের প্রয়োজন হয়, সে-প্রকার একজোড়া ভাল বলদের দাম খুব বেশী ২০০৲ টাকা; বাৎসরিক ১২৲ টাকা হিসাবে ইহার সুদ ২৪৲ টাকা। বলদের দ্বারা প্রায় সারা বৎসরই কাজ পাওয়া যায়, সুতরাং বলদের দামের দৈনিক সুদ ১ আনা ১ পাই। বৎসরে খুব বেশী ২৲ টাকা লাঙ্গল মেরামতের খরচ পড়ে, সুতরাং দৈনিক খরচ ৬ পাই। একটা বিলাতী লাঙ্গল দশ বছর পরে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সুতরাং দশ বছরে ২৫৲ টাকার বাৎসরিক ক্ষয় (wear & tear) ২॥০ টাকা এবং দৈনিক ক্ষয় ৮ পাই, এইরূপে বলদের দৈনিক ক্ষয় ১ আনা। বিহারে একটি "হারুয়া"র (ploughman) দৈনিক মজুরী ৩ আনা, এবং একজোড়া বলদের দৈনিক খাদ্যের খরচ ৬ আনা:—

	টাকা	আনা	পাই
বিলাতী লাঙ্গলের দামের দৈনিক সুদ	০	০	১০
একজোড়া বলদের " " "	০	১	১
লাঙ্গল মেরামতের দৈনিক খরচ	০	০	৬
বিলাতী লাঙ্গলের দৈনিক ক্ষয়	০	০	৮
একজোড়া বলদের " "	০	১	০
"হারুয়া"র দৈনিক মজুরী	০	৩	০
একজোড়া বলদের দৈনিক খাদ্য	০	৬	০
মোট—	০	১৩	১

দেশী লাঙ্গলের দামের দৈনিক সুদ, দৈনিক ক্ষয় এবং মেরামতের দৈনিক খরচ অত্যন্ত সামান্য, তাহাদের পৃথক গণনার মধ্যে আনা যায় না। দেশী লাঙ্গলের উপযোগী একজোড়া বলদের দাম ৫০৲ টাকা হইতে ১০০৲। যে প্রকারই বলদ হোকনা কেন তাহাদের আহারের পরিমাণ একই, দৈনিক ৫ আনার খাদ্য তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। একজন "হারুয়া"র দৈনিক মজুরী বিলাতী লাঙ্গলের ন্যায় ৩ আনা। সুতরাং দেশী লাঙ্গলের দৈনিক খরচ ৯ আনা; পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি বিলাতী লাঙ্গল একদিনে ২॥০ বিঘা জমি চষিতে পারে, এবং তাহার দৈনিক খরচ ১৩ আনা ১ পাই। সুতরাং এক বিঘা জমি চাষ করিতে বিলাতী লাঙ্গলে প্রায় ৫ আনা ৩ পাই খরচ পড়ে। আগেই দেখান হইয়াছে এক বিঘা জমি চষিতে দেশী লাঙ্গল ১৮৩ এবং বিলাতী লাঙ্গল ২২৪ ঘন গজ জমি নাড়িয়া দেয়, সুতরাং দেশী লাঙ্গলের হিসাবে বিলাতী লাঙ্গলে খরচ পড়ে ৪ আনা ৩ পাই। সাধারণতঃ বিলাতী লাঙ্গলে একবার লম্বাভাবে চাষ দিয়া দেশী লাঙ্গলে একটা চওড়া চাষ (cross ploughing) দিলেই জমি তৈয়ারী হইয়া যায়, সুতরাং বিলাতী লাঙ্গলে একবিঘা জমি তৈয়ারী করিতে সর্ব্বসুদ্ধ খরচ পড়ে ৪ আনা ৩ পাই+৩ আনা=৭আনা ৩ পাই, দেশী লাঙ্গলে অন্ততঃ তিনটা চাষ না দিলে জমিতে বীজ বোনা যায় না এবং পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি তিনটা চাষে দেশী লাঙ্গলে মোট খরচ হয় ৯ আনা। অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে যে খরচে দেশী লাঙ্গলে ১ বিঘা জমি তৈয়ারী হয় ঠিক সেই খরচে বিলাতী লাঙ্গল ১¼ বিঘা জমী তৈয়ারী করিতে পারে। যদিও বাহির হইতে দেখিলে বিলাতী লাঙ্গলের দাম ২৫৲ টাকা এবং তাহার উপযোগী একজোড়া বলদের দাম ২০০৲ টাকা এই দু'টাই চক্ষে পড়ে, কিন্তু প্রকৃতই বিলাতী লাঙ্গল দেশী লাঙ্গলের অপেক্ষা ঢের সস্তা। তথাপি অনেকে সন্দিগ্ধচিত্তে বলিবেন ইহা কাগজে কলমের হিসাব, কার্য্যতঃ বিলাতী লাঙ্গল দেশী লাঙ্গলের অপেক্ষা লাভজনক না হইতেও পারে। আচ্ছা, আমরা নিজের হাতে যাহা করিয়াছি তাহারই একটা উদাহরণ দিতেছি। ১৯১৩ সালের শীতকালে সাবোর কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্রে (Agricultural Experimental Station—Sabour) দেশী ও বিলাতী লাঙ্গলে পৃথক পৃথক জমি তৈয়ারী করিবার পর এক পশলা ভারী বৃষ্টি হইয়াছিল, সুতরাং আর একটা চাষ বেশী দিতে হইয়াছিল এবং ফলতঃ খরচ সাধারণ খরচের অপেক্ষা কিছু বেশী পড়িয়াছিল, তথাপি সে খরচ দেশী লাঙ্গলের খরচের অপেক্ষা কম।—*

* Report on the Agricultural Stations in Behar and Orissa year 1913—'14.

প্রত্যেক জমি-খণ্ডের পরিমাণ ১½ বিঘা (½ acre).

জমি-খণ্ডের নম্বর	লাঙ্গল	চাষের খরচ	জমি আলগা করিবার খরচ	মই দিবার খরচ	শস্য আছড়াইবার খরচ	অন্য খরচ	মোট খরচ	শরিষার শস্য-পাউণ্ড	৬ টাকায় ৮০ পাউণ্ড হিসাবে শস্যের দাম	৪½ বিঘার লাভ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		টা-আ-পা	টা-আ-পা	টা-আ-পা	টা-আ-পা	টা-আ-পা	টা-আ-পা	পাউণ্ড	টা-আ-পা	টা-আ-পা
B. D. E.	বিলাতী	১—৭—৭ (৩ চাষ)	০—৯—৮	০—১—১০	০—১০—৩	০—৭—৪	৪—৪—৮	২৫২ ২৪৬ ২৩৬	৫৫—০—১০	৫০—১২—২
A. C. F.	দেশী	২—০—৬ (৫ চাষ)	০—৪—৯	০—২—৩	০—৫—৭	১—৭—৪	৪—৪—১১	১৫২ ২০২ ১৬২	৩৭—১১—২	৩৪—৬—৩

এমন অনেক কাজ আছে যাহার পক্ষে দেশী লাঙ্গল খুব উপকারী।—শক্ত আঁট জমিতে প্রথম চাষ দিতে (opening), চওড়া চাষ দিতে (cross-ploughing), শস্যের সারির মধ্যে মধ্যে চাষ দিতে (inter-culture), ধানক্ষেতে কাদা চাষ দিতে (puddling), মাটী গুঁড়া করিতে প্রভৃতি কাজে দেশী লাঙ্গলের সঙ্গে বিলাতী লাঙ্গলের তুলনা হয় না।—এই-সব কাজের জন্য বিলাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যন্ত্র আছে। কিন্তু সাধারণ চাষের পক্ষে বিলাতী লাঙ্গল যে খুব কার্য্যকর এবং সস্তা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এমন অনেক শস্য আছে যাহাদের "বেলি" (ridge) করিয়া বুনিতে হয়—যথা আলু, রবিভুট্টা ইত্যাদি। এই-সব কাজ বিলাতী লাঙ্গলের দ্বারা যে কত সস্তায় এবং কত শীঘ্র হয় তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। আমাদের দেশে চাষারা কোদাল দিয়া "বেলি" তৈয়ারী করে, তাহাতে যেরূপ সময় লাগে সেইরূপ খরচও হয়। সাবোর কৃষিক্ষেত্রে ১৯১৩ সালের পরীক্ষায় দেশী উপায়ে আলু বুনিতে দেড়-বিঘায় মোট খরচ হইয়াছিল ১২২ টাকা ৫৪ আনা ৬ পাই এবং বিলাতী লাঙ্গলে আলু বুনিতে খরচ হইয়াছিল ৯৭ টাকা ৮ আনা। বিলাতী লাঙ্গলে কিরূপ "বেলি" তৈয়ারী করা যাইতে পারে আমরা এখানে তাহার নমুনার একটা ছবি দিলাম; একজন সম্পূর্ণ অশিক্ষিত দৈনিক ৩ আনার মজুরের দ্বারা এইরূপ "বেলি" হইয়াছিল, ভাল শিক্ষিত মজুরের দ্বারা ইহা অপেক্ষা ঢের ভাল "বেলি" হইতে পারে।

কোনও কৃষিক্ষেত্রে কেবল দেশী লাঙ্গল বা কেবল বিলাতী লাঙ্গল না কিনিয়া কার্য্যের পরিমাণানুসারে দুই-প্রকার লাঙ্গল মিলাইয়া কিনিলে চাষের সকল-প্রকার কাজই ভাল করিয়া সম্পন্ন হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক ১০ বিঘায় একটি দেশী লাঙ্গল এবং প্রত্যেক ২৫ বিঘায় একটি বিলাতী লাঙ্গল কিনিলেই যথেষ্ট।

বিলাতী লাঙ্গলের উপকারিতার বিষয়ে কোনও অভিযোগ কখনও শুনা যায় না, ইহার দাম এবং ইহার উপযুক্ত বলদের দাম লইয়াই অনেক-প্রকার আপত্তি উঠে। অনেকে বলেন দরিদ্র অনাহারী কৃষকদের পক্ষে একসঙ্গে এতগুলি টাকার সংস্থান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এক সময় ছিল বটে যখন রক্তশোষী মহাজনদের আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন কৃষকদের অর্থ সংগ্রহের অন্য কোন উপায় ছিল না এবং মহাজনদের আশ্রয় লওয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হওয়ারই রূপান্তর মাত্র। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। যৌথ-ঋণদান সমিতির (cooperative credit society) দ্বারা সর্ব্বত্রই কৃষকদের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই সদাশয় রেজিষ্ট্রারদের

বিলাতী লাঙ্গলে তৈয়ারী "বেলি" (ridge)।

(Registrar) চেষ্টায় যত্নে এবং সহানুভূতিতে অর্থহীন কৃষকদের অনেক প্রকার সুবিধা হইয়াছে ও প্রতিদিন হইতেছে। ন্যায্য এবং সামান্য সুদে টাকা সংগ্রহ করা কৃষকদের পক্ষে এখন একটুও দুরূহ নয়। অর্থের অভাবের অপেক্ষা আরও বড় একটা অভাব আমাদের কৃষকদের আছে—নূতনকে গ্রহণ করিবার শক্তির অভাব!

কৃষিকলেজ, সাবোর,
ভাগলপুর।

শ্রীনির্ম্মল দেব।

পিকিঙের নানা মহল্লায়

পিকিঙে তিব্বতী ও মোগল প্রভাব

এই দুই দিন অসহ্য গরম পড়িয়াছে। দিবাভাগের ৭।৮ ঘণ্টা ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকাও অসম্ভব। মাথা ধরিতেছে। হনলুলুতেও এইরূপ হইয়াছিল।

আজ হঠাৎ আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারায় বৃষ্টি। বাহিরে যাওয়া অসাধ্য। বিকালে বাহির হইলাম। পথে রিক্‌শ চালানও কষ্টকর। কাদা এত বেশী। ভারতীয় পল্লীগ্রামে গরুর গাড়ীর চাকা কর্দ্দমাক্ত পথে যেভাবে চলে পিকিঙের বড় রাজপথেও রিক্‌শ সেইভাবে চলিতেছে। সঙ্কীর্ণ গলিসমূহের অবস্থা ত বর্ণনাতীত। সহরের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরপ্রান্তে পৌঁছিলাম। তাহার পর এক বিশাল ফটক অতিক্রম করিয়া পিকিঙের বহির্ভাগে আসিলাম। বলা বাহুল্য এখানে জলকাদা উভয়েরই সমাবেশ। কোথাও ডোবার জল ভাঙ্গিয়া, কোথাও কাদায় হাঁটু ডুবাইয়া কুলীরা রিক্‌শ চালাইতে লাগিল। বর্ষাকালে যাঁহারা গরুর গাড়ীতে মোসাফের হইয়াছেন তাঁহারা এই দৃশ্য বুঝিতে পারিবেন। চীনের বর্ষাদৃশ্য দেখিতে দেখিতে জনপ্রাণীহীন প্রকাণ্ড মাঠের উপর আসিয়া পড়িলাম।

দোভাষী বলিলেন—"পিকিঙে প্রথম রাজধানী মোগল আমলে স্থাপিত হয়। আমরা কুবলা খাঁ স্থাপিত প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ দেখিতে চলিতেছি। সে ৭০০ বৎসরের কথা। মোগলদের পরে মিঙ্‌বংশীয় সম্রাটগণ দক্ষিণদিকে রাজধানী সরাইয়াছেন। সেইখানেই মাঞ্চুরাও রাজত্ব করিতেন। আজকালকার রাজনগর মিঙদের স্থাপিত।" মোগলেরা অবসন্ন হইলে তাঁহাদের প্রাসাদ মন্দিরে পরিণত হয়। মিঙেরা এই কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে মন্দির মাত্র দেখিতে পাইতেছি। মোগল্ আমলের রাজধানীর চারিদিকে মৃত্তিকাপ্রাচীর ছিল—তাহার পরিধি ১৮ মাইল।

লোকেরা এই স্থানে Yellow Temple দেখিতে আসে। সৌধের ছাদ পীতবর্ণ ইনামেল টালিতে নির্ম্মিত। এইজন্য নাম পীত মন্দির। মোগল আমলে পীতমন্দির রাজদরবার ছিল। এই গৃহের অলঙ্কারগুলি অন্যান্য চীনা সৌধের অলঙ্কারের অনুরূপ নয়। মিঙ ও মাঞ্চু যুগের অট্টালিকায় ড্রেগন, ফিনিক্স ইত্যাদির প্রাধান্য দেখিতে পাই—নক্‌সা, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিও বিভিন্ন। পীতমন্দিরের প্রাচীরে, কড়িবর্গায় কার্ণিশে ভারতীয় নক্‌সার মত কারুকার্য্য দেখা গেল। সমস্ত মেজে মর্ম্মর বাঁধান। গৃহ এক্ষণে নিতান্ত জীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন সম্পদের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের দালাই-লামা পিকিঙে আসিয়াছিলেন। তিনি এই পীতমন্দিরে বাস করিতেন। দালাই-লামা চীনা বৌদ্ধসমাজে Living Buddha বা বুদ্ধাবতার নামে পূজা প্রাপ্ত হন। কাজেই দালাই-লামার স্বভূমি তিব্বত চীনাদের নিকট স্বর্গস্বরূপ। সেইরূপ ভারতবর্ষকে জাপানীরা তেন্‌জিকু বা স্বর্গ বলিয়া জানে।

সেদিন মাঞ্চুসম্রাট-স্থাপিত লামামন্দিরে তিব্বতী ভাষা ও পুরোহিতগণের প্রভাব দেখিয়াছি। আজও তিব্বত হইতে নিয়মিতরূপে সন্ন্যাসীর দল আসিয়া এই মঠে বাস করিয়া থাকে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লাসা হইতে দালাই-লামা পিকিঙ পরিদর্শনে আসেন, তখন তিনি এই মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। মোগল জাতীয় পুরোহিতগণের কর্ত্তাও তিব্বতের দালাই-লামা। একদল পুরোহিত তিব্বতী শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন।

মাঞ্চু আমলে তিব্বতের প্রভাব পিকিঙে বেশী দেখিতে পাই। মাঞ্চুরা পিকিঙে সম্রাট হইবার পূর্ব্বেই দালাই-লামার ভক্ত ছিলেন। মুকডেনেও তাঁহারা তিব্বত হইতে লামাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। তিব্বতী বৌদ্ধ পুরোহিতগণের পদধূলিতে মুকডেনকে পবিত্র করা হইত। মুকডেনে লামা-প্যাগোডা আজ জীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে।

দালাই লামার প্রস্তর-স্তূপ।

ভারতীয় বুদ্ধের অবতারস্বরূপ তিব্বতী দালাই-লামা পীতমন্দিরে অবস্থানকালে বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বুদ্ধাবতারের সমাধিস্তম্ভের জন্য মাঞ্চুসম্রাট একটি সুরম্য মর্ম্মর প্যাগোডা নির্ম্মাণ
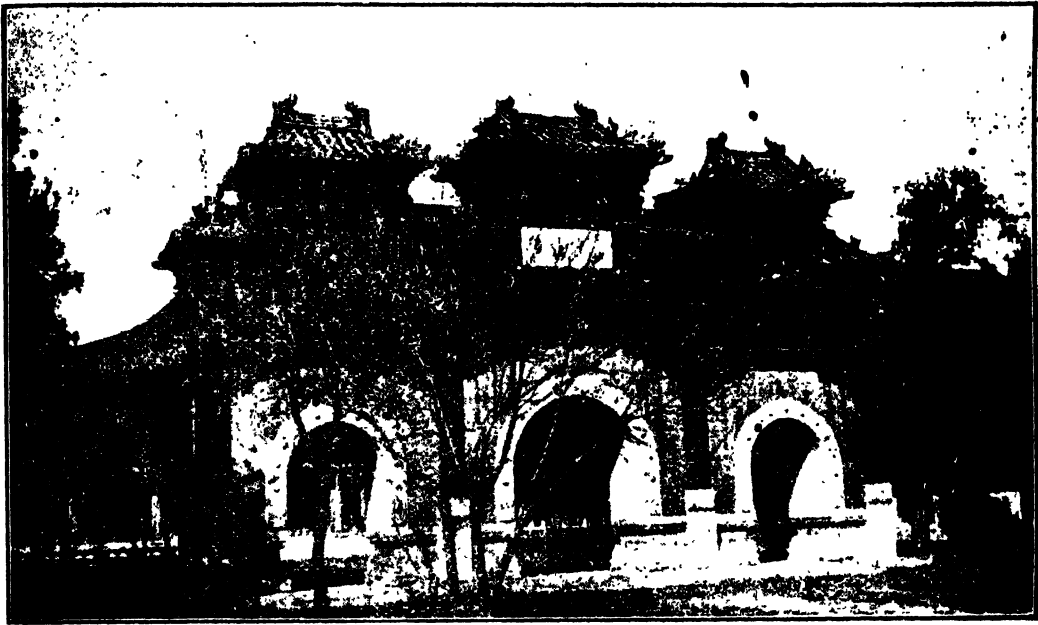
সাহিত্য-ভবনের খিলান-ফটক।

করান। পীতমন্দিরের পার্শ্বেই এই স্তূপ অবস্থিত। পিকিঙের ভিতরে বা বাহিরে বোধ হয় এরূপ সুন্দর কারুকার্য্যসমন্বিত বাস্তুশিল্পের নিদর্শন আর নাই। স্তূপের নিম্নভাগ অষ্টভুজ উপরিভাগ গোলাকার—উচ্চতম অংশ সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে। শিরোদেশে সোনালি পিত্তলের আবরণ। চারিকোণে চারিটা স্তম্ভ।

ভারতীয় স্তূপসমূহ যেরূপ নানাপ্রকার চিত্রে ও খোদাই কার্য্যে পরিপূর্ণ, পিকিঙের এই মর্ম্মরস্তূপও সেইরূপ। বুদ্ধদেবের বিভিন্ন মূর্ত্তি, দিক্‌পাল ইত্যাদি প্যাগোডায় এবং স্তম্ভসমূহে খোদিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ড্রেগন এবং ফিনিক্‌সের নক্‌সা ত আছেই। পীতমন্দিরে যে ধরণের অলঙ্কার দেখিতে পাই এই স্তূপে সেই ধরণের অলঙ্কার নাই। ইহা খাঁটি চীনা বা মাঞ্চু রীতিতে গঠিত। চীনসাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশ য়ুন্নান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মর্ম্মরপ্রস্তর আনীত হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি।

মাঞ্চুরা তিব্বতী লামাকে স্বয়ং বুদ্ধদেবের মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। স্তূপের গায়ে নানাপ্রকার খোদাই কার্য্য দেখিয়া এইরূপই বিশ্বাস হয়। আমরা বুদ্ধজীবনের নানা কথা চিত্রে, খোদাই কার্য্যে স্তূপগাত্রে দেখিয়া থাকি। অবিকল সেই ধরনের জন্মবৃত্তান্ত, শিক্ষাবৃত্তান্ত, কর্ম্মবৃত্তান্ত, ব্যাধিবৃত্তান্ত, মৃত্যুবৃত্তান্ত, দালাই-লামা সম্বন্ধে মর্ম্মরস্তূপের গাত্রে খোদিত রহিয়াছে। ভারতীয় স্তূপে এবং পিকিঙের এই প্যাগোডায় দর্শকমাত্রেই সাদৃশ্য বুঝিতে পারিবেন।

এক স্থানে দেখিলাম দালাই-লামা বৃক্ষ হইতে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার ধ্যান, উপাসনা এবং বৈরাগ্যের দৃশ্যও কল্পিত হইয়াছে। পিকিঙে উপস্থিত হইলে মাঞ্চুসম্রাট তাঁহাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন তাহাও বুঝিতে পারি। তাহার পর রোগশয্যার চিত্র, চিকিৎসকের আগমন, শিষ্যগণের প্রার্থনা ইত্যাদিও বিবৃত রহিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত যখন মৃত্যু হইল তখনকার দৃশ্যে জীবজন্তুর ক্রন্দনও দেখান হইয়াছে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-চিত্রেও এইরূপই দেখিতে পাই। একটা দৃশ্যে দেখা গেল সকলেই কাঁদিতেছে—কেবলমাত্র একজন সুখী। কারণ সে বুঝিল যে দালাই স্বর্গে যাইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি পরে দালাইয়ের পদে অধিষ্ঠিত হন।

মূর্ত্তিগুলির কল্পনা এবং গঠন অতি সুন্দর। উচ্চতম স্থাপত্যকার্য্যের নিদর্শন বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের কথা প্রায় প্রত্যেক মূর্ত্তিই ভগ্ন দেখিলাম। দোভাষী বলিলেন—

"১৯০০ খৃষ্টাব্দের বক্‌সার-বিদ্রোহের সময়ে জাপানীরা এই বর্ব্বরোচিত কার্য্য করিয়াছে। তাহারা এই মন্দির দখল করিয়াছিল।"

শুনিলাম পিকিঙের এই কেন্দ্রে সোনালি পিত্তলের বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি হয়। এখান হইতে মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বতে এই সমুদয় রপ্তানি হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ মন্দিরে নানা তিথিতে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে লামা পুরোহিতগণ মুখোস পরিয়া নাচগান করিয়া থাকে। বলদ, হরিণ, ভূত প্রেত, দৈত্য দানব ইত্যাদি নানা বেশে লামাদিগকে দেখা যায়। কোন কোন উৎসবে এই-প্রকার নাচ গানের দ্বারা Evil Spirits বা সয়তানের অনুচরবর্গকে বিতাড়িত করা হইয়া থাকে।

চীনা বাসনের কাজ।

মুসলমান হোটেলে রুটি তরকারি আহার করিয়া রাত্রিকালে একটা চীনা থিয়েটারে গেলাম। মুকডেনে যেরূপ দেখিয়াছি পিকিঙেও নাট্যাভিনয় সেইরূপই। দর্শকেরা যথাস্থানে বসিয়া ফলমূল চা কাফি ইত্যাদি আহার করিতেছে। হট্টগোল যথেষ্ট। জাপানী থিয়েটারে এবং "নো" মণ্ডপে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ সংযত।

কুব্‌লা খাঁর প্রবর্ত্তিত মোগল রাজধানীর প্রাসাদ পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। সেই আমলের কোন অট্টালিকা আজকাল আর দেখা যায় না। কেবল মাত্র ঢাক-গৃহ এবং ঘণ্টা-মন্দির তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই দুইটি সৌধ বর্ত্তমান রাজধানীর উত্তরাংশে অবস্থিত। শুনা যায় এই ঘণ্টা-গৃহই নাকি মোগল-পিকিঙের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ঘণ্টা-গৃহের ঘণ্টা মোগল আমলে নির্ম্মিত হয় নাই। পরবর্ত্তী মিঙবংশীয় সম্রাটগণের আদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঘণ্টার উচ্চতা ১৮ ফুট এবং প্রস্থ ১০ ফুট। ধাতুর পাত ৯ ইঞ্চি পুরু।

এই ঘণ্টার ঢালাই সম্বন্ধে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। যে কারিগরের হাতে এই কার্য্যের ভার ছিল সে দুইবার সম্রাটের পছন্দসই ঘণ্টা প্রস্তুত করিতে অসমর্থ হয়। তৃতীয়বার আদেশ প্রদান করিবার সময়ে সম্রাট বলিলেন—"এইবার কৃতকার্য্য না হইলে তোমার কঠোর শাস্তি হইবে। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাও হইতে পারে।" শিল্পীর চিত্তে ঘোরতর উদ্বেগ দেখা দিল। তাহার একমাত্র কন্যা পিতার অস্থিরতা লক্ষ্য করিল। কন্যা রূপে গুণে অসাধারণ ছিল। এই কন্যা ব্যতীত শিল্পীর পরিবারে আর কেহ ছিল না। কন্যা একজন গণকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিল। গণক বলিলেন—এইবারও তোমার পিতা অকৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু যে সময়ে ধাতু গলান হইবে সেই সময়ে তরল পদার্থের মধ্যে যদি কুমারীর রক্ত মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে সম্রাটের অভিপ্রেত ঘণ্টা প্রস্তুত হইতে পারিবে।" যথাসময়ে ঘণ্টা তৈয়ারি দেখিবার জন্য নগরের লোকেরা কারখানায় উপস্থিত হইল। ছাঁচের মধ্যে ধাতু ঢালা হইতেছে এমন সময়ে একটা চীৎকার শুনা গেল—"পিতার জন্য আত্মোৎসর্গ।" তৎক্ষণাৎ দেখা গেল—বালিকা তপ্ত ধাতুর মধ্যে জীবন বিসর্জন করিয়াছে। পিতা কন্যাশোকে উন্মত্ত হইয়া গেল—কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঘণ্টার ধ্বনিতে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইলেন।

সাহিত্য-ভবন।

কন্‌ফিউশিয়ান-মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যেই Hall of Classics নামক একটি সৌধ আছে। এখানে প্রসিদ্ধতম চীনা সাহিত্যের সংগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে। সৌধে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি দ্বিতল সুন্দর ছাদ-বিশিষ্ট কাষ্ঠভবন। মর্ম্মরের ভিত্তি এবং রেলিং চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের নানাস্থানে দেখা গেল। দোভাষী বলিলেন—"এই সৌধকে প্রাসাদ বিবেচনা করিতে পারেন। একটা সিংহাসন ইহার ভিতরে আছে। তৃতীয় মাঞ্চুসম্রাট্ এই গৃহে অধ্যয়ন করিতেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"চীনা ক্লাসিক্‌স্ কোন্ গৃহে রক্ষিত?" দোভাষী বলিলেন—"ঐ যে প্রাঙ্গণের দুই ধারে

লম্বা বারান্দা দেখিতেছেন উহার ভিতর প্রায় ১০০ সুবৃহৎ প্রস্তর-ফলক রহিয়াছে। এই ফলকগুলির উপর লিপি খোদিত হইয়াছে। এই ফলকগুলি গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন পত্রবিশেষ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"গ্রন্থরক্ষার এইরূপ বিচিত্র নিয়ম কেন?" দোভাষী বলিলেন—"খৃষ্টপূর্ব্ব আমলে সম্রাট সু হুয়াঙ বিরাট প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া সাম্রাজ্যকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করেন। ইনি নিজবংশে সাম্রাজ্যকে চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা হইত যে শিক্ষিত চীনারা হয়ত তাঁহার বংশজাত নৃপতিগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। এইজন্য দেশ হইতে পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্য বিদ্যালয় ও গ্রন্থমালা সকলই নির্ম্মূল করিবার জন্য সুহুয়াঙ যত্নবান্ হন। তাঁহার নিষ্যাতনে বিদ্বানেরা বনে জঙ্গলে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং বিদ্যালয় ও গ্রন্থশালাসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু সম্রাট দেশের সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া একত্র অগ্নিসাৎ করেন।"

পাগ্‌লামি একবার দেখা দিয়াছিল Great Wall বা মহাপ্রাচীর রচনায়—এইবার দেখা গেল গ্রন্থভস্মীকরণে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৃতীয় মাঞ্চুসম্রাট বিদ্যা, ধর্ম্ম ও শিল্পের একজন সহানুভূতিসম্পন্ন সংরক্ষক ছিলেন। পাছে আবার কোন ক্ষ্যাপা সম্রাট সাহিত্য-ধ্বংস-যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করেন এই ভয়ে তিনি প্রসিদ্ধ চীনা-বেদগুলি প্রস্তরে লেখাইয়া রাখিয়াছেন। ইহাও এক ধরণের পাগলামি নহে কি?

চীনারা কন্‌ফিউসিয়াস-প্রচারিত এবং কন্‌ফিউসিয়ান মতাবলম্বী যে-সমুদয় গ্রন্থকে বেদ স্বরূপ সম্মান করে সকলগুলি এই সাহিত্য-ভবনে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থগুলির ইংরেজী নাম প্রদত্ত হইতেছে :—

(১) The Canon of Changes.
(২) The Canon of Poetry or the Book of Odes.
(৩) The Canon of History.
(৪) The Spring and Autumn Annals—with three Commentaries.
(৫) The Book of Rites.
(৬) The Chou Ritual.
(৭) The Decorum Ritual.
(৮) The Book of Filial Piety.
(৯) The Confucian Analects.
(১০) The Exposition and Rectifier of the classics.
(১১) The Book of Menci

এই মাঞ্চু সম্রাট তিব্বতী দালাই-লামার ভক্ত ছিলেন আবার কন্‌ফিউশিয়াসেরও ভক্ত ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বী মন্দির নির্ম্মাণে ও সংস্কারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। পিকিঙের বহু অট্টালিকা এই সাম্রাটের আমলেই নূতন নির্ম্মিত অথবা সংস্কৃত করা হইয়াছে। মর্ম্মর-স্তূপ ইঁহারই লামা-ভক্তির নিদর্শন। এই ক্লাসিক্‌স্ ভবনের প্রশস্ত সৌধসমূহ তাঁহার বিদ্যানুরাগের পরিচয়। প্রাঙ্গণের একস্থানে একটি সুন্দর তোরণদ্বার দেখা গেল। ইহার ভিতর তিনটি খিলান। দ্বারের উভয় দিকে পাঁচ-প্রকার বর্ণবিশিষ্ট প্রস্তর ও ইনামেলের আবরণ রহিয়াছে। খিলানের কোণগুলিতে মর্ম্মরের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। মোটের উপর ফটকটা পিকিঙের বাস্তুশিল্পে অত্যুচ্চ গৌরবের অধিকারী।

এই সম্রাটের দশটি আজ্ঞা সাহিত্যভবনের এক প্রকোষ্ঠে খোদিত রহিয়াছে। সম্রাট. মন্ত্রী, পিতা, মাতা, সন্তান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী এবং বন্ধু—এই দশ-প্রকার লোকের কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে দশ অনুশাসন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

চীনাদের জগৎপ্রসিদ্ধ কারুকার্য্য।

সাহিত্যভবন হইতে নিষিদ্ধ নগর বা রাজপ্রাসাদে আসিলাম। রিপাব্লিক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ম্যাণ্ডারিন উপাধিধারী উচ্চ কর্ম্মচারী এবং প্রাসাদের ভৃত্যগণ ব্যতীত অন্য কোন লোক এই আবেষ্টনে প্রবেশ করিতে পারিত না। আজকাল আট আনা মূল্যের টিকিট ক্রয় করিয়া সকলেই ইহার ভিতর যাইতে পারে।

প্রাসাদ আজকাল একপ্রকার খালি পড়িয়া রহিয়াছে। কোন গৃহে মিউজিয়াম, কোন গৃহে আফিস, কোন গৃহে হোটেল বসান হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্-শি-কাই এই প্রাসাদে বাস করেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী মাঞ্চুসম্রাটের পরিবারবর্গ এই নিষিদ্ধ নগরের অভ্যন্তরেই একটা ক্ষুদ্র সৌধে জীবন যাপন করিতেছেন। দর্শকের সংখ্যা যথেষ্ট, এই জন্য প্রাসাদের এক গৃহে হোটেল রক্ষিত হইতেছে। চা পান করা গেল। পিকিঙে কোন উল্লেখযোগ্য মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয় ছিল না। এক বৎসর হইল প্রাসাদের ভিতর কতকগুলি গৃহে প্রাচীন হস্তশিল্পের নিদর্শনসমূহ

রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পুরাতত্ত্ব বা archæo-logyর মিউজিয়াম ইহা নয়। এখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগের চীনা Industrial Artএর নমুনা সংগৃহীত। চীনাদের যে-সকল কারুকার্য্য বিশ্ববিশ্রুত তাহারই বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ বস্তু এইখানে দেখিলাম।

এ কয়দিন পিকিঙের প্রাচীন সৌধাদি দেখিতে দেখিতে পীতবর্ণ ইনামেল টালির ছাদ ও দেওয়ালের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছি। জাপানে এই শিল্পের পরিচয় পাই নাই। কাষ্ঠশিল্পের কারিকরি জাপানীদের বিশেষত্ব। চীনাদের হাত কাষ্ঠগৃহেও কম পাকা নয়। বস্তুতঃ জাপানীরা কাষ্ঠশিল্পের অনুশীলনেও চীনাদেরই শিষ্য।

প্রাসাদের নূতন সংগ্রহালয়ে সম্রাট-পরিবারের সঞ্চিত মূল্যবান্ দ্রব্যসমূহ দেখিতে পাইলাম। এগুলির কোনটা ৩০০ বৎসরের পুরাতন, কোনটা মোগল আমলের জিনিষ, কোনটা খৃষ্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীর তাঙবংশীয় প্রস্তর। দ্রব্যসমূহ প্রাচীন বলিয়াই বিশেষরূপে যে আদরণীয় তাহা নহে। এরূপ কারিগরি, শিল্পনৈপুণ্য এবং কলাচাতুর্য্য জগতে বিরল। বহু স্থানের বহু মিউজিয়াম দেখিলাম—নানা ধরণের সৌন্দর্য্য চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু এই মিউজিয়ামে যে সমুদয় কারুকার্য্য দেখিতেছি তাহার তুলনা অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে করা অসম্ভব।

ধাতুর উপর নানা-প্রকার রং লাগান দেখিয়া মনে হয় যেন চিত্রাঙ্কন এইমাত্র করা হইয়াছে। ভারতীয় বিদ্রী সদৃশ Cloisonné work দেখিতে দেখিতে এক অভিনব সৌন্দর্য্যের আকরে আসিয়া পড়িলাম। তাহার পর পোর্সলেন বা চীনাবাসন। বলা বাহুল্য পৃথিবীতে যে বস্তুকে চীনা নামে অভিহিত করা হইয়াছে সেই বস্তু তাহার জন্মভূমিতে দেখিতেছি। কেবল তাহাই নহে। সেই দেশের রাজপ্রাসাদে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলিই দেখিতেছি। কাজেই পোর্সলেনের চূড়ান্ত দেখা হইল না কি? হাতীর দাঁত, বাঁশ, কাঠ, পিত্তল ইত্যাদি নানা পদার্থ-সম্পর্কিত শিল্পকার্য্যের নমুনাও এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হইতেছে। জাপানে রেশমের উপর সেলাই কার্য্য দেখিয়া যেরূপ একটা শিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছি, পিকিঙে এই মিউজিয়াম দেখিয়া কতকগুলি কারুকার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিলাম। অবশ্য বর্ত্তমান যন্ত্র-চালিত শিল্পের যুগে এই সকল কারুকার্য্য শীঘ্রই জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। এখানকার কোন কোন পোর্সলেন বাসনে ইতালীয় চিত্রকরগণের অঙ্কিত ইয়োরোপীয় দৃশ্য দেখিলাম।

মুসলমান-পাড়া।

সহরের ভিতর কয়েকটা মুসলমান মসজিদ দেখিয়া আসিলাম। এই অঞ্চলে বহু মুসলমানধর্ম্মী চীনাদের বাস। ঘরবাড়ী, বেশভূষা, কথাবার্ত্তা, ইত্যাদি দেখিয়া ইস্‌লামের বিশেষত্ব কিছু বুঝা গেল না। কোন কোন গৃহের দ্বারে আরবী অক্ষরে নাম লেখা দেখিলাম।

একটা মস্‌জিদে প্রবেশ করিতেছি এমন সময়ে বহুসংখ্যক বালক বালিকা আসিয়া ঘিরিয়া দাড়াইল। আমি গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলাম—"লা এলাহ্ ই ল্লাল্লা"।

অমনি আমার চারিদিক্ হইতে চীনা কণ্ঠে আওয়াজ হইল—"মহম্মদিন রসুল্লাল্লা।"

সুতরাং আরবীতে নামাজ আজান ইত্যাদি পঠিত হইয়া থাকে বুঝা গেল। কিন্তু মসজিদের নির্ম্মাণে মুসলমানী রীতি আদৌ অবলম্বিত হয় নাই। বৌদ্ধ ও কন্‌ফিউশিয়নে মন্দির এবং প্রাসাদ ইত্যাদি যে-ধরণে নির্ম্মিত, মুসলমান মন্দিরও সেই ধরণেই নির্ম্মিত। এমন কি, চীনা গৃহের ছাদের কোণে কোণে সয়তানের অনুচরবর্গকে তাড়াইবার জন্য যে-সকল পশুমূর্ত্তি রক্ষিত হয়, চীনাদের ইসলাম-মন্দিরের ছাদেও সেইগুলি দেখা গেল।

কয়েক জনের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। একজন মৌলবী-স্থানীয় ব্যক্তি বলিলেন—"আমাদের প্রত্যেকের দুইটা করিয়া নাম। একটা চীনা অপরটা আরবী। এই বালিকার নাম ফাতিনা, উহার নাম সার্বাও।"

দিনে পাঁচবার করিয়া নামাজ পড়া চীনা মুসলমানদেরও রীতি। পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া ইহারা উপাসনা করে। ভারতবর্ষেও এই রীতি। কিন্তু মিশরবাসীদের পক্ষে মক্কা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত—এইজন্য মিশরীয় মুসলমানেরা পূর্ব্বমুখী হইয়া নামাজাদি পাঠ করিয়া থাকে।

মসজিদের সম্মুখে আরবীতে লেখা রহিয়াছে—

"বিশ্‌মিল্লা হির্ রহমানুর্ রহিমু।"

ইহা ইস্‌লামধর্ম্মীদিগের মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ।

হিন্দুরা সকল শুভকার্য্যের পূর্ব্বে যেরূপ "ওঁ গণেশায় নমঃ" ইত্যাদি বলিয়া থাকে, পুস্তকারম্ভেও এইরূপ লিখিয়া থাকে, মুসলমানেরা সেইরূপ এই-প্রকার মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে।

মসজিদ ত্যাগ করিতেছি এমন সময়ে মৌলবী সাহেব বলিলেন—"আলেইকম সেলাম।"

পিকিঙে প্রায় বিশ হাজার মুসলমান পরিবারের বাস। গোটা চল্লিশেক ছোট বড় মসজিদ আছে। শুক্রবার যথা-রীতি ধর্ম্মপালন হইয়া থাকে। শূকর ভোজন নিষিদ্ধ। চীনা ধর্ম্মকলহ বড় দেখা যায় না। মিঙ এবং মাঞ্চু সম্রাটগণ মসজিদাদি নির্ম্মাণে রাষ্ট্রকোষ হইতে অর্থ সাহায্য করিতেন। যখন রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠিত হয় তখন চীনা, তিব্বতী, মোগল ও মাঞ্চুর ন্যায় ইস্‌লামধর্ম্মীদিগকে চীন-দেশের পঞ্চম জাতি বিবেচনা করা হইয়াছে। এইজন্য চীনস্বরাজের পতাকায় পাঁচ রং।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

বেদধ্বনি'র প্রতিধ্বনি

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, রাজা অশ্বপতি যখন অভ্যাগত বিদ্যার্থী-ছয়জন'কে একে একে প্রশ্ন করিলেন "কোন্ আত্মাকে উপাসনা কর", তখন তাহার উত্তরে বুড়িল বলিলেন "জল'কে মহারাজ," জন বলিলেন "আকাশ'কে মহারাজ," ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন "বায়ু'কে মহারাজ"। ইহাদের [illegible] রাজা অশ্বপতি বলিলেন 'তোমরা সকলেই বৈশ্বানর-আত্মার পৃথক্ পৃথক্ এক-একটি অবয়বের মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাহারই গুণে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বদেহে অন্ন ভোজন করিয়া থাক'। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৈশ্বানর-আত্মা পৃথক্ পৃথক্ আত্মা নহেন—তিনি একই আত্মা;—দ্যৌ তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার প্রাণ, আকাশ তাঁহার দেহ, জল তাঁহার জঘন, পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয়, অগ্নি তাঁহার হৃদয় মন এবং মুখ।"

রাজা অশ্বপতি তাঁহার সময়ের বৈশ্বানর-আত্মার উপাসক তিন-জনা'র সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই তো তাহা দেখা হইল;—Religious Teachers of Greece-এর গ্রন্থকার ইংরাজ অশ্বপতি James Adam পুরাতন গ্রীসের বৈশ্বানর-আত্মার উপাসক তিন-জনা'র সম্বন্ধে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন সেটা তবে দেখিতে বাকি থাকে কেন—এই সঙ্গে সেটাও দেখা হো'ক্। তাহা হইলেই পুরাতন গ্রীসের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা ভারতবাসীদিগের অবিদিত-পূর্ব্ব নূতন মতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যে, কেমন, তাহা পাঠক-মহোদয়-গণের নিকটে ছাপা থাকিবে না।

পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন—

The first three thinkers of whom we have to treat are Thales, Anaximander, and Anaximenes. * * * They each attempted to explain the universe from a single cosmological principle, which Thales identified with water, Anaximander with "the boundless", a material substance of infinite extent (এক কথায়—আকাশ বা Aether) and Anaximenes with air.

কি আশ্চর্য্য! James Adam সাহেব বর্ত্তমান খ্রীষ্ট-শতাব্দীর ইংরাজ-পণ্ডিত—রাজা-অশ্বপতি জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের আমলের ক্ষত্রিয় তত্ত্বজ্ঞানী; অথচ James Adam সাহে-বের মনোমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত এই যে তিনজন পুরাতন গ্রীসের বৈশ্বানরবাদী Thales, Anaximander, Anaximenes, আর, অশ্বপতি-মহাত্মা'র রাজ-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই যে তিনজন পুরাতন ভারতের বৈশ্বানর-বাদী বুড়িল, জন, ইন্দ্রদ্যুম্ন—তিনের সঙ্গে তিনের মিল রহিয়াছে কেমন-দেখ খাপে খাপে!

প্রাচ্য বৈশ্বানর-বাদী	প্রতীচ্য বৈশ্বানর-বাদী	বৈশ্বানর-আত্মার রূপ
বুড়িল	Thales	অপ, water
জন	Anaximander	আকাশ the boundless
ইন্দ্রদ্যুম্ন	Anaximenes	বায়ু air

Thales সম্বন্ধে James Adam সাহেব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপ :—

"According to the conjecture of Aristotle,—for it is a conjecture and nothing more,—Thales had in his

mind the philosophical conception of an indwelling soul (অন্তরাত্মা)। * * * * * * If Aristotle's conjecture is correct, the germs of the Platonic belief in a World-soul sustaining and moving all that is, are as old as Thales".

Adam সাহেব তাঁহার এই মন্তব্যটির সঙ্গে এই যে একটি টিপ্পনী জুড়িয়া দিয়াছেন "If Aristotle's conjecture is correct" এ কথাটি আমার ভাল লাগিতেছে না। একে তো Adam সাহেব Thalesএর কেহই নহেন—Aristotle Thalesএর তত্ত্বজ্ঞান-ভাণ্ডারের গুরুপরম্পরাগত উত্তরাধিকারী; তাহাতে আবার, Aristotleএর মতো বহুদর্শী সুবিচক্ষণ মহাপণ্ডিত সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় একজন খুঁজিয়া পাওয়া ভার; এমতাবস্থায় একজন তৃতীয় ব্যক্তির সহজেই মনে হইতে পারে যে, Thales কোন্ কথা কী ভাবে বলিয়াছিলেন, তাহা Aristotleএরই জানিতে পারিবার কথা; পক্ষান্তরে Adam সাহেবের মতো একদিগ্‌দর্শী ভারতান্ধ শ্রেণীর ইংরাজ-পণ্ডিতগণেরা দলবদ্ধ হইয়া সহস্র মাথা খুঁড়িলেও **তাঁহাদের** তাহা জানিতে পারিবার কথা নহে। আমি তাই বলি যে, "If Aristotle's conjecture is correct" এই শ্লেষ-বাক্যটি Adam সাহেবের মুখে আদবেই শোভা পায় না;—আরো তাহা শোভা পায় না এইজন্য—যে হেতু Aristotleএর conjectureটির সম্বন্ধে কিয়ৎপরে তিনিই বলিতেছেন—

"Nor is it otherwise than in harmony with the general character of early Ionic hylozoism (বৈশ্বানর-বাদ বা জগচ্চৈতন্য-বাদ) to conceive of the universe as alive, because the original elements, water, air, and so on, out of which the hylozoists (অর্থাৎ বৈশ্বানর বাদীরা) construct the universe, * * * are in a certain sense endowed with enegy and life."

Adam সাহেব তাঁহার পুস্তকের এই স্থানটির আরম্ভে বলিয়াছেন "Aristotleএর conjectureটি is a conjecture and nothing more"; এক্ষণে বলিতেছেন "Aristoleএর conjectureটি is in harmony with the general character of early Ionic hylozoism (অর্থাৎ that of বৈশ্বানর-বাদ)। Adam মহোদয় এই দুইরকমের দুই কথা বলিয়া আবেক-রকমের আর-এক কথা বলিতেছেন এই যে, Thales নিজে বলিয়াছেন বটে যে, "All things are full of Gods", but it must be allowed that the words of Thales, taken by themselves, and apart from the explanation of Aristotle, appear to be only a pious sentiment."

Adam সাহেবের এই তৃতীয় কথাটির ভাব এই যে, Thales নিজে এই যে একটি কথা বলিয়াছেন "All things are full of Gods", এটা ভক্তি-ভাবের উচ্ছ্বাসমাত্র, তা বই, Thalesএর দার্শনিক মতও যে ঐপ্রকার ছিল, তাহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কেন যে তাহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে তাহা তিনিই জানেন! Adam সাহেবকে আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি যে, এইটিই কি তবে বিশ্বাসযোগ্য যে, **ভক্ত** Thales ছিলেন **জগদাত্মবাদী**, আর, **জ্ঞানী** Thales ছিলেন **জগদান্ধবাদী**? আমাকে যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি তাঁহাকে স্পষ্ট বলিব যে, আমার বিবেচনায় এটা যেমন বিশ্বাস-যোগ্য নহে যে, ভক্ত Adam সাহেব খ্রীষ্টান—জ্ঞানী Adam সাহেব positivist, এটাও তেমনি বিশ্বাস যোগ্য নহে যে, **ভক্ত** Thales ছিলেন জগদাত্মবাদী (অথবা যাহা একই কথা—বৈশ্বানর-বাদী),—**জ্ঞানী** Thales ছিলেন জগদান্ধবাদী (অথবা যাহা একই কথা—জড়বাদী)।

পণ্ডিতবর James Adam, Anaximanderএর "Boundless"এর সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপ:—

"The "Infinite" of Anaximander is, primarily speaking, a physical concept, being nothing but the boundless matter which he regarded as the elementary substance out of which the world is produced. * * * What particular kind of matter Anaximander had in view when speaking of the "Infinite", we are nowhere told by the philosopher himself. All that can with certainty be affirmed is that he did not identify the infinite with any of the four elements.

Adam সাহেব এ যাহা বলিলেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, Anaximanderএর "Infinite" আর কিছুই না-আমাদের দেশীয় শাস্ত্রে যাহাকে বলে **আকাশ**। আকাশ-শব্দের অর্থ তিন স্থানে তিন প্রকার:—প্রচলিত আটপহুরিয়া বঙ্গভাষায় উহার অর্থ—নভোমণ্ডল; যেখানে সোপাধিক নিরুপাধিক চৈতন্যের সহিত খণ্ডাখণ্ড আকাশের উপমা দেওয়া হয়, সেখানে

(যেমন বেদান্ত-দর্শনে) উহার অর্থ অতীন্দ্রিয় আকাশ অর্থাৎ বস্তুশূন্য অবকাশ-মাত্র—কাণ্টের transcendental space; যেখানে আকাশ'কে পঞ্চভূতের প্রথমজাত ভূত বলিয়া ধরা হয়, সেখানে (যেমন উদ্ধৃত ছান্দোগ্য উপনিষদের আখ্যায়িকাটিতে) উহার অর্থ (Adam সাহেব যেমন বলিয়াছেন) a material substance of infinite extent, এক কথায়—boundless aether.

Adam সাহেব Anaximenesএর সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপ :—

Anaximenes differs from Anaximander, and resembles Thales, in so far as he derives the world from one of the four elements. The primary matter he declared to be air, infinite in quantity and possessed of eternal motion or life, by means of which it is transformed into a cosmos through the agency of rarefaction and condensation.

আমাদের দেশে কোনো কালেই ভূতের সংখ্যা পাঁচের কম ছিল না—এটা সকলেরই জানা কথা; পক্ষান্তরে, Anaximander এবং Anaximenesএর সময়ে, কিংবা তাহার পূর্ব্বে, পুরাতন গ্রীসে elementএর সংখ্যা চা'রের অধিক ছিল না—এটা Adam সাহেবের না-জানা কথা*। Adam সাহেব তাঁহার এই না-জানা কথাটির উপরে ভর করিয়া বলিতেছেন—

Anaximenes differs from Anaximander, and resembles Thales, in so far as he derives the world from one of the four elements [উহ—whereas Anaximander derives the world from আকাশ].

পক্ষান্তরে, আমি আমার ঐ জানা-কথাটা'র উপরে ভর করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, Thales, Anaximander, and Anaximenes resemble each other in so far as each derives the world from one or other of the five Bhutas (i.e. of the পঞ্চানি ভূতানি)।

Adam সাহেব এই যে বলিতেছেন—

The primary matter he (i.e. Anaximenes) declared to be air * * * possessed of eternal motion or life, by means of which it is transformed into a cosmos through the agency of rarefaction and condensation.

Adam সাহেবের এ কথাটির গোড়া'র সমাচার অবগত হইতে হইলে, ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রের গুহাভবনের ভিতরে অনুসন্ধান-চালনা ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই; কেননা—লাটিন গ্রীক সাক্সন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য আর্য্যভাষার শব্দাবলীর মূলধাতু যেমন সংস্কৃত ভাষার ধাতু-ভাণ্ডারে সঙ্গোপিত রহিয়াছে, তেম্নি প্রাচীন গ্রীসের বৈশ্বানরবাদের গোড়ার বৃত্তান্ত ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রের নিভৃত নিকেতনে সঙ্গোপিত রহিয়াছে।

Anaximenesএর বৈশ্বানর-বাদের উপলক্ষে Adam সাহেব এই যে দুইটি বিশ্ববিকাশনী প্রকরণ-পদ্ধতির কথার উল্লেখ করিয়াছেন—condensation (ঘনীকরণ) এবং rarefaction (তনূকরণ), এ দুইটি প্রকরণের গোড়া'র কথা হ'চ্চে দেশীয় শাস্ত্রে'র অনুলোম এবং প্রতিলোম পদ্ধতি। ঘনীকরণ হ'চ্চে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে নাবা—ইহারই নাম অনুলোম পদ্ধতি; তনূকরণ হ'চ্চে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ওঠা—ইহারই নাম প্রতিলোম পদ্ধতি।

এক-খণ্ড হিমশিলা স্থূলপদার্থ। তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে তাহা তরল হইয়া গেল। তাহার এই দ্বিতীয় অবস্থায় তাহাকে হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া আগুনে জাল্ দিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে তাহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আর এক ঘণ্টা পরে তাহা বায়ুবৎ বাষ্পীভূত হইয়া গেল। মিনিটদশেক পরে তাহা আকাশবৎ শূন্যে পর্য্যবসিত হইল। হিমশিলাটি'র স্বর্গারোহণের পথ মনে কর যেন —ঙ-ঘ-গ-খ-ক। ঙ-স্থানে ছিল সে **শিলাবৎ**, ঘ-স্থানে হইল **জলবৎ**, গ-স্থানে হইল **অগ্নিবৎ**, খ-স্থানে হইল **বায়ুবৎ**, ক-স্থানে হইল **শূন্যবৎ**। এইরূপ আমি স্বচক্ষে দেখিলাম—হিমশিলাটি ঙ-স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ঘ-গ-খ-পথের তিনটি স্থান, ঘ, গ, খ, উত্তরোত্তরক্রমে অতিবাহন করিয়া ক-স্থানে পৌঁছিয়া অব্যক্ত-ধামের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বস্তুটা যখন ঙ-স্থানে **শিলাবৎ** ছিল, তখন সে কোন্ পথের কোন্ কোন্ স্থান উত্তরোত্তর-ক্রমে অতিবাহন করিয়া ঙ-স্থানে আসিয়াছিল তাহা আমি চক্ষে দেখি নাই **যদিচ**,

* চারের চা-এর মাথা'র গোড়ায় Apostrophy দি'বার কারণ এই :—চতুর্=চাউর্=চা'র। যেমন, তণ্ডুল=চাউল=চা'ল।

কিন্তু তথাপি—এটা আমি অসংকোচে বলিতে পারি যে, স্থানত্রয়ের অর্থ যদি হয় **অবস্থাত্রয়**—তবে পরিবর্ত্তমান বস্তুটা যে-পথের মধ্যদিয়া ঙ-হইতে ক-এ উপনীত হইল দেখিলাম, সেই পথেরই খ-গ-ঘ স্থান (অর্থাৎ বায়ুবৎ, অগ্নিবৎ, এবং জলবৎ অবস্থা) উত্তরোত্তর-ক্রমে অতিবাহন করিয়া ঙ-স্থানে (অর্থাৎ শিলাবৎ অবস্থায়) উপনীত হইয়াছিল—কেননা ক এবং ঙ'র মাঝখানে দ্বিতীয় পথ নাই। ফল কথা এই যে, গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত গীতপ্রবাহ যেমন উপরের সুর হইতে নীচের সুরে এবং নীচের সুর হইতে উপরের সুরে ক্রমাগতই নাবা-ওঠা করিতে থাকে, ঈশ্বরেচ্ছা-প্রবর্ত্তিত প্রকৃতির পরিণাম-প্রবাহ তেমনি সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ক্রমাগতই নাবা-ওঠা করিতেছে—একমুহূর্ত্তও তাহার বিরাম নাই। আমি তাই বলি যে, Anaximenesএর এই যে, একটি কথা "air is possessed of eternal motion or life," এটা একটা অবান্তর-শ্রেণীর শাখা-কথা; উহার গোড়া'র কথা হ'চ্চে **প্রকৃতি স্বয়ং** is possessed of eternal motion or life; আর, বৈশ্বানর আত্মা যেহেতু প্রকৃতির অন্তরাত্মা, এই-হেতু—"রাজ-সেনা'র জয়" বলিলে যেমন প্রকারান্তরে বলা হয় "রাজার জয়," তেমনি "প্রকৃতি is possessed of eternal motion or life" বলিলে প্রকারান্তরে বলা হয় "বৈশ্বানর আত্মা is possessed of motion or life."

জিজ্ঞাসু॥ কিয়ৎপূর্ব্বে যখন তুমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলে যে, বুড়িল জল'কে, জন আকাশ'কে এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন বায়ু'কে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া মানিতেন, তখন আমি তাহার অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছিলাম যে, বৈশ্বানর আত্মা জল-বায়ু-আকাশ-প্রভৃতি ভূতগণেরই শ্রেণীভুক্ত; এক্ষণে তুমি বলিতেছ—"না—তাহার অর্থ উহা নহে—তাহার অর্থ বৈশ্বানর আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।" একথা তুমি বলিতেছ কোন্ শাস্ত্রের বলে? তোমার নিজের শাস্ত্রের বলে তো না?

প্রবোধয়িতা॥ ও-কথা আমি বলিতেছি শ্রুতিশাস্ত্রের বলে—বিশেষত মুণ্ডকোপনিষদের ২য়মুণ্ডকের ১ম খণ্ডের ৪র্থ শ্লোকের বলে। শ্লোক-সেটি এই:—

> "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
> দিশঃ শ্রোত্রে বাক্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
> বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
> পদ্ভ্যাং পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"

ইহার বাঙ্লা:—

"অগ্নি ইঁহার মস্তক; চন্দ্রসূর্য্য ইঁহার চক্ষুদ্বয়; দিক্‌সকল কর্ণদ্বয়; উচ্চারিত বেদ ইঁহার বাক্য; বায়ু ইঁহার প্রাণ; বিশ্ব ইঁহার হৃদয়; পৃথিবী ইঁহার পাদদ্বয়-সম্ভূতা; ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।"

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বেদোপনিষদের অভিপ্রায়ানুসারে বৈশ্বানর আত্মা প্রকৃতির অন্তরাত্মা; আর তাহা হইতেই আসিতেছে যে, "রাজ-সেনার জয়" বলিলে যেমন প্রকারান্তরে বলা হয় "রাজা'র জয়," তেম্নি "প্রকৃতি is possessed of eternal motion or life" বলিলে প্রকারান্তরে বলা হয় "বৈশ্বানর-আত্মা is possessed of eternal motion or life."

জিজ্ঞাসু॥ প্রকৃতির সহিত বৈশ্বানর-আত্মার সম্বন্ধের মধ্য দিয়া তুমি এক-রকম করিয়া ঘটাইয়া দাঁড় করাইলে বটে যে, বৈশ্বানর-আত্মা is possessed of eternal motion or life, কিন্তু তাহাতে আমার মন তৃপ্তি মানিতেছে না। যুক্তিবিচারের ঘটাড়ম্বর ক্ষণকালের জন্য স্থগিত রাখিয়া বৈশ্বানর-আত্মাকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বেদাদি-শাস্ত্রে কোথাও যদি "possessed of eternal motion or life" বলা হইয়াছে দেখিয়া থাক', তবে সাদা কথায় তাহাই আমাকে বল'।

প্রবোধয়িতা॥ প্রকৃত কথাটি তবে তোমাকে বলি—প্রণিধান কর:—

বৈশ্বানর শব্দের গোড়া'র অর্থ যে কি, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলেই হয়। উহার গোড়া'র অর্থ—বিশ্বে নরাঃ, অর্থাৎ জগৎসুদ্ধ সমস্ত নর। যাহার নাম নর, তাহারই নাম পুরুষ, তাহারই নাম আত্মা; তার সাক্ষী—

(১) নরোত্তম = পুরুষোত্তম।

(২) মহাপুরুষ = মহাত্মা।

(৩) অতএব, নর = পুরুষ = আত্মা।

নরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরম অভিব্যক্তি, পরম প্রতিষ্ঠা, এবং সারসর্ব্বস্ব। সকল জীবই নরের আদর্শে ন্যূনাধিক পরি-

মাণে গঠিত; সকল জীবেই নরের ভাব কিছু-না-কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। পিপীলিকাদিগের মধ্যেও নরপ্রকৃতির কত-রকমের কত-যে পূর্ব্বাভাস কতদিক্ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—প্রাণিতত্ত্ব-বেত্তা পণ্ডিতবর লবক্ তাহা দেখাইতে বাকি রাখেন নাই। কিন্তু তা বলিয়া, আর-আর জীবের তুলনায় মনুষ্যজাতির মর্ম্মান্তিক-গোচের বিশেষত্ব যে-একটি আছে, সেটি ভুলিলে চলিবে না। সে বিশেষত্বটির (অর্থাৎ মনুষ্যত্বের) বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইবার সময় হইলে দুইটি দল দুইদিকে ছটকিয়া বাহির হয়:—একটি দল তত্ত্বাবধারণ; আর একটি দল শুভানুষ্ঠান। মনুষ্যত্বের অঙ্কুরিতাবস্থাসুলভ এই দুইটি নবোন্মেষিত দলের মূলে জল-সেচন করিবার আদিম প্রকরণ সবে-মাত্র দুইটি—(১) বাচ্য-বাচন এবং (২) পাচ্য-পাচন। এ-দুইটি প্রকরণ-পদ্ধতি কেবল মনুষ্যজাতিরই অধিকারায়ত্ত— পশুপক্ষী-দিগের অধিকার-বহির্ভূত। বাচ্য-বাচন-দ্বারা তত্ত্বাবধারণের মূলে জল-সেচন করা হয়; পাচ্য-পাচন-দ্বারা শুভানুষ্ঠানের মূলে জল-সেচন করা হয়। বাণী এবং অগ্নি এই দুইটি সাধনাস্ত্র মনুষ্যত্বের ব্রহ্মাস্ত্র। গৃহস্থ সজ্জনেরা পর্ব্বে পর্ব্বে বাণীমন্ত্রদ্বারা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে গৃহে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের গৃহের এবং পল্লীর কুশলাদি বৃত্তান্তের তত্ত্বাবধারণ করেন এবং অগ্নিমন্ত্রদ্বারা আহার্য্য সামগ্রীসকল পাচন করিয়া—আহূতজনেরা ভোজে বসিলে—সেই-সকল অগ্নিপক্ক অন্নব্যঞ্জন পাতে পাতে পরিবেষণ করেন। এইরূপ সুবাচ্য-বাচন এবং সুপাচ্য-পাচনের মন্ত্রগুণে পুরবাসী জন-গণের মধ্যে পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ ক্রমশই পাকিয়া উঠিতে থাকে। বীণাবাদক যেমন বাদন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে করধৃত বীণাযন্ত্রের সুর বাঁধিয়া লয়,—পুরাকালে শুভানুষ্ঠাতা গৃহস্থেরা তেমনি বাণীমন্ত্র এবং অগ্নি-মন্ত্রের বলে গ্রামস্থ লোকজনের সহিত বন্ধুতা পাতাইবার পূর্ব্বে ঐ দুই মন্ত্রেরই বলে দেবতাগণের সহিত বন্ধুতা পাতাইয়া সংকল্পিত শুভ-কার্য্যটির গোড়া বাঁধিয়া লইতেন। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, বাণী-মন্ত্রের অধিদেবতা হিরণ্য-গর্ভ বা ব্রহ্মা। এবার আমরা দেখিব যে, অগ্নি-মন্ত্রের অধি-দেবতা বৈশ্বানর বা বিষ্ণু। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে "অয়-মগ্নির্বৈশ্বানরো যোহয়মন্তঃ পুরুষে—যেনেদং অন্নং পচ্যতে যদিদং অদ্যতে"; [বাঙ্‌লা] "এই যে অগ্নি—যিনি পুরুষের অন্তরে—যাঁহা দ্বারা ভুক্ত অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয়—ইনি বৈশ্বানর।" ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন'কে বলিতেছেন

> "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
> প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধং॥"

[বাঙ্‌লা] "আমি বৈশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করি এবং প্রাণাপানের সহিত যোগে মিলিয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন পাচন করি।" দুই স্থানেই মনুষ্যের জঠরাগ্নিকেই বৈশ্বানর বলা হইয়াছে তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; কিন্তু তা বলিয়া এরূপ মনে করিও না যে, দেশীয় শাস্ত্রের মতে বৈশ্বানর আত্মা কেবল জঠরাগ্নিরই অধিদেবতা; কেননা, ঋগ্‌বেদের ১ম মণ্ডলের ৫৯ সূক্তে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে "বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাং। স্থূণেব জনান্ উপমিদ্ যযন্থ। মূর্দ্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা—অথা ভবদ্ অরতিঃ রোদস্যোঃ॥" [বাঙ্‌লা] "বৈশ্বানর তুমি ক্ষিতি-সকলের নাভি। প্রোথিত স্তম্ভের ন্যায় তুমি জনগণ'কে ধারণ করিয়া আছ। অগ্নি দ্যুতিমান্ ব্যোমের (দ্যৌ-এর) মস্তক, পৃথিবীর নাভি, এবং স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিপতি।" পূর্ব্বোদ্ধৃত ছান্দোগ্য উপনিষদের আখ্যা-য়িকাটিতেও স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে যে, অগ্নি—বৈশ্বানর আত্মা'র হৃদয় মন এবং মুখ। এই-সকল বেদোপনিষদের বচন দ্বারা বেশ্ এটা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বেদাদি শাস্ত্রের মতে বৈশ্বানর আত্মা অগ্নি-স্বরূপ বা তেজঃ-স্বরূপ। অধুনাতন কালের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এটা একটা সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত যে, তেজোরশ্মি প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:—(১) তাপপ্রধান লোহিত রশ্মি; (২) জ্যোতিঃপ্রধান পীত রশ্মি; (৩) প্রাণ-প্রধান নীলোত্তর (violet) রশ্মি। তাপ জ্যোতি এবং প্রাণের অক্ষয় ভাণ্ডার এই যে বিশ্বব্যাপী তেজ, ইহাই সকল স্পন্দনের গোড়া'র স্পন্দন, সকল motionএর গোড়া'র motion, সকল জীবের প্রাণের নিদান। অতএব এ কথা খুব জোরের সহিত বলা যাইতে পারে যে, বেদাদি শাস্ত্রের মতে বৈশ্বানর-আত্মা is possessed of eternal motion or life। ইতি প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত। অতঃপর বৈশ্বানর-আত্মার সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি বিষয় পরে পরে দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

তেজের এই যে তিনটি প্রধান অবয়ব—আলোক, তাপ এবং ইন্ধন, তিনের মধ্যে আলোক সত্ত্বগুণ-প্রধান, তাপ রজোগুণ-প্রধান, এবং ইন্ধন তমোগুণ-প্রধান। সত্ত্বগুণের মধ্য দিয়া বৈশ্বানর আত্মার জ্ঞানের প্রকাশ, রজোগুণের মধ্য দিয়া ইচ্ছার প্রভাব, এবং তমোগুণের মধ্য দিয়া নিয়মের বন্ধন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রবর্ত্তিত হয়। বৈশ্বানর আত্মার জ্ঞানময় মঙ্গলময় তেজোরশ্মি এইরূপে ত্রিগুণের মধ্য দিয়া পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও—পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দু যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না—পরমাত্মা তেমনি ত্রিগুণে লিপ্ত হ'ন না। কঠোপনিষদে আছে

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।

[বাঙ্‌লা] "সর্ব্বলোকের চক্ষু সূর্য্য যেমন দৃশ্য বিষয়-সকলের কোনো-প্রকার দোষে লিপ্ত হয় না, তেম্নি, এক যিনি সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা তিনি লোকদুঃখে লিপ্ত হ'ন না।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে

"স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।"

[বাঙ্‌লা] "ইনি জ্ঞানময় ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করিলেন; জ্ঞানময় ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করিয়া যাহা-কিছু এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন; সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির মধ্যে অনু-প্রবেশ করিলেন।"

ইহার টীকা।

দেশীয় শাস্ত্রের অভিপ্রায়-মতে মনুষ্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টির গোড়াপত্তন করেন হিরণ্যগর্ভ-দেবতা বা ব্রহ্মা। তাহার পরে আত্মার অন্তর্যামি-রূপে মনুষ্যের হৃদয়ে অনু-প্রবিষ্ট হ'ন—বিষ্ণু-দেবতা। বিষ্ণু দেবতা জগৎসুদ্ধ নর-নারীগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম বৈশ্বানর। দেশীয় শাস্ত্রকর্ত্তারা জনসাধারণের ধারণার উপযোগী করিয়া যাহাই বলুন আর যাহাই লিখুন, এ কথা তাঁহারা বার বার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন নাই যে, যিনিই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা তিনিই বৈশ্বানর বিষ্ণু; একই পরমাত্মা সৃষ্টি এবং স্থিতি উভয়েরই মূলাধার।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

অতঃপর, বৈশ্বানর-আত্মাকে অগ্নি-স্বরূপ বলা হয় কী-অর্থে তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, পাঞ্চালদিগের অধিপতি প্রবাহন-রাজা গৌতম নামক ব্রাহ্মণ-কুলপতি'কে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন এইরূপ—

"অই যে দ্যুলোক উহা অগ্নি। ঐ অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধা আহুতি দ্যা'ন। সেই আহুতি হইতে সোম-রাজা উৎপন্ন হ'ন।

পর্জন্য (অর্থাৎ গর্জনকারী মেঘ) অগ্নি। এই অগ্নিতে দেবগণ সোম-রাজাকে আহুতি দ্যা'ন্। সেই আহুতি হইতে জল-বর্ষণ উৎপন্ন হয়।

পৃথিবী অগ্নি। এই অগ্নিতে দেবগণ জলবর্ষণ আহুতি দ্যা'ন। সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।

পুরুষ অগ্নি। এই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন আহুতি দ্যা'ন। সেই আহুতি হইতে রেত উৎপন্ন হয়।

স্ত্রী অগ্নি। এই অগ্নিতে দেবতারা রেত আহুতি দ্যা'ন্। সেই আহুতি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়।"

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধারূপী আহুতি-যোগে দ্যুলোকরূপী অগ্নি হইতে সোম উৎপন্ন হয়। সোমাহুতি-যোগে পর্জন্য-অগ্নি হইতে জলবর্ষণ উৎপন্ন হয়। জলবর্ষণ-রূপী আহুতি-যোগে পৃথিবী-অগ্নি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। অন্নাহুতি-যোগে নরনারী হইতে রেত এবং গর্ভ উৎপন্ন হয়।

টীকা।

এখানকার এই উপনিষদ্-বাক্যগুলির মধ্য হইতে সার নিষ্কর্ষণ করিয়া পাওয়া যাইতেছে সংক্ষেপে এই :—

(১) কার্য্য = উৎপাদন
(২) মূল কারণ = অগ্নি
(৩) সহকারী কারণ = আহুতি

তবেই হইতেছে যে,

(১) সন্তান-সন্ততি = কার্য্য
(২) পুরুষ = আত্মা = নর = অগ্নি
(৩) প্রকৃতি = আহুতি

ইহা হইতেই আসিতেছে যে,

বৈশ্বানর-অগ্নি = সমষ্টি আত্মা = পরম পুরুষ।
আহুতি = প্রকৃতি।

সন্তান সন্ততি — ব্যষ্টি আত্মা — নরনারীগণ।

সংক্ষেপে এ যাহা বলিলাম—এখানকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

বৈশ্বানর-আত্মার সম্বন্ধে কয়েক কথা যাহা বলিবার প্রয়োজন ছিল তাহা বলিয়া চুকিলাম। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্।

পণ্ডিতবর James Adamএর প্রদর্শিত পুরাতন গ্রীসের তিনজন মাথালো-শ্রেণীর বৈশ্বানরবাদীর মতের সঙ্গে আমাদের দেশের তিনজন বড়-ঘরের বৈশ্বানরবাদীর মতের কিরূপ খাপে খাপে মিল রহিয়াছে পূর্ব্বে তাহা আমি দেখাইয়াছি ; দেখাইয়াছি যে Thalesএর বৈশ্বানর Water = বুড়িলের বৈশ্বানর অপ্ ; Anaximanderএর বৈশ্বানর Boundless = জনের বৈশ্বানর আকাশ ; Anaximenes-এর বৈশ্বানর Air = ইন্দ্রদ্যুম্নের বৈশ্বানর বায়ু। এক্ষণে, উক্ত পণ্ডিতবর পুরাতন গ্রীসের বৈশ্বানরবাদের বিবরণ-বার্ত্তার যেরূপ উপসংহার করিয়াছেন তাহা দেখাই। তিনি বলিতেছেন—

"At this point I will invite you to pause and take a retrospect. As we survey the somewhat barren landscape over which we have travelled, two features appear to arrest our attention. In the first place each of these three thinkers derives the world from a single self-sufficient cause, both uncreated and imperishable (গীতার ভাষায় "অজমব্যয়ং"), at once material and spiritual (শাস্ত্রর ভাষায় "বোধাবোধাত্মকং"—অগ্নি + আত্মা); and, in the second place, there is a disposition to identify this cause with God (পরমাত্মার সহিত)..........The belief in a single worldcreating (বিশ্বকৃৎ) principle itself uncreated and immortal (অকৃত অমৃত), to a certain extent foreshadows the conception of God as the one creative and eternal Being, not indeed, transcendent (বৈদান্তিক ভাষায়—নিরুপাধিক = transcendent), but immanent in the world (সোপাধিক)।

প্রাচীন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কি আশ্চর্য্য খাপে খাপে মিল! কে বলে যে, পুরাতন গ্রীসের বৈশ্বানরবাদ—বেদধ্বনির প্রতিধ্বনি নহে। এখনই কী হইয়াছে—দুয়ের মধ্যে আরো কত যে মর্ম্মান্তিক-গোচের মিল তাহা ক্রমশ প্রকাশ্য।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরগাছা

(২০)

স্বামীর প্রতি মমতা জানাইতে গিয়া মণিমালা নিজের বাড়ীর সকলের যেন পর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বাপ-মায়ের সহিত তাহার আর কোনো সম্পর্ক নাই, তাহাকে দেখিলে তাঁহারা মুখ ঘুরাইয়া লন, কথা বলেন না, খুব হাসি-গল্পের মধ্যে তাহাকে দেখিলে তাঁহাদের মুখ অন্ধকার হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। সে যতই সকলের নিকট হইতে দূর হইতে লাগিল ততই সে স্বামীর নিকট হইতেছিল। তাহারা দুজনে পরমানন্দে সকলের উপেক্ষা উপেক্ষা করিয়া অশৌচের কয়দিন হবিষ্য রাঁধিয়া খাইল; তারপর দুজনে মিলিয়া দিদিমার শ্রাদ্ধের জোগাড় করিয়া শ্রাদ্ধ করিল। এতদিনে তাহাদের যেন নিজের একটি স্বতন্ত্র সংসার হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরের বাড়ীতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকা বড় বিশ্রী দেখায়। মণিমালার মাঝে-মাঝে মনে হইত একেবারে অন্যত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারিলে বেশ হইত। কিন্তু তাহার স্বামী একেবারে নিঃস্ব চাল-চুলা-হীন ; তাহাকে দুঃখে ফেলা হইবে বলিয়া মণিমালা কোনো দিন তাহার মনের কথা মুখ ফুটিয়া স্বামীকে বলিতে পারিত না। রাজবাড়ীর কেহ আর তাহাকে ঘাঁটাইত না বলিয়া রাখাল বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আনন্দেই ছিল ; শ্বশুর-বাড়ীর পরাধীনতার গ্লানি তাহার আর বড় একটা মনে পড়িত না। তাহার দিনগুলা জলের মতন সহজেই আজকাল গড়াইয়া চলিতেছিল। হঠাৎ সামনে আবার একটা বাধা পড়িয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল।

ইচ্ছা দাসী এক-মুখ হাসি লইয়া আসিয়া রাখালকে বলিল—নাতিন্-জামাই, নাতিন্ যে পোয়াতি! আমি খবর দিলাম, বকশিশ দাও।

রাখালের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া তখুনি ম্লান নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। রাখাল মণিমালার লজ্জানত স্মিত মুখের দিকে একবার চাহিয়া ইচ্ছাকে বলিল—ইচ্ছা-নানি, আমার এক কড়ারও সম্বল নেই, তোকে কি বকশিশ দেবো। জামা কাপড় মনে করছিস আমার? কিছু আমার না। হাতীর ঝুল, ঘোড়ার চারজামা, পেয়াদা-পাইকের

উর্দ্দি যেমন তাদের নয়, রাজার ঐশ্বর্য্যের, তেমনি এ-সব রাজার জামাইএর উর্দ্দি, এ-সব আমার নিজের কিছু নয়।

ইচ্ছা দাসী রাখালের কথা কিছু বুঝিতে পারিল না। হাসিতে-হাসিতে বলিল—আচ্ছা দিও না, চললাম আমি মহারাজের কাছে, দুনা আদায় করতে......

ইচ্ছা দাসী চলিয়া গেল। মণিমালা স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল—আবার দুষ্টুমি করছ!

রাখাল পরম প্রীতিতে পূর্ণ হইয়া পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল—মণি, সত্যি?

মণিমালা স্বামীর কাঁধে মুখ লুকাইয়া বলিল—যাও, আমি কিছু জানিনে।

মণিমালা জানে না বলিল বলিয়াই রাখালের যাহা জানিবার তাহা আর অজানা রহিল না।

সকলের আগে খবর দিতে পারিলে প্রচুর বকশিশ পাইবে বলিয়া ইচ্ছা দাসী ছুটাছুটি রাণীর মহলে গেল। যে মণিকে সে হইতে দেখিয়াছে, যাহাকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহার ছেলে হইবে; অতি পুরাতন দাসী ইচ্ছার আর আনন্দ ধরে না। রাজারাণীর এক সন্তান মণিমালার ছেলে হইবে শুনিয়া তাঁহাদেরও আনন্দের অবধি থাকিবে না। বকশিশটা প্রচুর লাভ হইবে। সে সেই বকশিশ দেখাইয়া বাড়ীতে এই খবর ছড়াইয়া দিয়া এই কয় দিনের নিঃঝুম নিরানন্দ বাড়ী আবার সরগরম করিয়া তুলিবে।

ইচ্ছা বুড়ি তাড়াতাড়ি গিয়া রাণীমাকে খবর দিল। রাণীমা মুখ অন্ধকার করিয়া সে ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ইচ্ছা মনে করিল রাণীমা বকশিশ আনিতে গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া ভাবিল—রাণীমার আসিতে বিলম্ব হইতেছে; বকশিশ পরে লইলেও চলিবে, যাই মহারাজকে গিয়া খবরটা দিয়া আসি।

মহারাজ সুসজ্জিত কক্ষে মখমলের গদি-আঁটা হাতীর দাঁতের চেয়ারে বসিয়া মার্বেল পাথরের টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া সোনার দোয়াত কলম দিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন; সোনার গুড়গুড়িতে মৃগনাভিগন্ধী অম্বুরি তামাক সাজিয়া ঘিসু খানসামা সোনার মুখনল হাতে করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় ইচ্ছা দাসী আসিয়া খবর দিল। রাজা ধনেশ্বর চিঠি লেখা ছাড়িয়া আর-একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া তাহাতে কি লিখিয়া ইচ্ছার হাতে দিলেন; তালুক-মুলুক দানের হুকুমনামা পরোয়ানা মনে করিয়া ইচ্ছা আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া হাসিতে হাসিতে তাহা দুই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। বুড়িটা একটা খুব জবর রকমের দাও মারিল দেখিয়া ঘিসুর মন ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। ধনেশ্বর সহজ শান্তস্বরে বলিলেন—খাজাঞ্চিকে দিগে, তোর মাইনে চুকিয়ে দেবে, আজ থেকে তোর জবাব হল।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল দেখিয়া ইচ্ছা বুড়ি হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া রাজার পায়ে পড়িল, সে বকশিশ চায় না; তাহার পাঁচসিকা মাহিনার চাকরীটি বজায় থাকুক; এই বুড়া বয়সে তাহার চাকরী গেলে সে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে।

রাজা অবিচলিত ধীর কণ্ঠে বলিলেন—ঘিসু, বুড়িটেকে লাথি মেরে ঘর থেকে দূর করে দে ত।

বুড়ি পা ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইতে-যাইতে ক্রন্দন-কোলাহলে জড়াইয়া-জড়াইয়া বলিয়া গেল—চাকরী করে এই বাড়ীতে বুড়ো হয়ে গেলাম। বুড়ো বয়সে বকশিশ হল এই অপমান! হা ভগবান্‌!

রাজা ধনেশ্বর তেমনি নিশ্চিন্তভাবে চিঠি লিখিতে লাগিলেন। ঘিসুখানসামা পুত্তলিকার মতো শুম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার আর নিশ্বাস ফেলিতেও সাহস হইতেছিল না।

ইচ্ছাদাসী রাখাল ও মণিমালার কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

রাখাল সমস্ত শুনিয়া বলিল—ঠিক হয়েছে! এ অপমান ত তোকে নয় ইচ্ছানানি, এ অপমান আমার। তোর তবু একটা আপনার বলবার মতন কুঁড়ে ঘরও আছে, সেখানে গিয়ে তুই স্বচ্ছন্দে থাকবি; আমার তাও নেই, আমাকে এইখানে পড়ে পড়ে লাথি খেতে হচ্ছে। আমার এক কড়ার সম্বল নেই যে তোর ক্ষতিপূরণ করব। তোর ভাত মারার কারণ হয়ে এ বাড়ীর ভাতের গ্রাস আমার বিষ বলে মনে হবে ইচ্ছা-নানি। তোর সঙ্গে-সঙ্গে এ বাড়ী থেকে আমিও বেরুবো। এই রাজভোগে থাকার চেয়ে গাছতলায় থেকে মুটেগিরি করে খাওয়াও ঢের সম্মানের, ঢের গৌরবের।

ইচ্ছা-নানির কোলে মণিমালা এত-বড়টি হইয়াছে ; সেই বুড়িকে এমন ভাবে তাহাদেরই জন্য অপমানিত হইয়া চাকরী খোআইয়া যাইতে হইতেছে দেখিয়া মণিমালার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। মণিমালা চোখ মুছিয়া উঠিয়া দুখানা চেলির কাপড়, দুখানা বাজু আর দুই শত টাকা বাহির করিয়া ইচ্ছার হাতে দিয়া বলিল—এই বাজু আর চেলি তোর নাত্নি আকালী আর পব্নীকে দিস ; আর এই টাকা তুই রাখিস। তোর নাতি পাতাসুকে মাসে মাসে পাঠিয়ে দিস, আমি তোকে কিছু কিছু তন্‌খা দেবো। তুই বুড়ো হয়েছিস, আর কতকাল দাসপনা করবি? এখন বাড়ী বসে থাকগে যা।

বুড়ির ও রাখালের মন মণিমালার কথায় ও ব্যবহারে অনেকখানি খুসী হইয়া উঠিল। তবু বুড়ি কাঁদিয়া কাটিয়া দুঃখ করিয়া গেল যে সে মণির ছেলেকে হাতে কোলে করিয়া দেখিয়া যাইতে পাইল না।

মণিমালার নূতন ঝি হইল রক্ষা। কঠিন দজ্জাল ঝগড়াস্তে বলিয়া রাজবাড়ীতে তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

(২১)

সঞ্চিত ক্রোধের বজ্র ইচ্ছা দাসীর উপর খরচ হইয়া যাওয়াতে রাজা ও রাণীর মনের দুর্যোগ ও মেঘ অনেকটা কাটিয়া গেল। তাঁহারা নাতির মুখ দেখিবার সম্ভাবনায় অল্পে অল্পে উৎফুল্ল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন ; এবং রাণী এত দিনে মণিমালাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে আদর করিলেন। রাজা ধনেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—মায়ের এইবার নিজের ছেলে হবে, সৎমায়ের আদর আমাদের ভাগ্যে আর একটুও জুটবে না!

মণিমালা সুখে আনন্দে পূর্ণ হইয়া মাথা নত করিয়া শুধু হাসিল ; যে অনাগত শিশু পিতামাতার স্নেহের রাজ্য তাহাদের ফিরাইয়া দিল তাহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া ভাবী মাতার মন মমতায় ভরিয়া উঠিল।

মণিমালার আদরযত্নের আর সীমা নাই ; মা চোখে-চোখে রাখিয়া ফিরেন। ছোঁয়াচ নজর বাও বাতাস না লাগে ইহার জন্য তুকতাক মাদুলি তাগা যে যাহা জানে এবং যে যাহা বলে তাহাই করা হয় ; মণিমালার গলা যেন আন্‌লা হইয়া উঠিল। দেবালয়ে দেবালয়ে পূজা পাঠানো হয় ; গণপতি, কেশব ও সারদানাথ ভট্টাচার্য্য নিত্য বাড়ীতে নারায়ণকে তুলসী দিতেছেন, হোম করিয়া খুব খাঁটি ঘি ভস্মে ঢালিতেছেন, চণ্ডী পড়িতেছেন। শুভদিন দেখিয়া দেখিয়া আজ সীমন্তোন্নয়ন, কাল পঞ্চামৃত, পরশু সাধভক্ষণ হইতেছে ; বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহলের অন্ত নাই, উৎসব-ব্যস্ততার সীমা নাই। রাজা প্রত্যহ পাঁচবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানেন মণিমালার কোনো অসুখ অভাব আছে কি না ; তাহার মন বেশ প্রফুল্ল আছে কি না।

তাহার মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য নানাবিধ দুর্লভ সামগ্রী—বেনারসী কাপড়, আগরার ঘাগরা, দিল্লির ওড়না, ঢাকাই গহনা, হাতীর দাঁতের বাক্স, বিলাতী ঘাগরা-পরা পুতুল প্রভৃতি—নানা দেশ হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল ; নিত্য নূতন সুন্দর ও মূল্যবান উপহারে মণিমালার ঘর ও মন বোঝাই হইয়া উঠিতে লাগিল।

নয় মাসে পড়িতেই দেশের মধ্যে সবচেয়ে যে নাম-করা ভালো দাই তাহাকে আনিয়া বাড়ীতেই রাখা হইল। রক্ষা দাসীর উপর কড়া হুকুম জারি হইল রাত-বিরেতে প্রসব-বেদনা একটু টের পাইলেই যেন রাণী ও রাজাকে খবর দেওয়া হয়। মণিমালাকে পাহারা দিবার জন্য আরো পাঁচ জন দাসী নিযুক্ত হইল, তাহারা পালা করিয়া সর্ব্বদা একজন মণিমালার কাছে থাকিবে ; রাত্রে জাগিয়া বসিয়া পাহারা দিবে।

বাড়ীর চাকর দাসীরা হলুদে ছোবানো কাপড় বকশিশ পাইয়া চারিদিকে আনন্দের রং লাগাইয়া দিয়াছে। সকলের মুখেই হাসি।

এইসব উৎসব আনন্দের মধ্যে রাখালকে সকলে ভুলিয়া বসিয়াছিল। মণিমালাকে লইয়াই সকলে ব্যস্ত। ইহাতে রাখাল হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল ; সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর আনন্দ-উৎসবটাও রক্ষা পাইতেছিল। কিন্তু রাখালের মন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না ; সে সর্ব্বদা ভাবে কেমন করিয়া সে এখান থেকে পলায়ন করিয়া আপন পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে ; আগে সে ও তাহার স্ত্রী ছিল, এখন আবার পরিবার বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে ; বিলম্ব করা আর চলে না, ক্রমশো ভার ও দায়িত্ব বেশী ও তাহা বহনের উপায় কঠিন হইয়া আসিতেছে।

যথাসময়ে মণিমালার একটি ছেলে হইল। দেউড়িতে দেউড়িতে নহবং বসিল, দরজায় দরজায় কলার গাছের কোলে পূর্ণঘটের মুখে নারিকেল বসিল, চৌকাঠে চৌকাঠে আম্রপল্লবের মালা দুলিল। রূপার গামলায় করিয়া বিবিধ মিষ্টান্ন গ্রামের ঘরে ঘরে বিলি হইল। দাই বেনারসী শাড়ী, পাঁচ মোহর, রূপার থালা ও এক জোড়া যশম বিদায় পাইয়া খুশী হইয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। দাসীরা সোনার হাঁসুলি ও চাকরেরা গলার মালায় গাঁথা সোনার কণ্ঠী বকশিশ পাইয়া পরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাজার বিস্তৃত জমিদারীর উত্তরাধিকারী দৌহিত্র হইয়াছে, বোম বন্দুকের শব্দে কাক বেচারারা উদ্বাস্ত হইয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

গরিব রাখালের ছেলে হইলেও রাজা তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী দৌহিত্রের নাম রাখিলেন ভূপাল।

ভূপালের জন্য নিপুণ মালাকর লাল রঙের বিচিত্র সুন্দর সোলার ঝারা তৈয়ার করিয়া দিল; ভূপাল সোনার বাটি হইতে সোনার ঝিনুকে করিয়া দুধ খাইয়া, সোনার কাজল-লতা হইতে কাজল পরিয়া, হাতীর দাঁতে খচিত দোলনায় সাটিন কিংখাবের বিছানায় শুইয়া সেই ঝারা দেখিয়া খেলা করে; একটু কাঁদিয়া উঠিলে পাঁচজন দাসী সোনার ঝুমঝুমি আর গালার রং-করা হাতীর-দাঁতের চুষিকাঠি লইয়া সান্ত্বনা করিতে ছুটিয়া আসে; সকাল বিকাল ঠেলা গাড়ীতে চড়াইয়া হরিয়া খানসামা ভূপালকে হাওয়া খাওয়াইয়া আনে, দুধের বোতল লইয়া ঝুনকিয়া দাসী ও মোটা মোটা লাঠি লইয়া কোমরে তরোয়াল বাঁধিয়া ইনাম সিং জমাদার আর বরকন্দাজ বরকতআলী সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভূপাল এমনি আদরে রাজারাণীর কোলে কোলে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল।

মণিমালা একএকবার সোনায় রূপায় জরিতে সাটিনে মোড়া ভূপালকে আনিয়া রাখালের কোলে দিয়া পরম সুখে হাসিত। রাখাল হাসিয়া বলিত—রাজার নাতিকে কোলে করবার জন্যে ত পাঁচ শ চাকর রয়েছে; আমাকে দিয়ে আর পাঁচ শ এক কর কেন!

মুক্তামালা কৌতুকসুখের কৃত্রিমকোপে চোখ রাঙাইত। রাখাল ভূপালকে বুকে করিয়া পরাধীনতার সকল গ্লানি ভুলিয়া সুখে হাসিত।

(২২)

এমনি সুখের একটানায় জীবনের দিনগুলি হুহু করিয়া গড়াইয়া চলিতেছিল।

রাজার উত্তরাধিকারীর জন্ম হওয়াতে পরম শাক্ত রাজার বাড়ীতে দুর্গোৎসবের বিশেষ রকম আনন্দ-উল্লাস না মিটিতে মিটিতেই আবার কালীপূজা আসিয়া উপস্থিত হইল। মান-সিক করিয়া শিশুর দীর্ঘজীবনের কামনায় নিষ্ঠুরভাবে পশুহননের তামসিক আনন্দ গোসাঁই-বাড়ীতে পালিত বৈষ্ণবপ্রাণ রাখালের চক্ষে বীভৎস বোধ হইতেছিল; চারিদিকে ছাগ মেষ মহিষের কাতর আর্ত্তনাদ ও রক্তপিশাচ লোকগুলার বিকট মা মা রবে চীৎকার রাখালকে বিক্ষুব্ধ পীড়িত করিতেছিল; রাখালের মন মূক পশুর দুঃখে ও মত্ত মানবের ব্যবহার দেখিয়া বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে আপনাকে সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপ-নাকে একটি ঘরে গোপন করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। বাড়ীর লোকেও এই আনন্দ-সঙ্গতের তাল কাটিয়া যাইবার ভয়ে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবারও চেষ্টা করিতে-ছিল না।

কালীপূজার রাত্রি। বাড়ীতে ছাদের আলিসায় আলি-সায় দীপমালা জ্বলিতেছে, আকাশের নিবিড় অন্ধকারে নক্ষত্রমালা জ্বলিতেছে, উভয়ের মাঝখানে বাজির ফুৎকার ও লোকের চীৎকার উঠিতেছে, এবং রাজবাড়ীর লোক-দের চক্ষু মদ্যমাংসের প্রচুর পরিবেষণে আনন্দে জ্বলিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

রাণী জগদ্ধাত্রী স্বচ্ছ শ্বেত পাথরের গেলাসে পিঙ্গলবর্ণের মৃদুবীর্য্য স্বাদু মদ ঢালিয়া স্খলিত কণ্ঠে মণিমালার দিকে অগ্রসর করিয়া ধরিয়া বলিলেন—মণি, তুই একটু খা।

মণিমালার মুখ শুকাইয়া গেল। সে শুষ্ক মুখে বলিল—না মা, আমি খাব না।

রাণী জগদ্ধাত্রী জেদ করিয়া বলিলেন—খাবিনে কি? আজকে মা-কালীর পেসাদ একটু মুখে দিতে হয়।

মণিমালার বলিতে ইচ্ছা ছিল না, তবু না বলিয়া পারিল না। ভয়ে ভয়ে বলিল—না মা, মদ খেলে উনি রাগ করবেন। বিজয়াদশমীর দিন সিদ্ধি খেয়েছিলাম বলে কত রাগ করছিলেন।

রাণী জগদ্ধাত্রী হা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—রাখাল! রাখাল রাগ করবে এই ভয়ে তুই খাবি নে? এই ষোল বচ্ছর খেয়ে এলি, গেল বছরও ত খেয়েছিলি, আর আজকে হল রাখালের ভয়! রাখাল কি তোকে ধমকায় নাকি? এত বড় আস্পর্দ্ধা। এই, কে আছিস, ডেকে আন ত' রাখালকে…

মণিমালা তাড়াতাড়ি মায়ের হাত হইতে গেলাস লইয়া বলিল—মা, মা, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি। তুমি ওঁকে কিচ্ছু বোলো না, আমি খাচ্ছি!

মণিমালা স্বামীকে অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য নিজের হাতে তুলিয়া সমস্ত বিষটুকু পান করিল।

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিলেন—লক্ষ্মী মেয়ে। যাও এখন শোওগে যাও।

মণিমালা ম্লান মুখে বলিল—যাব 'খন, তোমাদের খাওয়া দাওয়া হোক।

যখন সকলে যে যার ঘরে গিয়া বিছানায় পড়িল তখন গভীর রাত্রে অনেক দেরী করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া রাখাল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে আশা করিয়া মা-কালীর নাম জপিতে-জপিতে মণিমালা আপনার ঘরে গেল। ঘরে ঢুকিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

রাখাল বলিল—এত রাত্তির করে এলে, আমি তোমার জন্যে এখনো জেগে রয়েছি। এস…

রাখাল মণিমালাকে বুকে লইবার জন্য হাত বাড়াইল। মণিমালার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; রাখালের এই সাদর আহ্বান অগ্নিপরীক্ষার ন্যায় অতি নিদারুণ ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইল। মণিমালা স্তম্ভিত নির্ব্বাক আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল আবার বলিল—এস। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

মণিমালার মাথা ঘুরিতেছিল, সে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

—কি! অমন করছ কেন। অসুখ করছে না কি?—বলিতে বলিতে রাখাল খাট হইতে তড়াক করিয়া লাফাইয়া নামিয়া আসিয়া নত হইয়া মণিমালাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—তোমার মুখে ও কিসের গন্ধ? মদ খেয়েছ? মাতাল হয়ে আমার কাছে এসেছ?

মণিমালা কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল—আমি অপরাধ করেছি, আমাকে মাপ কর!

রাখাল গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—মাতালকে আমি মাপ করিনে, তুমি দূর হও। একদিন সিদ্ধি খেয়েছিলে, মাপ করেছিলাম; আজ আবার মদ খেয়ে এসেছ! তোমাকে আর বিশ্বাস নেই। তুমি বেরোও।

মুক্তামালা স্বামীর দুই পা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আজকে আমায় ক্ষমা কর; এমন অপরাধ আর কখনো করব না, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

রাখাল আর কিছু না বলিয়া মণিমালার হাত ধরিয়া তুলিয়া জোর করিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।

উত্তেজনার মুখে রাখাল হয়ত একটু উঁচু গলায় চড়া কথা বলিয়াছিল। সেই গোলমাল শুনিয়া একদিক হইতে বরজহাটির দিদি ও অপর দিক হইতে রাণী জগদ্ধাত্রী এবং তাঁহাদের সঙ্গে-সঙ্গে অনেকগুলি দাসী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাখাল মণিমালাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল দেখিয়া বরজহাটির দিদি বলিয়া উঠিলেন—একটা গেঁয়ার চাষার হাতে রাজকন্যার খোয়ার দেখলে গা জ্বলে যায়। রাজার যেমন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই, বাঁদরের গলায় দিলেন মুক্তার মালা! মানুষ হলে সে মাথায় করে রাখত, বাঁদর তাকে দাঁতে কাটছে! মণি যদি শক্ত হত ত উঠতে বসতে পায়ে ধরতে হত।

রাখালের মন গুণটানা ধনুকের মতো চড়া হইয়া উঠিয়াছিল; বরজহাটির দিদির কথার আঘাতে ক্রোধের বাণ ছিটকাইয়া গেল। রাখাল বলিয়া উঠিল—বরজহাটির দিদি, জুতোর দাম লাখটাকা হলেও সে পায়ে থাকে; তোমাদের কাছে মণিমালা রাজকন্যা, তোমরা তাকে ভয় করতে পার; আমি তাকে লাথি মারতে পারি।

রাখালের পা হঠাৎ ছুটিয়া মণিমালার গায়ে বাজিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী অমনি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কী! আমরা কি এতকাল দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছিলাম! আমার সামনে আমার মেয়েকে অপমান! আজকে একটু

মুখে দিতে হয় বলে আমিই জেদ করে একটুকু মা-কালীর পেসাদ খাইয়েছিলাম, নইলে গোঁয়ার স্বামী বকবার ভয়ে ও ত খেতে চাচ্ছিল না! এ লাথি ত মণিকে মারা নয়, এ আমাকে মারা হয়েছে!

মণিমালা তাড়াতাড়ি গিয়া মায়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া মিনতি জেদ ও তিরস্কার মিশাইয়া বলিল—মা, তুমি শুতে যাও। আমাদের একটু ঝগড়া হয়েছে কি না-হয়েছে তাতে তোমরা ছুটে এলে কেন?

রাখাল ক্রোধের উত্তেজনায় জ্ঞান হারাইয়া হঠাৎ যে গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহার লজ্জায় ও অনুতাপে কাতর হইয়া সে ঘরে লুকাইতে যাইতেছিল; দংশন করিয়া সাপ গর্ত্তে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া রাণী জগদ্ধাত্রী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন—ঝুনকিয়া, ইনাম সিং জমাদারকে ডাক ত, বেইমান চাষাটাকে ঘাড় ধরে বা'র করে দিক।

রাখাল উদ্ধত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কি বলিতে যাইতেছিল। মণিমালা ছুটিয়া গিয়া রাখালের দুইপা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তাহার দিকে তুলিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি একটিও কথা কয়ো না; ফুঁ দিয়ে আগুন উস্কে তুলো না; তুমি ঘরে যাও, আমাকে হুকুম কর আমিও ঘরে যাই। যা দণ্ড দিতে হয় তুমি দিয়ো, এত লোককে দিয়ে আমায় অপমানি করিয়ো না।

রাখাল মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতো ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গেল। মণিমালাও তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সমবেত লোকেদের নাকের সামনে ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া খিল লাগাইয়া দিল।

রাণী হইতে দাসী পর্য্যন্ত সকলে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধ দরজার দিকে তাকাইয়া রহিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী বরজহাটির দিদির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!

বরজহাটির দিদি গালে হাত দিয়া ঘাড় কাত করিয়া মুখে শব্দ করিলেন—প ছু!

(২৩)

রাখাল উদ্বেগ উত্তেজনায় পীড়িত হইয়া আর শুইতে পারিল না; কৌচের উপর জাগিয়া বসিয়া রহিল। মণিমালা নীরবে আসিয়া স্বামীর পায়ের কাছে ক্ষমার প্রতীক্ষা করিয়া বসিল; তারপর বসিয়া-বসিয়া ক্লান্ত হইয়া সেই মেঝের গালিচার উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাখাল লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় তাহার দিকে তাকাইতেও পারিতেছিল না। কাহার অপরাধ বেশী, কে কাহাকে ক্ষমা করিবে তাহাই সে বসিয়া ভাবিতেছিল। আর তাহার কানের কাছে রাণী জগদ্ধাত্রীর একটি কথা অনুক্ষণ বাজিতেছিল—গোঁয়ার স্বামীর বকবার ভয়ে ও ত খেতে চাচ্ছিল না!

প্রায় দেড় বৎসর হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, এতকাল রাখাল মণিমালাকে লইয়া অবিচ্ছেদে ঘর করিতেছে, এতদিনে মণিমালাকে তাহার চিনিতে পারা উচিত ছিল। মণিমালা যে তাহারই ইচ্ছানুগত হইয়া চলিতে চায় তাহার পরিচয় ত সে বারবার পাইয়াছে। তবে সে দারুণ রাগের বশবর্ত্তী হইয়া এমন অন্যায় ভুল করিয়া বসিল কেন? একদিন ভাঙ খাওয়াতে সে ত তাহার স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া নিষেধ করিয়াছিল এবং মণিমালাও ত তাহার শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল যে সে জীবনে আর কখনো মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না; তৎসত্ত্বেও মণিমালা আজ যে মদ খাইয়া আসিল তাহাতে রাখালের রাগ না করিয়া ইহাই বুঝা উচিত ছিল যে এ বাড়ীর হাওয়া এমন দূষিত, সংসর্গ এমন কলুষিত যাহাতে মণিমালা বাধ্য হইয়া আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে, সে স্বেচ্ছায় এ কাজ করিতে পারে না!—এই কথা মনে হওয়াতে রাখালের অন্তর আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; তখন তাহার মনে হইতে লাগিল এই পাপসংসর্গে তাহার স্ত্রীকে রাখা আর কিছুতেই উচিত নয়, তাহারও থাকা অনুচিত হইতেছে অনেক দিন হইতেই। কিন্তু সে যে নিঃস্ব, আশ্রয়হীন; রাজার মেয়েকে লইয়া গিয়া কোথায় রাখিবে, কেমন করিয়া রাখিবে? মণিমালাই কি এই রাজৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া তাহার সঙ্গে যাইতে রাজি হইবে? মণিমালা তাহাকে যেরূপ ভালো বাসিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহাতে সে যাইতে রাজি

হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সে রাজি হইলে এখান হইতে চলিয়া যাইবারই বা উপায় কি, চলিয়া গিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতি-পালনেরই বা উপায় কি ? আর মণিমালা যদি স্বেচ্ছায় না যাইতে-চাহে তবে তাহার স্ত্রীকে নিরাপদ করিবারই বা কি উপায় সে করিতে পারে।—ইহা ভাবিতে ভাবিতে রাখাল আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মাথার মধ্যে চিন্তার শত আবর্ত্ত তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতে লাগিল। এই বিষম জটিল গোলকধাঁধা হইতে পথ কোথায়, মুক্তির উপায় কি, তাহাই ভাবিয়া রাখালের সমস্ত অন্তর আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

অনেক বেলা হইয়া গেল। দুঃখের অবসাদে আচ্ছন্ন মণিমালার ঘুম তখনো ভাঙে নাই। সমস্ত রাত্রির বিক্ষুব্ধ জাগরণে রাখালেরও চেহারা মাতালের মতন হইয়া উঠিয়াছে। রাখাল ঠায় আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে।

ঘিসু খানসামা বাহিরে গলা খাঁখারি দিয়া ডাকিল—জামাইবাবু, মহারাজ আপনাকে ডাকছেন।

রাখাল বলিল—যাচ্ছি চল।

মণিমালার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া রাখালের পা ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল—আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখ, বাবার বকুনির তুমি একটি উত্তর দিতে পারবে না। আমরা দোষ করেছি। তাঁদের শাসন সহ্য করতে হবে। বল, করবে ?

রাখাল মণিমালাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া গম্ভীর ভাবে শুধু বলিল—করব মণি, আজ আমি সব সহ্য করব।

মণিমালা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বুঝিল, তাহার স্বামীর মনে কাল রাত্রে কি ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

রাজা ধনেশ্বর চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিলেন। রাখাল অপরাধীর ন্যায় কুণ্ঠিত ধীর পদে আসিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত্ত সমস্ত নিস্তব্ধ।

রাজা ধনেশ্বর শান্ত ধীর কণ্ঠে অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—দেওয়ানজীকে বলেছি; তিনি সব বন্দোবস্ত করে দেবেন; তুমি নেয়ে খেয়ে নিয়ে তোমার দেশে ফিরে যাও। আমরা মনে করব মণিমা বিধবা হয়েছে। তুমি যে-সমস্ত জিনিস ব্যবহার করতে, সে সমস্তই তোমার, তুমি ইচ্ছা করলে নিয়ে যেতে পার।

রাখাল একবার শুধু মুখ তুলিয়া রাজার দিকে চাহিল। তারপর শ্বশুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া যেমন নীরবে গিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। ফিরিবার পথে রাণীর ঘরে গিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। তারপর নিঃশব্দে আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল।

মণিমালা উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। দৃষ্টিতে প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

রাখাল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—ছুটি পেয়েছি মণি। আমার রাজার জামাই সাজার পালা শেষ হয়েছে; এখন জাত্রার পালা শেষ করে যাত্রার জোগাড় করতে হবে !

রাখাল ছলছল চোখে অগ্রসর হইয়া মণিমালার দুই হাত ধরিয়া বলিল—যাবার আগে তোমার কাছে আমি হাতে ধরে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি। আমার সকল অত্যাচার সকল রূঢ়তা ভুলে যেয়ো, যদি কিছু ভালো বাসার পরিচয় পেয়ে থাক শুধু সেইটুকু মনে রেখো। তুমি জানো আমি তোমায় লাথি মারতে পারি না; তোমার চারদিকে ঐশ্বর্য্যের যে অহঙ্কার জড়িয়ে থেকে আমাদের মিলনকে ক্রমাগত বাধা দিচ্ছিল, আমি তাকেই লাথি মেরে ভাঙতে গিয়েছিলাম। তাতে তোমাকেও দুঃখ পেতে হয়েছে, আমাকেও আমি বাঁচাতে পারিনি। আমাদের মিলনের বাধা ভাঙতে গিয়ে মিলনের বন্ধনও ছিঁড়ে গেল মণি ! তবু এ আমার মুক্তি !...ভূপাল তোমার কাছে রইল; আমার কেউ রইল না, দিদিমাও আমার আজ বেঁচে নেই। ভূপালের কাছে আমার নাম কেউ করবে না; যদি বা করে, তাতে ভূপালের মনে হবে তার বাবা ছিল একটা দানব কি রাক্ষস। তার কাছে তার বাবার যথার্থ পরিচয় তুমি দিয়ো।

রাখালের শোকে কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইল না। সে শান্ত ধীর ভাবে একে একে অশ্রুমুখী পত্নীকে ও হাস্যমুখ পুত্রকে চুম্বন করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে মুক্ত গগনের স্বাধীন বিহঙ্গ সোনার পিঞ্জর হইতে মুক্তি পাইয়াছে, তাহার আনন্দও হইতেছিল, আবার পিছনে যাহাদের ফেলিয়া যাইবে তাহাদের জন্য বেদনাও বোধ করিতেছিল। রাখাল এখন বুঝিতে পারিতেছিল এই দেড় বৎসরেই তাহার শ্বশুরবাড়ী তাহার কত আপনার হইয়া

উঠিয়াছিল; আজন্মের পরিচিত দেশে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে আবার নূতন করিয়া সকলের সঙ্গে পরিচয় করিতে হইবে। তাহার এই দ্বিতীয় নির্ব্বাসন।

অনেকক্ষণ কান্নার পর মণিমালা প্রথম কথা বলিতে পারিয়াই দৃঢ়স্বরে রাখালকে বলিল—তোমার সঙ্গে আমিও যাব।

রাখাল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আমার সঙ্গে কোথায় যাবে মণি? আমার বলে—

চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো,
পরের বাড়ী হবিষ্যি!

আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখব?

—যেখানে তুমি থাকবে।

—সে কুঁড়েঘরে তুমি থাকতে পারবে কেন? সেখানে দাসদাসী নেই, কে তোমার সেবা করবে? এ অসম্ভব মণি।

মণিমালা দৃঢ়স্বরে বলিল—তোমার সঙ্গে আমি গাছ-তলাতেও সুখে থাকব; তোমায় ছেড়ে আমি এবাড়ীতে থাকতে পারব না।

রাখাল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মণিমালার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহা সঙ্কল্পে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। রাখাল উচ্ছ্বসিত আনন্দ যথাসাধ্য গোপন করিয়া বলিল—বেশ করে ভেবে দেখো মণি। তোমাদের গোয়াল-ঘরের চেয়েও খারাপ মেটে বাড়ী, বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা, কেঁচো জোঁক কিলকিল করছে; ঘরের কানাচে শেয়াল ডাকে; গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নাইতে হবে, কাঁখে কলসী করে জল তুলতে হবে, গোবর দিয়ে ঘর নিকোতে হবে, রাঁধতে হবে, বাসন মাজতে হবে। এ সব সইতে পারবে?

মণিমালা দৃঢ় স্বরে বলিল—পারব।

রাখাল আনন্দিত হইয়া বলিল—তবে যাও, বাপ মায়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এস। আমরা মনের সুখে সকল ক্ষতি পূরিয়ে নিয়ে কুঁড়ে ঘরে স্বর্গ রচনা করব মণি!

মণিমালা স্বামীর সম্মতি পাইয়া তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গেল। গিয়া দেখিল সেখানে তাহার বাবাও গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন। তাহার উৎফুল্ল মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রাজা ধনেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—কি গো মা?

মণিমালা তাড়াতাড়ি আগ্রহের সহিত বলিল—বাবা, আমিও যাব।

বিস্মিত হইয়া রাজা ও রাণী বলিয়া উঠিলেন—কোথায় রে?

মণিমালা মাথা নত করিয়া বলিল—ওঁর সঙ্গে।

—সেখানে তুই কোথায় যাবি? ওর না আছে বাড়ী ঘর, না আছে চাকর দাসী। ওর সঙ্গে যাবি কি র্‌ে?

মণিমালা স্পষ্ট স্বরে বলিল—ওঁর সঙ্গেই তোমরা আমার বিয়ে দিয়েছ। ওঁর সঙ্গেই আমি যাব!

রাণী জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—যম জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা।
বেটি মাটি ঘর, হাত বদলালেই পর!

রাজা ধনেশ্বর তীব্র দৃষ্টিতে একবার মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা জাঁকিয়া বসিয়া আছে। তিনি বলিলেন—তোমরা মনে করেছ—তুমি যেতে চাইলেই আমি রাখালকে থাকতে বলব? তোমার বাবাকে তুমি তা হলে চেনো নি।

মুক্তামালা দৃঢ়স্বরে বলিল—তাঁকে একদণ্ডও এ বাড়ীতে আমি থাকতে বলতে পারিনে। তাঁর যাওয়াই উচিত, তাঁর যাবার উপায় আমি অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম। এখন তিনি যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে আমিও যাব।

রাজা ধনেশ্বর রূঢ়স্বরে বলিলেন—যাবে যাও, গহনা-পত্তর বেচে খেয়ে, যখন উপোষ করতে হবে তখন ফিরে এসো। সোনাউল্লা জমাদারকে পাঁচ টাকা মাইনে আর খোরাকি দিতে চাইলাম; সে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্লে—নেহি রহেগা! তারপর কিছুদিন বাদে এসে বল্লে—মহারাজ, দরমাহাসে কাম নেই, খালি খোরাকি মিলনেসেই রহেগা!

ধনেশ্বরের সূক্ষ্ম সৌখীন গোঁপের তলে একটি মৃদু হাস্য-রেখা ঈষৎ ফুটিয়া মিলাইয়া গেল।

তাহা দেখিয়া ও বাবার উপমাযুক্ত কথা শুনিয়া মণি-মালার অসহ্য বোধ হইল; সে পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ধনেশ্বর ডাকিয়া বলিলেন—ভূপালের জামা-কাপড়গুলো বার করে রক্ষার কাছে বুঝিয়ে দিয়ে যেয়ো ..

মণিমালা যাইতে-যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া গেল—ভূপালও আমাদের সঙ্গেই যাবে।

রাজারাণী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের সব গেল, রহিল শুধু জেদ আর জমিদারী চাল।

দাবানলের মতো সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল যে রাজার মেয়ে জামাই নাতি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। গুমটের দিনে যেমন একটি পাতা নড়ে না, সমস্ত দেশটা তেমনি স্তম্ভিত হইয়া গেল। রাখালের কিন্তু ফূর্ত্তি ধরিতেছিল না—তাহার মুক্তি, অথচ মণিমালাকে তাহার হারাইতে হইল না।

শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি মণিমালার পিসি কমলাকে সঙ্গে করিয়া পাহাড়পুরে আসিয়া পড়িলেন; দুজনে মিলিয়া রাজার রাগ যদি শান্ত করিতে পারেন। কিন্তু রাজা-রাণীর সহিত তাঁহাদের দেখা হইল না; রাজা-রাণী এই কতকক্ষণ আগে তাঁহাদের বড়গাছিয়ার বাগান-বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হতাশ হইলেন, এ রাগ তবে শীঘ্র পড়িবার নয়।

রাখাল ও মণিমালা হাসিয়া কাঁদিয়া সকলের কাছে বিদায় লইল। আজ পাগলা জামাই বাবুর জন্যও চাকর দাসী সকলেই চোখের জল ফেলিল। সকলকে বেশী করিয়া কাঁদাইল ভূপালের অবিশ্রাম হাসি।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবোত্তর বিশ্বনাট্য

শ্রীসরযূবালা দাসগুপ্তা প্রণীত

(সমালোচনা)

শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তার এই নূতন "দেবোত্তর" নাটকটিকে এদেশের পাঠকেরা বাংলাসাহিত্যের একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিবেন কি না তাহা বলিতে পারি না। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন, "Genius is the introduction of a new element in the intellectual universe"—প্রতিভা চেতনলোকে একটি নূতন উপাদানের অভ্যুদয়ের মত—সেই জন্যই তো প্রতিভাকে সমাদৃত ও সুপরিচিত হইতে গেলে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। সুতরাং যে দুচারজন রসগ্রাহী সেই প্রথম অভ্যুদয়েই জয়ধ্বনি করে, সমস্ত পাঠকবর্গের সংশয়-কোলাহলের মধ্যে তাহাদের সে জয়ধ্বনিটুকু কোথায় মিলাইয়া যায়।

শ্রীমতী সরযূবালা এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে আরও দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন—বসন্তপ্রয়াণ ও ত্রিবেণীসঙ্গম। এই তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ। বাংলাসাহিত্যে এখন রবীন্দ্রনাথ একচ্ছত্র সম্রাট—এখনকার সাহিত্যিকগণ জ্ঞাতসারে হোক্ অজ্ঞাতসারে হোক্ তাঁকেই প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তাঁরা তাঁর সৌরজগতেরই অন্তর্গত। তাঁহাদের কারো যে কোন বিশেষত্ব নাই এমন কথা বলি না—ভাষার বা ভঙ্গিমার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য তাঁহারা কেহ কেহ ফুটাইতে পারিয়াছেন বটে। তবে তাহাতে নূতন আর্টের সৃষ্টি হয় না। কারণ আর্ট শুধু ভঙ্গিমা নয়; আর্টের প্রাণ একটি নূতন নিজস্ব প্রকৃতি (temperament), একটি নূতন দৃষ্টি, নূতন রসানুভূতি। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগে শ্রীমতী সরযূবালা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সাহিত্য-স্রষ্টার নাম করিতে পারি না যাঁর উপর রবীন্দ্রনাথের লেশমাত্র প্রভাব পড়ে নাই। এই একটি জ্যোতিষ্ক বৃহস্পতির মত আপনার আলোকে আপনি দীপ্যমান, রবির আলোকের কোন অপেক্ষাই রাখে নাই।

আমার মনে হয় যে, এই বইখানি এই একটি কারণে গৃহীত হইতে বাধা পাইতে পারে। কিন্তু ইহার গ্রহণের পক্ষে এই বাধাই সর্ব্বপ্রধান বাধা নয়। দান্তে কি গেটে কি ব্রাউনিংকে বোঝা যে-সকল কারণে শক্ত, সেই-সকল কারণেই এই লেখিকাটিকেও বুঝিতে বাধা আছে। দান্তে, গেটে প্রভৃতির ভাণ্ডার কত তত্ত্ব, কত ইতিহাসপুরাণ, কত দেশের কত শিল্পরস প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণে পরিপূর্ণ। সেই-সকল উপকরণের সাহায্যে তাঁহারা যে ইমারত গড়িয়াছেন তাহার মোটামুটি একটা সৌন্দর্য্য বুঝিলেও খুঁটিনাটির (details) রস পাওয়া যায় না, যদি না সেই উপকরণগুলির সঙ্গে ভাল রকমের পরিচয় থাকে। তখন উপকরণগুলিই পদে পদে বিভ্রম জন্মায়। সরযূবালার ভাণ্ডারও যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী। এখনকার কালের বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, এবং অন্যান্য সকল তত্ত্ব, এখনকার কালের সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যশিল্প, এদেশের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিতরকার তত্ত্বগুলি—এই সমস্ত বিচিত্র উপকরণের স্তূপ এই লেখিকার মনের ভিতরটাকে একেবারে ঠাসিয়া রহিয়াছে। ইঁহার সৃষ্টিকার্য্যে এ সমস্তেরই বিচিত্র ব্যবহার দেখিতে পাই। সেইজন্য ইঁহাকে বুঝিতে গেলেও একালের সমস্ত তত্ত্ব, সাহিত্যের সমস্ত উপাদান-উপকরণগুলিকে বেশ করিয়া আয়ত্ত করা চাই। সে যে বড় শক্ত কাজ। দান্তে, গেটে, ব্রাউনিং এইজন্যই কোন-কালেই সর্ব্বজনপ্রিয় (popular) হইতে পারেন না। সরযূবালাও সর্ব্বজনপ্রিয় লেখিকা হইবেন না। সর্ব্বজনপ্রিয় যাহারা হয়, তাহাদের কতগুলি বাহিরের চাকচিক্য থাকে—ভাষার ছটা, উপমার ঘটা প্রভৃতি কতগুলি যাদুকরী শক্তির দ্বারা তারা পাঠকদের মন ভুলায়। ইঁহার মধ্যে সেই ছলাকলা একেবারেই নাই; ইঁহার ভাষা অত্যন্ত ঋজু (direct) পরিষ্কার ও অনাড়ম্বর, ভাবের মহোচ্চ শিখরে উঠিয়াও তাহার মুখে কোন ক্লান্তির চিহ্ন, কোন চেষ্টার বাহ্য লক্ষণ দেখা যায় না। ভাবপ্রকাশের জন্য এতটুকু তৌর্য্যত্রিক এই লেখিকা ব্যবহার করেন নাই বলিয়াই ইঁহার ষ্টাইল বাংলাভাষায় এমন একটি অসাধারণ শুভ্র দীপ্তি সঞ্চার করিতে পারিয়াছে।

তবু যে দুই বাধার উল্লেখ করা গেল, সেই দুই বাধাই যাঁহারা কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহারাও অনেকে এই কথাই বলিবেন যে, আমরা ত আধুনিক ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যে বেশ রস পাই, "দেবোত্তর" পড়িয়া সে রস পাই না কেন? তাহার কারণ কি সোজাসুজি এই নয় যে, এখানে লেখিকার সৃষ্ট চরিত্রগুলি কতগুলি তত্ত্ব বা থিওরির বাহনমাত্র হইয়াছে, তাহারা রক্তমাংসবিশিষ্ট সজীব মানুষ হইয়া উঠে নাই? সেইজন্য এ নাটকে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব জানার এক রকমের রস থাকিতে পারে, কিন্তু আসল রস—মানব-রসই নাই, human interest নাই। এ নাটকের পাত্রগুলি, মাতুমোড়ল, পরিচালক, বৈজ্ঞানিক, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলেই সমাজ সম্বন্ধে, রাষ্ট্র বা অর্থনীতি সম্বন্ধে কতগুলি থিওরি লইয়া গণ্ডগোল করিতেছে। এ নাটকে পাত্রপাত্রীদের মধ্যে যে-সকল ঘাতপ্রতিঘাত জাগিয়াছে, তাহা মতের সঙ্গে মতের সংঘর্ষ, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ নয়।

তারপরে তাঁহারা আরো বলিবেন যে, এ নাটকের প্লট বা আখ্যান-ভাগটিও বিদেশীক। যে-সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এ নাটকে আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের একটিকেও এদেশে দেখা যায় না। কোথায় আমাদের দেশে ধনী ও শ্রমীর সমস্যা (capital and labour problem), এবং সেই জন্য সোস্যালিজম্ বা সিণ্ডিকালিজম্ (socialism, syndicalism) বা ঐরূপ কোন আন্দোলন, কোথায় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে মূলধনওয়ালার সংঘর্ষ, কোথায় বা স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ লইয়া যে-সকল সমস্যা পশ্চিমে জাগিয়াছে সে-সকল সমস্যা (sex-problem)! এ কোন সমস্যাই এ দেশে দেখা দেয় নাই, বা এ-সকল সমস্যাপূরণের জন্য কোন আন্দোলনও দেখা দেয় নাই। আমাদের মজুরদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ বা সমাজ-বোধ নাই এবং সেই কারণেই Working Men's Association or Trade Unionism বা Co-operative Credit Societies প্রভৃতি এদেশে দেখা দেয় নাই। দীনুমোড়ল এদেশে কোথায়? পরিচালক এ দেশে কোথায়? বৈজ্ঞানিক কোথায়? এ-সমস্ত চরিত্র একেবারেই "বস্তুতন্ত্র" নয়। সুতরাং যে-সব চরিত্র বা অবস্থা এদেশে দেখা দেয় নাই, তাহাদের গড়িয়া খাড়া করিয়া ধরিলে মানুষের ঔৎসুক্য তাহাদের প্রতি স্বভাবতই ছোটে না। যেমন ইউরোপীয় নরনারীর প্রেমাভিনয়ের নকল করিয়া এদেশের নরনারীর প্রেমলীলা নাটকে-উপন্যাসে চিত্রিত করিলে তাহা বাস্তব হয় না এবং সেই কারণেই অগ্রাহ্য হয়, ঠিক্ সেই রকম এ-সকল চরিত্র ও চিত্র এদেশের হিসাবে অবাস্তব ও অপ্রত্যক্ষ বলিয়াই এগুলি গ্রাহ্য না হইবার কারণ আছে।

এতক্ষণ পরে যে দুইটি আপত্তি পাওয়া গেল, এগুলি কাজের আপত্তি বটে। এই আপত্তিগুলির ভিত্তি আছে কি নাই তাহা দেখিয়া গ্রন্থসমালোচনায় হাত দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম আপত্তির উত্তর আমি জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে "আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি" বলিয়া এক প্রবন্ধে কতক দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে আমি বলিয়াছি যে এখনকার নাট্যে উপন্যাসে simple types, সাদাসিধা চরিত্র অঙ্কণ যে আর চলে না তাহার কারণ—সমাজ ও সভ্যতার অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে এখনকার মানুষের মানসলোকটারও বদল হইয়া গেছে, তাহার পরিধির বিস্তার হইয়াছে, তাহার কেন্দ্র গভীরতর হইয়াছে, তাহার মধ্যে নানা জটিলতা উপস্থিত হইয়াছে। যেমন ধরা যাক চাষী কি মজুরের চরিত্র। তাহা আর এলিজাবেথের সময়কার নাটকের clown-এর চরিত্র হইতে পারে না। এখন চাষী বা মজুর যে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া শ্রমের মর্য্যাদা বুঝিয়া বড় বড় সমবায় গড়িয়া তুলিতেছে। আগেকার মত তাহার মনের সমস্ত অনুরাগ তো তাহার ক্ষেতটুকু বা শ্রমটুকুর মধ্যে সংকীর্ণ-দেশকালে বদ্ধ নয়। ব্যাপক দেশকালে বিস্তৃতক্ষেত্রে তাহার মন ছাড়া পাওয়ার জন্য এখনকার নাট্য বা উপন্যাসে মজুর আর clown নয়—সে একটা মস্ত আন্দোলনের চালক ও নিয়ামক, সে একটা সমাজ-শক্তি, সে বিশ্বমানবের বিগ্রহ। এইরূপে চরিত্র যতই জটিল হয়, ততই তাহার কাজগুলি আর অত্যন্ত বেশি পরিমাণে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না, ভিতরকার মানসবৃত্তিগুলার ও শক্তিগুলার পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতই তখন বেশি করিয়া তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে এবং বাহিরের ঘটনাকে তেমন করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন বিরল হইয়া আসে। মানুষের মানসপ্রকৃতির এই জটিলতাকে আধুনিক নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক হয় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করেন,—যেমন জর্জ্জ মেরেডিথ্ তাঁহার উপন্যাসগুলিতে করিয়াছেন,—নয় রূপক গড়িয়া symbolsএর সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করেন—যেমন সাডারম্যান (Sudermann) বা এনড্রিভ (Andriev) প্রভৃতি তাঁহাদের নাট্যগুলিতে করিয়াছেন। এই symbolism বা রূপকসৃষ্টি আবার দুই ভিন্নপ্রকারের হইতে দেখা যায়। একরকমের রূপক-নাটককে ভাব-প্রধান (idealistic) বলা যায়; অন্যরকম রূপক-নাটককে বস্তুপ্রধান (realistic) বলা যায়। মেটারলিঙ্ক বা ইয়েটস্ বা সিঞ্জের নাটক প্রথমশ্রেণীর; সাডারম্যান্ বা এনড্রিভ্ বা ব্যয়রনসনের (Bjornson) নাটক দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর রূপক নাটকে কতগুলি ভাবকে রূপ দিবার জন্য চরিত্র সৃষ্টি করা হয়—বলাবাহুল্য, সে চরিত্রগুলি কোন মতেই বাস্তব চরিত্র নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপক নাটকেও ভাব-গুলিকে রূপ দেওয়া হয়—কিন্তু বাস্তব চরিত্র ও ঘটনার আধারে ফেলিয়া। সেই বাস্তবের ছাঁচে ভাবগুলিকে ঢালাই করিয়া নূতন নূতন চরিত্র সৃষ্টি করা হয়। শ্রীমতী সরযূবালার এই নাটকখানি সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক।

সুতরাং এ নাটকের পাত্রপাত্রী কতগুলি অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্ থিওরির বাহন মাত্র, এ কথা বলিলে বইখানির প্রতি অবিচার করা হইবে। ইহারা প্রত্যেকেই বাস্তব, অথচ বাস্তব জগতে ইহাদিগকে আকারে প্রকারে মিলাইয়া লওয়া শক্ত। কারণ ইহারা symbols বা রূপকচ্ছবি। সাডারম্যানের "The Eternal Masculine" নাটকের প্রধান পাত্র একজন চিত্রকর—কিন্তু সে চিত্রকরকে বাস্তবজগতে তো কোথাও দেখা যায় না। অথচ সে চিত্রকরের চরিত্র একেবারে বাস্তব—তাহাকে চোখে দিব্য দেখিতে পাই। সেই ব্যক্ত চিত্রকর হইতে আদর্শীভূত যে চিত্রকর তাহার কাছ পর্য্যন্ত পাঠকের মনকে পৌঁছাইয়া দিবার শক্তি খুব বড় শিল্পীর শক্তি। সুতরাং এই জায়গায় ভাবপ্রধান রূপক রচনার চেয়ে বস্তুপ্রধান রূপক-রচনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়। কতগুলি ভাবকে রূপ দেওয়ার চেয়ে বাস্তবের অন্তরতম ভাব ও আদর্শগুলিকে খুলিয়া দেখানো, প্রত্যক্ষ করিয়া দেখানো, ঢের বেশি শক্ত কাজ।

শ্রীমতী সরযূবালার এ নাটকে সন্ন্যাসী, দীনুমোড়ল, বৈজ্ঞানিক, পরিচালক, জমিদারপুত্র, কামিনী প্রভৃতি সকল চরিত্রগুলিই একদিকে খুব বাস্তব—ইহারা কোন অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্ বা অবচ্ছিন্ন ভাবের কল্পমূর্ত্তি মাত্র নয়। অথচ ইহারা সকলেই বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতিনিধি; ইহাদের ভিতর দিয়া ইহাদের সেই বিশেষ বিশেষ আইডিয়াগুলাই ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাতের নাট্যলীলা জমাইয়া তুলিয়াছে। এই কারণেই ইহারা বাস্তব হইলেও ইহাদিগকে অবাস্তব বলিয়া ভ্রম হয়, ইহাদিগকে থিওরিমাত্র মনে হয়।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এই নাটকের আখ্যান অংশ বিদেশীক কিম্বা যে-সকল সমস্যা ইহার মধ্যে আলোচিত হইয়াছে সেগুলি এদেশে নাই। আমার কাছে এ আপত্তি কোন কাজেরই আপত্তি নয় বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে আজ মানুষের কোন সমস্যাই কোন দেশবিশেষে আবদ্ধ হইয়া নাই; ন্যূনাধিক পরিমাণে সব সমস্যাই সকল দেশেই দেখা দিতেছে। বিশ্বমানবকে এখন আর দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে পারি না; সে দেখা সত্য দেখা হয় না। কোন দেশই একলা বিশ্বমানবের কোন বড় সমস্যার সমাধান করিতে পারে না, সে সমাধানের জন্য সকল দেশের সহায়তা চাই। ধনী ও শ্রমীর সমস্যা কি কেবল ইউরোপে আছে, ভারতবর্ষে নাই? আমাদের দেশকে যদি বাণিজ্য-ব্যবসায়ে বিশ্বের হাটে মহাজনী করিতে হয়, তবে আমাদের "বনগাঁ"-গুলিও "নবনগরে" পরিণত হইবে, আমাদের চাষীগুলিকেও শ্রমী হইতে হইবে। তখন জমিদারের সঙ্গে শ্রমীর যে সংঘাত তাহা অবশ্যম্ভাবী। মিল ও কারখানা প্রভৃতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই-সব সমস্যা দেখা দিয়াছে বা দেখা দিতেছে এবং ক্রমশঃ আরও বেশি করিয়া দেখা দিবে। তখন ইউরোপে যে "কুরুক্ষেত্র" লড়াই বহুকাল ধরিয়া বাধিয়াছে এবং

আজও চলিতেছে, সেই কুরুক্ষেত্র লড়াই এখানেও বাধিবে। বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রতন্ত্রের জন্য ওস্তাদকারিগরের ভাত মারা যাইবে, তখন তারা শ্রমীদের সঙ্গে জোট বাঁধিবে এবং যে মহাজন কলের মালিক হইয়া লাভ শুষিয়া লইতেছে এবং যে পরিচালক মাঝে হইতে হাত চালাচালি করিয়া প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, এই উভয়কেই তাহারা পরম শত্রু বলিয়া মনে করিবে। তখন দীনুমোড়লের মত মোড়ল তাহাদের দ্বারা ধর্ম্মঘট করাইবে ও স্বাধীনতার মন্ত্র তাহাদের কানে দিবে। বৈজ্ঞানিক পরিচালককে কিছুকালের মত তাহার আবিষ্কারগুলিকে পেটেণ্ট করিতে ও মনোপলী করিতে দিবে বটে। কিন্তু যথার্থ বৈজ্ঞানিক, যে বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সাধনার বিষয় বিশ্বের উন্নতি, সেই বৈজ্ঞানিক মনোপলীর বিরুদ্ধে লড়িয়া অভিজাতবর্গ ছাড়িয়া ক্রমশঃ সর্ব্বসাধারণের দিকে নামিবে। এই নাটকে উদ্ঘাটিত ও বর্ণিত একটি দৃশ্যও তখন অদ্ভুত বা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলা চলিবে না।

এই প্রসঙ্গে তাই একটি কথা বলা দরকার। আর্ট শুধু বর্ত্তমানকে লইয়াই ব্যস্ত নয়, আর্ট ভাবীকেও যবনিকার আড়াল হইতে সামনে টানিয়া আনে। বঙ্কিম যখন সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের ছবি আঁকিয়াছিলেন, তখন বাংলাদেশে এ-সব স্ত্রীলোকের নমুনা বাস্তব সংসারে দেখিবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যে দেখা গেল তাহার মানে বঙ্কিমের প্রতিভা বর্ত্তমান রমণীর মধ্যেই সেই-সকল ভাবী রমণীর চিত্রকে দেখিতে পাইয়াছিল। রবিবাবুর গোরা বা ললিতা বা বিমলা এখন আমরা চোখে দেখি না বটে, কিন্তু ইহারা এদেশের ভিতরেই এখনিই এই মুহূর্ত্তেই সৃজ্যমান। বিশ বছর বাদে হয়ত এই-সব চরিত্রই সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। আর্টে তাই কোন ঘটনা বা চিত্র সম্ভব কিনা এটাও বিচার্য্য—এখন বর্ত্তমান আছে কিনা সেটা তেমন প্রশ্নের বিষয় নয়।

বরং এ নাটকের যেটা মূলবিষয় সেটা বিদেশীক না হইয়া এ দেশেরই বর্ত্তমান অবস্থার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এ নাটকের মূল বিষয় একটিমাত্র; তবে নাটকের তিন অঙ্কে তার তিন রকমের বিকাশ। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধশক্তি, ইহাদের দ্বন্দ্বের উপরেই এই নাটকের ভিত্তি এবং তাহার সমাধানই এ নাটকের চরম পরিণাম। প্রথম অঙ্কে যেখানে প্রকৃতির লীলাভূমি বনগাঁয়ে কল পাতিবার আয়োজন চলিতেছে—সেখানে প্রকৃতিমাতার মুখ দিয়া লেখিকা বলাইতেছেন—"চাষীর বংশই ছিল আমার আশ্রয়; কিন্তু হায়, আজ দেখছি তোদের মুখে একটা অশান্তির কালিমা, একটা ক্ষুৎপিপাসার ছায়া! আমাকে দিয়া তোদের অভাব ঘুচল না! তোদের যে অভাবের অভাব, সে ক্ষুধা আমি মিটাইব কেমনে? আমার ঝঞ্ঝাবাতে, কালোমেঘে, কুহেলিকায় ত জীবনতৃষ্ণা, জীবনের ভেল্‌কি নাই।... তাই আজ তোরা মায়ের স্নিগ্ধ ছায়াময় আঁচল ছেড়ে বিশ্বের হাটে চলেছিস।...ঐ গেল গেল, আমার সবুজ ঐ ধূসর ধোঁয়ায় ডুবে গেল! ওই বুঝি কলকারখানার ধোঁয়া—সব ধোঁয়া ধোঁয়াকার।"

এই প্রথম অঙ্কে প্রকৃতির শান্তি ও সৌন্দর্য্যের যে Idyllic পল্লীচিত্র আছে, তাহা অতিশয় উপভোগ্য। এই অঙ্কে এক ভাবে ক্ষ্যাপা সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কবি ও প্রকৃতিমাতার নিজের হাতে গড়া এক কৃষক-কন্যার অবতারণা দেখিতে পাই। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য-রসভোগের দিকটা ঠিক রুশো বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতন। এ ক্ষেত্রে মানুষের সৃষ্টি প্রকৃতির শান্তি ও সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করিতেছে এই আক্ষেপ ও প্রকৃতির বক্ষে প্রকৃতির শিশু হইয়া থাকিবার জন্য আকিঞ্চন ব্যক্ত হইয়াছেন কবি, মানবী রাণুর মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিরূপ দেখিতে পায়—Wordsworthএর Lucy কবিতাগুলি বা Solitary Reaper প্রভৃতির কথা এই রাণুর চিত্রটি মনে করাইয়া দেয়। কবি, রাণু সম্বন্ধে বলিতেছে —"সকল পদার্থেই তার স্নিগ্ধ দৃষ্টি, ঘরবাড়ী গাছমুড়ী সবেরই উপর তার অকৃত্রিম মমতা।"

প্রকৃতির এই idyllic রসের সঙ্গে আমরা তো সুপরিচিত। আমাদের পল্লীসভ্যতা ক্রমশঃ কলকারখানার আগমনে ও বিলাসের তাড়নায় সহরে সভ্যতা হইয়া উঠিতেছে বলিয়া কত সময়ে আমরা বিলাপ করিয়া থাকি। চাষীদের প্রধান, দীনু মোড়ল এবং শ্রমীদের প্রধান, পরিচালকের মধ্যে প্রথম অঙ্কে এ সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ আছে, সে বাদানুবাদ আমাদের দেশে যন্ত্রতন্ত্রের উন্নতিসাধন ও বাণিজ্যবিস্তারের প্রস্তাব উপলক্ষ্যে যথেষ্ট হইয়া গেছে। আমরা বলিয়াছি আমাদের ভারতবর্ষীয় সভ্যতা গ্রামসমাজের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়াও শান্তিনিষ্ঠায় এবং কল্যাণচেষ্টায় আদর্শস্থানীয় সভ্যতা হইয়াছে। নজিরস্বরূপে আমরা Lowes Dickinsonএর Letters of John Chinaman প্রভৃতি যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিবাদী পুস্তক হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছি এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে বস্তুতন্ত্র (material) সভ্যতা নাম দিয়া গালি পাড়িয়াছি। অর্থাৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দাঁড়াইয়াছে এই যে, যাহা কিছু কমনীয় নমনীয় ও রমণীয় তাহাই প্রকৃতি, যাহা কিছু প্রকৃতির বিরুদ্ধশক্তি তাহা বর্জ্জনীয়, তাহাকে দাবাইয়া রাখিলেই যেন প্রকৃতির কোলে আমরা হৃষ্টপুষ্ট নন্দদুলাল হইয়া বাড়িয়া উঠিব।

দীনুমোড়ল বলিতেছে—"তোমরা যতই রমণীয় অট্টালিকা উদ্যান শিল্পাগার সৃজন করছো, ততই সহরে মানুষের দেহ খর্ব্ব হচ্ছে, বাহুর বল ও হৃদয়ের তেজ কমে যাচ্ছে।" পরিচালক বলিতেছে—"মাটি কামড়ে আছ, কিন্তু তোমরা যা উৎপাদন কর, তাতে সকল মুখের খাদ্য কুলায় না। আমরাই প্রচুরতা আনয়ন করে সবাইকে অন্নবস্ত্র দিই।"

আমরা দীনুমোড়লের পক্ষ লইলেও দুই পক্ষেই সত্য আছে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে আঁকড়িয়া থাকিলেও উন্নতি হয় না, প্রকৃতির বিরুদ্ধশক্তিকেও একান্ত আশ্রয় করিয়া থাকিলেও উন্নতি হয় না। উন্নতি দুয়ের মিলনে —উন্নতি—প্রকৃতিকেই বড় করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া জানিলে। প্রকৃতির সেই অখণ্ড ও বিরাটস্বরূপের তত্ত্বটি এ গ্রন্থে আভাসরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এ তত্ত্ব কোন প্রকৃতির উপাসক কবির কাছে মেলে নাই। এ তত্ত্ব কেবল এই নবযুগের প্রকৃতির উপাসকদের কাছেই মিলিতে পারে। কারণ তাহারা প্রকৃতি হইতে মানুষকে একবার টানিয়া বাহির করিয়া মানুষের অর্থসামর্থ্যশক্তির লীলার মধ্যে তাহাকে মুক্তি দিয়া তারপর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে পুনরায় মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে বড় করিয়া মিলাইয়া দিবার বৃহৎ কল্পনা মনের মধ্যে পোষণ করে।

সুতরাং এই দিক্ হইতে দেখিতে গেলে এ নাটকের বিষয়টি একটুকুও বিদেশীক নয়, এ দেশের নিতান্ত উপযোগী। প্রকৃতির একটা বিরাট্ স্বরূপের ধারণা এই নাট্যকর্ত্রীর কল্পনার মধ্যে আছে। সেইজন্য প্রত্যেক অঙ্কের শেষে 'ছায়াদৃশ্য' বলিয়া যে একটি লিরিক অংশ তিনি তাঁহার এই নাটকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার সেই বৃহৎ কল্পনার দৃষ্টির কথা (vision), তাঁহার বৃহৎ যুগযুগব্যাপী "আমি"র কথা। বিশ্বনাট্যের দর্শক সেই "আমি"। সকলের পশ্চাতে অলক্ষিতে বিরাজমান সেই "আমি"। "যুগে যুগে সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় চলেছে, এই আমিই তাহার একমাত্র দর্শক।"

এই ছায়াদৃশ্য এমন অনুপম কবিত্বময় যে ইহার প্রসঙ্গ অন্যের উপর দিয়া সারিতে পারিলাম না।

প্রথম অঙ্কের শেষে ছায়াদৃশ্যটিতে "আমির" আত্মকথা এক হিসাবে

সমস্ত বিশ্ব-ইতিহাসের ধারার উপর দিয়া চোখ বুলানোর মত একটি ব্যাপার। "শৈশবে মায়ের বুকে ঘুমুতাম, তারি প্রশান্ত চোখের চাহনিতে মুগ্ধ হয়ে অজ্ঞানের মায়াজালে জড়িত ছিলাম।" "সেই নবজাত প্রাণের কাহিনী, সে ছিল এক ইন্দ্রজাল, এক স্বপ্নাভাস" অর্থাৎ সেই আদিম folklores myths and legendsএর যুগের কথা—প্রকৃতির মোহমুগ্ধ শিশুমানবের রূপকথা তৈরির যুগ।

"তারপর, একদিন দৈব মুহূর্ত্তে, সেই তন্দ্রাঘোর ছুটে গেল; আমার বাহুতে শক্তি-বোধ এল, আর অমনি যেন মায়ের ক্রোড় থেকে খসে পড়লাম।...আমি দূরে সরে যেতে লাগ্‌লাম...কখনো ভূগর্ভে, নদীর খাতে, পাহাড়ের ধ্বসে, কখনো হ্রদে মঞ্চ বেঁধে।...আমি দেখ্‌তাম অরণ্যে অরণ্যে দাবানল, দিক্‌প্রান্তে মরীচিকার ছলনা, আকাশে প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু, পর্ব্বতশৃঙ্গের চূর্ণবিচূর্ণ শিলাখণ্ডে দানববংশ, কন্দরে কন্দরে গন্ধর্ব্ব কিন্নর, কান্তারে কান্তারে বিষধর অজগর, গিরিগুহায় শ্বাপদশ্বাপদ!...আমি তখন ভয়ে ভয়ে তাদের পূজা করতে লাগ্‌লাম।" অর্থাৎ animistic and totemistic worships—অসভ্য মানবের দেবদেবীপূজা, জন্তুপূজা, বলিদান প্রভৃতি হিংস্রকাণ্ডের যুগ। এমনতর নিপুণতুলিকায় ছবি আঁকার মত করিয়া এই ইতিহাসকে আঁকিবার শক্তি এক ব্রাউনিং ছাড়া আর কাহারো মধ্যে দেখিয়াছি কি না সন্দেহ।

"তারপর...আমি কোনো বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ে ভেসে উঠ্‌লাম। চোখ মেলিয়া দেখি এক নূতন বিশ্বরাজ্য যাহার উত্তরাধিকারী আমি। ...মায়ের সিংহাসনে মানুষ বসলো।" "বুঝেছি, আবার মায়ের বুকে সবাইকে মিলতে হবে।...আবার মা প্রকৃতি হবেন প্রাণতোষিণী—আর জড়শক্তিরূপিণী নন্।" অর্থাৎ তারপর scientific and industrial age এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে যত অসন্তোষ ও অশান্তি, দ্বন্দ্ববিরোধ উপস্থিত।

এই ছায়াদৃশ্যটুকুতেই লেখিকার যে আশ্চর্য্য কল্পনাশক্তি ও কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যাঁহারা সমস্ত নাটকটির অর্থ বা রসগ্রহ করিতে পারিবেন না তাঁহারাও আনন্দে নিশ্চয় উপভোগ করিবেন। বাংলা ভাষাতে এই শব্দ-চিত্রগুলি একটি বিশেষ সম্পদ দান করিল। যাহার কিছুমাত্র রসবোধ আছে সে কেবলমাত্র এই ছায়াদৃশ্য পড়িয়াই চমৎকৃত না হইয়া পারিবে না। আশ্চর্য্য!

দ্বিতীয় অঙ্কে আসিয়া দেখি, প্রকৃতি ও তাহার বিরুদ্ধ শক্তিগুলির স্বরূপ প্রথম অঙ্ক হইতে এখানে একেবারে স্বতন্ত্র। প্রথম অঙ্কে কবি, রাণু প্রভৃতি প্রকৃতির পক্ষ এবং পরিচালক, মহাজন প্রকৃতির বিপক্ষ বা বিরুদ্ধ শক্তি। এখানে এক নূতন প্রকৃতির উপাসককে লেখিকা উপস্থিত করিয়াছেন—ইনি কবি নয়, বৈজ্ঞানিক। এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে-সঙ্গে মানবপ্রকৃতিকেও গাঁথিয়া তুলিবার জন্য তাঁতিনী ও কামিনী এই দুইটি অপূর্ব্ব চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। দুজনেই সর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত মুক্ত রমণীর রূপ। একজন মূর্ত্তিমতী বিদ্রোহ—তাঁতিনী। এই তাঁতিনীর স্বগত উক্তির (পৃঃ ৯৬-৯৭) দুঃখের মত একটি দৃশ্য কোন আধুনিক নাট্য সাহিত্যে নাই একথা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। দারুণ দুঃখের পেষণে চূর্ণ হইয়া এই মূর্ত্তিমতী বিদ্রোহ বলিতেছে—"হে হরি, জন্ম দিয়েছ, কিন্তু এ হেন স্ত্রীলোকের কোন ব্যবস্থা করনি! তুমি মন্দ হরি, মন্দের হরি! নইলে তোমার কলকারখানায়, এই দুনিয়ার, মেয়ে মানুষের এ বে-ইজ্জতি কেন?...আমার ইচ্ছে হয় আমি একবার মেয়ে-মোড়ল হতুম, সব মেয়ে জুটিয়ে এমন ধর্ম্মঘট করতুম যে একেবারে মানুষের বংশকে এই দুনিয়ার কারখানা থেকে মুক্তি এনে দিতুম!" এত বড় প্রকাণ্ড বিদ্রোহের কথা কোন suffragetteএর মুখ দিয়াও বাহির হয় নাই।

তাই দেখিতে পাই যে, এই দ্বিতীয় অঙ্কে অর্থাৎ "কুরুক্ষেত্রে," একদিকে যেমন মহাজন ও পরিচালকের সঙ্গে শ্রমীদের বিরোধ, প্রকৃতির পক্ষ বৈজ্ঞানিক ও প্রকৃতির বিপক্ষ পরিচালকের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে তেমনি এই-সব সমস্যার সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্বন্ধের সমস্যাটিকেও (sex problem) লেখিকা আশ্চর্য্য কৌশলের সঙ্গে একবয়নেই গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। এই কুরুক্ষেত্রে সবই ভাঙিয়া চুরিয়া যাইতেছে। মানবজীবনের যতগুলি জটিলতা, যতগুলি বিরোধ, সব এখানে একসঙ্গে হানা দিয়াছে। সেই বিচিত্র বিরোধের মধ্যে এই একটি চিরন্তন বিরোধ জাগিয়াছে—যুগলের সম্বন্ধ ব্যাপারটা একটা সামাজিক ব্যাপার না একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার?

"কামিনী" এখানে modern woman। সে গৃহ হইতে গৃহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'বিবাহ' নামক পরমপবিত্র ধর্ম্মানুগত সামাজিক সংস্কারটির বাস্তব চেহারা দেখিয়া বেড়াইতেছে। সেই যে ক'টি দৃশ্য তাহাও আর্ট হিসাবে অতুলনীয়। কামিনী যতই দেখিতেছে, ততই এই বিবাহ-সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহার মন বাঁকিয়া বসিতেছে। সে বলিতেছে—"একদিকে দেখি রূপের তৃষা, মনের টান, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিজীবন। সে জীবনের উপর সমাজের কোন শাসন চলে না। অপর দিকে দেখি মাতৃত্ব পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, যার কাজ শুধু বসে বসে মানবপরিবার গড়া। এটার উপরই সমাজের দাবী ও শাসন। ... বিবাহ কাকে বলে? সন্ততির প্রতিষ্ঠা না প্রেমের? সন্ততি চায় একে এক বাঁধা, কিন্তু হায়, প্রেমে বন্ধনের নিয়ম নাই। কি ঘোর সমস্যা! হয় প্রাণকে বলিদান, না হয় শিশুকে বলিদান।" তারপর কামিনী যখন সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া জমিদারপুত্রকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইল, তখন তাহার যে মনের ভাব তাহাও একেবারে আধুনিক স্বাধীন স্ত্রীর মনের ভাব। তাহার উক্তি স্বাধীন মানবীর উক্তি। সে জমিদারপুত্রকে বলিতেছে—"তোমরা যে আমাদের পরখ করে দেখ্‌বে...সেদিন চলে গেছে! ... আজ আমিই নারী হয়ে তোমাকে পরখ করে নেব। ... কিন্তু বলে রাখি নারী যেমন পুরুষের হাতে কাঠের পুতুল সেজে তার খেলার সাথী হয়, এবার নারীর হাতে পুরুষের কাঠের পুতুল সাজলে চলবে না। এ পরীক্ষায় কোন শাসন, সংস্কার বা বাধ্যবাধকতা নাই। দেখবো এবার নারীকে স্বাধীনভাবে ছুটতে দিতে পুরুষের প্রাণে কত বীর্য্য, তার হৃদয়ে কত সহিষ্ণুতা!...এই মানবমানবীর আজ সংগ্রাম ও পরীক্ষা।"

কিন্তু এই দ্বিতীয় অঙ্কে প্রকৃতির পক্ষীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রকৃতির বিরুদ্ধ পক্ষীয় পরিচালকের যে বিরোধ দেখানো হইয়াছে তাহা একেবারে নূতন। বৈজ্ঞানিককে পরিচালক আর তাহার যন্ত্রস্বরূপ করিয়া রাখিতে পারিল না—বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার সমস্ত মানুষের উন্নতি-সাধনের সহায় হইতে চলিল। কেন চলিল তাহার ইতিহাস যেখানে বৈজ্ঞানিক নিজে দিতেছে সে জায়গাটি পড়িলেই বুঝা যাইবে (পৃঃ ১২৯)। বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যে এমনতর ভাবুকতা থাকিতে পারে তাহা এই বৈজ্ঞানিকের চরিত্রটি না দেখিলে মনে করা শক্ত ছিল। একটুখানি অংশমাত্র উদ্ধার করি; পাঠক দেখিবেন এখানেও লেখিকার কবিত্ব কি অসাধারণ—

"স্বপ্নঘোরে দেখি এক দিব্যমূর্ত্তি, পৃথিবীর উপর পায়ে ভর দিয়া আঁধারে মেঘের আড়ালে দণ্ডায়মান! পায়ে হাতে শিকল বাঁধা, শরীরের পেশী দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, অঙ্গে ভীমকান্তি, মুখে ঐশীপ্রতিভা, চোখে অপূর্ব্বজ্যোতি! তখন শুনিলাম জলে স্থলে, ভূগর্ভে আকাশে অসংখ্য কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ঐ শক্তি বাঁধা" "দাও মুক্তি" "মুক্তি দাও"। সেই অবধি আজও মেঘের গর্জ্জনে, সমীরণের স্বনস্বনে, জলপ্রপাতের ঝরঝরে শুনিতেছি সেই একধ্বনি "দাও মুক্তি," "মুক্তি দাও।"...

"এবার নূতন যুগে বিজ্ঞান ও প্রেমে সন্ধিস্থাপন করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রেম উভয়ে মিলে নূতন বংশধারা সৃজন করবে। আর সে বংশ তোমাদের কলে, তোমাদের নিগড়ে আবদ্ধ থাকবে না। প্রকৃতির প্রসারিত বক্ষে ফিরে যাবে।"

পশ্চিমের সাহিত্যে বৈজ্ঞানিকের চরিত্র বেশ বড় স্থান পায় নাই। গেটের ফাউষ্ট বা ব্রাউনিংএর প্যারাসেলসাস্ বরং বিজ্ঞানের চর্চ্চা যে মানুষকে ভূতগ্রস্ত ও হৃদয়হীন করিয়া তোলে সেই রকম দিক্ হইতেই বৈজ্ঞানিককে আঁকিয়া দেখাইয়াছে। বাল্‌জাক তাঁর Quest of the Absolute উপন্যাসেও বৈজ্ঞানিককে অমনিতর বাতিকগ্রস্ত ও মমত্বহীন করিয়াই দেখাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক যে কবিরই মত প্রকৃতির মহা উপাসক এবং এ যুগে, চাইকি, কবির চেয়েও বৈজ্ঞানিকই প্রকৃতির দিকে মানুষকে ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে অনেক বেশি সহায় হইবেন, এ কথা কবি হুইটম্যান তাঁর কোন কোন কবিতায় বলিয়াছেন মাত্র, কিন্তু এই নাটকে বৈজ্ঞানিকের চরিত্রের যেমন একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া গেছে এমন ইউরোপীয় সাহিত্যের অপর কোন গ্রন্থে পাওয়া গেছে কিনা সন্দেহ।

তৃতীয় অঙ্কের নাম "ধর্ম্মরাজ্য"। দ্বিতীয় অঙ্কে যে কুরুক্ষেত্রের দৃশ্যপট তোলা হইয়াছে, যে-সকল বিচিত্র বিরোধ ও হানাহানির পালা অভিনীত হইয়াছে, তৃতীয় অঙ্কে সেই-সকল যুদ্ধের অবসান ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের দ্বারা সেই বিরোধগুলিকে মিটাইবার আয়োজন। এই অঙ্কটা কতকটা যেন প্লেটোর "রিপাব্‌লিক্" স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে সেখানে নাট্যরস এমন জমে নাই, বিচিত্র চরিত্রের এমন সমাবেশ নাই। এই যা তফাৎ। প্রাচীন মর্য্যাদা, বিধিবিধানকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াসী বৃদ্ধ রাজমন্ত্রীর চিত্রটি কি সকরুণ! অপর পক্ষে স্বয়ং ভগবানের প্রতিরূপ "সন্ন্যাসী"র চিত্রটিই বা কি অপূর্ব্ব মহিমাময়। এই সন্ন্যাসী আসিয়া সমস্ত বিরোধ ভঞ্জন করিলেন, অথচ তিনি কাহাকেও সরাইয়া দিলেন না বা বিনাশ করিলেন না! কি উপায়ে? না, এক নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া—বিশ্বমানবধর্ম্ম। এই ধর্ম্মটিকে এক নূতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। খৃষ্টান ধর্ম্মে একধরণের vicarious বা পরকীয় সাধনার কথা বলিয়াছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে অন্য ধরণের পরকীয় সাধনার কথা বলিয়াছে। এই বিশ্বমানবধর্ম্মে সেই বৈষ্ণবী যুগলভাব বা রোমান্ ক্যাথলিক মাতৃকার ভাব, কোন ভাবেরই কথা নাই। এই ধর্ম্মের সার কথা হইতেছে—"আমাদের বুঝ্‌তে হবে যে যত কর্ম্ম অকর্ম্ম, আশা নিরাশা, বন্ধন মুক্তি জগতে বিদ্যমান, তাহার প্রত্যেকটিতেই আমাদের প্রত্যেকের অংশ আছে। প্রতি মানব দিয়েই প্রতি মানবের বিকাশ।...সকল মানব নিয়ে এক বিশ্বমানব আছেন, সবাকার সিদ্ধি সেই বিশ্বমানবের সিদ্ধিতে, সবারই অসিদ্ধি তাঁর অসিদ্ধিতে। এই ধর্ম্মই বিশ্বমানব ধর্ম্ম।...একের চরম উৎকর্ষসাধনে শান্তি নাই, মিলন নাই, আছে কেবল বিক্ষিপ্ত হওয়া, আছে অতিমানবের অভ্যুদয়!"

..."প্রতি দেহীই আর্ট ও প্রাণের, জড় ও চেতনের সমাবেশ,—জড়াংশে উপকরণ, চেতনাংশে স্রষ্টা। কৃষক জমিদারের উপকরণ, না জমিদার কৃষকের উপকরণ, এ বিচার করিবে কে? আমার যে উপকরণ আমিও তার উপকরণ। বিশ্বমানব যোগে কৃষকও জমিদারের মধ্যবর্ত্তী, জমিদারও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী। আমি যাঁর মধ্যবর্ত্তী, আমারও সে মধ্যবর্ত্তী, কারণ আমাদের উভয়কে বিশ্বমানব বেষ্টন করে আছে। এই জ্ঞান না আসিলে সাম্য নাই। মুখোমুখী কারবার মানে এই সাম্যবোধ।"

এই এক নূতন ধর্ম্মের দিক হইতে দেখিতে গেলে, জমিদারে চাষীতে বিরোধ থাকে না, শ্রমীতে পরিচালকে বিরোধ থাকে না, রাজায় প্রজায় বিরোধ থাকে না।, প্রত্যেকেই যখন জানে যে তাহারই অবশিষ্ট কর্ম্ম অন্য দেহীর দ্বারা সাধিত হয়, তখনই তাহার নিজের কর্ম্মে তৃপ্তি থাকে ও পরকীয় আনন্দ উপভোগে সে বিশ্বমানবের সহিত যোগ উপলব্ধি করে। তখন রাজা হন প্রজাদের মধ্যে চরিতার্থ, প্রজারা হয় রাজার মধ্যে চরিতার্থ। জমিদার চাষীতে চরিতার্থ, চাষী জমিদারে চরিতার্থ। জমি কাহারও একলার সম্পত্তি নয়—জমি দেবোত্তর। জমিদারও সেবায়েৎ, চাষীও সেবায়েৎ। তবে জমিদারের স্থান আছে, সকল চাষীর প্রতিনিধি হিসাবে। শ্রমীতে পরিচালকেও তেমনি যৌথকারবার—কলকারখানাও দেবোত্তর।

এইখানে এই নূতন বিশ্বমানবধর্ম্মে নূতন ধর্ম্মরাজ্যে, রাজার মত রাণীরও কি কাজ হইতে পারে নাট্যকর্ত্রী তাহারও একটি সুন্দর ইঙ্গিত করিয়া দিয়াছেন। নারীর নিকট রাজতন্ত্র একটি বৃহৎ পরিবারের মত—রাজতন্ত্রে মাতৃশক্তি পালনীশক্তির প্রতিষ্ঠা নারীকে করিতে হইবে। সমাজে শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, রুগ্ন, অক্ষম ও অনাথ—এই অকর্ম্মীদের পালন ও রক্ষণের ভার নারীর হইবে। নিট্‌শের supermanism এখানে যেমন ধূলিসাৎ হইয়া গেল, তেমনি রুগ্ন অক্ষমেরা মরিয়া যাইবে নিট্‌শের এই বিধানও ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

ধর্ম্মরাজ্যে স্থান রহিল না কেবল জমিদারপুত্র ও কামিনীর—যুগলের। বিশ্বমানবধর্ম্মে সবই যে পরকীয়—নিজের কাজে হয় অপরের কাজ, অপরের ভোগে হয় নিজের ভোগ। যুগল প্রেমে যে সবই স্বকীয়। এই যুগলকে বাদ দিয়া ধর্ম্মরাজ্য হইল বটে, কিন্তু যুগলের সমস্যার একটা মীমাংসা ইহার পর ভবিষ্যৎ কোন নাটকে লেখিকা আমাদিগকে দিবেন এই আশা করিয়া রহিলাম।

ধর্ম্মরাজ্যে সকলেরই সন্ধি হইল মানে সকলেই বিশ্বমাতৃকা প্রকৃতির ক্রোড়ে আবার ফিরিয়া আসিল।

নাটকের কথা এইখানেই শেষ করিলাম। বলাবাহুল্য ইহার কথা এত সংক্ষেপে সারিয়া দিবার মত নয়। আশা করি পাঠকেরা নিজেরা ইহা পড়িয়া দেখিবেন ও আনন্দ উপভোগ করিবেন।

আধুনিক ইউরোপীয় নাট্যে আমরা সমাজের বা ধর্ম্মের বা আধুনিক সভ্যতার কতগুলি তীব্র প্রতিবাদের চিত্রমাত্র পাই—না পাই কোন সমস্যার সম্যক্ উদ্ঘাটন, না পাই কোন পরিণামের আভাস। যেমন বলা যাইতে পারে যে হাউপ্‌ট্‌ম্যানের The Weavers নাটক শ্রমের সঙ্গে অর্থের সংগ্রামের চিত্র হিসাবে এই নাটকের সদৃশ। কিন্তু সে নাটকে এ সংগ্রামের আদিও পাই না, অন্তও পাই না। হাউপ্‌ট্‌ম্যানের Rose Berndt বা The Ratsএ স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্বন্ধঘটিত সমস্যার একটা ছবি পাওয়া যায় মাত্র—কিন্তু সে ছবি-পর্য্যন্তই। হাউপট্‌ম্যান কি সাডারম্যান কি অপর কোন ইউরোপীয় নাটককার মানুষের সমস্যাগুলিকে এমন বড় করিয়া দেখান নাই, এত বিচিত্র চরিত্রের সৃষ্টি করেন নাই এবং তারপর সমস্ত বিরোধ ও সংঘাতের অমন অপূর্ব্ব সমাধানেও পৌঁছাইয়া দিয়া শান্তির সংবাদ আনিয়া দিতে পারেন নাই। এইখানেই এই নূতন লেখিকার অসাধারণ কৃতিত্ব।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

মনের বিষ

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

দণ্ডভুক্তিতে গিয়াও আমি শান্তি পাইলাম না ; শত পুরাতন স্মৃতি আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। নীলা ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ হইতে বাড়ীতে আসিয়া আমাকে তাম্রলিপ্তিতে ফিরিবার জন্য চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া তাগাদা করিতেছিল ; আমারও মধ্যে প্রতিহিংসা মনের শেষ বিষটুকু উগরাইবার জন্য আমাকে ফিরিতে তাগাদা করিতেছিল। কিন্তু শীঘ্র ফিরিতে পারিতেছিলাম না ভিদুরের জন্য। সেই আমার বন্ধু মন্ত্রী ভৃত্য দণ্ডভুক্তিতে আসিয়া সুখী হইয়াছে, তাহাই আমার সকল অশান্তি উদ্বেগ প্রশমিত করিয়া রাখিতেছিল, তাহার সেই সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিতে মন সরিতেছিল না। আমি যে বাড়ীতে গিয়া বাস করিতেছিলাম তাহারই পাশে একঘর চাষী গৃহস্থ ছিল ; বাড়ীতে শুধু প্রৌঢ়া বিধবা মাতা ও কিশোরী অনূঢ়া কন্যা। তাহাদের ক্ষেতখামার বাগবাগিচা আছে, মায়ে-ঝিয়ে চাষের তদারক করে। তাহাদেরই আমার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম ভিদুর কিশোরী রাজুকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাজুও তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতেছে ; রাজুর মা ভিদুরকে স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছে। আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম ইহাদের সুখী করিতে হইবে।

আমাদের বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিতে লাগিল। তাম্রলিপ্তিতে ফিরিতেই হইল। নীলাও, যথাসত্বর বিবাহ সম্পন্ন হইবার জন্য, আমারই ন্যায় ব্যস্ত হইয়াছিল। তাহার অর্থ-লালসা অপরিমিত। মহাশ্রেষ্ঠী হেমরাজের অগাধ সম্পত্তি ও গোবিন্দর অর্থবিত্তের অধিকারিণী হইয়াও সে সন্তুষ্ট নহে ; আমার ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত করিতে সে উদ্গ্রীব হইয়াছিল। আমিও তাহার সেই অমানুষিক ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিতে কম করি নাই, মহাশ্রেষ্ঠী শেষাদ্রিরূপে তাহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহাকে বহুমূল্য উপহারের পর উপহার দিয়া অসার করিয়া ফেলিয়াছি। অর্থের অপব্যবহারের সীমা নাই। পোষাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার জহরতের জন্য, বিবিধ বিলাস ব্যসন চরিতার্থ করিতে নীলা জলের মত অর্থ ব্যয় করিতেছে। সে এখন সুখী! মঠ হইতে ফিরিয়াই সে বিধবার শোকচিহ্ন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। সঙ্কোচের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাহার প্রেমলীলার অন্ত নাই। কথায়-কথায় আমার প্রতি সে তাহার অপরিমেয় প্রেম প্রকাশ করিতে চায়! হায়! নীলা যদি জানিত আমি কে! বিবাহ – আমার পরিণীতা স্ত্রীকে আবার বিবাহ! তথাপি উৎসব আয়োজনের অবধি নাই। হেমরাজের মৃত্যুর পর আজও ছয় মাস অতিবাহিত হয় নাই, তাহারই প্রাসাদে আজই তাহার বিধবা স্ত্রীর বিবাহের আনন্দোৎসব! সে চিত্র আমার চক্ষে অসহ্য। আমি বাহ্যিক উৎসবে আপত্তি করিয়াছি। বিবাহকালে কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধু ব্যতীত অপর কেহ নিমন্ত্রিত হইবেন না। বিবাহান্তে উৎসবের একশেষ করিব বলিয়া তাহাকে বুঝাইয়াছি। নীলা তাহাতেই স্বীকৃতা। স্বীকৃতা—কি সুখের আশায় তাহার প্রাণ নৃত্য করিতেছে! পূর্ব্ব স্মৃতি তাহাকে কি একবারও কাতর করে না? সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, দিনের আলো ফুরাইয়া আসিল ; রজনীর অন্ধকার অচিরে ঘনাইয়া আসিবে। কল্য আমাদের বিবাহ। শ্রেষ্ঠীপ্রাসাদে আমি ও নীলা বসিয়া আছি। বিবাহ-উৎসবের সম্বন্ধে গল্প হইতেছে। আমি মুখে-মুখে উৎসবের একটা তালিকা দিতেছি। নীলা উৎফুল্ল হইয়া হাসিয়া বলিল, "শেষ, তুমি উপকথার রাজার মত ; যাহা করিব বলিতেছ, তখনই তাহা সম্পন্ন হইতেছে ; কেবল হুকুমের অপেক্ষা,— তোমার না জানি কত অর্থ! সংসারে ধনী হওয়ার মত সুখ নাই, ধনের চেয়ে কিছুই বড় নয়!"

আমি বলিলাম, "কেবল প্রেম ছাড়া!"

নীলা গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া বলিল "ঠিক কথা—ভালবাসার চেয়ে কিছুই বড় নয়। যেখানে ভালবাসা ও ধনের একত্র সমাবেশ, সেইখানেই স্বর্গ!"

আমি বলিলাম, "সেই ত স্বর্গ। কিন্তু দুইটা বস্তু একসঙ্গে বাসা বাঁধিতে চায় না ; নহিলে স্বর্গ কে আকাঙ্ক্ষা করিত? নীলা, নীলা—তুমি কি আমার জন্য পৃথিবীতে স্বর্গ সৃজন করিবে? বল, আমাকে ভালবাসিবে কি না? তোমার মৃত স্বামীকে যে-ভাবে ভালবাসিতে,—বেশী কম

জানি না—আমাকে তেমনি ভালবাসিও,—সে তোমার প্রথম প্রেমিক।”

নীলা চমকিয়া উঠিল; বলিল, “শেখ, কেন তুমি বার বার আমার মৃত স্বামীর কথা তোল? মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করিতে কে ভালবাসে? আমি ত বলিয়াছি, তাহাকে আমি ভালবাসিতাম না;—তাহার মৃত্যু কি ভয়ানক! সন্ন্যাসী যখন তাহার মৃত্যুঘটনা বর্ণনা করিয়াছিল, আমি আতঙ্কে মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। তাহার জন্য দুঃখ করিবার অবসর পাই নাই। তাহার কথা মনে হইলেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর চিত্র মনে আসে। তাহার নাম আর আমাকে স্মরণ করাইও না। সে আমার কে? তুমি আমার সর্ব্বস্ব,—একমাত্র তোমাকেই আমি ভালবাসিয়াছি!”

আমি তাহার নিকট সরিয়া বসিলাম, তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “সত্যই কি আমাকে ভালবাস নীলা? ঠিক বলিতেছ?”

নীলা খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল। আমার স্কন্ধে তাহার মস্তক ন্যস্ত করিয়া আবেগময় কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল “এখনো কি অবিশ্বাস হয়? এ-কথা কতবার জিজ্ঞাসা করিবে? কি করিলে একথা তোমার বিশ্বাস হয়! কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব আমি, তোমাকে আমি কত ভালবাসি—মনপ্রাণ ভরিয়া ভালবাসি,—যতদিন জীবন থাকিবে ততদিন বাসিব!”

আমি তাহার পৃষ্ঠে মৃদু মৃদু করাঘাত করিতে করিতে বলিলাম, “তুমি কি আমার প্রেমের জন্য প্রাণ দিতে পার? আমাকে না আমার অর্থকে ভালবাস নীলা?”

নীলা আমার স্কন্ধ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল “অর্থ অতি তুচ্ছ! তাহার আমার অভাব নাই। আমি তোমার জন্যই তোমাকে ভালবাসি; তোমার গুণে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।”

ভাবিলাম, কাহার নিকট আর যাদুকরী! আমি মৃত,—অন্য জগতের প্রাণী; আমার নয়ন আর পার্থিব মোহ-আবরণে আবৃত করিবার শক্তি তোমার নাই; আমি তোমার অন্তর স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। আমি তাহাকে উৎসাহিত করিতে বলিলাম “আমি আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। যথার্থ প্রেমিকের আসন আমারই প্রাপ্য. নীলা তুমি আমাকে তাহা দান করিয়াছ; তুমি বলিয়াছ, আমি উপকথার রাজা,—তুমি তাহার রাণী! রাণীর সাজেই তোমাকে সাজাইব। আমার প্রথম উপহারের কথা মনে আছে কি?”

নীলা বলিল “মনে থাকিবে না? আমার অলঙ্কারের মধ্যে সেইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সম্রাজ্ঞীও তাহা প্রাপ্ত হইলে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেন।”

বলিলাম, “সৌন্দর্য্যে সম্রাজ্ঞীর উহা উপযুক্ত! কিন্তু আমার অন্যান্য জহরতের তুলনায় উহা কিছুই নয়। সেগুলি এখন তোমারই।”

নীলা লোলুপ-দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। বলিল, “কোথায় সেগুলি? কবে আমি তাহা দেখিতে পাইব? না জানি তাহাদের কি অপার্থিব সৌন্দর্য্য! সমস্তগুলিই কি আমার হইবে?”

“সমস্তই তোমার,—আমার স্ত্রীর। দেখিলে বুঝিবে সেগুলি কেমন! তাহার সূর্য্যকান্ত মণি বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল, চুনিগুলি রক্তের ন্যায় লাল, মুক্তাগুলি ডিম্বের ন্যায় শুভ্র, হীরকগুলির জ্যোতি তীরের মত তীক্ষ্ণ, পান্নাগুলি যেন অগ্নি।”—

নীলা চঞ্চল হইল। আমি বলিলাম, “শিহরিও না। মোলায়েম উপমা আমি দিতে জানি না; এক কথায়, লোক সে রত্নরাজির জন্য প্রাণ দিতে পারে; এমনি লোভনীয়!”

নীলা আগ্রহে বলিল “তাহা হইলে আমার অলঙ্কারের মত অলঙ্কার তাম্রলিপ্তিতে আর কাহার থাকিবে না। মহিলারা তাহা দেখিয়া আমার পানে কি চক্ষে চাহিবে! হিংসায় ফাটিয়া মরিবে! বল সেগুলি কোথায়? এখনি তাহা দেখিতে দোষ আছে কি?”

বলিলাম, “আজ নয়; কাল, বিবাহের পর; যখন তোমাকে আমি সম্পূর্ণ আমার বলিতে অধিকারী হইব, সেই শুভমুহূর্ত্তে তুমি তোমার নিজের ধন বুঝিয়া লইও। বিবাহের পর সকলে যখন ভোজে ব্যস্ত থাকিবে, নীলা, তুমি অন্যের অজ্ঞাতে আমার সঙ্গে আসিও; আমি আমার গুপ্ত ধনাগার তোমাকে দেখাইব।”

নীলা বলিল, “ভাল, শেখ, আলাউদ্দিনের মত তোমারও গুপ্ত ধনাগার আছে। তুমি সহজে কাহাকেও বিশ্বাস কর না।”

আমি হাসিয়া বলিলাম "আমি সংসারে অনেক ঠেকিয়াছি—বিশ্বাসের মূল্য অনেকেই জানে না নীলা! অমন দুষ্প্রাপ্য রত্ন বাড়ীতে রাখিতে সাহস হয় না; এজন্য তুমি আমাকে দোষী করিতে পার, কিন্তু সাবধানতার মার নাই।"

নীলা বলিল, "না—না—তুমি ঠিকই করিয়াছ। কিন্তু সেগুলি কি এখানে আনা যায় না? আমার তথায় যাইয়া দেখার কি আবশ্যক?"

"কোন্‌টি তোমার পছন্দ হইবে, আমি বুঝিব কি করিয়া? আর ভাণ্ডার হইতে এক দিনে অত রত্ন আনা কি সম্ভব?"

"সত্য! কিন্তু পছন্দের কথা আবার কেন? তুমি ত বলিয়াছ, উহার সমস্তই আমার; আমি সমস্তগুলি না পরিয়া সুখী হইব না; নিত্য নূতন নূতন অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মহিলাগণকে চমৎকৃত করিব।"

আমি তাহাকে বাহুমুক্ত করিয়া বলিলাম, "অলঙ্কারে শেষে তোমাকে বিতৃষ্ণ হইতে হইবে; এত ধনরত্ন সেখানে লুকান আছে; কত পরিবে নীলা?"

নীলা হাসিয়া বলিল, "দেখিও আমার অলঙ্কারে অরুচি হইবে না।"

আমি উঠিলাম। বলিলাম, "তবে আসি—বিদায় দাও,—কাল যে পর্য্যন্ত তোমাকে আমার বলিতে না পারিতেছি তাহার পূর্ব্বে আর দেখা হইবে না।"

নীলা আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল "কেন? এত দীর্ঘ সময় আমাকে পিপাসিত রাখিয়া তোমার লাভ কি?"

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম "নীলা, আমার প্রকৃতি অদ্ভুত। তোমার মৃত স্বামীর কথা আজ স্মরণ না করিয়া পারি না। তোমার বৈধব্য শেষ হইতে চলিল; অন্ততঃ এইটুকু সময়ের জন্য তোমার পরলোকগত স্বামীর কথা স্মরণ করিও। আমিও যে তোমার সেই স্বামীর স্থান অধিকার করিতে যাইতেছি। আমার পরিণামে কি আছে, কে বলিতে পারে? যদি আমাকেও অকালে জীবনের পরপারে যাইতে হয়—আমার কি ইচ্ছা হয় না, তুমি,—আমার এত ভালবাসার বস্তু—আমাকে কয়টা দিনের জন্য স্মরণ কর; নীলা, আমার নিজের কথা স্মরণ করিয়াই তোমার স্বামীর কথা স্মরণ করি। দুঃখিত হইও না নীলা, আমি তোমাকে অন্যভাবে বলি নাই।"

নীলা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; বলিল, "শেষ, পরের জন্য তোমার এত ভাবনা; যাহাকে তুমি জানিতে না, তাহার কথাও তুমি ভুলিতে পার না। তাহাতে আমি দুঃখিত হইব কেন! কিন্তু তোমার মুখে তাহার নাম শুনিলে মন আমার কেমন হইয়া যায়। হেমরাজেরও পরের জন্য এমনি টান ছিল। তোমাতে তাহাতে অনেক মিল; সময়-সময় তোমাকে দেখিয়া তাহার কথা মনে পড়ে। আমার এ ভ্রমের জন্য ক্ষমা করিও; তুমি আর তাহার নাম মুখে আনিও না।"

নীলা আমাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিল। আমি তাহার হস্ত হস্তে গ্রহণ করিয়া বলিলাম "নীলা! আজও তোমার চম্পক-অঙ্গুলীতে পূর্ব্ব বিবাহের প্রণয়-চিহ্ন হীরক-অঙ্গুরী শোভা পাইতেছে। আমি খুলিয়া লইতে পারি কি?"

নীলা সহাস্যে বলিল "সে আয়োজন ত করিয়াইছি—এখনি লইবে, লও!"

তাহার অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া বলিলাম, "এটা আমি লইতে পারি কি?"

"তোমার ইচ্ছা,—তোমাকে আমার অদেয় কি আছে?"

বলিলাম, "নীলা! তুমি আমারই। বিবাহের পূর্ব্বেই আমাকে তোমার যা কিছু সমস্ত দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ; সকলের সমক্ষে তাহার পুনরুক্তি করিবে মাত্র—এই ত?"

নীলার কম্পিত ওষ্ঠ,—হউক বিষ, তাহা আমারই জন্য; নীলকণ্ঠের ন্যায় তাহা পান করিব না কেন? বিদায় হইলাম। প্রেমিক-প্রেমিকার বিদায় যে রীতিতে সম্পন্ন হয়, তেমনি ভাবে। আমি শিক্ষিত নট বটে!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্রামের আমার অবসর নাই। আগামী কল্য আমার প্রতিহিংসা-যজ্ঞের আহুতির দিন। তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে আমাকে এখনও অনেক আয়োজন করিতে হইবে। বরাবর সমুদ্রতীরে চলিলাম। রাস্তা প্রায় জনহীন। আকাশ ভরা ঘন মেঘ; রজনীর অন্ধকার তাহাতে আরও গাঢ় হইয়াছে। সাঁ সাঁ শব্দে শীতল বায়ু প্রবাহিত হই-

তেছে। আমি তাহাতে দমিলাম না। আমার অন্তরে তাহা অপেক্ষা প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে। উপসাগর-কূলে মধুকর জাহাজের মাঝির গৃহের দ্বারে আঘাত করিলাম। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। স্বয়ং মাঝি আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিল; বলিল "মহাশ্রেষ্ঠী, আপনি এমন রাত্রে একা পদব্রজে বাহির হইয়াছেন? আমার কথার নড়চড় কখনও হয় না, আমি সমস্ত ঠিক করিয়াছি।"

আমি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "তাহা আমি জানি। তবু একবার মনে করিয়া দিতে আসিয়াছি, পরশু ভোরেই আমাকে একবার সিংহলে যাইতে হইবে।"

আমি তাহার সাহায্যে, বিবাহের পরদিন তাম্রলিপ্ত পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছি। পাথেয় মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে।

আমি তাহার হস্তে পাঁচ শত মুদ্রার তোড়া দিয়া বলিলাম, "তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার।"

সে হস্ত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিল, বলিল, "মহাশ্রেষ্ঠী আপনার দয়ার শেষ নাই! আমি এমন কি করিয়াছি তাহার জন্য আবার পুরস্কার। আমি আপনার স্নেহের ক্রীত দাস।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ভগবান আমাকে ধন দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিব না কেন? তোমার বিশ্বস্ততার জন্য তুমি যে পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত, তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নয়।"

মাঝি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উত্তর করিল "আপনার মত যদি সকল ধনীই হইত; সংসারে দুঃখীর দুঃখ থাকিত না।"

আমি হাত প্রসারিত করিয়া প্রসন্নমুখে বিদায় প্রার্থনা করিলাম। সে আমার কর গ্রহণ না করিয়া নতজানু হইয়া প্রণাম করিল। আমি তাহাকে বাহুতে বেষ্টন করিয়া বক্ষের নিকটে উঠাইয়া লইলাম। বিদায় হইলাম। ক্ষণেকের আলোক আমার হৃদয় হইতে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আবার সেই অন্ধকার; অন্তরে বাহিরে ঘোর তামস।

গৃহে ফিরিতে দ্বিপ্রহর বাজিয়া গেল। অন্যদিন হইলে ইহার কত পূর্ব্বে আমি আহারাদি শেষ করিয়া শয়নকক্ষে আশ্রয় লইতাম। ভিহুর আমার অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন চিত্তে বসিয়া ছিল। দ্বারে আমার পদশব্দ হইবামাত্র সে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। আমি তাহার উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলাম, "ভিহুর, আজ ফিরিতে বড় দেরী হইয়া গিয়াছে,—অনেক কাজ ছিল।"

সে ধীরস্বরে বলিল, "হাঁ, হুজুর, রাতটা বড় খারাপ হইয়াছে; আপনি একা পায়ে-হাঁটিয়া আসিতেছেন!"

"আমার কোন কষ্ট হয় নাই। কষ্ট না করিলে কি সুখ মিলে ভিহুর? আজ আমাকে অনেক বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে; কাল আমার সকল আশা পূর্ণ হইবে,—কাল আমার বিবাহ! সুখের দিন নয় কি ভিহুর?"

ভিহুরের বদন বিষণ্ণ, সে আত্মভাব গোপন করিয়া উত্তর করিল, "হাঁ, হুজুর, আপনি সুখী হইলেই সকলের সুখ।"

"আমি এ বিবাহে সুখী হইব তাহাতে সন্দেহ কি ভিহুর? শ্রেষ্ঠিনী নীলা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, তাম্রলিপ্তির বড় ধনী!"

ভিহুর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা' জানি হুজুর; আপনি ত তাঁহা অপেক্ষা কম ধনী নন। ধনের জন্য নিশ্চিত আপনি বিবাহ করিতেছেন না। সৌন্দর্য্য? আপনার একান্ত বাধ্য ভৃত্যের প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন—তিনি সৌন্দর্য্যে আপনাকে ঠিক সুখী করিতে পারেন নাই; বিবাহের পরে—যদি—হয়।"

স্নেহের চক্ষু কি তীক্ষ্ণ! ভিহুর কি আমার অন্তঃস্থল দেখিতে পায়? তাহার স্পষ্টবাক্যে দুঃখিত হইলাম না; বরং তাহার সহানুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি তাহাকে প্রবোধ দিবার ছলে বলিলাম, "তুমি ভুল বুঝিয়াছ ভিহুর, আমার মত সুখী কে? অমন অদ্বিতীয়া সুন্দরী আমার স্ত্রী হইবেন—তবু কি আমি অসুখী হইব? সৌন্দর্য্যে কে না মুগ্ধ হয়? আমার অগাধ অর্থ, সুন্দরী স্ত্রী, তোমার ন্যায় প্রভুভক্ত ভৃত্য, আমার আর অভাব কিসের? কিসের বা দুঃখ?"

ভিহুর সঙ্কুচিত হইল; ভয়ে ভয়ে বলিল, "না হুজুর, আমি সে কিছু বলিতেছি না। শ্রেষ্ঠিনী বিখ্যাত সুন্দরী, আমার প্রভুপত্নী হইতে যাইতেছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই; তবে আপনি বোধ হয় ও-সব পছন্দ করেন না।"

আমি সহাস্যে বলিলাম "কি-সব ভিদুর ? রমণীর সঙ্গ ? ভুল তোমার, ওটা মস্ত ভুল ! এতদিন আমি বিষয়কর্ম্মে এমন ব্যস্ত ছিলাম, ওসব লক্ষ্য করিবার অবসর একেবারে ছিল না। এখন সেদিন গিয়াছে, আমার এখন অনেক অবসর।"

ভিদুর আবার বলিল "হুজুর সুখী হইলেই অধীনরা সুখী।"

বলিলাম, "না—ভিদুর, এটা তোমার ঠিক মনের কথা নয়।—আমি সুখী হইলে তুমি সুখী হইবে জানি, কিন্তু এ বিবাহে আমার সুখী হওয়ার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ আছে।"

আমি তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিলাম। বন্ধুর ন্যায় বলিলাম "ভিদুর, বল ভিদুর ; তোমার মনে অন্য কি কথা জাগিতেছে ; গোপন করিও না ; তুমি আমার কেবল ভৃত্য নও—বন্ধু। আমার আত্মীয় বলিতে আর কেহ নাই !"

আমার বাক্যে তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল ; চক্ষু উজ্জ্বল হইল। ভৃত্য আত্ম-অবস্থা বিস্মৃত হইল ; বলিল "হুজুর অপরাধ লইবেন না। আমি শুধু ভৃত্যের ন্যায় আপনার সেবা করিয়া তুষ্ট হইতে পারি নাই ; আপনার স্নেহে আপনাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। আপনার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য হুকুমের অপেক্ষা রাখি নাই ; আপনার ইচ্ছা তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া তাহা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তাহার ফলে, আপনার মনোভাব পাঠ করিবার ক্ষমতা আমার জন্মিয়াছে। হুজুর, অপরাধ লইবেন না। এমন দিন যায় নাই, গোপনে আপনার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে না হইয়াছে। আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছি হুজুরের প্রত্যেক হাসির অন্তরালে একটা দুঃখ লুক্কায়িত আছে। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, সেটা কি ! ভুল করিয়াছিলাম, স্ত্রী-পুত্রহীন একার সংসারের বুঝি সে দুঃখ। যেদিন শ্রেষ্ঠিনীর নিকট আপনাকে দেখিলাম, সেই দিনই সে ভুল ভাঙিয়া গেল—অন্যে না বুঝুক,—আমি দেখিলাম, স্ত্রীলোক আপনাকে সুখী করিতে পারিবেনা ; জাজ্বল্যমান ঘৃণা তখন আপনার বদনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল ; তাহা দেখিয়া কে বলিবে, আপনি রমণীর উপাসক। তারপর সেই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের দিন, আপনার অনাবৃত চক্ষু, আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়াছে ; তারপর দণ্ডভুক্তিতে—না হুজুর, ভৃত্যের বড়ই প্রগল্‌ভতা হইতেছে।" ভিদুর নীরব হইল।

আমি বলিলাম, "থামিলে কেন ? দণ্ডভুক্তিতে কি ভিদুর ?"

সে অবাক হইয়া নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "বল, ভিদুর, কি ?"

তাহার উচ্ছ্বাসে বাধা পড়িয়াছিল ; সে স্বস্থান ঠিক রাখিয়া বলিল, "না হুজুর, আমি ভৃত্য, আপনি প্রভু,—এ-সকল বিষয় আমার মুখে শোভা পায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাহাতে কি ভিদুর ? আমিই তোমাকে সে অধিকার দান করিয়াছি ; বলিয়াছি তুমি শুধু ভৃত্য নও,—বন্ধু। বল।"

ভিদুর ভীত কাতর কণ্ঠে বলিল, "হুজুর, কি আর বলিব ? বলিবার কি আছে ? আপনার জন্য প্রাণ কেমন করে, তাই অধিকার বিচার না করিয়া এত কথা বলিলাম। কেবল প্রাণের টানেই এ-সকল অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছি। হুজুর, এই-সকল চিন্তায় নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারি নাই। অলক্ষ্যে আপনার শয়ন-কক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, রাত্রি অনেক হইয়াছে, আপনি তবুও নিদ্রা যান নাই ; কি ভাবিতেছেন, কি লিখিতেছেন। —লোকের মনে শান্তি থাকিলে কি এমন করিয়া রাত জাগে হুজুর। অপরাধ করিয়াছি, প্রভুর অজ্ঞাতে তাঁহার গুপ্ত অনুসন্ধান কোন-ক্রমেই সঙ্গত নয় ; ক্ষমা করিবেন ; —আমার মস্তিষ্ক স্থির রাখিতে পারি নাই।"

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম, "ভিদুর, তোমাকে ক্ষমা করিলাম। যে অপরাধের জন্য কেহ ক্ষমা ভিক্ষা করেনা, যে অপরাধের জন্য কেহ কাহাকেও ক্ষমা করে নাই, সেই ঘোর অপরাধ,—আমার প্রতি তোমার অপরিসীম স্নেহের জন্য তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু শুনিয়া সুখী হও বন্ধু ! আমি কল্যকার বিবাহে অসুখী হইব না ; কল্য আমার সকল দুঃখের অবসান,—যাহার জন্য আমাকে রজনীতে বিনিদ্র দেখিয়াছ, যাহার জন্য আমার আনন্দ ফুটিতে পায় নাই, সেই দুঃখ কাল

মুছিয়া ফেলিব ; আমার আশা কাল ফলবতী হইবে, আশীর্ব্বাদ কর, আমার মনস্কামনা, এতকালের সাধনা কাল যেন সিদ্ধিলাভ করে। বন্ধু, তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমার আশীর্ব্বাদ নিরর্থক হইবে না।"

আমার শেষ বাক্যে তাহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিল, "ঈশ্বর আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন,—আপনি সুখী হোন।"

আমি বলিলাম, "তোমার শুভ ইচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। আমার আর একটি অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে।"

"কি হুজুর?"

"কাল সন্ধ্যায় তোমাকে দণ্ডভুক্তিতে যাইতে হইবে।"

"দণ্ডভুক্তিতে? আবার দণ্ডভুক্তিতে কেন?"

"সেখানে কি আমার কোন কার্য্য থাকা অসম্ভব? রাজুর মায়ের নিকট আমার একটা বাক্স গচ্ছিত রাখিব; তোমাকে সেটি পৌঁছাইতে হইবে। অন্য কেহ তাহাকে জানে না, সেইজন্যই তোমাকে পাঠাইতেছি। ভিদুর এই সুযোগে সেখানে কয়টা দিন সুখে কাটাইয়া এসো। রাজুর সঙ্গলাভ সুখের নয় কি?"

"আমার এখন সে সুখের অবসর নাই। বিবাহের পর, শুনিয়াছি, আপনারা গৌড়ে যাইবেন; আমি না উপস্থিত থাকিলে জিনিসপত্র কে ঠিকঠাক করিয়া দিবে? আপনাদের সুখ-ভ্রমণ-যাত্রা আমি কি দেখিতে পাইব না?"

"ভিদুর, আমি আমার বন্দোবস্ত নিজেই করিয়া লইতে পারিব। সিন্দুক কয়টা তুমি পূর্ব্বেই সাজাইয়া রাখিতে পার, অন্য কাজের জন্য তোমার উপস্থিত থাকিবার দরকার নাই। সে-সকল কাজের চেয়ে দণ্ডভুক্তির কাজ বেশী দরকারী,—তুমি বিনা অন্যে তাহা ঠিক করিতে পারিবে না। আমার জন্য চিন্তিত হইও না; আবশ্যক হইলে, তোমাকে তথা হইতে অনায়াসে ডাকা যাইবে।"

"গৌড়ে যাত্রার পর বাক্সটা দিয়া আসিলে হয় না কি?"

"না। কাল সন্ধ্যাতেই তোমাকে যাইতে হইবে। ভিদুর, অবাধ্য হইওনা; আমার সুবিধা অসুবিধা আমি ভাল বুঝি;—কেন তুমি আমার জন্য বৃথা চিন্তা করিতেছ? আমার ইচ্ছা,—আমি যতদিন তাম্রলিপ্তিতে না ফিরি, ততদিন তুমি সেখানে থাক। আমায় বল, তুমি আমার পত্র না পাইলে দণ্ডভুক্তি পরিত্যাগ করিবে না; আমার এ শূন্য গৃহ পাহারা দিবার তোমার আবশ্যক নাই, তাহাতে আনন্দও নাই।"

সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে আমার দিকে ভীত কাতর দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল "হুজুর দাসের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন কি?"

"বিরক্ত,—কোন্ অপরাধে? তোমার ন্যায় ব্যক্তির উপর কেহ বিরক্ত হইতে পারে না; কিন্তু তুমি আজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহিতেছ, ইহাতে আমি দুঃখিত। তুমি জান, বিবাহে আমি সুখী হইব, পূর্ণ সুখ উপভোগ করিতে অন্য দেশে যাত্রা করিব। বিদেশে তোমার স্মৃতি অবশ্য আমার মনে জাগিবে, আমার ইচ্ছা হয় না কি সে স্মৃতি সুখময় হয়? তাম্রলিপ্তিতে থাকিলে তোমার সুখী হইবার আশা নাই। রাজু তোমার হোক। লক্ষ্য করিয়াছি, সে তোমাকে ভালবাসে; তুমি তাহাকে ভালবাস; তাহার মায়েরও তোমাদের বিবাহে অমত নাই; তবে আর বাধা কি? অর্থ? তুমি উপার্জ্জক; আমাকে তুমি অমনি সেবা কর নাই!"

ভিদুর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম, "আমার আজ কুমারজীবনের শেষ দিন। এস ভিদুর দুজনে আজ একসঙ্গে আহার করি, দ্বিধা বোধ করিও না; বলিয়াছি আমি, আজ তোমাকে ভৃত্য মনে করিতে পারিতেছি না।"

ভিদুরের পক্ষে সে অভাবনীয় সম্মান। সে বিনয়ে-উজ্জ্বল, স্মিত বদনে আমার সহিত ভোজনে বসিল। ক্ষুধা আমার ছিল না, তবু অন্য দিন হইতে খাদ্যগুলি অধিকতর সুস্বাদু বলিয়া মনে হইল। আহারান্তে ভিদুর স্থান পরিষ্কার করিয়া, তাহার শয়ন-কক্ষে প্রস্থান করিল।

আমার অদৃষ্টে নিদ্রা নাই; অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হইলাম। মহাজনের গদি হইতে আমার অধিকাংশ অর্থ ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া লইয়াছিলাম; সেই সমস্ত মোহর একটি বৃহৎ সিন্দুকে পূর্ণ করিলাম। রজনী প্রভাতে তাহা, আমি যে-জাহাজে যাত্রা করিব, তাহার মাঝির জিম্মা করিয়া দিবার জন্য, ঠিক করিয়া রাখিলাম।

অন্য আর একটি ক্ষুদ্র লৌহবাক্সে ২৫০০০, হাজার মোহর ও কতকগুলি মূল্যবান অলঙ্কার সাবধানে সজ্জিত

করিলাম। ভিদুরের নামে একখানি পত্র উহার মধ্যে থাকিল। তাহাতে আমার জীবনের ইতিহাস আভাস দিয়া লিখিলাম, "অশান্তাকে তোমার হস্তে দিয়া গেলাম। বিশ্বস্তভাবে সেবা করিয়া আমাকে যেমন সুখী করিয়াছ,—অশান্তা বৃদ্ধা, তোমার জননীস্থানীয়া, তাহাকেও তেমনি করিও। ১৫০০০ টাকা তোমার; তুমি যেমন পরিশ্রমী তাহাতে তাহার দ্বারা ফলমূল শস্যের খামার করিয়া সংসারে সুখী হইতে পারিবে। অলঙ্কারগুলি তোমার স্ত্রীর যৌতুক, আশা করি তাহা রাজুর ভাগ্যে আছে; রাজুর মায়ের পুত্র নাই; তুমি তাহার সে অভাব পূর্ণ করিবে। অর্থবান হইলে, কখন অভিজাত সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইও না; ওখানে শান্তি নাই; সে সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যে ভুলিও না। সেখানে রাজু নাই। ধনী কৃষক,—পত্নীর প্রেমে সুখী যে, তাহার আর লোভ করিবার সংসারে কিছু নাই। আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না; আমি স্মৃতিতে তোমাকে দেখিতে পাইব; শান্তরসাস্পদ দণ্ডভুক্তি পল্লীর বক্ষে দুইটি প্রাণী অতি সুখ শান্তিতে বাস করিতেছে,—তাহারা অন্তরে বাহিরে এক,—প্রাণে প্রেম, বদনে সন্তোষ,—দণ্ডভুক্তির সর্ব্বাপেক্ষা ধনী কৃষক; তোমাদের যুক্তপ্রেম নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সে সুখ দান করিবে। রাজুর মায়ের সুখের সীমা থাকিবে না। কয়েকটি কচি কচি সুকুমার শিশু তোমাকে রাজুর সহিত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া বৃদ্ধার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তাহাদের হাস্যকাকলীতে বৃদ্ধাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিবে; তাহাদের আব্দারের অত্যাচারে সে আর তোমাদের গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে অবসর পাইবে না। স্নেহময়ী অশান্তার দশাও তাই। সে চম্পাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত, সে কি এই শিশুগুলিকে লাভ করিয়া চম্পার শোক একটুও বিস্মৃত হইবে না? বৃদ্ধাদ্বয় নিশ্চয়ই অতীত কাহিনী আলোচনা করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত, অধীর হইবে;—আমি কল্পনায় এখনি যেন তাহা দেখিতে পাইতেছি। ভিদুর, ভগবান তোমাকে সুখী করুন; তোমার ন্যায় বন্ধুর সুখচিত্র কল্পনা করিতেও সুখ।"

বাক্সটি উত্তমরূপে বন্ধ করিলাম। রাজুর-মাকে একখানা পত্র লিখিলাম, তাহাতে আমার নিজের বিষয় কিছু বলিবার ছিল না। ভিদুরের কথা বিশেষ করিয়া লিখিলাম। যতদূর সম্ভব, তাহার সচ্চরিত্রতা, অমায়িকতা ও স্নেহময় প্রাণের পরিচয় দিলাম। রাজুর সহিত বিবাহ হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন কি সুখের হইবে, তাহার একটা চিত্র দিতে বিস্মৃত হইলাম না। যথাসত্বর বিবাহ সম্পাদনের অনুরোধ করিলাম। বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদিগকে এই অর্থের বিষয় জানাইতে নিষেধ করিলাম। অর্থ প্রেমের মূল্য নহে,—অন্তরায়! ভিদুরের নামের পত্রখানি যাহাতে বিবাহান্তে তাহার হস্তগত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। পরিশেষে লিখিলাম, "তোমার ভাবী জামাতার অংশবাদে অবশিষ্ট ১০০০০ টাকা থাকিল। তাহা দ্বারা শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদের পুরাতন পরিচারিকা অশান্তার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবে। অশান্তা অতি সুশীলা, তোমার এক বয়সী,—সে তোমার উপযুক্ত সঙ্গিনী হইবে। তাহাকে মাত্র ১০০০ নগদ দিও; অবশিষ্ট তাহার অভাবপূরণের জন্য;—তাহা তোমার নিকটেই থাকিবে।" পত্র শেষ করিলাম। মনে হইল,—ইহাদের সহিত জীবনের সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়া গেল! আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার; ইহাদের ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল হউক। আমার সহিত যাহারা সদ্ব্যবহার করিয়াছে, আমার সদ্ব্যবহারই যেন তাহারা স্মরণ করে। আমি তাহাদের স্নেহ-ঋণ যদি কিয়ৎ পরিমাণে শোধ করিতে পারিয়া থাকি, তাহাই আমার সুখ।

রাজুর মার পত্র গালামোহর করিলাম। শিরোনামার উপরে লিখিলাম, "অনুগ্রহ করিয়া এই পত্র প্রাপ্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ইহা খুলিবে না।" বাক্স দুইটি সাবধানে লুক্কায়িত রাখিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম। ভিদুরের শয়ন-কক্ষে গিয়া দেখিলাম সে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। গৃহ ত্যাগ করিলাম।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। তখনও প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘোর অন্ধকার। আমার তাহাতে দুঃখ নাই। রজনী যত ভয়ঙ্কর হয়, আমার পক্ষে ততই সুবিধা। আমি প্রেতরাজ্যে চলিয়াছি। সে স্থানের অপেক্ষা জগতে ভয়ঙ্কর আর কি হইতে পারে! সমাধিগুম্ফার দ্বারে উপস্থিত। গুম্ফার চাবি শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদে কোথায় থাকিত আমি জানিতাম।

পূর্ব্বেই তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। গুম্ফাদ্বার উন্মোচনের শব্দে স্তব্ধ রজনী মুখরিত হইল। অন্য দিন হইলে ভীত হইতাম; অদ্য আমি সর্ব্বপ্রকার ত্রাসের অতীত। অন্য বিষয় মানিবার অবসর নাই। যতদূর সম্ভব সত্বরতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিলেও সমস্ত শেষ করিতে তিন ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। সমাধিগুম্ফার দ্বার যখন রুদ্ধ করি, তখন রাত্রির ত্রিযাম অতীত। আমার বিবাহ-দিনের প্রভাত মৃতের মধ্যে হইল, এই শুভদিবসের সমাপ্তিও কি এই অশরীরী রাজ্যে হইবে? ভয়ানক স্থান! কি দুর্য্যোগ! নগরটা যেন মহাশ্মশান! কেবল দৈত্যের নিশ্বাসের মত প্রবল বায়ু গর্জ্জন করিতেছে, বৃষ্টি-ধারা কি তাহার আনন্দাশ্রু?

প্রফুল্ল মনে গৃহে ফিরিলাম। আমার কার্য্য সুসম্পন্ন! কক্ষগাত্রে লম্বিত আয়নাখানিতে আমার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। এ কি! আমিও কি প্রেত-রাজ্য হইতে প্রেত-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি? নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া নিজেরই ভয় হইল। চক্ষু দুইটি কোটরগত, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের চক্ষুর ন্যায় হিংসাদ্বেষে পূর্ণ! চক্ষে আবরণ ছিল না; তাড়াতাড়ি আবরণ পরিলাম। শ্বেত কেশগুলি কাফ্রির কেশের ন্যায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যথাস্থানে বিন্যস্ত করিলাম। বৃষ্টিপাতে পরিচ্ছদ আর্দ্র; রাস্তার কর্দ্দমে সমস্ত পোষাক মলিন, সমাধিগুম্ফার সেই গুপ্ত দ্বার রুদ্ধ করিতে চুন, সুরকি, ব্যবহার করিয়াছি, তাহার চিহ্ন পোষাক পরিচ্ছদে, হস্তে বিদ্যমান। হস্ত পদ ধৌত করিলাম। পোষাক পরিত্যাগ করিয়া একটা বাক্সে বন্ধ করিলাম। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত শিশুটির মত শয্যার আশ্রয় লইলাম। কি আত্ম-প্রতারণা! আমি গোপনীয়, আমার সকল কার্য্য গোপনীয়! সেই তাহার আরম্ভ,—আজ তাহার দ্বিযাম। তাহার শেষ কোথায় কে বলিবে? এ অসহ্য যন্ত্রণা—বিকট খেলা আর কত দিন? কোথায় কি ভাবে ইহার শেষ—আমার মুক্তি? আর ত সহ্য হয় না প্রভু! শেষ কর!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

প্রকৃত বণিক্

[মৌখিক ভাষায় লিখি। ' অক্ষর ঈষৎ ই। এই রূপ একটা অক্ষর না দিলে ভাষা মৌখিক হয় না। কোত্তে বোল্লে পোড়েচে প্রভৃতি শব্দের আদ্য অক্ষরে ও দিলে সাধুভাষার ধাতুর সহিত মিল থাকে না। অনেক শব্দের বানান প্রচলিত রাখা গেল; তা না রাখিলে ভাষাটা নূতন হইয়া পড়ে; শুনিয়া নহে, পড়িয়া, বুঝিতে কষ্ট হয়।]

মাস ছয়েক হ'ল, একদিন দুপর বেলা খেয়ে বা'র বাড়ীতে এসেচি, দেখি আমার ব'সবার ঘরের সমুখে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। আকার-প্রকার দেখে ভিক্ষুক বোধ হ'ল না, রেলে জিনিষপত্র হারায় নি, গাঁয়ে মন্দির মেরামত ক'র্‌ত্তে চায় নি, রামেশ্বর তীর্থদর্শনেও বা'র হয় নি। নমস্কার ক'ল্লে, আমার কাছে এসেচে ইংরেজীতে ব'ল্লে। দেখ্‌লাম লোকটি সজ্জন বিনীত। ভিতরে বসালাম, ইংরেজীতে প্রয়োজন জিজ্ঞাসা ক'ল্লাম। তিনি তেলুগু, দক্ষিণের কোকনডা হ'তে এসেচেন, বড় চিন্তায় প'ড়েচেন।

"কি চিন্তায়?"

তেলুগু॥ আজ্ঞে আমি বণিক্, আমি এলিজারিন রং বিক্রি করি। এই রং দিয়ে আমাদের দেশে রঙ্গাজীবেরা কাপড় রঙ্গায়, আমাদের মেয়েরা পরে। কিন্তু ইয়ুরোপে যুদ্ধ হওয়াতে জর্ম্মন রং আর আসচে না; যা সঞ্চয় ছিল এতদিন চ'লেচে, আর চলে না। আগে এক পিপা রং কিন্‌তাম ত্রিশ টাকায়, এখন কিন্‌চি চা'র শ টাকায়, তাও পাচ্চি না।

"আপনি বণিক্, বিক্রি হ'চ্চে না ব'লে বিপদ ভাব্‌চেন, না আর কিছু?"

বণিক্॥ আজ্ঞে, তা নয়। আমার বেচা-কেনা বন্দ নাই, রং নাই অন্য জিনিস আছে। দেশের মানসম্ভ্রম রাখ্‌তে পাচ্চি না, দেশে কি চাই কি না-চাই তা আমরাই ত দেখ্‌ব। আমাদের মেয়েরা বাজারে রং-করা কাপড় পাচ্চে না, দোকানী ব'ল্‌চে সে কাপড় নাই, রঙ্গাজীব ব'ল্‌চে রং পাচ্চি না, কি ক'র্‌ব। যা অল্পস্বল্প পাচ্চি তার দাম এত চ'ড়েচে যে কিন্‌তে পাচ্চি না।

"রং জোগাড় ক'রে দেওয়া কি আপনার কাজ? রং না পেলে কি ক'র্‌বেন।"

বণিক্‌॥ আজ্ঞে, সেই ত বিপদ, কি ক'রব জানি না, তাই আপনার কাছে এসেচি। কোন উপায় ব'লে দিন, আমাদের মান থাক।

আমি খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাক্‌লাম। দেশের পূর্বকালের ব্যবস্থা মনে প'ড়্‌তে লাগ্‌ল। কবিকঙ্কণের ধনপতি সদাগরের কথা মনে প'ড়্‌ল। রাজা তাকে ধরিয়ে এনে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, লোকে কেন এ দ্রব্য পায় না, সে দ্রব্য পায় না। ধনপতিকে বাণিজ্যে বা'র হ'তে হয়েছিল। বণিকেরা ব্যাপার ক'রে লাভ ক'ত্ত বটে, কিন্তু দেশের অভাব পূরণ ক'ত্তে বাণিজ্য ক'ত্ত। না ক'ল্লে রাজার কাছে দণ্ডনীয় হ'ত। আরও পূর্বকালে দু-হাজার বছর পূর্বে চাণক্যের সময়ে রাজা পণ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত ক'ত্তেন, স্বরাজ্যে উৎপন্ন পণ্যের ব্যবহার স্থাপন ক'ত্তেন, পররাজ্য হ'তে পণ্য আনাবার জোগাড় ক'ত্তেন। যারা আ'নত তারা অনুগ্রহ পেত, কিন্তু ইচ্ছামত দাম নিতে পা'ত্ত না। এখন কা কস্য পরিবেদনা। তোমার অমুক দ্রব্যের অভাব প'ড়েচে; তুমি খুঁজে নেবে কোথায় পাবে, দেশের বণিকের দায় নাই। খানিকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসলাম, কি বুদ্ধি ঠাওরেচেন?

বণিক॥ কি আর বুদ্ধি ক'র্‌ব? কোথায় কি হ'চ্চে, তা জান্‌বার জন্যে আমরা তিনজন তিন দিকে বেরিয়ে প'ড়েচি। একজন দেশে আছেন, আমি এদিকে এসেচি।

"আপনাকে এখানে আ'স্‌তে কে ব'ল্লে? আপনি কবে এসেচেন?"

বণিক॥ আমি কা'ল এসেচি। বড় শহর দেখ্‌লে রেল হ'তে নাম্‌চি। রেলষ্টেসনে জিজ্ঞাসা ক'চ্চি। সেখানে সন্ধান না পেলে শহরে ঢুকচি। কা'ল এক যুবা আপনার নাম ও বাসা ব'লে দিয়েচে।

বণিকের এই উত্তর শুনে বুঝ্‌লাম দেশে এখনও প্রকৃত বৈশ্য আছে। ব'ল্লাম, এখন বিলাতী রং পাচ্চেন না, দেশী রং পাবার চেষ্টা করুন।

বণিক্‌॥ দেশী রং পাওয়া গেলে ভাবনা থাকৃত না। আগে কি গাছ হ'তে রং হ'ত, তা জানি না, রঙ্গাজীবেরাও ভুলে গেচে।—কি ক'রে কাপড়ে সে রং পাকা ক'ত্তে হয়, তাই বা বলে কে?

আমি ব'ল্লাম দেশে গাছ লুপ্ত হয় নাই, গাছ আছে তবে গাছ তোলা ব্যাপার লোপ পেয়েছে। পঁচিশ বছর আগে ওড়িশায় একটা গাছের চাষ হ'ত, এখন আর হয় না। এখানে ওখানে বনে জঙ্গলে একটা দুটা যা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সে গাছ আপনাদের অঞ্চলেও জন্মে। তা ছাড়া আপনাদের অঞ্চলে যে গাছটা আপনা আপনি সমুদ্র-নিকটে অপর্যাপ্ত জন্মে, একটু চেষ্টা ক'ল্লে সেটা সংগ্রহ ক'ত্তে পারেন। তবে লোক নিযুক্ত ক'ত্তে হবে; আগে যারা সংগ্রহ ক'ত্ত তারা বোধ হয় এখন অন্য কাজ করে। কাপাস কাপড়ে সে রং ধরে না, ধ'ল্লেও পাকা হয় না। যে মসলা দিয়ে কাপড়ে রং পাকা ধরাতে পারা যায় তাকে রাগবন্ধ বলে। আপনি বণিক, আপনি না জান্‌তে পারেন; কিন্তু আপনাদের রঙ্গাজীবেরা নিশ্চয় জানে। তারা কি ক'রে বিলাতী রং কাপড়ে পাকা করে, তা কি জানেন?

বণিক্‌॥ জানি বই কি। আমরা যে রাগবন্ধও বিলাত হ'তে আনাই, বিক্রি করি। এক রকম তেল বিলাত হ'তে আসে। সেই তেল জলে মিশিয়ে কাপড়ে মাখিয়ে শুখিয়ে পরে রঙ্গের জলে ফুটালে লাল পাকা রং হয়। দেশী রং পেলে কি ক'রে তা কাপড়ে লাগাতে হয়, পাকা ক'ত্তে হয়, তা আমাকেই ব'লে দিতে হবে। নচেৎ দেশী রং পাওয়া না-পাওয়া সমান।

ঠিক কথা। বণিক আমার জানা নাম বুঝ্‌তে পাল্লেন না, বিজ্ঞানে লেটিন নাম আরও দুর্বোধ্য। তেলুগু নাম জান্‌তাম না। কাজেই গাছ জোগাড় করে দেখাতে হবে, কাপড়ে পাকা রং ক'রেও দেখাতে হবে। তাঁকে দিনকতক থাক্‌তে বল্লাম। অতি আশা না করেন, এ কারণ সাবধান ক'রে দিলাম। ব'ল্লাম, দেখুন আমি বাণিজ্য-ব্যাপার জানি না; আপনি গাছ প্রচুর জোগাড় ক'ত্তে পার্‌বেন কি না, লোককে লওয়াতে পার্‌বেন কি না, আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে কি না, তা আপনি বিচার ক'র্‌বেন। সাধু সহর্ষে "যে আজ্ঞে" ব'লে সে দিন চ'লে গেলেন।

পরে গাছ সংগ্রহ ক'রে আমার যা জানা ছিল তা সব তাঁকে দেখালাম। পরে ব'ল্লাম, বিলাত হ'তে যে রাগবন্ধ তৈল আ'স্‌ত তা অনুকরণ ক'ত্তে সময় লাগিবে। ইতি-

মধ্যে আপনি কলিকাতা যেতে পারেন। সেখানে শিবপুরে রঙ্গ-কলা শেখান হয়। শিক্ষক সজ্জন; তাঁর কাছে গেলে তিনি নিশ্চয় আপনার নিমিত্ত সময়ক্ষেপ ক'র্‌বেন।

বণিক নাম-ধাম সব জেনে নিয়ে চ'লে গেলেন। দিন বার তের পরে আমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে এলেন। মুখে পূর্ব্বের মতন বিষাদের ছায়া নাই, আশার সঞ্চার হয়েচে। কোথায় ছিলেন, কেমন ছিলেন, কি শিখেচেন, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ক'ল্লাম। একটা কথায় বড় দুঃখ হ'ল। তিনি আট দিন অন্ন গ্রহণ ক'র্ত্তে পারেন নাই।

"বঙ্গদেশ ভাল, বাঙ্গালী ভাল, শিবপুর কলেজের যুবকেরা ভাল, সব ভাল। কিন্তু...। সবাই মাছমাংস খায়! এমন একটু পবিত্র স্থান পেলাম না যেখানে পাক ক'র্ত্তে পার্ত্তাম। তেমন স্থান পেলে কি ক'র্ত্তাম জানি না। আমি কখনও নিজে পাক করি নাই, পাক ক'র্ত্তে জানি না।"

"কি খেয়ে ছিলেন?"

বণিক্॥ কেন, অন্য ভোজ্য প্রচুর। ডা'ল-ভিজা, দুধ, নারিকেল, মিষ্টান্ন।

এই কথা ব'লে যেন একটু লজ্জিত হ'লেন। ব'ল্লেন দেখুন আমাদের মধ্যে জাতিবিচার একটু বেশী। তা ছাড়া, আমি আপনাদের মতন education পাই নি, কলেজে পড়ি নি। যেটা এত কাল করি নি, সেটা এখন ক'র্ত্তে পারি না। সাধুর বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর হবে। মাথায় শিখা, গায়ে কোট, তদুপরি জরি-পা'ড় উত্তরীয়, পরিধানেও জরি-পা'ড় ধুতি, পায়ে মরাঠী চটি। জাতিতে বৈশ্য। ধনকড়ি আছে, দেশে মানসম্ভ্রম বিলক্ষণ আছে। মাদ্রাজ অঞ্চলে ইংরেজী ভাষা খুব চলিত আছে। ইনি বাড়ীতে কিছুদিন সংস্কৃতও শিখেছিলেন। তেলুগু ভাষাতেও অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে। তাতে কথাবার্ত্তায় অনেক সুবিধা হ'ল। এখানে তিনি কিছুদিন থাক্‌লেন। দেশে পত্র পাঠাতে লাগলেন। যে গাছ দেখিয়েছিলাম, সে গাছ দেশ হ'তে আনালেন। তাঁর ইচ্ছা, রঙ্গের কাথ বিক্রি করেন। বিলাত হ'তে রঙ্গের কাথ আ'স্‌ত। তেমন কাথ আর তেমন তেল পেলে ইয়ুরোপের যুদ্ধহেতু তাঁদিকে শাদা কাপড় প'র্ত্তে হ'বে না। কিন্তু কত গাছ হ'তে কতটুকু কাথ হ'তে পারে; কাথ ক'র্ত্তে খরচে পোষাবে কি না, ইত্যাদি অনেক কথা আছে। তিনি দেশে চ'লে গেলেন।

পাঁচ মাস পরে সেদিন তিনি আবার এসেছিলেন। একটা নিমিত্ত ঘ'টেছিল, পুরীতে রথযাত্রা দেখ্‌তে এসেছিলেন। তিন-চা'র ঘণ্টা ধ'রে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'ল। প্রধান কথা, রঙ্গের কি ক'রেচেন।

"দেশী রং বিক্রি কচ্চি।" নিজাম-রাজ্য হ'তে একটা, আর আমাদের অঞ্চল হ'তে অন্যটা, দু-টাই বিক্রি কচ্চি। কাথ করি না, গুঁড়া ক'রে একটা দ্রব্য মাখিয়ে শুখিয়ে বিক্রি কচ্চি। আমাদের অঞ্চলে তামাক-পাতার ডাঁটায় কিছু হয় না, ফেলা যায়। ইহার ক্ষার ও তিল তেলে বিলাতী রাগবন্ধ তেলের কাজ চ'ল্‌চে। দু'শ টাকায় পিপা বিক্রি কচ্চি। খুচরা দর দু টাকা পৌণ্ড।"

"দু টাকা পৌণ্ড! এত দামে কে নেবে? কেমন রং দাঁড়াচ্চে?"

বণিক্॥ রং বেশ হ'চ্চে, জর্ম্মান রঙ্গে যেমন হ'ত তেমনই। দাম বেশী মনে ক'চ্চেন? সেদিন মাদ্রাজে কি রকমে জানি না, শুনেছি আমেরিকা হ'তে, কিছু রং এসেছিল। যাতে মাদ্রাজের লোকেই পায়, এজন্যে মাদ্রাজ-গবর্মেণ্ট বিধিমতে চেষ্টা ক'রেছিল। তথাপি এক এক পিপা (১১২ পৌণ্ড) চৌদ্দ শ টাকায় নিলাম হয়েছে। সংবাদপত্রে প'ড়ে থা'ক্‌বেন।

"আগে কোথায় চারি আনা পৌণ্ড, এখন কোথায় তের টাকা পৌণ্ড! আপনি বেশী ক'রে বিক্রি করুন না, দেশের অন্ততঃ একটা নষ্ট ধনের পুনরুদ্ধার হ'ক। আপনার রঙ্গের গুঁড়া দু টাকা পৌণ্ড দরে বিক্রি না ক'রে কমে করেন না কেন?"

বণিক্॥ অনেক খরচা প'ড়চে। জোগাড় ক'র্ত্তে, আনাতে, তৈয়ার ক'র্ত্তে নানা রকমে খরচা প'ড়চে। বেশী ক'রে ক'র্ত্তে সাজ-সজ্জা ও দু-একটা কল কিন্‌তে হয়। সে সব ক'র্ত্তে পারি না। যুদ্ধ পরে গুঁড়া বিক্রি হবে না; যাই করি, চারি আনা পৌণ্ড বিক্রি ক'র্ত্তে পারব না। রঙ্গের কাথ বিক্রি ত দূরের কথা।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের এটাই আসল কথা। ইয়ুরোপে যুদ্ধ হচ্চে, দেশের এমন সুযোগ শীঘ্র হবে না, যে যা পার

ক'ত্তে থাক, নষ্ট ধন বা'র কর, দেশের শ্রী ফিরে যাক্— একথা অনেকে চীৎকারে ব'লছিলেন। পরে কি হবে, সেটা ভাবেন নি। দেশে অনেক জিনিষ হ'তে পারে। আগে হ'ত; এখন হয় না। বিদ্যাবুদ্ধি লোপ পায় নি; বিলাতীর দরে বিক্রি ক'ত্তে পারা যায় না,—এটাই গোড়ার কথা। পয়সায় পঁচিশ ছুঁচ বেচ্‌তে না পারলে হাঁকু-পাঁকু বৃথা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

আলোচনা

টিপ্পনী।

(১) বাঙ্গালা বানান।

বাঙ্গালা বানান সম্বন্ধে অনেক লেখা-লেখি হইয়াছে। এখানে কয়েকটা স্থূল কথার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। মুখের কথাই ভাষা। মুখে যে ধ্বনি করি, অক্ষররূপ সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা সে ধ্বনি প্রকাশের নাম লেখা। দেশ-, কাল-, পাত্র-ভেদে ধ্বনি বিভিন্ন হয়। তা ছাড়া, ধ্বনি বায়ুতে মিলাইয়া যায়, পুনঃ পুনঃ না শুনিলে না শিখিলে মুখে আনিতে পারা যায় না। তখন আঁকা অর্থাৎ লেখা চিত্র ধ্বনিটা মনে পড়াইয়া দেয়, যে কথা শুনি নাই জানিতাম না তাহাও জানাইয়া দেয়। আমরা বলি, ছেলেটি লেখা-পড়া করিতেছে,—সঙ্কেত লিখিতে ও পড়িতে শিখিতেছে। ছেলেটি পড়া-শুনা করিতেছে,—সঙ্কেত-সাহায্যে শব্দ বা ধ্বনি অভ্যাস করিতেছে, গুরুর মুখে শুনিতেছে। বানানের গুরুত্ব অস্বীকারের জো নাই। বানান যে সঙ্কেত; দিন দিন সঙ্কেত ইচ্ছামত বদলাইলে সকলে বুঝিতে পারে না।

লোক-সমাজের নিমিত্ত ভাষা। আমার তোমার একার নিমিত্ত নহে। লোকসম্মতিতে সমাজের স্থিতি। সমাজ স্বভাবতঃ স্থিতিশীল; লোক-সম্মতি গুরুতর কারণ ব্যতীত আমার তোমার খেয়ালে পরিবর্তিত হয় না।

সমাজ স্থিতিশীল; ইহার ভাষাও স্থিতিশীল। অথচ ভাষার পরিবর্তন হইতেছে। প্রথমে মুখের ধ্বনির হয়, পরে ধ্বনির চিত্রের হয়। স্থিতি ও গতি আপাততঃ বিরোধী বটে। কিন্তু শিশু যেমন ক্রমশঃ বালক, বালক ক্রমশঃ যুবা হয়, গতিশীল হইয়াও অবয়বের একটা স্থিতি থাকে, ভাষাতেও গতি থাকিলেও একটা স্থিতি থাকে। পুরাতনের সহিত নূতনের যোগ-রক্ষাই স্থিতি। এই যোগ-রক্ষা পরম্পরা-রক্ষা। ইহার অর্থ এমন নহে যে পঙ্‌ক্তির আদ্যের সহিত অন্তের যোগ, এবং মধ্যের বি-যোগ। আদ্যের সহিত মধ্যের, এবং মধ্যের সহিত অন্তের যোগ দ্বারা পুরাতনের সহিত নূতনের যোগ ঘটে।

চার অর্থে চলন, গতি। গতি সম হইলে, গণিত করিতে যেমন সুবিধা, গতি অনুসারে কাজ করিতেও তেমন সুবিধা। গতি কখন শীঘ্র কখন মন্দ, কোথাও ঋজু কোথাও কুটিল হইলে, এককথায় তাহা বিষম-চার বলা যায়। সম অপেক্ষা শীঘ্র হইলে গতিটা অতিচার হয়, কুটিল হইলে ক্রূর-চার। চার শব্দের সহিত ধর্মাধর্মের, আচারের সম্পর্ক নাই। জ্যোতিষে চার শব্দ বহুপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালাতে প্রায়ই সঞ্চার বলা হয়। কবিও লেখেন, "মেঘে যেন বিজলী সঞ্চার।"

উপরের কথাগুলি এদিকে সেদিকে টানিয়া বাঁকাইয়া নানা তর্কের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। কারণ, সীমানির্দেশ করিতে পারা যায় না। মুখের কথায় কথায় বহু শব্দের, বিশেষতঃ ক্রিয়াপদের, স্বর সংক্ষেপ ঘটে। ঘাড় নাড়িয়া, চোখ টিপিয়া, হাত-তালি দিয়া, হঁ-হাঁ করিয়া কাজ সারিতে পারিলে কে লেখা-পড়ার ধার ধারিত

আমরা যেমন বলি তেমন লিখিব, কি যেমন লিখি তেমন বলিব, কি দুই-ই করিব, ইহার বিচার দুই এক কথায় সম্ভবে না। আমার "বাঙ্গালা ভাষা" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য বিচার করিয়াছি। সবাই মানে পথের পথিক, কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম পথ দুইটার মাঝে অনেক স্থান, অনেক পথ করা যাইতে পারে। তথাপি আদ্যোপান্ত সঙ্গতি বিচার করিয়া, পথের সুবিধা অসুবিধা পর্য্যালোচনা করিয়া, পথ বাঁধিতে না পারিলে জানা পথেই চলা কর্তব্য। সকলের মুখে একপ্রকার ধ্বনি উচ্চারিত হয় না, সকলের শিক্ষা ও সংসর্গ সমান নয়। একটা মান বা আদর্শ চাই; সেটা লিখিত রূপ। যার-তার লেখা মূর্তি নহে; যে শব্দমূর্তি লিখিতে শিখিয়াছে, যে ভাষা-ব্যবসায়ী, তার লেখা মূর্তিমান হয়। পুরাতন পুথীর বানান সকলস্থলে গ্রাহ্য নহে। অনেক পুথীর বানান দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, লিপিকর অশিক্ষিত। গ্রামের মুদী, আদালতের মুহুরীর আঁকা শব্দচিত্র চিত্রকলা-বিৎ সাহিত্য-রসিকের আদর্শ হইতে পারে না। ওা-র প্রতি প্রবাসী সম্পাদক-মহাশয়ের মমতা নাই। আমারও বিরাগ নাই। আমার অনুরাগ সমতার প্রতি। যখন যেমন কলমে ও মুখে বাহির হইবে, তখন তেমন করিতে গেলে স্থিতিতে বাধে। শুনিলাম ওড়িশার আদালতের মুহুরী বেওয়া লিখিতেছে বেওা, ওয়ারেণ্ট ওারেণ্ট। ওড়িয়াতেও দুই ব-এর আকার এক। বাঙ্গালা শব্দ লিখিবার নিমিত্ত বাঙ্গালা অক্ষর কল্পিত হইয়াছিল। এই অক্ষর দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার ধ্বনি প্রকাশ করিতে পারা যাইবে না। আমাদের মুখেও সে সব ধ্বনি ঠিক থাকে না; ঠিক হইল না ভাবিয়া আমরা কাতর হই না। আরবী ফারসী শব্দের উচ্চারণ যেমন বাঙ্গালা করিয়া ফেলিয়াছি, জনসাধারণ ইংরেজীরও তেমন করিতেছে। কেবল আমরা ক-জন যাহারা ইংরেজী বোলি বলি বাঙ্গালা বোলিও বলি, ইংরেজী উচ্চারণ বাঙ্গালায় চালাইবার নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করিতেছি।

বানানটা গুরুতর নহে; কারণ সেটা সঙ্কেত; সঙ্কেত বদলাইতে কতক্ষণ লাগে। বানানটা গুরুতর; কারণ সেটা বিধিবদ্ধ হইয়া

গিয়াছে, সকলে শিখিয়াছে। শূন্যপুরাণে আছে,"কাত্তিকের সোলুণ্ডেতে।" প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু "সোলুণ্ডেতে" দিশাহারা হইয়াছিলেন।

বানান সম্বন্ধে তিনটা সূত্র চলিতেছে। (১) সংস্কৃত শব্দের যেমন উচ্চারণ করি না কেন বানানে সংস্কৃত দেখাইতেছি। কেবল বএর বেলা নহে; ড় ঢ় য় অক্ষরেও নহে। (২) সংস্কৃত হইতে আগত ও অপভ্রষ্ট শব্দের বানানে আমরা অনেকটা স্বাধীন, কতকটা সংস্কৃতের অধীন। পুরাতনের সহিত যোগরক্ষা আবশ্যক বলিয়াও পরাধীন। আমরা বলি যখন যেমন, লিখি যখন যেমন। বঙ্কিমচন্দ্রের এক পুস্তকে খুড়ী পিসী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের শেষে ই দেখিয়াছি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ই লিখিতেন, কি তাঁহার পুস্তকপ্রকাশক করিয়াছেন, তাহা জানি না। যিনিই লিখুন, ঈ লেখাই শুদ্ধ। কারণ পুরাতন পুথীতে ঈ, সংস্কৃতে ঈ, স্ত্রীলিঙ্গ জ্ঞাপনার্থে ঈ; মুখে যাহাই বলি না কেন। তদ্ধিত প্রত্যয়ে ঈ, যেমন দেশী বিদেশী, বাঙ্গালী মরাঠী; ইত্যাদি। (৩) অন্য শব্দের বানানে স্বাধীন হইয়াও প্রচলিত শব্দের বানানের সাদৃশ্যের অর্থাৎ দৃষ্টান্তের অধীন। যেমন মাষ্টার, মাশুল।

বহু বহু শব্দ আছে, যাহার বানান আমাদের উচ্চারণ মতন নহে। তথাপি যে কেহ কেহ "বাঙলা বাঙালী রাঙা ভাঙা" বানানের প্রতি অনুরক্ত হইতেছেন, তাহার যথোচিত কারণ জানিতে পারি নাই। পূর্বে করিলুঁ হইলুঁ পদ ছিল। পরে করিলাঙ হইলাঙ হইয়াছিল। বোধ হয় পড়িতে হইত, করিলাউ। হুঁ স্থানে হঙ দেখিয়া এই অনুমান দৃঢ় হইতেছে। অঁ ধ্বনি ব্যক্ত করিতেও ঙ লেখা হইত। যেমন কুঙর, সঙরণ। এইরূপ, ই ধ্বনি ঞ, প্রায়ই ঞি, দ্বারা লেখা হইত। যেমন নাঞি, গোসাঞি।

বাঙ্গালা বানানে য় অক্ষরের প্রাচুর্যের কারণ ছিল। হয়ত একটা কারণ পরে পরে দুই স্বর বসাইতে অনিচ্ছা। অদ্যাপি গ্রাম্য লেখক যত য় লেখে আমরা তত লিখি না। ভাষা কট্‌-মট্যা করিতে কেহই বলে না। কিন্তু যেটা আছে, সেটা জোর করিয়া মধুর করিতে পারা যায় না। তা ছাড়া, "বাঙ্গাল" "বাঙ্গালা"—ধ্বনি পুরুষোচিত বলা এক কথা, আর ভাষা তেজোব্যঞ্জক করিতে হইলে ঙ্গ লিখিতে হইবে বলা অন্য কথা। "ইনি কবি," স্বীকার করিলে, যিনি কবি তিনিই, ন্যায়ে, ইনি হন না।

এই টিপ্পনীর সহিত শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষে ও ভারতীতে প্রকাশিত ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধ পড়িতে পাঠককে অনুরোধ করি। মৌখিক ভাষায় লিখিতে হইলে বানানে সাবধান হইতে হয়। প্রবাসীর এই সংখ্যায় "প্রকৃত বণিক" প্রবন্ধ দেখুন।

(২) মেয়েদের আত্মহত্যা।

"কেরোসিনের কৃপা-"র যে যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে সব আত্মহত্যা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। যাহারা কেরোসিনে জীবন সাঙ্গ করিয়াছে, তাহারা দু'পাত পড়িতে পারিত কি? তাহাদের বাস নগরে, না গ্রামে? বাঙ্গালা উপন্যাস ও মাসিক পত্রের গল্প কেরোসিনের কৃপার ভিখারী করিয়াছিল কি না, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। রৌদ-বাতাসের অল্পতা বা অভাবে মানুষকে অধীর করে; মানুষের অভিমান বাড়ায় কি না, তাহাও দেখা কর্তব্য। আত্মহত্যার মূলে অধৈর্য প্রধান।

(৩) প্রতিবেশীর নিন্দা।

অদূরদর্শী বাঙ্গালী প্রবাসে গিয়া বাঙ্গালী জাতির মানসম্ভ্রম নষ্ট করিতেছে। দেশে বিদেশে তাহার ঔদ্ধত্য প্রকট হইতেছে। প্রতিবেশীর অযথা কুৎসা-রটনার এক প্রতিকার আছে। সেটি প্রতিবেশীর হাতে। বাঙ্গালার শিক্ষিত প্রতিবেশী বাঙ্গালা পড়িতে বুঝিতে পারেন। যদি তাঁহারা বাঙ্গালা পুস্তকে কিংবা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহাদের নিন্দার সংবাদ বাঙ্গালা মাসিক কিংবা সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে নিন্দুকের চৈতন্য হইবে। প্রতিবেশী নিজের সংবাদপত্রে নিন্দার সমালোচনা করিলে প্রতিকার হইবে না, বরং এক জনের মূঢ়তায় বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিরাগ জন্মিবে। আশা করি, স্বদেশপ্রেমিক প্রতিবেশী কথাটা বিস্মৃত হইবেন না।

(৪) পঞ্জিকা-সংস্কার।

লেখক-মহাশয় সমস্যাটা যত সহজে সারিতে চাহিয়াছেন, বোধ হয় তত সহজে সাধ্য নহে। বিশ পঁচিশ বৎসরের আলোচনায় এইটুকু হইয়াছে যে লোকে প্রয়োজন বুঝিয়াছে বা শুনিয়াছে। কি চাই যখন বলিতে পারিব, তখন উপায়ও দেখিতে পাইব। সে কথা ছাড়িয়া যদি প্রবন্ধের দিকে তাকাই, তাহা হইলে অনেক কথা লিখিতে হয়। দুই একটা লিখিতেছি। পৃথিবী গোলাকার। এ কারণ ইহার নাম ভূ-মণ্ডল। ভূ-মণ্ডলের পৃষ্ঠদেশে বৃত্তাকারে এমন স্থান আছে যেখানে গেলে পৃথিবীর অক্ষ বা মেরু দণ্ড সমান থাকিতে দেখায়, উত্তর প্রান্ত উপর আকাশে ঠেকে না। সে বৃত্তকে নিরক্ষ-বৃত্ত বলে, কারণ সেখানে অক্ষ ক্ষিতিজে থাকে, অক্ষ ও ক্ষিতিজে কোণ হয় না। ভূমণ্ডলে যেমন নিরক্ষ-বৃত্ত, নভো-মণ্ডলে তেমন বিষুব-বৃত্ত। বিষু অর্থে সাম্য; রবি যে বৃত্তে আসিলে দিবা-রাত্রি সমান হয়। বৎসরে এক দিন রবি বিষুব-বৃত্ত পার হইয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরে, এবং আর একদিন উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করে। ক্রান্তি শব্দে গমন বুঝায়; রবি উত্তর দক্ষিণে গমন করে, রবির উত্তর দক্ষিণ ক্রান্তি আছে। ক্রান্তি শব্দই সংক্রান্তি শব্দে আছে, কেবল সম্ উপসর্গ অধিক। সংক্রান্তি ও সংক্রমণ একই; বিষুব-বৃত্তে সংক্রমণ হয় বলিয়া বিষুব-সংক্রমণ বা বিষুব-সংক্রান্তি। রবির গমন-পথের নাম ক্রান্তি-বৃত্ত। কিন্তু রবি বর্ষে বর্ষে একই পথে গমনাগমন করে না, বিষুবে তাহার সংক্রমণ বা আগমন বা প্রবেশ বিষুবের একই বিন্দুতে ঘটে না। যেখানে ঘটে, সে বিন্দুর নাম ক্রান্তি-পাত। পাত অর্থে পতন, পতনস্থান। এ বৎসর যেখানে পাত, আগামী বৎসর সেখানে হইবে না, একটু পিছাইয়া পশ্চিম দিকে হইবে। পুরাণে রবির রথের চাকা একখানি। এক চাকার গাড়ীতে চড়িয়া রবি টলিতে

টলিতে যায়; আকাশে চাকার দাগ পড়িলে, রবির পথ দৃশ্যমান হইলে বিষুবে এত দাগ দেখা যাইত যে তাহা গণিতে পারা যাইত না। এ বৎসরের দাগ ও শত বৎসরের দাগ কিন্তু এত কাছে কাছে যে সূক্ষ্ম যন্ত্র, দূরবীক্ষণ-সম্বলিত যন্ত্র ব্যতীত, দুইটা দেখা যাইত না, একটা বোধ হইত। বহু বৎসর পরে আগের দাগ ও পরের দাগের মধ্যের অন্তর বাড়িয়া যায়, অক্লেশে মাপিতেও পারা যায়। অর্থাৎ ক্রান্তিপাত মন্দমন্দ পশ্চিমে হটিতেছে। বর্তমান পাঁজির আরম্ভ সময়ে—প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে একদিন—যেখানে পাত হইয়াছিল, এখন সেখানে হইতেছে না, প্রায় ২২।০ অংশ পশ্চিমে হইতেছে। এই অন্তরকে পাঁজিতে অয়নাংশ বলে। গত ৭ই চৈত্র সোমবার রাত্রি (ইংরেজী হিসাবে ২১ মার্চ ভোরে) রেলের ঘড়ীর ৪টা ১৭ মিনিটের সময় রবি বিষুব পার হইয়াছিল। আগের পাঁজি থাকিলে পরদিন মঙ্গলবার মেষ সংক্রমণ—মেষে প্রবেশ—ধরা যাইত, ১লা বৈশাখ গণা হইত। সংজ্ঞাগুলি কিন্তু ভুল হইত। কারণ সেখানে মেষও নাই, অশ্বিনী নক্ষত্রও নাই। এই দুই এখনকার ক্রান্তিপাতের অনেক পূর্ব দিকে আছে। ইয়ুরোপীয়েরা ভুল সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে, সংজ্ঞা কৃত্রিম করিয়া ফেলিয়াছে; আমরা সংজ্ঞা ঠিক রাখিতে গিয়া সংজ্ঞার উদ্দেশ্য কৃত্রিম করিয়া ফেলিয়াছি। দুই মতেই সুবিধা অসুবিধা আছে। আমরা বৈশাখ জ্যেষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতু বলিতেছি, কারণ পূর্বকালে বৈশাখের আদ্যে ক্রান্তিপাত হইত। এখন প্রায় ২২।২৩ দিন আগে হইতেছে। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে বরং চৈত্র বৈশাখ দুই মাস গ্রীষ্ম বলা উচিত। পূর্বকালে এমন পরিবর্তনের, অন্ততঃ একবারের, উল্লেখ আছে। শুধু ঋতু মাসের পরিবর্তন আবশ্যক হইলে পঞ্জিকা-সংস্কার সুসাধ্য হইত। আমাদের পাঁজির দিনক্ষণের সহিত পুণ্যধর্মকর্মের সম্পর্ক আছে। ৭ই কি ৮ই চৈত্রে মহা-বিষুব-সংক্রান্তি হইতেছে; আমরা ২২।২৩ দিন পরে জলপূর্ণ ঘটদান করিতেছি। আরও নানা কথা আছে। বর্তমান স্মার্তাচার্যগণ একটু মনোযোগী হইলে অনেক কথা সহজ হইয়া পড়ে। সুখের কথা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ পঞ্জিকা-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

অক্ষরের আলোচনা।

'অ' অক্ষরের গায়ে আকার যুড়িয়া যে 'আ' সৃষ্ট হয় নাই, তাহা বুঝাইতেছি। 'অ' অক্ষরের প্রাচীন উচ্চারণ ধরিলেই দেখিতে পাইবেন যে উহার দীর্ঘ উচ্চারণের অক্ষরের নাম 'আ'। ঐরূপ 'ই' ও 'উ' বর্ণ দুইটির দীর্ঘ উচ্চারণে 'ঈ' 'ঊ' হয়। দীর্ঘ বর্ণ চিত্রিত করিবার জন্য একেবারে নূতন অক্ষর না গড়িয়া হ্রস্ব বর্ণের গায়েই একটি অতিরিক্ত সোজা বা বাঁকা টান দেওয়া হইয়াছিল। প্রাচীন কালের অক্ষরগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে কথাটি স্পষ্টতর হইবে। বানানের জন্য 'অ' অক্ষরের কোন প্রতিভূ লইবার প্রয়োজন হয় নাই; 'আ' অক্ষরের পিছনের টান-টুকুকেই ঐ বর্ণের প্রতিভূ রাখা হইয়াছিল। ঠিক ঐরূপই যে 'ই' ও 'ঈ' অক্ষর দুইটির মাথার দিকের বাঁকা টান লইয়া হ্রস্ব ও দীর্ঘ ইকারের প্রতিভূ গড়া হইয়াছিল, তাহা প্রাচীনকালের অক্ষর দাগিয়া দেখাইতে পারিতাম; কিন্তু সুবিধা হইতেছে না। 'উ' বর্ণের নিচের দিকের বাঁকা টানটুকু যে হ্রস্ব উকারের প্রতিভূ হইয়াছিল তাহা এখনও হাতের লেখায় 'গুপ্ত' হইতেই বুঝিতে পারিবেন; দীর্ঘ বুঝাইবার জন্য 'উ' অক্ষরের নিচে আর একটি বাঁকা টান অধিক দেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য স্বরবর্ণের অক্ষরগুলির প্রাচীন চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে কিরূপে সেই অক্ষরগুলির কয়েকটি টান সেই সেই অক্ষরের প্রতিভূ হইয়াছিল। 'অ' অক্ষরটির জন্মের পূর্ব্বে যে উহার প্রতিভূর সৃষ্টি হয় নাই, তাহা হয়ত বুঝাইতে পারিয়াছি। 'ও' অক্ষরের গায়ে আকার কিংবা য-ফলা যে সুগৃহীত প্রাচীন নিয়মে হইতেছে না, তাহাই বলিলাম, নূতন সৃষ্টি চলিবে কি না সে তর্ক করিতেছি না। তবে বলিতে পারি, যে, অন্য কোন স্বরবর্ণের গায়ে ফলা বানান জুড়িবার যখন প্রথা নাই এবং চলিতেছে না, তখন একটি 'ও' অক্ষরের বেলায় নিয়ম ভঙ্গ করিলে, নিয়ম সম্বন্ধে জটিলতাই বাড়িয়া যায়।

য (ই+অ), র (ঋ+অ), ল (ঌ+অ) ও উহাদের বর্গের ব (উ+অ) দুইটি করিয়া স্বরবর্ণের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পরে উহারা ব্যঞ্জনের তালিকায় পড়িয়াছে। সন্ধির সূত্র দেখিলেই অনেকে উহা বুঝিতে পারিবেন। এ কথা মনে থাকিলে 'ব' অক্ষর লইয়া বেশি তর্ক উঠিবে না; আমাদের দেশের অক্ষর দিয়া যে সংস্কৃত ভাষার 'ব' লেখা চলে না, এবং অযথা বানানে ও উচ্চারণে ভুল হয়, তাহাও স্বীকৃত হইবে। নাগরি অক্ষরকে প্রাধান্য দিবার যখন কোন কারণ নাই, এবং বাঙ্গলা অক্ষরেও যখন সংস্কৃত লিখিত হয়, তখন উ+অ উচ্চারণজাত অক্ষরটির একটি মূর্ত্তি থাকা উচিত। প্রাচীন বাঙ্গলার পেট-কাটা অক্ষরটি চালাইলে বেশি গোল হয় না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

এলাহাবাদে চিনির কারখানা।

বিদেশী চিনির উপর কর এই প্রবন্ধে প্রবাসীতে (১৫শ ভাগ ২য় খণ্ড—৫৩৯ পৃষ্ঠা) লেখা হইয়াছিল যে "এলাহাবাদে বিস্তর টাকা মূলধন লইয়া একটা চিনির কারখানা খোলা হয়। উহা উঠিয়া গিয়াছে; একদিনও চলিয়াছিল কি না জানি না।" সত্যই বিস্তর টাকা মূলধনে একটি লিমিটেড কারখানা খোলা হয়—পরে সেটি Begg Dunlop Co. কানপুর হইতে আসিয়া একবৎসর কাল ভাড়ায় চলান, পরে Limited বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়। এখন সেই কলটি, কিশোরীলাল ক্ষত্রি ক্রয় করিয়াছেন ও তিনি তাহা আজ প্রায় ২ বৎসর হইতে খুব উত্তমরূপে চালাইতেছেন, এমন কি তাঁহার খরিদ মূলধন প্রথম বৎসরের লাভ হইতে উত্তোলন করিয়া লইয়াছেন ও এখনও বিশেষ লাভে বেশ উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হইতেছে। ইহাতে অনেক লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে। তজ্জন্য সদাশয় মহাজনকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

এলাহাবাদ প্রবোধ ট্রেডিং কোম্পানি।

বঙ্গীয় শব্দকোষ

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বিজ্ঞানভূষণ এম-এ কর্তৃক সঙ্কলিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত। আমি এই অমূল্য অভিধানের আলোচনা এই মাসে শেষ করিলাম।

ষাঁড়াষাঁড়ি বান—অমাবস্যার কোটালে যে প্রবল জোয়ার আসে। ষাঁড়ের আকারে জল ফুলিয়া আসে বলিয়া?

ষড়গত, ষড়গড়—ষড়ঙ্গ আয়ত্ত বা তন্ত্রের ষড়যন্ত্রে দক্ষ; তাহা হইতে অভ্যাস হওয়া।

সপসপ—ভিজা, আর্দ্র। চুল ভিজে সপসপ করছে।

সোমত্ত—যুবা বয়সের।

সহা, সওয়া—জল সওয়া বা সহা—পাড়ার সকল বাড়ীর জল সাধিয়া আনিয়া মঙ্গল কর্ম্ম সম্পাদন।

সান—মালদহে ঘোমটা। সান কাড়া = ঘোমটা টানা।

সাঁধি—সন্ধি, সরু গলি—তেসাঁধির মধ্যে ঢোকা।

সাব্যস্ত—আরবী সাবীৎ = দৃঢ় হইতে নহে?

সেঁকেল—সেঁকেত শুনি নাই; হুগলি জেলায় সেঁকেল শুনিয়াছি।

সেয়ান্তমি—সেয়ানার ভাব।

সাবান—আরবী সাবুন হইতে আসারই বেশী সম্ভাবনা।

সংসারী—বিষয়াসক্ত। "চট্ট চটির দোকান খুলে দস্তুর মতন সংসারী।" —দ্বিজেন্দ্রলাল।

সড়ঙ্গা—দীর্ঘাকার নৌকা।

সন-সনাতি, সন-সনাৎ—বাৎসরিক খাজনা।

সরহদ্দ—আরবী, সীমা।

সরান—(সং, সরণী) পথ।

সল—আং, সহল।

সাঁকাল—ধান ভানিবার সময় ঢেঁকির গড়ে ধান নাড়িয়া দেওয়ার কাজ। সেঁকেল।

সাঁচি—ছাঁচি, যেমন সাঁচি পান, সাঁচি বেত।

সাঁজা—দধি-বীজ।

সাঁজো—সদ্য, যেমন সাঁজো কাপড় কাচা, বাসি নয়।

সামনা-সামনি—পরস্পরের সম্মুখে।

সিউনি, সিঁয়নি—সেলাই, a seam.

সিজিল—আ, শৃঙ্খলা, সেরেস্তায় Record বা Register।

সেলেখানা—আ, অস্ত্রাগার।

সুলুক—সন্ধান।

সুলুপ—সরু নৌকা, sloop. কোষে সুলুপের সঙ্গে সুলুপ আছে।

সুঁই, সুই—সূচ।

সুতা কাটা—সুতা পাকানো।

সেঁচ—জল সেচন করা।

সেঁটকা, সিঁটকা—সঙ্কুচিত হওয়া বা করা।

সেঁয়াকুল—কুলের স্থায় বন্য কণ্টকী ক্ষুপ।

সোঁতা—স্রোত, শীর্ণ জল-স্রোত, সেঁতা, সিক্ত।

সোমাজি, সুমাজি—খোড়ো ঘর বা মাদুর চেটাইয়ে দড়ির বাঁধন দিবার জন্য বাঁশের সূচ।

স্বাতী-বিন্দু—স্বাতী নক্ষত্রের সময়কার বৃষ্টিবিন্দু, প্রবাদ আছে যে স্বাতী-বিন্দু গজের মাথায় পড়িলে গজমুক্তা হয়, শুক্তিতে পড়িলে মুক্তা ফলে, মানুষের মাথায় পড়িলে মানুষ অন্ধ হয়।

সেক্রেটারী—Secretary.

সোরাই—কুঁজো; পূর্ব্বে সীসার কুঁজা সোরার ভিতরে বসাইয়া পাক দিয়া দিয়া জল ঠাণ্ডা করা হইত, তাহা হইতে নাম হইয়াছে। ফা, সুরাহি।

স্লো—Slow.

সহিস—সইস।

সাকরেদ—সাগরেদ।

সিমেণ্ট—Cement.

সামটানো—সামলানো।

সাখরচে—যে সহজে খুব খরচ করিতে পারে, খরচকারীর সাহু বা রাজা।

সাজোয়ান—শ্রেষ্ঠ জোয়ান, খুব লম্বা চওড়া পুরুষ।

সুলকনি, সুলকুনি—নখের পাশে আঙুলে উদ্ধৃত চামড়া।

সমঝানো—ভাতের মাড় গালিয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিলে আপনার ভাপে আপনি সিদ্ধ হওয়া।

সছল-বছল—অতি সচ্ছল অবস্থা।

সপাং—নমনীয় যষ্টি ইত্যাদির আঘাত-জনিত শব্দ।

সিদ্ধিরস্তু—কোন কাজের আরম্ভে সিদ্ধিরস্তু বলিতে বা লিখিতে হইত, তাহা হইতে কর্ম্মের আরম্ভ।

সেংলা—সিক্ত ইটপাথরের গায়ে উদ্গত পিচ্ছিল উদ্ভিদ।

সয়—সিওয়ার, সেওয়ার।

সরঙ্গা—ক্ষীণ দীর্ঘ (বস্তু)।

সুঁপর‍্যা—লঙ্কা মরিচ, বাঁকুড়া জেলায় বলে।

সড়াৎ—অতি দ্রুত।

সরপট—অতি দ্রুত।

সেফটিপিন—Safety pin.

সামলা—মাথার এক-প্রকার পাগড়ি।

স্কলারসিপ—Scholarship.

সিগার, সিগারেট—Cigar, Cigarette.

সারা—শেষ, কাজ সারা হইয়াছে, সারা হলেম প্রাণ আমি সারা নিশি জাগিয়ে—নিধুবাবু।

সাবাড়া (ধাতু)—শেষ করা।

সাইৎ—শুভক্ষণ।

সাউকরী—হিন্দী সাওকার হইতে?

সালগম, শালগম—ফারসী শব্দ।

সেরেফ—আ, কেবল, মাত্র।

হড়পী—কেবল মাত্র সাপ রাখার পেড়া নয়, দেরাজ প্রভৃতির খোপ যাহা টানিয়া বাহির করিতে হয় তাহাকেও হড়পী বলে—হড়হড় শব্দ করে বলিয়া?

হেটো—হাটুয়া, যে দ্রব্য হাটে ক্রীত, অপকৃষ্ট।

হাত-তোলা—দান; অপরের হাত তোলার উপর নির্ভর করিয়া থাকা মানে দয়ার বা দানের উপর নির্ভর।

হাত টান—চুরি।

হাতী-শুঁড়—জলস্তম্ভ, দেখিতে হাতীর শুঁড়ের মতন বলিয়া।

হানা—পরিত্যক্ত, ভূতগ্রস্ত; হানা বাড়ী = পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ী।

হামরাই, হামরোই—আগ্রহে অগ্রসর; কোনো কাজে হামরাই হইয়া লাগা। ফারসী—হম্ সমান, রাহী পথ যায়; সঙ্গী, সহচর।

হাল—নৌকার কর্ণ।

হেলা-গোছা—বিশৃঙ্খল, অব্যবস্থা।

হাঁসুয়া—মালদহে হাঁসুলির মতন বাঁকা বড় কাস্তে।

হিলহিল—সরু লম্বা জীবের নড়া চড়া। হিলহিলিয়া, হিলহিলে—বিশেষণ। সাপ হিলহিলো, হিলহিল করে।

হটর হটর—টিকাতে টিকাতে চলা। গরুর গাড়ী হটর হটর করিয়া চলে।
হেঁতাল ব্যথা—প্রসবান্তে প্রসূতির বেদনা—after pain.
হেপা—লেঠা। হেপা সামলানো। লোকের হেপায় পড়ে কোনো কাজ করা—প্ররোচনা।
হেলা—সাঁতার (মালদহে, হিন্দী)।
হড়গড়ানে—খাড়া ঢালু স্থান। যথা—হড়গড়ানে দীঘির পাড়, তার উপর মল্লিকার ঝাড়, মল্লিকা-ঝাড়টি ফুটল, ছেলে বুড়ো ছুটল (হেঁয়ালি)।
হড়া—গাছ পাতা সুদ্ধ মটর সুটি।
হড়াপোড়া—হড়া পুড়াইয়া আহারের ব্যবস্থা। তাহা হইতে লক্ষণায় সার ও আবর্জনা, কাজ ও অকাজ একত্র মিশানো।
হাড্ডি—হাড়।
হাড্ডিসার—অস্থিসার, অতিকৃশ।
হদ্দ্যকান—ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত; আঃ।
হাঁকরানো—জোরে নিক্ষেপ করা; যে লাঠি হাঁকরেছিল, লাগলে মাথা ফেটে যেত।
হাঁড়ল—হাঁড়ার ন্যায় বিস্তৃত মুখ ও গভীর (গর্ত্ত প্রভৃতি)।
হাতকাটা—মুলো, হাফ্ হাতার জামা।
হাতছেঁচড়া—যাহার হাতটান বা চুরির অভ্যাস আছে; অতি কৃপণ যাহার হাত হইতে কিছু বাহির হয় না।
হাতের পোঁছা—পাঁচ আঙুলের মাথা একত্র করিলে হাতের পদ্মকলির মতন যে ভাব হয় তাহার বেড়।
হাবুগেলা—হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া হাব হাব শব্দ করিয়া গেলা। বাতাস গেলা। তাহা হইতে শূন্য প্রত্যাশায় থাকা।
হায়া—লজ্জা। বিপরীত বেহায়া।
হিঁদু, হিঁদুয়ানী—অবজ্ঞা।
হেঁদু, হাঁদু—উপহাসে।
হুমকা, হুমকি—হঠাৎ মুখের সামনে মুখ আনিয়া গর্জ্জন করিয়া ভয় দেখানো।
হুমা—আঃ, কাল্পনিক পাখী; ছায়া মাথায় পড়িলে লোক রাজা হয় প্রবাদ।
হাক্, হাক্ থু—ঘৃণার অনুকার শব্দ।
হাঁটকানো—উলোট পালট করা।
হাইকোর্ট—High Court.
হেঁই হেঁই, হেঁই গো হেঁই গো—অনুগ্রহ-প্রার্থীর কাকুতি।
হেঁইয়ো—কোনও ভারী দ্রব্য তুলিবার চেষ্টা-জনিত শব্দ।
হেঁকড়—Obstinate,
হাফটোন—Halftone.
হুড়—গোলমাল, ছেলেরা হুড় করিতে ভাল বাসে।
হুড়ে—যে হুড় করিতে ভাল বাসে বা করে।
হুড়ামুড়ি—হুড়াহুড়ি।
হটর-ঠ্যাং—অসমান স্থানে রক্ষিত পদার্থের ভাব, নড়নড়ে, যাহার ঠ্যাং হটর-হটর করিয়া নড়ে।
হটকা—লম্বা সরু, হটকা যেন তাল গাছ।
হেঁটকা—Tares.
হাঁকট পাঁকট—উলোট পালট; পেটটা কেমন হাঁকট পাঁকট কচ্ছে।
হাড়ে ভেল্কী খেলা—শকুনির পাশা তাহার বাপের হাড়ে তৈয়ারী ছিল এবং সে যখন যে দান ফেলিতে চাহিত তাহাই পড়িত; বাজীকর-দের গুরু আত্মারাম সরকারের হাড় ইন্দ্রজাল রচনা করিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস; তাহা হইতে এমন চাতুর্য্য ও কৌশল যে মৃত্যুর পরও হাড় অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন করে।
হকাস—হুঙ্কারের শব্দ।
হেড্ডাব্যাড্ডা—এলোমেলো।
হুতুমথুমো—হুতুম পেঁচা; জড়ভরত।
হাঁউ মাউ খাঁউ—উপকথার রাক্ষসের মানুষকে আক্রমণের শব্দ; তাহা হইতে লুব্ধ বা ক্ষুধার্ত্তের ভাব; তারা একেবারে হাঁউ মাউ খাঁউ করে এসে পড়ল।
হাবিজাবি—হাবজা গোবজা; পশ্চিম বঙ্গে হাবজা গোবজা বলে, যশোহরে বলে হাবিজাবি।
হেঁজিপেঁজি, হেজিপেজি—সামান্য, সাধারণ; সে ত তোমাদের মতন হেঁজিপেঁজি লোক নয়।
হাতছাড়া—অধিকার-বহির্ভূত; কাজ বা লোকটা আমার হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে।
হাপুস—জলপ্লাবিত; হাপুস নয়নে কাঁদে।
হরতন—তাসের এক প্রকার রং; Hearts.
হেওড়া হেওড়ি-কাওড়া কাওড়ি—হাড়ি ও কাওড় নীচ জাতির ন্যায় কলহ বিবাদ ও বচসা।
হেরাহেরি—দৃষ্টিসীমার মধ্যগত; প্রায় শেষ; কাজটা হেরাহেরি হয়ে এসেছে।
হেঁচড়াহেঁচড়ি—টানাটানি। হেঁচড়া ধাতু টানা।
হুঁশো, হুঁশোকান্ত—ভুলো, অমনোযোগী, অসাবধান; ফারসী হুশা মানে অলস, মন্থর, অকর্ম্মা।
হাজত—আঃ, দায়, আবশ্যক; জমীদারি সেরেস্তায় এই শব্দ ব্যবহার হয়; হাজত বাকি হাজত জমা অর্থাৎ যে খাজনা প্রজা দায়ে পড়িয়া বাকি ফেলিয়াছে বা দায়ে পড়িয়া জমা দিয়াছে।
হারিস—আঃ, অর্শ রোগ বিশেষ।
হাবলা—প্রকাণ্ড গর্ত্ত।
হুরী—বেহেস্তের পরী, আঃ।
হুল্লোড়—গোলমাল, গণ্ডগোল।
হামলা—আঃ, আক্রমণ; লোকটা হামলে এসে পড়ল।
হিজলদাগা—ঠ্যাটা; শাস্তি সহ্য করিয়া করিয়া পাকা বদমায়েস। হিজল ডালের আঘাতে যে দাগী হইয়া গিয়াছে।
হাউস—আঃ, হাওআস লোভ।
হুঁকানো—ফারসী হুখ্তন; To draw out. পাখা হুঁকানো=পাখা নাড়া বা বাতাস করা।
হায়জা—আঃ, কলেরা, ওলাউঠা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদান্তের চাষ

বরোজে না ফলে' পান, ফলিলে বেদান্ত,
বারুই হইত বিজ্ঞ, কাব্যের প্রাণান্ত।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

পঞ্চশস্য

যুদ্ধে ক্ষতহীন মৃত্যু (Science Siftings)—

বন্দুকের গুলি, শেলের টুকরা, বোমা প্রভৃতি লাগিয়া যে মৃত্যু হইতেছে ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহা ছাড়া যে এক-প্রকার মৃত্যু হইতেছে তাহাও বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় সমরের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রত্যেক স্থানের যুদ্ধের পরেই একশ্রেণীর মৃত সৈন্য দেখা যাইতেছে যাদের শরীরে কোনো আঘাত-চিহ্ন পাওয়া যায় নাই, এবং যারা মৃত্যুর পরেও ঠিক জীবিতেরই মত ভঙ্গীতে এবং ভাবব্যঞ্জক মুখে অবস্থান করিতেছিল। এরূপ সৈন্যও অনেক দেখা গিয়াছে যাহাদের স্মৃতিশক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে অথচ শরীরে কোনো আঘাতেরই চিহ্ন নাই! এই প্রকারের 'ক্ষতহীন' মৃত্যু ও অন্যবিধ অক্ষমতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সম্প্রতি বিখ্যাত ফরাসী অস্ত্রচিকিৎসক (surgeon) ডাক্তার হেনরী লিওনার্দ্দে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সকলেই জানেন যে সোডা-ওয়াটারের বোতল খুলিলে জলের মধ্য হইতে বুদ্বুদ উঠিতে থাকে। উহা অঙ্গারক বাষ্পের (carbon dioxide) বুদ্বুদ। যখন বোতলের মুখ বন্ধ থাকে তখন বোতলের আভ্যন্তরীণ বাতাসের চাপে উহা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, কিন্তু বোতলের মুখ খুলিলে যেই চাপ কমিয়া যায়, অমনি উহা জলের মধ্য হইতে বুদ্বুদাকারে বাহির হইতে থাকে।

শক্তিশালী বিস্ফোরকপূর্ণ একটি গোলা ফাটিলে নিকটবর্ত্তী কোনো লোকের উপর বিস্ফুরণের ক্রিয়াও কতকটা এমনি-ধারা হয়। আমাদের রক্তে অম্লজান ও অঙ্গারক বাষ্প মিশ্রিত আছে। যখন গোলাটি ফাটে তখন তাহার অব্যবহিত চতুর্দ্দিকের বাতাস এত প্রবল বেগে বিক্ষিপ্ত হয় যে সে স্থানটি অল্প সময়ের জন্য প্রায় বায়ুশূন্য হইয়া যায়। আর বিস্ফুরণে যে-সমস্ত গ্যাস বাহির হয়, তাহাও বাতাস হইতে অনেকাংশে লঘু। সুতরাং সেই স্থানের চাপ হঠাৎ অত্যন্ত কমিয়া যায়। সেই চাপের অল্পতা-প্রযুক্ত রক্তে-মিশ্রিত গ্যাসগুলি বুদ্বুদরূপে বাহির হইয়া রক্তবাহী কৈশিক নাড়ীগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।

এই ব্যাপার বিমান-বিদ্যায়ও (aeronautics) দেখিতে পাওয়া যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে যত ঊর্দ্ধে উঠা যায় বাতাসের চাপ ততই কমিতে থাকে। এ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত কারণেই আকাশযানে খুব দ্রুত শূন্যারোহণ অনেক সময় মারাত্মক হইয়াছে।

পক্ষান্তরে গোলা ফাটিলে তাহার প্রবল ধাক্কায় অদূরবর্ত্তী বায়ুরাশি সঙ্কুচিত হওয়ায় সেখানকার চাপ খুব বাড়িয়া যায়। ইহাতে সন্নিহিত ব্যক্তির রক্তের বেগ কমিয়া যায়, ফলে উহা সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত হইতে পারে না। রক্ত ফুসফুসে আসিতে না পারায় উহাতে অম্লজানের পরিমাণ কমিয়া যায়, স্নায়ুমণ্ডলীতে ভীষণ আঘাত লাগে, এবং সেই আঘাতে মৃত্যু যদিই বা না ঘটে তথাপি অন্ধতা, বধিরতা ও অন্যান্য ক্ষতহীন অক্ষমতা ঘটিয়া থাকে।

এতখানি ব্যাপার ঘটিতে এক সেকেণ্ডেরও কম সময় লাগে, আর প্রকৃত পক্ষে চাপের পরিবর্ত্তন খুব আকস্মিক না হইলে তাহা বিপজ্জনক হয় না। যাহা হউক, এই-প্রকার আকস্মিক চাপ পরিবর্ত্তনে যখন সমস্ত শরীরের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া যায় সঙ্গে-সঙ্গে পেশীগুলির ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যায়। সেইজন্য মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হাত পা যেমন ভাবে থাকে, তাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না। ফলে মৃত ব্যক্তি জীবিতের ভঙ্গীতেই থাকে। আমাদের দেশেও বজ্রাঘাতে মৃত ব্যক্তিদিগকে ঐ ভাবে থাকিতে শোনা যায়।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সঞ্জীবনী—

শারীর-বিজ্ঞানের শৈশবে স্থির হইয়াছিল যে আমাদের খাদ্যে মোটামুটি এই তিন পদার্থ—স্নেহ বা তৈল পদার্থ, কার্ব্বো-হায়ড্রেট ও প্রোটিন—থাকিলেই শরীর-পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে জানিতে পারা গিয়াছে যে প্রোটিনের মধ্যে vitamine বা সঞ্জীবনী নামক এক-প্রকার অম্লের ন্যূনতা ঘটিলে অপর পদার্থ হাজার থাইলেও শরীরের পুষ্টি হয় না এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বেরিবেরি, বিবর্ণতা ও শরীরের সকল রন্ধ্র দিয়া রক্তস্রাব (scurvy), অস্থির বিকৃতি
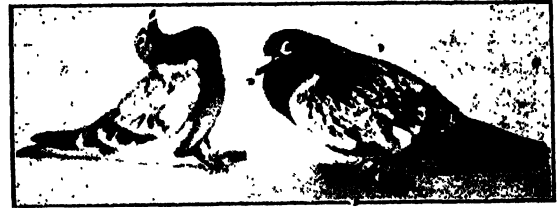
রুগ্ন পায়রা ভাইটামিন নিষেকের পূর্ব্বে ও পরে।

ও বক্রতা (Rickets) প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। যাহারা খাদ্য সম্বন্ধে অতি সাবধান হইয়া ধরকাট করে তাহাদের এই-সব রোগ হইতে দেখা যায়। সায়ান্স প্রোগ্রেস নামক কাগজে এই সম্বন্ধে নানা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ভুক্ত খাদ্যকে দেহপুষ্টির কাজে লাগাইবার জন্য জীব-শরীরে নানাবিধ জারক রসের ক্ষরণ ও উৎপচন হইতে থাকে। তাহাতে নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত দেহতন্তুগুলি নূতন হইয়া উঠে। খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন, কার্ব্বো-হায়ড্রেট এবং তৈল না থাকিলে শরীরগঠনে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। আবার প্রোটিনের মধ্যে ভাইটামিন বা সঞ্জীবনী অম্ল না

ছাঁটা চাউল খাইয়া ক্ষীণ ও আছাঁটা চাউল খাইয়া পুষ্ট একই বয়সের দুটি মুর্গি-ছানা।

থাকিলে পুষ্টি সম্পূর্ণ হয় না। বেরিবেরি রোগের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে জাপান, মালয় উপদ্বীপ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, বাংলাদেশ প্রভৃতি যেসব দেশের লোকদের প্রধান খাদ্য চাউল তাহাদের মধ্যেই এই রোগ হয়। ১৮৯৭ সালে আইকম্যান এই গূঢ় তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন যে যাহারা ছাঁটা চালের ভাত খায় তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হয় কিন্তু যাহারা আকাঁড়া চালের ভাত খায় তাহাদের এই রোগ হয় না। ছাঁটা চালের সহিত কুঁড়া মিশাইয়া ভাত রাঁধিলে তাহা বেরিবেরি রোগ প্রতিষেধ ও প্রতিকার করিতে পারে। ধানের তুসের নীচেই চালের

গায়ে যে কুঁড়া থাকে তাহা সঞ্জীবনী অন্নে পূর্ণ এবং সেই হেতু অত্যন্ত পুষ্টিকর। কুঁড়াহীন চালের ভাত খাইয়া বর্দ্ধিত জীবের মৃতদেহ কাটিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের শিরদাঁড়া স্নায়ুতন্ত্র হৃৎপিণ্ডের পেশী মস্তিষ্কের স্নায়ু প্রভৃতি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অপুষ্ট হয়। পাখীর পুষ্টির অভাব হইলে ডানা ও পা পক্ষাঘাতে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ঘাড়ের পেশীর সঙ্কুচনে মাথা পিঠের দিকে হেলিয়া যায়। পাখীর এইরূপ লক্ষণ দেখা গেলে ও কোনো চিকিৎসা না হইলে তাহারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মারা পড়ে; কিন্তু সেই অবস্থায় তাহাদিগকে চালের কুঁড়া বা তাহার তরলসার খাওয়াইলে তাহারা শীঘ্রই সুস্থ সবল হইয়া উঠে। বেরিবেরি রোগের ঔষধও এই ভাইটামিন। দুধ, ওট, গম, যব, ভুট্টা, সীম, বাঁধাকপি ও অন্যান্য কাঁচা সব্জীর মধ্যে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়। খাদ্যের উদ্দেশ্য শরীরের মধ্যেকার সঞ্চিত ভাইটামিন বৃদ্ধি করিয়া তাহার খরচের সহিত জোগান্ দিয়া চলা। এই ভাইটামিন সরবরাহে অভাব ঘটিলেই প্রথমে পেশীতে সঞ্চিত ভাণ্ডারে টান পড়ে, তারপর লিভার বা যকৃতের উপর এবং অবশেষে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বরাত পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঐ-সমস্ত রোগ খাদ্যের পরিমাণের উপর ততটা নহে খাদ্যের পুষ্টিকারিতার অভাবের উপর যতটা নির্ভর করে। অতএব বাবুআনি করিয়া ছাঁটা চাউলের ভাত না খাইয়া চাষা বনিয়া থাকাঁড়া চাউলের ভাত খাওয়াই উচিত।

নায়াগ্রা প্রপাতের উপর ঝোলা গাড়ী—

নায়াগ্রা প্রপাতের ঘূর্ণী দেখিবার সুবিধা ডাঙা হইতে হয় না; ঘূর্ণীর কাছে কোনো নৌকা বা জাহাজ যাইতে পারে না। কোনো কাজ অসম্ভব মনে করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে আমেরিকা জানে না। আমেরিকার আব-হাওয়ার এমনি গুণ যে সেখানে অলসও কর্ম্মঠ হইয়া উঠে, আনাড়িও নিপুণ হইয়া যায়। স্পেনিশ এক কোম্পানি উদ্যোগী হইয়া প্রায় দুলক্ষ টাকা খরচ করিয়া নায়াগ্রার ভীষণ প্রপাতের আবর্ত্তের উপর দিয়া এক ঝোলা গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এক পাড় হইতে অপর পাড় পর্য্যন্ত তিন জোড়া সমান্তরাল ১ ইঞ্চি মোটা তারের দড়া খাটানো হইয়াছে; এক দিককার ঠেকনো হইতে অপর দিককার ঠেকনোর মধ্যে লম্বিত ব্যবধান এখানে যতখানি পৃথিবীর আর কোনোখানে এমন লম্বা খাটালে তারের দড়ি খাটানো নাই; তথাপি সেই লম্বিত অবলম্বনহীন দড়ি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় সর্ব্বদাই টান-টান হইয়াই থাকে, একটুও নোল হইয়া পড়িতে পায় না; তারের এক মুখে একটা প্রকাণ্ড ভার ঝুলানো থাকে, চলন্ত গাড়ীর ভার যেমন-যেমন সরিয়া সরিয়া যায় বা আসে সেই ভারটাও তেমনি উঠিয়া নামিয়া সামঞ্জস্য রাখিয়া তার-গুলাকে সটান রাখে। রেলগাড়ীর রেল-লাইনের মতন দু লাইনে তিনটা-তিনটা তার থাকে, তাহাদেরই উপর দিয়া তিন জোড়া চাকা ইলেকট্রিক ট্রামের টালির চাকার মতন ঝোলা গাড়ীর মাথার উপরে গড়াইয়া চলে; সেইসব চাকা হইতে গাড়ীখানি তার দিয়া ঝুলানো থাকে; উপরের লাইনের বা গাড়ী ঝুলাইবার প্রত্যেক তার স্বতন্ত্র, কাহারো সহিত অপরের যোগ নাই, ইহাতে একটা তার ছিঁড়িয়া গেলেও অপরগুলির কোনো ক্ষতি হয় না। গাড়ী মোটরের বলে চলে, মিনিটে ৪০০ ফুট যায়, ৪½ মিনিটে গাড়ী এপার ওপার করিতে পারে; কিন্তু ঘূর্ণী দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া গাড়ী পুরা দমে না চলিয়া ঘূর্ণীর কাছাকাছি গিয়া আধা দমে চলে, এবং তাহাতে পারাপার করিতে ৬ মিনিট লাগে। গাড়ী থামাইবার জন্য দুপারে কংক্রীট গাঁথুনিতে পোক্ত করিয়া দুটা নিউম্যাটিক পাইপ বসানো আছে, বাতাস শোষার টানে গাড়ী আসিয়া নলের মুখে আটকাইয়া যায় এবং থামিবার সময় একটুও দমক বা ধাক্কা লাগায় না। গাড়ী জল হইতে ১৪৮ ফুট উঁচুতে থাকে। গাড়ীতে ২৪ জনের বসিবার ও ২৭ জনের দাঁড়াইবার স্থান হয়; একজন কণ্ডাক্টর বা চালক গাড়ী চালায়।
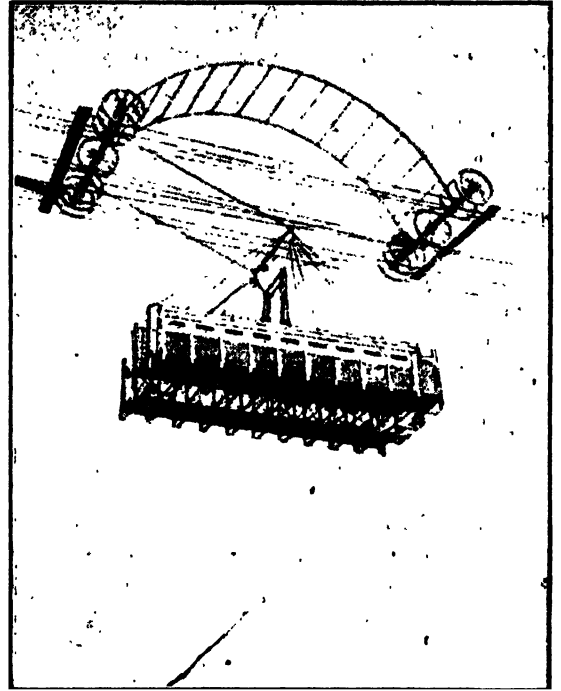
নায়াগ্রা প্রপাতের উপর ঝোলাগাড়ী।

* *
*

কামানের আওয়াজ ও ইতর জন্তু—

জার্ম্মানীর একজন পশুচিকিৎসক যুদ্ধে কামানের গুরু গর্জ্জনে কোন্ জন্তুর মনে কিরূপ ভাব হয় লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্রই বুনো শূওর ভালুক বেজি প্রভৃতি 'দেশত্যাগেন দুর্জ্জনঃ' পরিহারের নীতি অনুসরণ করে। তাহাদের পরে হরিণ 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা" স্থির করিয়া চম্পট দ্যায়। কিন্তু ভীরুতার দৃষ্টান্ত যে খরগোশ সে দিব্য বেপরোআ হইয়া বাপপিতামহের ভিটাতেই পড়িয়া থাকে। পাখীদের মধ্যেও যাহাদের আকার বড় তাহারা আগে পালায়। নেকড়ে বাঘ অত্যন্ত আওয়াজভীরু। যে-সব পাখী মিষ্ট গান করিতে পারে তাহারা কিন্তু কামানের আওয়াজে ভড়কায় না, তাহারা নিশ্চিন্ত মনে গান গাহিয়া বেড়ায়। পেঁচা, বাজ, শিকরে, কাক ভয় পায় না। কুকুর-জাতীয় জীব (কুকুর, নেকড়ে, শেয়াল, খ্যাঁকশেয়ালী) কামানের শব্দকে বড় ডরায়। শিক্ষিত পোষা কুকুর অবশ্য আওয়াজের মধ্যেও স্থির থাকে। ঘোড়াদের মধ্যেও যেগুলা যত আনকোরা সেগুলা ভড়কায় তত বেশী। জার্ম্মানদের ঘোড়া নানা শ্রেণীর ও নানা দেশের ঘোড়ার বাচ্চা হইলেও শীঘ্রই কামানের গুরুগর্জ্জন সহ্য করিতে শিখে, কিন্তু রুশিয়ার ঘোড়ার সহজে অভ্যাস হয় না।

* *
*

মুলোর জন্য চুম্বকের হাত—

যুদ্ধে যাহাদের হাত কাটা পড়িতেছে তাঁহাদের জন্য জার্মানরা এক-রকম লোহার হাত তৈরি করিতেছে তাহাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাইয়া উহাতে চুম্বকের গুণ দেওয়া যায়। এই কৃত্রিম হাতটি কাটা হাতের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে ইহার দ্বারা লোহার হাতিয়ার খুব আঁটিয়া ধরিয়া সকল রকম কাজ বেশ স্বচ্ছন্দে করা যায়। যে-সব হাতিয়ার লোহাতে তৈরি নয় তাহাদের গায়ে একএকটা লোহার পাত লাগাইয়া
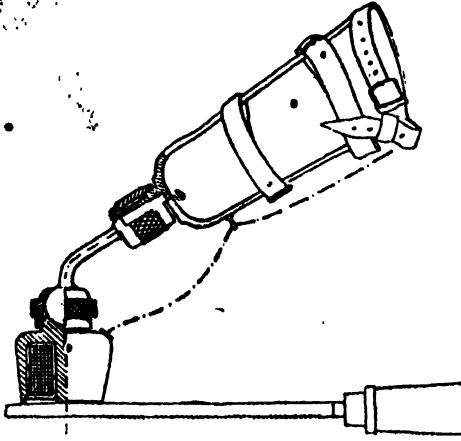
চৌম্বক হাতে উখা ধরা।

লইলেই এই হাতে ধরা চলে; বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলেই চুম্বক-শক্তি লোপ পায় এবং লোহার অস্ত্র হাত হইতে খসিয়া পড়ে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের সুইচ-চাবি অনায়াসে শরীরের অপর অঙ্গ—পা, চিবুক, বা অপর হাত দিয়া ঘুরাইয়া লোহার হাতে ইচ্ছামত যখন-তখন চুম্বক-শক্তি দেওয়া বা বন্ধ করা চলে। এইরূপ উপায়ে ছুতার কামার প্রভৃতির ব্যবসায় স্বচ্ছন্দেই চালানো যাইতে পারিবে।

* *
*

কৃত্রিম রক্ত।—

অধিক রক্তস্রাব হইলে জীব মরিয়া যায়। কেন? রক্তের মধ্যেকার লাল-কণিকার অপচয়ে বা রাসায়নিক সামগ্রীর ক্ষয়ে নহে, রক্তের পরিমাণের অল্পতাই মৃত্যুর কারণ। রক্তের চাপ কোনো রকমে বাড়াইয়া তুলিতে পারিলেই রক্তস্রাবের পরও জীবন রক্ষা করিতে পারা যায়। ইহার জন্য সুস্থ শরীর হইতে তাজা রক্ত বা নানাবিধ লবণ-দ্রাবক ধমনীতে সঞ্চালিত করার ব্যবস্থা আছে। তাজা রক্ত দেওয়াতে যে রক্ত দেয় তাহার আবার বিপদ হইতে পারে এই ভয়ে ডাক্তারেরা লবণ-দ্রাবকই বেশী ব্যবহার করেন। কিন্তু লবণ-দ্রাবক অধিকক্ষণ রক্তস্থালীতে থাকে না, দ্রাবকের জল শীঘ্রই শিরা দিয়া মূত্রাশয়ে চলিয়া যায় অথবা তন্তুজালে শোষিত হইয়া যায়। আমেরিকার ডাক্তার জেম্‌স্ হোগান জেলাটিন-সলুশান দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সন্তোষজনক ফল পাইয়াছেন; জেলাটিন-সল্যুশান ধমনীতে নিষিক্ত হইলে তাহার জলাংশ শরীরে শোষিত হইয়া যায় না; যতক্ষণ না শরীর আবার নূতন রক্ত তৈরি করিয়া তুলিতে পারে ততক্ষণ তাহা ধমনীতে থাকে এবং নূতন রক্ত যে-পরিমাণে তৈরি হয় সেই-পরিমাণে জেলাটিন লুপ্ত হইয়া আসে। এই সল্যুশান বা দ্রাবকে বিশুদ্ধ জেলাটিন, সোডিয়াম ক্লোরাইড ও পরিস্রুত জল থাকে। এই মিশ্রণ শিশিতে রাখিলে জমিয়া যায়; গরম করিলেই গলে। ডাক্তার হোগান নিমন্ত্রিত হইয়া জার্মানীতে ও ইংলণ্ডে গিয়া সেখানকার যুদ্ধ-হাসপাতালের ডাক্তারদের এই চিকিৎসা শিখাইতেছেন। ইহার জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক লইবেন না।

বন্দুকের গুলির আওয়াজ—

আধুনিক ধরণের জোরালো বন্দুক বা কামান আওয়াজ করিলে পর পর দুবার শব্দ শোনা যায়। চাঁদমারি করার সময় এইরূপ ডবল শব্দ শুনিয়া আগে লোকে মনে করিত যে প্রথম শব্দ বন্দুকের নল ছাড়িয়া গুলি ছোটার ও দ্বিতীয়টি চাঁদমারির গায়ে গুলি লাগার শব্দ। এ অনুমান ঠিক নয়। প্রথম শব্দটা নল হইতে গুলি বাহির হওয়ার বটে; দ্বিতীয়টি গুলিতে বাতাস হটাইয়া চলার শব্দ। গুলি যখন রওনা হয় তখন তাহার গতির বেগ শব্দের গতির বেগ অপেক্ষা বেশী থাকে; ক্রমে গুলির বেগ কমিয়া আসে, তখন শব্দের গতির হ্রাস না হওয়াতে গুলির আগে শব্দ চলিয়া যায় এবং লোকের কানে আগে শব্দ পৌঁছে, গায়ে গুলি লাগে পরে। যদি শ্রোতা ৩০০ ফুটের মধ্যে থাকে তবে দুই শব্দ মিশিয়া একটা শোনায়; ৩০০ ফুটের যত বেশী দূরে দূরে থাকে তত পর পর শব্দ দুটি শোনা যায়; দেড় মাইল দূরে একটা কামানের আওয়াজই খানিকক্ষণ ধরিয়া ক্রমান্বয়ে হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কামানের গোলা যদি শেল হয় তবে শেল যখনই মাটিতে পড়িয়া ফাটে তখন আবার এক পালা শব্দের ঢেউ চলে।

* *
*

যমজ—

যমজ সন্তান প্রায় একই রকম দেখিতে হয়; যমজ না হইলেও অনেক সোদরের মধ্যে আশ্চর্য্য সমতা দেখা যায়। যমজ সন্তান আবার দ্বিবিধ—যাহারা হুবহু এক, আর যাহারা সোদর-সদৃশ। যে দুই যমজ পৃথক পৃথক ডিম্বকোষ হইতে জন্ম লাভ করে তাহারা সোদর-সদৃশ হয় মাত্র; কিন্তু একটি ডিম্বকোষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যে যমজ উৎপন্ন করে তাহারা জরাসন্ধের ন্যায় একই ব্যক্তির দুই খণ্ড বলিয়া তাহাদিগকে দেখিতে হুবহু একই রকম লাগে। প্রথম প্রকারের যমজের চেহারায় সাদৃশ্য না থাকিতেও পারে এবং লিঙ্গ-বিভেদও ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়-প্রকারের যমজ সর্ব্বদা একই লিঙ্গের ও হুবহু একরকম আকৃতির হয়, অতি পরিচয় ব্যতীত উহাদের দুজনের কোন্‌জন কোন্‌টি ঠিক করিয়া চেনা দুষ্কর হয়। এইরূপ যমজ সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস একজন হাসিলে অপরজন হাসে, অপর জন কাঁদিলে ইহাকেও কাঁদিতে হয়; একের রোগ হইলে অপরও অসুস্থ হয়; ও মরিলে এও মরে। যমজ সন্তান হওয়া পরিবারগত বিশেষত্ব কি না এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ফল আমেরিকার দি জার্ণাল অফ হেরেডিটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সংখ্যা-তালিকা সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে যে যমজ জন্ম এক-এক পরিবারের ধারা মাত্র। এবং এক পরিবারের যমজ জন্মাইবার প্রবণতা মাতৃশাখাক্রমে কন্যা-পরম্পরায় চলিতে থাকে।

নিউমোনিয়া জীবনী-শক্তির চরম পরীক্ষা—

নিউ-ইয়র্কের 'মেডিক্যাল টাইম্‌স্‌ পত্রে একজন লিখিয়াছেন যে নিউমোনিয়ার আক্রমণ এড়াইয়া সারিয়া উঠিতে পারে যে তাহার আর কিছুতে শীঘ্র মার নাই; তাহার দেহ যে খুব টন্‌কো এবং স্বাস্থ্য অটুট তাহা প্রমাণ হইয়া যায়। এরূপ লোকের জীবন বীমা করিতে কোনো কোম্পানির ইতস্তত করা উচিত নয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের দাঁত বাঁধানো—

ব্রিটিশ জার্ণাল অফ্ ডেণ্টাল সায়ান্স নামক পত্রে প্রকাশ যে ডাক্তার মার্শাল সেভিল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া কতকগুলি মানুষের মাথার খুলি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাদের দাঁত বাঁধানো ছিল। মায়াযুগের লোকদের দাঁতে ছেঁদা করিয়া সোনা বা উজ্জ্বল মণি বসানো হইত; দাঁতের এনামেল কাটিয়া সোনা ও মণি বসাইতে সেই অতি প্রাচীন কালের লোকেরা আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানে দক্ষ ডাক্তারের ন্যায়ই নিপুণতা দেখাইয়াছে, এনামেল কাটিতে একটুও চটা উঠে নাই এবং ছিদ্রটির মধ্যে সোনা বা মণির খিল থাপে থাপে আঁট করিয়া বসানো হইয়াছে। একটা করোটির দাঁতের পাটিতে পাশাপাশি দুটি এমন দাঁত বসানো আছে যাহা সেখানকার দাঁত নয়, তাহা নিশ্চয় অপরের মুখের দাঁত ইহার মুখে ভাঙা দাঁতের স্থানে বসানো হইয়াছিল এবং বসিয়াছিল বেশ আঁট হইয়াই। কালো পাথর কাটিয়া তৈরি একটা কৃত্রিম দাঁতও একটা মাথায় পাওয়া গিয়াছে। একটি স্ত্রীলোকের মাথায় সামনের দাঁতগুলি সোনার পাতে মোড়া—যেমন মাড়োয়ারী স্ত্রীলোকদের দেখা যায়। দাঁতের গায়ে সোনার পাত আঁটিবার জন্য দাঁতের মাড়ির নীচে ও ধারে ধারে দাঁতের মসৃণ এনামেল ঘসিয়া ক্ষয় করা হইয়াছিল এবং একপ্রকার সিমেণ্ট দিয়া সোনার পাত দাঁতের গায়ে জোড়া হইয়াছিল। ডাক্তার সেভিল বলেন, যে, সেই অতি পুরাকালে ইকুয়েডর প্রদেশে ধাতুনির্ম্মিত ছেদনযন্ত্রের প্রচলন হয় নাই; প্রস্তর-সূচি বালুকা ও জল দিয়া ঘসিয়া দাঁতে ছিদ্র করিতে অসহ্য যন্ত্রণা হইবার কথা; কিন্তু সেই আদিম যুগের লোকেরা কোকা পাতা যে বেদনা-বোধের শক্তি অপহরণ করিতে পারে জানিতে পারিয়া থাকিবে; তাহারা কোকা গাছের পাতা চিবাইয়া দাঁত বেঁধার কষ্ট অনুভব করিত না। তাহারা চুন দিয়া কোকা পাতা চিবাইত তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

অনেকে মনে করেন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সভ্যতা ভারতবর্ষের বা মিশরের দান।

আমেরিকার ভাস্কর্য্যে প্রাচ্য ভাব—

আমেরিকায় সম্প্রতি বহু শ্রেষ্ঠ ভাস্কর আবির্ভূত হইয়া জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইহাদের সকলেই কিন্তু ভিন্ন দেশ হইতে আগত উপনিবেশী। ইহাদের মধ্যে পল ম্যানশিপ (Paul Manship) তাঁহার মূর্ত্তিশিল্পে প্রাচ্য ভাব ও প্রাচ্যসুলভ কারুকার্য্য সংযোজনার জন্য বিশেষ করিয়া লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ইনি এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে প্রাচ্য দেশের ভাবময়তা, ও যেটুকু-নহিলে-নয় রীতির বদলে কারুকার্য্যের বাহুল্য তাঁহার রচনায় যোগ করিতেছেন। তিনি প্রাচীন গ্রীস আসিরিয়া মিশর ও ভারতবর্ষের শিল্পকলার মধ্যে একটি অন্তরগত সমতার ধারা আবিষ্কার করিয়া সকল শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্বটুকু নিজের

সূর্য্য-ঘড়ী।
(পল ম্যানশিপ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত)

ঘুঘু-ঘু।
(পল ম্যানশিপ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত)

রচনায় আহরণ করিয়া দিতে পারেন। তিনি প্রাচ্য রীতিতে দৈহিক সৌষ্ঠবের সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়াও ভাব প্রকাশকেই প্রধান করিয়াছেন। অথচ তিনি সৌন্দর্য্যকেও নষ্ট হইতে দেন না। তাঁহার মতে in art

beauty is all—শিল্পে সৌন্দর্য্যসাধনই প্রধান। তাঁহার রচিত একটি সূর্য্য-ঘড়ী কেবল কাজ-চালানো গোচের শঙ্কু মাত্র নয়, উহার সঙ্গে বিচিত্র কারু-শিল্প যোগ করা হইয়াছে;—শঙ্কুর আধার-পীঠটিতে বিচিত্র লতাপাতার পেঁচের পাকে পাকে দ্বাদশ রাশিচক্রের সমাবেশ একেবারে ভারতবর্ষের ছাঁচে হইয়াছে; শঙ্কুর পশ্চাতে সময়ের দেবতার মূর্ত্তি গ্রীকধরণের হইলেও তাঁহার হাতের ফুলটি ভারতীয় কমলপাণি দেবতারই অনুকরণে; সময়-দেবতার কিরীট-ছটায় মুহূর্ত্তগুলি হাত ধরাধরি রাসমণ্ডলে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের পরিচ্ছদ ও চলন-ভঙ্গি সম্পূর্ণ ভারতীয়; এই ছটা-চক্র ও বেদীভূমি সমেত সমস্ত মূর্ত্তিটি নেপালী তারা বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির মূর্ত্তিশিল্পের অনেকটা অনুরূপ। একজন সমালোচক তাঁহার রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—What he does there he does, as a rule, superlatively well—তিনি যা করেন তাহা চরম সুন্দর করিয়াই করেন। তিনি নিজের শিশু কন্যার মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার

খুকী।
(পল ম্যান শিপ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত)

চারিদিকে যে একটি ফ্রেম বসাইয়াছেন তাহার খুঁটিনাটি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সোনারূপার গহনার উপর হইবার যোগ্য; এরূপ কারুকার্য্য ইটালির সেকরারা পুরাকালে করিত; এবং শিশুমূর্ত্তিটিতে দোনাতেলো ও মাইকেল এঞ্জেলোর ধরণ আছে; এখানে ম্যানশিপ ইটালির ভাবে ভাবিত শিষ্য। তাঁহার মূর্ত্তিগঠনের মধ্যে একটা সজীবতা ও তেজ আছে—তাহা বাস্তবের অনুরূপ অথচ অবাস্তব আতিশয্যে বিশেষ কোনো ভাবের প্রকাশক।—এখানে তিনি প্রাচ্য শিল্পরীতিতে অনুপ্রাণিত; এইজন্য তাঁহাকে সকল দেশের শিল্প-হাটের পসারী বলা হইতেছে।

জাপানের মূর্ত্তিশিল্প—

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে মূর্ত্তিপূজার সঙ্গে-সঙ্গে মূর্ত্তিগঠনের শিল্প উদ্ভূত হইয়াছিল। প্রাচীন জাপানে বুদ্ধমূর্ত্তি বা দেশের কোনো বীর বা অবতারের মূর্ত্তি কাঠে তৈরি হইত এবং সেগুলিকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হইত। জাপানের মেইজি যুগের পরে ব্রঞ্জের মূর্ত্তি গঠন আরম্ভ হইয়াছে এবং এখন মূর্ত্তিপূজা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বপ্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি চীন হইতে ৫২২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে আনীত হয়। চীনের ফেরত পর্য্যটক বা প্রচারকেরা ভারতের সাধু মহাত্মাদের মূর্ত্তি জাপানে আনিয়া পূজা প্রবর্ত্তন করিতেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধমূর্ত্তি চীন হইতে জাপানে আনেন তাঁহার নাম তাংসুনতা; তিনি ও তাঁহার পৌত্র তোরি বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণে দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

জাপানের মূর্ত্তিশিল্প অধুনা জাপানের পদানত পরাধীন কোরিয়ার শিল্পরীতির প্রভাবে উন্নত হইয়া উঠে। কোরিয়ার প্রভাব লাগিবার পূর্ব্বে জাপানের মূর্ত্তিশিল্প অস্বাভাবিক ও আমাঠা ছিল; ভাব আড়ষ্ট হইত বলিয়া বস্তুর সহিত মিল থাকিত না, কাপড়ে ভাঁজ দেওয়া হইত না, মাথার চুল সর্ব্বদাই অস্বাভাবিক রকমে কোঁকড়া করা হইত, এবং মানুষের মুখের ভাব শিশুর ন্যায় ব্যঞ্জনা-হীন হইত। খোদাই ও নক্সা কেবল এক রকম বাটালিতে যতদূর হইবার তাহাই করা হইত। এই সময়কার মূর্ত্তিশিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন য়ামাতো নামক স্থানের হেরিয়ুজি মন্দিরে তোরির হাতের তৈরি যে বুদ্ধমূর্ত্তি আছে তাহাই।

ইহার পরবর্ত্তী কালে চীনের সঙ্গে যখন খুব ঘনিষ্ঠ যোগ হয় তখন জাপানী শিল্পীরা চীনে গিয়া মূর্ত্তিগঠনের ভাব-পরিকল্পনায় ও কারুক্রিয়ায় নিপুণতা অর্জ্জন করিয়া আসিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে বহু চীনা বুদ্ধমূর্ত্তিও নমুনাস্বরূপ জাপানে আমদানি হয়। এইরূপে কোরিয়া ও চীনের শিল্প-রীতির প্রভাবে জাপানের মূর্ত্তিশিল্প লাভবান হইয়া উঠে।

ইহার পর ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি গঠন আরম্ভ হয়। কিন্তু তখনও আগে দারুমূর্ত্তি গড়িয়া তাহার উপর কাদা চাপড়াইয়া ছাঁচ তৈরি করিয়া লইত।

ইহার পর জাপানী নারা যুগে মূর্ত্তিনির্ম্মাণে যথেষ্ট কলানৈপুণ্য প্রকাশ পায় এবং জাপান নিজের স্বতন্ত্র শিল্প-সত্তার চেতনা উপলব্ধি করিতে পারে। এই যুগের প্রধান নমুনা য়ামাতোর য়াকুশি মন্দিরে কোয়ানান দেবীর মূর্ত্তি! এই মূর্ত্তি ব্রঞ্জে ঢালাই, ৭ ফুট উচ্চ, মুখভাব সম্পূর্ণ জাপানী ও পদ্মাসনও চীনা আদর্শের নহে। ঐ মন্দিরে আর-একটি মূর্ত্তিতে ভারতের ও গ্রীসের ধরণ সুস্পষ্ট; জাপানের নারা যুগে ভারত ও গ্রীসের প্রভাব জাপানী শিল্পে পড়িয়াছিল। মূর্ত্তির নাকের উপর খাড়া ললাট য়ুরোপের প্রভাব প্রকাশ করে, এই প্রভাব অবশ্য ভারতের ভিতর দিয়া জাপানে পৌঁছিয়াছিল।

নারা যুগে বৌদ্ধ ধর্ম্মের চরম বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে মূর্ত্তিশিল্পেরও বিবিধ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গের প্রতিমা-নির্ম্মাণের প্রণালী জাপানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, একখানা কাঠের পাটার উপর কাঠামো করিয়া খড় জড়াইয়া আগে মূর্ত্তির আদরা করা হইত, তারপর তাহার গায়ে এক-মেটেমো করিয়া খিচশূন্য মিহি মাটির প্রলেপ দিয়া দো-মেটে করিত। কখনো বা খড়ের উপর যে কাদা লেপিত তাহার সঙ্গে অভ্রের গুঁড়া মিশাইয়া লইত এবং সেই লেপ শুকাইলে তাহার উপর গালা গলাইয়া লেপিত; তাহার উপর কাপড় আঁটিয়া অবশেষে খিচশূন্য মিহি মাটির পালিশ করিত। নারা নামক স্থানের তোদাইজি মন্দিরে ব্রঞ্জের-মূর্ত্তি এই শেষোক্ত রকমে প্রস্তুত। আর একরকম প্রণালী ছিল এইরূপ—একটা কাঠের সাদামাঠা মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার গায়ে মাটি লেপিয়া শুকাইলে তাহার উপর কাপড় আঁটিয়া তাহার গায়ে গালার রং করিত।

ক্রোধ।
(জাপানী শিল্পী উন্‌কেই কর্ত্তৃক পরিকল্পিত)

এরূপে মোটাসোটা ধরণের মূর্ত্তি হইত, কারুক্রিয়ার সূক্ষ্ম নিপুণতা ইহাতে প্রকাশ পাইত না। বাংলা দেশে এখন পর্যন্ত প্রায় এইরূপ প্রণালীতে কাঠের পুতুল—মানুষ ঘোড়া ইত্যাদি—গড়া হইয়া থাকে।

নারা যুগে মূর্ত্তিশিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন নারা নামক স্থানের তোদাইজি মন্দিরের বুদ্ধমূর্ত্তি। উহাতে সেই যুগের শিল্পীদের ভাবসূক্ষ্মতা ও গঠনপারিপাট্য চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে।

নারা যুগের পরে হেইআন যুগে পূর্ব্বশিল্পীদের রচনার মহিমান্বিত তেজস্বী ভাব উপেক্ষিত হইয়া সূক্ষ্ম মৃদু মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য যোজনার দিকেই বেশী নজর পড়ে। সেই যুগের বিলাসিতা বৃদ্ধির ফলে মানুষ বেশ নাদুস-নুদুস হইয়া উঠে এবং তাহার ছায়া মূর্ত্তি-গঠনেও গিয়া পড়িয়া মূর্ত্তিগুলিকে গোলগাল করিয়া তুলে এবং তাহাদের পরিচ্ছদেও কোমল রমণীয়তা ও মেয়েলি ভাব সংক্রামিত হইয়া পড়ে। তখনকার শিল্পের প্রধান ভাব ছিল কমনীয়তা ও সহজ অবলীলা। এই শিল্প-যুগের প্রধান নিদর্শন আছে হোকাইজি মন্দিরে আমিদার মূর্ত্তিতে।

বজ্রমল্ল।
জাপানী কাঠের মূর্ত্তিতে ভয় ও বিস্ময়ের ভাব।
(শিল্পী উন্‌কেই কর্ত্তৃক পরিকল্পিত)

পরবর্ত্তী কামাকুরা যুগে যখন যোদ্ধৃভাব প্রবল হইয়া উঠিল তখন মূর্ত্তিশিল্প অবহেলায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। তথাপি অনেক চমৎকার বুদ্ধমূর্ত্তি এই যুগেই গঠিত হইয়াছিল। এবং হেইআন যুগের কমনীয়তা ঘুচিয়া মূর্ত্তিগুলি পুনরায় মহিমায় ও তেজে মণ্ডিত হইয়া উঠে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ ও জাপানী মূর্ত্তিশিল্পের শেষ ওস্তাদ বলিয়া আবহমান কাল

স্মরণীয় বিখ্যাত শিল্পী উঙ্কেই ১১৮৫-১১৮৯ সালের মধ্যে কোনো সময়ে জন্মলাভ করেন। কামাকুরা যুগের পর জাপানের মূর্তিশিল্প ক্রমশ লোপ পাইয়া গেল।

কামাকুরা যুগে জাপানী মূর্তিশিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। সেই চরমতা লাভের প্রধান ও শেষ সাধক বলিয়া উঙ্কেই আজিও সর্ব্ব-সমাদৃত। উঙ্কেই-গঠিত মূর্তিগুলির বিশেষত্ব এই যে সেগুলি স্বভাবানুগত, তাহাদের শরীরের সংস্থান শারীরতত্ত্বের অনুমত। তাঁহার বাটালি খুব তীক্ষ্ণ ধারে গভীর করিয়া কাটিয়া বিচিত্র রেখা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে জানিত, এবং তাঁহার তুলিও রং চাপাইতে চমৎকার। তাঁহার মূর্তিগুলির গতিভঙ্গি ও ভাবদ্যোতনা পরিকল্পনায় ও গড়িয়া ফুটাইয়া তোলায় তিনি অদ্বিতীয়। তেইচো নামক একজন কারিগর টুকরা টুকরা কাঠ জুড়িয়া প্রকাণ্ড মূর্তি-গঠনের রীতি প্রবর্ত্তিত করেন; উঙ্কেই এই রীতিকে শিল্পচাতুর্য্যে পরিণত করিয়া তোলেন, সমগ্র মিলিয়া যে আকার ও যে ভাবটি প্রকাশ করিবে তাহা ছোট ছোট খণ্ডে কতটুকু ধারণ করিবে তাহা আন্দাজ করিয়া সেই অনুযায়ী গঠন দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। এইরূপ বহু খণ্ড জুড়িয়া তিনি ধাতুমূর্তিও গড়িতে ওস্তাদ ছিলেন, তিনি বহু খণ্ড কাঠ খুদিয়া বিভিন্ন ছাত্রদের উহা হইতে ছাঁচ গড়িয়া ঢালাই করিতে দিতেন; সেই-সব বহু ছাত্রের হাতের ঢালাই-করা বিভিন্ন অংশ একত্র সন্নিবেশে অপরূপ ভাব বীর্য্য-সমন্বিত স্বভাবানুগত মূর্তিতে পরিণত হইত। ইঁহার গঠিত সকল মূর্তিতেই তেজ বীর্য্য বলিষ্ঠতা সুপ্রকাশ অথচ তাহা স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া দেহসংস্থানে অস্বাভাবিকতা আরোপ করিয়া নহে। উঙ্কেই ইচ্ছা করিলে কোমল ভাবও মূর্তির অবয়বে ফুটাইতে পারিতেন এবং তাহার নিদর্শনও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

চারু।

তাপিতা

স্বামীর চরণে মাথা রাখি' সজল নিলাজ দুটি আঁখি
সরলা বালিকা-বধূ কহে—
"আমারে চরণে ঠেলে, তুমি মদিরা-পেয়ালা রহ চুমি'
আমি কি রূপসী তত নহে?
কি রূপ তাহারি প্রিয়তম! কি খোঁপা বেঁধেছে অনুপম?
—কপালে পরেছে কটা টিপ্?
নয়নে আছে কি তারো বারি? আমারে কাঁদায়ে নেছে কাড়ি'
এ নারী-জীবনে ধ্রুব দীপ!
হে মম জীবিত সুখনিধি! তোমারি চরণ-গতিবিধি
আমারি ললাটে বিধি আঁকে,
তুমি যে আমারি প্রিয়তম! মদিরা করেছে মহাভ্রম!
মিছে সে আঁচলে বেঁধে রাখে।
কেন সে তোমাকে ভালবাসে? আমাকে কাঁদায়ে যেবা হাসে
—তুমি কি বেসেছ তা'রে ভালো?
তা'হলে, তা'হলে প্রাণ-প্রিয় আমারে মদিরা ক'রে নিও,
তোমারি অধরে মোরে ঢালো।
জীবনে এটুকু চাহি আমি হে মম পরাণপ্রিয় স্বামী,
তুমি তো আমারি,—কারো নহে।"
স্বামীর চরণে মাথা রাখি' নিলাজ সজল দুটি আঁখি
সরলা বালিকা বধূ কহে।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

অতিকায় ফল।

একটা ফুল, একটা কুমড়া, এক ঝাড় আককে বাড়াইয়া তোলাতে চাষীর নিপুণতা প্রকাশ পায় সত্য, ইহা তাহার অধ্যবসায়েরও নিদর্শন। কিন্তু দেশের ধন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইলে মিতব্যয়িতার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অপরিমিত খরচ করিয়া সুবৃহৎ ফল ফুল উৎপাদন দ্বারা লোকের বিস্ময়োৎপাদন করাকেও অমিতব্যয়িতা বলা যায়।

যে গাছে ২০টা বেগুন ফলিতে পারে তাহাতে ২টি মাত্র মুকুল রাখিয়া বাকিগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলে দুইটি বড় বেগুন উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই দুইটা বেগুনের ওজন ২০টা বেগুনের ওজন অপেক্ষা নিশ্চয় কম। সুতরাং ২০টার স্থলে বহু আয়াসে ২টা বেগুন ফলাইয়া কি লাভ হইবে? লাভ যে একবারে নাই তাহা নহে। আর্থিক হিসাবে বর্ত্তমানে কোন লাভের আশা না থাকিলেও, বীজ সঞ্চয়ের জন্য বড় ফল উৎপাদন করায় ভবিষ্যতে লাভ আছে। ক্ষেতের মধ্যে তেজস্কর গাছটি বাছিয়া লইয়া তাহার মূল শাখাতে ২।৩টা ফল উৎপাদন করিলে ফলগুলি স্বভাবতই বড় হইবে। ফল বড় করিতে হইলে পটাস-প্রধান সার প্রয়োগ করিয়া গাছটিকে বিশেষ তদ্বিরে রাখিতে হয়। এবম্প্রকার গাছের সুপক্ক ফল হইতে বীজ সংগ্রহ করিলে তাহা হইতে যে চারা হইবে তাহার ফল সাধারণতঃ বড় হইবে। এইরূপে কোন একজাতীয় ফলের উন্নতি বিধান করা সম্ভব। অতএব এস্থলে খরচের আতিশয্যে কুণ্ঠিত না হইয়া বীজের জন্য বৃহৎ ফলই উৎপাদন করাই কর্ত্তব্য।

কোন ক্ষেতে উচ্চ মাচায়, ভাল সারমাটি সংযোগ করিয়া, কয়েকটা কুমড়া গাছ জন্মান গেল। গাছটিতে ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলে মূল ডগায় ফলোৎপাদনকারী একটা ফুল রাখিয়া বাকি মুকুলগুলি, এমন কি কতকগুলি প্রশাখা ও কতকগুলি পাতা, ছিঁড়িয়া দেওয়া গেল। ফলটা যখন মানুষের হাতের মুঠার মত বড় হইল, তখন কুমড়ার লতার দুইপাশে দুইটা মাটির টবে চিনির জল রাখিয়া নরম সূতার পলিতা পাকাইয়া একমুখ চিনির জলে পূর্ণ পাত্রে স্থাপন করিতে হয়, অন্য মুখ কুমড়ার বোঁটার উপর ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। এই উপায়ে কুমড়া পলিতার দ্বারা ক্রমশঃ জল টানিয়া লইবে ও বড় হইতে থাকিবে এবং এক সপ্তাহ মধ্যে উহা অতিকায় হইয়া উঠিবে।

চিনির রস সহজেই করিয়া লওয়া যায়। গরম জলে ক্রমশঃ চিনি মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ ঘন রস প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। জল আগুনের তাপ হইতে নামাইয়া তবে তাহাতে চিনি সংযোগ করিতে হয়। জ্বালে চিনির রস চাপান থাকিলে রস চিট হইয়া যাইবে। চিট রস সূতার পলিতা বহিয়া লতার শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যেরূপ রস এখানে ব্যবহার-যোগ্য তাহাকে চিনির রস না বলিয়া চিনির জল বলাই ভাল। শীতল অপেক্ষা গরম জলে চিনি শীঘ্র দ্রব হয়। চিনির জলে সর্ব্বদাই গামলা পূর্ণ রাখা কর্ত্তব্য। এ-প্রকারে লাউ কুমড়া তরমুজ শসা অতি বড় করা যায়। বীজের জন্য ফল বড় করিতে হইলে কৃত্রিম অপেক্ষা স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করাই ভাল।

(কৃষক, জ্যৈষ্ঠ)।

* * *

জাতক ও অবদান।

মানুষ যখন বুদ্ধ হন, যখন তাঁহার দিব্যজ্ঞান হয়, তখন তাঁহার অনেকগুলি অলৌকিক শক্তির উদয় হয়। তাহার মধ্যে পূর্ব্বনিবাসের অনুস্মৃতি একটি। তিনি তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে, সৃষ্টির প্রথম

হইতে তিনি কতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং সেই-সকল কর্ম্ম দ্বারা তিনি বুদ্ধ হইবার পথে কখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া অনেক উপদেশ দিয়াছেন; সেই-সকল উপদেশ লোকে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্য অনেক সময়ে তিনি আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা দিয়া সেগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। এই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা, ইহার নাম জাতক।

জাতকের প্রাদুর্ভাব হীনযানে, পালিভাষায়, অত্যন্ত অধিক। পালিভাষার গ্রন্থে ৫৫৫টি জাতক আছে; অর্থাৎ বুদ্ধদেব আপনার ৫৫৫টি পূর্ব্বজন্মের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতে একখানি জাতকমালা আছে। সেখানি আর্য্য-শূরের প্রণীত; ইহাতে ৩৪টি মাত্র জাতক আছে। এই সংস্কৃত পুস্তক হীনযানের কি মহাযানের বলিতে পারা যায় না। কেননা, হীনযানের লোকেও সংস্কৃতে লিখিত। বসুবন্ধু যখন হীনযান ছিলেন, তখন তিনি অভিধর্ম্ম কোষ নামে একখানি পুস্তক লিখেন, সেখানি সংস্কৃতে। রায় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব এই পালি জাতকগুলি বাঙ্গলা করিতেছেন। বুদ্ধদেব কোন্ সময়ে, কোন্ শিষ্যের কথায়, কি উদ্দেশ্যে, এক একটি জাতক বলিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর তিনি সেই জাতকটির বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিতেছেন।

বুদ্ধদেব যখন নিজে এই গল্পগুলি বলিতেছেন, তখন মনে করিতে হইবে, এই গল্পগুলি তাঁহার পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। তিনি গল্পগুলি আপনার পূর্ব্বজন্মের গল্প বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এগুলি ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন সম্পত্তি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা হইতে খৃঃ পূঃ ছয় শতকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, মনের ভাব, ধর্ম্মের ভাব, জানিতে পারা যায়।

মহাযানের লোকের কিন্তু জাতকের উপর তত আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এক জাতকমালা ছাড়িয়া দিলে, উঁহাদের আর জাতকের বই নাই। এই জাতকমালা আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, তখন উহার নাম হয় বোধিসত্ত্বাবদানমালা। মহাযানীরা আর্য্যশূরের জাতকমালাকে বুদ্ধের বচন করিয়া তুলিয়াছেন। মহাযানে তাহার নাম বোধিসত্ত্বাবদান, বা, বোধিসত্ত্বাবদানমালা। ইহা দেখিলেই বোধ হইবে যে মহাযানীরা জাতক শব্দটা পছন্দ করিতেন না। উঁহারা জাতকের স্থানে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন। উঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাসাঙ্ঘিকের দল জাতকের পরিবর্ত্তে অবদান বলিতেন। মহাসাঙ্ঘিক হইতেই মহাযানের উৎপত্তি হইয়াছে। অবদান শব্দে সংস্কৃত ভাষায় মহৎ কার্য্য বুঝায়। মহাযানের অবদানে শুধু বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের কথা নয়, আরও অনেক মহাপুরুষেরই পূর্ব্বজন্মের কথা আছে। সুতরাং অবদান শব্দ যতটা ব্যাপক, জাতক শব্দ ততটা নয়। মহাযানে অবদানের অনেক পুস্তক আছে। আর্য্যশূরের অবদান-শতকে এইরূপ ১০০টি অবদান আছে। দিব্যাবদানমালায় ৩৭টি অবদান আছে। ভদ্রকল্পাবদানে ৩৫টি জাতক আছে। অশোকাবদান দিব্যাবদানমালার একটি অবদান, গদ্যে লেখা; কিন্তু অশোকাবদান-নামে পদ্যে-লেখা আরও একটি বৃহৎ অবদান ও সুগতজন্মাবদান নামে আরও একখানি অবদান আছে। অবদানের শেষ এবং উৎকৃষ্ট পুস্তক বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা—এখানি খৃঃ ১১ শতকে কাশ্মীরে ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস, নামে একজন কবির লেখা। তিনি হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার একজন সুক্ত নামে বৌদ্ধ বন্ধু ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র যখন রামায়ণ, মহাভারত, বৃহৎকথা প্রভৃতি বড় বড় পুস্তকের বিষয় লইয়া রামায়ণ-মঞ্জরী, ভারতমঞ্জরী, বৃহৎকথামঞ্জরী প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তখন সুক্ত একদিন আসিয়া বলিলেন, আমাদের অবদানগুলি বড় কটমট ভাষায় লেখা, কতক গদ্য, কতক পদ্য, কোনটাই সুবোধ নয়। তুমি যদি তোমার ভাষায় এইগুলি কাব্যাকারে লিখিয়া দাও, তবে আমাদের ধর্ম্মের বড় উপকার হয়। তাই ক্ষেমেন্দ্র বোধিসত্ত্বাবদান রচনা করেন। ইহাতে ১০৮টি অবদান আছে। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বত হইতে একখানি পুঁথী আনাইয়া ছাপাইতেছেন; ডানপাতে সংস্কৃত, বামপাতে ভুটিয়া ভাষায় তাহার তর্জ্জমা। তিনি ইহার বাঙ্গলাও করিতেছেন।

(নারায়ণ, শ্রাবণ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হারামণি

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন; কবিওয়ালা তর্জ্জাওয়ালা জারিওয়ালা বাউল দরবেশ ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের।]

নিশীথে যাইও ফুলবনে রে
ভোমরা নিশীথে যাইও ফুলবনে।
ডাল পাতা বৃক্ষ নাই এমন ফুল ফুটাইছে সাঁই,
ভাবুক ছাড়া না বুঝবে পণ্ডিতে রে
ভোমরা নিশীথে যাইও ফুলবনে।
নয় দরজা কইরে বন্ধ লইও ফুলেরি গন্ধ,
অন্তরে জপিও বন্ধুর নাম রে
ভোমরা নিশীথে যাইও ফুলবনে।
জ্বালাইলে দিলের বাতি দেখবে ফুল নানান জাতি
কত রকম ধরবে ফুলের কলি রে—
ভোমরা নিশীথে যাইও ফুলবনে।
অধীন সেখ ভানু বলে ঢেও খেলাইও আপন দিলে
পদ্ম যেমন ভাসবে গঙ্গার জলে রে
ভোমরা নিশীথে যাইও ফুলবনে॥

গানটি সীলেটের সেখ ভানু নামক একজন ফকিরের রচিত। রচয়িতা এখনও জীবিত।

সংগ্রাহক - এম-এস-হক্।

দেশের কথা

জগতের সকল উন্নত জাতিই আত্মনির্ভরশীল। তারা আত্মশক্তিতে আস্থাবান। নিজেদের তারা অক্ষম দুর্ব্বল বলিয়া ভাবে না, পরের কাছে তারা মাথা নত করে না, ভিক্ষুকের ন্যায় তারা পরের সম্মুখীন হয় না। আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞান তাদের প্রবল। তারা কথা কয় কাজ করিবার জন্য, তাদের কথা কেবল কথাতেই শেষ হয় না। তারা দেশসেবা করে দেশের প্রতি অনুরাগবশতঃই; বাজারে নাম বাজানো, খবরের কাগজে নাম জাহির করা বা "কথা গেঁথে গেঁথে করতালি" লওয়া তাদের দেশসেবার উদ্দেশ্য নয়।

প্রথমে চিন্তা তারপর কাজ। আমরা চিন্তা করাটাই একরকম ছাড়িয়া দিয়াছি, তাই কাজের কোঠাতেও শূন্য। আমাদের জন্য তিন চার হাজার বছর আগে শাস্ত্রকারগণ চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, আমাদের আহার-বিহার চলাফেরা মেলামেশা বিবাহ প্রভৃতির নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন —তা সে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাক আর না-ই খাক, তা আমাদের অক্ষম দুর্ব্বল করুক না কেন, ঋষরা ত্রিকালদর্শী ছিলেন তাঁরা কি আর ভুল চিন্তা করিয়া গিয়াছেন?—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমরা পরম নিশ্চিন্ত মনে চিন্তা করার বালাই রাখি নাই।

আমাদের দেশের একান্নবর্ত্তী পরিবারে অহরহ দেখিতেছি পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া পুত্রকন্যার পিতা হইয়া বয়সে প্রবীণ হইলেও কখনো সাবালক হইতে পারে না; তার সকল চিন্তা তার পিতা বা অন্য কোনো 'গুরুজন' ভাবিবে; এবং পিতা বা অন্য 'গুরুজন' বর্ত্তমান থাকিতে তার সাবালক হওয়াটা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক; তার বয়সই নয় হইয়াছে কিন্তু নিজের ভালোমন্দ ভাবিবার সে কে? তাহার পিতাই ত তাহার জন্য ভাবিতেছেন।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ভয় পাই, কাজ করা তো দূরের কথা। সেই জন্যই দেখিতে পাই আমাদের সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানেই সকলেই পাঁচজনের সঙ্গে মত মিলাইতে ব্যস্ত; পাঁচজনের সঙ্গে বিরোধ করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, নিজের মতে যা ভালো তাই করিতে অগ্রসর হওয়া আমাদের দ্বারা হয় না। আমরা যে কাপুরুষ তা আমরা মনে মনে বুঝিলেও মুখে বলি বিরোধ ভালো নয়, একযোগে কাজ করাই ভালো; অন্যায়চারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস নাই, তাই উদার ভাবে বলি "ক্ষমা হি পরমো ধর্ম্মঃ।" আমরা ভুলিয়া যাই, যে অক্ষম যে দুর্ব্বল তার মুখে ক্ষমা করার কথা সাজে না।

কংগ্রেস আমাদের দেশের প্রধান প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এখানে কেবল কথা কথা আর কথা। যার গলার জোর বেশী তারই এখানে জয়জয়কার। কংগ্রেসের সহিত আবেদন নিবেদন জয়গান করা ছাড়া, আর কোনো কর্ম্মের যোগ নাই। কংগ্রেসে যারা দেশবাসীর সম্মুখে কর্ম্মের আদর্শ, দেশসেবায় ত্যাগের আদর্শ, নির্ভীক স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ ধরিতে যায় তাহাদিগকে "একতা"র অনুরোধে বর্জ্জন করা হয়। কারণ তারা নূতনভাবে চিন্তা করিতে চায়, তারা বাঁধি পথ ছাড়িয়া নূতন পথে চলিবার উদ্যম করে। এইগুলাই তো বিরোধ সৃষ্টি করে, এবং বিরোধ আমরা চাই না!

আবেদন নিবেদন, এবং উহা শাসকসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে হতাশা—এ সমস্তই আমাদের উন্নতির দারুণ অন্তরায়। এ সম্বন্ধে 'চারুমিহিরের' উক্তি সমীচীন বলিয়া মনে হয়। "চারু-মিহির" বলেন -

ইংলণ্ডেশ্বর ভারতের সম্রাট। কিন্তু ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী মাত্রই আমাদের উপর রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া থাকেন। ব্রিটীশ পার্লিয়ামেণ্ট এবং ব্রিটীশ পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত মন্ত্রী-সমাজ দ্বারাই আমাদের দেশ শাসিত হইয়া থাকে। এই ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে ব্রিটীশ দ্বীপের অধিবাসী মাত্রেই প্রতিনিধি।

ব্রিটীশ দ্বীপের প্রায় পাঁচ কোটী অধিবাসী তাঁহাদের নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ভারতবর্ষের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিবেন সে আশা বাতুলতা মাত্র। যে স্থলে তাঁহাদের স্বার্থে ও আমাদের স্বার্থে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে সে স্থলে তাঁহাদের নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন কেহ তাহা প্রত্যাশা করে না। এই কথাটি আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই বলিয়াই আমরা আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সময় সময় অনেক অদ্ভুত আবদার করিয়া থাকি; এবং যথারীতি আমাদের ঐ-সকল আবদার অগ্রাহ্য হইলে আমরা হতাশ হইয়া পড়ি এবং তজ্জন্য কতই মনোকষ্ট ভোগ করিয়া থাকি। বাস্তবিক পক্ষে মনুষ্য-প্রকৃতির সহজ নিয়মগুলি মনে করিয়া চলিলে এই-সকল ঘটনায় হতাশ হইবার বা মনে কষ্ট পাইবার কিছুই নাই। আমাদের দেশের বাণিজ্যনীতির পরিবর্ত্তন বা শিল্পাদির রক্ষা বিষয়ে নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়াও যে আমরা তদ্বিষয়ে সফলকাম হইতে পারি না, তাহারও অন্য কোনও কারণ থাকা সম্ভবপর নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের আর-একটি জাতীয়

শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত এটিও কয়েক জনের একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে কিছু বলিতে সাহস হয় না। কারণ তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা বিদ্যার জাহাজ কেহবা বিদ্যার সমুদ্র। সাহিত্য-পরিষদে যে-সকল প্রবন্ধ পঠিত হয় তার অধিকাংশে সাহিত্যের "স" নাই, তবে প্রত্নতাত্ত্বিক কচকচি আছে যথেষ্ট। একদিন কোনো লোক একখানি পোড়ো বাড়ীর ইট কুড়াইয়া আনিয়া তাহার উপর প্রচুর গবেষণা-মূলক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন; কোনো দিন বা একজন নাকে চশমা আঁটিয়া এক জীর্ণ অপাঠ্য পুঁথির লিপি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাঁরা বিজ্ঞতার ভান করিতে পারেন, যাঁরা আপনাদের অস্তিত্ব নানা প্রকারে জাহির করেন, তাঁরাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা, এখানে প্রকৃত সাহিত্যিকের কল্কে পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। এ সম্বন্ধে আমরা দুইখানি সংবাদপত্রের মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ" লিখিয়াছেন—

মানবের জাতীয় উন্নতির মূল—তাহার সাহিত্য। যে জাতির সাহিত্য নাই, সভ্য সমাজে সে জাতির স্থান নাই। যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, তাহার নামই সাহিত্য। সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি।

বঙ্গবাণীর পবিত্র পাদপীঠ—"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ।" সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য—সানন্দ হৃদয়ের যথেচ্ছ অনুশীলন। এমন যে সাহিত্য-পরিষৎ, তাহা স্বার্থদুষ্ট ও অপবিত্র হইতে বসিয়াছে! যে "পরিষৎ" সাধারণের অমূল্য সম্পত্তি কতকগুলি লোক তাহাকে নিজেদের 'একচেটিয়া' করিয়া লইতেছেন।

কিছুদিন হইতেই সাহিত্য-পরিষদে দলাদলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মফঃস্বল হইতেই আমরা তাহা শুনিতে পাইতেছি।

বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয় যেন পরিষদের স্বর্ণ সিংহাসন মৌলিক মৌরশী করিয়া লইয়াছেন। পরিষদের সভাপতির পদ—সম্মানের পদ, সে পদের দায়িত্ব নিতান্ত কম নহে। সভাপতি মহাশয় শুধু ধনী বা বিদ্বান্ হইলেই চলিবে না,—সাহিত্যের মর্ম্মধারা ও বহিঃপ্রকাশ—তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। অধিকন্তু তাঁহার হৃদয়ে, নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠা, অনুসন্ধান-তৎপরতা এবং রসানুভাবকতা থাকা চাই। তাঁহার পরার্থ-পরায়ণ বুকে ত্যাগশীল তপস্বীর প্রাণ থাকা চাই। তিনি তোষামোদে গলিবেন না, কাহারও আবদারে ভুলিবেন না, কাহাকেও প্রতিযোগী বা প্রতিবন্ধক মনে করিবেন না, বাহবার করতালি—বক্তৃতার আলিঙ্গন—কিছুরই কামনা রাখিবেন না। তাঁহাকে—চতুর ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের মত—অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত এই ত্রিকালের মধ্যে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিতে হইবে। তিনি হইবেন গোধূলির প্রথম তারাটির মত উৎফুল্ল অথচ নিঃসঙ্গ। তাঁহার কাছে—পুরাতন নূতন, বড় ছোট, কিছুরই ভেদ থাকিবে না। পরিষদের ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের মনে হয়—কর্ত্তারা পরিবর্ত্তন চাহেন না। এ যেন দশশালা জমিদারীর বন্দোবস্ত! যিনি সভাপতি আছেন—চিরকালই তিনি সভাপতি থাকিবেন—ইহাই কি সাহিত্য-পরিষদের সনাতন নিয়ম?

"২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ" লিখিয়াছেন—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন দুইটিই সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালার জাতীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু এই দুইটি অনুষ্ঠানেই নানারূপ গলদ প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালীর এই দুইটি অনুষ্ঠানেই ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত খামখেয়ালী ও যথেচ্ছাচার পূর্ণমাত্রায় ইদানীং বিরাজ করিতেছে। জাতীয় সভাসমিতি মাত্রেই দেশবাসী সকলের সমান অধিকার আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। দুইটিতেই ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের অবৈধ আধিপত্য পরিলক্ষিত হইতেছে। উহার ফলে বাঙ্গালীর উক্ত দুইটি জাতীয় অনুষ্ঠানেই বহু সদস্যের এবং সাধারণের ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে এবং পরিষদ ও সম্মিলনে নানারূপ বিশৃঙ্খলাও দৃষ্ট হইতেছে। সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালকগণের মধ্যে জনকয়েকের একদেশদর্শিতা ও খামখেয়ালীর জন্যই পূর্ববঙ্গে স্বতন্ত্র সাহিত্যসম্মিলনের প্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে। সাহিত্যসম্মিলনের বর্ত্তমান পরিচালন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে সম্মিলনের উদ্দেশ্য কদাচ সফল হইবে না। আর এক কথা এই যে,—পরিষদের জন কয়েক "গাঁয়ে মানে না—আপনি মোড়ল" গোছের লোক সাহিত্যসম্মিলনেও সর্ব্বতোভাবে মোড়লগিরি করিয়া সম্মিলনের অনেক কার্য্য পণ্ড করিতেছেন। এই-সকল "হামবড়া" লোকের মোড়লগিরি হইতে সম্মিলনকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

তারপর পরিষদের কথা। পরিষদেও নানারূপ গোলযোগের আবির্ভাব হইয়াছে। পরিষদের পরিচালকবর্গের মধ্যে স্পষ্টবাদী, নির্ভীক, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এ সময় উচিত পরিষদের সভাপতির পদে এমন একজন ব্যক্তিকে সমাসীন রাখা,—যিনি ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের অন্যায্য আধিপত্যকে আপনার অনন্যসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি দ্বারা অনায়াসে দমন করিয়া পরিষদের গৌরবমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন।

পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারের অর্থ অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। যাঁহার বা যাহাদের প্ররোচনা বা আদেশে স্থায়ী ভাণ্ডারের টাকা অপর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে, তিনি বা তাঁহারা অচিরে সেই স্থায়ীভাণ্ডারের অর্থ পূরণ করুন। নচেৎ পরিষদের এ কলঙ্ক আর রাখিবার স্থান নাই।

"বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী" হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠে আমরা সুখী হইয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

আজকাল লোকের কাগজে নাম জাহির করিবার আকাঙ্ক্ষাটা যেন উৎকট হইয়া উঠিয়াছে; কিসে সংবাদপত্রে নাম বাহির হইবে তাহার জন্য যেন অনেকের একটা ছটফটানি দেখিতে পাই। কেহ তাঁহার কতিপয় বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে কাগজে বাহির হইল অমুক এক বিরাট "পার্টি" দিয়াছেন; দশজনের জায়গায় একশত জনকে খাওয়ানর কথা বাহির হইল; যদি তখন একটা আধটা গান কিংবা গ্রামোফোনের গান হয় তাহা হইলেই কাগজে বাহির হইল নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল, আর বাঁধি গৎ "The party was a grand success" এ ত আছেই। এই-রকম পার্টির কথা দেখিয়া-দেখিয়া আমাদের চোখ খরিয়া যাইতেছে; ডেপুটী, সব ডেপুটী, সদরওয়ালা, মুন্সেফ প্রভৃতি বদলী হইলেই "পার্টি"। এমন কি সবরেজিষ্ট্রার বদলী হইলেও বিদায়-সম্মিলনের

ছড়াছড়ি আরম্ভ হইয়াছে ; এইবার হেড-কনেষ্টবলের তারপর চৌকিদার নিয়োগ বদলীতে পার্টির ব্যবস্থা হইলেই চূড়ান্ত হয়। এ ত এক কথা। আবার অনেকে পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন কাঙ্গালী-বিদায় প্রভৃতির কথাও সংবাদপত্রে প্রকাশের প্রলোভন ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইতেছেন দেখিতেছি, কাঙ্গালীর সংখ্যা যতই হউক না কেন কাগজে দুই হাজার হইতে দশ হাজারের কম দেখা যায় না—ইহাতে রাজদ্রোহী বলিয়া গ্রেপ্তারের ভয় নাই কিম্বা মানহানির মোকদ্দমায় পড়িবার আশঙ্কাও নাই ; একটা লিখিয়া দিলেই হইল। হরি সঙ্কীর্ত্তন করিলেও নিস্তার নাই তাহার কথাও কাগজে উঠাইতে হইবে। সম্প্রতি কোন হিন্দু রমণী সাবিত্রী-ব্রত করিয়াছেন, তাহার কথাও কাগজে উঠিয়াছে দেখিলাম ; লোকের রুচি দিন দিন কিরূপ দাঁড়াইতেছে দেখুন। "এক হাতের দান অপর হাতে জানিতে পারিবে না।" আজকাল তাহার যো নাই, এখন মুষ্টি-ভিক্ষার কথাও ঢক্কানিনাদে দেশবিদেশে না জানাইলে তৃপ্তি হয় না।

সম্প্রতি আর এক উপায়ে কাগজে নাম জাহির করা হইতেছে। বিনাপণে ছেলের বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া অনেকে কাগজে ঢাকঢোল বাজাইতেছেন কিন্তু ভিতরের কথা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইতেছে পুত্রের পিতা ধনীর ঘরে পুত্রের বিবাহ দিয়া পণ না চাহিয়াও কন্যাকর্ত্তার যথেষ্ট অর্থ গৃহজাত করিতেছেন। যেখানে কিছু পাওয়ার আশা নাই সেইরূপ নিঃস্ব পিতার কন্যাকে বিনাপণে বিবাহ করাতেই মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়। নচেৎ কেবল নাম জাহির করাতে লাভ কি? "যশোহরে" একটি পণহীন বিবাহের সংবাদ পড়িলাম। সংবাদটি এই—

রয়েড়া-গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী জেঠতুত খুড়তুত দুই ভাই। ইঁহারা এতদিন অবিবাহিত ছিলেন। চারু বাবুর বয়স ২৫ এবং নরেন বাবুর বয়স ২৩। চারুবাবু মাগুড়া মুন্সেফী আদালতে চাকরী করেন, নরেনবাবু শৈলকুপা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক। এই ভীষণ বরপণ প্রথার দিনে ইঁহাদেরও বহুস্থান হইতে যথেষ্ট টাকা কড়ি এবং অলঙ্কারাদির প্রলোভন আসিয়াছিল, কিন্তু দুইজনেই একেবারে নিঃসহায় অতি দরিদ্র দুইটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বার্থত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কন্যাপক্ষের নিজ বাটীতে বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবার সামর্থ্য না থাকায় ইঁহারা নিজ খরচে অন্যত্র রাখিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। কন্যাপক্ষ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

অন্তত দুইজনও যে পণশূন্য নূতন পথে চলিয়াছেন ইহাও যথেষ্ট প্রশংসার কথা।

এতক্ষণ কেবল আমাদের কর্ম্মবিমুখতার কথা, পরনির্ভরতার কথা বলিয়া আসিলাম। সে সমস্তই নিরাশার কথা। এখন একটু আশার কথা, কর্ম্মের কথা শুনাই।

"স্বাস্থ্য-সমাচার" সংবাদ দিয়াছেন হরিনাভি গ্রামে বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর একটি শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে।

সভার কর্ম্মক্ষেত্র, হরিনাভি, কোদালিয়া ও চাংড়িপোতা গ্রামত্রয়ে লোকে নিদারুণ জলকষ্ট ভোগ করিতেছে দেখিয়া সভার সদস্যমণ্ডলী স্থির করেন যে বর্ত্তমানক্ষেত্রে গ্রামবাসিগণের জলকষ্টের অপনোদন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কিরূপ কার্য্যপ্রণালীর অবলম্বনে এবং স্বল্পব্যয়ে এই অভাব মোচন সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে আলোচনাপূর্ব্বক সভা স্থির করেন যে গ্রামের মধ্যে স্থানে স্থানে ভূগর্ভে "Tube well" 'নলকূপ' প্রোথিত করিলে বহুল পরিমাণে সভার সংকল্প সিদ্ধ হইতে পারে। পল্লীর জনসাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্বসংক্রান্ত সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে এত অনভিজ্ঞ যে তাহারা পুষ্করিণীর জল বিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে "Tube well" বা "নলকূপ" প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা সমধিক, কারণ টিউব ওয়েলের জল কলুষিত হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই।

সভা স্থির করেন যে লোককে শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে তাহার শরীর বা স্বাস্থ্যরক্ষার যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ তাহার স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষার জন্য শিক্ষারও সেইরূপ প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা যুগপৎ প্রবর্ত্তিত না করিলে, কোনটাই সুফলপ্রসূ হইবে না। পল্লীর কৃষক, শ্রমজীবী ও অন্যান্য শ্রেণীর নিরক্ষর লোকে স্বাস্থ্যরক্ষার মোটামুটি নিয়মগুলি যাহাতে শিখিতে ও বুঝিতে পারে, যাহাতে তাহারা কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া লিখিতে ও পড়িতে এবং সাধারণ হিসাবপত্র রাখিতে পারে, মোটের উপর পল্লীর একটি লোকও যাহাতে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত না থাকে তজ্জন্য গ্রামমধ্যে কয়েকটি নৈশবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

স্ত্রীশিক্ষা।—সর্ব্বজনীন শিক্ষার বিস্তার কল্পে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন যে সর্ব্বথা আবশ্যক, শিক্ষাবিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে মণ্ডলীর সদস্যগণ এ কথা একবাক্যে স্বীকার করেন, এবং পূর্ব্বোক্ত কমিটীর উপর গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের ভার অর্পণ করেন।

পরিশেষে সভা গ্রামে ম্যালেরিয়া ও কলেরা নিবারণার্থ দুইখানি উপদেশ-পত্র প্রত্যেক গৃহস্থকে বিতরণ করিবার ও উহার মর্ম্ম গৃহস্থকে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন।

এই প্রসঙ্গে "স্বাস্থ্য-সমাচারের" নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য যুক্তিযুক্ত—

প্রতি বৎসর প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে পল্লীর ও পল্লীবাসীর দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণরাগরঞ্জিত ভাষায় বর্ণিত হইতেছে, কিন্তু প্রাদেশিক সমিতি ও তাঁহার অঙ্গ ও উপাঙ্গ জেলা-সমিতিগুলি পল্লীর সংস্কারসাধনে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, বিপন্ন করিম সেখ ও সনাতন মণ্ডলের কুটীর-দ্বারে কয়জন কর্ম্মীর পায়ের ধূলা পড়িতেছে, তৎসম্বন্ধে আমরা কোন সংবাদই সংবৎসরের কোন সময়ে পাই না।

পল্লী-সংস্কারে রাজপুরুষদিগের সহায়তা প্রার্থনীয়, প্রতি বৎসর জেলা-বোর্ডের যে টাকা পল্লীর পথঘাটসমূহের সংস্কার উপলক্ষে ব্যয় হয়, তাহার অনেক টাকা কণ্ট্রাক্টের মহিমায় কণ্ট্রাক্টররূপী রাঘব-বোয়ালের এবং বোর্ডের অগাধজলসঞ্চারী কোন কোন রোহিতেরও উদরগত হইয়া থাকে। পল্লী-সমিতির নায়কগণ জেলাবোর্ডের কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যদি তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দেন, পথঘাট সংস্কারের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন তাহা হইলে সাধারণের প্রচুর অর্থের অপব্যয় নিবারণ এবং পল্লীর উন্নতিসাধন করিতে পারেন। আমাদিগের মনে হয় যে-সকল স্থলে কৃষকদিগের মঙ্গলের জন্য কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছে এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ সোসাইটীর উন্নতি-সাধনে ব্যাপৃত আছেন, সেই-সকল স্থানে সোসাইটীর জনহিতৈষী নায়ক ও সদস্যমণ্ডলী পল্লী-সমিতি বা হিতসাধন-মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিলে অচিরে সুফল ফলিতে পারে।

সু।

রাণীর বজরা

(ফরাসী লেখিকা মার্গারেৎ ওদুঁর গল্প হইতে)

সেদিন সকাল বেলা তার মাসি মারিয়া তাকে খুব শাস্তি দিয়ে আর কখনও নদীর ধারে যেতে বারণ করে দিয়েছিলেন। মাসির বেজায় রাগ হয়েছিল। তিনি বল্‌ছিলেন, "দেখো এখন, হতভাগা ছেলেটা বাপের মতনই একদিন জলে ডুবে শেষ হবে।"

ছেলে চোখের আড়াল হ'তে না হ'তেই মাসি সপ্তমে গলা চড়িয়ে "মিশেল, মিশেল" বলে চীৎকার সুরু করে দিলেন।

সারাটা সকাল মিশেল বাড়ীর পিছন দিকে মুখ ভার করে কেঁদে কেটে কাটাল, কিন্তু সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে সে আবার নদীর ধারে নৌকার গুণটানার পথে গিয়ে হাজির। কখন সে সেখানে এসে প'ড়ছে, তা সে আপনিই ভাল করে টের পায়নি। নদীর উপর দিয়ে যে-সব বড় বড় বজরা যাওয়া আসা করত সারাক্ষণই তাদের দিকে চেয়ে থেকেও কোন দিন তার ক্লান্তি বোধ হয়নি। বজরাগুলো কি রকম মস্ত মস্ত, কি রকম ভারী, তাদের চারিধার আবার শক্ত করে আঁটা! মিশেলের চোখে এ-সব ভারী আশ্চর্য্য ঠেক্‌ত। বজরাগুলি যখন একটি একটি করে তার চোখের সাম্‌নে দিয়ে ভেসে যেত, তখনই সেগুলির ভিতরকার জিনিষ কল্পনায় দেখা তার একটি কাজ ছিল। ঐ ধোঁয়াটে নৌকাখানায় বোধহয় পাথর বোঝাই আছে; ঐ মস্ত কাল খানা নিশ্চয় লোহা নিয়ে যাচ্ছে, আর ঐ যে বজরাগুলি নিঃশব্দে নদীর উপর দিয়ে ভেসে চলেছে, ওগুলির কানায়-কানায় ছাপিয়ে না জানি কত রহস্যই লুকানো আছে।

কতদিন সে গুণটানার রাস্তা ধরে নৌকাগুলির পিছন-পিছন কতদূর চলে যেত। নদীর মাঝখান থেকে মাঝি-মাল্লারা তার সঙ্গে কত গল্পই যে করে যেত তার ঠিক নেই। এদেশের অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এই ছেলেটির যে বিশেষ কিছু সাদৃশ্য নেই তা তারা বেশ বুঝ্‌তে পারত! মিশেল যে পারী থেকে এসেছে, আর তার নিজের বাড়ী যে স্যাঁ মার্ত্যাঁ খালের ধারে, একথা তাদের বলে দিতে তার কখনও ভুল হত না।

পারীর এই স্যাঁ মার্ত্যাঁ খালের কথাই তার সারাদিনের ভাবনা ছিল। এই খালের ধারে তার বাবা নৌকা থেকে জিনিষ নামাত; এইখানেই তার জীবনের সুখের দিনগুলি কেটে গেছে। নদীর ধারে বজরাগুলি যে বালির স্তূপ ঢেলে দিয়ে যেত, তারই উপর সঙ্গীদের নিয়ে সে কত রকম খেলা করত, তা' তার বেশ মনে পড়ে।

মাঝে-মাঝে এক-একখানা নৌকা ইট বোঝাই করে আন্‌ত; সেই-সব ইট দিয়ে ঘর বাড়ী বানান মিশেলের আর-এক কাজ ছিল। কিন্তু যতবার পাশ দিয়ে একখানা গাড়ী যেত, ততবারই তার সাধের ইমারৎ ভেঙে পড়ত। চীনা মাটির খেলনা আর বাসনের নৌকা আজাড় করা দেখ্‌তেই কিন্তু সব চেয়ে তার আনন্দ হত। সে-সব দিনে একবারটিও সে খেল্‌তে চাইত না। চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে দেখ্‌ত কত জোড়া হাতলওয়ালা ফুলদানী, নীল রঙের কাচের বাসন আর ফুলকাটা পেয়ালা নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেগুলি দেখতে এমন সুন্দর যে তার ইচ্ছা করত নিজের ছোট জামার আঁচল চাপা দিয়ে একটা নিয়ে পালায়।

সেদিনকার মত তার বাবার কাজ সাঙ্গ হলে তারা দুটিতে মিলে তাদের ছতলার ঘরখানিতে ফিরে যেত। সেই ঘরের জানলা দিয়েও দেখা যেত সেই খালটি। জানলার কাছে একটি ছোট টেবিল পেতে দু'জনে খেতে বসত। তারপর হ'ত মিশেলের ইস্কুলের সারাদিনের ইতিহাস বর্ণনা। তার বাবা তার গল্প শুনে আনন্দেই অস্থির। শুতে যাবার আগে বাবার কাছে একটা গল্প আদায় করা তার চাইই। নাবিক মাঝি মাল্লারাই সে-সব গল্পের নায়ক। এরই মধ্যে একটা গল্প তার বড়ই প্রিয় ছিল। গল্পের আরম্ভটা হত এই রকম, "এক নাবিকের একখানা চমৎকার, অতি চমৎকার বজরা ছিল; এতই তার রূপ যে খালের ভিতর দিয়ে যাবার সময় রাজ্যের যত সুন্দরী আর তাঁদের মেয়েরা খালের দরজায় এসে তার যাওয়া দেখতেন।"

স্যাঁ মার্ত্যাঁ খালের বিরহ তার প্রাণে বড় লেগেছিল। খালের কথা মনে করলেই সেই ছোট সাঁকো আর খালটি তার চোখের উপর ভেসে উঠত। সে সাঁকোর উপর দিয়ে এক এক বারে একটি একটি করে লোকের যাওয়াই

সেখানকার নিয়ম। মস্ত-বড়-কপাট-ওয়ালা খালের মুখটিও তার মনে ছবির মত আঁকা ছিল, সেই কপাটের ভিতর বড় বড় বজরাগুলি কেমন মুখ আঁধার করে পড়ে থাকে, দেখলে মনে হয় যেন তারা অপরাধী বন্দী। আর একটি জিনিষ তাঁর খুব মনে পড়ে, সে সেই খালের ধারের বাড়ীগুলির জলের ভিতরের উল্টো উল্টো ছায়া। পারের একটা কারখানা খালে এত গরম জল ফেলত যে সারাটা ঘাট ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে উঠত। ঠিক যেন কেউ জলের তলায় আগুন জালিয়ে দিয়েছে। বড়-বড়-ন'টা-চিম্‌নি-ওয়ালা সেই কারখানাটা তার বড়ই প্রিয়। কারখানার পাশ দিয়ে যাবার সময় চিম্‌নি ক'টা না গুণে সে কোন দিন যেত না। এক এক দিন সেই নটা চিম্‌নিই এক-সঙ্গে ধোঁয়া ছেড়ে আকাশে একরাশ মেঘের সৃষ্টি করে তুলত, সেই মেঘের রাশি আবার নেমে এসে জলের উপর লম্বা হয়ে সাঁকোর মতন পড়ে থাকত।

তারপর তাঁর দুঃখের দিন এল। একদিন সন্ধ্যাবেলা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে সে দেখল খালের ধারে তার বাবা নেই। বজরার মালিক তাকে বললে "খোকা বাবু, তুমি বাড়ী যাও, তোমার বাবা আর এখানে ফিরে আসবেন না।"

দু'দিন পরে মারিয়া-মাসি এসে তাকে আর্দ্ধেনে নিয়ে গেলেন। মারিয়া-মাসিকে সে মোটেই ভালবাসত না, তিনি সব তা'তেই তাকে মারতেন। কিছু করলেও মার, কিছু না করলেও মার। বজরা দেখতে যে তার অত ভাল লাগে, তা' সেখানে যেতেও তার মানা।

এখানকার সব বজরাগুলিই স্যা মার্ত্যাঁ খালের বজরার মত। কিন্তু এখানে বজরার গুণ টানে ঘোড়ায় আর পারীতে খালের দরজা পার করে দেবার সময় গুণ টানত মানুষে। সারি সারি দুজন কি চারজন করে মানুষ সাজ পরে গুণ টান্‌ত। ঘোড়ার মতন তাদের কাঁধের উপর দিয়ে একটা চামড়ার পেটি পরানো থাকত, ঘোড়ার মতনই গলা বাড়িয়ে তারা বজরা টেনে নিয়ে যেত।

এখানে দুটি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে নদীটি বয়ে গেছে, পারীর বাড়ীগুলির চেয়ে সে পাহাড় অনেক অনেক বড়। নদীর জল এখানে এত পরিষ্কার যে পাহাড়ের চূড়ার উপরের আকাশ-টুকুর ছায়াও তার মধ্যে দেখা যায়। নদীর ওপারে পাহাড়ের গা থেকে তিনটি শৃঙ্গ বেরিয়ে আছে। সেখানকার লোকেরা সেগুলির নাম রেখেছিল, "সিন্ধুকন্যা"! তাঁদের মাথা নেই, কিন্তু এককালে যে তাঁরা কন্যা ছিলেন তা দেখলেই বোঝা যায়। তাঁদের পোষাকের বড় বড় ভাঁজগুলি এখনও সবুজ মাঠের উপর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে।

সেই তিনটি পাহাড়ের চূড়ার দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ বসে থাকতে-থাকতে মিশেল দূরে ছোট ছোট ঘণ্টার আনন্দধ্বনি শুনতে পেল। তার মনে হল যেন একটি সুমিষ্ট গান শুনছে। ছোট ছোট ঘণ্টাগুলির শব্দ এমন পরিষ্কার আর এমন আনন্দময় যে মিশেল তারি সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগল "টুং টুং, টিন্ টিন্, টুং টুং টিন্ টিন।"

গুণটানার পথ দিয়ে যেতে-যেতে ঘণ্টা শুনে দুটি লোক দাঁড়িয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন বল্লে "নিশ্চয় রাণীর বজরা আস্‌ছে।" মিশেল কথাটা শুনতে পেলে। ছেলেটি দেখ্‌লে ঠিক তাদের পরেই দুটি ধপধপে শাদা চমৎকার ঘোড়া গুণটানার পথ দিয়ে আসছে। একটা জাল দিয়ে তাদের সমস্ত শরীর ঢাকা। লম্বা-লম্বা ঝালরগুলি নীচে দুল্‌ছে। তাদের মাথার উপর বড় বড় ঝুঁটি বাঁধা— তাতে আবার সোনারূপার টাকা মোহর ঝোলানো। তাদের চলা দেখ্‌লে একটুও ক্লান্ত মনে হয় না। মস্ত বড় বজরাখানা টানতে আর ঘণ্টাগুলি বাজিয়ে তুলতে যেন তাদের কতই আনন্দ!

যে লোকটি ঘোড়া দুটি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে দেখলে মনে হয় বেশ সুখী আর বেশ জোয়াল। ডান হাতখানা প্রথম ঘোড়ার পিঠের উপর দিয়ে বাঁ হাতে বর্শার মতন করে সে একটা চাবুক ধরে ছিল। তার আগায় বাঁধা কতকগুলো ফিতা হাওয়ায় উড়ছিল।

দেখতে দেখতে বজরাটা এগিয়ে এল। অমন সুন্দর বজরা বুঝি মিশেল কোনকালেও দেখেনি। জাহাজটার সাদা ধপ্‌ধপে খোলের উপর খুব চওড়া রঙীন ডোরাকাটা, দেখলে মনে হয় বজরাখানা একেবারেই নূতন। তার গায়ে বড় বড় অক্ষরে রাণী নামটি লেখা, জলের ভিতর অক্ষর-

গুলির ছায়া পড়েছে সব উল্টো উল্টো। মিশেল সেই দিকে চেয়ে দেখ্‌ল, তারা হেলে দুলে নাচ সুরু করে দিয়েছে। বজরার ঠিক সামনে ছোট্ট একটি খাঁচার ভিতর বসে একটি পাখী গান করছিল। মিশেল দেখল নৌকার মাঝখানে কতকগুলি সবুজচারা আর ফুলের টবের ধারে বজরার রাণী বসে।

তাঁর বসবার সুন্দর আসনটি কাঁচা সোনার রঙের, তাঁর শাদা পোষাকটি পায়ের একটু উপরে তোলা; ছোট পা দুখানির কাছে একটি সোনালি রঙের কুকুর শুয়ে। পিঠের উপর দিয়ে একরাশ কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল তাঁর কোমরের কাছে এসে পড়েছে, আর কপালের দুঁপাশে সোনালি চুলে বাঁধা দুটি রেশমী ফিতের থোপা তাঁর গালের উপর পড়ে দুলছে।

মিশেল আর কত মাঝি-মাল্লাদের মেয়েদের দেখেছে। এ মেয়েটি ত' মোটেই সে-রকম দেখ্‌তে নয়। একে দেখে মিশেলের মনে হ'ল সব-চেয়ে সুন্দর বজরাখানা এই মেয়েরই হওয়া উচিত।

মিশেল বাবার কাছে যে গল্পটা প্রায়ই শুনত, চট্‌ করে সেই গল্পটি তার মনে পড়ে গেল;—"সেই চমৎকার, অতি চমৎকার বজরার মালিকের এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল; মেয়েটির এমনি ভুবনমোহন রূপ যে সারা পৃথিবীর যত রাজা-রাজড়া সবাই তাকে রাণী করতে চাইত।"

বজরাটা ঠিক মিশেলের সাম্‌নে এসে পড়তেই সে উঠে দাঁড়াল। ছেলেটিকে হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে দেখে রাণীর পায়ের তলার কুকুরটা জেগে উঠে লাফিয়ে চেঁচিয়ে অস্থির। কিন্তু বজরাওয়ালার মেয়েটি একবার হাতখানা বাড়াতেই সে একেবারে চুপ। মেয়েটি মিশেলের দিকে চেয়ে একটুখানি হাস্‌ল। ঠিক তখনই পাহাড়ের চূড়াটুকুর উপর রোদ পড়ে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠ্‌ল। নদীটি তখন আয়নার চেয়েও স্বচ্ছ। পাহাড়টা নদীর উপর দিকে কি নীচের দিকে ঠিক করা শক্ত। ঘাসে ঢাকা সবুজ মাঠটি নদীর মাঝখান পর্যন্ত নেমে এসেছে, জলের ভিতর লম্বা লম্বা ঘাসগুলি কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। ক্রমে রূপার ঘণ্টার মধুর ধ্বনি মিলিয়ে আস্‌তে লাগল। বজরাটিও ধীরে ধীরে ভেসে চলল্‌। নদীটা তখন সরু একটা খালের মতনই সরু দেখাচ্ছিল, আর বজরাটা চল্‌ছিল যেন নদীর দুইপাড়ে ঠেকে ঠেকে।

হঠাৎ মিশেল দেখ্‌ল যে নৌকাখানা নদীর বাঁকে পড়ে চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে। তখন তার বড় দুঃখ হতে লাগল। অন্যদিনের মতন আজও ত সে বজরার সঙ্গে-সঙ্গে যেতে পারত। অবাক হয়েই চেয়ে ছিল, কেন সঙ্গে-সঙ্গে যাবার কথা মনে হয়নি! ভাল করে দেখবার জন্য সে জলের আরও কাছে ঘেঁসে গেল। জলের ভিতরেও সেই সবুজ মাঠ। গুণটানার পথ ছেড়ে চলল সে সেইদিকে ছুটে। কিন্তু এক পা ফেল্‌তেই কোথায় মিলিয়ে গেল পথ আর কোথায় মিলিয়ে গেল মাঠ। নদীর জল ফাঁক হয়ে তাকে দুদিক থেকে জড়িয়ে কোলে টেনে নিল্‌।

কয়েক মিনিট পরেই মারিয়া-মাসি "মিশেল মিশেল" বলে চীৎকার করতে লাগলেন। কেউ সাড়া দিল না। নিস্তব্ধ সন্ধ্যার দুই-একটি শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে মাসির কানের কাছে এসে বাজতে লাগল সেই দূরের রূপার ঘণ্টার মধুর শব্দ। শব্দটি অতি ক্ষীণ হলেও খুব পরিষ্কার। মনে হচ্ছিল যেন জলের ভিতর থেকে ঘণ্টাগুলি বেজে বেজে উঠ্‌ছে। মাসির তখন মনটা বড়ই উতলা। কিন্তু ঘণ্টার ধ্বনিটি তাঁর কানে এমন লেগেছিল যে তাঁর মুখ দিয়ে আপনা-আপনিই অতি মৃদু গানের মত ঘণ্টার সুরটি বেরিয়ে এল—"টুং টুং, টিন্‌ টিন্‌, টুং টুং টিন্‌ টিন্‌।"

শ্রীশান্তা দেবী।

অবেস্তা-প্রসঙ্গ

২

যস্ন (যজ্ঞ), ৯

হোম্ যশ্‌ত (সোম-যজুঃ)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

মূল

৬। কসে থ্বাংম্ বিত্যো, হওম, মষ্যো অস্তুয়িথ্যাই হুনৃত গএথ্যাই? কা অহ্মাই অষিশ্‌ এরেণাবি? চিৎ অহ্মাই জসৎ আয়প্তেম্?

সংস্কৃতানুবাদ

৬। কস্ত্বাং দ্বিতীয়ঃ, সোম, মর্ত্ত্যঃ অস্থ্বত্যৈ (—অস্থি-

মত্যো—ভূতমর্য্যৈ (অ-) সুস্থত জগতৈ্য * ? কা অস্মৈ আশীঃ অর্পিতা * ? কিম্ অস্মৈ (অ-)জসৎ (=অগচ্ছৎ) আপ্তব্যম্ ?।

বঙ্গানুবাদ

৬। হে সোম, কোন্ দ্বিতীয় মর্ত্ত্য ভূতময় জগতের জন্য তোমাকে অভিষব করিয়াছিলেন ? কোন্ আশী ইঁহাকে অর্পিত হইয়াছিল ? এবং কোন্ ফল ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল (ইনি কি ফল পাইয়াছিলেন) ?

মূল

৭। আঁৎ মে অএম্ পইতি অওখ্ত হওমো অষব দূরওষো,—আথ্‌বো মাংম্ বিত্যো মষ্যো অস্থইথ্যাই হুনূত গএথ্যাই। হা অস্মাই অষিশ্ এরেণাবি, তৎ অহ্মাই জসৎ আয়প্তেম্ যৎ হে পুথ্রো উদ-জয়ত বীসো সুরআউ থ্রএতওনো।

সংস্কৃতানুবাদ

৭। আৎ মে অয়ম্ প্রত্যবোচত সোমঃ ঋতাবা দূরৌষঃ—আপ্ত্যঃ মাং দ্বিতীয়ঃ মর্ত্ত্যঃ অস্থন্বত্যৈ (অ-) সুস্থত জগত্যৈ *, সা অস্মৈ আশীঃ অর্পিতা * তৎ অস্মৈ (অ-) জসৎ (=অগচ্ছৎ) আপ্তব্যম্ যৎ তস্য পুত্রঃ উদজায়ত বিশঃ (=বংশন্য=গোত্রস্য) শূরায়াঃ থ্রএতওনঃ (=ত্রৈতানঃ) (১)।

বঙ্গানুবাদ

৭। ইঁহাতে পবিত্র ও মৃত্যুর অপনয়নকারী সোম প্রতিবচন (প্রদান) করিলেন—দ্বিতীয় মর্ত্ত্য আপ্ত্য ভূতময় জগতের জন্য আমাকে অভিষব করিয়াছিলেন, এবং ইঁহাকে সেই আশীঃ অর্পিত হইয়াছিল ও সেই আপ্তব্য (ফল) ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল যে, বীরবংশে তাঁহার থ্রএতওন নামে পুত্র জাত হইয়াছিল।

মূল

৮ যো জনৎ অঝিম্ দহাকেম্ থিস্কফনেম্ থিকমেরেধেম্ খ্শ্‌শ-অষীম্ হজ্‌এর-যওখ্‌তীম্ অস্-অওজঙ্‌হেম্ দএবীম্ দ্রুজেম্ অঘেম্ গএথাব্যো দ্রবংতেম্, যাংম্ অস্-অওজস্তেমংম্ দ্রুজেম্ ফ্রচ কেরেন্তৎ অঙ্‌রো মইন্যুশ্ অবি যাংম্ অস্তইতীম্ গএথংম্ মহ্‌র্কাই অষহে গএথনাংম।

সংস্কৃতানুবাদ

৮। যঃ অহন্ অহিম্ দহাকম্ ত্রিজৃম্ভণম্ (=ত্রিমুখম্) ত্রিকমূর্দ্ধানম্ (২) সহস্রযুক্তিম্ অত্যোজসম্ দৈবম্ দ্রুহম অঘম্ জগতীভ্যঃ (সংস্থানেভ্যো বা) * (উপ-) দ্রবন্তম্, যম অত্যোজস্তমম্ দ্রুহম্ প্র চ অকৃন্তৎ (=অকরোৎ) অংহোমন্যুঃ অভি যম্ অস্থবতীম্ জগতীম্ * মৃতকায় ঋতস্য জগতীনাম্ *।

বঙ্গানুবাদ

৮। যে (থ্রএতওন) ত্রিমুখ, ত্রিমূর্দ্ধা, ষট্‌চক্ষু, সহস্র-শক্তি, অতি-ওজস্বী, দৈব (দেবসম্বন্ধী), দ্রোহকারী পাপ ও আমাদের সংস্থানসমূহের উপদ্রবকারী দহাক-নামক (দহাক=আক্ষ, দংশনকারী বা ক্ষয়কারী) অহিকে (= দৈত্যকে) বধ করিয়াছে,—অতি-ওজস্বিতম ও দ্রোহকারী যে (দহাক অহিকে) অংহোমন্যু (পাপস্রষ্টা) (৩) আমাদের ভূতময় সংস্থানসমূহকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের সংস্থান-সমূহের মরণ (অর্থাৎ ধ্বংসের) জন্য উৎপাদন করিয়াছেন।

মূল ও সংস্কৃতানুবাদ

৯। পূর্ব্বোক্ত ৬ সংখ্যকের ন্যায়, কেবল মূলের বি ত্যো, সংস্কৃত দ্বি তী য়ঃ স্থলে এখানে যথাক্রমে থ্রি ত্যো, তৃ তী য়ঃ হইবে।

বঙ্গানুবাদ

৯। কোন্ তৃতীয় মর্ত্ত্য, হে সোম, ভূতময় জগতের জন্য তোমাকে অভিষব করিয়াছিলেন ? কোন্ আশী ইঁহাকে অর্পিত হইয়াছিল এবং কোন্ ফল ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

মূল

১০। আঁৎ মে অএম্ পইতি-অওখ্ত হওমো অষব দূরওষো—থ্রিতো সামনাংম সেবিশ্‌তো থ্রিত্যো মাংম্ মষ্যো অস্থইথ্যাই হুনূত গএথ্যাই, হা অহ্মাই অষিশ্ এরেণাবি, তৎ অহ্মাই জসৎ আয়প্তেম্ যৎ হে পুথ্র উস্-জয়োইথে উর্বাখ্‌ষয়ো কেরেসাস্পস্‌চ, তূক্‌এষো অন্যো দাতোরাজো, আথ্‌ৎ অন্যো উপরো-কইর্যো যব গত্রস্নশ্ গদবরো।

১। স' ত্রিত—ত্রৈতান= অ'প্তিত-পুত্রের বংশধর।

২। দ্রষ্টব্য শতপথ, ১.৫.২.১, "ত্বষ্টুর্হ বৈ পুত্রঃ ত্রি শী র্ষা ষ ড় ক্ষ আস, সত্ত্ব ত্রী ণো ব মু খা ন্যা সুঃ।"

৩। জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম্মে অ ঙ্‌ র ম ই ন্যু (সং অংহোমন্যু) সমস্ত দুঃখ ও অকল্যাণের স্রষ্টা। ইঁহার বিপরীত স্পে ন্ত ম ই ন্যু, ইনি সমস্ত কল্যাণ ও অভ্যুদয়ের কর্ত্তা। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহা সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

সংস্কৃতানুবাদ

১০। আৎ মে অয়ম্ প্রত্যবোচত সোমঃ ঋতাবা দূরৌষঃ–ত্রিতঃ শ্যামানাম্ (=ত্রিতস্য পিতুঃ) সেবিষ্ঠঃ (=হিতকরঃ, প্রিয়তমঃ) তৃতীয়ঃ মাম্ মর্ত্ত্যঃ অস্থন্বত্যৈ (স্থ-) স্থুতত জগত্যৈ *, সা অস্মৈ আশীঃ অর্পিতা, তৎ অস্মৈ (অ-) জসৎ (=অগচ্ছৎ) আপ্তব্যম্ যৎ তস্য পুত্রৌ উদজায়তাম্ উবাক্ষকঃ কৃশাশ্বশ্চ, অতিচক্ষাঃ (ধর্ম্মবিধাতা) ধাতূরাজঃ, আৎ অন্যঃ উপরিকাযঃ (শ্রেষ্ঠকর্ম্মা) যুবা (স কেশ-) গুৎসকঃ গদাভরঃ (=গদাধরঃ)।

বঙ্গানুবাদ

১০। ইহাতে এই পবিত্র ও মৃত্যুর অপনয়নকারী সোম প্রতিবচন (প্রদান) করিলেন—তৃতীয় মর্ত্ত্য শ্যামের (=ত্রিতের পিতার, অথবা শ্যামগণের, Semites ?—Mill) হিতকর ত্রিত ভূতময় জগতের জন্য আমাকে অভিষব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই আশী অর্পিত হইয়াছিল এবং এই ফল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহার দুইটি পুত্র জাত হইয়াছিল–উবাক্ষক ও কৃশাশ্ব। ইহাদের একটি ধর্ম্মবিধাতা ধর্ম্মরাজ, ও অপরটি শ্রেষ্ঠকর্ম্মা, কেশগুচ্ছকশালী, যুবা ও গদাধর।

মূল

১১। যো জনৎ অহিম্ স্রবরেম্, যিম্ অস্পোনারেম্ নরে-গরেম্, যিম্ বীষকৃতেম্ জ়ইরিতেম্, যিম্ উপইরি বিশ রওধৎ অরেশ্ত্যো-বরেজ্ জ়ইরিতেম্,—যিম্ উপইরি কেরেসস্পো অযঙ্হ পিতূম্ পচত আ রপিথ্বিনেম্ জ়্র্বানেম্, তফ্সৎ চ হো মইর্যো থ্বাসৎচ, ফ্রাংশ্ অয়ঙ্হো ফ্রস্পরৎ যেষ্যংতীম্ আপেম্ পরাএঙ্হাং পরাংশ্ তর্শ্তো অপতচৎ নরেমনাও কেরেসাস্পো।

সংস্কৃত

১১। যঃ অহন্ অহিম্ শৃঙ্গভরম্ (=শৃঙ্গধরম্), যম্ অশ্ব-গিরম্ নর-গিরম্, যং বিষবন্তম্ হরিতম্, যম্ উপরি বিষম্ আরোহৎ অঙ্গুষ্ঠবর্হম্ (=অঙ্গুষ্ঠ-গাঢ়ম্) হরিতম্, যম্ উপরি কৃশাশ্বঃ অয়সী (=অয়স্পাত্রেণ) পিতুম্ (খাদ্যম্) অপচত আ মধ্যাহ্নং * কালম্ *, তপ্তশ্চ § (ভবিতুমারভত) সঃ মর্যঃ অশ্বনৎ (স্বিন্নো ভবিতুমারভত বা), প্রাক্ অয়সঃ (=অয়স্পাত্রাৎ) প্রাস্ফুরৎ বহন্তীম্ (=ক্ষুভ্যন্তীম্) আপম্ (=অপঃ) পরাস্যৎ, পরাঙ্ ত্রস্তঃ অপা-তক্রৎ নরমনাঃ কৃশাশ্বঃ।

বঙ্গানুবাদ

১১। যিনি শৃঙ্গধর অহিকে (দৈত্যকে) বধ করেন, যে অহি অশ্ব ও নরকে গিলিয়া ফেলে, যে স-বিষ ও হরিত-বর্ণ, যাহার উপর হরিতবর্ণ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ গাঢ় বিষ প্রবাহিত হয়, এবং যাহার উপরে কৃশাশ্ব লৌহে (লৌহপাত্রে) মধ্যাহ্নকালে খাদ্য পাক করিয়াছিলেন; (এই পাকে) সেই মর্ত্ত্য (মরণধর্ম্মা অহি) তপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতেছিল (অথবা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছিল) এবং লৌহ (-পাত্র) হইতে সম্মুখে লাফাইয়া উঠিয়া ক্ষোভপ্রাপ্ত জলকে পরিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল, আর পুরুষোচিত-বুদ্ধি-শালী কৃশাশ্ব ত্রস্ত হইয়া পরাঙ্মুখভাবে অপগত হইয়াছিল।

১২=৯, কেবল থ্রিত্যঃ (=তৃতীয়ঃ) শব্দের স্থানে তুইর্যঃ (=তুর্যঃ =চতুর্থঃ) হইবে।

মূল

১৩। আঅৎ মে অএম্ পইতি-অওখ্ত হওমো অষব দূরওসো—পোউরুষস্পো মাংম্ তূইর্যো মষ্যো অস্থইথ্বাই হুনূত গএথযাই, হা অহ্মাই আষিশ্ এরেণাবি চিৎ অহ্মাই জশৎ আয়প্তেম্, যৎ হে তূম্ উস্-জ়যঙ্হ, তূম্ এরেজ়ুবো জ়রথুশ্ত্র ন্মানহে পোউরুষস্পহে বীদএবো অহুর-ৎকএষো।

সংস্কৃত

১৩। আৎ মে অয়ম্ প্রত্যবোচত সোমঃ ঋতাবান্ দূরৌষঃ—পৌরুষাশ্বঃ মাম্ তুর্য্যঃ মর্য্যঃ অস্থিমত্যৈ অসুনুত জগত্যৈ *, সা অস্মৈ আশীঃ অর্পিতা বা; তদ্ অস্মৈ (অ-) জসৎ (=অগচ্ছৎ) আপ্তব্যম্ যৎ অস্য ত্বম্ উদজায়স্ব, ত্বম্ ঋজুঃ (=পুণ্যাত্মা) জরথুস্ত্র সদ্মনঃ পৌরুষাশ্বস্য বি-দেবঃ (=দেববিরোধী) অসুর—ধর্ম্মানুষ্ঠাতা *।

বঙ্গানুবাদ

১৩। ইহাতে পবিত্র ও দূরমৃত্যু এই সোম প্রত্যুত্তর করিলেন—চতুর্থ মর্ত্ত্য পৌরুষাশ্ব ভূতময় (জড়) জগতের জন্য আমাকে অভিষব করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে সেই আশী অর্পিত হইয়াছিল ও তাঁহার নিকটে সেই আপ্তব্য (ফল) উপস্থিত হইয়াছিল যে, হে জরথুস্ত্র, পৌরুষাশ্বের গৃহে তুমি ইহার হইয়া জাত হইয়াছ,—তুমি ঋজু (পুণ্যাত্মা) দেববিরোধী ও অসুরের ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা।

মূল

১৪। শ্রুতো অইর্যেনে বএজহি (৪) তুম্ পওইর্যো জরথুস্ত্র অহুনেম্ বইরীম্ ফ্রস্রাবয়ো বীবেরেথ্বন্তেম্ আখ্‌তুইরীম্ অপরেম্ খ ওখ্রুদ্যোহ্য ফ্রস্রাইতি।

সংস্কৃতানুবাদ

১৪। শ্রুতঃ আর্য্যে বীজে (৪) (=জনপদবিশেষে) ত্বম্ পৌর্য্য (=প্রথমঃ) জরথুস্ত্র অহুনম্ * বর্য্যম্ ("অহুন বইর্যম্" =প্রসিদ্ধং স্তুতিবিশেষম্,) প্রাস্রাবয়ঃ বিভৃত্বানম্ (=তত্র তত্র সবিরামম্) চতুঃকৃত্ব (৫) * অপরম্ তারতরয়া * প্রশ্রুত্যা (=স্বরেণ)।

বঙ্গানুবাদ

১৪। তুমি আর্য্যবীজে (জনপদে) (৪) বিশ্রুত, এবং হে জরথুস্ত্র তুমিই প্রথমে "অহুন বইর্য" স্তুতিকে (যথাস্থানে অর্থাৎ তিন-তিন শ্লোকের পরে) বিরাম দিয়া প্রতিবার উচ্চতর স্বরে চারিবার উচ্চারণ করিয়াছিলে।

মূল

১৫। তুম্ জেমগুজো আকেরেনবো বীস্পে দএব জরথুস্ত্র, যোই পর অস্মাৎ বীরো-রওধ অপতয়েন্ পইতি আয় জেমা, যো অওজিশ্‌তো, যো তংজিশ্‌তো যো থ্বখ্‌যিশ্‌তো যো আসিশ্‌তো যো অস্-বেরেথ্রজাং-তেমো অববং মনিবঅউ দামাংন্।

সংস্কৃতানুবাদ

১৫। ত্বম্ জ্মা-গূঢ়ান্ (ভূমধ্যে গূঢ়ান্) অকরোঃ বিশ্বান্ দেবান্ (=দানবান্) জরথুস্ত্র, যে পরা অস্মাৎ বীররোহাঃ (বীরাকৃতয়ঃ) অপতন্ প্রতি ইমাং জ্মাম্ (=পৃথিবীম্, তুলঃ—'জমি'); যঃ ওজিষ্ঠঃ, যঃ দ্রঢ়িষ্ঠঃ * (অবেস্তার পদটি সংস্কৃত ত্বঞ্চ্ বা তঞ্চ্ ধাতু হইতে), যঃ ত্বক্ষিষ্ঠঃ (=তেজিষ্ঠঃ, কর্ম্মিষ্ঠঃ, ঋগ্বেদে 'ত্বক্ষস্,' 'ত্বক্ষীয়স্' আছে), যঃ আশিষ্ঠঃ (=আশুগামিতয়ঃ, 'আশু' হইতে), যঃ অতিবৃত্রহতমঃ (অতিবিজেতৃতমঃ) অভবৎ মন্ব্যোঃ (৫) ধাম্নঃ।

বঙ্গানুবাদ

১৫। হে জরথুস্ত্র, তুমি সমস্ত দানবকে পৃথিবীর মধ্যে গূঢ় করিয়াছিলে (অর্থাৎ তোমার প্রভাবে তাহারা সেখানে লুকাইয়াছিল), যে (দানবেরা) ইহার পূর্ব্বে বীররূপে এই পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। (তুমিই ইহা করিয়াছিলে, তুমি—) যে উভয় মন্যুর (৫) ধামে (অর্থাৎ সৃষ্টলোকে) শ্রেষ্ঠ ওজস্বী, দৃঢ়তম, কর্ম্মিষ্ঠ, এবং সর্ব্বপ্রধান দ্রুতগামী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা।

মূল

১৬। আঅং অওখ্‌ত জরথুশ্‌ত্রো—নেমো হওমাই, বঙ্‌হুশ্ হওমো, হুধাতো হওমো অশ্‌দাতো, বঙ্‌হুশ্ দাতো বএষজ্যো হুকেরেফ্‌শ্ হ্বরেশ্ রেরেথ্রজাউ জইরি-গওনো নাংম্যাংহুশ্ যথ খ্বরেংন্তে বঙ্‌শ্‌তো উরুনএত পাথমইন্যো-তেমো।

সংস্কৃতানুবাদ

১৬। আৎ অবোচত জরথুস্ত্রঃ—নমঃ সোমায়, বসুঃ (উত্তমঃ) সোমঃ, সু (-বি-) হিতঃ সোমঃ শুদ্ধতয়া (-বি-) হিতঃ *, বসুঃ (বি-) হিতঃ ভৈষজ্যঃ (০ম্) সুকল্পঃ সুকর্ম্মা * বৃত্রহা (=শত্রুঘাতী) হরিগুণঃ (=হরিবর্ণঃ—হরিদ্বর্ণঃ, পীতবর্ণো বা) নম্রাংশুঃ (=নম্রপল্লবঃ)। যথা পানায় * বসিষ্ঠঃ (=উত্তমতমঃ) আত্মনঃ পথ্যতমঃ *।

বঙ্গানুবাদ

১৬। ইহাতে জরথুস্ত্র উত্তর করিলেন—সোমকে নমস্কার! সোম উত্তম, সোম সুবিহিত ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত! (ইহা) উত্তম ও প্রস্তুত! (ইহা) সুন্দরাকার, আরোগ্যপ্রদ ও সুকর্ম্মা; (ইহা) শত্রুঘাতী ও পীতবর্ণ; (এবং ইহার) পল্লব নম্র (হইয়া থাকে)। পানের জন্য ইহা যেমন উত্তমতম, (সেইরূপ) আত্মারও (উন্নতির জন্য) পথ্যতম।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

৪। অইর্যেন=ইরান, আর্য্য, বএজঙ্‌হ বা বএজ=বীজ। এই অইর্যেন-বএজকে ইরানগণের আদিম বাসস্থান বলিয়া গণ্য করা হয়। জরথুস্ত্র এইখানেই ধর্ম্ম প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন ইহা ইরান-দেশের পূর্ব্বভাগে, Jaxartes ও Oxusএর মধ্যবর্ত্তী ভূমি, অন্যেরা বলেন উত্তর ভাগে; পূর্ব্বে কাস্‌পিয়ান সাগর, পশ্চিমে রঙ্ঘ জনপদ (Rangh Provinces) দক্ষিণে মূল মিডিয়া (Media), ও উত্তরে অররাম্ (Arran)।

৫। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় টীকা দ্রষ্টব্য।

পুস্তক-পরিচয়

সঞ্চয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১২৬ পৃষ্ঠা। সুদৃশ্য হাফ বাইণ্ডিং, ভালো কাগজে খুব পরিষ্কার ছাপা। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

মহামনীষী চিন্তাশীল কবিবর নানা সময়ে ধর্ম্ম ও দার্শনিক ভাবের যে-সমস্ত কবিত্বরসমধুর উচ্চাঙ্গের ভাবব্যঞ্জনার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এখানি তাহারই সংগ্রহ পুস্তক। ইহাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে—রোগীর নববর্ষ, রূপ ও অরূপ, নামকরা, ধর্ম্মের নবযুগ, ধর্ম্মের অর্থ, ধর্ম্মশিক্ষা, ধর্ম্মের অধিকার, আমার জগৎ। প্রবাসীতে ইতিপূর্ব্বে পঞ্চশস্যের মধ্যে নূতন একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদের সংবাদ দিবার উপলক্ষে আমরা দেখাইয়াছিলাম যে বৈজ্ঞানিকের লেবোরেটারীতে বহু পরীক্ষার পর যে সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে মহাকবি ঋষি রবীন্দ্রনাথ তাহা আপনার ভাবুকতার দ্বারা 'আমার জগৎ' প্রবন্ধে পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ অপরাপর প্রবন্ধেও তাঁহার চিন্তার ধারা অপর-নিরপেক্ষ নবনব তত্ত্ব সৃষ্ট করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং এই পুস্তক চিন্তাশীল, ভাবুক ও রসগ্রাহী পাঠকের নব নব প্রশ্ন উদ্রেক ও পরিতৃপ্ত করিবে।

পরিচয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১৭১ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ অনিন্দ্য। মূল্য বারো আনা মাত্র।

এই পুস্তকে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে—ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, আত্মপরিচয়, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, ভগিনী নিবেদিতা, শিক্ষার বাহন, ছবির অঙ্গ, সোনার কাঠি, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, আষাঢ়, শরৎ। প্রায় সমস্ত প্রবন্ধেই বাহিরের সংঘাতে কেমন করিয়া জীবন গড়িয়া উঠে তাহাই দেখানো হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা আর্য্য অনার্য্য ও বিদেশীর সম্মিলিত কাহিনী। সেই সব ভাঙা-গড়া জোড়াতাড়ার মধ্যে এমন একটি পাকা অটল অনড় বিশেষত্ব এদেশের আছে যাহাতে ইহার "আত্মপরিচয়।" সেই অচল কেন্দ্রটিকে সামলাইয়া রাখিয়া দেশকে 'বিশ্ব-বিদ্যালয়ে' ভর্ত্তি হইতে হইবে এবং বাহিরের সহিত ভিতরের আদানপ্রদান এবং শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ চলিতে থাকিবে। তাহাতেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি হইবে। এই আদর্শকে সত্য বলিয়া মানিয়া ভগিনী নিবেদিতা আপনার প্রগাঢ় তপস্যার দ্বারা ভারতবর্ষকে উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তিনি ভারতবর্ষের শিষ্য হইয়াও শিক্ষকের আসন অনায়াসেই লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বের নব নব ভাব-বৈচিত্র্যের সোনার কাঠিতে আমাদের দেশের সাহিত্য সঙ্গীত চিত্র শিল্প সচেতন হইয়া উঠিবে। শিক্ষা আমাদের বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ে হইবে, কিন্তু শিক্ষার বাহন হইবে সম্পূর্ণ স্বদেশী। শিক্ষা আমাদের ব্যাপক না হইলে আমাদের বহুদিন-সঞ্চিত ভীরুতা আমাদিগকে মানিয়া-চলা ছাড়িয়া মুক্তভাবে চিন্তা করিবার অবসর দিতে পারিবে না। বহুকালের অশিক্ষার জড়তায় আমাদের সমাজ এমন পঙ্গু হইয়া নানান ভাবে অচল হইয়া উঠিয়াছে যে গৃহের ও পরিবারের বন্ধন আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে ও সমস্ত শক্তিকে পরাহত করিয়া আমাদিগকে কৃপণ করিয়া রাখিয়াছে। সকল মানুষকে সমাজের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দিয়া এই কৃপণতা পরিহার করিতে সক্ষম করিতে হইবে। ছবির অঙ্গ ছবির এবং আষাঢ় ও শরৎ দুটি ঋতুর অন্তর-নিহিত ভাবরসের পরিচয় বিশ্লেষণ করিয়াছে।

এই 'পরিচয়' গ্রন্থে আমরা আমাদের দেশের "আত্ম-পরিচয়" স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই। যাঁহারা দেশকে যথার্থ ভাবে বুঝিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে চান, যাঁহারা দেশের সন্তান নামের যথার্থ অধিকারী হইতে চান, তাঁহারা এই 'পরিচয়' গ্রন্থ অবশ্য পড়িবেন।

The United States of America : A Hindu's Impressions and Study—লালা লাজপত রায় কর্তৃক প্রণীত। ২০ খানি চিত্র-সংযুক্ত। প্রকাশক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা। কাপড়ে বাঁধা ৪২১ পৃষ্ঠা, মূল্য ২॥০ টাকা।

এই পুস্তকখানি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভক্ত—(১) Outlines of the History of the United States of America. আমেরিকা আবিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া আমেরিকার বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির উপনিবেশ ও পরস্পরে বিবাদ, আমেরিকার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য লাভ, স্বাধীনতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাফ্রিদাসদিগকে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টায় গৃহবিবাদ এবং অবশেষে সম্পূর্ণ গণতন্ত্র শাসন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। (২) ও (৩) Education in the United States. এই দুই পরিচ্ছেদে আমেরিকায় কত রকম স্কুলকলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে এবং কি কি উপায়ে কিরূপ ব্যবস্থায় কাহাদের সমবেত চেষ্টায় এবং কত খরচে রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাই বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (৪) The Education of the Negro (৫) A Negro in American Politics, নিগ্রোরা দাসরূপে আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় নীত হয়। উহাদের সহিত আমেরিকার উপনিবেশী শ্বেতাঙ্গদের সর্ব্ববিষয়েই অমিল ও প্রভুভৃত্য সম্পর্ক। সেই অসভ্য পদদলিত দাসজাতি স্বাধীনতা পাইয়া স্বচেষ্টায় নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থা কতদূর উন্নত করিয়া কতখানি রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়াছে তাহা এই দুই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। (৬) Religion in the United States, আমেরিকায় কত-প্রকার ধর্ম্মমত ও স্বাধীনচিন্তা প্রচলিত আছে এবং ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি পরস্পর কিরূপ অবিরোধী, সমাজে এবং রাষ্ট্রে অধিকার লাভ কিরূপ ধর্ম্মমতের নিরপেক্ষ তাহা এই পরিচ্ছেদ হইতে জানিতে পারা যায়। (৭) Charity and Social Service Organizations, দেশের দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য আমেরিকায় কত রকম ব্যক্তিগত বা সমবেত চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে তাহার পরিচয় এই অধ্যায়ে আছে। (৮) The Philippine Islands, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের নিকট হইতে আমেরিকা অধিকার করিয়া সেখানকার অসভ্য জাতিদিগকে কিরূপে দ্রুতগতিতে শিক্ষায় সভ্যতায় উন্নত করিয়া স্বাধীনতা লাভের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে তাহার বিবরণ এই পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। (৯) Politics and Government in the United States, আমেরিকার যুক্তরাজ্য কি প্রণালীতে পরিচালিত হয় এবং রাজ্য-পরিচালনায় কাহার কি অধিকার তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (১) Some Observations on Civilisation, পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল মন্ত্র কি ও পরিণতির ঝোঁক কোন্ দিকে তাহাই আলোচনা করিয়া তাহা হইতে আমরা কি উপদেশ পাইতে পারি তাহারই আভাস এই অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। (১১) Women in the United States, জগতের মধ্যে সকল সমাজ অপেক্ষা আমেরিকার সমাজে রমণীর স্বাধীনতা ও প্রভাব অত্যন্ত অধিক। ইহার কারণ কি এবং সমাজের ও পরিবারের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহাদের কিরূপ অধিকার আছে ও কতখানি আত্মবিকাশ হইয়াছে তাহা এই অধ্যায়ে বিশদভাবে

বর্ণিত হইয়াছে। (১২) Caste in America, আমেরিকায় ভারতবর্ষের ন্যায় জাতিভেদ না থাকিলেও ধনী দরিদ্রে সাদায় কালোয় কি কঠিন পার্থক্য ও হিংসা দ্বেষ আছে তাহাই এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়। (১৩) India in America, আমেরিকা-প্রবাসী ভারতবাসীরা সে দেশে কত রকম কাজের জন্য গিয়া আছে, এবং তাহাদের সহিত আমেরিকার লোকেরা কিরূপ ব্যবহার করে তাহারই বিবরণ এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

যে-সমস্ত সমস্যা আমেরিকাকে ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া মীমাংসা করিতে হইয়াছে ও হইতেছে তাহার অনুরূপ অনেকগুলি সমস্যা আমাদেরও সম্মুখে সমাধানের অপেক্ষা করিতেছে; অতএব আমরা আমেরিকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিখিয়া আমাদের ঘর সামলাইতে শিখিতে পারি। লালা লাজপত রায় স্বদেশভক্ত স্বদেশহিতৈষী কর্ম্মী ত্যাগী পুরুষ। তিনি বিদেশে ভ্রমণ করিয়া সকল দেশের অন্তরাত্মার পরিচয় লাভ করিয়া সকলকার নিকট হইতে স্বদেশের শিক্ষণীয় যাহা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন। সেই উদ্দেশ্যের একটি ফল এই আমেরিকার ইতিহাস। ইহা শুষ্ক তারিখ ও ঘটনার তালিকামাত্র নহে; নানান বিরোধী উপকরণের একতা সম্পাদনে কেমন করিয়া একটা নূতন জাতি শক্তিতে সামর্থ্যে কৃতিত্বে জগতের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিল, দাসত্ব হইতে কাফ্রি নিগোরা কেমন করিয়া সভ্য মানুষের সমান পদবী লাভ করিল, পরাধীন ফিলিপিনো অসভ্যদিগকে কিপ্রকারে শিক্ষিত সভ্য করিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়া আমেরিকা আপনাকে প্রকৃত বিজেতা ও স্বাধীনতার সম্মানকারী বলিয়া প্রমাণ করিতেছে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উন্নতির জন্য কতপ্রকার প্রতিষ্ঠান ও চেষ্টার আবশ্যক এবং সেইরূপে যাহারা কাজ করিতে চায় তাহাদের জ্ঞাতব্য বিবরণ ও করণীয় প্রণালী এই পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায়ে মানুষের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া নিজেও যে সেই মানুষ এবং আমারও স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্র আমার সেবা ও সাহায্য পাইবার প্রতীক্ষায় আছে সেই বোধ জন্মে; প্রাণে উৎসাহ আসে, কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, দৃষ্টান্ত দেখিয়া কর্ম্মের উপায় ও প্রণালী নির্দ্ধারণ করা যায়। বহু স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু আমাদের স্থান ও সময়ের অভাবে সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে হইতেছে। যাঁহারা ইংরেজি পড়িয়া বুঝিতে পারেন তাঁহাদের সকলেরই এই বই পড়িয়া দেখা উচিত; এই পুস্তক পাঠে পাঠকপাঠিকারা দেশের সেবা করিবার পথ আপনারাই আবিষ্কার করিতে পারিবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি সুস্থ হইলেই পরিবার সুস্থ কর্ম্মঠ হয়; প্রত্যেক গ্রাম স্বাস্থ্য লাভ করিলেই জেলা স্বাস্থ্য লাভ করে; প্রত্যেক জেলা স্বাস্থ্যে শিক্ষায় উন্নত হইলেই প্রদেশ উন্নত হয়; প্রদেশ উন্নত হইলেই রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সুপরিচালিত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। রাষ্ট্রাধিকারীদের নিকট হইতে প্রজাসাধারণের অধিকার ও সাহায্য লাভ করিবার চেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের অধিকারী হইবার যোগ্যতা ও আত্মনির্ভরতা আত্মচেষ্টায় অর্জ্জন করিতে হইবে। জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র জাতির কর্ণধারার এই সুলিখিত সুবিন্যস্ত ইতিহাস পাঠ করিলে পাঠকপাঠিকা নিজেদের কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই বইখানি সকলেই অন্তত একবার পড়িয়া দেখিবেন আশা করি।

প্রাচীন সভ্যতা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত। গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস, ২৪ মিডল্ রোড, ইটলি, কলিকাতা। ৯০ পৃষ্ঠা। বারো আনা।

বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সুলেখক বিজয় বাবু এই গ্রন্থে প্রাচীনতম জাতিদের সভ্যতা ও সেই সভ্যতার সংসর্গে অপর আধুনিক জাতির সভ্য হওয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে এই সাতটি সন্দর্ভ আছে—(১) মিশরের প্রাচীন সভ্যতা; (২) বাবিলন ও আসীরিয়া; (৩) ইউরোপে সারাসেন সভ্যতা; (৪) তুরস্ক রাজ্যের উৎপত্তি; (৫) চীনজাতীয় সভ্যতা; (৬) আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতা; (৭) বহির্ভারত। এই সকল প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পুঞ্জীভূত হইয়াছে। ইহা পড়িয়া আমরা অনেক বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। যেমন নূতন বিষয়, তেমনি চিত্তাকর্ষক রচনাভঙ্গি, তেমনি মার্জ্জিত প্রাঞ্জল স্বচ্ছ প্রবহমান ভাষা। এই পুস্তক বঙ্গভাষার একটি বিভাগকে সমৃদ্ধ করিবে। ইতিহাসকে এমন কৌতুকাবহ চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলাতে লেখকের একসঙ্গে পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যরসবোধের পরিচয় পাইতেছি।

প্রবন্ধ-রত্ন—শ্রীশিবরতন মিত্র সম্পাদিত; রায়সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের লিখিত ভূমিকা সংবলিত। অতুল লাইব্রেরী, কলিকাতা। কাগজের মলাট বারো আনা, কাপড়ের মলাট চোদ্দ আনা।

অক্ষয়কুমার দত্ত হইতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত ২৯ জন বিখ্যাত লেখকের নানা বিষয়ক গদ্য রচনা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। লেখকদের আবির্ভাবের সময় অনুসারে বইখানি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত; রচনাগুলি চরিতকথা, নীতিকথা, ইতিকথা, নিসর্গকথা, গার্হস্থ্যকথা, প্রাণীকথা, কাল্পনিক কথা, বিজ্ঞানকথা, স্বাস্থ্যকথা, আকাশকথা, পৌরাণিক কথা, প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগের নমুনাস্বরূপ বিচক্ষণতার সহিত নির্ব্বাচিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রবন্ধের বিষয়বোধক বিস্তৃত সূচী, প্রবন্ধের সঙ্গে পাশে পাশে বর্ণনার বিষয়নির্দ্দেশ, মুখবন্ধ, প্রবন্ধরচয়িতা ও প্রবন্ধবিষয়ের ছবি এবং তিনটি পরিশিষ্টে বাক্যের বিবৃতি, দুরূহ শব্দাদির ইংরেজি প্রতিশব্দ, গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর নাম, আদর্শ প্রশ্ন ইত্যাদি দেওয়াতে বইখানি ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও আয়ত্ত করিবার সুবিধা হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংগ্রহ পুস্তক বাংলায় খুব অল্পই আছে। ইহা সকল বিদ্যালয়েই পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত; কারণ তাহা হইলে ছাত্রেরা অল্প বয়স হইতেই বঙ্গসাহিত্যধুরন্ধরদের আদর্শ classic রচনার সহিত পরিচিত হইয়া সময়ের গতির সঙ্গে বঙ্গসাহিত্য কিরূপে গঠিত হইয়া কোন্ পথে চলিয়াছে তাহার পরিচয় পাইবে, এবং তাহাতে করিয়া তাহাদের নিজেদের মনে সাহিত্য-রসবোধের সঞ্চার হইবে ও সাহিত্যে অনুরাগ ও প্রীতি জন্মিবে; বঙ্গভাষার প্রধান লেখকদের ধারা ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর নামের সহিত পরিচয় ঘটিবে এবং জিজ্ঞাসা জন্মিলে সেই-সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পড়িবার আগ্রহ জন্মিবে। শিবরতন বাবু নির্ব্বাচনে যথেষ্ট রসগ্রাহিতা ও বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়াছেন। এ পুস্তকের যে সমাদর হইবে তাহা এক মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার আবশ্যকতা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

কন্যাদায় ও বরপণ হইতে উদ্ধারের উপায়—শ্রীঅঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৩৯ ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, শিবপুর। মূল্য দুই আনা।

এই পুস্তিকায় কন্যাদায়ে বিব্রত পিতা হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে-সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাই সর্ব্ববিধ লোকের ও সমাজের জ্ঞাতার্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মনু পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাকার ও রঘুনন্দন শিরোমণি প্রভৃতি ব্যবস্থাদাতা কন্যাবিবাহ সম্বন্ধে কি আদেশ করিয়াছেন, জবরদস্তি পীড়ন করিয়া বরপণ গ্রহণ বা চক্ষুলজ্জা এড়াইবার জন্য বরের পিতা নির্লোভ সাজিয়া কেবলমাত্র বাড়ীর ভিতরকার অবুঝ একটি স্ত্রীবের অনুরোধে পণ লইতেছেন বলিয়া ভান করিলে কি পাপ হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সৎপাত্র ও নির্লোভ কুটুম্ব না পাইলে কন্যার বিবাহ দিব না,—কন্যা আমরণ

অনূঢ়া থাকিলেও না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা ও মনের জোর করিতে না পারিলে এই সামাজিক ব্যাধি দূর করা দুঃসাধ্য ইহাই লেখকের ন্যায় সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিমত।

আমাদের হিন্দুসমাজের এই ব্যাধি দূর করিতে হইলে কেবল মাত্র কন্যার বিবাহ না দিলেই প্রতিকার সম্পূর্ণ হইবে না। এ-সম্বন্ধে প্রবাসীতে বারবার লেখা হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে মোটা বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি—(১) কন্যাকে আমরণ অনূঢ়া রাখিবার উপযুক্ত করিবার জন্য তাহাকে লেখাপড়া শিল্প গৃহকর্ম্ম শিখাইতে হইবে; (২) পুত্র পিতার সমস্ত বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, কন্যা যেন কেহই নয়; উভয়ের পিতৃধনে সমান অধিকার বর্ত্তাইবার মতন আইন করাইতে হইবে।

এই ব্যাধি চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশে একটি অভিনব অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, লেখক তাহার সংবাদ ও বিবরণ দিয়া তাহারও সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন এইরূপ—

"বীরভূম জেলায় মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ৫ ক্রোশ দূরে তুড়িগ্রাম নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে শ্রীরাজচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় একজন সদাশয় ও বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁহার উদ্যোগে ১২৮৭ সালে জনকতক লোক একত্রিত হইয়া অপাত্রে কন্যাদান ও অন্যায় অর্থগ্রহণাদি রহিত করণ মানসে "জ্ঞানানন্দী" নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী নিম্নে দেওয়া গেল:—

(১) পাল্‌টীস্থ ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ পরস্পর কন্যা আদান ও প্রদান করিবেন।

(২) পাল্‌টী মধ্যস্থিত ব্যক্তিগণের পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ। যদি প্রথমা ভার্য্যা হইতে বংশরক্ষা না হয়, কি তিনি বিশেষ রুগ্না হন কিম্বা তিনি শিশুপুত্রাদি রাখিয়া পরলোক গমন করেন তাহা হইলে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবেন। কিন্তু সকল স্ত্রীকে সমানভাবে ধর্ম্মতঃ প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৩) কেহ পাল্‌টীর বাহিরে বিবাহ করিতে পারিবেন না।

(৪) ঈশ্বর না করুন যদি পাল্‌টীর মধ্যে কোন পাত্র অন্ধ, খঞ্জ কি বিকলাঙ্গ হন, তাহা হইলে এরূপ পাত্রকে বিবাহ দিতে কেহ বাধ্য নহেন। যদি কেহ দেন, উত্তম।

(৫) কোন কন্যা উক্তরূপ রোগযুক্তা হইলে যদি তদ্রূপ পাত্রের অভাব হয়, তবে সেই কন্যার ধর্ম্মরক্ষার্থে কন্যাকর্ত্তার অভিমত বিবাহিত পাত্রকে বিবাহ মাত্র করিতে হইবে। কন্যার ভরণপোষণের ভার কন্যাদাতার উপরেই থাকিবে।

(৬) কোন সময়ে পাল্‌টী মধ্যে পাত্রাভাব ঘটিলে পাল্‌টী মধ্যস্থিত কন্যাকর্ত্তার অভিমত উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে হইবে এবং উভয় স্ত্রীকে সমভাবে প্রতিপালনও করিতে হইবে।

(৭) পাল্‌টী মধ্যে কন্যার অভাব হইলে শ্রোত্রীয় লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির কন্যাগ্রহণ করিতে পারেন।

(৮) পাল্‌টী মধ্যস্থিত কোন ব্যক্তি শূদ্রের যাজকতা প্রভৃতি অব্রাহ্মণের কার্য্য করিলে তিনি একেবারে কুলচ্যুত হইবেন।

(৯) বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা পরস্পর পরস্পরের নিকট উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(১০) বিবাহ-সময়ে কন্যাকর্ত্তা সাধ্য অনুসারে যাহা প্রদান করিবেন তাহাই পাত্রকর্ত্তা ও পাত্রকে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে।

(১১) শুভ বিবাহের পর অর্থাৎ কুশণ্ডিকাকালে পাত্রকর্ত্তা কি পাত্র, কন্যাকে বস্ত্র অলঙ্কারাদি সাধ্যমত যাহা দিবেন, তাহাই কন্যাকে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে।

শুভবিবাহ সময়ে পাত্রকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার দেয়

কন্যাকর্ত্তার দেয়	পাত্রকর্ত্তার দেয়
৺কুলদায়িনীর প্রণামী—১৲	৺কুলদায়িনীর প্রণামী—১৲
পাত্র দক্ষিণা—১৲	পুরোহিত দক্ষিণা—১৲
পুরোহিত দক্ষিণা—২৲	গুরুপ্রণামী—১৲
নরসুন্দর বিদায়—১৲	নরসুন্দর বিদায়—।০
বরযাত্রিগণের ভোজন—দক্ষিণা—২৲	শয্যাতোলানী—২৲
কুলপালকের পুরস্কার নগদ—৪৲	গ্রাম্যবৃত্তি
কন্যার সবস্ত্রখানিও কুলপালকের প্রাপ্য	ধাত্রীর বস্ত্র ১ খান,
পাত্র আশীর্ব্বাদী—২৲	কোটালের বস্ত্র ১ খান
	এগেনীর বস্ত্র ১ খান
	বা নগদ—২৲
	কুলপালকের পুরস্কার নগদ—৪৲
	বস্ত্রজোড় কন্যাআশীর্ব্বাদ—২৲
	কন্যাপক্ষের গৃহ হইতে পাত্রপক্ষের গৃহে লগ্নপত্র ১ জোড়া বস্ত্র বা নগদ ২৲ নরসুন্দরকে দিতে হইবে।

এই সম্প্রদায়ে আজ পর্য্যন্ত ৩৯টি ঘর যোগদান করিয়াছেন ও প্রায় ২৬ বৎসর ইহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে।

যিনি ইচ্ছা করেন তিনি এই জ্ঞানানন্দী সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া অনায়াসে সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। তবে ৬ষ্ঠ নিয়মের দুই বিবাহের কথা সকলের ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু অন্য বিষয়ে বাঁধাবাঁধির ভিতর না গিয়া আমরা সকলে কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়মানুসারে দলবদ্ধ হইতে পারি।

(১) বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রকর্ত্তা কি কন্যাকর্ত্তা পরস্পরের নিকট উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) বরকর্ত্তাকে বরের ন্যায্য পাথেয় ভিন্ন অপর বাবদে কোন অর্থ কন্যাপক্ষ দিবেন না।

(৩) বিবাহ-সময়ে কন্যাকর্ত্তা বরকন্যাকে নিজের সাধ্যমত যা কিছু বস্ত্রালঙ্কারাদি দিবেন, তাহাতে বরকর্ত্তার কোন কথা থাকিবে না।

(৪) কুশণ্ডিকা-কালে পাত্রকর্ত্তা কি পাত্র কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি সাধ্যমত যাহা দিবেন, তাহাই কন্যাকে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) উপরি উক্ত নিয়ম পালন করিতে গিয়া যদি কেহ নির্দ্দিষ্টকালের পূর্ব্বে কন্যাকে পাত্রস্থ না করিতে পারেন তাহাতে তাঁহার কোন দোষ স্পর্শিবে না ও ঐরূপ কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

যদি গ্রামে গ্রামে ৫।৭ জন লোকও এরূপ নিয়মে দলবদ্ধ হন তাহা হইলে পণাকাঙ্ক্ষী বরকর্ত্তাগণ ফাঁফরে পড়িবেন। আর দল হউক বা না হউক, যে যার নিজে নিজে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক উক্ত নিয়ম পালন করিলেই সমাজের রোগ দূরীভূত হইবে।"

মুদ্রারাক্ষস।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩২৩

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাহিত্যে বিপ্লব।

সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও জাতীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহা অতীত ও বর্ত্তমান কালের মানুষের বাহিরের ও ভিতরের জীবনের কতকটা ছবি, কতকটা সমালোচনা, কতকটা ঐ জীবন ভবিষ্যতে কিরূপ হইতে পারে তাহার আভাস ও তাহার দিকে মানুষকে প্রেরণ করিবার শক্তির আধার। বাহিরের আবেষ্টন যেমন এক-একজন মানুষের চিন্তা ও ভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার আন্তরিক জীবনকে পরিবর্ত্তিত করে, তেমনি এক-একটা শ্রেণী, সম্প্রদায়, সমাজ ও জাতির ভাব ও চিন্তাকেও পরিবর্ত্তিত করে। আবার এক-একজন মানুষের এবং শ্রেণী সম্প্রদায় সমাজ ও জাতির ভাব ও চিন্তার এবং আভ্যন্তরীন আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহাদের আবেষ্টনও পরিবর্ত্তিত হয় এবং বাহ্য জীবন আর পূর্ব্বের মত থাকে না। এই-প্রকারে আমাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীন জীবনে চিরকাল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ভাষা এবং সাহিত্যেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। আগে আমাদের সাহিত্যে অন্তরের ও বাহিরের যে-সব জিনিষ থাকিত, এখন তাহা হইতে স্বতন্ত্র অনেক জিনিষ তাহাতে নিবদ্ধ হইতেছে, সুতরাং ভাষাও তদনুসারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আগে আমাদের চিন্তা ভাব আদর্শ যাহা ছিল, এখন কেবল যে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা নয়, বিস্তর নূতন ভাব চিন্তা আদর্শ আমাদের মধ্যে আসিয়াছে; সুতরাং সেই-সকলকে প্রকাশিত করিবার জন্য ভাষার শব্দসম্পদ বাড়াইতে হইয়াছে, এবং সাহিত্যেরও আকার প্রকার বদলাইয়াছে। কতকগুলি লোক যদি সারাটা জীবন নিজেদের গ্রামে থাকিয়াই কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের ভাষা সেই গ্রাম্য জীবনের ঘটনা ভাব চিন্তা আদর্শ ব্যক্ত করিবার মত হইলেই চলে। কিন্তু যদি সেই গ্রামের মাঝখান দিয়া কেবল একটা রেলের লাইন চালান যায়, তাহা হইলে শুধু সেই-একটা পরিবর্ত্তনেই তাহাদের জীবনে নানা পরিবর্ত্তন ঘটে, নূতন নূতন মানুষের চলাচল হয়, তাহাদের মানসিক দৃষ্টি ও কল্পনা গ্রামের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। তখন নূতন নূতন শব্দেরও আমদানী সেই গ্রামে হইতে থাকে।

এই-জাতীয়, কিন্তু বৃহত্তর, একটা পরিবর্ত্তন সকল-দেশেই মধ্যে মধ্যে ঘটে। আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই রকম একটা বিপ্লব ইউরোপের নানাজাতির মনোরাজ্যে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের সাহিত্য পরিবর্ত্তিত, প্রসারিত ও শক্তিশালী হইয়াছিল। আমাদের দেশটি ঠিক একটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা গ্রামের মত কখনই ছিল না বটে, সকল সময়েই

বাণিজ্য, লুণ্ঠন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিদেশী জাতি এখানে আসিয়াছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিসকলের এদেশে আসিবার পর, এবং তন্মধ্যে ইংরেজের এদেশে প্রতিষ্ঠার পর, যেমন বহুদূর দেশ ও দূরবর্ত্তী জাতিদের সঙ্গে নানাভাবে আমাদের প্রতিবেশিতা, প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ, পরিচয় ঘটিয়া আসিতেছে, আগে এমন হয় নাই। আগে ভারতে যে-সব বিদেশী আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহারা প্রধানতঃ এশিয়ার মানুষ। এশিয়ার জাতিদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। এই-সব প্রাচ্য বিদেশীদের আগমনেও ভারতবর্ষের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে আমাদের জীবনের মূলে ঘা পড়িয়াছে। আর-এক দিক্ দিয়াও ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। ভারতবর্ষের মানুষকে হিন্দু জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি যে-সব ধর্ম্ম গড়িয়াছে, সেগুলির পার্থক্য সত্ত্বেও একটি মৌলিক ঐক্য আছে; এমন কি পরে যে মুসলমান ধর্ম্ম আসিয়া দেশকে বিপর্য্যস্ত করে, কয়েকটি খাদ্যাখাদ্য বিচার এবং বাহিরের ক্রিয়াকলাপ বাদ দিলে, তাহার সহিতও ভারতবর্ষের ধর্ম্মসকলের খুব সাদৃশ্য আছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করে, এবং প্রথম-প্রথম ইহার সঙ্গে অন্যান্য প্রাচ্য ধর্ম্মের খুব সাদৃশ্য ছিল, এখনও ইহার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় অনেকটা প্রাচ্যভাবাপন্ন। কিন্তু আধুনিক খৃষ্টধর্ম্ম প্রাচ্যধর্ম্মসমূহ হইতে অনেকটা পৃথক্। পুরাকালে প্রাচ্য জাতি ও পাশ্চাত্য জাতি সকলের প্রকৃতি যাই থাক্, তাহাদের মধ্যে এখন একটা প্রধান প্রভেদ এই দেখা যায় যে প্রাচ্যেরা পরলোকমুখী, পাশ্চাত্যেরা ইহলোকমুখী; ধর্ম্মমত ও তদনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়ে প্রাচ্যদের জীবন নিয়মিত; পাশ্চাত্যদের জীবনের উপর ধর্ম্মমত ও তদনুযায়ী ক্রিয়াকলাপের প্রভাব খুব কমিয়া আসিয়াছে। এমন কি, তাহাদের ধর্ম্মের উপরও পারলৌকিকতা অপেক্ষা ইহলৌকিকতার প্রভাব বেশী লক্ষিত হইতেছে।

এখন আমাদের জগৎ শুধু আমাদের গ্রামটি নয়, শুধু বাংলা নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, এশিয়া নয়; এখন পৃথিবীর জ্ঞাত সব দেশের কথা বালকবালিকারাও ভূগোল-ইতিহাসে পড়িতেছে, তথাকার অদ্ভুত নানা রকমের প্রাণী আলিপুরের জীবনিবাসে দেখিতেছে। সুমেরু ও কুমেরুর নিকটবর্ত্তী পৃথিবীর অজ্ঞাত কোন স্থান আবিষ্কৃত হইবামাত্র তাহার খবর এক পয়সার বাংলা দৈনিক কাগজে লোকে পড়িতেছে, এবং চারি আনা খরচ করিয়া তথাকার ছবি বায়োস্কোপে দেখিতেছে। প্রাচ্য প্রাচীন পারত্রিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য নবীন ঐহিকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছে। সামাজিক প্রথা রীতিনীতি পরিবারের গঠন এখন ঠিক মনুস্মৃতির ব্যবস্থা-মত কিম্বা কোরান শরীফের অনুযায়ী থাকিতে পারিতেছে না; লোকে জানিতেছে দেখিতেছে যে অন্য প্রকারের প্রথা রীতিনীতি আদর্শও আছে এবং তাহাতেও মানুষের জীবনযাপন অসম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে আধুনিক কালে একনায়কত্বের চেয়ে সভ্যদেশসকলে গণতন্ত্রেরই যে প্রাধান্য ঘটিতেছে, তাহাও আমাদের বালকবালিকারা পর্য্যন্ত পুস্তকে মাসিকপত্রে খবরের কাগজে পড়িতেছে।

মানুষের মনের মধ্যে এত নূতন জিনিষ আসিয়া পড়িলে ভাব চিন্তা ও আদর্শের, রীতিনীতি ও প্রথার, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার, পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্যেও যে পরিবর্ত্তন আসিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরিবর্ত্তন কখন-কখন ধীরে ধীরে হয়, কখন-কখন বা উহা বিপ্লবের আকার ধারণ করে। বিপ্লবের কুফল আছে; কিন্তু সুফল নাই, এমন মনে করা মহাভ্রম। ইতিহাস যিনি পড়িয়াছেন, তিনি এমন কথা কখনই বলিতে পারিবেন না।

সাহিত্যক্ষেত্রে বা ধর্ম্মজগতে বা অন্য কোন বিষয়ে যে-সব বিপ্লব ঘটে, তাহা বর্ষাকালের নদীর প্রবল বন্যার মত। কূল ছাপাইয়া বন্যার জল মাঠে পথে লোকালয়ে ঢুকিলে ঘরবাড়ীগ্রাম নষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু বহুকালের সঞ্চিত ময়লা আবর্জ্জনাও পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে, এবং ক্ষেতে পলি পড়িয়া মাটীতে নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চারও হইতে পারে। এরূপ হইয়াও থাকে। নদীর বন্যার মত দৈব ব্যাপারকে মানুষের শক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিতে এখনও কোন জাতি পারে নাই; আমেরিকায় এঞ্জিনীয়ারিঙের খুব উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও এখনও বন্যায়

প্রচুর ক্ষতি হয়। কিন্তু ছোটখাট বন্যাকে আয়ত্তাধীন করিয়া কাজে লাগাইতে অনেক দেশের লোক সমর্থ হইয়াছে। বাঁধ বাঁদিয়া খাল কাটিয়া উহার ধ্বংসশক্তিতে বাধা দিয়া—কেবল হিতকরী শক্তিটির সাহায্যে উপকার লাভ করিতে তাঁহারা পারিয়াছেন।

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতেছেন যে বাংলা-সাহিত্যে বিপ্লবের বন্যা আসিয়াছে আসিতেছে। নদীগর্ভে দাঁড়াইয়া উভয়তীরের প্রাচীর উত্তোলন করিয়া, কিম্বা ব্যাকরণ অলঙ্কার শাস্ত্রের বাঁধ বাঁধিয়া. এই বন্যা আটকাইতে যাওা সুবুদ্ধির কাজ কি না, সহজেই বুঝা যায়। যতটা সম্ভব, বন্যার জলকে সুপথে সুক্ষেত্রে চালাইয়া কাজে লাগান ভাল। প্রতিভাশালী যাঁহারা তাঁহারা এই কাজ করিতেছেন।

ভাষায় ও সাহিত্যে বিদ্রোহিতা।

প্রতিভা নূতন কিছু বলে, নূতন কিছু করে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় বর্ণিত প্রবৃত্তিবশে নূতন কিছু করিবার জন্যই নূতন করে না। প্রতিভা বিদ্রোহী, কারণ সে নিজের আত্মার নিয়ম ছাড়া অন্য নিয়ম মানিতে পারে না। মানিলে তাহার চলে না; তাহা হইলে তাহার শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না, তাহার যে কাজ তাহা হয় না। প্রতিভা ভাঙে বটে, কিন্তু গড়াটাই তাহার প্রধান কাজ। কি গড়িয়াছে, তাহাই দেখ। যাহা জীর্ণ, যাহা ভাঙিয়া যাইবেই, তাহার জন্য দুঃখ কেন? ভাঙাটাও যে সব সময়ই একটা অকাজ তাহা নয়। না ভাঙিয়া অনেক সময় গড়া যায় না। জীর্ণ অট্টালিকা ভাঙিয়া ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া সব আবর্জ্জনা ফেলিয়া না দিলে, তার জায়গায় সুশোভন প্রাসাদ নূতন করিয়া গড়া যায় না। অনেক সময় এক-একটা পল্লী এমন ময়লা ও রোগপরিপূর্ণ হয় যে পুড়াইয়া দিলে তবে তার শোধন হয়। সুতরাং যাহারা কুলিমজুরদের মত কেবল ভাঙে, স্থপতির মত গড়িতে পারে না, তারাও অকেজো নয়, নিছক নিন্দার পাত্র নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে কখন কখন, প্রতিভা না থাকিলেও, কেবল বাজে নিয়মের দাসত্ব ভাঙিবার জন্যই বিদ্রোহিতা দরকার হয়। প্রবাসীতে আমরা একাজ মাঝে মাঝে করিয়া থাকি। বানান সম্বন্ধে আলোচনা এই জন্য করিয়াছি। বানানের নিয়মগুলা, প্রাকৃতিক যে নিয়মে আগুনের ধর্ম্ম দহন, তেমন কিছু শাশ্বত নিয়ম নয়। ওগুলার পরিবর্ত্তন বরাবর হইয়া আসিতেছে। আরও হইবে।

বানান শিক্ষা।

একজন গ্রাহক কিছুদিন হইল আমাদিগকে এই বলিয়া পত্র লেখেন যে, তাঁহার অভিভাবকের মতে, প্রবাসী পড়িলে কোন কোন কথার বানানে ভুল হইতে পারে এবং তাহাতে পরীক্ষায় নম্বর কাটা যাইবে; অতএব তিনি আর গ্রাহক থাকিতে পারিবেন না। আরও অনেক বর্ণপরিচয়ের বহির মত প্রবাসী-সম্পাদকের লেখা দুখানা বর্ণপরিচয়ের বহি আছে। প্রচলিত বানান শিক্ষা তাহাতেই হইতে পারে। বানান-শিক্ষা দেওা প্রবাসীর উদ্দেশ্য নয়।

আমরা কালিদাস শেক্‌স্‌পিয়র ত নহি-ই, একটুও সাহিত্যিক প্রতিভা বা শক্তির দাবী রাখি না; সোজাসুজি খবরের কাগজ লিখিয়া খাই। তাই কেবল কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ছেলেরা বি-এ এম্-এ ক্লাসে উঠিয়া কিছু-কিছু পুরাতন ইংরেজী বহি পড়িতে আরম্ভ করে। তা ছাড়া, কথিত-ইংরেজীতে লেখা কথোপকথনে পূর্ণ উপন্যাসও দু-একখানা তাহাদিগকে পড়িতে হয়। তাহাতে অনেক ইংরেজী শব্দের বানান অভিধান-লিখিত বানান হইতে স্বতন্ত্র দেখা যায়। কিন্তু কোন অভিভাবক কি ছেলেকে বলেন, "চসার বা মার্লো পড়িও না, ডিকেন্স্ পড়িও না, বানান ভুলিয়া যাইবে?" মাসিক কাগজে বানান-পরিবর্ত্তনের আলোচনা পড়িয়া যাঁহাদের বর্ণাশুদ্ধি ঘটিতে পারে, তাঁহাদের এখনও মুক্ত বিচারক্ষেত্রে বিচরণের মত বয়স ও বুদ্ধি হয় নাই। তাঁহারা এখনও নাবালক আছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের নূতন সভাপতি।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর এরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিবেন না। কারণ তাঁহার অবসর নিতান্ত কম, এবং নির্ব্বাচনের সময় তিনি কিছু অসুস্থও ছিলেন। এই জন্য অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সুখের বিষয় তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ

করিয়াছেন। তিনি এই কার্য্যে বেশী সময় দিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু যাহা দিবেন তাহাতেই পরিষদের প্রভূত উপকার হইবে। তিনি কি ভাবে কাজ করিতে চান, তাহার কিছু আভাস নিম্নমুদ্রিত পত্রখানি হইতে পাওা যাইবে। পত্রখানি বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের সমুদয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে পাঠান হইয়াছে।

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে যখন আপনারা আমাকে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিত্বে নিয়োগ করিয়াছিলেন, আমি নিবেদন করিয়াছিলাম, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই; এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব সাহিত্য-পরিষৎ সাধকের সম্মুখে দেবমন্দিররূপে বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাংলাদেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবন-স্তর দিয়া রচিত হইতেছে।

আমাদের দেশের লুপ্ত গরিমা যে পুনরায় একদিন প্রকাশ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে তাহার অন্যতম প্রমাণ বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন সাহিত্য-পরিষৎ ও শাখাসমূহের উৎপত্তি। এই-সকল পরিষদকে আমি কখন বিভিন্নরূপে বা শাখাভাবে দেখি নাই। সহযোগী ও সহকর্ম্মী বলিয়া চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি। আমার বিশ্বাস দেশময় যে-সমস্ত শক্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে সেই-সকল শক্তিকে একত্রীভূত করিয়া আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে তাহার সংহার করিতে না পারিলে সাধনার পথে আমরা কখনই অগ্রসর হইতে পারিব না। প্রতি অঙ্গ সচল ও সবল হইয়া যদি পরস্পরের সাহায্য না করে তাহা হইলে দেহের পূর্ণ পরিপুষ্টি কখনই সম্ভবপর হয় না।

সাহিত্য-সেবাই সকল পরিষদের উদ্দেশ্য; তাহার শ্রীবৃদ্ধি সকলেরই লক্ষ্য। আমাদের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা সমবেত করিয়া সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে হইলে মিলিত হইয়া আমাদের এমন একএকটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত পরিষদগুলি সমভাবে গৌরব বোধ করিতে পারে। তৎপরিকল্পে মিলিতভাবে কার্য্য করিয়া মিলিতনামে সাহিত্যসম্বন্ধীয় নূতন নূতন তথ্য আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রতি বৎসর আপনাদের কয়েকজন প্রতিনিধি যদি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং আমাদের কয়েকজন প্রতিনিধি যদি আপনাদের নিকট যাইয়া ভাবের আদান প্রদান করিবার অবসর পান তাহা হইলে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক দিন দিন ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিবে। আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির আরও বিস্তৃত প্রচার যদি বাঞ্ছনীয় মনে করেন তবে তাহার সারাংশ প্রেরণ করিলে আমরা আনন্দের সহিত আমাদের পত্রিকায় আপনাদের নামে প্রকাশ করিব। পক্ষান্তরে আপনারাও আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন।

পরিষদের উন্নতিকল্পে আপনাদের অভিমত মধ্যে মধ্যে জানিতে পারিলে সুখী হইব।

আমি যে-সমস্ত সঙ্কল্প লইয়া এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছি সাধ্যানুসারে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব; কিন্তু তাহার সাফল্য আপনাদের শুভ কামনার উপর নির্ভর করিবে। ইতি।

বশংবদ

সভাপতি।

বঙ্গসাহিত্যপ্রেমী সকলে এই পত্রে ব্যক্ত সভাপতি মহাশয়ের আন্তরিক আগ্রহের আনুকূল্য করিলে পরিষদ নিশ্চয়ই সাহিত্যের সেবা ভাল করিয়া করিতে পারিবেন। বসু মহাশয় পরিষদগৃহে পাঠার্থীদের, এবং পরিষদের সংগৃহীত পুস্তকাদির সাহায্যে অনুসন্ধিৎসুদিগের, সুবিধার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যাঁহারা ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে সত্যমূলক মূল্যবান্ গবেষণা করিবেন, তাঁহাদিগকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করিবার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে কিছু বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিতে তিনি ইচ্ছুক। আরও যাহা যাহা করিতে চান, তজ্জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। পরিষদের প্রকাশিত সমুদয়গ্রন্থ একসঙ্গে যাহাতে সভ্যগণ ও অপরে খুব সস্তা দামে পাইতে পারেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন। তাহা হইলে পুস্তকগুলিরও বহুল প্রচার হইবে, এবং পরিষদেরও অর্থাগম হইবে। আয়বৃদ্ধির অন্যান্য উপায়ও অবলম্বিত হইবে।

জাত্যভিমান।

প্রবল দেশের প্রবল জাতির লোকেরা প্রবল আঘাত সহ্য করিতে অভ্যস্ত। দুর্ব্বল জাতির লোকেরা কাল্পনিক সামান্য আঘাতের চোটেই ছেঁচকাঁদুন্তে হইয়া পড়ে। আমাদের কথায় কথায় ধর্ম্মে আঘাত, সমাজে আঘাত, জা'তে আঘাত, কত-কি-তে আঘাত লাগে। কিন্তু ভগবানের সৃষ্টিতে যেটা যত দরকারী ও সারবান জিনিষ সেটা তত আঘাতসহ। আমাদের ধর্ম্ম সমাজ জা'ত টিকিবার মত হইলে, কথায় কথায় আঘাত কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই।

আজকাল অনেকেই জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে কথা বলেন; কিন্তু মন হইতে তাহা উৎপাটন করিবার চেষ্টা করা দূরে থাক্, বাহ্য আচরণেও জাত্যহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিয়া চলেন। আর একটা কৌতুকজনক ব্যাপার এই যে অনেকেই "নিজে" ছোট থাকিতে চান না বা "ছোটত্বে"র অপবাদ সহিতে পারেন না; কিন্তু যাহাদিগকে আপনাদের চেয়ে ছোট মনে করেন তাহাদিগকে আপনাদের সমান হইতে দিতে রাজী নহেন!

একজন ব্রাহ্ম একবার কোন শহরে গিয়া কতকগুলি লোকের সঙ্গে জা'ত সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলেন। ব্রাহ্মটি ব্রাহ্মণবংশীয়, এবং ঐ লোকগুলি হিন্দুরীতি অনুসারে নিম্নশ্রেণীস্থ। ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি যে তাঁহাদের সহিত আহার করেন বা করিতে প্রস্তুত, তাহাতে ঐ লোকগুলি বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তিনি যখন কোন "নিম্নতর" শ্রেণীর লোকদের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা তাঁদের সঙ্গে খাইতে পারেন?" তখন তাঁহারা বলিলেন, "আজ্ঞে, তা কি হয়?"

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।

মানুষের জীবনের ভিন্নভিন্ন বয়সে ভিন্নভিন্ন রকম শিক্ষা, কাজ ও আচরণের ব্যবস্থা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে হিতকর হইয়াছিল। কিন্তু উহা অপরিবর্ত্তনীয় নহে; অবস্থা অনুসারে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

আজকাল দেখিতেছি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিষয়ে অনেকে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা ও দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সত্যত্রেতাদ্বাপরে কেমন ছিল জানি না; বর্ত্তমান কলিকালেও হয় ত আছে। কিন্তু উহাতে বর্ণ নাই, আশ্রম নাই, এবং ধর্ম্ম নাই। বর্ণ মানে যদি গায়ের রং বুঝা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে, ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল বর্ণের মধ্যেই গৌর গোলাপী শাদা হইতে আরম্ভ করিয়া মীস্ কাল পর্য্যন্ত সব রঙের মানুষ রহিয়াছে। যদি শাস্ত্রোক্ত "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" জাতিচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছে মনে করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, যে, ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল জাতির লোকেই সকল জাতির কৌলিক কাজ করিতেছে; কেহই সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ কেবলমাত্র নিজের কৌলিক কাজে ব্যাপৃত নহে। সত্ত্বরজতমোগুণ সব জাতির মধ্যেই দেখিতেছি। তাহার পর ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির আশ্রম-অনুযায়ী কার্য্য ত কোন জাতিকেই করিতে দেখিতেছি না। বর্ণ গেল, আশ্রম গেল, বাকী থাকে ধর্ম্ম। কোন কোন ইতর প্রাণীর স্পর্শ অপেক্ষাও কোন কোন জাতের মানুষের স্পর্শ অশুচি, বলিয়া যে ব্যবস্থা শিক্ষা দেয়, তাহা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বটে কি না, তাহা বর্ণাশ্রমধর্ম্মীরা বলিতে পারিবেন, কিন্তু সোজা বুদ্ধিতে তাহাকে অতিবড় অধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সেই প্রসিদ্ধ ধূমপানযন্ত্রটির মত যাহা ঠিক্ পূর্ব্ববৎ আছে, কেবল খোল নলিচা ও কলিকাটি বদলিয়া গিয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ।

হেমেন্দ্রমোহন বসু।

পরলোকগত হেমেন্দ্রমোহন বসু বঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় চালাইয়া দেশের কতক টাকা দেশে রাখিবার পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন। বাংলা ছাপাখানা হইতে পরিষ্কার ছাপা যাহাতে হয়, তদ্রূপ চেষ্টা ও আয়োজন করিয়া তিনি বাঙালীদের ছাপাখানাগুলির উন্নতির অন্যতম কারণ হইয়াছিলেন। বাইসিকেল, ফোনোগ্রাফের রেকর্ড গ্রহণ, মোটর-কার প্রভৃতির ব্যবসা, তিনিই বাঙালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি যে এসব বিষয়ে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন, তাহা নিশ্চিত। তিনি বুদ্ধিমান্, দানশীল, দয়ালু, সৎকর্ম্মানুরাগী, স্বদেশপ্রেমিক লোক ছিলেন। স্বদেশী মেলার জন্য তিনি খুব পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার বেশ সামাজিকতা ছিল। তিনি বেশ "খোলাপ্রাণের" লোক ছিলেন। চটিয়া গেলে কর্ম্মচারীদিগকে খুব হয়ত বকিয়া দিতেন, কিন্তু কখনও কাহারও অন্ন মারিতে চাহিতেন না।

বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের জিজ্ঞাসুবৃত্তি।

প্রবাসীতে পূর্ব্বে এইরূপ লেখা হইয়াছে যে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় আমরা যে গৌরব বোধ করি, তাহা শুধু মুখের কথায় বা ছাপার অক্ষরে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। তাঁহার নিকট বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্য্যে শিক্ষা লাভ করিয়া অন্ততঃ কয়েকজন যুবক যাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা সমগ্র জাতির করা উচিত। সুখের বিষয়, বসু মহাশয় স্বোপার্জ্জিত অর্থে বিজ্ঞানমন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে ত জাতির কর্ত্তব্য করা হইল না। জাতীয় কর্ত্তব্যসাধনেরও চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বিজ্ঞানে অগ্রসর কতকগুলি ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া একাগ্রভাবে গবেষণা শিক্ষা করিবার সুযোগ দিবার জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

আবেদনপত্রে মাননীয় বিচারপতি শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, সার্ সৈয়দ আলী ইমাম্, সুসঙ্গের মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহশর্ম্মা, ডাক্তার সার্ কৈলাসচন্দ্র বসু, ও ডাক্তার শ্রীনীলরতন সরকার স্বাক্ষর করিয়াছেন।

যাঁহারা বাস্তবিক জিজ্ঞাসু, এরূপ ছাত্র টাকার জন্য শিখিতে আসিবেন না, শিক্ষার জন্যই আসিবেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যয়নির্ব্বাহের ব্যবস্থা জাতির পক্ষ হইতে করা কর্ত্তব্য।

এই জিজ্ঞাসুবৃত্তিভাণ্ডারে অর্থ প্রদান করা সকলেরই উচিত। অধ্যাপক বসু মহাশয়ের অনেক ছাত্র এখন মান্যগণ্য ও কৃতী হইয়াছেন। তাঁহারা সকলে অর্থ দান ও সংগ্রহ করিলে জাতীয় এই চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে।

আবেদনপত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল।

আবেদন

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা জগতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি বিজ্ঞানের নানা বিভাগে আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা কার্য্যতঃ দেখাইয়াছেন, যে, বিজ্ঞানের শাখা বহু হইলেও বিজ্ঞান এক। ভারতের প্রাচীন কবি ও ঋষিগণ অসাধারণ দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির বলে বিশ্বচরাচরের যে অন্তর্নিহিত ঐক্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, আচার্য্য বসু মহাশয় বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী-অনুসারে নিজের উদ্ভাবিত অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রসকলের সাহায্যে জড় উদ্ভিদ ও চেতনরাজ্যে সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; বস্তুতঃ তাঁহার গবেষণাদ্বারা দৃষ্ট পদার্থনিচয়ের মধ্যে বহু পার্থক্যরেখা লুপ্ত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে যেমন তাঁহার গবেষণা মানুষকে নূতন পথ দেখাইয়াছে, তদ্রূপ ফলিত বিজ্ঞানেও তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণ, কৃষির উন্নতিসাধন, চিকিৎসার উৎকর্ষবিধান, প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার গবেষণা ফলপ্রদ হইয়াছে বা হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা উপলব্ধি করিতেছেন।

বর্ত্তমানসময়ে যন্ত্রনির্ম্মাণকৌশলে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড অগ্রণী। কিন্তু তথা হইতেও বসু মহাশয়ের উদ্ভাবিত বিস্ময়কর যন্ত্রগুলির ফরমাইস্ আসিয়া থাকে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, কেবল চিন্তা-ও-ভাব-রাজ্যে নয়, যন্ত্র উদ্ভাবনে ও যন্ত্র নির্ম্মাণেও ভারতের প্রতিভা ও শিল্পনৈপুণ্য জগতের শ্রেষ্ঠজাতিদের সমান, এমনকি, তাঁহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠও হইতে পারে।

কেবল শিখিতে নয়, শিক্ষা দিতেও, কেবল অপরের সঞ্চিত জ্ঞানরত্ন আহরণ করিতে নয়, পরন্তু জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে নব-নব রত্নে অলঙ্কৃত করিতেও যে ভারতবাসীরা এখনও সমর্থ, বসু মহাশয় তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাতে জগৎসভায় ভারতের সম্মান কিরূপ বাড়িয়াছে, নবীন ভারতের আশা, সাহস, ও নিজের শক্তিতে বিশ্বাস কিরূপ সুদৃঢ় আশ্রয়ভূমি লাভ করিয়াছে, তাহা বলা অনাবশ্যক।

স্মরণাতীত যুগ হইতে ভারত একের সন্ধানে চলিয়া আসিতেছে। বিজ্ঞানের নানাবিভাগের মধ্যে ঐক্য এবং বিশ্বচরাচরের অন্তর্নিহিত ঐক্য দেখাইয়া বসু মহাশয় জ্ঞানরাজ্যে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব নবযুগের উপযোগী নূতন অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক আকারে জগদ্বাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতীয় জ্ঞানী-ও-জিজ্ঞাসুদের বংশ যে লুপ্ত হয় নাই তাহা, এই প্রকারে সপ্রমাণ হইয়াছে।

সুতরাং অনেক ভারতবাসীর প্রাণে স্বতই এই ইচ্ছার উদয় হইতেছে, যে, বসু মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে চলিবার লোক প্রস্তুত হউক, এবং তাঁহার সেই বৈজ্ঞানিক বংশধরদিগের দ্বারা তাঁহার প্রদর্শিত ভারতবর্ষের বিশেষত্ব রক্ষিত হউক।

উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রনির্ম্মাণালয়, পরীক্ষাগার ও শিক্ষামন্দির, এবং যোগ্য বিদ্যার্থী ব্যতীত ভারতবাসীর এই ইচ্ছা ফলবতী হইতে পারে না। বসু মহাশয় তাঁহার সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়া পরীক্ষাগার, শিক্ষামন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইতেছেন। তাঁহাকে পাঁচ বৎসর কাল গবেষণাকার্য্য চালাইতে সমর্থ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আর্থিক আনুকূল্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার প্রৌঢ় ও নবীন ছাত্রগণ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানানুরাগী দেশবাসীগণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় অগ্রসর ১২টি ছাত্রকে তাঁহার নিকটে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ন্যূনকল্পে মাসিক একশত টাকা বৃত্তি দিতে হইবে। এই বৃত্তিগুলি স্থাপন করিবার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা মূলধন সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। তাহারই জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট

এই আবেদন-পত্র উপস্থিত করা হইতেছে। জগতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য, ভারতের গৌরব রক্ষার্থ, চিন্তারাজ্যে ভারতের বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ভারতীয় জ্ঞানী-ও-জিজ্ঞাসুদের বংশধারা চিরপ্রবাহিত রাখিবার নিমিত্ত, সকলেই যথাসাধ্য অধিক পরিমাণে সাহায্য করুন, এই প্রার্থনা জনাইতেছি।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ,
শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, আলী ইমাম,
শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু, শ্রীনীলরতন সরকার।

অর্থাদি—কোষাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর,
নং ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট,
এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।
পত্রাদি সম্পাদকদ্বয়
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং
শ্রীযুক্ত বনওয়ারী লাল চৌধুরী
১২০ নং লোআর সারকুলার রোড,
এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

জন্মমৃত্যু।

১৯১৫ সালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জন্ম ও মৃত্যু কিরূপ হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। ১৯১৪ সালে বঙ্গে জন্মের হার হাজারকরা ৩৩৮৬ ছিল; ছয়টি প্রদেশের সংখ্যা ইহার উপর ছিল; সকলের চেয়ে বেশী (৫১'৩৭) ছিল মধ্যপ্রদেশে। ঐ সালে বঙ্গে মৃত্যুর হার হাজারকরা ছিল ৩১ ৫৭। এ বিষয়ে বাংলাদেশ চতুর্থস্থানীয় ছিল। মৃত্যুর হার সকলের চেয়ে বেশী (৩৬'৬৯) ছিল মধ্যপ্রদেশে, এবং সকলের চেয়ে কম (২৪'১৩) ছিল ব্রহ্মদেশে। যাহাই হউক ১৯১৪ সালে বাংলাদেশে জন্মের হার তবু মৃত্যুর হারের চেয়ে কিছু বেশী ছিল। কিন্তু ১৯১৫ সালে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী হইয়াছে। এই সালের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের হাজারকরা জন্ম, মৃত্যু ও শিশু-মৃত্যুর হার নীচের তালিকায় দিতেছি।

প্রদেশ	মৃত্যুর হার	জন্মের হার	শিশু-মৃত্যুর হার
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৩'৪৮	৩০'০৪	২০৫'১৪
বোম্বাই	৩৭'১০	২৬'১২	১৭২'০০
মাদ্রাজ	৩১.১৯	২১.৯৭	১৮৬.৫৩
বাংলা	৩১.৮০	৩২.৮৩	২১৮.৯৮
বিহার-ওড়িষা	৪০'৪৯	৩২.২৩	১৮৫.৯৩
আসাম	৩৩'৬০	৩০'৮৬	২৪১'৮৯
মধ্যপ্রদেশ	৪৭'৯৫	৩৫'৯১	২৫৯'৭২
পঞ্জাব	৪৩'৬০	৩৬'৩৩	১৮৮'৫৭
ব্রহ্ম	৩২'১৩	২৭'৯৯	২১৯'৩৫
উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত	৩১'৭৩	২৩'৬১	১৬৬'২৫
দিল্লী	৪৮'৩২	২৯'২২	২২০'৮৯

দিল্লীর জন্মের হার এবং পঞ্জাবের মৃত্যুর হার সর্ব্বোচ্চ। মাদ্রাজে জন্মমৃত্যু দুইই সর্ব্বনিম্ন। মৃত্যুর হার অপেক্ষা জন্মের হার যেখানে যত বেশী তাহাকে তত স্বাস্থ্যকর স্থান মনে করিলে দিল্লীই উচ্চতম স্থান অধিকার করে। কিন্তু ইহা একটা প্রদেশের মত বিস্তৃত নয়, এবং শহুরে জায়গার স্বাস্থ্যোন্নতি করাও সোজা। এইজন্য দিল্লীকে বাদ দিয়া, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশকেই ১৯১৫ সালে সকলের চেয়ে স্বাস্থ্যকর প্রদেশ বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশ ঐ সালে সকলের চেয়ে অস্বাস্থ্যকর ছিল; কারণ এখানে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক হইয়াছিল, যাহা অন্য কোন প্রদেশে হয় নাই। ইহাই জাতীয় বিনাশের পন্থা। বাংলা দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে অধিবাসীরা ও গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে এবং অন্য সকল বিষয়ের চেয়ে বেশী মন না দিলে দেশ উজাড় হইয়া যাইবে।

তুলনার সুবিধার জন্য ইউরোপের প্রধান প্রধান কয়েকটি দেশের জন্ম ও মৃত্যুর হার নীচে দিলাম।

দেশ	জন্মের হার	মৃত্যুর হার
বিলাত	২৩'৯	১৩'৮
অষ্ট্রিয়া	৩১'৩	২০'৫
বেলজিয়ম	২২'৬	১৪'৮
ডেন্মার্ক	২৬'৭	১৩'০
ফ্রান্স	১৯'০	১৭'৫
জার্ম্মেন সাম্রাজ্য	২৮'৩	১৫'৬
হল্যাণ্ড	২৮'১	১২'৬
হাঙ্গেরী	৩৬'৩	২৩'৩
ইটালী	৩২'৪	১৮'২
নরওে	২৫'৪	১৩'৪

দেশ	জন্মের হার	মৃত্যুর হার
রুমেনিয়া	৪৩'৪	২২'৯
সার্ভিয়া	৩৮'০	২১'১
স্পেন	৩২'৬	২১'৮
সুইডেন	২৩'৭	১৪'২

আমাদের দেশে শিশুদের মৃত্যুর হার বড় বেশী। কলিকাতার মত বড় শহরে ত কথাই নাই। এখানে ১৯১১, ১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪, ও ১৯১৫ সালে ক্রমান্বয়ে হাজারকরা ২৫১'৬, ২৫৯'৬, ২৭৪'৮, ২৮২'৭, এবং ২৮৭'৬টি শিশু মারা পড়িয়াছিল। শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, সামাজিক কুপ্রথা, ভাল দুধের অভাব, এইরূপ মৃত্যুর প্রধান কারণ। শহর-নির্ম্মাণ-কার্য্যে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গেডিস্ কলিকাতাকে মাতৃহন্তা শহর বলিয়াছেন। এখানে ১৫ ও ২০ বৎসর বয়সে নারীদের মধ্যে মৃত্যুর হার (হাজারকরা ২১) ঐ বয়সের পুরুষদের মৃত্যুর হারের প্রায় দ্বিগুণ। ইহার কারণ বাল্যমাতৃত্ব, পুনঃপুনঃ অকালমাতৃত্ব। যে বয়সে বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিয়া দেহের পূর্ণতা লাভ করিবে, সেই বয়সে পুনঃপুনঃ মাতৃত্ব ঘটিলে স্বাস্থ্যনাশ এবং বহুস্থলে মৃত্যু অনিবার্য্য। ইহার উপর আছে, অজ্ঞ ধাত্রী দ্বারা প্রসব, অপকৃষ্ট ও অস্বাস্থ্যকর সূতিকাগার, সূতিকাগারে ও সেখান হইতে বাহির হইয়া পুষ্টিকর পথ্যের অভাব, ভাল দুগ্ধের অভাব, ইত্যাদি। আমাদের ঘরবাড়ী এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে অন্তঃপুরিকারা বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের সুযোগ প্রায়ই পান না। অথচ পর্দ্দার প্রকোপ খুব বেশী বলিয়া তাঁহাদের বাহিরে বেড়াইবারও জো নাই।

কলিকাতায় সূতিকাগৃহের পীড়ায় প্রতি ৪০জনের মধ্যে ১ জন জননী মারা পড়েন। ইংলণ্ডে এইরূপ মৃত্যুর সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক কম।

বঙ্গের স্বাস্থ্য-কমিশনারের ১৯১৫ সালের রিপোর্টের উপর গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে ঐ বৎসর এত বেশী লোক মরিবার কারণ ওলাউঠা ও বসন্তের মহামারী, প্রতিকূল আর্থিক অবস্থা, এবং ঐ বৎসরে ও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের কৃষির দুরবস্থা; লোকসংখ্যার হ্রাস বঙ্গের সব জেলায় সমানভাবে হয় নাই, উহা প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগে আবদ্ধ ছিল; ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের লোকেরা বর্দ্ধনশীল ও তাহাদের অবস্থা সচ্ছল; তাহাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে।

ত্রিমিত্র ত্রিশত্রু।

যেমন জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে মিত্রতা ও শত্রুতা হয়, তেমনই সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ব্যাধি, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। এই ত্রিমিত্র আমাদের ত্রিশত্রু। ইহাদের একটি বা দুটিকে মারিলে হইবে না; তিনটিকেই ক্রমশঃ দুর্ব্বল করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে। তবে কেবল একটিকে হীনবল করিতে পারিলেও অনেক সুফল হয়; অন্য দুটিকে দুর্ব্বল করা যায়। শিক্ষা দ্বারা অজ্ঞতা কমাইতে পারিলে লোকের ব্যাধি কমিতে পারে; কারণ শিক্ষা মানুষকে স্বাস্থ্যরক্ষায় সমর্থ করে, ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে লোকে শিক্ষা করিতেও ভাল পারে, উপার্জ্জনও বেশী করিতে পারে। আবার দারিদ্র্য নষ্ট করিয়া অবস্থা সচ্ছল করিতে পারিলে শিক্ষারও সুযোগ বাড়ে, ব্যাধির প্রতিষেধ ও ব্যাধির চিকিৎসা দ্বারা স্বাস্থ্যও ভাল হয়।

আমাদের তিন শত্রু অজ্ঞতা, ব্যাধি, ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করিতে হইবে। এই তিন শত্রু বহুকাল ধরিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বে ধনে প্রাণে মারিতেছে। ইহারা যে অনিষ্ট করিয়া আসিতেছে, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের ভীষণ হত্যাকাণ্ড ও অর্থনাশ সামান্য।

বৈধব্যজনিত দুর্গতি।

ভাদ্রের প্রবাসীতে আমরা দেখাইয়াছি যে বাংলা দেশে বৈধব্যের জন্য অনেক নারী আইনবিরুদ্ধ কাজ করিয়া জেলে যায়। এবারে আরও তিনটি প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখাইব যে বঙ্গে বিধবাদের অবস্থা ঐ তিন প্রদেশের মধ্যে দুই প্রদেশের চেয়ে খারাপ। প্রত্যেক প্রদেশের মোট অবিবাহিতা, বিবাহিতা ও বিধবা নারীদিগের সংখ্যা, এবং ১৯১৫ সালে জেলে-প্রেরিত অবিবাহিতা, বিবাহিতা ও বিধবা নারীদিগের সংখ্যা দিতেছি।

বঙ্গদেশ।

	অবিবাহিতা	বিবাহিতা	বিধবা
মোট নারীসংখ্যা	৭৫,৬০,৮৮৫	১,০৪,২৪,৩২২	৪৫,১৬,৯০২
জেলে নারীসংখ্যা	৭	২৬৫	২৭৩

বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর।

মোট নারীসংখ্যা	৫৩,৮৬,৩১১	৯০,২৮,৬২৮	৩২,১৫,২১৬
জেলে „	৯২	৩৩৬	৩৬১

আগ্রা-অযোধ্যা।

মোট নারীসংখ্যা	৬৮,৮৭,৯০৭	১,১৭,৭৭,৮৪৫	৩৮,৭৪,৪৬১
জেলে „	১৭	৮৩৩	৪২০

মধ্যপ্রদেশ।

মোট নারীসংখ্যা	২১,৮৬,৭১০	৩৬,৯২,২১০	১১,০৬,৯২৬
জেলে „	৭	১৭৫	৯১

এই তালিকাগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, সকল প্রদেশেই অধিবাসিনীদের যত অংশ বিধবা, জেলের স্ত্রীকয়েদীদের মধ্যে তার চেয়ে বেশী অংশ বিধবা। এই আধিক্য বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরে সকলের চেয়ে বেশী লক্ষিত হয়; তার নীচে বাংলাদেশে। কিন্তু সব জায়গাতেই বিধবাদিগকে নিশ্চয়ই এমন প্রতিকূল অবস্থাতে পড়িতে হয়, যাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহারা জয়ী হইতে পারে না।

বালবিধবাদের বিবাহের কথা তুলিলেই বিরোধীরা বলেন, "আমাদের বিধবারা দেবী," ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরাও বলি, অন্যান্য নারীদের মত বিধবাদের মধ্যেও দেবীত্ব নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু সমাজ তাঁহাদিগকে এমন অবস্থায় ফেলে যে তাহাতে অনেকের চরম দুর্গতি হয়। কথা কাটাকাটি ছাড়িয়া তাঁহাদের এই দুর্গতিনিবারণের চেষ্টা করা প্রত্যেক ন্যায়বান্ হৃদয়বান্ লোকের কর্ত্তব্য।

অজ্ঞতা ও আইনভঙ্গ।

চারিটি প্রদেশের জেলসমূহের ১৯১৫ সালের বার্ষিক রিপোর্ট হইতে আমরা দেখাইতেছি যে যাহারা আইন ভঙ্গ করিয়া জেলে যায়, তাহাদের মধ্যে নিরক্ষর লোকদের সংখ্যাই খুব বেশী। প্রথম তিনটি প্রদেশের শতকরা সংখ্যা, শেষটির মোট সংখ্যা, দিলাম।

প্রদেশ	লিখনপঠনক্ষম	পঠনক্ষম	নিরক্ষর
বাংলা	১০.৯২	১.৮১	৮৭২৮
বিহার-উড়িষ্যা	৬.১২	১.৮০	৯২.০৮
আগ্রা-অযোধ্যা	৫.৪৭	০.৬৯	৯৩৮৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৫৯৫	৪১	৪২৫৬

অজ্ঞতা দূর করিতে চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বহু কর্ম্মচারীর মধ্যে শিক্ষার বিরোধিতা খুব দেখা যায়। ইঁহাদিগকে শাসন ও দমন করা গবর্ণমেণ্টের উচিত।

মুকুন্দ দাসের যাত্রা।

বড় বড় কবি ও অন্য লেখকেরা যাহা লেখেন, অনেক সময় তাহা পুস্তকে এবং অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। দেশে শিক্ষা উচ্চতম সীমা পর্য্যন্ত বহু বিস্তৃত হইলে কবি ও অন্যান্য লেখকদের ভাব চিন্তা আদর্শ সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার সামান্যই হইয়াছে। এই-জন্য, এক দিকে যেমন পুস্তকাদির দ্বারা লেখাপড়া সকলকেই শিখাইবার চেষ্টা করিতে হইবে, তেমনি যাত্রা, কথকতা, প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা, এবং ম্যাজিক লণ্ঠন এবং বায়োস্কোপ প্রভৃতি নূতন উপায় দ্বারাও লোককে শিক্ষা দিতে হইবে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাত্রার পালা কেবল রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি অবলম্বন করিয়া রচিত হইত। এই-সকল প্রাচীন গ্রন্থে লোকশিক্ষার প্রভূত উপাদান বিদ্যমান। কিন্তু কালক্রমে পৃথিবীর ও ভারতবর্ষের যে-সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে, তদুপযোগী নূতন নূতন শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। কিরূপ ভাব চিন্তা ও আদর্শ প্রচারিত হইলে, সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানাদি কিরূপ হইলে, আধুনিক পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যে আমরা উন্নতি, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারি, তাহা নানা পুস্তকে, মাসিকপত্রে ও সংবাদপত্রে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে উক্ত ও আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। এইগুলিকে যাত্রার পালার ভিতর দিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার প্রয়োজন আছে। বরিশালের প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা মুকুন্দদাস এই কার্য্য করিয়া সমাজসেবা এবং নিজের শক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। গান ও অভিনয় করিবার

শক্তি তাঁহার আছে। তাহার পালাগুলিতে কোন কোন প্রসিদ্ধ লেখকের রচনার প্রতিধ্বনি পাওা যায়, এবং কাহারও কাহারও কবিতার ঠিক্ এক একটি পংক্তি পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়; কিন্তু ইহা বলিলে তাঁহার নিজের শক্তির কোন লাঘব করা হয় না। একজন গ্রীক মনস্বী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে তিনি দর্শনশাস্ত্রকে স্বর্গ হইতে আনিয়া হাটে বাজারে পথে ঘাটে জনসাধারণের মধ্যে বিলাইয়াছিলেন। এটা সামান্য কাজ নয়।

অনেক দুর্লক্ষণ সত্ত্বেও বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-সব কারণে আমরা নিরাশ হইতে পারি না, আধুনিক আদর্শে অনুপ্রাণিত যাত্রার আবির্ভাব তাহার মধ্যে একটি। এরূপ যাত্রা সমাজে আদর পাইলে আশার দীপ আরও উজ্জ্বল হয়।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ।

মাননীয় বীট্‌সন-বেল সাহেব বাঁকুড়া পরিদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্থির করিয়াছেন যে অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকেরা সরকারী সাহায্য পাইবে। ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় ক্ষীরোদবিহারী দত্তের প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে এ বৎসর বাঁকুড়া জেলায় ভাল ফসল হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। যদি যথাসময়ে যথেষ্ট বৃষ্টি হয়, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে শস্য ভালই হইবে। অজন্মার পর এইরূপ হইয়া থাকে। যে-সকল সভাসমিতি সাহায্য দিতেছেন, তাঁহাদিগকে এখনও আরো কিছুদিন সাহায্য চালাইতে হইবে।

বঙ্গে পয়সা দিয়া ও বিনি পয়সায় চিকিৎসা।

১৮৯৩ জন এলোপ্যাথী মতের চিকিৎসক এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। অন্যান্য মতের চিকিৎসক দেশে আরও আছেন; কিন্তু মোটের উপর বলিতে গেলে এলোপ্যাথী মতে পাস্ করা ডাক্তাররা যেমন রীতিমত শিক্ষা পান, অন্য রকমের চিকিৎসকেরা এদেশে সেমন শিক্ষা পান না। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত-শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক বলিতে গেলে অধিকাংশ স্থলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকই বুঝিতে হইবে। সরকারী এইরূপ একটা হিসাব বাহির হইয়াছে যে প্রতি ৬৩ খানা গ্রামে সরকারী তালিকাভুক্ত এক একজন ডাক্তার আছেন। এই হিসাবে গ্রামগুলির চিকিৎসাবিষয়ক দুরবস্থা ঠিক বুঝা যায় না। কারণ ছোট বড় সমুদয় শহরে ও বড় বড় গ্রামে একাধিক ডাক্তার আছেন। সুতরাং ডাক্তারবিহীন গ্রামের সংখ্যা এই হিসাব হইতে যাহা বুঝা যায়, তার চেয়ে উহা বাস্তবিক অনেক বেশী।

বঙ্গে ৬০২টি চিকিৎসালয় আছে। সরকারী হিসাবে অনুমান করা হইয়াছে, বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে কেহই এইরূপ কোন না কোন চিকিৎসালয় হইতে ১৫ মাইল অপেক্ষা দূরে বাস করে না। এটা ভারী একটা আনন্দ ও সুবিধার কথা নয়। পীড়িত হইলে রোগী নিজে বা আত্মীয়দের সাহায্যে ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, কখন কখন নদীনালা খানাখন্দ পার হইয়া, চিকিৎসালয়ে যাইবে, তবে তাহার চিকিৎসা হইবে, ইহা অত্যন্ত দুরবস্থার কথা। গবর্ণমেণ্টের এদিকে দৃষ্টি দেওা উচিত। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী যাহা করেন, তাহাও অনেকস্থলে প্রকারান্তরে গবর্ণমেণ্টের আদেশ ও অনুমতি সাপেক্ষ। জমিদার ও অন্যান্য ধনী লোকদের কেহ কেহ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। সকলেই করিলে বড় ভাল হয়। যিনি দেশের জন্য কিছুই করেন না, তিনি সম্মানার্হ নহেন, সামাজিক মত কার্য্যতঃ এইরূপ দাঁড়ান বাঞ্ছনীয়।

চিকিৎসা-শিক্ষা।

ঢাকায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে বাংলা দেশে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিবার আগ্রহ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, এবং এখন যে-সব চিকিৎসা-শিক্ষালয় আছে, তাহাতে বিদ্যার্থীদের জায়গা হইতেছে না। কোন্ শিক্ষালয়ে কোন্ বৎসর কত ছাত্র পড়িতে চাহিয়াছিল, এবং ক'জন ভর্ত্তি হইতে পারিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহার হিসাব নিম্নলিখিত-মত দিয়াছেন।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ।

	প্রবেশার্থী	প্রবিষ্ট
১৯১২	৫৪৪	১৫৩
১৯১৩	৫৮১	১৫৩
১৯১৪	৭০২	১৫৪
১৯১৫	৭২০	১৬২
১৯১৬	৭২৫	

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ১৯১৫ সালে প্রবেশার্থী ছিল ৪৩৪, স্থান পাইয়াছিল ১১৫; ১৯১৬তে প্রবেশার্থী ও প্রবিষ্টের সংখ্যা ৪০৭ ও ১২২। ঢাকায় এবৎসর ১৭৯ জন প্রবেশার্থী ছিল, কিন্তু ভর্তি করা হইয়াছে ৭৭ জনকে।

মাননীয় মিঃ ডনাল্ড্‌ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলিয়াছেন যে সরকারী শিক্ষালয় আরও বাড়াইবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন, কিন্তু দেশের ধনী লোকদের সাহায্য ব্যতিরেকে বাড়াইতে সমর্থ নহেন। ধনী লোকেরা লাট বড় লাটের মূর্ত্তি নির্ম্মাণাদিতে টাকা দিলে উপাধি পায়। জ্ঞান বিস্তারের জন্য টাকা দিলে উপাধি দেওয়া হইবে, গবর্ণরেরা এরূপ অলিখিত প্রথা চালান দেখি, তাহা হইলে টাকার অভাব হইবে না। যাহারা বিদ্যার জন্য টাকা দেয়, তাহাদিগকে বড় বড় উপাধি দিলে লোকেও বুঝিবে যে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা জ্ঞানবিস্তারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মাঝে মাঝে যে-সব বক্তৃতা করেন, তাহা কপটতা নহে।

বাংলা দেশে চিকিৎসা-শিক্ষালয়ের যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা আমরা বিলাতের সঙ্গে তুলনা করিয়া শ্রাবণের প্রবাসীতে "বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ" প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি।

কংগ্রেসের সভাপতি কেন দেশী লোককেই করা চাই।

আমরা অনেক বৎসর হইতে মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে বলিয়া আসিতেছি যে কংগ্রেসের এবং প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি দেশী লোককেই করা উচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন মিঃ জেম্‌স্‌ র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোন্যাল্ডকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব হয়, তখন আমরা কারণ দেখাইয়া আপত্তি করিয়াছিলাম। তাহা ম্যাকডোন্যাল্ড পড়িয়া সন্তুষ্ট ও উৎসাহিত হন নাই, তৎকালে একজন বিলাত-প্রত্যাগত বাঙালী নেতা আমাদিগকে স্বদেশী মেলার মণ্ডপে বলিয়াছিলেন। তারপর শ্রীমতী এনি বেসাণ্টকে যখন আগ্রা-অযোধ্যার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সভানেত্রী করিবার প্রস্তাব হয়, তখনও আমরা কারণ দেখাইয়া আপত্তি করিয়াছিলাম। এবৎসরও আমরা মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। তাহার মর্ম্ম নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে বুঝা যাইবে। শ্রাবণের প্রবাসীতে (পৃঃ ৩২৭) আমরা লিখিয়াছিলাম:—

> আমরা আমাদের নিজের সাহস, শক্তি ও যোগ্যতা দ্বারাই বড় হইতে পারি, বিদেশীর সাহস, শক্তি ও যোগ্যতা দ্বারা নহে। "স্ব"-রাজ চাই, অথচ "বিদেশী"র নেতৃত্ব স্বীকার করিতেছি; ইহাতে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ দোষ ঘটে। কারণ, আমরা নিজেদের দেশের সব কাজ নিজেরা করিতে পারি, এই দাবী করিয়া স্বরাজ চাহিতেছি, অথচ সেই দাবীটা যে-সভা হইতে ইংরেজের কাছে যাইবে, তাহার নেত্রী হইবেন একজন বিদেশিনী। আমাদের মধ্যে একটা সভার কাজ চালাইবার মত লোকও যদি না থাকেন, তবে সমস্ত দেশের কাজ চালাইবার লোক আছেন বলিয়া ইংরেজকে কেমন করিয়া বুঝাইব? এই জন্য আমরা একজন দেশী সভাপতি চাই।

গত আগষ্ট মাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজে (পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮) লিখিয়াছিলাম:—

> In addition to a vigorous, active and strictly constitutional self-rule propaganda, there should be a clear, unequivocal demand made by the next President of the Indian National Congress that India should have self-rule when the war is over. On this occasion our spokesman should be an Indian, and he should be a pronounced, an out and out Home Ruler. It is by our own strength, courage, sacrifice and sufferings that we can have the right of self-rule. We must, therefore, make the demand through an Indian spokesman. There should be as little reason as possible for our opponents to say that the demand for self-rule is not an indigenous demand.

আমরা এতদিন ধরিয়া যাহা বলিয়া আসিতেছি, দেশী কোন সম্পাদক তাহাতে সায় দেন নাই। এতদিন পরে কিন্তু বেঙ্গলী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বের দাবী সমর্থন করিতে গিয়া ৫ই সেপ্টেম্বরের কাগজে আমাদের মতের সমর্থন করিয়াছেন।

> "There seems to be a feeling in some quarters that there should be a strong pronouncement made this year by the President of the Indian National Congress in support of self-government. That is the burning problem of the hour, and the President should speak out in clear and emphatic terms demanding self-government for India. We share this feeling and we should be sorry if the President did not make a clear "pronouncement" on the subject. That the Hon. Babu Ambika Charan Mazumdar, if elected, will fully answer the public expectations, we do not for a moment doubt. His past utterances afford clear evidence that he will do so. And we ask —is it not right and proper that such a pronouncement should be made by an Indian President, if only to avoid giving a handle to the enemies of Indian advancement, who might say that it is not the voice of India that utters the aspirations of India? If there is a feeling in some quarters that last year's presidential speech was somewhat halting in the matter of self-government, it should be an Indian who should set the matter right this year. We are on the eve of a great re-adjustment, and the demands of India should be voiced by an Indian on such an occasion."

বেঙ্গলী দেশী সভাপতি নিয়োগের যে কারণটি দেখাইয়াছেন, তাহা আমরা বহুপূর্ব্বে আমাদের কাগজে দেখাইয়াছি।

উদ্ধৃত অংশের গোড়ার দিকে বেঙ্গলী যাহা বলিতেছেন, তাহার সহিত আমাদের নিম্নোদ্ধৃত উক্তির তুলনা করুন।

"শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশের মতে যিনিই নির্ব্বাচিত হউন, তিনি জানিয়া রাখুন, দেশের লোকে হোম রূল বা স্বরাজ চায়। তার চেয়ে কম যিনি যাহা চাহিবেন, তাহা দেশের লোকের মতের, অর্থাৎ দেশের মুখপাত্র শিক্ষিত চিন্তাক্ষম লোকের মতের বিরুদ্ধে হইবে। পরিষ্কার ভাষায় বলিতে হইবে যে আমরা হোমরূল চাই।" ভাদ্রের প্রবাসী।

Whoever may be chosen president should note that the country is no longer in a mood to tolerate safe pronouncements in favour of home rule or self-rule 500 years hence.—*The Modern Review*, September, 1916, p. 345.

Our united cry should be, "No more sops, please; we want the staple solid food of all progressive peoples, self-rule."—*Ibid*, p. 346.

পাব্লিক সার্বিস কমিশনের রিপোর্ট।

যাহাতে তর্কবিতর্ক হয়, বাগ্‌বিতণ্ডা ঘটে যুদ্ধের সময় এরূপ কিছু করা উচিত নয়। বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরা এইরূপ কথা বলিয়া পাব্লিক সার্বিস কমিশনের রিপোর্ট যুদ্ধের পর ছাপিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আবার তাঁহারা বলিতেছেন, "আমরা মনে করিয়াছিলাম, যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবে, কিন্তু তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অতএব শীঘ্রই রিপোর্ট ছাপা হইবে।" এসব কথার কোন মূল্য নাই। যাহার জন্য খুব তর্কবিতর্ক ঘটিয়াছে ও ঘটিতে পারে, সরকারী কর্ম্মচারীরা এরূপ বহুৎ কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন, নিয়মটা কেবল আমাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজেরা কিছুই বলিতে ছাড়ে না। আর যখন রিপোর্ট প্রকাশ না করা স্থির হইয়াছিল, তখনও যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ যাহা জানিতেন, এখনও তাহাই জানেন। ঠিক্ কিছুই কেহ জানিতেন না, জানেন না।

এখন রিপোর্ট প্রকাশ করিবার একটা কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন যে যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ উপনিবেশগুলির মত স্বরাজ দাবী করিবে। যুদ্ধের সময় ভারতবাসীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরাগ, শুধু কথায় নয়, ধন দিয়া রক্ত দিয়া প্রাণ দিয়া দেখাইয়াছে। এই জন্য যুদ্ধের আগেকার সময়ের চেয়ে এখন অধিকতর দৃঢ়তার সহিত স্বরাজ দাবী করিবার মত কারণ ঘটিয়াছে, এবং সাহস হইয়াছে। পাব্লিক সার্বিস কমিশনের রিপোর্টে কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ভারতবাসীদের অধিকার বস্তুতঃ কিছুই বাড়ান হয় নাই, বরং তাহাদিগকে নিম্নস্থানে রাখিবার অধিকতর মজবুত বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা হইয়া থাকিবে। অথচ, "ভারতবাসীদের জন্য খুব সুবিধা করা হইয়াছে," এরূপ লোক-দেখাইবার ও বড়াই করিবার মত কিছু-কিছু জিনিষ রিপোর্টের প্রস্তাব ও সুপারিসের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। রিপোর্টটি এখন প্রকাশ করিয়া দিয়া ঐসব প্রস্তাব ও সুপারিসের সাহায্যে ইংলণ্ডের লোকের কাছে সমুদয় ইংলণ্ডীয় কাগজের দ্বারা ঢাক পিটান হইবে যে ভারতবাসীদিগকে খুব সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এখন ও যুদ্ধের পর আমরা স্বরাজ চাহিলে রাজকর্ম্মচারীরা বলিবেন, "তোমাদিগকে এই কল্য এত অধিকার দেওয়া হইল; তোমরা ইহারই যোগ্য কি না, আগে প্রমাণ কর, তারপর উঁচু কথা বলিও;" এবং বিলাতের লোকেরাও তাহাতে সায় দিয়া বলিবে, "হাঁ, হাঁ, ঠিক্ কথা।" এইরূপে এখন রিপোর্ট প্রকাশ দ্বারা আমাদের অগ্রসর হইবার পথে বাধা জন্মিবে। কিন্তু যখন "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম", তখন রিপোর্ট যখনই প্রকাশিত হউক, ফল একই; এবং তাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই। আমাদের কেবল ইচ্ছা এই যে রিপোর্টের সঙ্গে সাক্ষীদের সাক্ষ্যগুলিও যেন প্রকাশিত হয়। তাহার যে খুব বেশী মূল্য আছে, তাহা নয়। কেননা, কমিশনের সভ্য বাছিয়াছেন সরকারী কর্ম্মচারীরা, অনুসন্ধানের বিষয় ও প্রশ্ন স্থির করিয়াছেন তাঁহারাই, সাক্ষী বাছিয়া লইয়াছেন তাঁহারাই। তবুও ২।৪ জন সাক্ষী স্পষ্ট ও সত্য কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্থায়ী পুস্তকের আকারে পাইলে ভাল হয়।

বঙ্গের নবীন চিত্রকরসম্প্রদায়।

বাঙালী নবীন চিত্রকর সম্প্রদায়ের আঁকা অনেক ছবি গত বৎসর মান্দ্রাজে প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীর কোন কোন ছবি আমরা ছাপিয়াছি, এবং নবীন শিল্পীদের ছবি আমরা যত ছাপিয়াছি, আর কেহ তত ছাপেন নাই। কিন্তু

বাঙালী সাধারণ শিক্ষিত বিস্তর লোক ত এসব ছবিকে উপহাস করিয়াই থাকেন, কোন কোন দিগ্‌গজ পণ্ডিতও করেন। আমাদের কিন্তু ধারণা যে দোষত্রুটি সত্ত্বেও শিল্পের প্রাণ এই নবীনদের ছবিতে আছে। পাশ্চাত্য চিত্রাঙ্কণপ্রথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু ইংরেজ শিল্পীরও ধারণা এইরূপ। সম্প্রতি মান্দ্রাজের সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল ১৯১৫ সালের রিপোর্টে মান্দ্রাজে বাঙালী নবীন চিত্রকরদের চিত্রপ্রদর্শনী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Nothing so fine from the artist's point of view has ever been exhibited in Madras;" "শিল্পীর দিক্ দিয়া বলিতে গেলে মান্দ্রাজে এমন চমৎকার জিনিষ আর কখনও প্রদর্শিত হয় নাই।"

বিলাতী কাগজের লেখকের দক্ষিণা।

সাণ্ডে পিক্টোরিয়্যাল নামক বিলাতী সাপ্তাহিক কাগজে "মহাযুদ্ধের চারি অধ্যায়" শীর্ষক চারিটি প্রবন্ধ লিখিয়া উইন্‌ষ্টন চার্চিল সাহেব ১৫,০০০ টাকা পাইয়াছেন। যে যে সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটির পঁচিশ লক্ষ খানা বিক্রী হইয়াছিল। কাগজের কাট্‌তি খুব বেশী হইলে এবং বিজ্ঞাপন খুব বেশী পাওয়া গেলেই প্রকাশকেরা বেশী টাকা দিয়া প্রবন্ধ লইতে সমর্থ হয়। পাশ্চাত্য উন্নততম দেশ-সকলের ও জাপানের প্রায় সমুদয় প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী লিখিতে পড়িতে পারে। এই জন্য খবরের কাগজ পড়িতে খুব বেশী লোকে পারে। এই-সব দেশে বড়-বড় কারখানা ও বড়-বড় ব্যবসা আছে; তাহার সমস্ত বা অধিকাংশ তথাকার দেশী লোকের হাতে। সুতরাং ঐ-সব দেশের সংবাদপত্রসমূহ খুব বিজ্ঞাপন পায়। তা ছাড়া ঐসব দেশের লোকদের রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে, তাহারা নিজের দেশের কাজ যেমনটি করিয়া ইচ্ছা তেমনি চালাইবার চেষ্টা করিতে পারে এবং সে চেষ্টা শীঘ্র হউক বা কিছু বিলম্বে হউক সফল হয়; সুতরাং সংবাদপত্রে রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা পড়িতে তাহাদের ভাল লাগে। পাশ্চাত্য সভ্যদেশ-সকলে, আর্থিক সচ্ছলতাবশতঃ ও অন্যান্য কারণে, যাহারা কাগজ পড়ে, তাহারা কিনিয়া পড়ে, ধার করিয়া পড়ে না। আমাদের দেশে সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের উন্নতি হইতে পারে ও কাট্‌তি বাড়িতে পারে, যদি সবাই লিখিতে পড়িতে পারে ও কাগজ পড়ে, যদি দেশীলোকদের বড় বড় কারখানা ও ব্যবসা হয় ও তাহারা বিজ্ঞাপন দেয়, যদি দেশের লোকদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও শক্তি জন্মে এবং কাগজগুলা এখনকার মত কেবল নাকে কাঁদিতে ও ঘ্যান-ঘ্যান করিতে বাধ্য না হয়, এবং যদি আর্থিক সচ্ছলতা ও আত্মসম্মান বোধ বৃদ্ধি পাওয়ায় পাঠকেরা সবাই নিজের নিজের কাগজ কিনিয়া পড়ে।

নবনগরে অবৈতনিক শিক্ষা।

ছোটবড় অনেকগুলি দেশী রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা কয়েক বৎসর হইতে ছাত্রেরা বিনা বেতনে পাইতেছে। জামনগর বা নবনগরের নৃপতি বিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোআড় শ্রীরণজিৎ সিংহজী তাঁহার রাজ্যে ১৯১২ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিয়া দেন। গত ১লা সেপ্টেম্বর তাঁহার ৪৪তম জন্মোৎসব উপলক্ষে যে দরবার হয় তাহাতে ঘোষিত হইয়াছে যে সেই দিন হইতে সেকেণ্ডরী (অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত) শিক্ষাও অবৈতনিক হইল। ইহাতে কেবল যে ছাত্রদত্ত বেতনের আয় ছাড়িয়া দিতে হইবে, তাহা নহে; শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ায় ছাত্র বাড়িবে, সুতরাং আরও স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং আরও শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা ভারতবর্ষের মধ্যে এই জামনগর রাজ্যেই বোধ হয় প্রথম অবৈতনিক হইল। জামনগর রাজ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। ইহার আয়তন ৩৭৯১ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ৩৪৯৪০০, এবং রাজস্ব ২২,৬৫,০০০ টাকা। অর্থাৎ ইহার আয়তন দিনাজপুর ও রংপুর জেলার মাঝামাঝি। ইহার লোকসংখ্যা দার্জিলিং ছাড়া বঙ্গের আর সব জেলার চেয়ে কম। যাহাই হউক, সাড়ে তিন লক্ষ অধিবাসী যাহার, এরূপ রাজ্যের শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ সোজা কাজ নয়।

আমাদের গবর্ণমেন্ট মোট লোক-সংখ্যার শতকরা পনের জনকে শিক্ষা পাইবার বয়সের মানুষ বলিয়া ধরেন; তাহা হইলে জামনগরে মোটামুটি ৫২০০০ ছাত্রছাত্রী হইতে পারে। এতগুলি বালকবালিকার অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সোজা কাজ নয়।

বঙ্গের দেশী রাজ্য।

বঙ্গে দুটি দেশী রাজ্য আছে, কুচবিহার ও ত্রিপুরা। কুচবিহারের আয়তন ১৩০৭ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৫,৯৩,৯৫২ এবং রাজস্ব ২৪,৬০,০০০ টাকা। ত্রিপুরার আয়তন ৪,০৮৬ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ২,২৯,৬১৩ এবং রাজস্ব ১৬,৮০,০০০ টাকা। কুচবিহার রাজ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে; অন্য শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ জানি না। কেননা, কখনও বার্ষিক রিপোর্ট পাই না; বাহির হয় কি না তাহাও জানি না। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানে অগ্রণী বড়োদার মহারাজা গাইকওয়াড়ের কন্যা মহারাণী ইন্দিরা এখন কুচবিহারের মহারাণী। আমরা আশা করিয়াছিলাম, বড়োদার রাজনীতি কতকটা কুচবিহারে সংক্রামিত হইবে। কিন্তু তাহা হইয়াছে কি না, জানি না। জামনগর অপেক্ষা কুচবিহারের আয়তন কম ও আয় বেশী। সুতরাং শিক্ষা অবৈতনিক করা অসাধ্য নহে।

ত্রিপুরার ও আয় বেশ আছে। ইঁহার ও মহারাজা ইচ্ছা করিলে নিজের রাজধানীতে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ চালাইতে এবং সমুদয় স্কুলের শিক্ষা অবৈতনিক করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় শিক্ষিত ও উদারনৈতিক ব্যক্তি। তাঁহার আমলে লোকে শিক্ষা-বিষয়ে উন্নতি দেখিতে চায়। কুমিল্লার দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজটি প্রথম শ্রেণীর করিবার চেষ্টা হইতেছে। মহারাজা একাই ইহাকে প্রথম শ্রেণীর কলেজ করিয়া দিতে পারেন। ত্রিপুরার বার্ষিক রিপোর্ট দেখিবার সুযোগ আমাদের কখন না হওয়ায় সেখানকার শিক্ষার অবস্থা জানি না।

ফরিদপুরে কলেজ।

ফরিদপুর জেলায় কলেজ নাই; একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ করিবার চেষ্টা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের বিষয় বলিয়া বলিয়া লোকে ক্লান্ত হইয়াছে। জমিদার ও অন্য ধনীরা চেষ্টা করিলে প্রত্যেক জেলার শিক্ষালয়ের অভাব দূর হইতে পারে। ফরিদপুরের নেতাদের চেষ্টা প্রশংসনীয়। আমাদের বোধ হয় তাঁহারা যদি একেবারে প্রথম শ্রেণীর কলেজ করিবার চেষ্টা করেন ত ভাল হয়; তাহাতে ব্যয় খুব বেশী নয়, অথচ ছাত্রদের শিক্ষা অনেক ভাল হয়। অন্ততঃ গৃহনির্ম্মাণকালে ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নক্সা করান বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গালী সিপাহী।

গবর্ণমেণ্ট ২২৮ জন বাঙ্গালী সিপাহী লইবেন বলিয়াছেন। গত ২১ শে ভাদ্র কলিকাতা টাউনহলের সভায় ডাক্তার শরৎ মল্লিক বলেন যে তাহার মধ্যে আর ৭২ জন ভর্ত্তি হইতে বাকী আছে। আমরা শুনিলাম ৪৫০র উপর যুবক ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। প্রথম ১১৩ জন সিপাহীকে মহোৎসাহে টাউনহলের বহুজনাকীর্ণ সভায় বিদায় দেওয়া হইয়াছে।

এইসকল যুবকের পৌরুষ সার্থক হউক।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নূতন বিলাতী আইন।

প্রবাসীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় এই আইনের বিষয় আমরা লিখিয়াছি। ইহার যে-ধারা বিশেষ আপত্তিজনক মনে করি, তাহা প্রায় ঠিকই রহিয়া গেল। তাহা এই।—ব্রিটিশ ভারতের যে যে সিবিল বা সৈনিক কাজে ব্রিটিশ-ভারতীয়রা নিযুক্ত হইতে পারে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশী রাজ্যের বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট কোন রাজা বা প্রজা তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারিবে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশীরাজ্যের বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট কোন প্রজা বা ভারতসন্নিহিত দেশের কোন স্বাধীন জাতির কোন বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ব্রিটিশভারতে সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে; বিশেষভাবে কাশ্মীর ও নেপালকে মনে রাখিয়াই "ভারতসন্নিহিত দেশ" কথাগুলি সরকারী ভারত-সচিব ব্যবহার করিয়াছেন। স্বাধীন জাতির লোকেরা যে-সব সৈনিক-কাজে নিযুক্ত হইতে পারিবেন, তাহার সম্বন্ধে এমন কথা বলা হয় নাই যে সেগুলি কেবল সেই-সব কাজ যাহাতে ব্রিটিশভারতীয়গণ নিযুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য বোধ হয় তাহারা লেফ্‌টেনেণ্ট, ক্যাপটেন, মেজর, কর্ণেল, প্রভৃতি হইতে পারিবে। ব্রিটিশ-ভারতীয়রা তাহা হইতে পায় না। ব্রিটিশ ভারতের লোকদের যে অধিকার নাই, তাহা বাহিরের লোককে দেওয়ায় যে আমাদের প্রতি অবিচার হয় এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরও অগৌরব হয় তাহা কি গবর্ণমেণ্ট বুঝেন না? ব্রিটিশ ভারতের লোকদের উচ্চ

সৈনিক কাজ না দেওয়ার দুটা কারণ হইতে পারে; (১) এখানে উপযুক্ত লোক নাই, (২) উপযুক্ত লোক থাকিলেও তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। (১)-সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, এখানে আগে ত উপযুক্ত লোক ছিল; বড়-বড় বীর জন্মিয়াছিল; এখন শৌর্য্য যদি কমিয়া গিয়াছে বলা হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য ব্রিটিশ শাসনের উপর তাহার দায়িত্ব পড়িতে পারে কি না, গবর্ণমেণ্টের তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। (২)-সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, অসন্তুষ্ট-লোকদিগকেই অবিশ্বাস করিতে হয়। যদি বলা হয় যে ভারতবাসীদিগকে উচ্চ-সৈনিক কাজ দিয়া বিশ্বাস করা যায় না, তাহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে তাহারা অসন্তুষ্ট। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে, যাহাতে লোকের সন্তোষ জন্মে, ব্রিটিশ শাসননীতিকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিলেই প্রতীকার হয়।

যাহাই হউক, আমরা সমুদয় দেশীরাজ্য এবং কাশ্মীর ও নেপালকে ভারতবর্ষের অংশ বলিয়া মনে করি। তথাকার কাহারো কাহারো উচ্চ সৈনিক-কাজ পাইলে যদি আমাদের তাহা পাইবার পথ প্রশস্ত হয়, ভাল; কিন্তু সে পথ এই-প্রকারে বন্ধ হইলে সাতিশয় ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ হইবে।

দমননীতির সম্প্রসারণের পূর্ব্বাভাস।

পুলিস-রিপোর্টের উপর গবর্ণমেণ্ট-মন্তব্যে বলা হইয়াছে, যে, রাজদ্রোহসূচক পত্রী, পুস্তিকা, পুস্তক কাহারও নিকট থাকিলেই অপরাধ হয় না, কেহ তাহা প্রচার করিলে অপরাধ হয়। কিন্তু প্রচার হইয়া গেলে ত তখন অনিষ্ট হইয়াই গেল; এবং তদ্দ্বারা বিপ্লবপ্রয়াসীদের দল পুষ্ট হয়। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন, যে, রাজদ্রোহসূচক কোন লেখা কাহারও কাছে থাকিলেই তাহা অপরাধ হইবে, এইরূপ আইন করিলে বিপ্লববাদের সম্পূর্ণ প্রতিকার না হউক কিছু উপশম হইবে। পুলিস যখন খানাতল্লাস করিতে গিয়া গীতা পাইলে গীতাকেও গ্রেপ্তার করেন, তখন রাজদ্রোহসূচক সাহিত্যের গণ্ডী কোথায় গিয়া থামিবে বলা যায় না।

সকল ভালমন্দের আদি উৎস মানুষের মন। সেখানে খানাতল্লাসী চলে না, এবং মাল ক্রোক বাজেয়াপ্ত করাও চলে না। গবর্ণমেণ্ট সব উপায় চিন্তাই করিতেছেন। মানুষের মনটা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুকূল হয়, তাহার কি উপায় হইতেছে? গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের বোঝা উচিত, যে, বাহিরের ভড়ং, তামাসা, বোকা-বুঝান, এসবে কিছু হইবে না; খাঁটি রাষ্ট্রীয় উন্নতি চাই। তাহা পবশ করিয়া লইবার ক্ষমতা আমাদের আছে।

বঙ্গে রাজনৈতিক অপরাধ।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ডিউক সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় একবার দেখাইয়াছিলেন যে বঙ্গে ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ অন্য কোন কোন প্রদেশের চেয়ে কম হয়; এবং এই-সকল অপরাধের মধ্যে রাজনৈতিক অপরাধের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু তথাপি ইংরেজমহলে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে বাঙ্গালী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারী আইনভঙ্গ করিতেছে। বাংলাদেশে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে সাড়ে তিন শতের উপর লোককে আটক করা হইয়াছে; অন্য কোন প্রদেশে এমন করা হয় নাই। এরূপ দমননীতি সমর্থন করিতে হইলে দেখান চাই বটে যে বাংলাদেশ বিপ্লবপ্রয়াসীতে ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? ১৯.৫ সালে ডাকাতির সংখ্যা ৬৫৩, সিঁধ চুরি ৩৯,৮১২ এবং সাধারণ চুরি ২১,৫৫২ হইয়াছিল। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধও ছিল। এসকলের মধ্যে পুলিসেরই মতে কেবল ৩৬টি অপরাধ বিপ্লবচেষ্টার সহিত সংযুক্ত ছিল; তন্মধ্যে ২৪টি ডাকাতি। **শতকরা ৪টির চেয়েও কম রাজনৈতিক ডাকাতি।** এইজন্য বিনা বিচারে যে এতগুলি লোককে আটক করিয়া রাখা হইতেছে, ইহার আমরা কোনমতেই সমর্থন করিতে পারি না। ইহাতে অসন্তোষ বাড়িতেছে।

বিনা বিচারে আটক করা।

বাংলা দেশে এমন কিছু অশান্তির অবস্থা হয় নাই যাহাতে বিনা বিচারে আটক করিবার ক্ষমতা সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, হাইকোর্টের জজ হইবার যোগ্য একজন কর্ম্মচারী

পুলিশের সংগৃহীত সমুদয় প্রমাণ পরীক্ষা করিয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগকে আটক করিবার হুকুম দেন; এবং আবদ্ধ লোকদিগকে কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্ট ইহাও বলিয়াছেন যে আবদ্ধ লোকদিগকে সাধারণ মোটামুটি ভাবে বলা হয় যে তাহাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে। কিন্তু তাহাতে বেশী কি লাভ? তাহারা তদুত্তরে যদি বলে, "আমরা নির্দ্দোষ, আমরা কিছু জানি না," কিম্বা "পুলিশের অভিযোগ মিথ্যা," তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন না। ঠিক্ কি অভিযোগ আছে, ঠিক্ কি প্রমাণ আছে, তাহা জানিলে তবে তাহা মিথ্যা বলিয়া দেখাইবার সুযোগ হয়। তাহাও যথেষ্ট নয়। প্রকাশ্য আদালতের বিচারে ভাল ভাল উকীল ব্যারিষ্টার বুদ্ধি ও আইনের জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া তবে কোন কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্য ও মিথ্যা প্রমাণের জাল ভেদ করিতে পারে। মোটামুটি একটা অভিযোগের কথা শুনিয়া একজন সাধারণ লোকের পক্ষে এই-প্রকারে আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করা অসম্ভব। আমেরিকার কোথাও কোথাও সরকারী ব্যয়ে পাব্লিক ডিফেণ্ডার অর্থাৎ আসামীর পক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারী উকীল নিযুক্ত হয়। অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া যেমন গবর্ণমেণ্টের কাজ, নিরপরাধকে খালাস দেওয়া ও রক্ষা করাও তেমনি কর্ত্তব্য। সুতরাং আমরা বলি সন্দেহভাজন লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন পাব্লিক ডিফেণ্ডার নিযুক্ত করুন। প্রকাশ্য আদালতে উকীল ব্যারিষ্টার সাহায্য করেন, এসেসার জুরী সাহায্য করেন, কখন কখন হাইকোর্টের একাধিক জজ একসঙ্গে বসিয়া বিচার করেন; তাহাতেও কখন কখন ঠিক্ বিচার হয় না। আর, সন্দেহভাজনদের বেলায় একজন মাত্র, হাইকোর্টের জজ নয়, "জজ হইবার যোগ্য" লোককে শতশত লোকের ভাগ্যবিধাতা করিয়া রাখা কখনই ঠিক্ নয়। গবর্ণমেণ্ট তিনজন লোকের উপর ভার দিলে ভাল হয়, একজন হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-জজ, একজন সিবিলিয়ান জজ, এবং একজন বড় উকীল। তা ছাড়া একজন ভাল ব্যারিষ্টারকে উপযুক্ত ফী দিয়া পাব্লিক ডিফেণ্ডার নিযুক্ত করা হউক।

পুলিসের সমালোচনা।

পুলিশ রিপোর্টের উপর সরকারী মন্তব্যে, বাঙালীদের সংবাদপত্র-সকল পুলিশের যে সমালোচনা করে, তাহাকে "ill-natured" এবং "spiteful" বলা হইয়াছে। সরকারী যে-সব কর্ম্মচারী এই মন্তব্য লিখিয়াছেন, পুলিশের শক্তি তাঁহারা ত কখন অনুভব করেন না; কাজেই সব দোষটা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়। আমরা যদি মন্দ-স্বভাব ও বিদ্বেষ-বশতই সমালোচনা করি, তাহা হইলে সে বিদ্বেষটা আসে কোথা হইতে? পোষ্ট মাষ্টার, ডাকের পিয়ন, মুন্সেফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রভৃতির বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা আমরা কেন করি না? তাহাতেই প্রমাণ হয় যে বিদ্বেষটা আমাদের স্বভাবজাত নয়; অপর পক্ষের দোষ আছে।

ভাল কথা; গবর্ণর যে গৌর্লে সাহেবকে পুলিশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ফল কি হইল? তিনি যদি বলিয়া থাকেন যে পুলিশের উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ সাধু ও কার্য্যক্ষম, তাহা হইলে সে কথাটা প্রকাশ করা হয় না কেন? আমরা এমন মনে করি না যে পুলিশবিভাগের সবাই খারাপ লোক। কিন্তু আমরা গৌর্লে সাহেবের তদন্তের ফল জানিতে চাই; তাহা হইলে বুঝা যাইবে আমরা ill-natured ও spiteful কিনা। পুলিশের প্রশংসা গোপন করিবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না।

পল্টনে যোগ্যতার বিচার।

গত ২১শে ভাদ্র টাউন-হলের সভায় লাট সাহেব বলেন যে বাঙালীদের চেয়ে সিপাহী হইবার যোগ্যতর জাতি থাকায় সরকারী টাকার সদ্ব্যয় করিবার জন্য এতদিন বাঙালী সিপাহী লওয়া হইত না। ইহার উত্তর আমরা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে (পৃঃ ১৯-১১০) দিয়াছি; পুনরুক্তি করিব না। যদি কেবলমাত্র যোগ্যতারই আদর গবর্ণমেণ্ট করেন, তাহা হইলে নানা প্রদেশে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী লোক শতকরা কত অংশ চাকরী পাইবে, তাহার ব্যবস্থা কেন করা হয়?

কার্ত্তিকের প্রবাসী বাহির হইবার তারিখ

আগামী কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী গ্রাহকগণকে ডাকে ১০ই আশ্বিন পাঠান হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের চিঠি গ্রাহক-নম্বর সহ ৮ই আশ্বিনের মধ্যে আমাদের হাতে পৌঁছা চাই।
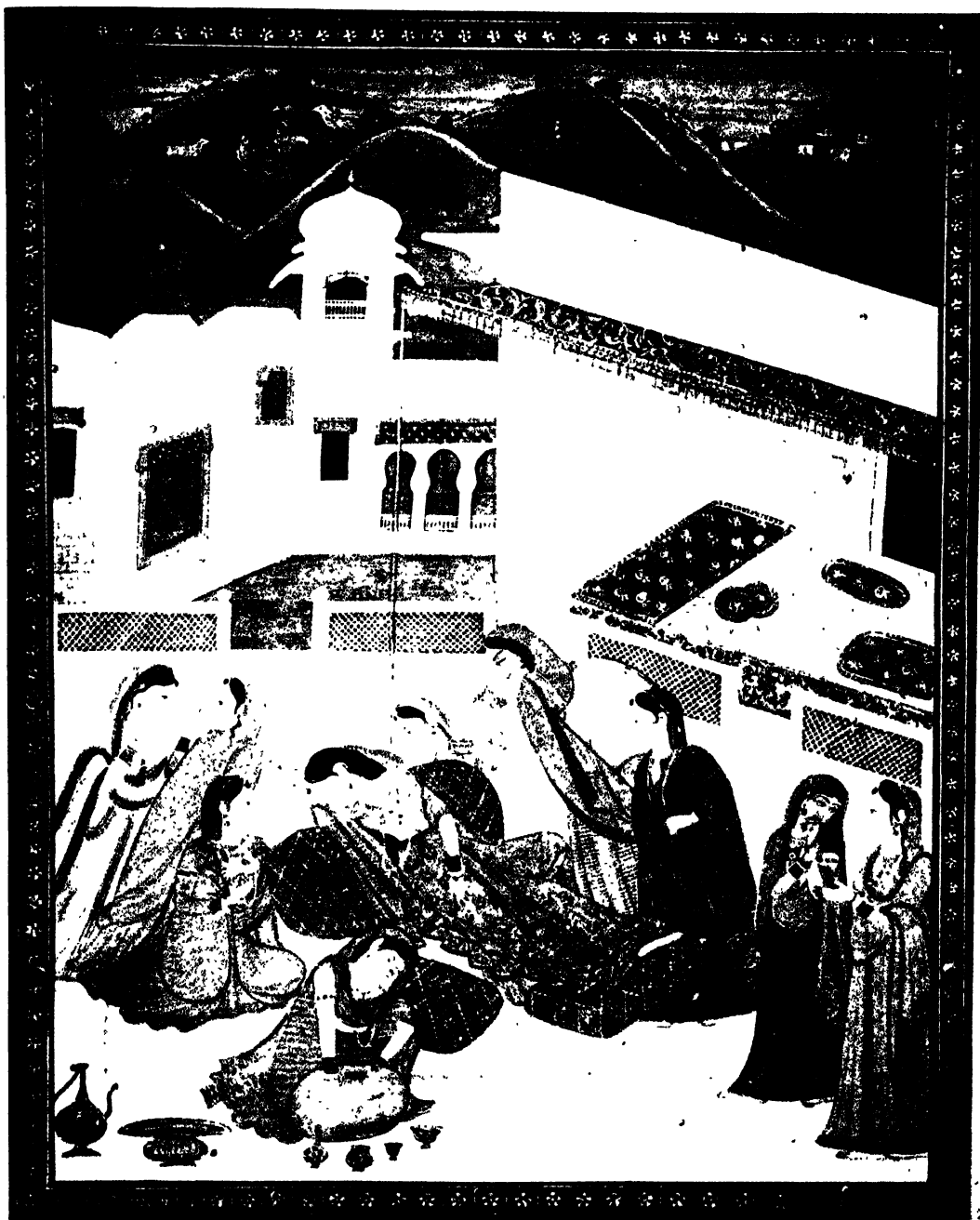
বায়োস্কোপ [illegible] হইয়া, বৃদ্ধ যুবা বালক, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই [illegible] প্রিয় ও পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং উহার [illegible] প্রচার কথা জানিবার কৌতূহল অনেকেরই [illegible] পারে।

বায়োস্কোপ ইংলণ্ডে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। শ্রীযুক্ত ফ্রীজ-গ্রীন নামক এক ব্যক্তি ইহার প্রথম উদ্ভাবন-কর্ত্তা বলিয়া দাবী করিতেছেন।

অনেক উদ্ভাবনের বেলাই কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ঠিক হইবার আগে একটা কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক-ঘটিত ব্যাপার হইতে ইঙ্গিত পাইয়া সেই কার্য্য ঘটাইবার করণ-মাত্র রূপে একটা যন্ত্র গঠিত হয় এবং পরে তাহা হইতে উদ্দেশ্যমূলক উদ্ভাবন উন্নত প্রণালীতে ক্রমে হইতে থাকে; যেমন,—চটের থলিতে ধোঁয়া ভরিয়া যখন দেখা গেল যে ধোঁয়া-ভরা থলি উড়িতে চায়, তখন থলি উড়াইবার কৌতুকের জন্যই প্রথম বেলুনের সৃষ্টি; বেলুনে করিয়া লোক উড়িতে পারার চেষ্টা—কৌতুক হইতে সঞ্জাত সৃষ্টিকে কাজে লাগাইবার পরবর্ত্তী উদ্দেশ্য; এবং তাহারই ফলে বেলুনের বিবিধ বিবর্ত্তন হইতে হইতে জেপেলিন ও এরোপ্লেন উদ্ভাবিত হইয়াছে; জল গরম হইবার সময় যখন ষ্টিভেনসন দেখিলেন যে ষ্টিম বা জলের ভাপ কেটলির লোহার ভারি ঢাকনিকেও নাড়িতে পারে, তখন ভারি জিনিস গাড়ীকে জীবের আকর্ষণ ব্যতীতও আপনার মধ্যেকার সঞ্জাত শক্তিতে নড়াইতে পারিবার কৌতুকের বশেই ষ্টিম-এঞ্জিন উদ্ভাবিত হইল; এবং লোক ও মাল বহাইবার কার্য্যে লাগাইবার উদ্দেশ্য লইয়া পরে উহার বিবিধ বিবর্ত্তন ঘটিয়া চলিয়াছে। এইরূপে বায়োস্কোপও কৌতুক হইতে কাজে ভিড়িয়াছে; প্রাকৃতিক ও বাস্তবিক জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা যে ফটোগ্রাফের সাহায্যে স্থায়ী করিয়া রাখিয়া তাহাকে আবার সচল করিয়া দৃশ্যপরম্পরায় বাস্তবিকের আভাস সৃষ্টি করা যায়, তাহা আগে ভাবিয়া পরে বায়োস্কোপের যন্ত্র কেহ গড়ে নাই; ইহারও জন্ম, কৌতুক হইতে; যখন দেখা গেল একটা শক্ত পাটার এক পিঠে একটা পিঁজরার ছবি ও অপর পিঠে একটা পাখীর ছবি আঁকিয়া সেই পাটাটিকে খুব জোরে তাড়াতাড়ি ঘুরাইলে চোখের উপর দুপিঠের দুটি ছবি একত্র হইয়া পিঁজরার মধ্যে পাখী আছে বলিয়া দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়, বা পাটার এক পিঠে একটা খাড়া দাঁড়ি ও অপর পিঠে একটা পাতা দাঁড়ি আঁকিয়া পাটা তাড়াতাড়ি ঘুরাইলে দুটি দাঁড়িতে মিলিয়া একটা ঢেরা হইয়া দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়, তখন জানা গেল যে চোখের উপর কোনো জিনিসের ছায়া একবার পড়িলে জিনিস সরিয়া গেলেও সেই ছায়া মিলাইতে কিছুক্ষণ (সেকেণ্ডের $\frac{1}{10}$ অংশ কাল) দেরি লাগে। সেই সময়ের মধ্যে দুটি ছবি পরপর চোখে পড়িলে জোড়া দেখায়। এই-সমস্ত জ্ঞান হইতে লোকের ঝোঁক চাপিল দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া কৌতুক করিতে হইবে।

১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডে একটি যন্ত্র প্রচলিত হইল তাহার নাম হইল জীবন-চক্র। ইহাতে ঘোড়ার দৌড় দেখানো যাইত। এই যন্ত্র একটি গোল টব, একটি খাড়া পায়ার উপর ঘুরে; টবের গায়ে লম্বা-লম্বা সরু-সরু কতকগুলি জানলা কাটা আছে; টবের খোলের মধ্যে ঘোড়ার দৌড়ের সময় দৌড়-আরম্ভ হইতে শেষে থামা পর্য্যন্ত ঘোড়ার ও সওয়ারের যত-রকম অঙ্গভঙ্গি হয় তাহা পর-পর যথাক্রমে ছবিতে আঁকা থাকে; একটা জানলার সামনে চোখ রাখিয়া সেই ছবির চাকা ঘন ঘন পাকে বনবন করিয়া ঘুরাইলে ঘোড়ার বিভিন্ন গতিভঙ্গি ক্রমাগত চোখে পড়িয়া এবং একটার ছায়া মিলাইবার পূর্ব্বে আর-একটার ছায়ার সঙ্গে জোড়া লাগিয়া একটি নিরবচ্ছিন্ন ঘোড়-দৌড়ের ছবি চোখের সামনে জাগিয়া উঠে। এইরূপে বেহালা বাজাইবার বিভিন্ন ভঙ্গি একটা চাকতির গায়ে চক্রাকারে আঁকিয়া ঐ টবের মধ্যে ঘুরাইলে জানলার সামনে তাড়াতাড়ি সকল ছবি পরপর আসিয়া দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইবে যেন জীবন্ত লোক বেহালা বাজাইতেছে। ১৮৭৭ সালে ম্যাসিয় রেইনো নামক একজন ফরাশী এই যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন।

এই জীবন-চক্র যন্ত্র প্রচলনের ৫২ বৎসর পরে ফ্রীজ-গ্রীন বায়োস্কোপ আবিষ্কারের পরীক্ষায় নিযুক্ত হন। তিনি পর্দার উপর ছবির ছায়া ফেলিয়া ছায়ার নড়াচড়া প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তিনি প্রকাশ্যে প্রথম যে ছবি দেখান তাহা একটি যুবতী চোখ ঘুরাইতেছে এই মাত্র। একজন দর্শক মহিলা মনে করিলেন পর্দার পিছনে একজন জীবন্ত
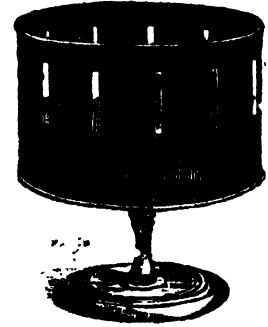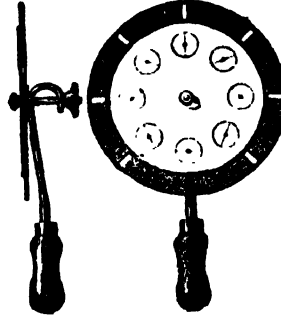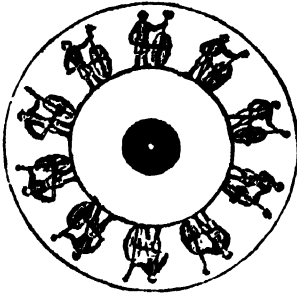
বায়োস্কোপের জনক, জীবন-চক্র।
ছবির চাকতি, চাকতি ঘুরাইবার হাতলের পার্শ্বদৃশ্য ও সম্মুখ-দৃশ্য, ছবির আধার টব।

যুবতী লুকাইয়া ঐরূপ করিয়া ঠকাইতেছে; তিনি উঠিয়া গিয়া পর্দ্দার পিছন দেখিয়া পর্দ্দার উপর হাত বুলাইয়া তবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে এ জীবন্ত লোকের জুয়াচুরি নয়, উহা চলন্ত ছবিরই কারসাজি।

কিন্তু ক্লীজ-গ্রীনের এই উদ্ভাবনকে ঠিক বায়োস্কোপ বলা যায় না, বায়োস্কোপের নকিব বা অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। ১৮৭২ সালে মুইব্রিজ নামক একজন আমেরিকা-বাসী ইংরেজ ২৪টি কামেরায় একসঙ্গে ছবি তুলিবার বুদ্ধি করিয়া নিমেষ-ফটোগ্রাফের দ্বারা যে গতির আভাস ধরা যায় তাহা প্রথমে প্রমাণ করেন। প্রকৃত বায়োস্কোপ আবির্ভূত হইল ১৮৯০ সালে, বহু লোকের চেষ্টা পরীক্ষা ও সাধনার ফলে। তখন ইহার নাম ছিল কিনেম্যাটোগ্রাফ, অর্থাৎ চলন্ত ছবি—বায়োস্কোপ মানে জীবন্ত দৃশ্য। এলায়াস হাউ নামক এক ব্যক্তি প্রথম সেলুলয়েডের গুটানো ফিতার গায়ে ছবির কর্ম্ম-পরম্পরার ভঙ্গি অঙ্কিত করিয়া বিবিধ ঘটনার দৃষ্টিবিভ্রম প্রদর্শন করেন। এই প্রথম ব্যবহৃত ফিল্ম্ বা ফিতার লম্বা ছিল মাত্র ২০ ইঞ্চি, এবং তাহাতে বানর-কুকুরের খেলা, যোদ্ধার পয়তারা, বেদ্যা ডিঙাইয়া পলায়ন, সয়তানের অমৃত হরণ ও তাহার লেজ ধরিয়া টানাটানি করিতে-করিতে লেজ ছিঁড়িয়া অমৃত-রক্ষকের ভূমে পতন, বাক্সর ভূতের মাথা চাগাড় ও পাখী শিকার প্রভৃতি এক-একটি মাত্র কর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থার কিয়দংশ মাত্র দেখানো হইত।

এই কিনেম্যাটোগ্রাফ পরে উন্নত হইয়া উঠিল এডিসন প্রভৃতির হাতে, যখন আবিষ্কার হইল যে টুকরা-টুকরা কাগজে ফটোগ্রাফ তোলার ন্যায় লম্বা ফিতার গায়ে সারি-সারি একটা ঘটনার ধারার ফটোগ্রাফ তোলা যায়। একটা কর্ম্মের ক্রমাগত ছবি খুব শীঘ্র শীঘ্র তুলিয়া তাহা অতি দ্রুত চোখের সামনে দিয়া সরাইয়া লইলে চোখের সামনে সেই কর্ম্মের অবিকল অনুষ্ঠান হইতে থাকে, ইহাই বায়োস্কোপের মূলতত্ত্ব।

কোনো ঘটনার ছবি যতই তাড়াতাড়ি তোলা হোক তাহারা অবিশ্রাম-কর্ম্মের খণ্ড খণ্ড স্থির অংশ ছাড়া প্রবহমান তো কিছুতেই নহে। আজকাল ক্যামেরার এত উন্নতি হইয়াছে যে এক সেকেণ্ড সময়ে দুগাজার ছবি তোলা যায়; সেই নিমেষপাতের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে অতগুলি ছবিও এক-একটি স্থির, তাহাদের শৃঙ্খল-পরম্পরা চোখের উপর পরপর পড়িয়া আশপাশের অচল পদার্থের তুলনায় গতির বিভ্রম উৎপন্ন করে। একজন চলন্ত মানুষের ফটোগ্রাফ তোলা হইতেছে মনে করা যাক। প্রথম ছবি তোলার সময় সে দুই পা মাটিতে রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, দ্বিতীয় ছবিতে উঠিল সে বাঁ পা তুলিয়া ফেলিতে যাইতেছে, তৃতীয় ছবি যখন তোলা হইল তখন আবার সে দুই পায়ে মাটিতে দাঁড়াইয়া আছে; লোকটির অবস্থান তিনবার তিন রকম চোখে পড়িলেও তাহার আশপাশের বাড়ীঘর গাছপালা একই অবস্থায় তিনবারই চোখে পড়ে; তখন
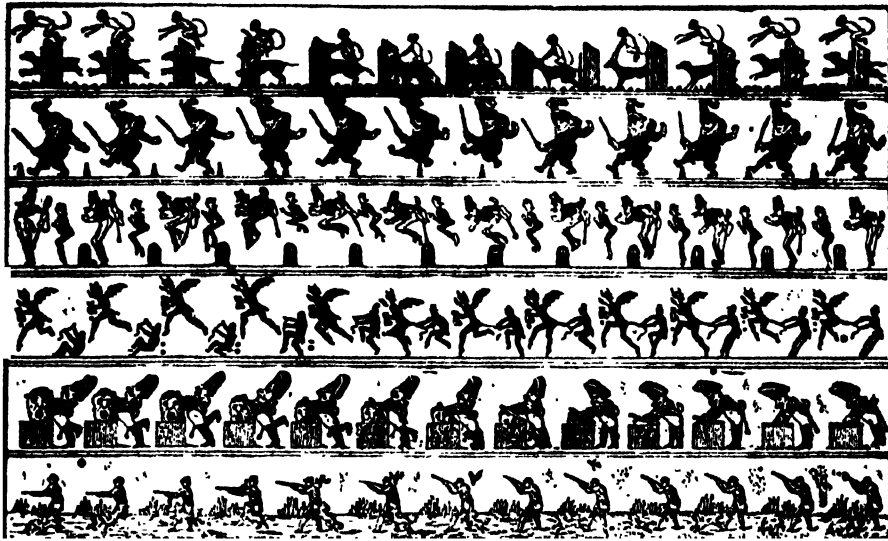
বায়োস্কোপের প্রথম ফিল্‌ম্‌, ২০ ইঞ্চি লম্বা।

এই স্থাবর ছবির পাশে লোকটির তিন অবস্থার তিনটি ভঙ্গির ছবি তুলনায় চলন্ত বলিয়া বোধ হয়, এবং মনে হয় লোকটি বাঁ পা তুলিয়া মাটিতে নামাইল আমাদের চোখের সামনেই। আমরা এইরূপে একটা স্থির চিহ্নের তুলনায় অপর বস্তুর গতি নির্দ্ধারণ করি। চলন্ত ট্রেন, গাড়ী প্রভৃতির চাকায় যদি কোনো একটা চিহ্ন থাকে, তবে তাহার প্রথম ছবি তুলিবার সময় চিহ্নটি আমার দৃষ্টির যেখানে ছিল দ্বিতীয় তৃতীয় ছবি তুলিবার সময়ও চাকা ঘুরিয়া চিহ্নটি যদি ঠিক সেইখানেই আসিয়া ক্রমাগত হাজির হইতে থাকে তবে আমার দৃষ্টিরেখার সহিত ঐ চিহ্নটির অবস্থান বারবার একই হইতেছে বলিয়া, আমার মনে হইবে গাড়ীর চাকা স্থির হইয়া আছে, ঘুরিতেছে না, অথচ ছবি তোলার সময় প্রকৃত-পক্ষে তাহা অতি দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। সুতরাং চলন্ত ছবি দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। এক-একখানি ছবি যদি একএক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর দেখানো যায় তবে কিছুতেই তাহা হইতে গতি বা প্রবাহের ভাব মনে আসিবে না। যে পরিমাণ বেগে ছবির ফিতা ঘুরাইলে চোখে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মধারা প্রতিভাত হয় তাহার চেয়ে বেগ একটু কম হইলেই ছবি কাঁপিতেছে বলিয়া মনে হয়। একবার একটা সুড়ঙ্গপথে ট্রেন যাওয়ার ছবি তোলা দরকার হয়; সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকার, ট্রেনের গতির ফটোগ্রাফ তোলা ত দুষ্কর; তখন বুদ্ধি করিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে ট্রেন-খানা দাঁড় করাইয়া একটা গাড়ীতে ডোরা কাটিয়া চিহ্নিত করা হইল; তারপর একটা স্থির চিহ্নের সামনে হঠাৎ উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া একটা ডোরার ছবি তুলিয়া দ্বিতীয় ডোরাটা সেইখানে সরাইয়া আনা হইল, এইরূপে পঞ্চাশটা ডোরার ছবি তুলিয়া তাহা ফিল্‌মে অনেকগুণ বাড়াইয়া যখন সেকেণ্ডে ১৬ টা ছবির বেগে দর্শকদের দেখানো হইল তখন চোখের সামনে ক্রমাগত ডোরা সরিতেছে দেখিয়া দর্শকরা সুড়ঙ্গের মধ্যে গাড়ী চলিতেছে দেখিল, যদিও সে ছবি স্থির অচল ট্রেনেরই।

ফ্রীজ-গ্রীন নিজের সেই সামান্য উদ্ভাবন হইতেই ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এবং ইহার উন্নতির জন্য ১৫ হাজার টাকা খরচ করেন। ১৮৮৯ সালে ৭৫০ টাকা মূল্যের দুটি উন্নত ধরণের ক্যামেরা সংগ্রহ করিয়া প্রায় আধুনিক ফিল্‌ম্‌ হইতে প্রদর্শিত ছবির ন্যায় জীবন্ত ছবি দেখাইতে পারিয়াছিলেন। এই ফিল্‌ম্‌ ছিল ২০ ফুট লম্বা ও দৃশ্য হাইড-পার্কের একটা কোণের জন-প্রবাহ। এখনকার পক্ষে এই অতি ছোট নগণ্য ফিল্‌ম্‌ তৈয়ার করিতে তখন অশেষ অসুবিধা উত্তীর্ণ হইতে হইয়া-

বায়োস্কোপের রঙ্গমঞ্চ।
মধ্যস্থলে মূক অভিনয় হইতেছে, আশেপাশে অভিনয়ের সরঞ্জাম আছে, সম্মুখে পরিচালক অভিনয় পরিচালনা করিতেছে ও ফটোগ্রাফার ফটোগ্রাফ তুলিতেছে।

ছিল এবং উহা সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারা একটা বিশেষ রকম জয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ফ্রীজ-গ্রীন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"আমেরিকানেরা ও জার্ম্মানেরা আমার উদ্ভাবনা চট করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইল, এবং জার্ম্মানেরা প্রকৃতিগত উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে শীঘ্রই তাহা এমন উন্নত করিয়া তুলিল যে আমি উহা প্রথম উদ্ভাবন করিয়া একটা নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলাম এই আত্মপ্রসাদ ছাড়া তাহাতে আমার বলিতে আর কিছুই রহিল না।" বাস্তবিক জগতের প্রায় সকল উদ্ভাবনের প্রবর্ত্তকের এর বেশী দাবী করিবার কিছু থাকে না; বৈষয়িক পুরস্কার পায় সেই পরবর্ত্তী লোক যে উদ্ভাবয়িতার আইডিয়া বা ভাবটিকে লইয়া কাজে খাটায়, আর যিনি উদ্ভাবয়িতা তাঁহাকে শুধু শূন্য প্রশংসা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।—তারহীন টেলিগ্রাফের মূলতত্ত্বের (principle) সূচনা হইয়াছিল আমাদের বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের দ্বারা; কিন্তু মার্কনি তাহা কাজে খাটাইয়া সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এক লাভের কারবার ফাঁদিয়া বসিয়াছেন।

আজকালকার জীবন্ত-দৃশ্যের পরিচালকেরা সমস্ত পৃথিবীকেই নিজেদের রঙ্গমঞ্চ করিয়া দেশবিদেশের ছোট-ছোট নানা প্রেক্ষাগৃহে জগৎ-ব্যাপারের সহিত সকলের অতি সত্বর ও অতি সহজে পরিচয়সাধন করিয়া দিতেছেন। ইহার জন্য খরচের অন্ত নাই, উদ্যোগ আয়োজনের অবধি নাই। যে নগর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহার বর্ণনার সহিত মিলাইয়া প্রদর্শনের জন্য নকল নগর পুনর্নির্ম্মিত হইতেছে; যে কাল অতীত হইয়া রীতিনীতি পোষাক-পরিচ্ছদ বদলাইয়া দিয়া গেছে সে কালকে আবার নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত করা হইতেছে। পাঁচ ছয় বৎসর আগেও মাত্র কয়েক কুড়ি পোষাকেই সকল কালের ও দেশের পোষাকের কাজ চালানো হইত এবং দৃশ্যের জন্যও বাঁধা রঙ্গমঞ্চে কয়েক শত টাকা দামের দৃশ্যপট ব্যবহৃত হইত। কিন্তু আজ-

বায়োস্কোপের অভিনয়- পাশের ক্যামেরায় ধরা হইতেছে।

কালকার প্রদর্শকেরা নভেল বা নাটকের বর্ণনার ন্যায় দৃশ্য-চিত্রকেও কলা-সঙ্গত বাস্তবপ্রায় ও বিশেষ আবেষ্টনের বিশিষ্টতা দান করিতে চায়। আমেরিকার কালিফর্ণিয়া প্রদেশের ইনসেভিল নামক দৃশ্য-উৎপাদনের কৃত্রিম শহরের কথা পূর্ব্বে প্রবাসীতে (১৩২২, আষাঢ়) পঞ্চশস্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে; সেই শহরে বায়োস্কোপের ছবি তুলিবার জন্যই নানা দেশ ও কালের উপযোগী দৃশ্য গঠনের ও আবেষ্টন-সংস্থানের সুবিধা হইবে বলিয়া প্রাসাদ ও কুটির, মিউজিয়াম ও চিত্রশালা, পশুশালা ও উদ্যান, নানাবিধ যান ও বাহন, লাইব্রেরী ও স্কুল, দোকান-পসার, কারখানা কল, যুদ্ধ সম্পর্কীয় প্রাচীন ও আধুনিকতম সকলবিধ উপকরণ গঠিত সংগৃহীত ও পরিচালিত হইতেছে। এই খেলাঘরের শহরের বাসিন্দার সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও তাহাদের অভিনয়ের জন্য আধুনিকতম সভ্যতার সমস্ত উপকরণই সেখানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং সেখানে গেলে দেখা যায় চারিদিকে সর্ব্বদাই অভিনয় ও তাহার ফটোগ্রাফ-শ্রেণী তোলা হইতেছে। সেই একটুখানি খেলাঘরে ভারতবর্ষ ও চীন, প্রাচীন ও মধ্য যুগ, অভিনেতাদের ইচ্ছামত তাহাদের দৃশ্য পরিচ্ছদ ও রীতিনীতি লইয়া আবির্ভূত হইতে থাকে।

সেলুলয়েডের ফিতায় ফটোগ্রাফ-তোলা ও ছেঁদা করিয়া ফিল্‌ম্ তৈরি করার বড় বড় কারখানা সকল-দেশেই হইয়াছে। ফিল্‌ম্ ও ক্যামেরার নিত্য নূতন উন্নতি সাধিত হইতেছে। মাইল-ভোর লম্বা ফিল্‌মের ফিতা তৈয়ারি, তাহার গায়ে সারি সারি ফটোগ্রাফ তোলা, ফটোগ্রাফ ডেভেলাপ করা, শুকানো কি যে বিরাট ব্যাপার ভাবিলে বুঝা যায়; কল-কারখানা ও সজাগ বুদ্ধিতে সবই সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

মহা জনতা দেখাইবার দরকার হইলেও যাহারা ছবি তোলে তাহাদের ভাবিতে হয় না। তাহারা প্রচার

করিয়া দ্যায় অমুক দিন অমুক সময় বায়োস্কোপের জন্য এই বিষয়ে অভিনয় হইতে ছবি তোলা হইবে। অমনি সেই অভিনয় দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক পাহাড়ের মাথায় গাছের ডগা হইতে সমুদ্র-কিনার পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলে। ফটোগ্রাফার যথাসময়ে জনতার দিকে ক্যামেরা ঘুরাইয়া চঞ্চল জনসঙ্ঘের ছবি তুলিয়া সহজেই আপনাদের উদ্দেশ্য সম্পাদন করে। অনেক সময় অভিনয় দেখিতে সমাগত লোক-দের টিকিট বেচিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার পর্য্যন্ত করিয়া লয়।
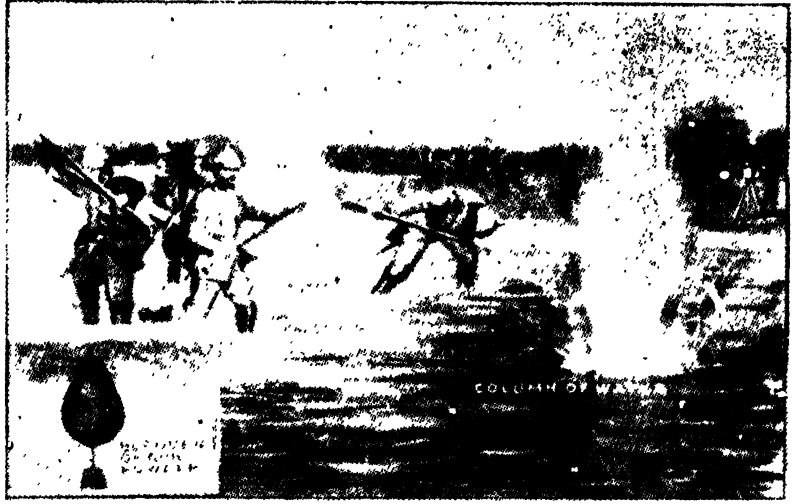
সৈন্য জল। পার হইবার সময় শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ প্রদর্শন।
ছবির বাঁ কোণে বারুদ-ভরা থলি ও ডাহিন কোণে থলি জ্বলিয়া ওঠাতে জলস্ফুরণ দেখানো হইয়াছে, মধ্যস্থলে দুজন সৈনিকের মাঝখানেও একটা জলস্ফুরণ আছে।

কোনো কোনো যুদ্ধ-ঘটনার ফিল্‌ম্ তুলিতে দু'তিন হাজার লোককে সাজাইয়া অভিনয় করাইতেও হইয়াছে।

অনেক সময় একটা বড় বাঁধা ষ্টেজ বা রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ঘরের ভিতরকার সমস্ত দৃশ্য অভিনয় করা হয় এবং ঠিক তাহার পাশে হইতে ছবি তোলা চলিতে থাকে—সে অভিনয়ের দর্শক শুধু ক্যামেরা ও বায়োস্কোপ কোম্পানির পরিচালকেরা। যে-সমস্ত দৃশ্য ফাঁকা জায়গার, সে-সমস্ত দৃশ্য যে দেশের সেই দেশে গিয়া বা সেই দেশের অনুরূপ অপর কোনো দেশে গিয়া খোলা জায়গাতেই অভিনয় করিয়া ছবি তোলা হয়; আমেরিকা এমন প্রকাণ্ড মহাদেশ যে সেখানে মেরু-দৃশ্য হইতে গ্রীষ্মমণ্ডলের দৃশ্য পর্য্যন্ত কিছুরই অভাব নাই; যুক্তরাজ্যের পূর্ব্ব বা আটলান্টিক উপকূলে শীতপ্রধান দেশের দৃশ্য ও পশ্চিম বা প্রশান্ত-মহাসাগরের উপকূলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দৃশ্য; সুতরাং যখন যেরকম দৃশ্য দরকার হয় তখন অভিনেতারা দলবল সাজসরঞ্জাম লইয়া তিন-চার শত মাইল দূরেও সেই রকম দৃশ্যের মধ্যে গিয়া অভিনয় করে। ফ্রান্সের বায়োস্কোপ-ফিলম্-নির্ম্মাতাদের এই সুযোগ নাই, তাহারা যথার্থ দৃশ্যের জন্য অষ্ট্রেলিয়া চীন ভারত আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইয়া অভিনয় করিয়া সেই-সেই দেশের দৃশ্যের মধ্যে ঘটনার ছবি তোলে। অনেক সময় সেই দেশে যাওয়ার প্রতিবন্ধক ঘটিলে কৃত্রিম দৃশ্যপট চিত্র ও গঠন করিয়া কৃত্রিম আলোক-পাতে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া কাজ চালাইয়া লওয়া হয়।

বায়োস্কোপে সূর্য্যোদয়, জ্যোৎস্না-প্লাবন, জলস্রোত, অগ্নিকাণ্ড, অপঘাত ও যুদ্ধব্যাপারের দৃশ্য খুব জমকালো ও লোকরঞ্জন হয়।

অনেকসময় কৃত্রিম আলোকপাতে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত ও জ্যোৎস্না-প্লাবনের ছবি তোলা হয়। অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যের জন্য অনেক ঘরবাড়ী সত্যসত্যই দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে হয়। অপঘাত মৃত্যু দেখাইবার সময় ঠিক মুহূর্ত্তে আসল অভিনেতা লোকটিকে সরাইয়া তাহার বদলে ঠিক তাহারই মতন হুবহু চেহারার ও পোষাকের একটা কৃত্রিম মূর্ত্তি জোগাইয়া লোকের মনে বিস্ময় ভয় ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। যুদ্ধের দৃশ্যও প্রায় সব ফাঁকি, কৃত্রিম অভিনয় মাত্র। কিন্তু সত্যের আভাস দিতে গিয়া অনেক সময় বাস্তবিকই দুর্ঘটনা ঘটে ও অভিনেতাদের অপঘাত মৃত্যু হয়। জিনিসপত্র নষ্ট অপচয় করার ত কথাই নাই। বায়োস্কোপওয়ালারা নিজেদের বাড়ীতে আগুন লাগা প্রভৃতি দুর্ঘটনাও ক্ষতি বলিয়া বিবেচনা করে না, ছবি তুলিয়া তাহা হইতেও লাভ

গোলন্দাজেরা দূরে শত্রুসৈন্য লক্ষ্য করিয়া যেন গোলা ছুড়িতেছে—

করে। যুদ্ধব্যাপারের অভিনেতাদের সঙ্গে স্প্রিং-দেওয়া সঙ্গিন, বারুদ-ভরা থলি, বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইবার যন্ত্র থাকে। কতকগুলা চাষাভুষা ধরিয়া একদলকে ইংরেজ সৈনিকের পোষাক ও অপর দলকে জার্ম্মান সৈনিকের পোষাক পরাইয়া একটু শিখাইয়া বুঝাইয়া তালিম করিয়া অভিনয় করায়। একদল অপর দলের ট্রেঞ্চ বা পগারে লাফাইয়া পড়িয়া-পড়িয়া তুহাতি শত্রুদের সঙ্গিনের খোঁচা লাগাইতে থাকে, স্প্রিং-দেওয়া সঙ্গিনের ভোঁতা মুখ গায়ে ঠেকিতেই বন্দুকের দিকেই তিন চার ইঞ্চি বসিয়া যায় এবং তাহা দেখিয়া দর্শকেরা ভাবে লোকগুলার গায়েই অতখানি করিয়া সঙ্গিন বিঁধিয়া যাইতেছে এবং সেই অনুমানেই দর্শকের অন্তর বেদনা ও ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে থাকে। কখনো বা দেখা যায় একদল সৈন্য জলা ভাঙিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে ছুটে এবং শত্রুপক্ষের কামান হইতে গোলাবর্ষণ হইতে থাকে, জলের উপর গোলা পড়িলে জল উঁচু হইয়া ছিটকাইয়া উঠিতে থাকে অথচ লোক একটাও জখম হয় না। ইহার কৌশল এই যে ছবিতে একবার দেখানো হয় যেন শত্রুপক্ষের গোলন্দাজেরা এক জায়গা হইতে ক্রমাগত কামান দাগিতেছে, পরক্ষণেই দেখানো হয় অপর-এক জায়গায় অপর পক্ষের সৈনিকেরা হাত পা তুলিয়া কাত হইয়া পড়িতেছে, বারবার পর্য্যায়ক্রমে একবার এই দৃশ্য পরক্ষণেই অপর দৃশ্য দেখাইলে দর্শকের মনে কার্য্যকারণ সম্পর্ক অনুমানে প্রকৃত যুদ্ধে গোলা লাগিয়া জখম হইয়া পড়ার ছবি জাগিয়া উঠে। ভার বাঁধিয়া বারুদ-ভরা থলি জলের তলে স্থানে স্থানে ডুবাইয়া তাহাদের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ-পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়া রাখা হয়; বিদ্যুৎ-পরিচালক কলের এক-একটি চাবি টিপিয়া একএকটি থলির বারুদ জ্বালাইয়া দিলে সেখানকার জল তোড়ে উঁচু হইয়া উঠে এবং দর্শক ভাবে গোলা পড়িয়া জল ছিটকাইতেছে। মাটিতেও এইরূপে শেল পড়িয়া মাটি ফাটার নকল করা হয়; স্থানে স্থানে কৌটা ভরিয়া বারুদ পুতিয়া চিহ্ন করিয়া রাখে এবং সৈনিকেরা সেই সব চিহ্নিত স্থান বাঁচাইয়া একটু দূরে দূরে চলে, তাহারা নিরাপদ স্থানে আছে দেখিয়া পরিচালকেরা বিদ্যুৎ-কলের চাবি টিপিয়া একএকটি

বিরুদ্ধ পক্ষের গুলিগোলা লাগিয়াই যেন এপক্ষের সৈনিকেরা জখম হইয়া পড়িতেছে। দুই ছবি পরপর দেখাইয়া কার্য্যকারণ কল্পনা উদ্বুদ্ধ করিয়া দর্শকের ভ্রান্তি উৎপাদন করা হয়।

কৌটা ফাটায়, তাহাতে মাটি খুঁড়িয়া ছিটকাইয়া উঠে, খুব ধোঁয়া হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে দু-চারটা সৈনিকের কৃত্রিম মূর্ত্তি শূন্যে ছুড়িয়া দেয় ও সেগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়ে, দর্শক মনে করে ঐখানে শেল পড়িয়া বিষম কাণ্ড ঘটাইল। শুকনো পাতা ঘাস খড় জড়ো করিয়া আগুন লাগাইয়া খুব ধোঁয়া করে, এবং ধোঁয়ার মধ্যে সৈনিকেরা অজ্ঞান হইয়া পড়িবার ভান করে, ছবিতে মনে হয় জার্ম্মানরা বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছে। ক্রমাগত অসংখ্য সৈন্য যাত্রা করিতেছে এরূপ ভ্রম উৎপাদনের জন্য একটা

জানলার নীচে একজন লোক লুকাইয়া থাকিয়া একটা কলের চাকা ঘুরাইতে থাকে, সেই কলে দুটি চাকার বেড়ে একটা চামড়ার পটি জড়ানো থাকে, সেই পটির উপর বন্দুকের মুখে সঙ্গিনের মতন কতকগুলি মিথ্যা সঙ্গিন লাগানো থাকে, কলের একটা চাকা ঘুরাইলে সঙ্গিনের ডগাগুলি ক্রমাগত জানলার ধার দিয়া চলিয়া যাইতে থাকে, জানলায় একজন তরুণী দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কখনো বা রুমাল নাড়ে, কখনো বা ফুল ছুড়িয়া দ্যায়, কখনো বা চুম্বনের ইঙ্গিত করিয়া চোখ মুছে, এবং তাহা দেখিয়া দর্শকেরা অনুমান করিতে থাকে দেশের বীরেরা কাতারে কাতারে যুদ্ধে চলিয়াছে, তরুণী তাহাদিগকে শুভ-

যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদের বিদায়-সম্ভাষণ।
জানালার নীচে একজন লোক কল ঘুরাইয়া ক্রমাগত সঙ্গিনের ডগা চলিয়া যাওয়া দেখাইতেছে ও ঘরের ভিতর হইতে তরুণী রুমাল নাড়িয়া ভ্রান্তি জন্মাইতেছে যেন বাহিরে সৈনিকেরা চলিয়াছে।

কামনা করিয়া বিদায় দিতেছে এবং আপনার প্রেমাস্পদকে ফুল দিয়া চুম্বন করিয়া অশুভ অশ্রু মার্জ্জনা করিতেছে। দর্শকের মন আভাস ও অবভাস মাত্র দেখিয়া কল্পনার জোড়াতাড়া দিয়া একটা সম্পূর্ণ ঘটনা ও দৃশ্য অনুমান করিয়া লইতে থাকে। পুল, কেল্লা প্রভৃতি উড়াইয়া দিবার অভিনয়ের সময় যে-লোক ছবি তোলে সে ত নিকটে থাকিতে পারে না, কি জানি যদি একটা গোলা বা ভাঙা ইট পাথর লোহা ছিটকাইয়া আসিয়া গায়ে লাগে, সুতরাং সে দৃশ্যের নিকটে ক্যামেরা বসাইয়া অনেক দূর হইতে বিদ্যুৎ-বহ তার লাগাইয়া ক্যামেরার হাতল ঘুরাইতে থাকে, এবং তাহাতে ছবি কিছুই মন্দ হয় না। এইরূপে আসল যুদ্ধের ত্রিসীমানাতে না গিয়াও বায়োস্কোপ-ওয়ালারা কৃত্রিম
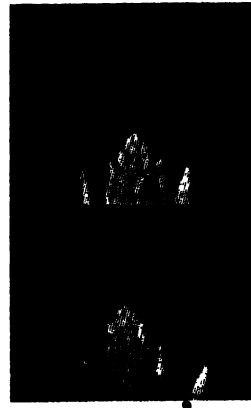
ফুলের কুঁড়ি হইতে ফুল ফোটার ক্রমবিকাশ।

অভিনয়ে ঠকাইয়া দর্শকদের মনে প্রকৃত যুদ্ধের ধোঁকা লাগায়, ছবিতে যাহা অসম্পূর্ণ থাকে দর্শকেরা কল্পনায় তাহা সম্পূর্ণ করিয়া পোষাইয়া লয়।

চলতি বিশেষ ঘটনার ফটোগ্রাফ লইয়া তাহা খবরের কাগজের মতন চটপট লোকের সামনে হাজির করা আজকালকার বায়োস্কোপের অঙ্গ, যেখানে যে কৌতূহলজনক ঘটনা যেই ঘটিতেছে অমনি তাহার ছবি বায়োস্কোপে দেখাইতে পারা বায়োস্কোপ-ওয়ালাদের প্রধান উদ্যোগ। ১৮৯৬ সালে রবার্ট পল নামে একজন ইংরেজ ডারবীর ঘোড়দৌড়ের পরদিনই লণ্ডনের আলহামরা থিয়েটারে তাহার চলন্ত ছবি প্রথম দেখাইয়া লোককে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল। ক্রমে এই প্রণালী সকলে অবলম্বন করিয়া দিনের ঘটনা সেইদিনই দেখাইতে পারিতেছে।

ছবিতে বাস্তবের ভ্রান্তি জন্মাইবার পক্ষে দর্শকের কল্পনা খুব সাহায্য করে; ছবি-প্রদর্শকরাও নানা কৌশলে তাহাতে বাস্তবতা আরোপ করিয়া দর্শকের কল্পনার সাহায্য করে। এই কৌশলের প্রধান অঙ্গ—কর্ম্ম-অনুযায়ী শব্দ উৎপাদন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিসন ছবির সহিত গ্রামোফোন জুড়িয়া ছবিদের দিয়া কথা বলাইবার উপায় করিয়াছেন; মুরহাউস্ নামক একব্যক্তি একটা কল তৈয়ারি করিয়াছেন তাহা হইতে ৫০ রকম যথার্থ শব্দের অনুকরণ করা যায়—যথা, ছেলের কান্না, কুকুরবিড়ালের ডাক, বন্দুকের আওয়াজ, ভারি জিনিস পড়া বা কাচভাঙার শব্দ, জলের স্রোত বৃষ্টি পড়া বা জলের মধ্যে চলার শব্দ ইত্যাদি।

দৈত্যের আবির্ভাবের রহস্য-উদ্‌ঘাটন।

একখানি ছবিতে পশ্চাতে নৈশ আকাশের ন্যায় কালো পর্দা টাঙাইয়া একজন লোকের বিকট ভঙ্গিতে ছবি তোলা হয় খুব বড় করিয়া; অপর একখানা ছবিতে বড় বড় উঁচু বাড়ী সুদ্ধ মানুষের আকৃতি তোলা হয় প্রথম ছবির তুলনায় খুব ছোট করিয়া; তারপর ঐ দুখানা নেগেটিভ পরপর একই কাগজের উপর ছাপিলে দৈত্যের আবির্ভাবের ছবি পাওয়া যায়।

বায়োস্কোপের অভিনয়ের জন্য খুব বড় বড় রঙ্গমঞ্চ আছে, একএকটা তৈয়ারি করিতে ৩০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছে; জগতের যত কিছু উপকরণ সেখানে সংগৃহীত থাকে। অভিনয় অবশ্য বোবার অভিনয়ের মতন হয় এবং তাহার দর্শক ও বিচারক থাকে ক্যামেরা। এই বোবার অভিনয় বড় কঠিন, কথার অভাব অঙ্গভঙ্গিতে সারিতে হয়, কেমন করিয়া নিজেদের ধরিলে ক্যামেরার চোখে সকল ভঙ্গি ধরা পড়িবে তাহার আন্দাজ রাখিতে হয়, এবং অতি সামান্য খুঁতও ক্যামেরার সর্ব্বদর্শী চক্ষু এড়াইবে না জানিয়া অতি সাবধান থাকিতে হয়, আবার সাবধানতার জন্য অভিনয় সহজ না হইয়া আড়ষ্ট হইলে সব মাটি। যে লোক ছবি তোলে তাহারও খুব পাকা আর্টিষ্ট হওয়া দরকার, বিচার করিয়া ক্যামেরা হটাইয়া হটাইয়া উপযুক্ত অবস্থান হইতে ছবি তোলা তাহার কর্ত্তব্য; ক্যামেরা সহজে হটাইবার জন্য তাহার পায়ায় চাকা থাকে ও বিদ্যুতের জোরে তাহা সহজেই চলে। একবার একজন লোক ব্যাঙের রকমসকমের ছবি তুলিয়া যখন পর্দার উপর ফেলিয়া দেখিল তখন দেখিতে পাইল সে যখন ক্যামেরা ঘুরাইয়া ছবি লইতেছিল তাহার ছায়া ব্যাঙের চোখে পড়িয়াছিল এবং সেই ছায়া এখন লেন্সের ভিতর দিয়া গিয়া পর্দায় বড় হইয়া উঠাতে ব্যাঙের চোখের মধ্যে তাহার ছবি তোলার রকমসকম হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে; তাহাকে সে ফিল্‌ম্ ত্যাগ করিতে হইল।

একএকটা বড় ঘটনা অভিনয় করিতে এক ঘণ্টার বেশী লাগে না; ছোট ছোট চুটকি ঘটনা ১০।১৫ মিনিটেই সারে। The Tale of Two Cities অভিনয়ে এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল এবং তাহার ফিল্‌ম্ হইয়াছিল ৩০০০ ফুট লম্বা।

সাধারণ থিয়েটারের ন্যায় বায়োস্কোপের অভিনয়ে বুড়াকে যুবা বা যুবাকে বুড়া সাজাইয়া চালানো যায় না, ক্যামেরার চোখে বয়স বড় সহজে ধরা পড়ে। এজন্য বুড়াকেই বুড়া ও অভাব পক্ষে আধা-বয়সীকে যুবকযুবতী সাজাইতে হয়। মুখে রং দিয়া আঁকজোক কাটিয়া চেহারায় বিশিষ্টতা দেওয়াও বায়স্কোপ-অভিনয়ে বেশী চলে না, কারণ

পর্দ্দার উপর ছবি এত বড় হইয়া পড়ে যে সমস্ত কৃত্রিম কারিগরি বিশ্রী হইয়া দর্শকের চোখে পড়ে। আজকাল মুখে কোনো রং না লেপিয়া শুধু শাদা রং করা হয়, তাহাতে রাগ দ্বেষ আনন্দে মুখের চামড়া যেমন ভাবে কুঞ্চিত হয় উজ্জ্বল আলোকে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়, এবং তাহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

একই দিনে এক ষ্টেজে দু-তিনটি অভিনয় হয় এবং একই অভিনেতা সময়মত সকল অভিনয়েই যোগ দ্যায়। ইহাতে অভিনয় থামিয়া থামিয়া খানিক খানিক করিয়া করিতে হয়। এবং কোন্ অভিনয়ের কোন্ কোন্ অংশ অভিনয়ে কত সময় লাগিবে তাহা আগে ঠিক করিয়া সেই অনুসারে মহলা দিয়া দিয়া স্থির করিয়া লওয়া হয়। অভিনয়ের সময় পরিচালক চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া ক্রমাগত হুকুম ও উপদেশ দিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে কোনো অভিনেতাই থতমত খায় না, সকলে সেই নির্দ্দেশ অনুসারে অভিনয় করিয়া যায়।

খোলা জায়গায় অভিনয়ের সময় অনেক মজা হয়। একবার একটা মারামারি দাঙ্গার অভিনয়কে সত্য বলিয়া ভ্রম করিয়া পুলিস্ সকলকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। একবার এক রাস্তায় রাত্রে অভিনয় হইতেছিল, ঘুমের ব্যাঘাত হওয়াতে একজন লোক আসিয়া আপত্তি করে; অভিনেতা পুলিস আসিয়া তাহাকে শান্তিভঙ্গের জন্য গ্রেপ্তার করিতে চাহিলে সে বেচারা সুড়সুড় করিয়া বাড়িতে ঢুকিল, অভিনেতারা হাসিতে-হাসিতে অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইল।

বায়স্কোপের অভিনয়ের প্লট লিখিয়া অনেক লোক বেশ দুপয়সা রোজগার করে। কল্পনা ও বিজ্ঞান দুইএ মিলিয়া বিচিত্র দৃশ্য উৎপন্ন করে।

ফরাসী অধ্যাপক ডাক্তার কোমাঁদোঁ বায়োস্কোপের ছবি তুলিবার ক্যামেরার চোখে অনুবীক্ষণ জুড়িয়া চর্ম্মচক্ষুর অগোচর জীবাণুদের ও কীটপতঙ্গাদির জীবনলীলা সাধারণের গোচর করিবার উপায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পার্সী স্মিথ ডিম হইতে পাখীর ও সাপের বাচ্চা বাহির হওয়ার ও বীজ হইতে গাছের ফুলফল ধরা পর্য্যন্ত ক্রিয়া বায়োস্কোপের ছবিতে দেখাইবার উপায় আবিষ্কার করেন। ডিমের খোলা স্বচ্ছ নয়; সুতরাং

মোটর-গাড়ী চাপা পড়িয়া অপঘাতে পা কাটার দৃশ্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন।
একজন পা-কাটা লোককে ও একজন পা-ওয়ালা লোককে ঠিক একরকম করিয়া সাজানো হয়; পা-ওয়ালা লোকটা রাস্তায় পড়িয়া ঘুমাইবার ভান করে ও মোটর-গাড়ী ছুটিয়া আসে; একটা চিহ্নিত জায়গায় আসিয়া গাড়ী থামে, ছবি-তোলাও অমনি বন্ধ করা হয়; তখন সেই মোটর-গাড়ী চালাইয়া আনিয়া যেখান হইতে পা কাটিবে পায়ের ঠিক সেইখানে চাকা ঠেকাইয়া দাঁড় করানো হয়; তারপর সেই লোকটা উঠিয়া যায়, তাহার স্থানে পা-কাটা খঞ্জ লোকটি আসিয়া শয়ন করে ও তাহার কাটা পায়ের সঙ্গে দুটি কৃত্রিম পা ঠেকাইয়া রাখা হয়; যে চিহ্নিত স্থানে গাড়ী প্রথম থামিয়াছিল, সেইখানে গাড়ী পিছু হটাইয়া লইয়া গিয়া আবার ছবি তোলা আরম্ভ হয় এবং চাকার লিক ধরিয়া গাড়ী চালাইয়া কৃত্রিম পায়ের উপর দিয়া পার করা হয়; তখন সেই খঞ্জ কৃত্রিম পাদুখানি দুহাতে তুলিয়া খেদ ও ক্রোধ করে; তখন গাড়ীর সওয়ার ডাক্তার নামিয়া পা সেলাই করিতে বসেন; এই সময় আবার ছবি তোলা বন্ধ করিয়া খঞ্জকে সরাইয়া পা-ওয়ালা লোকটিকে ঠিক সেই জায়গায় বসানো হয়, এবং আবার ছবি তুলিতে আরম্ভ করে; একটু পরেই ডাক্তার হাত ধরিয়া লোকটাকে খাড়া করিয়া দ্যায়, সেও দিব্য হাঁটিয়া বেড়ায়, লোকে ভাবে—বাঃ। ডাক্তারের চিকিৎসার কি কেরামতি, কাটা পা জোড়া লাগিল।

ডিমের ভিতরকার ভ্রূণের জীবনপ্রণালীর ছবি ডিম পাড়ার দিন হইতে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হওয়ার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লইবার জন্য প্রত্যহ একএকটি ডিম ভাঙিয়া ভ্রূণের ছবি হাতে আঁকিয়া তাহা হইতে ফিল্ম্ করিতে হয়, তাহার সঙ্গে ডিম হইতে ছানা বাহির হইবার ব্যাপারটুকুর ছবি ফটোগ্রাফ করিয়া জোড়া হয়। যে ডিম ফুটিতে
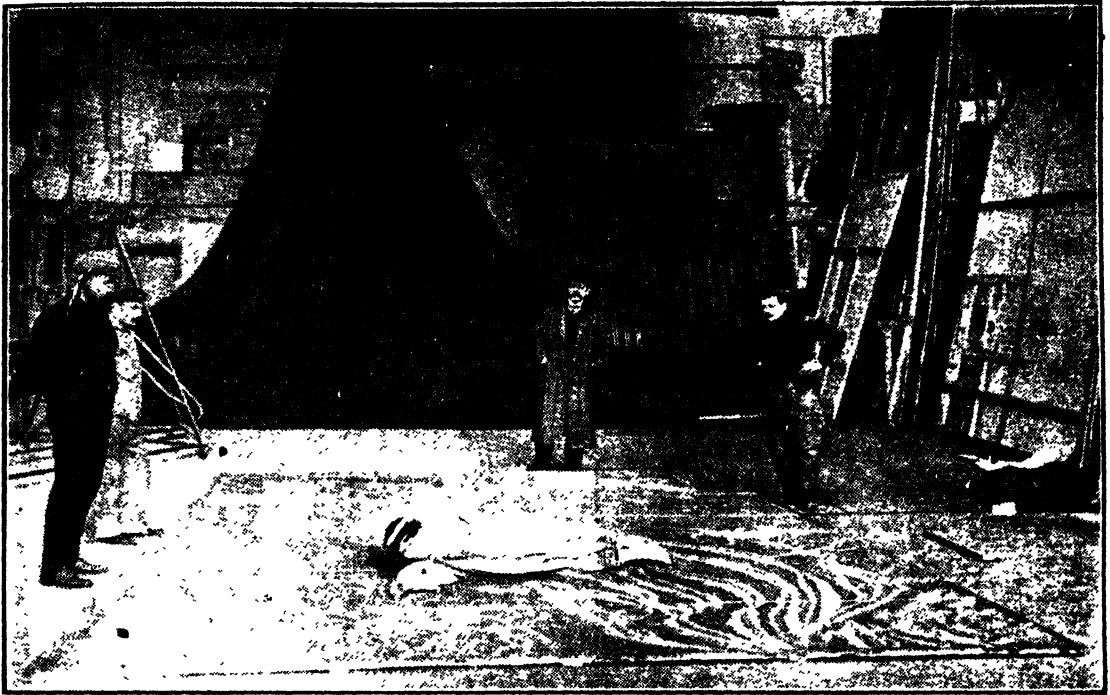
জলদেবীর জলে সঞ্চরণের রহস্য-উদ্‌ঘাটন।
একখানা চিত্রিত-পাটার উপর শুইয়া সন্তরণের ভঙ্গির ছবি ছাদ হইতে ক্যামেরা নীচুমুখ করিয়া বসাইয়া তোলা হইতেছে।

২১ দিন বা ৫০০ ঘণ্টা লাগে তাহার ভ্রূণ-পরিণতির ব্যাপার বায়োস্কোপের ছবিতে এক মিনিটে দেখিতে পাওয়া সম্ভব হওয়াতে লোকের শিক্ষালাভের কত সুবিধা হইয়াছে। একই সময়ে পোঁতা অনেকগুলি বীজের এক-একটি মাটি হইতে মধ্যে মধ্যে বাহির করিয়া বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হওয়া পর্যন্ত মাটির তলের ব্যাপারটার ছবি তোলা হয়, তারপর স্মিথের উদ্ভাবিত একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সেই অঙ্কুর হইতে গাছের পরিণতি ও তাহাতে ফুলফল ধরার ব্যাপারের ছবি দিবারাত্রি আধ ঘণ্টা অন্তর আপনা-আপনি লইতে থাকে। পরে সেই-সমস্ত অনেক দিনের অল্প অল্প করিয়া ঘটার ছবি এক মিনিটে চোখের সামনে দিয়া লইয়া যাওয়াতে বীজ হইতে গাছে ফুলফল ধরা পর্য্যন্ত ঘটনার সমস্ত ক্রম সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

প্রকৃতিতে যাহা বহুদিন ধরিয়া ঘটে তাহার ছবি লইয়া অল্প সময়ে তাহা ঘটাইয়া দেখাইলে ভেল্কি বলিয়া মনে হয়। বায়োস্কোপে নানা কৌশলে নানাবিধ সম্ভব ও অসম্ভব ঘটনার ভেল্কিবাজি দেখাইয়া দর্শকদিগের কৌতুক উৎপাদন করা হয়—সেগুলি শুধুই নানা কৌশলে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো। ম্যসিয় মেলিয়ে নামক একজন ফরাশী প্রথমে বায়োস্কোপে ভেল্কি দেখাইতে আরম্ভ করেন।

অদৃশ্য তার বাঁধিয়া জিনিসপত্র বা পুতুল চলাফেরা করানো হয়। খাট বিছানা ইত্যাদি বড় জিনিস লোকে লুকাইয়া থাকিয়া ঠেলিয়া লইয়া বেড়ায়। একটা ব্যাপারের ছবি তুলিতে-তুলিতে থামিয়া সেই ছবির সঙ্গে অপর ছবি ছাপিয়া (stop motion and double printing method) অনেক ভেল্কি তৈয়ার করা হয়। দুবার দুটি ছবির নেগেটিভ লইয়া একই কাগজে দুটির ছবি একত্রে ছাপিয়া (double printing) অতিকায় দৈত্য প্রভৃতির আকার উৎপন্ন করা হয়; একটা নেগেটিভের ছবি যদি বড় থাকে ও অপরটার ছবি খুব ছোট ছোট হয়, তবে ঐ দুই ছবি একত্র ছাপিলে ছোট ছবির তুলনায় সেই

বড় ছবিটাকে অপ্রাকৃতিক অতিকায় বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। একটি খোকার ছবি যদি ১০ ইঞ্চি খাড়া হয়, আর একজন বুড়ার ছবি মায় তাহার পশ্চাতের বাড়ীঘর পর্য্যন্ত যদি দুই ইঞ্চি হয় তবে ঐ দুটি ছবি একত্র এক কাগজের উপর পাশাপাশি ছাপিলে মনে হইবে খোকাটি অতিকায় বিরাট পুরুষ, যেহেতু সে গাছ বাড়ী প্রভৃতির চেয়েও লম্বা! নিকটে ক্যামেরা রাখিয়া ছবি তুলিলে ছোট জিনিসেরও বড় ছবি হয়, দূরে সরাইয়া তুলিলে বড় জিনিসেরও ছোট হয়; যদি নিকটে হইতে ক্রমশ দূরে ক্যামেরা সরানো যায় তাহা হইলেও এইরূপ বড় ছোট লোকের একত্র সমাবেশে লিলিপুট বা ব্রবডিংনাগ সৃষ্টি করা যায়।

জলদেবীর জলের মধ্যে সঞ্চরণ।

হঠাৎ আবির্ভাব বা মিলাইয়া যাওয়ার কৌশল এইরূপ —একটা ঘটনার ফটোগ্রাফ লইতে-লইতে ছবি লওয়া বন্ধ করা হয়, তখন যাহার আবির্ভাব বা তিরোভাব দেখাইতে হইবে সে অভিনয়ের স্থানে আসিয়া দাঁড়ায় বা সরিয়া চলিয়া যায় এবং তাহার পর আবার ছবি তুলিতে আরম্ভ করা হয়। এই ছবির ছায়া দেখিবার সময় দর্শকেরা দেখিবে হঠাৎ একটা লোক আবির্ভূত হইল বা মিলাইয়া গেল। এই প্রণালীকে stop motion বলে।

চন্দ্রলোকে বা শনির বলয়ের উপর মোটর চালানোর ভ্রান্তি উৎপাদন করা হয় নকলের দ্বারা। আসমানি রঙের একখানা কাপড়ের উপর মেঘ তারকা আঁকা হয় এবং তাহার মধ্যে চন্দ্র বা শনি-বলয়ের অনুরূপ একটা কাঠের গোলা ও চাকা আঁটিয়া দেওয়া হয়; একটা খেলনা মোটর গাড়ীতে দুটি পুতুল চড়াইয়া তাহা চন্দ্রমণ্ডল বা শনি-বলয়ের উপর দিয়া চালাইয়া ছবি তোলা হয়। ভ্রান্তি প্রবল করিবার জন্য এই ভেল্কির আগে ও পরে একখানা মোটর গাড়ীতে বাস্তবিক দুজন লোক চলিতেছে দেখানো হয় এবং খেলনা মোটর-গাড়ী ও পুতুল দুটি সত্যকার গাড়ী ও চড়নদারদের অনুরূপ করা হয়!

রেলগাড়ীর ঠোকাঠুকি ও গাড়ী চূর্ণ হইয়া উল্টাইয়া পড়া প্রভৃতিও খেলনা গাড়ী দিয়া অভিনয় করাইয়া ছবি তোলা হয় এবং ছোট গাড়ীর বড় ছবি দেখিয়া যথার্থ ঘটনাভ্রমে দর্শকদের রোমাঞ্চ হইতে থাকে। রবার্ট পল এইরূপ সত্যের ভ্রান্তি-উৎপাদক নকল জিনিসের বহু ছবি কৌশল করিয়া তুলিয়াছেন।

চুম্বক মানুষ পথ দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে আর লোহার জিনিস তাহার গায়ে লাগিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে— রাস্তার নর্দ্দমার লোহার ঢাকনি উঠিয়া গড়াইতে লাগিল, গ্যাসের আলোর থাম টানের চোটে ভাঙিয়া পড়িল— দেখিয়া দর্শকের কৌতুক ও বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ইহাও অদৃশ্য তারের টানে ঘটে; নর্দ্দমার ঢাকনি কাঠের ও ল্যাম্প-পোষ্ট মাঝখানে কব্জা-দেওয়া তৈয়ারি করিয়া রাখা হয়।

বুড়ী হঠাৎ যুবতী বা যুবতী হঠাৎ বুড়ী হইয়া পড়া দেখাইতে হইলে ছবি তোলা থামাইয়া বুড়ীকে সরাইয়া বুড়ীর স্থলে অপর একজন যুবতীকে বা যুবতীর স্থলে একজন বুড়ীকে আনিয়া আবার ছবি তোলা হয় এবং সেই ছবি অবিচ্ছেদে দেখিয়া দর্শক মনে করে হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ইহাকে Stop and substitution প্রণালী বলে।

সাইকেল, ঘোড়া, মানুষ, মোটর-গাড়ী পিছন দিকে ছুটিতেছে বা একটা জিনিস গড়াইয়া উঁচুতে উঠিতেছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মানো হয় মোটরের সামনে-ছোটার বা জিনিসের নীচে-গড়াইবার ছবির ফিতা উল্টা পাকে ঘুরাইয়া তাহার ছায়া দেখাইয়া।

একজন লোক দৌড়িয়া যাইতে যাইতে সামনে দেখিল একটা চিমনি, মারিল লাথি, চিমনি ভাঙিয়া পড়িল—দেখানো হয় দুটি ছবি একত্র জুড়িয়া; একটি, মানুষ দৌড়িয়া চিমনির কাছে গিয়া চিমনিতে ঠেকিল তাহার ছবি, ও অপরটি কোনো একটা চিমনি ভাঙিয়া পড়ার ছবি; উভয় ঘটনা একসঙ্গে পরপর ঘটিতে দেখিলে দর্শকেরা কার্য্য-কারণ অনুমান করিয়া লয়। লোকটি যেখানে চিমনিতে ঠেকিয়াছিল প্রথম ছবির সেই অংশটি যদি ভাঙিয়া পড়া চিমনির মাঝখানে জুড়িয়া দেওয়া যায় তবে মনে হইবে লোকটা দৌড়ের বেগে খাড়া চিমনি বাহিয়া উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে ও তাহারি ধাক্কায় চিমনি ভাঙিয়া পড়িতেছে।

জলদেবী জলের তলে সাঁতার দিয়া ফিরিতেছে দেখানো হয় কয়েক রকমে। (১) একটা খুব বড় চৌবাচ্চার তিন দিক খুব চকচকে পালিশ করা থাকে ও তাহার সামনের দিকে খুব স্বচ্ছ কাচ থাকে; কতকগুলি সামুদ্রিক জলজ উদ্ভিদ, কতকগুলি মাছ, ও বুদ্বুদ উঠাইবার জন্য গ্যাস ছাড়িবার উপায় সেই চৌবাচ্চার জলের মধ্যে রাখা হয়; কাচ-দেয়ালের বাহিরে একটি রমণী জলদেবী সাজিয়া, বসিয়া দাঁড়াইয়া শুইয়া কাত হইয়া হেলিয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে এবং দুচারজন জলচারিণী চৌবাচ্চার জলে ডুব সাঁতার কাটে; মাছের বিচরণ, জলচারিণীর ডুবসাঁতার, জলজ উদ্ভিদ, বুদ্বুদ সমস্ত মিলিয়া ভ্রান্তি জন্মায় যে জলদেবী জলের মধ্যেই বিচরণ করিতেছে। অথবা (২) একটা বড় তক্তার উপর সঞ্চরণশীল মাছ জলজ উদ্ভিদ বুদ্বুদ প্রভৃতির ছবি আঁকিয়া তক্তাখানি মেঝের উপর পাতা হয় এবং অভিনেত্রী জলদেবী সাজিয়া সেই তক্তার উপর শুইয়া সাঁতারের অঙ্গভঙ্গি করিতে থাকে; ছাদের উপর হইতে নীচুমুখে ক্যামেরা রাখিয়া সেই প্রক্রিয়ার ছবি তুলিয়া খাড়া পর্দ্দার গায়ে ছায়া ফেলিলে ভ্রম হইবে যে জলদেবী জলের মধ্যেই বিচরণ করিতেছে। (৩) মাছ-জিয়ানো চৌবাচ্চার ফটোগ্রাফ একটু under-exposure করিয়া তুলিয়া সেই প্লেটেই যদি জলদেবীর তক্তায় বিচরণ তোলা যায় তাহাতেও ভ্রান্তি উৎকৃষ্ট হয়। জলের ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় আলোর ব্যবস্থা এমন ভাবে করিতে হয় যাহাতে ফটোগ্রাফার ও তাহার ক্যামেরার ছায়া জলে পড়িয়া ফটোগ্রাফে প্রতিফলিত হইয়া না উঠে।

মোটর-গাড়ী বা মানুষ তাড়া খাইয়া খাড়া বাড়ীর দেয়ালের গায়ের উপর দিয়া দৌড়াইয়া পলাইতেছে দেখানো হয় এইরূপেই। একটা বড় মেঝের উপর বাড়ীঘর গাছপালা আঁকা হয় ও তাহার উপর দিয়া মোটর বা মানুষ ছুটিয়া যাইবার সময় ছবি তোলা হয়; তাহার ছায়া খাড়া পর্দ্দায় পড়িলে ভ্রান্তি জন্মে।

একটা লোক তাড়া খাইয়া একটা মস্ত উঁচু চিমনির ভিতরের ছেঁদা বাহিয়া উপরে উঠিতেছে এইরূপেই দেখানো হয়। মেঝের উপর কাত করিয়া শোওয়াইয়া চিমনির আকারের একটা কাঠের নল রাখা হয়; একটা লোক তাহার একমুখ দিয়া ঢুকিয়া বুকে হাঁটিয়া অপর মুখ দিয়া বাহির হয়। তাহার ছবির ছায়া খাড়া পর্দ্দার গায়ে পড়িলে মনে হয় লোকটা খাড়া চিমনি বাহিয়াই উপরে উঠিতেছে।

অনেক সময় দেয়ালের গায়ে টিকটিকির ন্যায় মানুষ বিচরণ করিতেছে এবং তাহারা যেন সরীসৃপের ন্যায় হাতপা টানিয়া বুকে হামা দিয়া ফিরিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই ইন্দ্রজাল সৃষ্টি খুব সহজে করা যায়। অভিনেতারা নীচে মেঝের উপর শুইয়া চারিদিকে বিবিধ অঙ্গভঙ্গি করিয়া বুকে হাঁটিয়া বেড়ায় এবং উপর হইতে ক্যামেরা নীচুমুখ করিয়া ছবি তোলা হয়; সেই ছবির ছায়া খাড়া পর্দ্দার গায়ে পড়িলে মনে হইবে লোকগুলা খাড়া দেয়ালের গায়ে বুকে হাঁটিয়া বা মাথা নীচে পা উপরে করিয়া বিচরণ করিতেছে।

হঠাৎ আবির্ভাব বা তিরোধান, ছায়ামূর্ত্তি হইয়া মিলাইয়া যাওয়া, স্মৃতিতে বা কল্পনায় অপ্রত্যক্ষ ঘটনা প্রতিভাত হওয়া প্রভৃতির কৌশল খুব সাধারণ। অনেক সময় একটি ঘটনা-শৃঙ্খলার ছবির মাঝখানে অপর একটি ঘটনার ছবি জুড়িয়া বা একটি ঘটনাপরম্পরার ছবি হইতে কিয়দংশ বাদ দিয়া হঠাৎ আবির্ভাব বা তিরোধান বা অপ্রত্যক্ষ ঘটনা স্মৃতিতে বা কল্পনায় প্রতিভাত বলিয়া বুঝানো হয় এবং দর্শকদের মন ছবির

বিপথগামিনী উৎসব-মত্তা কন্যার আনন্দের মধ্যে হঠাৎ মায়ের
একক জীবনের দুঃখে ও কন্যার শোকে ব্যাকুলতার
ছবি মনে পড়াতে কন্যার উদ্বেগ প্রদর্শন।

এক বিষয়ের চিত্রাবলীর মধ্যে অপর ঘটনার আভাস-চিত্র দিয়া প্রথম-ঘটনার সংশ্লিষ্ট লোকদের স্মৃতি কল্পনা বা অনুভূতির পরিচয় জানানো হয়।

সকল অনম্পূর্ণতা অনুভবের-দ্বারা সম্পূরণ করিয়া লয়। ছবি তুলিবার সময় ক্যামেরা ফোকাসের বা দৃষ্টিকেন্দ্রের বাহিরে রাখিয়া ছবি তুলিতে-তুলিতে ক্রমশ আগাইয়া ঠিক ফোকাসে পৌঁছিলে আবছায়া স্পষ্ট মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিতেছে বলিয়া ভ্রম হয় এবং উহার উল্টা রকমে ফোকাস হইতে ক্যামেরা ক্রমশ হটাইয়া লইলে একটা মূর্ত্তি ছায়া হইয়া বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরার লেন্সের মুখে বিবিধ পর্দ্দা লাগাইয়া অথবা ছবি ছাপিবার সময় কিয়দংশ অল্প অল্প ছাপিয়া আবছায়া করাও হয়। এ সমস্তই দৃষ্টির বিভ্রম ও মানসিক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই দৃষ্টিবিভ্রম ভালো করিয়া ঘটাইবার ও চিত্রে বাস্তবতার অবভাস আরোপ করিবার জন্য ছবিতে প্রাকৃতিক পদার্থের বর্ণ-সমাবেশের চেষ্টা, বায়োস্কোপের যন্ত্র ও ছবির বিশেষ উন্নতি হইবার আগে হইতেই চলিতেছে। ১৮৮৯ সালে গ্রীন ও ১৮৯৭ সালে ফ্রেডরিক আইভস্ নামক দুজন লোক ফটোগ্রাফে রং করিয়া ছবি দেখাইয়াছিলেন। বায়োস্কোপের সকল বিভাগের উন্নতির ন্যায় এ বিভাগের উন্নতিও রবার্ট পল ও পার্সী স্মিথ হইতে হইয়াছে। আগে ছবি হাতে রং করিয়া রঙিন ছায়া দেখানো হইত; এখন রঙিন ফটোগ্রাফ তুলিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

মানুষের মন যে কত স্বল্প উপকরণে কত বড় বড় জটিল ব্যাপার কল্পনায় গড়িয়া লইতে পারে বায়োস্কোপ তাহার প্রধান সাক্ষী ও দৃষ্টান্ত।

বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ্-পণ্ডিত অধ্যাপক মুন্‌ষ্টারবার্গ। ইনি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কস্‌মোপলিটান নামক খবরের কাগজে ইনি বায়োস্কোপে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে "ভবিষ্যৎ বায়োস্কোপ বিশেষভাবে ভাব রাগ কল্পনা লইয়া খেলা করিবে এবং তাহা দেখিয়া সাধারণ লোকে মনস্তত্ত্বের জটিল গহনে সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে। থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় মনের অব্যক্ত ভাব দর্শকদের বুঝাইবার কোনই উপায় নাই, কিন্তু বায়োস্কোপে তাহার সুযোগ আছে বলিয়া ইহা থিয়েটারের অভিনয়ের চেয়ে ঢের ভালো। একজন খুনী সাধু সাজিয়া লোক ঠকাইয়া কোনো কাজ করিতে যাইয়া আপনার পাপের স্মৃতিতে বিব্রত হইতেছে, অথবা একজন অন্যায়চারী আপনার অতীত জীবন বা মর্ম্মপীড়িত আত্মীয়স্বজনের কথা স্মরণ করিয়া কাতর হইতেছে, ইহা দেখাইবার উপায় থিয়েটারের অভিনেতাদের নাই, কিন্তু বায়োস্কোপে আসল ঘটনার ছবির মধ্যে একপাশে অভিনেতার মনের মধ্যেকার চিন্তারাজ্যের ঘটনার ছবি জুড়িয়া সহজেই মনের অবস্থা প্রকাশ করিয়া বুঝানো যায়। মানুষ ক্রমশই উন্নত হইয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি হইতেছে, তাহার আর মোটা জিনিসে বা স্থূল রসে তৃপ্তি হয় না; সে পুরাকালের ঘটনা-প্রধান মহাকাব্য ছাড়িয়া ভাবপ্রধান গীতিকাব্যের আদর করিতেছে, বাহিরের ঘটনার বর্ণনা-বহুল নাটক উপন্যাস ছাড়িয়া মনের ঘটনার বর্ণনা অবলম্বন করিতেছে; মানুষের মনের মূল ভাবরস —শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র

শান্ত বাৎসল্য—চিরন্তন; মানব-মনের ইতিহাসের গোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দশ রসের অতিরিক্ত কোনো রস আবিষ্কৃত বা নূতন উদ্ভূত হয় নাই, কালে-কালে মানুষের মনের পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে রসানুভূতির প্রকার মাত্র প্রভেদ হইয়া চলিয়াছে; আগে কেবলমাত্র দৈহিকমিলনের ভাবই আদিরসের উপজীব্য ছিল, এখন তাহা জুগুপ্সার বিষয় হইয়া নরনারীর মনোবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতই সাহিত্যের বিষয় হইয়াছে; আগে কদর্য্য ভাঁড়ামি ও কুৎসামূলক গালি হাস্য-রসের বাহন ছিল, এখন তাহা বীভৎস রসের কোটায় গিয়া পড়িয়াছে, তারস্বরে বিনাইয়া-বিনাইয়া বিলাপ এখন করুণার উদ্রেক না করিয়া হাস্যরসের উদ্রেক করে; অর্থাৎ মানুষের মন ক্রমশ সূক্ষ্ম ভাব গ্রহণে পটু হইয়া উঠিতেছে, বাহিরের স্থূল ঘটনা ছাড়িয়া সেই-সব ঘটনার মূল সূক্ষ্ম অগোচর কারণের সন্ধানে ব্যগ্র হইয়াছে; সুতরাং যে অভিনয় মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে তাহাই সমাদৃত হইতে বাধ্য। বায়োস্কোপ এইরূপ একটি সাধন, যে দৃশ্য-অভিনয়ের কলাচাতুরীতে অন্তর্জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য—আমাদের অনুভূতি, স্মৃতি, কল্পনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, অভিনিবেশ—ধরা পড়িয়া বাহিরে বিকাশ পাইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারিতেছে। প্রণয়ের প্রথম প্রভার রঙিন আলোকে যুবতীর চোখে সমস্ত বিশ্বসংসার রঙের নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে বলিয়া অভিনেতার মুখ দিয়া কবি বলাইতে পারেন কিন্তু তাহার চোখে পৃথিবীর ধূলি পর্য্যন্ত মধুময় হইয়া উঠিয়াছে দেখাইতে পারে শুধু বায়োস্কোপ। যাহারা ভাবে যে উপকথার পরীস্থানের ব্যাপারেই এমন সব রঙিন দৃশ্য দেখানো সাজে তাহারা সত্যকার আর্ট জিনিসটাকে বুঝে না। মানুষের মনের মধ্যে আনন্দের সোনার কাঠির স্পর্শে কত বিচিত্র রং যে জাগিয়া উঠে, কত মধুধারা যে ফোয়ারায় স্ফুরিত হয় তা যাহারা মনের রাজ্যের একটু খবর রাখে তাহারাই জানে। যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তরের বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটাইয়া খাপ খায় তাহাই প্রকৃত আর্ট। এইজন্য উদ্ভট কল্পনার দৃশ্যও রূপ ধরিয়া দৃষ্টির সম্মুখে আসিলে নিতান্ত বস্তুতন্ত্র নাটকের অভিনয়ের ন্যায়ই আমাদের মনের গ্রহণীয় হয়। সুতরাং বায়োস্কোপ-ওয়ালার সেই সাহস থাকা চাই যাহাতে সে দর্শকদের মনে এই বোধ জন্মাইয়া দিতে পারিবে যে তাহারা একটি কলা-ভবনে, আর্টের মন্দিরে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র দর্শকদের অভিজ্ঞতার স্মৃতির কল্পনার বা অভিনিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অভিনয় করিলেই হইবে না, অভিনয়ের সময় অভিনেতাদের ভাবরাগ প্রকাশ করিয়া দর্শকদের মনে তাহার সাড়া তুলিতে হইবে, তবেই দর্শকদের অভিনিবেশ হইতে স্মৃতি ও কল্পনা উদ্দীপ্ত হইতে পারিবে। ছবির অভিনয়ে মানুষের অভিনয়ের মতন যদি প্রণয় হিংসা ভয় আশা দেখাইয়াই পরিচালকেরা সন্তুষ্ট হয় তবে মানুষের অভিনয়ের কথার অভাবে দর্শকরা ক্ষুণ্ণই হইবে। অভিনয়ের প্রধান অঙ্গ কথা যখন বাদ পড়িতেছে তখন ছবির অভিনয় সেই ক্ষতি পুরাইয়া আরো অধিক কিছু না দিতে পারিলে লোকে গ্রাহ্য করিবে কেন? আমাদের মনের অভিনিবেশ যেমন সমস্ত বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও একাংশকে বিশেষ করিয়া গ্রহণ করে, ছবির অভিনয়ের জন্য ক্যামেরাকেও সেইরূপ মনের অভিনিবেশের কাজ লইয়া সমস্ত ঘটনার মধ্যে বিশেষ-বিশেষ অংশকে প্রধান করিয়া দেখাইতে হইবে; চঞ্চল মনে অনুভূতির ছাপ অবাধ ক্রমাগত হয় না, সেরূপ অবস্থা বুঝাইবার জন্য ক্যামেরাতেও ছাড়া-ছাড়া কাটা-কাটা ছবি তুলিতে হইবে, কিংবা ছবিগুলি কম্পিত হইতেছে দেখাইতে হইবে। ইহা সহজেই করা যায়। সেকেণ্ডে ১৬ খানা ছবি চালাইয়া যদি মাঝে-মাঝে ছবির ক্রম পাল্টাইয়া দি, ১,২,৩,৪,৫,৬, ছবি পরপর দেখাইয়াই চট করিয়া যদি উল্টা পাকে ৬,৫,৪, দেখাই এবং আবার ৪ হইতে ৯ পর্য্যন্ত দেখাইয়াই আবার ৯ হইতে ৬ ছবিতে ফিরিয়া যাই, তারপর ৬ হইতে ১২ ও ১২ হইতে ৯ এইরূপে ক্রমে চলাফেরা করি তাহা হইলে দর্শকদের মনে হইবে সমস্ত দৃশ্য প্রকম্পিত হইতেছে। সরল রেখাকে বক্র ও বক্রকে সরল করিয়া দেখাইয়াও মনের চঞ্চলতা প্রকাশ করা যাইতে পারে। এইরূপ উপায়ে ইউরোপীয় বাদ্যকরেরা বিবিধ মনোভাব, এমন কি প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতিভাস পর্য্যন্ত বাদ্যশব্দে প্রকাশ করিয়া থাকেন। মনের প্রশান্ত ভাব চারিদিকের প্রশান্ত ছন্দোময় ঘটনার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব। থিয়েটারের অভিনেতা শরীরের উৎকট ভঙ্গির দ্বারা ভয় প্রকাশ করে,

ছবির অভিনয়ে মানুষের ভক্তির সঙ্গে বিশ্বচরাচর ভয়ে চকিত হইয়া ভয়ের ভাবটাকে জোরালো করিয়া দিতে পারে।

"লোককে ক্রমে-ক্রমে বায়োস্কোপের মনস্তত্ত্বে তালিম করিয়া তুলিতে হইবে। বায়োস্কোপ সুন্দরের দূত ইহা লোককে বুঝাইতে হইবে। ইহা তখনই সম্ভব হইবে যখন বায়োস্কোপের পরিচালক ও দর্শক উভয়েই বুঝিবে যে বায়োস্কোপ থিয়েটারের মতন কেবল দেহের ক্রিয়া দেখাইলেই চলিবে না, মনের ক্রিয়া এখানে প্রাধান্যলাভ করিবে। নাটকে এই মনের ক্রিয়া কথায় প্রকাশ পায়, শ্রোতা তাহা অনুভব করে; বায়োস্কোপে সমস্তই চোখের ব্যাপার—মনকেও চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যেমন মনস্তত্ত্বের সংযোগে বৈজ্ঞানিকদের কার্য্য উন্নত ও সহজ হইয়াছে এবং উদ্দেশ্য সফল হইতেছে, বায়োস্কোপেও তেমনি পদার্থবিজ্ঞানের সহচররূপে মনস্তত্ত্ব যত প্রভাব বিস্তার করিবে বায়োস্কোপ ততই ছোট বড় সকল লোকের চিত্তরঞ্জন ও শিক্ষাদাতা হইয়া উঠিবে।"

বায়োস্কোপ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই বইখানি পড়িতে পারেন—Moving Pictures, by Frederick A. Talbot William Heinemann, London.

চারু।

সুখ

রক্তিম আঁখি-দুটি তার,
পদ্মের মত তার হাসি;—
সে যে মোর চিত্তের সার
সে যে মোর অন্তর-বাসী।

বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়ায়
অঙ্গের প্রতি আন্দোলে,
যৌবনের গন্ধ ছড়ায়
বাতাসের শ্বাস-হিল্লোলে।

ঘুমায় সে জ্যোৎস্নার মত
মুখ তার লুকিয়ে চায়,
স্বর্ণাভ-কুন্তল যত
অন্তর ধরিবার ফাঁদ।

সূর্য্যের মত জাগরণে
উষার মতন ফিরে চায়,
তন্দ্রা-আকুল ফুল-বনে,
চুম্বনে মাধুরী জাগায়।

মলয়ের মৃদু-কম্পনে
কাঁপে হেম অঞ্চলখানি,
পায়ে-পায়ে তারি সন্ধানে
লোটে হিয়া সার্থক মানি।

ছন্দের মত গতি তার,
গন্ধের মত করে খেলা,
অনিন্দ্য রূপ-সম্ভার,
আনন্দ-সঙ্গীত-মেলা।

বর্ণিমা অন্তর-রসে
রঞ্জিত কল্পনা-তুলি,
বিশ্বের চিত্ত-সরসে,
পদ্মের দল গেল খুলি।

সে যে মোর দুঃখের সুখ,
সে যে মোর অন্ধের আঁখি,
রঙিলতর সুরা-টুকু
পরাণ-পিয়ালা ভরে রাখি।

সরযূবালা সেন।

মনের বিষ

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! অদ্য আমার আবার বিবাহ। কম দুঃখে কবি সংসারকে নাট্যশালার সহিত তুলনা করেন নাই। এত মিথ্যা অভিনয়ও কি মানুষে করিতে পারে? আজ আমাকে বরবেশে সজ্জিত হইতে হইবে। প্রকৃতই কি আমি বিবাহপ্রার্থী বর? কাহাকে বরণ করিতে আমার বরবেশ? যে রমণী আমারই মৃত্যু কল্পনা করিয়া বিধবার অভিনয় করিতেছে, তাহারই বৈধব্যমোচনের জন্য আমার এত আয়োজন! আমি গিয়াছিলাম, আবার আসিয়াছি। যে প্রেমিকা একদিন আমাকে তাহার প্রণয়-লীলার অন্তরায় মনে করিয়াছিল, আজ সেই মোহিনীই প্রণয়-ভিখারিণী। আমার প্রণয়ে সে আজীবন পরিতৃপ্ত থাকিবে বলিয়া সে আজ দেবতার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিবে। নির্গুণ দেবতা, নিষ্ক্রিয় তুমি, নতুবা কি তুমি এরূপ অসার প্রতি-শ্রুতি নীরবে শ্রবণ করিতে পারিতে? প্রকাশ্যে পাপীর শাস্তি বিধানে তোমার শক্তি নাই। মনুষ্যের উষ্ণ শোণিত তোমার শিরায় প্রবাহিত হয় না; হইলে বুঝিতে আমার অন্তর কি বলিতেছে! বিশ্বরাজ্যের মালিক তুমি। অণুপরমাণুর মালিক নহ কি? চিরজাগ্রত তুমি; তোমার অণু কেন জাগে না। জাগাইতে তোমার ইচ্ছা নাই! কে বলে তুমি দয়াময়? গুরুপুরোহিত তোমার প্রশংসায় প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রয়াস পান। জানি না তাহারা নিজেরা সে-সকল সত্য জীবনে অনুভব করিয়াছেন কি না? মুখের কথা, কর্ণে ভাসে, হৃদয়ে তাহার সাড়া পাই না। অন্তরের ভাব প্রকাশ করিলে, তাহারা দম্ভে বলে অবিশ্বাসী। আজ পরীক্ষা প্রভু! হৃদয়-তৌলে মাপিয়া লইব, তোমার গুণ কতখানি, —যাহা, অসম্ভব সত্যই তাহা তোমাতে সম্ভব কি না! এত চিন্তা, এত কঠোর সাধনা,—সংসারে তাহার পুরস্কার নির্য্যাতন! দেখিব তুমি তাহার সাফল্য দান কর কি না? ধর্ম্মের অশনি পাপ-সংহারে গর্জ্জে কি না? চিন্তার পর চিন্তার প্রবাহ। উন্মত্তের কল্পনার ন্যায় অসংলগ্ন, অসংযত চিন্তা! কিছুতেই নিজকে স্থির রাখিতে পারিতেছিলাম না। প্রতিপদে ভয় হইতেছিল,—তীরে আসিয়া তরী নিমজ্জিত হয় বা!

দ্বিপ্রহর রাত্রিতে বিবাহ। প্রহর বাজিতেই ভিড়ুরী আমাকে বরবেশে সং সাজাইতে ব্যগ্র হইল। সাজিলাম। ক্রোড়পতি আমি; আমার বিবাহসজ্জার বর্ণনা নিষ্প্রয়ো-জন। দর্পণে আমার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া আমিই মোহিত হইলাম। বাহ্যিক চাকচিক্য মানুষকে কি এমনই মোহিত করে!

আমারই প্রাসাদে আমারই স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করিতে বরবেশে সমারোহ করিয়া উপস্থিত হইলাম। এই উপলক্ষে প্রাসাদ বিশেষভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে। আমি নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বৰ্দ্ধিত করিতে না চাহিলেও, জনসমাগমের অবধি নাই। নগরের ধনীনির্ধন, বালবৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ অনেকেই তথায় উপস্থিত হইয়াছে। আজ আমি অনেকের চক্ষেই নূতন। অনেকেই আমার অনুগ্রহ-প্রার্থী। সুদৃশ্য অশ্বচতুষ্টয়-সংযোজিত রথ হইতে অবতরণ করিবামাত্র আনন্দধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইল; দীন-দরিদ্র কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশায় আমার স্তুতিগীতি গাহিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে নিরাশ করিলাম না। আজ আমি মুক্তহস্ত। অর্থ! আভিজাত্যের হস্তে তাহার কি দুর্গতি! যদি তাহার দ্বারা অনশনক্লিষ্ট, চীরপরিহিত দুঃখীর দৈন্য একদিনের জন্যও বিদূরিত হয়, অর্থ সার্থক! আমার আজ শেষ,—ধন, মান, সম্মানের সমাপ্তির দিন। হেমরাজ মরিয়াছে; শেষাদ্রিও কাল আর থাকিবে না! মৃত্যু একপ্রকার নহে; দ্বিতীয়বার মৃত্যু আমাকে অদ্যই গ্রাস করিবে—আমি জানি অদ্যই।

বন্ধুগণ পূর্ব্বেই সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে প্রতিনমস্কার করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলাম।

কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। নীলা বিবাহ-বাসরে প্রবেশ করিল। নীলা সুন্দরী, বিবাহের পরিচ্ছদে তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছে। তাহার কণ্ঠে আমার প্রদত্ত কণ্ঠভূষণ; সুন্দরীর স্বাভাবিক কান্তিপূর্ণ শুভ্রবর্ণের ও বহুমূল্য বস্ত্রপরিচ্ছদের ঔজ্জ্বল্যে মিলিত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব

শোভার সৃষ্টি করিয়াছে! নীলার অগ্রে অগ্রে দুইটি ছয় সাত বৎসরের সুন্দরী সুসজ্জিতা বালিকা; এক এক পদ অগ্রসর হইতেছে, আর কনের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি বিকীর্ণ করিয়া সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতেছে। তাহারা ফুলসাজে সজ্জিত। পরীস্থান হইতে তাহারা যেন এইমাত্র নামিয়া আসিতেছে। নীলা বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মৃদু মধুর হাস্যে আমাকে নীরবে সম্ভাষণ করিয়া উপবেশন করিল। বালিকাদ্বয় তাহার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। কি সুন্দর দৃশ্য! নীলা স্বয়ং তাঁহাদের তালিম দিয়াছে।

পুরোহিতগণ তাঁহাদের সহকারীগণ সহ উপস্থিত হইলেন। আমি দণ্ডায়মান হইয়া নতশিরে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলাম। বিবাহ-ব্যাপার আরম্ভ হইল। আমি আমার হাত হইতে খুলিয়া একটি অঙ্গুরীয় তাহার সেই পূর্ব্ব-অধিকৃত অনামিকাতে পরাইয়া দিলাম। এ অঙ্গুরীয় নূতন নহে; আমার প্রথম বিবাহের সেই অঙ্গুরী। সুনিপুণ জহুরীর দ্বারা তাহা সংস্কৃত করাইয়াছিলাম। নীলা তাহার চিরব্যবহৃত বস্তু চিনিতে পারিল না। তাহার চক্ষু নাই; অন্তদিকে তাহার দৃষ্টি নাই; সে জগতকে প্রতিপদে প্রতারিত করিতে চায়; আজ সে বাহ্যিক ব্যবহারে এমন একটা ভক্তির ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে, যে, তাহার মত ভক্তিমতী যেন আর জগতে কেহ হইতে পারে না।

নীলা আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। আমিও বলিলাম, "আমি তোমাকে প্রকৃত প্রেম দান করিব।" প্রার্থনা প্রভৃতি যথারীতি সম্পন্ন হইল। বিবাহ হইয়া গেল। নীলা! আমার তুমি, আমার! স্বামীগণ স্ত্রীকে "আমার" বলিতে কত গর্ব্ব অনুভব করেন। আমার সে গর্ব্বে অধিকার আছে কি?

বন্ধুগণকে আপ্যায়িত করিয়া, আমরা স্বামীস্ত্রী অন্তঃপুরে রওনা হইলাম। সমাগত জনসাধারণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। তাহারা আমার দানে পরিতুষ্ট হইয়াছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এইবার মহাভোজ। সুসজ্জিত কক্ষগুলি শত দীপমালায় সমুজ্জ্বল। বঙ্গের অধিকাংশ অভিজাত বংশীয়গণ তাঁহাদিগের বংশমর্য্যাদা-জ্ঞাপক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আমাকে অনুগৃহীত করিতে সমাগত হইয়াছেন। পরিচ্ছদ-নিহিত মণিমুক্তা, হীরকখণ্ডাদি দীপালোকে জল্ জল্ জ্বলিতেছে। সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠবের সাজসজ্জার তুলনা নাই। পোষাক পরিচ্ছদে, অলঙ্কার জহরতে, পরিধান-ভঙ্গীতে এক অন্যকে পরাজিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। শত শত পুষ্পের শত শত প্রকারের সৌন্দর্য্য এককালে একস্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভ্রমরকুলেরও অভাব নাই! সম্মানিত মহাশয়গণ হাস্যলাস্যের প্রশংসায় স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছেন। সুখসম্মিলন! নীলা, এ সুন্দর সুন্দরীর মেলায় নায়িকা। তাহার ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই; দেহ-সৌষ্ঠবে সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, পোষাকপরিচ্ছদে সে অপরাজিতা; তাহার কণ্ঠভূষণের ন্যায় অনুপম অলঙ্কার বঙ্গে নাই। নীলার আনন্দ অসীম; এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র, সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব পরিতৃপ্তির সুযোগ সহজে আসে না। সকলের অতৃপ্ত চক্ষু নীলার প্রতি; সে তাহা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে। গর্ব্বে, গরিমায়, গল্পে, ব্যবহারে সে আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, আদর্শ রমণী! হায়, আদর্শ! না জানি, কত সুন্দরী তাহার স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত। তাহার স্থান? কোথায়? নরকে। মাতা তোমরা, ভগিনী তোমরা, স্বামীর একমাত্র শান্তি তোমরা, সাবধান হও; নীলার অদ্যকার ক্ষণিক সুখের মোহ দেখিয়া আত্মহারা হইও না; পরিণাম ইহার বিষম! রক্ষা কর, জগতে দেবী তোমরা, সংসার তোমাদের পুণ্যে শান্তিময় হউক; উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিওনা মা!

নীলার সম্ভাষণে চিন্তাস্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইলাম। প্রফুল্লমুখী নীলা হাসিতে হাসিতে মৃদুস্বরে বলিল, "প্রিয়তম! তুমি কি তোমার কথা ভুলিয়া গিয়াছ?"

"না, ভুলি নাই। চল তোমাকে আমার গুপ্ত ভাণ্ডারের অধিশ্বরী করিব।"

বদনে তাহার হাস্যরেখা ফুটিল। সে অতি মৃদুস্বরে আমাকে বলিল, "অবশেষে, অবশেষে তুমি আমাকে ভাল বাসিয়াছ।"

আমি উত্তর করিলাম, "অবশেষে অবশেষে কেন নীলা? প্রথম দৃষ্টিতেই তোমাকে ভাল না বাসিলে তোমাতে আমাতে আজ কি এ সম্বন্ধ স্থাপিত হইত? রমণী কি আমি

জানিতাম না; তুমিই প্রথম আমাকে স্ত্রী-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করিয়াছিলে; তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ।"

নীলা আমার বাক্যে প্রফুল্ল হইয়া আমাকে আবেগময় কণ্ঠে বলিল, "আমি তা জানি। তুমি স্ত্রীজাতিকে উপেক্ষা করিবে ভাবিয়াছিলে; আমি তখনি বলিয়াছি আমি ভাল বাসিয়া তোমাকে ভালবাসিতে শিখাইব; আজ আমার সকল আশা পূর্ণ। তুমি আমাকে ভালবাস, শুধু এ কথা বলিলে, তোমার মনের ভাবের ঠিক ব্যাখ্যা হইবে না। আমি জানি, তুমি আমাকে কেবল ভাল বাস না, আমার জন্য প্রাণ দিতে পার।"

আমি বলিলাম "তোমার জন্য কি আমি প্রাণ দেই নাই নীলা? আমার পূর্ব্বজীবন তোমার জন্যই মরিয়াছে।"

নীলা অতি সুমধুর মৃদু কণ্ঠে বলিল "প্রিয়তম! কি বলিতেছ? বুঝিলাম না।"

"প্রিয়তম! বুঝিয়া কাজ নাই। তোমার প্রেমের জন্য আজ আমি আবার যুবক হইব। ধমনীতে আমার রক্ত আবার উষ্ণ হইয়া বহিবে, এখনই বহিতেছে। তুমি আজ আমাকে এমনি পরিবর্ত্তিত করিয়াছ নীলা! রমণীর প্রেম আমাকে প্রকৃতই পাগল করিয়াছে; আমি তোমাকে আজ যে প্রেমের আবেগে বিবাহ করিয়াছি, সেরূপ ভালবাসা জগতের অন্য কোন সুন্দরীর জন্য ঘটে নাই। আমার নিজের কথা আমার মনে নাই, কেবল করিতেছি তোমার ভাবনা।"

নীলার আনন্দ ধরে না। তাহার হৃদয়ে বৰলালসার নিম্নেই প্রবৃত্তির স্থান, আমি চাটুবাক্যে তাহার সে বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিয়াছি। সে সন্তুষ্ট হইবে না কেন?

তাহাকে বলিলাম "এইবার সুবিধা করিয়া অন্যের অজ্ঞাতে সরিয়া পড়। আমি উপরের বসিবার ঘরে তোমার অপেক্ষা করিব। বাহিরে ঠাণ্ডা; তুমি কি বাহির হইবার পূর্ব্বে গরম কাপড় লইবে না?"

নীলা হাসিয়া বলিল "আমার সুখের চিন্তায় তুমি অস্থির হইয়াছ প্রিয়তম! ভাবনা নাই; শালে আমি সর্ব্বশরীর আবৃত করিব। তাহাতে দুই দিকই রক্ষা হইবে; কেহ আমাকে দেখিলে সহজে চিনিতে পারিবে না, ঠাণ্ডা হইতেও বাঁচিব।"

বলিলাম, "সুচতুর তুমি। সত্যই গুপ্তধন দেখিতে হইলে, গোপনভাবে যাওয়াই ঠিক। আমিও যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করিতে চেষ্টা পাইব।"

সে বলিল, "এও এক নূতনত্ব। দুইজনে গোপন ভ্রমণ কি সুখের হইবে। সত্য সত্যই তুমি আমাকে পাগল করিয়াছ।"

"বেশী দেরী করিও না, আমি প্রস্তুত থাকিব" বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলাম। দ্রুতপদে নিজ কক্ষে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। আজ আবার আমাকে পূর্ব্ব জীবনে ফিরিয়া যাইতে হইবে; জাল শেষাদ্রির বেশ পরিত্যাগ করিয়া আবার হেমরাজ সাজিতে হইবে। এতদিন বহু চেষ্টায় শ্বেত শ্মশ্রুতে বদন আবৃত রাখিয়াছিলাম। আজ তাহা ক্ষৌরী করিলাম। শ্মশ্রুহীন বদনে আবার হেমরাজের মুখাবয়ব পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিল। কেশ ও গুম্ফরাজি হেমরাজের ধরণে বিন্যস্ত করিলাম; কেশে কলপ দিয়া পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণবর্ণ করিলাম; গুম্ফে কলপ সংযোগ করিতে সাহস হইল না; কারণ নীলার সন্দেহ উদ্দীপ্ত না করিয়া গুম্ফ আবৃত করিবার উপায় নাই। কলপ সঙ্গে লইলাম। চক্ষের আবরণ খুলিয়া দর্পণের সম্মুখে পূর্ণায়তন বিস্তার করিয়া দাঁড়াইলাম। হাঁ, ঠিক ই আমার পূর্ব্বের চেহারা ফিরিয়া আসিয়াছে; আমাকে এখন দেখিলে কে না বলিবে আমি হেমরাজ! চক্ষে আবরণ দিয়া একটা শালে আপাদমস্তক আবৃত করিলাম। কেশ বিন্যাস করিয়া আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল বস্তুগুলি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিলাম। কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধ আলোকিত বারান্দায় আসিয়া উদ্বেগপূর্ণ চিত্তে নীলার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি আমার নাই। ধীরে ধীরে পদচারণ করিতেছি, কতক্ষণে নীলা দেখা দেয়। একজন ভৃত্য সেখান দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "ভিদুর কোথায়?" সে বলিল—"ভিদুর প্রভুর আদেশে দণ্ডভুক্তি গিয়াছে। যাইবার সময় সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।" আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলাম— "হায় প্রভুভক্ত ভৃত্য!"

সকলে ভোজের আয়োজনে নিযুক্ত; গৃহ কোলাহলে মুখর। নীলার তবু ত দেখা নাই; তবে কি সে আসিবে না?

এক মুহূর্ত্ত এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে। অবশেষে সিঁড়িতে মৃদু পদশব্দ শুনা গেল। নীলা আসিতেছে। উৎকণ্ঠিত চিত্তে সিঁড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। নীলা আসিয়াছে! তাহার দেহও আমার ন্যায় আবৃত। রক্ষা পাইলাম। নীলা আমার কণ্ঠদেশ ভুজবদ্ধ করিয়া আবেগময় স্বরে বলিল "প্রিয়তম! আমার কি বড় বিলম্ব হইয়াছে? হঠাৎ আসিতে পারি না; পাছে আমার ব্যবহারে কেহ সন্দেহ করে।"

বলিলাম "আর দেরী করা চলে না, চল, এখনি রওনা হই; বেশীক্ষণ অনুপস্থিত থাকিলে অতিথিরা কি ভাবিবেন।"

সে উত্তর করিল "আমি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি! বিলম্বের আর প্রয়োজন?"

গুপ্তপথে গুপ্তভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। আজ বিবাহ-উৎসবে সকলেই মত্ত,—অন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার কেহই নাই।

নীলা জিজ্ঞাসা করিল "কতদূর যাইতে হইবে?"

"বড় বেশী দূর নয়। প্রায় সমুদ্রের উপকূলে। একটা পোড়ো বাড়ী, গুপ্তধন রাখিবার উপযুক্ত যায়গা। তুমি পরিশ্রান্ত; বাতাস না ঝড় বহিতেছে, তোমার কষ্ট হইতেছে কি?"

নীলা আমার বক্ষে বাধা দিয়া বলিল, "না, না, সে জন্য নয়; তোমার সঙ্গে আমি নরকেও যাইতে সুখী। আমি ভাবিতেছি, কতক্ষণে আমরা সেখানে পৌছিব।"

নীলা আমার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিল। তাহার কি অপরিসীম তৃষ্ণা, অর্থ ও প্রবৃত্তি তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। আমি তাহার আশা পূর্ণ করিলাম। কেন করিব না, আমি কি তাহাতে অধিকারী নই? এই শেষ! গণ্ড তাহার ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় রক্তিম হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম। "নীলা, প্রিয়তমে! ব্যস্ত হইও না; আমার যাহা কিছু সমস্ত তোমারই। সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনেই আমাকে আমি তোমায় দান করিয়াছি; আজ তাহার পুনরভিনয় মাত্র হইল; বিশ্বাস কর, পৃথিবীতে যত দিন আছ তত দিন আমি তোমারই, তুমিও আমার, ব্যতীত অন্য কাহারও হইতে পারিবে না।"

নীলা সোহাগ-আবেশে নয়ন মুদ্রিত করিল, আমার বক্ষে লতাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ আর কেহই বাক্য ব্যয় করিলাম না।

নীলা জিজ্ঞাসা করিল—"আর কত দূর?"

"এই ত পৌছিলাম। তোমার কি শীত করিতেছে?"

"অল্প অল্প করিতেছে বৈ কি?"

"তবে আমার আরও নিকটে এস।"

নীলাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলাম, ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম বলিলেই হয়। সমাধি-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। নীলা কাঁপিতেছে। সে এরূপ নৈশ ভ্রমণে অভ্যস্ত নহে।

আকাশে মেঘ ক্রমে জমাট বাঁধিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে চন্দ্র মেঘান্তরালে লুকাইতেছে। আলোক আঁধার মিলিয়া মিশিয়া রজনীর স্তব্ধতা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। উপকূল হইতে হু হু বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। উন্মুক্ত প্রান্তর-বক্ষে অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন সমাধি-গুম্ফার সুউচ্চ চূড়াগুলি উপকথার দৈত্য বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। নীলা সমাধি-ভূমি জীবনে কখন দেখে নাই। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি! কি ভয়ানক স্থান! বড় ভয় করিতেছে! চল, আজ না হয় ফিরিয়া যাই।"

আমি বলিলাম, "সে কি! এই যে আসিয়াছি। এই কি ভয়ের সময়? সাহস কর। আমি তোমার সঙ্গে আছি তবু ভয়? এই আলো জ্বালিতেছি।"

তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সমাধি-গুম্ফার দ্বার উদ্ঘাটন করিলাম। সে কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া গুম্ফার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। লৌহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। সে ভয়ার্ত্ত মৃদুস্বরে বলিল "কি ভয়ানক অন্ধকার। ফিরে চল, ভয়ে আমার কথা সরিতেছে না।"

বলিলাম "এতদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিবার আর উপায় নাই। ধৈর্য্য ধর, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশের স্থান এ নয় নীলা।"

সে এবারে চীৎকার করিয়া উঠিল; বলিল, "আমাকে এ কোথায় আনিলে? এ যে নরক!"

"নরক বলিতে হয় বল; এস্থানে যে তুমি ইচ্ছা করিয়াই আসিয়াছ নীলা! এখন আর ভয় করিয়া ফল কি? গুপ্তধন কেহ খোলামাঠে ফেলিয়া রাখে না! পূর্ব্বে এ-সকল ভাব নাই কেন প্রিয়তমে? ভয় নাই। যাহাতে তোমার আনন্দ,—

যাহার উপাসনা এতদিন করিয়াছ,—সেই অর্থ,—অপরিমিত ধনরাশি এখানে আছে। আমি তোমাকে বক্ষে বহিয়া আনিয়া অগাধ ধন-সমুদ্রে ফেলিয়া দিতেছি. তাহাতে তুমি ডুবিয়া দেখ, অর্থে কি সুখ! অর্থ-সমাধি কি বাঞ্ছনীয় নয়? তোমার প্রেমের প্রতিদানে, আজ আমি তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছি।"

আমি তাহাকে ক্ষুদ্র শিশুটির মত বক্ষের নিকট তুলিয়া লইলাম। অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বহিয়া গুম্ফার অঙ্গনে অবতরণ করিলাম। তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিলাম, "অপেক্ষা কর,—আলো জালিতেছি।"

নীলা হতাশভাবে বলিল "আর আলো!"

গতরাত্রে গুম্ফার স্থানে স্থানে মোমবাতি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলাম। সেগুলি প্রজ্জলিত করিলাম। ঘোর অন্ধকারের পর আলোকরশ্মি সহ্য হইল না। নীলা শিহরিয়া নয়ন মুদ্রিত করিল। আমি সেই অবসরে গোঁপে কলপ লেপন করিলাম; রুদ্রদামের ধনাধার উন্মুক্ত করিলাম। কতকগুলি হীরক পার্শ্বস্থ শবাধারের উপর রাখিলাম. আলোকে হীরকগুলি জ্বলিতে লাগিল। নীলার চক্ষু হীরক-প্রভায় আকৃষ্ট হইল। তাড়াতাড়ি শবাধারের নিকটে আসিয়া নতমস্তকে রত্নরাজি পরীক্ষা করিতে গিয়া আতঙ্কে কয়েকপদ পশ্চাতে হঠিয়া আসিল। আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে প্রয়াস পাইল,—পারিল না। চতুর্দ্দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সারি সারি শবাধার, ইহা যে সমাধিগুম্ফা, নীলার বুঝিতে বাকি থাকিল না। সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল, তাহার পা উঠিল না। চক্ষু মস্তকে তুলিয়া শুষ্ক ভগ্ন বাধ-বাধ স্বরে বলিল, "আমাকে এখান হইতে শীঘ্র লইয়া যাও; এ সমাধিগুম্ফা—প্রেতের স্থান, এখানে থাকিলে আমার নিশ্চয় মৃত্যু। চল, শীঘ্র চল। অলঙ্কারে আমার কাজ নাই,—যত সুন্দরই হোক না কেন,—আমি মৃত ব্যক্তির অলঙ্কার প্রাণ গেলেও পরিব না!"

নীলা দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি বলিলাম, "নীলা, আমি বলিয়াছি এ অধৈর্য্য হইবার স্থান নয়। হীরকগুলি দেখিয়াছ কি? আরও অনেক আছে; এক এক করিয়া দেখিবে এস?"

নীলা ক্রোধে আরক্তিম হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। উচ্চস্বরে বলিল "শেষাদ্রি, একি ঠাট্টার সময়? কেন তুমি আমাকে এখানে আনিলে? এ যে প্রেতভূমি! তুমিও প্রেত!"

"সত্যই নীলা! আমি প্রেত;—এটি প্রেত-ভূমি; এটি তোমারই স্বামীর বংশের সমাধি-গুম্ফা,—এখানে তোমারই স্বামীর পূর্ব্বপুরুষগণ চিরনিদ্রায় অভিভূত। বেশী দিন নয়—ছয়মাস পূর্ব্বে,—তোমার স্বামী হেমরাজ এখানেই সমাহিত হইয়াছিলেন।"

নীলার নয়নে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সে প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। বদনের ভাব অমানুষিক,—তাহা প্রেতভূমিরই উপযুক্ত। তাহার ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছে,—বাক্য উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা নাই।

আমি আমার সেই ভগ্ন শবাধারের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, "এটা কি নীলা? এ শবাধারটি কাহার? তোমার স্বামীর হেমরাজের। কেমন করিয়া ইহা ভগ্ন হইল? হেমরাজের শব কোথায়?"

নীলা আর দাঁড়াইতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। অস্ফুট বিলম্বিত কণ্ঠে বলিল, "হেমরাজ—ও—কোথায় হেমরাজ."

"ও! কোথায় হেমরাজ? সে তাহার অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর পাপপথ পরিষ্কার করিয়া এখানে শান্তিলাভ করিতে আসিয়াছিল! এখানেও তাহার স্থান হয় নাই। কোথায় সে? শয়তানীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে তাহার কোথায়ও শান্তি নাই;—ভগবানের রাজ্যের শুভ নাই; সেই জন্যই বুঝি ভগবান তাহাকে এখান হইতে আহ্বান করিয়াছেন। তুমি কি তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার অবসর পাও নাই? প্রায়শ্চিত্তের জন্যই তাহার মৃত্যু-জাগরণ। আজ তাহার সাফল্য। চাহিয়া দেখ,—তোমার স্বামীকে চিনিতে পারিবে কি? প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,—বিবাহের রাতে আমার অনাবৃত চক্ষু তোমাকে দেখাইব;—তোমার জন্য আবার যুবক সাজিব; প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিতেছি, দেখ নীলা? আমি হেমরাজ।" চক্ষুর আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিলাম; গাত্রের শাল ও মাথার পাগড়ী উন্মোচন করিলাম; তীব্র স্বরে গুম্ফা প্রতিধ্বনিত

করিয়া কহিলাম "চিনিতে পার কি? বিশ্বাস হয় কি? আমি শেষাদ্রি নয়, হেমরাজ! আমি তোমার একবারের বিবাহের স্বামী নয়—দুই দুই বারের! তোমার উপর আমার দ্বিগুণ অধিকার। আজ তুমি আমার ইচ্ছার দাসী,—আমার বিচার তোমার চরম বিচার!"

নীলা কম্পিত কণ্ঠে নিজে নিজেই বলিল, "না, না, তাহা হইতে পারে না! হেমরাজ কখনই না। সে মরিয়াছে,—যে তাহাকে সমাহিত করিয়াছে, সে স্বয়ং আমাকে সমস্ত বলিয়াছে! মানুষ কি কখন মরিয়া বাঁচে। একি খেলা,—কি হৃদয়হীন ষড়যন্ত্র। অসহ্য! অসহ্য! শেষাদ্রি; তোমার সকলই অদ্ভুত। একি রহস্য? কেন তুমি আজ বহুরূপীর সাজ পরিয়াছ। কত দিন হেমরাজের নাম করিয়া আমাকে ভীত করিয়াছ; আজ আবার তাহার বেশে সাজিয়া একি অমানুষিক অভিনয় প্রিয়তম?"

আমি ব্যঙ্গের স্বরে বলিলাম, "ঠিক, প্রাণাধিকা, দৃষ্টি তোমার এমনি প্রখর বটে! ভালবাসাও তোমার তেমনি, নতুবা স্বামীকে চিনিতে না পারে কোন্ স্ত্রীলোক? আমার চেহারার কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য; কৃষ্ণ কেশ ভয়ে শুভ্র হইয়াছে; কেন হইয়াছে; দুই দিন এখানে থাকিলেই নিজের কেশ দেখিয়া বেশ তাহা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনই কি আত্মীয়ার চক্ষের ভ্রম জন্মাইবার পক্ষে যথেষ্ট? প্রাণে প্রকৃত টান থাকিলে প্রেমিক প্রেমাস্পদের ছায়া দেখিয়াও চিনিতে পারে। আর তুমি এতদিন একসঙ্গে অবস্থান, আলাপন করিয়াও—আমাকে চিনিতে পারিলে না। পারিবে কি। আমাকে ত তুমি এতদিন দেখ নাই; দেখিয়াছ আমার ধন-ঐশ্বর্য্যকে, আমার অঙ্গ-অবয়ব তোমার নয়নে পড়ে নাই,—দেখিয়াছ আমার পোষাক পরিচ্ছদ,—তাহার মূল্যে আমার ধনের পরিমাণ নির্ণয় করিতে ব্যস্ত ছিলে; আমার ব্যক্তিটিকে দেখিবার অবসর তোমার ছিল কি? ছিল না। ভাল হইয়াছে; তোমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা তাই এত সত্বর, এত সহজে করিতে পারিয়াছি।"

নীলা শিহরিয়া উঠিল; ভয়ে বিস্ময়ে, তাহার বদনমণ্ডল মৃত ব্যক্তির ন্যায় হইয়া গেল; কিন্তু তাহার অদম্য নাস্তিকতা, উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা, অসংযত আস্ফালন তখনও তাহাকে পরিত্যাগ করিল না। পিশাচী পিশাচের ন্যায় বিকট স্বরে বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত! কিসের প্রায়শ্চিত্ত? আমি তোমার কি করিয়াছি? তুমি আমাকে শাস্তি দিবার কে? দাও আমাকে যাইতে দাও।"

আমি হাহা করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "আমার তুমি কি করিয়াছ? আমি তোমার শাস্তি দিবার কে? এখনও কি সন্দেহ হয় আমি কে। প্রমাণ চাও, শোন তবে—" আমি একে একে আমার ব্যাধির বিবরণ হইতে গুম্ফা হইতে পরিত্রাণের কাহিনী বর্ণনা করিলাম। অবশেষে বলিলাম "সে রাত্রি কি ভয়ানক! মৃত্যু তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়। তখন মনে হইতেছিল—মানুষের তাহা হইতে আর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হইতে পারে না। কিন্তু নীলা, তখনও আমি জানিতাম না, তাহা অপেক্ষা আরও অসহ্য যন্ত্রণা ভবিষ্যতে আমার জন্য সঞ্চিত আছে! অত কষ্টের পরও কত আশা কত সুখ-কল্পনা বুকে লইয়া তোমার প্রেম লক্ষ্য করিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ে গৃহপানে ছুটিয়াছিলাম। প্রিয়তমা তুমি; আমার বিরহে না জানি কত কাতর হইয়াছ,—আমাকে যমদ্বার হইতে ফিরিয়া পাইয়া কতই না আনন্দ করিবে!..অত আশার পরিণাম কি হইয়াছিল নীলা? তাহা তুমি ভাল মতে জান। অকস্মাৎ তোমাকে দেখা দিয়া তোমাকে আনন্দে আত্মহারা করিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যার পর গৃহের পশ্চাৎদ্বার দিয়া অন্যের অজ্ঞাতে চোরের মত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কি দেখিয়াছিলাম? তাহাও কি তোমাকে বলিতে হইবে? মনে পড়ে কি?—সদ্য বিধবা তুমি, গোবিন্দকে লইয়া কি অভিনয়ে ব্যস্ত ছিলে। এখনও কি বলিতে চাও তুমি আমার কি করিয়াছ!—কি না করিয়াছ নীলা? আমি আমার সমস্ত হৃদয় তোমাকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম,—আমার বংশের মান, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা তোমাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। সুখী হইয়াছিলাম—তুমি তাহা আমার কোন্ অপরাধে পদাঘাতে ধূলিসাৎ করিলে? আমার অটল বিশ্বাস, প্রেমের স্বপ্ন কোন্ দোষে অকালে এমন নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া দিলে? অবিশ্বাসিনী তুমি, সন্তানঘাতী তুমি, আত্মসুখে অন্ধ তুমি, বুঝিবে কি তুমি, আমার হৃদয়ে কি যন্ত্রণা—তোমার প্রায়শ্চিত্তের জন্য কেন আমি এত উদ্‌গ্রীব। প্রতিহিংসা,—প্রতিহিংসাতেই

কেবল আমার সুখ। সে সুখে আমি আজ সুখী হইব।"

নীলার ঘনশ্বাস বহিতে লাগিল। সে স্পন্দিত বক্ষে, রুদ্ধ শ্বাসে আমার পায়ে পড়িয়া বলিল, "দয়া—দয়া—ক্ষমা কর—আমাকে বধ করিও না,—মৃত্যু ছাড়া যে শাস্তি দিতে হয় দাও। হাঁ, তুমি হেমরাজ আমার স্বামী,—আজও ত তুমি বলিয়াছ—তুমি আমাকে ভালবাস,—তবে কেন আমাকে হত্যা করিবে? এই কি আমার মরিবার বয়স? রক্ষা কর, ক্ষমা কর,—মরিতে বড় ভয়—"

আমি ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলাম "চাঞ্চল্যের এ সময় নয়। আমি তোমাকে হত্যা করিব না। সে ইচ্ছা থাকিলে তোমাকে এতদিন জীবিত থাকিতে হইত না; সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে শেষ করিতাম। স্থির হও, শোন, তোমাকে অনেক কথা বলিবার আছে; তোমার মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে এখনও অনেক সময় পড়িয়া আছে; উঠ, শোন।"

নীলা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলাম; বলিলাম, "নীলা! তোমার স্বামীর জন্য কি একটি প্রেমসম্ভাষণও তোমার হৃদয়ে নাই? আমি শেষাদ্রি তোমার বিলাসতৃষ্ণা তৃপ্ত করিবার যন্ত্র—আমাকে না কত সম্ভাষণে পাগল করিতে চেষ্টা করিয়াছ—তাহার একটুও কি এখন অবশিষ্ট নাই? হেমরাজ নাম তোমার এতই অপ্রিয়? শেষাদ্রির অগাধ অর্থ এখনও শেষ হয় নাই,—এই সমাধি-কক্ষেই তোমারই জন্য সঞ্চিত আছে। শেষাদ্রি আমি, হেমরাজ আমি, তোমার দুই দুইবারের স্বামী আমি; নীলা! প্রেমের কথা বল। তুমি না বলিয়াছ, আমার প্রেমের জন্য প্রাণ দিতে পার,—আজ তাহার পরীক্ষা। আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছি, এখন তোমার পালা।"

আমি তাহার হস্ত পরিত্যাগ করিলাম। সেও সরিয়া দাঁড়াইল। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতিপদে সে আমার প্রতি বক্রদৃষ্টি প্রেরণ করিতেছিল। তাহার গতিরোধ করিবার আবশ্যক নাই; আমি স্বস্থান পরিত্যাগ করিলাম না। সে সিঁড়ির নিম্ন ধাপে পৌঁছিবা মাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে উপরে উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, "কে আছ, উদ্ধার কর। প্রবঞ্চক, প্রতারক, রক্তপিপাসু দস্যু আমাকে ভুলাইয়া হত্যা করিতে এখানে বন্দী করিয়াছে। রক্ষা কর, কে কোথায় আছ—আমার সমস্ত অর্থ দিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিব।"

কে আছে, কে তাহার কথার উত্তর দিবে? তাহার নিজের স্বর প্রতিধ্বনিত হইল। সে উন্মত্তের ন্যায় লৌহ-দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। বহির্দেশের প্রবল বায়ুর অনবরত সনসন শব্দে লৌহ-দ্বারে আঘাতের শব্দ মিশিয়া গেল। আমি তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, "বৃথা চেষ্টা নীলা, বৃথা চেষ্টা! তোমার স্বাধীনতার পথ একটুও মুক্ত রাখি নাই। এক দিন তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম —পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছিলাম। তাহার উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি, আর না; অভিজ্ঞতায় আমার নয়ন উন্মুক্ত করিয়াছে—আজ আমি অতি সাবধান। তুমি আমার সম্পূর্ণ করতলগত। আমার অবাধ্য হইতে বৃথা চেষ্টা করিও না; যাহা বলি শোন। বলিয়াছি, স্বহস্তে তোমাকে হত্যা করিব না; তোমার আত্মকর্ম্মের ফলভোগ করিবার যথেষ্ট অবসর তোমাকে প্রদান করিব। আমি এখানে এক রাত্রে যাহা ভুগিয়াছি; তুমি তাহা দিনের পর দিন ভোগ কর। বুঝ, কিরূপে একরাত্রে আমার কেশ শুভ্র হইয়াছে, কি কষ্টে আমি,—প্রিয়তমা, প্রাণাধিকা তুমি,—তোমার প্রতি প্রতিহিংসাসাধনে ব্রতী হইয়াছি। আমা অপেক্ষা এখানে তোমার অভাব অনেক কম;—আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি,—প্রচুর খাদ্য, পানীয়, শীতবস্ত্র, নিত্য-ব্যবহার্য্য প্রায় সকল বস্তুই এখানে তোমার জন্য রাখিয়া দিয়াছি; আবশ্যক-মত তাহা ব্যবহার করিও; কেবল পাইবে না মনুষ্যের সঙ্গ। সমাজে আর বিষ ছড়াইতে দিব না তোমাকে। একা বসিয়া নিরবিলি আত্ম পাপ স্মরণ কর, —অনুতাপে দগ্ধ হও; ভাবিতে থাক,—তুমি কি করিয়াছ! তুমি কি! যে সৌন্দর্য্যে তোমার এত গর্ব্ব তাহার মূল্য কত? শত শত সুন্দরী এ প্রেতভূমিতে শয়ন করিয়া আছে। কোথায় তাহাদের সৌন্দর্য্যময় দেহ? তাহা যে এখন কীটের খাদ্য! তোমায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করিয়াও যাহাকে প্রেমপত্র লিখিতে ভুল নাই— সেই গোবিন্দর সুন্দর দেহ, আজ এই সমাধিভূমিতলে

কীটের খাদ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিও, তাহাতে সুখ নাই কি নীলা?"

নীলা গর্জ্জিয়া উঠিল; বলিল "কে সে মিথ্যাবাদী প্রতারক; তোমাকে মিথ্যা বাক্যে উন্মত্ত করিয়াছে। গোবিন্দকে আমি প্রেমপত্র লিখিয়াছি কে বলিল? সে আমাকে ভালবাসিত, সেও কি আমার অপরাধ? ভালবাসা না-বাসা তাহার হাত,—আমি তাহাতে কি করিতে পারিতাম?"

"কি করিতে পারিতে না-পারিতে এখন সে আলোচনায় ফল নাই; যাহা করিয়াছ তাহাই স্মরণ কর; তাহার প্রতিফলের জন্য প্রস্তুত হও। এখনও মিথ্যা অভিনয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না? নিজে দোষী হইয়া অন্যের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে চাহিতেছ। এখনো আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা! ভুল, তোমার নিতান্ত ভুল! পূর্ব্বের সে হেমরাজ আর এই হেমরাজ এক ভাবিও না। এখন আর আমার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার শক্তি তোমার নাই।"

নীলা চীৎকার করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা। নিশ্চয় কোন প্রতারক তোমাকে হেয়তম প্রতারণায় শত্রুতা সাধন করিয়াছে। সে আমার শত্রু, গোবিন্দর শত্রু, তোমার শত্রু! শত্রু নিশ্চয় ভুল বুঝাইয়াছে, তাহার ফলে তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ,—তোমার বন্ধু, গোবিন্দকে, হত্যা করিয়াছ!"

"কি বলিলে? আমি গোবিন্দকে হত্যা করিয়াছি? না,—তুমি, তুমি তাহাকে হত্যা করাইয়াছ। সে মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার প্রবঞ্চনা জানিতে পারিয়াছিল, সে তোমাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই,—আমিও পারিব না। তুমি একদিন আমার মৃত্যুসংবাদে তাহার নিকট আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহার মৃত্যুতে আমার নিকট আনন্দ প্রকাশ করিয়াছ। নীলা, তোমার স্বভাব কি আর আমার অজ্ঞাত আছে? প্রাণে তোমার বিন্দুমাত্র প্রেমের অস্তিত্ব নাই। তোমার সকলই লালসা। কি ভয়ানক! যমদ্বারে আসিয়াও তোমার স্বভাবের ব্যতিক্রম হইল না! এখনও মিথ্যা কথা! আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা! প্রমাণ না পাইয়াই কি তোমাকে আমি অভিযুক্ত করিতেছি। তোমাদের প্রত্যেকখানি প্রেমপত্র আমি পাঠ করিয়াছি। আমার সঙ্গেই সেগুলি আছে। দেখিতে চাও কি? দেখ, দেখ, সেগুলি আসল না নকল—তোমার প্রাণের নকল কথা কি না!"

পত্রের তাড়া নীলার সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিলাম। বলিলাম "দেখ, তোমার স্বহস্তের লেখা কি-না? না এখনও বলিবে জাল।"

পত্রের তাড়া দেখিয়া নীলার বদন মৃতবৎ হইয়া গেল। থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; দাঁড়াইবার শক্তি তাহার শেষ হইয়া আসিল; মেজেতে সে লুটাইয়া পড়িল; জ্ঞান হারাইল,—নীলা মূর্চ্ছিত।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। দৌর্ব্বল্য আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। দৌড়াইয়া গিয়া জল আনিলাম। তাহার চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করিলাম। তাহার আর সে লাবণ্য নাই। চক্ষু কোটরগত,—কোলে কালিমা পড়িয়াছে; ওষ্ঠ রক্তহীন, ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছে। কেশদাম অসংযত ভাবে এলাইয়া পড়িয়াছে। এই কি আমার সেই নীলা! বার বার শীতল জলের ছিটা দিতে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। চক্ষু উন্মোচন করিল। কম্পিত ওষ্ঠে কি যেন বলিতে চাহিল; পারিল না। আমি বলিলাম, "নীলা! আমার একমাত্র প্রেমিকা! কেন তুমি আমাকে বঞ্চিত করিলে। তোমাকে সুখী করিতে আমি ইচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলাম। যদি আর একটা দিন ধৈর্য্য ধরিতে পারিতে,—আমার মৃত্যুতে যদি এক বিন্দু অশ্রুও তোমার নয়নে দেখিতে পাইতাম,—শেষাদ্রি সাজিয়াও যদি একবারও তোমাকে আমার জন্য শোক করিতে শুনিতাম, তাহা হইলে আমি তোমার সুখের পথ,—তাহা যাহাই হউক না কেন,—ছাড়িয়া দিয়া তোমার অজ্ঞাতে চলিয়া যাইতাম। সে অবসর তুমি আমাকে দিলে না কেন? হাজার হউক আমি তোমার স্বামী, তোমাকে ভালবাসি; আমার ভালবাসা তুমি প্রতিহিংসায় পরিণত করিলে কেন নীলা?"

নীলা আমার বাক্য রুদ্ধশ্বাসে শ্রবণ করিল।

আবেগময় কণ্ঠে বলিল "ক্ষমা কর,—আমি না বুঝিয়া যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা কর। তোমার দুঃখ কি

গভীর, আমি এখন বুঝিয়াছি। আর না, আমি আর বিপথগামী হইব না,—সর্ব্ববিষয়ে তোমার সহধর্ম্মিণী স্ত্রী হইব ; বিশ্বাস কর, ক্ষমা কর, আমাকে এমন তিলে তিলে বধ করিও না।"

আমি দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলাম "ইহার পূর্ব্বে একথা বল নাই কেন প্রিয়তমা ? এখন আর সাধ্য নাই,—ক্ষমা বৃত্তি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ;—বিশ্বাস হারাইয়াছি। চল, নীচে যাই ; দেখ কি কষ্টে আমি, কোন্ পথে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলাম।"

নীলা উঠিল। পলায়নের পথ দেখিবার আশায় বোধ হয়, আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। কৌশলে আবার তাহাকে গুম্ফার প্রাঙ্গণে লইয়া আসিলাম। বলিলাম "ঐ দেখ, নূতন গাঁথা ঐ সেই স্থান।"

নীলা বসিয়া পড়িল। আমি বলিলাম, "এক মাস এই ভাবে থাক ; প্রায়শ্চিত্ত হউক,—আত্মার জন্য তাহার আবশ্যক আছে! তারপর,—তারপর—দেখা দিব।—আজ তবে আসি—বিদায়!"

নীলা ব্যাঘ্রীর ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল ; চীৎকার করিয়া বলিল "কোথায় যাও ? আমাকে একা ফেলিয়া কাপুরুষের মত কোথায় পলায়ন করিতেছ ? হত্যাকারী, পাষণ্ড,—ভাবিয়াছ এত সহজে তোমাকে আমি পরিত্রাণ দিব!"

আমি সবলে তাহার বাহু মুক্ত করিলাম। নীলা আমার বদনে ক্রোধদীপ্ত অগ্নিময় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ফুলিতে লাগিল। আমি বলিলাম "ভগবান তোমার আত্মার কল্যাণ করুন। দাড়াও, আমি তোমার পরিত্রাণের ব্যবস্থা করিতেছি।"

তাড়াতাড়ি আলোকগুলি নির্ব্বাপিত করিয়া দিলাম। সূচীভেদ্য অন্ধকারে গুম্ফা পূর্ণ হইল। চীৎকার করিয়া বলিলাম "অনুশোচনাই তোমার একমাত্র পরিত্রাণের উপায়।"

বার বার যাতায়াতে গুম্ফার পথ আমার পরিচিত হইয়াছিল ; সত্বরতার সহিত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। নীলার উত্তেজিত, আর্ত্ত কণ্ঠ, উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায় শুনা যাইতেছে। সহসা সে স্থান পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল না।

একটা ভয়ানক শব্দ হইল, কোন একটা ভারী বস্তু পতনের শব্দ। সঙ্গে-সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ। চীৎকার করিয়া ডাকিলাম "নীলা, নীলা!" উত্তর পাইলাম না ; কেবল সেই গোঁ গোঁ শব্দ। আবার চীৎকার করিয়া ডাকিলাম "নীলা,—নীলা।" উত্তর নাই। আলো জ্বালিলাম। কি ভীষণ দৃশ্য! নীলার মাথা ফাটিয়া রক্তে নদী বহিতেছে! সে একটি প্রকাণ্ড পাথরের নীচে পড়িয়া আছে! হতভাগিনী, পরিত্রাণের চেষ্টায় বোধ হয়, ব্যস্তত্রস্ত হইয়া আঁধারে আমার অনুসরণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। তাহার আঘাত লাগিয়া পুরাতন জীর্ণ গুম্ফার প্রস্তর তাহার উপর পতিত হইয়াছে। দৌড়িয়া গিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। ইহার মধ্যেই শেষ! দেহে প্রাণ নাই! সব ফুরাইল! আমার প্রতিহিংসা হইতে দেবতার অভিশাপ কি ভয়ানক! কি শোচনীয় মৃত্যু!

তথায় আর দাঁড়াইতে পারিলাম না ; অসহ্য দৃশ্য!

তৎক্ষণাৎ গুম্ফা পরিত্যাগ করিলাম। মনের কি অবস্থা লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম, তাহাও কি বলিবার! আর নয় ; এখানেই শেষ, আত্ম-কাহিনীর সমাপ্তি! সেই সঙ্গে আমারও শেষ হইল না কেন! হেমরাজ একবার মরিয়াছিল ; শেষাদ্রি মরিয়াছে ; হেমরাজ দ্বিতীয়বার মরিল,—তবু দেহে প্রাণ আছে। মনের বিষে সকলকে জ্বালাইতে গিয়া নিজেই জ্বলিতেছি—কবে তাহার শেষ!

(সমাপ্ত)

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

চিত্র-শিল্পের বিচার

শিল্প-কলা সম্বন্ধে কোন বিশেষ বাঁধা পথ নেই। এই কারণেই শিল্প-কলার বিচারেরও বিশেষ কোন নিয়ম এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। এ পর্য্যন্ত জগতে যেখানে যত প্রাচীন বা আধুনিক শিল্প-কলা দেখা যায় কোনটিকেই একটা বিশেষ ধারাবাহিক নিয়মের বাঁধুনিতে ধরা যায় না। তাতেই বোঝা যায় যে শিল্পের জীবনীশক্তি এতই প্রবল যে সে কোন একটা বিশেষ রীতিকে অবলম্বন করে বেশী দিন থাকতে চায় না। আমাদের দেশে দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ বলা যেতে পারে যে অজন্তার চিত্র-শিল্প যাঁরা দেখেছেন তাঁরা মোগল চিত্র-শিল্পকে কখনই সেই একই চোখে দেখে বিচার করতে পারবেন না দেখবেন যে, অজন্তার বৌদ্ধ-শিল্প এবং মোগল-শিল্প এক ভারতবর্ষের দেশীয় চিত্রকরদের দ্বারা আঁকা এবং কতকটা একভাবে আঁকা হ'লেও যেন আগাগোড়াই বৈমাত্র্য ভায়ের মত তফাৎ তফাৎ। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই যে, ভারতীয় মোগল শিল্পীরা যদি এই প্রাচীনতম দেশীয় শিল্পের সঙ্গে নিজেদের শিল্পের ঐক্য সংস্থাপনের চেষ্টায় কোন শিল্পকলা সৃষ্টি করে রেখে যেতেন তা হ'লে তাঁরা কখনই আজ এত বড় একটা শিল্প-কলা জগতে রেখে যেতে পারতেন না। মোগল শিল্পীরা তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ও ভাবের দ্বারা অকপট হৃদয়ে যা এঁকে রেখে গেছেন আজ সেই শিল্প সকল দেশে সকল কালে প্রকাশিত ও সাদরে গৃহীত হচ্ছে। তাই ব'লে এটাও ঠিক্ যে মোগল শিল্পীরা তাঁদের পূর্ব্বতন দেশীয় শিল্পীদের শিল্প সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীনও ছিলেন না। —তাঁরা পূর্ব্বতন শিল্পের যথেষ্ট কদর যে বুঝতেন তা' তাঁদের শিল্পেই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মোগল শিল্পীরা শিল্পের প্রধান জিনিষ 'অনুপ্রাণনা' সেই-সকল পূর্ব্বতন শিল্প থেকে যথেষ্ট লাভ করতেন।

আমাদের দেশের অতি প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পকলা দেখলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে সেগুলি শিল্পীরা খুবই নির্ভীকভাবে সৃষ্টি করে গেছেন—তাঁরা পশ্চাতে তাঁদের শিল্পকলার দর্শকদের সমালোচনার কথা মনেও স্থান দেন নি! কিন্তু মোগল শিল্প হ'ল **দরবারী শিল্প**—তাকে মোগল বাদশাহের প্রসাদ লাভ করে বেঁচে থাকতে হয়েছে—গুণীদের মজলিসে নিজ গুণপনা প্রকাশ করতে হয়েছে। শিল্পীরাও এ বিষয়ে কিছু সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। তাই আমরা দেখি মোগল শিল্পের ভালমন্দ বিচার করবার একটা বেশ ধারা অল্প আয়াসেই পাওয়া যায়—কিন্তু অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীনতম-শিল্পের খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাল মন্দ বিচার করা চলে না। এখনকার কালে দেশীয় শিল্পের যাঁরা বিচার করে থাকেন তাঁরা মোগল শিল্পের বিষয় যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিচার করে ভালমন্দ দুকথা বলবার সুযোগ পান—অজন্তার বা সিগিরিব শিল্প সম্বন্ধে কি তেমন একটা বাঁধা নিয়মে বিচার করতে পারেন? মোগল শিল্পীদের শিল্প মোগল দরবারের তীক্ষ্ণ বিচারে পেশ হ'য়ে তবে রাজদপ্তরে স্থান পেত। আজও তাই আমরা মোগল চিত্রগুলিকে বহুমূল্য শালের বা সোনা রূপার সূক্ষ্ম কাজের মত হিসাব করে দেখে-শুনে যাচিয়ে ঘরে তুলতে পারি।—কিন্তু সকল সমালোচনভয়ের অতীত বৌদ্ধ শিল্পীদের খেয়ালের সৃষ্টিতে এই দরবারী ভাবটা মোটেই দেখা যায় না।—সেগুলি শিশুর চিত্তের মত সরল ও অকপট বলে আমাদের মনে হয়। অবশ্য মোগল শিল্পে তাই বলে যে শিল্পীজনোচিত অনুপ্রেরণার বা পরিকল্পনা-শক্তির অভাব ছিল তা' নয়, বরং তাঁদের যত্ন ও সূক্ষ্ম কারুনৈপুণ্যের নিদর্শন দেখা যায়। সকল বিষয় গবেষণা করে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কোন যুগের শিল্পকলাকে অন্য কোন যুগের শিল্পকলার সঙ্গে তুলনা করা বা 'একটি অপরটির মত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল একথা বলা চলে না।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমঝদারদের মধ্যে কেহ কেহ মোগলচিত্রের সুস্পষ্ট বহুবর্ণের রঞ্জননৈপুণ্যকে ভারত শিল্পের একমাত্র প্রধান জিনিষ বলে মনে করেন এবং সেই নিয়মে সকল ভারতীয় চিত্রশিল্পকে বিচার করে থাকেন পাশ্চাত্যের চক্ষে সূর্য্যালোকিত রঙিন ভারতবর্ষের যা-কিছু সবই রঙিন; তাই তাঁরা মোগল চিত্রেও ঠিক্ তার সায় পান। আবার অজন্তার দিকে যদি দৃষ্টি দেন তো দেখবেন কোন কোন চিত্র নষ্টপ্রায় হ'য়ে গেলেও সেখানে এখনও কত রকমের স্পষ্ট-অস্পষ্ট বিচিত্র ধরণের বর্ণবিন্যাসে আঁকা ছবি! মোগলশিল্পীর ছবির সঙ্গে সেগুলির তুলনা করলে রঙের জোর কোন কোন চিত্রে মোটেই নেই বটে, তাই বলে সেগুলি ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্প নয় একথা একেবারেই বলা খাটে না।

এখনকার কালে আমাদের দেশে যে-জাতীয় শিল্পের অভ্যুত্থান হচ্ছে—এই শিল্পের বিষয় যদি আজ আমরা বিচার করতে বসি তা হ'লে এটা জোর করে আমরা বলব যে আমরা মোগলশিল্পীদের প্রদর্শিত পথ বা অজন্তার শিল্পীদের প্রদর্শিত পথ ধরে চলব বলে দৃঢ় সংকল্প হয়ে যদি শিল্পপথে যাত্রা সুরু করি তা হ'লে অচিরেই ভাঙাপথের খানার মধ্যে পড়ে আমাদের বিনষ্ট হ'তে হবে। এখন যা

আমরা কেহ মনে করি সমস্ত জীবন ধ'রে মোগলশিল্পীদের মত একখানি কোরান বা একখানি ছবি তুলি দিয়ে মক্স করে করে সম্পূর্ণ করে রেখে যাব—অথবা ভাবি যে অজন্তাগুহার চিত্রের ন্যায় পাহাড়ের দেয়ালে গুহা তৈরী করে ছবি এঁকে রেখে যাব, তা হ'লে সেটা কতদূর কিরূপ দাঁড়ায় তা অনুমান করলেই বোঝা যায়। মোগল আমলের সে সমঝদারও নেই, সে বাদশাও নেই আর সে আব-হাওয়াও নেই—বৌদ্ধ আমলের সে গুহাবাসের রীতিও নেই আর সে ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কিছুই নেই—এখন আছে আমাদের Winsor and Newtonএর রং, কার্টিজপেপার আর আছে বিলিতি তুলি। এখন আমাদের আধুনিক শিল্পের বিচার করতে হলে এই সব নানান দিক বিবেচনা করে তবে বিচার করতে হবে। এখন আমাদের শিল্পের বিচার করতে হ'লে এই যুগের স্বাভাবিক আসক্তির মধ্যেও জাতীয়-শিল্পের প্রাণটি বজায় আছে কি না দেখতে হবে। এখনও যদি কলের জলে জাত্ যাবে বলে জ্ঞাতসারে কোন ডোবার অপরিষ্কার জলকে পবিত্র বোধে পান করি তা হ'লে যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তেমনি শুধু প্রাচীন শিল্প অবলম্বন করে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাতে গেলে বিপদে পড়বার খুবই সম্ভাবনা। যদি মোগল বা অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পের বৃহৎ ছায়ায় আধুনিক শিশুশিল্পের চারাটিকে রোপণ করা যায় তা হ'লে যেমন অত্যধিক আওতায় মারা পড়বার সম্ভাবনা তেমনি ক্ষুদ্র চারার পক্ষে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপও বাঞ্ছনীয় নয়। মোগল ও বৌদ্ধ শিল্পের আওতাও চাই আবার বাইরের রোদ বৃষ্টি ঝড়ও লাগান চাই। তবে একদিন এই শিল্প-কলার কাণ্ডটি শক্ত ও কায়েমি হ'য়ে মাথা তুলে উঠতে পারবে।

আজকাল অনেকে আধুনিক শিল্পীদের (অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির) চিত্রে জাতীয়তার সঙ্গে-সঙ্গে বিজাতীয় গন্ধ অর্থাৎ জাপান ও পাশ্চাত্যের আভাস পান বলে দুঃখ করে থাকেন।—সে তো ভাল কথা! এতেই প্রমাণ হচ্চে যে আমাদের মধ্যে জীবনীশক্তি আছে এবং এখন আর "গোময়লিপ্ত গণ্ডিতে" আবদ্ধ না থেকে আমরা সাতসমুদ্র-তেরনদীর উন্মুক্ত বাতাসে সচেতন হ'য়ে উঠ্‌চি—এবং তারই খবর যেমন কাব্যে ঘোষণা করেছি তেমনি মাঝে মাঝে শিল্পেও ঘোষণা করচি। এখন আর আমাদের বাঙলার আদ্যিকালের মহাদেবের মত আমরা গোঁফে তা' দিয়ে ভুঁড়ি উঁচু করে সিদ্ধি খেয়ে, চোখ ঢুলুঢুলু করে বসে নেই—এখন জাগ্রত হ'য়ে জগতের সঙ্গে সুখ-দুঃখে যোগ দিতে শিখেচি।

জগতের কোন শিল্পকলা কখনও সাম্প্রদায়িক হ'তে পারে না। এমন কি কোন দেশের মধ্যে আবদ্ধও থাকতে পারে না। সত্য যেমন চাপা থাকে না, তেমনি বড় শিল্প যে-কোন দেশেই জন্মাক সেটির পৃথিবীময় বিস্তার হবেই হবে।

এখন আমাদের শিল্পের ভিতরকার কথা যদিও জাতীয়তা কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এবং স্পষ্ট কথা হচ্ছে 'শিল্পকলা।' এই শিল্প-কলা শুধু একটা গণ্ডিবদ্ধ শিল্প নয়, এটি সমগ্রভাবে আর্ট! খুঁটিনাটি ভাবে রচনার দোষ গুণ সকল শিল্পেই থাকবে—সেটা মানুষের সৃষ্টির গুণ; আমরা সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই না—শিল্পকলা ক্ষুদ্র ভাবে দেখবার জিনিষও নয়।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে শিল্প-কলার সমালোচনা শিল্পের সৃষ্টির পূর্ব্বে রাম না হ'তে রামায়ণের মত' হ'য়ে কোন ফল নেই। আগে শিল্পীদের শিল্পরচনা তার পরে সমালোচকের সমালোচনা। এখন নবীন শিল্পীরা স্বচ্ছন্দে শিল্পরচনা করে যান, একদিন তাঁরাই সমালোচকের সৃষ্টি করবেন।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

দুঃখশেষে

(হাইন হইতে)

দুঃখ প্রথম এসেছিল যবে
ভাবিনু—কভু এ সহা কি যায়?
—সহা হ'ল তা। কেমনে সহিনু
জানিবারে আজি চাহিনা তায়।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

পরগাছা

(২৪)

রাখাল গোসাঁইগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে গোসাঁইগঞ্জ সে দেড় বৎসর মাত্র পূর্ব্বে ছাড়িয়া গিয়াছিল এ যেন সে গোসাঁইগঞ্জ নয়। যেখানটিতে তাহার সহিত গোসাঁইগঞ্জের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, ঠিক সেই জায়গাটিতে আসিয়া সে মিলিতে পারিল না; তাহার অল্প কয়েক মাসের অনুপস্থিতিতেই বিচ্ছেদের ভাঙন এতদূর বেশী হইয়াছে যে জোড়া লাগিবার আর কোনো সম্ভাবনাই নাই। তাহার দিদিমা নাই, ব্রজ নাই, ব্রজর বাবা মথুর নাই, আরো কত চেনা মুখ আজ গ্রামে নাই—কেহ মরিয়াছে, কেহ বিদেশে চাকরী করিতে গিয়াছে; কত মেয়ের বিবাহ হইয়া যাওয়াতে তাহারা শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কত নূতন বৌ, নূতন শিশু গ্রামে আসিয়াছে, তাহারা রাখালকে কখনো দেখে নাই, হয়ত নামও শোনে নাই, তাই তাহারা রাখালকে চেনে না; রাখালও তাহাদিগকে চেনে না। তাহার পূর্ব্বপরিচিতদের মধ্যে আছে শুধু পূর্ণযৌবনা বিধবা প্রসাদী ও শোকজীর্ণ তাহার মা, আর গ্রামের সেই-সব অকর্ম্মা ছেলেদের দুচারজন - তাহাদের দলেও মরণের আঘাতে ভাঙন ধরিয়াছে, যে দুচারজন আছে তাহারাও ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট, উল্লাসশূন্য ও স্ফূর্ত্তিহীন। প্রসাদীর ম্লান সুন্দর মুখের দিকে চাহিতে চোখে জল আসে, তাহার সহিত কথা বলা আর সহজ নয়। রাখাল বড়লোকের বাড়ীতে দেড় বৎসর থাকিয়া ও লেখাপড়া শিখিয়া আদবকায়দায় চালচলনে সভ্যভব্য শহুরে রকমের হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে আবার সে রাজার জামাই, গ্রামের লোক তাহাকে এখন সমীহ করিয়া চলে, তাহাকে দেখিয়া সম্ভ্রমে তটস্থ হয়; রাখাল এই গ্রামের কাহারও আর আপনার লোক নয়।

মণিমালাও এই যেখানে আসিয়াছে তাহা তাহার কাছে সকল রকমেই অপরিচিত। খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর; উঠানে কাদা, ঘাস; বাড়ীর বাহির হইলেই জঙ্গল। এখানকার বাড়ীতে পায়খানা নাই, খিড়কিতেই পুকুর নাই, পুরুষদের সামনে দিয়া আধক্রোশ পথ হাঁটিয়া গঙ্গায় কাপড় কাচিতে যাইতে হয়; এখানে প্রতিদিন ধোপা আসে না, আপনার কাপড় আপনি ক্ষারে কাচিয়া লইতে হয়। এখানে যে-রকম মোটা চালের ভাত হয়, সে-রকম চাল তাহার বাপের বাড়ীতে হাতী ও গোরুর দানা ছিল; এখানকার ভাতের সঙ্গে যে একমাত্র ডাল ও তরকারী থাকে, কমিয়া যাইবে বলিয়া তাহার ভালো করিয়া খোসা ফেলা হয় না; তৈলের সহিত সম্পর্ক অল্পই থাকে, ঘৃত চোখেও দেখিতে পাওয়া যায় না। মণিমালা এতদিন রাজার বাড়ীর মেয়ে ছিল, এখন সে গরিব কৃপণ গৃহস্থের বাড়ীর বৌ হইয়াছে। রাখাল হঠাৎ এই বাড়ী হইতে রাজার বাড়ীতে বদলি হইয়া আদবকায়দার বাঁধাবাঁধিতে যে অসুবিধা ও অস্বস্তি বোধ করিয়াছিল, মণিমালা ঐশ্বর্য্যের কোল হইতে একেবারে এই রিক্ত দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া পড়াতে তাহার অপেক্ষাও অধিক পীড়া অনুভব করিতেছিল, কিন্তু সে হাসিমুখেই সমস্ত অনভ্যস্ত দুঃখকে অতি সহজে বরণ করিয়া লইতেছিল—পাছে তাহার স্বামীর সম্মানের এতটুকু হানি হয়, পাছে তাহার স্বামীর মনে দুঃখের এতটুকু আঁচ লাগে।

রাজার মেয়েকে দেখিবার জন্য গাঁয়ের মেয়ে ছেলে বৌ ঝি সকলে বৃন্দাবন গোসাঁইএর বাড়ীতে ছুটিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল রাজার মেয়ে তাহাদেরই মতন নিতান্ত সাধারণ একটি মেয়ে—তাহার সর্ব্বাঙ্গে হীরা মুক্তা ঝলমল করিতেছে না, তাহার দুপাশে দুজন সুন্দরী দাসী চামর ঢুলাইতেছে না, সে সোনার সিংহাসনেও বসিয়া নাই। গ্রামবাসিনীরা হতাশার নিশ্বাস ফেলিয়া অবাক হইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেবল দশ বছরের ছেলে হাবুল তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা, রাজকন্যা কৈ?'—তাহার মা মণিমালাকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল—'ঐ ত!'—হাবুল অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—'দূর! ও ত মানুষ!'— হাবুলকে অপ্রতিভ করিয়া সকলে উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। কাঙালীর মেয়ে কাত্যায়নী এতটুকু ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। সে নাক সিঁটকাইয়া বলিয়া উঠিল—পোড়াকপাল এমন রাজার মেয়ের! ডাইনে বাঁয়ে দাসী নেই, সোনার খাটে গা গড়ায় না, রূপোর খাটে পা থোয় না, আগে পিছে মোহর ছড়ায়

না—রূপকথার রাজকন্যেরা এর চেয়ে ঢের ভালো!

কাত্যায়নীর কথা শুনিয়া সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। অতটুকু মেয়ের কথার বাঁধুনি শুনিয়া মণিমালা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিল—বাবা! কী পাকা ঝুনো মেয়ে!

রাখালের বিবাহ দিতে গিয়া বৃন্দাবন গোসাঁই মণিমালার বাবার ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাই তিনি রাজার মেয়েকে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি আহ্লাদে গর্ব্বে গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া সকলকে শুনাইয়া-শুনাইয়া কেবলি বলিতেছেন—যার বাপের দুয়োরে বাইশ-বাইশটে হাতী বাঁধা, একখানা গাঁ জুড়ে যার বাড়ী, পাঁচ শ যার চাকর দাসী, সে এসেছে আমার এই কুঁড়েঘরে! আমার এ যে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, এ যে গরিবের দুয়োরে হাতীর পাড়া!

তাঁহার গৌরব-ঘোষণায় মণিমালা কুণ্ঠিত হইতেছিল। সে যে নিঃসম্বলে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে, সে যে রাজার মেয়ে তাহার সেই নাম ছাড়া আর কোনো পরিচয় ত সে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারে নাই; একজন সামান্য গৃহস্থ ভদ্রলোক যেমন করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া তাহার মেয়েকে ঘর করিতে পাঠায়, তাহার রাজা বাবা যে তাহাকে তেমনও কিছু দ্যায় নাই। শুধু ভুয়া নামের পরিচয়ে লজ্জা ছাড়া ত আর কিছু লাভ নাই, অতএব তাহার বাপের বাড়ীর কথা না তোলাই ভালো। মণিমালা এখন আর রাজার মেয়ে বলিয়া নয়, এই বাড়ীর বৌ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলেই বর্ত্তিয়া যায়, তাহার সকল লজ্জা ঢাকা পড়ে।

রাজার মেয়ে বাড়ীতে আসিতেছে, নারাণদাসী মনে করিয়াছিল এইবার তাহাদের সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে,—তাহাদের কুঁড়েঘর বালাখানা হইবে, ঘরসংসার সোনাদানায় ভরিয়া যাইবে, দেউড়িতে নগ্‌দী ও অন্দরে দাসী চাকর গিশ্‌গিশ করিবে, নারাণদাসীকে আর নড়িয়া বসিতে হইবে না। তাই রাখাল ও মণিমালা তাহার বাড়ীতে আসিলে সেও তাহাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল; আত্মীয়তা দেখাইয়া বলিয়াছিল—বেশ করেছে রাখাল বৌ নিয়ে চলে এসেছে; আপনার বাড়ী ঘর আপ্ত জন থাকতে সে কোন্ দুঃখে পরের বাড়ী পড়ে থাকবে।

কিন্তু দুদিনেই সে দেখিল যে ঐ নামে তালপুকুর, তাহাতে ঘটী ডোবে না। তাহার লাভের মধ্যে এই হইয়াছে যে তাহার বাড়ীতে অসীম ধন দৌলত আসিয়াছে ভাবিয়া গ্রামের চোরেরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া নিত্য রাত্রে তাহার বাড়ীতে আনাগোনা আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার সংসারে তিন জন লোক বাড়াতে খরচ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে নারাণদাসীর টিকলো নাকটা খড়্গের ন্যায় উপর দিকে অনেকখানি বাঁকা হইয়া উঠিয়াছিল। এবং সে কথায় কথায় মণিমালাকে শুনাইয়া বলিয়া উঠিত—গো-ভাগ্যি নেই, এঁটুলি-ভাগ্যি খুব আছে!

নারাণদাসীর একটি ছেলে ছিল তাহার নাম গৌর। সে ভুপালের সহিত খেলা করিতে-করিতে খুনসুটি করিয়া কাঁদিলে বা কাঁদাইলে নারাণদাসীর সমস্ত সঞ্চিত ক্রোধটা সেই অবোধ শিশুর উপরে গিয়া পড়িত; তাহাকে দুড়দাড় করিয়া ঠেঙাইতে ঠেঙাইতে চীৎকার করিতে থাকিত—হতভাগা ছেলে! জানিসনে ও রাজার নাতি, নেহাল করতে এসেছে! গরিবের ছেলে তুই, এক পাশে আড়ষ্ট হয়ে থাক, তোর এত আস্পদ্দা কেন?

মণিমালা ভয়ে ও কুণ্ঠায় চুপ করিয়া থাকিত, একটিও কথা বলিত না। রাখাল নিষ্ফল দুঃখে পীড়িত হইয়া গৌরকে কোলে করিয়া সান্ত্বনা করিত, ব্যথিত মণিমালাকে বলিত—মণি, দুদিন কষ্ট সয়ে থাকো, আমার একটা চাকরী হোক, তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাব।

কিন্তু সে না শিখিয়াছে ভালো করিয়া ইংরেজি, আর না শিখিয়াছে ভাল করিয়া ফার্সী; তাহার যে কোথায় কি চাকরি জুটিবে তাহা সে ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

(২৫)

একদিন বৃন্দাবন মণিমালার সমবয়সী দুটি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া মণিমালাকে বলিলেন—নাতবৌ, এরা সব তোমার সমবয়সী, এদের কাছে লজ্জা কোরো না, তুমি এদের সঙ্গে আলাপ কর।

তাহাদিগকে মণিমালার কাছে বসাইয়া দিয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন।

গোসাঁইগঞ্জে আসিয়া অবধি এত বৌঝি এই কয়দিন

তাহাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকিতেছিল যে মণিমালা তাহাদের কাহাকেও আলাদা করিয়া চিনিবার অবসরই পায় নাই। আজ দুজনকে একান্তে পাইয়া মণিমালা দেখিল তাহাদের একজন বিধবা, তাহার মুখখানি ভারি সুন্দর, একটি শান্ত শ্রীতে মণ্ডিত, শ্রাবণ-রজনীর জ্যোৎস্নার মতো তাহাতে বিষাদ করুণ ম্লানিমা যেন অশ্রুতে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে চাহিতেছে। আর একটি মেয়ে কালো, কিন্তু তাহার সুন্দর নিটোল দেহে যৌবনের জোয়ার আসিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাসির চঞ্চলতা ঝলমল করিতেছে। ইহার হাতে কাচের সরু সরু সবুজ চুড়ি, পরণে চওড়া কালাপেড়ে শাড়ী, কপালে খয়েরের টিপ, নাকে ছোট্ট একটি সুন্দর রসকলি, মুখে পান, পায়ে আলতা, কিন্তু সধবার লক্ষণ মাথায় সিঁদুর কিংবা বাঁ-হাতে লোহা নাই।

মণিমালা তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা বিধবা তরুণীর হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি কি ভাই প্রসাদী ঠাকুরঝি?

তরুণীর ক্ষীণ হাসি অধরপ্রান্তে একটু উঁকি মারিয়া গেল; সে লজ্জিত মৃদু স্বরে বলিল—হ্যাঁ। তুমি কেমন করে চিনলে বৌ?

মণিমালা হাসিয়া বলিল—আমি ওঁর কাছে এতবার তোমার কথা শুনেছি যে আমার মনে তোমার একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। সেই ছবির সঙ্গে তোমার চেহারা ঠিক মিলে গেল।

প্রসাদীর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে মুখ নত করিয়া হাসিল।

মণিমালা প্রসাদীর হাতখানি ধরিয়া-থাকিয়াই বলিল—তোমাকে ভাই ঠাকুরঝি বলে আমার মন ভরবে না; তুমি আমার আরো আপনার; তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক পাতাব ভাই?

সুন্দর কালো মেয়েটি অমনি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—ওর সঙ্গে সতিন পাতাও ভাই; ওরও মনটা খুসী হয়ে যাবে, তোমারও খুব আপনার হবে।

তারপর সে সুন্দর করিয়া মিহি গলায় গাহিল—

শোনো ঠাকুরঝি লো তোমায় বলি,
আমি রাই রাজনন্দিনী,
তুমি শ্যামের চন্দ্রাবলী!

প্রসাদী তাহাকে এক চড় কষাইয়া দিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল—দূর পোড়ারমুখী!

কালো মেয়েটি আবার গান ধরিল—

আমি বটেই পোড়ারমুখী
ওগো বটেই পোড়ারমুখী!
তোমার মনের-মধ্যে সুখের হাসি
ওই যে মেরে যাচ্ছে উঁকি,
আমি বটেই পোড়ারমুখী!

বিব্রত প্রসাদীকে বাঁচাইয়া মণিমালা সেই রঙ্গিনীকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার এত রঙ্গ, তুমি কে ভাই?

রঙ্গরসিকা গাহিয়া জবাব দিল—

আমি রঙ্গময়ী রসবতী হাসির বেসাত করি,
মনের মানুষ পাইনি খুঁজে তাইতে দেশান্তরী।
মাথায় নিয়ে হাসির ডালা
লুকিয়ে বুকে অশ্রুমালা
স্বয়ম্বরের বরকে খুঁজে ঘুরে-ঘুরেই মরি!

মণিমালা হাসিতে-হাসিতে বলিল—তা ত তোমার রকম দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমায় ডাকব কি বলে?

রঙ্গিনী গান ধরিল—

ওলো রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণপ্রেমের জোঁক,
তুমি চিনতে নার লোক?
ওলো রাই রাজনন্দিনী ওলো ঠ্যাকারী,
আমি প্রেমের ব্যাপারী!
ওলো রাই রাজনন্দিনী, তোমার পায়ের দাসী,
বৃন্দে আমায় বলে লোকে, ব্যবসা আমার হাসি।

তারপর সে হাসিয়া গদ্য কথায় মধু মাখাইয়া বলিল—আমার নাম ভাই বিন্দি, আমার বাবা ছিলেন ডাকসাইটে কবিওলা, কীর্ত্তন-গাইয়ে; বাবা আমায় লেখাপড়া শেখাতেন, গান শেখাতেন, মুখে-মুখে ছড়া বাঁধতে শেখাতেন; কখনো আমার বিয়ের কথাও মুখে আনতেন না। বড় হয়ে উঠলাম, বাবা মারা গেলেন; এখন মায়ের মুখে শুনি আমার নাকি খুব ছোটবেলায় একটা বিয়ে হয়েছিল। আমার বরটি ছিল পরম ভক্ত, তাই চট করে

কেষ্ট পেলে ! আমরা জাতে বষ্টম,—অনেক মিন্সে তিলক-ছাপার ফাঁদ পেতে কণ্ঠী বদল করে আমায় আবার ধরতে চায় ; আমি ভাই ধরা দিইনে, কোন্ ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়ে আমার এমন হাসি বেঘোরে মাঠে মারা যাবে ! আমি লোকের কাছে শুধুই হাসি ; আর কান্না যেটুকু আছে তা রাধাকান্তর জন্যে লুকিয়ে রেখেছি, পাছে দেবতার জিনিষে মানুষের নজর লাগে !

বিন্দির কণ্ঠস্বরে এমন একটা করুণ কান্নার সুর বাজিয়া গেল যে প্রসাদী ও মণিমালার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া বিন্দি হাসিতে হাসিতে গাহিল—

কিসের লেগে কাঁদব আমি, কাঁদব কিসের লেগে ?
নিজের হাসি না জোটে ত আনব ভিক্ষে মেগে !

হাসির ফুলে জগৎ আলো
নাইক কোথাও কান্না কালো,
হৃদয় মেলে ধরলে পরেই আঁধার যাবে ভেগে।
আমি কাঁদব কিসের লেগে !

এ গান শুনিয়াও শ্রোত্রীদের মুখ প্রফুল্ল হইল না দেখিয়া বিন্দি উঠিয়া নাচিতে-নাচিতে গাহিতে লাগিল—

চরকী-বাজি হাসির আমি, হাসির ফুলকি ছুটাই,
আনন্দেতে নৃত্য করে মনের আঁধার মিটাই।

তাহার রঙ্গ দেখিয়া মণিমালা ও প্রসাদী হাসিয়া কুটিকুটি হইতে লাগিল। মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বিন্দি ঠাকুরঝি, এত রঙ্গ তুমি শিখলে কোথায় ?

বিন্দি মণিমালার পাশে বসিয়া পড়িয়া হাসিতে হাসিতে গাহিল—

আমার মনটি শাদা, নাই যে বাধা,
তাইতে এমন রং ধরেছে ,
যে আসে, মোর সবাই আপন,
রঙ্গ রাজ তাই মন ভরেছে।

মণিমালা এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটিকে দেখিয়া সবিস্ময় আনন্দে হাসিতেছিল। নারাণদাসী মহাপ্রসাদের বাড়ী হইতে তাস খেলিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল—ওগো ও বড়মানুষের ঝি, অত হাসি কিসের ? বিন্দি পোড়ারমুখী এসে জুটেছিস বুঝি ?

বিন্দি হাসিয়া বলিল—হাঁ রাঙা-দিদি,

বিনা নিমন্ত্রণে আমি এসে জুটেছি,
আনন্দেরি ভোজে হাসি দেদার লুটেছি !"

রাঙা বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিল—আ মরণ !

বিন্দি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—

মরণ আমার সতিন—বুড়ো যম-রাজার রাণী,
বরের ভাগ নিয়ে মোদের নিত্যি টানাটানি !

নারাণদাসী তর্জ্জন করিয়া মণিমালাকে বলিল—ওগো ও বড়মানুষের ঝি, তোমার রাজা বাবা ত দশটা দাসী চাকর দ্যায়নি যে বসে বসে বিন্দি ছুঁড়ির রঙ্গ দেখলে চলবে ? একটু গতর নাড়, একখান কুটো ভেঙে দুখান কর ....

মণিমালা হাসিমুখে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করতে হবে রাঙা-দিদি ?

নারাণদাসী তীব্র স্বরে বলিল—তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে ? বিধি কপালের ওপর দুটো চোখ দিয়েছিল কেন ? দেখে শুনে করতে কম্মাতে পার না ?... খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে বসে আছ, রান্নাঘরটা নিকোতে হবে না, বাসনগুলো মাজতে হবে না ?

—বাড়ীতে যত সব কুড়ে নবাবের বাথান হয়েছে ! তাঁদের সেবা করতে-করতে আমার গতর মাটি, হাড় কালি হল !......নারাণদাসী গজগজ করিয়া বকিতে বকিতে আবার বাড়ী হইতে পাড়া-বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

মণিমালা কোমরে আঁচল জড়াইয়া হাতের চুড়িবালা উঁচুতে তুলিয়া সমস্ত ঘৃণাকে জোর করিয়া দূর করিয়া দিয়া গোবর তুলিতে যাইতেছিল। প্রসাদী ও বিন্দি তাহার দুইহাত ধরিয়া পিছনে সরাইয়া দিয়া বলিল—তুমি থাক বৌ, আমরা করছি ..

অপর বাড়ীর লোক আসিয়া তাহার কাজ করিয়া দিবে ইহাতে কুণ্ঠিত হইয়া মণিমালা বলিল—না না ভাই, তোমরা বোসো, আমি এখনি আসছি। তোমরা একদিন করে দিলে কি হবে ভাই, আমায় ত রোজ করতে হবে।

প্রসাদী হাসিয়া বলিল—তুমি কি এসব কাজ জানো যে করবে ?

—না জানি শিখতে হবে ত।

বিন্দি বলিল—শেখবার দরকার? তুমি সব কাজ ফেলে রেখে দিও, বিন্দি পোড়ারমুখী রোজ করে দিয়ে যাবে।

প্রসাদী হাসিয়া বলিল—আর পেসাদী পোড়াকপালী তার পেটেল হবে।

বিন্দি বাসনের গোছা কাঁধে তুলিয়া ডোবায় মাজিতে গেল, প্রসাদী একটা ঘটীতে গোলা করিয়া রান্নাঘর নিকাইতে বসিল। আর মণিমালা কুণ্ঠিত হইয়া এই দুটি সদ্যপরিচিত সখীর যত্ন দেখিতে লাগিল। মণিমালা ছলছল চোখে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্ব্বাসনের সকল দুঃখ মুছিয়া রাখিবার জন্যই এই দুটি মেয়ে যেন ষড়যন্ত্র করিয়াই তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছিল। মণিমালার মন প্রীতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন সময় কাঙালীর মেয়ে কাত্যায়নী আসিয়া কর্কশ স্বরে বলিল—হ্যাঁ বৌ-দিদি, পেসাদী-দিদিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে বুঝি? আমি রাঙা-দিদিকে বলে দেবো!

প্রসাদী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—যা যাঃ! বলগে যা তোর সাত কালের রাঙা-দিদিকে। রাঙা-দিদি এসে আমাদের শূলে দেবে আর তোকে পাহাড়পুরের রাজার রাণী করে দেবে!

কাত্যায়নী চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—কেন লো শতেকখোয়ারী, তুই আমাকে অমন করে বলবি—আমি কি তোর সঙ্গে কথা কয়েছি যে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলি! তোর মাকে বলে আমি ঝাঁটা না খাওয়াই ত আমার নাম নয়।

কাত্যায়নী ফরফর করিয়া চলিয়া গেল।

মণিমালা হাসিয়া বলিল—বাবা, মেয়েটা ত কম ঝগড়াস্তে নয়!

প্রসাদীও হাসিয়া বলিল—উঃ ভয়ানক ঝগড়াস্তে! ওর মা বাবা ঐ রকম কি না, তা ও আর কত ভালো হবে।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—ওরা কারা?

প্রসাদী হাসিয়া বলিল—এই পাড়ারই। হাড়ে হাড়ে চিনতে বেশী দেরী লাগবে না!

(২৬)

প্রসাদী ঘর নিকাইয়া গোলার ঘটী মাজিতে ও বিন্দিকে সাহায্য করিতে ডোবায় চলিয়া গেল। নারাণদাসী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত কাজ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সুখী হইল কিন্তু মণিমালাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

কতই তুমি জান ঠাট,
দাঁড়িয়ে যেন বৃষকাঠ।

একটু নড়োচড়ো, নইলে বাতে ধরবে যে।

মণিমালা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা রাঙা-দিদি, তুমি অমন ছেঁস পেড়ে-পেড়ে কথা কও কেন বল দেখি। কি করতে হবে সোজাসুজি বললেই ত হয়!

নারাণদাসী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—বাবা! গুবের সঙ্গে খোঁজ নেই, আবার চাট ছোড়েন! লোকে তাই কথায় বলে—

'কাঁচা মাটি কচি বৌ সাঁচা লক্ষ্মীমণি,
আনিলে জ্যাঠাই বৌ ঘটে ঠনাঠনি।'

মণিমালা তবু হাসিমুখেই বলিল—এত কথা বললে রাঙা-দিদি, কেবল কি করতে হবে সেইটিই এখনো বলা হল না।

নারাণদাসী ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—গোবরগুলো পচছে, ঘুঁটে দিতে হবে না?

মণিমালা হাসিমুখে গোবরের গাদার কাছে গিয়া বলিল—রাঙা-দিদি, একটু দেখিয়ে দেবে এস না, কেমন করে ঘুঁটে দিতে হয় জানিনে।

নারাণদাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ভ্যালা এক ন্যাকেশ্বর ঢিপি তুমি বাছা! বাপ মায়ে তোমায় এও শেখায়নি? শিখিয়েই যদি দেবো ত নিজে করলেই পারি?

মণিমালা লজ্জিত হইয়া বলিল—এক দিন দেখিয়ে দিলেই আমি শিখে নেব।

—ভ্যালা জালাতন।—বলিয়া নারাণদাসী মণিমালার কাছে আসিয়া বলিল—আগে এই গোবরগুলো বেশ করে চটকে নাও, তারপর এক এক তাল হাতে তুলে গুলি পাকিয়ে দেয়ালে এমনি করে চাপড়ে দাও......

মণিমালা ঘুঁটে দিতেছে, আর তাহার অপটুতা দেখিয়া নারাণদাসী হাসিয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করিয়া তাহার লজ্জিত

মুখখানি লাল করিয়া তুলিতেছে, এমন সময় বৃন্দাবন এক হাতে হুঁকা ঝুলাইয়া অপর হাতে একখানা কচুর পাতায় করিয়া চারটি চুনো মাছ লইয়া বাড়ী ঢুকিলেন। মণিমালাকে দিয়া ঘুঁটে দেওয়াইতে দেখিয়া বিরক্তি ও বেদনার স্বরে নারাণদাসীকে বলিলেন—রাঙা-বৌ, ও হচ্ছে কি! যার বাপের বাড়ী শ্বেত পাথরে ছাওয়া, একটু যে ধুলো মাড়াত না, তাকে দিয়ে তুমি গোবর ঘাঁটাচ্ছ? .....সর গো বাছা নাতবৌ, আমি তোমার হয়ে ঘুঁটে দিয়ে দিচ্ছি।—বলিয়া বৃন্দাবন উঠানে হুঁকা ও মাছ ফেলিয়া মণিমালাকে সরাইয়া নিজে ঘুঁটে দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল তাল তাল গোবর দেয়ালে না লাগাইয়া নারাণদাসীর মুখেই চাপড়াইয়া দ্যান; কিন্তু ততখানি সাহস তাঁহার ছিল না।

নারাণদাসী বৃন্দাবনের ব্যবহারে অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া নিজে ঘুঁটে দিতে লাগিল এবং স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া, কিন্তু কাহারও দিকে না চাহিয়াই, বলিতে লাগিল—নাত-বৌএর ওপর এত যদি দরদ তবে একজন দাসী রেখে দিলেই হয়, সে কাজ করবে, আর টাটে বসিয়ে নাতবৌএর চরণ পুজো কোরো!...

বৃন্দাবন তিরস্কারের প্রচুর সম্ভাবনা দেখিয়া হাত ধুইয়া রকের কোণ হইতে হুঁকাটি উঠাইয়া লইয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন।

তখন নারাণদাসী মণিমালাকে বলিল—ওগো বড়-মানুষের ঝি, মাছ বনাতে পার, না শুধু মাছ খেতেই পার?

অমন চুনো মাছ মণিমালার বাপের বাড়ীতে কেহ খাইত না, ফেলিয়া দিত। মণিমালা হাসিয়া বলিল—দুইই পারি।

মণিমালা গোবরের হাত ধুইয়া বঁটি লইয়া মাছ কুটিতে বসিল। সে ঐ অতটুকুটুকু মাছগুলাকে লইয়া যে কি করিবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অথচ জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা ও ভয় হইতেছিল।

মণিমালার ভাব দেখিয়া নারাণদাসী বলিয়া উঠিল—

অরাঁধুনীর হাতে পড়ে রুইমাছ কাঁদে—
না জানি রাঁধুনী আমায় কেমন করে রাঁধে!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—তোমাদের দেশের রুইমাছ-গুলি খাসা রাঙা-দিদি!

নারাণদাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল—

কাজেতে কাঁচা বচনে দড়
মগজে কচি বয়সে বড়!
এলেন বৌ ধেড়েকেষ্ট
ইতোভ্রষ্ট ততনষ্ট!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—রাঙা-দিদি, তুমি এত শোলোকও জান! এখন কথায়-কথায় শোলোক আওড়ানো রেখে আমায় একটু দেখিয়ে দেবে এস ত।

নারাণদাসী বাৎসল্যের সুরে বলিল—না ভাই, রেখে দাও, তোমার গোসাঁইদাদা দেখলে আবার রাগ করবেন—তোমার চাঁপার কলি আঙুলে আবার আঁসটে গন্ধ হবে!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—রাঙা-দিদির হাতের গোবরের গন্ধ শোঁকা গোসাঁইদাদার যদি সয় ত আমার হাতের আঁসটে গন্ধও সইবে!

—না ভাই, আমরা হলাম গিয়ে দুয়ো, আর তুমি হলে সুয়ো রাণী ভাগ্যিমানি! আমরা হলাম গরিবের ঘরের মেয়ে, আর তুমি হলে রাজার ঝি! তোমাতে আমাতে কি তুলনা!

নারাণদাসীর কথাগুলো ক্রমশ ঝগড়ার আকার ধরিতেছে দেখিয়া মণিমালা একটা কলসী কাঁখে তুলিয়া লইয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিল।

মণিমালা জল লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে, পথে বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা। বৃন্দাবন বলিলেন—নাতবৌ, কলসী রাখ তুমি।

মণিমালা ঘোমটা টানিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বৃন্দাবন আবার জেদ করিয়া বলিলেন—নামাও কলসী।

পথের মাঝখানে আর আপত্তি করিতে না পারিয়া মণিমালা কলসী নামাইয়া দিল। বৃন্দাবন এক হাতে জলের কলসী ও অন্য হাতে হুঁকা ঝুলাইয়া লইয়া বাড়ী চলিলেন; কুণ্ঠিত লজ্জিত মণিমালা পিছনে পিছনে চলিল।

বাড়ী আসিয়া নারাণদাসীর সামনে ধপাস করিয়া কলসী নামাইয়া বৃন্দাবন কণ্ঠস্বরে দমক দিয়া বলিলেন—এই নাও তোমার জল!

আজ বিপদ সঙ্গিন দেখিয়া মণিমালা বৃন্দাবনের সহিত

কথা বলিল—জল আনতে রাঙা-দিদি বলেন নি, আমি নিজেই গিয়েছিলাম।

বৃন্দাবন চটা স্বরে বলিলেন—কেন যাও তুমি বাছা? ওতে লোকের কাছে আমার মুখ হেঁট হয় জানো? লোকে বলবে যে আমি কপিলা গাইকে দিয়ে লাঙল টানাচ্ছি, পক্ষীরাজ ঘোড়াকে দিয়ে ধান মাড়িয়ে নিচ্ছি! তুমি কী সুখে ছিলে তা কি আমি দেখিনি; তোমায় কাজ করতে দেখলে আমার কষ্ট হয়, আমার বুকে বাজে।

নারাণদাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল শুনছ গো নাতবৌ দাদাশ্বশুরের দরদের কথা। তুমি পটের সুন্দরী টাটে বসে থেকো, আমি বান্দরী বাঁদী আছি তোমাদের সাতগুষ্টির সেবা করব।

মণিমালা হাসিয়া নারাণদাসীর কাছে গিয়া চুপিচুপি বলিল—তবু যদি না নাম হত রাঙা-বৌ, আর গোসাঁইদাদা রাঙা-বৌ বলতে না অজ্ঞান হতেন!

কথাটা বৃন্দাবন শুনিতে পাইয়া রাঙা-বৌএর দিকে চাহিয়া হাসিলেন। রাঙা-বৌ মুখ গোঁজ করিয়া মাছ কুটিতে বসিল।

(২১)

মণিমালার এ বাড়ীতে থাকা মুস্কিল হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন তাহাকে কাজ করিতে দেখিলে চেঁচাইয়া বকিয়া বাড়ী মাথায় করেন; আবার না করিলে নারাণদাসীর মুখঝাড়া ও খোঁটা সহিতে হয়। আবার তার উপর অধিকন্তু ছিল বিন্দি ও প্রসাদীর যত্নের উপদ্রব—তাহারা দাসীর মতো তাহার সমস্ত কাজ করিয়া দিবে মণিমালা ইহা সহ্য করিতে পারিত না, কুণ্ঠিত হইয়া কষ্ট বোধ করিত। তাহার উপর আর-এক বিপদ হইয়াছিল যে সে শাক্ত, সে অভ্যাসের দোষে তরকারী কোটা বলিত, বনানো বলিতে লজ্জা বোধ করিত; মাছের ঝোল বলিত, রসা বলিতে পারিত না; ইহাতে গ্রামের সকলেই তাহাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিত। সে শাক্ত বলিয়া ঠাকুরঘরের ভিতরে যাইতে পাইত না, ঠাকুরের ভোগের কিছু ছুঁইতে পাইত না। এই-সমস্ত ব্যবহার মণিমালার কাছে অত্যন্ত অপমানের মনে হইত; সে এইজন্য ঠাকুরবাড়ীতেই যাইত না, যে তাহার হাতে না খায় তাহার হাতের রান্নাও সে খাইত না, ঠাকুরের প্রসাদ হইলেও না। তাহার এই অহঙ্কার দেখিয়া পাড়ার রসকলিগুলি কুঞ্চিত হইয়া উঠিত; রাধাকান্তর দালানে পা ছড়াইয়া বসিয়া হরিনামের মালার এক-একটি ঝুলি হাতে করিয়া পাড়ার গিন্নিরা নারাণদাসীর কথায় সায় দিয়া বলিত—শাক্তর আবার এমন অহঙ্কার! রাখালের আস্কারাতেই ত এমন হচ্ছে—বৌ নয় ত যেন মাথার মণি! আজকালকার ছেলেদের ঐ কেমন ধারা; মা-মাসিকে দেখতে পারে না, কিন্তু বৌএর কাছে একটি টুঁ শব্দ করবে না।

পাড়ার লোকেদের রাখালের উপর রাগ হইবার একটু কারণ ঘটিয়াছে। গিন্নিরা, যেহেতু তাঁহারা গিন্নি, নাকের ডগায় তিলক কাটিয়া একখানি ছোট খাদি কেঠে কাপড় পরিয়া ডান হাত হরিনামের মালার ঝুলির মধ্যে ঢুকাইয়া পাড়া-বেড়াইতে বাহির হন, ইহা রাখালের অসহ্য; কেহ কাহারও কুৎসা করিতেছে শুনিলে তাহার আর রাখালের কাছে নিস্তার নাই; গ্রাম্য কথা বলিলে রাখাল তাহা অশ্লীল বলিয়া বক্তাকে সাবধান করিয়া দ্যায়; কেহ ছেলেকে দিয়া তামাক সাজাইতেছে দেখিলে রাখাল তাহাকে তিরস্কার করে; কোনো ছেলে অসভ্যতা করিলে বা লেখাপড়ায় অবহেলা করিলে রাখাল তাহাকে নিজের ছেলেরই মতন কড়া শাসন করে। ইহার ফলে এই হইতেছিল যে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ রাখালের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল—সকলে মনে করিতেছিল যেহেতু রাখাল বড়মানুষের জামাই সেহেতু সে সকলকে শাসন করিয়া বড়মানুষী জানাইয়া বেড়ায়। অথচ রাখালের পক্ষে ন্যায় এত প্রবল যে কেহ সাহস করিয়া তাহার উগ্র মতের প্রতিবাদ করিতেও পারিত না। মাত্র দেড় বৎসর শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই যেন রাখালের এ গ্রামে স্বত্ব লোপ পাইয়াছিল, এখন সে যেন একজন উড়িয়া আসিয়া গ্রাম জুড়িয়া বসিয়াছে—তাহার প্রচণ্ড প্রতাপে তাহার চেয়ে বয়সে ও সম্পর্কে বড়ও যাহারা তাহাদিগকেও নত কুণ্ঠিত হইয়া ভয়ে-ভয়ে থাকিতে হয়।

এই সময় একদিকে কেশব সেনের ধর্ম্মসংস্কার ও বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার লইয়া সারা বাংলায় যে তুমুল নাড়া লাগিয়াছিল, তাহার ধাক্কা রাখালের ন্যায় তাজা বলিষ্ঠ

মনকে সত্যের দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল। রাখাল সংবাদ-পত্রে সংস্কার সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিত। ইহাতে গ্রামের সেই-সমস্ত লোক, যাহারা নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর, সমস্ত ভাবনার ভার শাস্ত্রের ও ঋষিদের উপর দিয়া যাহারা নিশ্চিন্ত, যাহারা শুধু বাড়ীতে বসিয়া তামাক ও সময়ে-সময়ে গাঁজাটা চরসটা ফোঁকে ও দুপুর বেলা চণ্ডীমণ্ডপে তাস পিটিয়া বিকাল বেলা মাছ ধরিয়া সময় কাটায়, সুযোগ পাইলেই পরনিন্দা করিয়া দলাদলি পাকায়, এবং এক-একবার খুব ঘটা করিয়া তিলকসেবা করিয়া তেকণ্ঠী মালা আঁটিয়া প্রবাসে বাহির হইয়া জেলেমালাদের পায়ের ধূলা দিয়া বার্ষিক আদায় করিয়া আনিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ভুঁড়ির তোয়াজ করে, তাহারা যখন শুনিল যে রাখাল ম্লেচ্ছদের দলে ভিড়িয়া তাহাদের সমর্থন করিতেছে, তখন তাহাদের তাসের আড্ডা সরগরম হইয়া উঠিল।

শেষ দানের উপর ফেরাই ইস্কাবনের বিবি জোরে মারিয়া কাঙালী শেষ পিট কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল—রাখালকে আমাদের একঘরে করা উচিত—যে জাত মানে না, ঠাকুর-দেবতা মানে না, বিধবার বিয়ে দিতে চায়, তাকে একঘরে না করলে আমাদের ধর্ম্ম থাকবে না। ওর বড্ড বাড় বেড়ে উঠেছে, একটু দমন করাও দরকার।

কাঙালী উঠিয়া পড়িয়া খুব ঘোঁট করিয়া রাখালকে একঘরে করিবার জন্য দলে লোক টানিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় কাঙালীর ছেলেকে সুদানে যাইতে হইল—সে কমিস্যেরিয়টের কেরাণী ছিল।

এই দৈবগতিকে চক্রপরিবর্ত্তনে কাঙালী বেচারা একেবারে চুপ হইয়া গেল। কিন্তু যাহাদিগকে কাঙালী খোঁচা দিয়া-দিয়া উস্কাইয়া ধর্ম্ম ও জাতি রক্ষার সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল—হয় কাঙালী ছেলেকে ত্যাগ করুক, নয় আমরা কাঙালীকে একঘরে করব—ছেলে, জাহাজে চড়ে সমুদ্র-পারে গোরা পল্টনের সঙ্গে ম্লেচ্ছ দেশে গেছে, তাকে নিয়ে ত সমাজে চলা যেতে পারে না।

কাঙালী প্রমাদ গণিল। রাখালকে জব্দ করিবে বলিয়া যে অস্ত্র সে এতদিন ধরিয়া সযত্নে শানাইয়া তুলিতেছিল তাহা যে তাহারই বধের কারণ হইবে তাহা সে মোটেই ভাবে নাই। দুর্দ্দৈব ইহাকেই বলে।

চিন্তিত কাঙালীকে ডাকিয়া রাখাল বলিল—দেখ কাঙালী-দা, তুমি কিছু ভেবো না; চুপ করে থাক; আপনিই সব গোলমাল থেমে যাবে। উমেশ ফিরে এলে আর-একবার হৈ চৈ হবে; তখনও কিছু বোলো না, দেখো সে আন্দোলনও শিগগির থিতিয়ে যাবে; যদি না যায়, এরা যদি উদ্যোগ করে তোমায় একঘরে করেই, তবে জেনো তুমি একঘরে হবে না, আমরা দুঘরে হয়ে থাকব, আমি তোমার দলে।

কাঙালী কৃতার্থ হইয়া বলিল—তোমার ভরসাই ত করি দাদা। আমি এই জন্যেই ত তোমায় অত শ্রদ্ধাভক্তি করি। যখন গাঁয়ের লোক এককাঠ্ঠা হয়ে তোমাকে একঘরে করবে বলে বেঁকে বসল, তখন একা আমিই ত চারিদিক সামলে থামিয়ে রেখেছিলাম।

রাখাল শুনিয়া হাসিয়া বলিল—সেই জন্যেই ত দাদা আমি তোমায় কখনো ত্যাগ করতে পারব না।

(২৮)

মণিমালা দুপুর বেলা প্রসাদীদের বাড়ীতে গিয়া প্রসাদীর সহিত গল্প করিতেছিল। মণিমালা বিদ্যাসাগরের কথা তুলিয়া বলিল—অত বড় পণ্ডিত যখন বিধান দিয়েছেন তখন তুমি ভাই আবার বিয়ে কর না কেন? উনি বলছিলেন তোমার যদি মত হয় ত বিদ্যাসাগরকে বর ঠিক করতে চিঠি লিখবেন।

প্রসাদী করুণ হাসি হাসিয়া বলিল—একটা বিয়ে না করলে বাপ-মায়ে ছাড়ত না, তখন অবুঝ ছিলাম, বুঝলেও লজ্জায় বেধেছিল, চুপ করে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু ভগবান আমার সতীত্ব রক্ষা করেছেন। এমন সামগ্রী ত হেলায় হারাবার নয়।

মণিমালা অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রসাদীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—সই, বল্ আমার সতিন হবি?

প্রসাদী শান্তভাবে করুণ হাসি হাসিয়া বলিল—মেয়ে-মানুষ অক্লেশে জীবন দিতে পারে, কিন্তু স্বামীর ভাগ দিতে পারে না। তুইও বৌ, আমাকে যা হবার নয় তা নিয়ে ঠাট্টা করিসনে।

প্রসাদীর চোখ ছল্‌ছল করিতে লাগিল।

মণিমালা বলিল—ঠাট্টা নয় ভাই, আমি মন থেকেই বল্‌ছি। ওর মনের এককোণে তোর জন্যে একটু ব্যথা লেগে আছে, আমি এত করেও সেটুকু দূর করতে পারিনি। তুই ত জীবনটাই মাটি করতে বসেছিস। আয় তুই, আমার স্বামীকে সুখী কর্, আমিও তোকে একেবারে আমার করে নি—তোর এমন প্রাণ-ঢালা ভালোবাসার ঋণ একটু শোধ করতে দে।

প্রসাদী গম্ভীর হইয়া বলিল—সে ঋণ কি এমনি অপমানেই শোধ করবি বৌ!

প্রসাদীর কথায় মণিমালা ব্যথিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। প্রসাদীর কাছে তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল—প্রসাদী যেন তাহার কাছে অনেক বড় হইয়া উঠিল আর সে তাহার কাছে এতটুকু হইয়া গেছে—সে যেন ডিঙি মারিয়া দুহাত বাড়াইয়াও আর তাহার নাগাল পাইতেছে না।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো বিন্দি ঘরে আসিয়া মণিমালা ও প্রসাদী দুজনকে নাচাইয়া হাসিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল—

ওলো তোর পোষা পাখীর যায় বুঝি যায় প্রাণ!
ছুটো ব্যাধে ওত পেতেছে মারবে বলে বাণ!
রাঙা তেলাকুচোর টোপে
ফাঁদে পা সে দ্যায় বা লোভে,
তোমার বুলি ভুলি বুঝি শিখে আরেক তান!

মাথায় ও কোমরে হাত দিয়া ত্রিভঙ্গ ঠামের ঘুরণ নৃত্য বিন্দির আর থামে না। প্রসাদী হাসিয়া বলিল—আ মর পোড়ারমুখী, এতক্ষণ আড়ি পেতে শোনা হচ্ছিল বুঝি?

বিন্দি তাহাদের দুজনের সামনে হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া বলিল—হাঁ ভাই, আড়ি পেতে শুনছিলাম,—কাঙালী বাঁড়ুয্যে কেনারাম বুড়োকে বলছে, কাত্যায়নীর সঙ্গে রাখালদার বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। কেনা-বুড়ো অমনি বুড়ো গোঁপ চুমরে বললে—তার আর ভাবনা কি? তোমার মেয়ে যে সুন্দরী, তাতে রাখাল ত রাজি হয়েই আছে। ওরা রাখালদাকে গ্রেপ্তার করতে গেল, আমি ছুটে এলাম বৌকে খবর দিতে। ওলো, হাঁ করে বসে ভাবছিস কি? ছুটে যা, ডাকাত পলো বলে।

মণিমালার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—মরণ আর কি!

বিন্দি বলিল—সত্যি বলচি বৌ, কাঙালী বাঁড়ুয্যে আর কেনা-বুড়ো রাখাল-দাকে ভজাতে গেছে। পুরুষগুলো বড় লোভী, ওদের বিশ্বাস নেই। তুমি বাড়ী যাও।

মণিমালার কৌতূহল হইলেও বাড়ী ফিরিতে অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। রাখাল যদি মনে করে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া সে তাহাকে পাহারা দিতে আসিয়াছে। মণিমালা জোর করিয়া বলিল কারো সাধ্য নেই যে আমার স্বামীকে কেড়ে নেবে। একবার চেষ্টা করেই দেখুক না।

প্রসাদী ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া-থাকিয়া বলিল—কাঙালীদাদা কেন এ কাজ করতে যাচ্ছে জানিস বৌ? ওর ছেলে উমেশ বিলেত গেছে, ফিরে এলে একঘরে হবে ঠিক হয়েছে; উনি বলেছেন কাঙালীর দলে থাকবেন। পাছে তখন দলে না যান, তাই কাত্যায়নীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কাজটা খুব পাকা করে রাখছে। কাঙালী-দাদা কৌশল আর মতলব ছাড়া একপা কখনো চলে না। বৌ, তোর সতিনের বড় সখ হয়েছিল—কাত্যায়নী তোর সতিন হবে, তোর মনোবাঞ্ছা খুব ভালো করে এত শিগগির পূর্ণ হতে চলল, তোর খুব খুসী হওয়া উচিত।

প্রসাদী হাসিতে লাগিল। মণিমালাও হাসিল, কিন্তু সে হাসি বড় শুষ্ক, যেন পরের কাছে ধার করিয়া চাহিয়া আনা।

বিন্দি বলিল—তোরা ভাই হাসতে পারছিস! আমার ত গা ছমছম করছে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারছিনে। আমায় দেখতে যেতে হল।

(২৯)

রাখাল দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া তাহার গ্রামের যত লোক যেখানে চাকরী করে তাহাদিগকে একটা চাকরী জোগাড় করিয়া দিবার জন্য চিঠি লিখিতেছিল। পাশে বসিয়া গৌর দাগা বুলাইতেছে। কেনারাম কাঙালীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া সেইখানে বসিল। রাখাল কাগজ দোয়াত সরাইয়া রাখিয়া সরিয়া বসিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল।

কেনারাম বলিল—ক্যাঙালীর মেয়ে কাত্যায়নীর জন্যে ক্যাঙালী একটি সুপাত্র খুঁজছে। আমায় ধরেছে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে...

রাখাল হাসিয়া বলিল—দাদা-মশায়, ঘটকালি-করা যে আপনার পেশা হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ ভাই, কুলীনের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া মহা পুণ্যের কাজ। তোমাদেরই ঠিক পালটি ঘর। তাই তোমার কাছে নিয়ে এলাম...

—আমার সন্ধানে ত কোনো পাত্র নেই।

—উনি তোমাকেই কন্যা সম্প্রদান করতে চান।

—উনি কি জানেন না যে আপনিই ঘটকালি করে এর আগে আমার একটা বিয়ে দিয়ে চুকেছেন।

—কুলীনের ছেলের একটা বিয়ে ত বিয়েই নয়। অন্তত-পক্ষে এক গণ্ডা না হলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। আর ঐ হলুদবনের শেয়াল রাস্কাটা বুঝুক যে কুলীনের ছেলে অমনি তুয়ো-তাত্তা করবার জিনিস নয়-খাঁটি সোনা, মুচড়ে-মুচড়ে ফেলে দিলেও তার দাম বিশ টাকা ভরি।

রাখাল হাসিয়া বলিল—না দাদামশায়, আমার নিজের মূল্য সম্বন্ধে অত বড় ধারণা নেই। এখন দেখতে পাচ্ছি আমার যোগ্যতা এক কাণা কড়িরও নয়।

—বিয়ের যোগ্যতা তোমার ষোল আনাই আছে।

কাঙালী বলিল—আমার জাত রক্ষা তোমাকে করতেই হবে রাখাল।

রাখাল বলিল—আমি তোমার জাত মারব এমন পাষণ্ড আমায় মনে কোরো না কাঙালী-দা।

কেনারাম বলিল—মেয়েটি বেশ, যেন পটের সুন্দরী, দেখেছ ত তুমি।

—দেখেছি বলেই আরো দুঃখ হচ্ছে, যে, অমন সুন্দর মেয়েটিকে বাপ হয়ে ইনি কেমন করে যাকে-তাকে সঁপে দিতে চাচ্ছেন।

কাঙালী বলিল—জাত যায়, করি কি বল? আর তোমার মতন এমন খাঁটি কুলীন কোথায় পাব। আমাকে দয়া করতেই হবে। আমার একান্ন বিঘে ব্রহ্মত্তর জমি আছে; তোমায় লেখাপড়া করে যতুক দেবো। আমি এই পৈতে দিয়ে তোমার হাত জড়িয়ে দিচ্ছি, স্বীকার না করলে কিছুতেই খুলব না।

রাখাল হাসিয়া বলিল—বৃথা কষ্ট পাচ্ছ। ব্রহ্মত্তর অপহরণ করব এমন পাষণ্ড আমাকে ভেবো না কাঙালী-দা। ততক্ষণ অন্য কোথাও খুঁজলে কাজ দেখত। অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার লোভে অপকর্ম করতে পারে এমন লোকের অসদ্ভাব দেশে এখনো হয়নি।

রাখাল হাতের পৈতা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কাঙালী রাখালের হাত জোরে চাপিয়া ধরিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—তুমি যদি রাজি না হও তা হলে আমি অভুক্ত ব্রাহ্মণ মনক্ষুণ্ন হয়ে এই পৈতে ছিঁড়ে তোমায় শাপ দিয়ে যাব।

রাখাল পৈতার নাগপাশ হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া একটা মোটা বাঁশের লাঠি তুলিয়া বলিল—আর আমি এই নাদনা দিয়ে শাপের মুণ্ডপাত করে দেবো!

শাপের সহিত শাপুড়েরও মাথা ভাঙিবার আশঙ্কা করিয়া কেনারাম কাছা কোঁচা খুলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। কাঙালীকেও ডাকিতে হইল না।

(৩০)

মণিমালা ও প্রসাদী কাহারও মুখে কথা নাই। দুজনেই শুষ্ক মুখে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, না জানি বিন্দি কি খবর আনে। হঠাৎ বিন্দি দমকা হাওয়ার মুখে শুকনো পাতার মতো হাসি ও গানের ঘূর্ণী তুলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া নাচিয়া গাহিয়া অস্থির হইয়া উঠিল—

"টোপ ধরেনা ঠুকরে বেড়ায়, ভেসে ওঠে ফাতার গোড়ায়,
প্রেমডোর কেবল এড়ায়, অঙ্গ জলে হেরে তারে—"
পড়ল না সে চারে!

বিন্দির রকম দেখিয়া প্রসাদী ও মণিমালার মুখে হাসি ফুটিল। প্রসাদী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হল?

বিন্দি হাসিতে লুটিতে লুটিতে বলিল—

পরের ঘরে কাটতে যে সিঁদ এসেছিল সিঁদেল চোরে,
লাঠির বহর দেখে শেষে মানে মানে পড়ল সোরে।

রাখাল-দার লাঠি ভাগ্যি, কেনা-বুড়োর গোঁপের ঝোপে আটকে গেল, নইলে কাঙালীকে আজকেই প্রাণের কাঙাল হতে হত।...

প্রসাদী ও বিন্দি খুব হাসিতে লাগিল। মণিমালার মন স্বামীর দৃঢ়তা দেখিয়া গর্ব্বে আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

প্রসাদী হাসিতে-হাসিতে মণিমালাকে বলিল—আজকে কি প্রজাপতির ঘুম নেই? রঙিন ডানা মেলে কেবল ঘরে ঘরে ঘটকালি করে বেড়াচ্ছে? কেনা-বুড়ো গিছল তোকে সতিন দিতে, তুই এসেছিলি আমায় সতিন করতে...

এমন সময় প্রসাদীর মা আসিয়া বলিলেন—বৌমা, রাঙা-খুড়ি চেঁচাচ্ছে, তুমি বাড়ী যাও।

মণিমালা উঠিল। বিন্দি বলিল—চল বৌ, তোমার কিছু ভয় নেই, আমরা তোমার সান্ত্রী পাহারা সঙ্গে আছি।

(৩১)

কেনারাম ও কাঙালী চলিয়া গেলে রাখাল আবার চিঠি লিখিতে লাগিল। নারাণদাসী ঘুম হইতে উঠিয়া আসিয়া রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল—রাখাল, নাতবৌ কোথায়?

—বোধহয় প্রসাদীর বাড়ী গেছে।

—ভ্যালা এক পাড়াবেড়ানি বৌ হয়েছে। অমন বৌএর মুখে খ্যাংরা মারতে হয়।

—রাঙা-দিদিমা, ভালো করে বললেই হয়। অত-বড় রাজার মেয়ে আমার জন্যে কতখানি দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করছে। তাকে একদিনও কি একটা মিষ্টি কথা বলতে নেই রাঙা-দিদিমা?

—পড়ে পেলা ত সরে গলা। শুধু রবই শুনি রাজার মেয়ে, রাজার মেয়ে; দিদিশাশুড়ি বলে আমায়, কি মামা-শ্বশুর বলে গৌরকে একদিন একখানা সোনা রূপোর জিনিস কিছু দিয়েছে? অঙ্গে ত সোনা রূপোর একটা ছড় লাগল না, মিষ্টি কথা কিসে বেরুবে?

রাখাল হাসিয়া বলিল—আগে আমার চাকরী হোক, তারপর তোমায় বাউটি সুট গয়না গড়িয়ে দেবো।

নারাণদাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ গো হ্যাঁ—

কে যে কেমন দাতা
জানে তার জমাখরচের খাতা।

এই যে তিন-তিনটে প্রাণী বসে বসে খাচ্ছ, উপুড়হস্ত করবার নামটি নেই; তার আবার বাউটি সুট গয়না দেবেন!

শূন্য কথার মূল্য কি,
রয়েছে ভাঁড় নেইক ঘি!

—কেন রাঙা-দিদি, মণি ত মাসে মাসে দশটাকা ক দ্যায়।

—শুনতে দশ টাকা! তিন-তিনটে লোকের খাও দশটাকায় হয়?

—সজনের শাগ সেদ্ধ ভাত খেতে ওর চেয়ে ত বেশ খরচ পড়বার কথা নয়।

আর যায় কোথায়। নারাণদাসী চীৎকার করিয় উঠিল—তোমার রাজা শ্বশুর ত আমাদের হুণ্ডি বেঁ দ্যায়নি যে নিত্যি ক্ষীর সর নবনী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন খাওয়াব এতে যার মন না ওঠে সে নিজের ব্যবস্থা নিজে করলেই ত পারে; আমার ওপরে পিণ্ডি রাঁধবার ভার দেওয় কেন......

গণ্ডগোল বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া রাখাল আস্তে আস্তে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। গৌরও অমনি সেলেট ফেলিয়া বাহির হইল। রাখাল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—গৌর, কোথায় যাচ্ছিস? লিখলিনে।

গৌর বলিল—মা বলেছে লিখতে হবে না।

—পাজি ছেলে, মা বলেছে লিখতে হবে না! চ লিখবি।—বলিয়া যেই রাখাল তাহার হাত ধরিল অমনি গৌর ভাঁ করিয়া চীৎকার করিয়া মাকে জানাইয়া দিল যে ভাগ্নে তাহাকে মারিয়াছে।

নারাণদাসী রায়বাঘিনীর মতো গাঁক করিয়া আসিয়া পড়িয়া ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে ড্যাকরা, এমনি করেই কি শত্রুতা সাধতে হয়?—আমার ওপর রাগ করে কচি ছেলেকে মার!

রাখাল অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আমি ত ওকে মারিনি রাঙা-দিদিমা, শুধু পড়তে বলতেই কেঁদে উঠল।

—কারো অত আত্তি করে পড়তে বলতে হবে না। ওর বাপ-পিতমরা কত লেখাপড়া শিখেছিল যে ও শিখবে? যাদের পরের গোলামী করে খেতে হবে তারা লেখাপড়া শিখুকগে; আমাদের পায়ে কড়ি! ও আমার কত দুঃখের ধন, ওকে পড়ার জন্যে বকলে মারলে আমি ওকে বুকে করে কুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়ব।

এই কথার পর গৌরকে পড়াইবার দুরাশা রাখালকে ত্যাগ করিতে হইল।

মণিমালা বাড়ী আসিয়া সব শুনিয়া রাখালকে বলিল—দেখ আমরা নিজের খেয়ে পরে এঁদের কাছে চোর হয়ে আছি। রাত দিন এই খিটিমিটির চেয়ে ভিন্ন হওয়া ভালো।

রাখাল স্ত্রীর এই কথায় অত্যন্ত রাগিয়া বলিল—এমন কুপরামর্শ দিতে তোমায় কে শেখালে? যাদের খেয়ে আমি মানুষ, তাদের একটা কথায় আমি ভিন্ন হব? ফের যদি অমন কথা মুখে আন, ত আমি তোমার মুখদর্শন করব না।

মণিমালা লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল—ইহাদের ত ঢের খাইয়াছ! অর্দ্ধেক দিন উপবাসে কাটাইতে হইয়াছে; অর্দ্ধেক দিন দিদিমার ভিক্ষা আর মুখের গ্রাস খাইয়া প্রাণ ধারণ হইয়াছে! পৈতাটাও দিয়া দিল গাঁয়ের অন্য লোক! কটুকথার ঋণ কি কিছুতেই শোধ হইবার নহে!

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতীক্ষা

(হাইন হইতে)

প্রতিদিন প্রাতে জাগিয়া সুধাই—
"আজি কি আমার আসিবে প্রিয়া?"
—দিন চলে যায় বৃথা প্রতীক্ষায়,
অকশিয়া পড়ে ব্যথিত হিয়া।

বেদনা বহিয়া স্বপনের ঘোরে
ঘুমহীন নিশা যায়গো টুটি',
পরদিন হায় প্রভাতে আবার
নিরাশার মাঝে জাগিয়া উঠি।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

মীরাবাঈ

ভক্ত-প্রসূ হিন্দুস্থানে জীবের শিক্ষা ও মঙ্গলের জন্য কালে কালে কত সাধু-মহাত্মাই আবির্ভূত হইয়াছিলেন! সেই-সকল মঙ্গলময় মহাপুরুষের জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণী, সুললিত দোঁহা ও পদাবলী যেমন অজ্ঞানীর জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দেয়, কর্ণে অমৃত সিঞ্চন করে, তাঁহাদের অমিয় চরিত্র-কথাও তেমনই মনপ্রাণ অতুল আনন্দে বিভোর করিয়া দেয়।

আজ এই প্রসঙ্গে যাঁহার অলৌকিক চরিত্রের স্থূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তিনি রাজস্থানের এক বিখ্যাত ক্ষত্রিয়কুল-সম্ভূতা নারী ছিলেন। ইঁহার নাম মীরাবাঈ। মীরাবাঈয়ের জীবনের ইতিহাস ভক্তিরসে পূর্ণ। তিনি ভক্তিমার্গের চরম সীমায় উপনীতা হইয়াছিলেন। রাজবধূ এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইলেও তাঁহার মনে ভগবৎচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা স্থান পায় নাই। প্রেম, অনুরাগ ও বৈরাগ্যে এই ভক্ত-নারীর চরিত্র ভক্তসমাজের আদর্শ স্থানীয়।

যোধপুরের অন্তর্গত কুড়কী নামক গ্রামে ১৫৫৫-১৫৬০ সম্বতের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মীরাবাঈয়ের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা রতনসিংহ বিখ্যাত রাঠোরবংশীয় ছিলেন। মীরাবাঈ একমাত্র কন্যা বলিয়া পিতামাতার অত্যন্ত আদরের ছিলেন। মীরা যখন বালিকা তখন হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। সাধারণ বালিকার ন্যায় খেলাধূলায় তিনি আনন্দ পাইতেন না। তাঁহার উপাস্য দেবতা গিরধরলালজী তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব ছিল। এই গিরধরলালজী তিনি এক আশ্চর্য্য উপায়ে লাভ করিয়াছিলেন। একদিন এক সাধু তাঁহার বাটীতে অতিথি হন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই মীরা তাঁহাদের কাছছাড়া হইতেন না। সন্ধ্যাকালে আরতির সময় সাধুর নিকট গিরধরলালজীর মূর্ত্তি দেখিয়া বালিকার মন গলিয়া গেল। তিনি করজোড়ে সবিনয়ে সাধুকে বলিলেন ঐ রমণীয়কান্তি বিগ্রহটি তিনি লইবেন। কিন্তু সাধু বালিকার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। বিফলমনোরথ হইয়া মীরা পিতার নিকট গেলেন। তিনিও এ বিষয় গ্রাহ্য করিলেন না।

তখন মায়ের কাছে গিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। মাতা অন্যপ্রকারে তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন ভিজিল না। তিনি জিদ ধরিলেন, বিগ্রহটি তাঁহার চাই-ই। নতুবা তিনি খাইবেন না। শেষে ঘটিলও তাই। বিগ্রহটি না পাওয়ায় দুই তিন দিবস বালিকা অন্নজল স্পর্শ করিলেন না। পিতামাতা কন্যার এই হঠকারিতা দেখিয়া সাধুর নিকট হইতে বহুধনরত্নবিনিময়ে ঐ বিগ্রহটি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সাধু নিজ সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। নিজের ইষ্টদেবকে কিছুতেই তিনি অন্যের হাতে দিবেন না। সাধু অন্যত্র প্রস্থান করিলেন, কিন্তু সেই দিন গভীর নিশীথে গিরধরলালজী স্বপ্নযোগে সাধুকে দর্শন দিয়া বলিলেন "দেখ, তুমি যদি আপনার মঙ্গলকামনা কর, তবে সেই বালিকার নিকট আমাকে রাখিয়া আইস।" বেচারী সাধু পরদিন অতি প্রত্যূষে আসিয়া বালিকার হস্তে তাঁহার গিরধরলালজী সমর্পণ করিয়া গেলেন।

১৫৭৩ সম্বতে উদয়পুরের মহারাণা সঙ্গজীর পুত্র ভোজরাজের সহিত মীরাবাইয়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি পতিসহ চিতোরে গমন করেন। স্বামীগৃহে গমনকালে তিনি গিরধরলালজীকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। পতির অনুরাগিণী থাকিয়া তিনি গিরধরলালজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এই ভগবদ্ভক্তিশালিনী পত্নীর স্নেহ তাঁহার পতিকে বহুকাল ভোগ করিতে হয় নাই। বিবাহের দশ বৎসরের মধ্যেই মীরাবাঈ বিধবা হইলেন।

বিধবা হওয়ার পর তিনি সাধনপথে কঠোর ব্রত ধারণ করিলেন। সংসারের প্রতি নিস্পৃহ থাকিয়া তিনি সৎকার্য্যে আপনার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করিলেন। অহরহঃ সাধুসেবায় তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। অন্তরে নির্ম্মল বৈরাগ্য ধারণ করিয়া তিনি ভগবদারাধনাতে একাগ্রচিত্ত হইলেন। পরমারাধ্যের চরণে শরীর, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া দিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিপ্রস্রবণ ছুটিয়া গেল— ভগবৎপ্রেম শতমুখ হইয়া উঠিল, এবং সেই প্রেমের প্লাবনে তিনি কুল, মান ও লাজের বন্ধন ভাসাইয়া দিলেন।

কিন্তু সৎকার্য্যের বিঘ্ন অনেক। সংসারের প্রতি তাঁহার অনাস্থা ও বৈরাগ্য দেখিয়া পরিবারস্থ সকলেই অসুখী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাধনপথের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার দেবর মহারাণা বিক্রমজীৎ। কুলস্ত্রীর এইপ্রকার অহরহঃ সাধুসেবা ও ভজনপূজনাদি বংশের অমর্য্যাদাকর বিবেচনা করিয়া তিনি তাঁহাকে এইসকল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু যাঁহার মন-বিহঙ্গ সংস্কার-পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়াছে, তিনি এরূপ আদেশ গ্রাহ্য করিবেন কেন? রাণার আদেশ তিনি পালন করিলেন না। রাণা তখন অন্য এক উপায় অবলম্বন করিলেন।

চম্পা ও চামেলী নামে অতি চতুরা দুই পরিচারিকা রাণার অন্তঃপুরে থাকিত। রাণা তাহাদিগকে মীরাবাঈয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা সর্ব্বক্ষণ মীরার নিকট উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার স্বভাবসংশোধনের চেষ্টা করিবে, তাহাদের প্রতি এইরূপ আদেশ দেওয়া হইল। এই দুই রমণী তাঁহাকে অতিশয় উত্যক্ত করিতে লাগিল। তিনি যখন সাধুমণ্ডলীর নিকট বসিয়া সদালাপ ও সংপ্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন, সে সময় তাহারা লোকনিন্দার ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিত। পূজা-আরাধনার সময় তাহারা ইহার নিষ্ফলতা প্রতিপাদনের চেষ্টা পাইত, এবং সম্ভোগ ও বিলাস যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক তাহা বুঝাইতে প্রাণপণে যত্ন করিত। কিন্তু সব নিষ্ফল। শিশুকে মায়ের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলে সে যেমন প্রাণপণশক্তিতে মাকে আরও জড়াইয়া ধরে, মীরার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। বাধা পাইয়া সাধনপথে তিনি অধিকতর দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন। এদিকে চম্পা চামেলীর অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইল। মহাত্মা কবীর সাহেব বলিয়াছেন—

"পারস মেঁ অউর সন্তমেঁ,
বড়া অন্তর জান।
ও লোহা কঞ্চন করৈ,
যহ করে আপ সমান॥"

স্পর্শমণি এবং সন্ত এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত বেশী। স্পর্শমণি লৌহকে কাঞ্চনে পরিণত করে, কিন্তু যিনি সন্ত— তাঁহার সংসর্গে যে আসে তাহাকে তিনি নিজের অনুরূপ

করিয়া লন। চম্পা-চামেলী কিছুকাল তাঁহার সহবাসে থাকিয়া বিরুদ্ধভাব ভুলিয়া গেল, অবশেষে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সকল কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল।

চম্পা-চামেলীকে অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিয়া রাণা এই কার্য্যে আরও অনেক সুচতুরা রমণী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহারা একে একে সকলেই তাঁহার ঐশীশক্তির নিকট পরাস্ত হইয়া চম্পা-চামেলীর ন্যায় ভক্তিপথের পথিক হইল।

রাণা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় কনিষ্ঠা ভগ্নী উদাবাঈয়ের শরণাপন্ন হইলেন। উদাবাঈ ভ্রাতাকে আশ্বাস দান করিয়া মহা আড়ম্বরে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইলেন। তিনি অশেষপ্রকারে মীরাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

"দেখ মীরা, তুমি সকলের পরম স্নেহের পাত্রী ছিলে, কিন্তু নিজের বুদ্ধির দোষে তুমি সব হারাইতে বসিয়াছ। রাণা তোমায় ত্যাগ করিয়াছেন, রাণীও ত্যাগ করিয়াছেন। তোমার সখীগণ ঘৃণায় তোমার সহিত আর বাক্যালাপ করেন না। আত্মীয়স্বজনের অযাচিত স্নেহ প্রত্যাখ্যান করিয়া তুমি এমন কি ফল লাভ করিবে আশা করিয়াছ? মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার, সুন্দর উজ্জ্বল বস্ত্রবাস, তোমার কি এসকলের অভাব যে তুমি নিরাভরণা হইয়া ভিখারিণীর বেশে কাল কাটাইতেছ? এ তোমার কিরূপ আচরণ মীরা? ভারতবিখ্যাত সূর্য্যবংশের কুলবধূ তুমি, তোমার কি সাধুগণের সহিত করতালি দিয়া নৃত্য করা শোভা পায়? আমার কথা রাখ, অন্তঃপুরে চল। তোমার স্বামীর অকলঙ্ক কুলে আর কালি দিও না। রাণার ক্রোধানলে আর আহুতি প্রদান করিও না।"

উদাবাঈয়ের কথা মীরা স্থিরচিত্তে শুনিলেন এবং অবিচলিতভাবে উত্তর দিলেন,—

"অব নহিঁ মানুঁ রাণা থারী, মৈঁ বর পায়ো গিরধারী ॥
মনি-কপূরকী এক গতি হৈ, কোই কহো হজারী।
কঙ্কর কঞ্চন এক গতি হৈ, গুঁজ মিরচ একসারী ॥
অনড়ধনী কো সরণো লীনো, হাথ সুমিরনী ধারী।
জোগ লিয়ো অব ক্যা দিলগীরী, গুরু পায়ো নিজ ভারী ॥
সাধুসঙ্গত মইঁ দিল-রাজী, ভই কুটুম্বসুঁ ন্যারী।
ক্রোড় বার সমঝাও মোকুঁ, চালুজী বুদ্ধ হমারী ॥
রতন-জড়িতকী টোপী সির পৈ, হার কণ্ঠকো ভারী।
চরণ ঘুঁঘরু ঘমন পড়ত হৈ, মৈঁ কর্ আশ্যামসুঁ যারী ॥
লাজ সরম সবহী মৈঁ ডারী, যৌ তন চরণ অধারী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, ঝকমারো সংসারী ॥

তোমার রাণাকে আমি আর মানি না, আমি গিরিধারীকে বররূপে পাইয়াছি। যে যতই বলুক, মণি আর কর্পূর আমার নিকট এক। কাঁকর আর কাঞ্চন, কুঁচ আর মরীচ আমি সমান জ্ঞান করি। আমি পরম ধনীর শরণ লইয়াছি, তাঁহার নামের স্মরণ-মালা হস্তে ধারণ করিয়াছি। যে যোগমার্গ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নিকট আর সংসারের আকর্ষণ কিসের? আমি শ্রেষ্ঠগুরু লাভ করিয়াছি। সাধুসঙ্গেই আমার মন সন্তুষ্ট। আমি আত্মীয় কুটুম্ব হইতে পৃথক হইয়াছি। আমাকে কোটিবার বুঝাইলেও আমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে চলিব। রত্নমণ্ডিত মুকুট যাঁহার মস্তকে, কণ্ঠে যাঁহার সুচিক্কণ হার, যাঁহার চরণে ঘুঙ্গুর রুনুঝুনু বাজিতেছে সেই শ্যামের সহিত আমি প্রণয় করিয়াছি। লাজ সম্ভ্রম আদি ত্যাগ করিয়া এই দেহকে তাঁহার চরণের আধার করিয়াছি। মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, ইহাতে সংসারের লোক যাহা পারে করুক।

মীরার এইরূপ উত্তর শুনিয়া উদাবাঈ অবাক হইলেন। পরামর্শ দিয়া কৃতকার্য্যের আশা নাই দেখিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন, বলিলেন—

"ভাভী মীরা রাণাজী কিয়ো ছৈ থাঁ পর কোপ,
রতন কচোলে বিষ ঘোলিয়ো!"

"মীরা—স্নেহের ভ্রাতৃবধূ, রাণা তোমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তোমাকে খাওয়াইবার জন্য রত্নপাত্রে বিষ ঢালিতেছেন।"

মীরা। বাঈ উদা ঘোল্যো তো ঘোলন দো,
কর চরণামৃত বাহী মৈ পীবস্যাঁ।

মীরা বলিলেন—"উদা, রাণা আমার জন্য বিষ ঢালিতেছেন? তা ঢালিতে দাও, আমি চরণামৃত মনে করিয়া উহা পান করিয়া ফেলিব?"

উদা। ভাভী মীরা দেখতড়াঁহী মর জায়,
যো বিষ কহিয়ে বাসক নাগ-কো।

উদাবাঈ তখন বলিলেন "তুমি কি বলিতেছ মীরা! সে বিষ বাসুকীনাগের বিষের ন্যায় তীব্র, খাওয়া ত দূরের কথা, দেখামাত্রই মৃত্যু হয়।"

মীরা। বাঈ উদা নহী ম্হারে মায় ন বাপ,
অমর ডালী ধরতী ঝেলিয়া।

মীরা অবিচলিত ভাবে উত্তর দিলেন "উদা, মা বাপ আমার, আমার এই দেহ অমৃতপূর্ণ করিয়া সংসারে পাঠাইয়া দেন নাই। একদিন ত মরিতেই হইবে।"

অকৃতকার্য্য হইয়া উদাবাঈ ফিরিয়া গেলেন। এতরকমে বিফল হইয়াও রাণার কিন্তু মতিভ্রম দূর হইল না। তিনি কূটমন্ত্রীগণের পরামর্শে মীরাকে একেবারে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একটি রত্নপাত্রে তীব্র বিষ ঢালিয়া তাহা মীরার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে উহা কুলদেবতার চরণামৃত। মীরা জানিতেন যে উহা বিষ, পূর্ব্বেই এসংবাদ উদাবাঈ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু হউক বিষ, যখন দেবতার চরণামৃত নাম লইয়া উহা তাঁহার নিকট আসিয়াছে, তখন তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন কিরূপে? ভক্তনারী বিষপাত্র হস্তে লইলেন এবং তাহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া অতীব উৎসাহ সহকারে সেই তীব্র হলাহল গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। এই বিষপানের ফল কি হইল? ফল এই হইল যে তাঁহার ভগবৎপ্রেমের নেশা পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

একদিন মীরা ভক্তমণ্ডলী-বেষ্টিতা হইয়া নাম-কীর্ত্তন করিতেছিলেন এমন সময় উদাবাঈ তথায় উপস্থিত হইলেন। নামামৃতপানে তখন তিনি বিভোরা ছিলেন। তাঁহার লোচনযুগল হইতে অলৌকিক দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—মুখমণ্ডলে প্রেমোজ্জলকান্তি বিরাজ করিতেছিল। তাঁহার এই তেজঃপুঞ্জকান্তি দেখিয়া উদা স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক অদৃশ্য শক্তি আসিয়া তাঁহার মনে ভাবান্তর ঘটাইয়া দিল। কীর্ত্তন শেষ হইলে উদা ভাবাবেশে তাঁহার চরণপ্রান্তে শির নত করিলেন। চরণ-স্পর্শ মাত্রেই তাঁহার প্রতি ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। উদা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

উদা একদিন অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে গিরধরলালজীকে একবার প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিবার তাঁহার বড়ই আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার এই অভিলাষ যাহাতে পূর্ণ হয় তিনি দয়া করিয়া তাহার উপায় করুন। উদাবাঈয়ের ঐকান্তিক অনুরাগ ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তিনি চম্পা-চামেলী প্রভৃতি সখীগণকে গিরধরলালজীর ভোগ ও আরতির জন্য উপকরণাদির আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। সব আয়োজন প্রস্তুত হইলে তিনি সখীগণকে চারিদিকে লইয়া উপবেশন করিলেন এবং প্রেম ও বিরহের পদসমূহ রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে প্রহরেক কাটিয়া গেল, কিন্তু সঙ্গীতের বিরাম হইল না। যত বিলম্ব হইতে লাগিল, তিনি ততই অধীরা হইয়া আকুলকণ্ঠে প্রেমময়কে ডাকিতে লাগিলেন। হৃদয়-কন্দর হইতে প্রেম-মন্দাকিনী শতমুখী হইয়া প্রেম-সিন্ধুর দিকে ছুটিয়া চলিল। ভক্তের ডাকে শেষে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু আর না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার আরাধ্য ধন প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং মধুর কণ্ঠে বলিলেন "কেন তুমি এত অধীরা হইয়াছ?" অতঃপর তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিয়া কথালাপ করিতে লাগিলেন। এত অধিক রাত্রে মহলের ভিতর পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দ্বাররক্ষকেরা গিয়া রাণাকে নিদ্রা হইতে জাগাইল এবং মীরাবাঈয়ের মহলে একজন পুরুষ যে নিশ্চয়ই আসিয়াছে সে কথা বলিল। রাণা শুনিবামাত্র ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তরোয়াল খুলিয়া ছুটিলেন, এবং মীরাবাঈয়ের মহলে ঢুকিয়া চতুর্দ্দিক খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মীরাকে পরুষকণ্ঠে বলিলেন "কোথায় সেই দুর্বৃত্ত বল, আজ আর কিছুতেই তার নিস্তার নাই।" মীরা ধীরভাবে উত্তর করিলেন "আমার পরম মিত্র গিরধরলালজী ত আপনার চক্ষুর সম্মুখেই বিরাজমান রহিয়াছেন, আমায় আবার জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন?" রাণা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু মীরার চতুর্দ্দিকে অন্যান্য রমণীগণ ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ পালঙ্কের উপর ভয়ঙ্কর নরসিংহমূর্ত্তি আবির্ভূত

হইয়া পড়িল। সে মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই রাণা থরথর করিয়া কাঁপিয়া মাটিতে পড়িয়া সংজ্ঞা হারাইলেন। যখন সংজ্ঞা হইল তখন এই বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন "আমার কুলদেবতা একলিঙ্গদেবকে কেন ভজনা কর না? তোমার এই ইষ্টদেবতার তো বড়ই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিতেছি।"

এই প্রকার অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াও রাণার কিন্তু চৈতন্য হইল না। তিনি কিরূপে তাঁহাকে বিনাশ করিবেন তাঁহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক-দিন ফুলের সাজির ভিতর কয়েকটা বিষধর সর্প আবদ্ধ করিয়া তাহা প্রসাদী ফুল ও ফুলের মালা এই নামে পাঠাইয়া দিলেন। মীরা তাহা অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া আবরণ খুলিয়া দেখিলেন, তাহার ভিতর একটি শালগ্রাম শিলা ও কয়েক ছড়া সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্পের মালা রহিয়াছে।

মীরাবাঈ সম্বন্ধীয় এই-সকল অলৌকিক কথা হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। সম্রাট আকবর তখন দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছিলেন। এইরূপ শুনা যায় যে তিনি মীরাবাঈয়ের অমানুষী কার্য্যকলাপের কথা শুনিয়া তানসেন সহ তাঁহার দর্শনার্থ আগমন করেন। তিনি যে আসিয়াছেন এ কথা মীরাকে পূর্ব্ব হইতে জানান হয় নাই। কিন্তু মীরা তাঁহার সহচরীগণকে আদেশ দিলেন "সম্রাট আকবর স্বয়ং দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন, তোমরা গিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা কর।"

মীরার যশে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেই তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কেবল রাণা তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাব ত্যাগ করিলেন না। একটা না একটা প্রতিবন্ধক ঘটাইয়া তিনি তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। রাণার বারংবার অত্যাচারে তাঁহার ভজনসাধনের বড়ই ব্যাঘাত হইতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া তিনি পরম ভক্ত গোসাঁই তুলসীদাসের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইলেন,—

"শ্রীতুলসী সুখ-নিধান,
দুখ-হরণ গুসাঈ।
বারহিঁ বার প্রনাম করুঁ,
অব হরো সোক সমুদাই॥
ঘর-কে স্বজন হমারে জেতে,
সবন উপাধি বঢ়াই।
সাধু-সঙ্গ অরু ভজন করত,
মোহি দেত কলেস মহাই॥
বালপনে তেঁ মীরা কীন্হী
গিরধরলাল মিতাই।
সো তো অব ছূটত নহিঁ ক্যোঁ হুঁ,
লগী লগন বরিয়াই॥
মেরে মাত-পিতা-কে সম হৌ,
হরিভক্তন সুখদাই।
হম-কো কহা উচিত করিবো হৈ,
সো লিখিয়ো সমুঝাই॥"

শ্রীতুলসী, হে সুখ-নিদান, দুঃখহরণ গোসাঁই, আপনাকে আমি বারংবার প্রণাম করি, আমার সমুদয় উদ্বেগ আপনি হরণ করুন। আমার গৃহের যত সব আত্মীয়স্বজন, সকলেই উপদ্রব বাড়াইতেছে। আমি সাধু-সঙ্গ ও ভজন করি, কিন্তু সেইজন্য তাহারা আমাকে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়। মীরা বাল্যকাল হইতেই গিরধরলালের সহ মিত্রতা করিয়াছে, এখন কিছুতেই তাহা ছাড়ান যাইতে পারে না, বরং প্রেমের আকর্ষণ অধিক বাড়িয়াছে। হে গোসাঁই, আপনি আমার পিতামাতার তুল্য; হে হরিভক্তগণের সুখদাতা, আমার কি করা উচিত, আমায় তাহা বুঝাইয়া লিখিবেন।

ইহার উত্তরে গোসাঁই লিখিলেন,—

"জাকে প্রিয় ন রাম বৈদেহী।
তজিয়ে তাহি কোটি বৈরী সম, যদ্যপি পরম সনেহী॥
তজ্যো পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষন বন্ধু, ভরত মহতারী।
বলি গুরু তজ্যো, কন্ত ব্রজবনিতা, ভয়ে সব মঙ্গলকারী॥
নাতো নেহ রাম সৌঁ মনিয়ত, সুহৃদ সুসেব্য জহাঁ লৌ।
অঞ্জন কহা আঁখ জো ফূটে, বহুতক কহোঁ কহাঁ লৌঁ॥
তুলসী সো সব ভাঁতি পরম হিত, পূজ্য প্রান তেঁ প্যারো।
জা সোঁ হোয় সনেহ রামপদ, এতো মতো হমারো॥"

রাম বৈদেহী যাহার প্রিয় নন, সে পরম মিত্র হইলেও তাহাকে কোটী বৈরীর সমান ত্যাগ করিবে। প্রহ্লাদ

পিতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, বিভীষণ বন্ধু এবং ভরত মাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন; বলি-রাজা গুরু ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ব্রজাঙ্গনাগণ পতি ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের এই ত্যাগ সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলকর হইয়াছিল। রামের সহিত প্রণয় ও সম্বন্ধ যাহার যত বেশী, সে সেই পরিমাণে সুহৃদ ও সেবার যোগ্য। সে অঞ্জনে কি প্রয়োজন, যাহার প্রয়োগে চক্ষু অন্ধ হয়? এ বিষয়ে আমি আর কত বলিব? তুলসী বলিতেছেন, যাহার সঙ্গ করিলে রামপদে প্রেম জন্মে, সেই ব্যক্তি পরম হিতকারী, সেই পূজ্য এবং প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। ইহাই আমার মত।

গোসাঁইয়ের নিকট এই উপদেশ লাভ করিয়া মীরা আত্মীয়-স্বজন ও চিতোর পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উদাবাঈকে সেইখানেই থাকিতে উপদেশ দিয়া তিনি একদিন রাত্রিকালে গৈরিকবসনে ভূষিতা হইয়া চম্পা চামেলী ও অন্যান্য সখী সহ তাঁহার মাতার আলয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে তিনি পরম আদরে ও সম্মানে কিছু দিন অতিবাহিত করিলেন, পরে এখান হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

বৃন্দাবনে আসিয়া সাধু ও ভক্তগণের দর্শনলাভ করিয়া তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। একদিন সাধু দর্শন করিতে করিতে তিনি জীব গোসাঁইয়ের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের বাসনা জানাইলেন। কিন্তু জীবগোসাঁই আশ্রমের ভিতর হইতেই বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি সাধু, সুতরাং তিনি স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ পরিচয় করেন না। এই কথার উত্তরে মীরা বলিলেন "বৃন্দাবনে আমি সকলকেই সখী বলিয়া জানিতাম। এখানে পুরুষ একমাত্র গিরধরলালজী, আমি এতদিন ইহাই শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু এখন জানিলাম যে তাঁহার আরও প্রতিদ্বন্দী আছেন।" মীরার এই উচ্চভাবপূর্ণ বাক্য শুনিয়া গোসাঁইজী অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, এবং নগ্নপদে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে সসম্মানে পরম সমাদরে আশ্রমের মধ্যে লইয়া গেলেন।

বৃন্দাবনে কিছুকাল বাস করিয়া তিনি দ্বারকায় আসিলেন। তথায় রণছোড়জীর দর্শন ও সেবা এবং সাধু-সঙ্গে পরমানন্দে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

এ দিকে মীরাবাঈয়ের চিতোর পরিত্যাগ করার পর রাণা বিক্রমজীতের বড়ই সঙ্কট উপস্থিত হইল। গুজরাটের বাদশাহ সুলতান বাহাদুর সহসা চিতোর আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। রাণা বুন্দীদেশে প্রস্থান করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এই সুযোগে রাণার ছোট ভাই উদয়সিংহ সিংহাসনে বসিলেন, কিন্তু তিনিও নানা বিপদে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। তখন অনেকে অনুমান করিতে লাগিল যে পরমভক্ত মীরাবাঈয়ের উপর অত্যাচার এবং তাঁহার চিতোর পরিত্যাগ, এই সকল আকস্মিক বিপদের কারণ। মীরাবাঈ চিতোরের লক্ষ্মীস্বরূপিণী, তিনি চিতোরে পদার্পণ করিলে সকল বিপদ দূর হইবে—আবার দেশে সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসিবে। এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হওয়ায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় মীরাবাঈয়ের নিকট পাঠান হইল। কিন্তু তিনি দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া চিতোরে যাইতে সম্মতা হইলেন না। ব্রাহ্মণেরা অশেষ প্রকারে তাঁহার মিনতি করিলেন, কিন্তু কোনো ফল না হওয়ায় পরিশেষে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাদের কথা না রাখ তবে আমরা জলগ্রহণ করিব না—না খাইয়া তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।" মীরা এবার উভয়সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া শেষ বিদায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে রণ-ছোড়জীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। এই ঘোর সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি আকুলকণ্ঠে সঙ্কটনাশনকে ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে-ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমিষে মীরাবাঈয়ের দেহ রণছোড়জীর মূর্ত্তির সহিত মিলিয়া এক হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

অতঃপর তিনি নির্বিবাদে আপনার পূজা-আরাধনায় কিছুকাল পরমানন্দে অতিবাহিত করেন। পরিশেষে এক পরম সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইঁহার নাম রৈদাসজী। ইনি শব্দ-যোগের অভ্যাসী ছিলেন। মীরাবাঈ ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বরচিত ভজন ও

পদাবলীর অনেকস্থানে তিনি গুরু রৈদাসজীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মীরাবাঈ বহুভাষাভিজ্ঞা ছিলেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইহার ব্যুৎপত্তি ছিল। দেশ-দেশান্তর হইতে ইঁহার নিকট সাধুলোকের সমাগম থাকায় ইনি ব্রজবুলি এবং বাঙ্গালাভাষা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেন। "নরসী জী কী মায়রা" (নরসী নামক সাধুর জীবনবৃত্তান্ত) ও "রাগগোবিন্দ" নামক পুস্তকদ্বয় মীরা রচনা করিয়াছিলেন, জয়দেব-কৃত গীত-গোবিন্দের টীকাও ইনি প্রস্তুত করেন। ইঁহার প্রেম ও ভক্তিরসপূর্ণ ভজন এবং পদাবলী ভক্তমণ্ডলীর ও কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তির পরম আদরের জিনিষ।

অনুমান ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে, ১৬২০-১৬৩০ সম্বতের মধ্যবর্ত্তী সময়ে, মীরাবাঈ দেহত্যাগ করেন। ইঁহার দেহত্যাগের পর তিন শতাব্দী অতীত হইয়াছে, কিন্তু এই ভক্ত-নারীর ভক্তি-গাথা হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে আজও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

মুক্তিস্নান

(গল্প)

পঁচিশ বৎসর বয়সে, গগনচন্দ্রের যখন তিন দিনের জ্বরে স্ত্রী, এবং ওলাউঠায়, একদিনে, সবেমাত্র সন্তান, পুত্রটি মারা গেল, তখন সে মনে করিল, তাহার আত্মীয় স্বজন হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত লোক এবং স্বর্গের তেত্রিশ কোটী দেবতা একজোট হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। এই স্পষ্ট অত্যাচারের মধ্যে বাস করা গগনের অসাধ্য হইয়া উঠিল; সে দেশ ত্যাগ করিল। কিন্তু দেশত্যাগ করিয়াই বা বেচারা যায় কোথায়? যেখানে যায়, সেইখানেই দেখে ঘরে-ঘরে ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে, হাসিয়া খেলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে; কুললক্ষ্মীরা বিধাতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদের মত ঘরে-ঘরে বিরাজ করিতেছেন। ঘরে-ঘরে আনন্দের কোলাহল, কেবল তাহারই ঘর শ্মশান। গগনের মনে হইত এ বিধাতার কঠোর বিদ্রূপ। কক্ষচ্যুত একটা উল্কাপিণ্ডের মত আপনার তাপে জ্বলিতে-জ্বলিতে সে ছুটিয়া চলিল। লোকালয় ছাড়িয়া বনে গেল, দেখে সেখানেও সেই বিদ্রূপ। গাছে গাছে স্নিগ্ধ সবুজ পাতা, পাতার আশে-পাশে শতশত ফুল! গাছগুলি হাসিতে ভরা। বনের সঙ্গে তাহার মনের একটুও সাদৃশ্য নাই—সেখানে সে তিষ্ঠিতে পারিল না। গগন ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া, অবশেষে বিধাতার অত্যাচারের নিকট মাথাটি নত করিয়া, এমন একটি জায়গায় উপস্থিত হইল, যেখানে আসিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল যেন সে বিধাতার বিদ্রূপের গণ্ডি হইতে কতকটা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

তিন বৎসর গগন এখানে বাস করিতেছে। বিদ্রোহী গগনের মনে একটা দারুণ অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতির নিয়মে যেই সেই আগুনের তাপ একটু কমিয়া আসিত, অমনি সে নিরর্থক ঝোঁকের মাথায় চারিদিক হইতে কতকগুলি শুষ্ক আবর্জ্জনা আনিয়া সেই আগুন সতেজ করিয়া তুলিত। সে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, স্নেহ মমতা ভালবাসা যদি তাহার অদৃষ্টে থাকিবেই তাহা হইলে ভগবান সমস্ত দিয়াও তাহাকে কেন এমন করিয়া বঞ্চিত করিলেন? এ বঞ্চনা যখন তাঁহার অভিপ্রেত, তখন তাহাকে চিরদিনই বঞ্চিত থাকিতে হইবে। যদি তাহাই হইল, তবে সে তাহার হৃদয়কে পাষাণের অভেদ্য প্রাচীর দিয়া এমন সুদুর্গম করিয়া রাখিবে যে সমস্ত জগতের আনন্দ ও মর্ম্মবেদনার স্পন্দন কিছুতেই যেন সেখানে পৌছিতে না পারে। সে থাকিবে একেবারে মুক্ত অনাসক্ত ও বন্ধনহীন। জগতের সমস্ত কোমল বৃত্তি হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া, চিতার ভস্ম ও শুষ্ক হাড় ও রুদ্রাক্ষের মালায় আপনার চারিদিকে ভৈরবের এমন ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিবে যাহা দেখিয়া সমস্ত জগতের লোক তাহার দিকে সসম্ভ্রমে চাহিয়া থাকিবে।

যাহাদের দেশে গগন আসিয়া পড়িয়াছে তাহারা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোক। বাহিরের পীড়নে তাহাদের যেখানেই রক্তমাংসের আবরণটি ছিঁড়িয়া শ্বেত অস্থিগুলি বাহির হইয়া পড়ে, অমনি তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের ছোট ছোট সুখ ও আনন্দ দিয়া আহত স্থানটুকু ঢাকিয়া ফেলে। যে মাটিতে পড়িয়া তাহারা আঘাত পায়, সেই মাটিই তাহারা আরো আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরে। ইহারা না বুঝিয়া

শত বেদনার মধ্যে চায়—জীবন; আর গগন বুঝিয়াও চায়—মৃত্যু। সুতরাং সঙ্গী নির্ব্বাচনে গগনের একটা ভুল হইয়া গেল।

লোকালয় হইতে গগনের বাংলা কিছু দূরে। সেখান হইতে পল্লীর হর্ষকোলাহল কানে আসে না—দূর বনের শ্যামলতা কেবল একটা আবছায়ার মত দেখা যায়। একা থাকা চলে না, তাই গগন একটি চাকর রাখিয়াছে। তাহার নাম জয়রাম, সকলে তাহাকে ডাকে জারমা বলিয়া। পলাশের গ্রামে তাহার বাড়ী। গগনের সঙ্গে তাহার বন্দোবস্ত যে সে দিনরাত বাংলায় থাকিবে। দুই একদিন যাইতেই, একদিন বিকালে জয়রামের স্ত্রী তাহার শিশু-কন্যাটিকে লইয়া বাংলায় উপস্থিত। পিতাকে দেখিয়া মেয়েটির কত আনন্দ! সে আনন্দের কলধ্বনি বাংলার মধ্যে গগনের কানে গেল; সে একবার চমকিয়া উঠিল। বহুদিনের অতীত একটা স্নিগ্ধ কোমল স্মৃতি তাহার অন্তরের মধ্যে বর্ষার জ্যোৎস্নায় রজনীগন্ধ ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল। কোন্ দূর স্বপ্নলোক হইতে কাহার যেন বাঁশীর সুর তাহার কানে মধুসিঞ্চন করিতে লাগিল। কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য। গগন আপনাকে কঠিন শাসনে লাঞ্ছিত করিয়া তখনই আত্মস্থ হইয়া বসিল এবং নিজের দুর্ব্বলতার প্রতিশোধ লইবার জন্য শুষ্কতার আগুন তিনগুণ জোরে জ্বালিয়া দিল। সে ভাবিল, "এরা কেন এখানে এসেছে? ওদের এখানে কোন দরকার নাই।" সমস্তটা প্রাণ পাথরের মত করিয়া, সে এই মনে করিয়া বাংলা হইতে বাহির হইয়া আসিল, যে, উহাদের এখান হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে। কিন্তু বাহিরে আসিয়া যখন দেখিল, মেয়েটি হাসিয়া মার কোল হইতে ঝাঁপাইয়া পিতার কোলে যাইতেছে, তখন তাহার তাড়াইয়া দিবার শক্তি থাকিল না। যাহাদের বধ করিবার জন্য গগন দেশত্যাগী হইয়া, তিনটি বৎসর আপনাকে বর্ম্মে আবৃত করিয়া, দিনরাত সশস্ত্র হইয়া আছে, সে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, তাহার এই কঠোর শাসনে তাহারা একটুকও কুণ্ঠিত হয় নাই; বরং যেখানে একটু অবসর পায় সেইখানেই স্নিগ্ধ শ্যাম অপরাজিতা লতার মত কোমল বাহুগুলি বাড়াইয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। জয়রাম ও তাহার পত্নীকে কিছু না বলিয়া, গগন বিরক্তির সহিত বাংলা হইতে বাহির হইয়া গেল।

এরূপ ঘটনা প্রায়ই হইতে লাগিল। একদিন গগন বিকালে বেড়াইয়া বাংলায় আসিয়া দেখে, আজ শুধু জয়রামের ছোট মেয়েটি নয়, ষষ্ঠীর কৃপায় তাহার যে-কয়টি ছেলে মেয়ে হইয়াছে, মার সঙ্গে তাহারা সব কয়টিই আসিয়া বাংলা মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। গগনের অসহ্য হইল। সে এমন ধমক দিল, যে, ছেলেমেয়েগুলি ভয়ে মায়ের আড়ালে যাইয়া আশ্রয় লইল এবং মাও মুখখানি ম্লান করিয়া বাবুর বাংলা হইতে চলিয়া গেল। যখন এই কঠোরতার আগুন বেশ জ্বলিয়া উঠে গগন তাহাকে যেন একটা গৌরব অনুভব করে। সে আরো একটু কঠোর হইয়া জয়রামকে শাসন করিয়া দিল যে এরূপ প্রশ্রয় সে কিছুতেই দিবে না এবং পুনরায় যদি তাহার ছেলেমেয়েরা বাংলায় আসে তাহা হইলে তাহার চাকরি যাইবে। গরিব জয়রাম প্রভুর আজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইল, কিন্তু বাবুর এ গুরুতর শাসনের কোন সুসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

তাহারা চলিয়া গেল—কিন্তু গগনের মন যেন কেমন অশান্ত হইয়া উঠিল। বুকের উপর চাপান সমস্ত পাষাণ ভেদ করিয়া কি একটা অব্যক্ত বেদনা কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। উচ্ছৃঙ্খল অশ্বকে বশীভূত করিতে হইলে যেমন তাহাকে কশাঘাত করিতে হয়, তেমনি সে আপনাকে কশাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল, কিন্তু তবু সে কিছুতেই আপনাকে আপনার পূর্ব্ব মহিমায় স্থাপিত করিতে পারিল না। গগন আপনাকে একটা কল্পিত উচ্চতার শিখরে স্থাপিত করিয়া গৌরব অনুভব করিত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এটাও সে অনুভব করিত যে তাহার ঝোঁকের নেশাকে ফেনাইয়া তুলিয়া সে যে এত উচ্চ একটা বুদ্বুদের স্তূপ সৃষ্টি করিয়া তাহার উপরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেই স্তূপটা একদিন হাওয়ায় মিশিয়া যাইয়া তাহাকে অনেক নীচে ফেলিয়া দিবে। তাহার এরূপ মনে করিবার কারণ ছিল, কেননা মধ্যে মধ্যে তাহার বুভুক্ষিত হৃদয় এমন লোলায়িত রসনায় অপরের দ্বারস্থ হইয়া পড়িত, যে, সে লজ্জায় ও ঘৃণায় একেবারে মরিয়া যাইত।

কিছুদিন বাংলা একেবারে নীরব হইয়া গেল। গগন বড় অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু সে এই চপলতার জন্য নিজেকে এমন শাসন করিল, যে, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে জয়রামের সঙ্গেও কথা বলিত না। জয়রামও বিনা দরকারে বাবুর সঙ্গে কোন কথা বলিত না। তবে মানবপ্রকৃতির দুর্ব্বলতাবশতঃ যদি স্নানের সময় বাবুর গায়ে জল ঢালিতে ঢালিতে দৈবাৎ সংসারের সুখদুঃখের একটা কথা বলিয়া ফেলিত, তাহা হইলে গগন ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া দুর্ব্বাসার মত এমন একটা কঠোর অভিশাপ উদ্গিরণ করিত যে বেচারা জয়রাম কিছুদিন একেবারে মৌন হইয়া থাকিত।

এমন সময় বাংলায় আর-একটি জীবের আবির্ভাব হইল। সে গগনের বাল্যবন্ধু ফটিক। কোথা হইতে কোন্ সূত্রে সন্ধান পাইয়া সে একদিন আসিয়া বাংলা জাঁকাইয়া বসিল। ফটিক বলিল, "ভাই গগন, তোমার এ জায়গাটি বেশ স্বাস্থ্যকর, আমার শরীরটা ভাল নাই, তাই এসেছি দিন কতক তোমার আতিথ্য গ্রহণ করে যাই। কিন্তু ভাই, এমন সুদুর্গম ব্যূহটি রচনা করে রেখেছ যে আমি কিনা একজন মহারথী তাই এ ব্যূহ ভেদ করে আসতে পেরেছি।" এই বলিয়া ফটিক তাহার সরল হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিল। সে হাসির শব্দে জয়রাম একেবারে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। গগনের কঠোর দৃষ্টি, তপোমগ্ন মহাদেবের লতা-গৃহদ্বারস্থিত নন্দিকেশ্বরের মত সর্ব্বদাই যেন বলিতেছে "মা চাপলয়েতি।" জয়রাম এ পর্য্যন্ত কাহাকেও সে আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখে নাই, কাজেই সে প্রতিমুহূর্ত্তে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা করিতেছিল। কিন্তু বাবু কিছুই বলিলেন না দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ফটিক প্রথম দিনেই জয়রামের ঘরের সকল সম্বাদ লইয়া তাহাকে একেবারে আপন করিয়া ফেলিল। জয়রামও অনেক দিন পরে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ফটিক বলিল "জয়রাম তোর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসিস্, দেখবো।" বাংলায় আসিয়া অবধি এমন ভাবে জয়রামের সঙ্গে কেহ কোন দিন কথা বলে নাই, সুতরাং নূতন বাবুটির এই সস্নেহ আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। কিন্তু বাবুর ভয়ে শঙ্কিত তাহার মন সে আহ্বান গ্রহণ করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছিল। শেষে সে মনে মনে স্থির করিল যে বাবু বাংলায় না থাকেন এমন একটি সুযোগ বুঝিয়া ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া আনিবে। সেরূপ সুযোগ ঘটিতেও বেশী বিলম্ব হইল না, এবং একদিন বাবুর অনুপস্থিতিতে জয়রাম তাহার ছেলে-মেয়েদিগকে আনিয়া ফটিকের সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রথম আলাপেই ছেলেমেয়েগুলি যেন তাহার একেবারে চির-পরিচিতের মত হইয়া পড়িল। ফটিককে তাহাদের ভাষার নিষ্ফল অনুকরণের চেষ্টা করিতে দেখিয়া তাহারা হাসিয়া অস্থির হইতেছিল। তাহাদের ভয় ও সম্ভ্রমের সমস্ত বাধা ফটিকের সামনে ভাঙিয়া গেল। সেই দিন হইতে বিনা আহ্বানেই তাহারা যখন-তখন ফটিকের নিকট আসিতে আরম্ভ করিল এবং দুই-চারি দিনের মধ্যে এমন হইয়া পড়িল যে, ফটিকের সামনে আসিলে তাহারা বাবুর অস্তিত্বটা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া অনেক সময় বাংলার গাম্ভীর্য্যের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া ফেলিত।

এ-সব অনাচার বন্ধুর খাতিরে গগন সহ্য করিয়া থাকিত, কিন্তু ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে ফাল্গুনের পূর্ণিমায় তাহার সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। সমস্ত দুঃখ ও দারিদ্র্যের কৃষ্ণবর্ণটি ফাগুয়ার লাল রংএ সেদিন রঙ্গিল হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষুদ্র পল্লী হাসি ও গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ঘাটে, পথে, মাঠে গানের সুর বসন্তের বাতাসের সঙ্গে ঢেউ খেলাইয়া বেড়াইতেছে। পার্ব্বত্য নদীতে যেমন একদিনের জন্য বান আসে, তেমনি একদিনের জন্য কোথা হইতে যেন একটা আনন্দের প্লাবন তাহার শিলা-অবরোধ হইতে মুক্ত হইয়া গ্রামখানিকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। গগন অস্থির হইয়া বাংলা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু যখন ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল কি, জয়রামের ছেলে-মেয়েরা আর দেশসুদ্ধ ছেলেমেয়ের দল, ফাগুয়ার রংএ ফটিককে এমন রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে যে তাহাকে আর চেনা যায় না। ফটিককে কেন্দ্র করিয়া সেই ক্ষুদ্র উপগ্রহের দল যে কত রকম আবর্ত্তনে ঘুরিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। এ দৃশ্য দেখিয়া জয়রামের এতদিনের শাসনরুদ্ধ

হাসি মুক্তস্রোতের মত ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেছিল। ছেলেদের চপলতা অপেক্ষা জয়রামের এই হাসি গগনকে বেশী আঘাত করিল। ঐ হাসিতে সে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ দেখিতে পাইল। গগন কঠোর স্বরে ফটিককে বলিল "তুমি সব বিগড়ে দিলে!" এবং উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া জয়রামকে বলিয়া দিল যে আজ হইতে তাহার জবাব। বাংলায় আসিয়া অবধি দুঃখী জয়রামের হৃদয়টি উদরের ক্ষুধার চাপে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। আজ তাহার মনে হইতে লাগিল যেন ক্ষুধা অপেক্ষা হৃদয়টা বড়। "যে আজ্ঞা" বলিয়া জয়রাম তখনই বাংলা ছাড়িয়া গেল; সঙ্গে-সঙ্গে ছেলের দলও চলিয়া গেল। ফটিক বুঝিতে পারিল এ জবাব জয়রামের নহে,—তাহার। সেও সেইদিনই তাহার বিছানা ট্রাঙ্ক গুছাইয়া সেই দেশ ত্যাগ করিল।

ফটিক ও জয়রামের বাংলা ত্যাগে গগন বিশেষ বিচলিত হইল কি না বলা যায় না, কিন্তু একটা কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে আসিতে লাগিল, যে, এজগতে সে যেন খাপ্-ছাড়া একটা-কিছু। দিনটা তাহার বড় অশান্তিতে কাটিয়া গেল; সন্ধ্যার সময় সে বাহির হইয়া পড়িল। লক্ষ্যহীন ভাবে বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি হইয়া গেল। এক জায়গায় একটা ছাগশিশু জনহীন বনে কাতরকণ্ঠে ডাকিয়া-ডাকিয়া বেড়াইতেছিল। রাখাল তাহাকে ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। গগনকে দেখিয়া শাবকটি এমন ভাবে দৌড়াইয়া তাহার নিকটে আসিল যেন সে তাহার বিপদের মধ্যে একটা আশ্রয় পাইয়াছে। গগন কতবার তাহাকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে কিছুতেই তাহার সঙ্গ ছাড়িল না, বরং এমন কাতর কণ্ঠে গগনের দিকে চাহিয়া ডাকিতে লাগিল যে সে স্বর একটা তীক্ষ্ণ বাণের মত তাহার হৃদয়ের নীরস বালুকাস্তর ভেদ করিয়া বহু দিনের রুদ্ধ ভোগবতীর স্নিগ্ধ ধারা উৎসারিত করিয়া দিল। গগনের মনে হইতে লাগিল আজ সে সম্পূর্ণ পরাজিত এবং সেই সঙ্গে তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন বনের আড়াল হইতে শত চক্ষু তাহার এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া হাসিতেছে। লজ্জিত গগন দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া একটা খাদ পার হইয়া চলিয়া গেল; অক্ষম শাবকটি সেইখানে দাঁড়াইয়া ডাকিতে লাগিল। গগন কতদূর চলিয়া গেল, তবু সেই কাতর করুণ কণ্ঠ তাহার কানে রোদনের উচ্ছ্বাসের মত বাজিতে লাগিল, কাহার যেন দুইখানি কোমল বাহু তাহার পা জড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। গগন ফিরিল এবং সেই পথ ধরিয়া তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে কত বন কত খাদ পার হইয়া গেল, কিন্তু তাহাকে আর পাইল না। হতাশ হইয়া, ব্যথিত হৃদয়ে, ক্লান্ত দেহে সে বাংলার দিকে ফিরিয়া চলিল। বন পার হইয়া, ক্ষেতের আল দিয়া, আখের ক্ষেতের পাশে যেখানে নদীটি বেঁকিয়া গিয়াছে, সেখানে যখন সে উপস্থিত হইল—তখন তাহার পা আর চলে না, সমস্ত পথ ঘাট তাহার চোখে অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। পাশে একটা বড় পাথর ছিল; গগন তাহার উপরে একেবারে শুইয়া পড়িল এবং তখনি ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্নে সেই ছাগশিশুর করুণ আর্ত্তস্বর তাহার বুকের মধ্যে একখানা তীক্ষ্ণ ছোরার মত বিঁধিয়া গেল। সে জাগিয়া বসিল—তখন পূর্ণিমার রাত্রি ভোর হয়-হয়। জাগিয়াও একটা করুণ স্বর তাহার কানে যাইতে লাগিল। একটু পরে গগন বুঝিতে পারিল কে যেন গান গাহিতেছে। গানের অস্পষ্ট কথাগুলি অলস মধুর স্বরের সহিত জড়িত হইয়া তাহার কানে বাজিতে লাগিল। পাশের আখের ক্ষেতের মাচার উপর বসিয়া শনি মাহাতোর বিধবা কন্যা ক্ষেমিয়া গাহিতেছে—

> "যো দিন পিওয়া, ঘর ছোড়ি বিদেশ গেল,
> ওহি দিনসে আঁখিয়া-মে নিদ না আওয়ে,
> দিন গনইতে গনইতে আঙ্গুরি ক্ষিয়াইল।"

গানের প্রত্যেকটি কথা গগনের হৃদয়ে একটা অব্যক্ত বেদনা লইয়া আসিতেছিল। বহুদিন পূর্ব্বে দারুণ মর্ম্মবেদনায় সে যে একদিন লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিয়াছিল, সেই রোদনের সুর, আজ এত দিন পরে তাহার কানে যেন রণিত হইতে লাগিল। সে উঠিয়া অজ্ঞাতসারে যাইয়া সেই ক্ষেতের বেড়ার একটা গাছ ধরিয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া তৃষিতের মত সেই গানের সুধা পান করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, এও ত আমারি মত জীবনের সব হারাইয়াছে। কিন্তু সব হারাইয়াও, প্রিয়তমের আশায় কত বিনিদ্র রজনী জাগিয়া দিন গণিতে গণিতে অঙ্গুলি ক্ষয় করিতেছে—কবে সেই বাঞ্ছি-

তের সহিত আবার মিলন হইবে। ঐ যে সুর উহাতে তো আমার হৃদয়ের দাহ নাই,—ও সুর কত স্নিগ্ধ, কত কোমল। দয়িতের স্নেহে এখনও উহার আশার ফুল ফোটে; সেই বাঞ্ছিতের সঙ্গে উহার মনে অভিমানের খেলা। তাহারই রচিত সংসারটি জড়াইয়া ধরিয়া, তাহারই অপেক্ষায় রাত্রি জাগিয়া, দিন গণিতেছে। আর আমি আমার চারিদিকে এমন একটা নির্মম পাষাণের প্রাচীর গড়াইয়া তাহার মধ্যে বধির হইয়া বসিয়া আছি যে, শত পথ দিয়া, শত ছন্দে তাহাদের কোমল আহ্বান আমার দিকে আসিয়া সেইখান হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

ঊষার আলো ফুটিয়া উঠিল। ক্ষেমিয়া মাচা হইতে নামিয়া বাড়ী যাইবে, দেখে ক্ষেতের বেড়া ধরিয়া বাঙ্গালী বাবু তাহার দিকে চাহিয়া আছে। গগনকে সকলেই জানিত, সুতরাং ক্ষেমিয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল বাবু এত কাছে তাহা জানিলে কি আর সে এত চেঁচাইয়া গান করে। গগন ক্ষেমিয়াকে ইহার পূর্ব্বেও দেখিয়াছে, কিন্তু আজ প্রভাতের আলোকে তাহার চক্ষে সে দেবী হইয়া দেখা দিল। গগন বেশ বুঝিতে পারিল, সে এতদিন কেবল মিথ্যাকে লইয়া কাটাইয়াছে, আর যাহা সত্য, যাহা চিরসুন্দর, তাহা ক্ষেমিয়ার বেশে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

সেইদিন, সেইখানে, গগনের এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত আবর্জ্জনা এক মুহূর্ত্তে সুরের সুরধুনীতে ভাসিয়া গেল, গগন মুক্তিস্নান করিয়া উঠিল।

কিশোরীলাল দাসগুপ্ত।

যশ ও অপযশ

[হিন্দি কবিতার অনুবাদ। কবির নাম—গিরিধর। ছন্দের নাম 'কুণ্ডলী'; ইহা হিন্দি সনেট।]

রইল না কৈকেয়ী, অযশ রইল গো ভুবনে—
অভিষেকের দিনে সে যে রামকে দিল বনে;
রামকে দিল বনে, স্বামীর আনল মরণ ডেকে,
যার তরে পাপ করল এত, সেও জলে মুখ দেখে।
কয় কবিরায় এই দুনিয়ায় অমর শুধু এইই,
যশ অযশ এই রইল বেঁচে, রইল না কৈকেয়ী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জৌনপুর

আমাদের পর্য্যটকগণের মধ্যে অতি অল্প লোকের মুখেই জৌনপুরের কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। কেন যে পর্য্যটকগণের শুভদৃষ্টি হইতে এই জৌনপুর বঞ্চিত তাহা বুঝা যায় না। এমন নয় যে ইহা দুর্গম বা ব্যয়সাধ্য। বারাণসী হইতে ফয়জাবাদে যাইবার পথে ইহা অবস্থিত—সুতরাং বহু যাত্রী এখান দিয়া যাতায়াত করেন। তাঁহারা অনায়াসে এখানে অবতরণ করিয়া জৌনপুরের সম্পদহীন ভ্রষ্ট শ্রী দেখিয়া যাইতে পারেন। আসিলে দেখিতে পাইবেন স্থাপত্যের নমুনা যাহা আছে তাহার স্থান এখনও কত উচ্চে —যাহা ছিল তাহা আরও কত উচ্চে তাহা চিন্তা করুন। জৌনপুরে দ্রষ্টব্য গৃহাদির সংখ্যা বিস্তর। বর্ত্তমানে এগুলি জীর্ণ,—পূর্ব্ব গৌরব নাই বটে, কিন্তু ইস্‌লামীয় স্থাপত্যে উহাদের স্থান এখনও খুব উচ্চে।

জৌনপুরের আদি পত্তন হিন্দুদের হাতে। ভারতের ইতিহাসে এই হাত বহু সংখ্যক স্থানে বদল হইয়াছে। জৌনপুর সেই-সকল স্থানেরই অন্যতম। বিজেতা মুসলমান-গণ এ স্থানের পূর্ব্বেকার হিন্দুমন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া তাহারই ইট্‌পাথরে বর্ত্তমান মসজিদ্‌ ও প্রাসাদগুলি নির্ম্মাণ করেন। বিস্তর স্থানে তাহার পরিচয়-চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

এখানকার স্থাপত্যের ও এখানকার স্থানবিশেষের বিবরণ জানিতে হইলে আমাদিগকে ১৩৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইতিহাসের খোঁজ করিতে হয়। জৌনপুরের স্বাধীন অধিকারী প্রাচীন শার্কীবংশের প্রতিষ্ঠাকাল ১৩৯৭ খৃঃ অব্দ। আকবরের রাজত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—প্রায় শত-বর্ষ কাল—এ বংশ বরাবর স্বাধীন ছিল আকবরও শার্কীদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেন নাই, তিনি তাঁহাদিগকে আপন প্রাধান্য স্বীকার করাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। ১৩৬০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত জৌনপুরের প্রাচীন কেল্লা আজও গোমতী নদীর তীরে খাড়া আছে; উহাই পুরাতন প্রাসাদগুলির মধ্যে প্রধান। ইহার অধিকাংশ পাথর পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে গৃহীত।
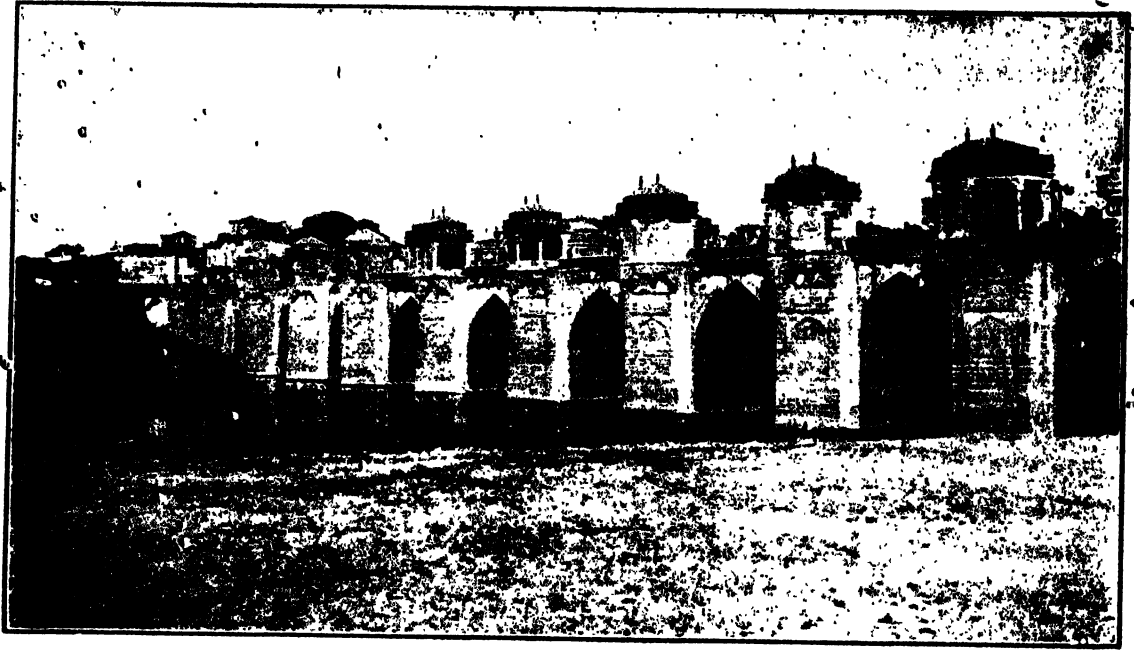
জৌনপুরে গোমতি নদীর পুল।

জৌনপুরে গোমতির উপর আকবর-নির্ম্মিত সেতুর দ্বিতীয় দৃশ্য।

কেল্লায় প্রবেশ করিতে প্রথমেই তোরণ-দ্বার পার হইতে হয়। তোরণটি বৃহৎ। জরাগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে সৌন্দর্য্যে যে এটি অনেক বিখ্যাত-সুন্দর তোরণের সহিত তুলনীয় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তোরণে ব্যবহৃত ইটগুলির নাম প্রাসানি ব্রক্; ইহা এক রকমের কলাইকরা হরিদ্রা ও নীল রংএর ইট। এই শ্রেণীর ইটের গাঁথনী দেখিয়া মানসিংহের গোয়ালিয়রস্থ প্রাসাদের কথা মনে পড়ে।

তোরণ পার হইলে, কেল্লার ভিতর-দ্বার। ভিতর দ্বারের গঠন খুব দৃঢ়। এই দরজার পাথরের উপর কতকগুলি ঘণ্টা খোদাই করা আছে। ঘণ্টাগুলিকে দেখিয়া এই-সমুদায় পাথর যে হিন্দুমন্দির হইতেই লওয়া হইয়াছে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠে। দরজাটি পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে ছোটখাট একটি মস্‌জিদ্ সম্মুখে পড়ে। মস্‌জিদের সাম্নে সুন্দর একটি 'লাট্' অর্থাৎ স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভটি বড়ই মনোহর; এই স্তম্ভটির দরুণ মসজিদটি দর্শকের মন বিশেষরূপে কাড়িয়া লয়। মস্‌জিদের কারুকার্য্য-খচিত মিনারটি আজও অটুট রহিয়াছে। বোধ হয় কয়েক শতাব্দী যাবৎ ইহা এই ভাবেই আছে; কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

মস্‌জিদ্ অতিক্রম করিয়া দুর্গের ভিতরে চারিদিকে বেশ ঘোরাফেরা করা যায়, কিন্তু বাগান ও অস্ত্রাগার ছাড়া এখানে দেখিবার মত আর কিছুই নাই। নদীবক্ষ হইতে দুর্গপ্রাচীর বেশ উচ্চ; প্রায় ১৫০ ফুট। প্রাচীরের উপর দাঁড়াইলে চারিদিকের দৃশ্য অনেক দূর অবধি দেখা যায়।

জৌনপুরের কেল্লার অভ্যন্তর।

সেই দৃশ্যাবলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে—জৌনপুরের পাথরের পুল। গোমতীবক্ষে জলের উপর দশটি খিলানের মাথায় এই পুলটি সুগঠিত। দুই পাশের ছয়টি খিলান অপেক্ষা মাঝের খিলান চারিটি বড়। নদীর উভয় তীরে ক্ষুদ্রতর আরও কতকগুলি খিলান মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া আছে। জৌনপুর বিজয়ের পর আকবর এই পুল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মুন্নীর্খা নামে আকবরের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর অধীনে, তাঁহার উপদেশ-মত, কাবুল দেশীয় স্থপতি আফজল আলি চারি বৎসরে ইহার নির্ম্মাণ শেষ করেন। নিরেট পাথরে পুলটি তৈয়ারী হইয়াছিল। মুন্নীর্খা কেবল পুলটির গঠনের তত্ত্বাবধান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, ইহার স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইহার সমুদায় ব্যয়ভার তিনিই নিজে বহন করিয়াছিলেন। স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ এবং স্থাপত্যের উৎসাহদাতা মুন্নীর্খার এই কীর্ত্তির ব্যয়ের পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টাকা। তৎকালে এই পুল জৌনপুরবাসীর পক্ষে আনন্দের এবং গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

পুলটির নির্ম্মাণ শেষ হইবার পর হইতেই প্রবল বন্যায় বহুবার ইহার শক্তির পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের ভীষণ বন্যার বিপুল স্রোতের বেগ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই বেগ এত বেশী হইয়াছিল যে সমস্ত খিলান পরিপূর্ণ করিয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে জল বাহির হইয়াও বন্যার জল শেষ হইল না, অবশেষে জল উপচাইয়া উঠিয়া পুলের উপরকার সমুদায় দোকান-ঘর ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল। এই বন্যায় জৌনপুরের যথেষ্ট ধন ও জনের ক্ষতি হইয়াছিল, এবং ইহার পর হইতে পুলের উপর আর দোকান বসাইবার কোন উদ্যম হয় নাই বটে, কিন্তু এমন দারুণ বেগ বন্যাও মূল পুলটির কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। ষ্টেসনের দিক হইতে পুলের ২।৩টি খিলান পার হইলেই একটি বিশেষ চিহ্ন পর্য্যটকের চোখে পড়িবে, এটি সেই প্রবল বন্যার জলের দাগ। উহা দেখিলে সহজেই অনুমান করা যায় স্রোতে নদীর জল কতদূর উচ্চে উঠিয়াছিল। পুলের উপর একটা ঘেরা জায়গায় একটি প্রস্তর-খোদিত সিংহমূর্ত্তি রহিয়াছে এবং তাহার নিম্নে স্বতন্ত্র পাথরের একটি হাতীর মূর্ত্তি। এ দুটি হিন্দুযুগের ভাস্কর্য্যের স্পষ্ট নিদর্শন। মূর্ত্তি দুইটির সম্মিলনে কতকটা "জগদ্ধাত্রী"-

মসজিদ্ নির্ম্মাণ করান। হিন্দুমন্দিরের উপকরণ মসজিদে পরিণত হইলেও, বারাণসীর 'বেণীমাধবের ধ্বজার' ন্যায় এই মসজিদের নাম আজ পর্য্যন্ত অটল ভাবে 'অটলা'ই রহিয়া গিয়াছে। দালানের বাহিরের দেয়ালে বিশেষতঃ চারিদিকের ঘেরাও বারান্দায় হিন্দুস্থাপত্যের চিহ্ন প্রচুর বিদ্যমান। মসজিদের হাতায় প্রকাণ্ড একটি উঠান আছে। উঠানের ঠিক মধ্যস্থলে মুসালা অর্থাৎ উপসনাস্থান হইতে উত্তর পূর্ব্ব কোণে গাছের শীতল ছায়ায় সুন্দর একটি ইঁদারা। ইঁদারাটি বেশ বড়। উঠানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মহিলাদের জন্য পাথরের চমৎকার জাফ্‌রী দেওয়া সুদৃশ্য একটি বিশ্রামাগার। ইহার কাছেই ছাদে উঠিবার সিঁড়ি। মস্‌জিদের মিহরাবে কৃষ্ণমর্ম্মর-ফলকে কোরানের একটি শ্লোক এবং মহাবাক্য ক্ষোদিত রহিয়াছে।

জৌনপুর দুর্গের লাট।

ইহার পরেই দ্রষ্টব্য জামা মস্‌জিদ্। জৌনপুরের সকলের অপেক্ষা জাঁকাল দালান—এইটি। কিন্তু এই মস্‌জিদে যাইবার পথ যেমন সংকীর্ণ তেমনই আবর্জ্জনাপূর্ণ। সুতরাং ইহার সম্মুখে পৌঁছিয়াই, ইহার বিরাট সৌন্দর্য্যটা দ্বিগুণ করিয়া মধুর লাগে। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত সমুচ্চ রোয়াকের উপর বিপুলায়তন মস্‌জিদ্; তদুপযোগী সুপ্রসর সোপানাবলী;—বড়ই সুন্দর। এইগুলি পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। ১৪৩৮ হইতে ১৪৭৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে হুসেন শার্কী এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। শোনা যায়, ইহার নক্সাটি নাকি ইব্রাহিমের কল্পনা হইতে উদ্ভূত। জামা মস্‌জিদের সীমানায় তাঁহার পরিবারবর্গকে কবর দেওয়া হইয়াছে। এই মস্‌জিদের কয়েকটি স্থান ভাঙা। এগুলি দেখিলে প্রথমেই মনে হয়, হয়ত এগুলি ইসলাম-ধর্ম্মবিরোধী কোনও শত্রুর হস্তক্ষেপচিহ্ন। তবে এ অনুমান

মূর্ত্তির বাহন সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হাতীর মূর্ত্তির দৃশ্যের মত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি দুইটি নাকি প্রাচীন কেল্লার অভ্যন্তরে পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে এই মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া জৌনপুরের সর্ব্বত্র মাইলের দূরত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে।

এইবারে আমরা এই বিখ্যাত পুল পার হইব। পুল পার হইয়া, ধূলিময় পথে খানিকটা হাঁটিলেই, অটলা মস্‌জিদে পৌঁছান যায়। এখন যেখানে এই মসজিদ্, ইহারই পার্শ্বে হিন্দুকালের অটলাদেবীর মন্দির ছিল। সুলতান ইব্রাহীম্ হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংস সাধন করিয়া সেই ইটপাথর দ্বারা এই

জৌনপুরের অটলা মসজিদ।

জৌনপুরের জামা মসজিদ।

জৌনপুরের জামা-মসজিদের উঠান।

ঠিক না হইতেও পারে। শার্কীগণের সহিত অপর মুসলমান-শক্তির সংঘর্ষের ফলেও এই-সকল স্থান ভগ্ন হওয়া অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ ইহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ তোরণের উপরকার চূড়া নূতন করিয়া তৈয়ার হইয়াছে দেখা যায়। ইহার উপর যে লোকের আজকাল নজর পড়িয়াছে এ বড়ই আনন্দের বিষয়। দেশের যে-সব অমূল্য বিত্ত এখনো বিশেষ ধ্বংসের পথে যায় নাই, অল্প চেষ্টাতেই যাহাকে রক্ষা করা যায়, তাহার জন্য দেশের লোক যে স্বার্থ ত্যাগ করিতেছেন, ইহাতে নিজেদেরই লাভ। জামা মসজিদে ইস্লামীয় স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নৈপুণ্য হিন্দু-আমলের স্থাপত্যের মুক্তায় জড়িত হইয়া আছে। এখানেও হিন্দু-আমলের পাথর অসংখ্য। মসজিদটি বিপুলকায়; দেয়ালও ইহার যথেষ্ট পুরু। দেয়াল-সুদ্ধ শুধু মসজিদটি ২৫×২৩৫ ফুট। সর্ব্ব-সমেৎ কুঠরী ইহার—৭টি, পাঁচটি নিচের তলায় এবং মহিলাদের জন্য বড় গম্বুজের দুই পাশে দুইটি উপরের তলায়। উপরের এই কুঠরী দুইটির মনোরম-সুন্দর খিলান দেখিলে কেহই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

এই মসজিদটিই বর্ত্তমানে সুরক্ষিত দেখা যায়। জৌন-পুরবাসী মুসলমানগণ সর্ব্বদা এখানে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের দলে-দলে আসা-যাওয়ায় এবং নমাজের ঠিক-ঠিক সময়মত মসজিদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপাসনায়, এইস্থান আজও সজীবতা হইতে—আজও সুশৃঙ্খল গম্ভীর জনতার আনন্দ হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই।

উঠানের মধ্যস্থলে উপাসকগণের ব্যবহারের জন্য একটি পুষ্করিণী। পাড় হইতে পল্লববহুল গাছের শাখাগুলি জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়ায় এখানে স্নান-উপযোগী শান্তিপ্রদ বড়ই মনোহর দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

জামা মসজিদের পরেই শার্কী সুলতানগণের কবরের স্থান। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। কবরগুলিও

নিতান্ত অপরিপাটি। কেবল গোলাম আলির কবরের উপর পারস্যভাষায় লিখিত সুন্দর একটি সমাধি-শ্লোক দেখা যায়।

ইহার পর দ্রষ্টব্যের মধ্যে—আর কয়েকটি মস্‌জিদ্‌। সংখ্যায় পাঁচ-ছয়টি। তাহাদের মধ্যে লাল দরওয়াজা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইব্রাহিমের পুত্র মহম্মদের পত্নী বিবিরাজা বেগমের প্রাসাদ আর এই মস্‌জিদ্‌ একই সময়ের তৈয়ারী এবং উভয়েই একেবারে পাশাপাশি। পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদের ঘোর সিঁদুরবর্ণ তোরণের সঙ্গে মিল রাখিয়া এই মস্‌জিদের "লাল দরওয়াজা মসজিদ্‌" নামকরণ হইয়াছে। ছোট হইলেও এই মস্‌জিদ্‌টি সৌন্দর্য্যে ভরপূর। ইহার গাত্রস্থ সুচারু স্তম্ভশ্রেণী নানা বিষয়ের ক্ষোদিত লিপিতে মণ্ডিত থাকায় অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন।

আমাদের দেখা এইখানেই শেষ হইল। এ সহরের প্রাচীন দালানগুলির সহিত হিন্দুমন্দিরের সাদৃশ্য যত বেশী এমন আর কোথাও দেখা যায় না। অন্যত্র মুসলমান-স্থাপত্যের নিদর্শনগুলির সহিত এখানকার এগুলির ইহাই প্রধান পার্থক্য। ইহা ছাড়া আরও কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে। ইস্‌লামীয় স্থাপত্যে গম্বুজ সর্ব্বোচ্চ গৌরবের বস্তু; গম্বুজ এখানেও আছে বটে, কিন্তু এগুলি নিতান্তই ছোটখাট রকমের। এখানকার মস্‌জিদের খিলানগুলিও উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ মস্‌জিদসমূহের খিলানের সংখ্যায় কম এবং এগুলি তাহাদের সহিত বিশেষ তুলনায় আসিতে পারে না। হিন্দুমন্দিরের উপকরণও এখানে অজস্র স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইয়াছে যত্রতত্র। তথাপি এমন একটি সৌন্দর্য্যের জাঁক এগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে, অন্যের সহিত তুলনার অবসর না দিয়াই এগুলি দর্শকের নয়নকে একেবারে ভুলাইয়া রাখে।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

কুসঙ্গে

(আব্‌দর্‌ রহিম্‌)

কুসঙ্গে কলঙ্ক রটে—যে দ্যাখে সেই টোকে;
শুঁড়ির হাতে দুধ-ভরা ভাঁড়,—মদ ভাবে তাও লোকে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বন্দী

(গল্প)

নিবিড় অরণ্য; নিস্তব্ধ প্রকৃতি; মাঝে-মাঝে হু হু করিয়া কন্‌কনে বাতাস বহিতেছে; চারিধার কুয়াসায় ঢাকা; অস্ত-তপনের গতিভঙ্গীটি লক্ষ্য করিবারও উপায় নাই। বেলা দ্বিপ্রহর হইতে ঘন পত্রবহুল বৃক্ষশাখাগুলির উপর তুষারকণা জমিয়া উঠিতেছে; সমীর-সম্পৃক্ত বরফ-গুঁড়ির অবিশ্রান্ত পতনে সমস্ত প্রকৃতি যেন রৌপ্যমণ্ডিত।

বনরক্ষকের আবাস-দ্বারের সম্মুখে একটি যুবতী শালকাঠ চেলা করিতেছিল। তাহার কানে দুটি নীলরঙের দুল, নিটোল নধর হাতদুখানিতে দুইগাছি মাত্র সোনার চুড়ি, সুসম্বদ্ধ কুন্তল-পরিধিতে কানন-পুষ্পের মাল্য-শোভা। যুবতী বনরক্ষকের কন্যা। শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃত একখানি আনন্দ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ-বল্লরী শালকাষ্ঠখণ্ডের অভিমুখে ঈষৎ অবনত,—কটিতট বেড়িয়া একখানি মোটা কাপড় চন্দ্রহারের আকারে বাঁধা,—দূর হইতে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন যুবতী সাক্ষাৎ বনদেবী!

আসন্ন সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিতা বনরক্ষক-পত্নী ভিতর হইতে ডাকিল—"শিগ্‌গির চলে আয় বাথিন, বড্ড অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে।"

"ভয় কি মা, যাচ্ছি, এই আমার হ'ল বলে।"—কাষ্ঠ-ছেদনরতা কন্যা সহাস্যে উত্তর করিল।

"ভয়ের আর অপরাধ কি বাছা; এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে দুটি মায়েঝিয়ে এই 'বনলা-পুরীতে' একলা রয়েছি; চারিদিকে দেশ-শত্রু প্রুসিয়ানদের অত্যাচার;—না, না, তুই শিগ্‌গির আয়, দোরটোরগুলো ভাল করে' বন্ধ করে দে; বিপদের কথা কি বলা যায় মা,—চাই কি, এখুনি এই পথ দিয়ে প্রুসিয়ানরা যেতে পারে।"—মাতার কণ্ঠস্বরে ভীতি ও উদ্বেগ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

শরীরের সমস্ত শক্তি-প্রয়োগে যুবতী অবশিষ্ট কাঠখানিকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল এবং কর্ত্তিত কাষ্ঠখণ্ডগুলি রন্ধনশালায় রক্ষা করিয়া দ্বার বন্ধ করিবার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিক সন্তর্পণে পরীক্ষা করিল; পরে মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া সকৌতুক হাস্যে বলিল—"এই নাও, আমি এসেছি।

তোমার স্বভাবটা কিন্তু বড্ডই ভীরু মা,—এতটা ভয় না

"তা যাই বল বাছা, আমার কিন্তু ভাল বোধ হচ্ছে না। তোমার বাপ বাড়ী নেই, আমরা দুজনেই স্ত্রীলোক। না, কোনোদিকেই সুবিধে বুঝ্‌ছি নে।"—দৃঢ় প্রত্যয়ভরে বৃদ্ধা মাথা নাড়িল। বস্তুতঃ, একাকী থাকিতে তাহার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না,—বাতাসের এই বিদ্‌ঘুটে শোঁ-শোঁ আওয়াজ,—গাছপালাগুলোর বেয়াড়া শব্দ—মড্‌ মড়্‌ পট্‌ পটাস্‌—এতে কা'র না ভয় হয় বাপু? তথাপি কন্যাকে কাছে পাইয়া বহুকষ্টে সে চরকাটার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিল।

"নিশ্চিন্ত থাকো মা, এখানে তোমার প্রুসিয়ানরা আসছে না; আর এলেই বা ভয় কি, আমি একাই তাদের নিকেশ করে দেবো।"—বলিয়া যুবতী কক্ষগাত্রে লম্বিত বন্দুকটির দিকে একবার তাকাইয়া লইল।

যুদ্ধ বাধিবার কিছু পূর্ব্বেই যুবতীর স্বামী সেনাদলে যোগদান করিতে আদিষ্ট হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। সেই অবধি বার্থিন পিতৃগৃহে মাতার নিকটেই থাকে। বার্থিনের পিতা নিকোলাস কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত, যুদ্ধের উপলক্ষে পরমোৎসাহে সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছে এবং জর্ম্মন সৈন্যদলের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য এই জনহীন অরণ্য-প্রদেশে বাস করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। অরণ্যজাত বহুবিধ ফলে, নাতিদূর-প্রবাহিত তটিনীর স্বচ্ছ জলে এবং শীকার-লব্ধ মৃগাদির মাংসেই এখানে ইহাদিগকে জীবন-ধারণ করিতে হয়।

কাননভূমির বহু দূরে একটি সহর—নাম রথেল। সহরটি প্রাচীন এবং একটি পাহাড়ের উপর উহা অবস্থিত। এই রথেল-বাসীরা দেশের জন্য প্রাণপণে যুঝিয়া বীরের কাম্য-মৃত্যু আলিঙ্গন করিতেছে,—সৈন্যদল গঠন, বন্দুক কামান প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতি সময়োপযোগী কার্য্যে তাহারা অহর্নিশি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিতেছে। ...আপামর সাধারণ এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া দলে ...-শিক্ষায় রত; মুদি, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, আইন-...শিক্ষক, ছাত্র, সাহিত্যিক প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব ব্যবসায় ছাড়িয়া আজ স্বদেশরক্ষায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ।

"প্রসিদ্ধ পরিচ্ছদ-ব্যবসায়ী ... ... বাসিয় 'সৌভিত্' আজ "রথেল ... ...'। সংগৃহীত সৈন্যগণের স্বাস্থ্য ও শারীরিক গঠন অনুসারে তিনি বহুবিধ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে স্থূলকায় ব্যক্তিরা বড় বড় পাথর খুঁড়িবার ভার পাইয়াছে, যেহেতু এ কার্য্যে তাঁহাদিগের দম বাড়িবে ও স্থূল শরীরগুলি পেশীমণ্ডিত হইয়া উঠিবে। আবার কৃশকায় তাহাদিগকে প্রস্তর উত্তোলন করিতে হইতেছে, কারণ ইহাই তাহাদিগকে স্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

প্রুসিয়ান সৈন্যগণ রথেলের অনতিদূরেই অবস্থান করিতেছিল,—এমন কি, নিকোলাসের গৃহ-নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে গুপ্তচর পাঠাইয়া ইতিপূর্ব্বে দুই দুইবার ফরাসী সৈন্যের গতিবিধিরও সন্ধান লইতে আসিয়াছিল। বৃদ্ধ নিকোলাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শত্রুপক্ষীয়ের ঐ চেষ্টা অবশ্যই ধরা পড়িয়াছিল—ফলে সেনানায়কের কাছে যথারীতি খবর পৌঁছিতেও বিলম্ব হয় নাই।

প্রায় দুই সপ্তাহ হইতে চলিল, নিকটবর্ত্তী স্থানে শত্রু আগমনের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া নিকোলাস নগরবাসীদিগকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য রথেলে গিয়াছে—আজও ফিরিয়া আসে নাই। যাইবার সময় বৃদ্ধ তাহার প্রিয় সহচর বাঘামুখো পাগাড়ী কুকুর দুটোকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুল করে নাই,—কারণ ইহারা বহুকাল-যাবৎ তাহার দেহরক্ষীর কাজ করিয়া আসিতেছে এবং এই বিশ্বস্ত বন্ধুযুগল একাধিকবার বৃদ্ধকে মৃত্যু-কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে।

(২)

নিকোলাসের গৃহত্যাগের দিন হইতে বার্থিনের মাতা বড়ই ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাইতেছিল। চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে আজ ক্রমাগতই তাহার মনে হইতেছিল যে বিপদ ঘটিতে আর বিলম্ব নাই। একে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য, তাহার উপর প্রুসিয়ানদের আগমন-সম্ভাবনা,—অথচ গৃহকর্ত্তা দূর দেশে, আজও ফিরিবার নামটিও নাই,—বিপদের আর অপরাধ কি! বৃদ্ধা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল,—আর চক্ষে কন্যার মুখপানে চাহিয়া কহিল—"আজ বুড়ো ফিরে আসবার দিন মা, এতটা রাত্তির হ'য়ে গেল, ... তো দেখা নেই!"

"এগারটার এদিকে বাবা ফিরছেন না নিশ্চয়ই, তুমি তো জানো মা, সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে খেতে বস্‌লে বাড়ী ফেরবার কথা বাবার আর মনেই থাকে না"—বলিয়া বার্থিন আরব্ধ রন্ধন-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িল।

"তাইতো,—কি যে হবে"—আপন মনে বৃদ্ধা হতাশা-সূচক মুখভঙ্গী করিতে লাগিল।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল অতীত হইয়াছে কিনা সন্দেহ, দরজার দিকে হঠাৎ একটা কোলাহল শ্রুত হইল; ভয়ের চিন্তায় আত্মহারা বৃদ্ধার কর্ণে সে কোলাহল প্রবেশ করিল না বটে, কিন্তু কন্যার সজাগ কর্ণে তাহা পৌছিল।

বার্থিন উঠিয়া দাঁড়াইল, দরজার ছিদ্রে কর্ণসংযোগ করিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত উহা শুনিতে লাগিল: তাইতো, কিসের শব্দ এ? কোথা হইতে আসিতেছে? তীক্ষ্ণবুদ্ধি বার্থিনের যুগল ভ্রূর মধ্যভাগে একপ্রকার উদ্বেগ-কুঞ্চন প্রকাশ পাইল।

"দেখ মা"—সে বলিল—"বনের ভেতর মানুষের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, অনেকগুলো মানুষ—বোধ হয় আট ন' জন হবে।"

"এঁ্যা, বলিস কি রে!"—চরকা হইতে বৃদ্ধার হাত খসিয়া আসিল, ওষ্ঠাধর ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সূতার সহিত হাতের আঙ্গুলগুলো জড়াইয়া গিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। কি বলিতে হইবে, কি করিতে হইবে তাহার কোনোপ্রকার কূলকিনারা না পাইয়া নিকোলাস-পত্নী যেন হতভম্ব হইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তমাত্র,—দরজায় সজোরে করাঘাত পড়িতে লাগিল।

"তাইতো, কি হবে মা বার্থিন!"—বৃদ্ধা হাঁপাইতে আরম্ভ করিল। ভিতর হইতে কোনোরূপ সাড়া না পাইয়া বহির্ভাগ হইতে কে একজন চীৎকার করিল—"শিগ্‌গির দরজা খুলে দাও, নইলে ভেঙে ফেল্‌তে দেরী করবো না।"

বার্থিন পাষাণমূর্ত্তির মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিতেছিল,—এক্ষণে কি-যেন সঙ্কল্প করিয়া বন্দুকটির পানে একবার তাকাইল; পরক্ষণেই উহাকে বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া ক্ষিপ্রগতিতে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল।

"কে তোমরা? কি চাও?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল—"প্রুসিয়ান সৈন্য; দরজা খোলো, যা' বলবার বলছি।"

"বক্তব্য না শুনে দরজা খুলতে পারছি নে; এখানে কি মনে করে এসেছো বল।"

"বনের মধ্যে পথ হারিয়ে আমার সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। দরজা খুলে দাও,—নইলে ভেঙে ফেলবো"—রুক্ষস্বরে উত্তর আসিল।

বার্থিন মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল,—জোড় করে ঊর্দ্ধে চাহিয়া কি-যেন প্রার্থনা জানাইল,—তৎপরে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বার-অর্গলমুক্ত করিয়া দিল।

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কয়েকজন সৈনিকপুরুষ বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। সাহসে ভর করিয়া যুবতী জিজ্ঞাসা করিল—"এই অন্ধকার রাত্রে এখানে আপনারা কি চান্?"

সৈন্যাধ্যক্ষ অগ্রসর হইয়া আসিয়া জানাইল—"ছত্রভঙ্গ হ'য়ে আমরা এই বনে এসে পড়েছি, পথ খুঁজে পাচ্ছিনে; সারাদিনটা আজ অনাহারেই কেটে গেছে—এখন কিছু আহার্য্যই আমাদের প্রার্থনীয়।"

বার্থিন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সৈন্যাধ্যক্ষের দিকে চাহিল—"দেখুন, বৃদ্ধা মাতাকে নিয়ে আমি একলা বাড়ী রয়েছি, আমার বাবা স্থানান্তরে গিয়েছেন, এ অবস্থায় আপনাদের মত অতিথির সেবা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি দুঃখিত হচ্ছি যে"—

যুবতীর কোমল কণ্ঠস্বরে সৈন্যাধ্যক্ষের মেজাজ নরম হইয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে বলিয়া উঠিল—"কোনো ভয় নেই তোমার; অনিষ্ট করবার অভিপ্রায়ে আমরা এখানে আসিনি, ক্ষুধায় কাতর হয়েই এসেছি। দোহাই তোমার, আজকের মত কিছু আহার্য্য দাও, নইলে আমরা মারা পড়ি।"

দেশশত্রু আজ আশ্রয়প্রার্থী,—জানেনা তাহারা যে-কোথায় আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। যদি আশ্রয় না দেওয়া যায়, জোর করিয়া উহা দখল করা ইহাদের পক্ষে বিশেষ আয়াস-সাধ্য নয়—এবং সে অবস্থায় কন্যা ও জননীর জীবনও যথেষ্ট নিরাপদ না হইতে পারে। অপর পক্ষে এই দেশশত্রুর বিরুদ্ধেই তাহার বৃদ্ধ পিতা আজ সমস্ত শক্তি

নিয়োগ করিয়াছেন,—এই দেশশত্রুর বিরুদ্ধেই তাহার স্বামী আজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। তথাপি আশ্রয় দিতে হইবে,—কিন্তু তাহার পর?

যুবতী রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া কহিল—"ভেতরে আসুন।"

প্রুসিয়ান সৈনিকগণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; কক্ষের আলোকরশ্মিপাতে তাহাদের শুভ্রতুষার-সমাচ্ছন্ন উষ্ণীষগুলি নক্ষত্রের মত জল্‌জল্‌ করিতে লাগিল।

টেবিলের ধারের বেঞ্চের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বার্থিন বলিল—"আপনারা ঐখানে বিশ্রাম করুন, আমি শীঘ্রই আহার্য্য তৈরি করে আন্‌ছি। উপস্থিত এই বিয়ার পানে তৃষ্ণা দূর করুন।" ক্ষিপ্রহস্তে কক্ষ-বিলম্বিত শিকা হইতে কিছু মাংস বাহির করিয়া যুবতী উহা খণ্ড খণ্ড করিল এবং উষ্ণ জলে ছাড়িয়া দিল। ক্ষুধিত সৈনিকগণ সতৃষ্ণ-নয়নে রন্ধননিযুক্তা যুবতীটির সুগোল হস্তের সঞ্চালন-ক্রিয়া দেখিতে লাগিল।

বন্দুক উষ্ণীষ প্রভৃতি টেবিলের উপর রক্ষা করিয়া প্রুসিয়ান সৈন্যগণ শান্ত শিশুদের মত আহারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৩)

নিকোলাস-পত্নী এতক্ষণ ভয়ে অৰ্দ্ধমৃতা অবস্থায় কন্যার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল, এক্ষণে সৈন্যগণকে শান্তভাবে উপবিষ্ট দর্শনে কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া চরকার দিকে মন দিল, তথাপি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার দৃষ্টি ক্রমাগতই সৈন্যদের দিকে ছুটিতেছিল এবং মনটাও সেই সঙ্গে দারুণ অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছিল। হঠাৎ দরজার নিকট গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল,—মনে হইল যেন কোনো হিংস্র বন্যজন্তু মানুষের সন্ধান পাইয়া আঘ্রাণ লইতেছে এবং ঘন-ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

জর্ম্মনসেনানায়ক বর্শা উত্তোলন করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইবামাত্র বার্থিন বলিল—"দোর খোলবার দরকার নেই, ওগুলো অন্য কিছুই নয়—নেকড়ে বাঘ; আপনাদেরই মত ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে বেচারীরা কিঞ্চিৎ রক্তমাংসের সন্ধানে ফিরুছে।"

সন্দিগ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ কিন্তু দরজা না খুলিয়া থাকিতে পারিল না। দেখা গেল, যুবতীর কথাই ঠিক,—হরিদ্রাবর্ণের দুইটি বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রপুঙ্গব অরণ্যের অন্ধকারে মিশাইয়া যাইতেছে। পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া সেনাপতি কহিল—"মাফ্‌ করবেন, স্বচক্ষে না দেখ্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছিলাম না।"

মৃদু হাসিয়া বার্থিন কহিল—"থাক্‌ তা'র জন্যে কি, এখন অনুগ্রহ করে আপনারা আসুন, আহার্য্য প্রস্তুত।"

* * * *

অনশন-ক্লিষ্ট সেনাদল আহার করিতেছিল—বার্থিন স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহাদের আহার দেখিতেছিল। আহা, কি করিয়াই না তাহারা খাইতেছে, দেখিলে দুঃখ হয়; পাত্রস্থিত রুটীমাংসগুলি আজ যেন আর সেই প্রাত্যহিক সাধারণ খাদ্য নয়—ক্ষুধিতদলের নিকট ইহা আজ এতই বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে মনে হয় যেন উহাই ঐ সৈন্যদলের সমস্তটুকু প্রাণ। এই প্রাণ বার্থিন আজ যোগাইতেছে—কি পরিতৃপ্তি! নারীচিত্তের আনন্দমাধুর্য্যে যুবতীর চক্ষের কোণে জল আসিল—হইলই বা দেশশত্রু, হইলই বা বিজাতীয়; ক্ষুধিতকে খাদ্য দেওয়ায়, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেওয়ায় বিবেকের জয়ধ্বনি যে শত্রুমিত্র-ভেদরেখার উপরও অনায়াসে বাজিয়া ওঠে।

দেখিতে-দেখিতে চিরন্তন রমণী-হৃদয়ের পালনশক্তির গৌরবে বার্থিনের বুকখানি ভরিয়া উঠিল—তাহার উদ্বেলিত পরদুঃখকাতরতা মনে-মনে আজ এই শত্রুদের কল্যাণকামনা করিল। বার্থিন স্থির করিল, পিতা আসিবার পূর্ব্বেই ইহাদিগকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া সে সাবধান করিয়া দিবে, আজিকার মত নিরাপদে পলায়ন করিবার অবসর প্রদান করিবে।

আহার-তৃপ্ত সৈনিকদল কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে যুবতীর দিকে চাহিয়া পানীয় প্রার্থনা করিল,—কৃতজ্ঞ সেনাপতি আনন্দাতিশয্যে বার্থিনের সম্মুখে একটি বহুমূল্য অঙ্গুরীয় রক্ষা করিয়া বলিল—"এ রাত্রের উপকার আজীবন মনে রাখ্‌বো; কৃতজ্ঞতার যৎসামান্য নিদর্শন এই অঙ্গুরীয়টি আপনার কাছে রাখ্‌বেন।"

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন রাখিবার ইচ্ছা বার্থিনের ছিল না, কিন্তু অঙ্গুরীয়টির দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র সে শিহরিয়া উঠিল

—হীরক ফলকে যে অক্ষর-দুটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, এ দুটি যে তাহার মনের মাঝখানে অনেক বেশী উজ্জ্বল !

সৈন্যাধ্যক্ষ বলিল—"নিতে দ্বিধা করবেন না ; উপহার যতই সামান্য হোক্, এর চারিধারে যে জয়-গৌরব মাখানো রয়েছে তা' অসামান্য। আপনি আজ বিজয়ীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন—সুতরাং জয়ীর গৌরব-নিদর্শনটি আপনারই প্রাপ্য। অনেক কৌশলে এই অঙ্গুরীয়ের অধিকারীটিকে বন্দী করতে পেরেছিলাম।"

নিরুদ্ধশ্বাসে যুবতী জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর ?"

সেনাপতি সগর্ব্বে বলিল—"কাল তা'কে হত্যা করেছি।"

যুবতী ক্ষিপ্রগতিতে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল; বলিয়া গেল—"বসুন, পানীয় আন্‌ছি।" সৈন্যাধ্যক্ষ যদি লক্ষ্য করিত তবে বুঝিত, বার্থিনের স্বর আর্দ্র, বেদনাময়, অশ্রু-ভারাক্রান্ত।

ভূমির নিম্নে বার্থিনদের একটি ঘর ছিল ; ঘরটি ছোট এবং চারিটি খিলানযুক্ত। লোকে বলিত, ফরাসীবিপ্লবের সময় শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এবং শত্রুকে বন্দী করিবার উদ্দেশ্যে এই ঘরটি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বার্থিন ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল,—একমুহূর্ত্তে তাহার চক্ষে জগতসংসারের চেহারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে ! কিন্তু না, শোকের অবকাশ নাই,—ক্রন্দনের অবসর নাই,—স্বামীহন্তা এখনও জীবিত, তাহারই ঘরে তাহারই প্রদত্ত আহার্য্যে উদরপূর্ণ করিয়া পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে উপবিষ্ট ! একটু পূর্ব্বে সে শত্রুর কল্যাণ-কামনা করিতেছিল, কেমন করিয়া পিতার অগোচরে ইহাদিগকে নিরাপদে অরণ্য-পারে প্রেরণ করিবে সেই কথাই ভাবিতেছিল,—কিন্তু এখন ?

বার্থিন উঠিয়া বসিল,—সহসা তাহার মনে হইল যেন স্বামীর সর্ব্বাঙ্গে রুধিরমাখা মূর্ত্তিখানি তাহার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বহ্নিময় যুগল-নয়নের নীরব ইঙ্গিতে বলিতেছে—'প্রতিহিংসা !'

বার্থিনের হৃদয়ভরা অশ্রু-সাগর উন্মাদ হাস্যে গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—ত্বরিতচরণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মদ্যপূর্ণ পাত্র-হস্তে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

(৪)

আকণ্ঠপূর্ণ আহার ও মদ্যপানের ফলে সৈন্যগণের নেশা ও নিদ্রা একইকালে জমিয়া আসিতেছিল। দেখিতে দেখিতে হস্ত-উপাধানের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া তাহারা টেবিলের ধারেই ঢুলিয়া পড়িতে লাগিল। বার্থিন সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিয়া গেল—"আপনারা আগুনের ধারে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, ওখানে অনেক জায়গা আছে, আরামে ঘুমুতে পারবেন ; আমি মাকে নিয়ে ওপর ঘরে শুতে যাচ্ছি।"

চারিদিক সুষুপ্ত ; নিম্নতলের নৈশ-নীরবতা তন্দ্রাচ্ছন্ন সৈনিকদলের নাসিকা-নিনাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ; সহসা সদর দরজার নিকট বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল,—উপর্য্যুপরি চার-পাঁচটা আওয়াজ !

নিদ্রোত্থিত সৈন্যগণ ব্যাপার বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই, ব্যস্তসমস্তভাবে বার্থিন ছুটিয়া আসিল—স্রস্তবসন, নগ্নপদ, হস্তে একটি বর্ত্তিকা !

খিলানযুক্ত কক্ষটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে সে বলিল—"শিগ্‌গির ঐ ঘরে আপনারা লুকিয়ে পড়ুন ; শ'য়েক ফরাসী সৈন্য এইদিকে আসছে ; এখনি আপনাদেরও প্রাণ যাবে, আমাদেরও সর্ব্বনাশ হবে।"

যুবতীর শঙ্কাচকিত ভাব দেখিয়া এবং বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া সদ্যনিদ্রোত্থিত সৈন্যদল কেমন যেন ভ্যাবাচেকা হইয়া গিয়াছিল,—এক্ষণে তাহারা সকলে সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল—"কৈ, কোথায় কোন্ দিকে লুকুতে হবে ? শিগ্‌গির চলুন, এ-যাত্রা প্রাণে বাঁচ্‌লে যথেষ্ট পুরস্কার দেবো।"

মনে-মনে পুরস্কারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যুবতী গুপ্তগৃহের দ্বার খুলিয়া দিল এবং হস্তস্থিত বর্ত্তিকাটি উচ্চে ধরিয়া বলিল—"এইযে, এইদিকে দরজা, শিগ্‌গির—শিগ্‌গির—"

মন্ত্রমুগ্ধবৎ সমস্ত সৈন্য পরস্পরকে ঠেলিতে-ঠেলিতে গুপ্তগৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং বার্থিন ক্ষিপ্রহস্তে উহার লৌহদৃঢ় কবাটদ্বয় রুদ্ধ করিয়া দিয়া পরিতৃপ্তির উচ্ছ্বাসে পাগলের মত হাসিয়া উঠিল।

প্রতিহিংসা-গ্রহণের উন্মাদ-চিন্তায় যে মহাশোকের পারাবার এতক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, অরণ্য-প্রকৃতির স্তব্ধ তিমিরতলে এইবার তাহা উথলিয়া উঠিল; গৃহপ্রাঙ্গণে একাকী বসিয়া মৃতস্বামীর উদ্দেশ্যে বার্থিন বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল।

গৃহ-দেওয়াল-লগ্ন ব্র্যাকেটের উপর একটি ছোট ঘড়ি টিক্‌টিক্ শব্দে কালের মাপ লইয়া চলিয়াছিল; আর্দ্র নয়নে ঘরে ঢুকিয়া বার্থিন দেখিল, রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। "বাবার তো ফের্‌বার সময় হয়েছে, আজ এত দেরী হচ্ছে কেন?"—যুবতী অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা দেওয়ালের মাঝখান দিয়া মনুষ্যের কথোপকথনের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। এতক্ষণ পরে মূর্খ জর্মন-সৈন্যদল যে যুবতীর কৌশল বুঝিতে পারিয়াছে তাহা বুঝিয়া লইতে কষ্ট হইল না। ভিতর হইতে কবাটে প্রচণ্ড পদাঘাত চলিতে লাগিল, কিন্তু বার্থিনের মুখে বিন্দুমাত্রও ভয় বা উদ্বেগের চিহ্ন দেখা গেল না—সৈন্যদলের নিষ্ফল চেষ্টা দেখিয়া সে হাসিল, কিন্তু সে-হাস্যে এবার আর উত্তেজনার জোর পৌঁছিল না, অতি মলিন কঙ্কালসার হাসি সে! যুবতীর মর্ম্মকেন্দ্র মন্থন করিয়া একটি সুদীর্ঘ তপ্তনিশ্বাস ঐ ক্ষীণহাস্যের অন্তরাল হইতে নৈশ বাতাসের অঙ্গে মিলিয়া গেল।

(৫)

"কে? বাবা আস্‌ছো?"

"কে, মা, বার্থিন? এত রাত্রে আমার পথ চেয়ে বসে আছিস্! হ্যাঁ আমি—দোর খোল্।"

দূর হইতে পিতার শরীররক্ষী সারমেয়যুগলের চীৎকার শুনিয়া যুবতী পিতার আগমন বুঝিতে পারিয়াছিল। এক্ষণে দ্বার খুলিয়া দিয়া বৃদ্ধের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"কান্না কেন মা? দেরী হ'য়ে গেছে, তাই অভিমান হয়েছে বুঝি?" সস্নেহে বৃদ্ধ কন্যার মস্তকচুম্বন করিল।

"বাবা"—মলিন দুখানি নয়ন তুলিয়া যুবতী বৃদ্ধের দিকে চাহিল, কিন্তু যে-কথা বলিতে যাইতেছিল তাহা বলিতে পারিল না,—সামলাইয়া লইয়া বলিল—"জর্ম্মন সেনাপতিকে আজ বন্দী করেছি বাবা; সসৈন্যে তিনি এখন আমাদের গুপ্তকক্ষে বিশ্রাম কর্‌ছেন।"

বৃদ্ধ অবাক হইয়া মিনিটখানেক কন্যার মুখপানে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল—"সেনাপতিকে!...বন্দী! তুই বন্দী করেছিস্? কি বলছিস্ বার্থিন?"

যুবতী আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনাই পিতাকে শুনাইল,—কি উপায়ে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছে, কেমন করিয়া কৌশলে তাহাদিগকে গুপ্ত-গৃহে আবদ্ধ করিয়াছে তাহাও বলিল, কিন্তু কতখানি বেদনা এই সেনাপতি-ঘটিত ব্যাপার তাহার বুকের ভিতর বাজাইয়া তুলিয়াছে তাহা শুনিবার পূর্ব্বেই দেশভক্ত বৃদ্ধ পরমোল্লাসে লাফাইয়া উঠিল। নিজের আনন্দ দিয়া সে বুঝিল যে, কন্যার ক্রন্দন পিতার বিলম্ব-ঘটিত অভিমানের জন্য নহে, পরন্তু সেনাপতির মত একজন প্রবল দেশশত্রুকে বন্দী করিতে পাবার আনন্দাতিশয্যে। দুইহস্তে কন্যাকে সে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল,—তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল এখনি আবার রথেলের দিকে ছুটিয়া গিয়া ফরাসী-সেনা-নায়ককে এই পরম উপভোগ্য সংবাদটা দিয়া আসে।

পিতার এতখানি উৎসাহ ও আনন্দে কন্যা বাধা দিল না; বলিল—"যাও, বাবা, লেভিঙ্‌কে খবর দিয়ে এস; কিন্তু বড় পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছো তুমি, কিছু না খাইয়ে তোমাকে ছেড়ে দেবো না।"

এতবড় একটা সংবাদ কাঁধে করিয়াও পানাহারে সময় নষ্ট করিতে পারে এতটা ধৈর্য্য নিকোলাসের ছিল না, সুতরাং কোনোমতে আহারটা শেষ করিয়া সারমেয় যুগল-সহ সে সত্বর গৃহত্যাগ করিল।

বন্দীরা পিতা ও কন্যার সমস্ত কথাবার্ত্তাই শুনিতে পাইতেছিল; এক্ষণে বিপদ আসন্ন বুঝিতে পারিয়া গৃহমধ্য হইতে তাহারা মহাক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বার্থিনের উপর অজস্র গালাগালিবর্ষণ এবং কবাটের উপর ঘন-ঘন পদাঘাত চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল ধরিয়া এইরূপ নিষ্ফল চেষ্টার পর তাহারা বাতায়নের রন্ধ্রপথে বারংবার বন্দুকের শব্দ করিতে আরম্ভ করিল—আশা, যদি অপর কোনো দলচ্যুত জর্ম্মন-সৈন্য সে শব্দ শুনিয়া সাহায্যার্থে উপস্থিত হয়।

বার্থিন উভয় বাহুর উপর মস্তক রক্ষা করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছিল,—বন্দীদলের উক্তপ্রকার

কোলাহল-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন তাহার চিত্তখানি সে-সময় যে কতদূরে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল তাহা কে বলিবে!

* * * *

প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তুষার-ঘন বনপথ উল্লাস-কলরবে মুখরিত করিয়া ফরাসী সৈন্যের জনতা নিকোলাসের আবাসবাটীখানি ঘেরিয়া ফেলিল। মহাসমারোহে গুপ্তগৃহের রন্ধ্রমুখে অগ্রসর হইয়া লেভিঙ্‌ সাহেব উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"জর্ম্মন-সেনাপতির সঙ্গে ফরাসী-সৈন্যাধ্যক্ষ লেভিঙ্‌ কথা কইতে চান।" নিস্তব্ধ,—কোনো প্রত্যুত্তর আসিল না!

লেভিঙের বক্তব্য পুনরুক্ত হইল, তথাপি ভিতর হইতে কোনোরূপ সাড়া পাওয়া গেল না।

এক্ষণে উপায়? এরূপ অবস্থায় গহ্বরমুখে অগ্রসর হওয়া তো কোনোমতেই নিরাপদ নয়। বুঝিতে পারা যাইতেছে, গুপ্তকক্ষের সিঁড়ি বহিয়া বন্দীরা পাতাল-পথে নামিয়া গিয়াছে,—সেখান হইতে তাহাদিগকে বাহিরে আনিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে অনেকগুলি ফরাসীসৈন্যের প্রাণহানি ঘটিতে পারে। কিয়ৎকাল উপায় চিন্তা করিয়া, লেভিঙ একটা রবারের পাইপ আনাইয়া লইলেন এবং সৈন্যদলকে আদেশ দিলেন, ইঁদারা হইতে জল 'পাম্প' করিয়া ঐ গহ্বর-মুখে ঢালিয়া দেওয়া হোক।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল উত্তীর্ণ হইতে না-হইতেই উদ্দিষ্ট ফল পাওয়া গেল। সিক্তদেহে রন্ধ্রমুখে উপনীত হইয়া জর্ম্মন-সেনাপতি হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল—"ডুবে মলুম আমরা; জল থামাও; ফরাসী সেনাপতির সঙ্গে আমি কথা কইতে চাই।"

"তা' হ'লে আপনারা আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক?" লেভিঙ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ইচ্ছুক, অবিলম্বে জলোচ্ছ্বাস থামান্—আমরা এই মুহূর্ত্তেই অস্ত্রত্যাগ কর্‌ছি।"

জলোচ্ছ্বাস থামিয়া গেল; একে একে ছয়জন জর্ম্মন সৈনিক আর্দ্রবসনে, নগ্নপদে, ভীতিবিকম্পিত কলেবরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল; লেভিঙ্‌ স্বহস্তে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া উন্মত্ত উল্লাসে 'হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে' শব্দে প্রভাত-গগন পূর্ণ করিয়া তুলিলেন।

বার্থিন চিত্রার্পিতবৎ একধারে দাঁড়াইয়া ছিল,—নিরুৎসাহ, নিরানন্দ, ম্রিয়মাণ! শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তে জর্ম্মন-সেনাপতি একবার তাহার দিকে চাহিল; সে দৃষ্টির অর্থ—"অকৃতজ্ঞ, প্রতারক! এমনি করিয়া সর্ব্বনাশ করিতে হয়!"

বার্থিন সে-দৃষ্টি দেখিল,—উহার অন্তর্নিহিত অর্থটুকুও বুঝিল,—কিন্তু তাহার অপলক উদাস চক্ষে হিংসা বা লজ্জা এতদুভয়ের কোনোটিই দেখা দিল না!

লেভিঙ্‌ অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আপনারই বুদ্ধি-কৌশলে ফরাসী সৈন্যদলের ভাগ্যে আজ এতবড় গৌরব-লাভ ঘট্‌তে পেরেছে,—এর উপযুক্ত পুরস্কার আমরা আপনাকে প্রদান কর্‌বো।"

বার্থিনের কপোলযুগল বহিয়া ধারায় ধারায় অশ্রু গড়াইয়া গেল। সংযত, স্থির অথচ বেদনা-কাতর কণ্ঠে সে বলিল—"আমার চরম পুরস্কার জর্ম্মন সেনাপতির হাত থেকেই কাল পেয়েছি ম্যাসিয় লেভিঙ্‌! এই দেখুন সে পুরস্কার,—আমার পিতৃদত্ত বিবাহ-যৌতুক, জর্ম্মনসেনাপতির হস্তে নিহত আমার প্রিয়তম স্বামীর স্মৃতি-চিহ্ন এই অঙ্গুরীয়টি।"

"হা ভগবান!"—জর্ম্মন-সেনাপতি চীৎকার করিয়া উঠিল! লেভিঙ্‌ ব্যথিত-বিস্ময়ে যুবতীর মুখের দিকে নির্ব্বাক চাহিয়া রহিলেন! বৃদ্ধ নিকোলাস জয়ের আনন্দে বিভোর থাকায় এতক্ষণ কন্যার দিকে চাহিতেই পারে নাই—এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্যাপারটা চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া পড়ায় সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"উঃ! বার্থিন!"*

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

রুচি-বৈচিত্র্য

নবীন প্রেমিক তার প্রিয়ারে সাদরে
"বউ কথা কও" বলি সাধিছে কাতরে।
ব্যাকুলা নবীনা তার দিনক্ষণ নাই
"পিউ কাঁহা" ব'লে যারে খোঁজে সব ঠাঁই।
দেখে শুনে বলে তাই প্রবীণা হাঁকিয়া
"চোখ গেল", "চোখ গেল" হ'ল কি শুনিয়া।

শ্রীব্রজমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

* মোঁপাসার মর্ম্মানুবাদ। লেখকের যন্ত্রস্থ ছোট গল্পের বই "পূরবী" হইতে গৃহীত।

জাতের পঞ্চায়ৎ, দলপতি ও দণ্ডবিধি

(Emile Senartএর ফরাসী হইতে)

জাতের মধ্যে শোণিত-সম্বন্ধের বন্ধন যতই দৃঢ় হউক না কেন, উহার দলবন্ধনপ্রণালী, উহার সর্ব্বস্বীকৃত শাসনাধিকার—উহাই জাতের স্থায়িত্ব বিধান করে, জাতের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া জাতকে রক্ষা করে।

বীম্‌স্ সাহেব আমাদের নিকট একটা ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন যাহার তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং যাহা এই জাতের দলবন্ধনপ্রণালীর সহিত, জাতের অধিকারাদির সহিত, জাতের কলকৌশলের সহিত আমাদিগকে অব্যবহিত সংস্পর্শে আনিয়া দেয়। ইহা একটা বলিবার যোগ্য ঘটনা;—ঘটিয়াছিল পুর্ণিয়ায়। কোন এক নিম্নশ্রেণীর লোক,—একজন ধোপা, আপন নিকট-সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার সহিত ব্যভিচার-দোষে অপরাধী বলিয়া তাহার উপর সন্দেহ হয়। সে অস্বীকার করিল, এবং উক্ত আরোপিত-অপরাধ সহাপরাধিনীকে তাহার বাড়ী হইতে সরাইতেও অসম্মত হইল। পরিশেষে তাহাকে প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করিল। তাহার জাতের কোন লোকই ঐ-বিবাহে উপস্থিত হইতে রাজি হইল না। উক্ত দম্পতীর বিরুদ্ধে লোকের মনোভাব সপ্তমে চড়িয়াছিল। অবশেষে ঐ-জেলার অধিবাসী ঐ-জাতের যত লোক (কয়েক শত লোক হইবে) সবাই একত্র হইয়া কতকগুলি "জুরি" বা বিচারক নির্ব্বাচন করিল। বিচারকগণ সমস্ত তথ্য মনোযোগ-সহকারে পরীক্ষা ও আলোচনা করিয়া, উহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিল এবং জাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। বিচারকগণের দস্তর-মত নামস্বাক্ষর-যুক্ত এক বিজ্ঞাপন, হাতে হাতে বিলি হইয়া, কাছাকাছি সমস্ত জেলার অধিবাসী সজাতের লোকদিগকে জানাইয়া দিল যে, অমুক ব্যক্তি, চিরাগত প্রথার বিপরীতে, দুর্নীতিমূলক আচরণের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায়, সমস্ত অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছে; সুতরাং কেহ তাহার সহিত একত্রে পানাহার ও ধূমপান করিতে পারিবে না—যদি কেহ করে, তাহা হইলে সে উহারই মত দণ্ডনীয় হইবে। কয়েক সপ্তাহ দণ্ড ভোগ করিয়া, এই হতভাগ্য অপরাধীর জীবন অসহ্য হইয়া উঠিল। কিছুকাল পরে সে বশ্যতা স্বীকার করিয়া, স্বীয় পত্নী হইতে পৃথক্ হইল। প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণের হিসাবে, তাহাকে একটা বড় রকমের ভোজ দিতে হইল; সেই ভোজে তাহার সমস্ত জাত-ভাই তাহার সহিত একত্র আহার করিল; এবং তখন হইতে সে তাহার অধিকারগুলা আবার ফিরিয়া পাইল।

ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, এই সমাজবন্ধনপ্রণালীটা কেবল প্রথা দ্বারাই নিয়মিত হইয়া থাকে। অতএব, উহা সর্ব্বপ্রকার অনিশ্চয়তার বশবর্ত্তী; এবং কাল, অবস্থা, ও আকস্মিক খেয়াল কল্পনায় প্রতিষ্ঠানাদির অল্পস্বল্প বদল হইয়া ও তাহাদের বন্ধনগ্রন্থি খুলিয়া গিয়া উহার ভিতর যে-সকল বিচ্ছিন্নতা উপস্থিত হয়, সেই-সকল বিচ্ছিন্নতারও বশবর্ত্তী; এই প্রণালীবদ্ধ সমাজকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এমন কোন আটক নাই যাহাকে ঠিক আইনসঙ্গত বলা যাইতে পারে। উহার অপরিহার্য্য মুখ্য উপাদানগুলির মধ্যে বড় একটা ইতরবিশেষ দেখা যায় না। সর্ব্বকালেই, বিস্তৃত পরিবার-গঠনের মধ্যে, গোত্র-গঠনের মধ্যে এই একই উপাদানগুলির প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে, জাত-ছাড়া অন্যত্রও এই-সকল উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, সাধারণ-স্বত্বাধিকার-সংস্কৃত অথবা বর্জ্জিত গ্রামের-গঠনপ্রণালীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের সমাজ ও জাতের সমাজ—এই দুই সমাজপ্রণালীর কর্ম্মচক্রগুলি পাশাপাশি কাজ করে বলিয়া, আমাদের ন্যায় সুদূরবর্ত্তী পর্য্যবেক্ষকের চোখে, অনেকস্থলে উহারা মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়।

এই সমাজশরীরের, দুইটি নিত্যস্থায়ী কর্ম্মেন্দ্রিয়; এক, দলপতি, আর-এক, পঞ্চায়ৎ।

কতকগুলি জাত আছে যাহাদের মধ্যে দলপতি নাই; যথা—পুণার "কাচি"দের মধ্যে। কিন্তু এইরূপ ব্যতিক্রম-স্থল খুবই বিরল। ইহা স্পষ্টই দেখা যায়, (ব্যতিক্রমের দ্বারা আরও দৃঢ় প্রতিপন্ন হয়) যে, জাতের নির্ব্বাচনমূলক সভা পঞ্চায়তেরই হাতে জাতসম্বন্ধীয় মুখ্য কর্তৃত্ব বিদ্যমান। বস্তুতঃ, সমস্ত জাতের উপরেই উহার কর্তৃত্ব এবং এই অঙ্গরাকার প্রতিষ্ঠানটি বিশেষরূপে গণতন্ত্রিক। দলপতি

কর্তৃক শাসনক্ষমতা পরিচালন, ক্ষতিপূরণরূপ অর্থদণ্ডবিধান যদি কোথাও থাকে ত সে জৈন সম্প্রদায়ের এক জাতের মধ্যে। উহা আসলে পুরোহিত-তন্ত্রাধীন; উহার দলপতি —একজন প্রকৃত "গুরু"—পদমর্য্যাদায় জাতের দলপতি অপেক্ষাও বড়। (১)

অন্য জাত সম্বন্ধে না হউক, অন্ততঃ "বল্লার" জাতের দলপতি সম্বন্ধে এলিয়ট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত বিধানের ক্ষমতা উহার আছে। কিন্তু আমি এ কথাটা তেমন বিশ্বাস করিতে পারি না।

শ্রেণী-ভেদে ও প্রদেশ-ভেদে দলপতিদিগের উপাধিগুলিও বিভিন্ন, যথাঃ—মীহতর, চৌধুরী, নায়িক, পটেল, পর্গনাইৎ ইত্যাদি। দলপতি-নিয়োগ কুলক্রমিক; কোন বিশেষ অপরাধের জন্য তাহার পদচ্যুতি ও তৎপ্রযুক্ত নব-নির্ব্বাচনের আবশ্যকতা না হইলে, দলপতির পদটা একই বংশের মধ্যে চলিতে থাকে। উত্তরাধিকারীর অভাব ভিন্ন জাতের লোকেরা নূতন নির্ব্বাচনে বড় একটা হস্তক্ষেপ করে না। দলপতির ক্ষমতার পরিসর-ক্ষেত্রটা পরিবর্ত্তনশীল। অধিকাংশ জাত ছড়াইয়া থাকার দরুন, সচরাচর এই ক্ষমতা ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রত্যেক জাতের অন্তর্গত কেবল এক খণ্ডাংশের উপরেই প্রসারিত হয়। কোন গুরুতর অবস্থায় দণ্ডবিধায়িনী পঞ্চায়ৎসভাও এই ক্ষমতার বহির্ভূত নহে।

দলপতি কতকগুলি সম্মানের অধিকার সম্ভোগ করিয়া থাকে; তাঁহার পত্নীও সেই অধিকারের অংশভাগিনী। এ ছাড়া দলপতির কতকগুলি বৈষয়িক সুবিধাও আছে; যথাঃ—উপহার লাভ, কোন কোন আয়ের অংশ লাভ, কতকগুলি খরচা হইতে মুক্তিলাভ। নিজ এলাকার মধ্যে দলপতি, বিবাহ-অন্ত্যেষ্টি-সংশ্লিষ্ট উৎসবাদিতে, গ্রামস্থ মন্দিরের উৎসবাদিতে অধ্যক্ষতা করে। কাজটার সহিত সংশ্লিষ্ট একটা বাঁধা লাভ থাকায়,—অন্তত কোন কোন জাতের মধ্যে—ইহার বিক্রয় হইতে পারে, বন্দোবস্ত হইতে পারে। দলপতির কাজ কতকটা "পেট্রিয়ার্ক" (কুলপতি) ধরণের কাজ—দলপতি জাতের সভা আহ্বান করে, সভার অধ্যক্ষতা করে; বিবাহের ঘটকালি ও বন্দোবস্ত করে, মোকদ্দামা মামলায় রফানিষ্পত্তি করে। কোন কোন বণিকশ্রেণীর মধ্যে, বেচা-কেনার কাজে দলপতি মধ্যস্থ হইয়া থাকে, জামিন হইয়া থাকে। তাই তাহার সাহায্যকারী পঞ্চায়ৎ, যাহাতে তাহার মান বজায় থাকে, কেহ তাহার অবাধ্য না হয়, কেহ তাহার অসম্মান না করে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

ফলত গ্রামের প্রাচীন লোকেরা সর্ব্বদাই দলপতিকে ঘিরিয়া থাকে। সেই প্রাচীনমণ্ডলীর মধ্যে জাতের বিশিষ্ট লোকেরা প্রতিনিধিস্বরূপ অবস্থিত।

এই মণ্ডলীটিকে যে নিত্যস্থায়ী হইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। অমুক অমুক বিশেষ কাজের জন্য, অবস্থা-অনুসারে, এই মণ্ডলীটি গঠিত হইয়া থাকে। কোন-কোন বিবাহ ও বিবাহভঙ্গের সমস্যাস্থলে, বিচারনিষ্পত্তি করাই এই মণ্ডলীর বিশেষ কাজ। কিন্তু কাজ যাহাই হোক্ না, কেন, উহাদের কর্ত্তৃত্বটা চূড়ান্ত বলিয়া মনে হয় না। নিষ্পত্তির শেষ কথাটা পঞ্চায়তের হাতেই রহিয়া যায়।

অবস্থা-অনুসারে, এই পঞ্চায়ৎ-সভা ন্যূনাধিক পরিমাণে বিস্তৃত; সাধারণত পঞ্চায়ৎ সমস্ত জাতের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিয়া থাকে। জাত-সংক্রান্ত পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পঞ্চায়তের হাতেই বিন্যস্ত; দলপতি আপনা হইতেই পঞ্চায়ৎকে আহ্বান করুক, কিংবা জাতের অন্তর্ভূত কতকগুলি লোক উহাকে আহ্বান করুক, আহূত হইলে পর,—বহিষ্করণ প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে বাদবিসম্বাদের কূটপ্রশ্নগুলি পঞ্চায়ৎই নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। নিজের কাজ নিজে চালাইবার যাহাদের বয়স হইয়াছে এমন-সব লোককেই পঞ্চায়তে আহ্বান করা হয়। বিচার করিবার ও মত দিবার অধিকার সম্বন্ধে, প্রতিনিধি নিয়োগ করা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয় না। মোটামুটি অধিকাংশ লোকের মতেই প্রশ্নসকল নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু বলপ্রয়োগের ক্ষমতা না থাকায়, উভয় দলের সংখ্যা কোন কোন সভার উপস্থিত-অধিবেশনে প্রায় সমান হইলে, অথবা এক অধিবেশনে লোকের মত, অন্য অধিবেশনের লোকমতের বিরোধী হইলে, বিবাদঘটিত প্রশ্নের মীমাংসাটা কখন কখন কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকে।

(১) Steele, Hindu Castes, p. 102. এই সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের উপর আর-একদল ব্রাহ্মণের শাসনাধিকার,—মঠের "ধর্ম্মাধিকারী"দিগের শাসনাধিকার তুলনা করা যাইতে পারে। এই ধর্ম্মাধিকারীদিগকে সকলেই খুব ভক্তি করে।

আমি অবশ্য নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না—কিন্তু আমার যেন মনে হয়,—পার্লেমেণ্ট-সুলভ এই ছোটখাটো অধিকারটিও তেমন স্থিরনিশ্চিত নহে। কিন্তু উহার ভিতরে ভিতরে কতকগুলি স্পষ্ট রেখার যে আভাস পাওয়া যায়—তাহাই যথেষ্ট।

যে-সকল জাতির সমাজগঠন উন্নত হইয়া এখনো প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক গঠনে পরিণত হয় নাই, সেই-সকল জাতির মধ্যে কতকগুলি মুখ্য লক্ষণ সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাই, যে লোক-সভা ও আচার-অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণিক সমাজান্তর্ভূত জাতসমূহের মধ্যে দেখা যায়, তাহার অনুরূপ লোকসভা ও আচার-অনুষ্ঠান যদি অনার্য্য যাযাবর লোকদের মধ্যে দেখিতে পাই তাহাতে আমরা বিস্মিত হই না। (২)

জাতের ক্ষমতা ও যোগ্যতা কতদূর—ইহাই আমাদের কৌতূহলের বিষয়। এই দিক দিয়াই আমরা জাতের প্রকৃত লক্ষণের পরিচয় পাইতে পারি। এই জাত-তন্ত্রটা একসঙ্গে—পৌরজনিক, কৌলিক, ও বিচার-ঘটিত কাজের যন্ত্রস্বরূপ।

যে-সকল গুরুতর ব্যাপার, আমাদের চোখে, শুধু একমাত্র পারিবারিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেইরূপ অধিকাংশ ব্যাপারেই জাত হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। জন্ম,—কখন কখন গর্ভাবস্থার কোন এক বিশেষ সময়,—বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি—প্রভৃতি যে-সকল গুরুতর অনুষ্ঠানে জাতভাইরা আসিয়া সমবেত হয়, শুধু সেই-সকল অনুষ্ঠানের কথা বলাই আমার অভিপ্রেত নহে। ব্যাপারটা যতটা শূন্যগর্ভ বলিয়া মনে হয়, আসলে তাহা নহে; এই সম্মিলনগুলি শুধু স্বেচ্ছাধীন আমোদের ব্যাপার নহে। কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে,—আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি—ঐরূপ সম্মিলনের ব্যাপারটা পরিত্যাগ করিলে, এমন কি জাত হইতে বহিষ্কৃত হইবারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমার মনে হয়, বিবাহের সম্বন্ধেই জাত বিশেষরূপে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। এই বিষয়ে, জাতের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কাহারও বড় একটা বিরোধ নাই। অনেকগুলি অদ্ভুত প্রথার মধ্যে ইহার আবির্ভাব দেখা যায়;—যেমন মনে কর,—"ঘিসাজি"দের মধ্যে, ছেলের বিবাহ দিবার সময় বাপ, কনে খুঁজিবার জন্য পুণায় কনৌজ ব্রাহ্মণদের গৃহে নিজের জাতভাইদের আনিয়া একত্র করে, এবং সেইখানে জাতের পঞ্চায়ৎ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে।

যে ক্ষেত্রে বিবাহভঙ্গ ও পুনর্ব্বিবাহ স্বীকৃত হয়,—তাহা জাতের সহযোগিতা, অনুমোদন ও দায়িত্বসহকারেই হইয়া থাকে—যদিও আজকাল দলপতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার দিকে ইংরেজ জজদিগের একটা প্রবণতা দেখা যায়। অতএব, পোষ্যপুত্রগ্রহণসম্বন্ধে জাতের হস্তক্ষেপ খুবই স্বাভাবিক; যুক্তির নিয়মানুসারেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। ফলত, পোষ্যপুত্রগ্রহণে জাতের সম্মতি আবশ্যক বলিয়া সচরাচর বিবেচিত হইয়া থাকে। কাজটা সহজে যাহাতে নিষ্পন্ন হয়, শুধু এই জন্যই জাত উহাতে হস্তক্ষেপ করে এরূপ নহে; পরন্তু, যে-পোষ্যপুত্রগ্রহণব্যাপার জাতের গোচরে আসে না, তাহা সাধারণতঃ অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। সন্তানহীন বিধবার পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে হইলে জাতের সম্মতি ত আরো আবশ্যক। এই সব স্থলে মৌন সম্মতির চিহ্নস্বরূপ, পোষ্যপুত্রের নিকট-আত্মীয়দের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক; তখন সেই নিকট-আত্মীয়েরা সেই জাতের সহিত একেবারে মিলিয়া মিশিয়া যায়। এইভাবে দেখিলে, জাতটাকে পরিবারতন্ত্রের একটা "নেজুর" বলিয়াই মনে হয়। জাতটা যেন পরিবারের সংশ্লিষ্ট একটা বড়ধরণের সাধারণ সভা। অনাথদিগের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করা আবশ্যক হইলে, এই অধিকারসূত্রেই জাত উহার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। পিতামাতার অবর্ত্তমানে উহাদের রক্ষকতার ভার দলপতির উপরেই ন্যস্ত হয়।

তা ছাড়া, ইহাকে একটা প্রকৃত বিচারালয় বলিলেও হয়। এমন কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে, যে যে স্থলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ঘটনাগুলা তবু কতকটা পুরাতন, আজিকার দিনে, ইংরেজের আমলে, এরূপ ব্যাপার হওয়া আর সম্ভব নহে। কিন্তু, কাজে না হোক্, মুখের সিদ্ধান্তে (in theory) উহার শাসনাধিকার মহা-অপরাধ পর্য্যন্ত (crime) প্রসারিত; ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা প্রভৃতি মহাপাতক সম্বন্ধেও জাতের শাসনাধিকার আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ, জাতের নিয়মভঙ্গে জাতের ক্ষমতা যতটা প্রকটিত হয়, মহাপরাধ বা আইন-ভঙ্গের অপরাধে ততটা প্রকটিত হয় না।

(২) Ibbetson.

আমাদের নিকট এই-সকল নিয়ম, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ও নিরর্থক অতিরিক্তকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বহুকাল যাবৎ অপরিহার্য্য ক্রিয়াকলাপের জালে ধর্ম্মবুদ্ধি আবদ্ধ থাকায়, জাতের ভিতর ঐ-সকল নিয়মপালনের এতটা আঁটাআঁটি। ইহার শাসনাধিকার,—আচারব্যবহার ও প্রথাদির উপরেই বর্ত্তায়। ঠিক প্রথা-অনুসারে চলা হইল কি না সেই বিষয়েই জাত খুব নজর রাখে। যে-সকল নিয়মভঙ্গ অপরাধ সমাজের মধ্যে রটিয়া যায়, জাত তাহারই দণ্ড-বিধান করে। রাষ্ট্র-শাসনকর্ত্তাদের বিচারনিষ্পত্তি অনুকূল হইল কি প্রতিকূল হইল—তাহাতে তাহার বড় একটা যায়-আসে না।

জাতের বিচারকর্ত্তারা যে-সকল অপরাধের বিচার করিয়া থাকে সেই-সকল অপরাধের একটা তালিকা কিংবা একটা কাছাকাছি হিসাব খাড়া করা বড় শক্ত। যে-সকল অপরাধ সকল-জাতের মধ্যেই সাধারণ সেই-সকল অপরাধ, অশুচি বলিয়া বিবেচিত কতকগুলি খাদ্যের ব্যবহার, অস্পৃশ্য জাতের সহিত ছোঁয়াছুঁই করা, বিশেষত তাহাদের সহিত আহার করা—এই-সকল ব্যাপারের মধ্যে,—অবস্থা-বিশেষে,—এরূপ অনেক সূক্ষ্ম ভেদাভেদ আছে যাহা একান্তই উপেক্ষার বিষয় নহে। সুরা ও তাড়ী প্রভৃতির নিষিদ্ধতা বা দণ্ডার্হতা সর্ব্বত্র সমান নহে। ব্যভিচারের জন্য নালিস হইয়া থাকে। তাছাড়া, সহাপরাধী পুরুষের জাতসম্বন্ধীয় উচ্চনীচতা অনুসারে, অপরাধিনী রমণীর অপরাধের বিচার করা হয়। এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য রীতিগুলি কতকগুলি বিশেষ জাতের বিশেষ রীতি। বেশ্যাবৃত্তি কোন জাতের নিয়মিত "পেষা" না হইলে, সে জাতের ভিতর, বেশ্যাবৃত্তি দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। পিতা-মাতার শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্বন্ধে অবহেলা করা, গোহত্যা করা—এতই গুরুতর অপরাধ যে সর্ব্বত্রই উহার জন্য কঠোর দণ্ডের বিধান আছে। আবার কতকগুলি জাতের মধ্যে, "বয়স-কালে" মেয়ের বিবাহ না দেওয়া, অথবা একটা নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ছেলের উপনয়ন না দেওয়া,—এই-সকল বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি জাতের মধ্যে ভারী কড়াক্কড় নিয়ম,—ঐ নিয়ম পালন না করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

জাতের শাসনাধিকার,—প্রথার উপর যাহার একান্ত নির্ভর, যাহা সময়ে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রীয় আদালতের বিচার নিষ্পত্তিতে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়—উহা স্বতন্ত্র ও পরস্পর-বৈরী অনেক ব্যবসায়-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকারের শাসনাধিকার খামখেয়ালী না হইয়া যায় না; এবং আমাদের এ-কালে, ব্রিটিশ-শাসনের শক্ত হাতের নীচে, যেমন অনেকগুলি ধারণা ও অন্ধসংস্কার অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ যে-শাসনাধিকার ঐ-সকল ধারণা ও অন্ধসংস্কার হইতে প্রামাণ্য লাভ করিয়াছে সেই শাসনাধিকারও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি আমরা যে ছবিটি আঁকিয়াছি তাহা মরণোত্তর ছবি নহে। এই প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; ইহার উদ্যম-চেষ্টাকে স্থায়ী-ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই। এই-সকল উদ্যম-চেষ্টা অনিয়মিত ও মন্থরগতি।

আর এক কথা,—সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই অস্পষ্ট। যেমন মনে কর, নিজে লাঙ্গল ধরা, সাক্ষাৎভাবে শাকসব্জির চাষ করা,—উচ্চজাতের মধ্যে সর্ব্বত্র অবনতির কারণ বলিয়া খ্যাত; কোন কোন দলের মধ্যে এইগুলা কি রীতিমত অপরাধের সামিল ধরা হইয়া থাকে?—হইতেও পারে, কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। স্পষ্ট যা লক্ষ্য করা যায় তাহা এই—যাহা জাতের অখণ্ডতা-রক্ষার সাক্ষাৎ পরিপন্থী, সেই বিবাহ সম্বন্ধীয়, উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয়, শুদ্ধাচার সম্বন্ধীয়, কোন কোন দলের নিজ প্রথাসম্বন্ধীয় অনিয়মের প্রতিই জাত মুখ্যরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে।

এই কার্য্যে, জাতের বিচারকগণ মৃদু হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ কঠোরতর উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহারা যে ক্ষতিপূরণের দণ্ড প্রচার করেন তাহা সাধারণতঃ বেশী নহে—গরিব দেশের পক্ষে যাহা উপযোগী, এবং অপরাধীর পক্ষে যতটা সাধ্যায়ত্ত, সেই পরিমাণেই ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা করেন। ক্ষতিপূরণের দণ্ড হইতে যে অর্থলাভ হয়, তাহা কতকগুলি দাতব্য অর্থভাণ্ডে অথবা বারোয়ারী সাধারণ উৎসবাদিতে প্রদত্ত হয়। বিচারক-দিগের নিজস্ব ও লক্ষণ-পরিচায়ক শাসনদণ্ড হইতেছে—প্রায়শ্চিত্ত। জাতভাইদিগকে একটা ভোজ দেওয়া;

বিশেষতঃ জাত হইতে একেবারেই বা কিছুকালের জন্য বহিষ্কৃত করা। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, দোষ অনুসারে শুধু যে দণ্ডের ইতর-বিশেষ হয় তাহা নহে—পরন্তু একই দোষের জন্য প্রথা-অনুসারে, এবং প্রথানুযায়ী অধঃপাতের গুরুত্ববোধ-অনুসারে দণ্ডের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। বিচারকদিগের খেয়াল এবং তাহাদের স্বীকৃত বা অস্বীকৃত কতকগুলা ব্যক্তিগত স্বার্থেরও কতকটা ইহাতে হাত আছে। একস্থলে কোন অপরাধের জন্য চিরবহিষ্কারদণ্ড আবার অন্যস্থলে সেই একই অপরাধের জন্য শুধু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই যথোচিত দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয়। আমরা এই সম্বন্ধে যে-সব বৃত্তান্ত জানিতে পাই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মিল নাই। আমার মনে হয়, চির-বহিষ্কার দণ্ড ক্রমেই অধিকতর বিরল হইয়া পড়িতেছে। এমন-কি খুব গুরুতর অপরাধের স্থলে, অপরাধী ব্যক্তির যদি জাতের লোকদের উপর কতকটা প্রভাব থাকে অথবা যদি তাহার কিছু অর্থসম্বল থাকে, তাহা হইলে চির-বহিষ্কার বড়-একটা তিষ্টিয়া থাকিতে পারে না। চির-বহিষ্কারের কথা তখনই উঠে যখন অবজ্ঞাত ও অস্পৃশ্য সমাজের সহিত কাহারও দীর্ঘকালের সংস্রব ঘটিয়াছে অথবা সে বাস্তবিকই কোন মহাপাপের কাজ করিয়াছে। আসল কথা বলিতে গেলে, প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের যাহা মনে হয়, এই দণ্ডটা তার চেয়ে ঢের বেশী ভয়ঙ্কর। ডুবোয়া বলিতেন—"প্রথা লঙ্ঘনের জন্য অথবা এমন কোন কাজ যাহা করিলে সমস্ত জাতটার অপমান বা কলঙ্ক হয়, সেই কাজের জন্য যে-বহিষ্কার দণ্ড প্রদত্ত হয় তাহা একপ্রকার (civil) রাষ্ট্রিক বহিষ্করণ;—যাহাতে করিয়া জাত-ভাইদের সহিত হতভাগ্য অপরাধীর কোন সংস্রব থাকে না। বহির্জগতের সম্বন্ধে সে এক-রকম মৃত বলিলেও হয়...জাত হারাইলে, সে যে শুধু আত্মীয় বন্ধুদের হারায়, তাহা নহে, সে কখন কখন এমন কি নিজ স্ত্রীপুত্রদেরও হারায়। স্ত্রীপুত্রেরা তাহার দুর্দ্দশার ভাগী হওয়া অপেক্ষা, তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করে। কেহ তাহার সহিত আহার করিতে সাহস করে না—এমন-কি এক বিন্দু জল দিতেও সাহস করে না...কেহ তাহাকে দেখিলে তখনি পাশ কাটাইয়া যায়, অথবা নিন্দনীয় লোক মনে করিয়া তাহার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে...সম্ভ্রমজ্ঞান বা একটু সূক্ষ্মতর সঙ্কোচ-বোধ থাকিলে, একজন সামান্য শূদ্রও একজন পতিত ব্রাহ্মণের সহিত কোন-প্রকার সম্পর্ক রাখিতে চাহিবে না।"

বহিষ্কারের অনুষ্ঠানটা একটু গূঢ়-অর্থব্যঞ্জক; জাত হইতে যে বহিষ্কৃত হয়, তাহার রীতিমত অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; উহা তাহার পক্ষে একপ্রকার সামাজিক (civil) মৃত্যু। যদি বহিষ্কৃত ব্যক্তি পুরুষ হয়,—তাহাকে পরিত্যাগ না করিলে, তাহার স্ত্রীপুত্রেরা সমাজের মধ্যে স্বকীয় বিশুদ্ধ স্থান রক্ষা করিতে পারে না। সেই বহিষ্কৃত ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইতেও পারে না, পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতেও পারে না। কেননা, ইহা খুব স্বাভাবিক, বহিষ্কারের পরে সন্তানাদি হইলে, সেই সন্তানেরা পিতৃদশারই ভাগী হইবে। বাপকে ত্যাগ না করিলে, অথবা যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তারা আবার জাতে উঠিতে পারে না।

প্রায়শ্চিত্ত বিবিধ প্রকারের।—কোন প্রখ্যাত মন্দিরে তীর্থযাত্রা হইতে পারে, গঙ্গা-স্নান হইতে পারে, অথবা কেবল উপবাসব্রতপালনও হইতে পারে। দণ্ডস্বরূপ অপরাধীর প্রতি গোঁফ কামাইবারও আদেশ হইতে পারে, লোহা পোড়াইয়া তাহার গায়ে দাগা দেওয়া যাইতে পারে, তাহার জিহ্বা পুড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে; অথবা যাহা আমাদের নিকট অতীব ঘৃণিত জিনিস সেই শুদ্ধিকর "পঞ্চগব্য" তাহাকে পান করান যাইতে পারে। পঞ্চগব্যের উপকরণ—দুগ্ধ, দধি, মাখন—আর বাকী অন্য গব্য দ্রব্য। সকল স্থলেই, সম্মিলিত জাত-ভাইদের সামনে, অপরাধীকে মাথা হেঁট করিয়া অপমান স্বীকার করিতে হইবে, সর্ব্বসমক্ষে স্বীয় বশ্যতার পরিচয় দিতে হইবে, অনুশোচনা প্রদর্শন করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি, জাত-ভাইদিগকে একটা ভোজ দিতে হইবে, এবং ভোজের ব্যয়ভার তাহাকে বহন করিতে হইবে।

হিন্দুরা যে এই ভোজের এতটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাহা যে শুধু তাহাদের স্বাভাবিক সামাজিকতার ভাব হইতে করে—একথা মনে করিলে হিন্দুদের প্রতি অন্যায় করা হইবে। দৈনিক আরাম ও আমোদ-প্রমোদ হইতে বঞ্চিত সাধারণ লোকদিগের মধ্যে, কোলাহল-

সহকারে একত্র ভোজন করিবার দিকে যে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সচরাচর দেখা যায়, তাহা হইতেই এই ব্যাপারটা একটু অতিরঞ্জিত হইয়াছে। ইহার গোড়ার উৎপত্তিটা নিশ্চয়ই আরো গুরুতর, কিন্তু সেভাবে সমর্থিত হয় নাই। যদি সাধারণ ভোজ হইতে অপরাধীর বহিষ্করণ,—"জাতঃপাতের" একটা সুস্পষ্ট ও অপরিহার্য্য পরিণাম হয়, তবে এ কথাও মানিতে হইবে, সাধারণ ভোজে জাত-ভাইদের সহিত একত্র আহার করিলে তবেই সে আবার জাতে উঠিয়াছে বলিয়া জানা যাইতে পারে। আমোদের ভোজ ও প্রায়শ্চিত্তের ভোজ, উল্টা রকমের হইলেও দুইই সমবেত লোকের সাধারণ ভোজ। দুইই এক উৎস হইতে নিঃসৃত। উহার পরিণাম হইতেই তাহা প্রকাশ পায়। উহা যে-মনোভাব হইতে উৎপন্ন তাহা একটা উদার ধরণের উচ্চ মনোভাব, কিন্তু আমরা প্রথমেই ইহাকে একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া মনে করি—আসলে তাহা নহে।

আমি এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি তাহাতে মনে হয় যেন এই জাত-সংক্রান্ত বিচারকার্য্য, চিরন্তন প্রথা-অনুসারেই জাত কর্ত্তৃক বা জাতের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তথ্যাদি হইতে এই-রকমই প্রকাশ পায়। কিন্তু এই-সকল প্রথা, ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের নামেই উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রায় ব্রাহ্মণই উহার কার্য্য-প্রকরণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। জাত ও জাতের পঞ্চায়ৎ ব্রাহ্মণের উপদেশ-অনুসারেই বিচার নিষ্পত্তি করে। কখন কখন ব্রাহ্মণ একাকীই এই কার্য্য নির্ব্বাহ করে বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়ে ব্রাহ্মণের প্রতিনিধিত্ব কতকটা মৌনসম্মতি-মূলক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পর-বাসী

(বৃন্দ কবি)

পরের ছায়ায় বসে যেই সে যে নানা মতে কাণা হয়
রবি-মণ্ডলে পশিলে চন্দ্র নিতুই কলা-ক্ষয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কষ্টিপাথর

যকৃৎ এবং উহার কার্য্য-প্রণালী।

যকৃৎ শরীরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মাংসগ্রন্থি (gland)। ইহা আমাদের বুকের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। যকৃতের রং কালো ও লালে মিশাইলে যেরূপ হয় সেইরূপ (Chocolate coloured)। মাংসের সহিত আমরা যে মেটুলি খাই তাহাই যকৃৎ।

যকৃৎ হইতে এক-প্রকার রস বাহির হয়, ইহার নাম পিত্ত। ইহা এক-প্রকার নলী (Bile duct) দ্বারা অন্ত্রনালীতে (dudenum) যায় এবং পাকস্থলী হইতে যে আধ-হজম খাদ্য আসে তাহা (Pancreas) ক্লোম-রসের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে হজম করে। যখন প্রয়োজন না হয় তখন পিত্ত একটি নল (cystic duct) দ্বারা এক-প্রকার থলীতে (gall bladder) জমা থাকে, পরে প্রয়োজন-মত অন্ত্রনালীতে যায়। মাংসাশী জীবের পিত্তের রং সাধারণতঃ উজ্জ্বল হলুদ, কিন্তু নিরামিষাশী জীবের পিত্তের রং সবুজ ও নীলে মিশ্রিত। যকৃৎ হইতে পিত্ত কোন-রূপ স্নায়বিক ক্রিয়া দ্বারা বাহির হয় না। Secretin নামক এক-প্রকার রাসায়নিক পদার্থ এই কার্য্য সম্পাদন করে। যেই আধহজম আহার্য্য পাকস্থলী (stomach) হইতে অন্ত্রনালীতে (intestine) আগমন করে অমনি অন্ত্রনালীর ভিতরকার দেওয়াল এই পদার্থ প্রস্তুত করে; ইহা রক্ত দ্বারা যকৃৎ এবং (Pancreas) ক্লোমে যায় ও তথা হইতে (Pancreatic juice) ক্লোম-রস ও পিত্ত বাহির হয়। পিত্ত শুধু নিজে হজম করিতে পারে না, ক্লোম-রসের সাহায্যে হজম করে।

পিত্ত alkaline,—ইহার প্রধান কার্য্য চর্ব্বি হজম করা।

অন্ত্রনালীতে পিত্তের প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইলে Jaundice বা ন্যাবা নামক রোগ হয়। অন্ত্রনালীতে পিত্ত প্রবেশ করিতে না পারিয়া যকৃতে ফিরিয়া যায়, তথা হইতে lymph এ গমন করে; lymph হইতে দেহের রক্তে প্রবাহিত হয়—কারণ lymph-প্রবাহ thoracic duct নামক শিরা দ্বারা রক্তে পৌঁছায়। অতএব সমস্ত দেহে পিত্ত প্রবাহিত হয়; চর্ম্মের রং পিত্তবর্ণ বা হলদে হয়, চক্ষুও হলদে হয়; প্রস্রাবে পিত্ত থাকে বলিয়া প্রস্রাবও হলুদ-বর্ণ হয়।

প্রথমে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে, যকৃৎ শুধু পিত্ত-দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করে মাত্র। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ফরাসী পণ্ডিত ক্লড বারনার্ড আর-একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের আবিষ্কার করেন।

এই কার্য্য শরীরের ব্যবহারের জন্য চিনি প্রস্তুত করা। যকৃৎ-কোষের (liver cells) একটি বিশেষ ক্ষমতা এই যে আমরা যে কার্ব-আত্রেত (carbohydrate) বা শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা হইতে এবং ইহার অভাবে (Proteins) প্রোটিন হইতে ইহা glycogen বা জীব-শ্বেতসার (animal starch) প্রস্তুত করে এবং জমাইয়া রাখে, পরে রক্তে ইহার স্বল্পতা হইলে ইহা রক্তে প্রবাহিত করে।

আমরা প্রত্যহ চিনি, ভাত প্রভৃতি কত কার্ব-আত্রেত জাতীয় আহার্য্য গ্রহণ করি। এই কার্ব-আত্রেত পাকস্থলী ও অন্ত্রনালী হইতে শোষিত (absorbed) হইয়া Portal vein বা যকৃৎ-ধমনী দ্বারা চিনিরূপে যকৃতে যায়। রক্তে যেটুকু চিনি থাকিলে শরীরের পেশী প্রভৃতি অন্যান্য tissue নির্ব্বিঘ্নে গ্রহণ করিতে পারে তদপেক্ষা অধিক যে চিনি (excess) থাকে তাহাই যকৃৎ এই রক্ত হইতে গ্রহণ করে। বাদ-বাকী চিনি চলিয়া যায়। যকৃৎ এই চিনি গ্রহণ করিয়া glycogen বা জীব-শ্বেতসার-রূপে জমা করে। যখন আবার রক্তে, যতটা চিনি থাকা দরকার তদপেক্ষা কম থাকে তখন ঐ জীব-শ্বেতসারকে চিনিতে

পরিণত করিয়া রক্তে প্রবাহিত করে এবং পেশী ও অন্যান্য tissue উহা ব্যবহার করে।

চিনি হইতে জীব-শ্বেতসার উৎপাদন করিবার কারণ এই যে, চিনি রক্তে দ্রবীভূত হয় কিন্তু শ্বেতসার গলে না; অতএব চিনি শ্বেতসারে পরিণত হইয়ে জমা থাকিবে, ব্যবহার হইবে না। জীব ও উদ্ভিদ-জগতে ইহার উদাহরণ বিরল নহে। আলু পিঁয়াজ প্রভৃতি, কার্ব-আয়োতকে শ্বেতসাররূপে আগামী বৎসরের গাছের জন্য জমাইয়া রাখে।

আমরা যখন কার্ব-আয়েত জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করি বা প্রয়োজন অপেক্ষা কম খাই তখন Protein (মাংস ডাল প্রভৃতি) হইতেও যকৃৎ প্রয়োজনানুসারে glycogen অর্থাৎ জীব-শ্বেতসারকে চিনি করিয়া প্রবাহিত করে।

পেভি (Pavy) প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী বলেন যকৃৎ জীব-শ্বেতসার (glycogen) হইতে চিনি প্রস্তুত জীবিতকালে করে না, মৃত্যুর পর glycogen হইতে চিনি হয়। মৃত্যুর পর শরীরের ব্যবচ্ছেদ হইলে যকৃতে চিনি পাওয়া যায়। জীবিতকালে যকৃৎ glycogen হইতে শরীরে ব্যবহারের জন্য চর্ব্বি (fat) প্রস্তুত করে। Splanchinic nerve নামক স্নায়ু যকৃতের জীব-শ্বেতসার প্রস্তুতের কার্য্য নিয়মিত করে।

বহুমূত্র রোগে প্রস্রাবে চিনি বাহির হয়। ইহার প্রধান কারণ আমরা খুব বেশী কার্ব-আয়েত খাদ্য গ্রহণ করি। যকৃৎ যে-পরিমাণে চিনি গ্রহণ করে তাহার চেয়ে বেশী চিনি রক্তে থাকিলে সে চিনি যকৃৎ গ্রহণ করিতে পারে না, উহা শরীরের tissueতে যায়, তথায় tissue প্রয়োজনের অধিক চিনি গ্রহণ না করায় ঐ চিনি প্রস্রাবের সহিত বাহির হয়। Glucosyria এই রোগের নাম। যকৃৎ কিছুদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইলেও ঐ রোগ উৎপন্ন হয়। ঠিক পরিমাণে চিনি যকৃৎ গ্রহণ করিতে না পারায় রক্তে অস্বাভাবিক (above normal) পরিমাণে চিনি প্রবাহিত হয়। সেই কারণে tissues খরচ করিবার পরও চিনি পড়িয়া থাকে ও প্রস্রাবে বাহির হয়। কম পরিমাণে চিনি খাইলে ও যকৃৎ সুস্থ হইলে এই রোগ সারে। সাধারণতঃ যে বহুমূত্র হয় ইহার কারণ আমাদের tissue-সমূহ অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়া স্বাভাবিক পরিমাণে (normal) চিনি গ্রহণ করিতে পারে না, অতএব রক্তে চিনি জমে ও অব্যবহৃত পদার্থ-রূপে (excretion) উহা প্রস্রাবে বাহির হয়। এই রোগের নাম diabetes mellitus। Tissue-সমূহ সুস্থ হইলে এই রোগ আরোগ্য হয়। ক্লোম (Pancreas) রোগগ্রস্ত হইলেও diabetes mellitus হইতে পারে। মস্তিষ্কের ক্ষতি হইলে এক-প্রকারে বহুমূত্র হয়, ইহার নাম Puncture diabetes। মস্তিষ্কের অপচয় হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত splanchinic nerve উত্তেজিত (stimulated), হয় এবং বেশী চিনি (sugar) প্রস্তুত হয়।

যকৃতের আর-একটি কার্য্য,—ইহা শরীরকে চর্ব্বির (fats) ব্যবহারে (Metabolism) সাহায্য করে।

যকৃতের আর-একটি কার্য্য ইউরিয়া (urea) প্রস্তুত করা। প্রস্রাবের প্রধান দ্রব্য ইউরিয়া। রক্ত দ্বারা শরীরের যে বিষ বাহির হয়, যকৃৎ রক্ত হইতে সেই বিষ গ্রহণ করে এবং তাহা হইতে ইউরিয়া প্রস্তুত করে (secretion)। এই ইউরিয়া বৃক্ক (kidney) দ্বারা প্রস্রাবে বাহির হয় (excretion)।

যকৃতের আর-একটি কার্য্য—উদরস্থিত শিশুর লাল রক্ত-কণিকা-সমূহ প্রস্তুত। কিন্তু শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে লম্বা হাড়ের মধ্যস্থিত মজ্জা এই কার্য্য করে। লাল রক্ত-সমূহ যকৃতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

(বিজ্ঞান, জুলাই) শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

এক ডুবে সাগর পার—

ইউরোপের এই মহাযুদ্ধে আশ্চর্য্য ঘটনার পর আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে। আগে যাহা মানুষের কল্পনার বিষয় ছিল, এখন তাহা বাস্তবে পরিণত হইতেছে। অল্পদিন আগে ইংলণ্ড জারমানীকে যখন ঘিরিয়া ঘেরাও করিয়া তাহার বহির্বাণিজ্য একরূপ অসম্ভব করিয়া তুলিলে জারমানী যখন বলিয়াছিল যে আমি এমন কতকগুলি ডুব-জাহাজ তৈয়ার করিব যাহারা জারমানীর বন্দরে ডুব মারিয়া একডুবে আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া একেবারে আমেরিকার বন্দরে মাথা তুলিবে এবং এইরূপে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যব্যবসায়ের আদান-প্রদান চলিতে থাকিবে, তখন এই আজগুবি কথাটা কেহই বড়-একটা বিশ্বাস করে নাই, তবে অদ্ভুতকর্ম্মা জারমানী নানা অসম্ভবকেও যখন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে তখন এই কল্পনার অতীত ব্যাপারও ঘটাইয়া তুলিতে সে পারে বলিয়া সকলের মনে একটু-একটু সন্দেহ ছিল। জারমানীর বাণিজ্য-পণ্য-বাহী প্রথম ডুব-জাহাজ জারমানী হইতে এক ডুবে আমেরিকার বাল্টিমোর নামক বন্দরে পৌঁছিয়া জারমানীর বাক্য যে কেবলই কল্পনামূলক মিথ্যা অহঙ্কার নয় তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

জারমানী নিজের দেশকে নিজের ভাষায় বলে ডয়েট্‌শ্‌লাণ্ড—এই প্রথম বাণিজ্যের ডুব-জাহাজের নামও তাহারা রাখিয়াছে ডয়েট্‌শ্‌লাণ্ড। এই ডয়েট্‌শ্‌লাণ্ডের নাম পৃথিবীর নূতন আবিষ্কারের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই ডুব-জাহাজ ডয়েট্‌শ্‌লাণ্ড জারমানী হইতে ডুব মারিয়া ষোল দিন ষোল রাত ক্রমাগত জলের তল দিয়া চলিয়া, সতত পাহারায় নিযুক্ত শত্রু দর দৃষ্টি এড়াইয়া, রং করিবার দ্রব্য বোঝাই লইয়া আমেরিকায় পৌঁছিয়াছে। এই রংয়ের মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। ডয়েট্‌শ্‌লাণ্ড জাহাজ তৈয়ার করিতে ইহার অর্দ্ধেকও খরচ পড়ে নাই। এই জাহাজ আমেরিকা হইতে জারমানীর সদ্য অভাবমোচনের অত্যাবশ্যক সামগ্রী সোনা, রবার এবং নিকেল লইয়া জারমানীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। যদি এইরূপে ভালোয় ভালোয় দুই চারি ক্ষেপ পাড়ী দিতে পারে তাহা হইলে রং প্রভৃতি যে-সমস্ত দ্রব্য জারমানীতেই উৎকৃষ্ট ও প্রচুর উৎপন্ন হইত তাহার অভাব আমেরিকার ও তাহার মারফতে সমস্ত জগতের থাকিবে না এবং জারমানীরও আবশ্যক দ্রব্যের অভাবমোচন আটক করা যাইবে না। এই ডুব-জাহাজের বিবরণ আমেরিকার কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে তাহার দৃষ্টিমাত্রে বুঝিবার মতন তালিকা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

চালক—	ক্যাপ্টেন ক্যনিগ্
মাঝিমাল্লা—	৩ অফিসার, ২৬ খালাসি
জাহাজের লম্ব—	৩০০ ফুট
জাহাজের ভার বহনের ক্ষমতা	৭৯১ টন
পণ্যদ্রব্য—	৭৫০ টন রং
পণ্যের মূল্য—	প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা
খেয়ার সময়—	১৬ দিন
তারিখ—	২৩ জুন হইতে ৯ই জুলাই
দূর—	৩৮০০ মাইল

এখন অনেকে মনে করিতেছে জলের তল দিয়া একডুবে জারমানী হইতে আমেরিকায় আসা যখন সম্ভব হইয়া গেল তখন জারমানী হইতে আমেরিকায় আকাশ দিয়া জেপেলীন্ উড়িয়া আসিতেও আর বিলম্ব
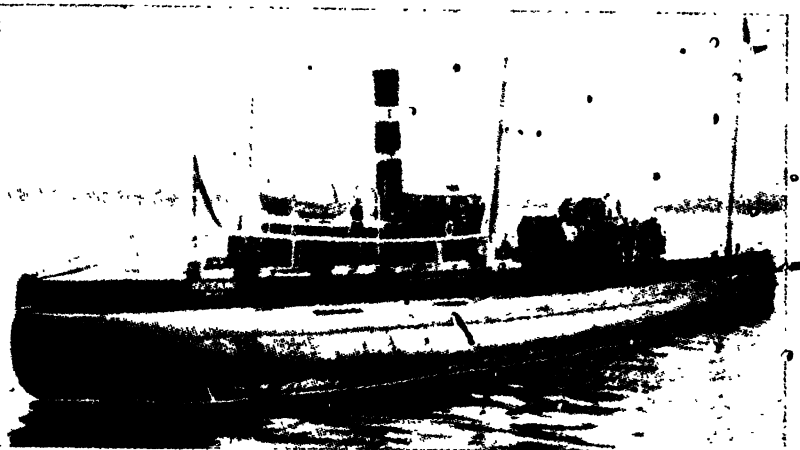
জার্ম্মানীর প্রথম বাণিজ্য ডুব-জাহাজ ডয়েট্‌শল্যাণ্ড ও তাহার ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত কনিগ।

হইবে না। এবং ইহা হইতে এই প্রমাণ হইয়া গেল যে যুদ্ধের সময় আর কাহাকেও কোনো দ্রব্যের অভাব ভোগ করিতে হইবে না।

আমেরিকার ইভনিং পোষ্ট খবরের কাগজে একজন জার্ম্মান ডুব-জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁহার ডায়ারী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে ডুব-জাহাজ জলের তলে ডুবিয়া চলিলেও তাহাকে কত রকম বিপদ এড়াইয়া চলিতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন—

কয়লার খাদে নামিবার সময় ঝোলা (Lift বা Elevator) যখন নামিতে শুরু করে তখন চড়নদারদের মনে কি-রকম একটা নিরাশ্রয় হতাশার ভাব আসে তাহা অনেকেরই জানা আছে। ডুব-জাহাজ যখন ডুবিতে থাকে তখনও চড়নদারদের মনে ঠিক সেইরূপ নিরাশ্রয় হতাশার ভাব জাগিয়া উঠে। আমাদের ডুব-জাহাজ ডুবিয়া চলিতেছিল এবং জাহাজের দৃষ্টি-নলে সীসার রঙের আকাশ ও সাগর ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। হঠাৎ আমার সর্ব্বশরীরে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় ঝিন্‌ঝিনি খেলিয়া গেল—দৃষ্টি-নলে একটা কিসের কালো ছায়া পড়িয়াছে। শুধু ছায়া, শুধু একটা কালো দাগ। ক্রমে তাহা আকার ধরিয়া হইল একটা জাহাজের গলুই; ক্রমে তাহার উপর কোয়াশার মধ্য হইতে গাছের গুঁড়ির ন্যায় একটা দুটা তিনটা চারটা ধোঁয়ার নল ফুটিয়া বাহির হইল। ওটা জাহাজমার! ডুব, দে ডুব! ভয়ের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভর, ভর, জাহাজের চৌবাচ্চায় জল ভর। প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় ছটফট্‌ করিতে-করিতে হাতে ঘড়ি লইয়া শুনিতে লাগিলাম জীবন-মৃত্যুর মধ্যেকার মুহূর্ত্তগুলি টিকটিক করিয়া খসিয়া চলিতেছে এবং জাহাজের চৌবাচ্চায় কলকল করিয়া জল ঢুকিয়া মৃত্যুকে দূরে সরাইবার চেষ্টা করিতেছে। জাহাজ-মার মাত্র ২০০০ গজ দূরে ছিল; ৪০০০০ ঘোড়ার জোরের কল পুরা দমে চালাইয়া আমাদের উপর আসিয়া পড়িল বলিয়া। তাহার গলুয়ের কামানগুলিরও বিরাম ছিল না। জীবনের দীর্ঘতম মুহূর্ত্ত!

জয় ভগবানের, জাহাজের চৌবাচ্চায় জল ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার ভারে জাহাজ তলাইয়া গেল, কিন্তু এত অল্পই তলাইল যে তখনও সেই রাক্ষসটার ছায়া আমাদের ঠিক মাথার উপর দিয়া সরিয়া যাইতেছে দৃষ্টি-নলের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইলাম। লোহার উপরে হাতুড়ির ঘায়ের মতন আমাদের চারিধারে শেল ফাটিতেছিল কিন্তু আমরা ঠিক মুহূর্ত্তে তলাইয়া গিয়া বাঁচিয়া গিয়াছি। জাহাজে বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠিল। মিটারে ডুবের মাপ হইতেছিল—দেখিতে দেখিতে ১৪ গজ! যাক্‌, বাঁচা গেল! সমুদ্রের তলে ডুবিয়া গিয়া এমন আরাম অনুভব করাতে একটু কৌতুক আছে বটে! মিটারে দেখিতে দেখিতে আমাদের ডুব ২৬ গজে দাঁড়াইল—আমি ৩০ গজ পর্য্যন্ত ডুবিতে হুকুম দিয়াছি। তখনও শুনিতে পাইতেছিলাম আমাদের মাথায় সমুদ্রের ছাদের উপর ফরাশি জাহাজটার গোঁয়ার কামানগুলা রাগে গর্জ্জন করিয়া আগুন ছড়াইতেছে।

হঠাৎ কিসে ধাক্কা লাগিল, আমরা জাহাজের চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িলাম। চোট সামলাইয়া উঠিয়া দেখিলাম সমস্ত জাহাজের আলো নিভিয়া গিয়াছে এবং ভড়কানো ঘোড়ার মতন জাহাজখানা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। আলো জ্বালিতে বলিলাম—সুইচ পুড়িয়া গিয়াছে। তখন ভাণ্ডার-বাটারী হইতে আলো জ্বাল হইল। একটু সামলাইয়া উঠিয়া বুঝিতে পারিলাম একটা মাইনের সহিত আমাদের ধাক্কা লাগিয়াছিল এবং মাইন ফাটিয়াও গিয়াছে—ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি। কিন্তু দেখা গেল জাহাজখানা মাথা নীচের দিকে ও লেজ উপর দিকে করিয়া স্থির হইয়া আছে, কিছুতেই হালের বাগ মানিতেছে না। আমরা ফাঁদে ব জালে আটক পড়িয়াছি! উপরে ভাসিয়া উঠিবারও উপায় নাই, সেখানে মাইনের মালা আমাদের জন্য বরণডালা সাজাইয়া আছে। আমি হুকুম দিলাম জাহাজের গায়ের সকল জোর লাগাইয়া ডুব মারিতে। এঞ্জিন ভনভন করিয়া উঠিল এবং জাহাজ জালের মধ্যে ঝটাপটি খাইতে লাগিল।—হঠাৎ জাহাজের গতি সরল হইয়া গেল জাহাজ লোহার জাল ফুঁড়িয়া ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। সেই টানাটানিতে আমাদের মাথার উপর দুর্দ্দাম শব্দে মাইন ফাটিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া আমাদের বন্ধু শত্রুরা একখানা জাহাজ ঘায়েল হইয়াছে ভাবিয়া নিশ্চয়ই খুব আনন্দ করিতেছিল এবং দেশবিদেশে খুব বড়াই করিয়া বিনা-তারের খবর ছড়াইতেছিল। বেচারাদের কোনো দোষ নাই, অত গভীর জলে না থাকিয়া আর একটু উপরে থাকিলেই আমাদিগকে বাস্তবিক ঘায়েল হইতেই হইত।

একটু দূরে গিয়াই আমাদিগকে আবার ভাসিয়া উপরে উঠিতে হইল, কারণ জলের তলে ডুবিয়া থাকিবার মতন সম্বল এই ঝটাপটিতে ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ফাঁড়ার উপরে ফাঁড়া! দেখি একখানা জাহাজ আমা-

দিগকে তাড়া করিয়া আসিতেছে। মাত্র ২০০ গজের ব্যবধান! তাহাও ক্রমশঃ প্রাণের মধ্যে অস্বস্তি ঘটাইয়া কমিয়া আসিতে লাগিল এবং তাহাতে চল্‌তি প্রবাদ সত্য করিয়া আমাদের মাথার চুল পর্যন্ত সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হইয়া উঠিতে লাগিল। আমি হুকুম দিলাম বন্দুক পিস্তল যা আছে সব লইয়া গুলি চালাও। হুকুমের সঙ্গে-সঙ্গে তামিল আওয়াজ চলিতে লাগিল। জাহাজখানা আমাদের গায়ে ঢু মারিবার জন্ম শিঙের স্থায় গোলুই পাতিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মাত্র ২০ গজ দূরে! ১৫ গজ! আর নিস্তার নাই। যে জোরে আসিতেছে এক ঢুঁয়েই তলাইয়া যাইব। সেই ঢুঁয়ের সম্ভাবনা আমার প্রাণের ভিতরে ছোরার খোঁচার মতন বিঁধিতেছিল। বন্দুক-পিস্তলের গুলিতে জাহাজের তলা ফাঁসাইবার বৃথা চেষ্টা! হঠাৎ একটা মতলব মাথায় আসিল, আমার একজন সঙ্গী বলিয়া উঠিল শত্রু-জাহাজের হাল ধরিয়া আছে যে তাহাকে তাগ করিয়া সকলে একসঙ্গে বন্দুক ছোড়ো। বলার সঙ্গেই করা। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গেই একটা চীৎকার শোনা গেল, আর অমনি সেই ইংরেজ কর্ণধার হাত তুলিয়া হালের চাকার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। ছাড়া পাওয়াতে আলগা চাকা ঘুরিয়া যাইতেই জাহাজও ঘুরিয়া গেল, কিন্তু তাহার শিঙের গুঁতার ঈষৎ স্পর্শ আমাদের জাহাজের গায়ে একটা টোল খাওয়াইয়া তাহার স্মৃতি রাখিয়া গেল।

* *
*

টোটা দাগিয়া কলের ধোঁয়ার চিমনি সাফ্—

কলের যেসব লম্বা-লম্বা চিমনীর ভিতর দিয়া ধোঁয়া বাহির হয় তাহার ভিতর ভুষা পড়িয়া ঝুল জমিয়া ছিদ্র ক্রমশঃ বুজিয়া আসে এবং তখন তাহার ভিতর দিয়া ভালো করিয়া ধোঁয়া বাহির হয় না, কারখানা-ঘরে ধোঁয়া হয়। সেজন্য মাঝে মাঝে চিমনী পরিষ্কার করা দরকার। মেঘের কাছবরাবর উঁচু চিমনী সাফ্ করা সহজসাধ্য নয়;
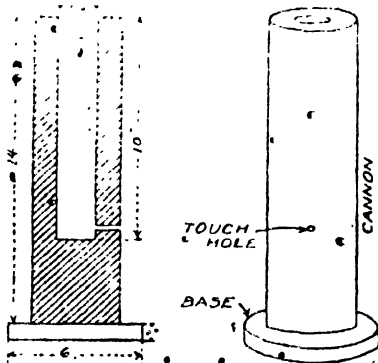
কলের চিমনি সাফ করিবার টোটা।

যে-সব লোক চিমনীর সুড়ঙ্গ দিয়া সাফ্ করিতে উঠে বা নামে তাহারা অনেক সময় বিপদে পড়ে, কালি ঝুল মাখিয়া তাহাদের চেহারা ত ভূতের মতন হইয়াই যায় এবং ভুষা নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গিয়া নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন করে। আমেরিকার একজন লোক, শ্রীযুক্ত রাসেল, বারুদ-ভরা বড় টোটা আওয়াজ করিয়া আওয়াজের চোটে বাতাসের ধাক্কায় চিমনী সাফ্ করিবার এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ১০০শ ফুট উঁচু ৪ ফুট বেড়ের চিমনীর পক্ষে এই টোটা ১৪ হইতে ১৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি বেড়ের হইলেই যথেষ্ট। এই টোটার মধ্যে উপর হইতে ১০ ইঞ্চি গভীর ও পৌনে-দু-ইঞ্চি বেড়ের একটা খোল থাকিবে, সেই খোলের তলার কাছে টোটার বাহির হইতে খোল পর্যন্ত সিকি ইঞ্চি বেড়ের একটা রঞ্জক-ঘর ছিদ্র থাকিবে, এই টোটা ৬ ইঞ্চি বেড়ের একটা চাকির উপর বসানো থাকিবে যাহাতে ইহা খাড়া হইয়া মাটির উপর দাঁড়াইতে পারে। এই টোটার খোলের-মধ্যে মুখ হইতে ২ ইঞ্চি নীচে পর্যন্ত বারুদ ভরিতে হইবে এবং তাহার উপরকার খালি ২ ইঞ্চি খোল আঁট কাদা দিয়া ভরিয়া টোটার মুখ আঁটিয়া দিতে হইবে। রঞ্জক-ঘরে একটা বারুদ-মাখা পলিতা ঢুকাইয়া টোটার খোলের বারুদের সহিত যোগ করিতে হইবে। এই টোটা চিমনীর মধ্যে উঁচুমুখে খাড়া করিয়া রাখিয়া রঞ্জক-ঘরের পলিতায় আগুন লাগাইয়া দিলে টোটার ভিতরকার বারুদ হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া টোটার মুখের কাদার চাপ ঠেলিয়া আওয়াজ করিয়া উঠিবে। সেই আওয়াজে চিমনীর ভিতরকার বাতাসে যে ধাক্কা লাগিবে তাহারই চোটে চিমনীর গায়ের সমস্ত ভুষা, কালি, ঝুল নীচে ঝরিয়া পড়িবে। চিমনীতে বেশী ভুষা জমিয়া থাকিলে একবারের আওয়াজে সমস্ত সাফ্ না হইলে একাধিকবার টোটা আওয়াজ করা দরকার এবং চিমনীর উচ্চতার অনুপাতে টোটারও বড়-ছোট হওয়া আবশ্যক।

* *
*

গল্পলেখা কল—

আজকাল মাসিক পত্রের যুগ। মাসিক পত্র গল্প নহিলে চলে না। গল্পের সুলেখক কম, প্লটের অভাব ততোধিক। আমেরিকার এক ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত ব্ল্যাকার্ড গল্প লেখার এক কল আবিষ্কার করিয়া এই বিষম সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ছাত্রদিগকে গল্প লিখিতে শিখাইবার শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ছাত্রেরা তাঁহার কল ব্যবহার করিয়া ঝুড়ি-ঝুড়ি গল্প অল্প সময়ের মধ্যে অনায়াসে রচনা করিতে পারিতেছে।

এই কলটি একটি ছোট পেষ্টবোর্ডের বাক্স, ৬ ইঞ্চি খাড়া, ৩ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি পুরু, একটা আলমারীর মতন। সামনের দিকের পেষ্টবোর্ডের গায়ে উপর হইতে নীচে পর্যন্ত অল্প অন্তরে অন্তরে ছয়টি জানলা কাটা আছে; সেই জানলার পিছনে আলমারীর মধ্যে রুটি-বেলা বেলনের মতন বারটি কাঠের ডাণ্ডা লাগানো আছে, তাহাদের দুই ধার খানিকটা করিয়া আলমারীর বাহিরে থাকে এবং তাহা ধরিয়া পাক দিয়া সেই বেলনগুলিকে আলমারীর মধ্যে ঘুরানো যায়। কাগজের ছয়টি লম্বা ফিতার গায়ে ডুশো ডুশো করিয়া ১২০০শ শব্দ একটার নীচে একটা সারবন্দি ছাপা আছে; সেই ছাপা কাগজের এক-একটি ফিতা এক-এক জোড়া বেলনের গায়ে এমন করিয়া জড়ানো আছে যে বেলনগুলি আঙুল দিয়া পাক দিয়া ঘুরাইলে ছাপা শব্দগুলি একে একে পর পর কাটা জানলার সামনে বাহির হইতে থাকে এবং মানে হয় এমন ভাবে ছয়টি জানলায় ছয়টি শব্দ বাহির করিয়া ছয় কথার একটি প্লটের সঙ্কেত লেখক সহজেই পাইতে পারেন।

মনে করুন প্রথম জানলায় শব্দ বাহির হইল—

সুন্দরী

সুন্দরীকে দেখিয়া না থামিবেন এমন গল্প-লেখক খুব কম আছেন। অতএব সুন্দরীকে প্রথম জানলায় দাঁড় করাইয়া দ্বিতীয় জানলার

গল্প-লেখা কলের আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত আর্থার ব্ল্যাকার্ড।

লেখককে সুন্দরীর উপযুক্ত শব্দের সন্ধানে আসিতে হইবে। কুকুর বিড়াল, রাস্তা ঘাট, ট্রেন ষ্টিমার প্রভৃতি সুন্দরী হইতে পারে না, সুন্দরীর যোগ্যও হইতে পারে না বলিয়া বেলন ঘুরাইতে ঘুরাইতে যখন শব্দ বাহির হইল—

বিধবা

তখন লেখকের মগজে প্লট অনেকখানি ঘনাইয়া উঠিবে নিশ্চয়। তখন তিনি তৃতীয় জানলা হাতড়াইয়া যদি দেখিতে পান

বিবাহ

তখন সে শব্দ ছাড়িয়া তিনি আর দোসরা শব্দের সন্ধান করিবেন না ইহাও স্থির। চতুর্থ জানলায় যদি শব্দ বাহির হয়

পিতা

পঞ্চম জানলায় বাহির হয়

আপত্তি

এবং ষষ্ঠ জানলায় যদি বাহির হয়

ত্যাগ

তাহা হইলে এই ছয়টি কথা হইতে যে-কোন বুদ্ধিমান লেখক রবীন্দ্রনাথের "ত্যাগ" নামক গল্পের অনুরূপ একটি চিত্তাকর্ষক গল্প খুব সহজেই গড়িয়া তুলিতে পারেন।

এই কলের সাহায্যে আমেরিকায় মিনিটে মিনিটে গল্প, উপন্যাস, নাটক ও বায়স্কোপে দেখাইবার দৃশ্যাবলীর প্লট প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের বাংলা দেশেও কোনো উদ্যোগী লোক এই সহজসাধ্য কলটি নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করুন না; ইহা হইতে এক সঙ্গে তাঁহার, লেখকের ও মাসিক পত্রের খোরাক জুটিতে পারে।

চারু।
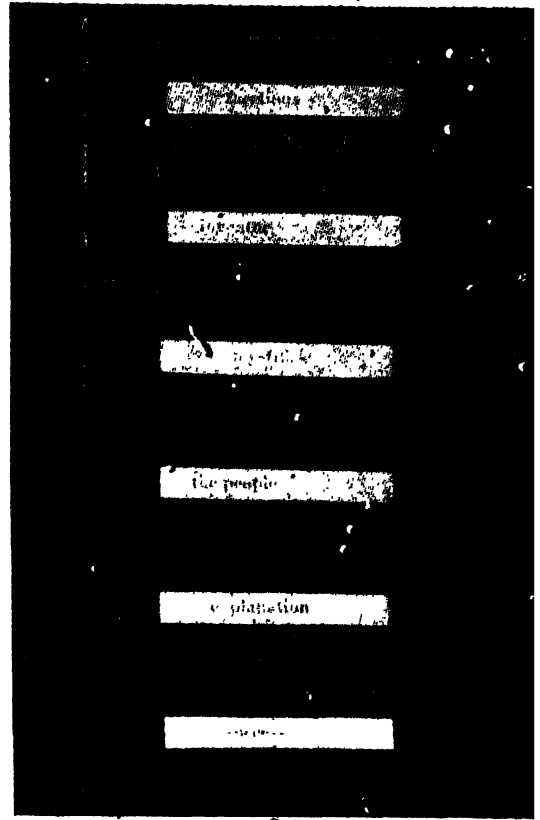
গল্প-লেখা কল।

চীনে দুনিয়া-পূজা

চীনা ইস্‌লামের পরিচয় পাইলাম। কন্‌ফিউসিয়াস এবং দালাই-লামার প্রভাবও দেখিয়াছি। চীনাসমাজে অন্যান্য ধর্ম্মপদ্ধতিও প্রচলিত আছে। আজ পিকিঙের Temple of Heaven, Altar of Agriculture ইত্যাদি দেখিতে যাইয়া তাহার সন্ধান পাইলাম।

টেম্পল্ অব হেভন্ শব্দে "স্বর্গ-মন্দির" বুঝায়। কিন্তু ইহার চতুঃসীমায় স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, নরক, পরকাল, ইহকাল, ইত্যাদির কোন চিহ্ন নাই। পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ইত্যাদির নামগন্ধও এই স্বর্গ-মন্দিরের পূজাপার্ব্বণে পাওয়া যায় না। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইল ইহাকে প্রকৃতি-পূজা বা বিশ্ব-পূজা বা জগৎ-পূজার মন্দির বিবেচনা করা যাইতে পারে। সমগ্র দুনিয়াকে হেভন্ বলা হইয়াছে।
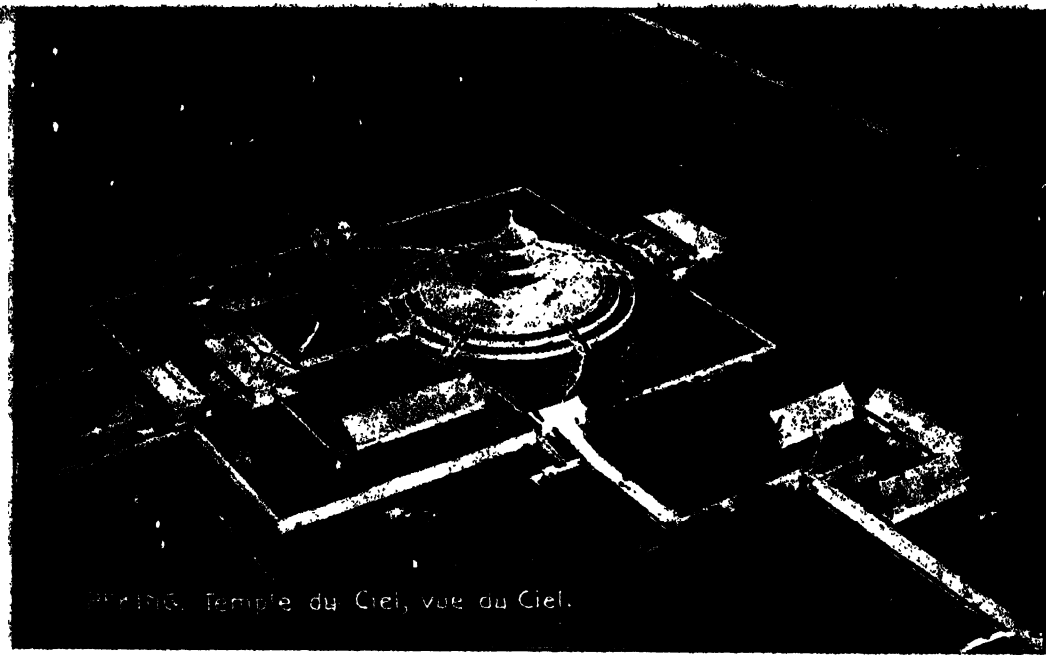
চীনের বিশ্বমন্দির, আকাশ-যান হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ।
মধ্যস্থলে ধানের মরাইএর মতন প্রধান মন্দির, তাহার চারিধারে তিন স্তবকে তিনটি বেদী ও সোপানাবলী।
এই মন্দিরের সম্মুখের ছবি প্রবাসীতে পূর্ব্বে একাধিক বার বাহির হইয়াছে।

মুখ্যভাবে কনফিউশিয়াস অথবা বুদ্ধ কাহারও প্রভাব এই দুনিয়া-পূজায় বিন্দুমাত্র নাই। গ্রহতারা, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, ধরিত্রী, দিবা রাত্রি, ইত্যাদির আরাধনা এই পূজার অনুষ্ঠান। যাগযজ্ঞ বলিদান ইত্যাদিও মহাসমারোহে হইয়া থাকে। এই পূজায় জনসাধারণের কোন অধিকার নাই। সম্রাট্ স্বয়ং ইহার পূজারি ও ভক্ত। সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য তিনি এইখানে দুনিয়ার পূজা করিয়া থাকেন। চীনে রিপাব্লিক স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সম্রাটগণ প্রতিবৎসর যথাসময়ে পূজা করিতে আসিতেন। পঞ্জিকা-অনুসারে পূজার তিথি নির্দ্ধারিত হয়।

অতি প্রশস্ত [illegible] উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার ভিতরে উদ্যান এবং প্রাচীরবেষ্টিত মন্দির ও বেদিসমূহ। [illegible] ঘুরিয়া দেখি পিকিঙের অন্যত্র যেমন, এখানেও সকল [illegible] জঙ্গল আগাছা পরগাছা ইত্যাদির প্রকোপ। সমগ্র চীনদেশটাই যেন সংস্কারের অভাবে পচিয়া যাইতেছে। পিকিঙ, মুকডেন এই দুই সহরে কেবল ধ্বংসোন্মুখ গলিত-প্রায় অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাইতেছি। প্রাচীনের সকল ঠাটই বজায় আছে—প্রবল ভূমিকম্পে কোন নগরের ধ্বংস সাধিত হইলে তাহার যেরূপ দৃশ্য হয় মুকডেন-পিকিঙে তাহা দেখি না। এই দুই সহরে পুরাতন সবই রক্ষিত হইতেছে অথচ সর্ব্ব-অঙ্গে ঘা। একখানা কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথির স্বরূপ চীনা সমাজ দর্শকগণের কৌতূহল আকর্ষণ করে মাত্র—পুঁথির আকৃতি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, পত্রের সংখ্যাও গণনা করিতেছি, অথচ লিপিগুলি সবই বিলুপ্তপ্রায়, ইহার পাঠোদ্ধার অসম্ভব।

যাহা হউক বনজঙ্গল ঠেলিতে-ঠেলিতে পিকিঙের এই রাজকীয় মন্দিরের সৌধসমূহের সমীপবর্ত্তী হইলাম। ভাবিতেছি এইগুলি যখন প্রথম নির্ম্মিত হয় তখন ইহাদের পশ্চাতে জনগণের কত উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল। সেই জীবনের গৌরব আজও এই জীর্ণশীর্ণ বিরাট অট্টালিকা-সমূহের সম্মুখে দাঁড়াইলে অনুমান করিতে পারি। চীন-সাম্রাজ্যের উপযুক্ত বিশ্ব-পূজার আয়োজন সন্দেহ নাই।

মিঙ সম্রাটগণের আমলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই মন্দির প্রথম স্থাপিত হয়। তাহার পর সময়ে সময়ে সংস্কার

সাধিত হইয়াছে। বৎসরে তিনবার করিয়া পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

একটা গৃহে সম্রাট উপবাস করিয়া রাত্রি যাপন করেন। একটা গৃহে রন্ধনাদি হয়। কোথাও পশু দগ্ধ হইয়া থাকে। কয়েকটা সৌধে প্রাচীন সম্রাটগণের স্মৃতিফলক রহিয়াছে। পিতৃপূজার স্থানও এই রাজকীয় পূজায় আছে। কন্‌ফিউ-শিয়ানদিগের প্রভাব খানিকটা দেখা যায়।

স্বর্গ-মন্দিরের বাস্তুশিল্পে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় সুনীল এনামেল-টালি। পিকিঙের অন্যান্য সৌধে, প্রাসাদে ও মন্দিরে গাঢ় পীতবর্ণের (glazed tile) চকচকে মসৃণ টালি দেখিয়াছি। বোধ হয় এই তুনিয়া-পূজার মন্দির ছাড়া চীনারা নীলবর্ণ টালির ব্যবহার অন্য কোথাও করে নাই। কেবল মাত্র ছাদের জন্যই এই বর্ণের প্রয়োগ হইয়াছে এরূপ নয়। গৃহসমূহের ভিতর চিত্রাঙ্কন, অলঙ্কারবিন্যাস ইত্যাদিতেও নীলবর্ণের প্রাচুর্য্যই লক্ষ্য করিতেছি। মোটের উপর একটা নীলিমার আবেষ্টনে রহিয়াছি।

দোভাষী বলিলেন—"আকাশের রঙের সঙ্গে মিলাইবার জন্য স্বর্গ-মন্দিরে নীল টালির অত্যধিক ব্যবহার করা হইয়াছে।"

প্রথমেই গোলাকার মন্দিরসদৃশ সৌধ দেখিলাম। ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত। ছাদ ত্রিতল—শীর্ষদেশে সোনালি বর্ণের আবরণ। একটি উচ্চ ও প্রশস্ত মঞ্চের উপর মন্দির স্থাপিত। এই মঞ্চে উঠিতে তিন ধাপ পার হইতে হয়। সমস্তটা মর্ম্মরের প্রস্তুত। পিকিঙের বহুদূর হইতে এই গোল মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরে সম্রাট্ জলবৃষ্টি এবং প্রচুর শস্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। চীনা বৎসরের প্রথম দিবস এই অনুষ্ঠান হয়।

মিঙ্ ও মাঞ্চু সম্রাটগণের স্মৃতিফলক দুই সৌধে রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এই তুনিয়া-পূজার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যসমূহ স্বর্গ-বেদিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গোলমন্দির হইতে ছাদহীন গোলাকার Altar of Heaven বা স্বর্গ-বেদিতে আসিলাম। এই বেদি তিন ধাপে বিভক্ত, আগাগোড়া মর্ম্মরে নির্ম্মিত। সর্ব্বনিম্নে ইহার বিস্তার ২১০ ফুট, দ্বিতীয় স্তরের বিস্তার ১৫০ ফুট এবং সর্ব্বোচ্চমঞ্চের বিস্তার ৯০ ফুট। প্রত্যেক ধাপ উঠিতে নয়টা করিয়া সিঁড়ি পার হইতে হয়।

সাতাইশটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিলাম। ইহার কেন্দ্রস্থলে একখানা গোলাকার মর্ম্মরপ্রস্তর। এই প্রস্তরের চারিদিকে গোলাকার প্রকোষ্ঠ। এইরূপ নয়টা প্রকোষ্ঠে উচ্চতম স্তর বিভক্ত। প্রথম কোষ্ঠ নয়টা মর্ম্মর-খণ্ডে গঠিত, পরবর্ত্তী কোষ্ঠ ১৮টা মর্ম্মরখণ্ডে গঠিত, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে নবম কোষ্ঠ ৮১টা মর্ম্মরখণ্ডে গঠিত। চীনাদের বিবেচনায় ৮১ সংখ্যা শুভসূচক। বেদির সর্ব্বনিম্ন ধাপে ১৮০টা ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে, দ্বিতীয় ধাপে ১০৮টা স্তম্ভ আছে, সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে ৭২টা স্তম্ভ আছে; এইরূপে সমগ্র বেদিতে ৩৬০টা ক্ষুদ্র স্তম্ভ দণ্ডায়মান। চীনা গণনায় বৎসরে ৩৬০ দিবস।

বেদিতে কোন ছাদ নাই, পূজার সময়ে পীতবর্ণ সাটিনের তাঁবু খাটান হইয়া থাকে। সম্রাট্ কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করেন। চীনসম্রাটকে Son of Heaven বা বিশ্ব-পুত্র বলা হইয়া থাকে। পূজার দিন তিনি বিশ্বের প্রকৃতি-স্বরূপ এই গোলাকার বেদির মধ্যকেন্দ্রে থাকিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনা করেন। এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্মর কোষ্ঠের শিলাখণ্ডের উপর চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির প্রতিনিধিস্বরূপ স্মৃতিফলকগুলি রক্ষিত হয়। বিশ্ব-পুত্র বিশ্ব-পূজার জন্য সমগ্রবিশ্বকে এইরূপে নিজের সম্মুখীন করিয়া লন। বিশ্ব-মন্দিরের কল্পনায় চীনাদের কবিত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতি-পূজার অন্তর্নিহিত দার্শনিকতাও পরিস্ফুট। জগতের নানা শক্তিকে একস্থানে সমবেত করিয়া বিশ্বপুত্র তুনিয়ার ঐক্যকে অর্থাৎ বিশ্বপতিকে অঞ্জলি প্রদান করিতেন। বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য উপলব্ধি করিবার এই প্রণালী উপেক্ষণীয় নয়। বহুর মধ্যে যে বিরাট-পুরুষ বিরাজ করিতেছেন এই উপায়েই তাঁহার সন্ধান সাধারণ্যে প্রচার করা হইত। এই হিসাবে পিকিঙের এই রাজকীয় বিশ্ব-মন্দির চীনাসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। বৎসরের আরম্ভে সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনা, বৎসরান্তে সাম্রাজ্যের হিসাবপ্রদান এবং পূর্ব্বপুরুষগণের আরাধনা—এই তিন উদ্দেশ্যে সম্রাটগণ তিনবার করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের

অনীশ্বরের শরণাপন্ন হইতেন। বেদান্ত বল, Pantheism বল,—ব্রহ্ম বল, একেশ্বরবাদ বল সবই এই চীনা প্রকৃতি-পূজায় বিদ্যমান। আবার শক্তিপূজা, বহুপূজা, বৈচিত্র্যপূজা, চন্দ্রপূজা, গ্রহপূজা সবই এইখানে মজুত রহিয়াছে।

প্রাসাদ হইতে সম্রাট্ যখন বিশ্ব-পূজার মন্দিরে আসিতেন সেই সময়ে পিকিঙে সহর ভরিয়া মহাসমারোহ হইত। বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইত। মন্ত্রী, ম্যাণ্ডারিন, রাজা-রাজড়া, আমীরওমরাও ইত্যাদি কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ পাল্কীতে, কেহ পদব্রজে সম্রাটের সঙ্গী হইতেন। এদিকে গানবাজনার ধুম চলিত। সম্রাটের পক্ষে এই পূজা নিতান্ত সুখের সামগ্রী ছিল না। কারণ তাঁহাকে দুই তিন দিন ধরিয়া অনাহারে থাকিতে হইত—এবং উপাসনা প্রার্থনা ধ্যান আরাধনা ইত্যাদিতে সময় কাটাইতে হইত।

বিশ্ব-মন্দির দেখিয়া কৃষিবেদি দেখিতে অগ্রসর হইলাম। প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন সম্রাট চীনদেশে কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া চীনসমাজে সংস্কার প্রচলিত আছে। সেই কৃষক সম্রাটের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই বেদি নির্ম্মিত। মিঙ্ সম্রাটগণের আমলে ইহা প্রস্তুত করা হয়। সম্রাটগণ সেই পূর্ব্বপুরুষের পূজা করিয়া থাকেন এবং বৎসরে একবার করিয়া এইখানে ভূমিকর্ষণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

চীনারা নদী এবং পর্ব্বতও পূজা করিয়া থাকে। চীনদেশে পাঁচটা পবিত্র পর্ব্বত এবং চারিটা পবিত্র নদী আছে। কৃষি-মন্দিরের ভিতর পর্ব্বত-বেদী (altar of mountains) এবং নদী-বেদী (altar of rivers) দেখা যায়। ভারতবাসীর পক্ষে পর্ব্বতপূজা, নদীপূজা ইত্যাদি বুঝা অতি সহজ। বস্তুতঃ চীনা বিশ্ব-পূজার কোন তত্ত্বই আমাদের অপরিচিত নয়।

পিকিঙ নগরে অসংখ্য দেওয়াল এবং পরিখা—কাজেই বিশ্ব-পূজক চীনারা প্রাচীর পরিখাদির দেবতাও কল্পনা করিয়াছে। এই দেবতারও পূজা হইয়া থাকে। কৃষি-মন্দিরের ভিতর এই বিগ্রহ দেখা যায়। চীনাহৃদয়ে এবং হিন্দুহৃদয়ে যথেষ্ট সাম্য আছে।

এই-সকল ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দুইজাতির ভিতর আদানপ্রদানের ফলে কতটা উৎপন্ন হইয়াছে সম্প্রতি তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। চীনারা এই-সকল পূজাপাঠ বৌদ্ধ নিয়মে করে কি কন্‌ফিউশিয়াসের দোহাই দিয়া করে তাহাও সম্প্রতি অনুসন্ধান না করিলাম। এই পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে চীনা জনসাধারণ এবং ভারতীয় জনসাধারণ দুনিয়াকে অনেকটা এক চোখেই দেখিয়া আসিতেছে।

কৃষি-মন্দিরে যাইয়া দেখি এখানে এক প্রদর্শনীর উদ্যোগ হইতেছে। জাপানী দ্রব্য বয়কটের ফলে চীনারা স্বদেশী শিল্পের উন্নতিবিধানে মনোযোগী হইয়াছে। তাহারই এক পরিচয় এখানে পাওয়া গেল। রাস্তায় কয়েকটা অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে নাচগান চলিতেছে। লোকজনের ভিড় মন্দ নয়—পাকৌড়ি তরমুজ ইত্যাদির দোকানও বসিয়া গিয়াছে।

নগর হইতে বহুদূরে পল্লীর ভিতর আসিয়া পড়িলাম। এইখানে দুইটা প্যাগোডা দেখা গেল। একটার সম্মুখে আসিলাম। ইহা ষষ্ঠশতাব্দীর বৌদ্ধস্তূপ। তেরটা ছাদ আছে—আকৃতি অষ্টকোণ। ইহার গাত্রে নানা মুদ্রা-সমন্বিত বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত। সহস্রহস্তবিশিষ্ট সহস্রাক্ষ দেবতার মূর্ত্তিও দেখিলাম। বহুসংখ্যক প্রহরীদেবও আছে। সমস্তটা গিরিমাটির বর্ণে রঞ্জিত—বলাবাহুল্য সংস্কারাভাব। প্যাগোডা মৃত্তিকার ইষ্টকে গঠিত। এই ধরণের প্যাগোডা নূতন দেখিলাম।

বৌদ্ধ প্যাগোডা হইতে অল্প দূরে তাওয়িষ্ট ধর্ম্মীদিগের প্রধান মন্দির। কনফিউশিয়াস যখন চীনে তাঁহার মত প্রচার করিতেছিলেন লেওট্জে (Laotze) তখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বরূপে নূতন এক ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। ভারতবর্ষেও ইহাদের সমসাময়িক দুইজন ধর্ম্মপ্রচারক আবির্ভূত হন—বুদ্ধ ও মহাবীর। বৌদ্ধ, জৈন, কন্‌ফিউ-শিয়ান এবং তাওয়িষ্ট—এই চারি মতবাদ প্রায় এক সময়ে জগতে দেখা দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে জৈন এবং তাওয়িষ্ট বেশী প্রতিপত্তি লাভ করে নাই। অন্য দুইটিই জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যেমন বৌদ্ধ ও জৈনের মন্দির মূর্ত্তি মতবাদ ইত্যাদিতে প্রভেদ বুঝিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য আবশ্যক, চীনেও সেইরূপ কনফিউশিয়ান ও তাওয়িষ্ট সম্প্রদায়দ্বয়ের পার্থক্য

বুঝা সহজ নয়। কালে বহু বৌদ্ধ ও কন্‌ফিউশিয়ান অনুষ্ঠান লেওট্‌জের ধর্ম্মে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

মন্দিরের ভিতর ৩০০ পুরোহিতের বাস। ইহারা অবিবাহিত। মন্দিরের জমিজমা বেশ আছে। দোভাষী বলিলেন—"মাঞ্চু সম্রাটগণ তাওয়িষ্টদিগের জন্য বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া রাখিয়াছেন।"

পুরোহিতেরা চুলের ঝুঁটি মাথার উপরে বাঁধিয়া রাখে। ইহাদের টিকি নাই—মাথার সম্মুখ ভাগ কামানও ইহাদের অভ্যাস নয়। উড়িয়া অথবা সরযূপারীণ ব্রাহ্মণগণের চেহারা দেখিতেছি না। চীনের তাওয়িষ্ট পুরোহিতদিগকে শিখসম্প্রদায়ের গুরুগণের অনুরূপ বোধ হইল।

মন্দিরের মধ্যে কাষ্ঠমূর্ত্তি অনেকগুলি দেখিলাম—বিশেষ কিছু বুঝা গেল না। ধূপদান, বাতিদান ইত্যাদি রহিয়াছে। কাষ্ঠফলকে দেবতার নামও লেখা আছে।

মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে অনেকগুলি সৌধ, বাগান ইত্যাদি দেখা গেল। একটা সুন্দর ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চও আছে। প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বস্থিত বারান্দায় শ্রোতৃমণ্ডলীর বসিবার আসন প্রদত্ত হয়। মঞ্চের সম্মুখে একটা গৃহ—ইহাতে পাঠচর্চ্চার বন্দোবস্ত আছে।

কোন মতবাদ যখন প্রথম প্রচারিত হয় তাহার রূপ তখন যেমন থাকে পরবর্ত্তীকালে তেমন থাকে না। সমাজের নানা ঘটনায় তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতে থাকে। প্রাচীন-মতবাদ মাত্রেরই এই দশা। এই কারণে সুপ্রাচীন চীনাসমাজে যে মন্দিরই দেখি না কেন সকল-গুলির মধ্যেই একটা পরিবারগত সাম্য দেখিতে পাই। বৌদ্ধ, কন্‌ফিউশিয়ান, মুসলমান, তাওয়িষ্ট ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের আচারব্যবহার, রীতিনীতি, অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি, শোভাযাত্রা ইত্যাদি পরস্পর-প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই তাওয়িষ্ট প্রতিষ্ঠানে আদিগুরু লেওটজের পরিচয় পাইলাম কি না জানি না—চীনের সমাজ বুঝিতে কষ্ট হইল না।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

বোবার ডায়ারী

(গল্প)

১

'ওগো কথা কও—বৌ কথা কও—'

তুমি ত বলছ কথা কও, কিন্তু কি করে কইব? আমি যে একেবারে বৌ! মা-প্রকৃতি আমার বাক্‌যন্ত্রের উপরেও ঘোমটা টেনে দিয়েছেন যে! তবু তুমি বলছ কথা কইতে? আচ্ছা, বেশ, কথাই কইব, কিন্তু কেবল তোমারই সঙ্গে। আর বাক্‌দেবী যখন আমার জিভের উপর এতটা নির্দ্দয়তা করেছেন, তখন তাঁর কলমটার আশ্রয় নিলাম—দেখি সে আমার কথা সব লিখতে পারে কি না। আর এই কলমটা ব্যবহার করবার শক্তি হতে তিনি যখন আমায় বঞ্চিত করেননি তখন সেইটুকু দয়ার জন্য তাঁকে নমো নমঃ।

বাকদেবতাকে নমস্কার!—ওগো আমি কথা বলতে পারি, যেমন করেই হোক পারি,—কিন্তু আমার কথা কইবার ভঙ্গী দেখে লোক হাসে, মুখ ফিরোয়। তাই আমি মুখের কথা বন্ধ করেছি-আমার কথার-দেবতার মুখ ফিরিয়ে দিয়েছি। তিনি বাইরের দিকে কারও সঙ্গে কথা বলেন না—অন্তরের মধ্যে যিনি আছেন কেবল তাঁরই সঙ্গে কথা বলেন। তাই আমিও বাক্যহীন নই—তাই আমিও বাক্‌দেবতাকে প্রণাম করলাম।

আমি বোবা নই—তোতলা, ভয়ানক তোতলা। একটা কথা কইতে গেলে আমার আধঘণ্টা লেগে যায়, আর এমন মুখ বিকৃতি হয় যে তা দেখে অতিবড় গম্ভীর লোকেরও হাসি আপনি ফেটে বেরোয়। তাই বড় লজ্জায় বাল্যকাল থেকেই কথা বন্ধ করেছি।

সে আজ অনেক দিনের কথা—একদিন আর্শির সুমুখে দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ে গেল। সেই হতে আমার কথা বন্ধ। সে কি বিশ্রী দৃশ্য! এতখানি জিভ বেরিয়ে পড়েছে!—অমন যে বালিকার কচি মুখখানি, একেবারে সৃষ্টিছাড়া কদাকার ভাব ধরেছে! সুন্দর বস্তু কুৎসিত হলে কি এতই কুৎসিত হতে হয়! ওগো সৌন্দর্য্যের দেবতা, তুমি আমায় এত দয়া করেছিলে বলেই কি বাক্‌দেবতা তোমায় বিদ্রূপ করবার জন্য আমায় এমন করেছেন।'

যখন চুপ করে আছি তখন আমার সমস্ত বাহিরটা ত' বেশ কথা বলে। আলোর-জগতে আমার সমস্ত দেহের প্রকাশটা এত সুন্দর, আর শব্দ-জগতে আমি এত কুৎসিত কেন? আর যদিই বা আমায় ভগবান শব্দ-জগতে কুৎসিত করলেন, কিন্তু সেই কুরূপটা আলোকের জগতেও দেখা দিল কেন? কথা বলবার চেষ্টা করলেই আমার সমস্ত স্বরূপ কুরূপে পরিণত হয় কেন? তার চাইতে একেবারে বাক্যহীন স্তব্ধ আকাশের অশোকবনে আমায় বনবাসে পাঠালেন না কেন নারায়ণ?

চতুর্দ্দিকে এত কথা, এত সুর, এত আনন্দের কলস্বর, তার মাঝখানে বসে আমি একেবারে নির্ব্বাক! আমার প্রাণের মাঝখান থেকে কত না সুর ঐ বাইরের ধ্বনির সঙ্গে মিলবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে! অথচ সেই স্বরের সিংহদ্বারে যে বিকটাকার তোতলা দৈত্য বসে আছে তাকে পার হয়ে আমার প্রাণের সেই সুকুমার স্বরগুলি বেরুতে পায় না, ভয়ে পিছিয়ে আসে। একি অভিশাপ!

* * *

'কথা কও—ওগো কথা কও।' ওগো বনের পাখী, তুমিও বলছ কথা কও। আর কথার রাজা মানুষের কুলে জন্মগ্রহণ করে', আমি অষ্টপ্রহর মনকে বুঝুচ্ছি, 'কথা কয়োনা—কথা কইতে চেষ্টাও কোরো না।' ক্রমাগত অন্তরাত্মাকে বলছি, 'থামো ওগো থামো।' কিন্তু সে যে থামতেই চায় না—বাক্যেই যে তার পরম প্রকাশ! সেই প্রকাশ-হারা নিতান্তই একলা মানুষটাকে যে আর সইতে পারছি না। সে অন্ধ নয়, যে, প্রাণের অন্ধকারে অনুপায় হয়ে বসে থাকবে। সে মানসিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত নয়, যে, চুপ করে প্রাণের এক কোণে পড়ে থাকবে। সে যে জড় নয়—সে যে একেবারে চৈতন্য। তার সমস্তটুকুই যে চঞ্চল—তার সবই যে 'প্রকাশময়।' তাকে আটকে রাখিবে কে?

*

ওগো আমারি কালামুখ কলমটি, তোকেই আজ মরণের দ্বারে এসে আশ্রয় করেছি—কারণ আর কথা না কয়ে থাকতে পারছি না। আর চুপ করে থাকলে মরণের পরও শান্তি পাব না। ওগো আমার শুভ্রদেহ কাগজগুলি, তোমাদের শাদা বুকে আমার এই কালো দাগগুলি সযত্নে ধারণ কোরো,—কারণ এ দাগগুলি কালো হলেও যে লিখছে তার বুকখানা চিরদিনই একেবারে রক্তে রাঙা,—সে যে-কথাগুলি লিখছে তা অন্ততঃ তার কাছে লালে লাল। এবং আজ এই পরপারে পা বাড়িয়ে সাহস করে বলতে পারছি যে, যাঁর জন্য লিখছি তিনিও নিশ্চয়ই এগুলিকে রাঙা ফুলের মত আদর করে পায়ে স্থান দিবেন।

* * *

শুনতে পাই গো, শুনতে পাই। বোবা হয়েছি বটে কালা হতে পারিনি। কিন্তু শুনতে পাওয়াও যে দুঃখের হতে পারে তা কি কেউ বুঝবে? যা আঘাত করে তা প্রতিঘাতকেও জাগায়; কিন্তু সেই প্রতিঘাত যদি বেরিয়ে যেতে না পারে তাকে নিজের মধ্যে হজম করা কি—যে কষ্ট তা কি কেউ বুঝবে? যে আঘাত জড়ের উপর কর তা হয় প্রতিঘাতের আকারে ফিরে আসে, না হয় সেই জড়বস্তুকে তাতিয়ে দেয়। আমার মনের উপর এই যে রূপ-রস-শব্দের আঘাত আসছে তার বড় প্রকাশটি তার শব্দের প্রকাশটি আমার নেই। তাই আমার সমস্ত আত্মাটি রাতদিন উত্তপ্ত হয়েই রয়েছে। এই উত্তাপ সারাদিন সইতে হচ্চে অথচ কোনো উপায় নাই। সময় সময় মনে হয় এই বুকের বয়লার হঠাৎ কোনদিন্ ফেটে গিয়ে সমস্ত জমাট কথাগুলা একেবারে জগতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকেও ভেঙে চুরে ফেলবে, অন্যকেও বেদনা দেবে।

* * *

কথা বলব? কিন্তু কবেকার কথা? প্রথম থেকে আরম্ভ করব? কিন্তু এর প্রথম থেকেই যে তোতলার কথা। প্রথম থেকেই যে আমার প্রাণের প্রকাশটা সরুমুখো ঘড়া হতে জল বেরুনোরি মত থম্‌কে থম্‌কে ঝলকে ঝলকে বেরিয়েছে। আমি যে কথায় তোতলা, কাজে তোতলা, জাগরণে তোতলা, ঘুমেও তোতলা। বাল্যকালে, কতদিন, মা যখন ঘুমুচ্ছেন, তখন জেগে বসে হাত পা মাথা নেড়ে কত কথাই না বলেছি। মা ঘুমুতেন, শুনতে পেতেন না

—কেউ শুনতে পেত না—অথচ আমি অনর্গল তুৎলে তুৎলে বকে যেতাম। দিনের বেলায় কেউ আমায় বেশী বকতে দিত না; তাই রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আপন মনে কথার বাঁধ ভেঙেচুরে ফেলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। কেউ শুনত না তাই রক্ষে, নইলে সেই নিস্তব্ধ রাত্রের সমস্ত আকাশটাও বোধহয় বিদ্রুপের হাসিতে ভরে উঠত।

* * *

আমার কৈশোর ও শৈশবের স্মৃতি সমস্তই ভাঙা-ভাঙা। যেন আমার জীবনটাই তুৎলে তুৎলে কথা বলেছে। জাগরণে যখন সংসারের নানান কথায়, আদরে-অনাদরে, আঘাতে-অনাঘাতে আমার বুকে একরাশ কথা জমে উঠত তখন আমি তাদের চাপে অজ্ঞানের মত হয়ে যেতাম—আমার নিজের অস্তিত্ব-বোধটুকুও থাকত না। তাই আমার জাগরণের বোধটাও ছিল ভাঙা-ভাঙা ছাড়া-ছাড়া। আমার ঘুমিয়ে পড়েও রক্ষে নেই,—স্বপনের মধ্যে কথা জমে উঠলে সে অবস্থাতেও মনে হত আমি কথা কইতে পারছি না। অমনি স্বপন কেটে যেত। আমার জীবনটার মধ্যে একটানা একটা স্রোতই যেন নেই।

* * *

কই ভাই, বৌ কথা-কও, আজ কোথায় তুমি? আজ তোমার সাড়া নেই কেন? এরই মধ্যে কি তোমার দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় এল নাকি? তবে কার সঙ্গে কথা কইব? এই শাদা বোকা পাতাগুলোর সঙ্গে? এদের মুখে যতক্ষণ কালী না পড়ে ততক্ষণ যে এরা বোবার চাইতেও নির্বাক—একেবারে মড়ার মত শাদা-মুখ। উড়ে গেছ তুমি? বেশ, তবে এদের সঙ্গেই কথা কইব। শোনো গো তোমরা আমার কলমের মুখেই শোনো। কর্মহীন রোগ-শয্যায় তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে বসলাম। আর কেউ না শোনে তোমরা অম্লান মুখ মলিন করে তুলে শুনে যাও।

আমি গরীব বামুনের মেয়ে—জন্মে' পর্য্যন্ত মা-বাপের বুকের বোঝা। একে ত' বাঙালীর ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মানই মহাপাপের ফল, তার উপর আবার আমি মুখ থাকতে মূক! আমার জন্মনক্ষত্রটা কি জানি না, কিন্তু তার কণ্ঠে ফলং বাক্‌রোধং এটা নিশ্চয়ই প্রথম থেকেই সবাই জানতে পেরেছিল। তাই আমি যতই বড় হতে লাগলাম, ততই আমাকে দেখে এবং আমার কথা শুনে সবারই বাক্‌রোধ হয়ে যেত। এমন সুন্দর মেয়ের এমন দশা!

দশা সে কেমন! একেবারে চরম! যাই কেউ বল্লে, 'মা বাণী আজ কি দিয়ে ভাত খেয়েছ?'—অমনি বাণীর বাণী বন্ধ, চক্ষু কপালে উঠল, ঘাড় বেঁকে গেল,—আর দেড় হাত জিভ বেরিয়ে গেল। তার অর্থ যে কি তা কেউ বুঝত কি না জানি না, কিন্তু এখন আমার মনে হয়, আমি না বলতে পারলেও, আমার রুদ্ধ বাক্‌শক্তি জিভ বার করে বুঝিয়ে দিত, যে, আমি জিভ দিয়েই ভাত খেয়েছি। ডাল-তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়া যায় না,—খেতে হলে জিভ দিয়েই খেতে হয়। কিন্তু হায়রে বোকা শ্রোতারা, তোমরা মজা দেখবার জন্য আমায় কথা কওয়াতে! আমায় কষ্ট দিয়ে তোমরা আমোদ পেতে! কিন্তু সত্য কথাটা ত' তোমরা বুঝতে না। খাও তোমরাও জিভ দিয়ে, কিন্তু জিভের সেই আসল ব্যবহারটা তোমাদের মনে থাকে না। তাই তোমরা কেবল সেটাকে ব্যবহার কর মুখ-ভ্যাংচাবার জন্যে—জিভ ভ্যাংচাবার জন্যে। নাক দিয়ে মানুষ নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু মানুষ সেই নাকের সজ্ঞান ব্যবহার করে নাক সেঁটকাবার সময়! এমনি সংসার—আর এমনি তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ!

* * *

হায়রে মানুষের জীবন! এ জীবনে মানুষকে মা-বাপের ঠাট্টাও সহ্য করতে হয়! আমার নাম কি-না বাণী! যে বাকশক্তিহীন হবে তার নাম রাখা হয়েছিল বাণী! এ যেন কালো ষণ্ডাগুণ্ডার নাম রাখা নলিনীমোহন, না হয় কমল-কুমার!—এ যেন পদ্মফুলের মত ছেলের নাম রাখা অঘোর-রুদ্র! এ যেন ধূমাবতীর মত মেয়েমানুষের নাম রাখা ললিতা! এ যেন ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়ের নাম রাখা রাজরাজেশ্বরী!

গরীব বামুনের তোতলা মেয়ে, তোতলা কেন, প্রায় বাক্‌শক্তিহীন মেয়ের সব চাইতে ভাবনার কথা বিয়ে হওয়া

আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মাবাপের আমার সেই ভাবনাটাই বাড়তে লাগ্‌ল। ক্রমশঃ আমিও তা বুঝতে পারলাম—আর নিজের জীবনের উপর ধিক্কার সঞ্চয় করতে লাগলাম। আমার ১০।১১ বছর হতে আরম্ভ হয়ে কতদিন পর্য্যন্ত কত লোক এসে দেখে গিয়েছে, কিন্তু আমার কথা শুনেই যে তারা হাসি চেপে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। সে সবই যে মনে পড়ে! কিন্তু আজ ভাবছি, কি তারা দেখে যেত! বাইরের রূপ দেখে তারা বলত, বাঃ বেশ ত! অপর কথা বলাতে গিয়ে হাসি চেপে তারা বলত, আহা! কিন্তু তারা ত' কেউ আমায় দেখেনি। দেখবে কি করে? মানুষের যা প্রকৃত প্রকাশ তাই যে আমার নেই—আমি যে বাক্‌শক্তিহীন! ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকলে কি মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়? চোখের ভাষা কি কেউ বোঝে? মানুষের অর্দ্ধেকের বেশী বোঝা-পড়াই যে কান দিয়ে! কান মলে না দিলে সে বাল্যকালে পড়ায় মন দেয়না, কোন জিনিষ বোঝে না—বড় হয়েও কান ধরে টানাটানি না করলে তার মাথাই যে কোনো দিকে এগোয় না!

* * *

আমি মাথায় যতই বড় হতে লাগলাম, মায়ের আমার মুখখানি ততই ছোট হতে লাগ্‌ল। আমি ত তখন প্রায় কথা বন্ধ করেছি। সারাদিন ভূতের মত খাটতাম—জেঠী-খুড়িদের বকুনির সঙ্গে চোখের নোনা জল দিয়ে ভাত খাই, আর মনকে বোঝাই খবরদার, চুপ করে থাক। কিন্তু সেই চুপ করে কাল হল;—বাবা যতদূর থেকে সম্বন্ধ করে মেয়ে দেখাতে আনতেন, তারা দুচার কথার পরই আরও দূর-দূরান্তে চলে যেত। আমার বিয়ের সম্ভাবনাও ততোধিক দূরে সরে যেত।

* * *

কিন্তু হঠাৎ একদিন অতি নিকট হতে আমার বিয়ের সম্ভাবনা হল। হায়রে! এত নিকটে থেকে এতদিন ধরে আমায় দেখে, শেষে আমার মত জানোয়ারকেও সে দয়া করে বিয়ে করতে চাইলে! কেন এ দয়া করেছিলে তুমি? দয়া করবার আর মানুষ পাওনি? আমি ত' নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হয়ে একপাশে পড়ে ছিলাম। আমি ত আমাকে আমার মন-গহনের মধ্যে নির্ব্বাসিত করেছিলাম! সেখানে যা ছিল তা আমারি ছিল—আমার মৌন পাখী, আমার স্রোতহারা নদী, আমার স্তব্ধ আকাশ, আমার অচঞ্চল বাতাস, আমারি মূক লোকজন আমারি চিরস্তব্ধ তপঃলোক। সেখানে তুমি এলে কেন?—আমি ত তোমায় চাইনি। তোমার দয়া ধর্ম্ম স্নেহ প্রেমের কলরব নিয়ে নিস্তব্ধ দেশে এসে তুমিও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছ—আমিও কোন্ স্তব্ধতর গভীরতম মৌনতার দেশের যাত্রী হলাম।

* * *

আমি ডাকিনি তবু সে এল্!—সে দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গ্রামের বড় পুকুরটায় জল আনতে গিয়েছিলাম। বৌ হবার পূর্ব্বেই আমায় বৌ হতে হয়েছিল—কারণ আমার বয়েসের অনেকেরই তখন ছেলে পর্য্যন্ত হয়েছে। তাই জল আনতে হলে গ্রাম্য বধূদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল আমায় তা হতেও বঞ্চিত হতে হয়েছিল। তাই গ্রামপথে লোকসমাগমের পূর্ব্বেই আমায় ঘাটের কাজ সারতে হত।

কলসীতে জল ভরে ফিরে দেখি লাল আকাশের গায়ে কালো দৈত্যের মত নিজের প্রকাণ্ড দেহটা অঙ্কিত করে কে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম আলো গাছের মাথাগুলো রাঙিয়ে দিচ্ছিল মাত্র। আমি চিরদিনই সূর্য্যোদয় দেখতে ভালবাসি—তাই বাল্যকাল থেকেই ভোরে উঠে কাপড় ছেড়ে জল আনতে যেতাম। মাঠের পারে সূর্য্য যখন লাল হয়ে উঠতেন তখন পুকুর-পাড় হতে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর দিকে চাইতে চাইতে জল নিয়ে বাড়ী আসতাম। আজও তাঁকেই দেখতে উঠছিলাম। কিন্তু সূর্য্যমূর্ত্তিকে আবৃত করে আজ কাকে দেখলাম! এ যে আমাদের পাড়ার শম্ভু! ঠাট্টা করে সবাই তাকে শুম্ভ-নিশুম্ভ বলত। মস্ত তার মাথাটা, প্রকাণ্ড তার দেহ; আর সব চাইতে ভয়ঙ্কর তার বড় বড় ঈষৎ রক্তাভ দুই চক্ষু!

তাকে আমি চিরদিনই ভয় করতাম, কারণ যেমন পাহাড়ের মত কালো গম্ভীর মূর্ত্তি, তেমনি সে স্বল্পভাষী। আপন কাজে সে চিরদিন মুখ গুঁজে লেগে থাকত। বামুনের ছেলে, কিন্তু হেন কাজ ছিলনা যা সে না করত

তার অবস্থা ভাল; বাড়ীতে আমলা-কর্ম্মচারী দাসদাসীর অন্ত ছিল না। অথচ সে সারাদিন ভূতের মত খাটে। আর এমনি তার গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ যে হঠাৎ অন্ধকারে শুনলে আঁৎকে উঠতে হয়। পাড়ার সবাই তাকে ভয় করত—আমিও করতাম।

* * *

সেদিন সেই প্রভাতে সেই শম্ভু আমার সমুখে। আমি এগুবো কি পেছুবো ঠিক করতে না পেরে চুপ করে দাঁড়ালাম। এমন সময় গুরুগম্ভীর আওয়াজ হল, 'উঠে এস বাণী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

কেন যে দাঁড়িয়ে রইলাম তা সে কেমন করে বুঝবে? তার মস্ত মাথাটায় দুনিয়ার সব ঢুকতে পারে কিন্তু সে যে ভয়ঙ্কর এ কথা ঢুকতেই পারে না, একথা সে ভাবতেই পারে না। পারলে সে কি এমন করে নিজেকে সকলের সামনে বার করত? তা হলে আমি যেমন বাক্যরোধ করে নিজেকেও গোপন করতে আরম্ভ করেছি সেও তেমনি নিজের চেহারাটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করত।

আমি উঠে এলাম। সে তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু যাই আমি তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছি সে আমার সমুখে দাঁড়িয়ে বল্লে "বাণী, আমার একটা কথা শোনো!" আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। মুখ দিয়ে কি শব্দ বেরুল মনে নেই, কিন্তু কলসীটা কক্ষচ্যুত হয়ে গড়াতে গড়াতে জলে গিয়ে পড়ল। কেন ভয় পেয়েছিলাম? কিসের ভয়? সেও মানুষ আমিও মানুষ, তবু মানুষকে মানুষের এত ভয়!

শম্ভু পিছিয়ে গিয়ে বল্লে "বাণী, তুমি ভয় পেয়েছ! ভয় কি?" ভয় যে কিসের তা এখনো বলতে পারিনে—তবে এইটুকু মনে আছে যে খুব ভয় পেয়েছিলাম। শম্ভুর মুখ লজ্জায় আরো কালো হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বল্লে "ভয় নেই, বাণী, আমায় ভয় করবার কোনো কারণ নেই। আমি কেবল এইটুকু জানতে এসেছি যে তোমার শুনছি বিয়ে হচ্ছে না। আমায় তুমি বিয়ে করবে? কথা বলে কাজ নেই, ঘাড় নেড়ে বল্লেই হবে।"

হায়রে কপাল! আমার কথা বলাকে সেও ভয় করে। তা করুক, আমি যখন অকারণে তার চেহারাকে ভয় করতাম সেই বা কেন অকারণে আমার তোতলা কথাকে ভয় করবে না? হতভাগিনী আমি যখন তার সেই গভীর দয়াকে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে অপমান করতে পেরেছিলাম, তখন কেন সে আমাকে বাঘের মত ভয় করে পালিয়ে গেল না? কেন সে আবার এল—বারবার এসে আমার জন্য মায়ের কাছে বাবার কাছে প্রার্থনা জানালে?

* * *

শম্ভু আমার ঘড়াটায় জল ভরে এনে বল্লে, "চল তোমার বাড়ীতে দিয়ে আসি।" কি সর্ব্বনাশ! তাকে সঙ্গে করে সারাপথ যেতে হবে! কিন্তু শম্ভু কোন কথা বল্লে না, আমার ঘড়াটা হাতে ঝুলিয়ে বাড়ীর দিকে চল্ল। আমিও মূঢ়ের মত তার অনুগমন করলাম। উপায় কি? সে যে কোন কথা শুনল না!

*

দয়া! তার দয়ার হাত থেকে কে আমায় বাঁচাবে? কেউ না। মা বাবা সে কথা শুনে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—বাঁচা গেল। কারণ শম্ভু সৎপাত্র এবং তার অভিভাবক আর কেউ নেই যে এ বিবাহে বাধা দেবে। তার চেহারাটা ছাড়া সে সর্ব্ববিষয়েই প্রার্থনীয় পাত্র। অতএব এ সম্বন্ধ ছাড়া যেতে পারে না।

* * *

এ সম্বন্ধ ছাড়া যেতে পারে না? তা বটে, কারণ আমি যে কুপাত্রী! কেইবা আমার দিকে চাইবে? কেইবা আমার অকারণ ভয়কে গ্রাহ্য করবে? বাবা চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেলেন। আত্মীয় বন্ধুরা বল্লেন—"বাঃ বোবা বাণীর এমন পাত্র জুটল!—কালে কালে কি না দেখতে হবে?"—মা-ই কেবল আমার মুখ দেখে হঠাৎ একদিন আমায় বুকে চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে বল্লেন "ভয় কি বাণী!"

ভয় যে কি তা কেমন করে বলব—কিন্তু সে আমার সমস্ত বহিরন্তরকে অধিকার করে বসল, আমি একেবারে কোণা নিলাম। মাঝে মাঝে আমার শরীর কেঁপে কেঁপে ভয়ঙ্কর শব্দহীন না—না—না—না—ধ্বনিতে ভরে উঠতে লাগল।

সেই না-না—শব্দ কেউ শুনলে না। কেউ শুনলে না

বটে কিন্তু যাকে শোনানর দরকার একদিন তাকে হঠাৎ সমস্ত তোতলামির বাঁধ ভেঙে শুনিয়ে দিলাম—না—না—না। কিন্তু সেও শুনলে না। তার মস্ত বুকখানার মধ্যে যখন দয়া প্রবৃত্তি জেগেছিল তখন তাকে কে ঠেকিয়ে রাখবে?

* *
*

ভয়ে আমার ভয় ভেঙে গিয়েছিল। তাই সেদিন দুপুর বেলায় তাদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার বাড়ীতে তার আত্মীয় স্বজনের কাছে যাওয়া-আসা যে আমার ছিল না তা নয়। বাল্যকালে যখন পূজাপার্ব্বণে তাদের বাড়ী ঢাকঢোল বেজে উঠত বা যখন তারা কাজে-অকাজে নিমন্ত্রণ করে পাড়াপরশীদের ভোজ দিত তখন ভাল কাপড়চোপড় পরে আমি অনেকদিন তাদের বাড়ী গিয়েছি। কিন্তু বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যেমন সবারই বাড়ী যাওয়া ছেড়েছিলাম—তেমনি তাদের বাড়ী যাওয়াও ছেড়েছিলাম।

আজ বিপদে পড়ে অনাহূত হয়েই তার কাছে উপস্থিত হলাম। দেখলাম সে দরজার দিকে পেছন করে বিছানায় বসে কি একটা বই পড়ছে! আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সে ফিরে চাইলে। অমনি তার সমস্ত মুখখানা হাসিতে ভরে গেল।

আমি সাহসে ভর করে ঘরে ঢুকে, যা বলবার ইচ্ছে ছিল তাই বলতে গেলাম—কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুল কেবল একটা আর্ত্তস্বর—একটানা অশ্রুরুদ্ধ না—না—শব্দ!

সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে আমার মুখের ওপর তার বিশাল চোখ দুটি রেখে বল্লে—"তোমার এই ভয় ভাঙাই আমার জীবনের একটি মাত্র কাজ হ'ল। আমি এ বিয়ে করবই। বিয়ের পর তোমার তোতলা রোগ সারাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। সারে ভালই, নয়ত আমারও কথা বন্ধ হবে। দেখি তাতেও যদি তোমার ভয় ভাঙে। কেন যে তুমি ভয় করছ তা ত জানিনে—হয়ত এমন দিন আসবে যেদিন তুমি বুঝবে যে আমি ভয়ের জিনিষ নই।"

তুমি ভয়ের জিনিষ নও—তুমি যে কিসের জিনিষ তা আজ এই এতদিন পরে মরণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বড় দেরীতে, প্রিয়তম, বড় বিলম্ব হল। কিন্তু না বোঝাই যে ভাল ছিল। যখন বুঝলাম তখন মৃত্যু যে আমাদের দুজনার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আর যে ভুল শুধরে কোন ফল নেই। আমি যে তাকে ইচ্ছে করে ডেকে আনলাম। সে যখন এসেছে তখন ত' আর ছাড়বে না।

* *
*

কি কথার মধ্যে কি কথা লিখেছি কাল। যে কথা বলছিলাম শেষ করি।

আমার কথা কেউ শুনলে না, বিয়ে হয়ে গেল। যাকে সমস্ত বহিরন্তর দিয়ে ভয় করতাম তাকেই বিয়ে করতে হল। তার দয়ার নির্দ্দয়তা হতে নিস্তার পেলাম না। এই দয়াটা যে আর কিছু হতে পারে—এ যে সেই প্রকাণ্ড কালো পর্ব্বতের বুকের নির্ম্মল সলিল—প্রেম-নির্ঝর হতে পারে তা যে কিছুতেই মন বুঝতে চায়নি। তাই বিয়ের পর হতে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি ভগবান আমাকে আমার স্বামীর দয়া থেকে মুক্তি দাও। আমার মত অনেক হাবাকালা বোবা ত' জগতে আছে, তাদের এ দয়া সে দেখাল না। দেখাল এই আমাকে! কেন এই অপমান আমি সইব? আমার রূপটুকুকে মাত্র দয়া দেখাবার তার কি অধিকার? আমি সুন্দর হয়েও গরীবের মেয়ে, তাই কি এমন লোককে আমার বিয়ে করতে হবে? যাকে দেখলে সবাই ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায় তাকেই, গরীব বলে তোতলা বলে আমায় বিয়ে করতে হবে? যাকে কেউ ভালবাসতে পারে না তাকে আমাকেই ভালবাসতে হবে? ভগবান! এ দয়া যে আমি চাই না। তার এই ভয়ঙ্কর দয়া থেকে আমায় মুক্ত কর। যাকে সমস্ত দেহে প্রাণে ভয় করি তাকে ভালবাসতে পারব না, তার দয়া আমার সইবে না।

* *
*

বাস্তবিক সে দয়া আমার সইল না? আমার মত পাপীর সে সুধার আগুন সইবে কেন? তাকে পূর্ণভাবে

বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাই সেই স্বর্গের আগুন আমায় দগ্ধ করলে। ওঃ আমার পাপের কি শেষ আছে? এ জ্বালা কিসে জুড়াবে!

* * *

সে আমার জন্য কি না করেছে? আমায় কলকাতায় নিয়ে এসে আজ পাঁচ ছ বৎসর ধরে আমার মন পাবার জন্য কি না করেছে সে। আজ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মরণের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে বুঝতে পারছি কি বস্তু হেলায় হারালাম! নিজের জীবনও নষ্ট করলাম আর একটি মহৎ প্রাণকেও নিষ্ফল করে দিলাম। তিনি আমারই জন্য জগৎসংসারের সঙ্গে বাক্যের সংস্রব ত্যাগ করেছেন। এই অগ্নির মত তেজস্বী মানুষকে সহ্য করা কি আমার মত খড়ের প্রতিমার কর্ম।

* * *

ভুল—ভুল—জীবনব্যাপী মতিভ্রম! হায় দেব অগ্নি, বিবাহের দিন তোমার সাক্ষাতে একি ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা আমায় করিয়ে নিয়েছিলে! স্বামী প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁর দেহ মন প্রাণ সব আমার, আর নষ্টমতি আমি কি প্রতিজ্ঞা করলাম! কেন সে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম? সেই প্রতিজ্ঞা শুনবামাত্র আমার সেই লাল চেলীখানা সত্যি-সত্যি আগুন ধরে লাল হয়ে উঠল না কেন? কেন সেই লাল হোমের সময় আমিও নিজেকে আহুতি দিলাম না? কেন—কেন—

* * *

প্রতিজ্ঞা করলাম, সারা জীবন আর কারও সঙ্গে কথা কইব না। স্বামীর সঙ্গে ত' নয়ই—মাবাপের সঙ্গেও নয়। যে মহাপ্রাণ মানুষটি এই বাক্যহীনার একটা কথা শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে রইল তাকে আমার তোতলা কথা হতেও চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত করে রাখলাম।

কথা কইব না! বটে! তোমার কথা কওয়াটাও যে কি বীভৎস দৃশ্য তা কি সেই প্রতিজ্ঞার সময় মনে ছিল না? তবে মূঢ়ে, তোমার কেন তখন মনে হল না, যে, তোমার কথা না-বলাই যে ভাল—মানুষের নয়নসুখকর থাকবার জন্যই যে তোমার বাক্যে সংযমী হওয়া উচিত। স্বামী তোমায় কথা কইতে দেখলেই যে আঁতকে উঠবেন—এই কথাটা মনে রাখনি কেন?

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর একটা প্রচণ্ড অভিমানে আমি অগ্নিসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করলাম, কথা কইব না। যেটুকু কথা কইবার শক্তি ছিল তাও চিরদিনের জন্য অন্তরে বন্ধ করে নির্ব্বাক কাঠের পুতুলের মত স্বামীর পিছনে ঘুরতে লাগলাম। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলে গেল—আমি কিন্তু আকার-ইঙ্গিতেও নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা অন্য কোন রকম মনের ভাব কাউকে জানাইনি। সবারই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নিজে খেটে মরতাম, আমার যে কি চাই তা কেউ জানতে পারত না।

* *

স্বামী লেখাপড়া শেখালেন। সেই এক অদ্ভুত ব্যাপার। একপক্ষ কতই না বকে যাচ্ছে—কত উপদেশ, কত অদ্ভুত গল্প, কত ইতিহাস, কত কাব্যকথা ঐ প্রকাণ্ড কালো মাথা থেকে বেরুতো তা কি সব মনে আছে? তাঁর অনর্গল বক্তৃতার স্রোতের মধ্যে পড়ে কত সময় হাবুডুবু খেয়েছি হাঁপিয়ে উঠেছি তবু নির্ব্বাক হয়ে বসে থাকতাম—কখনও তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় স্তম্ভিত হয়ে যেতাম, কখনও বা ঢুলুনি আসত। তবু তিনি কখনো থামেন নি। যেন তিনি এই নির্ব্বাক শ্রোতাটি পেয়ে তাঁর অন্তরের গভীর জ্ঞানের সাগরের উচ্ছ্বাসটাকে উন্মুক্ত করবার সুবিধা পেতেন। বাইরে কেউ ঐ লোকটির কাছে বড় একটা ঘেঁসত না, কিন্তু যে দু'একজন ওঁর অন্তরের খবর টের পেয়েছিল তাদের কাছে উনি যে কত লোভনীয় ছিলেন তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু হায়! সবই এই কাঠের পুতুলের কাছে ব্যর্থ হয়েছিল।

* * *

কতদিনের কথা আজ মনে পড়ছে—শুয়ে-শুয়ে ঐ বর্ষার আকাশের দিকে চেয়ে কত শত দিনের কথা বিদ্যুতের মত আমার এই মরণোন্মুখ প্রাণটা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে। তিনি আমায় এই মরক্কো-বাঁধান খাতাখানি কত দিন আগে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তুমি ত' কথা কইলে না—কখনো যে কইবে তারও আশা নেই। যদি কখনো ইচ্ছে হয়, এরই পাতে দুটো তোমার মনের কথা লিখে রেখো—আমি তাতেই খুসী হব।"

হঠাৎ আজ ক'দিন আগে সেই কথাটা মনে পড়েছে। তাই ক'দিন হতে লিখে যাচ্ছি।—জানি না শেষ পর্যন্ত লিখতে পারব কি না কিন্তু প্রাণপণে লিখব। তাঁর সঙ্গে কথা না কওয়ার প্রতিজ্ঞা অগ্নি-সাক্ষী করে করেছিলাম—সে প্রতিজ্ঞা রেখেছি। কিন্তু জীবনে যা হলনা মরণের পর যেন তিনি আমার খাতাখানার দূতীগিরিতে আমার সঙ্গে কথা কইতে পারেন তার উপায় করলাম। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি সারা জীবন ধরে করে গেলাম—প্রাণ থাকতেও কাঠের পুতুল থাকার যন্ত্রণা সারা জীবন ভোগ করে আমি যাচ্ছি। কিন্তু তিনি যেন মনে না করেন যে তাঁর সাধনা সিদ্ধ হয়নি। তিনি জয়ী হয়েছিলেন—তাঁর জয়পত্র এই আমি রেখে যাচ্ছি—এইটুকু আমার শেষ সান্ত্বনা।

* * *

মনে পড়ে এমনি একদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। স্বামী কোথা হতে একরাশ পাতাসুদ্ধ কদম-ফুল এনে বল্লেন "এরা তোমারি মত—দূর হতে যখন কালো পাতার মধ্যে ডালে-ডালে ঝুলছিল তখন কত কথাই বলছিল ; কিন্তু পেড়ে যাই হাতে করেছি অমনি এদের সরু-সরু দলগুলি ঝরে যাচ্ছে—সমস্ত দেহটাই এদের কাদার মত হয়ে যাচ্ছে।" তিনি সেই পাতা-ডালসুদ্ধ কদম-ফুলগুলো ঘরের নানান স্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। শেষে দুহাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন,—ডাক্তার বলছিল এমন করে থাকলে শুধু যে তুমি স্বাস্থ্যকে হারাবে তা নয়—হয়ত' প্রাণও হারাবে। তুমি যদি বল, তোমায় তোমার মার কাছে পাঠিয়ে দি।" আমি কোন কথা না বলে উঠে গেলাম। তিনি আমার ইচ্ছার কোন-রকম ইঙ্গিত না পেয়ে সারাদিন কেবল গভীর দৃষ্টিতে আমার অন্তরের খোঁজ নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আজ তাঁর সেই-দিনকার সেই কাতর দৃষ্টি কতকাল পরে এই বর্ষার বৃষ্টি-সাগর পার হয়ে আবার এসে উপস্থিত হয়েছে ; যা সত্য তা যে কিছুতেই মরে না। সেই-দিনকার কথা মনে হয়েছে, তবু প্রাণপণে বলছি, যখন এতদিনই গিয়েছে তখন আর কেন ? আর নয়—নয়—

ঐ যে স্তম্ভিতবর্ষণ মেঘের মত মানুষটি আমায় ঘিরে-ঘিরে মাঝে-মাঝে স্নিগ্ধ-গম্ভীর-স্বরে কুশল-প্রশ্ন করছে, ওকেই কি আমি এতদিন ভয় করে এসেছি ? শুধু ভয় কেন ?—তার চাইতেও যা আরও ভয়ঙ্কর, স্বামীকে যা করলে অনন্ত নরক, সেই ঘৃণাই করে এসেছি ? ঐ কি সেই মানুষ, যাকে মনে করতাম আমার জীবনের সূর্য্যোদয় এক প্রভাতে রাহুগ্রস্ত করে চির-জীবনের জন্য তাঁকে আমার জীবনাকাশ থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছে ? কৈ আর ত' তা মনে হয় না ? এখন যে কেবলই মনে হচ্ছে, ঐ মানুষটি ত' আমার ঊষর জীবন-ক্ষেত্রের দিগন্তবিস্তৃত দগ্ধ তাম্র-আকাশের প্রথম মেঘসঞ্চার।

জানি না কি অশুভলগ্নে কি অশুভ-দৃষ্টিতে ঐ আমার শ্যামল মেঘকে প্রথম দেখেছিলাম। সেই দৃষ্টির ফল যে কিছুতেই আমায় ছাড়তে চাইল না। ঐ সজল জলদের বজ্রবিদ্যুৎঝঞ্ঝার সম্ভাবনাই বেশী ভয় দেখিয়েছিল। তার শীতল বারিধারার সম্ভাবনার কথা মনেই উদয় হয়নি। কিন্তু যখন সেই বারিপাত অজস্রধারে আরম্ভ হল, তখন আমার অন্তর-গৃহের সমস্ত জানালা-কপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ওগো গুরুগর্জ্জিত মেঘ, ওগো ঘন-গম্ভীর দুর্বোধ অন্ধকার, ওগো ঘনায়িত গূঢ় স্নেহ, তুমি আমার সেই রুদ্ধ দুয়ার ভাঙতে পারলে না কেন ? কেন তোমার ততখানি শক্তি হল না ? আমি বা কেন সেই স্নেহশক্তিকে ঠেলে রাখবার শক্তি পেয়েছিলাম ! এখন সেই শক্তিই যে আমায় মরণের দিকে নিয়ে চল্ল।

* * *

সময় নেই, আর সময় নেই—আমার সব কথা যে কিছুতেই শেষ হবে না, সে কথা যে কেবলি ভুলে যাচ্ছি। যা লিখতে বসেছি তার আগাগোড়া কিছুরই যে ঠিক থাকছে না। ধীরে ধীরে অচঞ্চল পদে শেষদিন এগিয়ে আসছে তা বেশ জানতে পারছি। তবু শেষকথা যে আর শেষ হতেই চায় না। সারা জীবনের রুদ্ধকথার স্রোত যে এই কলম বয়ে বর্ষার ঝরণার মত নেমে আসতে চাইছে। একবার যখন কথার বাঁধ খুলেছে তখন আর কি করে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখব ? শেষ হবে না ?—শেষ বলা হবে না ? নাই বা হল। এই একখানা ছোট্ট খাতায়

আমার সমস্ত জীবনটা এঁটে যাবে? আমি এতই ছোট? না না—তা আমি নই। আমিই আজ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গিয়েছি। আমি ত আর বোবা রোগাক্রান্ত বিশ-পঁচিশ বৎসরের ছোট মানুষ মাত্র নই—আমি যে লোকে-লোকে কালে-কালে ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমার নিজের স্পর্শ যে আমি চারদিক থেকে পাচ্ছি। ঐ যে মেঘ থেমে-থেমে আমারই মত রুদ্ধবাক্ হয়ে গুর-গুর করে গুমরুচ্ছে! —ঐ যে বিদ্যুৎ চমকে-চমকে উঠছে ওরও যেন আমারই মত ভাঙা-ভাঙা তোতলা ভাষা—ঐ যে—ঐ যে—

* * *

আর একদিন—কি ভয়ঙ্কর কি নিষ্ঠুর সেদিন আমি হতে পেরেছিলাম। আমার মধ্যে, ওগো চিরন্তন নারী, ওগো নারায়ণী, তুমি কেমন করে এতটা ঘুমুতে পেরেছ? সে দিন সন্ধ্যায় কাজকর্ম্ম সেরে জানালার গরাদে ধরে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় তিনি হঠাৎ একটা বছর চার-পাঁচেকের কালোকোলো ছেলের হাত ধরে আমার ঘরে এসে বল্লেন "ওগো শুক্লরাত্রি, তোমার উপযুক্ত একটি উপহার এনেছি। আমার বোবা-কালার স্কুল থেকে এই ছোট অপরাজিতা ফুলটি আমার বাণীর জন্য এনেছি। তুমি এর বাণী ফোটাও।"

হঠাৎ আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। ইচ্ছে করল, সেই মুহূর্ত্তে হেসেকেঁদে ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ি। কিন্তু তা হ'ল না। কেন হল না? কেন সেদিন তা পারলাম না? তা হলে ত' আজ এ ডায়ারী লিখতে হত না। এই বুক-ফাটা রুদ্ধবাক্ অশ্রু ফেলতে হ'ত না।

ক্ষণপরেই মনে হল আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙাবার এ এক মন্দ ফন্দী বার করেননি তিনি। যাই একথা মনে হওয়া অমনি আমার সমস্ত দেহমন কাঠের মত শক্ত হয়ে গেল। ছেলেটিও আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে কেঁদে উঠল। সেও এ রাক্ষসীকে চিনলে!

ওরে নিষ্ঠুর, ওরে নির্দ্দয়—ওরে আমার অন্তরের পাথরের চাইতেও পাথরের মানুষ, তুই কি করে সেদিন চুপ করে ছিলি। যেদিন তিনি আমার রুদ্ধবাণী না শুনতে পেয়ে আমার চাইতেও যারা হতভাগী সেই বোবাকালা-দের কথা ফুটিয়ে তাদের মুখে আমার কথা ফোটাবার চেষ্টা করেছিলেন সে দিনও তুই একটি কথা দিয়ে তাঁকে আনন্দিত করিসনি আর যেদিন সেই মূক বালককে আমার কোলের কাছে এনে দিলেন সেদিনও তুই নির্ব্বাক ছিলি! ওরে পাষাণ—ওরে—ওরে—

* * *

এই ঘটনার পর হতে দেখি স্বামীও কথা বন্ধ করলেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কারও সঙ্গে তিনি আর বাক্যালাপ করতেন না। তাঁর প্রকাণ্ড লাইব্রেরী দিনে দিনে যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল তিনি ততই বাইরের সঙ্গ ত্যাগ করতে লাগলেন। আমি তাঁর পাশে গেলে, তিনি হয় নিজে চুপ করে পড়েন, না হয় নীরবে আমার হাতে কোনো বইয়ের পাতা খুলে দিয়ে চুপ করে আমার পানে চেয়ে থাকেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কেটে যায়। সংসারের কাজে কেউ ডাকলে আমি উঠে যাই, তারপর ফিরে এসে দেখি সেই পরম একক মানুষটি ঠিক তেমনি ভাবেই বসে আছেন!

ওরে ভক্তিহীন, ওরে উদ্ধতা নারী, কেন তুই নীরবে সেই পায়ে মাথা লুটাতিস না? কে তোকে সেই সামান্য একটু কাজ করতে মানা করত?

* * *

নারায়ণ! তুমি নাকি সৃষ্টির আগে একলা ছিলে? কিন্তু সে কি এমনি একলা? তোমার শ্রী, তোমার শক্তি, মা-লক্ষ্মী যদি তোমার পাশে সেই সময় এমনি ভাবে মড়ার চাইতেও মড়া হয়ে, জীবন্ত হয়েও চাঞ্চল্য-হীনা হয়ে পড়ে থাকতেন তা হলে তোমার নীল চক্ষে কত বেদনা গভীর হয়ে দেখা দিত দেবতা? হে আদি কবি, যদি তোমার সেই প্রথম সৃষ্টিসঙ্গীতের সময় তোমার বাক্ তোমার বাণী তোমার পাশে মূঢ় মূক হয়ে পড়ে থাকতেন সে দুঃখ কি তোমার সইত? তবে এই কপাটবক্ষ বিশালহৃদয় আমার একমাত্র শ্যামমূর্ত্তি নর-নারায়ণটির তা সইছে কি করে? কি শক্তি তাকে দিয়েছ প্রভু, যে, সে এই অধমাকে এত ভাল বেসেছে অথচ সেই অধমার কাছ থেকে সারা জীবনে একটি ইঙ্গিত

বা একটা অক্ষরও সে ভিক্ষে করেও পেলে না? অথচ সে দুঃখ তাকে সইতে হ'ল? কি তার অপরাধ? কেন তার এই শাস্তি? নারায়ণ, তার এই ভয়ঙ্কর স্নেহ কেড়ে নাও—সে বাঁচুক—সে সুস্থ হোক।

* * *

যতদিন পেরেছিলাম কোন রকমে দেহটাকে খাড়া রেখেছিলাম। তারপর হঠাৎ কোন্ দিন একেবারে শয্যা গ্রহণ করতে হল ঠিক মনে পড়ছে না, তবে এইটুকু মনে আছে যে স্বামী দিনরাত্রি আমার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে বসে থাকতেন। তাঁর অক্লান্ত সেবার চেষ্টা দেখে কত সময় যে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছি তার ঠিক নেই। তবু তিনি ত' আমায় ত্যাগ করেননি।

এমনি সময় স্বামী কোথা হতে আর একজনকে আমার সেবার জন্য নিয়ে এলেন। স্বামীর কালাবোবার ইস্কুলে নাকি সে কি করত। সে এল সেবা করতে, কিন্তু তার প্রথম করস্পর্শেই আমার বুকের দ্বার খুলে গেল - অমনি সে একেবারে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করলে। কি মধুর তার স্পর্শ! কি মধুর তার সেই প্রথম কথাগুলি!

* * *

উঃ একি জ্বালা!—না, আজ আর কিছু লিখতে পারব না। ভিতর থেকে একটা কাঁপুনি বেরিয়ে আসছে—অথচ বাইরে একটা প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব হচ্ছে।—নাঃ পারলাম না—

* * *

আঃ কি মিষ্টি তার নামটি—সুভাষিণী—মিষ্টি কথা। শুধু কি তার কথাই মিষ্টি, তার সবই মিষ্টি। তার নামের আগে ইংরিজি মিস্ কথাটাও মিষ্টি;—মিস কথাটা বাংলা মিষ্টির আধাআধি—আধাআধি কেন, তারও বেশী।

প্রথম যেদিন সে আমার সমুখে এসে দাঁড়াল তখনই তাকে দেখে আমার মনটা তার দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর যখন সে বল্লে—'আমি ক্রিশ্চান, আমার হাতে ওষুধ খাবে ত' ভাই',—তখন আমার মনে হল, কেন কথা বন্ধ করেছি? কেন তার হাত ধরে বলতে পারলাম না, যে, তুমি যাই হও তুমি আমার পরমাত্মীয়?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে ঝিকে ডেকে বল্লে, "তোমায় আমি যখনই ডাকব, এসে ওষুধ খাইয়ে যেও—খাবার দিয়ে যেও। আর বামুন-ঠাকুর যেন সর্বসময় বাড়ী থাকেন, তাঁকে যেন ডাকলে পাই।'

ঝি বল্লে, 'বাবু বলে দিয়েছেন, আপনার কথা-মত সবই হবে। বাড়ীর কাজের জন্য নতুন লোক রাখা হয়েছে।'

* * *

সুভাকে পেয়ে পর্যন্ত সবই আমার নতুন হয়ে গেল। সে ডাক্তারী শিক্ষাতেই জীবন কাটায়নি—তার গিন্নিপনাও চমৎকার! সবই যেন কলে চলতে লাগল। আমি শুয়ে-শুয়েও অনুভব করতাম, কার নিপুণ হাতে পড়ে স্বামী হতে আরম্ভ করে ঝি-চাকর পর্যন্ত সবাই যেন কেমন এক রকমের হয়ে গেল। সবই যেন ঘড়িঘণ্টা ধরে চলতে লাগল। সুভা এল আমার সেবা করতে, কিন্তু তার সেবার শক্তি রোগীকে ছাড়িয়ে সারা সংসারে ছড়িয়ে পড়ল।

কোথা হতে যে সে এসেছে, ইতিপূর্বে তার কি কাজ ছিল, তার বাপপিতামহ কোন্ জগতের মানুষ, কিছুই খোঁজ নিলাম না। সে যেন চিরদিনকার আপনার জন। মায়ের পেটের ভাইবোনও আমার ছিল, সবাইকেই আমি পর করে-ছিলাম। সকলেই আপন-আপন সংসার নিয়ে ব্যস্ত, চিরদিন আমাকেও উপেক্ষা করে এসেছে, আমিও কাউকে কখন ডাকিনি। কিন্তু আজ এই মরণের দ্বারে এসে এ কোন্ আপনার জনকে লাভ করলাম? কোথায় এতদিন এ লুকিয়ে ছিল?

* * *

আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। সুভার সঙ্গে মনে মনে 'মিষ্টিকথা' পাতালাম। স্বামীকেও যা দিতে পারিনি তা আমার মিষ্টিকথাকে দিলাম—তাকে ভাল বাসলাম। ভালবাসতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে। কিন্তু সে আমায় তাই শেখালে—নিজে ভালবেসে প্রাণপণে সবারই যত্ন করে মেয়েমানুষকে যে কি রকম হতে হয় তাই শিখিয়ে মরণোন্মুখ আমায় বাঁচালে। আমার

মনে হচ্ছে, যদিই বা আমি এখন মরি তবু যে ক'দিন সংসারে থাকব সে ক'দিন বেঁচেই থাকব। কারণ আমি তাকে দিনে দিনে মাসে মাসে ভালবাসতে পেরে আর সবাইকেও ভালবাসতে পারলাম। আর আমার কারও ওপর রাগ নেই। আমার স্নেহের উৎসের মুখে যে পাথর চেপে ছিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সুভা দু'হাত দিয়ে জোর করে সেই পাথরখানা তুলে ফেলে দিয়েছে।

বাঁধ ভেঙে গেল কি করে—পাথর সরল কি করে? সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সেদিন সন্ধ্যায় চুপ করে শুয়ে আছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। চাকর যে আলোটা ঘরে দিয়ে গিয়েছিল সেটাকে কমিয়ে আড়ালে রাখা হয়েছিল। আমি ঘুমুইনি—তবে চোক বুজে পড়ে ছিলাম। ক'মাস থেকেই অনুভব করছিলাম যে ক্রমশই আমার ভাল করে জেগে থাকবার ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। একটা তন্দ্রার মত অবস্থা আমায় যখন-তখন এসে আক্রমণ করে। সেই-রকম একটা অবস্থায় চুপ করে শুয়ে ছিলাম।

স্বামী আমার মাথার শিয়রে নীরবে বসে কি করছিলেন—কি আবার করছিলেন?—এই হতভাগিনীর দেহে যদি একটু প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন সেই আশায় আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলাম কে এসে দাঁড়াল। একবার চেয়ে দেখলাম। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বোধহয় আমাদের উভয়কে দেখলে; তারপর, বেশ অনুভব করলাম, সে চেপে-চেপে একটা নিশ্বাস ফেল্লে। শেষে স্বামীর দিকে এগিয়ে এসে চুপিচুপি বল্লে 'আপনি উঠে যান, আমি বসছি।' স্বামী প্রথমটা উঠলেন না—সেও দাঁড়িয়ে রইল। শেষে স্বামী উঠে বাইরে গেলেন, সে আমার পাশে বসল। তারপর হঠাৎ আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। সে কি কান্না! সে কি গভীর বেদনার চাপা কান্না!

কেন কাঁদল সে? কি তার দুঃখ? কি বেদনা তার বুকে ঢুকেছে? আমি আর থাকতে পারলাম না—দুই হাত দিয়ে, আমার যতটুকু জোর ছিল তাই দিয়ে তার মুখখানা তুলে ধরে দেখবার চেষ্টা করলাম। সেও যেন আমার প্রশ্ন বুঝলে। কতদিন সে এসেছে তবু চোখে-চোখেও তার সঙ্গে আমি কথা বলিনি। এই তার সঙ্গে—তার সঙ্গে কেন, বিয়ের পরে এই বোধহয় প্রথম মানুষের সঙ্গে, আমার সম্ভাষণ!

সে অশ্রুসিক্তমুখে ভাঙা-ভাঙা গলায় বল্লে, "হত-ভাগিনী! কি রত্ন তুমি হেলায় হারালে, হাতে পেয়েও পায়ে ঠেললে তা বুঝলে না। জানি না সেই শেষ দিনে তুমি ঈশ্বরের কাছে কি জবাব দেবে। নিজের ওপর অন্যায় করে অত্যাচার করে অন্য একজন নির্দোষ নিষ্পাপ মানুষকে এত বড় শাস্তি তুমি দিয়ে গেলে। তোমার জন্য কাঁদব, না তার জন্য কাঁদব, আমি যে বুঝতেই পারছি না। তুমি নিজের কণ্ঠরোধ করেছ, কিন্তু আর-একজনের কণ্ঠই বা কেন এমন করে রুদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছ? সংসারের আর-একজন প্রিয়জনের কেন হাত-পা হৃদয়-মন জন্মের মত বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছ? তাকে কেন চিনলে না? কেন তাকে ভালবাসলে না? উঃ তুমি মেয়েমানুষ নও!"

আমি অবাক হয়ে তার কথা শুনতে লাগলাম। কি জানি কেন তার সেই কথাগুলো আমার অসাড় মনটাকে হঠাৎ তাতিয়ে তুললে, তার কথাগুলো একেবারে জলন্ত অক্ষরে আমার মনে লেখা হয়ে গেল। সে আমার সেবা করতে এসে এই প্রথম তিরস্কার করলে, অথচ তা যেন আমার সমস্ত অন্তর-বাহিরের ওপর তীব্র ওষুধের মত কাজ করলে। কেন সে এ তিরস্কার করলে! কোথায় আঘাত পেয়ে সে এই প্রতিঘাত আমায় করলে?

* * * * *

প্রথমটা তার কথা ঠিক বুঝতে পারিনি, কিন্তু তারপর বুঝলাম। আমি যা কখনো সাহস করে ভেবে দেখিনি—যে কথা আমি নিজের কাছে নিজেই গোপন করে রেখে-ছিলাম, সেই কথা সে আমায় জোর করে বুঝিয়ে দিলে—শুনিয়ে দিলে। সে বুঝিয়ে দিলে যে আমি কেবল আত্ম-হত্যার পাতকী নই, স্বামীহত্যাও করতে চলেছি। স্বামীর স্নেহের এত নিদর্শন পলে পলে পেয়েও ইচ্ছে করে তাকে অন্তরে গ্রহণ করিনি। এমন করে স্বামীকে দূরে ঠেলে রাখবার আমার অধিকার নেই—ভালবাসাকে এত অপমান করবার কারও অধিকার নেই। তাকে জীবনে পূজা করতেই হবে—নইলে শুধু মৃত্যু নয়, তার চাইতেও

ভয়ঙ্কর আরও কিছু ভাগ্যে আছে। তাঁর স্নেহময় মূর্ত্তি আমার প্রাণের দ্বারে প্রতিমুহূর্ত্তে এসে আঘাত করেছে, তাকে ফিরিয়ে আমি নারায়ণকে নির্ব্বাসিত করে মৃত্যুকে এনে অন্তরাসনে বসিয়েছি। আমার নিস্তার নেই—নেই—নেই।

কিন্তু কেন? কে বলে দেবে কেন? হয়তো বাল্যকাল হতে ভালবাসতে শেখাই আমার হয়নি। কাউকে ভালবাসতে দেখিনি, কারও স্নেহ অনুভব করিনি, কাউকে নিজেও ভালবাসিনি। স্বামী যখন তাঁর অগাধ স্নেহ নিয়ে আমার প্রাণের দরজায় আঘাত করলেন তখন তাঁকে বিশ্বাস করতে পারিনি—ঘৃণাকে ক্রোধকে অভিমানকে ভেতরে ডেকে নিয়ে সজোরে অন্তরের কপাট বন্ধ করে দিয়েছি। যে অগ্নিকে সাক্ষী করে ঘৃণা আর ক্রোধকে ভেতরে ডেকে নিয়েছিলাম, সেই অগ্নি তাদের সঙ্গে অলক্ষ্যে আমার বুকে প্রবেশ করেছিলেন। আজ তাঁর দহন সারা দেহমনে অনুভব হচ্চে।

* *
*

আমি নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলাম—আমার সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেল।

ব্যর্থ হয়ে গেল? সত্যিই কি তাই? না, তা নয়—আজ এই মরণের দ্বারে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মনে হচ্চে যে; না তা নয়, আমি একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাইনি। মরতে-মরতে আমি মরলাম না—আমি বেঁচে গেলাম। ঐ অত-বড় বিশাল পর্ব্বতের মত মানুষকেও ভালবাসা যায়—ওকেও বুকে নেওয়া যায়। শুধু পূজা নয়, শুধু ভক্তি নয়, শুধু দূর হতে নমস্কার নয়, নিজেকে একেবারে ঐ মহাপুরুষের স্নেহস্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া যায়, মিশিয়ে দেওয়া যায়। বেঁচে গেলাম গো বেঁচে গেলাম। ঐ স্তম্ভিত গিরির বাহ্য রুক্ষতাকে পাতার শ্যামল শোভায় ফুলের নানা রঙে ভরিয়ে দেওয়া যায় এ সাহস আমার মিষ্টিকথার মিষ্টি কথায় আমার প্রাণে জোয়ারের মত সজোরে এসেছে। আমি ভয় হতে অভয়ে, অনাশ্রয় হতে আশ্রয়ে উত্তীর্ণ হলাম। ও আমার সুভাষিণী, ও আমার মিষ্টিকথা, তুমি আমায় বাঁচালে। আমার ধূসর আকাশে ঐ সজল জলদকে নতুন শোভায় জাগিয়ে তুমি আমায় বাঁচালে, ভাই, বাঁচালে। তুমি যাকে ভালবাসতে পার, তাকে কি আর আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারি? সে আমার হৃদয়াকাশে এতদিন ভীষণ উষ্ণতা হয়ে বিরাজ করছিল, আজ তোমার অশ্রু-শীতল নিশ্বাসে সে আজ কান্তকোমল শ্যামল মেঘের শোভায় মধুর বর্ষণোন্মুখ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার প্রাণ-চাতক বেঁচে গেল গো, বেঁচে গেল।

* *
*

একি নতুন জীবনস্রোত আমার সমস্ত দেহে প্রবেশ করছে! এও যে আমায় আগুনের মত তাতিয়ে তুললে! আমি কথা কইতে যাচ্ছি, কিন্তু এ কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে আমার মধ্যে। সারা জীবনের নিজের তৈরি বাঁধ আজ দেখছি শক্ত পাথরের মত হয়ে গিয়েছে। আমি ত পারলাম না। জিভ আমার একেবারে জড় হয়ে গিয়েছে—কোথায় মা বাক্‌দেবী! এক মুহূর্ত্তের জন্য দয়া কর মা—একবার তাকে বলতে দাও যে তোমার জয় হয়েছে—ওগো তোমারই জয়! হায়, সে তোতলাবার শক্তিটুকু ছিল তা থাকলেও বাঁচতাম। তাও যে আমার নেই! কি হবে!—

পারলাম না—পারলাম না—ও ভাই মিষ্টিকথা, কিছুতেই যে পারলাম না। তোমার বাক্‌শক্তি ধার দিতে পার বোন? তা হলে সারা জীবন ধরে তুমিই আমার এই কথাগুলো তাঁর তৃষিত কর্ণে শুনিয়ো। বোলো, আমি তাঁকে এই শেষ ক'দিন কি যে ভাল বেসেছি তা লিখে যেতে পারব না। মিষ্টিকথা, তোমার মিষ্টি কথায় সু ভাষায় বোলো যে তাঁর সাধনা নিষ্ফল হয়নি—মহাবীর এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। আমার মরণের পর আমার এই হাত দুখানা তুমি নিজের হাতে তুলে তাঁর গলায় দিয়ে বোলো "এই তোমার জয়ের মালা!"

* *
*

পরিয়েছি, আমি নিজে মালা পরিয়েছি। বীরের গলায় তাঁর জয়চিহ্ন দিয়েছি—তার পুরস্কারও আমার ঠোঁটে লেগে আছে। বাঁচালে—আমায় বাঁচালে—

সখী, আর দুদিন আমায় ধরে রাখ—আর একদিন—উঃ এ যে ভয়ঙ্কর আনন্দ—আমার সইছে না যে—

* * *

আর পারলাম না—প্রিয়তম, আমার কথার শেষ হল না—প্রিয়তম, আমার শেষ কথা আমার মিষ্টিকথার জন্য রেখে গেলাম। মিষ্টিকথা, তুমি আমার এই ভারটুকু নিও ভাই—আমার কথা তুমি বোলো ভাই—আর যে লিখতে পারছি না—হাত যে কাঁপছে তবু প্রাণপণে লিখছি—

কাল যদি পারি ত'—

* * *

আর পারলাম না—প্রিয়তম—শেষ কথা শেষ হবে না—সুভা,—শেষ কোরো ভাই—

* *

বেঁচে গেলাম—প্রিয়তম বাঁচিয়েছ আর লিখতে পারব না—কলমটা পড়ে যাচ্ছে—একটু থাম ওরে—আর একটা—

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

বেদ-মন্ত্রে দীক্ষিত যবনাচার্য্য

প্রথম স্তবক—ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ।

পণ্ডিতবর James Adam তাহার প্রণীত "গ্রীসের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্য-পরম্পরা" নামক গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে—

"Heraclitus of Ephesus is unquestionably the most remarkable figure among the Greek philosophical thinkers until we come to Socrates."—

এইরূপে বক্তব্য বিষয়ের গোড়া ফাঁদিয়া কিয়ৎপরে বলিতেছেন

"The book in which the Ephesian philosopher embodied the results of his self-examination [সত্য কথা বলিতে হইলে—the results of his contact with the Indian sages] was written probably in the first decade of the fifth century before Christ. It was known to very few of the ancients; but it survived at least the third century A. D.......If we consider the fragments for a moment without regard to their doctrinal relationship, we must admit that they are unique in ancient literature for impressiveness and strength."

টিপ্পনী।

একটু পরেই প্রকাশ পাইবে যে, Heraclitus-এর ঐ fragmentগুলা ভারতবর্ষের ছাঁচে আপাদ-মস্তক পরিগঠিত; অতএব, তাহা যে, "unique in ancient literature" হইবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"The secret of their (অর্থাৎ ঐ fragmentগুলা'র) power depends partly on the thought, but also to some extent on the style * * *. The one peculiarity which above all others lends distinction to the style of Heraclitus is his constant use of powerful and suggestive comparisons, metaphors, and images, which are none the less imposing because they are occasionally obscure."

টিপ্পনী।

পণ্ডিতবর James Adam জানেন না (জানিবেনই বা তিনি কেমন করিয়া) যে, Heraclitusএর এই-রকম unique ধরণের ভাষা বৈদিক কালের প্রাচীন আর্যভাষা'র অবিকল প্রতিলিপি।

বৈদিক আর্যভাষার একটি নমুনা।

(ঋক্‌বেদ হইতে উদ্ধৃত)

বাণী বলিতেছেন

"অহং সুবে পিতরং অস্য মূর্দ্ধন্।
মম যোনি রপ্সু অন্তঃসমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু উ বিশ্বা।
উত অমূং দ্যাং বর্ষ্মণা উপস্পৃশামি।"

[বাংলা] "এই পৃথিবীর মূর্দ্ধস্থিত পিতা দ্যৌ'কে আমি প্রসব করিয়াছি। আমার উৎপত্তিস্থান অন্তঃসমুদ্রের অপ্‌রাশিতে (অর্থাৎ সমুদ্রের গভীর অন্তস্তরের পরিব্যাপ্ত জলরাশিতে)। সেখান হইতে আমি সমস্ত বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া সমুত্থান করি, এবং ঐ দ্যৌ'কে শরীর দ্বারা স্পর্শ করি।"

তাহার পরে পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন—

"The exordium (অর্থাৎ the introductory part) of Heraclitus' book has been preserved, and forms the natural starting point of our discussion. The first sentence is as follows:

'Having hearkened not unto me, but to the Logos, it is wise to confess that all things are one'."

Heraclitusএর এই যে মস্ত একটা অনন্যবিদিত-পূর্ব্ব নূতন কথা—কিনা "All things are one"—এটা

যে আমাদের দেশের কত কালের পুরাতন কথা, তাহা নিতান্ত ভারতান্ধ না হইলে কাহারো চক্ষে ঢাকা থাকিতে পারে না। কঠোপনিষদে কি লেখে প্রণিধান কর :—

"যদেব ইহ তদ্ অমুত্র—যদ্ অমুত্র তদন্বিহ * * * নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"

[বাংলা] "যাহা এখানে (অর্থাৎ ইহলোকে), তাহা ওখানে (অর্থাৎ পরলোকে); যাহা ওখানে, তাহারই প্রতিচ্ছবি এখানে * * * *। এ ভবে এমন কিছুই নাই যাহা নানা", অর্থাৎ সবই এক—All things are one.

কিন্তু সে যা হো'ক্—Heraclitus এই যে বলিতেছেন —"Having hearkened not unto me, but to the Logos"—Logos ব্যক্তিটা কে? বড় কঠিন প্রশ্ন!

কী যে ইহার উত্তর দিব—ভাবিতেছি তাই! ভাবনা-নদীর কূলকিনারা দেখিতেছি না। আমার এই ক্ষুদ্র মনস্তরী মাঝগঙ্গায় টলমলায়মান—এগোনো-ও বিপদ্—পিছোনো-ও বিপদ্! আমার এই ঘোর বিপদের অবস্থায় —বেদোপনিষদের দেবতুল্য নাবিক মহাত্মারা মা ভৈ র্মা ভৈঃ শব্দে দৃঢ়রূপে হাইল্ আঁটিয়া ধরিয়া—স্বধারা-মতে পাইল্ তুলিয়া—এবং প্রাণপণে দাঁড় টানিয়া—নৌকাটিকে নিমেষের মধ্যে পরপারের কিনারায় লাগাইলেন; কিনারায় লাগাইয়া আমাকে সত্যৈকভরসা-নামক একজন বলিষ্ঠ নাবিকের স্কন্ধে আরোহণ করাইলেন। নাবিক-মহাপুরুষটি নিম্নপ্রদর্শিত কয়েকটি ধাপের একটির পর আরেকটিতে উত্তরোত্তর-ক্রমে পদ-নিক্ষেপ করিয়া উঁচা পাড় ভাঙিয়া আমাকে অবলীলা-ক্রমে নিরাপদ কূলে পৌঁছাইয়া দিলেন।

১ম ধাপ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ-মালার দ্বিতীয় অধ্যায়ে * এই যে দুইটি ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে—

"পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম।"

"ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম।"

[বাংলা] "জিজ্ঞাসা করি বাণীর পরম প্রতিষ্ঠা কে?"

"ব্রহ্মা-ইনি বাণীর পরম প্রতিষ্ঠা।"

* বিগত চৈত্রের প্রবাসীতে প্রকাশিত "পরাবিদ্যা এবং অপরা-বিদ্যা" শিরস্ক প্রবন্ধটি দেখ।

—এই দুইটি ঋক্‌মন্ত্রের কথার ভাবে বেশ এটা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপা —বাণী বা সরস্বতী তেমি ব্রহ্মার শক্তিস্বরূপা। পুরাণ-তন্ত্রাদিতে কিন্তু বিরিঞ্চিকে যেরূপ অবিরিঞ্চি একশেষ করিয়া সাজাইয়া দাঁড় করানো হইয়াছে, তাহাতে সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা কি পত্নী তাহা ঠিক করিয়া ওঠা কঠিন। পুরাণ-তন্ত্রে যাহাই বলুক, আর যাহাই লিখুক—'সরস্বতী লক্ষ্মীর দিদি-ই কেবল হ'ন" এই কথাটাই লোকত ধর্ম্মত শুনায় ভাল; তা বই, "সরস্বতী শুক্লপক্ষীয় সম্পর্কে লক্ষ্মীর ভাসুর-ঝি—কৃষ্ণপক্ষীয় সম্পর্কে লক্ষ্মীর দিদি" এরূপ একটা কুৎসিত কথা ভদ্রসমাজের কাণে বড্ড বাজে। এ-হেন শাস্ত্র-বিভ্রাট্-স্থলে, আমার বিবেচনায়, "কর্ত্তব্যং মহদাশ্রয়ং"—বেদের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদে এই যে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম" "ব্রহ্মা-ইনি বাণীর পরম প্রতিষ্ঠা।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, দাহিকা-শক্তি যেমন অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিতা—বাণী তেমি ব্রহ্মাতে প্রতিষ্ঠিতা; অথবা, যাহা একই কথা—দাহিকা-শক্তি যেমন অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি, বাণী বা সরস্বতী তেমি ব্রহ্মার স্বাভাবিকী শক্তি। তবেই হইতেছে যে, 'সরস্বতী = ব্রাহ্মীশক্তি = ব্রহ্মাণী। দর্শন-শাস্ত্রের কিন্তু এটা একটা গোড়া'র কথা যে, "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" অর্থাৎ শক্তি = শক্তিমান্, যেমন দাহিকাশক্তি = অগ্নি। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, সরস্বতী = ব্রহ্মাণী = ব্রহ্মা।

২য় ধাপ।

সেণ্ট্ জনের লিখিত খৃষ্টচরিতের ললাটে এই যে একটি মন্ত্র-বচন মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে—

"In the beginning was the Word (Logos), and the Word was with God, and the Word was God."

—এই জর্ডানের জলে কৃতাভিষেক (কিনা baptize করানো) মন্ত্র-বচনটিকে গঙ্গাজলে সুসংস্কৃত করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করাইলে তাহার গাত্রে কেমন দেখ তাহা মানায় সুন্দর :—

"In the beginning was সরস্বতী, and সরস্বতী (as ব্রহ্মাণী) was with ব্রহ্মা and সরস্বতী was ব্রহ্মা, because শক্তি-শক্তি-

মত্তোরভেদঃ'।" তবেই হইতেছে যে, সরস্বতী = হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মা = Logos (the Word)।

৩য় ধাপ।

কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৩য় বল্লীর ১০ম শ্লোকের অন্তর্গত "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" এই বচনটির অর্থ শাঙ্কর ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এইরূপ :—

"সর্ব্ব-প্রাণি-বুদ্ধীনাং প্রত্যগাত্ম-ভূতত্বাদ্ আত্মা; মহান্ সর্ব্বমহত্বাং; অব্যক্তাদ্ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্য-গর্ভং তত্ত্বং বোধাবোধাত্মকং মহান্ আত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে।"

[বাংলা] "জগৎসুদ্ধ সমস্ত জীবের বোধাবোধাত্মিকা সমষ্টিবুদ্ধি যেহেতু প্রতি-জীবের ব্যষ্টিবুদ্ধি অপেক্ষা নিরতিশয় মহান্, এই-হেতু সেই বোধাবোধাত্মিকা সমষ্টিবুদ্ধির প্রত্যাগাত্মা যিনি অব্যক্তের প্রথমজাত সন্তান হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, তিনিই মহান্ আত্মা শব্দের বাচ্য; তাই উক্ত হইয়াছে 'জীববুদ্ধি হ'তে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ'।"

দ্বিতীয় ধাপে দেখিয়াছি যে, ঋক্‌বেদে আছে "ব্রহ্মাই বাণীর পরম প্রতিষ্ঠা" আর, তাহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বাণী বা সরস্বতী ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী; এক্ষণে দেখিলাম—ব্রহ্মা বোধাবোধাত্মিকা সমষ্টিবুদ্ধির প্রত্যগাত্মা; ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বোধাবোধাত্মিকা সমষ্টিবুদ্ধি-ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী। এমতে পাইতেছি যে, বোধাবোধাত্মিকা সমষ্টিবুদ্ধি এবং সরস্বতী উভয়েই ব্রহ্মাণী। তবেই হইতেছে যে, বোধাবোধাত্মিকা সমষ্টিবুদ্ধি = সরস্বতী।

৪র্থ ধাপ।

সাংখ্য-দর্শনে সমষ্টি-বুদ্ধির সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন করা হইয়াছে এইরূপ—"অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ"—"বুদ্ধি কি? না অধ্যবসায়"। অধ্যবসায় কিন্তু বুদ্ধির বহিরঙ্গ মাত্র; বুদ্ধির অন্তরঙ্গ হ'চ্চে বোধ বা জ্ঞান। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, অবোধ অধ্যবসায় এক-প্রকার বরাহের গোঁ; তাহার সঙ্গে বোধ-জোড়া লাগাইয়া না দিলে বুদ্ধির সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক থাকে না। উপরি-উক্ত শাঙ্কর-ভাষ্যের অভিপ্রায়-মতে তাই সমষ্টিবুদ্ধি = বোধ + অবোধ অধ্যবসায়

= বোধাবোধ।

অধ্যবসায়ের গোড়া'র বনিয়াদ হ'চ্চে ক্রিয়া-শক্তি; তা'র সাক্ষী :—

অধ্যবসায় = কর্ম্মোদ্যম = ক্রিয়া-শক্তির স্ফূর্ত্তি।

আনন্দগিরিকৃত টীকায় তাই বোধাবোধাত্মিকা শব্দের অর্থ ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :—"বোধাবোধাত্মিকা অর্থাৎ বোধ বা জ্ঞান এবং অবোধ ক্রিয়াশক্তি এতদ্ উভয়াত্মিকা।" এমতে পাইতেছি—বুদ্ধি = জ্ঞান + ক্রিয়া-শক্তি = Intelligence + efficient energy। এই-সঙ্গে এটাও কিন্তু দেখা চাই যে, সমষ্টিবুদ্ধি বলিতে বুঝায় **সেই হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞিত মহান্ পুরুষের** মহতী বুদ্ধি, যাঁহার **একদিন** মর্ত্ত্য জীবদিগের **একশত যুগ**, তা বই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বুঝায় না। ইহা হইতেই আসিতেছে যে,

(১)

সমষ্টি-বুদ্ধি = সর্ব্ববিষয়-গত জ্ঞান + সর্ব্বসমর্থনী ক্রিয়া-শক্তি = All-pervading universal reason + All-determining efficient energy.

(২)

৩য় ধাপে পাইয়াছি—সমষ্টি-বুদ্ধি = সরস্বতী।

(৩)

২য় ধাপে পাইয়াছি—সরস্বতী = হিরণ্যগর্ভ = Logos.

এইরূপ করিয়া Logos শব্দের ভিতরের অর্থটিকে আমি ২য় ধাপের অস্ফুট অবস্থা হইতে ৩য় ধাপের অর্দ্ধস্ফুট অবস্থায় এবং ৩য় ধাপের অর্দ্ধস্ফুট অবস্থা হইতে ৪র্থ ধাপের সুপরিস্ফুট অবস্থায় ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দাঁড় করাইয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বসুদ্ধ ধরিয়া পাইতেছি —Logos = হিরণ্য-গর্ভ = সরস্বতী = সর্ব্ববিষয়গত জ্ঞান + সর্ব্বসমর্থনী ক্রিয়াশক্তি।

বেদোপনিষদের অন্তর্নিভৃত ঋষিবাক্যের পরিষ্কার আলোকে Logos শব্দের অর্থ আমার বুদ্ধিতে আমি যতদূর যাহা বুঝিয়াছি,—এই তো তাহা ভাঙিয়া বলিলাম; এক্ষণে পণ্ডিতবর James Adam পুরাতন গ্রীক তত্ত্বজ্ঞানী-দিগের লুপ্তাবশিষ্ট পুস্তকের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ড পত্রাবলী ঘাঁটিয়া তাহার মধ্য হইতে উক্ত শব্দটির অর্থ টানিয়া বাহির করিয়াছেন কিরূপ, তাহা দেখা যা'ক্। পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন—

"What is this Logos of which Heraclitus here and elsewhere speaks?......You will observe, to begin with that Heraclitus expressly distinguishes between the Logos and himself—'having hearkened not to me, but to the Logos', i.e., it is not I, Heraclitus, who speak, but the Logos in or through me'."

টীকা।

"Heraclitus distinguishes between the Logos and himself" অর্থাৎ between হিরণ্যগর্ভ or মহান্ আত্মা and জীবাত্মা or অহঙ্কারাত্মক বিজ্ঞানাত্মা। "It is not I who speak, but the Logos in or through me." অর্থাৎ "It is not I who speak, but সরস্বতী in and through me." একটু পূর্ব্বে আমি দেখাইয়াছি যে-হিসাবে শক্তি=শক্তিমান্, সেই হিসাবে সরস্বতী=ব্রহ্মা। "কবির মুখ দিয়া সরস্বতী বলিতেছেন" এরূপ কথা আমাদের দেশে কিছুই নূতন নহে; তার সাক্ষী:—ব্রহ্মা বাল্মীকি মুনিকে কি বলিতেছেন শ্রবণ কর—

> "মহর্ষে যদয়ং প্রোক্ত শ্বয়া ক্রৌঞ্চবধাশয়ঃ,
> শ্লোক এবা স্তুগং বন্ধ স্তব বাক্যস্য শোচতঃ।
> মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী॥
> রামায়ণ। আদিকাণ্ড। ২য় সর্গ। ৩২।৩৩ শ্লোক।

[বাংলা] "মহর্ষে, শোকের আবেগে ক্রৌঞ্চবধের কথা এ যাহা তুমি বলিলে, ইহার শ্লোক বাঁধা হো'ক;—তোমার ঐ বচনটি স্বতঃপ্রবৃত্তা সরস্বতী।"

শুধু তা না—সর্ব্বশাস্ত্রেই বলে যে, সমস্ত বেদ আগাগোড়া ব্রহ্মার বাণী—মন্ত্রপ্রণেতা ঋষিরা নিমিত্ত মাত্র। ইতি টীকা সমাপ্ত।

পণ্ডিতবর James Adam অতঃপর বলিতেছেন,—

"The positive content of the fragments we have hitherto discussed may be expressed in three propositions. The first is that the Logos (ব্রহ্মা) is eternal—both pre-existent (অজ) and everlasting."

টীকা।

আমাদের শাস্ত্রেও তাহাই বলে:—বলে এই যে, ব্রহ্ম এক হিসাবে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, আর এক হিসাবে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বোক্ত হিসাবে তিনি পরব্রহ্ম শব্দের বাচ্য, শেষোক্ত হিসাবে অপর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা শব্দের বাচ্য। "ব্রহ্ম অজ এবং অবিনাশী" এই বেদ-বাক্যটির কুত্রাপি যখন ব্যভিচার সম্ভবে না, আর, অপর ব্রহ্ম যখন কোনো শাস্ত্রেরই মতে পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় ব্রহ্ম নহেন, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সকল শাস্ত্রেরই মতে ব্রহ্মা অজ এবং অবিনাশী।

প্রশ্ন॥ কিন্তু শাস্ত্রে এটাও তো বলে যে, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে অব্যক্ত হইতে জন্মেন এবং প্রলয়কালে অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হ'ন।

উত্তর॥ শাস্ত্রে বলে বটে তাই, কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, ব্রহ্মা-যিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি জন্মমৃত্যুর অধীন।

প্রশ্ন॥ উহার অর্থ তবে কী?

উত্তর। উহার অর্থ শুধু এই যে, সূর্য্য যেমন নিশাবসানে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, এবং দিনাবসানে ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হয়, ব্রহ্মা তেম্নি আপনার স্বায়ম্ভবী শক্তির বলে সৃষ্টিকালে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হ'ন এবং প্রলয়-কালে ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হ'ন। এই স্বায়ম্ভবী শক্তিতে ভর করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্ব্বেও অনাদিকাল বর্ত্তমান ছিলেন এবং সৃষ্টির পরেও অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকিবেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই নির্বিতর্কে স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইতি টীকা সমাপ্ত।

পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন "Secondly, (Heraclitusএর মতে) all things happen through the Logos."

টীকা।

আমাদের শাস্ত্রেও তাহাই বলে হিরণ্যগর্ভ logosএর এক নাম স্বয়ম্ভূ, আর এক নাম বিধাতা। ব্রহ্মা=বিধি=বিধাতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে হো'ক আর যখনই হো'ক যাহা কিছু ঘটে, তাহা তাঁহারই অনুজ্ঞা-ক্রমে ঘটে; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি রেণুকণাও স্থানচ্যুত হইতে পারে না। ইতি টীকা সমাপ্ত।

পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন—

'And, in the third place, (Heraclitusএর মতে) the duty of man is to obey this universal Logos and so to place himself in harmony with the rest of nature."

টীকা।

আমাদের শাস্ত্রেও তাহাই বলে। তার সাক্ষী কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৩য় বল্লীর ১৩শ শ্লোকে আছে—

"জ্ঞানং আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ"।

[বাংলা] সাধক জ্ঞান'কে অর্থাৎ অহঙ্কারাত্মক বুদ্ধিকে মহান্ আত্মার অধীনে অর্থাৎ সমষ্টি-বুদ্ধির—Universal reasonএর—logosএর—অধীনে সঁপিয়া দিবেক।" ইতি টীকা সমাপ্ত।

পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন—

"Are we to suppose, then, that the Logos of Heraclitus is only a sovereign ordinance or law [বিধির (কিনা ব্রহ্মার) বিধান], which Nature invariably obeys, and which man must follow, if he is to play his appointed part in the economy of the world? This is virtually the interpretation given by Heinze. It will be remembered, however, that in one of the passages already discussed, Heraclitus opposes the universal Logos (সমষ্টি-বুদ্ধি=মহান্ আত্মা) to a sort of private intelligence (to অহঙ্কারাত্মিকা ব্যষ্টি-বুদ্ধি).........From so marked an antithesis we may provisionally infer that the Heraclitean Logos is itself intelligent (মহান্ আত্মা হিরণ্যগর্ভ যদি intelligent নহেন—intelligent তবে কে?); and the inference is supported by two other fragments, in which the allusion to the Logos is too obvious to be mistaken. 'There is but one wisdom, to understand the knowledge by which all things are steered through all. The Logos, we have seen, is the power through which all things come to pass (সর্ব্বসমর্থনী ক্রিয়াশক্তি) and consequently identical with the knowledge that steers (তরায়) all things (যোগের ভাষায়—তারক জ্ঞান)।"

টীকা।

বেদোপনিষদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ বচন হইতে সার মন্থন করিয়া **আমিও যে** অবিকল উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা আমি কিয়ৎ পূর্ব্বে দেখাইয়া চুকিয়াছি; আমি দেখাইয়াছি যে, logos=হিরণ্যগর্ভ=সর্ব্ববিষয়গত জ্ঞান+সর্ব্বসমর্থনী ক্রিয়াশক্তি। ইতি টীকা সমাপ্ত।

পণ্ডিতবর James Adam কিয়ৎপরে বলিতেছেন—

"From this it appears that the Heraclitean Logos, if not exactly synonymous with "reason," is something whose essential nature is rationality, intelligence, or thought."

টীকা।

অনতিপূর্ব্বে আমি কঠোপনিষদের ৩য় বল্লীর ১০ম শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য হইতে সার নিষ্কর্ষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, **বুদ্ধি বোধাবোধাত্মিকা** অর্থাৎ বোধ এবং অবোধ এতদুভয়াত্মিকা। সাংকেতিক ভাষায়—**বুদ্ধি**=বোধ+অবোধ অধ্যবসায়=জ্ঞান+ক্রিয়াশক্তি; তাহার মধ্যে জ্ঞান (reason)=বুদ্ধির অন্তরঙ্গ; ক্রিয়াশক্তি=বুদ্ধির বহিরঙ্গ। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, সমষ্টি-বুদ্ধি যেহেতু=Logos=সর্ব্ববিষয়গত জ্ঞান (Universal reason)+সর্ব্বসমর্থিনী ক্রিয়াশক্তি (Creative energy); এইহেতু Universal reason=Logosএর অন্তরঙ্গ, Creative energy=Logosএর বহিরঙ্গ। ইতি টীকা সমাপ্ত।

অতঃপর পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন—

"It is another question by what English equivalent we should attempt to render a word so full of meaning. I am disposed to think that if we are forced to select a single term, we shall do well to follow the latest editor, Professor Diels, and speak of 'the Word' rather than of 'Reason'.........There is nothing impossible in such a use of the term Logos so early as Heraclitus: for thought had already been represented by Homer as the language of the soul."

টীকা।

Logos যে কি অর্থে বাণী বা ব্রহ্মাণী তাহা আমি অনতিপূর্ব্বে দেখাইয়া চুকিয়াছি। ইতি টীকা সমাপ্ত।

পণ্ডিতবর James Adam তাহার পরে বলিতেছেন—

"We have next to consider whether the Logos of Heraclitus is a purely spiritual essence, or a material substance endowed with the property of thought."

এ প্রশ্নের উত্তর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অনেক কাল পূর্ব্বে দিয়া চুকিয়াছেন। কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৩য় বল্লীর ১০ম শ্লোকের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন "হৈরণ্যগর্ভ তত্ত্ব (Greek ভাষায়—Logos) বোধাবোধাত্মক অর্থাৎ বোধ এবং অবোধ উভয়াত্মক।" আনন্দগিরি উহার টীকা করিয়াছেন এইরূপ যে, বোধাবোধ=জ্ঞান+ক্রিয়াশক্তি। ইহাতে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, Logosএর অন্তরঙ্গ=জ্ঞান =Reason, Logosএর বহিরঙ্গ=ক্রিয়াশক্তি। একটু

বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ক্রিয়াশক্তিও ঐ রকমের দুই অঙ্গে বিভক্ত ;—তাহার অন্তরঙ্গ=প্রকরণ, এবং বহিরঙ্গ=উপকরণ। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—প্রণিধান কর।

আগ্নেয় ক্রিয়াশক্তির প্রকরণ তিন প্রকার :—

(১) প্রতাপন অর্থাৎ তাপস্ফুরণ।

(২) প্রদাহন অর্থাৎ প্রবিভাজন।

(৩) প্রদ্যোতন অর্থাৎ জ্যোতিস্ফুরণ।

উহার উপকরণও তিন প্রকার :—

(১) কঠিন শ্রেণীর দাহ্য পদার্থ—যেমন কাষ্ঠ।

(২) তরল শ্রেণীর দাহ্য পদার্থ—যেমন ঘৃত।

(৩) বিয়ৎ শ্রেণীর দাহ্য পদার্থ—যেমন বায়ু।

অতএব, পণ্ডিতবর James Adam প্রশ্ন এই যে একটি উত্থাপন করিয়াছেন—

"Whether the Logos of Heraclitus is a purely spiritual essence, or a material substance endowed with the property of thought."—

ইহার শাস্ত্র-সম্মত সদুত্তর এই যে, Logos is a spiritual essence (আত্ম-চৈতন্য) endowed with material প্রকরণ এবং উপকরণের মূলাধার-স্বরূপ সর্ব্ব-সমর্থনী ক্রিয়াশক্তি, তা বই, তিনি purely spiritual essence নহেন—নিরুপাধিক জ্ঞান মাত্র নহেন।

অতঃপর James Adam সাহেব বলিতেছেন—

"The fragments hitherto examined are consistent so far as they go, with the incorporeality of the Logos; but from other fragments that in Heraclitus' philosophy the spiritual is not yet separated from the material. He is still a hylozoist in the fullest sense, although he leaves the milesian thinkers far behind when he invests the primal substance not merely with life, but with rationality or thought."

টীকা।

দুঃখের বিষয় এই যে, পণ্ডিতবর James Adam নিতান্তই ভারতান্ধ; নচেৎ এ দেশীয় শাস্ত্রের বাষ্পও যদি তাঁহার জানা থাকিত তাহা হইলে তিনি সাধ করিয়া এইরূপ একটা স্বকপোলকল্পিত গোলোকধাঁদার মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন না। Heraclitusএর পুস্তকের দুই স্থানে দুই রকম কথা বলা হইয়াছে দেখিয়া—Logosকে এক স্থানে অশরীরী আত্মা এবং আর এক স্থানে শরীরী আত্মা করিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে দেখিয়া—James Adam মহোদয় ভাবিয়াছেন যে "Logos শরীরী আত্মা" এইটিই Heraclitusএর প্রকৃত মন্তব্য কথা—"Logos অশরীরী আত্মা" এটা তাঁর কেবল একটা কথার কথা। আমি কিন্তু তাহা বলি না এইজন্য—যেহেতু আমাদের দেশের বেদোপনিষদে যে-কথা বলে—Heraclitus সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন ;—সে কথা এই যে, Logos শরীরীও বটেন—অশরীরীও বটেন। বেদোপনিষদের অভিপ্রায়-মতে Logos কী অর্থে শরীরী এবং কী অর্থে অশরীরী, তাহা দেখাইতেছি—প্রণিধান কর :—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ,
৩য় অধ্যায়, ৭ম ব্রাহ্মণ, ১৫শ অনুবাক্।

"যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো, যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ, যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং, যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি, এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।"

[বাংলা] "এই যে পুরুষ—যিনি সর্ব্বভূতে থাকিয়া সর্ব্বভূত হইতে অন্তর (চলিত বাংলায়—সর্ব্বভূত হইতে ভিন্ন),* ভূত-সকল যাঁহাকে জানে না, সমস্ত ভূত যাঁহার শরীর, অন্তরে থাকিয়া অর্থাৎ আড়ালে থাকিয়া যিনি সমস্ত ভূত নিয়মিত করেন,—ইনি তোমার অন্তর্যামী আত্মা!"

এমতে পাইতেছি—(১) "অন্তর্যামী Logosএর শরীর=সর্ব্বভূত" এই অর্থে Logos শরীরী আত্মা, আর, (২) "Logos আড়ালে থাকিয়া সমস্ত ভূত নিয়মিত করেন" এই অর্থে Logos অশরীরী আত্মা।

এই-সকল বেদ-বচন হইতে সার নিষ্কর্ষণ করিয়া জীবাত্মা এবং হিরণ্যগর্ভ-সংজ্ঞিত (অথবা যাহা একই কথা, Logos-

* বাংলা "অন্তরে" শব্দ অন্তর-শব্দ হইতে হয় নাই; হইয়াছে তাহা "অন্তঃ" শব্দ হইতে—অন্তঃ=অন্তর=অন্তরে—এইরূপ করিয়া। সংস্কৃত ভাষায়—অন্তঃ শব্দেরই অর্থ ভিতর, তা বই "অন্তর" শব্দের অর্থ ভিতর নহে। অন্তর-শব্দের অর্থ ব্যবধান দ্বারা পৃথক্‌কৃত; ইহাতে ফলে-দাঁড়াইতেছে যে অন্তর=ভিন্ন; যেমন—ভাষান্তর=ভিন্ন ভাষা, পাঠান্তর=ভিন্ন পাঠ, রূপান্তর=ভিন্ন রূপ ইত্যাদি। কোনো স্থলেই অন্তর-শব্দের অর্থ ভিতর নহে। পক্ষান্তরে, অন্তঃ শব্দের অর্থ "ভিতর" ছাড়া আর-কোনো অর্থ কোনো স্থলেই সম্ভবে না; তার সাক্ষী—অন্তরিন্দ্রিয়=ভিতরের ইন্দ্রিয়; অন্তস্তর=ভিতরের স্তর; অন্তঃপুর=ভিতর-পুর।

সংজ্ঞিত) মহান্ আত্মার মধ্যগত ভেদাভেদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এইরূপ :—

(১) জীবাত্মার শরীর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ; মহান্ আত্মার শরীর বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ চেতনাচেতন সজীব-নির্জীব সমস্ত জগৎ।

(২) উভয় শরীরই শরীরী পুরুষের ক্রিয়াশক্তির স্ফূর্ত্তিক্ষেত্র।

(৩) জীবাত্মা বহুল পরিমাণে স্বীয় শরীরের অধীন ; আর, যে-পরিমাণে যিনি স্বীয় শরীরের অধীন, সেই পরিমাণে তাঁহার শরীর তাঁহার কারাগার।

(৪) Logos-সংজ্ঞিত বা হিরণ্যগর্ভ-সংজ্ঞিত মহান্ আত্মা স্বীয় শরীরে অবস্থিতি করিয়াও পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় শরীর হইতে নির্লিপ্ত এবং স্বতন্ত্র, তাই তাঁহার নাম স্বয়ম্ভূ। আর, তাঁহার শরীর সেই যে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড-তাহা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিয়মের অধীন ; তাই তাঁহার নাম বিধাতা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশের কথা

আমাদের দেশে একতার অভাব সর্ব্ববাদীসম্মত। কেন? তার উত্তর দিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। তবে জাতীয় ঐক্যবোধের প্রধান অন্তরায় জাত-বিচার একথা বলা যাইতে পারে। কোনো লোকের সঙ্গে একত্র পানাহার না করিলে যেমন তার সঙ্গে সখ্য প্রগাঢ় হয় না, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাধ পানাহার ও সর্ব্বোপরি বিবাহ যদি না চলে তো জাতীয় একতা সম্পাদিত হইতে পারে না। দেশের ইতিহাস যাহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের অবিদিত নাই যে আমাদের দেশেও এককালে বিবাহের ক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল, এখনকার মত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তখন বিবাহ করিতে হইত না। ফলে তখন দেশ বীর্য্যশালী শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল—তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সাগরপারে মহা-ভারত রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বিবাহ চলিতে থাকিলে, সমাজের মধ্যে নূতন রক্তের আমদানি না হইলে যে সমাজ ক্রমশ দুর্ব্বল নিস্তেজ হইয়া পড়ে একথা বৈজ্ঞানিক সত্য। বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণেই বুদ্ধিমান শক্তিশালী সন্তানের উদ্ভব সম্ভব হয় এ-কথা অনেকেই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। আধুনিক কালে হিন্দুসমাজের কোনো কোনো সম্প্রদায়ে অসবর্ণ বিবাহ চলিলেও উচ্চবর্ণের মধ্যে চলে না। সম্প্রতি কলিকাতা শহরে এক ধনী বৈদ্য ব্যারিষ্টারের কন্যার সহিত এক কায়স্থের হিন্দুমতে বিবাহ হইয়াছে। কন্যার পিতাও ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। সম্প্রতিকার এই অসবর্ণ বিবাহে অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় হিন্দু-সমাজ বিবাহ সম্বন্ধে উদার হইতেছেন। এইরূপই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করি এরূপ অসবর্ণ বিবাহ কেবল ধনীদের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া দেশের নির্ধনদের মধ্যেও সুপ্রচলিত হইবে। আহারের সময় জাত-বিচার বাংলার শহর হইতে প্রায় উঠিয়া গেছে। ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র সকলেই সকলের সঙ্গে একত্র আহার করিয়া থাকেন—প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে। বিবাহের বেলায়ও জাতবিচার না থাকাই উচিত। দেশের মধ্যে এক বর্ণের সঙ্গে অপর বর্ণের, তারপর এক প্রদেশবাসীর সঙ্গে অপর প্রদেশের লোকের যখন বিবাহ চলিবে তখন জাতীয় ঐক্য সহজেই সংঘটিত হইয়া যাইবে—তার জন্য কাহাকেও গলা ফাটাইতে হইবে না।

আমাদের বিশাল দেশের অভাব অপরিসীম। দেশের দুঃখদারিদ্র্যের মোচন করিবার জন্য অসংখ্য কর্ম্মীর প্রয়োজন। নানা উপায়ে নানান পথে দেশসেবা করা যাইতে পারে। আমরা তাই বুঝিতে পারি না, লাট-সভার সদস্যের পদপ্রার্থী একজন কেহ পরাজিত হইয়া অপর কেহ সেই স্থানে নির্ব্বাচিত হইলে কেন গভীর আর্ত্তনাদ ও হাহাকার উঠে, যেন দেশের সর্ব্বনাশ হইল। পূর্ব্ববঙ্গের কেহ নির্ব্বাচিত হইলে পশ্চিম বঙ্গেই বা তাঁর অপদার্থতা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা হয় কেন। যে সত্যসত্যই দেশসেবা করিতে চায় তাহাকে নিজের স্বার্থ দেশের স্বার্থের তলায় রাখিতে হইবে। তবে নিজের স্বার্থহানি হইল বলিয়া এত তীব্র দুঃখ কেন? এ সম্বন্ধে দেশের লোক কি ভাবেন তা নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যগুলি হইতে অনেকটা বোঝা যাইবে। "বরিশাল-হিতৈষী" বলেন—

আজ দেশ-হিতৈষী বলিয়া বড়াই করিয়া যাঁহারা দেশের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার দাবী করেন, বিজয়ী বীরের মত যাঁহাদের অশ্বমুক্ত গাড়ী দেশবাসী টানিয়া আনে—তাঁহারা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা দেশের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন? তাঁহারা কি বলিতে পারেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন স্বেচ্ছায় স্বদেশসেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন! এবং তাঁহাদের তজ্জন্য কতখানি ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। তাঁহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন অপর দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাদের এতটুকু ত্যাগ স্বীকারের জন্য কি পরিমাণ সম্মান তাঁহারা পাইতেন।

দেশে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একজন আধজন একটু আধটুক দেশের কথা বলেন ও ভাবেন—আর সে বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় আপন বাঁচাইয়া দু-একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অতি বিরল—তাই এদেশে স্বদেশসেবী বলিয়া তাঁহাদের সম্মানের অবধি নাই। কে এমন সাহসী স্বদেশসেবক আছেন বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন—আমি স্বদেশকে সেবা করিতে যাইয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছি—কে স্বদেশ-সেবায় লাঞ্ছিত হইবার দুঃখ বরণ করিতে পারেন! আমরা ত দেখি সুখে স্বচ্ছন্দে দিবসের সর্ব্ববিধ আপন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তবে অবসর-মত দেশের কার্য্য করা হয়—ইহার নাম ত্যাগ স্বীকার! ইহার পর দেশের লোকের নিকট সম্মান পাইলাম না বলিয়া আক্ষেপ করা হয়!

"রংপুর-দিকপ্রকাশ" বলেন—

আমাদের মনে হয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যগিরির জন্য দেশসেবা-প্রণোদিত হইয়া অতি কম লোকেই উমেদারী করিয়া থাকেন, লাট-দরবারে প্রতিপত্তি এবং অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহিত সদ্ভাব প্রভৃতির লালসাই এই-সমুদায় ঐকান্তিকতার জননী। আর যিনিই সদস্য হউন, কেবল মাত্র লাটদরবারের প্রশ্নোত্তরের ফলে যে ভারতের মোক্ষলাভ হইবে এ বিশ্বাস শিক্ষিত সমাজে ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে। দেশের মঙ্গল সাধনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে লাটদরবারের বাহিরে থাকিয়াও যথেষ্ট কাজ করা যাইতে পারে।

"চারুমিহির" বলেন—

যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনয়ন করিতে অধিকারী তাঁহারা অধিকাংশ স্থানে দেশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল মাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভোট দিয়া আসিতেছেন। ইহারা সভ্যপদ প্রার্থীর যোগ্যতা বা অযোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য করেন না; তাঁহারা কেহ কখনও কোন-প্রকার কোন হিতকর কার্য্য করিয়াছেন কি না, দেশের কল্যাণে কখনও কোন স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন কি না, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইলে নির্ভীকচিত্তে দেশ-হিতকর কার্য্য করিতে ও গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিতে সমর্থ হইবেন কি না ইত্যাদি আবশ্যকীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনুসন্ধান না করিয়া কতকগুলি সঙ্কীর্ণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভোট দিয়া আসিতেছেন। মিউনিসিপালিটীতে বলুন, ডিষ্ট্রিক্ট ও লোকেলবোর্ডে বলুন, আর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের কথাই বলুন, যেন সর্ব্বত্রই এক ভাব। সর্ব্বসাধারণের হিতকল্পে ইঁহাদের হাতে যে ভার অর্পিত হইয়াছে তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়া ব্যক্তিগত অনুরোধ উপরোধে বাধ্য হইয়া এই দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী লোকের আজকাল অভাব নাই। যাঁহারা জীবনে কোন দিন কোন দেশ-হিতকর কার্য্যে যোগদান করেন নাই, স্বার্থত্যাগ কাহাকে বলে যাহারা জানেন না, সাধারণের উপকারার্থে এক মুহূর্ত্ত ব্যয় করিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত, নিজ, নিজের পরিবার ও নিজের আত্মীয়স্বগণ এই ত্রিগণ্ডিতে যাঁহাদের স্বদেশবাৎসল্য সীমাবদ্ধ, সমাজের ও দেশের লোকের উপকার করিতে সমর্থ হউন বা না হউন "মাননীয়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বুক ফুলাইয়া রেলে ষ্টীমারে পরিভ্রমণ করা যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহারাই জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে প্রয়াসী ও যত্নবান।

"পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী" বলেন—

যেন তেন প্রকারেণ নির্ব্বাচিত হইয়া, দেশবাসীর মতামত গ্রহণ না করিয়া এখন আর চলিবে না। নির্ব্বাচিত সভ্যগণ জনসাধারণের মুখ-পাত্র, জনসাধারণের বাণীই তাঁহাদের বাণী। সমাজের নৈতিক মেরদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা অসূয়া দ্বেষ উচ্চ মহান আদর্শকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। তাই উচ্চ চরিত্রের অভাবে গোখলের ন্যায় মহাপুরুষ-দিগের গম্ভীর বাণী আর সভাসমিতিতে ব্যবস্থাপক সভায় শোনা যাইতেছে না। নামকা ওয়াস্তে হইলে দেশ-সেবার মহাভাব ফল্গুনদীর ন্যায় মনের মধ্যে প্রবাহিত হয় না। নির্ব্বাচনের সময় নানা ভাবে দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া যাঁহারা ভোট সংগ্রহ করেন, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলে তাঁহারা নিজকে জন-সাধারণ হইতে অনেক তফাৎ মনে করেন।

বাংলা দেশের অধিবাসী যাঁরা এবং যাঁদের ভাষা বাংলা তাঁরাই বাঙালী। ধর্ম্মগত বা আচারগত পার্থক্য থাকিলেও সকল বাঙালীরই মধ্যে সদ্ভাব ও জাতীয় কার্য্যে ঐক্য থাকা দরকার। সহযোগী "মোহাম্মদী" দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—

আজকাল দেশের যত আন্দোলন আলোচনা, যত "সম্মেলন" ও সম্ভাষণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, বাঙ্গালী শব্দটি "হিন্দু" অর্থেই ব্যবহার হইয়া থাকে। সংবাদপত্রগুলিতেও প্রায় এই পরিভাষায় শব্দটির প্রয়োগ হইয়া থাকে। বঙ্গের শতকরা ৫২ জন "বাঙ্গালী"কে এরূপ-ভাবে বাদ দেওয়া হইতেছে কেন? বাঙ্গালী খৃষ্টানদিগকেও গণনার মধ্যে আনা হয় না কেন?—অনেকে হয়ত অসন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু আসল কথা এই যে, আমাদের হিন্দুভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকেই এখনো সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী পার হইতে পারেন নাই। এখনো তাঁহাদের ভাষায় "ভদ্রলোক" বলিতে মাত্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ—হিন্দু। মুসলমানগণ "ভদ্রলোক" হইতেই পারে না।

কোনো হিন্দু বাঙালীর মনের ভাব এরূপ হইলে জাতীয় ঐক্য সুদূর-পরাহত হইবে।

"যশোহর" পত্রিকায় পড়িলাম—

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহোদয়ের অনুগ্রহে এবং অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের উদারতায় কায়স্থ ছাত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রকুমার ব্যাকরণ-কাব্য-সাংখ্য-তর্ক-তীর্থ বেদান্ত পড়িবার জন্য টোলে ভর্ত্তি হইয়া নিস্তারিণী দাসীর ব্রাহ্মণ ছাত্রাবাসে থাকিবার স্থান পাইয়াছেন। গত ১৯শে আষাঢ় সোমবার কলেজ ও টোলের তাবৎ অধ্যাপক লইয়া একটি সভা হয়। তাহাতে চারিজন অধ্যাপক ভিন্ন অপর ৩২ জন, কায়স্থ ছাত্রের সর্ব্বশাস্ত্র পড়িবার অধিকারে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া স্বাক্ষর করেন। তৎপর ডাঃ বিদ্যাভূষণ শ্রীমান সুরেন্দ্রকে বেদান্ত ক্লাশে ভর্ত্তি করিবার আদেশ প্রদান করিয়া, এই-প্রকার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কায়স্থ ছাত্রের স্মৃতি মীমাংসা প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র পড়িবার অধিকার লিপিবদ্ধ করেন।

এই অনুষ্ঠানে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের (চারজন ছাড়া) ন্যায়পরতার পরিচয় পাওয়া গেল। জগতের সকল নরনারীরই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানলাভে জন্মগত অধিকার আছে। একথা যারা অস্বীকার করে তারা স্বার্থপর। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণের এই স্বার্থপরতার কলঙ্ক কতকটা মোচন হইল। এরূপ কাজে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের লোকেদের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি বাড়িবে বই কমিবে না।

সাহিত্য-পরিষদ ও সম্মিলনী সম্বন্ধে "রত্নাকর" নিম্নোদ্ধৃত সমীচীন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

আজকাল সাহিত্য-পরিষদ ও সাহিত্য-সম্মিলনীগুলিতে বড় বড় রাজকর্ম্মচারী, নামজাদা বারিষ্টার এবং রাজামহারাজাদিগকে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। ইহারই নাম কি সাহিত্য-সেবা! কালের প্রভাব অতিক্রম করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। আজকাল অর্থই পরমার্থ। অর্থহীন সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-সেবার জমকালো আসর হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হইবেন তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

———　　সু—।

পুস্তক-পরিচয়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ। ১৯১৬। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

এই পুস্তকখানির বিস্তৃত সমালোচনা আমরা পরে করিব। এক্ষণে কেবল সামান্য এবং প্রধানতঃ বাহ্য পরিচয় দিতেছি। ইহা ভাল পুরু কাগজে নূতন বড় অক্ষরে সুমুদ্রিত। পৃষ্ঠা লম্বায় প্রবাসীর সমান, চৌড়ায় কিছু কম। পৃষ্ঠার সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৮০৬। তা ছাড়া আর্ট পেপারে ছাপা ২৯ খানি ভাল ছবি আছে। সুন্দর কাপড়ের মলাট, তাহার উপর সোনালি অক্ষরে গ্রন্থের, গ্রন্থকারের ও প্রকাশকের নাম লেখা আছে। মূল্য সাড়ে তিন টাকা কমই বলিতে হইবে।

গ্রন্থখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে মহর্ষির জীবনকে বাহির ও ভিতর উভয় দিক্ হইতেই দেখান হইয়াছে। তাঁহার জীবনের জ্ঞাতব্য বাহ্য ঘটনা-সকল ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ও ধর্ম্মতত্ত্বেরও ক্রমপরিণতি কিরূপ হইয়াছিল, তাহাও দেখান হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ বাঙালীর জীবনের অনেক কথা ইহা হইতে জানা যায়। তিনি যে-সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনকার ভাল মন্দ দুই দিক্ই অপক্ষপাতে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিতের অনেক উপাদান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা এখনও আছে, তাহা বহু যত্নে ও পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহাকে ইহার জন্য গভীর চিন্তা করিতে হইয়াছে, এবং কোন কোন বিষয়ে দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের মত মনীষীর উপদেশ ও সাহায্য পাওয়ায় তাঁহার গ্রন্থ অধিকতর মূল্যবান্ হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ একাধারে সাধক, ঋষি, কবি, ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, দেশভক্ত গৃহস্থ ছিলেন। এই নির্ম্মলচেতা পুরুষপ্রবরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনে আমাদিগকে সমর্থ করিয়া গ্রন্থকার বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যাঁহাদের দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ও যোগের সৌভাগ্য ঘটে নাই, তাঁহারা এই গ্রন্থ না পড়িলে আধুনিক ভারতবাসীর শক্তি কোথায়, গৌরব কোথায়, সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহাদেরও অনেকে সব কথা ত জানেন না, জানিলেও সব কথা মনে থাকে না; এবং জানিয়া মনে করিয়া রাখিলেও ত যথেষ্ট হয় না। চরাচর বিশ্ব ত সব মানুষই দেখে, কিন্তু তাহার রহস্য, সৌন্দর্য্য, মর্ম্ম উদ্ঘাটন কবি-ঋষিরাই করিয়াছেন। বিশ্বের পক্ষে কবি-ঋষিরা যাহা করেন, শ্রেষ্ঠ চরিতাখ্যায়কেরা জগতের প্রধান মানুষদের পক্ষে তাহা করেন। অজিত বাবুর দ্বারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এই কার্য্য সাধিত হওয়ায় তাঁহার গ্রন্থ সার্থক হইয়াছে।　　সম্পাদক।

———

"বেদান্তের চাষ" সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ

ভাদ্রের প্রবাসীতে বেদান্তের চাষ নামে পাদপূরণের একটি দ্বিপদী কবিতা পড়িয়া অনেকে উহা জাতিবিশেষকে বা ব্যক্তি-বিশেষকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে মনে করিয়াছেন। প্রবাসীর ন্যায় কাগজে ইহা কেমন করিয়া স্থান পাইল তাহার কৈফিয়ৎ অনেকে চাহিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা কৈফিয়তের অপেক্ষা না করিয়াই যথেচ্ছ গালাগালি করিয়াছেন। প্রবাসী মাসিকপত্র; কোনো মাসের কোনো বিষয়ের কৈফিয়ৎ পরের মাসের আগে দিবার উপায় প্রবাসীর হাতে যখন নাই তখন গালিবর্ষণটা সেই পর্য্যন্ত মুলতবি রাখিলে নিজেদের ভদ্রতারই পরিচয় দেওয়া হইত।

কোনো আপত্তিজনক বিষয় দুইরকমে কাগজে স্থান পাইতে পারে—(১) ইচ্ছায় ও জ্ঞাতসারে, অথবা (২) কোনো রচনার যে দ্ব্যর্থ আছে তাহা আন্দাজ না করিতে পারাতে।

আমাদের ত্রুটি ধরিয়া যাহারা গালাগালি করিয়াছেন তাঁহারা ঐ দ্বিতীয় কারণটির সম্ভাবনা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

সম্পাদক সমস্ত বিষয়ের জন্য technically দায়ী থাকিলেও একখানা বড় কাগজের সমস্ত খুঁটিনাটি দেখা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হয় না, তাঁহাকে সহকারীদের উপর নির্ভর করিতে হয়। ঐ দু-লাইন কবিতা ছাপাতে যদি কিছু অন্যায় হইয়া থাকে তাহা আমারই বুঝিবার ভুলে হইয়াছে, ইহার জন্য লেখক বা সম্পাদক কেহই নিন্দনীয় নহেন।

কবিতাটি আমাদের হস্তগত হইয়াছিল এই আকারে—

"বরোজে না হয়ে পান হইলে বেদান্ত
ব্যসনীর দুঃখ, কিন্তু দেশ ধন্য হত।"

আমি ঐ কবিতাটিকে একটু পরিবর্ত্তন করিয়া করিয়াছিলাম—

বরোজে না ফলে' পান ফলিলে বেদান্ত
বারুই হইত বিজ্ঞ, কাব্যের প্রাণান্ত।

বরোজ ও পান আসল কবিতায় ছিল বলিয়া আমার মনে পানের ব্যাপারী অর্থে বারুই শব্দটি আসিয়াছিল, জাতিবিদ্বেষ হইতে নহে; গোরু ও দুধের কথায় গোয়ালা ও জুতা সেলাইএর প্রসঙ্গ থাকিলে মুচির কথাই মনে হইত।

ঐ কবিতার অন্তরগত ভাবটি নানা উপমায় প্রকাশ করা চলিতে পারিত।—

(১)

মাটিতে না ফলে' ধান ফলিলে বেদান্ত,
চাষারা হইত বিজ্ঞ, কাব্যের প্রাণান্ত।

(২)

গরুতে না দিয়ে দুধ দিলে সে বেদান্ত,
গোয়ালা হইত বিজ্ঞ, শিশুর প্রাণান্ত।

(৩)

খেজুরের গাছে যদি ঝরিত বেদান্ত,
রসের অভাব হ'ত শিওলি মোহান্ত।

এইরূপে ad infinitum চালানো যাইতে পারে।

ঐ তিনরকমের কবিতা হইতে কি ইহাই মনে করিতে হইবে যে (১) বৈদান্তিক মাত্রকেই চাষা বলা হইয়াছে বা (২) যে বৈদান্তিকের পূর্ব্বপুরুষের কৌলিক বৃত্তি ছিল কৃষি বা দুগ্ধদোহা বা খেজুর-রস সংগ্রহ তাঁহাকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে? সাধারণ নির্দ্দোষ উপমা মনে করিয়া সরল অর্থ কি অচিন্তনীয়? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্যবর্ণনায় একটি শ্লোক আছে—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

ইহাতে সর্ব্বোপনিষদকে গোরু, গীতাকে দুগ্ধ, অর্জ্জুনকে গো-বৎস ও শ্রীকৃষ্ণকে গোপের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; সকলে এই শ্লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেন, কেহ ভাবেন না যে লেখক সম্মানের যোগ্যকে ব্যঙ্গ বা অবজ্ঞা করিয়াছেন। উপমার প্রসঙ্গে কোনো জাতির উল্লেখ হইলেই কি অনুমান করিতে হইবে সেই জাতিকে অসম্মানের উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে? মহাকবি মধুসূদন মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম সর্গে লিখিয়াছেন—

"বরোজে সজারু পশি বারুইর, যথ
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর।"

মধুসূদন নিশ্চয় কোনো জাতিবিদ্বেষ হইতে উহা লিখেন নাই; নিশ্চয়ই তিনি বারুইদিগকে ভীরুতা বা অসহায়তার দৃষ্টান্তস্থল মনে করিয়া এই উপমার সৃষ্টি করেন নাই।

আমাদের দেশের প্রত্যেক ব্যবসাই জাতিগত হইয়া গিয়াছিল; যে জাতির যে ব্যবসায় কৌলিক তাহা ছাড়া অপর কিছু করা যেন মহা অন্যায় বলিয়া অনেকের মনে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ই যে সাধু ও অনবজ্ঞেয় এ বোধ নাই; সেইজন্য কোনো বিশেষ দ্রব্যের ব্যবসায়ীর উল্লেখ করিতে হইলে জাতের উল্লেখ অনিবার্য্য হয় এবং তাহাতে সেই জাতের লোক সহসা মনে করিয়া বসেন তাঁহাদের আত্মসম্মানে আঘাত করা হইয়াছে। অপরে আমাকে বিদ্রূপ করিবে এই ভয়ে শঙ্কিত হইয়া সন্ত্রস্ত থাকিলে বিনা কারণেই মনে আঘাত লাগে এবং তাহাতে লোকের ক্ষেপাইবার প্রবৃত্তিকেই জাগ্রত করিয়া তোলা হয়। এইরূপ অবস্থার একটি গল্প আছে যে, এক জামাই শ্বশুরবাড়ী গিয়া সদাই সতর্ক হইয়া ছিল পাছে তাহাকে কেহ অসম্মান দেখায়। শাশুড়ী আসিয়া আদর করিয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা, বাড়ীতে টাটকা মুড়কি করেছি, দুটি খাবে?' অমনি জামাই চটিয়া আগুন—'কী! এতবড় আস্পর্দ্ধা আমাকে ছুঁচো বলা!' শাশুড়ী আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া মিনতি করিয়া বলিলেন—'সে কি বাবা, মুড়কি খেতে বললে ছুঁচো বলা হল কি করে?' জামাই তর্জ্জন করিয়া বলিল—'হল বৈকি! খৈ আর গুড় দিয়ে হয় মুড়কি! গুড় আনে গোরুরগাড়ী করে! গোরুরগাড়ী করে ক্যাচকোঁচ! ছুঁচো করে ক্যাচকোঁচ! আমাকে ছুঁচো বলা হল না?' জামাইএর এই নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত দেখিয়া শ্বশুরবাড়ীর গ্রামসুদ্ধ লোক তাহাকে 'মুড়কি' বলিয়া ক্ষেপাইতে সুরু করিয়া তাহাকে গ্রামছাড়া করিয়া ছাড়িল।

এইরূপ হইতে পারিবার একটু শঙ্কা আমার মনে থাকিলেও, আমি জাতিবাচক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলাম এই ভরসাতে যে, যে কাগজ কোনো জাতিকেই কখনো ছোট মনে করে না বা কোনো জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানে না, সেই কাগজে একটা জাতির প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ দেখিয়া কেহ ভাবিবেন না যে সেই জাতিকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে; আমি জাতিবাচক শব্দটি বিশেষ দ্রব্যের ব্যবসায়ী অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলাম, জাতিবাচক শব্দরূপে নহে। প্রবাসীর পূর্ব্বাপর মত ও অন্তরগত উদ্দেশ্য দেশের পাঠকসাধারণ যে এই ষোল বৎসরেও বুঝিতে পারেন নাই ইহা আমি অনুমান করিতে পারি নাই। যে ব্যক্তি-বিশেষকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছে তিনি ত নানা কারণে প্রবাসীর ও আমার সম্মান্য ও শ্রদ্ধাভাজন।

যাহাই হোক লোকে ঐ কবিতা হইতে একটি দুষ্য অর্থ অনুমান করিতেও যে পারিয়াছে এবং তাহাতে লেখক ও প্রবাসীর উপর যে অবিচার হইয়াছে তাহার জন্য আমারই অসাবধানতা দায়ী, মন্দ অভিপ্রায় নহে। আমি সকলকার কাছে প্রকৃত ব্যাপার নিবেদন করিলাম, আশা করি এখন সুবিচার করা কঠিন হইবে না। আমার অনভিপ্রায় সত্ত্বেও আমি যে বহু লোকের মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কারণ হইয়াছি তাহার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ। যাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন বা অপমান বোধ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের কাছে আমি বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রবাসীর সহকারী-সম্পাদক।

ভাদ্রের প্রবাসীতে প্রকাশিত "বেদান্তের চাষ" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিয়া যাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ও অপমান বোধ করিয়াছেন, এবং যে-সকল পাঠক দুঃখিত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিকট সরল অন্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

কোন কোন সংবাদপত্রে যাঁহাকে এই কবিতার লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, খবরের কাগজে আন্দোলনের অনেক পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছি, এবং তিনি স্বীয় ঔদার্য্য-গুণে কবিতা-সংসৃষ্ট সকলকে ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার চিত্তে কোন বিকার হয় নাই।

যাঁহারা প্রবাসী পূর্ব্বাপর পড়িয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বিচার করিতে পারিবেন, যে, জাতির (casteএর) জন্য কাহাকেও জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক উপহাস বা বিদ্রূপ করা প্রবাসীর পক্ষে সম্ভবপর কি না।

এই উপলক্ষে কেহ বা সংবাদপত্রে লিখিয়া, কেহ বা আমাকে চিঠি লিখিয়া আমার নিন্দা করিতেছেন; কেহ কেহ মিথ্যা কথাও প্রচার করিতেছেন। আমার এই-প্রকারে নিন্দাভাজন হওয়া সুখের বিষয় না হইলেও, সুখের বিষয় এই, যে, নিন্দাকারীরা প্রকারান্তরে স্বীকার ও প্রচার করিতেছেন যে জাত্যহঙ্কার ভাল নয়। আমারও বিশ্বাস ঐরূপ। অধ্যাপক ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম। আমার পিতৃকুল মাতৃকুল শ্বশুরকুল ব্রাহ্মণ; কিন্তু, ঐরূপ বিশ্বাস-বশতঃ, আমি কৌলিক ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন দাবী ও অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছি, এবং ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী যে-কোন জাতির লোকের সহিত যে-কোন প্রকারে আমাকে মিশিতে হইয়াছে, তাহাতে আমি জ্ঞাতসারে জাত্যহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিই নাই। তথাপি, সকল মানুষকে সমান দেখিতে সমর্থ হইয়াছি, এতবড় অহঙ্কার ও আস্পর্দ্ধার কথা আমি মুখেও আনিতে পারি না। বংশের অহঙ্কার বিনাশের সাধনা সকলকেই করিতে হয়। আমাকে সংবাদপত্রে ও চিঠি লিখিয়া যাঁহারা তিরস্কার করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের ও আচরণের দৃষ্টান্ত দ্বারা জাত্যহঙ্কার বিনাশের সহায়তা করিলে, আমি যে গালি খাইতেছি, তাহাও আনন্দের বিষয় হইবে। ইতি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
প্রবাসীর সম্পাদক।

... শ্রী ... সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।